বাংলা

স্নাতকোত্তর (সি বি সি এস) কার্যক্রম

এম. এ. তৃতীয় সেমেস্টার

প্রথম পত্র

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

(ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্‌ট্যান্স লার্নিং)

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া - ৭৪১ ২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

পাঠ-প্রণেতা

অধ্যাপক ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. তাপস বসু — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামানিক — বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ডিসেম্বর, ২০১৯

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও

নিউ স্কুল বুক প্রেস, ৩/২ ডিক্সন লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১৪

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়-এর অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ-সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইনানুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের লেখক/পাঠ-প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of distance and reaching the unreached students are the threefold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellor has invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directoate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Sankar Kumar Ghosh, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of PGBOS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks is also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would especially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and co-ordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

পাঠক্রম

বাংলা

প্রতি পত্রে পূর্ণমান – ১০০

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম. এ. তৃতীয় সেমেস্টার

প্রথম পত্র

পর্যায় গ্রন্থ্ ঃ ১ জনা – গিরিশচন্দ্র ঘোষ (সময় ঃ ৪ ঘন্টা)

একক–১ ঃ 'জনা' নাটকের কাহিনি

একক–২ ঃ ট্র্যাজেডি নাটক হিসাবে জনা

একক–৩ ঃ 'জনা' নাটকে ক্রোড় অঙ্কের প্রয়োজনীয়তা

একক–৪ ঃ জনা ও নীলধ্বজ চরিত্র

পর্যায় গ্রন্থ্ ঃ ২ নূরজাহান – দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (সময় ঃ ৪ ঘন্টা)

একক–৫ ঃ 'নুরজাহান' নাটকের চরিত্র বিচার

একক–৬ ঃ ট্র্যাজেডি নাটক হিসাবে নুরজাহান

একক–৭ ঃ ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে 'নুরজাহান' নাটকের সার্থকতা

একক–৮ ঃ 'নুরজাহান' নাটকে ব্যবহৃত সঙ্গীতের তাৎপর্য

পর্যায় গ্রন্থ্ ঃ ৩ চণ্ডালিকা – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সময় ঃ ৪ ঘন্টা)

একক–৯ ঃ 'চণ্ডালিকা'র ভাব-উৎস

একক–১০ ঃ 'চণ্ডালিকা'র বস্তুসংক্ষেপ

একক–১১ ঃ 'চণ্ডালিকা'র শ্রেণিবিচার

একক–১২ ঃ প্রকৃতির চিত্তজাগরণে আনন্দের ভূমিকা

পর্যায় গ্রন্থ্ ঃ ৪ ছেঁড়া তার – তুলসী লাহিড়ী (সময় ঃ ৪ ঘন্টা)

একক–১৩ ঃ গণনাট্য আন্দোলন এবং তুলসী লাহিড়ী

একক–১৪ ঃ 'ছেঁড়া তার' নাটকের পটভূমি

একক–১৫ ঃ 'ছেঁড়া তার' নাটকের কাহিনি এবং চরিত্র বিশ্লেষণ

একক–১৬ ঃ 'ছেঁড়া তার' নাটকের সংলাপ

সূচিপত্র

প্রথম পত্র

প্রথম পত্র	একক	পাঠ-প্রণেতা	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ-১	১	অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামানিক	‘জনা’ নাটকের কাহিনি	১–৭
	২	অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামানিক	ট্র্যাজেডি নাটক হিসাবে জনা	৮–১০
	৩	অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামানিক	‘জনা’ নাটকে ক্রোড় অঙ্কের প্রয়োজনীয়তা	১১–১৩
	৪	অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামানিক	জনা ও নীলধ্বজ চরিত্র	১৪–২৭
পর্যায় গ্রন্থ-২	৫	অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামানিক	‘নুরজাহান’ নাটকের চরিত্র বিচার	২৮–৩৮
	৬	অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামানিক	ট্র্যাজেডি নাটক হিসাবে নুরজাহান	৩৯–৪৩
	৭	অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামানিক	ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে ‘নুরজাহান’ নাটকের সার্থকতা	৪৪–৫২
	৮	অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামানিক	‘নুরজাহান’ নাটকে ব্যবহৃত সঙ্গীতের তাৎপর্য	৫৩–৫৯
পর্যায় গ্রন্থ-৩	৯	অধ্যাপক ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক	‘চণ্ডালিকা’র ভাব-উৎস	৬০–৬৬
	১০	অধ্যাপক ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক	‘চণ্ডালিকা’র বস্তুসংক্ষেপ	৬৭–৭১
	১১	অধ্যাপক ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক	‘চণ্ডালিকা’র শ্রেণিবিচার	৭২–৭৭
	১২	অধ্যাপক ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক	প্রকৃতির চিত্তজাগরণে আনন্দের ভূমিকা	৭৮–৮১
পর্যায় গ্রন্থ-৪	১৩	অধ্যাপক ড. তাপস বসু	গণনাট্য আন্দোলন এবং তুলসী লাহিড়ী	৮২–৮৬
	১৪	অধ্যাপক ড. তাপস বসু	ছেঁড়া তার নাটকের পটভূমি	৮৭–৮৮
	১৫	অধ্যাপক ড. তাপস বসু	ছেঁড়া তার নাটকের কাহিনি এবং চরিত্র বিশ্লেষণ	৮৯–৯১
	১৬	অধ্যাপক ড. তাপস বসু	ছেঁড়া তার নাটকের সংলাপ	৯২–৯৬

প্রথম পত্র

পর্যায়গ্রন্থ - ১

জনা : গিরিশচন্দ্র ঘোষ

একক - ১

'জনা' নাটকের কাহিনী

বিন্যাসক্রম :

১.১.১.১ : ভূমিকা

১.১.১.২ : 'জনা' নাটকের কাহিনী

১.১.১.৩ : নাটকীয় বিরোধ

১.১.১.৪ : নামকরণ

১.১.১.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.১.১.১ : ভূমিকা

বাংলা নাটকের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নাম গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যে বাংলা নাট্য আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। গিরিশচন্দ্র ঘোষ শুধুমাত্র নাট্যকার বা অভিনেতা হিসেবে আমাদের মধ্যে স্থান পেয়েছেন, তাই নয় তিনি তাঁর পরবর্তী সময়ে বাংলা নাটক লেখা এবং অভিনয় জগতে প্রভাব বিস্তার করতে সাহায্য করেছেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ একদিকে ছিলেন নাটক রচয়িতা, অপরদিকে অভিনেতা, নাট্যশালার পরিচালক, নাট্যকর্মীদের শিক্ষক। এই বিবিধ কারণের জন্য সমকালীন সময়ে গিরিশচন্দ্র প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ সমকালে এবং পরবর্তীকালে যে পরিমাণ প্রশংসা লাভ করেছিলেন, তা খুব কম নাট্যকারেরাই অর্জন করেছেন। কোনো কোনো প্রসিদ্ধ সমালোচক তাঁকে ইংলন্ডের সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা গ্যারিকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু বলা প্রয়োজন, যে গ্যারিক শুধুমাত্র অভিনেতা ছিলেন, আর দু-একটি নাটক লিখেছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র একাধারে অভিনেতা, নাট্যকার, পরিচালক এবং নাট্যকর্মীদের শিক্ষক ছিলেন। আবার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তাঁকে মহান কবি বলেও উল্লেখ করেছেন। আবার আধুনিক যুগের নাট্যকার ও অভিনেতা উৎপল দত্ত মনে করেন,

> "গিরিশচন্দ্র ভারতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তো বটেই, তাঁর যেকোনো রচনা বিশ্বনাট্যসাহিত্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য।" আবার তাঁর নাটকে আকৃষ্ট হয়ে আবেগের বশে তাঁকে শেক্সপীয়রের পাশেও বসাতে চেয়েছেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাংলা ভাষায় ছন্দ এবং অলঙ্কারের প্রবর্তক ছিলেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কুমুদবন্ধু সেন বলেছেন—"আমার দৃঢ় বিশ্বাস। অদূর ভবিষ্যতে এমন একদিন আসিবে যখন জগতের সকল জাতি তাঁহার গ্রন্থাবলী ভক্তি সমাদরের সহিত পাঠ করিবে।"

নাট্যজগতে আবির্ভাব ঘটে গিরিশচন্দ্র ঘোষের একজন দক্ষ অভিনেতা হিসেবে। তিনি ছিলেন একজন সুঅভিনেতা ও মঞ্চ পরিচালক। অভিনয় করার মধ্য দিয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র সহ ঐ সময়ের একাধিক নাট্যকারের রচিত নাটক অভিনয় শেষ করেন। তারপরই বাংলা নাট্যসাহিত্যে একদিকে যেমন নতুন নাটকের অভাব ঘটল, তেমনি অপরদিকে, বাংলা নাটকের দর্শকদের একঘেয়েমি দূর করার জন্য প্রয়োজন পড়ল নতুন বাংলা মৌলিক নাটকের। এই সময়ে গিরিশচন্দ্র বাংলা নাট্যশালার প্রয়োজনে বাংলা নাটক লিখতে শুরু করলেন।

সমকালীন নাট্যশালা, নাটক, অভিনেতা-অভিনেত্রী দর্শক প্রভৃতি সম্পর্কে সবচাইতে বেশি অভিজ্ঞতা যার ছিল তিনি হলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। নাট্যশালা ও সাধারণ দর্শকের মনের মতো করে নাটক লেখার অভিজ্ঞতা একমাত্র গিরিশচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব ছিল। এই অভিজ্ঞতা অর্জনের সাফল্যে গিরিশচন্দ্র বাংলা নাট্য-সাহিত্যকে প্রায় ১০০টির মতো নাটক উপহার দিয়েছেন। যদিও সব নাটক মঞ্চসাফল্য এবং দর্শক অভিমনে স্থান লাভ করতে পারেনি। গিরিশচন্দ্র ঘোষ সুদীর্ঘকাল অভিনেতা-পরিচালক-নাট্যকার হিসেবে যে অবদান রেখেছেন তা বাংলা নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করেছে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের সুদীর্ঘকাল নাট্যসাহিত্যে অবস্থান করার ফলে ব্যক্তিগত ও অপরের ভাবনাচিন্তা আশ্রিত হয়ে তাঁর নাটক লেখায় পটপরিবর্তন লক্ষ করা যায়। রামকৃষ্ণদেবের ভাবনাচিন্তা তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। কখনো বা সমস্ত বন্ধনকে উপেক্ষা করে বৈরাগ্যের পথকে বেছে নিয়েছেন। তাঁর এই ভাবনা চিন্তার পরিবর্তন তাঁর নাটক রচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের চেষ্টাতে বাংলা নাটক সর্বপ্রথম উন্নীত হয়। নাট্যকর্মীদের প্রশিক্ষিণ দেওয়ার জন্য তিনি স্কুল স্থাপন করেন। বাংলার একাধিক নাট্যশালার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। ন্যাশনাল থিয়েটার থেকে শুরু করে ক্ল্যাসিক, মিনার্ভা, স্টার প্রভৃতি নাট্যশালার সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগাযোগ ছিল। তাঁরই হাতের তৈরি করা একাধিক পরিচালক এবং অভিনেতা জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, যেমন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, নটী বিনোদিনী প্রমুখেরা।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রায় ৩৫ বছর ধরে অভিনয় ও নাটক রচনায় নিয়োজিত ছিলেন। এই নাটকগুলির মধ্যে পৌরাণিক নাটক, পঞ্চ রং, গীতিনাটক, সামাজিক নাটক, ভক্তিরসাশ্রিত নাটক প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(ক) গীতিনাট্য : আনন্দ রহো (১৮৭৭), আগমনী (১৮৭৭), অকালবোধন (১৮৭৭), দোললীলা (১৮৭৮), মোহিনী প্রতিমা (১৮৮১) প্রভৃতি। অঞ্জলি গিরিশচন্দ্রের প্রথম দিকের রচনা।

(খ) পৌরাণিক নাটক : গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর পৌরাণিক নাটকের জন্যই সবচেয়ে বেশি খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর প্রতিভার মূল বৈশিষ্ট্য এই ধরনের নাটকে সর্বাধিক প্রকাশ পেয়েছে। যেমন - ১৮৮১ সালে প্রকাশিত — 'শিবের বিবাহ', 'রাসলীলা', 'রাবণ বধ', 'সীতার বনবাস', 'অভিমন্যু বধ', ১৮৮২ সালে - 'সীতার বিবাহ', 'ব্রজ বিবাহ', 'সীতা হরণ', ১৮৮৩ সালে - 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'দক্ষযজ্ঞ', 'ধ্রুবচরিত', 'নলদময়ন্তী', ১৮৮৪ সালে 'শ্রীবৎসচিন্তা', 'কমলে কামিনী', 'প্রহ্লাদ চরিত্র', 'বৃষকেতু', ১৮৮৫ সালে - 'প্রভাসযজ্ঞ', ১৮৯০ - 'মহাপূজা', ১৮৯৩ সালে - 'জনা', ১৯০০ সালে - 'মণিহরণ', 'পাণ্ডব গৌরব', 'নন্দদুলাল', ১৯০৫ সালে - 'হরগৌরী'।

(গ) জীবন চরিত্রমূলক নাটক : 'চৈতন্যলীলা' (১৮৮৪), 'বুদ্ধদেব চরিত্র' (১৮৮৫), 'নিমাই সন্ন্যাস' (১৮৮৮), ইত্যাদি। এগুলি জীবনচরিতমূলক হলেও মূলত ভক্তিরসাশ্রিত। তরল ভক্তিরস ও মধ্যযুগীয় দেববাদে সুগভীর বিশ্বাস এই নাটকগুলিতে ধরা পড়েছে।

(ঘ) সামাজিক নাটক : 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯), 'হারানিধি' (১৮৯০), 'মায়াবসান' (১৮৯৭), 'বলিদান' (১৯০৫), 'শাস্তি কি শাস্তি' (১৯০৭), ইত্যাদি।

(ঙ) ঐতিহাসিক নাটক : 'মীরকাসিম' (১৯০৪), 'অশোক' (১৯০৪), 'সিরাজদৌল্লা' (১৯০৬), 'ছত্রপতি শিবাজী' (১৯০৭), ইত্যাদি।

(চ) প্রহসন : 'সপ্তমীতে বিসর্জন' (১৮৮৫), 'বেল্লিক বাজার' (১৮৮৬), 'বড়দিনের বকশিস' (১৮৮৭), 'য্যায়সা কি ত্যায়সা' ইত্যাদি।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রকৃত উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে। তিনি হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য হৃদয়-প্রধান ভাবের আশ্রিত ভক্তিরসকে গ্রহণ করেছিলেন পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ভক্তিরসকে অবলম্বন করে পৌরাণিক নাটকে এক গণজোয়ার আনলেন। আর এই জোয়ারেই সমৃদ্ধশালী হয়েছে বাংলা নাট্যসাহিত্য তথা পৌরাণিক নাটক। এই সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র ঘোষ নিজেই তাঁর লেখনীর মধ্যে তুলে ধরেছেন —

> "জাতীয়বৃত্তি পরিচালিত ব্যাতীত কবিতা বা নাটক জাতীয় হিসাবে হিতকর হয় না। ভারতবর্ষের জাতীয়তার মর্মে ধর্ম, দেশ হিতৈষণা প্রভৃতি যত প্রকার কথা আছে তা হতে কেহ ভারতের মর্ম স্পর্শ করিতে পারিবে না। ভারত ধর্মপ্রাণ যাহারা লাঙ্গল ধরিয়া চৈত্রের রৌদ্রে হাল সঞ্চালন করিতেছে তাহারা কৃষ্ণ নামে আকৃষ্ট। যদি নাটকের সার্বজনিক হওয়া প্রয়োজন হয় তবে কৃষ্ণ নামেই হইবে। হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম। মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিত হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে। এই মর্মাশ্রিত ধর্ম বিদেশীর ভাষণ তরবারী ধার উচ্ছেদ হয় নাই।"
>
> (গিরিশচন্দ্র রচিত পৌরাণিক নাটক প্রবন্ধ, রঙ্গালয় পত্রিকা ৩০ চৈত্র, ১৩০৭)

তবে পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রেই গিরিশচন্দ্র বেশি সফল। তাঁর পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'জনা' (১৮৯৩) নাটকটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি নাটক। জনাই এই নাটকের প্রধান চরিত্র। তার স্বামী নীলধ্বজ এবং পুত্র প্রবীর। প্রবীর যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের ঘোড়া আটকালে অর্জুনের সঙ্গে প্রবীরের যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে প্রবীর নিহত হয়। অন্যদিকে প্রবীরের মাতা জনা প্রবীরের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করলে কৃষ্ণ তা ব্যর্থ করে দেয়। শেষপর্যন্ত জনা দুঃখদীর্ণ হয়ে গঙ্গাগর্ভে প্রাণ বিসর্জন দেয়। নাটকটি পৌরাণিক হলেও ভক্তিরসের আধিক্যে নাটকের সংঘাত অনেকটাই তরলীকৃত হয়ে পড়েছে। এ নাটকের আর একটি উল্লেখযোগ্য ও উপভোগ্য চরিত্র হল বিদূষক। তার মধ্যে দিয়ে কৃষ্ণভক্তির সুরটিকে তুলে ধরেছেন গিরিশচন্দ্র।

১.১.১.২ : 'জনা' নাটকের কাহিনী

প্রবীর কাহিনী, জনা কাহিনী এবং কৃষ্ণ কাহিনী — এই তিনটি কাহিনী 'জনা' নাটকের কাহিনী নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। নাটকের নামকরণ থেকে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে জনা কাহিনী এই নাটকের প্রধান কাহিনী। কিন্তু এই নাটকে জনা চরিত্রকে কেন্দ্র করে নাটকের ঘটনা আদৌ আবর্তিত হয়নি। শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করেই এই নাটকের কাহিনী বর্ধিত হয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক মহিমাময় রূপের ঐশ্বর্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে কাহিনীর উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতি ঘটেছে। গিরিশচন্দ্র প্রথম জীবনে উচ্ছৃঙ্খল হলেও পরবর্তী জীবনে রামকৃষ্ণদেবের প্রভাবে তিনি ভক্তির পথে পা বাড়িয়েছিলেন এবং সত্যিকারের হরিভক্তি পরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন, তা তাঁর নিজের কথাতেই স্পষ্ট—"একবার হরিনাম বলার, গুণ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। সকলে আশীর্বাদ করুন যেন হরিনামের গুণ আমাতে ফলবতী হয়।"

কৃষ্ণভক্তিতে আত্মহারা গিরিশচন্দ্র 'জনা' নাটকে সেই কৃষ্ণভক্তির কথাই বলেছেন। ফলে জনা ও প্রবীরের কাহিনী কৃষ্ণ কাহিনীর কাছে গৌণ হয়ে পড়েছে। আসলে জনা ও প্রবীর কাহিনী কৃষ্ণ কাহিনীর পরিপূরক হয়েছে এই নাটকে।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ নাটকের প্রথম অঙ্কে প্রবীরের কাহিনীকে উপস্থাপিত করেছেন, তা শুধুমাত্র কৃষ্ণের অলৌকিক কাহিনীকে রূপদানের জন্য। প্রবীর যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের ঘোড়া বন্দী করলে পাণ্ডবদের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে এবং সেই পরিস্থিতিতে কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে। শিবের বলে বলীয়ান প্রবীরের বিনাশ সাধনের জন্য হস্তিনানগর ত্যাগ করে পাণ্ডব শিবিরে কৃষ্ণের আবির্ভাব দিয়ে কাহিনী শুরু হয়েছে এবং কৈলাসে মহাদেব কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে অভয়দানের মধ্যে দিয়ে প্রথম অঙ্কের কাহিনী শেষ হয়েছে।

দ্বিতীয় অঙ্কে প্রবীর নিধনের পরিকল্পনাকে রূপ দিতে গিয়ে কৃষ্ণ প্রবীরের হৃদয়ে কামপ্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলার জন্য কাম ও রতিকে প্রবীরের কাছে পাঠিয়েছে।

তৃতীয় অঙ্কে প্রবীরের কাহিনী ক্রমপরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। প্রবীর রমণী মোহে পতিত হয়ে হারিয়েছে দুর্লভ অস্ত্র। শ্রীকৃষ্ণের প্রবীরকে বধ করার যে পরিকল্পনা তাও সফলতার দিকে এগোতে থাকে। ব্যভিচারী কার্যকলাপের আত্মগ্লানিতে মর্মবিদ্ধ প্রবীর নিজের মৃত্যু কামনা করে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় এবং শেষপর্যন্ত মৃত্যুকেই সে বরণ করে নেয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে প্রথম অঙ্ক থেকে তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত প্রবীর কাহিনীকে কেন্দ্র করে শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তিই প্রাধান্য পেয়েছে। পাণ্ডব শত্রু প্রবীরকে হত্যা করাই ছিল শ্রীকৃষ্ণের প্রধান লক্ষ। নাটকের কাহিনীও সেই দিকেই অগ্রসর হয়েছে। প্রবীরের মৃত্যু সেই উদ্দেশ্যকেই সফলতা দিয়েছে।

আবার চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে জনাকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ পেয়েছে। প্রবীরের মৃত্যু পাণ্ডবদের স্বস্তি দিতে পারেনি। কারণ জনা, অবশ্য প্রবীরকে বিনাশ করবার জন্য কৃষ্ণকে যে পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয়েছে, জনাকে তেজহীন করতে ততটা করতে হয়নি। চতুর্থ অঙ্ক থেকে জনাকে কেন্দ্র করে কাহিনী নতুন করে শুরু হলেও আসলে প্রাধান্য পেয়েছে কৃষ্ণকাহিনী। জনা কাহিনীর যা কিছু আকর্ষণ তা চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ইতি টেনে দিয়ে নাট্যকার কৃষ্ণকাহিনীকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্যই মাহিষ্মতীপুরে শ্রীকৃষ্ণের আগমনের চিত্র অঙ্কন করেছেন। পঞ্চম অঙ্কে বিদূষকের কৃষ্ণদর্শন ও জনার অলৌকিক মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে মাহিষ্মতীপুরের শান্তিস্থাপন প্রাধান্য পাওয়ার মধ্যে দিয়ে আসলে সেই কৃষ্ণের অলৌকিক শক্তিই প্রাধান্য পেয়েছে।

সুতরাং চতুর্থ অঙ্ক থেকে পঞ্চম অঙ্ক পর্যন্ত কৃষ্ণের অলৌকিক মায়া, মাহিষ্মতীপুরে আগমন ও দর্শনদানের মাধ্যমে কৃষ্ণকাহিনী রূপলাভ করেছে। আর জনা কাহিনীটি যেন কক্ষচ্যুত নক্ষত্র — যে কিনা নিঃসঙ্গিনী, একাকিনী।

তবে কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে কাহিনী আবর্তিত হলেও নাট্যকার ও নাটকের কাহিনী ঐক্য রচনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কারণ প্রবীর বা জনা কাহিনীর কোনোটিকেই গিরিশচন্দ্র পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে পারেননি। প্রথম অঙ্ক থেকে তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত প্রবীর কাহিনী প্রাধান্য পেয়েছে। আবার জনা প্রবীর কাহিনীর অন্তরালেই থেকে গেছে। চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কে জনাকে কেন্দ্র করে কোনো কাহিনী রচিত হয়নি; হয়েছে জনার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার বর্ণনা। তাই প্রবীর ও জনাকে অবলম্বন করে কৃষ্ণকাহিনীকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে নাট্যকার কাহিনী ঐক্যের প্রতি অবহেলা করেছেন। গিরিশচন্দ্র প্রাচ্য রীতি অনুযায়ী কাহিনী ঐক্য রচনা করেছেন, কার্যকারণ সূত্রের অনিবার্যতা বা অপরিহার্যতার নীতি নিয়ম অনুসারে নয়।

১.১.১.৩ ঃ নাটকীয় বিরোধ

এই নাটকের প্রধান বিরোধ প্রবীরের সঙ্গে পাণ্ডবদের। এই বিরোধের কথা প্রথম অঙ্কেই পরিলক্ষিত। জনার সঙ্গে কিন্তু পাণ্ডবদের সরাসরি কোনো বিরোধ ছিল না, জনা নিজেই প্রবীরের বিরোধকে নিজের মনে করে নেয়। আবার অপরপক্ষে কৃষ্ণ জানত যে জগতে একমাত্র অজেয় প্রবীর, তাই প্রবীর নিধনেই কৃষ্ণ সক্রিয় হয়েছিল। এই দিক থেকেও জনা কোনো প্রত্যক্ষ বিরোধের কেন্দ্রে আসে না। প্রত্যক্ষ বিরোধের কেন্দ্রে রয়েছে প্রবীরই। এই প্রত্যক্ষ বিরোধকেও যথাযথ রূপ দিতে ব্যর্থ গিরিশচন্দ্র। কারণ প্রবীর শেষপর্যন্ত পাণ্ডব বিরোধিতা ত্যাগ করে নিজের ব্যভিচারী জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়েই জীবন ত্যাগ করেছে। আবার কৃষ্ণের সঙ্গে প্রবীরের বিরোধেরও অবসান ঘটে অলৌকিক উপায়ে। আর জনার বিরোধ তো কোথাও-ই বাস্তব রূপ পায়নি। পুত্র শোকাতুরা নারীর হৃদয়ের কাতর ক্রন্দন ও জ্বালাময়ী ভাষণের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থেকেছে। আসলে মহাদেবের আশ্বাসদানই এই নাটকের বিরোধকে ইতিপূর্বেই অবসিত করেছে। পরবর্তীতে প্রবীর বিরোধের ঘটনা নেহাতই গতানুগতিক। এই অর্থে এ নাটকে আপাতদৃষ্টিতে যা বিরোধ বলে মনে হয় তা কিন্তু যথার্থ বিরোধ নয়, মুক্তিরই অপরদিক।

'জনা' নাটকের কাহিনীটি ট্র্যাজিক নয়। নাট্যকার প্রবীরের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কোনো বীরত্বের মহিমা বা মৃত্যুর গরিমাকে প্রকাশ করেননি। বরং প্রবীরের মৃত্যু সুপরিকল্পিত। প্রবীর মহাদেবের কিঙ্কর। স্বর্গচ্যুত এই কিঙ্করের স্বর্গে প্রত্যাবর্তনের জন্যই প্রবীর কাহিনী সৃষ্টি। সুতরাং প্রবীরের মৃত্যুর মধ্যে অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ের বেদনা জেগে ওঠে না। অন্যদিকে জনাও গঙ্গাজলে আত্মনিমগ্ন হয়ে জাগতিক দুঃখ ও পাপের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে চয়েছে। সুতরাং প্রবীরের জীবনও ট্র্যাজিক নয়। জনার জীবনও নয়। অমরাবতীতে প্রত্যাবর্তনের লোভেই যেন জীবন ত্যাগের আকৃতি ও আর্তি ফুটে উঠেছে।

নাট্য কাহিনী রচনাতে অনেক অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। প্রবীর হত্যার ঘটনা থেকে শুরু করে জনার তেজ হরণ এবং জনার তেজকে অলৌকিক তেজে রূপ দেওয়া, গঙ্গারক্ষীদের অলৌকিক কার্যকলাপ, তাদের অশরীরী অবস্থিতি, বিদূষকের রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিদর্শন প্রভৃতি অলৌকিক। এত অলৌকিক কাহিনীর উপস্থাপনায় আসল কাহিনীটিই গুরুত্ব হারিয়েছে। অতিপ্রাকৃতকে প্রাকৃত করে তোলা হল একটা আর্ট। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ সেই আর্টের অধিকারী নন। ফলে অতি প্রাকৃতের উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে নাট্যকাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে নিজের সৃষ্টির দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে।

নাটকটি কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা দিয়ে শুরু হয়নি, শেষও হয়নি। ধর্মের জয় দেখানোই এই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। মাহিষ্মতীপুরে পাপ সেইদিনই প্রবেশ করেছে যেদিন কৃষ্ণ বিরোধিতা প্রকাশিত হয়েছে। তাই দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই এখানে একমাত্র উদ্দেশ্য, কৃষ্ণের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপই প্রধান লক্ষ, জনার গঙ্গালাভের মধ্যেই শাপ, তাপ ও পাপের হাত থেকে মুক্তি। ফলে এখানে আক্ষরিক অর্থে কোনো ট্র্যাজেডি নেই। বিয়োগান্ত হলেও এর পরিণতি হয়েছে 'মধুরেণ সমাপয়েত'।

১.১.১.৪ : নামকরণ

সাহিত্যে নামকরণের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই নামকরণ কয়েকটি বিষয়ের উপর লক্ষ রেখে করা হয়। বিষয়বস্তু, প্রধান-প্রধান চরিত্র, প্রধান ঘটনাকে কেন্দ্র করে নামকরণ করা হয়। আবার ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণের রীতিও সাহিত্যে বহুল প্রচলিত। 'জনা' নাটকের ক্ষেত্রে এই নামকরণ করা হয়েছে চরিত্রকে কেন্দ্র করে। এই নাটকটিতে জৈমিনী মহাভারত, কাশীরাম দাসের মহাভারত অনুসরণ লক্ষ করা যায়। এই নাটকের

অবয়ব নির্মাণে জৈমিনী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের পঞ্চদশ অধ্যায়ের 'গঙ্গাশাপ' বৃত্তান্তে জনার নাটকীয় ক্রিয়াকলাপকেই নাট্যকার গ্রহণ করেছেন, কিন্তু পার্থক্য আছে। জৈমিনী মহাভারতে 'জনা' চরিত্রটি জ্বালা নামে অভিহিত হয়েছে। জৈমিনী ও কাশিদাসী মহাভারতে কাহিনী বিন্যাসে, চরিত্রগুলির আচরণে পারস্পরিক সাদৃশ্য লক্ষ করা গেলেও গিরিশচন্দ্র জনা চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের এবং প্রতিহিংসার রূপটি সার্থক ভাবে তুলে ধরেছেন।

'জনা নাটকের নায়িকা ও প্রধান চরিত্র জনাই। তিনি রাজমহিষী এবং বীর পুত্রের জননী। তার নির্ভিক মানসিকতার পরিচয় কাশিরাম দাস যেমন দিয়েছেন তেমনি মধুসূদনও তাঁর 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পত্রেও দিয়েছেন। আবার শেক্সপীয়রের 'রিচার্ড দ্যা থার্ড' নাটকের রানী মার্গারেট চরিত্রের প্রভাবও জনার মধ্যে লক্ষ করা যায়। বীরত্ব, নির্ভীকতা এবং ব্যক্তিত্বের সার্থক প্রতিমূর্তি হল জনা। প্রবীর যখন পিতার কাপুরুষতার জন্য কর্তব্য পালনে বিমুখ তখন মাতা জনাই তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে কর্তব্য পালনের জন্য। পতিভক্তি ও কর্তব্যবোধের মধ্যে জনার কাছে কর্তব্যবোধই জয়ী হয়েছে। আবার অলৌকিক শক্তির নির্ভরতাও জনা চরিত্রে বিদ্যমান ছিল। বিশেষ করে গঙ্গাভক্তি। পুত্রের প্রতি তার একটি উক্তিতেই তা প্রমাণিত—

"কারে ভয় / জাহ্নবী সহায় / স্মরিয়ে জাহ্নবী পদ

প্রবেশ সমরে / পাণ্ডব সহায় যদি বুঝে

জুরন্দর / তবু জয় হইবে সমর।"

জনা যে তেজস্বিনী নারী তার প্রমাণ পাওয়া যায় স্বামী নীলধ্বজকে বলা একটি কথাতে—

"ধন্য ধন্য মহারাজ / দাসত্বে আনন্দ তব

রাখিলে ক্ষত্রিয় কীর্তি অতুল জগতে / পুত্রঘাতী বিপক্ষের দাস।"

এইভাবেই জনা বার বার তার নিজ অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে নাটকের মধ্যে।

বীর পুত্র প্রবীরের মৃত্যুর পর জনা মর্মান্তিক শোকে প্রায় বাহ্যজ্ঞানহীন হয়ে পড়ে। এই ঘটনার সঙ্গে শেক্সপীয়রের রানী মার্গারেটের সাদৃশ্য অনেকখানি লক্ষ করা যায়। রানী মার্গারেটও পতি-পুত্র শোকে প্রায় উন্মাদিনী হয়ে গিয়েছিল। নাটকটিতে জনা ও প্রবীরকে কেন্দ্র করে নাটকীয় জীবন দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটেছে। নাটকে পুত্র ও মাতার ব্যক্তিত্বই সর্বত্র প্রকাশিত। অন্যদিকে জনা চরিত্রের সুতীব্র পাণ্ডব বিদ্বেষ, স্বামী ও অন্যান্য কৃষ্ণভক্তদের ক্ষেত্রে বিদ্বেষপরায়ণ মনোভাবও প্রকটিত। প্রতিহিংসার অগ্নিকন্যা চরিত্রটিকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে লৌকিক ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছে।

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে জনা পৌরাণিক নাটক। আর পৌরাণিক নাটকে ট্র্যাজিক পরিণতি ঘটেনা। দুঃখ-আঘাত-সংঘাত এ সবই মধ্যেকার ঘটনা। পরিণতিতে শান্তি ও মুক্তি। আর সেই পথ রেখেই নাটকের শেষে যুক্ত হয়েছে ক্রোড় অঙ্ক। এই ক্রোড় অঙ্কে জনা স্বর্গে গমন করে হর-পার্বতীকে দর্শন করেছে। সেখানে জনাকে দেখা যায়—

"নহে আর পুত্র শোকে উন্মাদিনী / প্রবঞ্চ বুঝিয়ে

ভূতা, মন কর স্থির।"

আলোচনার পরিশেষে তাই বলা যায় যে প্রথাগত ভঙ্গিমাতেই নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'জনা' নাটকের নামকরণ করেছেন। পৌরাণিক নাটকে প্রধানত মূলরস হিসেবে ভক্তিরসকেই বেছে নেওয়া হয় এবং

তারই মাহাত্ম্যকীর্তন করা হয়। 'জনা'তেও তাই-ই ঘটেছে। জনা চরিত্রের বহুমুখীতার পরিচয় তুলে ধরে নাট্যকার শেষপর্যন্ত জনার মধ্যে দিয়ে দেবমাহাত্ম্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেই দিক থেকে নামকরণ যথাযথ হয়েছে।

১.১.১.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'জনা' নাটকের গঠন কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করো।

২। পৌরাণিক নাটকরূপে 'জনা' কতদূর সার্থক—তা' দৃষ্টান্ত সহযোগে আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

৩। 'জনা' নাটকের নামকরণ কতদূর সার্থক—তা' দৃষ্টান্ত সহযোগে আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

৪। 'জনা' নাটকের নাটকীয় বিরোধ সম্পর্কে তোমার সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করো।

——————

একক - ২

ট্র্যাজেডি নাটক হিসেবে 'জনা'

বিন্যাসক্রম :

১.১.২.১ : ট্র্যাজেডি নাটক হিসেবে 'জনা'
১.১.২.২ : 'জনা' নাটক : নব্য পুরাণ
১.১.২.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.১.২.১ : ট্র্যাজেডি নাটক হিসেবে 'জনা'

পৌরাণিক নাটকের মূল সুর ছিল ধর্মচিন্তা, ভক্তিরস, দেবমাহাত্ম্য প্রভৃতি ফলে পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডির পরিণতি ও আঙ্গিক সবক্ষেত্রে পৌরাণিক নাটকে মেনে চলা সম্ভব হয়নি। আবার সংস্কৃত নাটকের রীতি ছিল মিলনাত্মক, তা কখনো বিয়োগান্তক ছিল না। কাজেই বাংলা নাটকেও অনেকক্ষেত্রে সংস্কৃত নাটকের মিলনান্তক পরিণতিকেই অনুসরণ করা হয়েছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'জনা' নাটকটিতেও জনার ট্র্যাজিক পরিণতিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ট্র্যাজেডির ভাবকে এ নাটকে রক্ষা করতে পারেননি।

অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন—ট্র্যাজেডির বিষয় হবে গুরুগম্ভীর। নায়ক বা নায়িকার চরিত্রের কোনো ভুল (Error) থেকেই ঘটবে তার পতন। সেই পতন দেখে দর্শক মনে একই সঙ্গে করুণা ও ভীতির (Pity and Fear) উদ্রেক ঘটবে। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে চরিত্রের ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে দায়ী থাকে নিয়তি, আর শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডিতে নিয়তির সঙ্গে সঙ্গে মানব চরিত্রের দুর্বলতাও ট্র্যাজেডির উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই দুর্বলতাকে বলা হয়েছে অহংকার ও ত্রুটি। চরিত্রের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে সে ট্র্যাজিক পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়।

এবার আমরা 'জনা' নাটকটির দিকে আলোকপাত করব। নাটকটিতে নায়িকার প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই 'জনা'কে 'She tragedy' বললেও সঙ্গত হয়। জনা ক্ষাত্র বংশীয় নারী। তিনি পুত্রকে বীরধর্ম পালনে উৎসাহিত করেছেন। আর তা করতে গিয়ে পুত্রের যদি কোনো অমঙ্গল ঘটে সেক্ষেত্রে তিনি অশ্রু বিসর্জন করবেন না। পুত্রবধূকে তিনি বলেছেন জয়-পরাজয় যুদ্ধের নিয়ম। অতএব তার কর্তব্য হল স্বামীকে যুদ্ধে উৎসাহ দেওয়া। এইভাবে জনা চরিত্রটির মধ্যে যথার্থ ব্যাক্তিত্বের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন নাট্যকার। জনার মধ্যে একটি অর্ন্তদ্বন্দ্ব ছিল। একদিকে গঙ্গার প্রতি তার ছিল অচলাভক্তি, অন্যদিকে শিব ও পার্বতীর প্রতি তার মন যথেষ্ট ভক্তিনির্ভর ছিল না। এই দ্বন্দ্বই জনাকে সক্রিয় করে রেখেছে। সকলে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিপরবশ হলেও জনা কিন্তু ছিল কৃষ্ণবিমুখ। জনার আদেশেই প্রবীর অর্জুনের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বটিকে আটকে রাখে এবং অনিবার্য যুদ্ধে প্রবীর প্রবল বীরত্ব প্রদর্শন করে। জনা সর্বদাই প্রবীরকে যুদ্ধে উৎসাহিত করেছে। সে বলেছে —"রণে যেতে পুত্রে আমি কভু না বারিবঙ্গ"

এহেন জনার জীবনে চরম আঘাত নেমে আসে প্রবীরের মৃত্যুতে। সে হয়ে ওঠে প্রতিহিংসা পরায়ণ। প্রতিশোধ নিতে চাইলে সে তার স্বামী নীলধবজকে সঙ্গে পায় না। কারণ নীলধবজ কৃষ্ণভক্ত। অর্থাৎ দেখা যায় জনার দ্বন্দ্ব শুধু হৃদয়েরেই নয়, বাইরের জগতের সঙ্গেও তাকে নিয়ত সংগ্রাম করতে হয়েছে। নাট্যকার গিরিশ ঘোষ জনা চরিত্রটি পরিকল্পনায় মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা', 'প্রমীলা', শেক্সপীয়রের

'রিচার্ড দ্য থার্ড, প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সুতরাং জনাকে যে একটি ট্র্যাজিক নায়িকা হিসেবে তুলে ধরার আকাঙ্ক্ষা নাট্যকারের ছিল তা গোপন থাকেনি।

জনা চরিত্রটি বিশ্লেষণ করলে চরিত্রটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। জনা বীর রমণী, বীর পুত্রের জননী এবং ভক্তিমতী, পতিভক্তি, বাৎসল্য ও আধ্যাত্মিক নিষ্ঠা এই তিনটির ত্রিবেণী সঙ্গমে চরিত্রটি যথার্থই নাটকীয়তা লাভ করেছে। এতদসত্ত্বেও চরিত্রটি ট্র্যাজিক হয়ে উঠতে পারেনি। জনা শেষপর্যন্ত গঙ্গাবক্ষে আত্মসমর্পণ করে নিজের সমস্ত দুঃখকে ভুলতে চেয়েছে। এখানেই জনার জীবনের ট্র্যাজেডি। আপন কর্ম প্রেরণা ও নৈতিক শক্তিতে অচল থেকে তিনি যে সংগ্রাম করেছেন তাকে নাট্যতত্ত্বের ভাষায় 'Spectacle of doing something horriable' বললে ভুল হয় না। অন্যদিকে প্রবীরের মৃত্যুর তীব্র বেদনা আমাদের মনে 'Sufferings of something terriable' বলা যেতে পারে। এদিক থেকে বলা যায় জনা চরিত্রের মধ্যে ট্র্যাজিক উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। গঙ্গাবক্ষে জনার আত্মবিসর্জন দর্শকের মনে 'Pity' ও 'Fear' জাগিয়ে তোলে।

তবে শেষপর্যন্ত দেখা যায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ পৌরাণিক নাটকের নিয়মকে মানতে গিয়ে জনা চরিত্রটির ট্র্যাজিক ভাবকে অঙ্কুরে বিনাশ করেছেন। নাটকের শেষে একটি 'ক্রোড় অঙ্ক' যুক্ত করা হয়েছে। এখানে পূর্বাপর সঙ্গতিযুক্ত জনা চরিত্রটি স্বভাবধর্মে বিচ্যুত হয়েছে। এখানে জনাকে দেখা গেছে —

"নহে আর পুত্র শোকে উন্মাদিনী

প্রপঞ্চ বুঝিয়ে ভূপ মন কর স্থির।"

ট্র্যাজেডির সমস্ত উপাদানগুলি সুচারুরূপে ব্যবহার করা সত্ত্বেও ভক্তিরসের পরিপূর্ণতার জন্য জনার রূপান্তর ঘটিয়েছেন নাট্যকার এবং শেষে জনা চরিত্রের শাস্ত্রসম্মত রূপান্তর ঘটিয়েছেন। আর এখানেই 'জনা' নাটকের জনা চরিত্রটি ট্র্যাজেডির সমস্ত সম্ভাবনার আলো জ্বালিয়ে শেষপর্যন্ত ট্র্যাজিক হয়ে উঠতে পারেনি।

১.১.২.২ : 'জনা' নাটক : নব্য পুরাণ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা নাটকের প্রারম্ভকাল থেকেই ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক ও বিষয়কে কেন্দ্র করে নাট্যকাররা নাটক লিখতে শুরু করেন। বাংলা নাটক প্রথম দিকে সংস্কৃত নাটক থেকে বিষয় গ্রহণ করলেও পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য নাটকের দ্বারাই বেশি প্রভাবিত হয়েছিল। ফলে পাশ্চাত্য নাটকের জীবনবোধ, আদর্শ, গঠনরীতি এবং নব্যচিন্তার প্রভাব বাংলা নাটকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষও সেই পথকে অনুসরণ না করে থাকেননি। তাঁর নাটকেও পাশ্চাত্য প্রভাব সুদৃশ্য ও সুস্পষ্ট। তবে তা করতে গিয়ে সবক্ষেত্রেই যে তিনি সফল হয়েছেন এমন কথাও বলা যায় না।

উনিশ শতকীয় নাট্যধারার মধ্যে বহুল জনপ্রিয় ছিল পৌরাণিক নাটকের ধারা, যেগুলি বাঙালীকে সারা বিশ্বের মানুষের চাইতে স্বতন্ত্র করেছে। সেই ভক্তিভাব, ধর্মবিশ্বাস, আবেগময়তা প্রভৃতিকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে পৌরাণিক নাটকে। গিরিশচন্দ্রের 'জনা' নাটকটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

পৌরাণিক নাটকের প্রধান বিষয় পুরাণ কথিত কথা। এছাড়া দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন, অলৌকিক, অপ্রাকৃত ঘটনা পৌরাণিক নাটককে আকর্ষণীয় করে তোলে। এই ধরনের নাটকের মূলরস হল ভক্তিরস এবং নাটকের শেষে দেবতার জয় দেখান হয়। 'জনা' নাটকেও এই শর্তগুলি পালন করা হয়েছে। তবুও 'জনা'র কাহিনী ও উপস্থাপনা অনেকক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য অনুসারী। এই নাটকে তাই পুরাণ কাহিনীর পাশাপাশি নব্য ভাবনাচিন্তার ছাপ লক্ষ করা যায়।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'জনা' নাটকটি রচনার ক্ষেত্রে জৈমিনী মহাভারত, কাশীরাম দাসের মহাভারত প্রভৃতি থেকে কাহিনী গ্রহণ করেছেন। চরিত্র, কাহিনী বিন্যাসের ধারা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট শিল্পসার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন।

এছাড়া মধুসূদনের জনা পত্রিকাটিও গিরিশচন্দ্রের স্মরণে ছিল। তবে গিরিশচন্দ্র নাটকটি লিখতে গিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিষয় সংগ্রহ করলেও নিজস্বতার পরিচয় তিনি রেখেছেন। তাই বহু জায়গায় মূল পুরাণের চেয়ে অধিকতর মানবমুখী হয়ে উঠেছে।

পৌরাণিক নাটকে প্রধানত মিশ্র রসের পরিচয় পাওয়া যায়। 'জনা'তেও মিশ্ররীতির প্রয়োগ লক্ষণীয়। যদিও এই নাটকে গিরিশচন্দ্র ভক্তিরসের মাধুর্যকে তুলে ধরতেই প্রয়াসী হয়েছেন তা সত্ত্বেও এখানে নারী জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতই বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। এই কারণে জনা চরিত্র হয়ে উঠেছে অনেক মানবিক।

কাশীরাম দাসের মহাভারত থেকে কাহিনী গ্রহণ করলেও গিরিশচন্দ্র কাশীরাম দাসের চেয়ে কতগুলি স্বতন্ত্র সৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। যেমন নীলধবজের কৃষ্ণভক্তি। কাশীদাসী মহাভারতে নীলধবজ ভক্তিপ্রবণ হয়ে নয়, ভয়বশতই কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করে। কাশীরাম দাসের নীলধবজ সম্মুখে পুত্রকে নির্মমভাবে নিহত হতে দেখে ও নিজের প্রাণরক্ষার্থে ক্ষত্রিয়রূপ সমস্ত গুণগুলিকে তুচ্ছ করে। গিরিশচন্দ্র নীলধ্বজকে যথার্থ কৃষ্ণভক্ত রূপে দেখিয়েছেন। উনিশ শতকীয় নব্যদৃষ্টিকোণ থেকেই গিরিশচন্দ্র মহাভারতের কাহিনীকে দেখেছিলেন।

আবার জনা চরিত্রের ক্ষেত্রেও গিরিশচন্দ্র পরিবর্তন আনেন। জনা চরিত্রের উপর শেক্সপীয়রীয় নারী চরিত্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। ফলে চরিত্রটি বাঙালী নারীর মতো স্বভাবকোমল হয়ে ওঠেনি বরং তেজদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। সে নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু কাশীরাম দাসের জনা ছিল অনেক ভীরু। সেই ভীরুতা গিরিশচন্দ্রের জনায় স্থানতো পায়-ই-নি বরং পুত্রঘাতীর কাছে আত্মসমর্পণকারী স্বামীর প্রতি দুর্মর ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে।

প্রবীর চরিত্রের ক্ষেত্রেও শেক্সপীয়রের কাছে ঋণী গিরিশচন্দ্র। 'A mid Summer night's dream' নাটক থেকে প্রবীরের চরিত্র অঙ্কনে তিনি সাহায্য নিয়েছেন। এছাড়া জনা নাটকে মায়াকাননের মায়া কুমারীদের অঙ্কন কার্যটিও শেক্সপীয়রীয় রীতিরই অনুসরণ।

কাজেই বলা যায় যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ জনা নাটক রচনার ক্ষেত্রে সমকালীন ভাব ও ভাবনার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। একথা ঠিক যে পৌরাণিক নাটক রচনাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তা সত্ত্বেও জনা নাটকের কাহিনী ও চরিত্র পরিকল্পনায় গিরিশচন্দ্র নব্য পুরাণের এক বিশেষ চেতনাকে স্থান দিয়েছেন, যার ফলে নাটকটি সমকালীন দর্শক পাঠক এমনকি এ কালের নাট্যপ্রিয় মানুষের কাছে ভীষণ আকর্ষণীয় একটি নাটক।

১.১.২.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'জনা' নাটকটিতে কী সার্থক ট্র্যাজেডি বলা যায়?—নাটকের পরিণতি আলোচনা করে তোমার বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করো।

২। 'জনা' নাটকের সংগীতগুলির গুরুত্ব আলোচনা করো।

৩। 'জনা' নাটকের সংলাপ সম্পর্কে তোমার মতামত জানাও।

——————

একক - ৩

'জনা' নাটকে ক্রোড় অঙ্কের প্রয়োজনীয়তা

বিন্যাসক্রম :

১.১.৩.১ : 'জনা' নাটকে ক্রোড় অঙ্কের প্রয়োজনীয়তা
১.১.৩.২ : 'জনা' ভক্তিরস
১.১.৩.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.১.৩.১ : 'জনা' নাটকে ক্রোড় অঙ্কের প্রয়োজনীয়তা

ক্রোড় অঙ্ক হল একটি বিশেষ নাট্যআঙ্গিক যা সাধারণত পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে দেখা যায়। পৌরাণিক নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি নানা রকম ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে নাট্যপরিণতিতে এসে একেবারে বিধ্বস্ত (সাধারণত দৈব শক্তির ক্রীড়নক হয়ে পড়ে) ও ট্র্যাজিক চরিত্রে পরিণত হয়। কিন্তু পৌরাণিক নাটকের শর্তানুসারে পৌরাণিক নাটক হয় মিলনান্তক; বিয়োগান্তক নয়। এই শর্ত পালনের জন্য ট্র্যাজিক চরিত্রগুলিকে শেষপর্যন্ত শেষ দৃশ্যে এমনভাবে তুলে ধরা হয় যাতে দেখা যায় তাদের কোনো দুঃখ শোক নেই, তারা দেবতার পাদপদ্মে নিবেদিত প্রাণ। পৌরাণিক নাটকের এই শেষ দৃশ্যকে বলা হয় ক্রোড় অঙ্ক। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষও তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির পরিণতিতে ক্রোড় অঙ্ককে নানা নামে অভিহিত করেছেন। 'দোললীলা' নাট্যগীতির ক্ষেত্রে যার নাম 'পটপরিবর্তন', 'সীতাহরণ' এর ক্ষেত্রে তাই 'অন্তরীক্ষ'। আবার 'পাণ্ডব গৌরব' এ ক্রোড় অঙ্কের নাম 'পটপরিবর্তন'। 'জনা'-তে ক্রোড় অঙ্কটি ক্রোড় অঙ্ক নামেই অভিহিত হয়েছে।

তবে এই ক্রোড় অঙ্কের অবতারণার ফলে জনা চরিত্রটি ট্র্যাজিক হয়ে উঠতে পারেনি। জনার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সে পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক পর্যন্ত লড়াই করেছে। তারপর যখন সে বুঝতে পেরেছে যে প্রতিশোধ গ্রহণে সে ব্যর্থ হবে তখন গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়াকেই একমাত্র পথ হিসেবে বেছে নেয়। কিন্তু পৌরাণিক নাটকের দাবি মেটাতে গিয়ে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র এরপর একটি ক্রোড় অঙ্ক যুক্ত করলেন। আসলে উনিশ শতকে কৃষ্ণচর্চার এক নতুন ঢেউ উঠেছিল সেই কৃষ্ণভক্তি প্রকাশের জন্যই এই ক্রোড় অঙ্কের অবতারণা।

'জনা' নাটকের শেষে ক্রোড় অঙ্ক যুক্ত করার ফলে একদিকে যেমন পৌরাণিক নাটকের শর্ত রক্ষিত হয়েছে, অন্যদিকে দর্শকদের মিলনান্তক নাট্য পরিণতি দর্শনের ক্ষুধা মিটেছে। বাংলা পেশাদার মঞ্চে ক্রোড় অঙ্ক যুক্ত এবং বর্জিত 'জনা' নাটকের দুই ধরনের প্রয়োজনাই নাট্যদর্শকরা দেখার সুযোগ পেয়েছেন। একদল দর্শক ক্রোড় অঙ্কে জনা-প্রবীর-মদনমঞ্জরীকে জীবন্ত ফিরে পেয়ে খুব খুশি হত। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত নাট্যসমালোচক ড. দর্শন চৌধুরী বলেছেন —

> "দর্শককে তিনি সচেতনভাবেই ঠকিয়েছেন। ট্র্যাজেডিকে মিলনান্তক করা তো হাস্যকর, গিরিশ সেটি ভালভাবেই জানতেন। এইভাবে গিরিশের বিয়োগান্তক পরিণতি ক্রোড় অঙ্কের মেলতায় প্রশান্তি লাভ করেছে। দর্শক পরিতৃপ্ত হয়েছে।"

অন্যদিকে বিদেশি ট্র্যাজেডি নাটক দেখা একদল দর্শককে খুশি করতে নাট্যচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ি

ক্রোড় অঙ্কটি বাদ দিয়ে অভিনয় করতেন। নাট্যমন্দিরে শেষ দৃশ্যের যবনিকা নেমে আসত গঙ্গার এই সর্বশেষ উক্তিতে—“অর্জুন শোণিতে কর শীতল আমায়।”

মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে তখন তীব্র বিষাদের ছায়া। ক্যাথারসিসের প্রবাহ। আধুনিক দর্শকরা এতে সন্তুষ্ট হত। তাই দেখা যাচ্ছে যে পৌরাণিক নাটকের শর্তটি পালনের জন্য ক্রোড় অঙ্কের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও নাট্যমঞ্চায়নের বা অভিনয়ের ক্ষেত্রে এই ক্রোড় অঙ্কটি দেখানো বাধ্যতামূলক ছিল না।

১.১.৩.২ : ‘জনা’ নাটকে ভক্তিরস

বাঙালী ভক্তিপ্রবণ জাতি। এই ভক্তির ফল্গুস্রোত বাঙালীর অন্তরে আবহমানকাল থেকেই প্রবাহিত। ভক্তি যেমন বাঙালীর জীবনের একটি অঙ্গ তেমনি এই ভক্তিকে বাঙালী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপে আস্বাদন করতে চায়। বাংলা নাট্যসাহিত্যও সেই ভক্তিরসকে বাদ দিয়ে অগ্রসর হতে পারেনি। গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর পৌরাণিক নাটকে সেই ভক্তিরসকে পরিবেশন করে বাঙালীর মনে একটি স্বতন্ত্র জায়গা করে দিয়েছে। আমরা তাঁর ‘জনা’ নাটকটিতে সেই ভক্তিরসের প্রসঙ্গটি আলোচনা করবো। আমরা এখানে বিভিন্ন চরিত্রের কিছু সংলাপের নিরিখে ‘জনা’ নাটকের ভক্তিরসের বিষয়টি আলোচনা করব—জনার গঙ্গাভক্তি ঞ্জ জামাতা অগ্নির কাছে বর প্রার্থনা—

“যেন অন্তকালে গঙ্গাজলে
ত্যাজি প্রাণবায়ু ;
ভাগীরথী পদে মতি রহে চিরদিন ;”

নীলধ্বজের কৃষ্ণভক্তি ঞ্জ

“রানী, শোক কর দূর,
কৃষ্ণ দরশন পাব পাণ্ডব কৃপায় ;
নরদেহ পবিত্র হইবে।”

প্রবীরের মাতৃভক্তি ঞ্জ

“ত্রিপুরারি হন যদি অরি,
তাঁরে নাহি ডরি, —
মার নাম কবচ আমার।”

মদনমঞ্জরীর পতিভক্তি ঞ্জ

“প্রাণপতিঙ্গ কাঁদে সতী,
সোহাগে কর হে সাথী;
যাই যাই, প্রাণেশ্বর ডাকে মমঙ্গ”

আবার জনা মদনমঞ্জরীকে পতিভক্তি শিক্ষা দেয় —

“আরে হীনমতি,
পতি-ভক্তি এই কি তোমারঙ্গ

কে বা সে অর্জুন? — কে বা নারায়ণ?

পতিভক্তি এই কি তোমার?”

স্বাহার পতিভক্তি ঃ স্বামী অগ্নির প্রতি সংলাপ

“হই যেন পতি সোহাগিনী,

পতির সেবায় অলস না হই কভু।

ভুল না গো কন্যা তব জননী বিহীনা।”

জনা নাটকে ভক্তির নানা রূপের পরিচয় উপরোক্ত সংলাপগুলিতে স্পষ্ট। কাজেই নাটকটিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর ‘ভক্তিরত্নাকর’ বলা যুক্তিযুক্ত।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের পূর্বে যেসব নাটক রচিত হয়েছে এবং শৌখিন রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছে তাতে পরিপূর্ণ ভক্তিরস কোথাও ছিল না। গিরিশচন্দ্র পেশাদার রঙ্গমঞ্চের নাট্যকার, নট ও নাট্যপরিচালক রূপে বুঝেছিলেন যে, কৃষ্ণযাত্রার রসে পুষ্ট বাঙালী দর্শকরা নাটকের মধ্যে কৃষ্ণভক্তিকে আস্বাদন করতে চায়। সেই কারণেই গিরিশচন্দ্র তাঁর বৃষকেতু, চৈতন্যলীলা, নিমাই সন্ন্যাস, রূপসনাতন, বিল্লমঙ্গল ঠাকুর এবং জনা নাটকের মধ্যে কৃষ্ণভক্তির প্লাবন এনে দিলেন।

‘জনা’ নাটকের মধ্যে কৃষ্ণভক্তির দিক থেকে বিদূষক চরিত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদূষকের কৃষ্ণভক্তি হল সখ্যভক্তি। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিদূষক বলেছেন— “যে হয় তোমার অনুগত, তারে কাঁদাও অবিরত।” প্রকৃতপক্ষে রাধার কৃষ্ণভক্তির বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে দুঃখ বরণের চিত্র আছে। ‘জনা’ নাটকে বিদূষক যেন সেই অহৈতুকী মঞ্জরীভাবের ভক্তিরসের কথাই বলেছে। কৃষ্ণের কৃপা লাভ করতে হলে দুঃখ, কষ্ট, বেদনার মধ্যে দিয়েই যেতে হয়। নীলধবজের নিঃসঙ্গ ভক্তি সাধনায় পারিবারিক দুঃখের ছাপ পড়েছে। আবার জনাও বহুদুঃখের মধ্যে দিয়ে ক্রোড় অঙ্কে এসে পৌঁছেছে। বৈষ্ণবদর্শনে কৃষ্ণবিশ্বাসই মূল শক্তি, জনা নাটকে বিদূষকের চরিত্রে সেই বৈষ্ণবীয় ‘বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালী গীতা, ভাগবত, মিল, বেন্থামের দ্বারা শিক্ষিত হয়ে উঠছিল। এই সময় বাঙালী কোনো কিছুকে যুক্তিতর্কের বিচার ছাড়া মেনে নিত না। অনেক পরীক্ষার পর নরেন্দ্রনাথ দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরু বলে গ্রহণ করেছিলেন। জনার জীবনে লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের মানবমুখী আচরণ ধীরে ধীরে বিশ্বাস্য হচ্ছিল। কাজেই আমরা বলেছি জনা নাটকটি দ্বিতীয় ভক্তিরত্নাকর। গিরিশচন্দ্র সেই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কর্মময় সন্তান—উনিশ শতকের বাঙালী ভক্তিবাদকে তিনি সঠিকভাবে জনা নাটকে উপস্থিত করেছেন। ফলে ভক্তিরসের নাটক হিসেবে ‘জনা’ আজও বাঙালী দর্শক-পাঠককে সমানভাবে ব্যাকুল করে তোলে।

১.১.৩.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ‘জনা’ নাটকের ভক্তিরস সৃষ্টিতে নাট্যকার কতটা সফল হয়েছেন, নাটকই বা কতখানি উৎকর্ষ লাভ করেছে এ বিষয়ে তোমার অভিমত দাও।

২। ‘জনা’ নাটকের ক্রোড় অঙ্কের গুরুত্ব বুঝিয়ে দাও।

———————

একক - ৪

জনা ও নীলধ্বজ চরিত্র

বিন্যাসক্রম :

১.১.৪.১ : ‘জনা’ চরিত্র

১.১.৪.২ : নীলধ্বজ

১.১.৪.৩ : প্রবীর

১.১.৪.৪ : শ্রীকৃষ্ণ

১.১.৪.৫ : বিদূষক

১.১.৪.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.১.৪.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১.১.৪.১ : ‘জনা’ চরিত্র

‘জনা’ নাটকের উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলি হল—নীলধ্বজ, প্রবীর, বিদূষক, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, বৃষকেতু, অগ্নি, জনা, স্বাহা ও গঙ্গা। এই চরিত্রগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে প্রবীর ও জনা। কেননা নাট্য কাহিনী উভয়কে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। তাই এই নাটকে সমস্যা আমাদের বিচার্য বিষয়।

জনার পুত্র প্রবীর হল ক্ষাত্রবীর। নাটকের প্রথমে দেখা যায় অগ্নির নিকটে তার একমাত্র বাসনা —

“প্রবীর ভুবন বিজয়ী রথী - দেহ মোরে অরি,

মরি কিংবা মারি, মিটুক সমর বাঞ্ছা মোর।”

রাজা নীলধবজ কিন্তু এ ব্যাপারে একান্ত অরাজী। কিন্তু যুদ্ধের ক্ষেত্রে উৎসাহ দেয় জনা, সে বলে—

“হয় হোক যা আছে মা জাহ্নবীর মনে,

রণ সাধ যদি তোর, রণ পণ মম।” (১/৪)

প্রবীরের এই রণসাধ মেটাতে গিয়েই জনার জীবনে নেমে আসে ট্র্যাজেডির ঘনঘটা।

পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবীর পরাভূত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। কিন্তু মৃতুই ট্র্যাজেডির মুল কথা নয়। এই ট্র্যাজেডির কারণ চরিত্রের ভ্রান্তি (Error of Judgement বা Hamartia)। প্রথম ভ্রান্তি জনার এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তি প্রবীরের। জনা নীলধবজকে বলেছে —

‘মৃত্যুশ্রেয়, হেয় প্রাণ হতে’ (১/৪)।

রাজ্যের মন্ত্রীকে সে প্রশ্ন করেছে —

‘রণ মৃত্যু না হলে কি এড়াবে শমন?’ (২/৩)।

নাটকে দেখা যায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবীর কাম ও রতির সংস্পর্শে এসে হীনবল হয়েছে। যদিও এটা কৃষ্ণের কৌশল কিন্তু যুদ্ধে এই রণকৌশলকে দায়ী করলে চলবে না। সেখানে 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'। জনার আক্ষেপ কৃষ্ণের রণকৌশলের বিরুদ্ধে। তাই প্রতিহিংসায় জনার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে এবং তার জীবনে নেমে এসেছে ট্র্যাজেডি।

জনা নাট্যকারের অন্তরতম চরিত্র। এটি সমগ্র নাটকের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। প্রবীরের মৃত্যু হয়েছে চতুর্থ অঙ্কে। প্রবীরকে নায়কের আসনে বসালে চতুর্থ অঙ্কেই নাটক শেষ হয়ে যায়। তাহলে পুত্রশোকাতুর জননীর হৃদয় দহনের চিত্র দেখানো সম্ভব হত না। পঞ্চম অঙ্কে প্রবীর নেই কিন্তু জনা আছে। নাটকের এটি অনিবার্য অংশ। প্রবীর চরিত্র এ নাটকের উপলক্ষ - নাট্যকারের লক্ষ তাঁর মানসকন্যা জনা। নাটকের শুরুতেই দেখা যায় অগ্নির কাছে জনার প্রর্থনা —

> "নাহি অন্য বাসনা আমার,
>
> যেন অন্তকালে গঙ্গাজলে ত্যাজি প্রাণ বায়ু।"

পরবর্তীকালে একথাই সত্য হয়ে দাঁড়ায় এবং পরিশেষে জনা চরিত্রে বীরগর্ভ করুণরসের সৃষ্টি হয়েছে। এখানেই ক্ষাত্রবীর্যের এই চরিত্রটি স্বতন্ত্র পরিণামে চিহ্নিত।

অন্যদিকে প্রবীরের মধ্যে নায়কোচিত কিছু গুণও আছে (বীরত্ব, আত্মশ্লাঘা ইত্যাদি)। নায়কত্ব নিয়ে জনা ও প্রবীরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও প্রবীর ও জনা পরস্পরের জীবনে অপরিহার্য সত্তা। একজনকে বাদ দিয়ে অপরজনকে কল্পনা করা যায় না। প্রবীরের সমস্ত ধ্যান-জ্ঞান, চিন্তা-চেতনা হল তার মা। সে একান্ত মাতৃভক্ত। তাই জনা চরিত্র প্রবীর চরিত্রের মূল আশ্রয়। জনা নাটকে জনা একাধারে কেন্দ্রীয় ও নাট্যঘটনায় গতিসঞ্চারক চরিত্র। তাই জনা যখন নীলধবজকে বলে —

> "তব আজ্ঞা শিরোধার্য মম মহারাজ;
>
> কিন্তু, প্রভু, ক্ষত্রিয় জননী, রণে যেতে
>
> পুত্রে কেন করিব নিষেধ।" (১/৪)

তখন এই সংলাপের মধ্যে দিয়ে জনার সৌন্দর্যবোধ ও বিচারবুদ্ধির কোমল-কঠোর রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। আবার চরিত্রের পরবর্তী স্তরে দেখা যায় জনা আরো ব্যক্তিত্বময়ী। নীলধবজের প্রতি জনার আরও একটি উক্তি তুলে ধরে তা আমরা প্রমাণ করব। —

> "দেহ আজ্ঞা, যার রণে নন্দনে লইয়া ;
>
> আজ্ঞামাত্র চাই — একটা গোটা পদাতিক সঙ্গে নাহি লব,
>
> তনয়ে করিব রথী, সারথী হইব।" (১/৪)

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে জনার এই অভীপ্সা উচ্ছাসের মাত্রাধিক্যে একটা অপ্রকৃতিস্থতা। কিন্তু উদ্দেশ্যসাধনে এটাই তার স্বাভাবিক শক্তির স্ফুর্তি। অবাধ চরিত্র কল্পনার স্বর্গভূমিতে জনার এই নারীরূপ চিত্রণ অনবদ্য। এছাড়াও জনা দেবতার কাছে আরাধনা করে শক্তি অর্জনের প্রত্যাশায়, যাতে পরবর্তী সংগ্রামের জন্য সে তৈরি হতে পারে। পৌরাণিক নাটকে এই শক্তিই দৈবশক্তি। জনা কায়-মনো-বাক্যে জাহ্নবীর কাছে আরাধনা করে —

> "মা জাহ্নবী, তোর পাদপদ্মে পূজা করে পুত্র কোলে পেয়েছি।
>
> দেখো মা, দাসীরে বঞ্চনা কোরোনা।

মা হয়ে মা মার প্রাণে ব্যথা দিয়োনা।" (২/১)

সে আবার নিজেকে পরীক্ষা করে —

"কে রে মন, তুই থেকে থেকে কেঁদে উঠছিস?
আমার প্রবীরের অকল্যাণ হবে। যদি
স্থির না হোস, আমি জাহ্নবী তটে বসে
তীক্ষ্ণ ছুরিকায় বুক চিরে তোকে বার করব।" (২/১)

পরক্ষণেই আবার এ সংশয় কেটে যায় —

"বীরমাতা হয়ে বীরশ্রেষ্ঠ পুত্রের গৌরবের
পথে কি কণ্টক হব? জনার জীবন
থাকতে নয়। আমি পণ করেছি, রণ -
রণ-রণ। স্বয়ং জাহ্নবীর কথাতে তা বারণ
হবে না।" (২/১)

আত্মপ্রত্যয়ে অটল জনার এই হল চরিত্র মাধুর্য। এখানে জনা চরিত্রটি হল বহির্মুখী (Extrovert) এবং চরিত্রের মধ্যে বহুর্দ্বন্দ্ব (Direct Conflict) দেখা যায়। একটি উচ্চাঙ্গের চরিত্র চিত্রণের এই পরিস্থিতির সৃষ্টি গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব হস্তচিহ্নের স্মারক।

এরপর দেখা যায় জনা প্রবীরের জন্য ক্রমশ অস্থির হয়ে পড়ে এবং জনা ছুটে যায় প্রবীরের শয়নকক্ষে। নিদ্রিত প্রবীরকে সে ডেকে তোলে এবং প্রবীরকে নির্ভয় চিত্তে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে বলে। মাতৃভক্ত প্রবীর মাতৃ আদেশে জাহ্নবীর আশীর্বাদ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যায় পাণ্ডব দমনের উদ্দেশ্যে।

এরপরই শুরু হয় পুত্রের জন্য জনার তীব্র ব্যাকুলতা। তার অশান্ত মন পুত্রের পথ চেয়ে বসে থাকে। এদিকে প্রবীর রণস্থলে কাম ও রতির মরণ ফাঁদে নিজেকে বিসর্জন দেয়। জনা কিন্তু দূর থেকে বোধদৃষ্টি দিয়ে আসন্ন বিপদ বুঝতে পারে। জনা নীলধবজকে বলে —

"প্রাণেশ্বর, প্রাণমম কাঁপে থর থর,
কোনো মায়াবিনী ভুলাল বাছারে।" (৩/২)

এদিকে প্রবীর পরাজিত হয় অর্জুনের কাছে। মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়ে যায় জনার আদরের দুলালকে। আতঙ্কিতা ও আশঙ্কিতা জনা ছুটে যায় যুদ্ধপ্রান্তরে। মৃত পুত্রকে দেখে তার অসহায় আর্তনাদ —

"হা পুত্র, হা প্রবীর আমার।" (৩/৪)

নাট্যকার এখানে জনা চরিত্রের এক করুণ অথচ মহিমাময় মূর্তি এঁকেছেন। পরক্ষণেই জনার চোখে তপ্ত অশ্রু দেখা যায়। প্রতিশোধস্পৃহায় সে রণরঙ্গিণী মুর্তি ধারণ করে সকল প্রতিকুল শক্তির উদ্দেশ্যে বলে—

"সব মিলে যদি হয় অর্জুন সহায়,
পুত্রহন্তা অরাতিরে রক্ষিতে নারিবে।" (৩/৪)

আবার স্বামী নীলধবজকে সে বলে —

"চল রণে, ক্ষত্রিয় বিক্রমে"

কিন্তু কৃষ্ণভক্ত নীলধবজ সে আহ্বানে সাড়া না দিলে জনা তাকে কটাক্ষ করতেও ছাড়ে না। এরপর থেকে জনা সর্বদাই প্রতিহিংসার অনলে জ্বলতে থাকে। এই শক্তিই তাকে ঘরছাড়া করে। সে আত্মধিক্কারে রাজপুরী ত্যাগ করে চলে যায়। স্বাহার 'মাতৃ' সম্বোধন তার কাছে মিথ্যাভাষণ বলে মনে হয় এবং বলে—

"কে রাক্ষসী? মা বলিস মোরে,

মরেছে প্রবীর, পুত্রবধূ মম পড়িয়া সমরে,

ফুরায়েছে মা বলা আমার।" (৪/৫)

জনার নিঃশেষিত মাতৃত্ব ও আশাভঙ্গের চিত্রকে গিরিশচন্দ্রের কবিমানস অপূর্ব দক্ষতায় অঙ্কন করেছে। উন্মাদিনী জনার নয়নের তপ্ত অশ্রু শুকিয়ে যায় — 'অনল কেবল, শোক নাই জনার হৃদয়ে' জাহ্নবীতীরে শ্মশানভূমির নিবিড় অন্ধকারে চলে জনার অক্ষম ক্ষাত্রতেজের পিশাচী নৃত্য। ভাই উলুক তাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু জনা বলে —

"ঘরে যাব - কোথা ঘর ... মরেছে প্রবীর — কে আছে আমার ... বেদনা বেজে আছে বুকে ... এ প্রতিহিংসা ..... প্রতিহিংসা জ্বলে।" (৫/৩)

শিল্পের (Art) একটা সর্বজনীন রূপ আছে। গিরিশচন্দ্র জনা চরিত্রে তাকে চিরায়ত করেছেন। 'অশুভ শক্তির প্রভাবে পরাজিত একজন পুত্রহারা নারীর কান্নাকে বিশ্বভুবনের' দরজায় তিনি পৌঁছে দিয়েছেন। জনা এখানে ভারতীয় নারী হয়েও সর্বদেশের, সর্বকালের ও সর্বজনের পরিচিত নারী — শিল্পীর হাতে শিল্পীত একটি ট্র্যাজিক চরিত্র।

গিরিশচন্দ্র এই নাটকের অন্তিম পর্বে জনা চরিত্রের মধ্যে মানুষের এক চিরন্তন হাহাকারকে ফুটিয়ে তুলেছেন। অপ্রকৃতস্থ জনা জাহ্নবীর শীতল জলে আত্মবিসর্জন দিয়ে জীবনের সকল জ্বালার অবসান ঘটিয়েছে।—

"এসেছি মা বঞ্চনা কোরোনা,

নন্দিনীরে নে গো কোলে।" (৫/৩)

আর এখানেই জনার মতো একটি বীরগর্ভ করুণ চরিত্রের সমুন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়।

পৌরাণিক নাটকের শেষে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভক্তিভাব মিশ্রিত আধ্যাত্মরসের উপস্থাপনা লক্ষ করা যায়। জনা নাটকেও তা দেখা যায়। এখানে ক্রোড়অঙ্কে কৈলাসে হর-পার্বতীর পূজারতা প্রসন্নবদনা যে জনাকে দেখা যায়, তা আর এক জনা, গিরিশচন্দ্রের ভক্তিরস সংস্কারজাত সে অন্য এক পৌরাণিক নারীর চিত্র ও চরিত্র যা তদানীন্তন দর্শক সমাজকে খুশী করেছে। নাট্যকার গিরিশচন্দ্রও দায়মুক্ত হয়েছেন। চরিত্র চিত্রণে নাট্যকারের এইটুকু দুর্বলতা।

১.১.৪.২ : নীলধ্বজ

জনা, বিদূষক ও প্রবীরের তুলনায় নীলধ্বজ চরিত্রটি অনেক কম জটিল। চরিত্রটির মাত্রাগত বিস্তারও বেশি নয়। নীলধ্বজ প্রকটভক্ত, বিদূষকের মতো প্রচ্ছন্ন নয়। সে রাজা হলেও ইহজগতে তার একমাত্র কামনা কৃষ্ণদর্শন, রাজ্যরক্ষা নয়। সে পিতা, কিন্তু সেখানে তার কৃষ্ণবাঞ্ছার সঙ্গে পুত্রের স্বাভাবিক

বীরত্ববাসনার বিরোধ, সেখানেও কৃষ্ণই তার কাম্য, পুত্রের জয় নয়। সে স্বামী কিন্তু পত্নীর মনোবাসনা ও পুত্রশোকের মর্মান্তিক হাহাকার তার কৃষ্ণার্তির কাছে পরাভব স্বীকার করে।

এ নাটকে নীলধ্বজই একমাত্র চরিত্র, যে দুটি বিবাদমান প্রবণতার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে জনা ও প্রবীরের অর্জুন বিরোধ, অন্যদিকে তার নিজের কৃষ্ণভক্তি। এই বিবাদে তার মধ্যে যে প্রবল অন্তঃসংক্ষোভ ও আত্মদ্বন্দ্বের উদ্ভব হওয়া উচিত ছিল, বিবেকের যে সংঘাত উপস্থিত হওয়া প্রত্যাশিত ছিল, নাট্যকার তা থেকে নীলধ্বজকে বঞ্চিত করেছেন। নীলধ্বজ এ নাটকে ক্ষত্রিয় রাজা নয়, বীরপুত্রের পিতা নয়, দর্পিত স্ত্রীর স্বামী নয়, সে শেষপর্যন্ত ভক্ত। অগ্নির কাছে তার প্রার্থনা—

"দেহবর,

যেন নটবর নব-ঘন কায়

বাঁশরী-বয়ান ত্রিভঙ্গিম ঠাম

নররূপী নারায়ণে পাই দরশন।"

প্রথম থেকেই সে কৃষ্ণে সমর্পিত তার ধ্রুব বিশ্বাস—

"কৃষ্ণার্জুন নর-নারায়ণ,

অবতর হরিতে ধরার ভার

নরশ্রেষ্ঠ পুজ্য লোক-মাঝে।"

সুতরাং তার নির্দেশ 'কৃষ্ণার্জুনে অবশ্য পূজিবে।' প্রবীরকে সে বলেছে 'রাখ বাক্য, রণসাধ ত্যজহ প্রবীর।' একটু দুর্বলভাবে হলেও তার পিতৃত্বের অনুভব ফুটে উঠেছে প্রবীরের অন্তর্ধানে তার উদ্বেগে —

"কিছু ত বুঝিতে নারি,

বন্দী কি হইল পুত্র অরির কৌশলে?

দেখ, দ্বিপ্রহর উদয় হইল,

তবু কেন গৃহে না আইল?"

কিন্তু পুত্রশোকের আর্তি মুহূর্তে মুছে গিয়েছে, সে ভেবেছে —

"সফল জীবন মম,

পাব আজ কৃষ্ণ দরশন।"

তার এই প্রার্থনা পূরণের জন্য যে মূল্য সে দিয়েছে তার গুরুত্ব সম্বন্ধে সে নিজেই যেন সচেতন নয়। জনার ধিক্কারেও সে আর বিচলিত হয়নি।

"কৃষ্ণ-দরশন পাব পাণ্ডব-কৃপায়

নরদেহ পবিত্র হইবে।"

এর চেয়ে মূল্যবান সেই মুহূর্তে তার কাছে আর কিছু নেই, তাই এই প্রতিরোধহীন রক্তমাংসের আবেগহীন, নিশ্চেষ্ট ও অমেরুদণ্ডী ভক্তি তার সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধা জাগায় না।

এইভাবে দেখা যায় মহিষ্মতীপুরীরাজ নীলধবজ ভীরু ও দুর্বল চরিত্ররূপে কাশীরাম দাসের মহাভারতে চিত্রিত হয়েছেন। 'জনা' নাটকের নীলধবজ বীরপুরুষ নন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র তাঁকে পরমভক্তরূপে দেখিয়েছেন। যিনি মনে করেন, ঈশ্বরই সব — 'সকলই তোমার ইচ্ছা'। তিনি নিজে যন্ত্রমাত্র। এ যেন গীতার বাণী 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি'। তাই তার যুদ্ধে আগ্রহ নেই। —

"জয় আশা নাহিক সমরে

অকারণ প্রজানাশ।"

এই চিন্তার মধ্যে তাঁর রাজার দায়িত্ববোধ ও মনুষ্যত্ব জাগ্রত দেখা যায়। এমনকি প্রবীরের হঠকারিতায় তাঁর দুর্ভাবনা —

"অবোধ বালক,

নাহি জানে পাণ্ডব বিক্রমঙ্গ"

একে ভীরুতা না বলে পিতৃহৃদয়ের সংগত স্নেহ-শঙ্কা বলা যায়। এই পিতৃত্ব পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে কন্যা স্বাহাকে বিদায় দেবার সময় —

"পতিগৃহে যাও, গুণবতী,

ছেদি হৃদয় বন্ধন

বিদায় দিতেছে তোরেঙ্গ

বাছা, কে আছে আমার তোমা বিনাঙ্গ"

তখন পিতৃস্নেহের সঙ্গে সংসারী মানুষের অভিমানও মিশে যায়। পুত্র অকালমৃত, পত্নী স্বামীবিমুখ, নিঃসঙ্গ নীলধবজকে ঈশ্বর ছাড়া দেখায়, আশ্রয় দেবার সত্যিই কেউ নেই। 'দগ্ধ কায়ে আছে মাত্র প্রাণ'— কন্যাকে একথা বলা আসলে খেদোক্তি; ভীরুতা বা দুর্বলতা নয়। কৃষ্ণদর্শন পেতে তাই তিনি উন্মুখ। অর্জুনকে বলেন —

"সখাঙ্গ সফল জীবন মম

পাব আজ কৃষ্ণ দরশন।"

পুত্রশোকের এই পটভূমিতে বাসনা কিংবা ঘোষণা - 'আনন্দের দিন আজি' বিসদৃশ মনে হতে পারে। এক্ষেত্রে বলা যায় যিনি ঈশ্বরকে দেহমন প্রাণ দেন, তিনিই এমন পারেন। সাংসারিক ও বৈষয়িক বুদ্ধিতে এর ব্যাখ্যা মেলেনা।

মানুষ নীলধবজকে সেইভাবে দেখা হয় না। অর্জুন তার কাছে এলে তিনিই প্রশ্ন করেছেন —

"কেমনে হে পাষাণ পরাণে

সেই করে প্রহারিলে পুত্রে মম,

ব্যাথা কি হল না ধনঞ্জয়?"

পিতার ও পুরুষের শোকের প্রকাশ এর চেয়ে আর কোন্ ভাষায়, ভাবে সম্ভব? তবু ক্ষমা করেছেন, কৃষ্ণকে দেখতে পাবেন বলে। সর্বস্ব ত্যাগ না করলে, তাঁকে যে পাওয়া যাবেনা। তবু কি সংশয় নেই? পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে রাজা অগ্নিকে বলেছেন —

"রাজ্যে মম গোবিন্দের পদার্পণে
কি কারণে নিরানন্দ হল পুরী?"

আসলে শোককে বুকে চেপেই পতিত পাবনকে বরণ করতে চেয়েছিলেন তিনি। তার সেই অন্তর্গত রক্তের ভিতরে বহমান কান্না জনা বা কেউ দেখেননি। অগ্নি বুঝেছিলেন বলেই জ্ঞানদৃষ্টির কথা বলেন, কৃষ্ণ 'তাপ তব করুণ মোচন' আশীর্বাদ করেন। সেই তাপ দূর হয়েছে অলৌকিক শক্তিতে এও মনে রাখতে হবে। নীলধবজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন শান্তি — 'শান্ত কর অশান্ত প্রাণ' বলেছেন। সত্যিই কি পিতৃ হৃদয়ের জ্বালা প্রশমিত হয়েছে। জনার যে স্নেহ শোকে - ক্রোধে উদ্বেল, নীলধবজে তা সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। তাই কৃষ্ণকে বলতে হয় — 'জেনো বীর প্রপঞ্চ সকলি।' মহাকালের খেলা ও লীলা বলে শান্তনা দেন। দিব্যচক্ষু দান করেন। বস্তুত নীলধবজ এক ভাগ্যহত পুরুষ। সংসারে যিনি শান্তি পাননি; ঈশ্বরে আস্থা যাকে প্রাণপণে খুঁজে নিতে হয়। জনার বিশ্বাসের জোর তাঁর নেই বলে তাকেও ট্র্যাজিক চরিত্ররূপে ভাবা যায়। যদিও ক্রোড়অঙ্কে নিত্য নিরঞ্জনের জয়গান গাওয়ায় সেই ধার তীব্রতা হারিয়েছে। তবুও যখন যবনিকা পতন হয়, তখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে কোনোটা সত্য? যে আকস্মিক ঝড় নীলধবজের সুখের পরিবার বিপর্যস্ত করে দিল তা সত্য, না দিব্যদৃষ্টিতে তিনি যে দুঃখলেশহীন নিরবচ্ছিন্ন শান্তির রাজ্য দেখতে পেলেন তাই-ই সত্য?

এইভাবে দেখা যায় প্রথমে ভক্তি ও আত্মসমর্পণ, পরে মানবিক স্নেহ ব্যাকুলতার মধ্যে নীলধবজের গতিবিধি স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠেনি। কেবল স্বাহার বিদায়চিন্তার মধ্যে তার পিতৃহৃদয়ের বিষণ্ণতাটুকু আমাদের একটু যে ছুঁয়ে যায় তার কারণ এ বিষয়টি বাঙালীর স্বভাবিক বেদনার একটি স্থায়ী উৎস। দুই পরস্পরবিরোধী ধারার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দ্বন্দ্বে ও সক্রিয়তায় নীলধবজের চরিত্রটি যেভাবে উজ্জীবিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, নাট্যকার সে বিষয়ে উদাসীন থেকেছেন।

১.১.৪.৩ : প্রবীর

'জনা' নাটকের অপর একটি প্রধান চরিত্র প্রবীর। সে বীরত্বে কারও অপেক্ষা ছোটো নয়। তাকে বাঁচিয়ে রেখে যুধিষ্ঠিরকে ধর্মরাজ্যের রাজা করা যায় না। তাই অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করে, প্রবীরের সঙ্গে যুদ্ধ এবং ছলে-বলে-কৌশলে প্রবীরকে পরাজিত করা কৃষ্ণেরই চক্রান্ত।

এই নাটকে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের মধ্যে একদিকে মহাবীর প্রবীর ও তার জননী জনা। অন্যদিকে নরনারায়ণ অর্জুন জনার্দনের শ্রীচরণাশ্রিত ভুবনবিজয়ী বীর। উভয়পক্ষই ধর্মের আশ্রিত বটে, কিন্তু প্রবীর কৃষ্ণকে নারায়ণ জেনেও নিজের ক্ষাত্রধর্ম বলি দিতে প্রস্তুত নয় —

প্রবীর —

"অহংকারে ধরিয়ছি ঘোড়া
প্রাণ ভয়ে দিব ছেড়ে?
সম্মুখ সংগ্রামে পাণ্ডবে না ডরি,
নাহি ডরি নারায়ণে।"

মদনমঞ্জরী —

"ক্ষম দোষ, পাণ্ডব-সহায় হরি,
ডরি পাছে রুষ্ট হন জনার্দ্দন।"

প্রবীর —

"নিজধর্ম করিলে সাধন
রুষ্ট যদি হন জনার্দ্দন,
নারায়ণ কভু তিনি নন।
ধর্ম্মের স্থাপন হেতু হন অবতার;
নিজ ধর্ম্মে রুচি আছে যার,
তার প্রতি বহু প্রতি তাঁর ;
তবে কেন ভাব অকারণ?
ধনু-করে ক্ষত্রিয় শমনে নাহি ডরে।"

প্রবীর মাতৃভক্ত। সমস্ত কাজে মাতৃ আজ্ঞা তার শিরোধার্য। প্রবীরের পিতা নীলধবজ যখন তাকে ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে আদেশ দেয়, তখন অভিমানী প্রবীর মায়ের কাছে এসে জানায় যে ঘোড়া সে ফিরিয়ে দেবে, কিন্তু ক্ষত্রিয়ত্বের অপমান সহ্য করতে পারবে না, সে মৃত্যুবরণ করবে। জনা তাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলেন, বললেন—বলবানে পূজো দেওয়ার নিয়ম আছে, নরনারায়ণ ধনঞ্জয় প্রবল প্রতাপ বীর, তাকে সম্মান জানাতে কোনো লজ্জা রাখা উচিত নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রবীর মাকে জিজ্ঞাসা করলেন —

"শুনি, মাতা, জাহ্নবীর বরে
পাইয়াছ মোরে;
কাপুরুষ পুত্র কি দেছেন ভাগীরথী?
রণে যদি না যাই, জননী,
দেবতার হবে অপমান।"

পাছে কোনো অকল্যাণ হয় এই ভয়েই জনা পুত্রকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু পুত্রের দুর্দমনীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে শেষপর্যন্ত জনা নিষেধ করতে পারেননি। তিনি ক্ষত্রিয় নারী, বীর জননী, পুত্রকে প্রতিশ্রুতি দিলেন রাজাকে বুঝিয়ে তিনি সমস্ত ব্যবস্থা করবেন।

"স্থির হও, আমি বুঝাইব ভূপে।
হয় হোক্ যা আছে মা জাহ্নবীর মনে,
রণ-সাধ যদি তোর, রণ পণ মম।"

জনা রাজাকে প্রবীরের যুদ্ধে যাবার সম্মতি দিতে বলে। রাজা কিছুতেই রাজী হন না — "জেনে শুনে নারায়ণে না করিব অরি।" দাম্ভিক ধনঞ্জয়কে পরাজিত করার জন্য পুত্র উন্মুখ। "যদি হয় জয়, পূজা লোকময় পাইবে নন্দন মম।" অতএব মহান কাজে ব্রতী পুত্রকে জনা কিছুতেই নিবারণ করবেন না। তিনি শুধু রাজার অনুমতি প্রার্থনা করেন —

"দেহ আজ্ঞা, যাব রণে নন্দনে লইয়ে,
আজ্ঞামাত্র চাই;—"

সুতরাং প্রবীরের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং সেই যুদ্ধ পরিচালনার প্রধান ভার গ্রহণ করলেন জননী জনা।

প্রবীর ক্ষাত্রধর্মের মর্যাদা রক্ষার জন্য নারায়ণের সঙ্গে বৈরিতা করতেও পিছপা হবে না। দেববলে বলীয়ান অর্জুন বাজী ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করলে প্রবীর তাকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় —

"অশ্ব দিব ফিরায়ে পরাজয় মানি,
ভেবনা সম্ভব কভু।
দেবতার বলে যদি বলী তুমি আজি,
দেব-রোষ যদি মম প্রতি,
ক্ষত্রিয়-শোণিত বহে ধমনীতে মম,
রণে নাহি দিব ক্ষমা।"

এই ক্ষত্রিয়ত্বের অভিমানই প্রবীরের পতনের কারণ। এই অভিমানই তাকে কৃষ্ণের সঙ্গে বৈরিতা করতে প্ররোচনা দিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ তাকে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য অনেক বুঝিয়েছেন, কিন্তু প্রবীর সে কথা শোনেনি, বরং কপটের শিরোমণি বলে শ্রীকৃষ্ণকে গালাগাল দিয়েছে —

"জগবন্ধু নারায়ণ, যদি হে কেশবঙ্গ
একের কি হেতু বন্ধু, বৈরী অপরের?
পাণ্ডবের সখা, আর নহ সখা কার?"

প্রবীরকে কৃষ্ণ আবার অনুরোধ করেন বাজী প্রত্যর্পণের জন্য। কৃষ্ণ আশ্বাস দেয় যে এতে তার মর্যাদা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবে না। প্রবীর তাও উপেক্ষা করে। সে ছিল অতুলনীয় পরাক্রমশীল বীর। তার অসামান্য বীরত্বের কথা ভীমের মুখ দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে —

"রামজয়ী পিতামহে দেখেছি সমরে,
ধনুর্বেব্দ দ্রোণ সনে করিয়াছি রণ
কিন্তু এ হেন বিক্রম
মানবে সম্ভব কভু নাহি ছিল জ্ঞান।"

অর্জুন বলছেন —

"বীর্যবান রথিশ্রেষ্ঠ তুমি হে কুমার
প্রকাশিলে অতুল বিক্রম
তোমা সম বীর নাহি ত্রিভুবনে
*   *   *   *
কৃষ্ণসনে অর্জুনে জিনেছ রণে।"

প্রবীরের এই অপরিমেয় শক্তি ও বীরত্বের মূলে ছিল তার মাতৃভক্তি। —

“দেব-বরে দেব-অংশে জন্মেছে কুমার,

দেবের প্রসাদে

মাতৃভক্তি অপার তাহার।”

মায়ার ছলনায় যেদিন সে মাতৃপদধুলি গ্রহণ করতে বিস্মৃত হল, সেদিনই তার পরাজয় হল। প্রবীরের প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়ে মাতৃভক্তির অলৌকিক মহিমার কথা ব্যক্ত করেছেন —

“সত্য কহি, শক্তি নাহি ধরে ষড়ানন-

বিমুখিতে মাতৃভক্ত যোধে।

মাতৃ-পদধুলি বীর নিত্য ধরে শিরে,

ম্রিয়মান ডরে মম চক্র আসে ফিরে,

পাছে ভস্ম হয়।

মাতৃভক্ত মহাতেজা,

প্রবীরে নিবারে বীর নাহি ত্রিভুবনে।”

প্রবীর চরিত্রের দুয়ি স্পষ্ট ‘dimension’ এ নাটকে নাট্যকার বিশেষভাবে পরিস্ফুট করেছেন। প্রথমত, সে বীরকীর্তি ও বীরযশের প্রার্থী, আর তার নিজের চরিত্রে ক্ষত্রিয়োচিত শৌর্যের অভাব নেই। বয়সে বালক বলে তার এ বিষয়ে অভিমান বরং একটু বেশি প্রকট। দ্বিতীয়ত, সে ইন্দ্রিয় পরবশ; সুন্দরী রমণীর ছলা- কলা-লোভন-লাস্যে সে বীরের আত্মসংযম থেকে ভ্রষ্ট হয়। কিন্তু তার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি আকস্মিক, দেবতাদের চক্রান্তের ফল। তা সত্ত্বেও প্রবীর চরিত্রের এই পরস্পরবিরোধী দুটি প্রবণতা ঠিক সমন্বিত হয়নি, সামঞ্জস্য পায়নি। বলতে পারি নাটকের আখ্যানের প্রয়োজনের কাছে প্রবীর চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণতিকে বিসর্জন দিয়েছেন গিরিশচন্দ্র। প্রবীরের ‘বীরের সদ্‌গতি’ কামনা প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে পরিস্ফুট হয়েছে।

পরের গর্ভাঙ্কে যখন দেখি যে, ‘মেঘনাদবধ কাব্য’-এর ইন্দ্রজিৎ বধের ধরনে স্বর্গে-মর্ত্যে প্রবীরের পরাভব ও মৃত্যুর জন্য চক্রান্ত চলছে, তখন তার বীরত্বের মহিমা একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে। কারণ সে দেবতাদের দ্বারা মৃত্যুর জন্য চিহ্নিত, সে শ্রীকৃষ্ণের বিশাল সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রে একটি ক্ষুদ্র কীলক মাত্র। তখন তার বীরত্বের আস্ফালনকেও খানিকটা সাজানো ও কৃত্রিম মনে হয়।

প্রথম অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে আমরা লক্ষ করি প্রবীরের অভিমানের একটি অলৌকিক ভিত্তি আছে, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত শৌর্য নয়। সে মাতৃভক্ত এবং মাতার আশীর্বাদের দুর্দমনীয় শক্তির দ্বারা সমর্থিত—

“মা গো, তব পদে মতি,

তোমার চরণ মম গতি,

অক্ষয় কিরীটি শিরে তোর পদধূলি,

মাতৃনাম অক্ষয় কবচ বুকে, -

সম্মুখ-সমরে বিমুখ কে করে মোরে?”

ব্যক্তিগত শক্তি ও যোদ্ধা অহমিকার লৌকিক গৌরবের সঙ্গে মাতৃপদধুলি ও মাতৃনামের অলৌকিক শক্তির ম্যাজিক, বিশ্বাসের আস্ফালন প্রবীরের বীরত্বকে উজ্জ্বল না করে বরং তার ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠান ভূমিটিকে দুর্বল করে তোলে।

কিন্তু তবু যে যুদ্ধে সে সহজে আত্মসমর্পন করেনি এতে তার প্রকৃতিগত শৌর্যের গৌরব সে অনেকটাই পুনরুদ্ধার করেছে। অর্জুনের সন্ধি প্রস্তাব সে সঘৃণা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নিজের সাময়িক স্খলনের তীব্র অনুশোচনায় তার মধ্যে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণকে ধিক্কার ও ভর্ৎসনায় কঠোর আঘাত করে সে বলেছে —

“বুঝিয়াছি চক্রী, চক্র সকলই তোমার,
ধিক্ ধিক্ঙ্গ মৃত্যু শ্রেয়ঃ এ জীবনে ধিক্,
স্মরণ হতেছে এবে, কাম-পিপাসায় -
আসিয়াছি নারীর পশ্চাতে।
অস্ত্র ধনু হরিয়াছ হরি,
ভাব কি হে তাতে হবে পরাজয়?
দেখিব, কেমনে তুমি রাখিবে অর্জুনে—।”

কৃষ্ণই তাকে বিভ্রান্ত করে ধনুর্বাণ ত্যাগ করিয়েছে, কৃষ্ণই তাকে মাতৃপদধূলি দিয়ে যুদ্ধে অজেয় হওয়ার সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করেছে। কাজেই প্রবীর এখন একা, কেবল নিজের বীর্যবত্তার স্বাভাবিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে, কোনো দেবী বা অলৌকিক সমর্থন তার পিছনে নেই, কাজেই সে হয় ‘রণক্ষেত্রে হৃদয়ের রুধির’ ঢালবে না হয় অর্থাৎ যদি সে জয়ীও হয়, সে আর গৃহে ফিরে যাবেনা, কারণ তাকে ‘বেশ্যা-দাস কবে সবেঙ্গ’ সে অগ্নিকুন্ডে আত্মবিসর্জন দেবে। এই শেষদিকেই প্রবীরকে আমরা যথার্থ বীরের মহিমা লাভ করতে দেখি। কিন্তু মৃত্যুকালীন স্বগতোক্তির মধ্যে যে সংবাদ আমরা পাই — সে শিবানুচর, মহেশ্বর, তার দাসকে আবার কৈলাসে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন — সে সংবাদ প্রবীর চরিত্রের এই স্বোপার্জিত ও অন্তিম মহত্বের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় এবং হানিকর। ক্রোড় অঙ্কেও প্রবীর ও মদনমঞ্জরী কৈলাসে ‘বিল্টবদলে জবাফুলে / পূজিছে পার্বতী-হরে” এই সংবাদ পাই আমরা। প্রবীরের মৃত্যুজনিত অপচয়বোধ তাতে বিন্দুমাত্র কমে বলে মনে হয় না।

১.১.৪.৪ : শ্রীকৃষ্ণ

যদিও এই নাটকের নামকরণ করা হয়েছে ‘জনা’ তবুও নাটকের কেন্দ্রিয় চরিত্র জনা বা প্রবীর নয়। কেন্দ্রিয় চরিত্র হল শ্রীকৃষ্ণ। গিরিশচন্দ্র ছিলেন প্রাচ্য ধারণার অনুরাগী। তাঁর নাটকে আদর্শ নায়ক হবার যোগ্যতা রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি চরিত্রেই আছে, জনা বা প্রবীরের নেই। সুতরাং প্রাচ্য ধারণা অনুযায়ী আদর্শ নায়কের আসনে তিনি শ্রীকৃষ্ণকেই অধিষ্ঠিত করেছেন এই নাটকে।

এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে শ্রীকৃষ্ণকে নিয়েই এই নাটকের কাহিনী আবর্তিত। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই কৃষ্ণের উপস্থাপনা। নীলধবজ কর্তৃক কৃষ্ণদর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষা দিয়েই এই নাটকের কাহিনী শুরু। অগ্নিরও মন্তব্য হল — “নররূপী পীতম্বর আমি এই পুরে; পুরাবেন বাসনা সবার।” মহিষ্মতীপুরে কৃষ্ণের আগমন ও আবির্ভাবের সংবাদ অগ্নি কর্তৃক ঘোষিত হলেও তা নিয়ে বিশেষ কোনো

আগ্রহ দেখাননি। কারণ কৃষ্ণের আগমনে মহিষ্মতীপুরে যে ঝড় উঠবে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তার ভাষায় 'কৃষ্ণ দয়াময়, নাম কল্লেই হন উদয়, কিন্তু যেখানে দেন পদাশ্রয়, সেখানে যে সর্বনাশ হয়," একথা নিশ্চয়। অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্বকে বন্দী করে প্রবীর সেই সর্বনাশের দ্বার উন্মুক্ত করেছে। অর্থাৎ বিরোধের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণ আবির্ভাবের পথকে দ্রুততর করেছে।

শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়াকলাপ মহিষ্মতীপুরকে অবলম্বন করে শুরু হয়েছে। প্রবীর কর্তৃক অশ্বমেধ যজ্ঞাশ্বকে বন্দী করার যে ঘটনা অশ্বের রক্ষক অর্জুনের কাছে অজানা থাকলেও শ্রীকৃষ্ণের কাছে অজানা ছিল না। অলৌকিক শক্তিধর শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানেই তা জানতে পেরে হস্তিনা ত্যাগ করে পাণ্ডব শিবিরে এসে উপস্থিত হয়েছে এবং সেই সংবাদ অর্জুনকে প্রদান করে প্রবীর বিনাশের সকল দায়দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছে। মহাদেবের কাছ থেকে আশ্বাসবাণী সংগ্রহ করেছে, গঙ্গা রক্ষকদের অশ্বচুরির পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে, মদনমঞ্জরী দুর্লভ অস্ত্রদান করে প্রবীর সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছে, আবার কাম ও রতিকে নিয়োগ করে প্রবীরের কাছে পুনরায় সেই দুর্লভ মন্ত্র উদ্ধার করেছে। সর্বশেষে তেজহীন, বলহীন দেবতার আশীর্বাদ বিহীন ব্যভিচারী দুষ্ট প্রবীরকে মাতৃপদ বন্দনার পূর্বে হত্যা করার ইঙ্গিত সে অর্জুনকে দিয়েছে। প্রবীরের মৃত্যুর জন্য কৃষ্ণকে যতখানি পরিশ্রম করতে হয়েছে, জনার মৃত্যুর জন্য তার এক চতুর্থাংশও পরিশ্রম করতে হয়নি। কেবলমাত্র বৃক্ষরূপে জনার দীর্ঘনিশ্বাসকে বক্ষে ধারণ করে জনাকে করেছে নির্বীর্য ভুজঙ্গিনী, অর্জুনকে সুনিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে। এরপরই মহিষ্মতীতে তার আবির্ভাব ঘটিয়েছে। এখানে কৃষ্ণের ক্রিয়াকলাপ অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ। অর্থাৎ মহিষ্মতীপুরে উদয় হয়ে সবার বাসনা সে পূর্ণ করেছে। নীলধ্বজকে দর্শন দিয়ে, বিদূষককে ধন্য করে, প্রবীরকে মুক্তি দিয়ে, জনাকে জাহ্নবীর কোলে ফিরিয়ে দিয়েছেন। মহিষ্মতীপুরে যা কিছু ঘটে গেল তার মূলে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণ। মহিষ্মতীপুরে শ্রীকৃষ্ণের আগমন ধর্ম সংস্থাপনের জন্য। মহাকালের রথের রশি ধরে শ্রীকৃষ্ণ মহিষ্মতীপুরে আগমন করেছে এবং তারই ভাঙা গড়ার লীলাখেলাকে সমাপ্ত করেছে। ফলে শ্রীকৃষ্ণই এই নাটকের নায়ক চরিত্র, অবশ্য ট্র্যাজিক নায়ক নয়। কারণ অলৌকিক শক্তির অধিকারী কোনো চরিত্র ট্র্যাজিক নায়ক হতে পারে না। অ্যারিস্টটল সুপারম্যানকে ট্র্যাজিক নায়কের আসন দিতে স্বীকৃত হননি। অতিমানব ট্র্যাজিক নায়ক হবার অযোগ্য।

১.১.৪.৫ : বিদূষক

আলোচ্য নাটকে একমাত্র বিদূষক ছাড়া অন্য কোনো মানব চরিত্রে কোনো প্রকার জটিলতা নেই। প্রতিটি চরিত্রে গিরিশচন্দ্র কেবলমাত্র দু-একটি বিশিষ্ট বৃত্তির উপর জোর দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর প্রতিভার যাদুস্পর্শে প্রতিটি চরিত্র জীবনের স্পন্দনপূর্ণ সজীব চিত্র। বিদূষক সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের বংশোদ্ভব, তার ভোগ বিলাস এবং পরিহাসপটুতা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। কিন্তু নাম মাহাত্ম্যে তার বিশ্বাস তার নিজস্ব সম্পদ।

বিদূষক নামমাহাত্ম্যে বিশ্বাস করে; কৃষ্ণভীতি তার চরিত্রের অপর এক বৈশিষ্ট্য। বস্তুতঃ এই দুই বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশই এই চরিত্রটিকে অনন্য সাধারণ করেছে। কথাটা একটু সতর্কভাবে বিচার করা প্রয়োজন। বিদূষক কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেছে। সুতরাং পরকাল সম্পর্কে নিশ্চিন্ত। কিন্তু সে ইহকালকেও ভোগ করতে চায়, যদিও তার দৃষ্টিতে জীবনভোগের অর্থ নির্ঝঞ্ঝাটে মোণ্ডার সাহায্যে রসনার পরিতৃপ্তি। তার এই আকাঙ্ক্ষা বিদূষক খুব সহজ ভাষায় এইভাবে ব্যক্ত করেছে "হরি হে তোমার দোহাই, দুটো মোণ্ডা খেতে এসেছি, দুদিন খেয়ে যাই।" (১/৪)। ইহকাল পরকালের সামঞ্জস্য রেখে তার প্রার্থনা ঃ "হরি হেঙ্গ তোমার মহিমা তুমি নিয়ে থেকো, অন্তিমকাল দেখো, আর রাজধানীতে দুটো মোণ্ডার পথ রেখো।" (ঐ) তাহার বিশ্বাস কৃষ্ণনাম স্মরণ অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তির সাথে ঐহিরক সুখের নিত্যবৈরিতা। এই কারণেই কল্পতরু

উৎসবের সময় 'হরি নিয়ে ছড়াছড়ি'তে সে অস্বস্তি বোধ করেছে। এই কারণেই জনার সংকল্পে হতবুদ্ধি নীলধবজ শ্রীহরিকে স্মরণ করলে সে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছে, "কৃপাময়কে ডেকে ঐহ্যিকের ভালাই কারু কখন হয়নি। .... মহারাজ .... বাঁকা ঠাকুরকে স্মরণ করবেন না। .... বাঁকা ঠাকুর সোজা পথে চলতে শেখেননি।"

এটা ছাড়াও বিদূষকের কৃষ্ণভীতির প্রত্যক্ষ কারণ আছে। বিদুষক যে শুধুই অগ্নির সামনে কৃষ্ণ নামোচ্চারণ করেছে তা নয়। ব্রাহ্মণীর ভাষায় যদিও 'উনি ভুলে মুখে কৃষ্ণনাম করেন না।' (এই উক্তিতে আতিশয্য মার্জ্জনীয়), তবুও একদিন 'উনি' ঠিক এই ভুলটিই করেছিলেন—বিদূষক একদিন মনের খেয়ালে বলেছে, "দয়াময় হরি, একবার দেখা দাও, বামনির হাতের খাড়ু খোল।" এই খেদোক্তির ভিতর অসাধারণত্ব কিছুই নাই। সাধারণ গৃহস্থ ঘরে দাম্পত্য জীবনে এটা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক অনন্যসাধারণ। বিদূষক বলেছে, "সেই অবধি আমার গা ছমছমানি একদিনের তরে যায়নি। (৫/১)।" অবশ্য এই 'গা ছমছমানি'কে আমরা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করতে পারি না, কারণ সত্যকার 'গা ছমছমানি' হলে এই সময় সে ব্রাহ্মণীর সাথে হাল্কা রহস্যালাপ করতে পারে না। তবে একথা ঠিক যে তার বিশ্বাস অসতর্ক মুহূর্তে উচ্চারিত তার প্রার্থনা শ্রীহরির চরণে পৌঁছেছে। তিনি আসবেন এবং আসনে তার প্রার্থনা অপূর্ণ থাকবে না। অর্থাৎ শ্রীহরির দর্শনমাত্র তার ঐহ্যিক ভোগ সুখের সমাপ্তি ঘটবে। আপাতবৈষম্য সত্ত্বেও বিদূষকের কৃষ্ণভীতি নামমাহাত্ম্যে তার বিশ্বাসের সাথে নিবিড় সম্বন্ধযুক্ত।

বিদুষকের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য তার নির্লিপ্ততা। প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত তার কথায় ও আচরণে একটা ঔদাসীন্য লক্ষ করা যায়। কল্পতরু উৎসবকালে হরিনামের ছড়াছড়িতে অমঙ্গলের আশঙ্কা করলেও এই অনুভুতি তাকে কোনোরূপ বিচলিত করে নাই। অগ্নির প্রশ্নের উত্তরে হালকা জবার এর সাক্ষ্য দেয়। প্রবীরের মৃত্যুর পর অভিমানবশতঃ বৃক্ষতল থেকে রাজ্যের নোড়ানুড়ি সংগ্রহ করে শেষপর্যন্ত ব্রাহ্মণীর ইতুভাড় নিয়ে টানাটানি করলেও (৪/২) এই মর্মান্তিক ঘটনা যে সত্যিই তাকে অভিভূত করেছে এমন কোনো নিদর্শন নাই। কিন্তু এই পার্শ্বদৃশ্য (Side Scene) শোকোন্মাদ জনার কাহিনীর বর্ণনার ফাঁকে চিত্তের সমতা আনতে সাহায্য করে। অন্নদাতা রাজাকে ছেড়ে বাস্তুভিটা ত্যাগ করাতেও তার আচরণে কোনোরূপ চাঞ্চল্যের আভাস নেই। (বৈপরীত্য গুণে 'নল দময়ন্তী'র বিদূষক এবং 'পাণ্ডব গৌরবে'র কঞ্চুকার দুর্দশাগ্রস্থ রাজার জন্য ব্যাকুলতা স্মরনীয়)। অবশ্য এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে। বিদূষকের ধারণা শ্রীকৃষ্ণের রাজপূরীতে আসায় রাজার আশু জীবনাবসানের সম্ভাবনা রয়েছে এবং নিজের ক্ষেত্রে এইরূপ সম্ভাবনা সে ছাড়াতে চাই। এ সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই। বিদূষক নিজেই বলেছে, "আমি তো সটকাই, রাজা আমার বাঁচবার আশা রইল, হরিদর্শনের পর যদি টেঁকে যাও, তবে দেখা হবে, নইলে এই শেষ দেখা।" (৪/৩)। এই কি নির্লিপ্ততার সাক্ষ্য দেয়? প্রশ্নটি উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে অশ্বত্থবৃক্ষ উপন্যাসের তাগিদে এই চরিত্রটিকে রাজার আশ্রয় থেকে জনহীন প্রান্তরে টেনে আনতে হয়েছে এবং এই থেকেই জটিলতার সৃষ্টি। কিন্তু বিদূষকের এই সময়কার আচরণ সম্বন্ধে চূড়ান্ত রায় দেবার আগে আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে, আপাতদৃষ্টিতে বাঁচবার তাগিতে রাজার সান্নিধ্য ত্যাগ করলেও বিদূষকের ভোগতৃষ্ণা নেই, অথবা মৃত্যুকেও সে ভীতির চোক্ষে দেখে না। সে ভয় করে হানাহানি কাটাকাটিকে। এই কারণেই জনার সম্মুখে সে অস্বস্তিবোধ করেছে এবং তার কৃষ্ণভীতির পেছনে আছে 'চক্রী'র নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলার সুদীর্ঘ ইতিহাস। নাহলে নীলধ্বজের কাছ থেকে সে যেমন সহজভাবে বিদায় নিয়েছে, যাঁকে সে এড়াতে চেয়েছে এই কৃষ্ণের আগমনেও সে তেমনই সহজভাবে গ্রহণ করেছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রশ্ন করলেন, "ব্রাহ্মণ, তুমি আমায় ভয় করো কেন?" বিদূষক সহজভাবে উত্তর দিলেন, "যখন এসে দাঁড়িয়েছ, সে সব চুকে গিয়েছে।" কিন্তু সেইসঙ্গে সে এটাও বলল, "কিন্তু সাফ বলছি, যেখানে নিয়ে যাও, তুমি যে চাবুক হাতে করে, কি শঙ্খ-চক্র-গদা-

পদ্ম ধরে এসে সামনে দাঁড়াবে, আমি তাতে চোখ খুলছি না। যদি দেখা দেবে, — বাঁশী ধরে, তোমার রাধিকাকে ডেকে সামনে দাঁড়াও,—আমি চোখের কাপড় খুলছি।" (৫/১)। বিদূষক তার সংকল্পে অটল থাকল এবং সে তখনই তার চোখের বাঁধন খুলল, যখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে তার ঈপ্সিত প্রেমময় মুর্তিতে দর্শন দিলেন। বিদূষক দেব-বাঞ্ছিত চতুর্ভুজ মুর্তিতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে চাইনা, একথা স্মরণ রাখলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পার্থসারথি এবং প্রবীরের হত্যাকারী শ্রীকৃষ্ণের আগমনের আগে রাজার প্রতি আপাতদৃষ্টিতে তার বিসদৃশ আচরণ সহজবোধ্য হয়ে পড়ে এবং এতে বিস্ময়ের কোনো কারণ থাকে না।

বিদূষকের পরিকল্পনা গিরিশচন্দ্রের সাহসী মনের পরিচয় দেয়, কিন্তু এই চরিত্রটি কাহিনীকে কোনোরকম প্রভাবিত করেনি। তবুও বিদূষক কাহিনী নিরর্থক নয়, এটা নীলধবজ কাহিনীর উপর নীরব টিপ্পনী। বিদূষক বিশ্বাসবলে স্বীয়বঞ্চিত রূপে শ্রীকৃষ্ণের দেখা পেল; পক্ষান্তরে নীলধবজকে দুঃখের আগুনে পরিশুদ্ধ হয়ে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হল।

১.১.৪.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'জনা' নাটকে জনা চরিত্রটি আলোচনা করো।

২। 'জনা' নাটকে অপ্রধান চরিত্রগুলি আলোচনা করো।

৩। 'বীরমাতা পুত্রের বীরত্ব করে সাধ'–এই উক্তির আলোক জনা চরিত্রের স্বরূপ পর্যালোচনা করো।

৪। 'জনা' নাটকের জনা ও নীলধ্বজ চরিত্র চিত্রণে নাট্যকারের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ণয় করো।

১.১.৪.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস—আশুতোষ ভট্টাচার্য

২। বাংলা নাটকের ইতিহাস—অজিত কুমার ঘোষ

৩। বাংলা নাটকের কথা—সাধন কুমার ভট্টাচার্য

৪। জনা : সম্পাদিত—রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫। জনা : সম্পাদিত—তরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়

৬। নাটকের কথা—দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

——————

প্রথম পত্র

পর্যায়গ্রন্থ - ২

নুরজাহান : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

একক - ৫

‘নুরজাহান’ নাটকের চরিত্র বিচার

বিন্যাসক্রম :

১.২.৫.১ : নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১.২.৫.২ : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত প্রহসন

১.২.৫.৩ : পৌরাণিক নাটক

১.২.৫.৪ : সামাজিক নাটক

১.২.৫.৫ : নাটকের চরিত্র বিচার

১.২.৫.৬ : নুরজাহান

১.২.৫.৭ : জাহাঙ্গীর

১.২.৫.৮ : শের খাঁ

১.২.৫.৯ : লায়লা

১.২.৫.১০ : প্রধান দুই পুরুষ চরিত্রে নুরজাহানের প্রভাব

১.২.৫.১১ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.২.৫.১ : নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ভূমিকা : কবি—নাট্যকার—গীতিকার ও সুরকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীত জগতের একজন দিকপাল ব্যক্তিত্ব। তৎকালীন মঞ্চ—অভিজ্ঞতা ও নাট্যকারদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তিনি মূলত ইউরোপীয় নাট্যদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নাটক লিখতে শুরু করেন। আর নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে নাটক রচনার কৃতিত্বের মধ্য দিয়েই তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেন।

পুরাণের ভক্তিরস আবরণ থেকে মুক্ত করে বাংলা নাটককে নতুন পথে চালিত করার প্রত্যাশাই ছিল তাঁর সব থেকে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। দ্বিজেন্দ্রলাল এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে সফল হয়েছেন। হাসির গান রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল বিশেষভাবে দক্ষ ছিলেন। আর সেই গানের সূত্র ধরেই বাংলা নাট্যজগতে তাঁর প্রবেশ। তাঁর নিজের ভাষায়—

“প্রথমত, প্রহসনগুলির অভিনয় দেখিয়ে সেগুলির স্বাভাবিকতায় ও সৌন্দর্যে মোহিত হইতাম বটে, কিন্তু সেগুলির অশ্লীলতা ও কুরুচি দেখিয়া ব্যথিত হই। ঐ সময়ে ‘কল্কিঅবতার’ নামে একখানি প্রহসন গদ্যে পদ্যে রচনা করিয়া ছাপাই। পরে আমার পূর্ব রচিত কতকগুলি হাসির গান একত্রে গাঁথিয়া ‘বিরহ’

নাটক রচনা করি।.....তৎপরে উক্তরূপে 'ত্র্যহস্পর্শ' রচনা করি এবং উহা স্টারে অভিনীত হয়। পরে 'প্রায়শ্চিত্ত' রচনা করি এবং সেখানি ক্লাসিকে অভিনীত হয়"।

১.২.৫.২ : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত প্রহসন

কল্কি অবতার (১৮৯৫), বিরহ (১৮৯৭), ত্র্যহস্পর্শ (১৯০০), প্রায়শ্চিত্ত (১৯০২), পুনর্জন্ম (১৯১১), আনন্দবিদায় (১৯১২)।

প্রহসনগুলি রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকার মূলত সামাজিক কুসংস্কার ও চরিত্রের অসঙ্গতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সমকালীন অশ্লীলতা ও ভাঁড়ামির পরিবর্তে তাঁর এই স্বতন্ত্রতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'আনন্দবিদায়' প্রহসনটি সেই সময় বিশেষভাবে সাড়া ফেলেছিল। কারণ প্রহসনটিতে প্যারোডির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা হয়। ফলে সমকালে প্রহসনটি বিশেষভাবে নিন্দিত হয়েছিল। তবে প্রহসনটিতে নাট্যকারের কৃতিত্ব ও শিল্পমূল্য বিশেষভাবে প্রশংসার দাবি রাখে।

১.২.৫.৩ : পৌরাণিক নাটক

সীতা (১৯০৮), পাষাণী (১৯০০), ভীষ্ম (১৯১৪)। দ্বিজেন্দ্রলাল পূর্বে রচিত পৌরাণিক নাট্যধারা থেকে সম্পূর্ণরূপে সরে এসে মৌলিক চিন্তাধারা প্রসারের চেষ্টা করলেন। কারণ তাঁর পূর্বে রচিত নাট্যকারেরা মূলত নাটক রচনার ক্ষেত্রে তরল ভক্তিরস, যাত্রাসুলভ আঙ্গিক এবং গীতবাহুল্যকেই বেশি করে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাটকে কোথাও যাত্রাকে অনুসরণ করেননি, অলৌকিক ঘটনার বাহুল্য দেখাননি, বরং সেগুলির যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যেমন : 'সীতা' নাটকে সীতার চরিত্রে আধুনিক রোমান্টিক প্রকৃতি-প্রীতি, রাম চরিত্রে কর্তব্যনিষ্ঠা ও প্রেমচেতনার দ্বন্দ্বের ছবি রয়েছে। শূদ্রক হত্যা প্রসঙ্গে তিনি শূদ্র অধিকারবোধ ও ব্রাহ্মণ্য আদর্শের সঙ্গে সংঘাতের চিত্রটি এঁকেছেন। 'পাষাণী' নাটকে অহল্যার চরিত্রস্খলনে তিনি মানবিক মনস্তত্ত্বের সন্ধান চেষ্টা করেছেন। আবার 'ভীষ্ম' নাটকে নায়কের কর্তব্যরক্ষা ও চিরকৌমার্যের প্রতিশ্রুতিপালনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বেঁধেছে হৃদয়বৃত্তির, এর আগের নাট্যকারেরা যে প্রতিভা দেখাতে পারেননি। বস্তুত, পৌরাণিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সাহসিকতার পরিচয় রেখেছেন। দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে জীবনসত্যকে খোঁজার বা সন্ধানের চেষ্টা করেছেন। তাই এই ধারার ক্ষেত্রে তিনি শ্রেষ্ঠ না হলেও অবিস্মরণীয়।

১.২.৫.৪ : সামাজিক নাটক

'পরপারে' (১৯১২), 'বঙ্গনারী' (১৯১৬) নামক দুটি সামাজিক নাটক রচনা করেছিলেন। তবে এই নাটক দুটির নাট্যোৎকর্ষতা সেইভাবে লক্ষ করা যায় না।

১.২.৫.৫ : নাটকের চরিত্র বিচার

নাটকের ক্ষেত্রে চরিত্র বিষয়টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নাট্যকার কেবলমাত্র একটি কাহিনীকে কখনোই চরিত্র ছাড়া উপস্থাপন করতে পারেন না। বরং বলা ভালো চরিত্রকে আশ্রয় করেই নাট্যঘটনা এগিয়ে চলে। নাট্যকার চরিত্রকে আশ্রয় করে শুধুমাত্র নাটককে সমাপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যান তা নয়, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের ক্ষেত্রে চরিত্রই তার মূল হাতিয়ার। সুতরাং বলতেই পারি চরিত্র নাটকের প্রাণ। নাট্যকার কথা

বলেন ঐ চরিত্রগুলির মুখ দিয়েই। নাটকের ক্ষেত্রে চরিত্রের এই প্রাসঙ্গিকতাকে মাথায় রেখেই আমরা 'নুরজাহান' নাটকের চরিত্রগুলির অবদান আলোচনা করব।

'নুরজাহান' নাটকটি চরিত্রমুখ্য নাটক। নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য নুরজাহানের সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনাবলী উপস্থাপন করা নয়, কোনো একটি তত্ত্বকে রূপকাকারে প্রকাশ করা নয়, অথবা ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সুযোগ বিশেষ কোনো ভাবাবেগকে রূপ দেওয়া নয়, নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য এখানে—নুরজাহান চরিত্র অবলম্বনে মানব চরিত্র রহস্যকে রূপ দেওয়া নয়, বরং নুরজাহান চরিত্র অবলম্বনে মানব চরিত্র রহস্যরূপ দেওয়া তথা ব্যক্তিত্ব রহস্যব্যক্ত করা। চরিত্রগুলির দোষ-গুণ, উত্থান-পতনকে জীবন্তরূপে উন্মোচিত করা।

১.২.৫.৬ : নুরজাহান

মোগল ইতিহাসের এক অনন্যসাধারণ, প্রহেলিকাময়, ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী হলেন নুরজাহান। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধা নারীচরিত্রকে তাঁর 'নুরজাহান' নামক নাটকে জীবন্ত করে তুলেছেন।

সমগ্র নাটকটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নুরজাহানের মূল বিষয় নারীপ্রকৃতির সঙ্গে ক্ষমতা লিপ্সার দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব জটিল প্রণয়ের বিচিত্র ঘূর্ণাবর্তের মাঝখানে স্থির একটি বিন্দুর মতো আপন প্রতিহিংসার লক্ষ্যে অটল নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র নুরজাহান। স্বামী শের খাঁর চারিত্রিক শক্তি ও ভালোবাসার গৌরবে সে যখন মহীয়সী ঠিক তখনই ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীরের কামনার লেলিহান শিখা পুড়িয়ে দিল তার অন্তর, পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিল তার প্রিয়তমকে এবং দস্যুর মত লুটে নিল তার রূপযৌবন। স্বামী প্রেমের অম্লান স্মৃতি আপন বক্ষপঞ্জরে লালন করেই সে হল জাহাঙ্গীরের অঙ্কশায়িনী ভারত সম্রাজ্ঞী 'নুরজাহান'। সাথে সাথে শুরু হল আত্মক্ষয়ী প্রেমের তপস্যা। অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত নুরজাহান শের খাঁর নিষ্কলুস ভালোবাসার মহত্ব স্মরণ করে স্বামীহত্যার তীব্র ঘৃণায় রাজঅন্তঃপুরে জ্বালিয়ে দিল বিদ্রোহের আগুন। ধীরে ধীরে জাহাঙ্গীরের হাত থেকে কেড়ে নিল তার সকল শক্তির উৎস রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা।

কিন্তু নুরজাহান ধোয়া তুলসীপাতা নয়। তার চরিত্রেও দুর্বলতা ছিল। নাট্যকার নাটকের শুরুতেই তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। শ্যামল-কোমল বঙ্গপ্রকৃতির সৌন্দর্য রসমুগ্ধ শের খাঁ যখন প্রাণবন্যায় উচ্ছ্বাসিত আবেগে বলে ওঠেন — 'কি সুখী আমারে মেহের', তখন নুরজাহান বলেছিল — 'কিন্তু এত সুখ বুঝি সইবে না'- শের খাঁ এর উত্তর জানতে চাইলে নুরজাহান বলেছিল —"এত সুখ সয় না, নিজের সইলেও পরের সয় না, ঈর্ষা হয়, লোভ হয়, কেড়ে নিতে ইচ্ছে হয়"।

নুরজাহানের এই নিস্পৃহ সংশয়দীর্ণ উক্তি কি তার অন্তরের গোপন লালসা ও ভারতসম্রাজ্ঞী হওয়ার স্বপ্নসাধের উপর ইঙ্গিত করে না? শের খাঁর প্রতি তার ভালোবাসা যে নিখাদ ছিল না তার প্রমাণ প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যেই আমরা পেয়ে যাই। সেখানে এক দাসীর প্রশ্নের উত্তরে সে বলেছিল—'না আমি সম্রাটকে কখন ভালোবাসি নাই...।' কিন্তু নুরজাহানের এই উক্তি সর্বাংশে সত্য নয়। নৃত্যের সময় সেলিমের সঙ্গে তার চারিচক্ষুর মিলনে যে অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে তা অন্যকিছুরই ইঙ্গিত দেয় —

"রাত্রিযোগে আমরা নৃত্য আরম্ভ কল্লাম। কুমার সেলিম ছিলেন। বাদ্যের শব্দের উপর আমাদের নৃত্য, তরঙ্গের উপর তরীর মত তালে তালে উঠতে আর পড়তে লাগল। পরে আমি গান ধরে দিলাম। আমি অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়ে দেখলাম যে কুমার আমার নৃত্যে কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হয়ে আমার পানে একদৃষ্টে চেয়ে

আছেন। তখন আমার ভিতরে শয়তান জেগে উঠল। হঠাৎ আমার মুখের আবরণ যেন আপনিই খুলে পড়ল। আমাদের চারিচক্ষুর সম্মিলন হল। যেন অতি ত্রস্তভাবে আমি আবরণ মুখের উপর তুলে নিলাম। সেলিম উন্মত্তবৎ হয়ে আমার দিকে ধেয়ে এলেন। পরিবারের অপর লোক তাঁকে গিয়ে ধরে বসিয়ে দিল। সভাভঙ্গ হোল। আমি যেন একটা বিজয়গর্বে বাড়ি ফিরে এলাম। দুদিন পরে যখন একদিন আমার পিতা ও ভাই আসফ বাড়ি ছিলেন না, তখন সেলিম একেবারে আমার কাছে উপস্থিত। তাঁর উদভ্রান্ত কথাবার্ত্তায় বুঝলাম যে আমার জয় সম্পূর্ণ হয়েছে।"

নুরজাহানের এ জাতীয় উক্তি কি সেলিমের প্রতি তার প্রচ্ছন্ন অনুরাগ-আসক্তির পরিচয় বহন করে না? মেহেরউন্নিসা তথা নুরজাহানের মধ্যে প্রথম জীবনের অনুরাগেরই অনুরণন দেখা যায়। কেননা প্রথম অনুরাগের কথা কোনোদিনও ভোলা যায় না। নাট্যকার সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তোলার জন্য প্রথম থেকেই এইভাবে দ্বন্দ্বের বীজ গেঁথে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, শের খাঁর সঙ্গে তার বিবাহ এবং আকবর কর্তৃক শের খাঁকে বর্ধমানের শাসনকর্তা নিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে যখন জনৈকা সেই রমণী তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—'তবে তোমার এখনও তার প্রতি আসক্তি আছে'? তার উত্তরে নুরজাহান জানিয়েছিল —

"না তাকে আসক্তি বলে না, সে একটা উদ্দাম প্রবৃত্তি, হয়ত উচ্চাশা, হয়ত অহংকার, কিন্তু আসক্তি নয়।" তার এই উদ্দাম প্রবৃত্তি যদি আসক্তি না হয়ে উচ্চাশা ও অহংকারই হয় তবে তার চারিত্রিক শক্তির ঔদার্য কোথায়? এ তো আসলে রূপের আগুনে রূপাসক্তকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ক্ষতবিক্ষত করার বিকৃত উল্লাস মাত্র। এই কি তার বিজয়গর্ব? যদি তা হয় তবে তো আরও ভয়াবহ। আবার এটি যে কেবল উচ্চাশা নয়, তার প্রমাণ মেলে নুরজাহান যখন বলে —

"সেই প্রথম যৌবনের চাঞ্চল্য জয় করেছিলাম।....তখন বুঝিনি যে সে প্রবৃত্তি তখন চাপা ছিল মাত্র, মরেনি। স্ফুলিঙ্গ ছাই ঢাকা ছিল — নিবে যায়নি। সেই স্ফুলিঙ্গ নতুন ইন্ধন সংযোগে আবার ধোঁয়াচ্ছে। ভগবান। নারীর হৃদয়কে এত দুর্বল করেছিল। — এই প্রবৃত্তিটাকে দমন কর্ত্তে পাচ্ছি না?" (১/৮)

আগ্রায় অবরোধ থেকে নুরজাহানের যখন মুক্তির সুযোগ ঘটে তখন এক অনির্দেশ্য বেদনায় তার মন হতাশ হয়ে পড়ে —"ভারতের অধিশ্বরী। — 'না এ কথা ভাবাও পাপ'— কিন্তু আমার ভবিষ্যতে নিষ্ফল রোদন ছাড়া কি আর কিছু নেই।" (২/৫)

জাহাঙ্গীরকে প্রণয়ের খেলায় দীর্ঘ চার বছর হার মানায় মেহের। আর সেখানেই তার সার্থকতা। শেষে সে জাহাঙ্গীরকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। মেহেরউন্নিসা পর্ব শেষ করে শুরু হয় নুরজাহান পর্ব। সম্মান, জৌলুস, উপভোগ সবই চলে আসে তার হাতের মুঠোয়। ভারতসম্রাজ্ঞী হয়ে সে ভুলে যায় ভালোবাসতে। বড্ড বেশি ভালবেসে ফেলে সাম্রাজ্যকে। উচ্চাকাঙ্ক্ষিণী নারীর নিজ মুখ থেকেই সেই উচ্চাশার কথা শুনতে পাওয়া যায়—"এ বিশাল সংসারে আজ আমি একা, আর কাকে ভয়? কিসের জন্য ভয়। দাও ঘোড়া ছুটিয়ে দাও, নুরজাহান। পড়ো পড়বে। হয় জয়, না হয় মৃত্যু। আজ আমারও সাধ্য নেই যে আমাকে ফিরাই।" (৪/২)

তাহলে কি আমরা বুঝবো নুরজাহানের দ্বন্দ্বটা আসলে শের খাঁর প্রণয়মুগ্ধ সুকোমল নারী প্রবৃত্তির সঙ্গে উদ্দাম প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব এবং তাই যদি হয় তাহলে নুরজাহানকে আমরা কিভাবে গ্রহণ করব, নুরজাহান সম্রাজ্ঞী হতে চায় অথচ সম্রাটকে ভালোবাসে না বরং তার সর্বনাশ কামনা করে। মনে মনে শের খাঁর ভালোবাসার সুখময় স্মৃতি বহন করে শাসন ক্ষমতা করায়ত্ব করে — এটা কি দ্বিচারিণী স্বভাব নয়। প্রবৃত্তির এই উদ্দাম রূপ যাকে রাষ্ট্রদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করে সে কি মানবী না পিশাচী?

আসলে নাট্যকার নুরজাহানের মানসদ্বন্দ্ব পরিস্ফুট করতে তাকে আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপিত অথচ জাহাঙ্গীরের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ তৎপর রক্ত-মাংসের নারী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। চরিত্রের দ্বন্দ্বই যদি নাটকের প্রাণ হয় তবে নুরজাহানের চরিত্রে সেই দ্বন্দ্বচরিত্র বিকাশে ও নাট্যরস সৃষ্টিতে আলোচ্য নাটকে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং নাটকের শেষদিকে পরাভূত উন্মাদিনী নুরজাহানের দ্বৈতসত্তা দ্বন্দ্ব সকরুণ দীর্ঘশ্বাসের মত তার ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের উপর যে বেদনার রেশ ছড়িয়েছিল তা পাঠক তথা দর্শক চিত্তকে আপ্লুত করে —

"আসফ ।। নুরজাহান।

নুরজাহান ।। কে নুরজাহান? সে ত নেই। সে ত মরে গিয়েছে

আসফ ।। শোনো মেহের —

নুরজাহান ।। মেহেরঙ্গ সেও মরে গিয়েছে। তারা দুজনেই মরে গিয়েছে।"

নুরজাহান চরিত্রে মনলোকের জটিল চলচ্ছবি সে-যুগে যে সাহস ও দক্ষতার সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল অঙ্কন করেছিলেন তার তুলনা মেলা ভার। 'আত্মার সামঞ্জস্য' হারানো এবং বহুচারী নুরজাহানের আশ্চর্য অন্তর্জগৎকে নাট্যকার সুচারু, সুসংবদ্ধ ও সুস্পষ্টভাবে উন্মোচিত করে তুলেছেন।

১.২.৫.৭ : জাহাঙ্গীর

নুরজাহান নাটকের পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে জাহাঙ্গীর অন্যতম। সেলিম (জাহাঙ্গীর) আকবরের জ্যেষ্ঠপুত্র। জানা যায় অল্প বয়সে তিনি নুরজাহানের প্রতি মনোমুগ্ধ হয়েছিলেন। সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনে বসে তিনি তার প্রাক্‌যৌবনের স্মৃতিচারণা করে নুরজাহানকে পেতে চাইলেন। নুরজাহানকে পাওয়ার ইচ্ছা যে তার অন্যায় তা জেনেও তিনি নিজ প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারেননি। জাহাঙ্গীর ভারত সম্রাট সুতরাং তাঁর জীবনে নারীর অভাব না হওয়ারই কথা। কিন্তু মানুষ তার বিচিত্র মনের কাছে হেরে যায়। জাহাঙ্গীরের ক্ষেত্রেও আমরা তাই-ই লক্ষ করি। কেননা জাহাঙ্গীরের প্রথম জীবনের প্রথম প্রেমের তৃষ্ণা মেটেনি, অপরিপূর্ণ ছিল তাঁর মনের ইচ্ছা। তাই তিনি ষড়যন্ত্র করে নুরজাহানের স্বামী শের খাঁকে হত্যা করেন। হত্যার পর তিনি তার মনের মানুষ নুরজাহানকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। কিন্তু নুরজাহান টানা চার বছর ধরে স্বামীর হত্যাকারীকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। ভালোবাসা মানুষকে দুর্বল করে দেয়। তাই জাহাঙ্গীর নুরজাহানের প্রতি সবলের অত্যাচার করতে পারে না। ভালোবাসার মাধ্যমেই নুরজাহানকে পেতে চাইলেন জাহাঙ্গীর। অপেক্ষা করলেন চার বছর, এখানেই জাহাঙ্গীর চরিত্রের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব।

জাহাঙ্গীর জীবনকে ভোগবিলাসের মধ্যে দিয়েই উপভোগ করতে চান। নুরজাহানের প্রতি ভালোবাসায় ক্রমশ যখন মুগ্ধ হয়ে যান তিনি তখনই তার মনে হয় এই প্রণয়ের বা মন দেওয়া-নেওয়ার খেলায় জাহাঙ্গীর হেরে গেছেন। আর তখনই জাহাঙ্গীর নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। শুরু হয়েছে নুরজাহানের রাজত্ব। এই রাজত্বে তিনি 'সুরা, সৌন্দর্য্য, সঙ্গীত' - এর সাম্রাজ্যে গিয়ে বাঁচতে চেষ্টা করেছেন। সম্রাট জীবনের গুরুর দিকে তিনি ছিলেন একজন দক্ষ ও সুশাসক। তার প্রমাণ আমরা পাই খসরুকে সাবধান করে দেওয়ার মধ্যে—"প্রহরিঙ্গ একে কারাগারে নিয়ে যাও — আবদুলঙ্গ দেখ, এর হাত পা গরাদের সঙ্গে বেঁধে সমস্ত দিন সোজা করে দাঁড় করিয়ে রাখো। পৃষ্ঠে কোড়া দিয়ে প্রহার কর।" (২/২)

এখানে জাহাঙ্গীর সম্রাটরূপে পক্ষপাতশূন্য হতে চাইলেও পিতা হিসেবে ক্ষমাহীন। এ ছাড়া লায়লাকে শাস্তি দিতে চাওয়াও তার সুবিচারেরই পরিচয়। তার জীবনের আত্মিক সম্পদ বলতে শুধু ঐ ন্যায়বোধের অহংকারটুকুই সম্বল। তাও তিনি শেষপর্যন্ত হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হন। তাই সাজাহানের শাস্তির কথা তুললে তিনি নুরজাহানকে বলেন—"ন্যায়বিচার। সেদিন গিয়েছে নুরজাহান। আর আমি সম্রাট নাই।..... ন্যায়বিচার নুরজাহানঙ্গ তা কর্ত্তে গেলে আমিও অব্যাহতি পেতাম না। তুমিও না।" (৩/৮)

এইভাবেই তিনি নুরজাহানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে সুশাসকের মর্যাদা সম্পূর্ণই হারিয়ে ফেলেন।

জাহাঙ্গীর ক্রমশই ভারতীয় ইতিহাস থেকে হারিয়ে যেতে থাকেন। অথচ তিনি ভালোবাসায় বিশ্বস্ত ছিলেন। জাহাঙ্গীরের মধ্যে তাই এই সময় এক বৈরাগ্যের করুণ সুর বাজতে থাকে। নিজেই যেন নিজের প্রতি প্রতিশোধ নিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই আমরা তার মুখে শুনি—"সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাক। আমি ক্ষুব্ধ নই"।

এইভাবে পথ হারিয়ে ফেলেছেন জাহাঙ্গীর, আর সেখান থেকে বেরিয়ে আসার কোনো রাস্তা তিনি খুঁজে পাননি।

এরপর জাহাঙ্গীর সুশাসক ও ন্যায়বিচারে বিশ্বাসী হয়ে নুরজাহানের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছেন। ঘোষণার পরক্ষণেই তিনি আবার মহাবৎ খাঁর কাছে প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছেন—"একটা অনুরোধ।.... তোমার কাছে আমি নুরজাহানের প্রাণ ভিক্ষা চাই।" (৪/৮)

একজন সেনাপতির কাছে ভারত সম্রাটের এই প্রাণভিক্ষা চাওয়া বিশুদ্ধ ও পবিত্র ভালোবাসারই সাক্ষ্য দেয়। এখানে আমরা জাহাঙ্গীরকে একজন আদর্শ প্রেমিক হিসেবেই দেখতে পাই। এ যেন রবি ঠাকুরের— 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়'—গানেরই অনুরণন। সব মিলিয়ে জাহাঙ্গীরের ভালোবাসার মধ্য দিয়ে ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষার একটি সুন্দর প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে।

'নুরজাহান' নাটকটি দ্বিজেন্দ্রলাল মূলত শেক্সপীয়রের নাটকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই রচনা করেছিলেন। আর সেই প্রভাব সবথেকে বেশি পড়েছে জাহাঙ্গীর চরিত্রের মধ্যে। এক্ষেত্রে আমরা 'জুলিয়াস সীজার' নাটকের অ্যান্টনির সঙ্গে জাহাঙ্গীর চরিত্রের জীবনের সাযুজ্য লক্ষ করি।

সব মিলিয়ে জাহাঙ্গীর চরিত্রটিকে নাট্যকার প্রাণ-মন-আত্মার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে জীবন্ত করে তুলেছেন। জাহাঙ্গীর নিজের ভাগ্যচক্র নিজেই তৈরি করেছেন। আর সেখানে নুরজাহানের প্রভাব ব্যাপকতা লাভ করেছে। ক্লান্ত, অবসন্ন, হতাশাগ্রস্ত একটি পুরুষ চরিত্র আমাদের সামনে আস্তে আস্তে ম্লান হয়ে যায়। আর জাহাঙ্গীরের জীবনের এই পরিণতির জন্য মূলত দায়ী নুরজাহান।

১.২.৫.৮ : শের খাঁ

বার্গনেশিয়ার পুরুষ ছিল শের খাঁ। প্রকৃত নাম আলি কুলি। আলির বীরত্বে উৎসাহিত হয়ে সেলিম তাকে এই নাম দেয়। জীবনকে গড়ার জন্যই মূলত মোগল সেনাবাহিনীতে যোগদান এবং নিজস্ব ক্ষমতায় অল্পদিনের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা পায়। কথিত আছে সে একবার খালি হাতে বাঘ মেরেছিল। শের খাঁর সম্পর্কে নাট্যকার জানিয়েছেন—"দেবতার মত গঠন, সিংহর মত বীর্য্য, মাতার মত স্নেহ, শিশুর মত সারল্য।"

ঘটনাচক্রে এই বীরপুরুষ রাজনৈতিক কূট-কৌশলে জড়িয়ে পড়ে। সে মেহেরউন্নিসাকে বিয়ে করে বর্ধমানের সরকারি পদ নিয়ে ১২-১৩ বছর সুখী দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করে। তাদের এই সুখী-দাম্পত্য জীবনের একমাত্র ফসল কন্যা লায়লা। নুরজাহানের উক্তিতে জানা যায়—"না প্রিয়তম, আমার বোধ হয় এত সুখ ওদের সৈলো না, এত সুখ বুঝি কারো সয় না।" (১/২)

শের খাঁ, মেহেরউন্নিসাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসত। মহৎ স্বামীর যাবতীয় কর্তব্য পালনেও সে দায়িত্ববান। কিন্তু ঘটনাচক্রে ভয়ংকর অজানা দুর্দৈব নেমে আসে তার জীবনে, জাহাঙ্গীরের শিকার হয়ে পড়ে। এর কারণ সে নিজে নয় বরং নুরজাহানের স্বামী হওয়ায়। অর্থাৎ শের খাঁ নিজের জীবনচক্র নিজে তৈরি করল না। সেলিমের প্রাক্ যৌবনের অনুরাগের স্মৃতির অনুরণনের শিকার হতে হল তাকে। মেহেরউন্নিসার স্বামী বলেই তাকে নিয়তির হাতে পড়তে হয়। শের খাঁর প্রতি আমাদের সহৃদয় সহানুভূতি জাগে। সে প্রথমবার বীরের মতো জাহাঙ্গীরের সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেও দ্বিতীয়বার ষড়যন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য জানতে পেরে আত্মসমর্পণ করে। শের খাঁকে আমরা বলতে শুনি—"তোমাদের সুবাদার কুতব ধরাশায়ী, তোমরা ক্ষুদ্র জীব, তোমাদের বধ করে আর কি হবে। যদি এ সময়ে একবার সম্রাট জাহাঙ্গীরকে পেতাম। যাক। আমি এই অস্ত্রত্যাগ কর্লাম। একটু অপেক্ষা করো।.... এখন আমি মরতে প্রস্তুত। আমায় বধ করো।" (১/৯)

বলাবাহুল্য দুর্দৈবের মত অভাবনীয় ভয়ংকর নিশ্চিত ভবিষ্যৎ জেনেই তার এই ইচ্ছামৃত্যু।

নুরজাহানের জীবনকে যদি দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় — মেহেরউন্নিসা ও নুরজাহান — তাহলে প্রথম পর্যায়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত শের খাঁ। 'সরল উদার শের খাঁ'-কে মেহের বিশ্বাস দিয়েছে, ভক্তি দিয়েছে — কিন্তু অন্তরের প্রেমটুকু দিতে সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ। শের খাঁ তাই নিজেই বলেছে —"আমি তোমার কাছে গিয়েছি শুষ্কতালু ফিরেছি শুষ্কতালু। মেহেরঙ্গ প্রেম শুদ্ধ বিশ্বাস আর সেবা চায় না। এ তৃষ্ণা অন্তরের।" (১/৮)

যে নারীর লালসা ও ভোগবিলাস প্রবণতা এত বেশি সে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসতে পারে না। তাই শের খাঁ শুধুমাত্র মেহেরের 'রূপের সুরা' পান করেছিল মাত্র। হয়তো শের খাঁর স্মৃতির বশেই নুরজাহান জাহাঙ্গীরের প্রস্তাবে চার বছর সম্মত হয়নি বা সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। নুরজাহান চরিত্রে শের খাঁর প্রভাব এইটুকুই। অর্থাৎ আমরা দেখি শের খাঁর বাঁচা ও মরা নুরজাহানের ভাগ্যবিপর্যয়ের সঙ্গে জড়িত। যেন এ রকমই —'Lady thy name is fate'.

১.২.৫.৯ : লায়লা

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'নুরজাহান' নাটকের চরিত্রালোচনায় আমরা দেখি নুরজাহান ও শের খাঁর কন্যা লায়লা একটি বিকাশধর্মী ও অতিব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। নাটকের শুরুতে বালিকা লায়লাকে বর্ধমানে দেখা গেছে সরল, মধুর ও আনন্দময়ী রূপে। সে আর তার মাতুল কন্যা অপূর্ব রূপসী খাদিজা গান গাইছে। সেই গানের ভাষায় এবং সুরে মুগ্ধ নুরজাহান ও শের খাঁ। অপূর্ব সুন্দরীর গলা জড়িয়ে ধরে ইতস্তত বেড়াতে দেখা গেছে তাকে — মনে কোনো ঈর্ষা নেই, সারল্যের প্রতিমূর্তি সে। মায়ের প্রতি ভক্তিমতি লায়লা। পিতার প্রতিও লায়লার ছিল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। সেই পিতাকে কেন্দ্র করেই মায়ের সঙ্গে তার বিরোধ ঘনিয়ে ওঠে। মানুষের আচরণের একটা নীতি থাকা চাই—এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিল তার মনে। মাতা পিতৃহন্তার গৃহে আশ্রয় নিয়েছে বলে তার মনে ধিক্কার জন্মেছিল। সে জন্যই সে মায়ের উদ্দেশ্যে বলেছে — "জাহাঙ্গীরকে বিয়ে করার পূর্বে তুমি বিষ খেতে পারতে।" দৃঢ়চেতা, কঠিন হৃদয়া, অসমসাহসী লায়লা

সম্রাটের প্রাসাদে থেকেই উচ্চকণ্ঠে বলে সম্রাট নীচ, কাপুরুষ। সম্রাটের সামনে দৃপ্তকণ্ঠে বলে—"কি আস্পর্দ্ধায় সম্রাট শের খাঁর পরিবারের উপর এই অত্যাচারের উপর অত্যাচার স্তুপীভূত করেন। আকাশে কি ঈশ্বর নাই? পৃথিবী থেকে কি ধর্ম একেবারে লুপ্ত হয়েছে?" (২/৪)

লায়লার দাঁড়াবার স্থান ঊর্ধ্বজগতে। তার অহংকার এই যে সে শের খাঁর কন্যা। এই কারণেই সে সম্রাটকে তুচ্ছ করে। তার ভর্ৎসনা নুরজাহানের চিত্তকে আলোড়িত করে।

লায়লা ইতিহাসের প্রসিদ্ধ চরিত্র নয়। কিন্তু চরিত্রটিকে নাটকে উপস্থাপন করার কৃতিত্ব দ্বিজেন্দ্র লালের। আলোচ্য নাটকে লায়লা বুদ্ধিমতী, তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্না তরুণী। সে তার মাকে সম্রাটের নিকট থেকে সরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত মা-এর উচ্চাশার জন্য তার সেই মনোবাসনা ব্যর্থ হয়। তেজস্বিনী তরুণী তাই নুরজাহানকে মা বলে সম্বোধন করতেও ঘৃণাবোধ করে। সেই জন্যই নুরজাহানকে সে বলে—"আমার জীবনের সেরা দুঃখ এই, যে তুমি আমার মা। ওঃঙ্গ ছেলেবেলায় কেউ আমায় নুন খাইয়ে কেন মারেনি। তাহলে এ অপবাদ শুনতে হত না।"

মাতা পিতৃহত্যাকরীকে বিবাহ করায় পবিত্র হৃদয়া লায়লা মনে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল। তার পাণ্ডুর, বিষণ্নমুখ, আনত চক্ষু, কম্পিত ভগ্নস্বর তার সেই মনোবেদনারই সাক্ষী। সারল্যের মধ্যেই সে সৌন্দর্যের সন্ধান পায়। শারিয়ার সকলের উপেক্ষিত, তার সরলতার মধ্যেই লায়লা খুঁজে পায় প্রকৃত সুন্দরকে। আসলে সরলতার প্রতি লায়লার ছিল শ্রদ্ধা, আর চালাক ও ধূর্তের প্রতি ছিল অগাধ ঘৃণা। দুর্বলচিত্ত শাহজাদা শারিয়ারকে ভালোবেসেও সে তাকে সম্রাট পুত্র বলেই বিয়ে করতে রাজি হয়নি। তাই লায়লা বলেছে— "আপনাকে বিবাহ করতে পারি না, ...অপরাধ আপনি জাহাঙ্গীরের পুত্র।" (২/৭)

নুরজাহানের (মেহেরউন্নিসার) পূর্বের দাম্পত্য জীবন, পূর্ব প্রণয়ের স্মৃতিচারণা, শের খাঁকে মনে রাখা এবং নুরজাহান চরিত্রের দ্বন্দ্ব পরিস্ফুটনেই লায়লা চরিত্র প্রাসঙ্গিক। সবমিলিয়ে বলা যায় কাঠিন্য ও মাধুর্যের সম্মিলনেই লায়লা চরিত্র গঠিত। এই বুদ্ধিমতী তরুণী সম্পর্কে শাজাহানের উক্তি স্মরণীয়—"নুরজাহানের মেয়ে যেন দ্বিতীয় সেকেন্দার শাহ।" এই উক্তিতে কিছুটা রহস্য থাকলেও বক্তব্যটা অনেকাংশেই সত্য। তবে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে নাট্যকার লায়লা চরিত্রে একটু বেশিই বাস্তবহীন হয়ে উঠেছেন।

'নুরজাহান' নাটকটিতে আমরা আরো বেশ কিছু চরিত্রের সন্ধান পাই। সেক্ষেত্রে প্রতিটি চরিত্রই নাটকটিকে বিশেষকরে নুরজাহান চরিত্রের দ্বন্দ্ব প্রকাশে সহায়ক হয়েছে। যেমন নাট্যকার নুরজাহান চরিত্রের বিপরীত দৃষ্টান্তরূপে সরলা, ধর্মপ্রাণা স্বামী প্রেমে একনিষ্ঠা, সন্তানস্নেহে বিগলিতপ্রাণা রেবা চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন। নুরজাহানের ঈর্ষাকে ত্বরান্বিত করেছে জাহাঙ্গীর প্রশংসিত রেবা। তাই জাহাঙ্গীর রেবাকে 'ঊর্ধ্বস্থিত নক্ষত্রের' সঙ্গে তুলনা করায় নুরজাহানকে আমরা বলতে শুনি—"আচ্ছা তবে দেখি, যে সেই নক্ষত্রের রশ্মি এই পূর্ণচন্দ্রের প্রভায় পাণ্ডুর হয়ে যায় কিনা।" (২/৮)

সবমিলিয়ে আমরা দেখি রেবা যথার্থই 'নুরজাহান' নাটকের একটা আলোক, একটা সংগীত, একটা প্রার্থনা।

নুরজাহানের প্রবল প্রতিপক্ষ হিসেবে আমরা জাহাঙ্গীরের মধ্যমপুত্র খুরমকে (পরবর্তীকালে সাজাহান উপাধি পান) পাই। সমগ্র নাটকে সে একজন দক্ষ যোদ্ধা, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও উৎসাহী চরিত্র। স্থান, কাল ও ঘটনার কিছু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও নাটকটিকে ঐতিহাসিক পদবাচ্য করে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক এবং সেক্ষেত্রে চরিত্রটি সৃষ্টিতে নাট্যকার বিশেষভাবে কৃতিত্বের দাবি রাখেন।

মহাবৎ খাঁ নুরজাহানের আর এক উপযুক্ত প্রতিপক্ষ। নাটকের গোটা চতুর্থ অঙ্ক জুড়েই মহাবৎ খাঁর বিচরণ। আমরা দেখি যে সে সাহসী ও স্পষ্টবাদী। তাই ভারত সম্রাজ্ঞীর সামনেই সে নিজস্ব মতামত জানাতে দ্বিধা করে না। সবমিলিয়ে বলা যায় মহাবৎ সৎ, গর্বী ও ক্ষমতাশালী এক যথার্থ চরিত্র এবং নাটকের অত্যন্ত সজীব ও চলমান চরিত্র।

এ ছাড়াও এ নাটকে বেশ কিছু অপ্রধান চরিত্র রয়েছে যারা 'নুরজাহান' নাটকটির বুনটটিকে দ্বন্দ্বময় করে তুলেছে। যেমন—পারভেজ, আসফ খান, আয়াস, শারিয়ার, খসরু, বন্দররাজ, কর্ণসিংহ, খাদিজা।

১.২.৫.১০ : প্রধান দুই পুরুষ চরিত্রে নুরজাহানের প্রভাব

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নুরজাহানের জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী একটি সূত্রে বিধৃত করে নাট্যরূপ দান করেছেন 'নুরজাহান' নাটকে। বলা বাহুল্য নাটকে সর্বোতভাবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্র নুরজাহান। তার জীবনের উত্থান-পতন নাটকটির মূল উপজীব্য। নায়ক বলতে সেই অর্থে নাটকে কেউ নেই, সেই কেন্দ্রীয় স্থানে নুরজাহানের অবস্থান। নুরজাহানের সংস্পর্শে দুজনের (পুরুষ) সাক্ষাৎ বিশেষভাবে পাওয়া যায়—শের খাঁ ও জাহাঙ্গীর, এদের দুজনের সংযোগস্থল একটাই, তা হল নুরজাহান। এই দুই পুরুষের জীবনে নুরজাহানের প্রভাব বিস্তার। বস্তুতপক্ষে এই দুই পুরুষ চরিত্রের উত্থান-পতন নুরজাহানের সাথেই জড়িত। শের খাঁর পত্নী মেহেরউন্নিসা ও ভারতসম্রাজ্ঞী নুরজাহান—এই হল নুরজাহানের জীবনের দুটি পর্যায়। অজিত কুমার ঘোষ নুরজাহানের জীবনের দুই পুরুষ চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

"শের খাঁ ও জাহাঙ্গীর—এই দুটি চরিত্র পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটা গূঢ় সাদৃশ্য আছে। নারীর প্রেমতৃষ্ণা উভয়ের জীবনের করুণ পরিণতি ঘটাইয়াছে।" (বাংলা নাটকের ইতিহাস, পৃঃ ২৩৯)

সুতরাং আলোচনা দীর্ঘায়িত করলে আমরা দেখতে পাই নুরজাহান কি প্রকারে উক্ত দুই পুরুষের উপর প্রভাব ফেলেছিল। বর্ধমানে কন্যা লায়লা ও স্ত্রী মেহেরউন্নিসাকে নিয়ে সুখী দাম্পত্য জীবন কাটান শের খাঁ। তিনি অমিত শক্তিশালী বীর, কিন্তু তার উদার হৃদয়ের সবখানি জুড়ে এক সীমাহীন ভালোবাসা ব্যাপ্ত হয়েছিল। এককথায় ভালোবাসার যোগ্যপাত্র শের খাঁ। অথচ এই 'সরল উদার শের খাঁ' কেও তার স্ত্রী মেহেরউন্নিসা ওরফে নুরজাহান ভালোবাসতে পারেনি। মেহের তাকে সেবা দিয়েছে ভক্তি দিয়েছে কিন্তু প্রেম দিয়ে হৃদয় তৃষ্ণা মেটাতে পারেনি। উত্তেজিত মেহেরকে প্রশ্ন করেও শের খাঁ তার উত্তেজনার কারণ জানতে পারেনি। তাই শের খাঁর মনের অবশ্যম্ভাবী সন্দেহ থেকে জন্ম নেয় ভীতি। আর সেই কারণেই মনের সন্দেহের মীমাংসা সে নিজেই করে —"এই রকম পালিয়ে পালিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু ভাল। দিবারাত্র একটা সন্দেহে, সংকোচে, শঙ্কায় জীবনধারণ কর্চ্ছি। কেন? কি অপরাধে?" (১/৮)

শের খাঁ মেহেরউন্নিসাকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবাসত। কিন্তু ঘটনাচক্র তাদের জীবনচক্রকে ভেঙে তছনছ করে দেয়। ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীরের শিকার হয়ে পড়ে শের খাঁ। এর কারণ সে নিজে নয়, কারণ সে কুমার সেলিমের প্রথম যৌবনের প্রণয় পাত্রী সুন্দরী মেহেরউন্নিসার স্বামী। অর্থাৎ তার মৃত্যুর কারণ তার স্ত্রী। আর সে জন্যই সে অস্ত্র ফেলে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করে প্রতিপক্ষের কাছে। এখানে আমরা দেখতে পাই শের খাঁর অভিমানক্ষুব্ধ অন্তর একটুও নালিশ করল না, একটি কথাও বলল না। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে এক ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস চিরকালের জন্য নুরজাহানের চিত্ততলে সঞ্চিত করে রাখল। তার এ মৃত্যুর জন্য দায়ী যৌবনের মহামূল্য ভুল — মেহেরের 'রূপের সুরা পান'। তিনি যথার্থই বলেছেন—"হ্যাঁ, অন্যায়

আমার।.... সেই যৌবনে আমি তোমার রূপের সুরা পান করেছিলাম। যানতান না যে বিষপান কর্ল্লাম।" (১/৮)

যাকে বিয়ে করতে ভারতের ভাবী সম্রাট উন্মত্ত তাকে 'বিবাহ' করা শের খাঁর পক্ষে 'পতঙ্গের অগ্নিতে ঝাঁপ দেওয়াই সার' — এটাই সরল, নিষ্পাপ শের খাঁর আসল অন্যায়। একথা সে নিজেও উপলব্ধি করেছিল। আবার একথাও সত্য যে মেহেরের প্রেমের সুধা পেলে বোধ হয় শের খাঁকে হত্যা করার সাধ্য কোনো সম্রাটেরই হত না।

এখানে আমরা দেখতে পাই একজন পুরুষ তার নিজের জীবনচক্রকে নিজে তৈরি করলেন না। শের খাঁর জীবনের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রক তার স্ত্রী — মেহেরউন্নিসা বা নুরজাহান। আমাদের মনে গভীর দাগ কেটে যায় তার এই অন্তর্লীন ভালোবাসা। অদ্ভুত ঘটনাচক্রের শিকার হয়ে পড়ে সে। জাহাঙ্গীরের মধ্যে প্রথম থেকেই যে দ্বন্দ্ব পাওয়া যায় তা নুরজাহানকে কেন্দ্র করেই। তিনি ন্যায় পরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও প্রবৃত্তির তাড়নায় নুরজাহানের রূপতৃষ্ণার কাছে পরাজিত হয়েছেন। তিনি জানেন পরস্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ অন্যায়, অন্যায়ভাবে শের খাঁকে হত্যা করা অপরাধ। তবুও সেখানে নিজেকে নিবৃত্ত করার জন্য কঠোর হতে পারেননি। জাহাঙ্গীরের কথাতেই দেখি রেবার প্রণয়ভিক্ষু হয়েই জীবন কাটালেন তিনি, কখনো হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশের অধিকার পাননি। তার আক্ষেপ—"যদি আমায় ভালোবাসতে পার্ত্তে।" (১/২)

জাহাঙ্গীর পার্থিব ভালোবাসার মুগ্ধতা নুরজাহানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন—"তোমার কি মোহমন্ত্রে আমায় মুগ্ধ করে রেখেছো হে যাদুকরী।" (৪/৪)

এই নুরজাহানের মূর্তি তার চেতনার সবটুকু জুড়ে রয়েছে। কিছুতেই এই নারীর স্মৃতি এড়াতে তিনি পারেন না। সমস্ত হিতাহিত বিবেচনা শক্তি তার আচ্ছন্ন। আর এই আচ্ছন্নতার জন্যই জাহাঙ্গীর কূট-কৌশলে শের খাঁকে হত্যা করে কার্যসিদ্ধি করেছেন। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি জাহাঙ্গীরের এইরূপ অন্যায় কর্মের পেছনে যে রমণীর মুখচ্ছবি ভেসে আসে সে — নুরজাহান।

নাটকটির দ্বিতীয় অঙ্কে নুরজাহানের সম্মতিক্রমে তাকে জাহাঙ্গীর বিয়ে করেন। নুরজাহান বিয়ের পরেই নতুন হাসি নতুন বাসনা নিয়ে নিজের ও জাহাঙ্গীরের জীবন মরণ ভরিয়ে তুলবেন, সে আশারই প্রকাশ পাই নর্তকীদের গানে— "নতুন হাসিতে, বাসনা রাশিতে, জীবন মরণ ভরিয়ে দাও গো।" (২/৬)

এই অঙ্কেরই প্রায় শেষের দিকে জাহাঙ্গীরকে দুর্বল ও নিষ্প্রভ মনে হয়। তবে জাহাঙ্গীরের এই দুর্বল ব্যক্তিত্বই মূলকাহিনীর নিয়ামক শক্তি। জাহাঙ্গীর দমিত হয়ে যান আর শুরু হয় নুরজাহানের রাজত্ব।

জাহাঙ্গীরের মনে হয় ভালোবাসা বুঝি হারজিতের খেলা। জাহাঙ্গীরকে পাবার আগেই নুরজাহানের তার প্রতি ভালোবাসা লোপ পেয়েছে। নুরজাহান তাকে বিয়ে করেছেন কেবলমাত্র ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির মোহে। এই মন দেওয়া-নেওয়ার খেলায় জাহাঙ্গীর হেরে গেছেন। আর তা জানামাত্র নিজেকে নিজে গুটিয়ে নেন। তার আত্মগ্লানিই দীর্ঘশ্বাস হয়ে বের হয়—"যা ইচ্ছা হয় কর। — আর ভাবতে পারিনা, ভাবতে চাহিনা।" (৪/৪) 'সুরা, সৌন্দর্য, সঙ্গীত'—এর সাম্রাজ্যে পালিয়ে গিয়ে তিনি যেন বাঁচতে চেষ্টা করেন। জাহাঙ্গীর ভালো শাসক ছিলেন ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে। কিন্তু তিনি নুরজাহানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর ক্রমশ নিজেকে হারিয়ে ফেলেন।

জাহাঙ্গীর ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে হারিয়ে যেতে লাগলেন অথচ তিনি ভালোবাসায় বিশ্বস্ত ছিলেন। নুরজাহানের অপরাধে তাকে তিনি মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিলেন—তিনি সুশাসক ন্যায়বিচারের বিশ্বাসী।

এখানেই তার হৃদয়ের একটি অংশ ছেদ হয়ে যায়। ঘোষণার পরেই জাহাঙ্গীর মহাবৎ খাঁর কাছে নুরজাহানের প্রাণভিক্ষা করলেন। একজন সম্রাট একটি নারীর জন্য সেনাপতির কাছে প্রাণভিক্ষা করে গভীর ভালোবাসারই পরিচয় দিলেন। এ যেন ভালোবাসায় পূর্ণ—জাহাঙ্গীর। একটি নারীকে ভালোবেসে তাকে পরিপূর্ণ রূপে পাওয়ার আকাঙক্ষা তার মধ্যে প্রকাশিত। জাহাঙ্গীর তার ভাগ্যচক্র নিজেই তৈরি করেছিলেন। সেখানে নুরজাহানের প্রভাব ব্যাপকভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। বিশেষ করে এই নুরজাহানের জন্যই ক্লান্ত, অবসন্ন, হতাশাগ্রস্ত এই পুরুষটি আমাদের সামনে আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যায়।

সুতরাং আমরা দেখলাম একজন উদার, বীর, সরল, সদাশয় ব্যক্তি শের খাঁ নুরজাহানের রূপ-মৃগ-তৃষ্ণিকার পিছনে ছুটে প্রাণ ত্যাগ করেছেন। অন্যদিকে এই নুরজাহানকে আলিঙ্গন করে জাহাঙ্গীরের জীবনে শোচনীয় করুণ পরিণাম ঘটেছে। বস্তুতপক্ষে, এই দুই পুরুষেরই এমন জীবন পরিণতির নিয়ামক — নুরজাহান। অতএব এই দুই পুরুষ চরিত্রে নুরজাহান তার সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম — একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১.২.৫.১১ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'নুরজাহান' ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে কতখানি সার্থক হয়েছে তা যুক্তিসহ আলোচনা করো।

২। ''সুরা, সৌন্দর্য ও সঙ্গীত আমায় ঘিরে থাকুক আর তার উপর তুমি তোমার রূপ, কণ্ঠস্বর, আলিঙ্গন দাও,...চক্ষু থেকে পৃথিবী নিভে যাক''—এই সংলাপের প্রেক্ষিতে জাহাঙ্গীর চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো।

৩। সেলিম (জাহাঙ্গীর) চরিত্রটি 'নুরজাহান' নাটকে কেন অত্যধিক।

৪। 'নুরজাহান' নাটকে মহাবৎ খাঁ এবং লায়লা এই দুটি অপ্রধান চরিত্রের গুরুত্ব আলোচনা করো।

৫। ''এ জয়ে তোমার গৌরব নাই। —আমি দুর্বল নারী মাত্র। তুমি বীর, তুমি পুরুষ। আর আমি যাই হই, নারী মাত্র। এ জয়ে তোমার পৌরষ নাই। আমি অবনতশিরে আমার পরাজয় স্বীকার করি।''—বক্তা কে? তাঁর জীবনের কোন্ প্রেক্ষিতে তিনি অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন তা আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

——————

একক - ৬

ট্র্যাজেডি নাটক হিসাবে নুরজাহান

বিন্যাসক্রম :

১.২.৬.১ : ট্র্যাজেডি নাটক হিসেবে নুরজাহান

১.২.৬.২ : নুরজাহানের নাট্যদ্বন্দ্ব

১.২.৬.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.২.৬.১ : ট্র্যাজেডি নাটক হিসেবে নুরজাহান

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি নাটক কোন্‌টি সে বিষয়ে হয়তো তর্ক থাকতে পারে। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে তাঁর রচিত ১৯০৮ সালের 'নুরজাহান' নাটকের ট্র্যাজেডির তীব্রতা এবং গভীরতা সর্বাধিক। 'নুরজাহান' নাটকের ট্র্যাজেডি সংঘটিত হয়েছে নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র নুরজাহানকে ঘিরে। আর তাই নাটকের নাম যখন নায়িকা নামাঙ্কিত তখন নাটকটির ট্র্যাজিক গৌরব অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত। আমরা সেই 'নুরজাহান' নাটকের ট্র্যাজিক সার্থকতা বিচারের পূর্বে ট্র্যাজেডির স্বরূপ বৈশিষ্ট্যের উপর প্রথমে দৃষ্টিপাত করব।

ট্র্যাজেডি হল কোনো মহৎজীবনের মর্মন্তুদ বিনষ্টির কাহিনী। অন্তর্দ্বন্দ্বে পরাভূত বা অভিভূত মানবজীবনের করুণ কাহিনীকে সাধারণত ট্র্যাজেডি বলা হয়। মানুষের জীবনের মধ্যেই ট্র্যাজেডির বীজ সুপ্ত অবস্থায় থাকে। কোনো অসতর্ক মুহূর্তে সেই বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং বিরাট মহীরূহের আকার ধারণ করে। এরপর নিদারুণ হাহাকার ও অসহায়ত্বের মধ্যে আভাসিত হয় সেই জীবনের পরিণাম। সেই পরিণাম হয় মৃত্যু আর না হয় মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর। গ্রীক ট্র্যাজেডি অনুযায়ী মানুষের এই পরিণতি নিয়তি দ্বারা নির্ধারিত হয়। আবার শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডি অনুযায়ী তা চরিত্রটির অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণে বা ভুলের কারণে সংগঠিত হয়। এ বিষয়ে আরও বলা যায় চরিত্রটিকে অবশ্যই কাহিনীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সক্রিয় হতে হবে এবং তার মধ্যে doing and suffering বর্তমান থাকবে।

ট্র্যাজেডি দর্শক বা পাঠক মনে করুণা মিশ্রিত ভয়ের সৃষ্টি করে। স্নেহ-মমতা, করুণা, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, নারীর কোমল গুণগুলি ট্র্যাজেডিতে থাকে না, যা থাকে তা হল, নির্মম কাঠিন্য ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। নুরজাহান এরকমই অসাধারণ চরিত্র, তার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতিটি পদক্ষেপ তার পক্ষে আত্মপীড়নে, আত্মক্ষয়ে পর্যবসিত হয়। নারী চরিত্রের ট্র্যাজেডি (She-Tragedy) অবলম্বনে লিখিত 'নুরজাহান' নাটকটি। অধ্যাপক এ. নিকল বলেছেন — ট্র্যাজেডির প্রধান চরিত্র যদি নারী হয়, তবে সেই নারীকেও পুরুষায়িত হতে হবে। নুরজাহান চরিত্রে তা কতদূর রক্ষিত হয়েছে তা সবিশেষ আলোচনায় স্পষ্ট হয়।

সমগ্র 'নুরজাহান' নাটকের মধ্যে প্রথম দৃশ্য থেকেই ক্রুদ্ধ নাটিকার রক্তচক্ষু ও তার পক্ষবিস্তারের আভাস আমরা পাই। এটিই ক্রমশ দানা বেঁধে নাটকের ট্র্যাজেডির রসকে ঘনীভূত করে। নাটকের প্রথম পর্যায়ে আমরা দেখি নুরজাহান ও শের খাঁর সুখী দাম্পত্য জীবন। নুরজাহান সুরভিত পদ্মের সৌন্দর্যে পত্নীপ্রাণ শের খাঁর পদতলে যে সুখের জীবন অতিবাহিত করেছিল তার মধ্যে হঠাৎ ঝড়ের তাড়না শুরু হয় সেলিমের আগমনে। এক উৎসব চঞ্চল রাতে নুরজাহান নিজের মধ্যেই আবিষ্কার করে সেলিমের প্রতি

তার দুর্বলতা। নাটকে ঠিক এই জায়গা থেকে শুরু দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্ববিক্ষত নুরজাহানের ট্র্যাজেডি। একদিকে স্বামীর প্রতি তার শ্রদ্ধা মিশ্রিত আনুগত্য অন্যদিকে সেলিমের প্রতি তার ভোগলোলুপ জিগীষা তার সেই নিশ্চিত হাস্যময় পদ্মকে দুলিয়ে দেয়।

নুরজাহান এই উভয় সংকটের মুহূর্তে আত্মরক্ষার জন্য স্বামীকে নিয়ে বর্ধমানে চলে আসে। কিন্তু পাঠকমাত্রই অবগত যে এর ফলে তার বিবেক কিংবা সংসার বাঁচলেও অবদমিত হৃদয়াবেগ ক্রমশই তাকে আকুল করে তুলেছে। এই বর্ধমানে আগমন এক অর্থে নুরজাহানের পরাজয়। এর মধ্যে শের খাঁর মৃত্যু হয়। নুরজাহান আবার আগ্রার প্রাসাদে ফিরে আসে এবং শুরু হয় স্বামী হত্যার প্রতিশোধ স্পৃহা ও অগ্নিদাহ। এক্ষেত্রে নাট্য সমালোচক অজিত কুমার ঘোষের মন্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ—"আশ্চর্য মানুষ, আর তারা অপেক্ষাও আশ্চর্য মানুষের মন।" (বাংলা নাটকের ইতিহাস)

যে নুরজাহান স্বামী শের খাঁকে সেই অর্থে কোনোদিন ভালোবাসেনি, হঠাৎই স্বামীর মৃত্যুতে ভালোবাসা তীব্র হয়ে ওঠে। শুরু হয় তার বাইরে-ভিতরে-পশ্চাতে-সম্মুখে দাবদাহ। আর এই চরমমুহূর্তে লায়লা ও আসফের সাহায্যে প্রতিশোধস্পৃহাকে চরিতার্থ করার জন্য সে সেলিমকে বিয়ে করে এবং সমগ্র রাজ্যে উত্তাল ঢেউ ও কালবৈশাখীর ঝড় তোলে। আর সেই সর্বব্যাপী ধ্বংসলীলার শোষণে তার নারীত্ব ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়ে যায়। অন্যদিকে লায়লা ও আসফ তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। যে শ্রদ্ধাশীল স্বামীর প্রেমের কারণে এই উন্মত্ত নুরজাহানের নবজন্ম তাও নিঃশেষে শুকিয়ে যায়। যে আগুন সে পরের ঘর জ্বালানোর জন্য লাগিয়েছিল সেই আগুন অবশেষে তাকেই লেহন করে। ব্যর্থ অসহায় নুরজাহান তারই সৃষ্ট পথের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তারই বিদায়ের দিন গুনতে থাকে। তীব্র আগুনে সে সোনায় পরিণত হয়। তাই ভাগ্য বিপর্যয়ের চরম মুহূর্তে সে আজ বলে—

"আসফ।। নুরজাহান।

নুরজাহান।। কে নুরজাহান? সে ত নেই। সে ত মরে গিয়েছে।

আসফ।। শোনো মেহের -

নুরজাহান।। মেহের। সেও মরে গিয়েছে। তারা দুজনেই মরে গিয়েছে।"

জীবনযুদ্ধে পরাভূত আশাহত নুরজাহানের নারীসত্তা যখন জেগে ওঠে তখনই সৃষ্টি হয় নাটকের চরম ট্র্যাজেডি। তখনই সৃষ্টি হয় পাঠকের মনে তীব্র সহানুভূতি। প্রসঙ্গত অজিত কুমার ঘোষের মন্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে—"উপরের দেবতা তাহাকে শাসন করিবার জন্য ঝড়ের গর্জন ও বিদ্যুতের কষাঘাত শুরু করিয়াছেন। নীচের মানুষ তাহাকে দমন করিবার জন্য তাহার শক্তি ও দর্প চূর্ণ করিয়া তাহাকে সহায়সম্বলহীনা এক ভিখারিণী করিয়া ফেলিয়াছে, ইহা অপেক্ষা হৃদয়বিদারক দৃশ্য আমরা আর কোথায় দেখিয়াছি?" (বাংলা নাটকের ইতিহাস)

অ্যারিস্টটল তাঁর 'Poetics' গ্রন্থে ট্র্যাজেডির সারাৎসার যন্ত্রণা বা 'suffering' কে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন —"An action of a destructive or painful nature" রূপে। নুরজাহান চরিত্রে সে দৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যা দর্শক মনকে করুণরসের আধারে অভিভূত করে।

যদিও সমালোচকেরা মনে করেন যে ট্র্যাজেডির চরিত্র যদি নারী হয় তবে সেক্ষেত্রে নারীর সুকোমল জীবন যথার্থ অর্থে ট্র্যাজিক মহিমা পায় না। কিন্তু তাই যদি হয় তা হলে ইউরিপিদিস কিংবা শেক্সপীয়র অথবা ইবসেনের নাটকে নায়ক চরিত্র ট্র্যাজেডির মহিমা পেল কি করে? সেক্ষেত্রে লক্ষ করলে দেখা যাবে নুরজাহান মিডিয়ার ন্যায় প্রতিহিংসাময়ী, লেডি ম্যাকবেথের ন্যায় অপ্রকৃতিস্থ। অর্থাৎ সে ভারতের সর্বময়ী অধিশ্বরী ছিল বলেই নয় দারুণতম অন্তঃসংঘাতের মধ্য দিয়ে একান্ত দুঃখময়

ট্র্যাজিক মর্যাদা লাভ করেছিল। আর সে জন্যই নুরজাহান ট্র্যাজিক চরিত্র হিসেবে অনন্য সাধারণ, নাটকটিও ট্র্যাজিক মহিমায় মহিমান্বিত।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নুরজাহানের চরিত্রের অসংগতির মধ্যে সংগতিবিধান করতে চেয়েছিলেন। নাটকের সমাপ্তিতে নুরজাহানের সেই দ্বৈত ব্যাক্তিত্ব স্পষ্টভাবেই পরিস্ফুট—"...মেহেরউন্নিসা ছিল শের খাঁর স্ত্রী। আর নুরজাহান ছিল জাহাঙ্গীরের স্ত্রী। মেহেরউন্নিসা মার্ল্লো শের খাঁকে, নুরজাহান মার্ল্লো জাহাঙ্গীরকে।"

এক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করি নাটকে যে দুই পুরুষ চরিত্র নুরজাহানকে প্রভাবিত করেছিল তাদের মধ্যে একজন তাকে সংসার দিয়েছে আর একজন দিয়েছে সাম্রাজ্য। কিন্তু নুরজাহানের সর্বগ্রাসী ভুল সিদ্ধান্ত এবং তার নিয়ন্ত্রণাধীন উচ্চাশা শেষপর্যন্ত তাকে একেবারে পর্যুদস্ত করেছে। এখানেই সে পরাজিত, ক্ষতবিক্ষত এক অসহায় নিরুপায় নারীর আর্তনাদ এই পর্যায়েই ট্র্যাজেডির রসকে ঘনীভূত করে।

নাটকটিতে নুরজাহান চরিত্রের ট্র্যাজেডি প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নাট্যসমালোচক শ্রী অজিতকুমার ঘোষ জানিয়েছেন—"নুরজাহান-এর ট্র্যাজেডি একমাত্র নুরজাহানের চরিত্র অবলম্বন করিয়াই অনন্য মহিমা লাভ করিয়াছে।.... বোধহয় বাংলা সাহিত্যে ইহার ন্যায় সংঘাত তাড়িত ট্র্যাজিক নারী চরিত্র আর একটিও নাই।" (বাংলা নাটকের ইতিহাস)

এক্ষেত্রে নাট্যকার মূলত শেক্সপীয়রীয় রীতিতে প্রথম থেকে দ্বন্দ্বের বীজ গেঁথে দিয়েছেন। এ নাটকের দ্বন্দ্ব বাইরের নয়, অন্তরের।

নুরজাহানের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, চতুরতা, ক্ষমতা করায়ত্ব করার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা এবং এই আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপায়ণে তার ক্ষিপ্তা ও দৃঢ় মনোভাব তার চরিত্রের এমন গুণ তাকে নায়কোচিত দীপ্তি দান করেছে। অন্যদিকে তার অনন্য সাধারণ রূপ, তার একাকিত্ব ও তার আত্মজ্ঞান ও নিজের সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ওঠার যন্ত্রণা তাকে ট্র্যাজিক মহিমা দান করেছে। মৃত্যু নয় বেঁচে থেকে অন্তর্দ্বন্দ্বের আগুনে দগ্ধ হয়েই নুরজাহানের ট্র্যাজেডি। তাই ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য বলেছেন—"ইহা একখানি মনস্তাত্ত্বিক ট্র্যাজেডি।" (নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক নাটকবিচার)

চরিত্রগত ত্রুটির কারণে নুরজাহান ট্র্যাজিক চরিত্র। শেষপর্যন্ত সে দর্শক মনে করুণা জাগিয়ে, আবেগ পরিশুদ্ধ করে সার্থক ট্র্যাজিক চরিত্র হয়ে ওঠে এবং নাটকটি বাংলা নাটকের ইতিহাসে ট্র্যাজেডি নাটক রূপে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে।

১.২.৬.২ : নুরজাহানের নাট্যদ্বন্দ্ব

দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে 'নুরজাহান' অন্যতম। ড. অজিতকুমার ঘোষ এই নাটকটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—"ট্র্যাজেডির বিস্তৃতি ও জটিলতা যেমন 'সাজাহান'-এ সর্বাপেক্ষা বেশি, ট্র্যাজেডির তীব্রতা ও গভীরতা তেমনি 'নুরজাহান'-এ সকলের তুলনায় অধিক। 'সাজাহান'-এর ট্র্যাজেডি সঞ্চারিত হইয়াছে সাজাহান, ঔরংজেব, দারা, সুজা, মহম্মদ, সোলেমান প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্রে ; কিন্তু 'নুরজাহান'-এর ট্র্যাজেডি একমাত্র নুরজাহান চরিত্র অবলম্বন করিয়াই অনন্য মহিমা লাভ করিয়াছে।" (বাংলা নাটকের ইতিহাস, পৃঃ ২৩৬, ৭ম সংস্করণ) প্রসঙ্গক্রমে আমরা 'নুরজাহান' নাটকটির নাট্যদ্বন্দ্ব বিচারে অগ্রসর হব।

নাট্যদ্বন্দ্ব বা নাট্যসংঘাত নাটকের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন আলংকারিক অ্যারিস্টটল বা ভরত

এই দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করেননি। উনিশ শতকের বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক হেগেল এই দ্বন্দ্ববাদের স্রষ্টা। পরবর্তীতে প্রচুর নাট্যসমালোচক নাট্যদ্বন্দ্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তাকে নাটকের প্রাণ বলেও মনে করেছেন। ট্র্যাজেডি, কমেডি যে নাটকই হোক না কেন তা দ্বন্দ্বমুক্ত নয়। তবে ট্র্যাজেডি নাটকে অন্তর্দ্বন্দ্বই প্রাধান্য লাভ করে। কারণ সেখানে আত্মঅনুশোচনা ও ভাগ্যবিপর্যয়ই প্রধান হয়ে ওঠে। 'নুরজাহান' নাটকের ভূমিকাতেই নাট্যকার দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন—"এই নাটকে বাহিরের যুদ্ধ অপেক্ষা ভিতরের যুদ্ধ দেখাইতেই আমি আপনাকে সমধিক ব্যাপৃত রাখিয়াছি।" ভিতরের এই যুদ্ধ বলতে অন্তর্দ্বন্দ্ব (inner conflict)-কেই বোঝানো হয়েছে। আর এই অন্তর্দ্বন্দ্ব নুরজাহানের জীবনেরই। 'নুরজাহান' মূলত কেন্দ্রীয় চরিত্র সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের উত্থান-পতনের কাহিনী। একটি কাহিনীতে নাট্যদ্বন্দ্বের রূপ দিয়ে তার সঙ্গে বিভিন্ন উপকাহিনী ও শাখাকাহিনী জুড়ে দেওয়া হয়েছে—যাতে তার উচ্চাশা ও ফলাফলকে যথাযথ বোঝা যায়।

নয়টি দৃশ্যে সম্পূর্ণ প্রথম অঙ্কটিতে নায়িকা সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের জীবনের পশ্চাদপট বর্ণিত। প্রথম স্বামী শের খাঁর সঙ্গে নুরজাহানের সম্পর্ক এবং প্রাক্-বিবাহ জীবনে কুমার সেলিমের সঙ্গে তার সম্পর্ক এখানে নাট্যকাহিনীর পটভূমি রচনা করেছে। নাটক শুরু জাহাঙ্গীরের সম্রাট হওয়ার ঘটনা দিয়ে। এই সংবাদে নুরজাহান ও শের খাঁর প্রায় বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় ক্রমে যখন এটা স্পষ্ট হয় যে, সম্রাট জাহাঙ্গীর শের খাঁকে হত্যা করে বিধবা মেহেরউন্নিসাকে পেতে চায়। তখন দ্বন্দ্ব ক্রমশ জমে ওঠে, আর নুরজাহানের অন্তর্দ্বন্দ্বেরও সূচনা লক্ষ করা যায়। প্রথমদিকে নুরজাহান প্রবৃত্তিকে জয় করার চেষ্টা করেছিল এইভাবে—
"নুরজাহান। সেলিম সম্রাটঙ্গ — আবার সে কথা কেন মনে আসে? — না সে চিন্তাকে আমি মনে আসতে দিব না। না না না। সে প্রথম যৌবনের একটা খেয়ালমাত্র। এখন আবার সে চিন্তা কেনঙ্গ সেলিম সম্রাট, তাতে আমার কি? আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কাজ কি?" (১/১)

প্রথম অঙ্কে জাহাঙ্গীরের পত্নী রেবা এবং পুত্র খসরুর উপকাহিনীরও অবতারণা করা হয়েছে। অর্থাৎ এই প্রথম একটি উপকাহিনীকে মূলকাহিনীর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হল, নুরজাহানের সঙ্গে একদিকে শের খাঁর, অন্যদিকে জাহাঙ্গীরের সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং শের খাঁর মৃত্যুতে সেই জটিলতার নূতনতর দিককে নুরজাহানের মনের মুকুরে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। অর্থাৎ নাটকের প্রথম অঙ্কে দ্বন্দ্বের উপস্থাপন লক্ষ করা যায়।

দ্বিতীয় অঙ্কে দ্বন্দ্ব ঊর্ধ্বগতি লাভ করে। এই অঙ্কে খসরুর উপকাহিনী যেমন বিস্তারলাভ করেছে তেমনি খসরুর বিচারকার্যে মহাবৎ খাঁ এবং জাহাঙ্গীরের অন্যান্য পুত্রদের উপস্থিতিও সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার এবং সর্বোপরি নুরজাহানের একমাত্র কন্যা লায়লার সাথে তার মায়ের একই সঙ্গে ঘৃণা ও ভালোবাসার সম্পর্কের উন্মোচন ঘটে। পিতাহত্যাকারীকে বিবাহ করার জন্য লায়লা তার মা নুরজাহানকে ঘৃণা করলেও মায়ের সঙ্গে একযোগে একটা বিরাট ঝড় তুলতে চায়। তাদের পরিচয় এখন থেকে মা ও মেয়ে নয়, দুই শয়তানী শক্তি। এই অঙ্কে নুরজাহান জাহাঙ্গীরের বিবাহ প্রস্তাবে সম্মত হয়, তার ভাই আসফের মধ্যস্থতায়। এই বিবাহের পর সে উপলব্ধি করে যে, সে তার নিজের শয়তানী শক্তির সাথে যুদ্ধ করেও পরাস্ত হয়েছে। নুরজাহানের উচ্চাশাই তাকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যায় এবং নাট্যদ্বন্দ্ব ক্রমশ অঙ্কুরিত হয়ে বিষবৃক্ষের রূপ নেয়। তাই নুরজাহানের মুখে অনির্দেশ্য বেদনার হতাশাবাণী শুনতে পাওয়া যায়—"ভারতের অধিশ্বরী। না একথা ভাবাও পাপ — কিন্তু আমার ভবিষ্যতে নিষ্ফল রোদন ছাড়া কি আর কিছু নাই।" (২/৫)

তৃতীয় অঙ্কের শুরুতেই সাজাহান দাক্ষিণাত্য বিদ্রোহ দমনে যাত্রা করে। নুরজাহান তাকে পরামর্শ দেয় ভাই খসরুকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। নুরজাহানের প্রত্যক্ষ ইঙ্গিতে খসরু হত্যার দায়ভার চাপিয়ে দেওয়া

হয় সাজাহানের উপর। তৃতীয় অঙ্কের শেষে সাজাহানের বিচার শুরু হয় নুরজাহানের দরবার কক্ষে। বিদ্রোহী হয়ে ওঠে শুধু সাজাহান নয়, সেনানী মহাবৎ খাঁ ও নুরজাহান আত্মজা লায়লা। চরম সংকট ঘনিয়ে আসে এবং দ্বন্দ্ব চরমোৎকর্ষতা লাভ করে।

চতুর্থ অঙ্কে নাট্যদ্বন্দ্ব নিম্নগতি প্রাপ্ত হয়। ক্ষমতার শিখরে উঠে নুরজাহান তার শত্রুদের সংখ্যাবৃদ্ধি করে চলে। মহাবৎ খাঁকে সেনাপতি পদ থেকে চ্যুত করে কুমার পরভেজের অধীনে বঙ্গদেশের সুবাদার করে পাঠানো হয়। পরে বঙ্গদেশ থেকে পাঞ্জাবে তাকে বদলির আদেশ পাঠানো হয়। মহাবৎ সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে সম্রাজ্ঞী তাতে বাধা দেয়। এখানে নুরজাহানের পতনকে ত্বরান্বিত করেছে প্রধানত মহাবৎ খাঁ এবং তার সাথে যোগ দিয়েছে সাজাহান। এখানে নুরজাহান শিখরের কিনারায় দাঁড়িয়ে। যার পরই তার ক্রমপতন ঘটেছে। নুরজাহান লড়াই করেছে ঠিকই কিন্তু তা যেন অনিবার্য পতন ও পরাজয়ের জন্যই। তাই নুরজাহান নিজেকেই বলেছে—“এ বিশাল সংসারে আজ আমি একা। আর কাকে ভয়? কিসের জন্য ভয়। দাও ঘোড়া ছুটিয়ে দাও নুরজাহান। পড়ো পড়বে—হয় জয়—না হয় মৃত্যু। আর আমারও সাধ্য নাই যে আমাকে ফিরাই।” (৪/২)

পঞ্চম অঙ্কে এ নাটকের পরিণতি। নুরজাহান এখানে মহাবতের বন্দী দশা থেকে মুক্তির কৌশল অবলম্বন করেছে। নিজেই নিজের থেকে পালাতে চেষ্টা করেছে। একটা অর্জিত অভ্যাস তাকে কলের পুতুলের মতো চালিয়ে নিয়ে যায়। সে চলতে চায় না, কিন্তু চলা ছাড়া তার কোনো উপায় নেই। কন্যাকে শেষে তাই করুণস্বরে বলে—“মেহেরউন্নিসাকে চিন্তিস? সে ছিল তোর মা। আর এই নুরজাহান ছিল তোর সৎ মা। আর আমি?—আমি তোর কে? আমি তোর কেউনা। আমি তোর কেউ না। কেউ না।” (৫/৮)

নাটকের জটিল ঘটনাসমূহের মালায় গাঁথা প্লটটি জটিলতর হয়ে উঠেছে নুরজাহানের কামনা-বাসনা-স্বপ্নসাধ ও প্রতিহিংসার অনেকান্ত ট্র্যাজিক অনুভবে। মানুষের ব্যক্তিত্বের ও দ্বন্দ্বের পরাজয়কে একে একে তাই তিনি এখানে দেখিয়েছেন। সাধনকুমার ভট্টাচার্য বলেছেন—“নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল নুরজাহান কাহিনী আশ্রয়ে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে সেই ব্যক্তিত্ব হারানোর তথা সর্বরিক্ততার ট্র্যাজেডি দেখাতে চেষ্টা করেছেন। আমরা দেখি, ‘বধু-মেহের’, ‘মাতা-মেহের’, ‘মহিষী মেহের’ (নুরজাহান)—এই সমস্ত ব্যক্তিত্ব হারিয়ে আপন সত্তার সবকিছুই হারিয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও রিক্ত হয়ে শোচনীয় পরিণাম লাভ করেছে। বহু ব্যক্তিত্বময় ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিলোপের, নিরাশ্রয় অহং-এর মহাশূন্যতা ট্র্যাজেডি, গ্রীক বা শেক্সপীয়রের কোনো ট্র্যাজেডির আদর্শে পাওয়া যায় না, আদর্শ হিসেবে নুরজাহান ট্র্যাজেডির আদর্শকে আমরা মৌলিক বলেই গণ্য করতে পারি এবং সেই মৌলিক পরিকল্পনার জন্য নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভাকে বারবার ধন্যবাদ দিতে পারি।” (নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার, ২য় খণ্ড)

নুরজাহানের সম্রাটের প্রতি গোপন লালিত প্রেম, সেলিমের প্রতি আগ্রহ, শের খাঁর প্রতি প্রেমের বিগত স্মৃতি, স্বামী হন্তার কণ্ঠলগ্ন হওয়ার আত্মদায়—বহুচারী নুরজাহানের আশ্চর্য অন্তর্দ্বন্দ্বকে ও অন্তর্জগৎকে উন্মোচিত করে দেয়।

১.২.৬.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ‘নুরজাহান’ নাটকে পাশচাত্য প্রভাব কিভাবে নাটকের পরিণতিতে পরিস্ফুট হয়েছে তা বিশ্লেষণ করো।

২। ‘নুরজাহান’ নাটক অবলম্বনে নাট্যদ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে নাট্যকারের সাফল্যের পরিমাপ করো।

————

একক - ৭

ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে 'নুরজাহান' নাটকের সার্থকতা

বিন্যাসক্রম :

১.২.৭.১ : ঐতিহাসিক নাটক

১.২.৭.২ : ইতিহাসাশ্রিত নাটকের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

১.২.৭.৩ : নুরজাহান নাটকের পটভূমি

১.২.৭.৪ : নাটকের গঠনশৈলী

১.২.৭.৫ : ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে 'নুরজাহান' নাটকের সার্থকতা

১.২.৭.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.২.৭.১ : ঐতিহাসিক নাটক

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ঐতিহাসিক নাট্যকার হিসেবেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সর্বজনবিদিত। বলাবাহুল্য ঐতিহাসিক নাট্যকার হিসেবেই তাঁর কৃতিত্ব সর্বাধিক এবং এই ধারার বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকারও তিনি। তাঁর রচিত ঐতিহাসিক নাটকগুলি হল—'তারাবাঈ' (১৯০৩), 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫), 'দুর্গাদাস' (১৯০৬), 'মেবার পতন' (১৯০৮), 'নুরজাহান' (১৯০৮), 'সাজাহান' (১৯০৯), 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১)।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বুকে বসে রাজপুতদের সঙ্গে মোগলদের লড়াইয়ের কাহিনী নিয়েই তাঁর বেশিরভাগ ঐতিহাসিক নাটক রচিত। এই নাটকগুলির মধ্যে তাঁর জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম, দেশানুরাগ, স্বাজাত্যবোধ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রভৃতি লক্ষ করা যায়। বলা যায় এই নাটকগুলির মাধ্যমে তিনি ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের একটি সংযোগসূত্র সৃষ্টির সঙ্গত চেষ্টাও করেছেন। অতিভাবালুতা, কবিত্ব ও আদর্শের বাড়াবাড়ি দ্বিজেন্দ্রলালকে উন্নততর নাট্যকারের মহিমা থেকে বঞ্চিত করেছে। কোনো কোনো নাটকে তাঁর কাব্যধর্মীয় সংলাপ অবশ্য শিল্পমূল্যের বিচারে সার্থকতা অর্জন করেছে, তবে নাট্যবিচারের ক্ষেত্রে তা দোষের। তিনি মঞ্চবদ্ধ নাট্যকার ছিলেন না বলেই তৎকালীন যুগে তাঁর নাটকগুলি অভিজাত সাহিত্যরুচির স্পর্শ পেয়েছে। তা সত্ত্বেও একথা প্রাসঙ্গিক যে, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্র ও তাঁর পরবর্তী নাট্যকারদের মধ্যে রুচিসম্পন্ন ও আধুনিক জীবনদৃষ্টিসম্পন্ন নাটকের সংযোগসেতুটি গড়ে দিয়েছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

১.২.৭.২ : ইতিহাসাশ্রিত নাটকের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

মানুষের অতীত আশ্রয়ী ও তথ্যনিষ্ঠ জীবনব্যাখ্যাই ইতিহাস, আর এই অতীত আশ্রয়ী ও জীবনব্যাখ্যাকে সাহিত্যিক যখন সাহিত্যরসে জারিত করে জীবনকে অনুভব করায়, তখনই তা হয়ে ওঠে ঐতিহাসিক উপন্যাস, নাটক বা গল্প ইত্যাদি। ইতিহাসের সত্য বিশেষ সত্য। আর সাহিত্যে প্রকাশ পায় নিত্যসত্য বা 'অধিকতর সত্য'। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'ঐতিহাসিক রস'। ইতিহাসের মর্যাদা পাওয়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মনৈতিক আন্দোলনাদির এবং তৎসম্পর্কিত ব্যক্তির জীবন কথার

নাট্যরূপই হল ঐতিহাসিক নাটক। আর একটু অন্যভাবে বলা যায় — যে নাটকের মূল কাহিনী, প্রধান প্রধান ঘটনা ও চরিত্রগুলি ইতিহাস থেকে গৃহীত এবং নাট্যকারের সৃজনশীল পরিকল্পনা সহযোগে বা মানবিক গুণে মণ্ডিত হয়ে শিল্পমূল্যে রসোত্তীর্ণ হয় তাকেই আমরা ঐতিহাসিক নাটক বলি। তবে একথা স্মরণীয় যে নাট্যকার ইতিহাসকার নন, তাই তিনি ঐতিহাসিক ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা না দিয়ে ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে তথা পরিস্থিতির মধ্যে জীবনের যে রসরূপ নিহিত রয়েছে সেই রূপকেই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। এই কথাগুলি স্মরণে রেখে আমরা ঐতিহাসিক নাটকের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সূত্রাকারে এভাবে বলতে পারি —

এক, অতীত ইতিহাসের কোনো এক স্মরণীয় অধ্যায় অবলম্বন করে লিখিত হবে।

দুই, মূলকাহিনী ও প্রধান প্রধান চরিত্রগুলিকে ঐতিহাসিক হতে হবে।

তিন, নাট্যকার ইতিহাসের অন্ধদাসত্ব করবেন না। স্বাধীন সৃজনশীল কল্পনায় ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোকে প্রয়োজনমত তিনি বিশ্বাস্য ও মানবিক রূপ দেবেন। স্বাভাবিক কারণেই নাটকে অনৈতিহাসিক দু-একটি চরিত্র—ঘটনাও যুক্ত হতে দেখা যায়।

চার, বহু ঘটনা ও উপাদান বিচ্ছিন্নভাবে থাকে ইতিহাসে, এগুলি গ্রহণের সময় তিনি সতর্কভাবে নির্বাচন করবেন। নিজ উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আবশ্যিক ঘটনাগুলিকে তিনি সজ্জিত করবেন। ঘটনা সন্নিবেশ এমন হবে যাতে বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন ঘটনাগুলি একটি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়।

পাঁচ, মূল চরিত্রকে ইতিহাসের বাস্তবতা ও কল্পনার সম্ভাব্যতার মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য হতে হবে।

ছয়, যে যুগ ও কালের পরিচয় নাটকে স্থান পাচ্ছে, সেই যুগের রীতিনীতি আচার-বিচার, সংস্কার, জীবনাদর্শ প্রভৃতিকে যতদূর সম্ভব বাস্তবতার সঙ্গে তুলে ধরতে হবে।

সাত, ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি যে 'কালের সারথি' একথা মনে রেখে তাদের ক্রিয়াকলাপ ও পরিচয়ে অসাধারণত্বের ছাপ ফুটিয়ে তুলতে হবে। তাদের ভাষার আভিজাত্য ও আচরণের স্বাতন্ত্র্যও রক্ষা করতে হবে।

১.২.৭.৩ : নুরজাহান নাটকের পটভূমি

বাংলা সাহিত্যে প্রথম ঐতিহাসিক নাটক লেখার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) নাটকে। তিনি এক্ষেত্রে সার্থক নাট্যকার না হলেও এই ধারার পথ প্রদর্শক। এরপর গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ এই ঐতিহাসিক নাটক রচনার ধারাকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যান। আর কৃষ্ণনাগরিক তথা বাংলা নাট্যসাহিত্যের স্বনামধন্য নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাতে এই ধারা শ্রেষ্ঠত্বলাভ করে। আর সেক্ষেত্রে তাঁর 'নুরজাহান', 'সাজাহান', ও 'মেবার পতন' নামক ঐতিহাসিক নাটকগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর 'নুরজাহান' নাটকের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় নাটকটি সম্পর্কে আমাদের অনেক মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন—"নুরজাহান নাটকের মূল ইতিবৃত্তভাগ আমি প্রধানত ডো সাহেব প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে লইয়াছি। জাহাঙ্গীর আত্মজীবনী হইতেও কতক সাহায্য পাইয়াছি। তবে তাহার উপর অধিক নির্ভর করিতে পারি নাই। কেননা, মানুষের আত্মদোষ গোপন ও আত্মগুণ অতিরঞ্জনের প্রবৃত্তি এতাদৃশ প্রবল ও সার্ব্বজনীন, যে তাহার আত্মসমালোচনার কথা দূরে থাকুক, স্ববিবৃত ঘটনাগুলি পর্যন্ত অতথ্য দোষে দূষিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।"

এছাড়াও তিনি ভূমিকাতেই মৎ প্রণীত ঐতিহাসিক নাটকের থেকে এই নাটকের মূল পার্থক্যগুলিকেও স্পষ্টভাবেই বলে দিয়েছেন। সেগুলি এইরূপ —

এক, নাটকে তিনি দেবচরিত্র সৃষ্টির পরিবর্তে দোষগুণ সমন্বিত মনুষ্যচরিত্র সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছেন।

দুই, বাহিরের যুদ্ধ অপেক্ষা ভিতরের যুদ্ধকেই অর্থাৎ অন্তর্দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

তিন, নাটকে তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তির সামনে কারও স্বগতোক্তিকে একেবারেই বর্জন করেছেন।

অর্থাৎ নাটকটি রচনার পটভূমি হিসেবে তাঁর এই উদ্দেশ্যগুলি বেশি করে কাজ করেছে—প্রকৃত মনুষ্যচরিত্র সৃষ্টি, অন্তর্বিরোধ এবং প্রকাশ্যে স্বগতোক্তির বর্জন। নুরজাহান ভারতীয় ইতিহাসের এক অনন্য ও অসাধারণ নারী চরিত্র। যাঁকে ঘিরে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় একাধিক সাহিত্য ও রোমান্সের সৃষ্টি হয়েছে। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সেই সুযোগকেই কাজে লাগিয়েছেন তাঁর নাটক রচনার ক্ষেত্রে। আভিধানিক অর্থে 'নুরজাহান' শব্দের অর্থ 'জগতের আলো'। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর তার রূপে মুগ্ধ হয়ে এই নামকরণ করেন।

'নুরজাহান' নাটকটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়ে রচিত হয়েছে। স্বভাবতই নাট্যকার ইতিহাসকে বা ইতিহাসের সাংস্কৃতিক পটভূমিকে নাটকে ব্যবহার করেছেন—

(ক) মোগলযুগের প্রাদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় শাসনের দ্বন্দ্বময় সম্পর্কের ইঙ্গিতময়তা।

(খ) নুরজাহানের মতো মানসিকভাবে অস্থির চরিত্রের (অর্থাৎ Phychopathic personality) স্বরূপ উন্মোচনের সহায়ক মোগল পরিবেশ চিত্রণে।

(গ) ক্ষীণভাবে হলেও মোগল যুগে সম্রাটের অধীন ও সম্রাটচালিত শাসনব্যবস্থার সামাজিক গঠনের ইঙ্গিতদানে।

সুতরাং বলা যায় মোগল ইতিহাসের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটের কাহিনী সূত্রেই দ্বিজেন্দ্রলালের 'নুরজাহান' নাটকটি রচিত। ইতিহাস অবলম্বনে হলেও স্বাদেশিকতার সমকালীনতামুক্ত এই নাটকে বেশ কিছু অনৈতিহাসিক পটভূমিও রয়েছে। যেমন :

(১) উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে নুরজাহান জাহাঙ্গীরের পুত্রদের হত্যা করিয়েছেন।

(২) পুত্রশোকেই নুরজাহানের শুভাকাঙ্ক্ষিণী খসরু-জননীর মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, খসরুর মৃত্যুর অনেক আগেই তার জননীর মৃত্যু হয়েছিল।

(৩) সেলিমের সঙ্গে মেহেরউন্নিসার পূর্ব প্রণয়।

(৪) শের খাঁর সান্নিধ্যে স্নিগ্ধ দাম্পত্য জীবন।

(৫) স্বামীর মৃত্যুর পর আগ্রায় আগমন এবং দীর্ঘকাল পরে সম্রাটের পত্নীত্ব অর্জন।

১.২.৭.৪ : নাটকের গঠনশৈলী

'নুরজাহান' নাটকটি ভালো করে পড়লে দেখা যায় এর প্লট বা কাহিনী শুরু থেকে শেষপর্যন্ত সুবিন্যস্তভাবে বিবৃত হয়েছে। আর সেক্ষেত্রে নাট্যকার বিশেষভাবে প্রশংসার দাবিদার। ইতিহাসের সঙ্গে সুসামঞ্জস্য রেখে মূলত এই নাটকের কাহিনী অগ্রসর হয়েছে। বস্তুত 'নুরজাহান'—এর কাহিনী শুধু সুনির্মিত

নয় আদি ও অন্তের মধ্যে এক ঐক্যবোধের দ্বারা যুক্তও বটে। মোগল ভারতের কাহিনী নিয়ে লেখা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লিখিত 'নুরজাহান' নাটকটি পাঁচ অঙ্কের। প্রথম অঙ্ক (৯টি দৃশ্য) বাদ দিয়ে বাকি প্রতিটি অঙ্কই আটটি দৃশ্যে সমাপ্ত। প্রথম অঙ্ক এবং দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চমদৃশ্য পর্যন্ত নুরজাহান মেহেরউন্নিসা, অর্থাৎ ভিত্তিস্বরূপ হলেও প্রথম অঙ্কটি দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। অবশ্য 'নুরজাহান' নামকরণে প্রথম অঙ্কটি নাটকের সাথে যুক্ত হয়েছে।

নাটকের প্রথম অঙ্কের গুরুত্ব নাটকে খুবই জরুরি। কারণ প্রথম অঙ্কই হল 'Key note of Play'। দ্বিজেন্দ্রলাল সেইভাবে তাঁর প্রথম অঙ্ক গড়ে তুলেছেন। সেলিমের দিল্লিশ্বর হওয়ার সংবাদ শুনে মেহেরউন্নিসার দীর্ঘশ্বাস ফেলার মধ্য দিয়ে তা প্রমাণিত হয়। কিন্তু নাটকীয়তার প্রকৃত সূত্রপাত হয় দ্বিতীয় অঙ্কে। প্রথম অঙ্কে শের খাঁর ও সম্রাটের অসম দ্বন্দ্বের ফলে সেইভাবে নাট্যদ্বন্দ্ব দানা বাঁধেনি। তবে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে 'নুরজাহান'-এর বিবাহ সম্মতি ব্যাপকতর দ্বন্দ্বেরই পরিচায়ক। দ্বিতীয় অঙ্কে দ্বন্দ্বের সূচনামাত্র লক্ষ করা যায়। পঞ্চাঙ্ক নাটকে সাধারণত তৃতীয় অঙ্কে কাহিনী চরমোৎকর্ষতা লাভ করে। স্পষ্ট না হলেও এখানে পাঠক তথা দর্শক দ্বন্দ্বকে উপলব্ধি করতে পারেন। এ নাটকে সংঘাতের একপক্ষে নুরজাহানের অবস্থান। তার প্রাচীন প্রতিপক্ষকে পাওয়া যায় অষ্টমদৃশ্যে। তিনি মোগল সেনাপতি মহাবৎ খাঁ — যিনি সম্রাটের শাসন মানলেও নুরজাহানের শাসন মানতে নারাজ। স্বাভাবিক কারণেই তিনি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন।

চতুর্থ অঙ্কে নুরজাহানের মানসিক টানাপোড়েন ব্যাপকতা লাভ করে। এখানে তিনি নিজেকে সাবধান করতে চাইলেও ক্ষমতার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় তা করতে পারছেন না। এই দ্বন্দ্ব তার ক্ষমতার রথ চালানোর পথে হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই নুরজাহান নিজেকেই বলেছে—"এ বিশাল সংসারে আজ আমি একা। আর কাকে ভয়? কিসের জন্য ভয়? দাও, ঘোড়া ছুটিয়ে দাও, নুরজাহান। পড়ো পড়বে। হয় জয়, না হয় মৃত্যু। আর আমারও সাধ্য নাই যে আমাকে ফিরাই।" (৪/২)

এই অঙ্কেরই পঞ্চম দৃশ্যে মহাবৎ খাঁর সাথে যোগ দিয়েছে সাজাহান, রাণা কর্ণসিংহ। আর বন্দী হয়ে পড়েন জাহাঙ্গীর ও নুরজাহান।

পঞ্চম অঙ্কে গ্রন্থিমোচন। মহাবৎ নুরজাহানের প্রাণ ফিরিয়ে দিলেও নুরজাহান মহাবতের হত্যার চেষ্টা পরিত্যাগ করেননি। শেষদৃশ্যে অপরাধের শাস্তি বিধান। চারিত্রিক ত্রুটির কারণেই নুরজাহান উন্মাদিনী হয়ে উঠেছে। তাই করুণস্বরে উন্মাদিনী নুরজাহান তার কন্যাকে শেষপর্যন্ত বলে—"মেহেরউন্নিসাকে চিনতিস? — সে ছিল তোর মা। আর এই নুরজাহান ছিল তোর সৎমা। আর আমি? - আমি তোর কে? আমি তোর কেউনা। আর তোর কেউনা। কেউনা। ও-হো-হো-হো- ।" (৫/৮)

অর্থাৎ নাট্যকার নাটকটির গঠন বা প্লটের ক্ষেত্রে ফ্রেতাগের সূত্রটিকেই মূলত মাথায় রেখেছেন।

ক. উন্মোচন

খ. যেখান থেকে নাটকীয় গতিবেগ শুরু হয় সেই ঘটনা।

গ. চরমোন্নতির জন্য ঘটনার অগ্রগতি

ঘ. পরিবর্তিত বিন্দু

ঙ. নাটকের পরিসমাপ্তি

সেদিক থেকে শেক্সপীয়রের 'কিং লিয়র'—নাটকের সঙ্গে এর মিলও খুঁজে পাওয়া যায়।

নুরজাহানের কাহিনী শুধু সুনির্মিত নয়, আদি ও অন্তের মধ্যে এক ঐক্যবোধের দ্বারা যুক্তও বটে। এই নাটকের নানা ঘটনা ও চরিত্র শেষপর্যন্ত নুরজাহানের উচ্চাকাঙ্ক্ষা — প্রমত্ততা ও তার পরিণামকেই তুলে ধরেছে। ফলে এই কাহিনীতে এমন একটি চরিত্র বা ঘটনা নেই যা মূল কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কহীন। এই উপকাহিনীগুলি রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল—

নুরজাহান

নুরজাহান | জাহাঙ্গীর

মূলকাহিনী

উপকাহিনী

শের খাঁ | লায়লা | খসরু | রেবা | সাজাহান | মহাবৎ খাঁ

আবার এই উপকাহিনীগুলিকে কেন্দ্র করে এক-একটি শাখা কাহিনী গড়ে উঠেছে। যেমন—

ক. শের খাঁর উপকাহিনী

শের খাঁ | জাহাঙ্গীর | লায়লা | মেহেরউন্নিসা

খ. লায়লার উপকাহিনী

লায়লা | নুরজাহান (মেহেরউন্নিসা) | জাহাঙ্গীর | শারিয়ার

গ. খসরুর উপকাহিনী

খসরু | জাহাঙ্গীর | শারিয়ার

ঘ. রেবার উপকাহিনী

রেবা | জাহাঙ্গীর | নুরজাহান

ঙ. সাজাহানের উপকাহিনী

সাজাহান | নুরজাহান | জাহাঙ্গীর | খাদিজা

চ. মহাবৎ খাঁর উপকাহিনী

মহাবৎ | জাহাঙ্গীর | কর্ণাসিং | নুরজাহান

উপরের রেখাচিত্রগুলি থেকে আমরা স্পষ্টতই বুঝতে পারি যে, প্রত্যেকটি কাহিনী, উপকাহিনী, শাখা কাহিনীর সঙ্গেই নুরজাহানের প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। অর্থাৎ আমরা বলতেই পারি যে, সমগ্র নাটকটি শুধু নামকরণের দিক থেকেই নয় প্রকৃত অর্থেই নুরজাহানময়। নাটকের জটিল ঘটনামূহের মালায় গাঁথা প্লটটি জটিলতর হয়ে উঠেছে নুরজাহানের কামনা-বাসনা-স্বপ্নসাধ ও প্রতিহিংসার অনেকান্ত ট্র্যাজিক অনুভবে।

নাটকের প্রত্যেক অঙ্কের অষ্টম দৃশ্যই হয়ে উঠেছে 'টার্নিং পয়েন্ট'। প্রথম অঙ্কের অষ্টম দৃশ্যেই শের খাঁ বুঝতে পারেন মেহেরের তার প্রতি ভালোবাসা শুধুমাত্র মোহ। এমন শূন্যতাবোধের মতই আছে, সংঘাত সৃষ্টির ইঙ্গিত, নূতনতর সংঘাতের শুরু। এমনকি নুরজাহানের মৃত্যুদণ্ড-রহিতের মতো ঘটনাও রয়েছে, চতুর্থ অঙ্কের অষ্টম দৃশ্যে। আবার নাটকের শেষ অঙ্কের অষ্টম দৃশ্যেও উন্মাদিনী নুরজাহান ও অন্ধ স্বামীর পরিবারকে দুহাত ধরে লায়লার শোভন সুন্দর জীবনের শপথ গ্রহণ নাটকীয় তাৎপর্যপূর্ণ এবং পরিবেশ সৃষ্টিতে গৌরবদীপ্ত। তবে নাট্যকার স্থানগত, কালগত ও কার্যগত এই ত্রিবিধ ঐক্য বজায় রাখতে পারেননি।

১.২.৭.৫ : ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে 'নুরজাহান' নাটকের সার্থকতা

স্বাভাবিক অতীতচারিতা নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বর্তমান দৃশ্যমান জগৎ থেকে তিনি পুনঃপুনঃ অতীতের বিস্তৃত নেপথ্যে মানস ভ্রমণ করেছেন। এখানে তাঁর জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম, দেশানুরাগ, স্বাজাত্যবোধ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রভৃতি লক্ষ করা যায়। আলোচ্য 'নুরজাহান' (১৯০৮) নাটকটিতে অতীতের মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়কাল প্রতিবিম্বিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্ণচরিত্র' নামক প্রবন্ধে বলেছেন যে—"ইতিহাসে অনেক সময় শুষ্ক ইন্ধনের ন্যায় রাশীকৃত তথ্য পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কবির কাব্যে সত্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।" অর্থাৎ একজন ঐতিহাসিক নাট্যকারের মূল লক্ষ থাকে যুগের অভিপ্রায়, প্রবহমানধারা ও মানব চরিত্রকে পরিস্ফুট করে ঐতিহাসিক রস সৃষ্টি করা।

ঐতিহাসিক নাটকের দুটি দিক — এক, ইতিহাস ও ঐতিহাসিক তথ্য, উপাদান, ব্যক্তিত্ব এবং সর্বোপরি বর্ণিতব্য যুগের একটি যথাযথ ও অবিকৃত ভাবপরিমণ্ডল নির্মাণ। দুই, যেহেতু নাটক একটি যৌথ শিল্পকর্ম, ইতিহাসের নিরস উপকরণ ও চরিত্রাদি কল্পনার রসে এমনভাবে জারিত হয় যাতে নাটকের চিরকালীন আশা, আকাঙ্ক্ষা, বিপন্নতা, আর্তি পরিস্ফুট হয়। ইতিহাস ও কল্পনার সমন্বয় এমনভাবে হওয়া চাই যাতে কল্পিত চরিত্র ও কাহিনী ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও যুগপরিবেশকে ক্ষুণ্ণ করতে না পারে। নাট্যকারের কাছে ইতিহাস বড়ো নয়, ঐতিহাসিক রস সৃষ্টি করাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য।

পূর্বে আলোচিত ইতিহাসের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য এবং বর্তমানে ঐতিহাসিকতার প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে আমরা 'নুরজাহান' নাটকের ঐতিহাসিকতা যাচাই করব। নাট্যকার নাটকটির উপাদানগুলিকে অত্যন্ত সতর্ক ভাবে ব্যবহার করেছেন। ইতিহাসের সমস্ত উপাদানকে নাটক লেখার কাজে ব্যবহার করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, সম্ভবও ছিল না। নাট্যকার ভূমিকাতেই বলেছেন—"মৎ প্রণীত অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটক হইতে নুরজাহান নাটকের অনেক বিষয়ে প্রভেদ লক্ষিত হইবে। প্রথম প্রভেদ এই যে, আমি নাটকে দেবচরিত্র সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করি নাই। আমি এই নাটকে দোষগুণ সমন্বিত মনুষ্য চরিত্র অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।.....দ্বিতীয় প্রভেদ এই যে নাটকে বাহিরের যুদ্ধ অপেক্ষা ভিতরের যুদ্ধ দেখাইতে আমি আপনাকে সমধিক ব্যাপৃত রাখিয়াছি।....তৃতীয় প্রভেদ এই যে আমি এই নাটকে দ্বিতীয় ব্যক্তির সমক্ষে কাহারও স্বগতোক্তি একেবারে বর্জন করিয়াছি।" (দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখিত প্রথম সংস্করণের ভূমিকা)।

তাই নাটকটি পড়লে দেখা যায় নাট্যকার অনেক স্থানেই তাঁর স্বাধীন কল্পনার আশ্রয় নিলেও ইতিহাস নিষ্ঠার কোনো অভাব রাখেননি। 'নুরজাহান' নাটকটি পাঁচটি অঙ্কে বিধৃত। প্রায় প্রতিটি অঙ্কেরই বিষয়বস্তু বা কাহিনী ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। প্রথম অঙ্কের ঘটনা ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ জাহাঙ্গীরের সিংহাসন আরোহণের সময় থেকে ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে শের খাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সময়কাল। প্রথম অঙ্কটি ন-টি দৃশ্যে বর্ণিত। নুরজাহান ও শের খাঁর দাম্পত্য জীবন, নুরজাহান সেলিমের প্রাক্-বিবাহ সম্পর্ক এই অঙ্কের প্রেক্ষাপট রচনা করেছে। নাটকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জানা যায় যে জাহাঙ্গীরের নুরজাহানের প্রতি দুর্বলতা, শের খাঁকে মেরে বিধবা নুরজাহানকে লাভ করার বাসনা এবং নুরজাহানের আত্মিক দ্বন্দ্ব প্রথম অঙ্কেই ধীরে ধীরে ঘটেছে। নাট্যকার এখান থেকেই নাটক রচনার উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

এই অঙ্কে শের খাঁকে পরাস্ত করতে জাহাঙ্গীর যে বঙ্গদেশের সুবাদার কুতবউদ্দিন খাঁকে নির্দেশ দেন এবং আক্রমণে শের খাঁর মৃত্যু ঐতিহাসিক ঘটনা। আবার আকবরের সমাধির পাশে রাত্রিকালে খসরু ও তার সহচরদের ষড়যন্ত্রের এই দৃশ্য ঐতিহাসিক ঘটনার ভিত্তিতে রচিত। তবে নাট্যকার ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে নিজের মত করে সাজিয়ে নিয়েছেন নাটকের প্রয়োজনে।

দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনাকাল ১৬০৮-১৬১১ খ্রিস্টাব্দ। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে নুরজাহানের বিবাহ হয়। দ্বিতীয় অঙ্কে নাট্যক্রিয়া উর্ধ্বগতি লাভ করেছে। নুরজাহান তার শয়তানী প্রবৃত্তিকে দমন করার আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। নুরজাহান তাই স্বগতোক্তিতে বলেন—"ঈশ্বর জানেন তোমায় ভালোবাসার জন্য নিজের সঙ্গে কি যুদ্ধ করেছি, তবু পাল্লাম না। তাই তুমি অসীম বৈরাগ্য মৃত্যুকে সেধে ডেকে নিলে। আমার উচ্চাশাই তোমার সর্বনাশ করেছে, আমারও সর্বনাশ করেছে।—না তবু যুদ্ধ কর্ব্ব। এ শয়তানীকে দমন কর্ব্ব।" (২/৩)

প্রথম অঙ্কে সংঘাতের যে বীজ দেখা গিয়েছিল দ্বিতীয় অঙ্কে নুরজাহান সম্রাজ্ঞী হবার পর তা ক্রমশ অঙ্কুরিত হয় এবং বিষবৃক্ষের রূপ ধরে, এই অঙ্কে জাহাঙ্গীরের দরবারে খসরুর বিচার সম্পূর্ণতই ঐতিহাসিক ঘটনা।

তৃতীয় অঙ্কের ঘটনাকাল ১৬২০-১৬২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই অঙ্কের নাট্য ঘটনা চরম ক্লাইম্যাক্সে ওঠে। এই অঙ্কের শুরুতেই জাহাঙ্গীরের নির্দেশে সাজাহান বিদ্রোহ দমনে যাত্রা করে। নুরজাহানের পরামর্শে খসরুকে সঙ্গে নিয়ে যায়। সাজাহান খসরুকে হত্যা করেছিল কিনা তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। আর এই মতভেদেই নাট্যকার তা কাজে লাগিয়েছেন। বন্দররাজের খসরু হত্যা, সাজাহানের ওপর দায়ভাগ, নুরজাহানের দরবারে সাজাহানের বিচার, সাজাহানের ব্যর্থ বিদ্রোহ, সৈন্যাধ্যক্ষ মহাবৎ খাঁর বিদ্রোহ ইতিহাস সমর্থিত।

চতুর্থ অঙ্কে নাট্যক্রিয়া পতনমুখী হয়েছে। এ অঙ্কের ঘটনাকাল ১৬২০-১৬২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এখানে নুরজাহানের পতনকে ত্বরান্বিত করেছে প্রধানত মহাবৎ খাঁ এবং তার সাথে যোগ দিয়েছে তার অপর শত্রু সাজাহান। নাট্যকার এই অঙ্কে নুরজাহানের সঙ্গে মহাবৎ খাঁর সংঘর্ষের ঐতিহাসিক কারণ তথা সূত্রগুলিকে নিপুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

পঞ্চম অঙ্কের সময়কাল ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দ। নুরজাহান এখানে মহাবতের বন্দী দশা থেকে মুক্তির নানা কৌশল অবলম্বন করেছে। জাহাঙ্গীরের হাতে তার রাজত্ব প্রত্যার্পণের ঘটনা, শারিয়ারকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করার জন্য নুরজাহানের চেষ্টা, জাহাঙ্গীরকে মৃত্যুর পর সম্রাটরূপে সাজাহানের সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচন ও নুরজাহানের জন্য পেনশন মঞ্জুর, পারভেজের মৃত্যু ও শারিয়ারের অন্ধত্ব ইতিহাসসম্মত ঘটনা। এই সব ঘটনার প্রেক্ষাপটে নুরজাহানের পতনকে অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমদিকে ভাই

আসফ নুরজাহানের সহযোগী থাকলেও পরে যে সে মহাবৎ খাঁর দলভুক্ত হয় তা ঐতিহাসিক সত্য। মহাবৎ খাঁর শাসন ইতিহাসে তাই ১০০ দিনের শাসন নামে পরিচিত।

চরিত্রের ক্ষেত্রে বলা যায় 'নুরজাহান' নাটকে নারী-পুরুষ মিলে ১৪টি চরিত্র থাকলেও নাট্যকারের সব থেকে বেশি দৃষ্টি কেন্দ্রীয় চরিত্র নুরজাহানের দিকে। তার কুমারী জীবন, বিবাহিত জীবন, জননী জীবন এবং স্বামী হত্যার পরে দীর্ঘ অন্তর্দ্বন্দ্বময় বৈধব্য জীবন ও পরে জাহাঙ্গীরকে বিবাহের পর ভারত সম্রাজ্ঞীর জীবন ও সম্রাটের মৃত্যুর পর তার জীবন পরিণাম অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নাট্যকার অঙ্কন করেছেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক নুরজাহানের প্রতি সেলিমের ও সেলিমের প্রতি নুরজাহানের আকর্ষণের কথা স্বীকার করেছেন। শের খাঁ ও মেহেরের দাম্পত্য জীবনের কথা ইতিহাসে বিস্তৃতভাবে নেই। নাটকে এদের জীবনচিত্র নাট্যকারের কল্পিত। নাট্যকার ইতিহাসের নুরজাহানের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কল্পনাকে যুক্ত করে তার একটি পূর্ণরূপ গড়ে তুলেছেন। শুধু নুরজাহানই নয় মহাবৎ খাঁ, জাহাঙ্গীর, জাহাঙ্গীরের পুত্র সকল, শের খাঁ, লায়লা প্রভৃতি চরিত্রগুলির চিত্রণে নাট্যকার ইতিহাসের অমর্যাদা করেননি।

মোগল যুগের সুন্দর একটি প্রতিবেশ সৃষ্টি করেছেন নাট্যকার। যুগের মর্জি ও সুরকে ফুটিয়ে তুলেছেন। ১৬০৫-১৬২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী মোগল যুগের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা কালগত বিচারে ইতিহাস সম্মত। নাটকটি বিশ্লেষণ করলে আরো দেখা যায় যে, একদিকে মুসলিম সাম্রাজ্যের মেয়েদের উদ্দামতা, পাশাপাশি সুন্দরী রমণীদের প্রতি বাদশাহের দুর্বলতা সেই সময়ের চিত্রকে আভাসিত করেছে। তেমনি ঝিলামতীর, কাবুল, বারুণীদুর্গ, মেবার, সুবে, বাংলা, আগ্রা, বর্ধমান, উড়িষ্যা প্রভৃতি মোগল আমলের শাসিত স্থানগুলি এই নাটকে পাওয়া যায়। আবার এই নাটকের মোগল সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ তথা মেবার বিজয়ের সন্ধি কিংবা তৎকালীন জায়গীরদার প্রথা, সুবাদার প্রথা, সমকালীন যুগ পরিবেশকে চিহ্নিত করে।

ঐতিহাসিক নাটকের প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে যেমন অসাধারণত্ব থাকে নুরজাহানের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, চতুরতা, ক্ষমতা করায়ত্ব করার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা এবং এই আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপায়ণে তার ক্ষিপ্ততা ও দৃঢ় মনোভাব তার চরিত্রের এমন গুণ যা তাকে নায়কোচিত দীপ্তিদান করেছে অর্থাৎ নুরজাহানের চরিত্রে অসাধারণত্ব রক্ষিত হয়েছে। ঐতিহাসিক নাটকের শর্তানুযায়ী 'নুরজাহান' নাটকে আভিজাত্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে—"রেবা।। দেখ খসরু, আমি তোমার মা, মায়ের চেয়ে ভাববার জন্য সংসারে আর কেউ নেই। তার দেহ, স্নেহ, মন, তার প্রবৃত্তি, তার ইহ জীবন, সন্তানের লালনের জন্যই গঠিত। আমি তোমার সেই মা।... একাজ কদাপি কোরোনা। বলো কর্ব্বে না?"

'ঐতিহাসিক' শব্দটি নাটকের বিশেষণ। কেননা সর্বপ্রথম রচনাটিকে নাটক পদবাচ্য হয়ে উঠতে হবে। কোনো পাঠকই ইতিহাস জানার জন্য ঐতিহাসিক নাটক পড়ে না। তবে নাট্যকারকে ইতিহাসের কথা মাথায় রেখেই নাটক রচনায় অগ্রসর হতে হয়। তাই ইতিহাসকে অনুসরণ করে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই ঐতিহাসিক নাটকটি রচনা করেছেন। কিন্তু নুরজাহানের ঐতিহাসিক বিবরণদান তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, বরং তার লক্ষ ছিল রসসৃষ্টি। এদিক থেকে নুরজাহান নাটকে নাট্যকারের কয়েকটি সাফল্য হল—

ক. নাট্যকার ইতিহাসকে নাটকের প্রেক্ষাপট ও আবহসৃষ্টির কাজে লাগিয়েছেন।

খ. ঐতিহাসিক চরিত্রের কঙ্কালে তিনি রক্ত-মাংসের মানুষের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন।

গ. তিনি ইতিহাসের অন্ধকারকে কল্পনার আলোয় উজ্জ্বল করে ভরিয়ে তুলেছেন।

ঘ. ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবন রূপায়ণে দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাস ও কল্পনার শিল্পসম্মত সংমিশ্রণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন।

৬. দ্বিজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক চরিত্র রূপায়ণের পাশাপাশি এমন কিছু চরিত্র সৃষ্টি করেছেন যারা পুরোপুরি ঐতিহাসিক চরিত্র নয়, কিন্তু ইতিহাসের সম্ভাবনাজাত এবং এই ধরনের (যেমন-বন্দররাজ) চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছেন।

এইজন্যই 'নুরজাহান' নাটকটি ইতিহাসেরই স্মরণ-বিস্মরণে গড়া এক আশ্চর্য শিল্প সৃষ্টি—একটি সার্থক ঐতিহাসিক নাটক।

১.২.৭.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'নুরজাহান' নাটকের নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

২। 'নুরজাহান' নাটকটি ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে সফল—আলোচনা করো।

৩। 'নুরজাহান' নাটকের গঠনকৌশল আলোচনা করো।

——————

একক - ৮

'নুরজাহান' নাটকে ব্যবহৃত সঙ্গীতের তাৎপর্য

বিন্যাসক্রম :

১.২.৮.১ : 'নুরজাহান' নাটকে ব্যবহৃত সংগীতের তাৎপর্য

১.২.৮.২ : 'নুরজাহান' নাটকের সংলাপ বিচার

১.২.৮.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.২.৮.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১.২.৮.১ : 'নুরজাহান' নাটকে ব্যবহৃত সংগীতের তাৎপর্য

সংগীত ও সংগীত সম্বলিত নৃত্য থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন নাটকের উদ্ভব হয়েছিল। গ্রীক-'tragoedia' র অর্থই হল ছাগসংগীত। আবার গ্রীক কমেডির উৎপত্তি হয়েছিল লিঙ্গ সঙ্গীত অথবা Phalic Song থেকে। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় নাট্যরীতির সঙ্গে দেশীয় যাত্রার মিশ্রণেই বাংলা নাটকের জন্ম হয়। আবার যাত্রার প্রাণই হল গান। লোকে আগে যাত্রা দেখত না, যাত্রা শুনতো। স্বাভাবিক কারণেই সেখানে গানের প্রাধান্য দেখা দেয়। আর বাংলার প্রথম দৃশ্য-কাব্যের যে পরিচয় পাওয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে — যেখানে গীতেরই সমাহার। এরপর যখন বাংলা নাটকের মৌলিকতা লক্ষ করা যায়, তখন নাটকগুলি গীতাভিনয়ের মাধ্যমে হত এবং যেগুলি গীতাভিনয় নামেই পরিচিত ছিল। বাংলার জলবায়ু গানের অনুকূলে, এখানকার প্রকৃতিতে, আকাশে - বাতাসে গানের রেশ শোনা যায়। বলাবাহুল্য গান বাঙালীর সত্তা ও রক্তে প্রবাহিত।

শব্দ যেখানে এসে শেষ হয়, সুরের সেখানে আরম্ভ হয়। সঙ্গত কারণে নাটক তথা বাংলা নাটকে সংযোজিত গান অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে যে কোনো নাটকের গানের ব্যবহারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি প্রাথমিক কথা বলা যায় —

"Music can serve many functions. It can establish the label of probability, it can characterise, it can convey ideas, it can condense by speeding up characterization and exposition, it can lend variety and it can be pleasurable in itself."

[The Essential Theatre, Oscar o, Brockett Holt, Rineheart and winston, 1976, Page - 22]

এই বক্তব্যের সূত্র ধরে বলা যায় গান মানুষের আবেগকে কথার তুলনায় আরও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে। অর্থাৎ কথায় আমরা যার নাগাল পাই না, সুরই ছুঁয়ে দিতে পারে তার চরণ। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন —

"কথা জিনিসটা মানুষেরই, আর গানটা প্রকৃতির। কথা সুস্পষ্ট এবং বিশেষ প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, আর গান অস্পষ্ট এবং সীমাহীনের ব্যাকুলতায় উৎকণ্ঠিত। সেইজন্য কথায় মানুষ মনুষ্যলোকের এবং গানে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মেলে। এই জন্যে কথার সঙ্গে যখন মানুষ সুরকে জুড়ে দেয়, তখন সেই কথা আপনার অর্থকে আপনি ছাড়িয়ে গিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যায়।" (শ্রাবণ সন্ধ্যা)

গানের এই প্রাসঙ্গিকতাকে স্মরণে রেখে আমরা 'নুরজাহান' নাটকের গান ব্যবহারের অপরিহার্যতা দেখতে পারি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন একজন বিশিষ্ট সুরকার। প্রথম জীবনের পারিবারিক ঐতিহ্য, শিক্ষা ও অনুরাগ তাঁর নাটকের সংগীত রচনার ক্ষেত্রে প্রেরণার সঞ্চার করেছে। বস্তুত, তাঁর নাটকগুলিতে সংগীত ব্যবহার প্রায়শই লক্ষিত হয়। নাট্যকার স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগেই তাঁর বেশিরভাগ ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই তার ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে স্বদেশী গানের ও সুরের মূর্ছনা আমাদেরকে মুগ্ধ করে। যেমন — 'মেবার পতন' (১৯০৮) নাটকের 'কিসের শোক করিস ভাই'; 'সাজাহান' (১৯০৯) নাটকে 'ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' অথবা 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' প্রভৃতি গানগুলি দেশাত্মবোধক সংগীতেরই সাক্ষী বহন করে। কিন্তু 'নুরজাহান' নাটকের ক্ষেত্রে নাট্যকার এরূপ কোনো উদ্দেশ্য প্রকাশ করেননি। এখানে তিনি মূলত চরিত্র ও নাটকের পরিবেশ অনুযায়ী সংগীতের ব্যবহার করেছেন। যেগুলির মধ্যে হাস্যরসাত্মক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেলেও, বাহ্যিক মূল্যকে একদমই অস্বীকার করা যায় না। সবমিলিয়ে নাটকে নয়টি গান ব্যবহৃত হয়েছে। সেগুলির প্রথম চরণ, কোনো অঙ্কের কোনো দৃশ্যে এবং কাদের মুখে গীত হয়েছে তা ছকের মাধ্যমে উল্লেখ করা হল।

	গানের প্রথমচরণ	অঙ্ক ও দৃশ্য	কে গেয়েছে
১.	অতুল চির বিমোহন তুমি সুন্দর সুরাধাম	১ম/১ম	লালয়া ও খাদিজা
২.	কেন ঝরে বারিধারা ঘনশ্যাম বরিষায়	১/৬	লায়লা
৩.	আজি, নূতন রতনে, ভূষণে যতনে	২/৭	নর্তকীরা
৪.	কেন এত সুন্দর শশধর?	৩/১	খাদিজা
৫.	কি শেল বিঁধে আমার হৃদে	৩/৬	লায়লা
৬.	আমি যদি পীঠে তোর ঐ/লাথি একটা মারিই রাগে	৪/১	সভাসদ
৭.	গম্ভীর গরজন বাজে মৃদঙ্গে	৪/২	নর্তকীরা
৮.	আমরা এমনই এসে ভেসে যাই	৪/২	ঐ
৯.	নিতান্ত আমারই, তবু যেন সে আমার নয়	৫/৫	খাদিজা

নাটকের শুরুতেই লায়লা ও খাদিজার কণ্ঠে গাওয়া দ্বৈত সংগীতটি শুরুতেই আমাদের সামনে নাটকের অন্তর্বিরোধ সূচিত করে দেয়। এই গানে তৃপ্তির মধ্যে অতৃপ্তির এবং সৌন্দর্যের উর্বরতার মধ্যে তার ধ্বংসের কারণ নিহিত থাকার যে কথা আছে তা শের খাঁ ও মেহেরউন্নিসার কথাবার্তাতেও প্রকাশিত। গানটি সমগ্র নাটকের ভূমিকাকে ব্যক্ত করায় এই নাটকের থিম সং (Theme Song) হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি গানটি সমকালীন বন্দদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অনুপম চিত্র। লায়লার একক কণ্ঠে গীত অপর দুটি গানও নাটকে নাট্যকার সঠিকভাবে সংযোজন করেছেন। 'কেন ঝরে বারিধারা ঘনশ্যাম বরিষায়'—গানটি নুরজাহানের দ্বন্দ্বদীর্ণ অন্তরের দ্বার উন্মুক্ত করার মূর্ত প্রকাশ। নুরজাহানের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সেই সত্যই প্রমাণ করে। গানটির শেষ দুটি ছত্রে নাট্যকার অদ্ভুত নাট্য সফলতা সৃষ্টি করেছেন।—

"তবু যদি হাসে ধারা মুখের সে হাসি হায়

অন্তরে দারুণ জ্বালা জ্বলে যায় জ্বলে যায়।"

নিজের মেয়ের কণ্ঠে নুরজাহান এই গান শুনে জ্বলে পুড়ে তীব্র অভিমানে জানায়—

"খবরদার আর এ গান আমার কাছে কখনো গেও না বুঝলে বালিকা?"

নুরজাহানের এই গান শুনে ক্রোধের বহিঃপ্রকাশই গানটিকে নাটকে সার্থক করে তুলেছে।

পিতৃহারা লায়লা, মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন লায়লার হৃদয়ের বেদনা ও একাকিত্ব প্রকাশ পেয়েছে—

"কি শেল বিঁধে আমার হৃদে আমারই প্রাণ জানে গো।"

গানটি সেইসঙ্গে লায়লার জীবনের ট্র্যাজেডিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। নাট্যকার নাটকের গোড়া থেকেই লায়লাকে দ্বন্দ্বদীর্ণ ট্র্যাজিক চরিত্র হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। পিতা শের খাঁর মৃত্যুর পর যার মাতা নুরজাহান জাহাঙ্গীরের অঙ্কশায়িনী, জাহাঙ্গীরের পুত্র শারিয়ারকে ভলোবেসেও তাকে গ্রহণ করতে না পেরে দুঃখ আর নৈরাশ্যের মধ্যে যার আশ্রয়—এমন ট্র্যাজিক চরিত্রের মুখে এই গানটি সার্থক রূপ পেয়েছে।

খাদিজার গাওয়া গান দুটির মধ্যে তার প্রেমার্তি আর মিলনের মধ্যেও অতৃপ্তির ভাবকেই প্রকাশ করেছে। 'নিতান্ত আমারই, তবু যেন সে আমার নয়'—গানটি সাজাহানের উদ্দেশ্যে তার প্রেমসঙ্গীত। গানটি বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেমবৈচিত্ত্যের রাধার কথা স্মরণ করায়,

"বুকের মাঝারে আছে, খুঁজিয়ে না পাই কাছে,

অন্তরে রয়েছে সদা, তবু কেন ভয়।"

প্রিয়তম সাজাহানকে কাছে পেয়েও হারাবার ভয়ে ভীতা খাদিজা যেন বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার মতোই বিরহ কাতরা। নর্তকীদের গাওয়া গানগুলির মধ্যে জাহাঙ্গীরের শোচনীয় ও বিপর্যস্ত জীবনই প্রকাশিত হয়েছে। 'সুরা, সৌন্দর্য, সঙ্গীত' — এর সাম্রাজ্যে পলায়নপর জাহাঙ্গীরের চরিত্রই নর্তকীদের গানে প্রকাশিত হয়। 'পিশাচী'-নুরজাহান চরিত্রেরও উন্মোচন ঘটাতেও গানগুলি সুপ্রযুক্ত। অর্থাৎ নর্তকীদের গাওয়া তিনটি গানও নাটকের কাহিনী ও চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আর সভাসদ দ্বারা গীত গানটি হাস্যরসাত্মক ও কৌতুক সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। তাই পলায়নপর রাজাকে দেখে দর্শকদের হাসি পায়, অনুকম্পা জাগে না। সবমিলিয়ে বলা যায় মোগল বাদশাহের বিলাসের চিরাচরিত উপকরণ, নর্তকীদের নৃত্য-গীত হিসেবে সার্থক। সেইসঙ্গে ট্র্যাজিক রসসৃষ্টি করতেও সহায়ক। নাটকের চরিত্র ও পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গীতগুলি সুসম্পর্ক যুক্তও বটে। তাই সংগীতগুলিকে আমাদের 'Contextual Song' বলতে কোনো বাধা থাকেনা।

১.২.৮.২ : 'নুরজাহান' নাটকের সংলাপবিচার

কাহিনী, চরিত্র, বাক্‌রীতি বা সংলাপ, ভাবনা, দৃশ্যই সঙ্গীত—এই ৬টি উপাদানের সমবায়ে গড়ে ওঠে নাটক—এমন অভিমত প্রকাশ করেছিলেন অ্যারিস্টটল তার আলোচনায়। নাটকের ষড়াঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, Diction (ডনিতি) এর মাধ্যমে চরিত্র বিকশিত হয়, নাটক সম্মুখগতিতে এগিয়ে যায়। নাটকে নাট্যকারকে সবকথা বলতে হয় — ঘটনার ও পাত্র-পাত্রীর সংলাপের মাধ্যমে, তাই নাটকে নাট্যকার নীরব, মুখর শুধু ঘটনা ও পাত্র-পাত্রী। নাটকীয় ঘটনা এমন যা 'Should, speak for themselves without verbal exposition' এবং নাট্যসংলাপকে এমন হতে হবে যার উদ্দেশ্যে অ্যারিস্টটল বলেন —

"The effects aimed in speech should be produced by
the speaker and as a result of the speech."

—এই দিকদিয়ে নাটকের সংলাপ অভিভাবকহীন, ফলে তার সমস্ত দায়িত্ব নিজেকেই বহন করতে হয়। দোষ, ত্রুটি সংশোধনের জন্য কেউ নেই। উপন্যাসিক তাঁর পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে সঙ্গেই চলেন। পাত্র-পাত্রী কথা দিয়ে যা বোঝাতে পারেন না ; তিনি তা বিশ্লেষণ করেন, আগের সঙ্গে পরের আনুপূর্বিক সম্পর্ক তুলে ধরেন এবং তা বুঝিয়ে দেন। কিন্তু নাট্যকার নেপথ্যে থাকেন বলে সব কিছুর তার তার সংলাপকেই বহন করতে হয়। তাই চরিত্রের প্রকাশন বা বিকাশন, অগ্রগতি-সৃষ্টি-সমস্ত দায়িত্ব সংলাপের।

সংলাপ শুধুমাত্র নাটকের বাহন নয়, তা নাটকের প্রাণ—"Action is to drama is body is to man, in its language, resides the drama soul."

—নাট্যকার জীবন সম্বন্ধে তার যাবতীয় অভিজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য নাটকের চরিত্র সৃষ্টি করেন এবং সেই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কিছু আচরণ ও সংলাপের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। নাটকের চরিত্রানুযায়ী নাট্যকার সংলাপ সৃষ্টি করেন।

নাটকীয় দ্বন্দ্ব এবং চরিত্রের উপর নির্ভর করে সংলাপ অগ্রসর হয় এবং ধীরে ধীরে দ্বন্দ্ব ও চরিত্রের সাফল্যের পেছনে তার শক্তি প্রয়োগ করে। এর ফলে নাট্যগতির সৃষ্টি হয় এবং নাট্যরস দর্শক মনে চরিত্রগুলির মূলরস পৌঁছে দিতে পারে। নাটকের সমস্ত গতিপ্রকৃতি সংলাপের উপরই নির্ভরশীল। চরিত্ররূপে সুষ্ঠু অভিব্যক্তির কারণে বাক্‌ভঙ্গির অবতারণা, মধ্যে শব্দ প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যের, চিত্রকল্পের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়েও নাট্যকারকে সচেতন হতে হয়। সংলাপই নাটকের মধ্যে আবেগ; দ্বন্দ্বের উত্থান পতন, উৎকণ্ঠা, প্রভৃতি সৃষ্টি করে নাটকটিকে গতি সঞ্চারী করে তোলে।

নাটকীয় সংলাপ হবে সংক্ষিপ্ত, আবেগদীপ্ত, চরিত্র প্রকাশক ও প্রাণময়, ঔচিত্য অনুযায়ী তা পাত্র-পাত্রীদের মুখে সংযোজিত হবে। আর ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে সাধারণত সংলাপ হবে আভিজাত্যপূর্ণ ও গাম্ভীর্য। তাদের সংলাপের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হবে তাদের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটক 'নুরজাহান' এর ক্ষেত্রে তা কতদূর রঞ্জিত হয়েছে আলোচনায় তা বিচার্য। 'নুরজাহান' ঐতিহাসিক নাটক এই নাটকে নানা ধরনের চরিত্রসৃষ্টি করেছেন নাট্যকার। প্রধান প্রধান চরিত্র ছাড়াও রয়েছে ইতিহাসের সম্ভাবনাজাত কিছু চরিত্র এবং বেশ কিছু কাল্পনিক চরিত্র, যারা নাটকের পরিবেশ রচনার উপযোগী। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে দ্বিজেন্দ্রলাল চরিত্রে উপযোগী ভাষা সৃষ্টিতে মনযোগী শিল্পী। সেইজন্য এক একটি চরিত্র তাঁর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করেছে, অন্তত চরিত্রানুযায়ী ভাষা তথা সংলাপ নির্মাণে লেখক অত্যন্ত যত্নবান।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় নাট্যকার ঐতিহাসিক রাজপুরুষের চরিত্রে যে সংলাপ ব্যবহার করেছেন তা সাধারণ মানুষের চরিত্রে ব্যবহৃত হয়নি। ফলে এই দুই শ্রেণীর চরিত্রের অবস্থানগত পার্থক্য এ নাটকে অত্যন্ত স্পষ্ট। জাহাঙ্গীর বা নুরজাহানের মতো চরিত্র যে ভাষায় কথা বলে পুরোবাসিরা বা সভাসদবর্গ সে ভাষায় কথা বলে না। আরো লক্ষণীয় সম্রাট জাহাঙ্গীরের চরিত্রে সম্রাটোচিত গাম্ভীর্য ও গুরুত্ব আনার জন্য নাট্যকার ঐ চরিত্রটির মুখে তৎসমশব্দ ব্যবহার করেছেন—

"বলবে না? কুলাঙ্গারঙ্গ তোমায় বলতে হবে। আমি

তোমায় বলব। আমি তোমায় যন্ত্রনার যন্ত্রে চড়াব।

আমি বেত্রাঘাতে তোমার পৃষ্ঠচর্ম লোলখন্ডিত করব।"

এই নাটকে ঐতিহাসিক চরিত্রের মুখে আবেগ প্রধান সংলাপের পাশাপাশি কাব্যধর্মী সংলাপের অবস্থান লক্ষ করা যায়। 'নুরজাহান' এর সংলাপে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে—

"কি সুন্দর এই বঙ্গদেশ। এ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে যার

উপরদিয়ে শ্যামলতার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে.....

সমস্ত দেশটা যেন একটা অপার্থিব সুখস্বপ্ন দেখছে।" (১/১)

—ভাবকোমলের আবেগের প্রকাশে সূক্ষ্মতা যেমন আছে তার সঙ্গে সিক্ততাও রয়েছে এই সংলাপে।

উপমা সৃষ্টিতে তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, উপমাদানের ক্ষেত্রে তার উপমানের চয়ন প্রচলিত ধারা থেকে ভিন্ন। তার উপমাদানের একটি উদাহরণ রেবার সংলাপে পাওয়া যায়—"যে কর্ত্তব্য সাধন কর্তে যদি না পার নাথ, তাহলে এ সাম্রাজ্য একখানি মেঘের প্রাসাদের মত বিলিন হয়ে যাবে।" (৩/২)

চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশের জন্য তিনি স্বগতোক্তি ব্যবহার করেছেন। এই স্বগতোক্তির মধ্যে দিয়ে আমরা চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্পর্কে একটি ধারণা পাই। নুরজাহান বলেছে—

"সেলিম সম্রাট্য আবার সেকথা কেন মনে আসে? - না

সে চিন্তাকে আমি মনে আসতে দিবনা।"

ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এই স্বগতোক্তিগুলি লক্ষ করবার মতো, এগুলির মধ্যে কাব্যিক সুষমা ফুটেছে, একাধিক অলংকার সমৃদ্ধ ভাষার প্রয়োগে।

সাধারণ মানুষের সংলাপ রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল প্রাত্যহিক জীবনের সরল ভাষাকে গ্রহণ করতে চেয়েছেন অথচ ভাব যেখানে গভীর ও সমুন্নত হয়েছে সেখানে ভাষাও হয়েছে উচ্চভাব প্রকাশের উপযোগী। পুরবাসীদের কথোপকথনে দৃশ্যের সংলাপ কথ্যভাষাশ্রয়ী।—

"পঞ্চম পুরবাসী।। আরে ছাড়ো ছাড়ো উঃ বাবারে

ছাড়ো—দেখ তোমরা।"

—এখানে কথ্যভাষার সংলাপ রচনা একেবারে উপযুক্ত হয়েছে।

'নুরজাহান' নাটকে নারীচরিত্রের সংলাপে তীব্রতা যেন বেশি। নুরজাহান চরিত্রের বুদ্ধি ও হৃদয়কে আশ্রয় করে নানা সত্তার দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে উঠেছে। পত্নীমেহের, মাতা মেহের ও সম্রাজ্ঞী নুরজাহান একই নুরজাহানের তিনসত্তা, একদিকে স্বামীর স্মৃতি ও কন্যার প্রতি কর্তব্যবোধ, অন্যদিকে উচ্চাশা ও ক্ষমতালিপ্সা নুরজাহান চরিত্রটি এই বিপরীত বৃত্তির সংঘাতে আন্দোলিত হয়েছে। তার বিশ্লেষণী মনের একটি সংলাপ স্বাভাবিক ভাবেই মনে আসে—"মানুষের মধ্যে কি দুটি মানুষ আছে? তা না হলে অশান্তদ্বন্দ্ব চলছে কার সঙ্গে?"

নুরজাহান নাটকের সংলাপে শেক্সপীয়রের নাট্যরীতির সংলাপ প্রয়োগের মতো ব্যবহার দেখা যায়। ওথেলোর আবেগদীপ্ত কন্ঠোস্বরে এক অনির্বচনীয় ভাষা স্ফুটে ওঠে—

"Speek of me as I am ; nothing axtenuate

nor set down aught in malice, then must you speak."

নুরজাহান নাটকের পঞ্চম অঙ্কের ষষ্ঠদৃশ্যে দ্বিতীয় বার বিধবা নুরজাহান বলেছে—

"সেদিন আমার ছিল ছুটবার আগে অশ্বের একটি

অধীর উদ্দত আবেগ। আর আজ আমার আছে-

পথশ্রান্ত অশ্বের মন্দীভূত তেজ।"

'নুরজাহান' নাটকের সংলাপ ব্যবহারে যে ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলির লক্ষ করা যায় তা নিম্নরূপ—

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(১) নাট্যকার তার নিজস্ব নির্দেশ অর্থাৎ চরিত্র ও দৃশ্য নির্দেশ রচনা করেছেন সাধুভাষায় কিন্তু নাটকের সংলাপ রচিত হয়েছে চলিত ভাষায়।

(২) পুরবাসী সাধারণ মানুষের ভাষা রচিত হয়েছে মান্যচলিত ভাষায়।

(৩) অন্যান্য চরিত্রের সংলাপ বা কথ্য বাংলায় লেখা হলেও জাহাঙ্গীর বা নুরজাহানের সংলাপে কিছুই বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

(৪) জাহাঙ্গীর সংলাপ তৎসম শব্দবহুল এবং সমাসবদ্ধ পদ নির্মিত এবং সম্রাটোচিত গাম্ভীর্য ও পদমর্যাদা প্রকাশের উপযোগী।

(৫) নুরজাহানের সংলাপ ব্যবহারে স্পষ্টতই ৩টি স্তর লক্ষ করা যায়—সাধারণ মানুষরূপে, সম্রাজ্ঞীরূপে, এবং স্বগতোক্তির ব্যবহারে।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

(১) প্রত্যক্ষ ভাষণের ক্ষেত্রে ক্রিয়া বিভক্তির মহাপ্রাণতা প্রায় অক্ষুণ্ণ।

(২) মান্যকথা বাংলার আদর্শই এই নাটকে অনুসৃত হয়েছে।

(৩) তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দের ব্যবহার রীতিগতভাবে লক্ষণীয়।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য :

(১) নঞর্থক অব্যয়ের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যবহার।

(২) প্রবাদ প্রবচনের সীমিত ব্যবহার।

(৩) সমন্ধসূচক পদের বহুল প্রয়োগ।

(৪) বিশেষ শব্দযুক্ত সমাসের দ্বারা গঠিত বিশেষণ পদের বহুল ব্যবহার।

এককথায় বলা যায় নুরজাহান নাটকের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আসলে সংলাপ নির্মাণে শিল্পজাত কৌশলের চাবিকাঠি। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল সেই চাবিকাঠিকে সঙ্গে নিয়েই তার ঐতিহাসিক নাটকের সংলাপ রচনায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এবং সেদিক থেকে ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান ও নান্দনিক উপাদানের মিশ্রণে যে শিল্পের সৌধ নির্মিত হয়েছে তা 'নুরজাহান' নাটকের সংলাপ রচনার গুণেই।

১.২.৮.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'নুরজাহান' নাটকের সংলাপ রচনায় নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কৃতিত্ব বিচার করো।

২। 'নুরজাহান' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

৩। 'নুরজাহান' নাটকের হাস্যরস।

৪। 'নুরজাহান' নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো।

৫। 'নুরজাহান' নাটকে পাশ্চাত্য প্রভাব।

৬। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'নুরজাহান' নাটকে সুদীর্ঘকালের ইতিহাসের আঙ্গিকে সৌভ্রাতৃত্ব বন্ধন তুলে ধরেছেন।—আলোচনা করো।

১.২.৮.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। ক্ষেত্র গুপ্ত—বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস।

২। ড. অজিতকুমার ঘোষ—বাংলা নাটকের ইতিহাস।

৩। আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম ও ২য়।

৪। ড. বিপ্লব চক্রবর্তী—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নুরজাহান।

৫। সাধনকুমার ভট্টাচার্য—নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার, ২য় খণ্ড।

৬। ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কালজয়ী বাংলা নাটক : পুনর্বিচার।

৭। আজকের প্রতিভাস—দ্বিজেন্দ্রলাল বিশেষ সংখ্যা।

——————

প্রথম পত্র

পর্যায়গ্রন্থ - ৩

চণ্ডালিকা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একক - ৯

চণ্ডালিকার ভাব-উৎস

বিন্যাসক্রম :

১.৩.৯.১ : কথামুখ

১.৩.৯.২ : চণ্ডালিকার ভাব-উৎস

১.৩.৯.৩ : গল্পাংশ

১.৩.৯.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.৩.৯.১ : কথামুখ

প্রতিভার বিশালতা ও বৈচিত্র্যে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যের—বিশেষতঃ বাংলা সাহিত্যের সকল শাখাপ্রশাখা রবিকরস্পর্শে উজ্জীবন্ত ও সমুজ্জ্বল হয়েছিল। এক্ষেত্রে নাটক আমাদের আলোচ্য। ছোট-বড়ো মিলিয়ে অনেকগুলি নাটক-নাটিকার সফল স্রষ্টা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রতিভা ঔৎকর্ষ্যে কবি গল্পস্রষ্টা-ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিতে পারেন নাট্যস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, নৃত্যনাট্য, ঋতুনাট্য, তত্ত্বনাট্য ও প্রহসনে সমৃদ্ধ হয়েছে রবীন্দ্র নাট্যভাবনা। এই সকল নাট্যভাবনার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাটকে 'চণ্ডালিকা'র অবস্থান চিনে নিতে হবে।

১.৩.৯.২ : 'চণ্ডালিকা'র ভাব-উৎস

'চণ্ডালিকা'র গ্রন্থাকারে প্রকাশ কাল ১৩৪০ সালের (ইং ১৯৩৩) ভাদ্র মাস। এর কয়েক বছর পরে ১৯৩৮ সালে নাটিকাটির নৃত্যনাট্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়। নাটিকাটির উৎসমূলে রয়েছে মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' (Calcutta-1882) শিরোনামে প্রকাশিত গ্রন্থের 'শার্দূলকর্ণাবদান' আখ্যান। মূল আখ্যানটি মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের রচনা 'দিব্যাবদানমালা'র অন্তর্গত। শার্দূলকর্ণাবদানের বিস্তারিত গল্পকথাকে সংক্ষেপে প্রাঞ্জল ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন রাজেন্দ্রলাল। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে ব্রতী রবীন্দ্রনাথের কাছে রাজেন্দ্রলাল-প্রণীত গ্রন্থটি অনন্তরত্নসম্ভব আকর গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছিল। এই গ্রন্থে ধৃত নেপালী-বৌদ্ধ সাহিত্যের বেশ কয়েকটি কাহিনীর অনুষঙ্গে উদ্বুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন 'কথা ও কাহিনী'র অসামান্য কবিতাবলী এবং কয়েকটি তত্ত্বনাটক-নাটিকা। ধর্ম-দর্শন-ইতিহাস-রোমান্স ও কাব্যরসের ভিয়ানে ঐ সকল কাব্য-নাটক-নাটিকা প্রাচীন ভারতের ছায়াময় ধূসর ভাবলোকটিকে যুক্তি-বুদ্ধিদীপ্ত মায়াময় মানব-রসলোকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে।

১.৩.৯.৩ : গল্পাংশ

'দিব্যাবদানমালা'র 'শার্দূলকর্ণ' অবদানের ইংরেজী অনুবাদ থেকে গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ মূল কাহিনীর প্রথমাংশটিকে 'চণ্ডালিকা' নাটিকার উৎস-উপাদান (Source element) রূপে ব্যবহার করেছেন। কলকাতা 'Asiatic Society of Bengal'-প্রকাশিত 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' গ্রন্থের ২২৩-২২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত 'শার্দূলকর্ণাবদান' আখ্যানের সেই প্রথমার্ধের বস্তুসংক্ষেপ প্রাঞ্জল বাংলায় তুলে ধরেছেন নাট্যকার। নাটিকার ভূমিকারূপে তার উপস্থিতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।—

"গল্পের ঘটনাস্থল শ্রাবস্তী। প্রভু বুদ্ধ তখন অনাথ শিশুদের উদ্যানে প্রবাস যাপন করছেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দ একদিন এক গৃহস্থের বাড়িতে আহার শেষ করে বিহারে ফেরবার সময় তৃষ্ণা বোধ করলেন। দেখতে পেলেন, এক চণ্ডালের কন্যা, নাম প্রকৃতি, কুয়ো থেকে জল তুলছে। তার কাছ থেকে জল চাইলেন, সে দিল। তাঁর রূপ দেখে মেয়েটি মুগ্ধ হল। তাঁকে পাবার অন্য কোনো উপায় না দেখে মায়ের কাছে সাহায্য চাইলে। মা তার জাদুবিদ্যা জানত। মা আঙিনায় গোবর লেপে একটি বেদী প্রস্তুত করে সেখানে আগুন জ্বালাল এবং মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে একে একে ১০৮টি অর্কফুল সেই আগুনে ফেললে। আনন্দ এই জাদুর শক্তি রোধ করতে পারলেন না। রাত্রে তার বাড়িতে এসে উপস্থিত। তিনি বেদীর উপর আসন গ্রহণ করলে প্রকৃতি তার জন্য বিছানা পাততে লাগল। আনন্দের মনে তখন পরিতাপ উপস্থিত হল। পরিত্রাণের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

ভগবান বুদ্ধ তাঁর অলৌকিক শক্তিতে শিষ্যের অবস্থা জেনে একটি বৌদ্ধ মন্ত্র আবৃত্তি করলেন। সেই মন্ত্রের জোরে চণ্ডালিনীর বশীকরণবিদ্যা দুর্বল হয়ে গেল এবং আনন্দ মঠে ফিরে এলেন।" (ভূমিকা,
Ānanda
চণ্ডালিকা)

রাজেন্দ্রলাল অনুদিত গল্পের শেষার্ধটুকু চণ্ডালিকার নাট্যতত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত নয়। তবুও তৌল বিশ্লেষণের জন্য প্রাসঙ্গিকবোধে তা হুবহু উদ্ধৃত হ'ল—"Matters, however, did not progress so satisfactorily as could be wished. The girl, disappointed at night, rose early the next morning, put on her finest apparel, and stood on the road by which Ānanda daily went to the city for alms. came, and she followed him to every house he went for alms. This caused a great scandal, and followed by the girl, ran back to the hermitage, and reported the occurence to the Lord. The Lord was then called upon to exercise diplomacy to save the character of his disciple. He said to Prakriti, "you want to marry . Have you got the permission of your parents? Go and get their permission." This afforded but slight respite, for Prakriti soon retumed from the city with her parents' permission. The Lord then said, "Should you wish to marry , you must put on the same kind of ochre-coloured cloth, divested of her vicious motives, and had all her former sins removed by the mantra called 'Sarva durgati - Sodhana-dharani', the destroyer of all evils. This did the Lord convert her into a Bhikshuni."

প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধ মিলিয়ে সম্পূর্ণ 'শার্দূলকর্ণাবদান'-এর মূল কাহিনী বৈচিত্র্যে ও বিস্তারে আদ্যান্ত নাটকীয়, রমণীয় ও উপভোগ্য। ভগবান বুদ্ধ 'এবং মায়া শ্রুতম' অর্থাৎ 'এরকমই শুনেছি'—এইরূপ ভনিতা করে চিত্তাকর্ষক কাহিনীটি সমাগত শিষ্যবর্গকে উপহার দিয়েছেন। স্মৃতিচারণ সূত্রে বলা গল্পটির কেন্দ্রস্থলে আছেন স্বয়ং গুরু ও সম্প্রচারক পরমপ্রাজ্ঞ ভগবান বুদ্ধ এবং তার প্রেক্ষাপটে আছে শ্রাবস্তী নগরীর জেতবনে তাঁর গৃহীশিষ্য অনাথপিণ্ডদের রম্য উদ্যানবাটিকা। একদা ভগবান বুদ্ধ সেই বাগিচায় বিশ্রামরত।

তখন তাঁর প্রিয়শিষ্য আয়ুষ্মান আনন্দ পূর্বাহ্ন অতিবাহিত করে, পাত্র-চীবরাদি গ্রহণ করে ভৈক্ষ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শ্রাবস্তী মহানগরীতে প্রবেশ করলেন। ভিক্ষাচরণ শেষে অন্নগ্রহণ করে তিনি একটি ভালো উদপান বা কূপের কাছে এলেন। তখন 'প্রকৃতি' নামে এক চণ্ডালকন্যা [*মাতঙ্গ দারিকা*] কূপ থেকে জল তুলছিল। আনন্দ তাকে বললেন, 'ভগিনী, আমাকে জল দাও, পান করি।' [দেহি মে ভগিনি পানীয়ং, পাস্যামি।] আনন্দের এই কথা শুনে (বিস্মিতা) প্রকৃতি বলল, 'পূজনীয় আনন্দ, আমি চণ্ডাল কন্যা।'—'ভগিনি, আমি তোমার কুল-জাতি প্রভৃতি কিছুই জানতে চাই না; আমাকে জল দাও, পান করি।' আনন্দ বললেন। অগত্যা সেই চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি আয়ুষ্মান আনন্দকে পানীয় জল দান করল। জলপান করে আনন্দ সেখান থেকে চলে গেল।

আয়ুষ্মান আনন্দের সর্বাঙ্গে—মুখাবয়বে, কণ্ঠস্বরে, সাধুতায়, সৌষ্ঠবে মুগ্ধ প্রকৃতির চিত্তে সংরাগ উৎপন্ন হল। (ভাবল), "আমার মা মহাবিদ্যাধরী। তিনি নিশ্চয়ই শক্তি প্রভাবে আনন্দকে আমার কাছে এনে দিতে পারবেন।" তারপর সেই চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি পানীয় জলের ঘড়া (কলসী) নিয়ে সেখানে সেই চণ্ডালগৃহে উপস্থিত হয়ে, ঘড়াটিকে একান্তে রেখে মাকে বলল, "মা, জানো, মহাশ্রমণ গৌতমের শিষ্য শ্রমণ আনন্দ আজ এসেছিলেন। মা, আমি তাঁকে স্বামীরূপে বরণ করতে চাই; তুমি কি তাঁকে এখানে এনে দিতে পারো?" তিনি (মা) বললেন, "পুত্রি, আনন্দকে অবশ্যই এখানে এনে দিতে পারি। শুধু আনন্দ কেন, মৃত বা বীতরাগ যেই হোন না (তাঁকেও)।

[শক্তাহং পুত্রি আনন্দমানয়িতুং স্থাপয়িত্বা যো মৃতঃ স্যাদো বীতরাগঃ।] বৎসে, আরও শোনো, শ্রমণ গৌতম এখন কৌশলরাজ প্রসেনজিতের সেবা-ভজনা ও পরিচর্যাগ্রহণরত। রাজা যদি ব্যাপারটা জেনে ফেলেন, তাহ'ল চণ্ডালকুলের সমূহ বিপদ। শুনেছি, শ্রমণ গৌতম বীতরাগ। বীতরাগ ব্যক্তির মন্ত্র অন্য সকলের মন্ত্রশক্তিকে পরাজিত করে।"

চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি এই সকল কথা শুনে মাকে বলল, "মা, শ্রমণ গৌতম বীতরাগ হলেও তাঁর কাছ থেকে শ্রমণ আনন্দকে ফিরিয়ে আনো; না হলে আমি জীবন ত্যাগ করবো।" প্রকৃতির মা বলল, "তাঁকে অবশ্যই লাভ করবে। পুত্রি, তোমাকে মরতে হবে না; শ্রমণ আনন্দকেই এখানে এনে দিচ্ছি।" [মা তে পুত্রি জীবিতং পরিত্যজেয়ম্। আনয়ামি শ্রমণমানন্দম্।] তারপর প্রকৃতিজননী গৃহাঙ্গনটিকে গোময় দ্বারা অনুলিপ্ত করে তন্মধ্যে একটি বেদী নির্মাণ করল। তার উপর দর্ভ (কুশ ঘাস) বিছিয়ে দিয়ে তাতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করল। আটশত অর্কপুষ্প (আকন্দফুল) গ্রহণ করে মন্ত্রপুত এক একটি পুষ্প সেই প্রজ্জ্বলন্ত হুতাসনে নিক্ষেপ করল। তারপর এই বিদ্যা বা মন্ত্র পড়তে লাগল — "অমল-বিমল-কুঙ্কুম (কাশ্মীরদেশীয় সুগন্ধ পুষ্পবিশেষ) -পুষ্পঙ্গ সুমনকে (অনুরাগপ্রীত মনকে) বিদ্যুতের মতন আবদ্ধ করো। ইচ্ছা দ্বারা (মন্ত্রবিদ্যায়) দেবতা (বরুণ) বর্ষণ করে, বিদ্যুৎ ভৈরব গর্জন করে। রাজা-মহারাজা-দেবতা-মনুষ্য-গন্ধর্ব, শিখাযুক্ত ও বিশিখ দেবদেবীদের বিস্মিত ক'রে আনন্দের আগমন-সংগমন-পরিক্রমণ ও গ্রহণের জন্য 'স্বাহা' মন্ত্রে এই অর্ঘ্য উৎসর্গ করি।"

এদিকে আয়ুষ্মান আনন্দের চিত্ত আক্ষিপ্ত (আকৃষ্ট, বশীভূত) হল। বিহার থেকে বেরিয়ে তিনি সেই চণ্ডাল গৃহে উপস্থিত হলেন। চণ্ডালী (প্রকৃতি-জননী) দূর থেকে আনন্দকে আসতে দেখে প্রকৃতিকে বললে, "পুত্রি, ঐ সেই শ্রমণ আসছেন। শয্যা প্রস্তুত করো।" চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি হৃষ্টতুষ্ট ও প্রমুদিত হয়ে আনন্দের জন্য শয্যা রচনা করতে লাগল। আনন্দ সেই চণ্ডালগৃহে সমুপস্থিত হলেন এবং বেদীর নিকট অবস্থান করতে লাগলেন। একান্তে অবস্থানরত আনন্দ অশ্রু-বিসর্জন করতে করতে বললেন, "আমি ব্যসনগ্রস্ত হয়েছি। [ব্যসনপ্রাপ্তোঽহমস্মি।] ভগবান (বুদ্ধ) আর আমাকে উদ্ধার করবেন না।" প্রভু বুদ্ধ

আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্যকরূপে আকর্ষণ করলেন এবং মন্ত্রশক্তির দ্বারা চণ্ডালীর মন্ত্রকে পরাজিত করে আনন্দকে সম্বুদ্ধ (পূর্বজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত) করলেন। তিনি এই মন্ত্র আবৃত্তি করলেন, "সুনীতি অচ্যুত ও স্থিতিশীল হোক। সকল প্রাণীর স্বস্তি হোক।। জলাশয় প্রসন্ন, নির্দোষ, প্রশান্ত ও সর্বজনের অভয়প্রদ হোক। শত্রুগণ শাম্যাবস্থা লাভ করুক, (সকলের) ভয় বিদূরিত হোক ।।১।। ভিক্ষুগণের স্বস্তি ও আনন্দবিধানের জন্য এই সকল সত্যবাক্যের দ্বারা সকল দেববৃন্দ ও যোগীদের নমস্কার করি ।।২।।"

[স্থিতিরচ্যুতিঃ সুনীতিঃ। স্বস্তি সর্বপ্রাণিভ্যঃ।

সরঃ প্রসন্নং নির্দোষং প্রশান্তং সর্বতোহভয়ম্।

ঈতয়ো যত্র শাম্যন্তি ভয়ানি চলিতানি চ ।।১।।

তদ্বৈ দেবা নমস্যন্তি সর্বসিদ্ধাশ্চ যোগিনঃ।

এতেন সত্যবাক্যেন স্বস্ত্যানন্দায় ভিক্ষবে ।।২।।]

চণ্ডালমন্ত্র প্রতিহত হল। আয়ুষ্মান্ আনন্দ সেই চণ্ডালগৃহ থেকে নির্গত হয়ে যে বিহারে তিনি থাকতেন সেই দিকে পা বাড়ালেন। আনন্দকে চলে যেতে দেখে প্রকৃতি পুনরায় মাকে বলল, 'দেখো মা, শ্রমণ আনন্দ ফিরে যাচ্ছেন।' মা তাকে বলল, "পুত্রি, শ্রমণ গৌতম (বুদ্ধ) এঁকে সর্বতোভাবে আবেষ্টন করে রয়েছেন; তাই আমার মন্ত্রসকল বিফল হবে।" প্রকৃতি বলল, 'শ্রমণ গৌতমের মন্ত্রের চেয়ে বেশি শক্তিশালী কোনো মন্ত্র কি আমাদের নেই?' মা তাকে বলল, "পুত্রি, শ্রমণ গৌতমের মন্ত্রের চেয়ে অধিব শক্তিশালী মন্ত্র আমাদের নেই। পুত্রি, যে মন্ত্রে সর্বলোক প্রভাবিত হয়, শ্রমণ গৌতম তাদের ইচ্ছামাত্রই পরাজিত করেন। পুনরায় কেউ তাঁর মন্ত্রবলকে প্রতিহত করতে পারেন না। এতই বলশালী শ্রমণ গৌতমের মন্ত্র।"

তারপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবান বুদ্ধের নিকটে গিয়ে তাঁর পাদবন্দনা করে একান্তে অবস্থান করতে লাগলেন। তাঁকে তদবস্থায় দেখে ভগবান (বুদ্ধ) বললেন, "আনন্দ, এই 'ষড়ক্ষরীবিদ্যা' গ্রহণ করো। নিজের হিত ও সুখের জন্য, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী-উপাসক-উপাসিকাগণের হিতসুখের জন্য এই বিদ্যা ধারণ করো, আবৃত্তি করো, উত্তমরূপে আয়ত্ত করো। আনন্দ, এই 'ষড়ক্ষরীবিদ্যা' ছয় সম্যক সম্বুদ্ধ, চার মহারাজা, দেবরাজ ইন্দ্র (শক্র), সহাম্পতি ব্রহ্মা প্রভৃতি দ্বারা ভাষিত হয়। এই জন্যই আমি সম্যকসম্বুদ্ধ শাক্যমুনি তোমাকে একথা বলছি। তুমি (এই বিদ্যা) গ্রহণ করো, আবৃত্তি করো, আয়ত্ত করো। সেই মন্ত্র যেমন বলছি এইরূপ ঃ

"অণ্ডরে পাণ্ডরে কারণ্ডে কেয়ুরেহর্চিহস্তে স্বরগ্রীবে বন্ধুমতি বীরমতি ধর বিধ চিলিমিলে বিলোড়য় বিষাণিলোকে। বিষ চল চল। গোলমতি গণ্ডবিলে চিলিমিলে সাতিনিম্নে যথাসংবিভক্তে গোলমতি গণ্ডবিলায়ৈ স্বাহা।।"*

আনন্দ, এই ষড়ক্ষরী বিদ্যা দ্বারা কেউ যদি স্বস্ত্যয়ন ও পরিত্রাণের জন্য উদ্যোগী হয় (তা হলে জেনো) সে বধ্য হলেও দণ্ডাদেশ থেকে মুক্ত হয়। (তেমনি) প্রহারযোগ্য (অপরাধী) প্রহার থেকে, পরিভাষণ (তিরস্কার) দ্বারা প্রহারযোগ্য পরিভাষণ থেকে এবং রোমহর্ষক ভর্ৎসনাযোগ্য থেকে মুক্ত হয়। আনন্দ, আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, দেবলোক-মানবলোক ও সহস্রলোকের শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-প্রজাগণ (সাধারণলোক) দেব-মনুষ্য-অসুর প্রভৃতির যে কেউ নিজেদের রক্ষাকল্পে এই ষড়ক্ষরী মন্ত্র বাহুতে বন্ধন করে স্বস্ত্যয়ন করলে পূর্বতন সকল কর্মবিপাক থেকে মুক্ত হয়ে জয়ী হয়।"

---

* ভাবে বোঝা যাচ্ছে, বিষ ঝাড়ার মন্ত্র। কিন্তু 'অণ্ডরে পাণ্ডরে' প্রভৃতি বীজমন্ত্রাত্মক শব্দের অর্থ দুর্বোধ্য হওয়ায় অনুবাদ করা গেল না। অগত্যা মূল মন্ত্র হুবহু উদ্ধৃত হ'ল। — লেখক।

এদিকে চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি রাত্রির অবসানে স্নান করে পবিত্র হয়ে, মুক্তমালা প্রভৃতি অলঙ্কার-বিভূষিতা হয়ে, শ্রাবস্তী নগরীতে গেল এবং নগরীর প্রবেশমুখে ভিক্ষু আনন্দের নিয়ত গমনাগমন-প্রত্যাশায় অবস্থান করতে লাগল। আনন্দ প্রকৃতিকে অবিরত তাঁর পিছনে ছায়ার মতো বিচরণ (অনুসরণ) করতে দেখলেন। দেখা মাত্রই এই অপ্রগল্‌ভা (লজ্জাহীনা) রমণীর রূপমোহে পুনরায় নিমজ্জিত হবার ভয়ে দুঃখিত হৃদয়ে সত্বর শ্রাবস্তী ত্যাগ করে যেখানে বুদ্ধ অবস্থান করছিলেন সেই জেতবনে উপনীত হলেন এবং তাঁর পাদবন্দনা করে একান্তে অবস্থান করলেন। আনন্দ বুদ্ধকে বললেন, "প্রভু, এই চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি আমার পিঠে পিঠে লেগে রয়েছে, (ছায়ার মতো) অনুসরণ করছে। আমি থেমে থাকলে সেও তদবস্থায় থেমে থাকছে। দেব, যখন আমি পিণ্ড বা অন্নগ্রহণের জন্য লোকালয়ে প্রবেশ করছি, সেও সেই গৃহস্থের দরজার সামনে মৌনী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে। প্রভু, আমাকে রক্ষা করুন, হে সুগত, আমাকে রক্ষা করুন।" আনন্দ এই কথা বললে বুদ্ধ প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রকৃতি, আনন্দকে তোমার কিসের প্রয়োজন?' প্রকৃতি বলল, 'প্রভু, আনন্দকে স্বামীরূপে পেতে ইচ্ছা করি।' 'আনন্দকে যে পেতে চাও তা কি তোমার মাতা-পিতা জানেন?' 'হে প্রভু, হে সুগত, তাঁরা জানেন।' 'তাহলে তুমি তাঁদের আমার সামনে নিয়ে এসো' — বুদ্ধ বললেন।

অতঃপর সেই চণ্ডাল কন্যা প্রকৃতি ভগবান বুদ্ধকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর পাদবন্দনা করল এবং তাঁকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে মাতা পিতার নিকট গেল। তাঁদের প্রণাম করে একান্তে বলল, 'মা, প্রভু গৌতম তোমার সামনেই শ্রমণ আনন্দকে সমর্পণ করতে চান।' (তারপর) সে মাতা-পিতাসহ ভগবান বুদ্ধের কাছে গেল। তার মাতা-পিতা বুদ্ধের চরণবন্দনা করে একান্তে অপেক্ষা করতে লাগল। প্রকৃতিও তাই করল। সে বলল, 'প্রভু, এই (দেখুন) আমার মাতা-পিতা অবগত হয়েছেন।' তখন বুদ্ধ প্রকৃতির মা-বাবাকে বললেন, 'আপনারা কি জানেন যে প্রকৃতি আনন্দের জন্য (পাগল)?' তারা বলল, "প্রভু সুগত, আমরা জানি। আর সে জন্যই আমরা প্রকৃতিকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছি।" অতঃপর তারা বুদ্ধের চরণবন্দনা করে, তাঁকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে তাঁর কাছ থেকে দূরে চলে যেতে উদ্যত হল। প্রকৃতির মা-বাবাকে এইভাবে চলে যেতে উদ্যত দেখে বুদ্ধ প্রকৃতিকে বললেন, 'প্রকৃতি, তুমি কি (সত্যই) আনন্দকে প্রার্থনা করো?' প্রকৃতি বলল, 'প্রার্থনা করি প্রভু, প্রার্থনা করি সুগত।' বুদ্ধ (বললেন), 'প্রকৃতি, সেজন্যই তোমার কর্তব্য আনন্দের (মতো) বেশ ধারণ (অর্থাৎ ভিক্ষুণী হওয়া)। প্রকৃতি বলল, 'ধারণ করবো প্রভু, ধারণ করব সুগত। ভগবান আমাকে প্রব্রাজিত করুন, সুগত আমাকে প্রব্রাজিত করুন।' [প্রব্রজয়তু মাং সুগত, প্রব্রাজয়তু মাং ভগবান।] তখন ভগবান (বুদ্ধ) প্রকৃতিকে বললেন—'এই ভিক্ষুণীর বেশ গ্রহণ করো, ব্রহ্মচর্য পালন করো।' [এহি ত্বং ভিক্ষুণি, চর ব্রহ্মচর্যম।] এই কথা বলে তিনি প্রকৃতিকে কাষায় বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করলেন। তারপর প্রকৃতিকে 'ভিক্ষুণী' আখ্যা দিয়ে তাকে ধর্মকথা দ্বারা সন্দর্শন করলেন, সম্যকরূপে বরণ করলেন, সম্যকরূপে উদ্দীপিত ও নন্দিত করলেন। সেই সকল কথা যা সংসারী, প্রতিকুলা রমণীর পক্ষে দীর্ঘ রাত্রি ধরে শ্রবণযোগ্য যেমন দানকথা, শীলকথা, স্বর্গকথা, কামাদিনিঃসৃত নব নব ভয়, সংক্লেশ প্রভৃতি সম্পর্কে উপদেশ—(এই সকল) ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুণী প্রকৃতির নিকট বোধিপক্ষে সম্যকভাবে প্রকাশ করলেন।

অনন্তর ভিক্ষুণী প্রকৃতি বুদ্ধের ধর্মকথা দ্বারা সন্দর্শিতা (সম্যকদৃষ্টা), সমাদাপিতা (সম্প্রদানযোগ্যা), সমুত্তেজিতা (উদ্দীপিতা), সংপ্রহর্ষিতা (উল্লসিতা), হৃষ্টচিত্তা, কল্যাণচিত্তা, মুদিতচিত্তা, বিনীবরণচিত্তা (মুক্তচিত্তা), ঋজুচিত্তা ও অখিলচিত্তা হয়ে ধর্মোপদেশ গ্রহণ করল। যখন ভগবান বুঝলেন, ভিক্ষুণী প্রকৃতি পূর্বোক্ত গুণরাজির অধিকারিণী হয়েছে, তখন তিনি তাকে 'প্রতিবলা বিদ্যা'য় (প্রতিপক্ষের বল বা শক্তিহরণবিদ্যায়) নিপুণ করে তোলার জন্য উপদেশ দিলেন। দুঃখ নিরোধের উপায় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বললেন।

অতঃপর ভিক্ষুণী প্রকৃতি অনুরূপ আসনে নিষণ্ণ হয়ে চারটি আর্যসত্য ও দুঃখ নিরোধের উপায় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করলেন। যেমন রাত্রির অবসানে পরিত্যক্ত বস্ত্র রঙিন জলে চুবিয়ে নিলে তা সম্পূর্ণ রঙিন হয়ে ওঠে, তেমনিভাবে ভিক্ষুণী প্রকৃতি আসনে (যোগাসনে) উপবিষ্টা হয়ে চারটি আর্যসত্য [চতুরার্যসত্যানি] সম্যকভাবে উপলব্ধি করলেন। যেমন দুঃখসমূহের নিরোধই হল পথ। [দুঃখং সমুদয়ং নিরোধং মার্গম্।]

তারপর ভিক্ষুণী প্রকৃতি দৃষ্টধর্মা, প্রাপ্তধর্মা, বিদিতধর্মা, অকোপ্যধর্মা (দ্বেষ বা অসুয়াহীন ধর্ম যাঁর), পর্যবসিতধর্মা (ধর্মাচরণ অর্থাৎ Practice of religion সমাপ্ত হয়েছে যাঁর), অধিগত অর্থলাভসংবৃত্তা (ধর্মার্থ সম্যক্ ভাবে অধিগত বা উপলব্ধ হয়েছে যাঁর), তীর্ণাকাঙক্ষাবিচিকিৎসা (আকাঙক্ষা ও সংশয়োত্তীর্ণা), বিগতকথাংকথা (মৌনী), বিশারদ (ধর্মবিশারদ), অপরাপ্রত্যয়া (বেদ-বেদাঙ্গ প্রভৃতি অপরাবিদ্যায় বিশ্বাসিনী), অনন্যনেয়া (একাগ্রতা দ্বারা লভ্য) অনুধর্মচারিণী (ভগবান বুদ্ধের ধর্মাশাসনের অনুগামিনী) হলেন এবং ধর্মবিষয়ে আদ্যন্ত জিজ্ঞাসু হয়ে ভগবান বুদ্ধের শ্রীচরণে মাথা ঠেকিয়ে বললেন, "ভগবান, আমার (মোহ) বিদূরিত হয়েছে। হে সুগত, আমার মোহ বিদূরিত হয়েছে। [অত্যয়ো মে ভগবান, অত্যয়ো মে সুগত।] হে প্রভো, মূঢ়া, অব্যক্তা, অকুশলা, প্রজ্ঞাহীনা (সরলা) বালিকার মতো সহর্ষচিত্তে আচার্য ভিক্ষু আনন্দকে স্বামীরূপে (প্রভুরূপে) বরণ করলাম। (প্রভু), লক্ষ করেছি, তিনি (সত্যই) বিগতমোহ। তাঁকে আমার নির্মোহরূপ প্রদর্শন করেছি এবং তারও মোহমুক্তরূপ আবিষ্কার করেছি। তাঁর কাছে সম্যক বর প্রার্থনা করে বলেছি, 'প্রভু, আমাকে মোহমুক্ত জানুন, অনুকম্পাবশতঃ আমাকে গ্রহণ করুন'।"

ভগবান বুদ্ধ বললেন, "প্রকৃতি, কঠোর সংযম অবলম্বন করে তুমি বাসনার নিবৃত্তি ঘটিয়েছ। তাই তুমি মূঢ়া, অব্যক্তা, অকুশলা, দুষ্প্রজ্ঞজাতীয়া (সরলা-) বালিকার মতো ভিক্ষু আনন্দকে তোমার প্রকৃত স্বামী বা প্রভুরূপে গ্রহণ করে সমুচিত আচরণই করেছো। প্রকৃতি, যেহেতু তুমি মোহাদির বিনাশকে জেনেছো, দেখেছো, সম্যকরূপে আয়ত্তাধীন ও বরণীয় করেছো, সেই কারণেই আমিও তোমাকে গ্রহণ করলাম। আমি আশা করি, প্রকৃতি, তুমি ধর্মবিষয়ে প্রত্যাশিত কুশল আচরণ করবে। তাতে তোমার কোনোপ্রকার হানি বা অনিষ্ট হবে না।"

তখন ভিক্ষুণী প্রকৃতি ভগবানকর্তৃক উপদিষ্ট ও অভিনন্দিত হয়ে একাকিনী অতিসাধারণভাবে অপ্রমত্তা, আতপ্তা, স্মৃতিমতী ও জনহিত সম্পর্কে অবহিতা হয়ে একান্তে বিহার করতে লাগলেন। এরই জন্য কুলদুহিতাগণ কেশ উৎপাটিত করে, কাষায় বস্ত্র পরিধান করে। প্রকৃতি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহত্যাগী 'অনাগারিকা' হয়ে ভ্রমণ করতে লাগলেন। অতঃপর ব্রহ্মচর্য পালন শেষে হৃষ্টচিত্তে ধর্ম সম্পর্কে অভিজ্ঞা হয়ে স্বয়ং ধর্মদর্শন করে বললেন, "আমার জাতি-ধর্ম বিনষ্ট হয়েছে, ব্রহ্মচর্য প্রতিপাদিত হয়েছে, কৃত্যসমূহ সম্পূর্ণ হয়েছে। এ ছাড়া আর কিছু আমি জানি না।" [ক্ষীণা মে জাতিঃ, উষিতং ব্রহ্মচর্যম্, কৃতং করণীয়ম, নাপরমস্মাদ্ভবং প্রজন্মামীতি]। [৩৩ 'শার্দূলকর্ণাবদ নম্' ('দিব্যাবদানম্')—ড. পি. এল. বৈদ্য-সম্পাদিত, পৃঃ ৩১৪-৩১৮]

দ্বারভাঙ্গা মিথিলা ইনস্টিটিউট থেকে ড. পি. এল বৈদ্যের সম্পাদনায় 'দিব্যাবদানে'র যে সংস্করণ প্রকাশিত হয় (১৯৫৯) তাতে শার্দূলকর্ণের উপাখ্যানে আরও বৈচিত্র্য ও নাটকীয় ঘটনার সন্নিবেশ লক্ষ করা যায়। ভগবান বুদ্ধের পূর্বজন্মকেন্দ্রিত স্মৃতিচারণাসূত্রে জানা যায়, এ জন্মের প্রকৃতি পূর্বজন্মে ছিল ব্রাহ্মণ পুষ্করসারীর কন্যা। চণ্ডাল ত্রিশঙ্কু ছিলেন নানা শাস্ত্রদর্শী মহা পণ্ডিত। শার্দূলকর্ণ নামে তাঁর এক সর্বগুণসম্পন্ন পুত্র ছিল। ["তস্য ত্রিশঙ্কোর্মাতঙ্গরাজস্য শার্দূলকর্ণো নাম কুমারোহভুদুৎপন্নঃ। রূপতশ্চ কুলতশ্চ গুণতশ্চ সর্বগুণৈশ্চোপেতোহভিরূপো দর্শনীয়ঃ প্রাসাদিকঃ পরময়া শুভবর্ণপুষ্কলতয়া সমন্বাগতঃ।"] ত্রিশঙ্কু পুত্র শার্দূলকর্ণের সঙ্গে প্রকৃতির বিবাহদানের জন্য পুষ্করসারীকে অনুরোধ করলে তিনি ঘৃণাভরে সে

অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। এই অংশে ভ্রূকুটি-কুটিল ব্রাহ্মণের বর্ণনায় অপূর্ব কথাচিত্রেরও নাট্যরসের পরিচয় আছে। প্রথমে ব্রাহ্মণ পুষ্করসারীকে চণ্ডাল ত্রিশঙ্কুর অনুরোধ — "পুত্রায় মে শার্দূলকর্ণায় প্রকৃতিং দুহিতরমুৎসৃজ্য ভার্যার্থায়। যাবন্তং কুলশুল্কং মন্যসে তাবন্তং দাস্যামি।" অর্থাৎ ত্রিশঙ্কুর বক্তব্য এই—প্রকৃতিকে শার্দূলকর্ণের স্ত্রী রূপে উৎসর্গ করো। তার জন্য যে কুলশুল্ক আবশ্যক সেই কড়ি তিনি দিতে প্রস্তুত। পরে ক্রোধান্ধ পুষ্করসারীর রুদ্রমূর্তি — "ইদং চ খলু পুনর্বচনং শ্রুত্বা ত্রিশঙ্কোর্মাতঙ্গরাজস্য ভৃশং ব্রাহ্মণঃ পুষ্করসারী অভিষিক্তঃ কুপিতশ্চণ্ডীভূতোঽনাত্তমনাঃ কোপং চ দ্বেষং চ ম্রক্ষং চ তৎপ্রত্যয়াৎ সংজনিত্বা ললাটে ত্রিশিখাং ভ্রূকুটিং কৃত্বা কণ্ঠং ধময়িত্বা অক্ষিণী পরিবর্ত্য নকুলপিঙ্গলাং দৃষ্টিমুৎপাদ্য ত্রিশঙ্কুং মাতঙ্গরাজমিদমবোচৎ — ধিগ্ গ্রাম্যবিষয়শ্চণ্ডাল নেদং শ্বপাকবচনং যুক্তম্ যস্তং ব্রাহ্মণং বেদপারগং হীনশ্চণ্ডালযোনিজো ভূত্বা ইচ্ছস্যবমর্দিতুম্।" ['দিব্যাবদানম্', শার্দূলকর্ণাবদানম্, ড. পি. এল. বৈদ্য সম্পাদিত, পৃঃ ৩২০] তখন ত্রিশঙ্কু দীর্ঘ জাতিবিচারে প্রবৃত্ত হন। তাঁর যৌক্তিক বিচারে পর্যুদস্ত হয়ে ব্রাহ্মণ পুষ্করসারী চণ্ডালপুত্র শার্দূলকর্ণের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দেন।

তর্কযুদ্ধে পরাজিত ব্রাহ্মণ পুষ্করসারীর ত্রিশঙ্কু-প্রশস্তি ও শার্দূলকর্ণের সঙ্গে আত্মজা কন্যা প্রকৃতির বিবাহদানে সম্মতি — এই পর্যায়ের বর্ণনাংশটুকু বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লেখা এবং কাব্যোৎকর্ষে সমৃদ্ধ —

"জ্ঞানেন হি ত্বং পরমেণযুক্তঃ
সর্বেষু শাস্ত্রেষু ভবান্ কৃতার্থঃ।
শ্রেষ্ঠো বিশিষ্টো পরমোহসি লোকে
ভবান্ হি বিদ্যারণেন যুক্তঃ।।
দদামি তেহং প্রকৃতিং মমামলাং
শীলেন রূপেণ গুণৈরূপেতঃ।
শার্দূলকর্ণঃ প্রকৃতিশ্চ ভদ্রা
উভৌ রমেতাং রুচিতং মমেদম্।।"

['দিব্যাবদানম্', 'শার্দূলকর্ণাবদানম্', ড. পি. এল. বৈদ্য সম্পাদিত, পৃঃ ৪২৪]

১.৩.১২.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'অভিশাপ নয়, অভিশাপ নয়, আনছে আমার জন্মান্তর'–প্রকৃতির এই উক্তি তার জীবনে কীভাবে সত্য হয়ে উঠেছে 'চণ্ডালিকা' নাটক অবলম্বনে বুঝিয়ে দাও।

২। 'চণ্ডালিকা' নাটকে আনন্দের প্রতি প্রকৃতির বাসনাময় ভালোবাসা কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা নাট্যবস্তু অবলম্বনে জানাও।

৩। 'চণ্ডালিকা' নাটিকার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা করো এবং প্রসঙ্গতি ঞ্জ নাটিকার শিরোনামটি যথাযথ হয়েছে কি না তা আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

৪। তত্ত্বনাটিকা হিসেবে 'চণ্ডালিকা'র সাফল্য নির্দেশ করো।

——————

একক - ১০

‘চণ্ডালিকা’র বস্তুসংক্ষেপ

বিন্যাসক্রম :

১.৩.১০.১ : ‘চণ্ডালিকা’র বস্তুসংক্ষেপ

১.৩.১০.২ : বৌদ্ধ গল্প ও ‘চণ্ডালিকা’ ঃ তৌল বিশ্লেষণ

১.৩.১০.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.৩.১০.১ : ‘চণ্ডালিকা’র বস্তুসংক্ষেপ

রবীন্দ্রনাথের নাটিকা ‘চণ্ডালিকা’ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংক্ষিপ্ত অনুবাদের উপর নির্ভর করেই রচিত হয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবির মৌলিক অনুভব, কল্পনা বৈচিত্র্য, হৃদয়ের রঙ, হৃদয়ের স্পর্শ। আশ্চর্যের বিষয়, বিস্তারিত মূল কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত না হয়েও কেবলমাত্র অনুভূতির নিবিড়তায় তিনি মূলের আখ্যান গৌরব স্পর্শ করেছেন। স্থান বিশেষে কিছু কিছু বৈপরীত্য থাকলেও মূলকাহিনীর বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে নাটিকা ‘চণ্ডালিকা’র বিস্ময়কর মিল লক্ষণীয়।

প্রথম দৃশ্য উপস্থাপনার সঙ্গে সঙ্গেই নাট্যরস ঘনীভূত হয়েছে। বোশেখের নিঃঝুম দুপুরের কাঠফাটা রোদ্দুরে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছে চণ্ডালকন্যা (মূল কাহিনীতে ‘মাতঙ্গদারিকা’) প্রকৃতি। কোনো এক অনির্বচনীয় আনন্দে সে আত্মহারা। শ্লেষাত্মক ভাষায় তার মা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, ঘর ছেড়ে রোদে পুড়ে কার জন্য তপস্যা। প্রকৃতি বলে, তার প্রতীক্ষা তাঁরই জন্য যিনি জাত-পাত, অশুচি-অস্পৃশ্যতার অহঙ্কার দূরে সরিয়ে রেখে চণ্ডালিনীর কাছে প্রার্থনা করেছেন তৃষ্ণার জল, বলেছেন, ‘জল দাও,’ বলেছেন, “শ্রাবণের মেঘকে চণ্ডাল নাম দিলেই বা কী, তাতে তার জাত বদলায় না, তার জলের ঘোচে না গুণ। .....নিন্দে কোরো না নিজেকে। আত্মনিন্দা পাপ, আত্মহত্যার চেয়ে বেশি।”

প্রকৃতির এই সব অস্বাভাবিক অসংলগ্ন কথায় চিন্তিত হয়ে পড়েন তার মা। ‘জল দাও’ — এই একটি চকিত বাক্যে প্রকৃতির অন্তর্লোক শোধিত হয়। এ যেন তার নবজন্ম। তার জন্মান্তর কবে কেমন করে সম্ভব হল জানতে চাইলে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে সে জবাব দেয় — “সেদিন রাজবাড়িতে বাজল বেলা দুপুরের ঘন্টা, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। মা-মরা বাছুরটাকে নাওয়াচ্ছিলুম কুয়োর জলে। কখন সামনে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু, পীত বসন তাঁর। বললেন, জল দাও। প্রাণটা উঠল চমকে, শিউরে উঠে প্রণাম করলেম দূর থেকে। ভোর বেলাকার আলো দিয়ে তৈরী তাঁর রূপ। বললেম, আমি চণ্ডালের মেয়ে, কুয়োর জল অশুদ্ধ। তিনি বললেন, যে মানুষ আমি তুমিও সেই মানুষ; সব জলই তীর্থজল যা তাপিতকে স্নিগ্ধ করে, তৃপ্ত করে তৃষিতকে। প্রথম শুনলুম এমন কথা, প্রথম দিলুম এক গণ্ডুষ জল, যাঁর পায়ের ধুলোর এক কণা নিতে কেঁপে উঠত বুক।”

বৌদ্ধ ভিক্ষুর (এখনও নাটিকায় তাঁর নাম অনুল্লেখিত) ‘জল দাও’ বাক্যটি যেন সমগ্র নাটিকাতে পরমাণুবিভাজনের কাজ করেছে। এতকালের হীনমন্য ভীরুতার সংস্কার এক নিমেষে ধুয়েমুছে গেছে প্রকৃতির মন থেকে — “কেবল একটি গণ্ডুষ জল নিলেন আমার হাত থেকে, অগাধ অসীম হল সেই জল। সাতসমুদ্র এক হয়ে গেল সেই জলে, ডুবে গেল আমার কূল, ধুয়ে গেল আমার জন্ম।” কেবল তারই

কাছে সন্ন্যাসীর জল প্রার্থনার বিশেষ অর্থ খুঁজে পেয়েছে সে—"সমস্ত শ্রাবস্তী নগরে আর কি কোথাও জল ছিল না, মা। এলেন কেন এই কুয়োরই ধারে। একেই তো বলি নতুন জন্মের পালা। আমাকে দান করতে এলেন মানুষের তৃষ্ণা মেটাবার শিরোপা। এই মহাপূণ্যই খুঁজছিলেন। যে-জলে ব্রত হল পূর্ণ সে-জল তো আর কোথাও পেতেন না, কোনো তীর্থেই না। তিনি বললেন, বনবাসের গোড়াতেই জানকী এই জলেই স্নান করেছিলেন, সে-জল তুলে এনেছিল গুহক চণ্ডাল। সেই অবধি নেচে উঠেছে আমার মন, গভীর কণ্ঠে শুনতে পাচ্ছি দিনরাত — দাও জল, দাও জল।"

প্রকৃতির কথাবার্তায় আচরণে ভীত-সন্ত্রস্ত মা ভাবেন বুঝি ঐ সন্ন্যাসী তাঁর মেয়েকে মন্ত্র পড়ে গুণ করেছে। যার প্রতীক্ষায় প্রকৃতির পথ চেয়ে থাকা তিনি কেন আসবেন পথ ভুলে অশুচি চণ্ডালিনীর ঘরে?

বিধাতার সংসারে চণ্ডালিনীরও কাউকে সেবার অধিকার আছে — ভিক্ষুকের এই আশ্চর্য কথায় প্রকৃতির অন্তরাত্মা জেগে উঠেছে। সন্ন্যাসী তাকে নারীত্বের মর্যাদা দিয়ে দাসীত্বের হীনতা থেকে সেবিকার মহিমান্বিত আসনে বসিয়েছেন, এতেই প্রকৃতির গৌরব। কিন্তু ভিক্ষুর প্রতি তার শ্রদ্ধা রূপমুগ্ধতা নয়; কারণ তার রূপমুগ্ধ এক রাজকুমারের তাকে রাজরানী করার আহ্বান সে হেলায় তুচ্ছ করেছে। 'জল দাও' —এই মহাবাণী তাকে আত্মাবিষ্কারের — নবজন্মের আনন্দে উত্তাল করে তুলেছে— ".....আমার যুগযুগের অপেক্ষা করে থাকা এই জন্মেই সার্থক হবে, মন কেবলই তাই বলছে। সার্থক হবে। সেই জন্যেই তো শুনলুম এমন আশ্চর্য কথা — জল দাও। আজ জেনেছি, আমিও পারি দিতে। এই কথা সবাই আমাকে ভুলিয়ে রেখেছিল। দেব, দেব, আজ আমার সব কিছু দেব বলেই বসে আছি তাঁর পথ চেয়ে।"

সেবার অধিকার পাকা করবার জন্য ভিক্ষুর সান্নিধ্য লাভে মরিয়া প্রকৃতি মায়ের কাছে জিদ ধরেছে মন্ত্র পড়ে তাঁকে চণ্ডালগৃহে নিয়ে আসতেই হবে। প্রকৃতির প্রার্থিত সন্ন্যাসী যে ভগবান বুদ্ধশিষ্য আনন্দ এ সত্য জেনে বিস্ময়াবিষ্টা প্রকৃতিজননী কন্যার দুঃসাহস ও আস্পর্ধাকে তিরস্কৃত করতে থাকলে প্রতিবাদে গর্জে ওঠে প্রকৃতি — "আমার সাহস! ভেবে দেখ তাঁর সাহসের জোর! কেউ যে-কথা আমার কাছে বলতে পারেনি তিনি সহজেই বললেন, জল দাও। ঐটুকু বাণী, তার তেজ কত — আলো করে দিলে আমার সমস্ত জন্ম; বুকের উপরে কালো পাথরটা চিরকাল চাপা ছিল, দিলে সেটাকে ঠেলে, উছলে উঠল রসের ধারা। মিথ্যে তোর ভয়, তুই যে তাঁকে দেখিসনি। সমস্ত সকালবেলা ভিক্ষা শেষ করলেন শ্রাবস্তী নগরে এলেন মাঠ পেরিয়ে শ্মশান পেরিয়ে, নদীর তীর বেয়ে, রৌদ্র মাথায় করে। কিসের জন্যে। আমার মতো মেয়েকেও কেবল ঐ একটি কথা বলবার জন্যে—জল দাও। মরে যাই, মরে যাই। কোথা থেকে নামল এত দয়া, এত প্রেমঙ্গ নামল সেই ভীরুর কাছে যে সবার চেয়ে অযোগ্যঙ্গ আর কিসের ভয় আমার! জল দাও! সেই জল-যে আমার জন্ম ভরে উপচে উঠেছে, না দিতে পারলে তো বাঁচব না। জল দাও! এক নিমেষে জেনেছি, জল আছে আমার, অফুরান জল, সে আমি জানাব কাকে। তাই তো ডাকছি দিনরাত। শুনতে যদি না পান, ভয় নেই, দে তোর মন্তর পড়ে। সইবে তাঁর সইবে।"

পীতবসন শ্রমণেরা এগিয়ে চলেছেন মাঠপারের রাস্তা দিয়ে, সঙ্গে আনন্দ, কণ্ঠে তাঁর অভয়মন্ত্র— 'বুদ্ধো সুসুদ্ধো করুণামহান্নবো' ইত্যাদি। প্রকৃতির অভিমানক্ষুব্ধ প্রত্যাশা— "আমাকে উনি ফেলে যেতে পারবেন না কারণ আমি যে ওর নিজের হাতের নতুন সৃষ্টি।" কিন্তু ব্যর্থ হল তার আকাঙক্ষা। হতাশ-ভগ্নোদ্যম প্রকৃতি এবার মরিয়া হয়ে ওঠে। আরও নিষ্ঠুর মন্ত্র পড়ে আনন্দকে আকৃষ্ট করে চণ্ডালগৃহে নিয়ে আসার জন্য করুণ মিনতি জানায় মাকে। ভয়ঙ্কর মন্ত্র পড়া শুরু করেন তিনি—মরণপণ সেই মন্ত্র।

যাদু আয়নায় ফুটে ওঠে মন্ত্রাকৃষ্ট আনন্দের গতিবিধি—ধীর পদক্ষেপে তিনি এগিয়ে চলেছেন চণ্ডালপল্লীর দিকে — সাত দিনের পথ বৈশালী পনেরো দিন ধরে তিনি আসছেন। প্রকৃতির মা আত্মবলিদানের বিনিময়ে কন্যাকে সুখী দেখতে চান। মৃত্যুপথযাত্রী মায়ের দুর্দশা প্রত্যক্ষ করেও নবজন্মের উন্মাদনায় আচ্ছন্ন প্রকৃতি স্বার্থপরের মতো বলে ওঠে—"অভিশাপ নয়, অভিশাপ নয়, আনছে আমার জন্মান্তর, মরণের সিংহদ্বার খুলছে, বজ্রের হাতুড়ি মেরে। ভাঙল দরজা, ভাঙল প্রাচীর, ভাঙল আমার এ জন্মের সমস্ত মিথ্যে। ভয়ে কাঁপছে আমার মন, আনন্দে দুলছে আমার প্রাণ। ও আমার সর্বনাশ, ও আমার সর্বস্ব, তুমি এসেছ—আমার সমস্ত অপমানের চূড়ায় তোমাকে বসাব, গাঁথব তোমার সিংহাসন। আমার লজ্জা দিয়ে, ভয় দিয়ে, আনন্দ দিয়ে।"

মৃত্যু সমাসন্ন জেনেও মেয়ের নিষ্ঠুরতায় ব্যথিতা মা বলেন, "ও নিষ্ঠুর মেয়ে, দয়া কর্ আমাকে। আমার আর সহ্য হয় না। শিগ্‌গীর আয়নাটা দেখ্।" মুমূর্ষু মাকে দেখে প্রকৃতির ধ্যান ভেঙে যায়। সর্বনাশ ঘটতে চলেছে বুঝতে পেরে আয়নাটা দেখেই সে ফেলে দেয়, চিৎকার করে ওঠে—"মা, ওমা, ওমা, রাখ্ রাখ্ রাখ্ রাখ্ ফিরিয়ে নে ফিরিয়ে নে তোর মন্ত্র। এখনি এখনি। ওরে ও রাক্ষুসী, কী করলি, তুই মরলি নে কেন! কী দেখলেম! ওগো, কোথায় আমার সেই তীপ্ত উজ্জ্বল, সেই শুভ্র নির্মল, সেই সুদূর স্বর্গের আলো! কী ম্লান, কী ক্লান্ত, আত্মপরাজয়ের কী প্রকাণ্ড বোঝা নিয়ে এল আমার দ্বারে। মাথা হেঁট করে এল। যাক্, যাক্, এ-সব যাক্ (পা দিয়ে মন্ত্রের উপকরণ ভেঙে ছড়িয়ে ফেললে)—ওরে, তুই চণ্ডালিনী না হোস যদি, অপমান করিস নে বীরের। জয় হোক তাঁর জয় হোক।"

যাদুমন্ত্রের আকর্ষণে প্রতিরোধশক্তিহীন আনন্দ চণ্ডালগৃহে উপস্থিত। তাঁকে দেখে মুক্তির আনন্দে বিহ্বল প্রকৃতি আনন্দের পায়ে আত্মনিবেদন করে ক্ষমা প্রার্থনা করে—"ক্ষমা করো ক্ষমা করো। অসীম গ্লানি পদাঘাতে দূর করে দাও। টেনে এনেছি তোমাকে মাটিতে, নইলে কেমন করে আমাকে তুলে নিয়ে যাবে তোমার পুণ্যলোকে। ওগো নির্মল, পায়ে তোমার ধুলো লেগেছে, সার্থক হবে সেই ধুলোলাগা। আমার মায়া-আবরণ পড়বে খসে তোমার পায়ে, ধুলো সব নেবে মুছে। জয় হোক, তোমার জয় হোক, তোমার জয় হোক।" প্রকৃতির মাও তাঁর অনিচ্ছাকৃত পাপাচরণের জন্য আনন্দের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করেন। করুণাঘন আনন্দ ভগবান বুদ্ধের নামগান করতে থাকেন —

"বুদ্ধো সুসুদ্ধো করুণামহান্নবো

যোচ্চন্ত সুদ্ধব্বর-ঞ্ঞানলোচনো।

লোকস্‌স পাপুপকিলেসঘাতকো।

বন্দামি বুদ্ধম্ অহমাদরেণ তম্।।" — নাটিকার সমাপ্তি এখানেই।

পরবর্তীকালে নৃত্যাভিনয়ের উপযোগী করে রচিত 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যে (১৯৩৮) গুরুদেব গদ্যসংলাপ সম্পূর্ণ বর্জন করে কাব্যসংলাপ ব্যবহার করেছেন। তাতে কাব্যধর্মে, নাটকীয়তায়, সাংগীতিক ভাবমাধুর্যে, গূঢ়ার্থের অভিব্যঞ্জনায় ও নৃত্যশৈলীর অপরূপতায় নাটকটি অসামান্য মাত্রা অর্জন করেছে। বুদ্ধ শিষ্য আনন্দের মহাবাণী "যেই মানব আমি সেই মানব তুমি কন্যা/সেই বারি তীর্থ বারি/যাহা নির্বাপিত করে তৃষিতেরে/জল দাও"—প্রভৃতি নবযুগের নব মানবতার ধ্রুব আদর্শ প্রকাশ করে নৃত্যনাটিকার মূলসূত্ররূপে নাট্যগীতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। নৃত্যনাটিকাটির পরিসমাপ্তিও সন্ন্যাসী আনন্দের কল্যাণ এষণায়—'কল্যাণ হোক তব কল্যাণী'তে। সমগ্র নাটিকাটিতে সংগীতের ব্যবহার নাটকীয় আবহ ও সিকোয়েন্স সৃষ্টিতে সহায়তা করে নৃত্যনাট্য ও গীতরসসুধাধারায় অনুভূতির পেয়ালা পূর্ণ করে তুলেছে। রসবোধের এই ঘনীভূত নির্যাস নাটিকাটির দর্শক-শ্রোতা অথবা পাঠক-পাঠিকার এক পরম প্রাপ্তি।

১.৩.১০.২ : বৌদ্ধ গল্প ও 'চণ্ডালিকা' ঃ তৌল বিশ্লেষণ

আলোচনা শেষ করবার আগে অবদান সাহিত্যের মূল কাহিনীর সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের অনুবাদ এবং রবীন্দ্রনাথকৃত তস্য রূপান্তরের দুয়েকটি পার্থক্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ করি। প্রথমতঃ মূলকাহিনীর ভাববস্তুতে প্রিয়দর্শন আনন্দকে দেখে প্রকৃতির রূপ-লালসা ও শয্যারচনা প্রভৃতি পরিণামে শমিত-দমিত হয়েছে করুণাঘন বুদ্ধের স্বয়ং বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণে। সেক্ষেত্রে রাজেন্দ্রলালের অনুবাদে এবং রবীন্দ্রভাবনায় আনন্দই প্রধান লক্ষ্য, ভগবান বুদ্ধের ভূমিকা নিতান্তই গৌণ।

দ্বিতীয়তঃ ড. পি. এল. বৈদ্য সম্পাদিত অবদান গ্রন্থের 'শার্দূলকর্ণাবদান' আখ্যানে শ্রমণ আনন্দকে প্রকৃতির কামসঙ্গী করে দেবার প্রয়াসে যাদুমন্ত্র উচ্চারণ করে প্রকৃতির মায়ের পর পর আটশত অর্কপুষ্প অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দানের প্রসঙ্গ আছে— "......অগ্নিং প্রজ্জ্বাল্য অষ্টশতমর্কপুষ্পানাং গৃহীত্বা মন্ত্রণাবর্তয়মানা একৈকর্ম্মপুষ্পং পরিজপ্য অগ্নৌ প্রতিক্ষিপতিস্ম।" রাজেন্দ্রলালের অনুবাদে এক্ষেত্রে আটশতস্থলে একশত আটটি অর্কপুষ্প অগ্নিতে নিক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। স্বভাবতই এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রাজেন্দ্রলালেরই অনুগামী। মনে হয়, রামায়ণে বর্ণিত শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক একশ আট নীলপদ্ম অঞ্জলি দানের যে আখ্যান পরবর্তীকালে হিন্দু সম্প্রদায়ের শুভ প্রতীকরূপ যজ্ঞীয় সংস্কারে পরিণত হয়েছিল রাজেন্দ্রলালের অনুবাদে তারই অবচেতন স্বীকৃতি।

তৃতীয়তঃ মূল অবদান-কাহিনীর প্রকৃতি কাম-ক্রোধাদি রিপুর সমন্বয়ে আদিম অন্ত্যজ সমাজের যথার্থ নায়িকা। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা'র প্রকৃতি অভিনব সৃষ্টি—আদ্যন্ত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন শ্রদ্ধাশীলা, ভক্তিমতী ও প্রেমমুগ্ধা তপস্বিনী। মানুষকে মানুষ হিসেবে যোগ্য সম্মান না দিয়ে মানবত্বকে উপেক্ষা করলে প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই অপমান করা হয়। এই আত্মবঞ্চনা ও অবমাননার হাত থেকে মনুষ্যত্বকে উদ্ধার করা জাতীয় জীবনের পক্ষে শুভপ্রদ এবং তা জাতির পক্ষে অপরিহার্য, অন্যতায় জাতির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী— এমন একটা বোধ রবীন্দ্রনাথকে 'চণ্ডালিকা' রচনায় অনুপ্রাণিত করে থাকবে বলে আমার ধারণা।

আসলে মূল কাহিনীবৃত্তকে রবীন্দ্রনাথ আপন বিশ্বাস ও আদর্শ প্রচারের কাজে ব্যবহার করেছেন। জাতবিচার, ছুৎমার্গ বা অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি লৌকিক আচার যা মানবিকতাকে বাধা দেয়, মনুষ্যত্বকে অবমানিত করে, সেই অসার, ভুয়োদর্শন সামাজিক আচার-সর্বস্বতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিতৃষ্ণা সুবিদিত। 'চণ্ডালিকা' নাটিকা ও নৃত্যনাট্যে তিনি অস্পৃশ্যতারূপ সামাজিক ব্যাধিটির বিরুদ্ধে জেহাত ঘোষণা করেছেন। এক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত সমকালীন অস্পৃশ্যতা-বর্জন আন্দোলন রবীন্দ্রমানসের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকতে পারে। চণ্ডালিকার (প্রকৃতি) স্বাধিকার সচেতনতার পরিচয় দানে সমাজের লাঞ্ছিত-অবহেলিত-বঞ্চিত মনুষ্যত্বের মর্মকথা ধ্বনিত হয়েছে। মূলের প্রকৃতির তীব্র ভোগলালসার উষ্ণতা চণ্ডালিকায় আনন্দের ক্ষমার শান্ত পরশে তিরোহিত হয়েছে। তার কামনা রূপান্তরিত হয়েছে প্রেমে। ফলতঃ নাটিকাটিতে বৌদ্ধধর্মের প্রেম ও করুণার আদর্শই জয়যুক্ত হয়েছে।

'চণ্ডালিকা' আলোচনা প্রসঙ্গে একটি বিশেষ ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। লক্ষণীয়, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ইংরেজী অনুবাদে 'শার্দূলকর্ণাবদান'-এর অন্তর্ভুক্ত ত্রিশঙ্কু-পুষ্করসারী-শার্দূলকর্ণ-প্রকৃতি বৃত্তান্ত নেই। থাকা উচিত ছিল। কেন না জাতি-পংক্তি বিধ্বস্ত ভারতীয় সমাজের বীভৎস সংকীর্ণ দুর্বলতার দিকগুলিকে অনাবৃত করে দিয়েছে এই বৃত্তান্ত। সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎ ভারতের শম-শান্ত-জাতিধর্মনিরপেক্ষ সুদৃঢ় ও সুমহান ভূমিকার আপাত রূপরেখাটিও তৈরী করে দিয়েছে এই আখ্যান। বিতানিত কাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে জীবন্ত ও বাস্তব অংশও এটি। এমন নাট্য গুণান্বিত দ্বান্দ্বিক ঘটনাংশটি অনুবাদকের নজর এড়িয়ে

গেল বোধ করি গল্পটিকে অতিসংক্ষেপে ব্যক্ত করার তাগিদেই। বৌদ্ধ গল্পকথাকে সাধারণের কাছে সহজলভ্য করে তোলার প্রয়োজনেই গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি। ফলে বৌদ্ধগল্পের অনেক মূল্যবান নাটকীয় অনুষঙ্গ বাদ দিতে হয়েছে তাঁকে। সুতরাং একটা অভাববোধ থেকেই যায়।

চণ্ডালিকা রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ রাজেন্দ্রলালের অনুবাদের উপরে নির্ভর করেছিলেন। সঙ্গত কারণেই ত্রিশঙ্কু-পুষ্করসারী আখ্যান তাঁর অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি, কল্পনা ও ধীশক্তির সহযোগে সেই অভাববোধ তিনি পূর্ণ করে দিয়েছেন। চণ্ডালিকার ঘটনাবস্তুকে তিনি এমনভাবে ঢেলে সাজিয়েছেন যার সঙ্গে মূল বৌদ্ধগল্পের প্রতিপাদ্য জাতিসাম্য তথা বর্ণসাম্যের বিষয়টি মিলেমিশে কোনো না কোনো ভাবে অভিন্নতা লাভ করেছে।

মনে রাখতে হবে, 'চণ্ডালিকা'র প্রতিপাদ্য বিষয়টি কেবলমাত্র অচ্ছুত চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি কর্তৃক তৃষ্ণার্ত শ্রমণ আনন্দকে জলদানেই শেষ হয়নি। তার প্রতিক্রিয়ায় নাটিকাটি প্রকৃতিজননীর আত্মশোধন ও আত্মদানে এবং চণ্ডালিনী প্রকৃতির চিত্তজাগরণ ও সংস্কারমুক্ত জীবনানন্দে জাতিপংক্তি-বিধবস্ত ভারতীয় সমাজে নবজীবনের বাণীবহ হয়ে উঠেছে। চণ্ডালিকার আধুনিক যুগোচিত এই নবায়ন একাধারে রোমান্টিকতা ও যুক্তিবাদের যুক্তবেণী রচনা করে নবজীবনের সিংহদুয়ার খুলে দিয়েছে। মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী বর্ণশ্রম প্রথা ও জাত্যাভিমানরূপ দুষ্ট ব্যাধি যে একটা দেশের সামগ্রিক বিকাশের অন্তরায় নাট্যকার ব্যঞ্জনায় তা আমাদের বুঝিয়েছেন। তাই তত্ত্বনাটিকা হিসেবে চণ্ডালিকা একটি সার্থক ও সফল সৃষ্টি। চণ্ডালিকায় নায়িকা প্রকৃতির চিত্তজাগরণ ও নবচেতনায় উত্তরণের ইতিবৃত্ত থেকে আধুনিক প্রগতিশীল ভারতের সাম্প্রদায়িক, রক্ষণশীল ও বিভেদপন্থী জনগণ শিক্ষাগ্রহণ করতে পারবেন বলে আমাদের ধারণা। সুতরাং নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের সচেতন অভিপ্রায় প্রসূত সৃষ্টি তাঁর মানসকন্যা চণ্ডালিকা প্রকৃতির আত্মশোধন, আত্ম-আবিষ্কার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অটল থাকার ইতিবৃত্ত একালেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

১.৩.১০.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'চণ্ডালিকা' নাটকে মা ও মেয়ের সংস্কার ও অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা করো।

২। 'চণ্ডালিকা' নাটকে 'আনন্দ' চরিত্রটির গুরুত্ব নির্ধারণ করো।

———————

একক - ১১

চণ্ডালিকার শ্রেণিবিচার

বিন্যাসক্রম :

১.৩.১১.১ : 'চণ্ডালিকা'র শ্রেণিবিচার—ট্র্যাজেডি, কমেডি, মেলোড্রামা

১.৩.১১.২ : 'চণ্ডালিকা'র গঠনশৈলী—কাহিনী, ভাষা-সংলাপ-নাট্যদ্বন্দ্ব প্রভৃতি

১.৩.১১.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.৩.১১.১ : 'চণ্ডালিকা'র শ্রেণিবিচার— ট্র্যাজেডি, কমেডি, মেলোড্রামা

প্রশ্ন ওঠে, 'চণ্ডালিকা' কোন্ শ্রেণির নাটক?—ট্র্যাজেডি, কমেডি, মেলোড্রামা? এককথায় এর সদুত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, সমীচীনও নয়। কেন না কবি-দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের মতো নাট্যস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ও বিস্ময়কর প্রতিভা স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। 'মালিনী' নাটিকার ভূমিকায় যদিও তিনি শেক্সপীরিয় নাট্যশৈলী ও আদর্শকে সমকালীন বাংলা নাটকের আদর্শ বলে উল্লেখ করেছেন এবং সেই নাটকের বিশালতায় ও বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হয়েছেন, তা সত্ত্বেও তাঁর কোনো নাটকেই শেক্সপীয়রের নাট্যাদর্শের হুবহু আক্ষরিক অনুস্মৃতি নেই। কেবল শেক্সপীয়র কেন তাঁর বহুপূর্বে আবিষ্কৃত গ্রীক নাট্যকলার হুবহু অনুসরণও তাঁর নাট্যসৃষ্টিতে অনুপস্থিত। বস্তুতঃ রবীন্দ্র নাটক নাটিকাগুলিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্যদর্শের ছায়া থাকলেও সেগুলি নিতান্তই রাবীন্দ্রিক মননশীলতা ও জীবনবীক্ষণের অভিনব শিল্পরূপ। তাতে গ্রীক নাট্যকলার ত্রিদিব ঐক্যের (Unity of place, time and action) কোনো কোনো উপাদান-অনুষঙ্গের সঙ্গে শেক্সপীয়রগৃহীত প্লট (কাহিনী), ক্যারেক্টার (চরিত্র), কনফ্লিক্ট (দ্বন্দ্ব), এ্যাকশন্ (ঘটনা প্রবাহের গতিশীলতা) এবং সবশেষে নাট্যস্রষ্টার নিরাসক্ত-নিরপেক্ষ জীবনবোধ বা ফিলসফি অফ লাইফের অনেকাংশে মিল দেখা গেলেও তা তাঁর পূর্বসূরী কোনো নাট্যপ্রতিভার কোনো প্রকার নাট্যসৃষ্টির হুবহু প্রতিরূপ নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ নাটকের অঙ্ক-বিভাজনের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। শেক্সপীয়রের অধিকাংশ নাটক অঙ্ক-বিভাজিত। এই এ্যাক্ট-বিভাজন পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকেই দেখা যায় না। 'রাজা','মালিনী', 'চণ্ডালিকা'র মতো নাটিকাগুলি কয়েকটি দৃশ্যের সমবায় মাত্র। 'রাজা' নাটকে রবীন্দ্রনাথ আবার দৃশ্যের পরিবর্তে সংখ্যা ব্যবহার করেছেন। সেক্ষেত্রে কয়েকটি দৃশ্য (Scene) বা সংখ্যা (Number) বিভাজিত নাটিকাগুলিকে আমরা কি একাঙ্ক নাটক (One Act Play) আখ্যা দেবো? নাট্যস্রষ্টা কিন্তু কোথাও সে কথা বলেননি। তাহলে? আবার তাঁর অনেক নাটকেই দেখা যায়, ভাবপ্রাধান্য নাট্যদ্বন্দ্ব ও ঘটনার অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে। সেই জন্যই জনৈক রবীন্দ্র নাট্য সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন —"In Rabindranath's drama the pressure of thought often strangles the action." মন্তব্যটি সর্বাংশে সত্য না হলেও আংশিক সত্য তো বটেই। কেননা তাঁর অনেক নাটকই Imitation of life in action—দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষমুখর বাহ্যিক জীবনের রসরূপ হলেও অন্তরঙ্গ জীবনের তথা আত্মিক জীবনের রসারোপও সেখানে দুর্লক্ষ নয়। যেমন 'রাজা' নাটকটিকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই আখ্যা দিয়েছেন 'Inner drama of the soul'-বলে। তাঁর ভাব ও তত্ত্বপ্রধান নাটক-নাটিকাগুলিতে এমনটা আকছার দেখা যায়। সুতরাং প্রচলিত তথা Traditional ভাবনার আলোকে রবীন্দ্রনাটক-নাটিকার বিচার করতে বসলে অনেক সময়েই ভ্রান্তিতে পড়তে হবে। অতএব রবীন্দ্র নাট্যসৃষ্টি নিতান্তই রাবীন্দ্রিক বলে তার বিচারের আঙ্গিকও স্বতন্ত্র।

অতঃপর চণ্ডালিকা প্রসঙ্গ। প্রাথমিক বিচারে চণ্ডালিকা মিলনান্তক (কমেডি) নাটিকা। চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি এই নাটিকার মুখ্য চরিত্র। নানা দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রকৃতি চরিত্রের উদ্ভাস, আত্ম-উদ্‌ঘোষণ ও আনন্দবাক্যে আত্মবোধে উজ্জীবন, বৌদ্ধ ধর্মানুগ প্রেম মৈত্রী ও করুণাদর্শের জয় সূচিত হয়েছে এই নাটিকায়। সুতরাং প্রাপ্তির দিক থেকে প্রকৃতির অভিলাষ পূর্তির ইতিবৃত্ত নাটিকাটিকে একটি মিলনদীপ্ত পরিণামী সত্যে পৌঁছে দিয়ে মিলন-মধুর অথবা মিলন-বিধুর কমেডি নাটকের শর্ত পূরণ করেছেন নাট্যকার। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে 'চণ্ডালিকা'কে কি ধরনের কমেডিরূপে গ্রহণ করব? সাধারণভাবে নাট্যসমালোচকগণ কমেডি নাটকের নানান বৈশিষ্ট্যের ও বৈচিত্র্যের উল্লেখ করে থাকেন। সেই সূত্রে কমেডির সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ নানান। ইংরেজী ভাষায় গৃহীত Comedy শব্দটির উৎসমূল গ্রীক Comos শব্দ যার অর্থ বিবাহ। সুতরাং কমেডি প্রসঙ্গে একটা মিলন-মধুর আবহের প্রতিভাস ভেসে ওঠে। তাই Comedy কে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলা যায়, যে নাটকে মানবজীবনের আশা-আকাঙক্ষার পূর্ণতাকেন্দ্রিক হর্ষোল্লাসের চিত্র অঙ্কিত হয় তাকে বলে কমেডি। কমেডিও বিষয়-বৈচিত্র্যে নানাবিধ। যেমন প্রেম, কবিত্ব ও কল্পনার প্রাচুর্যে ভরা নাটককে বলা হয় Romantic Comedy, সামাজিক রীতিনীতিকে ব্যঙ্গ করে রচিত নাটককে বলা হয় Comedy of manners, মানব চরিত্রের দোষগুণের উল্লেখে সমুজ্জ্বল নাটককে বলে Comedy of characters, আবার নাটকীয় চরিত্রগুলির পারস্পর আচরণে ষড়যন্ত্র বা চক্রান্তের পরিচয় থাকলে সেই নাটককে বলে Comedy of Intrigu ইত্যাদি। 'চণ্ডালিকা'য় কমেডি নাটকের এই চারটি বিষয় বৈচিত্র্য অল্পবিস্তর একত্রে সন্নদ্ধ হয়েছে। সেখানে কবিত্ব ও কল্পনাপ্রাচুর্যের সঙ্গে সমাজবিধির বিরুদ্ধে জেহাদ যেমন আছে প্রকৃতির সাধনার অঙ্গ হয়ে, তেমনি আনন্দ, প্রকৃতি, প্রকৃতির মা—সকলের সামাজিক অবস্থান ও আত্মসমীক্ষণের মধ্যে মানব চরিত্রের ভালোবাসা, করুণা, স্খলন-পতন কেন্দ্রিত দোষগুণের উল্লেখে চণ্ডালিকা প্রকৃতার্থে একটি ইতিবাচক অস্তিবোধে ভাস্বর মিলনান্তক নাটক হয়ে উঠেছে। নাটিকার পরিণতিতে আনন্দকণ্ঠ নিঃসৃত আশীর্বাণী — 'কল্যাণ হোক তব কল্যাণী।' আসলে সংযম-সহিষ্ণু-উদার প্রেম ও কল্যাণ আদর্শের জয়গান। 'চণ্ডালিকা'য় এরূপ আদর্শের প্রতিস্থাপন Comedy নাটকের আদর্শবিরোধী নয়। সুতরাং বিষয়টিকে লঘু করে দেখলে চলবে না।

তৎসত্ত্বেও সূক্ষ্ম বিচারে 'চণ্ডালিকা'কে কেবল Comedy না বলে Tragedyও বলব। কেননা প্রকৃতির আত্মমর্যাদাবোধ ও নবজীবনাদর্শে উজ্জীবনের জন্য তার মায়ের আত্মদানের নিষ্করুণ অধ্যায়টি সমস্ত আনন্দময় উপলব্ধিকে ম্লান করে দিয়েছে। যৌবনের ভরা জোয়ারে ভেসে চলার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় অসহায়া মমতাময়ী জননীর আত্মত্যাগের ভয়ঙ্কর নির্মম পরিণামের আশঙ্কাকেও আমল দেয়নি প্রকৃতি। ভালোবাসার অথবা জৈবিকতার উন্মাদনায় আনন্দকে আকৃষ্ট করবার মোহে আচ্ছন্ন এমনি স্বার্থপর সে। আপ্তসুখের জন্য অথবা সদ্য জাগ্রত চেতনায় প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তার অহঙ্কারসর্বস্ব অযৌক্তিক অশোভন নিষ্ঠুর আচরণ তার চারিত্র্যগৌরবকে ম্লান করে দিয়েছে। কিন্তু সত্যি সত্যিই যখন আশঙ্কা সত্য হল তার জননীর নিষ্করুণ স্বেচ্ছামৃত্যুতে, তখন পরম প্রাপ্তির আনন্দে উদ্ভাসিত তার উজ্জ্বল সুন্দর মুখশ্রীতে আলোর সঙ্গে ছায়ার মতো মিশে থাকলো এক বেদনাবোধ, পরমাত্মীয় হারানোর নিষ্করুণ দীর্ঘশ্বাস। বস্তুত মাতৃহারা প্রকৃতির আত্মদ্বন্দ্বের সূচনা হল এখান থেকে। নাটিকা শেষ হয়ে গেলেও তার অতঃপর জীবিতকাল যে সবসময় মাতৃমৃত্যুর পাপমূল্যে কেনা একটা দুঃসহ কষ্টের মধ্যেই কাটবে—এমনটা অনুমান করতে বাধা নেই। 'চণ্ডালিকা'র পরিণতি বিষাদদীর্ণ, ছায়াচ্ছন্ন সেই গোধূলিলোকে যার অবিসম্বাদিত নায়িকা প্রকৃতি। তাই চণ্ডালিকার Tragedy প্রকৃতিরই Tragedy। সমস্ত কৃতকর্মের শুভাশুভ ফল, Doing ও Suffering-এর সবকিছু সেই আপন বক্ষপঞ্জরে ধারণ করেছে; কামনা-বাসনার স্বপ্ন-কুহক থেকে

জ্যোতির্ময় দিব্য প্রেমে উত্তরণ ঘটেছে তারই। নতুন জন্মলাভে উদ্ভাসিতা প্রেম-তপস্বিনী চণ্ডালিকার উত্তরণের আখ্যানই তো নাটকের মুখ্য বিষয়। সেই বিষয়টির রূপায়ণে স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির আকর্ষণেই Tragedy র মর্মমূলে প্রবেশ করেছেন।

Tragedy নাটক তো আসলে সুগভীর কৌতুহলোদ্দীপ্ত সংযত-সংহত-বিষাদদীর্ণ মানবজীবনের শিল্পিত রূপালেখ্য। তাই Tragedy-র আখ্যানবৃত্তের মধ্যে এমন কতকগুলি দৃঢ়সম্পৃক্ত অনুষঙ্গ ব্যবহার করতে হয় যা আমাদের মনের মধ্যে একই সঙ্গে করুণা (Pity) ও ভীতির (Fear) মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, অন্তরস্থিত অস্থির প্রবৃত্তির দোলাচলতাকে নিয়ন্ত্রিত করে মনের মধ্যে একপ্রকার প্রশান্ত সাম্যবস্থা এনে দেয়। এইভাবে মানবিক ভাবাবেগের মোক্ষণ (Cathersis) ঘটে এবং ট্রাজেডির বিপদ-বিষন্নতা মনের গহীন স্তরে দুঃখ-বিষাদ- উত্তীর্ণ এক সুসূক্ষ্ম আনন্দরসের সৃষ্টি করে, Saddest বিষয়টি ও তখন Sweetest হয়ে ওঠে। Tragedy-তে এই ভাবমোক্ষণের বিষয়টি ক্রিয়াশীল থাকে বলেই মনীষী হেগেল তার মধ্যে সন্ধান পেয়েছিলেন শাশ্বত বিচারবোধের (Eternal Justice), দার্শনিক লুকাস খুঁজে পেয়েছিলেন মানবমহত্বের সত্যবোধ ও সৌন্দর্যদৃষ্টিকে। 'চণ্ডালিকা'য় রবীন্দ্রসৃষ্টির মধ্যেও Tragedy-আশ্রিত জীবননিরীক্ষার পূর্বকথিত শুভাশুভ ফলগুলি একত্রে সমাহিত হয়ে সৌন্দর্যরসবোধ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। সকল দ্বন্দ্ববিভেদ উত্তীর্ণ এক প্রশান্ত করুণাঘন উপলব্ধিতে কেবল প্রকৃতি ও তার মায়ের মতো নাটকের পাত্র-পাত্রীদেরই নয়, দর্শক-শ্রোতার মনও কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছে নিবিড় জীবনরসে—আনন্দরসে। তাই নাটিকার উপসংহারে প্রকৃতি যেমন আনন্দের জয়গানে মুখর হয়ে বলতে পারে, 'জয় হোক, তোমার জয় হোক, তোমার জয় হোক।' তেমনি তার মা মৃত্যুসরণীতে দাঁড়িয়েও উচ্চারণ করতে পারেন—"জয় হোক, প্রভুঙ্গ আমার পাপ আর আমার প্রাণ দুই পড়ল তোমার পায়ে, আমার দিন ফুরল ঐখানেই—তোমার ক্ষমার তীরে এসে।" মৃত্যুর মধ্য দিয়েও এই পরম প্রাপ্তির নির্যাস, আত্মবোধ ও আত্মশোধনের সংবেদন ট্র্যাজেডির উপলব্ধিকে, আনন্দরসকে আরও ঘনীভূত করেছে।

অতএব, আলোচনাসূত্রে বোঝা গেল যে 'চণ্ডালিকা' একটি বিমিশ্র রসের নাটিকা যার মধ্যে কমেডির আনন্দোচ্ছাস ও ট্র্যাজেডির জীবনরস মিলেমিশে একাকার হয়ে নাটিকাটিকে যৌগিক রসসিক্ত একটি 'মেলোড্রামা'য় পরিণত করেছে। নাটিকাটিকে তাই মেলোড্রামা রূপে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

১.৩.১১.২ : 'চণ্ডালিকা'র গঠনশৈলী—কাহিনী, ভাষা-সংলাপ-নাট্যদ্বন্দ্ব প্রভৃতি

'চণ্ডালিকা'র গঠনশৈলীটি অনবদ্য। নাটক নিয়ে রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুবিদিত। আশ্চর্যের বিষয়, তিনি যখন যে বিষয় নিয়েই রচনা করেছেন বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে তাকেই অভিনব বলে মনে হয়েছে। অর্থাৎ নাট্যসৃষ্টির ক্ষেত্রেও তিনি 'বারে বারে আধুনিক, ফিরে ফিরে আধুনিক।'

'চণ্ডালিকা'র সৃষ্টি উৎসে রয়েছে চিত্তাকর্ষক **বৌদ্ধ আখ্যান**। প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধধর্মাশ্রিত পরিবেশটিকে তিনি আবহ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বুদ্ধ শিষ্য আনন্দের করুণাঘন প্রশান্ত ভাবমুর্তির পাশে হাজার হাজার বছরের অপমান থেকে সদ্য জেগে ওঠা প্রকৃতির আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামী দৃঢ়তা নাট্য পরিবেশটিকে ভাবঋদ্ধ ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভাব প্রকাশের অনুকূল স্থান-কাল ও পাত্রোপযোগী তীব্র-তীক্ষ্ণ স্ফটিকঘন সংলাপ। 'চণ্ডালিকা' বিশ্লেষণে এই **'সংলাপ'** বিষয়টির উপর বিশেষ নজর দিতে হবে। চণ্ডালিকা নাটিকার সংলাপের ভাব যেমন ঝরঝরে প্রাঞ্জল, তেমনি আবেগঘন ও কাব্যময়। কবির হৃদয়বোধের সঙ্গে নাট্যকারের বাস্তব জীবনবীক্ষার সম্মিলনে অসাধারণ সুন্দর সুন্দর সংলাপ সৃষ্টি করেছেন তিনি। দুএকটি দৃষ্টান্তেই আমার বক্তব্য সপ্রমাণ হবে। —

"মা। প্রকৃতি, ও প্রকৃতিঙ্গ গেল কোথায়? কী জানি কী হল মেয়েটার। ঘরে দেখতেই পাইনে।

প্রকৃতি। এই-যে মা, এখানেই আছি।

মা। কোথায়?

প্রকৃতি। এই-যে কুয়োতলায়।

মা। আশ্চর্য করলি তুই। বেলা গেল দুপুর পেরিয়ে, কাটফাটা রোদ, মাটি উঠেছে তেতে পা ফেলা যায় না। ঘরের জল কোন্ সকালে তোলা হয়ে গেছে। পাড়ার মেয়েরা সবাই জল নিয়ে গেল ঘরে। ঐ দেখ্, ঠোঁট মেলে গরমে কাক ধুঁকছে আমলকী গাছের ডালে। তুই এই বৈশেখের রোদ পোয়াচ্ছিস বিনি কাজে। পুরাণ-কথা শুনেছি, উমা তপ করেছিলেন ঘর ছেড়ে বাইরে, রোদে পুড়ে, তোর কি তাই হল।

প্রকৃতি। হাঁ, মা তা করছি তো বটে।

মা। অবাক করলেঙ্গ কার জন্যেঙ্গ

প্রকৃতি। যে আমাকে ডাক দিয়েছে" (চণ্ডালিকা, প্রথম দৃশ্য)

এখানে ছোটো ছোটো চলিত শব্দের সমবায়ে বাক্য গঠন, কবির রসবোধ ও বাস্তব নিরীক্ষায় মধ্যাহ্ন প্রকৃতির প্রাকৃত সৌন্দর্য সুন্দরভাবে ফুটেছে। মঞ্চে অভিনয়যোগ্য দৃশ্যকাব্যের উপযোগী সংলাপই বটে। অনুরূপ একটি দৃষ্টান্তে প্রকৃতির চিত্তজাগরণের উদ্বেল-উচ্ছ্বাসের উপযোগী সংলাপ রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, যেখানে কবির আবেগ ও নাট্যকারের জীবনবোধ মিশ্রিত হয়ে ঝরে পড়েছে ছোটো ছোটো বাক্যের হীরকোজ্জ্বল দ্যুতি। —

"মা। আচ্ছা সাহস তোর প্রকৃতি।

প্রকৃতি। আমার সাহস। ভেবে দেখ্ তার সাহসের জোরঙ্গ কেউ যে-কথা আমার কাছে বলতে পারেনি তিনি সহজেই বললেন, জল দাও। ঐটুকু বাণী, তার তেজ কত — আলো করে দিলে আমার সমস্ত জন্ম; বুকের উপরে কালো পাথরটা চিরকাল চাপা ছিল, দিলে সেটাকে ঠেলে, উছলে উঠল রসের ধারা। মিথ্যে তোর ভয়, তুই যে তাঁকে দেখিসনি। সমস্ত সকালবেলা ভিক্ষা শেষ করলেন শ্রাবস্তী নগরে এলেন মাঠ পেরিয়ে, নদীর তীর বেয়ে, প্রখর রৌদ্র মাথায় করে। কিসের জন্যে। আমার মত মেয়েকেও কেবল ঐ একটি কথা বলবার জন্যে — জল দাও। মরে যাই, মরে যাই। কোথা থেকে নামল এত দয়া, এত প্রেমঙ্গ ..." (চণ্ডালিকা, প্রথম দৃশ্য)

নাটকের সংলাপ তার ভাষা-ব্যবহারের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। সেই ভাষাও হবে আদৌ ভাবপ্রকাশের উপযোগী, আবেগঘন কিন্তু সহজ, সাবলীল ও বোধগম্য। সংলাপ অংশটি নাতিদীর্ঘ কিন্তু নাতি হ্রস্ব না হলে নাট্যরস তেমন জমে না। সংলাপ সম্পর্কে এ হল সাধারণ দর্শন। ব্যতিক্রমও অনেক সময় উৎকৃষ্ট নাট্যরস সৃষ্টি করে এমন দৃষ্টান্তও প্রচুর। তবে সাধারণভাবে দীর্ঘ নাট্যসংলাপ নাটকের গতিময়তা রুদ্ধ করে। সুতরাং দীর্ঘ বিতানিত নাট্যসংলাপ পরিহার করাই ভালো। এ সম্পর্কে বিশ্বখ্যাত নাট্যস্রষ্টা শেক্সপীয়র ও বার্নার্ড শ-এর নাট্য সংলাপ প্রসঙ্গ মনে পড়ে। বর্তমান গতিশীল জীবনের প্রেক্ষাপটে বিশ্ববন্দিত নাট্যকারদ্বয়ের নাটকে ব্যবহৃত দীর্ঘ সংলাপ নাট্যরসবোধের কতখানি অন্তরায় হতে পারে সে বিষয়ে 'The Magic Curtain' গ্রন্থে বার্নার্ড শ'র দুটি বিখ্যাত নাটক — 'Back to Mathuselah' ও 'Saint John' এর মঞ্চায়ন প্রসঙ্গ দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। 'Saint John'-এর মতো সুদীর্ঘ সংলাপঋদ্ধ নাটককে মঞ্চাভিনয়ের উপযোগী করে তুলতে হলে যে কাটছাঁটের

প্রয়োজন তা খোদ নাট্যস্রষ্টাকেই জানিয়ে দিয়েছিলেন 'Theatre Guild'-এর তদানীন্তন সম্পাদক Laurance Langner—"Johnson cannot be successfully given until after your death because it can not be cut". কিন্তু খোদ লেখকের রচনার উপর হস্তক্ষেপের বাধা Copyright Act-এর প্রসঙ্গ টেনে এনে তিনি মন্তব্য করেছিলেন—"Many of his plays will never be seen at their best until after the Copyrights are expired" কিন্তু বিষয়টি বিতর্কিতই রয়ে গেছে। কেন না, কোনো প্রকার সংক্ষেপকরণ ছাড়াই শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সীজার', 'ম্যাকবেথ', 'অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা', 'হ্যামলেট', 'ওথেলো' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় ও মঞ্চসাফল্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

রবীন্দ্র নাটক সম্পর্কেও একই কথা। সংলাপ দীর্ঘ-প্রলম্বিত হলেও তা দর্শকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটায় না, বরং উল্টেট রসবোধের কারণ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত সংলাপটি তুলে ধরা যেতে পারে। প্রথমে ছোটো সংলাপের সৌন্দর্য আনন্দকে মন্ত্রবলে চণ্ডালগৃহে টেনে আনার জাদুতে মত্ত প্রকৃতির মা। মন্ত্রের প্রভাব কতটা কাজ করছে তা জানবার জন্য প্রকৃতিকে জাদু আয়নায় প্রতিফলিত আনন্দের অবস্থান দেখতে বললে প্রকৃতি বলে ওঠে, "না, দেখব না, দেখব না, আমি শুনব মনের মধ্যে—ধ্যানের মধ্যে। হঠাৎ সামনে দেখব যদি দেখা দেন। আর একটু সয়ে থাকো, মা — দেবেন দেখা, নিশ্চয় দেবেন। ঐ দেখো, হঠাৎ এল ঝড়, আগমনীর ঝড়, পদভরে পৃথিবী কাঁপছে থরথরিয়ে, বুক উঠছে গুর্ গুর্ করে।" এই ক্ষুদ্র সংলাপে আনন্দকে পাবার জন্য প্রকৃতির মায়ের অসাধ্যসাধন, প্রকৃতির আকুলতা প্রত্যাশা সংশয়শঙ্কা চমৎকারভাবে নাট্যরসে আপ্লুত হয়েছে। এর পাশে আনন্দ দর্শনে অভিভূত প্রকৃতির দীর্ঘ কাব্যরসসিক্ত সংলাপটি কেমন সুন্দরভাবে মানিয়ে গেছে—"প্রভু, এসেছ আমাকে উদ্ধার করতে—তাই এত দুঃখ পেলে—ক্ষমা করো, ক্ষমা করো। অসীম গ্লানি পদাঘাতে দুর করে দাও। টেনে এনেছি তোমাকে মাটিতে, নইলে কেমন করে আমাকে নিয়ে যাবে তোমার পুণ্যলোকেঙ্গ ওগো নির্মল, পায়ে তোমার ধুলো লেগেছে, সার্থক হবে সেই ধুলো লাগা। আমার মায়া আবরণ পড়বে খসে তোমার পায়ে, ধুলো সব নেবে মুছে। জয় হোক, তোমার জয় হোক, তোমার জয় হোক।" (চণ্ডালিকা-২য় দৃশ্য)

'চণ্ডালিকা'র সংলাপের ভাষা সম্পর্কে রবীন্দ্র নাটকে সংলাপ প্রসঙ্গটি বিবেচ্য। রবীন্দ্রনাথ কবি নাট্যকার। স্বভাবতই তার নাট্যভাষায় কবির ধর্ম ও নাট্যকারের ধর্ম মিশ্রিত হয়েছে। 'চণ্ডালিকা'য় সংলাপের ভাষা গদ্য-পদ্য মিশ্র। কিন্তু কবির সৃষ্ট ভাষা বলে তাতে কাব্যধর্মের প্রাচুর্য। তার গদ্যভাষাও তাই কাব্যরসপুষ্ট, উজ্জ্বল-সুন্দর। কাব্যভাষা না গদ্যভাষা—কোনটি নাট্য সংলাপের উৎকৃষ্ট বাহন এ সম্পর্কে সমালোচক T.S.Eliot-এর সিদ্ধান্ত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে এক্ষেত্রে গদ্যভাষা ও পদ্যভাষা বা কাব্যভাষা তুল্যমূল্য। যাঁরা মনে করেন গদ্যভাষা অনেক বেশি বাস্তবতাশ্রিত বলেই গ্রহণযোগ্য তাঁদের মনে রাখা উচিৎ নাটকও আসলে কাব্যের মতোই আমাদের অন্তর্লোকের 'আমি'রই সৃষ্টি এবং সেই অন্তর্লীন গূঢ় আবেগ পদ্যভাষাতেই ফোটে ভাল। কেন না গদ্যের সৃষ্টিও ওই আবেগ-প্রেরণা থেকে। তাই তিনি জোর দিয়েই বলেন— "I say that prose drama is merely a slight by product of verse drama. The human soul, in intense emotion, strives to express itself in verse. .....The tendency, at any rate, of prose drama is to emphasise the ephemeral and superficial, if we want to get at the permanent and universal, we tend to express ourselves in verse." ('Selected Essays' সমালোচনা গ্রন্থের 'A Dialogue on Dramatic Poetry' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। এলিএটিয় তত্ত্বের ভাষ্য অনুযায়ী জীবনের উপলব্ধির ক্ষেত্রে যা কিছু 'স্থায়ী ও চিরন্তন' (Permanent and Universal) তা প্রকাশের উৎকৃষ্ট মাধ্যম পদ্যভাষা (Verse)। এ সত্য মেনে নিলে 'বিসর্জন', 'রাজা', 'চিত্রাঙ্গদা' প্রভৃতি রবীন্দ্রসৃষ্ট নাটকে ব্যবহৃত কাব্যভাষার অন্তর্ভেদী শক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন চলে না। উৎকৃষ্ট কাব্যভাষা উৎকৃষ্ট নাট্যরসসৃষ্টির সহায়ক। 'চণ্ডালিকা'য় এর দৃষ্টান্ত প্রচুর। একটি দৃষ্টান্ত দিয়েই প্রসঙ্গটিতে ছেদ টানতে চাই। চণ্ডালিনী প্রকৃতি জননীর জাদুর আকর্ষণে সংসারবিরাগী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী আনন্দ কতোটা পথ পাড়ি দিয়েছেন সে প্রসঙ্গে

মা মেয়েকে প্রশ্ন করেন, 'আজ কোথায় এসেছেন আন্দাজ করতে পারিস?' উত্তরে প্রকৃতি বলে—"কাল সন্ধ্যার সময় দেখেছি উপলি নদীর ধারে পাটল গ্রামে। নববর্ষায় জলের ধারা উন্মত্ত, ঘাটের কাছে পুরানো পিপুল গাছ, জোনাকি জ্বলছে ডালে ডালে, তলায় শেওলাধরা বেদী—সেইখানে এসেই হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। অনেকদিনের চেনা জায়গা; শুনেছি ঐখানে বসে ভগবান বুদ্ধ একদিন রাজা সুপ্রভাসকে উপদেশ দিয়েছিলেন। দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন, স্বপ্ন বুঝি ভাঙল হঠাৎ। তখনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেম আয়না, ভয় হল কী জানি কী দেখব। তার পরে গেছে সমস্ত দিন, কিছু জানতে চাইনি, আশা করছি, আশা ছাড়ছি—এমনি করে আছি বসে। এখন রাত আসছে অন্ধকার হয়ে। প্রহরী হাঁক দিয়ে চলেছে রাস্তায়, এক প্রহর গেল বুঝি কেটেঙ্গ আর সময় নেই, সময় নেই মা, এ রাত ব্যর্থ করিস নে। তোর সব জোরটা দে ঐ মন্ত্রে।" (চণ্ডালিকা, ২য় দৃশ্য)—উদ্ধৃতিটি বিশাল, সন্দেহ নেই। কিন্তু তার কোনো অংশই নাট্য-উদ্দেশ্য ও নাট্যরস বহির্ভুত মনে হয় কি? কাঙ্ক্ষিত প্রিয়তমকে অন্যায়ভাবে জোর করে স্বধর্মবিচ্যুত করার জন্য পাপবোধ, আত্মগ্লানি যেমন প্রকৃতিকে পীড়িত করে, তেমনি দীর্ঘকালের অবমাননার প্রতিবাদে সদ্যোজাগ্রত অন্তরাত্মা প্রচ্ছন্ন প্রতিশোধ গ্রহণে প্রাণিত করে। নায়িকা চিত্তের বিচিত্র উপলব্ধি মর্মদাহ, জয়াভিলাষ, সংশয়-শঙ্কাবিজড়িত আকুতি প্রভৃতি কী সুন্দর এক আনন্দ-বেদনামুগ্ধ রসপরিণামে পৌঁছে দিয়েছে নাট্যকাহিনীকে। যে সংলাপ এতখানি তৃপ্তিদায়ক তা আয়তনে কিছুটা বড়ো হলেও কখনো অনাট্যিক কিম্বা অবাঞ্ছিত মনে হয় না।

'চণ্ডালিকা'র গঠনশৈলীর আর একটি উপাদান মায়া-দর্পণের ব্যবহার। এতে আধিভৌতিক রহস্যঘন প্রাচীন যুগের আবহটি সমুজ্জ্বল হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রাচীন সাহিত্যে Occult Art-এ Magical Mirror বা মায়াদর্পণের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। প্রাচীন ভারতীয় ও চীনীয় সাহিত্যে এর ব্যবহার সুপ্রতুল। সৈয়দ ইদ্রিশ শাহ-রচিত 'Oriental Magic' গ্রন্থ থেকে চীনীয় সাহিত্যে মায়াদর্পণের ব্যবহার সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য সংস্কারের অনুগামী হয়ে মায়াময় কনকদর্পণের কথা বলেছেন 'সোনারতরী' কাব্যগ্রন্থের 'বিম্ববতী' কবিতায়। চণ্ডালিকায় প্রকৃতির মা এই মায়াদর্পণের সহায়তায় আনন্দকে বশীভূত করে প্রকৃতির কাছে টেনে এনেছেন। বলা বাহুল্য, ভগবান বুদ্ধের মন্ত্রশক্তির প্রভাবে প্রকৃতিজননীর যাদুকরী শক্তি পরাভূত হয়েছে এবং আনন্দও মঠের দিব্যজীবনে ফিরে গেছেন। দানবী শক্তির উপরে দৈবীশক্তির প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হল এই ঘটনায়। নাট্যকৌশল হিসেবে মায়ামুকুরের ব্যবহার চণ্ডালিকার নাট্য আকর্ষণ বাড়িয়েছে সন্দেহ নেই।

১.৩.১০.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'চণ্ডালিকা' নাটকটির গঠা ও নামকরণের সার্থকতা স্পষ্ট করো।

২। অস্পৃশ্য চণ্ডাল কন্যার নারীত্বের জাগরণ এই নাটকে কিভাবে উন্মেচিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে নাটকটির সার্থকতা নিরূপণ করো।

৩। 'চণ্ডালিকা' নাটিকার গঠনশৈলী বিশ্লেষণ করো।

৪। "সংলাপ-বৈচিত্র্যের দ্বারা নাট্যরস সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' তুলনারহিত।"–আলোচনা করো।

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চণ্ডালিকা' নাটিকাটির শ্রেণি নির্ণয় করে ট্র্যাজেডি অথবা কমেডি নাটিকা হিসেবে তার গুরুত্ব আলোচনা করো।

———————

একক - ১২

নাটকের চরিত্র বিচার

বিন্যাসক্রম :

১.৩.১২.১ : প্রকৃতির চিত্তজাগরণে আনন্দের ভূমিকা

১.৩.১২.২ : 'চণ্ডালিকা'র নামকরণ

১.৩.১২.৩ : 'চণ্ডালিকা'য় গান ব্যবহারের প্রাসঙ্গিকতা

১.৩.১২.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.৩.১২.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১.৩.১২.১ : প্রকৃতির চিত্তজাগরণে আনন্দের ভূমিকা

আলোচনা প্রসঙ্গে আগেই বলেছি, 'চণ্ডালিকা'য় চণ্ডালিনী প্রকৃতির চিত্তজাগরণে আনন্দের ভূমিকাই ছিল প্রধান। নাটিকার মধ্যে তাঁর উপস্থিতি নগন্য হলেও নাটিকার বাচ্যধর্ম অতিক্রমী অভিঃব্যঞ্জনা ও গূঢ়ার্থ প্রকাশে তাঁর স্বল্প উপস্থিতি পরমাণু বিভাজনের শক্তি নিয়ে বিকশিত হয়েছে। কেবলমাত্র একটি ক্ষুদ্র বাক্য 'জল দাও' যে এমন করে অস্পৃশ্যা প্রকৃতির অন্তরে তুফান তুলবে তা আগে কে জানত? অথচ বিভাজিত-পরমাণুর মতো সত্যসত্যই প্রকৃতির অন্তরে যে তার দুর্নিবার প্রতিক্রিয়া বেড়েই চলেছে উথাল-পাথাল সাগর তরঙ্গমালার মতো তার রেশ আদ্যন্ত নাট্যপরিবেশটিকে রেখেছে উজ্জীবন্ত ও গতিশীল। নাট্যঘটনা ও নাট্যদ্বন্দ্বের বিস্তারে আনন্দের অনির্দেশ্য উপস্থিতি সমগ্র নাট্যধারা ও নাট্যচেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

'চণ্ডালিকা'র বিশ্লেষণের মানদণ্ড মূলতঃ দুটি—(এক) সাহিত্যসৃষ্টির বা মনস্তত্ত্বের দিক থেকে তার বিশ্লেষণ এবং (দুই) আর্টের দিক থেকে তার বিচার। নাট্যকার যখন 'চণ্ডালিকা'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন তখন প্রকৃতি ও আনন্দের মানসিক সংগ্রামের দিকগুলিকে উজ্জ্বল করে তুলতে কার্পণ্য করেননি। আনন্দ ও প্রকৃতি—এই দুটি চরিত্রকে কেন্দ্র করেই সঞ্চারিত হয়েছে নাটিকার গতি, আভাসিত হয়েছে তার প্রকৃতি। প্রকৃতির 'মানসিক ক্রমবিকাশের পটভূমির' উপর নাটিকাটি গড়ে উঠলেও তাঁর মূল প্রেরণাশক্তি আনন্দই। দৃশ্যভাবে ও অদৃশ্যভাবে তাঁকে কেন্দ্র করেই নাটিকায় পরিণামী সত্যের প্রতিষ্ঠা।

সাহিত্যসৃষ্টির মানদণ্ডে 'চণ্ডালিকা'র বিচারে অগ্রণী হলে দেখা যায় মানুষের আদিম আকর্ষণ — দেহের আকর্ষণী শক্তি যা 'শিবের তপস্যা'কেও টলাতে পারে, যার অপ্রতিরোধ্য যাদুতে 'মুনিগণ ধ্যানভাঙ্গি দেয় পদে তপস্যার ফল।'—প্রকৃতি ও পুরুষের সেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব যে উন্মথিত উদ্বেল করেছিল প্রকৃতির অন্তর তাও আনন্দের কল্যাণেই। তাঁর সংস্পর্শেই প্রেমের সুকল্যাণ মঙ্গলজ্যোতিঃ প্রকৃতির অন্তরকে প্রাণবন্যায় ফেনিল করে তুলেছে। নাটিকার প্রথম দৃশ্যেই এর পরিচয় মেলে। এ সম্পর্কে সমালোচক যথার্থ বলেছেন—"প্রথম দৃশ্যে চণ্ডালিকা সাধারণ মেয়েদের দৈনন্দিন কাজের এবং পথের গতানুগতিক স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। সেখানে তার সখী আছে, মা আছে, কর্ম আছে। সেই পথের জীবনের মধ্যে একদিন তার প্রাণে এসে পৌঁছল কোন্ প্রেমের ডাক, প্রথমে সাড়া দিয়ে উঠল তার দেহ, তার কামনা, তারপর অসীম ছন্দের মধ্য দিয়ে টানাছেঁড়ার অপরিমেয় অভিজ্ঞতার সাধনায় তার মন বিকশিত হল প্রেমের গভীর আনন্দে।...

মূল উপাখ্যানের মধ্যে আনন্দ স্বপ্রকাশ নয়, চণ্ডালিকার মুখের বাণী থেকেই তার দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া যায়।" আনন্দের মানসিক দ্বন্দ্বকে দৃশ্যমান করবার জন্য মায়াদর্পণের ব্যবহারে তারই ছায়া জেগে উঠেছে দর্শকের চোখে। সমালোচক যথার্থই বলেছেন, "আনন্দের যে দ্বন্দ্ব সে চণ্ডালিকার চেয়ে কিছু কম নয়। একদিকে তার সুগভীর জ্ঞানের সাধনা, আর একদিকে তার দেহের কামনা; এই বস্তুজগতের আকর্ষণ জ্ঞানীকেও টেনে আনলে মাটির পৃথিবীতে, কিন্তু অবশেষে মানুষই জিতল। জীবধর্মের আদিমতাকে ছাপিয়ে উঠল তার আত্মার শক্তি।

এই যে প্রকৃতি-পুরুষের স্বভাবের মধ্যে মূলগত বিরুদ্ধতা, চণ্ডালিকার সাহিত্য ও নৃত্যনাট্য সেই মানসিক জটিলতাকে সুর ও তালের ছন্দে প্রকাশ করতে চেয়েছে।" ('চণ্ডালিকা'—প্রতিমা দেবী, প্রবাসী, আশ্বিন-১৩৪৫)। তাই 'চণ্ডালিকা' নাটিকার প্রাণ প্রকৃতি হলেও তার 'প্রাণস্য প্রাণম্'—প্রাণারাম হল আনন্দ, সঞ্জীবনী শক্তিও ঐ পুরুষোত্তম আনন্দ। তাঁকে বাদ দিয়ে অথবা অগোচরে রেখে নাট্যকারের কোনো প্রকার উদ্দেশ্য-অভিপ্রায়ই সিদ্ধ হতো না।

১.৩.১২.২ : 'চণ্ডালিকা'র নামকরণ

চণ্ডালিকা নাটকটি নায়িকা চণ্ডালিকার নিগৃহীত-অনাদৃত জীবনের অভিশাপ থেকে মুক্তির অভিজ্ঞান। নাটকের নামকরণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করেছেন। কখনো ব্যক্তিচরিত্র আশ্রিত শিরোনাম, কখনো ভাবাশ্রিত সংকেতধর্মী শিরোনাম ব্যবহার করেছেন তিনি। 'মালিনী', 'চিত্রাঙ্গদা' প্রভৃতি ব্যক্তিচরিত্রাশ্রিত নাটক যেমন রচনা করেছেন তেমনি তত্ত্ব ও সংকেতধর্মী নাটকও রচনা করেছেন 'রক্তকরবী', 'বিসর্জন', 'রাজা', 'মুক্তধারা', 'ডাকঘর', 'অচলায়তন' প্রভৃতি। 'চণ্ডালিকা' দ্বিতীয় শ্রেণীর নাটিকা। 'চণ্ডালিকা' কোনো বিশেষ নারী চরিত্র নয়। সে যেন নাটিকার নায়িকা চণ্ডালকন্যা প্রকৃতির ভাবরূপ। হাজার হাজার বছরের অবজ্ঞা ও অভিশাপ থেকে আনন্দের আহ্বানে কাঙ্খিত মুক্তি ও সামাজিক মর্যাদা-প্রত্যাশী। সমগ্র চণ্ডাল সমাজের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সত্তারূপেই নাটকের মধ্যে তার আবির্ভাব এবং পরিণামে পরমাত্মীয়া মায়ের মহান আত্মদানের জটিল বন্ধুর পথে তার মুক্তি, তার জয়। প্রকৃতির চণ্ডালিনী সত্তা দ্বন্দ্বের প্রতীক অনামিকা চণ্ডালিকা। চণ্ডালিকার ঘনীভূত নির্যাসই প্রকৃতি অথবা প্রকৃতির ভাবচেতনার ঘনীভূত নির্যাস চণ্ডালিকা। বস্তুতঃ প্রকৃতি ও চণ্ডালিকা অভিন্না। চণ্ডালিকার নৃত্যনাট্য সংস্করণে বিষয়টি আরও পরিষ্কৃত হয়েছে 'ওকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছিঃ। ও যে চণ্ডালিনীর ঝি।' গানটিতে। সুতরাং আপন সমাজের প্রতিনিধিত্বকারিণী প্রকৃতি নাটিকার কেন্দ্রিয় চরিত্র হলেও নাট্যকার তার প্রতীকধর্মী নামটিকেই নাটকের শিরোনাম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। 'চণ্ডালিকা'র স্থলে নাটকটির নামকরণ নানাভাবেই হতে পারত, যেমন 'প্রকৃতি', 'আমি তোমারি মাটির কন্যা', 'জাগরণ', 'মুক্তি' প্রভৃতি অনেক কিছু। সব দিক বিবেচনা করে 'চণ্ডালিকা'—নাট্যকার প্রদত্ত এই নামটিকেই সার্থক বলে মনে হয়।

১.৩.১২.৩ : 'চণ্ডালিকা'য় গান ব্যবহারের প্রাসঙ্গিকতা

রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাশ্রয়ী ও রূপক-সংকেতধর্মী নাটক-নাটিকাগুলিতে গানের ব্যবহার সুলভ। বস্তুত নাটকের ভাববস্তুকে অন্তর্গূঢ় অভিব্যঞ্জনা দানের জন্য গানের বিশিষ্ট ভূমিকা নাট্যমোদী সামাজিকগণের দ্বারা স্বীকৃত ও অভিনন্দিত হয়েছে স্বদেশে ও বিদেশে। স্বয়ং শেক্সপীয়ারের নাটক-নাটিকাগুলি এর সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'চণ্ডালিকা'য় নাট্যকার বেশ কয়েকটি গান ব্যবহার করেছেন সচেতনভাবেই। গদ্যভাষার সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেই 'অর্থের বন্ধন থেকে' 'ভাবের স্বাধীন লোকে' চিত্তকে মুক্তি দেবার অভিপ্রায়েই

তিনি গান সংযোজন করেছেন 'চণ্ডালিকা'য়। তাতে স্বপ্নকুহেলিতে আচ্ছন্ন প্রকৃতির চিত্তলোকে সমুদ্রতরঙ্গের বিভোক্ষ-চঞ্চলতার মতো বহুকালের চাপিয়ে দেওয়া সংস্কারের বিরুদ্ধে দৃপ্ত আবেগ যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি প্রকাশিত হয়েছে নবজাগ্রত চিত্তের বাঁধভাঙ্গা আনন্দ-উল্লাস। তার চিত্র সংস্কার-মুক্তির আনন্দে, মানবিক বোধের অন্তরঙ্গ উদ্বোধে 'তাতা থৈ থৈ' করে নেচে উঠেছে। 'যে আমারে দিয়েছে ডাক, দিয়েছে ডাক,' 'বলে দাও জল, দাও জল।' 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা', 'ফুল বলে, ধন্য আমি মাটির পরে', 'ওগো, তোমার চক্ষু দিয়ে মেলে সত্য দৃষ্টি', 'না না, ডাকব না, ডাকব না অমন করে বাইরে থেকে,' 'আমি তারেই জানি তারেই জানি', 'হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু', 'আমি তোমারি মাটির কন্যা, জননী বসুন্ধরা' প্রভৃতি একগুচ্ছ সুখ্যাত গানের প্রয়োগ একাধারে নাট্যবিষয়ের আবহ ও অনুক্রমজাত পরিস্থিতিকে (Sequence) এবং নায়িকা-মনের সুদৃঢ় প্রত্যয় ও আনন্দের প্রতি অনুরাগদীপ্ত রূপটিকে সুন্দর ভাবে প্রকাশে সক্ষম হয়েছে। দর্শক-শ্রোতার মন ঐ সকল সংগীত-অভিনয়ের রম্যবোধে বস্তুনিষ্ঠ নাট্যরসের অতিরিক্ত ভাবের অমরাবতী স্পর্শ করেছে। 'চণ্ডালিকা' নাটিকায় সংগীত সংযোজনের সার্থকতা ও প্রাসঙ্গিকতা এখানেই।

১.৩.১২.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। অবদান সাহিত্যের মূল গল্প, রাজেন্দ্রলাল মিত্র বর্ণিত তার ইংরেজী অনুবাদ ও রবীন্দ্রসৃষ্ট 'চণ্ডালিকা' নাটিকার মধ্যে আঙ্গিকগত একটি তৌল বিশ্লেষণ উপস্থাপন করো।

২। নাট্যরসের বিচারে 'চণ্ডালিকা'কে মেলোড্রামা বলা যায় কি? — তোমার মতামত দাও।

৩। অস্পৃশ্য চণ্ডালকন্যা প্রকৃতির কাছে তৃষ্ণার্ত আনন্দের জলপ্রার্থনা কিভাবে প্রকৃতির প্রেম ও আত্মমর্যাদা বোধকে উস্কে দিয়ে তাকে 'নূতন জন্ম' দান করেছে তা নাটিকার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও।

৪। প্রকৃতির চিত্তজাগরণে আনন্দের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

৫। উদ্দেশ্যপ্রবণতা, কাব্যধর্মিতা ও গানের ব্যবহার 'চণ্ডালিকা'র নাট্যধর্ম ক্ষুণ্ণ করেছে কিনা তা আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট করো।

১.৩.১২.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। 'চণ্ডালিকা'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২। অবদান সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ ('রত্নাবলী'—প্রকাশিত ২য় সং)—ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক।

৩। রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় - প্রকাশিত ২য় সং)—ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক।

৪। রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য-প্রবেশক (বিশ্বভারতী, ৪র্থ সং)—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

৫। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (৩য় সং)—ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৬। বাংলা নাটকের ইতিহাস (পরিবর্ধিত ষষ্ঠ সং)—ড. অজিতকুমার ঘোষ।

৭। রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা (২য় সং)—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

৮। রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ—প্রমথনাথ বিশী।

৯। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (পুরাতন চতুর্থ খণ্ড, বর্তমান পঞ্চম খণ্ড)—ড. সুকুমার সেন।

১০। রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা (২য় সং, ১৩৮২)—শ্রী অশোক সেন।

১১। The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal (The Asiatic Society of Bengal, Calcutta-1882)—Dr. Rajendralal Mitra.

১২। Avadna Sataka (Buddhist Sanskrit Texts, No. 19, Mithila Institute, Darbhanga) Ed—Dr. P. L. Vaidya.

১৩। Divyavandana (Do. 1959, Texts No. 20) Ed—Dr. P. L. Vaidya.

১৪। A History of Indian Literature (Vol-II)—M. Winternitz.

১৫। World Drama—Allardyce Nicoll.

১৬। Aristotle On the Art of Poetry : Translated by Ingram Bywater.

১৭। Selected Essays—T. S. Eliot.

প্রথম পত্র

পর্যায়গ্রন্থ - ৪

ছেঁড়া তার ঞ্জ তুলসী লাহিড়ী

একক - ১৩

গণনাট্য আন্দোলন এবং তুলসী লাহিড়ী

বিন্যাসক্রম :

১.৪.১৩.১ : ভূমিকা

১.৪.১৩.২ : তুলসী লাহিড়ীর অন্যান্য নাটক

১.৪.১৩.৩ : প্রসঙ্গ : তুলসী লাহিড়ীর সংক্ষিপ্ত জীবন পরিক্রমা

১.৪.১৩.৪ : গণনাট্য আন্দোলন এবং তুলসী লাহিড়ী

১.৪.১৩.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.৪.১৩.১ : ভূমিকা

'সমাজের এই অবস্থায় তার জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে বাস্তবধর্মী নাটকের প্রয়োজন খুব বেশি। দিশেহারা মানুষকে আশার আলো দেখান, তার দোষত্রুটি সহানুভূতির সঙ্গে দেখিয়ে দিয়ে তার সংশোধনের উপায় দেখান, তার পশুত্বের খেয়োখেয়িতে অবসন্ন মনে মনুষ্যত্বকে উদ্বুদ্ধ করে সব দুঃখ-কষ্ট-লাঞ্ছনা-যাতনা সহ্য করার সঙ্কল্প এনে দেওয়া আজ অত্যন্ত প্রয়োজন, কিন্তু যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সংস্কৃতিহীন স্বার্থপর সমাজদ্রোহীদের হাতে অর্থ গিয়ে পড়ায় পোড়া পেটের জন্য বহু চিন্তাশীল শিল্পীকেও ব্যভিচার করে উদরান্ন সংগ্রহ করতে হচ্ছে। এই যুগের এই নৈতিক যুদ্ধে বোড়ার দু-দিকে দু-পা রেখে দাঁড়িয়ে থাকার উপায় নেই। প্রত্যেক চিন্তাশীলকে এদিক ওদিক একটা কিছু বেছে নিতেই হবে এবং যার হাতে যা অস্ত্র আছে তাই দিয়েই যুদ্ধ করতে হবে।'

কথাগুলি বাংলার অন্যতম নাট্যব্যক্তিত্ব তুলসী লাহিড়ীর (১৮৯৭-১৯৫৯)। তুলসী লাহিড়ী অর্থাৎ তুলসীদাস লাহিড়ী বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে সংগঠিত উল্লেখযোগ্য গণনাট্য ও নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম ঋত্বিকও। নাট্যকার ও অভিনেতা তুলসী লাহিড়ীর আত্মোপলব্ধির সমকালীন বাক্যবিন্যাস উপরের অংশটি। শুধু নাট্য আন্দোলনের সঙ্গেই তাঁর সংযোগ ছিল না, তিনি একাধারে গীতিকার সুরকার এবং চলচ্চিত্রকারও। ১৯২৯-এ ওস্তাদ জমীরুদ্দীন খাঁ তুলসী লাহিড়ীর লেখা দুটি গান রেকর্ড করেন হিজ্ মাস্টার ভয়েস কোম্পানীতে। প্রথম যৌবনে গান লেখা শুরু করলেও গীতিকার রূপে তুলসী লাহিড়ীর প্রতিষ্ঠা তারপর থেকেই। শুধু গান লিখেই তিনি ক্ষান্ত হননি, সুরারোপও করেছেন। সুরকার তুলসী লাহিড়ীর আত্মপ্রকাশ, ১৯৩১-এ আর্ট থিয়েটারে 'স্বয়ংবরা' নাটকে সুর সংযোজনার মধ্য দিয়ে। 'পোষ্যপুত্র' ও 'মন্দির' নাটকেও সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব তিনিই নিয়েছিলেন।

নাটকে পেশাদারী মঞ্চে তাঁর অভিনেতা জীবন শুরু ১৯৩১-এ। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' নাটকে চন্দ্রবাবুর চরিত্রে অভিনয় করেন। অভিনয় শিক্ষাও প্রথম যৌবনে স্বভূমি রঙপুরে, তারাপ্রসন্ন সান্যালের কাছে। চলচ্চিত্র নির্মাণেও তিনি তৎপর হয়েছিলেন। চলচ্চিত্রকার রূপে আমরা তাঁকে পেয়েছি ১৯৩২-এ। নিজের রচিত কাহিনী—'যমুনা-পুলিন' নিয়েই তিনি প্রথম সবাক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। অস্থিরতার সুতোয় তাঁর কর্মজীবন ছিল বাঁধা। ফলে সিনেমার জগতে বা গ্রামোফোন কোম্পানীতে রেকর্ডের জন্য গান লেখা অথবা পেশাদারী নাটকে অভিনয়, সংগীত পরিচালনা—এসব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতানৈক্য দেখা দেওয়ায়। সর্বোপরি তাঁর স্বাধীন চিন্তাভাবনাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। ১৯৪১-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন তুঙ্গে তখন তিনি ফিরে গেলেন রঙপুর সংলগ্ন জলপাইগুড়ি জেলায়। ১৫০ বিঘা নাবাল ধানী জমি এবং ৬০ বিঘা উঁচু জমি কিনে চাষবাসে তিনি মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে তিনি গ্রামবাংলার বিশেষত উত্তরবঙ্গের দারিদ্রপীড়িত অত্যাচারিত কৃষকদের খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। গরীব-দুঃখী নানাভাবে, নানা কারণে বিপর্যস্ত কৃষক সমাজকে নিয়ে তুলসী লিখলেন 'দুঃখীর ইমান' (১৯৪৩) নাটকটি। খানিকটা প্রকৃতির উষ্মায় আর বাকিটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৈনিকদের অতিরিক্ত খাদ্য সংগ্রহের কারণে, বাংলাদেশে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে দেখা দিয়েছিল পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৩৫০ বঙ্গাব্দ)। এরই প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছিল তার সাড়া জাগানো নাটক—'ছেঁড়া তার' (প্রথম নাম দেওয়া হয়েছিল, 'ছিন্ন তার')।

মন্বন্তরকে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। শুধু তাই নয় শরীরী অনুভবেও তা ধরা পড়েছিল। প্রত্যক্ষ সেই অনুভবের নাটক 'ছেঁড়া তার'। 'ছেঁড়া তার' নাটকের জন্ম সম্পর্কে জরুরী তথ্য—'বহুরূপী'র ঘরোয়া এক সান্ধ্য আলোচনায় (পার্কসার্কাসে শম্ভু মিত্রের ভাড়া বাড়িতে) মন্বন্তরের অভিজ্ঞতা থেকে যে বাস্তব কাহিনী শোনান তুলসী লাহিড়ী তা উপস্থিত সকলকে বিমোহিত করে। সকলেই সংশ্লিষ্ট কাহিনী নিয়ে তুলসী লাহিড়ীকে নাটক লিখতে অনুরোধ জানান। 'বহুরূপী'র অন্যতম প্রাণপুরুষ শম্ভু মিত্র বলেন ঃ 'এই তো নাটক পেয়েছি। আপনি এই নিয়েই লিখে দিন আমাদের নাটক।' জন্ম নিল "ছিন্ন তার"। দেশভাগজনিত দাঙ্গার বীভৎসতা তুলসীদাস ভুলতে পারেন না বলে, মুসলমান চরিত্রদের নিয়ে লিখতে তিনি বিমূঢ়—বিভ্রান্ত, দ্বিধাগ্রস্তও তখন তৃপ্তি ভাদুড়ী (পরে মিত্র)'র বিশেষ অনুরোধে লেখেন নাটক ওই 'ছিন্ন তাঁর' নামেই। অভিনয়ের সময় (১৯৫০) নাম পরিবর্তিত হয়ে হয়—'ছেঁড়া তার'।

১.৪.১৩.২ : তুলসী লাহিড়ীর অন্যান্য নাটক

ছেঁড়া তার (১৯৫০), ব্যতীত তুলসী লাহিড়ী রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল —

(ক) **পূর্ণাঙ্গ ঃ** দুঃখীর ইমান, বাংলার মাটি, লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার, মায়ের দাবি, এইযুগ, ঝড়ের মিলন, চাষী, ভিত্তি, পথিক, পরীক্ষা ইত্যাদি।

(খ) **একাংক ঃ** নববর্ষ, নায়ক, গ্রীনরুম, ওলটপালট, মণিকাঞ্চন, চৌর্যানন্দ, দেবী, ঘরেফেরা ইত্যাদি।

(গ) **অন্যান্য ঃ** পূর্ণাঙ্গ নয়, অবলা পরিসরে তদন্ত, বেইমান, শিল্পীর আত্মহত্যা, জয়মঙ্গল, মায়াকাজল, একটি কথা ইত্যাদি।

আকাশবাণী, কলকাতা কেন্দ্রে তিনি নাট্যকাররূপে যোগ দিয়েছিলেন। আসলে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে তুলসী লাহিড়ী সংগীত পরিচালনার কাজ করেন। এই কাজে দানীবাবু (সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, গিরিশচন্দ্রের পুত্র) তাঁকে বিশেষভাবে আহ্বান জানান এবং অনুপ্রাণিত করেন। আর্ট থিয়েটারে কনসার্ট বাজানোর মধ্য দিয়েই তার সংগীত পরিচালকের ভূমিকায় ক্রমে অবতীর্ণ হওয়া।

এসরাজ (‘দিলরুবা’ নামে ‘ছেঁড়া তার’ নাটকে এই তার যন্ত্রটির কথা উঠে এসেছে) তাঁর প্রিয় বাজনা। ভালো বাজাতেন। নাটকের আবহসুরে ধরা পড়েছে সেই এসরাজের সুর। ‘ছেঁড়া তার’ নাটকের মহিম এবং রহিমুদ্দিনের জীবনের সংগীতের প্রতি গভীর ভালোবাসার পটে আছে—এই বিশেষ যন্ত্রশিল্পটি। শচীন সেনগুপ্তের ‘স্বামী-স্ত্রী’ নাটকে এরই সাহায্যে আবহসংগীত সৃষ্টিতে তুলসী লাহিড়ী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

নাটক রচনা করে আকাশবাণীর নাট্যপ্রচারের প্রবাহে তিনি যেমন গতি সঞ্চার করেছিলেন, তেমনি গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন ধারার নাটক লিখতে প্রাণিত হয়েছিলেন। সেই নাটকগুলির অন্যতম ‘ছেঁড়া তার’, ‘পথিক’। এই নাটকগুলিতে বিভিন্ন সময়ে তিনি অভিনয়ও করেছেন। গণনাট্য আন্দোলন থেকে বিভঙ্গ, অবশ্যই তার প্রভাব, উদ্ভুত নবনাট্য আন্দোলন অর্থাৎ গ্রুপ থিয়েটার-এ যোগদান। ‘বহুরূপী’-র পর ‘আনন্দম’ ‘রূপকার’-এর প্রয়োজনায় তাঁর রচিত নাটকগুলির অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতা রূপেও আত্মভরপুর তুলসীদাসের সঙ্গে দর্শকদের দেখা হলো। আমৃত্যু এই নাট্য আন্দোলন থেকে তিনি আর বিচ্ছিন্ন হননি।

১.৪.১৩.৩ : প্রসঙ্গ : তুলসী লাহিড়ীর সংক্ষিপ্ত জীবন পরিক্রমা

তুলসী লাহিড়ী (০৪.০৪.১৮৯৭—২২.০৬.১৯৫৯) বর্তমান বাংলাদেশ অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ববঙ্গের রঙপুর জেলার, গাইবান্দা সাব ডিভিসনের নলডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী। তুলসীর প্রকৃত নাম — হেমচন্দ্র। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় তিনি স্কুল থেকে বিতাড়িত হন। পারিবারিক কৃষ্ণভক্তির সূত্রে তুলসীদাস নাম নিয়ে তিনি আবার নতুন উৎসাহ-উদ্যমে শুরু করেন বাকি ছাত্রজীবন। স্কুলের পর ইন্টারমিডিয়েট (I.A) কোর্সের পাঠ নিয়েছিলেন তুলসীদাস। বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি কলকাতায় উচ্চশিক্ষার (B.A) জন্যে চলে আসেন। কোচবিহারে ভিক্টোরিয়া কলেজ (বর্তমানে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সরকারী কলেজ) থেকে বি.এ. পাশ করেন। আইন পাশ করেন কলকাতার রিপন কলেজ (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) থেকে। পারিবারিক পরিধির দিকে দৃষ্টি ফেরালে আমরা দেখব — তাঁর পিতার নাম — সুরেন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন রঙপুরের ডিমলা এস্টেটের ম্যানেজার। কর্নেট বাজনায় সুরেন্দ্রনাথের দক্ষতা সুবিদিত। পিতামহ শিবচন্দ্র কোচবিহার রাজার উচ্চ পর্যায়ের কর্মচারী ছিলেন। তুলসীর সংগীত শিক্ষায় পিতা ও পিতামহের প্রভাব অপরিসীম। পিতামহ এবং কোচবিহারের রাজসভার নর্তকী—সংগীতজ্ঞা তারাবাঈ-এর কাছে তুলসীর সংগীত শিক্ষা। তারাবাঈ-এর উৎসাহে তুলসী মরিস কলেজ থেকে সংগীত শিক্ষা করেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে আইন ব্যবসা শুরু করেন তুলসী। তবে তিনি আইনের জগতে বেশি দিন ছিলেন না। শিল্প-সংস্কৃতি মনের মধ্যে স্থায়ী আসন করে নিলে সম্ভব হয় না ঐ কালো কোর্ট গায়ে আদালত চত্বরে নিয়মিত প্রবেশ এবং প্রস্থান। অন্যতম বন্ধু বিমল গুপ্তের অনুরোধে তুলসী উকিলের গাউন, আইনের বই, আদালত চত্বর পাকাপাকিভাবে ছেড়ে সংগীতচর্চায় মন দিয়েছিলেন। তাঁদের পরিবার ছিল অনেকটাই সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্যে লালিত।

সঙ্গীতজ্ঞরূপে তুলসী লাহিড়ীর প্রতিষ্ঠা সর্বজনবিদিত। তিনি মেগাফোন এবং হিজ্ মাস্টারস্ ভয়েস (এইচ.এম.ভি) কোম্পানীতে সংগীত পরিচালকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, পাশাপাশি গীতিকার তুলসী লাহিড়ীর খ্যাতি সঙ্গীত মহলে দারুণভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। কমলা ঝরিয়া, মাণিকমালা, ইন্দুবালা, আঙুরবালা, আশ্চর্যময়ী দাসী, নজরুল ইসলাম প্রমুখ তুলসীর রচিত গান সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে রেকর্ড করেন।

তিনি চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছিলেন সব মিলিয়ে এগারো। শিল্প সাধনার এইসব প্রবাহের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও তারা যে পরিচয়টি শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য বিস্তার করেছে তা হল নাট্যকার এবং নাট্যাভিনেতা। ভারতীয় গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা বিশিষ্ট অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ গড়ে ওঠার সূত্রে, তিনি ভারতীয় গণনাট্য সংঘে যোগ দেন এবং একসময়ে সভাপতিও হন। গণনাট্য আন্দোলন যখন দ্বিখণ্ডিত হয়ে নবনাট্য আন্দোলনের জন্ম হল সেই সময় তিনি শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য্য, গঙ্গাপদ বসু প্রমুখের সঙ্গে "বহুরূপী" নাট্যগোষ্ঠির সঙ্গে যুক্ত হন। (প্রথম অবস্থায় নাম ছিল - অশোক মজুমদারের থিয়েটার)। ১৯৪৮-এর ১ মে রেলওয়ে ম্যানসনে (বর্তমানে সুভাষ মঞ্চ) বহুরূপীর পথ চলা শুরু হয় তুলসী লাহিড়ী রচিত এবং অভিনীত 'পথিক' - নাটকের মধ্য দিয়ে। সর্বজনবিদিত তাঁর রচিত 'ছেঁড়া তার' নাটকটি নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। বহুরূপীর সঙ্গে কিছুদিন যুক্ত থাকার পর মনোমালিন্যে সবিতাব্রত দত্ত ও তিনি বহুরূপী থেকে বেরিয়ে প্রথমে 'আনন্দম' ও পরে 'রূপকার' নাট্যসংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২২ জুন তাঁর মৃত্যু হয় যকৃতের অসুখে।

১.৪.১৩.৪ : গণনাট্য আন্দোলন এবং তুলসী লাহিড়ী

'ছেঁড়া তার' বাংলা নাট্য আন্দোলনের অন্যতম মাইলস্টোন। বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন নাটকের পর ছেঁড়া তার'-ই নাট্য আন্দোলনের বক্তব্য-বৈশিষ্ট্য এবং উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে তুলেছিল। 'নবান্ন' নাটকটি যেমন গণনাট্য এবং নবনাট্য — দুই আন্দোলনের ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে 'ছেঁড়া তার' নবনাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রেই সীমাসংহত করেছে। আসলে, বাংলাদেশের নির্যাতিত কৃষক-কৃষিজীবী মানুষদের কথা মধুসূদন এবং দীনবন্ধু তাঁদের প্রহসন এবং নাটকে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ্বেই তুলে ধরে, যে প্রতিবাদ- প্রতিরোধের ভাষাকে উচ্চকিত করেছিলেন তারই শিল্পী, উত্তরাধিকারের দায়িত্ব বহন করেছে 'নবান্ন', 'দুঃখীর ইনাম', 'ছেঁড়া তার'।

প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ এবং ফ্যাসিস্ট বিরোধীদের সক্রিয় উত্তরসূরীরাই ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (I.P.T.A) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে। এই প্রতিষ্ঠা নেপথ্যে তৎকালীন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির (C.P.I.) প্রভাব ছিল যথেষ্ট। ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক শিল্পীসঙ্ঘ এবং ইয়ুথ কালচারাল ইন্স্টিটিউট (Y.C.I)—তৎকালীন এই দুটি ফ্রন্ট প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক শক্তি ও সামর্থ্যে ভারতীয় গণনাট্য সংঘকে পরিপুষ্ট করেছিল। গণনাট্যের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাম্যবাদী, সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রচার করা—একক সংগীত, সম্মেলক সঙ্গীত, আবৃত্তি এবং নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে। একদিকে পরাধীন দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচন, অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে ঘনিয়ে আসা নাৎসী-ফ্যাসিস্ট শক্তির নিষ্করুণ অত্যাচার অনাচারের, পাশাপাশি পঞ্চাশের মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে বহু মানুষের দুঃসহ যন্ত্রণা, বিপর্যয়, মৃত্যুর মাঝে কালোবাজারী মজুতদার তথাকথিত জোতদার, জমিদারদের অত্যাচার—এইসবের বিরুদ্ধে ধিক্কার প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলাই ছিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘের লক্ষ্য। গণনাট্য সংঘ সাধারণ মানুষকে বিশেষ করে শোষিত অত্যাচারিত গ্রামীণ মানুষকে সচেতন করে তোলার জন্য শহরতলি তথা গ্রামে-গ্রামান্তরে অভিনয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। গণনাট্য সংঘের বক্তব্যকে তুলে ধরার জন্যই নতুন করে নাটক লেখা হয়েছিল। বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন', 'জবানবন্দী', 'নবান্ন', 'দেবীগর্জন', 'গোত্রান্তর', ও 'মরাচাঁদ'—এই নাটকগুলি তারই ফলশ্রুতি। তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান', 'ছেঁড়া তার', 'পথিক' — একই গোত্রের।

গণনাট্য সংঘ নাটক লেখা ও নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে যে শর্তগুলিকে প্রাধান্য দিয়েছিল, তা হল —

(ক) কৃষিজীবী-শ্রমজীবী মানুষজনদের নিয়েই নাটক রচনা করতে হবে।

(খ) অত্যাচার-অনাচার-অবিচারের দিকটিকে তুলে ধরতে হবে।

(গ) একইসঙ্গে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ব্যাপারটিকেও প্রাধান্য দিতে হবে।

(ঘ) কোনোরকম যৌনতা বা অশ্লীলতার প্রদর্শন থাকবে না।

(ঙ) প্রথাগত নাটকের মতো নায়ক-নায়িকা চরিত্রের প্রাধান্য সুচিত হবে না, এ জাতীয় নাটকে। 'সংশ্লিষ্ট' নাটকে গণচরিত্রই প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে।

(চ) সমবেত অভিনয়ের মধ্যে নাট্য বক্তব্য ফুটিয়ে তুলতে হবে। যাতে গণচেতনার উন্মেষ ঘটে।

(ছ) খুব কম খরচে সাধারণ মাপে, দৃশ্যসজ্জা, আলোকসজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ, অন্যান্য সাজসজ্জার ব্যবস্থা করতে হবে।

(জ) নাটকের শেষে অত্যাচারিত, পীড়িত, শোষিত জনগণের জয় ঘোষিত হবে ইতিহাসের কার্যকারণ সম্পর্কের সূত্রে।

এই শর্ত বা বৈশিষ্ট্যগুলি গণনাট্য আন্দোলনের অধিকাংশ নাটক এবং অভিনয়ে আমরা প্রতিফলিত হতে দেখি। এরই আলোকে আমরা 'ছেঁড়া তার' নাটকটি বিচার করব।

১.৪.১৩.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর কিভাবে 'ছেঁড়া তার' নাটকে উঠে এসেছে তা আলোচনা করো।

২। 'ছেঁড়া তার' নাটকের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা করে নাটকের শিরোনামটি সার্থক হয়েছে কিনা বলো।

৩। গণনাট্যের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করে 'ছেঁড়া তার' নাটকে তা কতটা অনুসৃত হয়েছে দেখাও।

৪। 'ছেঁড়া তার' নাটকটিকে ট্রাজেডি নাটক বলা যায় কিনা আলোচনা করো।

——————

একক - ১৪

‘ছেঁড়া তার’ নাটকের পটভূমি

বিন্যাসক্রম :

১.৪.১৪.১ : ‘ছেঁড়া তার’ নাটকের পটভূমি
১.৪.১৪.২ : ‘ছেঁড়া তার’ নাটকে সংগীতের ভূমিকা
১.৪.১৪.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.৪.১৪.১ : ‘ছেঁড়া তার’ নাটকের পটভূমি

মোট তিনটি অঙ্ক, নয়টি দৃশ্যে বিভাজিত ‘ছেঁড়া তার’ নাটকের নাট্য কাহিনীতে দুটি বিষয় প্রাধান্য লাভ করেছে। একটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জনিত পরিস্থিতি, দ্বিতীয়ত, সেই পরিস্থিতিকে সামাল দিতে খানিকটা মানুষের বাকিটা প্রকৃতির কারণে সৃষ্ট মন্বন্তর। ‘নবান্ন’ নাটকের বিষয়ও ছিল একই। আমরা জানি, মিত্রশক্তি (আমেরিকার রুজভেল্টের নেতৃত্বধীন) ও অক্ষশক্তির (জার্মানীর হিটলারের নেতৃত্বাধীন) — মধ্যে চলা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কঠিন দিনগুলির উত্তাপ বাংলাদেশের কৃষিজীবী মানুষদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলাদেশে যে সব ইংরেজ-মার্কিন সৈন্যরা মিত্রশক্তির হয়ে লড়াই করছিল, তাদের দীর্ঘদিনের রসদ-খাদ্য সম্ভার মজুত করার জন্য স্থানীয় প্রশাসন চাষীর ঘর থেকে অধিকাংশ ধান-চাল ইত্যাদি সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছিল। সময়টা ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ। ওই বছরই প্রচণ্ড খরার কারণে নির্ধারিত ফসল ফলল না। এই দুই কারণে কৃষকের ঘর হলো ফসল শূন্য। গরু-লাঙল বাড়ির অন্যান্য জিনিস বিক্রি করে অতিরিক্ত পয়সায় খাদ্যসামগ্রী কিনে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করার সামর্থ্যও তাদের ছিল না। বাধ্য হয়ে জোতদার-মজুতদারদের কাছ থেকে অতিরিক্ত দামে ফসল সংগ্রহ করে বহু মানুষ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ল। অনেকে সরকারী লঙ্গরখানায় আশ্রয় নিল। বাকীরা গ্রাম ছেড়ে কলকাতা শহরে চলে এল উচ্ছিষ্ট খাবারটুকু কুকুরের সঙ্গে লড়াই করে সংগ্রহের চেষ্টায় অথবা, দোরে দোরে ফ্যান ভিক্ষা করে ফিরল। চরম-কষ্ট, যন্ত্রণা বিপর্যয়, বিপন্নতার মধ্যে প্রায় লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু হল। গৃহপালিত পশুদের মৃত্যুর হিসেব আর কেউ রাখার প্রয়োজন বোধ করল না। বছর ঘুরে যাবার পরে অহল্যাভূমি আবার স্বাভাবিক জলবায়ুর স্পর্শে সজীব, সতেজ হয়ে উঠল। প্রচুর ফসল ফলল, কিন্তু খাবার লোক নেই—তাদের অনেকেই তখন ইহলোক ছেড়ে পরলোক গমন করেছে, ‘ছেঁড়া তার’ নাটকের পটভূমিতে আছে এই কাহিনী। পুরুষানুক্রমিক কৃষক রহিমুদ্দি এই কাহিনীর প্রধান চরিত্র। সে পড়াশুনোর সুযোগ পায়নি ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও। জোতদার-মজুতদার-মহাজন হাকিমুদ্দির চক্রান্তে তাঁর পিতা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ায় সেই ঋণশোধের দায়িত্ব বর্তেছে রহিমুদ্দির উপর। ছোটবেলা থেকেই চাষবাসের কাজে সে মন দিয়েছে, স্কুলে যাবার পথটিকে দূরে সরিয়ে। তার পিতার মক্কায় হজ করতে যাবার প্রসঙ্গটি হাকিমুদ্দি চক্রান্তের অঙ্গীভূত। এই নাটকে ধর্মকেন্দ্রিক কুসংস্কার প্রাধান্য বিস্তার করেছে। তারই সুযোগ নিয়েছে মহাজন-মজুতদার তথা শোষক-প্রবঞ্চকেরা। রহিমুদ্দির পিতার মতো তার স্ত্রীও এর শিকার হয়েছে।

১.৪.১৪.২ : ‘ছেঁড়া তার’ নাটকে সংগীতের ভূমিকা

নাটকে সবমিলিয়ে সাতটি গান আছে। ছটি পুরো, একটি অপূর্ণ বা মূল গানের ভগ্নাংশ। এই গানগুলি সংযোজিত হয়েছে যথাক্রমে—প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে (তিনটি), প্রথম অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে

(দুটি), দ্বিতীয় অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে (একটি) তৃতীয় অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে (একটি)। নাট্যকারের গীতিকার -সুরকার সত্তার প্রকাশ ঘটেছে স্বাভাবিকভাবেই।

প্রথম গানটি রহিমুদ্দির ছোটবেলার বন্ধু মহিমের মেয়ে মায়ার কণ্ঠে সংযোজিত। নাট্যকার নিজেই জানিয়েছেন - 'বাজার চলতি আধুনিক গান' এটি। তবে এই সংযোজন অকারণ নয়। গ্রাম থেকে প্রয়োজনে জেলা শহরে এসে, রহিমুদ্দি ছোটবেলার বন্ধু মহিমের বাড়িতে, মহিমের সঙ্গে দেখা করতে এলে এই গানটি মায়া হারমোনিয়াম বাজিয়ে গায়। বাল্যবন্ধু মহিম শিক্ষাদীক্ষার মধ্য দিয়ে উচ্চ সরকারী কর্মী নাটকে, (বর্তমানে Dputy Director of Agriculture), আর শিক্ষার অভাবে রহিমুদ্দি সেই 'চাষার ছেলে চাষা'। স্বভাবতই জীবনের চলার ছন্দ-পথ-মত সবই যেন ভুলে ভরা। সেই কথাই এই গানে প্রতিফলিত।

দ্বিতীয়টি গানের ভগ্নাংশ। রহিমুদ্দি আর্থিক-সামাজিক দিক থেকে সমপর্যায়ের পিতৃ-মাতৃহীন ফুলজানকে বিবাহ করে সুখী। ধনী-অভিজাত পরিবারের কন্যার দিকে হাত না বাড়িয়ে, ফুলজান-বসিরকে নিয়ে দাম্পত্য জীবনের সুখের ছবিটি এই গানে বর্ণিত। পরের গানটি (৩য়) মহিমের গাওয়া। রোমান্সের আবেশে জীবনের দার্শনিক অনুভূতি এই গানে উচ্চকিত। উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গানের প্রভাবও লক্ষণীয়।

সাধারণ গ্রামবাসী প্রতিবাদী গোবিন্দ (জাম্বুবান) ঢাক-ঢোল বাজিয়ে পাঁচালীর সুরে চতুর্থ গানটি গেয়েছে, গ্রামের পথে। দীর্ঘ এই গানে গ্রামবাংলার নানা দুঃখ দুর্দশার চিত্র ধরা আছে। সেইসঙ্গে হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি এবং 'দাড়িওয়ালা' মৌলবী ও 'টিকিধারী' পুরোহিতদের দৌরাত্ম্য এবং ভিন্ন পথে সামাজিক শোষণের বিষয়টিও বর্ণিত হয়েছে এই গানটির মধ্যে। পঞ্চম গানটি অব্যবহিত পরেই আছে। রহিমুদ্দির কণ্ঠে দীর্ঘ গানটি আমরা শুনেছি। এই গানে রূপকার্থে অত্যাচারী হাকিমুদ্দির স্বরূপটি তুলে ধরা হয়েছে। স্বপ্নে মৃত্যুর পর কবর থেকে উঠে পরলোকে অন্যান্যদের সঙ্গে মহাশক্তিশালী আল্লাতালার মুখোমুখিতে রহিমুদ্দির বিচারে হাকিমুদ্দি বেকসুর মুক্ত হতে দেখে বিস্মিত হয়। স্বপ্নভঙ্গে সে সত্যকে উপলব্ধি করে—'আসল বিচার আছে বাকি।' ষষ্ঠও গানটি গেয়েছে রহিমুদ্দির অনুগামী, প্রতিবাদী গণচরিত্র সেই গোবিন্দ। মন্বন্তরজনিত পরিস্থিতিতে ক্ষুধার জ্বালা যেমন তীব্র হয়েছিল, তেমনি ক্ষুধা নিবৃত্তির অভাবও পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেই দুঃসহ উপলব্ধিতে অনুভব বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে ষষ্ঠ গানে। 'প্যাটে' জ্বালা জুড়াতে পারে, তা শরীর থেকে বাদ দেওয়ার মধ্য দিয়ে। গায়ক গোবিন্দের এই চরম অনুভবের কথাই ছোট গানটিতে ধ্বনিত হয়েছে। শেষ গানটি মন্বন্তর উত্তর পরিস্থিতিতে গোবিন্দ গেয়েছে। দীর্ঘ এই গানে মন্বন্তরে গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষজনের দুঃখ-দুর্দশা-বিপর্যয় কতটা আকাশছোঁয়া হয়েছিল তা ধরা পড়েছে। গানটি কোরাসে অর্থাৎ সমবেতভাবে গাওয়া হলে আরো আকর্ষণীয় হতো। মন্বন্তরে নাকাল, বেঁচে যাওয়া মানুষেরা একদিকে তিক্ত অভিজ্ঞতা, চরম পরিণতি, অহরহ মৃত্যুর বিভীষিকা, অন্যদিকে মজুতদার-জোতদার-শোষকদের স্বরূপ, সমস্বরে তুলে ধরতো (যা গোবিন্দ একা তুলে ধরেছে তার পরিবর্তে) তা'হলে সংশ্লিষ্ট গানের সার্থক সংযোজন হতো—একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। গানের সঙ্গে সঙ্গে তাল, বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারের উল্লেখ সংগীতজ্ঞ তুলসীর পরিচয়কে উজ্জ্বল করে।

১.৪.১৪.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' নাটকের শিরোনামটি নাটকের অভিপ্রেত ভাব-ব্যঞ্জনার প্রকাশে কতখানি সফল হয়েছে তা নাটকের ভাব ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও।

২। 'ছেঁড়া তার' নাটকের গঠনশৈলী বিচার করো।

৩। 'ছেঁড়া তার' নাটকে সংযোজিত গানগুলির ভূমিকা নিরূপণ করো।

৪। 'ছেঁড়া তার' নাটক অবলম্বনে মন্বন্তরের ভয়াবহ চিত্র বর্ণনা করো।

——————

একক - ১৫

‘ছেঁড়া তার’ নাটকের কাহিনি এবং চরিত্র বিশ্লেষণ

বিন্যাসক্রম :

১.৪.১৫.১ : ‘ছেঁড়া তার’ নাটকের কাহিনী এবং চরিত্র বিশ্লেষণ

১.৪.১৫.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.৪.১৫.১ : ‘ছেঁড়া তার’ নাটকের কাহিনী এবং চরিত্র বিশ্লেষণ

হাকিমুদ্দি এই নাটকে শোষক - অত্যাচারী শক্তির ঝক্‌ঝকে প্রতিনিধি। বাস্তবে সে মজুতদার - জোতদার। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হবার জন্য প্রয়াসী। যত রকমের খারাপ দিক — কুপ্রবৃত্তির কক্ষ আছে তার সবই হাকিমুদ্দির জীবনে পরিপূর্ণ। বিভূতিভূষণের ‘আরণ্যক’ উপন্যাসের রাসবিহারী সিং-এর সঙ্গে হাকিমুদ্দির স্যাযুজ্য বড়ো বেশি মাত্রায়। স্বভাবতই ভালোমানুষ, পরোপকারী, স্বজ্জন, সংগীত রসিক (নাট্যকারের মানসিক অভিপ্রায় প্রাধান্য পেয়েছে), ‘গাছে-গাছে’ ফুল ফোটানো, তার নিরীক্ষণ এবং দিলরুবার তারে সুর তোলা ও তার আবেশে আবিষ্ট হওয়া রহিমুদ্দির সঙ্গে হাকিমুদ্দির অবস্থানকে বিপরীত দুই মেরুতে দাঁড় করিয়ে দেয়। এই দুই চরিত্রের মধ্যে বিরোধ-সংঘাতের নানা ইঙ্গিত নাট্যকার শুরু থেকেই দিয়েছেন। যুদ্ধের জন্য ‘মাঙ্গন’ তোলা এবং মন্বন্তরের সময় সর্বগ্রাসী ভূমিকা যখন প্রকট তখন ‘মাতব্বর’, ‘দেওয়ানি’, হাকিমুদ্দির সঙ্গে রহিমুদ্দির সঙ্গে সংঘাত তীব্র হয়, চরমে পৌঁছয়। হাকিমুদ্দির বাড়ির সরকারি লঙ্গরখানায় যাওয়ার জন্য এবং সেখান থেকে বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের কালে স্ত্রী ফুলজানকে তালাক দেওয়া। হাকিমুদ্দির চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রই জয়লাভ করে শেষপর্যন্ত। সুখের দাম্পত্যজীবন অকালেই শুকিয়ে-গুটিয়ে যায়। দুঃখে-কষ্টে-যন্ত্রণায়-আত্মদহনে রহিমুদ্দি আত্মহত্যা করে। নাটক শেষ হয়।

রহিমুদ্দির জীবনের এই পরিণতির কেন্দ্রে আছে সেই মন্বন্তর। মন্বন্তরজনিত পরিস্থিতিতে একাধারে মজুতদার-জোতদার-‘মাতব্বর’-দেওয়ান-হাকিমুদ্দি প্রতিহিংসা চরিতার্থতায় রহিমুদ্দির পুত্র — বসির, স্ত্রী ফুলজানকে সরকারী লঙ্গরখানা থেকে বিতাড়িত করে, রহিমুদ্দির ‘চৌকিদারী কর’ দেওয়ায় লঙ্গরখানায় তারা সামিল হওয়ার যোগ্য নয়—এই অজুহাত তোলে। অতএব ‘তালাক’ চাই। রহিমুদ্দি-বসির বিচ্ছিন্ন ফুলজানকে হাকিমুদ্দি ঠাঁই দিতে চায় তার আঙিনায় শুধু ক্ষুধা নিবারণে নয়, তার প্রতি নির্যাতনে, শরীর লেহনে এবং চাতুর্যের নানা আঁকিবুকির ফলশ্রুতিতে। সেই বিতাড়নে অভিমানী রহিমুদ্দি ‘তালাক’ দেয় ফুলজানকে। এই ঘটনায় ‘ছেঁড়া তার’ নাটকে ট্র্যাজেডির বীজ প্রোথিত হয়েছে। রহিমুদ্দি ও ফুলজানের দাম্পত্য জীবন অ- সুখী ছিল না। প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে, সুখী দাম্পত্য জীবনের কথা রহিমুদ্দি বাল্যবন্ধু মহিমকে জানিয়েছে দৃঢ়তার সঙ্গে। পিতৃ-মাতৃহীন প্রায় ‘অনাথ’ নারী ফুলজানকে বিবাহ করে, সুখী রহিমুদ্দির দাম্পত্য জীবন যে চিরশত্রু হাকিমুদ্দির পছন্দ ছিল না, তাই বিনষ্টির পথ খুঁজেছে সে অনিবার।

এই দাম্পত্য জীবনে বিপদ ঘনিয়ে আসার চকিত স্বর আমরা শুনতে পাই, প্রথম অংকের তৃতীয় দৃশ্যে শহর থেকে রহিমের আনা ফুলজানের নতুন জুতো পরবার প্রয়াসকালে।

ফুলজান ঃ (কপট অভিমানে) — জুতা পিঁধি মুই পাইরবারে নই - তোর সাথে চইলবার।

রহিম ঃ (হেসে সস্নেহে তার দিকে হাত বাড়িয়ে)—ধরেক জোর হাত। হাটেক। মোর সাথে চলার লাইগ্‌বে তোর।

রহিমুদ্দি ফুলজানের হাত ধরেই সারাজীবন অতিবাহিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু অনেকটাই গ্রীক নেমেসিসের মতো ফুলজানের কণ্ঠে ধরা পড়েছে অনাগত ভবিষ্যৎ—'.... মুই পাইরবারে নই তোর সাথে চইলবার।' সত্য হয়েছে এই কথা। দ্বিতীয় অংকের তৃতীয় দৃশ্যে স্ত্রী-পুত্রের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য 'তালাক' দিয়ে বিচ্ছেদ সে ঘোষণা করে তা স্থায়ী হয় হাকিমুদ্দির শঠতায়। সহজ-সরল, অশিক্ষা-কুশিক্ষায় অভ্যস্থ ফুলজান ধর্মীয় অনুশাসনের বেড়াকে বড়ো করে দেখল। হৃদয়ের উত্তাপে ধর্মীয় অনুশাসনের রজ্জুকে দগ্ধ-খর্ব করে রহিমুদ্দির সঙ্গে স্বাভাবিকতার অনুসরণে বা সেই দুষিত গ্রাম্যসমাজ থেকে রহিমুদ্দি প্রস্তাবিত পথে পালিয়ে গিয়ে। ফুলজান রহিমুদ্দির সঙ্গে বাঁচতে চাইল না। তার হাত কাঁপল, পা কাঁপল, বুকও কাঁপল। ফলশ্রুতি নাটকের পরিণতিতে নিজের হাতে বরণ করা রহিমুদ্দির মৃত্যু।

দাম্পত্য প্রেম শেষপর্যন্ত জয়যুক্ত হল না। কে দায়ী? উত্তর—প্রথমত, ফুলজান, দ্বিতীয়ত, ফুলজান, তৃতীয়ত, হাকিমুদ্দি চতুর্থত, মন্বন্তর এবং পঞ্চমত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ফুলজান সাহসী হতে পারে না জানে না। তা না হলে সে স্বামীকে ছেড়ে 'চিরশত্রু' হাকিমুদ্দির ব্যবস্থাপনায় সরকারি লঙ্গরখানায় যেত না। চকিত 'তালাক'-এ যাওয়ার পর স্বামীর ক্ষুধা নিবৃত্তির বিষয়টি বাঙালি বধূ হয়ে সে দৃঢ়তার সঙ্গে ভাবল না। অতঃপর লঙ্গরখানা থেকে ফিরেও সে ধর্মীয় সংস্কার-কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থেকে ফিরিয়ে দিল রহিমুদ্দিন আকুল আহবান। তরান্বিত করলো রহিমুদ্দির মৃত্যু, নাটকের বিয়োগান্তক পরিণতি। সর্বোপরি হাকিমুদ্দির শেষ হাসিটিও।

হয়তো এ থেকে ভাবীকালের দর্শক-পাঠক-মানুষেরা অশিক্ষা-কুশিক্ষা, ধর্মীয় অনুশাসন, দাম্পত্য জীবনের নানা প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করবে। এটাই নাটকের শিক্ষা। পলায়মান হাকিমুদ্দির দিকে সরেমামুদের দৌড়, তাকে মেরে ফেলার বুলি মুখে নিয়ে যেমন বিশ্বাসসম্মত নয় তেমনি ফুলজানের 'আল্লার' প্রতি দোষারোপও আমাদের আশ্বস্ত করে না।

এই একই কাহিনীর অনুসরণে ওপার বাংলায় সৈয়দ মোহম্মদ হাসেম 'কিনারা' (১৯৫৫) গল্প রচনা করেছেন। কেন ঋণ স্বীকার বা অনুসরণের কথা উল্লেখিত হল না? এমন নকল বা অনুসরণের প্রয়োজন ছিল কি? এতে গল্পকারের বদনাম রোখা অসম্ভব।

'নবান্ন' নাটকে সরাসরি সংঘাত দেখা যায় না, শহরের কালোবাজারী, মজুতদারদের স্বরূপ উদঘাটন ছাড়া। তবে সমাপ্তিতে নতুন ফসল ওঠার দিনে সমবায় পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ (গাঁতায় খাটা - ফসল রক্ষা-বিপদের দিনে সমবন্টন) সম্পর্কিত উচ্চারণ গণনাট্যের বক্তব্য-বৈশিষ্ট্যকেই গুরুত্ব দেয়, অথচ, 'ছেঁড়া তার' নাটকে শোষক প্রবঞ্চকের সঙ্গে শোষিত-বঞ্চিতদের সরাসরি সংঘাত প্রত্যক্ষ করা যায়। যদিও সেই সংঘাত যতটা না মনস্তাত্বিক ততটা প্রয়োগিক নয়। নাট্য সমাপ্তিতে রহিমুদ্দির আত্মহত্যা গণনাট্যের আদর্শকে বিঘ্নিত করেছে নিঃসন্দেহে। নাট্যকারের এই যে নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গি (Nঙ্গgative attitude) গণনাট্য সংঘের আদর্শ- বৈশিষ্ট্য-শর্ত কোনোকিছুর সঙ্গে মেলে না। কোনো কোনো সমালোচক এই পরিণতিকে সমর্থন করে বলেছেন যে, এর মধ্য দিয়েই প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে এবং অবশিষ্ট সংগ্রামী মানুষেরা তাদের প্রতিবাদকে এই সূত্র ধরেই আরও তীব্র করে তুলবে। কিন্তু, এর উল্টোটাও তো হতে পারে। সংগ্রামী মানুষ-জনের, সজীবতা এই পরিণতি দেখে থিতিয়েও যেতে পারে। মস্ত ধূসরতার জন্ম দিতে পারে, এমন কি পরিণতির কথা ভেবে আত্মঘাতীও হতে পারে তাই, আমরা এই পরিণতিকে স্বাভাবিক বলে যেমন মেনে নিতে পারি না, তেমনই গণনাট্যের আদর্শ রূপেও চিহ্নিত করতে পারি না। নাট্যকারের অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতাই এক্ষেত্রে দায়ী — এ কথা আমাদের বলতেই হয়।

গণনাট্য-নবনাট্য আন্দোলনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাটকের শেষে অকস্মাৎ কার্যকারণবিহীন লাল পতাকা তুলে ধরে সংগ্রামী মানুষের প্রতিবাদ প্রতিরোধের জয়ও যেমন স্বাভাবিক নয়, তেমন, 'ছেঁড়া তার'-এর নির্বিষিকরণও সমর্থনযোগ্য নয় অবশ্য, এ প্রসঙ্গে নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীকে দোষারোপ করেও লাভ নেই, কারণ, তাঁর সামনে এমন কোনো নাটক বা নাট্যাদর্শ ছিল না, যার দ্বারা তিনি উদ্বুদ্ধ হয়ে সঠিক গণনাট্য রচনা করতে পারেন। তাই, এই নাটকের যে ত্রুটিগুলি আমাদের চোখে পড়ে তা নাট্য আন্দোলনের প্রথম যুগের নাটক হিসেবে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ থাকে না।

এই নাটকে তিনটি প্রধান চরিত্র ছাড়া গণচরিত্র—গোবিন্দ, মামুদ, শ্রীমন্ত, কানা ফকির প্রমুখ যেমন আছে, তেমনই নাটকের প্রয়োজনে হাকিমুদ্দির অনুচর কুকড়া, শিয়ালু; প্রশাসনিক স্তরে দারোগা, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এবং রহিমুদ্দির ছোটবেলার বন্ধু মহিম, পুত্র বসির প্রমুখের উপস্থিতি ঘটেছে।

গণনাট্যরূপে 'ছেঁড়া তার' পুরোপুরি সার্থক এই কথা বলা যাবে না। তবে গণনাট্যের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য এই নাটকে লক্ষণীয়, মঞ্চসজ্জার ডিটেলিং (detailing), সাধারণ দৃশ্য, সাজসজ্জা, পোশাক পরিচ্ছদ এবং সাবলীল আলোর ব্যবহার সন্দেহাতীতভাবেই গণনাট্যের শর্ত পূরণ করেছে।

১.৪.১৫.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'ছেঁড়া তার' নাটকের হাকিমুদ্দি ও রহিমুদ্দি–দুই বিপরীত মেরুর চরিত্র। দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করো।

২। 'ছেঁড়া তার' নাটকে রহিমুদ্দি এবং হাকিমুদ্দির সংঘাতে রক্তাক্ত হয়েছে ফুলজান। অবশেষে এই নাটকে দেখা দিয়েছে ট্র্যাজেডি"–আলোচনা করো।

৩। 'ছেঁড়া তার' নাটকে ফুলজানের জীবনের সংকট কিভাবে ঘনীভূত হয়েছে এবং একারণে ফুলজান কতখানি দায়ী তা নিরূপণ করো।

——————

একক - ১৬

ছেঁড়া তার নাটকের সংলাপ

বিন্যাসক্রম :

১.৪.১৬.১ : 'ছেঁড়া তার' নাটকের অভিনয় এবং ইবসেনের প্রভাব

১.৪.১৬.২ : 'ছেঁড়া তার' নাটকের সংলাপ

১.৪.১৬.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.৪.১৬.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১.৪.১৬.১ : 'ছেঁড়া তার' নাটকের সংলাপ

সংলাপ নাটকের প্রাণ। চরিত্রের বিকাশে, নাট্যকাহিনীর প্রসারণ ও পরিণতির ক্ষেত্রে সংলাপ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নাটকের অন্যতম বিষয় দ্বন্দ্ব; সেখানেও সংলাপ মুখ্য অবলম্বন। সার্থক সংলাপ সৃজনে নাট্যকাহিনীর বিবর্তন ঘটে, চরিত্রগুলির স্বরূপ উদঘাটিত হয় বলে পাশ্চাত্যের সমালোচকেরা নাট্য সংলাপের গুরুত্ব নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছিলেন 'Dialogue is the Drama.'। নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' নাটকের সংলাপে পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে মানুষের চরম বিতৃষ্ণা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর জেলার সেকালে পূর্ববঙ্গের রাজসাহী ডিভিসনের উত্তরবঙ্গের অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে সংযুক্ত তুলসী লাহিড়ীর এই নাটকের সংলাপে আঞ্চলিক 'বাহে' উপভাষার প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়েছে। বিশ্বযুদ্ধ, যুদ্ধোত্তর সময়পর্বের দাঙ্গা-মন্বন্তর, প্রত্ন-ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের বিপর্যয় তথা মনুষ্যত্বের সার্বিক অবক্ষয় এই নাটকে যেমন আছে, তেমনই আছে অনন্ত সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ, জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে বিপর্যস্ত, রক্তাক্ত অথচ হার না মানা মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বাঁচার, শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের সংগ্রামী প্রত্যয়।

তিন অঙ্কের নটি দৃশ্যের সংলাপের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কৃষক জীবনের মর্মন্তুদ পরিণতি যেমন প্রভাসিত হয়েছে, তেমনি আশার আলোও সংগুপ্ত থাকেনি। অবক্ষয়িত মনুষ্যত্ব সম্পর্কে সচেতন এই নাটকের অন্যতম চরিত্র — রহিমুদ্দি। গ্রামের সাধারণ মানুষের বোধ ও বোধির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে প্রথমেই তার অভিমত — 'মানুষগুলার হাত পা ও মাথা সবে আছে, কিন্তুক্ কাঁয়ো পুরা মানুষ নয়।' তার পাশের গোবিন্দ, তমিজ প্রমুখকে বিপর্যয়ের—অর্থনৈতিক দুরবস্থার দিনে সে ধৈর্য ধরে থাকতে বলে, কোনো অশুভ শক্তির বশ্যতা স্বীকার করতে নিষেধ করে — 'মান আর হুঁস এই দুইটা থাকলে মানুষ, মানুষ হয়। এই হুঁসে মাইন্‌ষেক ঠ্যাকায়। মানের জন্য দুঃখ পায়াও মান ছাড়ে না।' ফুলজানকে তালাক দেওয়া বা পরিশেষে হদীসের নির্দেশ অপেক্ষা হৃদয়ে টান যে অনেক গভীর সেই প্রসঙ্গটি বোঝানোর সময় তাঁর সংলাপে যন্ত্রণা নৈরাশ্য তীক্ষ্ণভাবে ধরা পড়েছে। ফুলজান ও রহিমের কথোপকথনে কখনও মধ্যম পুরুষ আবার কখনও বা প্রথম পুরুষের ব্যবহার দেখা যায়। ক্রিয়াপদ, সর্বনামের বিভিন্ন ব্যবহারে স্বাভাবিক মেজাজ বজায় থাকে। কেননা ওই উত্তেজনা-যন্ত্রণার মধ্যে এটাই স্বতোচ্ছল। রহিমের ব্যক্তিত্ব, আবেগ তার সংলাপে প্রথমাবধি বর্তমান। হাকিমুদ্দির ধানেরগোলা লুঠ করার প্রসঙ্গে ব্যক্তিত্ব এবং বসির বা ফুলজানের উদ্দেশে নানা মন্তব্য আবেগবাহিত সংলাপ—এর দৃষ্টান্ত। একই শব্দের দুই বা তিনবার প্রয়োগ বক্তব্যকে জোরালো করতে সাহায্য করেছে নিঃসন্দেহে।

এই নাটকের সংলাপে অনুজ্ঞাবাচক বাক্যের প্রয়োগ বিশেষ লক্ষণীয়। অনুজ্ঞার প্রয়োগে এই নাটকে সর্বনামের এবং ক্রিয়ার প্রয়োগে বিপর্যয় লক্ষিত হয়েছে। নিশ্চয়ার্থে অনুজ্ঞাপদ—'ধরেক মোর হাত'। অব্যয় রূপে বাক্যের মধ্যে ও শেষে 'না' এবং 'সে'-র প্রয়োগ চরিত্রের সংলাপে সারল্য এনেছে। যেমন : 'তোর না ব্যামার হইছে', 'সব মুই শুনছো না', ইত্যাদি। 'ফের একদিনের বেশি প্যাট ও ভইরবার নয়' রহিমুদ্দি এবং ফুলজানের বাক্‌রীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য শব্দের পুনরাবৃত্তি। নাটক যতই পরিণতির দিকে এগিয়েছে ততই তা বেড়েছে। দিলরুবার তার ছিঁড়ে যাওয়াতে রহিমের 'উন্মাদের মতো' কেঁদে ওঠা এবং রহিমের মৃত্যুতে ফুলজানের 'উন্মাদের মতো' চিৎকার করে ওঠা।

রহিমুদ্দির সংলাপের মধ্যে এমন দু-একটি নিদর্শন পাওয়া যায়, যেগুলির সাধারণ বা আভিধানিক অর্থ এক রকমের কিন্তু, নাটকের তাৎপর্যের দিক থেকে তার অর্থ আর এক রকমের। নাটকের অগ্রগতিতে, নাট্যঘটনার পরিণতির আলোকেই সেইগুলি বিচার্য। যেমন ঃ 'দুইখান মাস' কিংবা 'আল্লা' - ধান ঘরে ওঠার দু মাস পরে যে সমৃদ্ধির কল্পনা রহিম করেছিল, বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার কোনোরকম মিলই নেই। 'আল্লা' এই শব্দটি এই নাটকে বহু অর্থে প্রযুক্ত। কখনো তা বিস্ময়বোধক অব্যয়, কখনো দেবতা, কখনো বা ভাগ্যের নিয়ন্ত্রীশক্তি।

নিজের বিপর্যস্ত ভাগ্য প্রসঙ্গে রহিমের সংলাপে বারবার এসেছে নদীর চিত্রকল্প কখনো তা সরাসরি, কখনো পরোক্ষে 'খাটিয়া খাটিয়া কোনো মতে উজাইনো', 'সখ সাধ সব তলেয়া গেইছে'-এটিই স্পষ্টরূপ নিয়েছে—'শ্রীমন্ত রে, আইজ মোর দরিয়ার ডুবায় লাগিবে।' রহিম তার সংলাপে নিজস্ব উপভাষার প্রয়োগ ঘটিয়েছে ঠিকই কিন্তু কখনো কখনো তার ব্যতিক্রমও লক্ষ করা যায়, বিশেষত শিক্ষিতজনের সঙ্গে কথার ক্ষেত্রে রহিম চলিত বাংলাতে বলেছে — 'আমি আর গান করি না যে।'

হাকিমুদ্দির সংলাপ প্রথম থেকেই আদেশব্যঞ্জক, তার চরিত্রটি বহির্মুখী, তার সংলাপেও চরিত্রের এই বিশেষ দিকটি প্রভাসিত। তার আত্মপ্রত্যয় অনেকটাই প্রকাশ পেয়েছে তার সংলাপে। তার সংলাপের আর একটি বৈশিষ্ট্য ভবিষ্যৎকাল বোঝাতে সে বর্তমান কালের প্রয়োগ ঘটিয়েছে — 'তোক্ ক্যানে মারে?', 'লুট ক্যানে হয়?', 'সেই ধান থাকতে মোর গেরামের মানুষ ক্যামন মরে?' — সংলাপের শেষে এই যে প্রশ্নবোধক একটি অভিব্যক্তি এ তার চরিত্রের সপ্রতিভতা এবং আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয়বাহী। হাকিম সংলাপেও অনুজ্ঞার প্রয়োগ বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়—'চলি যাও ... এই ঠে থাকি নিকাল যাও। ... এ সাল না খায়া মরবু', 'আইসে বুঝি প্রেসিডেন'। হাকিমুদ্দির নিজের ব্যবহৃত শব্দ 'মৌত'—এক্ষেত্রে নাটকীয় ঘটনার পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তার বিরুদ্ধে গেছে। উপভাষী 'বাহে'র অবারণ ব্যবহার নিয়েও স্বতন্ত্রভাবে কিছু বলার থাকে না।

এই নাটক একটি বিশিষ্ট অঞ্চলের উপভাষাকে ভিত্তি করে রচিত। উপভাষা ও লোকভাষার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। মানুষ যখন কোনো এক বিশিষ্ট অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক বা অন্য কোনো বন্ধনের মধ্যে সংঘবদ্ধ হয় তখনই তাদের 'লোক' এই অভিধায় ভাববিনিময়ের জন্য নিজস্ব বাক্‌রীতির আশ্রয় নেয়। যেমন হাকিমুদ্দিকে উদ্দেশ করে তারা 'দেওয়ানী', 'মাইন্যমান' প্রভৃতি আখ্যাগুলি **Antonomasia**-র নিদর্শন, রহিমুদ্দির উদ্দেশে বলা 'বুঝমান', 'চোখা' এগুলি **onomatology**-র দৃষ্টান্ত। যুদ্ধের চাঁদাকে বলা হয়েছে 'রাজার মাঙ্গন', মসজিদ হল 'জুম্মাঘর' হাকিমুদ্দির ভাষায় কুক্‌রা 'ভাতমারা', কলেরা রোগটির প্রচলিত শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'নদী ফিরা'। নতুন শব্দ নির্মাণ, বিদেশি ও অপরিচিত শব্দের অনুবাদ বা প্রতিশব্দ সৃষ্টি, ধন্যাত্মক অনুকার শব্দকে বিচিত্রভাবে প্রয়োগ, প্রত্যয় ও উপসর্গ যোগ করে নতুন শব্দ নির্মাণ - লোকভাষার এইসব বিশিষ্ট দিক 'ছেঁড়া তার', স্বচ্ছন্দে প্রতিফলিত হয়েছে। গণনাট্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত (মন্বন্তর-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-কালোবাজারী-

মজুতদারী-শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা) এবং নবনাট্য আন্দোলনের সূচনায় অভিনীত হওয়ার সূত্রে বাণিজ্যিক থিয়েটার, সিনেমা, সুর-সংগীতের জগতের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থাকার পর তুলসীদাস লাহিড়ী ভিন্ন গোত্রের নাটক 'গোত্রান্তর', 'পথিক' বিশেষত 'ছেঁড়া তার' রচনা করে নাট্য আন্দোলন এবং নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে যে নজির গড়লেন তা কোনোভাবেই অস্পষ্ট বা ম্লান হবার নয়।

১.৪.১৬.২ : 'ছেঁড়া তার' নাটকের অভিনয় এবং ইবসেনের প্রভাব

'ছেঁড়া তার' নাটক প্রথম অভিনীত হয় ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর, নিউ এম্পায়ারে, সকাল ১০টায়, 'বহুরূপী'র প্রযোজনায়। 'বহুরূপী' প্রতিষ্ঠার (১ মে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ) মধ্য দিয়েই নবনাট্য আন্দোলনের প্রকাশ্যে পথ চলা শুরু। এই আন্দোলনের অন্যতম ঋত্বিক শম্ভু মিত্র সংকীর্ণ রাজনৈতিক আবহাওয়া সরিয়ে ভালো নাটক, ভালোভাবে অভিনয় করার কথা ঘোষণা করেছিলেন নবনাট্য আন্দোলনের নাট্যকর্মীরূপে 'মোটামুটিভাবে বলা যায় সৎ মানুষের নতুন জীবনবোধের এবং নতুন সমাজ ও বলিষ্ঠ জীবনগঠনের মহৎ প্রয়াস যে সুলিখিত নাটকে শিল্প সুষমায় প্রতিফলিত তাকেই বলতে পারি নবনাট্যের নাটক।' (বহুরূপী পত্রিকা, ১০ নভেম্বর, ১৯৬০)

নবনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নাট্যকর্মীরা সেই সময় 'ভালো নাটক' খুঁজতে রবীন্দ্রনাথের দিকে যেমন হাত বাড়ালেন, তেমনি প্রতীচ্যের বিখ্যাত নাটকগুলির দিকেও দৃষ্টি ফেরালেন। নরওয়ের নাট্যকার ইবসেনের নাটক বাংলার জল হাওয়ায় পৌঁছলো 'বহুরূপী'র মাধ্যমে। তার আগে অবশ্য সফোক্লেসের 'অয়াদিপাউস' এসে গিয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে প্রতীচ্যের নাটক নিয়ে পড়াশুনো আগে থেকেই শুরু হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল পাশ্চাত্যে গিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। ইবসেনের নাটক ও নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে তাঁর সংযোগ গড়ে উঠেছিল। 'সাহাজান' নাটকে ইবসেনীয় প্রভাব দুর্নিরীক্ষ নয়।

সুপাঠক তুলসী নাট্যচর্চার সূত্রে পড়েছিলেন ইবসেনের নাটক। তাইতো 'ছেঁড়া তার'-এ ইবসেনের নাটকের স্বাভাবিক প্রভাব আমাদের চোখে পড়ে, বিশেষভাবেই পড়ে। নরওয়ের এই নাট্যকার আধুনিক জীবনের ভাষ্যকার। আধুনিক জীবনের ছোটো-বড়ো নানা সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, নীচতা ইত্যাদির আবর্তে ব্যক্তি পরিবার-সমাজে যে সংকট-সংঘাত ঘনিয়ে এসেছে তার ছবি ইবসেন তুলে ধরেছেন। আধুনিককালের দেশ দেশান্তরের নাট্যকারেরা তাঁর নাটকের পাঠ নিয়েছেন গভীরভাবেই এবং বার্নাড শ-এর মত নাট্যকার জানিয়েছেন 'drama of ideas' কিংবা অন্যরা 'Modern drama begins with Ibsen'। ইবসেনের বিখ্যাত নাটকগুলি হল—The Doll's House, An enemy of the people, The wild Duck (এই তিনটি নাটক, বাংলায় অনূদিত এবং রূপান্তরিত হয়ে অভিনীত হয়েছে যথাক্রমে — 'পুতুল খেলা', 'দশচক্র' (সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রায়ন করেছেন 'গণশত্রু' নামে)। 'বুনোহাঁস' নামকরণে প্রথম নাটক দুটি বহুরূপীর প্রযোজনায় অভিনীত হয়েছে, Ghost, Lady Inger, Hedda Gabler, White House, Rosemerholm, The Pretender ইত্যাদি। একটি কথা বলে নেওয়া ভালো — ইবসেনের নাটকের ব্যক্তি-পারিবারিক Tragedy'র সূত্র ধরেই আধুনিক নাটকের বলয়ে Tragedy'র ধারাকে Domestic Tragedy বা Ibsenian Tragedy নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

ইবসেনের নাটকগুলি যদি নিবিষ্ট চিত্তে পড়া যায় বা তার অভিনয় দেখা যায়, তা হলে আমরা নীচের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে খুঁজে পাবো।

(ক) শেক্সপীয়ারের পঞ্চম অংকের নাটক যখন গোটা বিশ্বে নাট্যরচনার আদর্শ হয়ে উঠেছিল, তখন ইবসেন তিন বা তার থেকে কম অংকে নাট্য ঘটনাকে বাঁধতে চেয়েছেন।

(খ) নাটকে স্বভাবতই ঘটনার প্রাধান্য কমেছে।

(গ) নাট্যঘটনা বা কাহিনী সর্বতো একমুখী।

(ঘ) নাট্যসংলাপ বস্তুনিষ্ঠ এবং প্রয়োজনভিত্তিক।

(ঙ) স্বগতোক্তি (Mologue) বর্জিত।

(চ) নাট্য দৃশ্যের শুরুতে বা মাঝে, বন্ধনীর মধ্যে মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যসজ্জা, অভিনেতার অবস্থান এবং নাট্যকেন্দ্রিক অভিনেতার মানসিকতার উল্লেখ।

(ছ) Detailing বা বিস্তৃতভাবে এই নির্দেশের বিষয়টি লক্ষণীয়। যাতে দর্শকদের যা বোঝানোর তা সরাসরি বুঝিয়ে দেওয়া। অকারণ ঔৎসুক্য (Suspense)-এর মধ্যে না রাখা।

(জ) ব্যক্তির মানসিক দ্বন্দ্বকে পারিবারিক বা সামাজিক প্রেক্ষাপটে সযত্নে ফুটিয়ে তোলা।

(ঝ) অবশ্যই নিজস্ব পোষিত ভাবনাকে (Idea) নাটকের মধ্যে প্রসারিত করা।

(ঞ) নিয়তি-দৈব ভাবনা, অলৌকিকতা, অতিনাটকীয়তা, অপ্রাকৃত ঘটনা ইত্যাদি বর্জন।

(ট) Remembarence বা স্মৃতিচারণার প্রতি গুরুত্ব আরোপণে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নাট্যকাহিনীকে অতীত-বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত রাখার অনায়াস ভঙ্গি।

(ঠ) কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতীক (Symbol)-এর ব্যবহার।

(ড) নাট্য পরিণতির নানামুখ। সমাপ্তিতে তাই কোনো সমাধান থাকেনা, থাকে সংশয়। যেমন — 'an enemy of the People', 'Doll's House'। আবার আত্মহত্যার মধ্যে সমাপ্তিও লক্ষণীয়। সেক্ষেত্রেও সংশয়-বিভ্রান্তি দূর হয় না। আসলে আমাদের জীবন, আমাদের দৈনন্দিন সংকটের, নিঃসংশয় সমাধান কি সত্যিই হয়। শেষোক্ত ধারায় সমাপ্তি ঘটেছে — The Wild Duck, Rosemerholm, White house নাটকে।

(ঢ) আধুনিক জীবনের সমস্যা-সংকট নাটকের মধ্যে তুলে ধরলেও তা প্রপাগাণ্ডা (Agit Prop.) বা রাজনৈতিক নাটক (Political Theatre)-এ রূপান্তরিত হয়নি।

'ছেঁড়া তার' নাটকে, ইবসেনের নাটকের বৈশিষ্ট্যগুলির বেশ কয়েকটির প্রভাব বিশেষভাবে আমাদের চোখে পড়ে। যেমন 'ছেঁড়া তার'-এর নাট্যকাহিনী তিনটি অংক এবং মোট নয়টি দৃশ্যে বিভাজিত হয়েছে। প্রথাগত পঞ্চাঙ্কের নয়। নাট্যঘটনা একমুখী। অহেতুক ঘটনার ঘনঘটাও নেই। সংলাপ বস্তুগত এবং ঘটনাসম্পৃক্ত। মঞ্চ-দৃশ্য-আলোকসজ্জা—বাস্তবসম্মত সরলীকৃত এবং বিস্তৃত। দৃশ্যের শুরুতে বন্ধনীর মধ্যে বিস্তারিতভাবে সমস্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে নাট্য নির্দেশকের দায়িত্বও অনেকটা হাল্কা হয়েছে। প্রতীক এখানে দিলরুবা। দিলরুবার তার ছিঁড়ে যাওয়া নিঃসন্দেহে একটা প্রতীক। রহিমুদ্দির জীবনের তারও এভাবেই ছিঁড়েছে। প্রতীকের ব্যবহার চমৎকার ও সার্থক। স্মৃতিচারণাও আছে রহিমুদ্দির। তার দ্বন্দ্বদীর্ণ মানসিকতারই পরিণতি আত্মহত্যা। সংক্ষেপে বললে বলতে হয় যে, 'ছেঁড়া তার' নাটকটিতে ইবসেনের প্রভাব পড়েছে এবং তা নাট্যকারের সচেতনতায়, অসাবধানতা বা অনবধানতায় নয়। অনুবাদ-রূপান্তরের পাশাপাশি এই প্রভাব শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর এবং অবশ্যই সমর্থনযোগ্য।

১.৪.১৬.৪৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ‘ছেঁড়া তার’ নাটকে পাশ্চাত্যের প্রভাব নিরূপণ করো।

২। ‘ছেঁড়া তার’ নাটকের নামকরণ কতদূর সার্থক–আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

৩। ‘নবান্ন’ এবং ‘ছেঁড়া তার’–একই পটভূমিতে রচিত হলেও দুই নাটকের মধ্যে আছে বিস্তর ব্যবধান আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

৪। ‘ছেঁড়া তার’–নাটকের সংলাপ সৃজনে দৃষ্টান্তসহ নাট্যকারের সাফল্য ও ব্যর্থতার সার্বিক মূল্যায়ন করো।

৫। ‘ছেঁড়া তার’ নাটকে ইবসেনের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করো।

১.৪.১৬.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। সনাতন গোস্বামী সম্পাদিত, তুলসী লাহিড়ী রচিত ‘ছেঁড়া তার’ নাটক

২। নির্মলেন্দু ভৌমিক—ছেঁড়া তার (সার্বিক আলোচনা গ্রন্থ)

৩। তরুণ মুখোপাধ্যায়—বাংলা নাটকের দিক্‌দিগন্ত

৪। তাপস বসু—ভাঙনের থিয়েটার

৫। রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কালজয়ী বাংলা নাটক

৬। সুধী প্রধান—সৎনাট্য কথা

৭। শম্ভুমিত্র—প্রসঙ্গ নাট্য

৮। তাপস বসু—বাংলা নাটক : ঐতিহ্য ও আধুনিকতা

——————

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সি বি সি এস) কার্যক্রম

এম. এ. তৃতীয় সেমেস্টার

দ্বিতীয় পত্র

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

(ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং)

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া - ৭৪১ ২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

পাঠ-প্রণেতা

অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক – প্রাক্তন অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপিকা ড. সাবত্রী নন্দ চক্রবর্তী – বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামানিক – বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. লায়েক আলি খান – বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

ড. রাজশেখর নন্দী – সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক) বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ডিসেম্বর, ২০১৯

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও

নিউ স্কুল বুক প্রেস, ৩/২ ডিক্সন লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১৪

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়-এর অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ-সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইনানুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের লেখক/পাঠ-প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of distance and reaching the unreached students are the threefold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellor has invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directoate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Sankar Kumar Ghosh, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of PGBOS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks is also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would especially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and co-ordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

পাঠক্রম

বাংলা

প্রতি পত্রে পূর্ণমান – ১০০

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম. এ. তৃতীয় সেমেস্টার

দ্বিতীয় পত্র

পর্যায় গ্রন্থ ঃ ১ প্রবন্ধ সংকলন—নীলরতন সেন সম্পাদিত (নির্বাচিত ৬টি প্রবন্ধ) (সময় ঃ ৪ ঘন্টা)

একক–১ ঃ বঙ্গদর্শনের পত্র সূচনা ঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,
ভারতবাসীদিগের একতার উপায় ঃ কেশবচন্দ্র সেন।

একক–২ ঃ হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও ঃ শিবনাথ শাস্ত্রী
ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত ঃ প্যারীচাঁদ মিত্র

একক–৩ ঃ যাত্রার ইতিবৃত্ত ঃ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

একক–৪ ঃ বর্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য ঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

পর্যায় গ্রন্থ ঃ ২ প্রাক্-চল্লিশ বাংলা ছোটগল্প (নির্বাচিত ৮টি গল্প) (সময় ঃ ৪ ঘন্টা)

একক–৫ ঃ শঙ্কিতা অভয়া ঃ জগদীশ গুপ্ত, গা মানুষ জাতির কথা ঃ রাজশেখর বসু

একক–৬ ঃ নিমগাছ ঃ বনফুল, পুন্নাম ঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র

একক–৭ ঃ হাড় ঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, রস ঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র

একক–৮ ঃ নিম অন্নপূর্ণা ঃ কমলকুমার মজুমদার,
খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর ঃ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

পর্যায় গ্রন্থ ঃ ৩ চল্লিশোত্তর বাংলা ছোটগল্প (নির্বাচিত ৮টি গল্প) (সময় ঃ ৪ ঘন্টা)

একক–৯ ঃ সুন্দরম্ ঃ সুবোধ ঘোষ, জননী ঃ বিমল কর

একক–১০ ঃ ভারতবর্ষ ঃ রমাপদ চৌধুরী, রাজার টুপি ঃ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

একক–১১ ঃ পলাতক ও অনুসরণকারী ঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়,
অশ্বমেধের ঘোড়া ঃ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

একক–১২ ঃ পাড়ি ঃ সমরেশ বসু, দুই রাত্রি ঃ সন্তোষ কুমার ঘোষ

পর্যায় গ্রন্থ ঃ ৪ চল্লিশোত্তর বাংলা প্রবন্ধ (সংস্কৃতির রূপান্তর ঃ গোপাল হালদার) (সময় ঃ ৪ ঘন্টা)

একক–১৩ ঃ বিশ্ববিপ্লব ও বিশ্বশান্তি

একক–১৪ ঃ মানবতার প্রতি বিশ্বস্ততা

একক–১৫ ঃ সংস্কৃতির সংজ্ঞা এবং তিনটি অঙ্গের পরিচয়

একক–১৬ ঃ সমাজতন্ত্রই ভবিষ্যৎ

সূচিপত্র

দ্বিতীয় পত্র

দ্বিতীয় পত্র	একক	পাঠ-প্রণেতা	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ-১	১	ড. লায়েক আলি খান	বঙ্গদর্শনের পত্র সূচনা ঞ্জ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১–৩
		ড. লায়েক আলি খান	ভারতবাসীদিগের একতার উপায় ঞ্জ কেশবচন্দ্র সেন	৪–৬
	২	ড. লায়েক আলি খান	হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও ঞ্জ শিবনাথ শাস্ত্রী	৭–৯
		ড. লায়েক আলি খান	ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত ঞ্জ প্যারীচাঁদ মিত্র	১০–১৩
	৩	ড. লায়েক আলি খান	যাত্রার ইতিবৃত্ত ঞ্জ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৪–১৬
	৪	ড. লায়েক আলি খান	বর্তমান শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য ঞ্জ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	১৭–২১
পর্যায় গ্রন্থ-২	৫	অধ্যাপিকা সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	শঙ্কিতা অভয়া ঞ্জ জগদীশ গুপ্ত	২২–২৪
		অধ্যাপিকা সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	গা মানুষ জাতির কথা ঞ্জ রাজশেখর বসু	২৪–২৫
	৬	অধ্যাপিকা সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	নিমগাছ ঞ্জ বনফুল	২৬–২৭
		অধ্যাপিকা সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	পুন্নাম ঞ্জ প্রেমেন্দ্র মিত্র	২৭–২৮
	৭	অধ্যাপিকা সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	হাড় ঞ্জ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	২৯–৩০
		ড. রাজশেখর নন্দী	রস ঞ্জ নরেন্দ্রনাথ মিত্র	৩১–৪১
	৮	ড. রাজশেখর নন্দী	নিম অন্নপূর্ণা ঞ্জ কমলকুমার মজুমদার	৪২–৪৭
		ড. রাজশেখর নন্দী	খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর ঞ্জ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	৪৮–৫৬
পর্যায় গ্রন্থ-৩	৯	অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক	সুন্দরম্ ঞ্জ সুবোধ ঘোষ	৫৭–৬১
		অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক	জননী ঞ্জ বিমল কর	৬১–৬৫
	১০	অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক	ভারতবর্ষ ঞ্জ রমাপদ চৌধুরী	৬৬–৬৯
		অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক	রাজার টুপি ঞ্জ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৯–৭৩
	১১	অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক	পলাতক ও অনুসরণকারী ঞ্জ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	৭৪–৭৮
		অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক	অশ্বমেধের ঘোড়া ঞ্জ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৯–৮২
	১২	অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক	পাড়ি ঞ্জ সমরেশ বসু	৮৩–৮৭
		অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক	দুই রাত্রি ঞ্জ সন্তোষ কুমার ঘোষ	৮৭–৯০
পর্যায় গ্রন্থ-৪	১৩	অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামানিক	বিশ্ববিপ্লব ও বিশ্বশান্তি	৯১–৯৫
	১৪	অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামানিক	মানবতার প্রতি বিশ্বস্ততা	৯৬–৯৯
	১৫	অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামানিক	সংস্কৃতির সংজ্ঞা এবং তিনটি অঙ্গের পরিচয়	১০০–১০৯
	১৬	অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামানিক	সমাজতন্ত্রই ভবিষ্যৎ	১১০–১১৮

দ্বিতীয় পত্র

পর্যায়গ্রন্থ - ১

প্রবন্ধ সংকলন

(নীলরতন সেন সম্পাদিত ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত)

একক - ১

বিন্যাসক্রম :

২.১.১.১ : বঙ্গদর্শনের পত্র সূচনা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২.১.১.২ : 'পত্রসূচনা' প্রবন্ধের গুরুত্ব

২.১.১.৩ : ভারতবাসীদিগের একতার উপায় : কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪)

২.১.১.৪ : প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য

২.১.১.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.১.১.১ : বঙ্গদর্শনের পত্র সূচনা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলা গদ্যচর্চার ধারায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) এক অবিস্মরণীয় নাম। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বছরের গ্র্যাজুয়েট। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরকে প্রায় চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বাংলা গদ্যচর্চায় হাত দিয়েছিলেন। ব্যক্তিজীবনে বিদ্যাসাগরকে তিনি গ্রহণ করতেপারেননি। তাঁর সামাজিক আন্দোলন (বিধবা বিবাহ)-এর বিরোধী ছিলেন তিনি। এবং তাঁকে 'নিছক অনুবাদক' বলে ছদ্মনামে কঠোর সমালোচনাও করেছেন। বিদ্যাসাগরের গদ্যশৈলীর অপকৃষ্টতা দেখাবার ইচ্ছাতেই যেন প্যারীচাঁদের গদ্যের প্রাপ্যের অতিরিক্ত প্রশংসা করেছেন তিনি। অথচ আমাদের আনন্দ এইখানে যে, গদ্যচর্চায় বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদের গদ্যভাষা-শৈলী রপ্ত করেননি, করেছেন বিদ্যাসাগরী শৈলীকেই।

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নকল্পে, বহু কর্মব্যস্ততার মধ্যেও, বঙ্কিমচন্দ্র একটি পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। বাঙালী জীবনের মান উন্নয়নের জন্য একটি প্রথম শ্রেণীর বাংলা সাহিত্যপত্রের প্রয়োজন তিনি অনেকদিন থেকেই অনুভব করে আসছিলেন। ১৮৭০-৭১-এর ইংরেজি লেখালেখিতেও এ বিষয়ে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তিনি ঃ

> "We can hardly hope for a healthy and vigorous Bengali literature in the utter absence of anything like intelligent criticism" [Bengali literature / Calcutta Review. 1871 No.-104]

এক স্বাস্থ্যকর ও শক্তিশালী সমালোচনাকর্মের জন্য আগ্রহী বঙ্কিমচন্দ্র অবশেষে পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বহরমপুরে বসে লেখা সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে পত্রিকা প্রকাশ করেন কোলকাতা থেকে। প্রকাশের ঠিকানা ঃ—ভবানীপুর, ১নং পিপুল পটি লেন।

প্রকাশক ও মুদ্রক শ্রী ব্রজমাধব বসু। পত্রিকার নাম 'বঙ্গদর্শন মাসিক পত্র ও সমালোচন'। পত্রিকার প্রকাশকাল ১ বৈশাখ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ, ১২ এপ্রিল ১৮৭২। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের ফলে, বাঙালী পাঠকের হয়ে, তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এইভাবে ঃ "পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম তাহা দুইকালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি—কোথায় গেল সেই 'বিজয়বসন্ত', সেই 'গোলেবকাওলি', সেই বালক ভুলানো কথা — কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্যঙ্গ বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো 'সমাগত রাজবদুন্নতধ্বনিঃ'। এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিক পত্র, কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।"

এই পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধ হিসেবে মুদ্রিত হয় 'পত্র সূচনা' নামক প্রবন্ধ। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হবার ২০ বছর পরে 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৭ম প্রবন্ধরূপে এই রচনাটি গৃহীত হয়। এবং তখন রচনাটির শিরোনাম বদল করেন লেখক। নতুন শিরোনাম হয় 'বঙ্গদর্শনের পত্র সূচনা'। এই প্রবন্ধটির শিরোনামের পাশে তারকা চিহ্নিত করে, গ্রন্থে পাদটীকায় বঙ্কিমচন্দ্রকে লিখতে দেখি—"এই প্রবন্ধ মুদ্রিত করিবার কারণ এই, ইহার মধ্যে যে সকল কথা আছে তাহার পুনরুক্তি প্রয়োজনীয়। ১২৭৯ বৈশাখে বঙ্গদর্শন প্রথম প্রকাশিত হয়।"

২.১.১.২ : 'পত্রসূচনা' প্রবন্ধের গুরুত্ব

'বঙ্গদর্শন'-এর প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্যের গুরুত্ব আছে। তিনি বলেছেন, বঙ্গভাষী লেখকদের দুর্ভাগ্য এই যে, তাঁরা যত যত্ন করুন না কেন এ দেশের শিক্ষিত (নিশ্চয়ই ইংরেজি শিক্ষিত), বঙ্কিমের ভাষায় 'কৃতবিদ্য', সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁদের রচনা পাঠে বিমুখ। ইংরেজিপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জ্ঞান আছে যে, তাঁদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাংলা ভাষায় লিখিত হতে পারেনা। তাঁদের মতে বাংলা ভাষার লেখকগণ বিদ্যাবুদ্ধিহীন। লিপিকৌশল শূন্য, না হয় তাঁদের রচনা ইংরেজির অনুবাদমাত্র, সুতরাং মূল রচনা যখন ইংরেজিতে আছে তখন বাংলায় তা পড়ে আত্মাবমাননা নিরর্থক। সংস্কৃত পণ্ডিত অভিমানীদের ভাষা (বাংলা)-র প্রতি অশ্রদ্ধা সর্বজনবিদিত। আর যাঁরা বিষয়ী তাঁরা কোনো ভাষারই বই পড়েন না। তাঁদের অবকাশ নেই। সুতরাং বাংলা গ্রন্থ (ও পত্রিকা) পড়বার দায়িত্ব হল নর্মাল স্কুলের ছাত্র, গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, অল্পবয়সিনী পৌরকন্যা ও কোনো কোনো নিষ্কর্মা রসিকতা-ব্যবসায়ী পুরুষের। কোনো কোনো কৃতবিদ্যা ব্যক্তি বাংলাগ্রন্থের বিজ্ঞাপন অথবা ভূমিকা পাঠ করে বিদ্যোৎসাহী বলে খ্যাতিলাভ করেন। নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো কাজ বাংলায় হয় না। বিদ্যালোচনা, সভা, লেকচার, প্রোসিডিংস ইত্যাদি সকল কিছু ইংরেজিতে হয়। কথোপকথন ষোল আনা, কখনো বার আনা ইংরেজিতে, 'পত্রলেখা কখনোই বাংলায় হয় না'।

ইংরেজদের থেকে বাংলাদেশ উপকৃত হয়েছে। এর প্রধান কারণ হোল ইংরেজি ভাষা। ভারতের বিভিন্ন জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হলে ইংরেজি হবে তার প্রধান উপায়। "এত মতত্ব এক পরামর্শত্বি, একোদ্যম কেবল ইংরেজী দ্বারা সাধনীয়, কেননা এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে।" কিন্তু ইংরেজি যতই অধ্যয়ন করা যাক, সমগ্র বাঙালি জাতি ইংরেজ হয়ে উঠতে পারবে না। বঙ্কিম বলেন,—"ইংরেজী কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্মস্বরূপ হইবে মাত্র।" তাঁর মতে নকল ইংরেজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙালি স্পৃহনীয়।

সুশিক্ষিত, জ্ঞানবন্ত, বাঙালি কর্তৃক বাংলা ভাষা চর্চা না হলে বাঙালীর উন্নতি সম্ভব নয়। সমগ্র বাঙালি জাতির উন্নতি না হলে দেশের কোনো মঙ্গল সাধিত হবে না। উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা বলেন যে, উচ্চশ্রেণীর লোকেরা শিক্ষিত হলে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বিদ্বান হয়ে উঠবে। শিক্ষা জলের ধারার ন্যায় নিম্নগামী হয়ে জনসাধারণের উন্নতি সাধন করবে, এই ধারণা ভ্রমাত্মক।

আসল কথা, উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে সহযোগিতা নেই। শক্তিমান উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা যতদিন ভাগ্যবিড়ম্বিত ব্যক্তিগণের জন্য দুঃখবোধ না করে ততদিন কোনো ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণীর পক্ষে উন্নতির সম্ভাবনা নেই। সমাজের মধ্যে যদি সম্প্রদায়গত পার্থক্য থাকে তবে দেশের প্রভূত অনিষ্ট হয়। প্রাচীন এথেন্সে সকলের সমঅধিকার স্বীকৃত হয়েছিল, কিন্তু স্পার্টায় এক জাতি প্রভু ও এক জাতি ছিল দাস। এথেন্সের সভতা সমগ্র ইয়োরোপকে আলোকিত করেছে, কিন্তু স্পার্টা কুলক্ষয়ে ধ্বংস হয়েছে। ভাষাভেদ পার্থক্য সৃষ্টির কারণ। সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে হৃদয়ের বন্ধন অত্যাবশ্যক। বঙ্কিম বলেন, তিনি বঙ্গদর্শনকে সর্বজনপাঠ্য করে তোলার প্রয়াস করবেন। নব্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপামর সাধারণের সহৃদয়তা বৃদ্ধির প্রয়াস তাঁদের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। ভাষার বন্ধনের সাহায্যে জাতিগত সংহতিস্থাপন, সমাজের মঙ্গলসাধন, উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে অনৈক্যের অপসারণ; এই সকল চিন্তা ও বক্তব্য বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা ও সমাজ সম্বন্ধে গভীর দূরদৃষ্টির পরিচয় বহন করে। জাতিগত ঐক্য স্থাপিত না হলে যে ধ্বংস অপরিহার্য একথা প্রমাণ করতে তিনি ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত চয়ন করেছেন। রোম, এথেন্স, ইংলন্ড এবং আমেরিকা ইহার উদাহরণস্থল। প্রাচীন ভারতবর্ষে এক সময়ে বর্ণগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে এদেশের অনিষ্ট ও অমঙ্গল হয়েছে এখন বর্ণগত পার্থক্য কিছু পরিমাণে লোপ পেয়েছে বটে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষা এবং সম্পত্তির প্রভেদে অন্যপ্রকার পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধেও এই সমস্যার কথা বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই বিষয়টি অনেক আগেই অনুধাবন করেছিলেন। 'পত্রসূচনা' তার প্রমাণ।

যাইহোক সামাজিক স্তরে এই যে বিভেদ, এর মূলে, বঙ্কিমের বিবেচনায়, আছে ভাষার ব্যবধান। সুশিক্ষিত বাঙালির মনোভাব যদি বাংলা ভাষায় প্রচারিত না হয় তবে সাধারণ বাঙালি তার মর্ম উপলব্ধি করতে পারবে না। সুশিক্ষিত বাঙালি রচনার বেলায় বাংলা ভাষা গ্রহণ করতে পারে না। কেননা বঙ্কিমের আক্ষেপ 'সুশিক্ষিতে' বাংলা পড়েনা। "সুশিক্ষিতে যাহা পড়িবে না, তাহা সুশিক্ষিতে লিখিতে চাহে না।" অন্যদিকে ভালো বাংলা বই, পত্রপত্রিকা কোথায় যে সুশিক্ষিত লোক তা পাঠ করবে? অতএব উঁচুমানের পত্র-পত্রিকার প্রয়োজন। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন সেই প্রয়োজনেই আবির্ভুত। — একথা বঙ্কিমের প্রতিপাদ্য। তিনি বলেন—"আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙালীর পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব, এইমাত্র বলিতে পারি। যত্নের সফলতা ক্ষমতাধীন। এই আমাদিগের প্রথম উদ্দেশ্য।" এরপর এই পত্রিকা প্রকাশের আরো দুটি উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন লেখক। (১) এই পত্রিকা কৃতবিদ্যা বাঙালীদের মুখপত্র হোক। এই পত্র কোনো বিশেষ পক্ষের বা সম্প্রদায়ের নয়। (২) যাতে নব্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপামর সাধারণের সহৃদয়তা বৃদ্ধি পায় এই পত্রিকা তার জন্য চেষ্টিত।

হয়তো এসব বাসনা সম্পূর্ণ সফল হবে না, হয়তো দীর্ঘজীবী হবে না এ প্রয়াস, তবু চেষ্টা মাত্রেরই একটি সুফল আছে। সেই ভরসায় এই পত্রিকা-সম্পাদক উপসংহারে লিখেছেন—"এ জগতে কিছুই নিষ্ফল নহে। একখানি সাময়িক পত্রের ক্ষণিক জীবনও নিষ্ফল হইবে নাঙ্গ.... কালস্রোতে এ সকল জলবুদ্বুদ মাত্র। এই বঙ্গদর্শন কালস্রোতে নিয়মাধীন জলবুদ্বুদ স্বরূপ ভাসিল; নিয়ম বলে বিলীন হইবে। অতএব ইহার লয়ে আমরা পরিতাপযুক্ত বা হাস্যস্পদ হইব না। ইহার জন্ম কখনই নিষ্ফল হইবে না। এ সংসারে জলবুদ্বুদও নিষ্কারণ বা নিষ্ফল নহে।"

২.১.১.৩ : ভারতবাসীদিগের একতার উপায় : কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪)

উনিশ শতকের বিতর্কিত ব্রহ্মবাদী ব্যক্তিত্ব কেশবচন্দ্র সেন। কোলকাতার কলুটোলা নিবাসী প্যারীমোহন সেনের দ্বিতীয় পুত্র কেশবচন্দ্র। তাঁর পিতামহ রামকমল সেন হুগলী জেলার গৌরীভা গ্রাম থেকে কলুটোলায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁর ১১ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়। পিতামহর মৃত্যু হয়েছিল আরো ৫ বছর আগে। ফলে তাঁর অভিভাবকত্ব করেন জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন। বংশসূত্রে তাঁরা বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন পরম বৈষ্ণব। হিন্দু কলেজে ৭ বছর বয়স থেকে ১০ বছর পড়াশুনা করেন তিনি। মাঝে কিছুদিন নতুন প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটনে ভর্তি হলেও আবার হিন্দু কলেজে ফিরে আসেন। কিন্তু পরীক্ষা চলাকালে কোনো অপরাধে তাঁকে শাস্তি ভোগ করতে হয় ও আর পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। এর ফলে তিনি গভীর মানসিক আঘাত পান এবং অধ্যাত্ম ভাবনার দিকে ঝুঁকে পড়েন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয়সূত্রে যুবক কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন ও ১৮৫৭ সালের দিকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। সুবক্তা, মেধাবী ও কর্মোদ্যোগী কেশবচন্দ্রকে পেয়ে দেবেন্দ্রনাথেরও কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে কেশবচন্দ্রের নতুন নতুন উদ্যোগ ও প্রক্রিয়া ব্রাহ্মধর্মের পুরাতনপন্থীদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করে। ফলে দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন। ১৮৬৬-র শেষ দিকে (১১ নভেম্বর) কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেবেন্দ্রনাথদের ব্রাহ্মগোষ্ঠী 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে অভিহিত হয়। নতুন ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজের সংস্কার পন্থা ও বৈষ্ণবীয় নামকীর্তন প্রক্রিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক নিন্দিত হতে থাকে। এই সব কাজে বক্তৃতায় পরিশ্রমে ভগ্নস্বাস্থ্য কেশবচন্দ্রের মৃত্যু হয় বহুমূত্র রোগে, ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ জানুয়ারি। "কেশবচন্দ্রের অসামান্য মনীষা মুখ্যতঃ দেশের ধর্ম এবং সমাজ সংস্কারগত প্রয়োজনেই নিযুক্ত হইয়া ছিল। বাগ্মিতা, সংবাদপত্র পরিচালনা ও ধর্মোপদেশাশ্রিত রচনা তাঁহার লোকোত্তর প্রজ্ঞার সার্থক নিদর্শন। কেশবচন্দ্র প্রধানত ধর্মতাত্ত্বিক ছিলেন। তাঁহার নিত্যনূতন ধর্মীয় চিন্তাধারা বিবিধ ধর্মমূলক প্রবন্ধের মধ্য দিয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছে এবং বাংলা ভাষায় কেশবচন্দ্র যে অভিনব ভঙ্গী ও বাক্যগ্রন্থনের সরল কৌশল প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহার এক স্বতন্ত্র সাহিত্যিক রূপও উন্মোচিত হইয়াছে। বঙ্কিমপর্বে কেশবচন্দ্রের এই স্বতন্ত্র সাহিত্যিক সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিবার নহে।" [অধীর দে /আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা (১ম), পৃষ্ঠা-১৮৭] একটা ব্যাপারে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে অন্য গদ্যকারের পার্থক্য আছে। তাঁর কোনো বাংলা রচনাই তিনি নিজে লেখেননি। তাঁর সমস্ত বক্তৃতা বা ধর্ম উপদেশ তাঁর অনুগত শিষ্যরাই অনুলিখন করেছেন। এবং পরে কেশবচন্দ্র সেগুলি সংশোধন ও পরিমার্জন করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবে গ্রন্থকারের রচনার ভাবপ্রবাহ ও স্বতস্ফূর্ততা এর মধ্যে কিছু পরিমাণে হলেও ব্যাহত ও ক্ষুণ্ণ।

কেশবচন্দ্রের প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি হল—

১। সেবকের নিবেদন (১৮৮০), ২। জীবনবেদ (১৮৮৪), ৩। দৈনিক প্রার্থনা (১৮৮৪-৮৫), ৪। ব্রহ্ম গীতোপনিষৎ (১৮৮৬, ৯৩), ৫। ব্রাহ্মিদিগের প্রতি উপদেশ (১৮৮৭), ৬। সাধু সমাগম (১৮৮৭), ৭। মাঘোৎসব (১৮৮৮), ৮। ব্রহ্মোপসনা (১৯০১), ৯। প্রতিমা (১৯১২), ১০। দৈনিক উপাসনা (১৯১৬), ১১। আচার্য্যের উপদেশ (১৯১৬-১৮), ১২। সঙ্গত (১ম-১৯১৬, ২য়-১৯৩৮)।

কেশবচন্দ্রের অনেকগুলি রচনাই তাঁর বক্তৃতার বহু দিন পরে তাঁর শিষ্যদের দ্বারা গ্রন্থিত। কেশবচন্দ্রের অধিকাংশ রচনাই ধর্মবিষয়ক। তাঁর ব্রাহ্ম ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তিনি তাঁর সব বক্তৃতায় যুক্ত করে দিয়েছেন। তা সে সব বক্তৃতা শিক্ষা, সমাজ বা অন্য যে কোনো বিষয় নিয়েই হোক না কেন। 'জীবনবেদ' কেশবচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা। ধর্মসাধক কেশবচন্দ্রের আত্মজীবনাশ্রিত এই গ্রন্থে তাঁর

আধ্যাত্ম জীবনের প্রসঙ্গ থাকলেও এখানে 'মানুষ' কেশবচন্দ্রের পরিচয় সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে যায়নি। মানুষ কেশবচন্দ্র যে ক্রমান্বয়ে সাধক পুরুষে রূপান্তরিত হয়েছেন—এ কথার বর্ণনায় 'জীবনবেদ' অধিক আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। কেশবচন্দ্রের কিছু পত্র আছে যা মহৎভাব ও সমৃদ্ধ ভাষার ব্যবহারে সাহিত্য গুণান্বিত হয়ে গদ্যকার কেশবচন্দ্রের অনন্যতার স্মারক হয়ে আছে। বিশেষ করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর পত্রগুলি এ ব্যাপারে দৃষ্টান্তস্থল হতে পারে।

২.১.১.৪ : প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য

'ভারতবাসীদিগের একতার উপায়' প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয় সুলভ সমাচারে ৫ চৈত্র, ১২৮০ সালে। যথেষ্ট বস্তুবাদী ও যুক্তিবাদী মানসিকতায় রচিত এই প্রবন্ধে কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষের মৌলিক একটি সমস্যার সমাধানসূত্র অনুসন্ধান করেছেন। ভারতবর্ষের সমস্ত দুঃখের মূলে আছে এই দেশের অনৈক্য। এই অনৈক্যের সমাধান না হলে দেশের উন্নতি অসম্ভব। এজন্য ভারতবর্ষের অনৈক্যের উৎস সন্ধানে অগ্রসর হয়েছেন কেশবচন্দ্র।

ভারতবর্ষের মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের ঐক্য অসম্ভব। এবিষয়ে কেশবচন্দ্র আর কোনো মন্তব্য করেননি। তাঁর বক্তব্য, পক্ষান্তরে যখন আর্যরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন তাঁদের মধ্যে ঐক্য ছিল। এখন সেই ঐক্য নেই কেন? কেশবচন্দ্র এজন্য দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন— ১. ভাষা। যতদিন সমগ্র ভারতবর্ষে এক ভাষা না হবে ততদিন কিছুতে একতা সম্পন্ন হবে না। যতদিন আর্যদের একমাত্র সংস্কৃত মাতৃভাষা ছিল ততদিন অনৈক্য ছিল না। কালক্রমে আর্যরা আদিম ভারতবাসীর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে বর্ণসঙ্কর হলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবং সমগ্র ভারতবর্ষে আর্যরা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তখন আর্যদের ভাষা ও আদিম অধিবাসীদের ভাষা মিশ্রিত হয়ে অনেক বিকৃত ভাষা দেখা দিল এবং ভাষাভেদে দলভেদের উৎপত্তি হল। নিজের ভাষাকে উৎকৃষ্ট মনে করে অন্যের ভাষাকে নিকৃষ্ট ভাবার চেষ্টায় জাতি ও সম্প্রদায়ে বিদ্বেষ দেখা দিল। এখন ভারতবর্ষে অনেক ভাষা প্রচলিত—এর মধ্যে বাংলা, হিন্দি, উর্দু, উৎকল, পাঞ্জাবী, দ্রাবিড়, কর্ণাটি, মহারাষ্ট্রি, তৈলঙ্গী — প্রধান। সংস্কৃত এখন মৃতপ্রায় ভাষা। এখন প্রদেশে প্রদেশে ভাষা সূত্রে বিরোধ। সমস্ত বঙ্গদেশে এক বাংলা ভাষা প্রচলিত হলেও কোলকাতার বাংলা ভাষা ও পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের বাংলা ভাষার মধ্যে একতা নেই—"কলিকাতা অঞ্চলের লোকেরা পূর্ব বাঙ্গালার লোকদিগকে বাঙ্গাল বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। বাঙ্গালদিগকে মনুষ্যের মধ্যেই গণ্য করেন না। আবার পূর্ববঙ্গের লোকেরা শ্রীহট্ট ত্রিপুরা চট্টগ্রামের লোকেদেরও বাঙ্গাল বলে অবজ্ঞা করে। কিন্তু পূর্ববঙ্গের লোকেদের মধ্যেও বেশ কিছু ভালো লোক আছেন। তাঁদের অনেক আচার-আচরণ কোলকাতার লোকদের থেকেও ভালো। অথচ তাঁদের মধ্যে বিরোধের একমাত্র কারণ ভাষা তথা উচ্চারণের দূরত্ব।"

ভাষার একতা ছাড়া যদি ভারতবর্ষে একতা না আসে তা হলে সারা ভারতের জন্য কোনো এক ভাষার সন্ধান করা যায় না কি? এজন্য লেখকের পরামর্শ, সারা ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ভাষা হিন্দী। এই হিন্দী ভাষাকে যদি ভারতবর্ষে একমাত্র ভাষা করা যায়—তাহলে এই সমস্যা মিটতে পারে। তবে এ ব্যাপারে রাজশক্তি ইংরেজের সাহায্য ও সহযোগিতা দরকার। তবে ইংরেজ সরকার তা চায় না। কারণ বিজিত জাতির মধ্যে একতা বিজয়ী ইংরেজের ভয়ের কারণ হতে পারে। তাই একাজ দেশীয় বড়ো বড়ো রাজারা করতে পারেন। এ ব্যাপারে ইংরেজদের ভয়ও অমুলক। কেননা কোনো দেশে একটি ভাষার একতা থাকলে সে দেশ অপরাজেয় হয় না, তা হলে ফরাসীরা জার্মানীর দ্বারা পরাজিত হয় কেন?

কেবল ভাষা-ঐক্য নয়, উচ্চারণের ঐক্যও দরকার। এজন্য এক ভাষাভাষী মানুষদেরও সুশিক্ষিত হতে হবে। দ্বিতীয় বিষয় ধর্ম। যেমন ভাষা এক না হলে একতা হতে পারে না, তেমনি ধর্ম এক না হলে

কোনো কালে একতা হতে পারে না। আমাদের এদেশে মুসলমান এরূপ প্রভেদ তো আছেই, অন্যদিকে হিন্দুদের মধ্যে সম্প্রদায় ভেদে অনৈক্যের দুর্লঙঘ্য প্রাচীর। একে কিভাবে অতিক্রম করা যায়? কেশবচন্দ্র খুব স্পষ্টভাবে এবারে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার প্রসঙ্গে চলে আসেন। তিনি বলেন—"আর্য জাতির চিরপূজ্য একমাত্র অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মের উপাসনা সমস্ত ভারতে প্রচলিত হইলে সর্বপ্রকার অনৈক্য চলিয়া যাইবে।" এক ভাষা ও এক ধর্ম প্রচলিত হলে ভারতবর্ষের সবরকমের অনৈক্য অপসৃত হবে।

সমাজ রাজনীতির বিচিত্র জটিল ছককে ধর্মপ্রচারক কেশবচন্দ্র অনেকটা ধরতে পারলেও সমগ্রটা উপলব্ধি করতে পারেননি। তিনি কেবল তাঁর নিজস্ব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইছেন। এক ভাষা এক ধর্ম প্রচলিত হলেই যে জাতীয় ঐক্য প্রচলিত হয় না তার প্রমাণ পাকিস্তান, বাংলাদেশ প্রমুখ রাষ্ট্র বরং জাতীয় ভাব গড়ে তোলার জন্য যে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর সাম্যবিধানেই যে একটা শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে বিশ শতকে গড়ে ওঠা সোভিয়েত দেশ তার প্রমাণ এবং সোভিয়েতের বিনষ্টির কারণও পূর্বোক্ত সূত্রের ওপর নির্ভরশীল।

২.১.১.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা দেশের কোন্ কোন্ সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে তুলতে চেয়েছে এবং কিভাবে? —আলোচনা করো।

২। 'বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নব্য লেখকদের প্রতি যে আহ্বানগুলি রেখেছেন, তা নিজের ভাষায় আলোচনা করো।

৩। 'ভারতবাসীদিগের একতার উপায়' প্রবন্ধে লেখক ভারতবাসীদের একতার যে যে উপায় সন্ধান করেছেন তার উল্লেখ করো এবং ঐ বক্তব্য কতটা সমর্থনযোগ্য বলে তুমি মনে করো তা বুঝিয়ে দাও।

৪। 'বঙ্গদর্শনের পত্র সূচনা' প্রবন্ধটির প্রকাশকাল কত? প্রকাশকালে রচনাটির নাম কি ছিল?

৫। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের প্রধান তিনটি উদ্দেশ্য—লেখকের অনুসরণে বুঝিয়ে দাও।

৬। আমাদের দেশের জাতীয় ঐক্যের ব্যাপারে কেশবচন্দ্রের ধারণা কী ছিল?

৭। ভাষা ও ধর্মের ঐক্য বলতে কেশবচন্দ্র কী বলতে চেয়েছেন?

৮। ভারতের জাতীয় ঐক্য প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্রের যুক্তিগুলি কতটা গ্রহণযোগ্য—আলোচনা করো।

পর্যায়গ্রন্থ - ১

একক - ২

বিন্যাসক্রম :

২.১.২.১ : হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও : শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯)
২.১.২.২ : প্রবন্ধের মূলভাব
২.১.২.৩ : ডেভিড হেয়ারের জীবন চরিত : প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)
২.১.২.৪ : বাঙালী জীবনে ডেভিড হেয়ারের অবদান
২.১.২.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.১.২.১ : হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও : শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯)

উনিশ শতকের মনোজ্ঞ ইতিহাসকার শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’ গ্রন্থের জন্য সংস্কৃতি-মনস্ক বাঙালীর কৃতজ্ঞতা ভাজন। শিবনাথের বংশগত পদবী ভট্টাচার্য। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি সুন্দরবন লগ্ন চাংড়িপোতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শিবনাথ। পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য, মাতা গোলকমণি দেবী। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগর যখন প্রথম বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠান করেন মাত্র ৯ বছর বয়সে শিবনাথ তাতে যোগ দেন। সংস্কৃত, বাংলা ও পাশ্চাত্য ভাষায় পারঙ্গম শিবনাথ পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি কেশবচন্দ্র সেনের কাছে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে কেশবচন্দ্রের প্রভাবে মুক্ত হয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করে তাকে দৃঢ় নিয়মতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে এম.এ. পাশ করার পর লাভ করেন ‘শাস্ত্রী’ উপাধি। তিনি ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, এছাড়া তাঁকে দেখি জাতিভেদ প্রথা দূরীকরণ, সুরাপান নিবারণ, নারীমুক্তি, পতিতা-পুনর্বাসন প্রভৃতি সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত থাকতে। রাজনৈতিক সচেতনতায় ভারতসভা স্থাপন করেন আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায়। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেন তিনি।

১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে ইংলন্ডে অ্যানি বেসান্তের বাসগৃহে সমাজতান্ত্রিক নেতাদের সান্নিধ্যলাভ করেন শিবনাথ। ১৮৯০তে বৃটিশ কিন্ডার গার্টেন পদ্ধতির অনুসরণে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেও তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান আছে। তাঁর সমকালের বাংলার শিক্ষা সাহিত্য এবং নানাবিধ সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে অভিন্নভাবে জড়িত ছিলেন শিবনাথ। ব্রাহ্মধর্মের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তাঁর লেখালেখিতে প্রধানত ধর্ম ও সমাজসংস্কার বিষয়ই প্রাধান্য লাভ করেছে। তবে তিনি কাব্য ও উপন্যাস রচনায়ও পারঙ্গম ছিলেন। প্রথমদিকে প্রকাশিত তাঁর একটি উৎকৃষ্ট কাব্য—‘নির্বাসিত বিলাপ’ এর প্রশংসা করেছেন হরপ্রসাদ মিত্র। সাহিত্য বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ সংখ্যায় কম হলেও গুণগত উৎকর্ষে যথেষ্ট গুরুত্ব পাবার যোগ্য। তাঁর ‘ঋষিত্ব ও কবিত্ব’ কিংবা ‘কাব্য ও কবিত্ব’ প্রবন্ধ একথার প্রমাণ। তাঁর অন্যান্য বিষয়ে লেখা প্রবন্ধের মধ্যে আছে ঃ—‘এই কি ব্রাহ্মবিবাহ’, ‘গৃহধর্ম’, ‘জাতিভেদ’, ‘রামমোহন রায়, ‘বক্তৃতা স্তবক’, ‘মাঘোৎসবের বক্তৃতা’, ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’, ‘প্রবন্ধাবলী মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র', 'ধর্মজীবন' (৩ খণ্ড) এবং 'আত্মচরিত'। ১৮৭৮ থেকে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এইসব গ্রন্থ লেখা হয়েছে।

উনিশ শতকে আমাদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বিষয়ে আলোচনা আছে 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে। বিখ্যাত পুরুষ রামতনু লাহিড়ীর জীবনবৃত্তকে অনুসরণ করে সমকালীন কোলকাতা কেন্দ্রিক সৃজ্যমান রেনেসাঁ-পুষ্ট বাঙালী জীবন ইতিহাস পরিক্রমা করেছেন শিবনাথ। আর আত্মজীবনকে অবলম্বন করেও তিনি বিচরণ করেছেন সমকালের বৃহত্তর সামাজিক বৃত্তে। ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য শিবনাথ তাঁর আত্মচরিতে যেসব পরিহাসোজ্জ্বল লঘু কৌতুকের অবতারণা করেছেন তা স্মৃতিমেদুর সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে উঠেছে। তাঁর ভাষ্য শৈলীতে পাণ্ডিত্যের চাইতে বুদ্ধিমত্তার ছাপ আছে যথেষ্ট। নিরাবেগ যুক্তিনিষ্ঠ ও তথ্যনির্ভর বক্তব্য স্থাপনে শিবনাথের গদ্য সাবলীল ও সমর্থ।

২.১.২.২ : প্রবন্ধের মূলভাব

'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থের চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ থেকে নির্বাচন ও সম্পাদনা করে 'হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও'—এই জীবনীমুলক প্রবন্ধ সংকলিত। শিবনাথ শাস্ত্রীর দীর্ঘ ও বিস্তৃত রচনাকে কিছুটা সংক্ষিপ্ত করে এই প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে। সংকলিত এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও (Hঙ্গnry Vivian Derozio)-র জীবনীর উল্লেখ সূত্রে উনিশ শতকের নবজাগরণে এই মহৎ মানুষটির অবদান কতখানি তা নতুন যুগের পাঠকের কাছে উপস্থাপন করা। উনিশ শতকে জাতি গঠনের ক্ষেত্রে স্বাধীন ও মুক্তচিন্তার অধিকারী যুবক শিক্ষায় ডিরোজিওর অবদান এই প্রবন্ধের পাঠকের কাছে স্পষ্ট উপলব্ধ হবে।

ডিরোজিও যখন হিন্দু কলেজে শিক্ষক ছিলেন রামতনু লাহিড়ী তখন সেখানে ছাত্র। ডিরোজিও জাতিতে পর্তুগীজ বংশোৎপন্ন ফিরিঙ্গি। কোলকাতার পদ্মপুকুর এন্টালির কাছে মামলালি দরগার কাছে এক বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মসাল ১৮০৯। ডিরোজিওর পিতা ছিলেন এক সওদাগরি অফিসের বড় কর্মী। ফলে তাঁর পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল। ডিরোজিওর বড়ো ভাই ফ্রাঙ্ক কুসংসর্গে পড়ে বিপথগামী হন। দ্বিতীয় ভ্রাতা ক্লাডিয়াসকে শিক্ষার জন্য তাঁর পিতা স্কটল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেন। ডিরোজিওর প্রথমা বোন সোফিয়া ১৭ বছরে মারা যান। আর ছোটো বোন এমিলিয়া ডিরোজিওর সঙ্গিনী ও এদেশে সমাজ আন্দোলন ও শিক্ষাকর্মে উৎসাহ দাত্রিনী ছিলেন।

ডিরোজিওর শিক্ষালাভ হয় স্কটল্যান্ড থেকে আগত এক স্বাধীন ও মুক্তচিন্তার অধিকারী শিক্ষক ড্রমণ্ড এর কাছে। ধর্মতলায় তাঁর স্কুলে ডিরোজিও ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা অর্জন করেন। এরপর পিতার অফিসে কিছুদিন কেরাণীগিরিও করেন তিনি। তারপর ভাগলপুরে মাসির বাড়িতে থাকতেন। ভাগলপুরে থাকাকালে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা ও দার্শনিক প্রবন্ধ লিখে বিখ্যাত হন। তার মধ্যে Fakir of Jhungura এবং জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের গ্রন্থ সমালোচনা বিখ্যাত, এই সময়ে তাঁর লেখালেখি Dr. Grant এর সম্পাদিত Indian Gazette-এ প্রকাশিত হতো এবং কোলকাতার শিক্ষিত সমাজে তাঁর রচনার সুখ্যাতি প্রচারিত হতে থাকে। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে ভাগলপুর থেকে কোলকাতায় এসে তিনি তাঁর কবিতা গ্রন্থ প্রকাশের চেষ্টা করতে থাকেন। এবং ঐ সময়ে হিন্দু কলেজে একটি শিক্ষকের পদ খালি থাকায় স্কুল কমিটি সেই পদে ডিরোজিওকে ১৮২৮ এর মার্চে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন।

অসাধারণ মেধাবী ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ডিরোজিও চতুর্থ শ্রেণীর সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হলেও অচিরকালের মধ্যে হিন্দু কলেজের সব শ্রেণীর ছাত্রের তিনি হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন। তাঁকে ঘিরে ছাত্ররা সব সময়েই শিক্ষা ও আনন্দ উপভোগ করতো ক্লাস ও ক্লাসের বাইরে। স্কুল ও স্কুলের বাইরে নিজের বাড়িতেও ছাত্রদের জন্য অবারিত ছিল ডিরোজিওর দরজা। জনপ্রিয় এই শিক্ষকটি বাঙালী হিন্দু ছাত্রদের কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে ভালো মন্দের তর্কবিচার দিয়ে জীবনকে বুঝবার শিক্ষা দিতে লাগলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত Academic Association-এ কাজে প্রবল সহায়ক হয়েছিল। এই সভায় মুক্ত ও জ্ঞানবাদী ভাষণও আলোচনা হতো। সে আলোচনায় ডিরোজিওর ছাত্রশিষ্যরা অংশগ্রহণ করতেন এবং এই সভায় তৎকালের কলিকাতাস্থিত জ্ঞানী ও পণ্ডিতেরা উপস্থিত থেকে সবিস্ময় প্রশংসা করতেন। ডেভিড হেয়ার, লর্ড বেন্টিকের প্রাইভেট সেক্রেটারি কর্নেল বীটসন, বিশপ কলেজের অধ্যক্ষ ড. মিলস তাঁদের অন্যতম।

ডিরোজিওর যুক্তিবাদী শিক্ষার ফলে নতুন উৎসাহী যুবকেরা কট্টরপন্থী সংস্কারাবদ্ধ পরিবারের বয়স্কদের সঙ্গে আচার বিচারের ব্যাপারে নানান তর্ক ও অশান্তি সৃষ্টি করে। জাতি সংস্কার অগ্রাহ্য করে, নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করে, সুরাপান ইত্যাদি করে গোটা সমাজকেই বিব্রত ও বিরক্ত করে তুলতে থাকে। এর ফলে ডিরোজিওর বিরুদ্ধে নানান সত্য-মিথ্যা অভিযোগ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বৃন্দাবন ঘোষাল নামে এক ব্রাহ্মণ ডিরোজিওর ম্লেচ্ছাচারের নিন্দা ছড়ানোতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তখন ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজের প্রধান শিক্ষক সংযত হতে নির্দেশ দেন।

এই সময়েই রামমোহন রায় তাঁর ব্রহ্মবাদী নবধর্ম প্রচার করতে থাকেন। তাঁর ব্রহ্ম উপাসনাগৃহ সকল জাতির মানুষের জন্য মুক্ত বলে তিনি ঘোষণা করেন। এবং তাঁর ঈশ্বরব্রহ্ম যে নিরাকার একথা প্রচারিত হওয়ায় পৌত্তলিক হিন্দুরা আরো উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। এই সময়ে খ্রিষ্টিয় মিশনারী আলেকজাণ্ডার ডাফ ইংরেজী ভাষার স্কুল ও খ্রিস্টধর্ম প্রচারের চেষ্টায় ছিলেন, রামমোহন তাঁকে সহযোগিতা করেন। তাঁর জন্য একটি বাড়িও ঠিক করে দেন। এবং ৬টি ছাত্রও জোগাড় করে দেন। এতেও হিন্দুসমাজ রামমোহনের ওপর ক্ষিপ্ত হয়। এর মধ্যেই রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন।

এই উত্তেজিত সময়ে কট্টরপন্থী হিন্দু অভিভাবকরা শিক্ষক ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে বিতাড়িত করবার চেষ্টা করতে থাকেন। কলেজ কমিটি ১৮৩১-এর এপ্রিল মাসের সভাতে ডিরোজিওকে চাকরী থেকে অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ডাক্তার উইলসন এই সিদ্ধান্ত জানালে ডিরোজিও সেই সিদ্ধান্তক্রমে পদত্যাগ করেন। চাকরী ত্যাগ করে ডিরোজিও একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করে সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। পত্রিকাটির নাম 'ইস্ট ইন্ডিয়ান'। এটি ছিল দৈনিক পত্রিকা। এবং দ্রুত পত্রিকাটি গ্রাহকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

কিন্তু এরপর আর বেশিদিন ডিরোজিও জীবিত ছিলেন না। ১৭ ডিসেম্বর তিনি কলেরায় আক্রান্ত হন ও ২৪ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর একজন অপদার্থ ইংরেজ ডিরোজিওর পত্রিকার সম্পাদনা করেন এবং ডিরোজিওর মাতা ও ভগিনীকে প্রচুর দেনাগ্রস্ত করে দেন।

ডিরোজিও মাত্র তিন বছর হিন্দু কলেজের শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বাংলার নবজাগরণের যে বীজমন্ত্র নবীন প্রজন্মের কানে দিয়ে গিয়েছিলেন তার সুদূরপ্রসারী ফল লাভ করেছে বাঙালী জাতি। কিন্তু ডিরোজিওকে তার প্রাপ্য সম্মান আমরা দিতে পারিনি। সেই ক্ষোভ জানিয়েছেন শিবনাথ এই রচনাতেও—"ডিরোজিও অন্তর্হিত হইলে কিছুদিন তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাব চলিয়াছিল; এবং তদর্থ একটি কমিটিও গঠিত হইয়াছিল, কিন্তু কালাবর্তে সকলি মিলাইয়া গেলঙ্গ নব্যবঙ্গের একজন প্রধান শিক্ষক ও দীক্ষা গুরুর চিহ্নমাত্র রহিল না।"

২.১.২.৩ : ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত / প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের সূত্রধার হিসেবে বিবেচিত প্যারীচাঁদ মিত্র। বাংলা গদ্যের কথ্যরূপের প্রতি অনুরাগ দেখিয়ে উনিশ শতকের বাঙালী জীবনকে ভাষায়িত করার কাজে নিমগ্ন ছিলেন। 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনা করে তিনিই বাঙালীকে দেখিয়ে দিলেন, বেতাল পঞ্চবিংশতি, তুতিনামা, আরব্য উপন্যাস, গোলে বকায়লি ইত্যাদির বাইরেও গল্পরস আছে। রূপকথা ও গালগল্পের বাইরে বাঙালীর সমকালের বাস্তব জীবন-পরিস্থিতির দিকে আকর্ষণ করলেন প্যারীচাঁদ। প্যারীচাঁদ 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। আর রাধানাথ শিকদারের সঙ্গে 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি সাময়িক পত্র সম্পাদনা করতেন। অবশ্য কথ্য ও সাধুমিশ্রিত বাংলা গদ্যরীতিতে একাধিক রচনা লিখলেও শেষ অবধি প্যারীচাঁদ ঢলে পড়েন নীতি উপদেশ ও আধ্যাত্মচর্চার দিকে এবং ক্রমাগত তিনি সাধুরীতিকেই অবলম্বন করেন।

'ডেভিড হেয়ারের জীবন চরিত' ছাড়াও তাঁর আরো কিছু উল্লেখযোগ্য রচনা আছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে। এরপর থেকে ১৮৮১-র মধ্যে অন্তত ১০টি বাংলা গ্রন্থ রচনা করেন তিনি। তাঁর রচিত একটি ব্যঙ্গধর্মী নক্সা—'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯), এছাড়া তাঁর রচনার মধ্যে আছে—'রামারঞ্জিকা' (১৮৬০), 'কৃষি পাঠ' (১৮৬১), 'ডেভিড হেয়ারের জীবন চরিত' (১৮৭৮), যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫), 'এতদ্দেশীয় স্ত্রী লোকদের পূর্বাবস্থা' (১৮৭৯)। এছাড়া তাঁর ৩টি উপন্যাসও আছে ঃ 'অভেদী', 'আধ্যাত্মিকতা', 'বামাতোষিণী'। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত গ্রন্থাবলী হল ঃ 'ঈশ্বর উপাসনা', 'উপাসনা', 'পিতাপুত্র'। বাংলা ছাড়া ইংরেজিতেও তাঁর একাধিক গ্রন্থ আছে, যেমনঃ 'ডেভিড হেয়ার', 'দেওয়ান রামকমল সেন', 'স্ট্রে থট্‌স অন্ স্পিরিচ্যুয়েলিজম্'—প্রভৃতি।

২.১.২.৪ : বাঙালী জীবনে ডেভিড হেয়ারের অবদান

ডেভিড হেয়ারের জন্ম ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি। স্কটল্যান্ডের অ্যাবেরডিন শহরে। মামার বাড়িতে। ডেভিডরা ৪ ভাই, জোসেফ, আলেকজাণ্ডার, জান ও ডেভিড। ডেভিড হেয়ার কোলকাতায় আসার কয়েক বছর পর তাঁর দ্বিতীয় ভাই আলেকজাণ্ডার কোলকাতায় আসেন। তিনি এক কন্যার জন্ম দেন ও মারা যান। পরবর্তীকালে জানও ভারতবর্ষে আসেন ও প্রচুর উপার্জন করে দেশে ফিরে যান। ডেভিড হেয়ারদের পৈতৃক ব্যবসা ছিল ঘড়ি নির্মাণ। ডেভিড হেয়ার তাঁর ২৫ বছর বয়সে কোলকাতায় আসেন। তাঁর জীবনকে স্পষ্ট দুটো ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১৮১৯ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন একজন দক্ষ ঘড়ি কারিগর ও ঘড়ি ব্যবসায়ী। ১৮২০ সাল থেকে পুরোপুরি এদেশের শিক্ষা সংস্কার এবং শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে সর্বত্যাগী মানুষ। ঘড়ির ব্যবসায়ে অর্জিত প্রভূত বিত্ত ডেভিড হেয়ার এদেশের মানুষের স্বার্থে ব্যয় করেছিলেন। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের প্রথমের দিকে বন্ধু এডওয়ার্ড গ্রে-কে এক লক্ষ টাকায় তাঁর ব্যবসা হস্তান্তরিত করে তিনি সর্বাত্মকভাবে দেশের কাজে আত্মনিযুক্ত হলেন।

উনিশ শতকের কোলকাতা শহরের বাঙালি বাবুদের সংস্পর্শে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন এদেশের মানুষের রুচি ও সংস্কৃতিগত অস্বাস্থ্যের স্বরূপ। যথার্থ শিক্ষার অভাব যে এই যাত্রা, খেউড় ও পক্ষী বাবুদের কুরুচি নির্মাণ করেছে সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দিগ্ধ হন। শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় ছাত্রেরা কেবল কিঞ্চিৎ অঙ্কবিদ্যা, পত্রলেখা, জমা ওয়াসিল বাকি, গুরুদক্ষিণা ও গঙ্গার বন্দনা শিখছে।

ইংরেজী কি বাংলা কিছুই ভালোভাবে শিখছে না। ভালো পাঠ্যপুস্তক নেই। ভালো শিক্ষক নেই। এই অভাব দূর করার জন্য তিনি এদেশের যোগ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ শুরু করেন। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রমুখদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে তিনি সুপ্রিম কোর্টের প্রাধান জজ স্যার হাইড ইস্ট-এর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর কাছে ডেভিড হেয়ার এই কোলকাতা শহরে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন। হাইড সাহেব এই কাজে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে দায়িত্ব দেন। শহরের প্রধান প্রধান হিন্দুদের সমর্থন আদায়ের জন্য বৈদ্যনাথ সকলের সঙ্গে কথা বলে অনুমতি ও সমর্থন নিয়ে হাইডকে অবগত করান।

পরবর্তীকালে হাইডের বাড়িতে সভা হয়। সেখানে এদেশের বালকদের শিক্ষার্থে যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার সিদ্ধান্ত হয় তাই হিন্দু কলেজ নামে পরিচিত। প্রথমে সিদ্ধান্ত ছিল এই কলেজের অধ্যক্ষতার দায়িত্বে থাকবেন রামমোহন রায়। কিন্তু রাজা রামমোহন তাঁর সতীদাহ নিবারণী সংস্কার আন্দোলন ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য কট্টরপন্থী হিন্দুদের বিরাগভাজন ছিলেন। অতএব তাঁরা এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন না। ফলে রামমোহন নিজ ঔদার্যে অধ্যক্ষের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ালেন। তখন বিমুখ মাতব্বরেরা আবার এগিয়ে এসে অর্থ সহায়তা করলেন। কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ডেভিড হেয়ার কোলকাতায় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে অনেক টাকা সংগ্রহ করে দেন। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারিতে হিন্দু কলেজের গৃহ নির্মাণের সূত্রপাত হয়। এর আগে ১৮১৭-র প্রথম দিকে (২০ জানুয়ারি) গরাণহাটার গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে শুরু হয়েছিল হিন্দু কলেজ।

ডেভিড হেয়ার কোলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭) এবং কলিকাতা স্কুল সোসাইটি—এ দুটি সংগঠনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ছিলেন। কোলকাতায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যালয়গুলির ছাত্র পাঠ্যগ্রন্থ প্রণয়নের কাজে এই দুটি সংগঠনকে তিনি প্রভূত সাহায্য করেন। স্কুল সোসাইটির সম্পাদক হিসেবে তাঁর স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ছিল প্রশংসনীয়। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা জুভিনাইল সভা স্থাপিত হয়। এ সভার কাজ ছিল এদেশে নারীশিক্ষার প্রসার ঘটানো। এই কাজেও হেয়ার সাহেব অর্থসাহায্য করেছেন। কেরি ও মার্শম্যান শ্রীরামপুরের সর্বত্র বাংলা ভাষা চর্চার জন্য সে সভা করেন হেয়ার সাহেব সেই সভার জন্যও অর্থ ব্যয় করেছেন।

সমকালে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ডিরোজিও ছিলেন সংস্কারপন্থী। তাঁর অনুগামী হিন্দু ছাত্ররা বিপথগামী হচ্ছে দেখে কলেজ কর্তৃপক্ষ ডিরোজিওকে কলেজ থেকে বরখাস্ত করেন। কিন্তু পক্ষান্তরে ডেভিড হেয়ার ছিলেন এদেশের মানুষের অন্তরের বন্ধু। তাঁর পরোপকারিতা, দুঃখবরণ ও নিঃশর্ত সেবায় গুণমুগ্ধ হিন্দু কলেজ ও অন্যান্য কলেজের ছাত্ররা তাঁর প্রতিমূর্তি স্থাপনের জন্য এক সভা করে। এ সভা হয় মাধবচন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে। সেই সভায় ডেভিড হেয়ারকে পার্চমেন্ট পেপারে লিখিত এক প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়। সেই সম্মান সভার প্রত্যুত্তরে হেয়ার সাহেব জানান, এদেশের মানুষেরা জ্ঞানে বুদ্ধিতে ও হৃদয়ে মনস্বভাবে অনেক বড়ো। কিন্তু অজ্ঞানতা ও কুশাসনে তারা বিনষ্ট হচ্ছিল। তাদের যথার্থ জ্ঞানের আলোয় আনার কাজ তিনি করেছেন। অবশ্য তা সূচনা মাত্র। এবং তিনি জানান : "যে বীজ আমাকর্তৃক বপিত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে বৃক্ষরূপে স্বপ্রকাশ—উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করিতেছে এবং তাহার সাক্ষী আমার চতুস্পার্শে রহিয়াছে।"

কঠোপনিষদ থেকে জানা যায় জীবনযাপনের দুটি পথ—প্রেয়পথ ও শ্রেয়ঃপথ। প্রেয়পথ ইন্দ্রিয় তুষ্টিজনক —মান ও গৌরবর্ধক। আর শ্রেয়ঃপথ নিষ্কামভাবে ধর্মানুষ্ঠান। বিঘ্ন ও কঠোরতা অতিক্রম করে আধ্যাত্মিকতায় লীন হওয়া। ডেভিড হেয়ারের জীবনাচার ছিল শ্রেয়ঃপথের। মিতাহারী ও সংযমী এই

পুরুষের খাদ্যাভাসও ছিল আমাদের দেশের মানুষের মত। এদেশের মিঠাই সন্দেশ, চন্দ্রপুলি, ডাবের জল, মাগুর মাছ ছিল তাঁর প্রিয় পছন্দ। স্কুলের শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য তিনি ছিলেন অক্লান্ত পরিশ্রমী। যে সব ছাত্র খাবার বা পোশাক বা বই-এর অভাবে পড়া বন্ধ করে দিত তাদের তিনি বাড়িতে গিয়ে সাহায্য করে বিদ্যালয়ে পাঠাতেন। দুঃখী বালকদের দুর্গোৎসবের সময় বস্ত্রাদি দিতেন। তার মাতা ও ভগিনীদেরও তিনি বস্ত্রাদি বিতরণ করতেন।

মিতাহারী হলেও হেয়ার সাহেবের শরীরে ছিল যথেষ্ট শক্তি ও মনে ছিল অদম্য সাহস। আবার হৃদয়ে ছিল মমতা ও করুণা। পরের দুঃখে তিনি বড়ো সহজে বিগলিত হতেন। দুঃশীল ছাত্রদের তিনি নজরে রাখতেন। সংশোধনের চেষ্টা করতেন এবং একদিন যথার্থই তাদের 'শিক্ষিত' করে তুলতেন। ছাত্রদের চরিত্র গঠনে তাঁর চেষ্টার অনেক কাহিনী আছে।

১৮৩৫-এ পাবলিক ইনস্ট্রাক্শন কমিটি হেয়ার সাহেবের সম্পর্কে যে রিপোর্ট তৈরী করে তাতে তাঁর এই নগরীর সার্বিক মানোন্নয়নে আত্মদানের প্রশংসা ছিল মুক্ত কণ্ঠে।

কোলকাতায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ছাত্র সংগ্রহ থেকে শুরু করে নানান ব্যাপারে এই কলেজকে সাহায্য করেন। এই কলেজের ডাক্তার ব্রমালি তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে—"হেয়ার সাহেবের সাহায্য ব্যতিরেকে এ কলেজ স্থাপন করা যাইত না। এজন্য তাঁহার নিকট সংক্ষেপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।"

১৮৩৪-এ কোলকাতায় সাধারণ জ্ঞান-উপাজিকা সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। কোলকাতার নাগরিকেরা এই সভায় আলোচনা করতেন। এই সভার অনারারি সদস্য ছিলেন ডেভিড হেয়ার। ১৮৩৪-এ হিন্দু কলেজের কাছে যে বিদ্যালয় 'বঙ্গভাষা উত্তমরূপে শিক্ষার জন্য' প্রতিষ্ঠিত হয় তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য ডেভিড হেয়ারকে আহ্বান করা হয়। — এ আহ্বান তাঁকে সম্মান জানানোর জন্য।

এদেশের সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্যও ডেভিড হেয়ার সচেষ্ট ছিলেন। মানুষের প্রতি অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে যোদ্ধা ছিলেন ডেভিড হেয়ার। ১৮১৫-তে মরিচ দ্বীপে কুলি পাঠানো শুরু হয়। অনেকের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ঠিকাদারেরা না জানিয়ে লোক সংগ্রহ করে নিয়ে যেত। এরকম একটি খবর পেয়ে ডেভিড হেয়ার নিজে অভিযান চালিয়ে বন্দী কুলিদের মুক্ত করেন। ডেভিড হেয়ার ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে ৩১ মে রাতে কলেরায় আক্রান্ত হন ও পরের দিন ১ জুন মৃত্যুমুখে পতিত হন। গ্রে সাহেবের বাড়িতে। নিজের বাড়িও পাওনাদারদের ঋণ শোধ করতে দিয়ে দিয়েছিলেন এই পরোপকারী দানবীর। সেদিন অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছিল। তবু লোকে লোকারণ্য হয়েছিল তাঁর মৃত্যুমিছিল। হিন্দু কলেজের সামনে তাঁর সমাধি হয়েছিল।

বাল্যকালে পিতার অভাবের সংসারের জন্য অল্প বয়সে ঘড়ির কারিগর হয়েছিলেন। ফলে বেশিদূর পড়াশুনা সম্ভব হয়নি। তাই কোলকাতায় যখন তিনি আসেন তখন কোলকাতার মানুষের শিক্ষাবিস্তারের কাজে আত্মনিযুক্ত হলেও কোনো বড়ো পদে নিজেকে অধিষ্ঠিত করেননি। কিন্তু আমৃত্যু ছিলেন পরোপকারী ও বিদ্যানুরাগী। নব্যবাংলা সৃজনে যে কজন বিদেশী মানুষের শুভ ইচ্ছা ও আত্মত্যাগ আছে ডেভিড হেয়ার তাঁদের অন্যতম। একালের বাঙালী প্রজন্মের কাছে তাই ডেভিড হেয়ারের জীবনকথা জানা একান্ত জরুরী।

২.১.২.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। মানবকল্যাণ ধর্মে ব্রতী ডেভিড হেয়ারের কল্যাণকর্মের তালিকা দাও এবং কেন বাঙালী জাতির ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন তা জানাও।

২। নব্যযুগের বাঙালী ছাত্ররা ডিরোজিওর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল কেন? তা আলোচনা করো।

৩। ভারতবন্ধু ডেভিড হেয়ার কীভাবে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রসারে নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন, তা প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিত 'ডেভিড হেয়ারের জাবীনচরিত'—প্রবন্ধ অনুসরণে ব্যাখ্যা করো।

৪। 'হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও' রচনাটির উৎস কী?

৫। ডিরোজিওর সঙ্গে রামতনু লাহিড়ীর সম্পর্ক কী ছিল?

৬। ডিরোজিওর শিক্ষকতা জীবনের ইতিবৃত্ত লেখো।

৭। নবযুগের বাঙালী ছাত্ররা ডিরোজিওর প্রতি মুগ্ধ ছিল কেন?

৮। হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিওকে পদত্যাগ করতে হল কেন?

পর্যায়গ্রন্থ - ১

একক - ৩

বিন্যাসক্রম :

২.১.৩.১ : যাত্রার ইতিবৃত্ত : সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯)

২.১.৩.২ : প্রবন্ধের মূল বক্তব্য

২.১.৩.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.১.৩.১ : যাত্রার ইতিবৃত্ত : সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯)

'পালামৌ' রচয়িতা সঞ্জীবচন্দ্র ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ। চার ভাইয়ের মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্র দ্বিতীয়। প্রথম শ্যামাচরণ, তারপর একমাত্র ভগ্নী নন্দরাণী, তারপর সঞ্জীবচন্দ্র। সঞ্জীবচন্দ্রের পর বঙ্কিমচন্দ্র এবং পূর্ণচন্দ্রের জন্ম। 'পালামৌ' মূলত ভ্রমণকাহিনী হলেও সেই রচনায় সঞ্জীবচন্দ্রের ব্যক্তিগত দার্শনিকতা ও মননঋদ্ধ ভাবনার রসে এই রচনাও ব্যক্তিগত প্রবন্ধের স্তরে উন্নীত হয়ে গেছে অনেক ক্ষেত্রে। ভ্রমণকাহিনী ছাড়া সঞ্জীবচন্দ্র গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ইংরেজীতেও লেখা তাঁর একটি প্রবন্ধগ্রন্থের খবর পাওয়া যায়। তাঁর বাংলা প্রবন্ধগ্রন্থের তালিকায় আছে ঃ ১. 'যাত্রা সমালোচনা' (১৮৭৫), ২. 'সৎকার' (১৮৮১), ৩. 'বাল্যবিবাহ' (১৮৮২)। সঞ্জীবচন্দ্র প্রধানত সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর রচনাগুলি 'বঙ্গদর্শন' ও 'ভ্রমর' পত্রিকায় প্রকাশিত হতো।

গ্রামীণ সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি সঞ্জীবচন্দ্রের অনুরাগ ছিল প্রবল। পল্লীবাংলার যাত্রাগান সম্পর্কে তাঁর গভীর কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার প্রমাণ যাত্রা সমালোচনা নামক প্রবন্ধ থেকে পাওয়া যায়। সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে কৃষ্ণযাত্রা ও বিদ্যাসুন্দর যাত্রা তথা সখের যাত্রার পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। সঞ্জীবচন্দ্রের গদ্যচর্চার প্রধান বৈশিষ্ট্য কবিত্বযুক্ত সরল ও অনাড়ম্বর বাকবিন্যাস। যুক্তি ও বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে এই সরল প্রকাশভঙ্গি তাঁর রচনাকে সুখপাঠ্য করেছে। তাঁর রচনারীতির প্রশংসা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন—"যাঁহারা তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা লক্ষ করিয়াছেন যে, সে লেখাগুলি কথা কহার অজস্র আনন্দ বেগেই লিখিত—ছাপার অক্ষরে আসর জমাইয়া যাওয়া—এই ক্ষমতাটি অতি অল্প লোকেরই আছে।"

কিন্তু এই অনন্য প্রতিভাকে তিনি ততটা কার্যে প্রয়োগ করেননি। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন—"সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা ধনী কিন্তু গৃহিণী নহে।"

সঞ্জীবের প্রতিভা সম্পর্কে ড. সুকুমার সেনের মূল্যায়ন—"তাঁহার সাহিত্য প্রতিভা যতটা উজ্জ্বল ছিল উদ্যম উৎসাহ অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতা ততটা জাগ্রত ছিল না। সেই জন্যই তাঁহার রচনায় তাঁহার প্রতিভার ভগ্নাংশ মাত্রের পরিচয় রহিয়াছে।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস)

২.১.৩.২ : প্রবন্ধের মূল বক্তব্য

বঙ্গদর্শনের ১২৮৯ ফাল্গুন সংখ্যায় 'যাত্রার ইতিবৃত্ত' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ এই প্রবন্ধটির সূচনা যাত্রা বিষয়ক ইংরেজীতে লেখা নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের একটি গ্রন্থের সমালোচনার সূত্রে। উক্ত গ্রন্থ ঢাকা

অঞ্চলে প্রচলিত ‘স্বপ্নবিলাস’ প্রভৃতি তিনখানি যাত্রা অবলম্বনে লেখা। আমাদের দেশে যাত্রার প্রচলন বহু পুরাতন কাল থেকে। লেখক জানান চৈতন্যদেবের বহুপূর্বে বাংলায় যাত্রা ছিল। সে যাত্রা শক্তিবিষয়ক। তখম কৃষ্ণযাত্রা ছিল না। শ্রীচৈতন্যের সুবাদে বৈষ্ণবধর্মের শক্তি বৃদ্ধি হলে কৃষ্ণযাত্রার কথা বৈষ্ণবেরা ভাবতে থাকেন। এই সময়ে এক বৈষ্ণবের পরিকল্পনা মত কালীয়দমন লীলা অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। একটি বড়ো পুকুরকে কালিন্দীর হ্রদ হিসেবে সাজিয়ে এই অভিনয় হয়। এই অভিনয় জনপ্রিয় হয়। লোকে কালীয়দমন হিসেবে কৃষ্ণযাত্রা বুঝতে শুরু করে। দেখা যায় উত্তরকালে কৃষ্ণজীবনের অন্য যে অংশই অভিনীত হোক না কেন (দান, মান, মাথুর) সব পালাকেই কালীয়দমন বলে লোকে বুঝতো।

এই কালীয়দমন যাত্রার সময়সীমা বুঝতে হলে বলতে হবে চৈতন্যদেবের পর এর জন্ম। রামমোহন রায়ের পর এর মৃত্যু। এর আদিতে বৈষ্ণব ধর্ম, অন্তে ব্রাহ্ম ধর্ম। প্রায় ৪০০ বছর এই কৃষ্ণযাত্রার সময়সীমা। এই কালীয়দমন যাত্রাপালাকার হিসেবে যাদের নাম জড়িত আছে তাদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন শ্রীদাম সুবল নামক দুই ভাই। তাঁরা আদি যাত্রা পালাকার নন কিন্তু প্রথম যুগের বিখ্যাত দুই শিল্পী। এদের সময় বাংলার অর্থনীতি অনেকটা স্বচ্ছল ছিল। তখন মুসলমান পর্বের শেষ হয়েছে। কোম্পানীর শাসন ও ব্যবসা চলছে। বাংলার মস্‌লিন বস্ত্রের বিদেশের বাজারে চাহিদা বাড়ায় বাঙালীর ঘরে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আসে। আর তখন কবি ভারতচন্দ্র, কবিওয়ালা নন্দলাল, কীর্তনওয়ালা বাঞ্ছারাম, বৈরাগী পুরাণ-বক্তা (কথক) গদাধর শিরোমণির সময়।

শ্রীদাম সুবলের পর জনপ্রিয় যাত্রা পালাকার পরমানন্দ দাস। শ্রীদাম সুবলের দলের থেকে শিক্ষিত হয়ে তিনি স্বাধীন যাত্রাদল সৃষ্টি করেন। এই পালায় পরমানন্দ দূতীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন। কৃষ্ণ, রাধার চরিত্র থাকতো গৌণ ভূমিকায়। দূতীই সমগ্র ব্যাপারটি গানে ও কথায় ভরিয়ে তুলতো। মানের পালায় পরমানন্দের কৃতিত্ব ছিল সমধিক। পরমানন্দ দাসের সময়ে আর একজন যাত্রা পালাকারের নাম পাওয়া যায়, প্রেমচাঁদ। লোকে তাঁকে ‘থর কাটা প্রেমা’ বলতো। মহাজনী পদকে প্রেমচাঁদ কিছুটা হাল্কা জনপ্রিয়তা দিয়েছিলেন।

প্রেমচাঁদের শিষ্য ‘ছোকরা’ ছিলেন বদন অধিকারী। আর পরমানন্দ দাসের ‘ছোকরা’ গোবিন্দ অধিকারী। গোবিন্দ প্রথম প্রথম গুরুর নিয়মে যাত্রাপালা পরিবেশন করলেও উত্তরকালে মৌলিক রীতিতে যাত্রা পরিবেশ শুরু করেন ও জনপ্রিয়তা পান। বদন অধিকারী কিন্তু সাবেক রীতিতে যাত্রাপালা পরিবেশন করেছেন আমৃত্যু। যাত্রা পরিবেশনার পরিবেশ নিয়ে সঞ্জীবচন্দ্র জানান যে আগে বৃহৎ জনসমুদ্রে যাত্রাগায়করা যে সুর ও স্বরক্ষেপণ ব্যবহার করতেন তার ফলে সবাই তা শুনতে পেতো। তাঁরা চিৎকার করতেন না কিন্তু এমন বিশেষ স্বরগ্রামে পৌঁছে দিতেন তাদের গান বা কথাকে যা সকলের শ্রুতিগ্রাহ্য হতো। এটা এক ধরণের দক্ষতা—অভ্যাস ও চর্চার ফল। বন্দুকের আওয়াজ যত দূর যেতে পারে তার চেয়ে অনেক দূরগামী চৌকিদারী হাঁক ও ডাকাতদের ‘কুক’। যাত্রা পালা-গায়কেরাও এক বিশেষ স্বরক্ষেপণের সুর আয়ত্ব করেছিলেন বলে তা সম্ভব হতো। এখনকার দিনে শ্রোতার সংখ্যা সীমিত হয়েছে, আর যাত্রাগানের শিল্পীরাও সেই বিশেষ পারঙ্গমতা থেকে বিচ্যুত। এর মূলে আছে মহারাষ্ট্রী বাঈজীদের Culture। সঞ্জীবচন্দ্র জানিয়েছেন এক সময়ে মহারাষ্ট্রীয় পুরুষ বর্গীরূপে আমাদের লুণ্ঠন করতে এসেছিল। তখন ধনী পুরুষেরা ধন রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু এরপর যখন মহারাষ্ট্রীয় নারী বাঈজীরূপে আমাদের বাংলায় এল তখন ধনীরা সব ধন তাদের পায়ে ঢেলে দিলেন। শুধু তাই নয়, এই বাঈজীরা আরো এক সর্বনাশ করল আমাদের, তা হোলো আমাদের সাবেকী সুরের যে মহিমা ও আভিজাত্য ছিল এই বাঈজী সংস্কৃতি তা বিনষ্ট করলো।

বাবুরা খোল করতালের উদাত্ত ধ্বনি ফেলে তবলার মৃদু তালে নিমজ্জিত হলেন। সুতরাং টপ্পার সুরে তাঁরা বিভোর হলেন। এই সময়ে শখ করে এক ধনী ব্যক্তি নতুন যুগের দাবীতে মহাজনী গান সুর বর্জন

করে তবলা ও ঘুঙুরের বোলে শখের দলের সৃষ্টি করলেন। লোকে বুঝল খোল করতালওয়ালারা কালীয়দমন পালা করে। আর তবলা ঘুঙুর নিয়ে নতুন সুরে পালাগান করে শখের দলের পালাগায়করা। শখের দলে যুক্ত হল মানুষের কথা, কাহিনী। আর কালীয়দমন তো কেবল দেবতার প্রসঙ্গ।

লেখকের সমকালে যাত্রার বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন গোপাল উড়ে। বিদ্যাসুন্দর পালা করে তিনি জনপ্রিয় হয়েছিলেন, তত দিনে কালীয়দমন থেকে গিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে আবার শুরু হল ইংরেজী রীতির অপেরা। এখানে পোশাকের পারিপাট্য, শরীরী প্রদর্শনী, চিৎকার ও পতন-উত্থান আছে। এখানে আর যাত্রার সুরনির্ভরতা নেই কেবল। এখানে দেখা গেল Action-ও তাই আগেকার যাত্রা ছিল শোনার ব্যাপার। এখন অপেরা হল দেখার বিষয়। "পূর্বে লোকে যাত্রা শুনিত, এখন লোকে যাত্রা দেখে।"

২.১.৩.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। যাত্রার উৎপত্তির ইতিহাসটি লিপিবদ্ধ করো এবং পূর্বেকার যাত্রাপালার দর্শক–সমাজে কিভাবে কথা বা সুর পৌঁছে দেওয়া হতো তা বিবৃত করো।

২। যাত্রার উৎপত্তির ইতিহাস কি?

৩। কালীয়দমন কাকে বলে?

৪। কয়েকজন কালীয়দমন পালাকারের নাম লেখো।

৫। পূর্বেকার যাত্রাপালার দর্শক সমাজে কিভাবে কথা বা সুর পৌঁছে দেওয়া হতো?

৬। আমাদের যাত্রার সুরের বিনাশ সাধনে লেখক কাদের ভূমিকা আছে বলে মনে করেন?

৭। শখের দলের ইতিহাস কি? শখের দল ও কালীয়দমনের পার্থক্য কি?

৮। যাত্রা ও অপেরার পার্থক্য কি?

৯। বদন অধিকারী বা গোবিন্দদাসের সঙ্গে গোপাল উড়ের পার্থক্য কোথায়?

পর্যায়গ্রন্থ - ১

একক - ৪

বিন্যাসক্রম :

২.১.৪.১ : বর্তমান শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)

২.১.৪.২ : উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের নানাদিক

২.১.৪.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.১.৪.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

২.১.৪.১ : বর্তমান শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)

হরপ্রসাদ বঙ্কিমযুগের গদ্য রচয়িতাদের অন্যতম। নৈহাটির নৈয়ায়িক পণ্ডিত বংশের সন্তান হরপ্রসাদের প্রকৃত নাম শরৎনাথ ভট্টাচার্য। পেশাগত ভাবে অধ্যাপক এবং এশিয়াটিক সোসাইটি ও সাহিত্য পরিষদের পুঁথি সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত নিষ্ঠাবান কর্মী। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত ও ইংরেজী ভাষায় তিনি ছিলেন পারঙ্গম। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণায় নিরত এই মানুষটি বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহ ও সান্নিধ্যধন্য ছিলেন। জাতির নষ্ট কোষ্ঠি উদ্ধারে ব্রতী ছিলেন হরপ্রসাদ। তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি নেপাল রাজদরবারের পুঁথি-শালা থেকে বাংলা ভাষায় রচতি প্রাচীনতম পুঁথির আবিষ্কার ও সম্পাদনা। যার নাম দিয়েছিলেন তিনি, 'হাজার বছরের পুরাতন বাঙ্গালা ভাষায় লেখা বৌদ্ধ গান ও দোঁহা।' এছাড়াও তাঁর আবিষ্কার অশ্বঘোষের সৌন্দরানন্দ পুঁথি, সন্ধ্যাকর নন্দীর দ্ব্যর্থবোধক রামচরিত, জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের বর্ণরত্নাকর প্রভৃতি। বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে তাঁর বহু আবিষ্কার ইংরেজি ভাষাতেই প্রকাশিত। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের সাংস্কৃতিক জীবন বিষয়ক বহু তথ্যই বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

তাঁর প্রথম দিককার প্রায় সমূহ রচনাই বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত। বঙ্গদর্শন ছাড়া হরপ্রসাদ সমকালের আর্য্যদর্শন, নব্যভারত, সাহিত্য, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, নারায়ণ, মানসী ও মর্মবাণী প্রভৃতি পত্রিকায় লিখেছেন।

বাঙালী ও বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের প্রমাণ বাংলা ভাষাকে উচ্চশিক্ষার বাহন করার জন্য তাঁর প্রচার ও লেখালেখি। ১৮৮০-তে বঙ্গদর্শনের পাতাতেই এ বিষয়ে তিনি দাবী জানিয়ে ছিলেন। বঙ্গদর্শনের ভাদ্র ১২৮৭-তে মুদ্রিত তাঁর 'কালেজী শিক্ষা' প্রবন্ধটি তার প্রমাণ। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলা ভাষা প্রচলনের উদ্যোগ করেন বঙ্কিমচন্দ্র। তখন হরপ্রসাদ ও আশুতোষ তাঁকে সমর্থন করেন। আশুতোষের প্রস্তাব সেনেটে গৃহীত হয়। বঙ্গদর্শনের (১২৮৮) পাতায় 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে আদর্শ বাংলা ভাষা সম্পর্কে হরপ্রসাদ তাঁর মতামত প্রকাশ করেন। সাধু অসাধু বা সংস্কৃত প্রাকৃত— ভাষার এই জাতীয় জাতিভেদ তিনি অগ্রাহ্য করেন। তাঁর কাছে স্টাইলের উপযোগিতাই ছিল বড় কথা।

হরপ্রসাদের প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ 'ভারত মহিলা' (১৮৮১) হোলকার প্রদত্ত পুরস্কার লাভ করে এবং বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত হয়। ঐ সময়ে লেখা তাঁর আর একটি গ্রন্থ 'বাল্মীকির জয়' পৌরাণিক রূপক আখ্যায়িকা। কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের ভাবানুবাদ করেন 'মেঘদূত ব্যাখ্যা' নামে। প্রকাশিত হয় ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে।

এছাড়া তাঁর দুটি উপন্যাস আছে—‘কাঞ্চনমালা’ (১৯১৬) এবং ‘বেনের মেয়ে’ (১৯২০)। ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে মনে হলেও আসলে ইতিহাসের পটভূমিতে লেখা কাল্পনিক কাহিনী। ‘ভারত মহিলা’ নামক গ্রন্থের পাঁচটি অধ্যায়ে তিনি প্রাচীন শাস্ত্রাদি অবলম্বনে ভারতীয় নারীর সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন। বঙ্কিম প্রবর্তিত তুলনামূলক সাহিত্যালোচনাও হরপ্রসাদ করেছেন তাঁর দু-একটি প্রবন্ধে ‘কালিদাস ও শেক্সপীয়র’, ‘বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি’ প্রভৃতি রচনা তার প্রমাণ। প্রাচীন সাহিত্য ও সমাজ ভাবনা নিয়ে তাঁর প্রবন্ধাবলীর মধ্যে আছে, মেঘদূত, রঘুবংশ, রঘুবংশের গাঁথুনি, কালিদাসের বসন্ত বর্ণনা, পার্বতীর প্রণয়, দুর্বাসার অভিশাপ প্রভৃতি প্রবন্ধ।

তাঁর দুখানি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ সংকলন হল ‘প্রাচীন বাংলার গৌরব’ (১৯৪৬) এবং ‘বৌদ্ধধর্ম’ (১৯৪৮) দুটিই তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত। হরপ্রসাদের সাহিত্যকর্মের অনেক নিদর্শন এখনো বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ইতস্তত ছড়ানো। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তি হরপ্রসাদ রচনাবলীর ১ম ও ২য় সম্ভার প্রকাশ করেছিলেন। সেখানেও তাঁর সব রচনা বিধৃত হয়নি। শৈলীর দিক থেকে উল্লেখ্য যে হরপ্রসাদ মূলত বঙ্কিমীরীতিকে আদর্শ করে গদ্যচর্চায় অবতীর্ণ হলেও ক্রমাগত তিনি তাঁর নিজস্ব রীতি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সাধু গদ্যরীতিতে লেখা শুরু করলেও তাঁর ব্যক্তিগত প্রবণতা ছিল চলতি গদ্যচর্চার দিকে এবং সাধু ও চলতি রীতির দূরত্ব ঘুচিয়ে দেবার ইচ্ছায় তিনি সাধু প্রকরণের মধ্যেই ব্যবহার করেছেন দেশী, বিদেশী, তদ্ভব ও তৎসম শব্দের মিশ্রণ। তাই তাঁর সাধু রীতির সমস্ত রচনাই শৈলী বা প্রকরণের দিক দিয়ে সহজ সরল ও ভাবের ভার বহনে সক্ষম ও স্বচ্ছন্দ।

২.১.৪.২ : উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের নানা দিক

হরপ্রসাদের রচিত ‘বর্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য’ প্রস্তাব আকারে রচিত একটি দীর্ঘ আলোচনা। বঙ্গদর্শন ফাল্গুন ১২৮৭ সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর ইংরেজী ভাষাচর্চার ফলে যে যুগ-পরিবর্তন ঘটে নতুন কালের বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির ইতিহাস তার মধ্যেই নিহিত। তিনি বিষয়টিকে চিহ্নিত করেন এইভাবে : “এই বিপ্লবের প্রধান কারণ ইংরেজি শিক্ষা, ইহার ফল—সমাজ উন্নতি ও সাহিত্য উন্নতি।” ঊনবিংশ শতকের সূচনা কাল রাজনৈতিক দিক থেকে খুবই সমস্যা জটিল। বাংলাদেশ বাস্তব অর্থে রাজা বা শাসনহীন। গোটা ভারতবর্ষেও দুর্বল মুসলমান রাজার সুযোগে অশান্তি ও প্রজাপীড়নের পরিস্থিতি উপস্থিত। কাবুল, কাশ্মীর, পেশোয়ার, পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ, রাজপুতনা, দিল্লী, অযোধ্যা সর্বত্রই অরাজকতা, জাতিবিদ্বেষ, অশান্তি। এই পরিবেশে কোথাও সাহিত্যচর্চার অবকাশ ও পরিবেশ ছিল না। এই কারণে তৎকালে ভারতীয় সাহিত্যচর্চা লুপ্তপ্রায় হয়েছিল।

আপাতদৃষ্টিতে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ অধিকৃত বাংলায় শান্তি স্থাপনের চেষ্টা হলেও দ্বৈত শাসনের (ইংরেজ + নবাব) সময় থেকেই বাঙালীর জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৯৩ পর্যন্ত বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা যদিও বা কিছুটা ছিল। কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তাও বিনষ্ট হয়ে গেল। মুসলমান আমলে জমিদারী প্রথা সমাজব্যবস্থার পুরাতন ব্যবস্থার সঙ্গে যেভাবে ছিল এই নতুন নিয়মে এবং সূর্যাস্ত আইনের ফলে পুরাতন জমিদারেরা জমিদারী হারালেন। নতুন জমিদারীর দায়িত্ব পেলেন সমাজের অপেক্ষাকৃত ঐতিহ্যহীন ও নিম্নবর্গীয় মানুষেরা। টাকার জোরে তাঁরা জমিদার হয়ে গেলেন। তাঁরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতায় গুরু পুরোহিতের বংশবদ শ্রেণী। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সমাজের দুর্দিনে, অরাজকতার সময় একদা জাতি ও সমাজকে স্থির দিশার সন্ধান দিলেও পরবর্তীকালে তাঁরা সেই মহিমা থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। তাছাড়া তাঁদের দিয়ে সাহিত্যের সেবা হয়নি। ইংরেজ আমলে তাঁদের সম্পত্তিও সরকারি নিয়মে বাজেয়াপ্ত হতে থাকে।

বর্গীর হাঙ্গামার সময় থেকেই পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার বর্ধিষ্ণু ও শিক্ষিত বহু পরিবার নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে কোলকাতার নিকটবর্তী ভাগীরথীর দু তীরে বসবাস শুরু করে। কালক্রমে এই কোলকাতাতেই নবজাগরণের সূচনা হয় এবং রামমোহনের কোলকাতা বাসের সময় থেকেই তার যথার্থ সূচনা।

নতুন এই সময়ে একদিকে সামাজিক রীতিনীতি ও কুপ্রথার অবসানের জন্য আন্দোলন চলতে থাকে। অন্যদিকে ইংরেজি ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়।

সমাজসংস্কারক ও আধুনিক জীবন-শিক্ষক রামমোহনই বাংলা গদ্যের আদি লেখক। রামমোহন সম্পর্কে হরপ্রসাদের মূল্যায়ন হল : "ইনিই সর্বপ্রথম উৎকৃষ্ট বাঙ্গালী লেখক, ইহা হইতে বাঙ্গালা গদ্য বাঙ্গালীর অভ্যস্ত হইতে আরম্ভ হয়। পদ্য ভিন্ন সাহিত্য হইতে পারে, ইনিই সর্বপ্রথম লোককে বুঝাইয়া ছিলেন।" রামমোহনের কাজের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আর একজনের নাম উল্লেখ করা যায়। ইনি গৌরীশঙ্কর। রামমোহনের সমাজ সংস্কার কর্মের প্রতিবাদ করতে নেমে অনেক লেখালেখি ও পত্রিকা সম্পাদনায় নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন তিনি। এরপর বাংলা সাহিত্য সেবক হিসেবে গদ্য ও পদ্যে পারঙ্গম ঈশ্বরগুপ্তের নাম স্মরণীয়। যিনি নিজে কেবল লেখক বা সাংবাদিক বা সম্পাদক ছিলেন না। সমকালের যুবসমাজকে সাহিত্য সেবায় নিযুক্ত করেছিলেন তিনি। বঙ্কিম, দীনবন্ধু, দ্বারকানাথেরা তাঁর মন্ত্রশিষ্য বলে মনে করেন লেখক হরপ্রসাদ।

এরপর উল্লেখ্য নাম রেবরেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি মৌলিক লেখক ও অনুবাদক। অভিধানকার। বাংলা সাহিত্য ও ইংরেজি শিক্ষার উন্নতি তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল। ধারাবাহিকভাবে বাংলা সাহিত্যের প্রথম দিকের সেবক শিল্পীদের নাম পরিচিতি দিতে গিয়ে লেখক হরপ্রসাদ একে একে উল্লেখ করেছেন—রাজেন্দ্রলাল মিত্র, নীলমণি বসাক, টেকচাঁদ ঠাকুর, হুতোম প্যাঁচা, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রমুখের নাম। এই সময়ে অক্ষয়কুমার দত্ত ও তাঁর সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বারাও বাংলা সাহিত্যচর্চা পুষ্টিলাভ করেছিল। সমকালে কবিওয়ালারাও নিজেদের ধরণে আমুদে বাঙালীকে রস পরিবেশনে নিরত ছিলেন। তাদের মধ্যে পাঁচালিকার দাশরথি রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যের সৃজ্যমান পর্বে কয়েকটি ব্যাপার স্পষ্ট লক্ষ্যগোচর হয়েছিল ১. ভাষার সৃষ্টি, ২. গদ্যের সৃষ্টি, ৩. হিন্দু কলেজের ছাত্রদের দ্বারা ইংরেজী ভাবের প্রচার, ৪. সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের দিয়ে সংস্কৃত অনুবাদ প্রচার, ৫. সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ও প্রসার।

এর ফলে মুক্তচিন্তা মুক্তবুদ্ধি নিয়ে নতুন যুগের সাহিত্যকর্ম শুরু হল। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল। আমরা এক অগাধ জ্ঞান ও রসভাণ্ডারের অধিকারী হলাম। এই নতুন সমৃদ্ধ যুগের সাহিত্যের সূচনা মাইকেলের 'তিলোত্তমা সম্ভবে'র প্রকারে সময় থেকে। মাইকেলের কাব্য ও নাটক এক একটি রত্ন বা রত্নখনি—বলেন হরপ্রসাদ। মাইকেলের সঙ্গে সঙ্গে আরো দুজন কবি বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন। তাঁরা হলেন হেমচন্দ্র ও রঙ্গলাল। হেমচন্দ্রের কবিতায় বাঙালী একদা মুগ্ধ হয়েছিল। মাইকেলের আদর্শে তিনি রচনা করেন 'বৃত্রসংহার' কাব্য। 'মেঘনাদবধে'র তুলনায় 'বৃত্তসংহারে'র অনেক ত্রুটি আছে। অপূর্ণতা আছে। তবু যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে ততদিন তাঁর 'বৃত্রসংহার' ও কবিতাবলী বাংলার প্রধান গ্রন্থগুলির মধ্যে বিবেচিত হবে।

মাইকেলের থেকে বয়সে বড় সমকালীন আর একজন কবি হলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোলাধ্যায়। তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রথম দেশাত্মরাগের কাব্য, বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত তাঁর নীতি কুসুমাঞ্জলি-ও একদা জনপ্রিয় হয়েছিল।

এই যুগে আর একজন শক্তিশালী কবি নবীনচন্দ্র সেন। 'পলাশীর যুদ্ধ' রচনা করে বিখ্যাত হয়েছিলেন এই কবি। সমকালীন আর এক সাহিত্যিক নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। দীনবন্ধু ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্য

ছিলেন। সমাজচিত্র অঙ্কনে তাঁর দক্ষতা তুলনারহিত। তাঁর 'সধবার একাদশী', 'জামাই বারিক' সমাজচিত্র হিসেবে উৎকৃষ্ট। 'নীলদর্পণ' নাটকও সমাজের পক্ষে ছিল প্রবল উপকারী।

দীনবন্ধুর প্রায় সমকালীন ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পূর্বে রামায়ণ, মহাভারত বঙ্গীয় যুবককে যে শিক্ষা দিত সমকালে, সেই পরাধীন দেশে বঙ্কিমের গ্রন্থাবলী যুবকদের সেই শিক্ষা দেয়। তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' নিয়ে কেবল তাঁর প্রতিভার মূল্যায়ন অনুচিত। দেশ ও জাতিপ্রিয় বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম কীর্তি তাঁর বঙ্গদর্শন পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রচার। এ ব্যাপারে হয়তো সংবাদ প্রভাকরের ঈশ্বরগুপ্ত তাঁর প্রেরণা ও অনুকরণস্থল। কিন্তু বঙ্গদর্শনে এদেশের পাঠক ও লেখককুল সৃষ্টিতে বঙ্কিমের অবদান তুলনারহিত। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরী করেও বাংলাভাষার ক্ষেত্রে তাঁর প্রবল নিষ্ঠাপূর্ণ পরিশ্রম আমাদের সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা দাবী করে।

বঙ্গদর্শনকে আদর্শ হিসেবে রেখে এদেশে ঐ সময়ে একাধিক পত্র প্রকাশিত হয়। আর্যদর্শন, বান্ধব, ভারতী এগুলির অগ্রগণ্য আর্যদর্শনের সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ও পূর্ণচন্দ্র বসু, বান্ধব পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ভারতীয় সম্পাদক জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বঙ্গদর্শনে যাঁরা লেখক হিসেবে রচনা শুরু করেন কালক্রমে তাঁদের অনেকেই এদেশে শক্তিশালী লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। এই ব্যাপারেও বাঙালী জাতির ঋণ বঙ্গদর্শন সম্পাদকের কাছে। এদের মধ্যে উল্লেখ্য নাম—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার (সাধারণী পত্রিকার সম্পাদক), চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ।

এই যুগে আর একজন নাট্যকারের নাম স্মরণীয় তিনি উপেন্দ্রনাথ দাস। ইয়ংবেঙ্গলের দোষগুণ তাঁর নাটকে সুচারুরূপে বিধৃত। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস লেখক রজনীকান্ত গুপ্তের নামও উল্লেখ্য। উল্লেখ্য আর একজন লেখক রাজকৃষ্ণ রায়। অসংখ্য গ্রন্থের প্রণেতা।

কবি ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রীও এই যুগে সাহিত্য সৃষ্টি করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসকার রমেশচন্দ্র দত্ত (আর. সি. দত্ত) এই সময়ে সাহিত্য সৃষ্টিতে আত্মনিযুক্ত ছিলেন।

এই সময়ে আরো দুটি গ্রন্থ খুব বিখ্যাত হয়েছিল—'বঙ্গাধিপ পরাজয়' এবং 'স্বর্ণলতা'। দুটি গ্রন্থেরই রচয়িতার নাম ছিল না। হরপ্রসাদ তাই উল্লেখও করেননি। এরপর উল্লেখ্য গ্রন্থ হরলাল রায়ের 'হেমলতা' এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'পুষ্পাঞ্জলি'।

হরপ্রসাদ উল্লেখ করেছেন, আগে বাংলা জানা লোকেরাই কেবল বাংলা ভাষাচর্চা করতেন। এখন সময় বদল হয়েছে। এখন —

> "অনেকে ইংরেজি লেখায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াও বাঙ্গালা আরম্ভ করিতেছেন। ক্রমে লোকের সংস্কার দাঁড়াইতেছে যে, নানা ভাষা শিখিব, নানা দেশ দেখিব, কিন্তু লিখিব নিজ ভাষায়।"

এর প্রমাণস্বরূপ তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে লেখা নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা পত্রাবলীর উল্লেখ করেছেন।

সবশেষে লেখক আর একটি বিষয় উত্থাপন করেছেন। তা হল, এখন যাঁরা সাহিত্যচর্চা করছেন তাঁরা প্রায় কেউই সাহিত্যচর্চাকে একমাত্র পেশা হিসেবে গ্রহণ করেননি। অন্য পেশায় নিযুক্ত থেকে সাহিত্যে কিছুটা অভিনিবেশ দিয়েছেন। এর ফলে —

> "সাহিত্য জন্মিয়াছে, জন্মিতেছে ও জন্মিবে, কিন্তু যতদিন সাহিত্য ব্যবসায় না হইবে, Profession না হইবে, ততদিন সাহিত্যের বদ্ধমূলতা হওয়া অসম্ভব।"

আমাদের দেশে সাহিত্যচর্চায় ব্রাহ্মদের উৎসাহ একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। আর আছে ইংরেজী ভাষার চর্চা। এই ভাষায় সমৃদ্ধ জ্ঞান ও তথ্য সংগ্রহ করে যাঁরা বাংলা ভাষার সেবায় আসবেন তাঁদের লেখার গুণমান বৃদ্ধি পাবে। এবং লেখক যথেষ্ট আশাবাদী যে একদিন বাংলা ভাষার চর্চা স্বচ্ছন্দ ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে এবং আগামী দিনে অনেক শক্তিশালী লেখক বাংলা ভাষার সেবায় আত্মনিযুক্ত হবেন।

২.১.৪.৩ ঃ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'বর্তমান শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য' বলতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কোন সময়কে নির্দেশ করেছেন? ঐ সময়কালীন বাংলা সাহিত্যের যে বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখিত হয়েছে তা লিপিবদ্ধ করো।

২। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বর্তমান শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য' অবলম্বনে তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি আলোচনা করো।

৩। বর্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য প্রবন্ধটি কোন্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল?

৪। আধুনিক বাংলা সাহিত্যচর্চার সূচনা কোন্ সময় থেকে?

৫। আধুনিক বাংলা সাহিত্যসৃষ্টির বিলম্বের পিছনে যে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিত বর্তমান তা লিপিবদ্ধ করো।

৬। হরপ্রসাদ-এর প্রবন্ধ অবলম্বনে বাংলা সাহিত্যে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রঙ্গলাল, মাইকেল ও দীনবন্ধুর অবদান উল্লেখ করো।

৭। বাংলা সাহিত্যচর্চায় বঙ্গদর্শন ও সমকালীন অন্য পত্রিকাগুলির অবদান কি ছিল?

৮। বাংলা সাহিত্যসেবকদের আংশিক সময়ের সাহিত্যসেবার সমস্যা কি? এই সমস্যা থেকে উত্তরণের কি পথ লেখক নির্দেশ করেছেন?

২.১.৪.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বঙ্কিম রচনাবলী / যোগেশচন্দ্র বাগল লিখিত বঙ্কিমসাহিত্যের পরিচয়-সমন্বিত / সাহিত্য সংসদ।

২। বঙ্কিমচন্দ্র জীবনী / অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য / আনন্দ পাবলিশার্স।

৩। আধুনিক বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ধারা (১ম) / ড. অধীর দে।

৪। বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস / ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।

৫। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ — শিবনাথ শাস্ত্রী।

৬। পালামৌ (প্রবন্ধ) — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস — সুকুমার সেন।

দ্বিতীয় পত্র

পর্যায়গ্রন্থ - ২

প্রাক্-চল্লিশ বাংলা ছোটগল্প

(নির্বাচিত ৮টি ছোট গল্প)

একক - ৫

বিন্যাসক্রম :

২.২.৫.১ : লেখক পরিচিতি—জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭)

২.২.৫.২ : 'শঙ্কিতা অভয়া'—কাহিনী

২.২.৫.৩ : 'শঙ্কিতা অভয়া'—বিশ্লেষণ

২.২.৫.৪ : লেখক পরিচিতি—পরশুরাম/রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০)

২.২.৫.৫ : গা মানুষ জাতির কথা

২.২.৫.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.২.৫.১ : লেখক পরিচিতি—জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭)

বাংলা ছোটগল্পের জগতে এক শক্তিশালী অথচ স্বভাবে একেবারে স্বতন্ত্র প্রকৃতির লেখক জগদীশ গুপ্ত। তাঁর নির্মোহ নিরাসক্ত কঠিন দৃষ্টির দর্পণে তাই উদ্ভাসিত হতে পেরেছে জীবনের এক নিষ্ঠুর সত্যের ভয়ঙ্কর মুখচ্ছবি। জগদীশ গুপ্ত 'belated kallolian' মানিকের মতোই। সমালোচকের [গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, জগদীশ গুপ্ত ও তাঁর সমকালীন কয়েকজন ঔপন্যাসিক] মতে "তাঁর দৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য তথা আধুনিকতা—তাঁর তির্যক-অস্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। নরনারীর প্রতিদিনের চেনা জগতের সহজ সুখদুঃখ চাওয়াপাওয়ার স্নিগ্ধ সরল আখ্যান তাঁর রচনায় সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। তাঁর কথাসাহিত্য জীবনরহস্যের অতল অন্ধকারের দিকে ইঙ্গিত করে। সে অন্ধকারের, সে দুঃখ যন্ত্রণার যেন শেষ নেই, এই অন্ধকার ও অন্তহীন দুঃখযন্ত্রণা লেখকের কল্পনার সৃষ্টি নয়। অতি নিষ্ঠুর এই বাস্তব সত্য জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত।" শহর কোলকাতা থেকে দূরে বোলপুর থেকে মফস্বল শহরে মানুষের লোভ হিংসা স্বার্থের দ্বন্দ্ব, প্রেম ও কামের টানাপোড়েন সাধারণ জীবনে তার প্রতিফলনের বিচিত্র ছায়া রূপায়িত করেছেন জগদীশ গুপ্ত তাঁর লেখা ছোটোগল্পগুলিতে। ব্যক্তিজীবনে পেশায় তিনি ছিলেন আদালতে মুহুরি এবং তাই মানুষকে খুব কাছ থেকে সহজে চিনে নেওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। জগদীশ গুপ্তের গল্পগুলি কল্লোল কালিকলমে প্রকাশিত হলেও তাঁকে কল্লোলের লেখক বলা যায় না, তিনি তাঁর গল্পে একটি স্বতন্ত্র জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন।

"মানুষের মনের ভিতরের মতো অন্ধকার এবং কালিমা সবই টেনে বের করে তিনি তাঁর সাহিত্য জগৎটি অন্ধকার পরিপূর্ণ করে তুলেছিলেন। ফলে যা ঘটবার তাই ঘটে। প্রচলিত এবং অভ্যস্ত মূল্যবোধগুলির উপর সমাজ দাঁড়িয়ে থাকে সেগুলি জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়।"

জগদীশ গুপ্তের গল্পে প্রেম বা ভালোবাসার গভীর সংরাগ নেই বরং যৌনতা, প্রতিহিংসা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি প্রাধান্য পেয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তাঁর যে গল্পগ্রন্থ বেরিয়েছে (১৩৫৪) তা 'মেঘাবৃত অশনি।' এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য গল্প, 'শঙ্কিত অভয়া', যে গল্পে জগদীশ গুপ্তের শক্তি ও স্বাতন্ত্র্য প্রস্ফুট হয়েছে।

২.২.৫.২ : শঙ্কিতা অভয়া—কাহিনী

কন্যা শান্তিময়ীর জন্য জননী অভয়ার শঙ্কার কোনো শেষ নেই। শান্তিময়ীর জীবনে যদি কোনো অশুভ পরিণাম ঘটে, এ ভেবে অস্থির ও ব্যাকুল। শান্তির বয়স সতেরো কিন্তু তার রূপ চোখে পড়ার মতো, বিশেষ করে অভয়ার অতীত দিনের মতো, তাই শান্তিকে দেখে অভয়া অত্যন্ত ভয় পায়। তার ভয় কেবল তার একার, শান্তি তার পিতা অতুলের সঙ্গে ভয় ভাবনার বাইরে নানা বিষয়ে আলোচনা করে, গানবাজনার মধ্য দিয়ে তারা আনন্দেই থাকে। অভয়ার মনে হয় অতুল তার মেয়েকে অযথা প্রশ্রয় দেয়, শান্তি সব রকমের উৎকট আর উদ্ভট প্রশ্নের খোলাখুলি আলোচনা করে পিতা অতুলের সঙ্গে। ফুটবল, ক্রিকেট, চলচ্চিত্র, রঙ্গালয়, এমনকি প্রেমের প্রসঙ্গ পর্যন্ত বাদ যায় না—প্লেটোনিক লাভ পর্যন্ত।—অভয়া সহ্য করতে পারে না, বাধা দেয় অভয়ার সমস্ত বিক্ষোভই নিষ্ফল হয়ে যায়। পিতা ও কন্যার এই আত্মবিস্মৃত আলাপ আলোচনা, নৃত্য, সঙ্গীতচর্চা এসবের মধ্যেই সে ভয় পায়।

..."অভয়ার মনে হইতে লাগিল, সে বড়ো অসহায়, আর বড়ো দুঃখিনী। প্রচণ্ড মূর্তি ধারণ করিয়া দুষ্কার্যের প্রতিবাদ করিবার মতো মনই তার নয়—সে তা পারে না। তার এই অক্ষমতা হয় তার আরো কষ্টের কারণ—সেই কষ্টেই সে আরো অবসন্ন হইয়া ওঠে। মনে হয় পাগল হইয়া যাইবে।"

অভয়া কিছুতেই কাউকে নিরস্ত করতে পারে না। কেবল নিজেই যন্ত্রণা পায়, সে স্পষ্ট দেখছে অতুল তার মেয়েকে নিয়ে অধর্মের পথে উচ্চন্নের পথে এগিয়ে চলে—সে কিছুতেই শান্তিকে ফেরাতে পারছে না দেখে, একদিন বাধ্য হয়ে শান্তিকে সে সব বলতে চায়, অভয়া বলে যে অতুল শান্তির বাবা নয়, কেউ নয়, অতুল অভয়াকে নিয়ে কুলত্যাগ করে চলে এসেছে। অতুলকে নিরুত্তাপ নিরুদ্বিগ্ন হয়ে শান্তির সঙ্গে সহজ ও ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে দেখে অভয়ার মনে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ বেড়ে যায়—অভয়া অতুলকে বিশ্বাস করতে পারে না, ভয় পায়, যন্ত্রণা অনুভব করে। তাই মা হয়েও সে, মেয়েকে প্রশ্ন করতে পারে যে অতুল তাকে নষ্ট করেছে কিনা, — বিমূঢ় শান্তির বিদ্যুৎস্পৃষ্ট নিস্তব্ধতায় গল্পটি শেষ হয়।

২.২.৫.৩ : শঙ্কিতা অভয়া—বিশ্লেষণ

'শঙ্কিতা অভয়া'—**নামকরণ ঃ** গল্পটির নামকরণ অভয়ার শঙ্কার স্বরূপ সন্ধানে। গল্পটির প্রথমাবধিই অভয়া অতুলের সঙ্গে শান্তির সম্পর্ক এবং অতুলের নিরুদ্বিগ্নতা দেখে অভয়ার শঙ্কিত চিত্ততার প্রকাশ। অভয়ার দৃষ্টিকোণে গল্পটি লেখা। অভয়া তার অতীত জীবনের দুষ্কৃতি থেকে এক আশ্চর্য ভয় অনুভব করে। অভয়া অল্প বয়সে অতুলের সঙ্গে কুলত্যাগ করে চলে এসেছে,—"তাই অভয়ার মনে হয় অতুল ইচ্ছে করলে যে কোনো স্ত্রীলোককে বশীভূত করতে পারে" এই ধারণা অভয়ার মনের গভীরে থাকে তাই শান্তি ও অতুলের হাসি ঠাট্টা আলোচনা সে সহ্য করতে পারে না। অভয়ার অপরাধবোধের আগুন অতুলের সঙ্গে কুলত্যাগ করে চলে আসার জন্যে তার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে তাকে তুষের আগুনের মতো দগ্ধ করে। তাই, "তার মনে মনে হইতে লাগিল, পাপের প্রায়শ্চিত্ত শুরু হইয়াছে, তার অজ্ঞানতা, তার অন্ধকার, তার উত্তেজনা, ভ্রম, দুর্বুদ্ধি সবই তার পাপ, কিন্তু যথার্থ কে পাপী সে তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া নানা ছলে

তাহার সংবিতকে উত্তাপ দিয়া বক্র বিকৃত বীভৎস করিয়া তুলিয়াছিল, সে আজও পরম আনন্দে আছে”...

‘শঙ্কিতা অভয়া’—অভয়ার শঙ্কার স্বরূপ ও মূল্যচেতনার সংকট লেখক জগদীশ গুপ্ত অভয়ার এই মানসিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তার গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মূল্যচেতনার সংকটকে ব্যক্ত করেছেন। অভয়ার অন্তর্দ্বন্দ্ব যত জটিলতা পেয়েছে ততই সে অতুলের প্রতি সন্দেহে জর্জরিত হয়ে উঠেছে। এই গভীর মূল্যবোধের সংকট থেকে তার পরিত্রাণের কোনো পথই নেই। অভয়ার মনে অন্ধকার আরো নিবিড় হয়েছে, কোনো ক্ষীণ আলোকিত রশ্মিও অভয়ার এই যন্ত্রণার সামান্য উপশম ঘটাতে পারে না। নির্মম এই পরিণতিতে মাতা ও পুত্রীর আর্ত অস্তিত্বের জিজ্ঞাসার মধ্যেই গভীর অন্ধকারে গল্পটিকে সমাপ্ত করেছেন লেখক। ‘অভয়া’ তার নামটিকে নিজের অস্তিত্ব দিয়ে ব্যঙ্গ করেছে, তার অপরাধবোধের জটিলতায় আক্রান্ত হয়েছে অতুল এবং বিপর্যস্ত হয়েছে শান্তি। অর্থাৎ অভয়ার মূল্যবোধের সংকট পাশাপাশি অন্য দুটি মানুষের জীবনযাপনের মধ্যে এক বিরাট অন্তরাল। এ জটিল জিজ্ঞাসা মনোমোহনের অন্ধকারকে প্রশস্ত করেছে, যা থেকে কোনো উত্তরণের ক্ষীণ আলোকরশ্মিও লক্ষিত হয়নি।

২.২.৫.৪ : লেখক পরিচিতি—পরশুরাম/রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০)

বিজ্ঞানী রাজশেখর বসু বাংলা গল্পের রসনির্মাণে বিশিষ্ট ব্যঙ্গ কৌতুক উইটের মিশ্রণে নিজের সৃজনশীল ভাষায় এক অসামান্য সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি ভাষাবিদ—অভিধান রচনা করেছেন, মূল সংস্কৃত থেকে রামায়ণ অনুবাদ করেছেন—আবার হাস্যরসাত্মক গল্প রচনায় সিদ্ধহস্ত।

চিকিৎসা সঙ্কট এবং গা মানুষ জাতির কথা দুটি গল্প একটি হাস্যকৌতুক রচনার অন্যতম উদাহরণ, অন্যটি বিজ্ঞানকল্প কাহিনী। পরশুরাম সমকালীন শিক্ষিত বাঙালি যুবকদের উদ্দেশ্যে গল্পরচনা করেছেন, শিক্ষিত যুবকদের মনে যে আলস্য জড়তা এবং দৈবানুরাগ তৈরি হয়েছিল তাকে ভেঙে দিয়ে নতুনভাবে সঞ্জীবিত করতে চেয়েছেন, ব্যঙ্গের অন্যতম বাহন ভাষা, এবং সরস ব্যঙ্গরচনায় পরশুরাম অদ্বিতীয়।

২.২.৫.৫ : গা মানুষ জাতির কথা

কল্পবিজ্ঞানের মোড়কে সমাজমনস্ক লেখকের অসামান্য কালোত্তীর্ণ সৃষ্টি এই গল্পটি। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯৩৮-এ লেখা এই গল্পটির মধ্যে যে আগামী জীবনের সম্ভাবনার কথা লিখেছেন তা এখন ঘটমান জগতের সঙ্গে অনেকটাই মেলে।

কাহিনী সংক্ষেপ ঃ অ্যানাইহিলিন বোমার বিস্ফোরণে মানব সভ্যতা যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হল তখন সমগ্র সৃষ্টি — কীট পতঙ্গ গাছপালা সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। বড়ো বড়ো শহরের রাস্তার নীচে গভীর ড্রেনে যে ইঁদুরেরা বাস করতো বোমা থেকে নির্গত গামারশ্মির প্রভাবে তারা সহজাত প্রখর বুদ্ধি এবং ত্বরিত উন্নতির সম্ভাবনা নিয়ে ধরাতলে গামানুষ অর্থাৎ গামা মানুষ হয়ে উঠল। সেই সমাজে ও বিশ্বশান্তি সম্মেলনের আয়োজন খাতে সৃষ্টি আর ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়। সেই সম্মেলনে পৃথিবীর বৃহৎ দেশগুলি থেকে যাঁরা প্রতিনিধি এসেছিলেন তাঁদের ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ভৃঙ্গারাজনন্দী, তাঁর সদ্য আবিষ্কৃত ভেরাসিটিন ইঞ্জেকশন দিয়ে সত্যভাষণে বাধ্য করেন। তাতে তাঁদের প্রকৃত অভিসন্ধি ধরা পড়ে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়। প্রত্যেকেই অন্যকে বঞ্চিত করে সমৃদ্ধ হতে চায় এবং সেই কথা প্রকাশ হতেই মূল উদ্দেশ্য যে, অন্যকে ধ্বংস করার জন্য বোমা তৈরি তাও জানাজানি হয়ে যায়। সকলেই যখন বোমাটিকে আয়ত্ত করার জন্য উঠে পড়ে লাগেন তখনই বোমাটির বিস্ফোরণ হয়। “কোনও আওয়াজ কানে এল না, কোনও ঝলকানি চোখে লাগল না, শব্দ আর আলোকের তরঙ্গ ইন্দ্রিয়দ্বারে পৌঁছবার আগেই সমগ্র গামানুষ

জাতির ইন্দ্রিয়ানুভূতি লুপ্ত হয়ে গেল।” গল্পের পরিণতিতে গল্পকার এই আশা ব্যঞ্জিত করেছেন যে আবার একদিন পৃথিবী ফুলে ফলে সম্পূর্ণতা পাবে “সুপ্রজাবতী হবার আশায় ধরণী বারবার গর্ভধারণ করবেন।”

সামাজিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করলে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রচনা। যে সময়ে এটি লিখেছেন গল্পকার তখনও জাপানের বুকে প্রথম আণবিক বোমাটি বিস্ফোরিত হয়নি, তখন এই সাবধানতার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এবং তখন নিরস্ত্রীকরণ চুক্তির আণবিক শক্তির জন্য সাহায্য প্রার্থনা প্রভৃতি নিয়ে বিশ্বজুড়ে যে ভয়াল পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে চলেছে তাতে আজও পরশুরাম সমান প্রাসঙ্গিক।

ব্যঙ্গরূপক হিসেবেও গল্পটি একটি সার্থক সৃষ্টি। হাস্যরস পরিবেশনে, পরিস্থিতি নির্মাণ কৌশলেও পরশুরাম অদ্বিতীয়। সমাজ সংশোধনের এবং লোভ নিবৃত্ত করার জন্য অবলদাসজীর মতো সৎ পথে চলাই লেখক প্রদর্শিত পথ। গল্পটির মধ্য দিয়ে আসন্ন ধ্বংসের ভয়ঙ্কর যে পরিণামকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন পরবর্তীকালে তা সত্যরূপে নিয়ে দেখা দিয়েছে। ভূয়োদর্শী লেখক পরশুরামের সম্পূর্ণ পরিচয় জানতে গেলে এ গল্পটি অবশ্যই পাঠ করতে হবে। তিনি যখন গল্পটি লেখেন তখনও আণবিক বোমায় ক্ষতির ভয়ঙ্কর উদাহরণ হিরোসিমা, নাগাসাকির অভিজ্ঞতা পৃথিবীর মানুষ জানতে পারেনি।

২.২.৫.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। জগদীশ গুপ্ত রচিত ‘শঙ্কিতা অভয়া’ গল্পটি কোন্ কোন্ দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যবাহী—তা আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

২। জগদীশ গুপ্তের ‘শঙ্কিতা অভয়া’ গল্প অবলম্বন করে অভয়ার শঙ্কার কারণ ও তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করো।

৩। ‘গা মানুষ জাতির কথা’ গল্পের মধ্য দিয়ে ইঙ্গিতে মানব সভ্যতার ধ্বংসের যে কথা পরশুরাম বলেছেন তা আলোচনা করো।

৪। ‘‘রাজশেখর বসুর কৌতুকের ভিত্তি ব্যঙ্গ, কিন্তু বাচন ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য তাঁর আঘাতের সূক্ষ্মতা অজস্র হাস্যে রূপান্তরিত”—সমালোচকের এই মন্তব্য কতখানি গ্রহণযোগ্য ‘গা মানুষ জাতির কথা’ গল্প অবলম্বনে তা ব্যক্ত করো।

পর্যায়গ্রন্থ - ২

একক - ৬

বিন্যাসক্রম :

২.২.৬.১ : লেখক পরিচিতি—বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯)

২.২.৬.২ ঃ গল্প পরিচয়—নিমগাছ

২.২.৬.৩ ঃ লেখক পরিচিতি—প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮)

২.২.৬.৪ ঃ গল্প পরিচয়—পুন্নাম

২.২.৬.৫ ঃ আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.২.৬.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

২.২.৬.১ : লেখক পরিচিতি—বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯)

বনফুল ছোটোগল্পের জগতে এক অসামান্য শিল্পী। তাঁর অধিকাংশ ছোটোগল্পের পরিণতিতে একটা চমক থাকে। বনফুলের জীবনদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য হল এই যে অতি সাধারণ উপকরণ, অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটি মুহূর্ত নির্বাচন করে বিচিত্র অনুভবের পরিস্ফুটনে এবং স্বীয় পরিবেশন নৈপুণ্যে তা প্রাণময় করে তোলেন।

ছোটোগল্পের শিল্পরূপগত বিচারে তার প্রতিবেশী হল একাঙ্ক নাটক এবং লিরিক কবিতা। বনফুল তাঁর ছোটোগল্পে এই শিল্পরূপের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ছোটোগল্পকে একাঙ্ক নাটক এবং লিরিক কবিতা গুণাবলীকে একত্রে সমন্বিত করে ছোটোগল্পের গঠনশিল্পকে শক্তিশালী করে তুলেছেন।

২.২.৬.২ : গল্প পরিচয়—নিমগাছ

কাহিনী সংক্ষেপ ঃ নিমগাছ দেখলে সকলেই তার থেকে কিভাবে উপকৃত হতে পারে সে ব্যাপারেই সচেষ্ট হয়। কেউ তার ছাল ছাড়িয়ে নেয়, কেউ পাতা তুলে আনে, “কচি ডালগুলো ভেঙে চিবোয় কত লোক ..... দাঁত ভালো থাকে।” নিমের হাওয়া ভালো বলে গাছটি কেউ কাটেও না, যত্নও করে না। চারপাশে জমে আবর্জনা। হঠাৎ একদিন একটা নতুন ধরনের লোক এসে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। সে পাতা তুললো না ডাল ভাঙল না, শুধু চেয়ে রইল গাছটার দিকে। তার মনে হল যেন “এক ঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে।” এই মানুষটি আর কেউ নয়, কবি। নিমগাছটার ইচ্ছে করল এই মানষটির সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু মাটির ভেতরে গভীরে তার শিকড় ছড়ানো তাই পারলো না, আর পাশের বাড়ির গৃহকর্মনিপুণা লক্ষ্মী বউটারও এই দশা।

বিশ্লেষণ—এই ছোটোগল্পটিতে নিমগাছটি সম্পর্কে নানা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—একটির পর একটি বাক্যে। নিমগাছটি তার সম্পূর্ণ অবয়ব নিয়ে শরীরী সত্তা নিয়ে দাঁড়ায় যেন পাঠকের সামনে, কিন্তু এরপর ছোটোগল্পের শেষ বাক্যটি গল্পের সমাপ্তি টেনেছে। সম্পূর্ণ গল্পটি যে নিমগাছ সম্পর্কে; নিমগাছটির পরিপূর্ণতা, অস্তিত্ব ফুটিয়ে তুলেছে তা আসলে বাহ্য। নিমগাছটি গল্পকারের বর্ণনার মূল উদ্দেশ্য নয়, গল্পের শেষ পংক্তিতে যে গৃহকর্মনিপুণা লক্ষ্মী বউটার কথা বলা হয়েছে সেই হল এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র।

নিমগাছটি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা আসলে গৃহকর্মনিপুণা লক্ষ্মী বউটা সম্পর্কেই বেশি সত্য। গল্পের গঠন কৌশলের মূল রহস্যটিই আছে গল্পের অন্তিম বাক্যটিতে, আবার সেটি চমক দিয়ে গল্পটি শেষ হয়েছে। যে গৃহবধুকে বর্তমান সমাজে কেউ যত্ন করে না, সেই গৃহবধূটি সবার সেবায় আত্মনিয়োগ করে পরিণামে অবহেলায় অনাদরে ঘরের কোণে পড়ে থাকে, সেই গৃহবধূটিকে প্রশংসা করলেও সে তার কোনো সাড়া দিতে পারে না। সমাজে সংসারে তার শিকড় অনেক দূর চলে গেছে। অনড় হয়ে সে থাকে পরের সেবায় নিয়োজিত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে গৃহে নারীর অবস্থানটিও এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গল্পটির পরিণতি মাত্র একটি বাক্যে হয়ে ওঠে গভীর ব্যঞ্জনাবহ।

২.২.৬.৩ : লেখক পরিচিতি— প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮)

প্রেমেন্দ্র মিত্র বাংলা গল্পের জগতে এসেছিলেন, "যাদের কথা কেউ লেখে না, যাদের চোখ ধাঁধানোর ছড়াছড়ি নেই, তাদের কথা লেখার একটা তাগিদ" অনুভব করে। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত জীবনের ব্যর্থতা ক্ষয় (গল্প লেখার গল্প) আশাভঙ্গ এবং আদর্শচ্যুতি, নাগরিক জীবনের মানসিকতা অবিশ্বাস মানবিক মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব সংকট তাঁর ছোটোগল্পে বিচিত্রভাবেই উদঘাটিত হয়েছে। তাঁর সাহিত্যজীবন দীর্ঘ (১৯৩০ থেকে আরম্ভ করে ১৯৮০ পর্যন্ত দীর্ঘ) এর মধ্যে সমাজে অনেক মূল উপজীব্য পরিবর্তন ও সংঘটিত হয়েছে তবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের বিষয় সমকালীন নগরজীবন এবং তার ক্ষয়। নাগরিক ব্যক্তির মূল্যবোধের ক্ষয় ও সংকট তিনি তাঁর অধিকাংশ গল্পে রূপায়িত করেছেন।

২.২.৬.৪ : গল্প পরিচিয়— পুন্নাম

কাহিনী সংক্ষেপ ঃ স্বামী-স্ত্রীর সংসারে একটি রুগ্ন শিশু জীবনের সব আনন্দকে কেড়ে নিয়েছে। ললিত এবং ছবি একান্ত চেষ্টা করে শিশুটিকে শান্ত করতে সেবায়, যত্নে; কিন্তু কিছু হয় না, অতি সীমিত তার আয় এবং সে একটি জাহাজের সরকার। মাসে যা আয় হয় তার তাতে মুদির ঋণ শোধই চলে না, তা ডাক্তার। কিন্তু তারা কোনো ত্রুটি রাখেনি। ডাক্তারের পরামর্শ হাওয়া বদল করার জন্য। ললিত যেভাবে পারে টাকা সংগ্রহ করে ছবি ও ছেলেকে নিয়ে চেঞ্জে যায়। ছেলে ভাল হয়ে ওঠে। পাশের বাড়ির ছেলে টুনুর প্রতি ললিতের ছেলের আক্রমণাত্মক মনোভাব, অন্ধ অবোধ স্বার্থপরতা কদর্যভাবে প্রকাশিত হয়। প্রতিবেশী শিশু টুনুর উপর তার অত্যাচারের শেষ নেই। শেষপর্যন্ত টুনু রোগে ভুগে মারা যায়। সুস্থ হয়ে ওঠে ললিতের নীচমনা ছেলেটি। ললিত অনুশোচনায় আত্মধিক্কারে বলে ওঠে যে সে চুরি করেছে, জাহাজের গাঁঠরি বিক্রি করেছে—ভবিষ্যতের মানুষের দাবি মেটানোর জন্য। একথা সে স্বীকার করে যে এ চুরি কোনোদিন ধরা পড়বে না। চিরকাল ধরে শুধু তাকেই খোঁচা দেবে। বেঁচে থাকার জন্য বিবেককে বলি দেয় যে নিম্ন মধ্যবিত্ত তাদেরই মর্মবেদনা এখানে শিল্প রূপায়িত। 'পুন্নাম' নরক থেকে ত্রাণ করে যে সেই পুত্র। এখানে ললিতের পুত্র নরক থেকে ত্রাণ করেনি, বরং সে নরকের পথ অবারিত করে দিয়েছে। নিম্নবিত্ত মানুষ সর্বস্ব হারিয়েছে, নীতি হারিয়েছে—তবু তার বিবেকের আত্মদংশন আছে। অসুস্থ পুত্রের জীবন বাঁচাতে ললিত চুরি করে অর্থ সংগ্রহ করতেও দ্বিধা করে না, কিন্তু মনের গ্লানি তিক্ততাকে মুছে ফেলতে পারে না। সন্তানকে পিতামাতা পৃথিবীতে আনবার দায়িত্ব নিয়ে তারাই তার বুকে হিংসার জঘন্য বৃত্তি বীজরূপে প্রোথিত করেন। সেই সন্তানের হিংসাকুটিল মানসিকতা দেখে তাদের পাপবোধ জেগে ওঠে। এই নিদারুণ মূল্যবোধের সংকটের মধ্যেও তাদের মনে হয় এতখানি ক্ষুব্ধ বিচলিত হবার বুঝি কিছুই কারণ নেই।

২.২.৬.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ‘নিমগাছ’ গল্পটি অণুগল্পের সার্থক প্রকাশ—আলোচনা করো।

২। ‘বনফুলের গল্পের গঠনভঙ্গি ভিন্ন মাত্রার’—পঠিত যে কোনো একটি গল্প আলোচনা করে মন্তব্যটির গ্রহণযোগ্যতা বিচার করো।

৩। বনফুল রচিত ‘নিমগাছ’—গল্পটির নামকরণ কতদূর সঙ্গত হয়েছে—তা’ পর্যালোচনা করো।

৪। বনফুলের ‘নিমগাছ’ গল্পটিকে সার্থক অণুগল্প বলার পক্ষে তোমার যুক্তি প্রদর্শন করো।

৫। ‘পুন্নাম্’ গল্পটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

৬। প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত ‘পুন্নাম’ গল্পটির অভিনবত্ব বিচার করো।

২.২.৬.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। সাহিত্যে ছোটো গল্প—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

২। আধুনিক বাংলা ছোটো গল্প ও গল্পকার—ভূদেব চৌধুরী।

৩। কালের পুত্তলিকা—অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়।

পর্যায়গ্রন্থ - ২

একক - ৭

হাড়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বিন্যাসক্রম :

২.২.৭.১ ক্স লেখক পরিচিতি—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০)

২.২.৭.২ ক্স গল্প পরিচয়—হাড়

২.২.৭.৩ ক্স আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.২.৭.৪ ক্স সহায়ক গ্রন্থাবলী

২.২.৭.১ : লেখক পরিচিতি—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে মন্বন্তর দুর্ভিক্ষ, বেকারী, দারিদ্র্য প্রভৃতি সামাজিক বিপর্যয়ের মধ্যেই সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প রচনার সূত্রপাত। তাই স্বাভাবিক কারণেই সমকাল তাঁর গল্পে বিচিত্র জটিলভাবে ছায়াপাত করেছে। বীতংস তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ। সাম্যবাদী চিন্তায় তিনি নিজে ছিলেন উদ্বুদ্ধ, তাঁর রচনায় সাম্যবাদী ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

বীতংস গ্রন্থের হাড় গল্পটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'হাড়' গল্পে সমাজের দুইটি শ্রেণীর বৈষম্য এবং জীবন সম্পর্কে মূল্যবোধের তীব্র বৈষম্যকে দেখিয়ে ব্যক্তির মূল্যবোধের সংকটকে রূপায়িত করা হয়েছে।

পটভূমি ঃ সারাদেশে যখন বেকারত্ব, যুদ্ধের বিভীষিকা, মন্বন্তর, মধ্যবিত্তের সামনে বেঁচে থাকার কোনো অবলম্বন নেই, তখন দেশের বিত্তবান মানুষের গোষ্ঠীর স্বার্থসর্বস্ব অর্থলিপ্সা অমানবিকতা স্পষ্ট হয়েছে 'হাড়' গল্পে।

২.২.৭.২ : গল্প পরিচয়—হাড়

'হাড়' গল্পে একদিকে অসহায় বুভুক্ষু মানুষ, অন্যদিকে রায়বাহাদুরের সুখী বিলাসী জীবনযাপন, একদিকে ধনগরিমা এবং অন্যদিকে নির্ধন বুভুক্ষকে দুই বিপ্রতীপতার মধ্যে তৎকালীন সংকটকে তীব্রভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। এরমধ্যে একটি মধ্যবিত্ত বেকার কিভাবে মনুষ্যত্ব—মূল্যবোধ হারিয়ে সামান্য চাকরীর জন্য স্তাবকতা করছে, নিজেকে বিকিয়ে দিচ্ছে একটা চাকরীর জন্য তাও দেখিয়েছেন। একদিকে গ্ল্যাডিকোরার দামী সেন্ট, ভারী পর্দা, মশারী আলো এবং ভেলভেটের দামী বাক্সে তুচ্ছ হাড় অন্যদিকে ডাস্টবিন এবং সামান্যতম আহার্যের জন্য কুকুর ও মানুষের কাড়াকাড়ি।

দারিদ্র্য আর বিলাসিতার পরস্পর বিপরীতধর্মী এই ছবির মাধ্যমে লেখক গল্পের মূলরসকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। রায়বাহাদুরের বিচিত্র হাড়ের সংগ্রহ দেখানোর সময়ও বাইরের নিরন্ন মানুষের সম্পর্কে ধনীর বিরক্তি আর উষ্মা প্রকাশ পেয়েছে।

"পার্কের এই ডেসটিট্যুটগুলোর জ্বালায় রাতে আর ঘুমনো যায় না।....... খেতে না পেলে চিৎকার

করবে, খেতে পেলেও তাই। রায়বাহাদুরের বাড়িতে চা খাওয়ার সময়ে বুভুক্ষুদের চিৎকার শুনে যুবকের মনে হয় মরবার আগে মানুষের গলার স্বর কি ওইরকম গগনভেদী হয়ে ওঠে।"

পুঁজিবাদী আত্মকেন্দ্রিক ধনী মানুষটির কাছ থেকে উপদেশের নামে বঞ্চনা পেয়ে ফিরে আসার সময়ে "ওই কালো আকাশের রঙ আগুনের মতো লাল হয়ে উঠবে কবে, এই ম্যাগ্নোলিয়ার গন্ধজড়িত মিঠে হাওয়ায় বড়ো আগুনের ঝলক লক্‌লক্ করে বয়ে যাবে কবে?"

যাদুবিদ্যায় অসামান্য গুণে একটা কুমারী মেয়ের অস্থি প্রকৃতির অধীশ্বর করে তুলবার স্বপ্নের মধ্যে অবাস্তবতা অনেক। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে দারিদ্র্য ক্ষুধা শোষণের যন্ত্রণার শেষপর্যন্ত বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া অনেক বেশি স্বাভাবিক। কিন্তু সে সময় এখনও আসেনি, যখন বিপ্লবের মহান মন্ত্র ঐ সর্বহারা মানুষকে শ্রেণীচেতনায় উদ্বুদ্ধ করবে, সেই উত্তরণের প্রতি আশা জাগিয়ে ব্যক্তির মূল্যবোধের এই সংকট থেকে পাঠকদের নিষ্কৃতি দিয়েছেন লেখক।

রায়বাহাদুর হাড় পেয়েছেন, বুভুক্ষু মানুষ ওরাও হাড় পেয়েছে। রায়বাহাদুর মন্ত্র পাননি, কিন্তু ওরা মন্ত্র পাবে। শোষকের সামনে শোষিতের ধীরে ধীরে হেরে যাওয়াকে চিত্রিত করেছেন। শুধু মূল্যচেতনার অবক্ষয় এর মধ্যেই থেমে থাকেনি। গল্পের 'ওরা মন্ত্র পাবে' ..... এর মধ্য দিয়েই সংগ্রামী মানুষের সার্থকতার অস্ত্যর্থক প্রত্যক্ষে গল্পের সমাপ্তি ঘটেছে। সমাজ পরিবর্তনের মন্ত্র তারা পাবে, এই সমাজকে একদিন শোষণমুক্ত করার অসাধ্য সাধনে ব্রতী হবে। শোষকের সামনে শোষিত বুভুক্ষু মানুষের ক্ষয়ের চিত্র, ধীরে ধীরে হেরে যাওয়া আছে এই গল্পে—কিন্তু হারতে হারতেও তিনি তাদেরকে প্রত্যয়ে উদ্দীপিত করেন ওরা মন্ত্র পাবে। উচ্চবিত্ত মানুষ—সাধারণ মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন শুধু নয় তারা সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রামের থেকেও বিচ্ছিন্ন, এক কৃত্রিম জগতে বিচ্ছিন্ন থাকতে থাকতে হয়তো তারা জীবন বিচ্ছিন্ন হাড়ে পরিণত হবে। যে হাড় একদিন শরীরের অভিন্ন অংশ ছিল, আর আজ শুধু হাড় শুষ্ক রিক্ত জীবন সম্ভাবনাশূন্য এক আবর্জনা মাত্র। যে মানুষেরা সংগ্রামী তাদের কোলাহল শোনা যাচ্ছে তাদের জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আগামী জীবন গড়ে উঠবে। গল্পের পরিণতিতে গল্পকার এই আশাই ব্যঞ্জিত করেছেন। সংগ্রামী মানুষের সার্থকতার অস্ত্যর্থক প্রত্যক্ষে গল্পের সমাপ্তি ঘটেছে। উচ্চবিত্তদের শ্রেণীচেতনায় মূল্যবোধের সংকটকে সূচিত করেছেন লেখক।

২.২.৭.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হাড়' গল্পটির মধ্যে শ্রেণী চরিত্রের সংকট আলোচিত হয়েছে–বিশ্লেষণ করো।

২। 'হাড়' গল্পে রায়বাহাদুরের চরিত্র ব্যাখ্যা করো।

২.২.৭.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। সাহিত্যে ছোটগল্প ঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

২। আধুনিক বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার ঃ ভূদেব চৌধুরী

৩। কালের পুত্তলিকা ঃ অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়

পর্যায়গ্রন্থ - ২

একক - ৭

রস

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

বিন্যাসক্রম :

২.২.৭.৫ ঞ্জ লেখক পরিচিতি—নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৭-১৯৭৫)

২.২.৭.৬ ঞ্জ গল্প পরিচয়—রস

২.২.৭.৭ ঞ্জ রস গল্পের চরিত্রসৃষ্টি

২.২.৭.৮ ঞ্জ নামকরণ

২.২.৭.৯ ঞ্জ গল্পভাষা

২.২.৭.১০ ঞ্জ আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.২.৭.১১ ঞ্জ সহায়ক গ্রন্থাবলী

২.২.৭.৫ : লেখক পরিচিতি—নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৭-১৯৭৫)

বাংলা কথাসাহিত্যে নরেন্দ্রনাথ মিত্র স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। বাংলা সাহিত্যজগতে তিনি একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার। নরেন্দ্রনাথ মিত্র ১৯১৭, খ্রিঃ ৩০শে জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। লেখকের জন্মস্থান বাংলাদেশের ফরিদপুরের সদরদিতে। পিতা--মহেন্দ্রনাথ মিত্র ও মাতা--বিরাজবালা দেবীর সন্তান ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রিঃ শাস্□য় সংগীত শিল্পী শোভনাদেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র ভাঙ্গা উচ্চবিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছেন। তিনি আই-এ পাশ করেছিলেন ফরিতপুরের রাজেন্দ্র কলেজ থেকে। পরবর্তীকালে তিনি বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। কলকাতায় আসার পর নরেন্দ্রনাথ মিত্র বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেছিলেন। প্রথম দিকে নরেন্দ্রনাথ মিত্র কবিতা লিখতেন, তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতার নাম ‘মূক’। প্রথম মূদ্রিত গল্প ‘মৃত্যু ও জীবন’ (১৯৩৬)। গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রথম গল্প সংকলন ‘অসমতল’ (১৯৪৫)। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখা গল্পগ্রন্থগুলি হল –‘হলদেবাড়ি’ (১৯৪৫), ‘সেতার’ (১৯৪৫), ‘বিদুৎলতা’ (১৯৪৫), ‘উলে□ারথ’ (১৯৪৬), ‘পতাকা’ (১৯৪৭), ‘চড়াইউৎরাই (১৯৫০) ইত্যাদি। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখা প্রথম উপন্যাস ‘হরিবংশ’। এরপর একে একে লিখলেন ‘দীপপুঞ্জ’, ‘চেনামহল’ ‘দেহমন’ ‘দূরভাষিনী’, ‘সঙ্গিনী’, ‘অনুরাগিনী’, ‘সহৃদয়া’, ‘চোরাবালি’, ‘তিনদিন তিনরাত’, ‘শিখা’, অনাত্মীয়া, সিঁদূরে মেঘ’ ও ‘নির্বাসিন’ প্রভৃতি উপন্যাস।

১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮ খ্রিঃ সাপ্তাহিক ‘দেশ’ পত্রিকায় আবু সয়ীদ আইয়ুব একটি নিবন্ধে লিখেছেন – ‘‘নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘বিকল্প’ গল্পটিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বড় গল্পের পর্যায়ে উত্তীর্ণ বলে চিহ্নিত করেছেন।’’ নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তুলনা করেছেন সমালোচকেরা।

দু'জন কথাশিল্পীর মিল দেখা যায় মনস্তাত্ত্বিক চুলচেরা বিশ্লেষণে। নরেন্দ্রনাথ মিত্র মানুষের স্বভাব-চরিত্র মনোলোকে কি প্রভাব নিয়ে আসে, সেই দিকটার প্রতি আলোকপাত করেছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, ডঃ সরোজমোহন মিত্র তাঁর 'বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প' গ্রন্থে বলেছেন — ''নরেন্দ্রনাথ প্রধানত মনের কারবারি। নানা ঘটনার পিছনে মানুষের মনে যে বিচিত্র ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় নরেন্দ্রনাথের গল্পে তারই প্রাধান্য।''

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সমসাময়িক অন্যতম কথাসাহিত্যিক হলেন — নবেন্দু ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সুবোধ ঘোষ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সতীনাথ ভাদুড়ী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, সন্তোষকুমার ঘোষ প্রমুখ। এঁরা প্রত্যেকেই বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেয়েছেন। সমসাময়িক গল্পকাররা কথাশিল্পী হিসেবে বাংলা ছোটগল্পের ভুবনকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। সমকালীন গল্পকার সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পর্কে বলেছেন — ''গল্পকে গল্প করে বলা, সেইসঙ্গে শিল্পের স্বচ্ছতম গুণটিকে ঘাসের শিসে শিশিরবিন্দুর মতো ধরে রাখা — নরেন্দ্রনাথের জাদুশক্তি বলুন, জোর বলুন, সব এইখানে। আর অনায়াস তাঁর এই সিদ্ধি। সেখানে তিনি মপাশাঁ, ও হেনরি, চেকভ কি রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ আসনে।'' (১৪ই মার্চ ১৯৮৩। (গল্পমালা বইয়ের মলাট)।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে বলা যায় কল্লোল পরবর্তী যুগের লেখক। বিশ শতকের চারের দশকে সাধারণ মানুষের জীবন ছিল না সুমধুর। তখন পরিবেশ - পরিস্থিতি ছিল খুবই জটিল। মানুষের জীবন ছিল দিশাহারা। কান্না - হাসির দোল-দোলানো জীবনে সবকিছুতেই এসেছে বাধা। সেই সময় মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের অবস্থা ছিল খুবই ভয়াবহ। প্রতিটি পদক্ষেপে দিশাহারা মানুষগুলি ব্যথা পেয়েছে। একদিকে কালোবাজারি, মজুতদারি, মন্বন্তর, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বিমান-হানা, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে তখন তারা ছিল বি□বস্ত। 'কালের পুত্তলিকা' গ্রন্থে অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন — ''বাঙালি নিম্ন-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আশা - আকাঙ্খা, আনন্দ-বেদনা, হতাশা ও ব্যর্থতার সফল রূপকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র। বস্তুত মধ্যবিত্ত জীবনের এত বড়ো শিল্পী খুব কমই এসেছেন। আপাতত-শান্তি বৈচিত্র্যহীন মধ্যবিত্ত জীবনে যে এতো রহস্য ছিল তা নরেন্দ্রনাথ উদঘাটন করে না দিলে আমরা জানতেই পারতাম না। মানবমনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য উন্মোচনে তিনি নির্মম নিপুণ।'' (পৃঃ ৩৮৫)

প্রত্যেক লেখকই কমবেশি নিজের চেনা জানা গণ্ডির ভেতর থেকে গল্পের উপাদান খুঁজে নেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্রও সৃজন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাংলা কথাসাহিত্য রচনা করেছেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'মহাশ্বেতা', 'চোর' চাঁদমিঞা', সেতার, হেডমাস□ার, 'পালঙ্ক' গল্পের মতো 'রস' গল্পেও অর্থনৈতিক - সামাজিক দ্বন্দ্বের কথা তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের পাঠ্য 'রস' গল্পের বিষয় ও কাঠামোগত বিন্যাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সর্বোপরি বলা যায় নরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখনী আর্থসামাজিক সংকটকে নির্ভর করে সাহিত্য সৃজন করেছে। তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে শান্ত-নিস্তরঙ্গ পল্লীজীবন যেমন উঠে এসেছে তেমনি কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকে তিনি নিপুন শক্তিতে তুলে ধরেছেন। পরবর্তীকালে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সাহিত্যকর্মকে নিয়ে চলচ্চিত্র রূপায়িত হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - অগ্রগামীর হেডমাস□ার, বিলম্বিতলয়, রাজেন তরফদারের 'পালঙ্ক' প্রভৃতি। ১৯৭৪ সালে 'রস' গল্প অবলম্বনে বলিউডে একটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল। হিন্দি চলচ্চিত্র 'সওদাগর' ছবিতে অমিতাভ বচ্চন অভিনয় করেছিলেন

'মোতালেফ' চরিত্রে। ২০১৯ খ্রিঃ অমিতাভ বচ্চন দাদাসাহেব ফালেক পুরস্□ার পেয়েছেন। গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র এই চলচ্চিত্রের আগেই ১৯৬২ খ্রিঃ আনন্দ পুরস্□ারে ভূষিত হয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্র শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৪ই সেপ্টে□ম্বর ১৯৭৫ খ্রিঃ।

২.২.৭.৬ : গল্প পরিচয় - রস

বাংলা মধ্যবিত্ত জীবনের একজন শ্রেষ্ঠ কথাকার হলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। বিশ শতকের চারের দশকে বাংলা কথাসাহিত্যে তিনি গোত্রান্তর ঘটিয়েছেন। সেইসময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নরেন্দ্রনাথ মিত্র মধ্যবিত্ত জীবনের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, হাসি-কান্না-বাংলা গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে তুলে ধরেছেন। তিনি মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার ছিলেন বলে, মানব চরিত্রের অন্তর্নিহিত রূপটি 'রস' গল্পের মধ্যে তুলে ধরতে পেরেছেন। ফুলবানু ও মাজুখাতুনকে কেন্দ্র করে মোতালেফের অন্তরে প্রেমের যে দ্বন্দ্ব 'রস' গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে প্রেম-প্রীতি এসেছে তাঁর লেখনীর কলা কুশলতায়। নরেন্দ্রনাথ মিত্র 'রস' গল্পটি শুরু করেছেন এইভাবে —''কার্তিকের মাঝামাঝি চৌধুরীদের খেজুর বাগান ঝুরতে শুরু করল মোতালেফ। তারপর দিন পনের যেতে না যেতেই নিকা করে নিয়ে এল পাশের বাড়ির রাজেক মৃধার বিধবা স্□ী মাজুখাতুনকে। পাড়াপড়শী সবাই তো অবাক। এই অবশ্য প্রথম সংসার নয় মোতালেফের। এর আগের বউ বছর খানেক আগে মারা গেছে। তবু পঁচিশ-ছা□বিশ বছরের জোয়ান পুরুষ মোতালেফ। আর মাজুখাতুন ত্রিশে না পৌঁছলেও তার কাছাকাছি গেছে। ছেলেপুলের ঝামেলা অবশ্য মাজুখাতুনের নেই। মেয়ে ছিল একটি, কাঠিখালির শেখদের ঘরে বিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ঝামেলা যেমন নেই, তেমনি মাজু খাতুনের আছেই বা কি। বাক্স সিন্দুক ভরে যেন কত সোনা-দানা রেখে গেছে রাজেক মৃধা, মাঠ ভরে যেন কত ক্ষেত- ক্ষামার রেখে গেছে যে তার ওয়ারিশি পাবে ? মাজুখাতুন ভাগের ভাগ ভিটার পেয়েছে কাঠা খানেক, আর আছে একখানি পড়ো পড়ো শনের কুঁড়ে। এই তো বিষয় সম্পত্তি, তারপর দেখতেই বা এমন কি একখানা ডানকাটা হুরীর মত চেহারা। দজ্জাল মেয়ে মানুষের আঁট-সাঁট শক্ত গড়নটুকু ছাড়া কি আছে মাজু খাতুনের যা দেখে ভোলে পুরুষেরা, মন তাদের মুগ্ধ হয়।'' নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস' গল্পটির নায়ক মোতালেফ। খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করা তার কাজ। এই শিক্ষা মোতালেফ নিয়েছে রাজেক মৃধা নামে এক নামডাকওয়ালা গাছির কাছ থেকে। গল্পপাঠে আমরা জানতে পারি কার্তিক মাসে গাছে গাছে খেজুর রস সংগ্রহ করে ঘরে আনলেও তার ভাল আয় হয় না। সকাল বেলায় খেজুর গাছ থেকে রস নামিয়ে আনে, তার পর সেই রসে জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করা হয়। তারপর সেই খেজুর গুড় দিয়ে যেমন পাটালি তৈরি হয় তেমনি টিনে বা মাটির হাঁড়িতে করে খেজুর গুড় বাজারের দোকানে চলে যায় বিক্রির জন্য। নরেন্দ্রনাথ মিত্র যখন 'রস' গল্পটি লিখেছিলেন তখন খেজুর গুড় বিক্রির ভালো বাজার ছিল না, তাই বিক্রি-বাটাও কম হতো।

তখনকার দিনে সাধারণ মানুষদের পরিবারে অর্থনৈতিক সংকট লেগেই থাকতো। গ্রামের দিকে ভাল কাজ পাওয়া যেত না। আবার কেউ বড়লোকের বাড়িতে কাজ পেলেও সম্মানজনক পারিশ্রমিক পেত না। তারফলে জীবন নির্ধারণের জন্য বাধ্য হয়ে খেজুর গাছের রস সংগ্রহ করতে হতো। এখনকার দিনের মতো ১০০ দিনের কাজ, ২ টাকা কিলো দরে রেসন থেকে চাল সংগ্রহ করা ইত্যাদির ব্যবস্থা

ছিল না। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়ে মোতালেফ প্রচুর পরিশ্রম করে রস সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। মোতালেফের মতো অনেকেই রসে জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকতো বলে, বাজারে গুড় ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতার মধ্যেও পড়তে হতো।

'রস' গল্পের মাজুখাতুন ছিল সব দিক দিয়ে বঞ্চিতা ও অবহেলিতা নারী। মোতালেফ, মাজুখাতুনকে বিয়ে করেছে কার্যসিদ্ধি উদ্ধারের জন্য। শুধু নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রয়োজনে ও খেজুর রসের ভালো গুড় তৈরির জন্য তাকে সে নিকা করে এনেছে। গল্পপাঠে আমরা জানতে পারি মোতালেফ মাজুখাতুনকে কখনোই ভালোবাসেনি। মোতালেফের চাউনিটা তেরছা হলে কি হবে, সে বেছে বেছে সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়েছে। এমনকী সুন্দর মুখের খোঁজ করেছে সে অনবরত। 'রস' গল্পটির মূল কাহিনী খেজুরগাছ থেকে রস সংগ্রহের কাহিনী হলেও লেখক মানবজীবনের গভীর রোমানি□ক রসকে তুলে ধরেছেন।

খেজুরের রস থেকে গুড় তৈরির ভালো কারিগর ছিল মাজু খাতুন। সেইজন্য মোতালেফ, মাজুখাতুনকে নিকা করে নিয়ে এসেছিল। এমনকী মোতালেফকে নিকা করার খরচ পর্যন্ত দিতে হয়নি। যাইহোক, মোতালেফ অর্থনৈতিক উন্নতির কথা ভেবে মাজুখাতুনকে বিয়ে করেছে। কেননা মাজু খাতুন, একমাত্র মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পর স্বামীর ভিটেয় একাকী জীবন ভালো লাগছিল না বলে মোতালেফের কথাতে রাজী হয়েছিল। মাজু খাতুন, বয়সের দিক থেকে মোতালেফের থেকে বড়। তবুও, মাজুখাতুনের মোতালেফকে বিয়ে করার উদ্দেশ্য একটাই, সে সবদিক থেকে সুপুরুষ।

মোতালেফ সফল একনিষ্ঠ কর্মী; যে কাজে হাত দিয়েছে, সে কাজে সোনা ফলেছে। সে সকাল বেলা ঘুম থেকে ওঠে, আর রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত নিষ্ঠাভরে কাজ করেছে। খেজুর গাছ পরিষ□ার করে, জ্বালানি সংগ্রহ করে, রস সংগ্রহ করা সত্যিই কঠিন কাজ। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে, তার মনে সহজ-সরলতা প্রায় নষ্ট হতে বসেছে। তখন নিজের হাতে তৈরি করা গুড়ের সুনাম কি করে হবে, সেই চিন্তাতে ব্যস্ত থেকেছে। আর মাজুখাতুন, মোতালেফের সঙ্গে থাকলে, তাদের তৈরি করা গুড় বাজারে অনেক মানুষের মুখে স্বাদ এনে দিতে পারে।

আসলে সেইসময়কার মুসলিম সমাজের ভেতরের ছবিকে নরেন্দ্রনাথ মিত্র 'রস' গল্পের মধ্যে তুলে ধরেছেন। মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় তালাক দেওয়ার রীতিকে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনি নিম্নবিত্ত মুসলিম সমাজ যে কুসংষ□ারে বিশ্বাসী ছিল তাও লেখকের নজর এড়িয়ে যায় নি। আবার কন্যাপণ দেওয়ার রীতিও যে সেই সময়কার সমাজে চলতো তারও পরিচয় আমরা গল্পে পেয়েছি। ফুলবানুর বাবা এলেম সেখ, মোতালেফের সঙ্গে ফুলবানুর নিকা দেওয়ার সময় অর্থ নিয়েছে। ''সবচেয়ে পছন্দ হয়েছিল মোতালেফের ফুলবানুকে। চরকান্দার এলেম সেখের মেয়ে ফুলবানু। আঠার উনিশ বছর হবে বয়স। রসে টলটল করছে সর্বাঙ্গ, টগবগ করছে মন। ইতিমধ্যে অবশ্য একহাত ঘুরে এসেছে ফুলবানু। খেতে পরতে কষ্ট দেয়, মার ধোর করে এই সব অজুহাতে তালাক নিয়ে এসেছে কইডুবির গফুর সিকদারের কাছ থেকে। আসলে বয়স বেশি আর চেহারা সুন্দর নয় বলে গফুরকে পছন্দ হয়নি ফুলবানুর। সেই জন্যই ইচ্ছা করে নিজে ঝগড়া কোন্দল বাঁধিয়েছে তার সঙ্গে। কিন্তু একহাত ঘুরে এসেছে বলে কিছু ক্ষয়ে যায়নি ফুলবানুর, বরং চেকনাই আর জেল্লা খুলেছে দেহের, রসের ঢেউ খেলে যাচ্ছে মনের মধ্যে। চরকান্দায় নদীর ঘাটে ফুলবানুকে একদিন দেখেছিল মোতালেফ। এক

নজরেই বুঝেছিল যে, সেও নজরে পড়েছে।'' আঠের-উনিশ বছরের স্বামী পরিত্যক্তা ফুলবানুর প্রতি মোতালেফের আকর্ষণ সর্বাধিক। সেই পরিস্থিতিতে ফুলবানুও মনের মানুষের মান রাখতে সর্বদা সচেষ্ট থেকেছে। সেইসঙ্গে ফুলবানুও দেখে নিতে চেয়েছে মনের মানুষের 'ত্যাজ' কতখানি।

শীতের শুরুতেই মোতালেফ ৮০ থেকে ১০০টি খেজুর গাছ রস সংগ্রহের জন্য বরাদ্দ পেয়েছে। মাজুখাতুন, মোতালেফের বাড়িতে আসার পর থেকেই খেজুর গাছের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। চৌধুরীদের বাগানেও ত্রিশটি গাছ বেশি বরাদ্দ পেয়েছে। চৌধুরীদের সঙ্গে মোতালেফের চুক্তি হয়েছে ,-''গাছ কেটে হাঁড়ি পেতে রস নামিয়ে দিতে হবে। অর্ধেক রস মালিকের, অর্ধেক তার। মেহনৎ কম নয়, এক একটি করে এতগুলি গাছের শুকনো মরা ডালগুলি বেছে বেছে আগে কেটে ফেলতে হবে। বালিকাচায় ধার তুলে জুৎসুই করে নিতে হবে ছ্যান। তারপর সেই ধারালো ছ্যানে গাছের আগা চেঁছে চেঁছে তার মধ্যে নল পুততে হবে সরু কঞ্চি ফেড়ে। সেই নলের মুখে লাগসই করে বাঁধতে হবে মেটে হাঁড়ি। তবে তো রাতভরে টুপটুপ করে রস পড়বে সেই হাঁড়িতে। অনেক খাটুনি, অনেক মেহনৎ। শুকনো শক্ত খেজুর গাছ থেকে রস বের করতে হলে আগে ঘাম বের করতে হয় গায়ের। এতো আর মার দুধ নয়, গাইয়ের দুধ নয় যে বোঁটায় বানে মুখ দিলেই হল।''

খেজুর গাছ থেকে রস নামাবার বিদ্যে মোতালেফকে নিজের হাতে শিখিয়েছিল রাজেক মৃধা। বছর কয়েক ধরে রাজেকের সঙ্গে কাজ করে, অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। তাছাড়াও রাজেকের সঙ্গে সিকদারদের মকবুল, কাজীদের ইসমাইল কাজ করলেও মোতালেফের মতো তাদের হাত পাকেনি। আসলে খেজুর গাছ কাটলেই হয় না, বা হাঁড়ি বয়ে রস আনলেই হবে না – ''রস জ্বাল দিয়ে গুড় করবার মতো মানুষ চাই।'' রস থেকে গুড় তৈরির প্রক্রিয়ায় অনেক সময়ের প্রয়োজন। প্রচুর জ্বালানি সংগ্রহ করতে হয়। রস ফুটিয়ে গাঢ় করার জন্য একজন দক্ষ শিল্পীর প্রয়োজন। যে মন দিয়ে, ধৈর্য্য ধরে দক্ষ কারিগরের মতো রস থেকে গুড় তৈরি করতে পারবে।

গল্পপাঠে আমরা জানি-মোতালেফের মা, ছোটবেলায় মারা গিয়েছিল। তার ফলে ছেলেবেলা থেকেই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে সে বড় হয়েছে। তার উপর তো অর্থনৈতিক হাহাকার ছিলই। মোতালেফ, মাজুখাতুনকে বিয়ে করলে গুড়ের ব্যবসায় বেশ কিছু টাকা অতিরিক্ত উপার্জন হলেও ফুলবানুর রূপের মোহে পড়ে মোতালেফ কিছু দিনের মধ্যেই মাজুখাতুনকে তালাক দিয়ে বসে। মোতালেফ কম বয়সী মেয়েদেরকে তুলনা করতোয়ষ-'কাচা রসের হাঁড়ির' সঙ্গে। আর মাজুখাতুনকে মোতালেফ বলতো – ''তুমি হইলা নেশার কালে তাড়ি আর নাস্তার কালে গুড়।''

তারপর এলেম শেখকে কন্যাপণ দিয়ে মোতালেফ, ফুলবানুকে বিয়ে করে বাড়িতে নিয়ে এসেছে। এরপর ফুলবানুর সঙ্গে মোতালেফের সৌন্দর্যময়, স্নিগ্ধসম জীবন শুরু হয়েছে। এমনকী তাদের পারিবারিক জীবন হেসে-খেলেই কেটে গেছে। শারীরিক ও মানসিকভাবে ফুলবানুর যাতে কোন কষ্ট না পায়, তারজন্য মোতালেফ সদা সচেষ্ট থেকেছে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় ফুলবানুকে, মোতালেফ সুয়োরানী করেই রেখেছে। অপরদিকে মাজুখাতুনের কিন্তু হাতের গুণ ছিল। তার তৈরি করা গুড় বাজারে দুপয়সা সের প্রতি বেশি দরে বিক্রী হয়েছে। মাজুখাতুনের তৈরি করা গুড়ের কদরই আলাদা। কেন না সে তো জাত কারিগর। তাই মেহনৎ করে গুড় তৈরি করতে পারে। সেই মাজুখাতুনকে বিনা অপবাদে মোতালেফ তালাক দিয়েছে। ''গুড় বেচে আরও পঞ্চাশ টাকার জোগাড় হতেই মোতালেফ মাজুখাতুনকে তালাক

দিল। কারণটাও সঙ্গে সঙ্গে পাড়াপড়শীকে সাড়ম্বরে জানিয়ে দিল। "মাজুবিবির স্বভাব-চরিত্র খারাপ। রাজেকের দাদা ওয়াহেদ মৃধার সঙ্গে তার আচার ব্যবহার ভারি আপত্তিকর'' এই কথা শোনার পর মাজুখাতুন রেগে গেছে। তারপর মাজুখাতুন তার আগের স্বামীর পুরনো ভিটেতে চলে গেছে।

মোতালেফ সময়ের পরিবর্তনে মাজুখাতুনের সর্বনাশ করে ছেড়েছে। সেই জন্য মাজুখাতুনের বুকের ভিতরটা জ্বলে উঠেছে। সেই পরিস্থিতিতে মোতালেফকে, মাজুখাতুন জানিয়েছে – ''আউ আউ, ছি ছি! তোমার গতরই কেবল সোন্দর মোতিমেঞা, ভিতর সোন্দর না। এত শয়তানি, এত ছলচাতুরী তোমার মনে ? গুড়ের সময় পিপড়ার মত লাইগা ছিলা, আর গুড় যাই ফুরাইল অমনি দূর্ দূর্ !'' এই পরিপ্রেক্ষিতে ফুলবানু খুশী হয়েছে ভীষণ। কিন্তু তার সুখ বেশিদিন স্থায়ী ছিল না। তার খুশীর মনোভাব শীত আসতেই বিষন্নতায় ভরে গেছে। একবছর ঘুরে আবার যখন শীতের সময় এসেছে। তখন মোতালেফ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তখন মোতালেফের একটাই উদ্দেশ্য ভাল গুড় তৈরি করে বাজার ধরে রাখা। সে গুড় তৈরিতে কোন ফাঁকি রাখেনি অথচ ভাল গুড় তৈরি হচ্ছে না। মানুষও ফুলবানুর হাতের গুড় খেয়ে আবার আগের মতো স্বাদ পাচ্ছে না। তাই বাজারে মোতালেফের গুড়ের চাহিদা নেই। ফলে তার জীবনে অর্থনৈতিক সংকট নেমে এসেছে।

ওদিকে মাজুখাতুনও ফের গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল রাজেকের পড়ো – পড়ো শনের কুঁড়োয়। কিন্তু মাজুখাতুনের দিন কাটলেও, রাত কাটতে চায় না। সেই দৃশ্য দেখে রাজেকের বড় ভাই ওয়াহেদের মাজুখাতুনের প্রতি মায়া হয়েছে। ''নদীর ওপারে তালকান্দায় নাদির শেখের সঙ্গে দোস্তি আছে ওয়াহেদের। এক মাল্লাই নৌকা বায় নাদির। মাসখানেক আগে কলেরায় তার বউ মারা গেছে। অপোগণ্ড ছেলেমেয়ে রেখে গেছে অনেকগুলি। তাদের নিয়ে ভারি মুশকিলে পড়েছে বেচারা। কমবয়সী ছুঁড়ী-টুঁড়িতে দরকার নেই তার। সে হয়তো পটের বিবি সেজে থাকবে, ছেলেমেয়ের যত্ন-আত্তি করবে না। তাই মাজুখাতুনের মত একটু ভারিক্কি ধীরবুদ্ধি গৃহস্থ ঘরের বউই তার পছন্দ।'' আমরা জানি, নাদির শেখের পঞ্চাশ-একান্ন বছর বয়স হয়ে যাওয়ায় খুব সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। কারণ কয়েকটি ছোট ছোট বাচ্চা রেখে তার বউ কলেরায় মারা যাওয়াতে তার এত দুঃশ্চিন্তা। সেইজন্য মাজুখাতুনকে সে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এসেছে। এতে নাদির শেখ খুব খুশী হয়েছে। নাদির শেখ গাছি নয়, শীতকালে খেজুর গাছ কাটতে যায় না। সে বরঞ্চ –''বর্ষাকালে নৌকা বায়, শীতকালে কিষাণ কামলা খাটে, ঘরামির কাজ করে।'' কেননা মাজুখাতুনের রসের ব্যাপারে তার ঘেন্না ধরে গেছে।

মাজুখাতুন, নাদির শেখকে বিয়ে করে অন্যত্র চলে যাওয়ায় ফুলবানুও খুশী হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে মোতালেফ দিনরাত বউকে তোয়াজ করতে শুরু করেছে। বাজার থেকে ভালো ভালো আনাজ কিনে নিয়ে এসেছে। দু'জনে হাসিতে, খুশীতে, আনন্দে থেকেছে। তখন মোতালেফ, ফুলবানুকে বলেছে – পুরুষ মাইনষের ঠোঁট তো ফুলজান কেবল পানের রসে রাঙ্গা হয় না, আর – একজনের পানখাওয়া – ঠোঁটের রস লাগে।'' মোতালেফের নিজের কোন ভুঁই ক্ষেত নেই, সেইজন্য মল্লিকদের, মুখুজ্যেদের কিছু কিছু জমি বর্গা চাষ করেছে। কিন্তু ভালো কৃষক বলে কোনদিনই সে পরিচিত ছিল না। ''ফুলবানুর ইচ্ছা, অন্য বাড়ির জাগ – দেওয়া পাটও সে ছাড়িয়ে দেয়। সেই ছাড়ানো পাটের পাটখড়িগুলি পাওয়া যাবে তাহলে। কিন্তু মোতালেফ রাজী নয় তাতে, অত কষ্ট বউকে সে করতে দেবে না।''

কিন্তু ফুলবানুর সুখ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। বছর ঘুরতেই মোতালেফ খেজুর গাছে রস সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। গল্পে দেখা গেছে ''বসন্ত যায়, বর্ষা যায়, কাটে আশ্বিন কার্ত্তিক, ঘুরে ঘুরে ফের আসে শীত। রসের দিন মোতালেফের বতরের দিন। কিন্তু শীতটা এবার যেন একটু বেশি দেরিতে এসেছে। তা হোক, আরো বেশি গাছের বন্দোবস্ত নিয়ে পুষিয়ে ফেলবে মোতালেফ।'' মোতালেফের খেজুর গাছের সংখ্যা এবছর বৃদ্ধি পেয়েছে। খেজুর গাছে রস আনার ব্যাপারে এ গাঁয়ের মধ্যে মোতালেফই সেরা। কেননা সে তো দক্ষ গাছী। সেইজন্য মোতালেফের হাতে একটুও সময় নেই ফুলবানুর সঙ্গে রঙ্গ-তামাশা করার। কিন্তু রস সংগ্রহ করে আনলে কি হবে, রস থেকে গুড় তৈরি করতে গিয়েই সমস্যা তৈরি হয়েছে। ফুলবানু গুড় তৈরী করতে পারে না, শেখালেও গুড় তৈরির প্রক্রিয়া মনে রাখতে পারে না। মোতালেফ ডালপাতা, খড় সংগ্রহ করে ফুলবানুকে গুড়ে জ্বাল দিতে বলেছে – ''রস জ্বাল দেও, — যেমন মিঠা হাত, তেমন মিঠা গুড় বানান চাই, সেরা আর সরেস জিনিস হওয়া চাই বাজারের।'' কিন্তু ফুলবানুর এত রস একসঙ্গে জ্বাল দেওয়ার কোন অভিজ্ঞতা নেই। ফুলবানুকে, মোতালেফ উৎসাহ দিয়েছে; তাকে সব বিষয়ে সহযোগিতা করেছে। তার একটাই লক্ষ্য –''মনের মইধ্যে যেমন টগবগ করে রস, জ্বালার মধ্যেও তেমন করা চাই।''

উনুনের ধারে বসে ফুলবানুর রূপ-সৌন্দর্য আগুনের তাপে ঝলসে যায় গেছে। কিন্তু চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই, তবুও মনের মত গুড় তৈরি হয় না। ''কেমন যেন নরম নরম থাকে পাটালি, কোনদিন বা পুড়ে তেতো হয়ে যায়।'' মোতালেফের তৈরি গুড় বাজারে চাহিদা নেই।স্বাদে, গন্ধে কোনদিক থেকেই বাজার দখল করতে পারে না। তারফলে মোতালেফের গুড়ের যে সুনাম ছিল। তা নষ্ট হয়ে গেছে। পরিচিত ক্রেতা যারা ছিল, তারাও আর তার কাছ থেকে গুড় কেনে না। ''পুরনো খদ্দেররা একবার গুড়ের দিকে চায় আর একবার মুখের দিকে চায় মোতালেফের, এ তোমার কেমনতরো গুড় হইল মিঞা? গত হাটে নিয়া দেখলাম গেল বছরের মত সোয়াদ পাইলাম না। গেলবারও তো গুড় খাইছি তোমার, জিহ্বায় যেন জড়াইয়া রইছে; আস্বাদ ঠোটে লাইগা রইছে এবার তো তেমন হইল না। তোমার গুড়ের থিকা এবার ছদন শেখ, মদন সিকদারের গুড়ের সোয়াদ বেশি।'' এরপরই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথাকাটি শুরু হয়েছে ও সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। সুনাম নষ্ট হওয়ায় মোতালেফের সারা অঙ্গ পুড়ে ছার-খার হয়ে গেছে। সে প্রচুর পরিশ্রম করলেও গুড়ে স্বাদ হচ্ছে না, মানুষ গুড় খেয়ে তৃপ্তি পাচ্ছে না। এরফলে ক্রেতাদের কাছ থেকে প্রায়দিনই নিন্দামন্দ শুনতে হয়েছে। ফলে অর্থনৈতিক ভাবে মোতালেফ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ফুলবানুর রূপ সৌন্দর্যে একদিন মোহিত হয়েছিল মোতালেফ। আর এখন সেই ফুলবানুই হয়ে উঠেছে তার চক্ষুশূল। এমনকী ফুলবানুকে নানারকম কটু কথা বলতেও মোতালেফ ছাড়ে না। শেষপর্যন্ত ফুলবানুর চুলের মুটি ধরে অপমান করে, কটূ কথা শুনিয়েছে — ''হারামজাদী, গুড় পুইড়া গেল সেদিকে খেয়াল নাই – তোমার, তুমি আছ সাজগোজ লইয়া, পটের ভিতর গুণা বাইরাইয়া আইলা তুমি বিদ্যাধরী, এইজন্যেই গুড় খারাপ হয় আমার, অপমান হয়, বদনামে দেশ ছাইয়া গেল তোমার জন্যে''! এরপর ফুলবানু অপমান সহ্য করতে না পেরে বাপের বাড়ি চলে গেছে। এই পরিস্থিতিতে মোতালেফের সঙ্গে তার ঘর করা অসহ্যনীয় হয়ে উঠেছে। বদরাগী মানুষ মোতালেফের সঙ্গে সে সম্পর্ক ছেদ করতে চেয়েছে। কিন্তু এলেম শেখ মেয়েকে বুঝিয়ে রেখে গেছে –''গৃহস্থঘরে অমন বারবার অদলবদল আর ঘর-বদলানো কি চলে। তাতে কি মান সম্মান থাকে সমাজের কাছে। একটু সবুর করলেই আবার মন নরম হয়ে আসবে মোতালেফের। দু'দণ্ড পরেই আবার মিলমিশ

হয়ে যাবে। স্বামীস্ত্রীর ঝগড়াঝাঁটি দিনে হয়, রাত্রে মেটে।'' তবুও মোতালেফের সঙ্গে ফুলবানুর মধুর পারিবারিক সম্পর্কে চিঁড় ধরেছে। তারফলে ফুলবানুর জীবনে পারিবারিক সংকট নেমে এসেছে।

তবুও মোতালেফ আগের মতই দৈনন্দিন কাজ করে গেছে। ভোরের বেলায় গাছে উঠে রসভরা বড় বড় হাঁড়ি নীচে নামিয়ে এনেছে, কিন্তু গত বছরের মতো তার মনে কোনও সুখ নেই। সেই পরিস্থিতিতে দু'মাস পর মোতালেফেরও পারিবিরিক সংকট নেমে এসেছে। শুকনো মনে, পারিবারিক সংকটের মধ্যে মোতালেফের জীবনে রঙ্গ-তামাশার অভাব দেখা গেছে। ''রসবতী নারী ঘরের মধ্যে ঘোরা ফেরা করে, তবু যেন মন ভরে না, কেমন যেন খালি-খালি মনে হয় দুনিয়া।''

এই অবস্থায় একদিন হাটের মধ্যে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় নাদির শেখের সঙ্গে। দু'জনের মধ্যে কুশল বিনিময় হয়। তারপর মোতালেফ, নাদির শেখের ছেলেমেয়েদের জন্য সের দুই তিন গুড় দিতে চায় বিনামূল্যে। নাদির শেখ সে গুড় নিয়ে বাড়ি গেলে রেগে জ্বলে ওঠে মাজুখাতুন। গল্পে দেখা যায়, মাজুখাতুন রেগে আগুন হয়ে বলতে থাকে —''ও গুড় ছাওয়ালপানরে খাওয়াইতে চাও খাওয়াও, কিন্তু আমি ও গুড় ছোব না হাত দিয়া, তেমন বাপের বিটি না আমি।'' পরের হাটবার থেকে নাদির শেখ আর মোতালেফের গুড়ের কাছে যায় না। কেননা মাজুখাতুন তার সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ করে না। অপরদিকে নাদির শেখও, মাজুখাতুনকে ভয় করে। সে জানে, মাজুখাতুন সব দিক দিয়ে পারদর্শী। তাই রাগলে আর কারোর রক্ষে নেই, তখন মাজুখাতুনের কোনও কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

বেশকিছুদিন নাদির শেখের সঙ্গে মোতালেফের দেখা হয়নি। তাই দু'হাঁড়ি রস নিয়ে মোতালেফ, নাদির শেখের বাড়ি চলে এসেছে। এই অবস্থায় নাদির শেখ মনে মনে ভয় পেয়ে গেছে। গল্পে দেখা যায়-''যে মানুষের নাম গন্ধ শুনতে পারে না বিবি, সেই মানুষ নিজে এসে সশরীরে হাজির হয়েছে। না জানি, কি কেলেঙ্কারিটাই ঘটায়।'' ঘরের ভেতর থেকে মাজুখাতুন সব লক্ষ্য করেছে, তাই এখন মোতালেফকে তার সহ্য হচ্ছে না। নাদির শেখ কিন্তু যথারীতি অতিথি আপ্যায়ন করেছে। মাজুখাতুন, মোতালেফকে লক্ষ্য করে বলেছে –''তুমি বোঝবা না মিঞা, কুকুর বিড়াল থিকাও অধম থাকে মানুষ, শয়তান থিকাও সাংঘাতিক হয়।'' মোতালেফ, নাদির শেখের বাড়ি এমনি এমনি আসেনি, সে এসেছে তার আসল উদ্দেশ্য নিয়ে। মাজু খাতুন যেহেতু ভাল গুড় তৈরি করতে পারে, তাই তার কাছে বিনীত অনুরোধ-যদি মাজু খাতুন একটু ভাল গুড় বানিয়ে দেয় তাহলে তার নতুন খদ্দের হয়। এমনকী গুড় বিক্রি করে আবার আগের মতন বাজার ধরতে পারে। তাহলে মোতালেফের অর্থনৈতিক উপার্জন ও বৃদ্ধি পায়। এই কথায় মাজু খাতুনের চোখে অভিমানের স্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করা গেছে। যা শুধুমাত্র মোতালেফের মতো ব্যবসায়ী মানুষই বুঝতে পেরেছে। সেই পরিস্থিতিতে নাদির শেখ বলেছে- ''ও কি মেঞা, হুঁকাই যে কেবল ধইরা রইলেন হাতে, তামাক খাইলেন না ? আগুননি নিবা গেল কইল্কার ?'' গল্পের শেষে মোতালেফ তখন শেষ প্রতীকী বাক্য বলতে থাকে –''মেঞাভাই, নেবে নাই।'' নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর 'রস' গল্পের কাহিনী শেষ করেছেন এইভাবে। আসলে প্রকৃতির নিয়ম বড় বিচিত্র। জৈবিক প্রবৃত্তির তাড়নায় মোতালেফের জন্য মাজুরও মন ছটফট করেছে। তাই মাজুখাতুন যতই রাগ করুক, ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে মোতালেফকে অপমান করুক। তারপরেও মোতালেফের প্রেমের ডাকে সাড়া দিয়েছ। পুনরায় সম্পর্কের জোট বাঁধার ইঙ্গিত লক্ষ্য করা গেছে। সেই জীবনধর্মিতাকে কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র 'রস' গল্পটিতে নিপুণ তুলিতে অঙ্কণ করেছেন।

২.২.৭.৭ : ‘রস’ গল্পের চরিত্রসৃষ্টি

‘রস’ গল্পের মাজুখাতুন চালাক চতুর হলেও অবহেলিতা নারী। মোতালেফ শুধুমাত্র নিজের স্বার্থ দেখেছে, তাই মাজুখাতুনকে ভালোবাসেনি। শুধু নিজের প্রয়োজনে, খেজুর গাছের রস থেকে গুড় তৈরির সময় তার দরকার পড়েছে। আর গুড় তৈরির কাজ শেষ হয়ে গেলে তার উপর নেমে এসেছে অত্যাচার। গল্পপাঠে আমরা জানতে পেরেছি - মোতালেফ ভালোবেসেছে ফুলবানুকে। তাকে নিয়ে সে সুখে ঘর বাঁধতে চেয়েছে। কিন্তু ভালো গুড় তৈরি করতে পারে না বলে, মোতালেফ ফুলবানুকেও মানসিক দিক থেকে অত্যাচার করতে শুরু করেছে। অপরদিকে মাজু খাতুনের মনেও ক্রোধ হিংসা জেগে উঠেছে। সে প্রতিবাদী মনোভাব নিয়ে মোতালেফকে উদ্দেশ্য করে বলেছে – ‘‘তুমি বোঝবা না মিঞা, কুকুর, বিড়াল, থিকাও অধম থাকে মানুষ শয়তান থিকাও সাংঘাতিক হয়।’’

বাংলা সাহিত্যে বিশ শতকের চারের দশকে নারী চরিত্রগুলি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কেননা নারীদের মধ্যে ভালো মন্দ বোঝার সময় এসে গেছে। আর পড়ে পড়ে মার খাওয়ার দিন নেই, তা তারা বুঝতে শিখেছে। চারের দশকে দাঙ্গা, মন্বন্তর, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নারীশক্তির আত্মিক অবক্ষয় ঘটেছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক সব দিক থেকে তারা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বীরাঙ্গনা হিসেবে প্রতিবাদী হয়েছে পুরুষতান্ি□ক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। চরিত্রটি যেন মধ্যবিত্ত ধ্যান ধারণা থেকে সরে এসে ধীরে ধীরে সমকালের উপযোগী আধুনিক নারী চরিত্র হয়ে উঠেছে। মাজুখাতুন আর মুসলিম সমাজের নিয়ম কানুনের মধ্যে বন্দী নয়। একবিংশ শতাব্দীতে তিন তালাকের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার বিল পাশ করেছে। তারফলে নারীরা নিজেদের মনের কথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতে পেরেছে। অন্ধ-কুসংস্□ার থেকে আজকের দিনের নারীরাও মুক্ত হতে পেরেছে।ফলে পুরুষতান্ি□ক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার সময় এসেছে। কিন্তু ‘রস’ গল্পের মাজুখাতুনকে দেখে আমরা বুঝতে পারি ঐ সময়ে মুসলিম সমাজ তিন তালাকের মতো কোন আইন ছিল না। তবু সে নিজের ভালো-মন্দ বুঝতে পেরেছে। নিজের জীবনে শান্তিতে থাকার জন্য মোতালেফের মতো স্বার্থপর মানুষকে ঘৃণা করেছে। মাজুখাতুনের চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক তৎকালীন সমাজের চিত্রটি তুলে ধরেছেন। পুরুষতান্ি□ক সমাজে নারীদের অবস্থানের চিত্রটিও লেখক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। নারীরা যে অবহেলিত নয়, তাদেরও মান-মর্যাদা আছে। মাজুখাতুনকে দেখলেই তা বোঝা যায়। নরেন্দ্রনাথ মিত্র সেই প্রেক্ষাপটেই ‘রস’ গল্পের নারী মননের সূক্ষ্ম চিন্তাভাবনাগুলোর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

২.২.৭.৮ : নামকরণ

বাংলা মধ্যবিত্ত জীবনের একজন শ্রেষ্ঠ রূপকার হলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। বিশ শতকের চারের দশকে বাংলা কথাসাহিত্যে তিনি বিবর্তন ঘটিয়েছেন। তখনকার সময়ে দাঁড়িয়ে তিনি মধ্যবিত্ত মানুষদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার চিত্র গল্পের মধ্যে তুলে ধরেছেন। তিনি মানবচরিত্রের ভেতরের রূপটি টেনে এনে সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন। ‘রস’ গল্পের মধ্যে প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসার সম্পর্ককে নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করেছেন। মাঘ মাসে মোতালেফ খেজুর গাছ থেকে রসের হাঁড়ি নামিয়ে এনেছে। মাটির উনুনে রস জ্বাল দিতে পারতো মাজুখাতুন। তার হাতের গুড়ের স্বাদই আলাদা। মোতালেফ তাকে

তালাক দেওয়ায় সে চলে গেছে নাদের শেখের বিবি হয়ে। মোতালেফের ঘরে এসেছে সুন্দরী বউ ফুলবানু, কিন্তু তার হাতে গুড় ভাল হয় না। মোতালেফ এক রসের লোভে আর এক রসের হাঁড়ি ভেঙে ফেলেছে। মোতালেফ যেহেতু শিল্পী কারিগর, লোকে তার বদনাম করেছে। তখন সে ছুটে চলেছে, মাজুখাতুনের কাছে রসের হাঁড়ি নিয়ে। তাই সব দিক থেকে 'রস' নামকরণ সার্থক।

গল্পমালা -১ এর ভূমিকায় 'রস' গল্প সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথ মিত্র বলেছেন — ''এ গল্পের যে পটভূমি তা আমার খুবই পরিচিত। পূর্ববঙ্গে আমাদের গ্রামের বাড়িতে পূর্বদিকে ছিল একটি পুকুর। সেই পুকুরের চারধারে ছিল অজস্র খেজুরগাছ। ছেলেবেলা থেকে দেখতাম আমাদের প্রতিবেশী কিষাণকে সে সব খেজুর গাছের মাথা চেঁছে মাটির হাঁড়ি বেঁধে রাখত। বাঁশের নল বেয়ে সেই হাঁড়িতে সারারাত ধরে ঝির ঝির করে রস পড়ত। সেই রস কড়াইতে করে, বড় বড় মাটির হাঁড়িতে করে জ্বালিয়ে গুড় তৈরি করতেন আমাদের মা — জেঠীমারা। শীতের দিনে রস থেকে গুড় তৈরির এই প্রক্রিয়া মায়ের পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে রোজ দেখতাম। আমাদের চিরচেনা এই পরিবেশ থেকে 'রস' গল্পটি বেরিয়ে এসেছে।'' নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস' গল্পের যে কাহিনী মোতালেফ, মাজুখাতুন ও ফুলবানুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। গল্পটিতে তিনটি চরিত্রের হৃদয়ের আকর্ষণ যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি কাজ ফুরিয়ে গেলেও চরিত্রগুলিকে অপমান করতেও দেখা গেছে। খেজুর রসকে ঘিরে রূপ-সৌন্দর্য্যের সঙ্গে জীবিকার সংঘাত নরেন্দ্রনাথ মিত্র নিপুণ তুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ গল্পের নায়ক চরিত্র মোতালেফ, ও দুটি নারী চরিত্রের পরিচয় আমরা পেয়েছি; তারা হল মাজুখাতুন ও ফুলবানু। নারীর দৈহিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়ে জীবন ও যৌবনের চাহিদা মেটানোর জন্য সুচতুর মোতালেফ 'রসের হাঁড়ি'-কে ব্যবহার করেছে। সেইজন্য সে ফন্দি ফিকিরও করেছে। সর্বোপরি 'রস' নামকরণ সার্থক হয়ে উঠেছে।

২.২.৭.৯ : গল্পভাষা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পভাষা খুবই সহজ-সরল এবং সুখপাঠ্য। তাঁর লেখা গল্প পড়ে পাঠকের কোন ক্লান্তি আসে না। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ভাষার সাবলীলতা -প্রাঞ্জলতা তাঁর গল্পের প্রাণ। নরেন্দ্রনাথ মিত্র সহজ-সরল-সুন্দর ভাষায় গদ্য রচনা করেছেন। জীবনের শেষ অবধি আনন্দবাজার পত্রিকার সহসম্পাদক পদে কর্মরত থেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন। বাংলা গদ্যের অন্যতম সেরা কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র সে সময়ের মানুষের আঁতের কথাকে নিজের মতো করে গল্পে উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। এখন আমরা 'রস' গল্পের কয়েকটি সংলাপ তুলে ধরব- যেগুলি মোতালেফ, মাজুখাতুনের উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করেছে-

ক) কম বয়সী মাইয়া পোলা অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু শত হইলেও, তারা কাঁচা রসের হাঁড়ি।

খ) তুমি হইলা নেশার কালে তাড়ি আর নাস্তার কালে গুড়, তোমার সাথে তাগো তুলনা ?

আবার 'রস' গল্পে ফুলবানুর প্রতি মোতালেফের সংলাপ লক্ষণীয়।

ক) গাছির কাছেও যে গাছের রস দুই-চাইর মাসেই ফুরায় ফুলজান, কেবল তোমার রসই বছরে বার মাস চোঁয়াইয়া পড়ে।

খ) পুরুষ মাইনষের ঠোঁট তো ফুলজান কেবল পানের রসে রাঁঙ্গা হয় না, আর একজনের পানখাওয়া – ঠোঁটের রস লাগে।

'রস' গল্পের শেষের দিকে ব্যঞ্জনাগর্ভ ভাষা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনারীতি ও ভাষা বৈশিষ্ট্যের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঃ-

''হঠাৎ যেন হুঁস হল নাদির শেখের, বলল, ও কি মেঞা, হুঁকাই যে কেবল ধইরা রইলেন হাতে, তামাক খাইলেন না ? আগুনই নিবাই গেল কইকার ? হুঁকোতে মুখ দিতে দিতে মোতালেফ বলল, না মেঞাভাই নেবে নাই।''

২.২.৭.১০ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস' গল্পের নামকরণের সার্থকতা প্রতিষ্ঠিত করো।

২। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস' গল্পের ব্যঞ্জনা নিজের ভাষায় বুঝিয়ে দাও।

৩। 'রস' গল্পটির শিল্প সার্থকতা সম্পর্কে তোমার অভিমত লিপিবদ্ধ করো।

৪। 'রস' গল্পে মোতালেফ চরিত্র সম্পর্কে যা জান লেখো।

৫। 'রস' গল্পে নারী চরিত্র হিসেবে মাজুখাতুনের পরিচয় দাও।

৬। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস' গল্পের অর্থনৈতিক সংকটের পরিচয় নিজের ভাষায় আলোচনা করো।

২.২.৭.১১ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। গল্পমালা - নরেন্দ্রনাথ মিত্র - আনন্দ পাবলির্শাস।

২। বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ - বীরেন্দ্র দত্ত - পুস্তক বিপণী।

৩। বাংলা ছোট গল্প : মননে-দর্পণে - শীতল চৌধুরী।

৪। আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী - জগদীশ ভট্টাচার্য।

৫। বাংলা ছোটগল্প তত্ত্ব ও গতি প্রকৃতি - সোহারাব হোসেন।

৬। বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প - সরোজমোহন মিত্র।

পর্যায়গ্রন্থ - ২

একক - ৮

নিম অন্নপূর্ণা

কমল কুমার মজুমদার

বিন্যাসক্রম :

২.২.৮.১ : লেখক পরিচিতি—কমল কুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯)

২.২.৮.২ : গল্প পরিচয়—নিম অন্নপূর্ণা

২.২.৮.৩ : নামকরণ

২.২.৮.৪ : চরিত্র চিত্রণ

২.২.৮.৫ : গদ্যভাষা

২.২.৮.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.২.৮.১ : লেখক পরিচিতি—কমল কুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯)

বাংলা কথাসাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার ছিলেন কমলকুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯)। তিনি ১৯১৪ খ্রিঃ ১৭ই নভেম্বর উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার টাকি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল রেণুকাময়ী দেবী ও পিতা ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র মজুমদার। কমলকুমার মজুমদারের মামার বাড়ি ছিল লখনউ। তাদের সাত ভাইবোনের সংসারে তিনিই ছিলেন সকলের বড়। লেখকের বাবা মা দু'জনেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা নিয়ে তাঁদের বাড়িতে প্রায়শই সাহিত্যচর্চা হতো। পরিবারের সবাই মিলে বিভিন্ন মনীষীদের জন্মদিন পালন করতেন। তাঁদের পরিবারের অনেকেই সংস্কৃতি মনস্ক ছিলেন বলে যাত্রা ও নাটক দেখতে যেতেন। পরবর্তীকালে কমলকুমার মজুমদারের পরিবার বৈদ্যনাথ ধাম থেকে পাঁচ মাইল দূরে রিখিয়ায় এসে বসবাস করতে লাগলেন। সেখানে তাঁর বাবা জমি কিনে বাড়ি-ঘর তৈরি করেছিলেন। সেখানে দীর্ঘদিন থাকার সূত্রেই লেখককে রিখিয়ার পরিবেশ – পরিস্থিতি বারবার আকর্ষণ করতো। কমলকুমার মজুমদার মায়ের সান্নিধ্যে থেকে ছোটবেলা থেকেই সংস্কৃত চর্চা করতেন ও বিভিন্ন ভাল নাটকের অভিনয় করতেন। এর পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সামাজিক কাজেও অংশগ্রহণ করতেন। সেইসময় ১৯৩৪ খ্রিঃ জানুয়ারি বিহারের মুঙ্গেরে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল। লেখক ও তাঁর বন্ধুরা ভূমিকম্প বিধ্বস্ত এলাকায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে কমলকুমার মজুমদারকে রাজশাহীর খেতুরির মেলাতে বিভিন্ন সাধু-সন্তদের সঙ্গে ঘুরতে দেখা গেছে।

কমলকুমার মজুমদার সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা 'উষ্ণীষ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৭ খ্রিঃ। ঐ পত্রিকাতেই 'লালজুতো', 'প্রিনসেস' ও 'মধু' ছোটগল্পগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৩৯ খ্রিঃ কমলকুমার মজুমদার ও তাঁর ভাই নীরদ নাচ-গান, ছবি আঁকার স্কুল চালু করেছিলেন। কিছুদিন যাওয়ার পর লেখকের পরিবারে আর্থিক সংকট নেমে আসে। ১৯৪৩-৪৪ খ্রিঃ নাগাদ কমলকুমার মজুমদারকে রিখিয়া ছেড়ে

কলকাতায় ফিরে আসতে হয়েছে। তারপর কিছুদিন তিনি ব্যবসার কাজে মনোযোগ দিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ পারিবারিক অর্থসংকটের চেহারাটা কিছুটা হলেও লাঘব হতে থাকে। এরপর তিনি কিছুদিন সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে চলচ্চিত্র বিষয়েও আলোচনা করেছেন। রিখিয়ায় থাকাকালীন কমলকুমারের বোন গীতা দেবীর সঙ্গে কলকাতারই মেয়ে দয়াময়ীর পরিচয় হয়। তারা যৌথ উদ্যোগে 'দেওয়াল' পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন। কিছুদিন পর সাহিত্যমনষ□ দয়াময়ীর সঙ্গে ১৯৪৭ খ্রিঃ কমলকুমার মজুমদার পারিবারিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৪৯ খ্রিঃ কমলকুমার মজুমদার সিগনেট প্রেস প্রকাশনার শিল্প উপদেষ্টার হয়ে কিছুদিন কাজও করেছিলেন। লেখকের পরিবারে অর্থনৈতিক হাহাকার থাকায় গৃহশিক্ষকতার কাজও তাঁকে করতে হয়েছিল। পরিবারের আর্থিক সুরাহার জন্য একই সঙ্গে তিনি জনগণনা দপ্তরেরও কাজ করেছেন। সেই সূত্রেই বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে যেমন পরিচয় হয়েছিল, তেমনি বিভিন্ন জায়গায় লেখককে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। এরপর তিনি কিছুদিন গ্রামীণ শিল্প ও কারিগরী বিভাগেও কর্মরত ছিলেন। ১৯৫৪-৫৫ খ্রিঃ নাগাদ কমলকুমার মজুমদার সাউথ পয়েন□ স্□ুলে শিল্প শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি ছবি, নাটক, কাঠের কাজ, ছোটদের আঁকা শেখানো, চিত্রনাট্যরচনা প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। ১৯৫৭ খ্রিঃ – ৫৮ খ্রিঃ 'দেশ' পত্রিকায় কমলকুমার মজুমদারের লেখা 'মতিলাল পাদরী' ও 'তাহাদের কথা' প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর 'নহবৎ' পত্রিকায় ১৯৬৯ খ্রিঃ 'অর্ন্তজলী যাত্রা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৭৬ খ্রিঃ 'Arts and Crafts' নামে একটি বিদ্যালয় খোলার পরিকল্পনা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা যায়, ১৯৬৩ খ্রিঃ কমলকুমার মজুমদারের 'গল্পসংগ্রহ' প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ গ্রন্থেই আমাদের আলোচ্য 'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। কমলকুমার মজুমদারের লেখা গল্পের সংখ্যা উনত্রিশ। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল — 'লালজুতো', 'মধুজল', 'তেইশ', 'মল্লিকাবাহার', 'মতিলাল পাদরী', 'তাহাদের কথা' 'ফৌজী বন্দুক', 'নিম অন্নপূর্ণা', 'কয়েদখানা', 'বাবু', 'আমোদ বৌস□মী' ইত্যাদি। কমলকুমার মজুমদারের লেখা উপন্যাসের সংখ্যা আট। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – 'অর্ন্তজলী যাত্রা', 'গোলাপ সুন্দরী', 'অনিলা স্মরণে', 'শ্যাম-নৌকা', 'সুহাসিনীর পোমেটম', 'পিঞ্জরে বৈশা', 'সুখ', 'খেলার প্রতিভা', 'শবরীমঙ্গল' প্রভৃতি। কমলকুমার মজুমদার বিংশ শতাব্দীর ও আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁকে বলা হতো 'লেখকের লেখক'। অবশেষে ১৯৭৯ খ্রিঃ ৯ই ফেব্রুয়ারি কলকাতার বাসভবনে তিনি পরলোক গমন করেন।

২.২.৮.২ : গল্প পরিচয়—নিম অন্নপূর্ণা

'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পটি কমলকুমার মজুমদারের সৃজন প্রক্রিয়ার ফসল। গল্পটিতে বিশ শতকের চারের দশকে কলকাতার নিম্নবিত্ত পরিবারের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মন্বন্তর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাঙালি পরিবারের খাদ্যাভাসের ছবিটি 'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পে ফুটে উঠেছে। গল্প পাঠে আমরা জানতে পারি প্রীতিলতার সংসারে বড় অভাব। তার দুই মেয়ে যূথী ও লতি। কমলকুমার মজুমদার গল্পটি শুরু করেছেন এই ভাবে –''যূথী বারান্দায় দাঁড়িয়ে সবুজ পাখীটির ঘোরাফেরা দেখছিল, এ সময় তার হাত-দুটি অদ্ভূতভাবে উঁচু করা ছিল, একারণ, যে ফ্রকটি তার পরনে ছিল সেটিতে একটিও বোতাম নেই এবং বোতামের জায়গা থেকে সোজা শেষ পর্যন্ত ছিঁড়ে দু-হাট খোলা, ফলে বেচারীকে স□র্বক্ষণই সাধারণভাবে চলাফেরার সময় তার আপনকার হাত দুটিকে উঁচু করে রাখতেই হয়।'' প্রীতিলতার পরিবারের

আর্থিক সংকটের ছবিটি ধরা পড়েছে উপরের উদ্ধৃতি থেকেই তা বোঝা যায়।

বাঙালি পরিবারের হাহাকার, শূন্যতা প্রীতিলতাকে জর্জরিত করে দিয়েছে। শত চেষ্টা করেও মেয়ে দুটিকে ঠিকমতো খাবারের সংস্থান করতে পারে না। পোশাক-পরিচ্ছদের দিক থেকে তাদের জীর্ণতা লক্ষ্য করা গেছে। তার উপর আবার প্রতিবেশী খেতুর মা-র দৈনন্দিন জীবন সংগ্রাম গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। ''খেতুর মা যূথীর বেনীও ছেড়ে দিয়েছিলেন, দিয়েই বললেন, তোমার মেয়ে কি বলল বাবা, বললে পেত্যয় যাবে না, সাত সকালে লোকে শুনলে বলবে খেতু মিত্তিরের মা কি লোক গা – ভদ্দরনোকের মেয়ে ঘেন্না পিত্তি নেই একেবারে ভিকিরীর অদম গা...পাখীর ছোলা চুরি করতে গিয়ে কি কাণ্ড বাধালে...মুখ থেকে না পড়লে কি আমিই টের পেতুম।'' বেচারী খেতুর মা বুড়ো মানুষ, তার শতছিন্ন কাপড়ের আঁচল। নিম্নবিত্ত পরিবারের দুর্দশার ছবি খেতুর মার চরিত্রের মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে। যূথী ও আর এরকম কাজ করবে না বলে ভীতত্রস্তস্বরে আঃ আঃ করে বলেছিল — ''তোমার পায়ে পড়ি আর করব না আ...করব না এবং তার অল্পবুদ্ধিতে রক্তাক্ত হাতটি ঈষৎ উঁচু করে দেখিয়ে মার, প্রীতিলতার দৃষ্টি আকর্ষণ অথবা করুণা ভিক্ষা করতে চেয়েছিল এ কারণ প্রীতিলতা — সূক্ষ্ম, বিবশ, যদিও বিশীর্ণা যদিচ বহুদিবস হাভাতে তথাপি ইদানীং সরোষিত তীব্র ভয়ঙ্কর ফণা তুলে আসছিল — অজস্র ছেঁড়া – মধ্য দিয়ে প্রকাশিত তার অঙ্গাংশ সকল লাল-মলিন ছিন্ন কাপড়ে ধরা-পড়া একটি ঝড়!'' প্রীতিলতার দীর্ঘদিন না খাওয়ার ফলে শরীরে কোন ক্ষমতা ছিল না। তার মেয়ে যূথীরও অবস্থা তথৈবচ, যূথীর মুখে প্রতিমুহূর্তেই না – পাওয়ার দুর্দ্দৈব তৎসহ না-মাজা বাসনের মত ময়লা করুণ মর্মন্তুদ কাহিনী গল্পে ধরা পড়েছে।

''প্রীতিলতা অন্য আর একদিক থেকে নিশ্বাস নেবার জন্য ছোট বারান্দার আর আর দিকে চাইল ; এখানে সেখানে সাতবাস্‌টে অন্ধকার – বালতি আর টোল খাওয়া ডেকচির জল ছাড়া, আর কোথাও যে সকাল হয়েছে এ সত্যের উল্লেখ নেই।'' খাদ্যের অভাবে প্রীতিলতার দেহটা যে যমত দেহ থেকে ছুটে বের হয়ে গেছে, শীর্ণকায় হয়ে গেছে। প্রীতিলতার দুই মেয়ে যূথী ও লতিও বুঝেছিল তারা বড় নিঃসহায়। 'হাভাতের মতো' আচরণ প্রীতিলতা একেবারে সহ্য করতে পারে না। সেইজন্য দুই মেয়েকে প্রতিমুহূর্তে সাবধান করে দেয়। আর কাউকে জানাতে নিষেধ করে যে তারা অতি কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। তাদের বাড়িতে চোকর সিদ্ধ হয়, ভাতের থেকে চোকর তাদের খুব ভাল লাগে। দুঃখের সংসারে ভাতের থেকে চোকর একশ গুণ ভাল। তা খেয়ে তারা জীবন অতিবাহিত করে। তাদের অভাবের সংসারে ভাতের পরিবর্তে চোকর সিদ্ধ হয়, তা যেন কেউ না জানে। ''প্রীতিলতা মুখ ঝামটা দিয়ে উঠে বললে, থাক, থাক, আর চোকরের গুণ গাইতে হবে না...লোককে যেন বোলো না আমরা চোকর খাই। প্রীতিলতা সব কূল বজায় রেখে পারিবারিক মেলা মেশা করেছে। কিন্তু যত দিন গেছে, অভাবের সংসার তাকে কুরে কুরে খেতে থাকে। পরবর্তীকালে প্রীতিলতার বাড়ির দরজায় বুড়ো ভিখিরিকে দেখে প্রথমে তার দয়া হয়। ''বুড়ো হলে কি হয়, খুব টনটনে জ্ঞান। যখনই যূথী – লতি যায় অমনি মারমুখো হয়ে উঠে....বোধ হয় জানো, বোঁচকায় অনেক টাকা আছে।''

প্রীতিলতা ভিখিরি বুড়ো মানুষটির অর্থ, চাল সবকিছু আত্মসাৎ করতে চেয়েছে। কেননা প্রীতিলতার দুই মেয়ে যূথী ও লতি অভাবের সংসারে খাওয়া – খাওয়া খেলা খেলছিলো। তাদের খেলার মধ্যে কোন পেটভরা বা তৃপ্তির আনন্দ ছিল না। মেয়েগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাদের দক্ষতার কারণে

মা-বাবাকে গর্বিত করা। ব্রজর মনেও তখন কন্যাদ্বয়ের এরূপ খেলা আত্মিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তাদের পরিবারে সর্বত্রই হাহাকার নেমে এসেছে। উনুনে হাঁড়িতে জল ফুটছে, অথচ বাড়িতে চাল বাড়ন্ত। সেই পরিস্থিতিতে প্রীতিলতাকে বলতে শোনা গেছে — ''আমার ইচ্ছে করে গলায় দড়ি দিতে, না লেখা না পড়া, খালি খাই...খাই...কোথাকার দুর্ভিক্ষ হাভাতের ঘর থেকে যে এসেছে ভগবান জানেন...''। প্রীতিলতার একথায় ব্রজরও যথেষ্ট লজ্জা হয়েছে। তাদের পরিবারে ভাত যদি থাকত তাহলে সে অনায়াসে এ যাত্রা উত্তীর্ণ হতে পারতো। ''প্রীতিলতা অবশ্যই হার স্বীকার করবে না। সে কোনদিন মরা মাগুর মাছ খায়নি, কাউকে খেতেও দেয়নি। সে হাভাতের একজন হতে কোনক্রমেই পারবে না।''

সেই সময় কলকাতার পরিবেশ – পরিস্থিতি খুব ভয়ানক হয়ে উঠেছে। চারদিকে মন্বন্তরের অন্ধকার নেমে এসেছে। এ সময় শহরে একটা টিউশনি পর্যন্ত পাওয়া যায় না। শহরের অনেকের পরিবারের কষ্ট দেখা গেছে কিন্তু কিছুতেই প্রীতিলতা হার মানবার মত দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনি। যতই মেয়ে দুটির ক্ষিদে পাক, সে কিছুতে নিজেদের অভাব লোককে জানতে দেবে না। আবার ব্রজর প্রতিও তার রাগ করার কিছু নেই। কেননা তার অক্ষমতা প্রীতিলতার সমস্ত স্বপ্নকে যেমন নষ্ট করেছে তেমনি তার জীবনকে পর্যন্ত বানচাল করে দিয়েছে। তখন প্রীতিলতার করুণ কন্□স্বর ফাঁকা হাঁড়িতে প্রতি□বনিত হয়েছে মাত্র।

মরণাপন্ন বুড়ো মানুষটি রাস্তায় বসে কাশছে, তার গলা দিয়ে রক্ত পড়ছে। প্রীতিলতা বুড়ো ভিখিরি মানুষটিকে ধাক্□া দিয়ে ফেলে দিয়েছে। ''সে পিঠের ঝটকায় এমনভাবে বৃদ্ধকে আঘাত করেছিল যে বৃদ্ধ টাল সামলাতে না পেরে রকে মুখ থুবড়ে পড়ল; কম্পিত, বিচলিত হাত দ্বারা কোনক্রমে রকের কিনারাটা ধরেছিল, চোখ দুটি চাইবার চেষ্টা করলে, মুখমণ্ডল যেন বা ফুলে উঠে, গ্যাসের আলো ফেলে, মুখখানি এসময় অর্দ্ধ উন্মুক্ত ছিল।'' প্রীতিলতার ভাতের হাঁড়ি উনুনে চড়েছে, তলায় আগুন দিয়েছে। আর বুড়োটির সংগ্রহ করা চালগুলি নিয়ে কয়েকদিনের উপবাস ভঙ্গ করেছে। ''গরম ভাতের সামনে বসে ব্রজর নিজেকে মানুষের মত মনে হল এবং প্রীতিলতাকে তারিফ করবার জন্য বলেছিল, হ্যাঁ কোথায় পেলে...''। গরম ভাতের থালার সামনে বসলেও সে ভাত মুখে তুলতে পারেনি। তবুও দরিদ্র পরিবারে একটু সুখ-শান্তি-তৃপ্তি নেমে এসেছে। অনেকদিন পর তারা গরম ভাতের স্বাদ পেয়ে মহা আনন্দে খেতে বসেছে। কিন্তু ''অনন্তর গরম ভাত পাওয়ার জন্যই হোক অথবা অন্য কোন কারণেই হোক, একটু সোহাগ – খোরাকী গলায় বলেছিল, বুড়োর জন্য মন খারাপ করছে.....খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না...''।

২.২.৮.৩ : নামকরণ

'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পের নামকরণ প্রতীকী অবশ্যই। কেননা ভারতীয় পুরাণের মা অন্নপূর্ণার মতো মুক্তহস্তে সবকিছু দান করতে পারে না এ গল্পের প্রীতিলতা। সমাজের বহুবিধ সংকটের কারণে, প্রীতিলতা পরিবারকে সুস্থভাবে পরিচালনাও করতে পারে না। পরিবেশ – পরিস্থিতির চাপে সর্বত্রই দুঃখের হাহাকার লক্ষ্য করা গেছে। সেইজন্য প্রীতিলতা প্রতিবেশী কাউকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েও দিতে পারে না। বরঞ্চ গল্পে দেখা গেছে এক বৃদ্ধর সংগ্রহ করা চাল ছিনতাই করে নিয়েছে। ''আজ

খুব বরাত ভাল – চাল পেয়েছি, বলে এক পকেট থেকে চাল বার করল। একি চাল কোথায়...'' প্রীতিলতা সেই চাল দিয়ে তার পরিবারের বুভুক্ষ মানুষগুলির মুখে হাসি ফুটিয়েছে। অপরদিকে প্রীতিলতার পাশবিক অত্যাচারে বুড়োটা শেষ পর্যন্ত মারা গেছে। কলকাতার দুর্ভিক্ষেরা পরিবেশে প্রীতিলতা মান সম্মান নিয়ে যেমন খাদ্যসংগ্রহের জন্য লঙ্গরখানায় লাইনে দাঁড়ায়নি, তেমনি নিজের দুঃখের কাহিনি প্রকাশ করেও হাভাতে হতে চায়নি। গল্পের শেষে তবু 'হাভাতের মতো' মানুষদের কাজ করতে প্রীতিলতা বাধ্য হয়েছে। জীবনে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য, নিরুপায় হয়ে এই জঘন্য কাজও তাকে করতে হয়েছে। সর্বত্রই প্রতিকূল পরিস্থিতি, সেই অবস্থায় মাথা উঁচু করে বাঁচতে প্রীতিলতা বৃদ্ধ ভিখিরির চাল ছিনতাই করতে বাধ্য হয়েছে। গল্পকার কমলকুমার মজুমদার গল্পের শেষে ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে নামকরণকে ইঙ্গিত করেছেন। গল্পের শেষে দেখা যায় – প্রীতিলতার মন দুঃখে – অনুশোচনায় ভরে উঠেছে। তাকে বলতে শোনা গেছে — ''অনন্তর গরম ভাত পাওয়ার জন্যই হোক, অথবা অন্য কোন কারণেই হোক, একটু সোহাগ — খোরাকী গলায় বলেছিল, বুড়োর জন্য মন খারাপ করছে – খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না...''। তাই 'নিম অন্নপূর্ণা' নামের ব্যঞ্জনা অনেক বড় তাৎপর্যে দীপিত হয়ে ওঠে পাঠকদের কাছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে অর্থনৈতিক সংকট, বেকার সমস্যার কারণে অনেক মানুষকে গ্রাম ছেড়ে কলকাতা শহরে আসতে হয়েছে। ঐ নিরাশ্রয় মানুষগুলির অস্তিত্বের সংকটকে কমলকুমার মজুমদারের মনে গভীর ছায়া ফেলেছে। সর্বোপরি দুর্ভিক্ষ, কালোবাজারি, মজুতদারীর ফলে ঐ নিরন্ন মানুষগুলির জীবনসংশয় গল্পকার 'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পে তুলে ধরেছেন। এমনকী ঐ পরিবেশ–পরিস্থিতিতে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মা অন্নপূর্ণার মতো খাদ্যের থালা হাতে কাউকে সহযোগিতার হাত বাড়াতে দেখা যায়নি। গল্পের নায়িকা প্রীতিলতাও পারেনি সবুজ মন নিয়ে কলকাতার পারিবারিক সংকটের চেহারাটিকে পালটে দিতে। সর্বোপরি 'নিম অন্নপূর্ণা' নামের প্রতীকী ব্যঞ্জনা গল্পটিকে সার্থক করে তুলেছে।

২.২.৮.৪ : চরিত্র চিত্রণ

'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পে কমলকুমার মজুমদার শিক্ষিত নগরবাসী নিম্নবিত্ত মানুষদের চরিত্র চিত্রিত করেছেন। তাঁর গল্পের সৃষ্ট চরিত্রগুলি মূলত জীবনমুখী। বিশ শতকের চারের দশকের কলকাতার জনজীবনে সাধারণ মানুষের সমস্যাকে লেখক নিপুণ তুলিতে অঙ্কন করেছেন। প্রীতিলতার দারিদ্র্য পূর্ণ জীবন 'হা ভাতে' হলেও একটা সময়ে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য বৃদ্ধ ভিখিরিকেও ধাক্□া দিয়ে ফেলে দিয়েছে। তাঁর সংগ্রহ করা চাল ও টাকা লুঠ করে নিয়েছে। প্রীতিলতার মেয়ে যূথী ও লতির চরিত্র-চিত্রণে গল্পকার কমলকুমার মজুমদার মানুষের অস্তিত্বের সংকটকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন।

২.২.৮.৫ : গদ্যভাষা

'কমলকুমার মজুমদারের ভাষাশৈলী নির্মাণে তাঁর দক্ষতা বাংলা সাহিত্যের অনেক পাঠককেই যেমন আকর্ষণ করেছে। তেমনি অনেককেই বিমুখ করেছে। এ কারণেই অনেক পাঠকের কাছে তাঁর ভাষা প্রবল বির্তক তৈরি করেছে। সাহিত্য সৃজন প্রক্রিয়ায় বিষয়বস্তুর থেকে সরে গিয়ে গদ্যশৈলী একটা আলাদা মাত্রা দান করেছে। কমল কুমারের রচনাশৈলী, গদ্যরীতি, জীবন দর্শন সর্বত্রই বাংলা

কথাসাহিত্যের একজন মৌলিক ভাবনার লেখক বলেই স্বীকার করতে হয়। সর্বোপরি বলা যায় কমলকুমার মজুমদারের রচনা বাংলা সাহিত্যের পাঠককে নতুন ভাবে ভাবিত করেছে।

কমলকুমার মজুমদারের গদ্যরীতির জটিলতার কারণগুলি হল —

ক) কমলকুমার মজুমদার তাঁর গল্প ও উপন্যাসে দীর্ঘবাক্য গঠন করেছেন।

খ) কথাসাহিত্যিক কমলকুমার মজুমদার শব্দ ও বাক্য ব্যবহার ছাড়াও প্রেক্ষিত নির্মাণ এবং দৃশ্য বা ভাবনা বর্ণনা করতে গিয়ে দুর্বোধ্য উপমা ও প্রতীকের ব্যবহার তাঁর রচনাকে করে তোলে পর্বত প্রতিম দুর্ভেদ্য।

গ) ব্যাকরণের কোন নিয়ম শৃঙ্খলা তাঁর কথাসাহিত্যে লক্ষ্য করা যায় না। শব্দকে এখানে-সেখানে বসিয়ে শব্দের বহুতর মাত্রা যোগ করেছেন। সর্বোপরি বলা যায় তিনি কঠিন করে লেখেন। খুব সহজ, তরতরে লেখা তাঁর গদ্যের মধ্যে পাওয়া যায় না।

ঘ) কমলকুমারের উপন্যাসে, গল্পে বা প্রবন্ধে যেসব পদবিন্যাস দেখা যায়, তা ''ফরাসী ঘেঁষা' অনেকে মনে করেন।

ঙ) কমলকুমার মজুমদার ভাষার বর্ণনাত্মকতার সঙ্গে নানা শিল্প মাধ্যমের অনুষঙ্গ ও সূক্ষ্মতা আরোপ করে ভাষাকে রূপাত্মক করে তুলেছেন। তাঁর গদ্যরীতি বাংলাসাহিত্যে সম্পূর্ণ একক। কমলকুমার একবার সাধু গদ্যরীতিতে লেখা শুরু করার পর আর চলিত ভাষার গদ্যরীতিতেত লিখতে পছন্দ করেননি। কমলকুমার মজুমদারের গল্প – উপন্যাসে আরাধ্য দেবদেবী ও গুরুপ্রতিম শ্রীরামকৃষ্ণের আশী□র্বাদ প্রার্থনা করা হয়েছে। তবে এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো 'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পটির সূচনাতে কোন ধর্মীয় সম্বোধন লক্ষ্য করা যায় না।

২.২.৮.৬. : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পের নামকরণের সার্থকতা প্রতিষ্ঠিত করো।

২। কমলকুমার মজুমদারের জীবনদর্শন 'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পটিকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে তা আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট করো।

৩। কমলকুমার মজুমদারের 'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পের গদ্যভাষা সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪। 'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পের নারী চরিত্রগুলির পরিচয় দাও।

২.২.৮.৭. : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার - ভূদেব চৌধুরী।

২। বাংলা ছোটগল্প - শিশিরকুমার দাস।

৩। ছোট গল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ - বীরেন্দ্র দত্ত।

৪। বাংলা ছোটগল্প তত্ত্ব ও গতি প্রকৃতি - সোহারাব হোসেন।

পর্যায়গ্রন্থ - ২

একক - ৮

খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

বিন্যাসক্রম :

২.২.৮.৮ : লেখক পরিচিতি—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮৩)

২.২.৮.৯ : গল্প পরিচয়—খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর

২.২.৮.১০ : নামকরণ

২.২.৮.১১ : প্রতীকধর্মীতা বা ব্যঞ্জনা

২.২.৮.১২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.২.৮.১৩ : সহায়ক প্রশ্নাবলী

২.২.৮.৮ : লেখক পরিচিতি—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮৩)

স্বাধীনতা উত্তর আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাকার হলেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮৩)। তিনি ১৯১২ খ্রিঃ ২০শে আগস্ট বাংলাদেশের কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন অপূর্বচন্দ্র নন্দী, মাতা চারুবালা দেবী। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে তাঁর বাবা-মা আদর করে 'ধনু' বলে ডাকতেন। লেখক ১৯৩০ খ্রিঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া অন্নদা উচ্চবিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পাশ করেছিলেন। তার দু'বছর পর ১৯৩২ খ্রিঃ আই.সি.এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এইসময় বাংলাদেশের কয়েকজন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী মানুষের সঙ্গে লেখকের পরিচয় হয়, তারপর তিনি নিজেও রাজনীতিকে ভালোবেসে দেশের কাজ করার জন্য তাদের দলে যুক্ত হয়ে যান। সেই অপরাধে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে দু'বছর কারাবাস করতে হয়েছিল। ১৯৩৪ খ্রিঃ কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি আবার পড়াশোনায় মন দেন। তিনি যেমন পড়াশোনোয় ভাল ছিলেন, তেমনি ভাল ছবি আঁকতে ও আবৃত্তি করতে পারতেন। তারপর ১৯৩৫ খ্রিঃ, লেখক সম্মানের সহিত বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বিশ শতকের তিনের দশকে বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন। তারফলে সমাজের সর্বত্র হাহাকার নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। সুস্থ, সুশৃঙ্খল সমাজ জীবন সেসময় আশা করা ছিল অন্যায়। তাই জীবনের চতুর্দিকে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে অর্থনৈতিক সমস্যায় তখন কাজ পাওয়া বড় মুশকিল। ভারতবর্ষের মতো বাংলাদেশেও তখন সর্বত্র অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। সেইজন্য জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বাংলাদেশের কুমিল্লা এলাকায় ভাল কাজ পাননি। তাই লেখককে কর্মের সন্ধানে কলকাতায় আসতে হয়েছিল। প্রথমবার তিনি যখন কলকাতা এলেন, তখন সময়টা ছিল ১৯৩৬ খ্রিঃ। এই সময় কলকাতার পরিবেশ-পরিস্থিতি ও খুব একটা ভাল ছিল না। কলকাতার নাগরিক

মানুষদের জীবনযন্□ণাও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। একদিকে মধ্যবিত্ত মানুষদের চরম দুর্দশা, অপরদিকে সমাজের সর্বত্রই দুর্নীতি, কলোবাজারী, মজুতদারি। এসবের মধ্যেও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী কলকাতার বেঙ্গল ইমিউনিটিতে কাজে যুক্ত হয়ে যান। এরপর টাটা এয়ারক্র্যাপ□, ওয়ালটার থমসনে কিছুদিন কাজ করেছিলেন। হাতে কিছু অর্থ এসে যাওয়ার জন্য তিনি বিবাহ করবেন বলে মনস্থির করলে পাত্রী দেখা শুরু হয়। কলকাতার কামিনীকুমার ধর চৌধুরীর কন্যা পারুল দেবীর সঙ্গে লেখকের বিয়ে হয়েছিল ১৯৪৬ খ্রিঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি। তার কিছুদিন পর থেকেই তাদের পারিবারিক সংসার খরচ বাড়তে লাগল। লেখক খুব বেশি মাইনে পেতেন না, তাই অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের জন্য তিনি প্রাইভেট পড়ানো শুরু করেছিলেন। সেইসঙ্গে 'দৈনিক জনসেবক' ও 'দৈনিক আজাদ পত্রিকাতে'ও কিছুদিন কাজ করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী 'মজদুর' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বও পালন করেছেন। এরপর সাহিত্যচর্চায় মনোযোগের কারণে চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। সাহিত্যপাঠ করতে ও ভালবাসতেন বলে তাকেই ধ্যান-জ্ঞান করেছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছোটবেলা থেকেই। তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেন পড়াশোনো করার সময় থেকেই। ঢাকার 'বাংলার বাণী' পত্রিকায় তিনি জ্যোৎস্না রায় ছদ্মনামে গল্প লিখেছেন। ১৯৩৬ খ্রিঃ কলকাতায় বসবাস করার সময় 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সেই সুবাদেই তাঁর লেখা 'রাইচরণের বাবরি' 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ সময় 'পূর্বাশা' পত্রিকাতেও তিনি লিখতেন। তাঁর লেখা 'অন্তরালে' গল্পটি 'পূর্বাশাতে' ছাপা হয়। এরপর একে একে 'সংবাদ', 'আত্মশক্তি' ও 'নবশক্তি' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় কুড়িটি। প্রথম গল্প সংকলন 'খেলনা' (১৯৪৬)। তাছাড়াও তিনি তিপান্নটি উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাসের নাম 'সূর্যমুখী' (১৯৫১)। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্প গ্রন্থের নাম হল — 'চন্দ্রমল্লিকা' (১৯৪৬), 'শালিক কি চড়ুই' (১৯৫৪), 'চারইয়ার' (১৯৫৪), 'বনানীর প্রেম' (১৯৫৭), 'মহিয়সী (১৯৬০), 'ছিদ্র' (১৯৭৬) প্রভৃতি। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অন্যান্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস হল — 'মীরার দুপুর' (১৯৫৩), 'বারো ঘর এক উঠোন' (১৯৫৫), 'নীলরাত্রি' (১৯৫৮), 'আলোর ভুবন' (১৯৬২), 'আকাশলীনা (১৯৬৪), 'প্রেমের চেয়ে বড়' (১৯৬৬), 'সুনন্দার প্রেম' (১৯৬৭) ইত্যাদি। 'বারো ঘর এক উঠোন' (১৯৫৫) উপন্যাস সম্পর্কে 'আমার সাহিত্য জীবন আমার উপন্যাস' নামের এক আত্মজৈবনিক রচনায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বলেছেন — ''বারো ঘর এক উঠোন লেখার পর সমালোচকদের নিন্দা আক্রমণের যেমন কমতি ছিল না, তেমনি আমার ভাগ্যে প্রশংসা বাহবাও অজস্র জুটেছিল। পাল্লার কোন দিকটা ভারি ছিল বলা মুশকিল। ওজন করে দেখিনি। দেখার উৎসাহ ছিল না।'' বীরেন্দ্র দত্ত, 'বাংলার ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ' গ্রন্থে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সম্পর্কে লিখেছেন — ''মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে বৈজ্ঞানিক নিরাসক্ত দৃষ্টির সফল প্রয়োগ করেছেন তাঁর রচনায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তারই সগোত্র।'' (পৃ.১২৫) জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বিশ শতকের চারের দশকের কথাকার হয়ে মধ্যবিত্ত সমাজের অসুখের চিত্রকে কথাসাহিত্যে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। আবার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির একাত্মতার কথাও লক্ষ্য করা যায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সমসাময়িক কথাসিহিত্যিক যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে – সন্তোষকুমার ঘোষ, গৌরকিশোর ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর, সমরেশ বসু প্রমুখ। সমসাময়িক প্রত্যেক লেখকের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সুসম্পর্ক বজায় ছিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সাহিত্যকে ভালবেসে, সাধনা করে গেছেন।

সেইদিক থেকে তিনি আবার সাধকও। প্রকৃতি প্রেমিক লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ১৯৮২ খ্রিঃ ২রা আগস্ট কলকাতার এক নার্সিংহোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

২.২.৮.৯ : গল্প পরিচয় - খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর হাতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের পরিচয় লক্ষ্যণীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। লেখক সেইসমস্ত মানুষদের জীবনকথাকে গল্পের মধ্যে তুলে ধরেছেন। স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য, নিষ্ঠুরতা, মনস্তাত্ত্বিকতা ও শ্রেণী বিভাজন ফুটে উঠেছে তাঁর কথাসাহিত্যের মধ্যে। একদিকে সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষ, অপরদিকে সমাজের শিক্ষিত সুন্দর ভদ্রলোক। খালপোলকে কেন্দ্র করে এপারের মানুষ ও ওপারের মানুষদের বিভাজন করা হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর দৃষ্টিতে কোন মানুষই অবহেলার পাত্র নয়; প্রত্যেকেই মনুষ্যত্বের আদর্শ গুণাবলী নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু সমাজের বুর্জোয়া শ্রেণীর মানুষের প্রভাব-প্রতিপত্তি তা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তার ফলে যারা গরীব ছিল, তারা আরো গরীব হতে থাকে। তখন তাদের অবস্থান হয় সমাজের শেষ সীমায় তখন তারা অর্থনৈতিক হাহাকারের মধ্যে, জলা জায়গায়, টিনের ঘরে বসবাস করে। অর্থনৈতিক মন্দার কারণে সেই সমস্ত মানুষদের জীবনে প্রাচুর্য ও বৈভবের অভাব দেখা যায়।

নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে গল্পের নায়ক উমেশ বসবাস করলেও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বে সে শিল্পী হতে পেরেছে। তাঁর জীবনে দুঃখ-কষ্ট থাকলেও তাঁর প্রতিভার বিকাশ হয়েছে। খালপোলে –''পোলটা আজ আর দুপুরের রোদ লাগা খালের জল বা জলের ওপর কাঠ বোঝাই বিশাল নৌকোটার মন্থর গতির দিকে তাকিয়ে নেই। তার দৃষ্টি আর একটু দূরে খালের এপারের পাঁচ চালা একটা সরু গলির মুখে নিমগাছের ছায়ায় ঢাকা টিনের ঘরের দিকে।''

শেষপর্যন্ত মেয়ে মানুষের চিত্র অঙ্কণে তাঁর জীবনে সুখ-সমৃদ্ধির আভাস লক্ষ্য করা গেছে। তারপর সুন্দর জীবনের জন্য উমেশ অপেক্ষা করতে থাকে।

'খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর' গল্পটি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী শুরু করেছেন এইভাবে –''নতুন কংক্রিটের পোল তৈরী হওয়ার পর জায়গাটার চেহারা বদলে গেছে। এধারের খালটাকে আর চেনা যায় না। চিনতে কষ্ট হত না, যদি ওপরের ডালপালা ছড়ান প্রকাণ্ড শিরীষ গাছটা কাটা না পড়ত। কিন্তু যারা পোল তৈরী করতে এসেছিল, তারা গাছটাকে রক্ষা করতে পারেনি।'' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অনুভব ক্ষমতা ছিল তীব্র। তাই খালপারের প্রকৃতি বর্ণনার সঙ্গে ঋতু পরিবর্তনের বিষয়টি তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন আবার খালপাড়ের ওই জীবনকে কেন্দ্র করেই সুখ-দুঃখময় লেখক আনন্দ উপলব্ধি করেছেন। গল্পে দেখা যায় — ''শিরীষ গাছের ছায়ায় ছায়ায় কাঁটানটে আর কচুর জঙ্গল ছড়িয়ে থাকত কত! পাখির কিচির মিচির শোনা গেছে, সকাল সন্ধ্যা। ফড়িং দেখা গেছে, প্রজাপতি দেখা গেছে। এখন সব শেষ। যেন সাদা নতুন চুনকাম করা বিশালকায় সেতু এপারের কালো চকচকে নীচের রাস্তার সঙ্গে ওপারের কাঁচা, মাটির পথের মিতালি পাতিয়ে হা-হা করে সারাদিন হাসছে।'' সময়ের পরিবর্তনে মানুষের জীবনধারন পদ্ধতি বদলে গেছে। নগর সংস্কৃতির আগমনের ফলে গ্রাম্য সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গেছে। বন-জঙ্গল-ঝোপ-ঝাঁড় পরিষ্কার করে নব্য সংস্কৃতির আগমন ঘটেছে। তারফলে নির্জনতার অভাবে পাখি, ফড়িং এর দেখা মেলা ভার। শহরের মানুষের

কাছে গ্রাম্যজীবন নতুন বলে মনে হতে পারে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী গল্পটিতে সাধারণ মানুষগুলোর বেঁচে থাকার লড়াইকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

তেমনি একইসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী 'খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর' গল্পে মানবজীবন সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। সভ্যতার অগ্রগতির ফলে মানুষ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ফলে জীবনধারণে শান্তি ও আনন্দ লোপ পেতে বসেছে। গল্পে দেখা যায় –খালপোল মিতালি পাতিয়েছে এপারের সঙ্গে ওপারের। তাই কোনোদিন যাদের দেখা যায়নি, সেইসব জেলে, ডোম, বাগ্‌দীর ছেলেমেয়েরা ওপারের ধুলো, বালি, কাদা, জঙ্গল আর মাটির সঙ্গে নুয়ে পড়া পাতার ঘর হোগলার ডেরা ছেড়ে এখন হুটহাট পোলের ওপর চলে আসে।'' নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষগুলির হাঁটু পর্যন্ত ধূলা। পরনে তাদের লালচে ময়লা কাপড়। রুক্ষ, শুষ্ক মাথার চুল নিয়ে ওরা পোলের ওপর ঘুরে বেড়ায়। আর পোল থেকে নিচের জল দেখে ওরা খুশীতে হি-হি করে হাসতে থাকে। এটা ঠিক, যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ – পরিস্থিতিরও পরিবর্তন ঘটে। তেমনভাবেই পরিবর্তন এল খালপোলের নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষের জীবনধারণ পদ্ধতিতে। 'খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর' গল্পে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মেলবন্ধনের ছবিকে স্রষ্টা নিপুণ তুলির সাহায্যে জীবন্ত করে তুলেছেন। গাছ-লতা-পাতার সঙ্গে খালের এপার-ওপার দুইপারের মানুষের উৎসাহকে লেখক এড়িয়ে যেতে পারেননি –''কদিন পর্যন্ত পোলটাই একটা বিস্ময়, নতুনত্ব হয়ে রইল ওপারের মানুষ আর এপারের মানুষদের কাছে। তারপর সেই নতুনত্ব যখন সকলের চোখে আস্তে আস্তে সয়ে গেল, স্বাভাবিক হয়ে এল, তখন একদিন সবাই অবাক চোখ মেলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল এক অদৃশ্য শিল্পীর হাতের আঁকা নানা চিত্র পোলের গায়ে ফুটে উঠেছে।''

আমরা জানি, শিল্পীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হল মানুষ। তাই মানুষ, প্রকৃতির স্বজন হয়েই বেঁচে আছে। 'খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর' গল্পে উমেশ নামক এক চিত্রকরের আঁকা নানা চিত্র পোলের গায়ে ফুটে উঠেছে। প্রকৃতি ও মানুষ দু'জনের প্রতিই উমেশের আকর্ষণ ছিল। এক অদৃশ্য শিল্পীর হাতের আঁকা ছবিগুলি প্রথমে প্রকৃতির পট থেকে পরিবর্তিত হয়ে মেয়ে মানুষের চিত্রে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রকৃতির থেকে চোখ সরিয়ে, মেয়ে মানুষের শরীরের দিকে মানুষের আকর্ষণকে কেন্দ্র করে গল্পটি শেষ হয়েছে। শিল্পীর জীবনে অর্থনৈতিক হাহাকার থাকার কারণে রং-তুলি কিনে আনতে পারেনি। তাই ইটের গুড়ো বা কাঠকয়লা ঘষে ঘষে পোলের গায়ে ভারি যত্ন করে ফুল-লতাপাতা-মাছ-পাখি এঁকে রেখেছে। ''বোঝা যায় তার তুলি নেই। দোকান থেকে রং কিনে আনার সামর্থ্য নেই। কিন্তু সেটা বড় কথা না। অঙ্কণটাই আসল নয় চিত্রগুলিই এখানে বড়। তাছাড়া ইটের রং ও রং, কয়লার রং ও রং।'' উমেশের জীবনে অর্থনৈতিক হাহাকার থাকলেও ছবি আঁকার ক্ষেত্রে কোনদিনই অবহেলা করেনি। শিল্পী সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে নিজের মতো করে চিত্রাঙ্কণ করে গেছেন। অভাব থাকা সত্ত্বেও উমেশের মন সরল প্রকৃতির। তাঁর মনে লোভ প্রায় নেই বললেই চলে, সে শুধু পরিশ্রম করে, পারিশ্রমিক পেতে চায়। সেইজন্য খালপোলের এপারের সুন্দর-ভদ্র মানুষেরা শিল্পীর প্রতিভাকে কুর্নিশ জানিয়েছে। তারা মনে করেছে অনাদরে – অবহেলায় থেকে শিল্পী নিজেকে প্রকাশ করতে পারেনি। সেই পরিস্থিতিতে তারা প্রত্যেকেই এক বাক্যে স্বীকার করেছে — ''আহা কী চমৎকার হাত।''

উপরোক্ত ঘটনার তিনদিন পর উমেশ পোলের গায়ে আবার চিত্র অঙ্কণ করেছে। তবে গাছ-ফুল-পাখি-মাছ না এঁকে এবার সে এঁকেছে–''চন্দ্র-সূর্য-পর্বত-সমুদ্র-ঝরণা-নদী।'' খালের এপারের শহরের

মানুষেরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখলেও ওপারের নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষগুলি ঐসব ছবি দেখে হি-হি করে হেসে গড়িয়ে পড়েছে। ময়লা কাপড় পরা লোকগুলি শিল্পের মহত্ব বোঝেনি, কারণ তাদের পেটে ছিল ক্ষিদে। যাদেরকে দু'বেলা খাবার জোগাড় করতে হিমসিম খেতে হয়, তাদের কাছে শিল্পের মাহাত্ম্য প্রাধান্য পায় না। তবে ওই সব মানুষরা নিরন্ন হলেও মনের দিক থেকে তারা ছিলো খুবই সরল প্রকৃতির। তাই তাদেরকে বলতে শোনা যায় – ''পাগলা, মাথায় ছিট আছে বেটার।''

ঐ ঘটনার পাঁচ-ছয়দিন পর উমেশ আবার পোলের দুপাশে সাপ-ব্যাঙ-বিছা-টিকটিকি-আরশোলার ছবি এঁকে রেখেছে। বাগ্‌দীপাড়ার ছেলেমেয়েরা পোলের কাছাকাছি থাকে বলে, তারাই আগে দেখেছে ছবিগুলি। তাদের মধ্যে একটা ছেলে সেই ছবিগুলি গুণে গুণে দেখেছে – ''চৌদ্দটা সাপ, আটাশটা ব্যাঙ, তিনকুড়ি আরশোলা, বাইশটা টিকটিকি।'' পোলের গায়ে আঁকা রয়েছে। শিল্পীর নতুন সৃষ্টি দেখতে তখন সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সেখানে ভিড় জমিয়েছে।

উমেশ সম্পর্কে তখন সাধারণ মানুষগুলির ধারণা জন্মলাভ করেছে –''লোকটি সাধক যোগী- বস্তুত সত্যিকারের শিল্পী তাই হয়। কেবল ছবি আঁকা গান গাওয়া নয়, ছবি ও গানের ভিতর দিয়ে মানুষকে শিক্ষা দিতে মাঝে মাঝে, এঁরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন।'' তাই এই শিল্পীদের 'আর্টিস□' না বলে 'প্রফেট' বলা ভাল। খালপোলের এপারের চশমার পুরু লেন্‌স পরা বৃদ্ধ লোকটি ঐ ছবিগুলি দেখে মন্তব্য করেছিলেন — ''আণবিক সভ্যতার বড়াই করে আমরা যতই লাফালাফি করি না কেন, □বংসের মুখে এসে পৃথিবী থরথর করে কাঁপছে। শিল্পী বলতে চাইছে, দু-পায়ের ওপর দাঁড়ানো মানুষের দিন শেষ হতে আর দেরী নেই, ওরা আবার আসছে, আসছে, আবার বুকের ওপর ভর দিয়ে চলা জীবদের রাজত্ব চলবে কয়েক কোটি বছর।''

নাগরিক জীবনছন্দে বিশ্বাসী মানুষেরা অনেকাংশে কুসংস□ারমুক্ত হলেও তাদের হাতে সময় খুব কম। অথচ সকলেই সাফল্যের মুখ দেখতে চায় খুব তাড়াতাড়ি। সেইজন্য মানুষের মনের সংযম নষ্ট হতে বসেছে। সকাল থেকে রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত তারা প্রচুর পরিশ্রম করলেও অর্থ উপার্জনের বাইরে কিছু চেনে না তারা। তার ফলে মানুষের জীবন থেকে ন্যায়-নীতি হারিয়ে যেতে বসেছে। প্রকৃত শিল্পমনস□ লেখকরা মনে করেন, জীবনের সব মাত্রাকে টাকার মূল্য দিয়ে মাপা যায় না। আর তা যারা করতে চায়, তাতে জীবনের পথ তাদের কাছে জটিল হয়ে ওঠে। সভ্যতার অগ্রগতির ফলে মানুষ প্রকৃতি থেকে আলাদা হয়ে পড়েছে। তারফলে মানুষ যন□র সঙ্গে কাজ করতে করতে হয়ে উঠেছে যান্□ক। এমনকি বিশ্বায়নের ফলে মানুষের মনের কোমলতাও নষ্ট হতে বসেছে। তারফলে মানুষের মন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। আমরা জানি, আদিমকাল থেকেই মানুষ, প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নিয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখেছে। তাই প্রকৃতির যেমন মনোহরি রূপ আছে; তেমনি ভয়ঙ্করী রূপও বর্তমান। নগর সভ্যতার অগ্রগতি হওয়ার ফলে পরিবেশে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেছে। ফলে এই স্বার্থকপর হিংসার সমাজে, মানুষের মনের নির্মলতা হ্রাস পেতে বসেছে। তাই জীবনে প্রকৃতির স্পর্শ পেলে, সেই মন আবার সবুজ হয়ে উঠবে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর' গল্পে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একাত্মতার কাহিনি লক্ষণীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। লেখক বলেছেন – ''যেন হাজার বছরের পুরোনো এই সেতু – এর আবার নতুনত্ব কি, এর দিকে তাকাবার আছে কি। দুপুরের গনগনে রোদ মাথায় নিয়ে নিঃসঙ্গ ব্রীজটা মানুষের স্বভাবের কথা চিন্তা করে ঠোঁট টিপে হাসছিল হয়তো।''

ফাল্□ুন মাসের শেষে, এক রাত্রিতে হঠাৎ করে বৃষ্টি নামায় পোলের গায়ে সাপ-ব্যাঙ-আরশোলা-টিকটিকির ছবিগুলি ধুয়ে মুছে গেল। ফলে ব্রীজটার গায়ে আর কোন ছবি আঁকা দেখা যাচ্ছেনা। ''একটু আঁচড় নেই, একটু দাগ নেই কোথাও।'' গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও মনে করেন, আমাদের জীবনধারণ পদ্ধতির মধ্যেও মাঝে মাঝে বৃষ্টির প্লাবন নেমে আসুক। তাহলে মানুষ যে আমার-আমার করে মরে, তার অবসান হবে। এখানে একটা কথা বলা বোধকরি যুক্তিসঙ্গত হবে, ধনী শ্রেণীর মানুষ যে নিম্নবিত্ত পরিবারের মানুষজনকে চিরকাল হেয় প্রতিপন্ন করে এসেছে, তার থেকে সাধারণ মানুষ মুক্তি পাবে। সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণীর মানুষ নিজেদের সকল অহংকার ত্যাগ করে নতুন পথে যাত্রা শুরু করবে। তারফলে সমাজে আর শ্রেণী বিভাজন থাকবে না। মানুষ মানবিকতার জোরে মাথা উঁচু করে বাঁচার প্রেরণা পাবে।

খালপোলের মানুষদের প্রতিহিংসা পরায়ণ আচরণের দৃশ্যপটটি লেখক কুশলী দক্ষতায় আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন, নিম্নোক্ত চরণগুলির মধ্য দিয়ে – ''এধারে কুড়িটা ওধারে কুড়িটা মানুষের মুখ এঁকে রেখে গেছে। উহুঁ, একটাও পুরুষদের মুখ না, সব মেয়েমানুষের মুখ।'' ফাল্□ুন মাসের রাত্রে যেদিন বৃষ্টি হল, তার পরের দিনই উমেশ এক ধাপ এগিয়ে এসে পোলের গায়ে উপরোক্ত মেয়েমানুষের ছবিগুলি এঁকেছে। পোলের গায়ে কোন সরীসৃপ জন্তু জানোয়ারের ছবি বাদ দিয়ে কুড়িটা নারীমুখের ছবি দেখে খালপোলের এপার-ওপারে মানুষ স্তব্ধ হয়ে গেছে। ঐ সমস্ত লোকগুলি আলোচনা করছিল, এ নির্ঘাত বিরহী শিল্পী। শিল্পীর ব্যর্থ প্রেমের পরিচয় পেয়ে উত্তেজিত জনতা প্রচণ্ড ভাবে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হযে পড়েছে। এ তো পাগলের লক্ষণ ছাড়া আর কিছু নয়। তারা উমেশ সম্পর্কে এও মনে করেছে — ''যে লোকটার মাতার দোষ হয়েছে।'' বলতে কোন বাধা নেই, গল্পটি এখান থেকেই গতি পেল ও এক নতুন বাঁক নিল।

তেমনি একইসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী উমেশের জবানিতে তাঁর জীবনের করুণ চিত্রটিও ইঙ্গিতময়তায় আমাদের কাছে পরিবেশন করেছেন কোনো রাখ-ঢাক না রেখে। গল্পে দেখা যায় –''অশ্লীল ছবির গন্ধ পেয়ে মাছির ঝাঁকের মতো মানুষ পোলের ওপর এসে ভিড় করতে লাগল। পোলের দুপাশে, দু'দিকের ঢালু থেকে আরম্ভ করে উলঙ্গ নরনারীর মিছিল দেখতে ভদ্র-অভদ্র-শিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে রীতিমত ঠেলাঠেলি ধাক্□াধাক্□ি আরম্ভ হয়ে গেল।'' উমেশ কিছুদিন আগে দেড় হাজার ফুট লম্বা ব্রীজটার মধ্যে চন্দ্র-সূর্য-সমুদ্র-পর্বত এঁকে রেখেছিল। আর কিছুদিন পর দুই প্রান্তে চল্লিশটি নারীর মুখ এঁকে রেখেছে। তার তিন দিন পর উমেশ আবার খালপোলে বাজিমাত করে দিয়েছে। গল্পপাঠে আমরা জানতে পারি উমেশ দেয়ালের গায়ে উলঙ্গ নর-নারীর ছবি এঁকে রেখেছে। দর্শকদের তখন বলতে শোনা গেছে, আহা যদি একবার চিত্রকরের দেখা পেতাম তাহলে আমাদের জীবন ধন্য ধন্য হয়ে যেত। সেই পরিস্থিতিতে সেতুটা – ''পড়ন্ত রোদের আভা গায়ে নিয়ে ব্রীজটা যেন আলস্যের হাই তোলে।''

আগে যে যুবকটি ছবিগুলি মুছে দিয়েছিল, সে পকেট থেকে রুমাল বের করে অশ্লীল ছবিগুলি মুছবে বলে মনস্থির করলে। তখন উত্তেজিত জনতা বলতে থাকে –''মশাই সবুর করুন সবুর করুন, এখনি সব মুছে ফেলা কেন – এমন চমৎকার চিত্র, আর একটু দেখেনি। আপনিও চোখ ভরে দেখে নিন।'' এমতাবস্থায় শিক্ষিত-অশিক্ষিত খালপোলের দর্শকদের মধ্যে একটা চিৎকার শোনা যাচ্ছে, একটি লোককে দেখে। তার পরনে ছেঁড়া চটি, আর বগল থেকে কব্জি পর্যন্ত রঙ-বেরঙের কাপড়ের

টুকরো জড়ানো। যাঁর—''হাতে একটা টিনের কৌটো। যার সঙ্গে চোখাচোখি হচ্ছে, তারদিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে আর হাতের কৌটটা নেড়ে বিড়বিড় করছে, হেল্প। হেল্প।''

শেষপর্যন্ত পোলের গায়ে উলঙ্গ নরনারীর মিছিল দেখে পুলিশও দাঁত বের করে হাসতে থাকে। তবে শহরের বাবুরা রুমাল দিয়ে ঘষে ঘষে দশ মিনিটের মধ্যে সব ছবি মুছে দিল। তারপর বাগ্‌দী পাড়ার মানুষ ও অপরদিকে শহরের বাবুরা নিজের নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সেই পরিস্থিতিতে খালপোল আগে যেমন ছিল, তেমনি আবার শূন্য, নীরব হয়ে গেল। তখন ব্রীজটার দিকে আর কেউ তাকাবার নেই। সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এমনকী কেউ কোনোদিন পোলের গায়ে চিত্রকর্ম করেছিল, তা দেখে বোঝা যাবে না। কাজেই পোলের উপর আর মানুষের ভিড় নেই। গল্পে দেখা যায় —''ঘোলা জলের দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে ধরে খালপোল খালের বুকের কাঠবোঝাই নৌকাটার মন্থর গতি দেখতে দেখতে হাঁপিয়ে ওঠে।'' কিন্তু পোলটার দৃষ্টি সীমানা ছাড়িয়ে দূরে আর একটু দূরে চলে গেল নিমগাছের ছায়ায় ঢাকা টিনের ঘরের দিকে। গল্পপাঠে আমরা জানতে পারি নিচু চালের টিনের ঘরে উমেশের বসবাস। শিল্পীর সাধনার ক্ষেত্রভূমি। যেখানে সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে শিল্পী নিজের কাজ মনোযোগ দিয়ে করে চলেছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।

২.২.৮.১০ : নামকরণ

'খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর' গল্পে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী গল্পের যেটুকু কাহিনি বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে এই নামের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। গল্পের মধ্যে উমেশ নামক শিল্পীর গুণগান করা হয়েছে। শিল্পী হিসেবে তিনি সারা বছর কাজ করেন। গল্পের প্রথমে দেখা যায়, উমেশ-লতা-পাতা আঁকলেও পরে মানুষের চাহিদার কথা ভেবে নারীমুখ এঁকেছে। কোনও একজন শিল্পী প্রথম কর্মক্ষেত্রে আসেন এক এক রকম শিক্ষা নিয়ে। গল্পে উমেশও প্রকৃতি, সরীসৃপ শ্রেণীর ছবি আঁকার পর শেষপর্যন্ত উলঙ্গ নারীর ছবি এঁকেছে। উমেশের মনে হয়েছে কাজের জায়গায় এসে সেই শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ করতে গিয়ে বিভিন্ন মানসীকতার প্রয়োজন হয়েছে। আমরা গল্প পাঠে জানতে পারি শিল্পীর কাজ দেখতে আলাদা করে লোক ডাকতে হয়নি। খালপোলের এপার ও ওপারের মানুষ বিনা নিমন্□ণেই এসেছেন কাজ দেখতে। উমেশের শিল্পকলা দেখতে শহরের বাবুদের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি গাড়ির সংখ্যা, ক্যামেরা ম্যানের সংখ্যা, স্□ুল পড়ুয়াদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। দর্শকরা এসে ভাবেন, এই চিত্রকর কি নিছক কাজই করেছেন, না তাঁর কাজের মধ্যে একটা অন্বেষণ আছে? টিনের ঘরের চিত্রকর হলেও গল্পের অশ্লীল নারীমুখ অঙ্কন করে সমাজের আব্রুটি দর্শকদের বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। বহু দর্শক, বহু শিল্প রসিক উমেশের প্রশংসা করেছে। ''আলো না থাকলেও ও ঠিক এঁকে যেত। এই শিল্পী সাধারণ মানুষ না। ঐশ্বরিক শক্তি সম্পন্ন কোনো পুরুষ হবে।'' এই গল্পের মধ্য দিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বলতে চেয়েছেন, এই পুরুষতান্□িক সমাজে নারীরা কখনও কখনও দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। খালপোলকে কেন্দ্র করে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষদের জীবনধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে লেখক আলোকপাত করেছেন। সম্ভবত নিম্নবিত্ত শ্রেণীর পুরুষ ও নারীরা কখনও কখনও ভুলে যান তাঁদের ভেতরের আসল শক্তির কথা। অস্থির এই সময়ের প্রেক্ষিতে নারীশক্তির পূর্ণ জাগরণ ভীষণ জরুরি।

সেইজন্য প্রকৃতির পট থেকে চোখ ফিরিয়ে নারী শক্তির চিত্র অঙ্কন করেছেন গল্পকার। শিল্পী এই চিত্রের মধ্য দিয়ে, কোনও একক নারীর কথা বলেননি। তিনি সমাজের অবহেলিত, নিপীড়িত মানবীদেরকে সংঘবদ্ধভাবে তাঁর ক্যানভাসে তুলে ধরেছেন। ''আগে কালী দুর্গা, বা পরমহংস-টংস যা আঁকা আছে ঝুলিয়ে দেব, তারপর কিছু ল্যাণ্ডস্কে□প, তারপর না হয় —'' তখন মানুষের এত আকর্ষণ ছিল না, তাই বিক্রি কম হতো। শিল্পী নানা মাধ্যমে তাঁর শিল্পকর্মকে ফুটিয়ে তুললেও, তাঁর অর্থ উপার্জন হতো না। আর খালপোলে যখন উলঙ্গ নারীদের চিত্র এঁকেছেন, তখন দর্শকদের চাহিদা ও আকর্ষণ দুইই বেড়ে গেছে। আসলে মাতৃশক্তি যেমন চিরকালই আকৃষ্ট করেছে শিল্পীদের তেমনি দর্শকদেরও। ''ছবি দেখতে দোষ কি – এ তো জলজ্যান্ত কোনো মেয়েছেলে কাপড় চোপড় ছেড়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে না। কেন আপনি যে বড্ড ক্ষেপে যাচ্ছেন, পুরীর মন্দিরে গিয়ে দেখুন না, কত উলঙ্গ ছবি চারদিকে আঁকা রয়েছে।'' আমরা জানি প্রতিমুহূর্তে শিল্পীর সৃজন প্রক্রিয়া চলতেই থাকে। মনের ভেতরে সে যেন ফল্□ধারার মতো। উমেশ রাজপ্রাসাদে বসবাস করার সুযোগ পায়নি, তাই টিনের ঘরই তার শেষ সম্বল। তবু সে তো শিল্পী, শিল্পই তার পরিচয়। যেকোনও ভাবে উমেশ, মানুষের সঙ্গে শিল্পের যোগসূত্র তৈরি করার চেষ্টা করেছে। এটাই শিল্পীর কাজ। তাই ''শিল্পীর আবার পরিচয় জিজ্ঞাসা করা কেন।'' শিল্পীর সৃজন প্রক্রিয়া যে কোনও ফরম্যাটে হতে পারে। তা গ্যালারিতে, স্ট্রিট কর্ণার শোতে, প্যাণ্ডেলে, প্রকৃতির ক্যানভাসে বা খালপোলে ও হতে পারে। তাতে কোন দোষ নেই। শিল্পীর কৃতজ্ঞতা আপামর জনসাধারণের কাছে, কেননা মানুষ সচেতন হয়ে, শিল্পের প্রশংসা করেছে। খালপোলের মানুষও যে আলাদাভাবে শিল্পের কদরকে বুঝতে পেরেছে এটাই হল গল্পের সবথেকে বড় কথা। গল্পের টিনের ঘরের চিত্রকর উমেশ, তার সৃজন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে বার্তা দিতে চেয়েছে; তার ব্যাপ্তি কিন্তু অনেক। গল্পকার নিঃসঙ্গ লেখক হিসেবেও সেইসময় সাধারণ মানুষকে সচেতন করার কাজে ব্রতী হয়েছেন তা গল্প পাঠেই বোঝা যায়। তাই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ''খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর '' গল্পের নাম সবদিক দিয়ে সার্থক।

২.২.৮.১১ : প্রতীকধর্মীতা বা ব্যঞ্জনা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর' গল্পে মানবসমাজের শ্রেণীগত চিত্রটি লক্ষ্য করা যায়। খালপোলকে কেন্দ্র করে সমাজের এপার, ওপার বিভাজন করা হয়েছে। নগরায়ণের ফলে মানুষের মনের সবুজতা নষ্ট হয়ে গেছে। এমনকী আধুনিক সমাজে হিংসা, মারামারি, স্বার্থপরতা বেড়েই চলেছে। ''আধুনিক সমাজ আধুনিক সভ্যতাকে ব্যঙ্গ করতে শিল্পী ইঁট-কাঠকয়লা দিয়ে ব্রীজের গায়ে এসব ছবি এঁকে রেখেছে। আমরা কৃত্রিম হয়ে গেছি, আমাদের সভ্যতাটা মেকী।'' গল্পকার এই ভাবনার মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজের নানারকম দুর্নীতিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন। গল্পে সমাজের শ্রেণী বিন্যাস তো বেশ বুদ্ধিদীপ্ত সুকৌশলে নির্মাণ করেছেন। আবার ইট-চুন-সুরকি-লোহা-সিমেন্□র সেতুটার মধ্যে গল্পকার প্রাণের স্পন্দন লক্ষ্য করেছেন —''দুপুরের গনগনে রোদ মাথায় নিয়ে নিঃসঙ্গ ব্রীজটা মানুষের স্বভাবের কথা চিন্তা করে ঠোঁট টিপে হাসছিল হয়তো।'' সমালোচকরা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে নিঃসঙ্গ লেখক অভিধায় অভিহিত করেন। একটি ব্রীজকেও তিনি প্রাণ প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, তা তিনি করেছেন নিজের খেয়াল বশেই। আসলে তাঁর মাথায় যখন যা ভাবনা এসেছে, তখন তাকে সম্বল করে লিখে গেছেন। গল্পের শেষের দিকেও দেখা যায় — ''উমেশ ঠোঁট

টিপে হাসল। কিন্তু পোল হাসে না। গম্ভীর থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। উমেশ অবশ্য তাতে দুঃখ পায় না। জানলা থেকে সরে গিয়ে তক্তপোশের তলা থেকে জংধরা পুরোনো টিনের সুটকেসটা টেনে বার করে।'' আর একটি কথা না বললে নয় – গল্পের ভেতর জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রতীক ধর্মীতার মধ্য দিয়ে শিল্পের কদর্য ও মনোমুগ্ধকর রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সেই সময়ের সমাজব্যবস্থা থেকে উত্তরণ চেয়েছেন। তাই এতদিন ধরে শোষিত, নিপীড়িত মানুষের দুঃখ যন্□ণারও যে একদিন অবসান হবে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর স্বপ্ন দেখেন। তিনি প্রতীক বা ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে পোলটার গোত্রান্তর হৃদয়ঙ্গম করেছেন—''কিন্তু পোলটা আজ আর দুপুরের রোদ লাগা খালের জল বা জলের ওপর কাঠ বোঝাই বিশাল নৌকোটার মন্থরগতির দিকে তাকিয়ে নেই। তার দৃষ্টি আর একটু দূরে-খালের এপারের পীচ-ঢালা একটা সরু গলির মুখে নিমগাছের ছায়ায় ঢাকা টিনের ঘরের দিকে।'' সুতরাং উমেশ শিল্পী হলেও ''সর্বহারা শ্রেণীর প্রতিনিধি। তাই উমেশের সঙ্গে খালপোলের একটা চোরা দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে। এর পরিণতিতে যদি উমেশের সর্বদিক দিয়ে উন্নতি হয়, তাহলে গল্পটি আলাদা মাত্রা পেয়ে যায়। খালপোলকে কেন্দ্র করে উমেশের জীবনে অর্থনৈতিক উন্নতির একটি পথরেখা তৈরি হয়ে যায়। টিনের ঘরের চিত্রকর হলেও তার সৃজন প্রক্রিয়া উন্নতমানের। গল্পকার উমেশের ভাবনাকে ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে শেষ করেছেন এইভাবে - ''রোদটা এখনও চড়া। একটু ছায়া, একটু বিকেলের জন্য উমেশ অপেক্ষা করতে থাকে।''

২.২.৮.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ''খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর' গল্পটির নামকরণের সার্থকতা প্রতিষ্ঠিত করো।

২। 'খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর' একটি প্রতীকী গল্প-এ বিষয়ে তোমার অভিমত লিপিবদ্ধ কর।

২.২.৮.১০ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা বিশ শতক – ডঃ শ্রাবণী পাল সম্পাদিত, অক্ষর প্রকাশনী

২। বাংলা ছোটগল্প ঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ – বীরেন্দ্র দত্ত – পুস্তক বিপনী।

৩। আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী – জগদীশ ভট্টাচার্য – ভারবি।

৪। বাংলা ছোটগল্প তত্ত্ব ও গতিপ্রকৃতি – সোহারাব হোসেন।

৫। বাংলা ছোট গল্প ঃ মননে-দর্পণে – শীতল চৌধুরী।

৬। বাংলা ছোটোগল্প ও গল্পকার – ভূদেব চৌধুরী।

৭। বাংলা ছোটোগল্প – শিশির কুমার দাস।

দ্বিতীয় পত্র

পর্যায়গ্রন্থ - ৩

চল্লিশোত্তর বাংলা ছোটগল্প

(নির্বাচিত ৮টি ছোট গল্প)

একক - ৯

বিন্যাসক্রম :

২.৩.৯.১ : লেখক পরিচিতি—সুবোধ ঘোষ (১৯০৮-১৯৮০)

২.৩.৯.২ : সুন্দরম্ (সুবোধ ঘোষ)

২.৩.৯.৩ : লেখক পরিচিতি—বিমল কর (১৯২১-২০০৩)

২.৩.৯.৪ : জননী (বিমল কর)

২.৩.৯.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.৩.৯.১ : লেখক পরিচিতি—সুবোধ ঘোষ (১৯০৮-১৯৮০)

জন্ম ১৯০৮ সালে হাজারিবাগে। নিজের জীবনে অল্পবয়স থেকে তিনি বিভিন্ন ধরনের সংগ্রাম ও জীবিকার দ্বারা অভ্যস্ত হয়েছিলেন। যার ফলে জীবন-পর্যবেক্ষণের বিস্তৃত সুযোগ ঘটেছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর পঠন-পাঠন সমৃদ্ধ পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্য। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস লিখেলেও সুবোধ ঘোষ ছোটোগল্পকার হিসেবে সমধিক সার্থক শিল্পস্রষ্টা। তাঁর সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ 'অগ্রণী পত্রিকায় 'ফসিল' নামে গল্প লিখে। এই গল্প পাঠকমহলে ইতিবাচক সাড়া জাগায়। প্রথম গল্পেই বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব এবং রচনাশৈলীর বিশিষ্টতার যে স্বাক্ষর রেখেছিলেন সুবোধ ঘোষ জীবনব্যাপী সাহিত্যসাধনায় সেই প্রতিশ্রুতির ব্যতয় ঘটেনি। চতুর্ভুজ ক্লাব, সুন্দরম্, কর্ণফুলির ডাক, পরশুরামের কুঠার, অযান্ত্রিক, পরিণাম রমণীয় তাঁর বিখ্যাত গল্পের কয়েকটি। সুবোধ ঘোষের গল্প উপন্যাসে বহির্বঙ্গের প্রেক্ষাপট বাংলা কথাসাহিত্যের ভৌগোলিক বিস্তৃতি বাড়িয়ে দিয়েছে। মননশীলতা ও বৌদ্ধিক বিশ্লেষণের গুণে সুবোধ ঘোষের সমাজবীক্ষা এবং চরিত্রায়ণ তাঁর সৃষ্টিকে উন্নত মানের অধিকারী করেছে। নৃতত্ত্ব, পুরাণকথা, সামরিক বিদ্যা, ইতিহাস, শিল্পচিন্তা প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে কৌতুহলী এই লেখক সম্পাদনা কর্মেও দক্ষতার পরিচয় রেখে গেছেন। আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত এই লেখক বাঙালীর হৃদয়ে অক্ষয় আসনে অধিষ্ঠিত।

২.৩.৯.২ : সুন্দরম্ (সুবোধ ঘোষ)

"সমস্যাটা হল সুকুমারের বিয়ে।"

'সুন্দরম্'-গল্পের শুরুতে একটি ছোটো বাক্য। কিন্তু বাক্যের প্রথম শব্দ 'সমস্যাটা' গল্পের সূত্র ধরিয়ে দিয়েছে। সমস্যা যাকে নিয়ে, সে "সুকুমার" এবং সমস্যার বিষয় "বিয়ে"। সাধারণভাবে আমাদের বিবাহ সমস্যার নানা কারণ মনে আসে। সুকুমারের বিয়েটা তার পরিবারের কাছে এই কারণে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, সুকুমার আবাল্য ব্রহ্মচর্য পালন করে আসছে নিষ্ঠার সঙ্গে, এখন বিয়ের বয়স হয়েছে তার।

তা সত্ত্বেও তাকে বিয়েতে রাজি করানো যাচ্ছে না। সংসার সম্পর্কে তার ঔদাসীন্য দেখে তার প্রিয়জনেরা আতঙ্কিত। ছেলে সংসারবিমুখ বিবাগী হয়ে গেলে বংশ রক্ষা হবে কীভাবে? এই চিন্তা থেকে সুকুমারকে সংসারজীবনে উৎসাহী করবার উপায় খোঁজেন তাঁরা। এই কাজে সবচেয়ে উপযুক্ত ভূমিকা নিতে পারবে বলে নিযুক্ত হয় সুকুমারের একজন ভগ্নিপতি কানাইবাবু। একটু একটু করে উপদেশ-পরামর্শ-মন্ত্রণা দিয়ে কানাই ক্রমে সুকুমারকে উপন্যাস পড়ায়, সিনেমা দেখাতে নিয়ে যায়। সুকুমারের নির্লেপে ফলত কোথায় যেন ফাটল ধরে। একদিন সে কানাইকে উদ্বেলিত স্বরে বলে ওঠে—'মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই'।

এই গল্পে সুকুমারের বাবা লাসকাটাঘরের 'ঝানু সার্জেন' কৈলাস ডাক্তার জীবনতত্ত্বের অন্য একটি দিক ধরে রয়েছেন। সুকুমারের ঔদাসীন্যে বাড়ির অন্যান্যদের মত তিনি বিচলিত নন। হয়তো ডাক্তারী বিজ্ঞানচেতনা থেকেই তাচ্ছিল্যভরে তিনি বলেন—'প্রোটিনের অভাব.... কত পাকামি দেখলামঙ্গ' সত্যি সত্যিই সুকুমারের ব্রহ্মচর্য-সাধনাপর্ব কেটে যায় একদিন। জীবনের স্বাভাবিক প্রেরণা ও দাবিকে দুরে সরিয়ে রেখে সুকুমার যে কৃত্রিম ভাবজগতে এতদিন বিচরণ করেছে, সেখান থেকে সে যখন ফিরল, তখন তার ভিতরের বুভুক্ষা কোন্ কাঙ্ক্ষনীয় সুন্দরকে বরণ করে নিল, তারই গল্প 'সুন্দরম্'।

সুকুমারের জন্য পাত্রী দেখা শুরু হল। প্রথম পাত্রীকে অপছন্দ করায় নাকচ করার পর গল্পে দ্বিতীয় আর একটি দিকের অবতারণা। আচমকা, পাঠককে কোনো পূর্বাভাস না দিয়ে কৈলাস ডাক্তারের বাড়িতে কদাকার আবর্জনার মত একটি পরিবার ঢুকে পড়ে। 'মানুষের ব্যঙ্গমূর্তি কয়েকটি প্রাণী'। ডাক্তারের ময়নাঘরের সহকরী যদুডোম ও নিতাই সহিসের উদ্যত গলাধাক্কা থেকে ডাক্তারই বাঁচান পরিবারটিকে। কুষ্ঠরোগী হাবু বোষ্টম, তার সঙ্গিনী বসন্তরোগে কানা হয়ে ইরানী বেদিয়াদের দলছাড়া হামিদা, তাদের শিশুপুত্র আর তাদের মেয়ে তুলসীকে নিয়ে এই পরিবার। সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত তুলসীর বর্ণনা 'সুন্দরম্' গল্পের সৌন্দর্য সম্পর্কিত তত্ত্বটির উপস্থাপনায় বিশেষ জরুরী—"দেখবার মত চেহারা এই তুলসীর। বছর চৌদ্দ বয়স, তবু সর্বাঙ্গে একটা রূঢ় পরিপুষ্টি। কোনো ডাকিনীর টেরাকোটা মূর্তির মত কালি-মারা শরীর। মোটা থ্যাবড়া নাক। মাথার খুলিটা বেঢপ, টেরে বেঁকে গেছে। চোয়াল জুড়ে জন্তুর একটা হিংসা ফুটে রয়েছে যেন। মুখের সমস্ত পেশী ভেঙেচুরে গেছে ছন্নছাড়া বিক্ষোভে। এ মুখের দিকে তাকিয়ে দাতাকর্ণও দান ভুলে যায়। গা শির শির করে।"

হাবু বোষ্টম কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হওয়ায় ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিতে এসেছে। মুচিপাড়ার ভাগাড়ের পেছনে থাকবার জন্য ম্যুনিসিপ্যালিটির অনুমতি পেতে গেলে এই সার্টিফিকেট জরুরী। কৈলাস ডাক্তার রাজি হলেন এবং এই কুৎসিত পরিবারটি অপসৃত হবার পর তাঁর পরিবারের সুন্দরী পুত্রবধূসন্ধানী সদস্যদের উদ্দেশ্য করে হেসে হেসে বললেন—'দেখলে তো সুন্দরী তুলসীকেঙ্গ ওরও বিয়ে হয়ে যাবে জানো?' কদর্য চেহারা নিয়েও ডাক্তারের দৃষ্টিতে তুলসী সুন্দরী, কেননা সেই বিশিষ্ট প্রেক্ষণবিন্দু স্বাস্থ্যশ্রী, দেহযন্ত্রের সুচারু সুষমাই সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। কৈলাস ডাক্তারের সুন্দরের ধারণা তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর কর্মজগতের অভিজ্ঞতা থেকে। আপাতসুন্দর দেহ মৃত্যুর পর যখন লাশকাটা টেবিলে শোয়ানো থাকে, অভিজ্ঞ সার্জেন তার আপাদমস্তক কাটাছেঁড়া করে বিশ্লেষণ করেন, তখন তার অন্তরঙ্গ রূপ চোখে পড়ে তাঁর। সেই বিশিষ্ট রূপের জহুরীর কাছে দেহযন্ত্রের আভ্যন্তর রূপই আসল সত্য। বাইরের রূপ নয়, স্বাস্থ্যের সৌন্দর্যকে ডাক্তার সুন্দর বলে মানেন বলেই তিনি কদাকার তুলসীকে 'সুন্দরী তুলসী' বলে অভিহিত করেন। এই সঙ্গে গল্পের irony বা পরিহাসের মতো শোনা যায় ঝি-এর একটি মন্তব্য—'বিয়ে হবে না কেন? সবই হবে। তবে সেটা আর বিয়ে নয়!'

এইখানেই গল্পের টার্নিং পয়েন্ট। সুকুমারের বিবাহের প্রতি অনাসক্তি থেকে আকর্ষণ জেগে ওঠা এবং পাত্রী পছন্দ করাতে তার যথেষ্ট শুচিবায়ুর পরিচয় রয়েছে। সদ্বংশজাত, ধনী পরিবারের, শিক্ষিতা, সুরুচি-

সম্পন্না সর্বোপরি সুরূপসী কন্যা ছাড়া সুকুমার বিয়েতে রাজি হয় না। একের পর এক পাত্রী দেখা চলতে থাকে। সুকুমার নাকচ করতে দ্বিধাবোধ করে না সেইসব পাত্রীদের। ইতিমধ্যে অন্য ঘটনা ঘটে। ডাক্তার একদিন তুলসীকে দেখতে পান সুকুমারের পড়ার ঘরের বারান্দায়। যদু তাড়িয়ে দেয় তাকে। আর একদিন তুলসীর সঙ্গে যদু-নিতাইকে একই জায়গায় বসে মস্করা করতে দেখলেন ডাক্তার। সুকুমারের দরজা খোলা দেখে তাকে সাবধান হতে বললেন। তুলসী থালা হাতে দৌড়ে পালাল। যদু-নিতাই কোনো সদুত্তর দিতে পারল না।

ডাক্তার অসামান্য স্বাস্থ্যবতী, পরিশ্রমী, স্পোর্টসে প্রাইজ পাওয়া মমতাকে পুত্রবধূ হিসেবে নির্বাচন করলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই মেয়েটির গ্রহণযোগ্যতাকে সুকুমার সমেত বাড়ির কেউই মেনে নিল না। বাড়ীর লোকেদের প্রতি বিরক্ত হয়ে ডাক্তার পাত্রী খোঁজার দায়িত্ব তাদের হাতেই ছেড়ে দিলেন।

পরের দৃশ্যে আবার এসেছে তুলসী। এবার তার ভূমিকা অন্যরকম। রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়ে সে নিতাইদের সঙ্গে বচসা করছে। ডাক্তার শুনলেন পয়সা না পেয়ে সে সুকুমারের ঘরের দিকে ঢিল ছুঁড়েছে, নিতাইয়ের হাত কামড়ে দিয়েছে। তাকে তাড়িয়ে দেবার পরও ফটকের বাইরে থেকে কিছুক্ষণ ঢিল-পাটকেল ছুঁড়ে সে বিদায় হল। তিন-চার মাস ধরে তুলসীর এবাড়ীতে আনাগোনা লক্ষ করেছেন ডাক্তার। তার প্রবেশে বিশেষ নিষেধাজ্ঞা দিলেন তিনি। কিন্তু সেদিনই সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরার পথে আবার দেখা গেল তুলসীকে। এবার তুলসী রুদ্রমূর্তিতে নয়, চোরের মত পা-টিপে পালিয়ে গেল। ডাক্তার হাঁকডাক, বকাঝকা করে সুকুমারের ঘরে-বারান্দায় ঢুকলেন, আলো জ্বলছে সেখানে আর তাঁর নিজের ঘর তছনছ করে গেছে কে! আর কিছু নয়, পাওয়া যাচ্ছে না শুধু নতুন বেলেডোনার শিশিটা!

অবশেষে সুকুমারের প্রার্থিত পাত্রী পাওয়া গেল। সৌন্দর্যে তো বটেই, বংশে, শিক্ষায়, গুণে কোনো ত্রুটি নেই সেই মেয়ের। ডাক্তারকে শুধু আশীর্বাদ করতে যেতে হবে সেদিন। সেদিনই ডাক্তারের কাছে ময়না তদন্তের জন্য তিনটি লাস এসেছে। এই কাজ সেরে রেখে তিনি যাবেন ভাবী পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করতে।

লাসকাটা ঘরে রচিত হয় গল্পের শেষ দৃশ্য। প্রথম দুটি লাস আগুনে পোড়া, 'পচে পাঁক হয়ে গেছে'। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ডাক্তারি রিপোর্ট অকিঞ্চিতকর। তৃতীয় মৃতদেহের টেবিলের পাশে এসে তার ঢাকা খুলে নিতেই চমকে উঠলেন ডাক্তার। আর কারও নয়, ডাক্তারের কাছে যে মেয়েটি তার কুৎসিত দেহাবয়ব নিয়েও 'সুন্দরী তুলসী' — এই মন্তব্য ও বিশেষণ লাভ করেছিল, সেই অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী তুলসীর এমন অকালমৃত্যুতে ডাক্তার বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। তাঁর বেদনা তাঁকে এই মৃত্যুরহস্য উদ্ধারে আরও তৎপর করে তোলে। অধীত শাস্ত্রজ্ঞান অনুযায়ী তিনি মৃতার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধরে ধরে ব্যবচ্ছেদ ঘটিয়ে চলেন; মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে মাথার খুলি, বক্ষপঞ্জরের অলিগলি ধরে চলতে থাকে তাঁর নিপুণ হাতের ছুরি, সাঁড়াশি, চিমটে। চোখের পাতার আড়ালে অক্ষিগোলকের অবস্থা দেখে বোঝা যায় যে অনেক অশ্রু নিষিক্ত হয়েছে তুলসীর দুচোখ থেকে—'ইস মরার সময় মেয়েটা কেঁদেছে খুব'। যদু বিশেষজ্ঞের মতো মৃত্যুর কারণ বাতলে দেয়—হাঁ হুজুর, কাঁদবেই তো, সুইসাইড কিনা! করে ফেলে তো ঝোঁকের মাথায়। তারপর খাবি খায়, কাঁদে আর মরে।' কিন্তু বিচক্ষণ ডাক্তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গূঢ় কোনও চিহ্ন তল্লাশ করতে থাকেন। গলার স্বররজ্জু অনাহত, কণ্ঠরোধে মৃত্যু হয়নি। যদুই পথনির্দেশ করে এবার—'এ সবে কোনো জখম নেই হুজুর। পেটটা দেখুন।' পাকস্থলী দুভাগ করেই ডাক্তার দেখতে পেলেন কোথায় মৃত্যুর কামড়। বেলেডোনা (এ ক্ষেত্রে বিষ) মেশানো সন্দেশ ও পাঁউরুটির অজীর্ণ পিণ্ড থেকে মৃত্যুর কারণ আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু এতো প্রত্যক্ষ কারণ। আর কোন্ ইতিহাস লুকানো আছে অফুরাণ প্রাণশক্তির অধিকারী মেয়েটির অকালে ঝরে পড়ার পেছনে? বিশেষত ডাক্তারের ঘর থেকেই খোয়া যাওয়া বেলেডোনাই যে

মৃত্যু ঘটিয়েছে—তার সঙ্গে কোন্ সংশ্লেষে জড়িয়ে থাকতে পারে তুলসী? এ আত্মহত্যা নয়, হত্যা—কিন্তু কেন? 'উত্তেজনায় বুড়ো কৈলাস ডাক্তারের ঘাড়ের রগ ফুলে উঠল দপদপ করে। পোখরাজের দানার মত বড় বড় ঘামের ফোঁটা কপাল থেকে ঝরে পড়ল মেঝের ওপর।' আবার টেবিলের কাছে এগিয়ে এলেন ডাক্তার। তলপেটের বন্ধনী উন্মুক্ত করেই দেখা গেল—'পরিশঙ্কে ঢাকা সুডোল সুকোমল পেটিকা। মাতৃত্বের রসে উর্বর মানবজাতির মাংসল ধরিত্রী। সর্পিল নাড়ীর আলিঙ্গনে ক্লিষ্ট কুঞ্চিত বিষিয়ে নীল হয়ে আছে শিশু এশিয়া।' এই অনভিপ্রেত সন্তানের জন্ম সম্ভাবনা যার সামাজিক স্থিতি টলিয়ে দেবে, তারই প্ররোচনায় তুলসী বেলেডোনা মিশ্রিত খাবার খেয়েছে। জঠরের শিশুসন্তানসহ তলিয়ে গেছে মৃত্যুর অতলে। তুলসীকে সুকুমারের উদগ্র কামনার শিকার হিসেবে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যারা নিয়েছিল, তাদেরই সংক্ষিপ্ত সংলাপে গল্প শেষ করেন লেখক—'শালা বুড়ো নাতির মুখ দেখছে'।

'সুন্দরম' গল্পের শ্রেণী নির্ণয় করতে গেলে লেখকের নিজের একটি মন্তব্য স্মরণে রাখা জরুরী। "এই সৌন্দর্যের একটি লৌকিক সংস্কার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ একটি তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা এই গল্পে সৃষ্টি করা হয়েছে। বিশেষ করে শারীর সৌন্দর্যের সংস্কার সম্বন্ধে একটি কঠিন জিজ্ঞাসার নির্মাণ।" সুকুমারের পাত্রী নির্বাচনে যত বাছবিচার এবং উন্নাসিকতা, তাতে মনে হয় সে রূপতত্ত্বের প্রচলিত ধারণা ও সংস্কারে আত্যন্তিক বিশ্বাসী। সে মানব মনের একটি দিক। কিন্তু এরই অন্তরালে বাহ্যসংস্কারকে ডুবিয়ে দিয়ে সুকুমারের জৈব কামনার আগ্রাসী প্রেরণা প্রয়োজনের তাগিদে যে মেয়েটির দেহ ভোগ করেছে—তার জাতি-বংশ-মান-মর্যাদা তো দূরের কথা, তার চেহারা দেখলে 'দাতা কর্ণও দান ভুলে যায়'। এই যে ভাবনা এবং আচরণের বৈপরীত্য, এর মধ্যে থেকে একটি তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন লেখক। তাই গল্পটিকে তত্ত্বজিজ্ঞাসামূলক বলা যেতে পারে। তবে লেখকের মনোলোকে যে কঠিন জিজ্ঞাসা জেগেছিল, তাকে একটি বাস্তবসম্মত প্লটে শিল্পসম্মতভাবে রূপদান করেছেন বলেই একটি তত্ত্ব বহন করা সত্ত্বেও 'সুন্দরম্' শিল্পগুণান্বিত হয়েছে।

'সুন্দরম্' গল্পের climax বা চরম মুহূর্ত এসেছে একেবারে গল্পের শেষে। সুকুমার যদি তত্ত্বনিরীক্ষার বা বিশ্লেষণের মাধ্যম (গিনিপিগঙ্গ) হয়, নিরীক্ষক হলেন কৈলাস ডাক্তার। কৈলাস ডাক্তার দেহযন্ত্রের জহুরী। তাঁর চোখ মানুষের বাহ্যরূপের অন্তরালে, আপাতসৌন্দর্যের ভেতরে সত্য ও খাঁটি জৈব রূপকে চেনে। সেই চেনা থেকেই তিনি তুলসীর আপাত কুশ্রী রূপের প্রতি অবজ্ঞা না দেখিয়ে তার স্বাস্থ্যোদ্দীপ্ত রূপের প্রশংসা করেছিলেন। সুকুমারের ব্রহ্মচর্য নিয়ে বাড়ীর সকলে চিন্তিত হলেও তিনি ব্যঙ্গের সঙ্গে বলেছিলেন — 'প্রোটিনের অভাব। পেটে দুটো ভালো জিনিস পড়ুক, গায়ে মাংস লাগুক — এসব ব্যামো দুদিনেই কেটে যাবে।' তাঁর বিশ্লেষণ যে ভুল নয়, তার প্রমাণ — সুকুমার অচিরকালের মধ্যেই রীতিমতো সমঝদারের ভঙ্গিতে পাত্রী (যাচাই) পরিক্রমা করতে লাগল। এই ব্যাপারে কোনোরকম সমঝোতা করতে সে নারাজ। পাত্রী নির্বাচনে যে কয়েকমাস সময় লেগেছে, ততদিনও সুকুমারের ব্রহ্মচর্য অপেক্ষা করে ধৈর্য রাখতে পারেনি। হতকুৎসিত তুলসীকে ব্যাভিচারের খেলায় সামিল করেছে। পরিণামে তুলসী যখন অন্তঃসত্বা, তখন তাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছে। লাসকাটা টেবিলে নিজের বিশ্বাসকে সরেজমিন প্রত্যক্ষ করেছেন কৈলাস ডাক্তার। তুলসীকে ব্যবহার করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল কে? যেহেতু যদু ও নিতাইয়ের সঙ্গে তাকে বারবার মস্করা বা বাদানুবাদ করতে দেখা গেছে, তাই পাঠকের সন্দেহ প্রাথমিকভাবে তাদের ওপরেও গিয়ে পড়তে পারে। সেই সংশয় নিরসন করে পাঠককে আমূল বিমূঢ় করে দেয় যদু ডোমের উক্তি—'শালা বুড়ো নাতির মুখ দেখছে'। ছোট্ট এই কথায় নিহিত থাকে গল্পের মূল ভাববীজ। গল্প থেকে যায়। কিন্তু এই তথ্যসূত্র ধরেই পাঠকের চিত্তে চলতে থাকে অনুরণন। মানবচরিত্রের অনন্ত রহস্যসূত্র, তত্ত্বগতভাবে জীবনধর্মের বিচিত্র পথচারনা।

'সুন্দরম্' গল্পের বিশিষ্ট জীবনদর্শনটি কৈলাস ডাক্তারের জীবনদৃষ্টির মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে। শুধু শবব্যবচ্ছেদ নয়, লেখকের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি লাসকাটা ঘরের নিরীক্ষার প্রতীকে যেন সমাজব্যবচ্ছেদের কাজই

করেছে। সামাজিক বিবাহ সম্পর্ক বা বিবাহবন্ধনের ক্ষেত্রে মানুষ যেসব রীতি-নীতি-সংস্কার মেনে চলে, কার্যত তার অধিকাংশই জৈবিক সংস্কারের আনুগত্য করে না। সুকুমারের কৌমার্য ব্যাভিচারের পঙ্কে স্নান করে তুলসীকে হত্যা করার মতো নিষ্ঠুরতম পাপকর্ম ঘটে যায়। আর তার বিপরীতে এক সুন্দরী সুলক্ষণা কন্যাকে বধূরূপে বরণ করবার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়। সমাজের সাজানো সৌন্দর্যবিলাসী সভ্যতা-সংস্কৃতির ভিত্তিমূল কতোখানি দ্বিচারিতা ও মিথ্যার ওপরে প্রতিষ্ঠিত, তাই প্রকট হয়ে ওঠে।

'সুন্দরম্' গল্পের নামকরণে লেখক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'বিশেষ করে শারীর সৌন্দর্যের সংস্কার সম্বন্ধে একটি কঠিন জিজ্ঞাসার নির্মাণ'—লেখকের বয়ানে গল্পের এই প্রতিপাদ্য। ময়নাঘরের ডাক্তার কৈলাসের সৌন্দর্যদৃষ্টির সঙ্গে প্রথাগত সৌন্দর্যদৃষ্টির মিল নেই। বহুকালের অভ্যাসে তিনি সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছেন দেহের গভীরে—নাড়ী, ধমনী, পেশি, রক্তমাংসে বিন্যস্ত এক অভিনব অন্তরঙ্গ সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ হন। জামাতা কানাইকে তিনি সাধারণ মানুষের সৌন্দর্য ধারণার হেঁয়ালির কথা এইভাবে ধরিয়ে দেন— 'তোমাদের সুন্দরের তো মাথামুণ্ড নেই। ......চুল কালো হলে সুন্দর, আর চামড়া কালো হলে কুৎসিত। এই কথাটা কি মহাব্যোমে লেখা আছে শাশ্বত কালি দিয়ে? ....' বস্তুত, মানবিক সৌন্দর্যচেতনার স্রষ্টা সুবোধ ঘোষকে এক তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। কৈলাস ডাক্তার তারই প্রতিনিধিত্ব করেন। সেই সৌন্দর্যের সামনে নেই কোনো জাতি-ধর্ম, শিক্ষা-সভ্যতা, আছে শুধু জীবন। বহমান জীবনধারার অনিবার্য গতি এই সৌন্দর্যদৃষ্টির কাছে সব ভ্রূণই সুন্দর। সব ভ্রূণ সম্ভাবনাই সৃষ্টির পটভূমিকায় স্রষ্টার মত সৌন্দর্যশালী। অপূর্ব এই সৌন্দর্যচেতনাই কৈলাস ডাক্তারের নতুন সৌন্দর্যদর্শন। 'সুন্দরম্' গল্পে লেখকের ময়নাতদন্তের শেষে এই সুন্দরেরই প্রতিষ্ঠা। তাই গল্পটির নামকরণ যথার্থ ও সুপ্রযুক্ত।

'সুন্দরম্' গল্পের ভাষা সম্পর্কে অধিকন্তু বলার অপেক্ষা রাখে। ছোটোগল্পের ভাষায় যে ব্যঞ্জনা প্রত্যাশিত, বিবৃতির পরিবর্তে সঙ্কেতধর্ম নিয়ে তেমন ভাষাই, শব্দচয়নে ও বাক্যযোজনায় লেখক ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও এই গল্পের বিশেষ প্রয়োজনে বিশেষ এক ধরনের ভাষা তাঁর প্রয়োজন ছিল। সে হচ্ছে ময়নাঘরে লাসকাটার বিভিন্ন স্তরপর্যায়কে ফুটিয়ে তোলবার জন্য প্রয়োজনীয় ভাষা এবং পরিভাষা। ব্যবচ্ছিন্ন দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভাষা ও পরিভাষা খুঁজতে গিয়ে লেখক অ্যানাটমির পাঠ্যপুস্তকের আশ্রয় নিয়েছেন। বাংলা সাহিত্য এই অভিনব রূপের আশ্রয়ে যেমন হয়েছে প্রসারিত, তেমনি বাংলা শব্দভাণ্ডারকে বিস্তৃত ও সমৃদ্ধশালী করায় সুবোধ ঘোষের বর্তমান গল্পটির অবদান বিশেষভাবে স্বীকৃতিযোগ্য ঃ "খণ্ড স্ফটিকের মত পীতাভ ছোটো বড়ো কত গ্রন্থির বীথিকা। প্রশান্ত মুকুট ধমনীঙ্গ সন্ধিতে সন্ধিতে সুপ্রচুর লসিকার বুদ্বুদ। গ্রন্থিস্ফীরে নিষিক্ত অতি অভিরাম এই অংশুপেশীর স্তবক আর তরুণাস্থির সজ্জা। ঝাঁপিখোলা রত্নমালার মত আলোয় ঝলমল করে উঠল। ..... ছোঁ মেরে কাঁচিটা তুলে নিয়ে তুলসীর তলপেটের দুটো বন্ধনী ছেদ করলেন। নিকেলের চিমটের সুচিকণ বাহুপুটে চেপে নিয়ে স্নেহাক্ত আগ্রহে ধীরে ধীরে টেনে খুলে ধরলেন—পরিশস্কে ঢাকা সুকোমল এক পেটিকা। মাতৃত্বের রসে উর্বর মানবজাতির মাংসল ধরিত্রী। সর্পিল নাড়ীর আলিঙ্গনে ক্লিষ্ট, কুঞ্চিত, বিষিয়ে নীল হয়ে আছে শিশু এশিয়া।"

২.৩.৯.৩ : লেখক পরিচিতি—বিমল কর (১৯২১-২০০৩)

জন্ম ১৯২১-এ। কর্মসূত্রে বহুবিচিত্র ভৌগোলিক প্রেক্ষিতে বিভিন্ন জীবনযাপন দেখার অভিজ্ঞতা রয়েছে বিমল করের। কিন্তু বহির্লোকের বর্ণময়তার চেয়ে অন্তরজীবনের গভীরতম ও সূক্ষ্মতম আলোড়ন তাঁর লেখার মূল বিষয়। "গল্পের টান, গল্পের জাদু কখনোই তাঁর কাছে শেষ কথা নয়, গল্পের মধ্যে মননকে, তীব্র তীক্ষ্ণ নির্মোহ জীবনজিজ্ঞাসাকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। মানুষের অন্তরে যে জটিলতা, অন্তর ও বাহিরে যে সূত্র-সম্বন্ধ, নিঃসঙ্গ অন্তরজীবনের যে বেদনা ও অসহায়তা বোধ, এইসব বিমল

করের গল্পকে এমন এক স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে, যাকে কিছুতেই পূর্বতন ধারার অনুসৃতি বলে মনে হয় না।”...... বাংলা ছোটোগল্পে নতুন বা অন্যরকম কিছু লিখতে চেয়ে বিমল কর অন্তরের গহনলোকে প্রবিষ্ট হয়েছেন। নিরন্তর আত্ম-অতৃপ্ত জীবন-জিজ্ঞাসা নিয়ে মনন ও উপলব্ধির অতলে অন্বেষণ করেছেন জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। এক অনিবার্য বিষণ্ণতা প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে তাঁর লেখাতে। ‘গভীরতম’ আখ্যায় ভূষিত হন তিনি বাংলা কথাসাহিত্যের বিরল একজন লেখক হিসেবে। ‘ছোটোগল্প - নতুন রীতি’ নামে পত্রিকা সম্পাদনায় বিমল করের নতুন ভাবনা ও রীতির গল্প সম্পর্কে আগ্রহ ও সচেতন শিল্পবোধ প্রমাণিত। উপন্যাসে যেমন তিনি সিদ্ধহস্ত, তেমনই গল্পের ভুবনকেও তাঁর স্বাতন্ত্র্যদীপিত প্রতিভাস্পর্শে করেছেন কালজয়ী। নিষাদ, মানবপুত্র, সুধাময়, আত্মজা, সোপান, বরফ সাহেবের মেয়ে, উদ্ভিদ—বিমল করের অনেক উৎকৃষ্ট গল্পের মধ্যে কয়েকটি মাত্র। আনন্দ পুরস্কার, নরসিংহ দাস পুরস্কার ইত্যাদির সঙ্গে তিনি সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কারেও সম্মানিত।

২.৩.৯.৪ : জননী (বিমল কর)

গল্পটি লেখকের অন্যতম প্রিয় গল্প বলে জানিয়েছেন তিনি। চাকরিসূত্রে বিহারের কোনো সাঁওতাল-পল্লীতে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে তিনি একটি কুটিরের দেওয়ালে একটি ছবি চিত্রিত দেখেন। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে ঐ পরিবারে একটি ছোটো ছেলে অকালে মারা যায়। মৃত্যুর পর ইহলোক ছেড়ে পরলোকের যাত্রাপথ একাকী অতিক্রম করতে হবে ছেলেটিকে। সেই যাওয়াটুকু যাতে সহজ ও সুগম হয় তারই জন্য নিজেদের ইচ্ছা ও কল্পনা দিয়ে ছবিটি এঁকে রেখেছে ঐ অকালমৃতের প্রিয়জনেরা। গাধা কিম্বা ঘোড়ার পিঠে বসে রয়েছে বাচ্চা ছেলেটি, তার হাতের লাঠিটা কাঁধে, যার একপ্রান্তে বাঁধা রয়েছে হয়তো বা চিঁড়ে-গুড়ের পুটলি, অন্য প্রান্তে এক ঘটি জল। এই অন্তিম যাত্রাপথের পাথেয় সম্পর্কে চিন্তাটি লেখককে একই সঙ্গে বিষণ্ণ ও মুগ্ধ করে তুলেছে। ভাবিয়েছে অনেকদিন। তারপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত। ক্রমে শিল্পীমন যেভাবে এই প্রতীতিটিকে (impression) শিল্পরূপ দিলেন, তা-ই হয়ে উঠল একটি পূর্ণায়ত ছোটোগল্প-জননী।

যদিও সাধারণভাবে ছোটোগল্পে ভূমিকাপর্ব অগ্রহণীয়, তবুও ‘জননী’ তে একটু ভূমিকাকে স্থান দেওয়া হয়েছে। গল্পের অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে আমরা জানতে পারি মফঃস্বল শহরে এক বিঘের ওপর দোতলা বাড়ি ও পাঁচ বিঘের পাঁচিলঘেরা বাগান সমেত আবাসে অবস্থাপন্ন পরিবারটি দীর্ঘকালের বসবাস। প্রথম পুত্রের পর প্রথম কন্যা, তারপর দ্বিতীয় পুত্র, দ্বিতীয় কন্যা এবং পঞ্চম সন্তান কনিষ্ঠ বা ছোটো ছেলে ‘কড়ে’ কে নিয়ে একটি ভরাট সংসার। এই কনিষ্ঠ পুত্রের জবানীতে গল্পটি উপস্থাপিত। কথকের বলা ভূমিকায় পরিবারটির ওপরে নেমে আসা বেশ কয়েকটি দুর্বিপাকের কথা অত্যন্ত সংক্ষেপে ব্যক্ত হয়েছে।

বড় মেয়ে অনুপমা অসামান্যা রূপ থাকা সত্ত্বেও বিবাহিত জীবনে সুখী হতে পারেনি। দুশ্চরিত্র স্বামীকে ত্যাগ করে সে একলা চলে এসেছে পিতৃগৃহে, আর ফিরে যায়নি। দ্বিতীয় পুত্র দীনেন্দ্র এক ট্রেন যাত্রায় আচম্‌কা দুর্ঘটনায় দুচোখ হারিয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ। আকস্মিকভাবে সন্ন্যাসরোগে মৃত্যু হয়েছে পরিবারের কর্তা—বাবার। ছোটো মেয়েটি চঞ্চল ছটফটে স্বভাবের। স্বেচ্ছায় সে নানা সেবামূলক কাজে অতিরিক্ত পরিশ্রম করার ফলে অকালে স্বাস্থ্য হারিয়ে শয্যা নিয়েছে। এও পরিবারের স্বজনদের কাছে বেদনাবহ। আর সবশেষে যে শোকের ঘটনার কথা আমরা জেনেছি, সেই সাম্প্রতিক আঘাত হল মায়ের মৃত্যু—“এই ফাল্গুনের গোড়ায় মা চলে গেল। মা-র মাথার চুল সাদা হয়েছিল, গালের চামড়া দুধের জুড়ানো সরের মত কুঁচকে এসেছিল। কপালভরা দাগ আর আধপাকা ছানি চোখ নিয়ে মা বিদায় নিল। যাবার সময় দেখে গেল তার হাতের পাঁচটি আঙুলই একে অন্যের পাশে রয়েছে।”

এই মৃত্যুই গল্পের সূচনাবিন্দু—স্টার্টিং পয়েন্ট। মায়ের দেহ বারোয়ারী শ্মশানে না নিয়ে তাঁর সন্তানেরা বাগানের এক প্রান্তে দাহ করেছে। সেই জায়গায় শ্বেতপাথরের বেদী তৈরী করে সেখানে ধূপ-দীপ জ্বেলে মায়ের পাঁচটি সন্তান সমবেত স্মৃতিতর্পণের জন্য বসেছে। চৈত্রের বাতাস, অকলুষ চন্দ্রিমা, শোকশুদ্ধ আত্মাপঞ্চক আর বেদির মাথার কাছে এদের বাবার হাতের কদম গাছ — এই প্রেক্ষিত ও আবহে মায়ের দ্বিতীয় পুত্র মাতৃতর্পণের এক অভিনব প্রস্তাব রাখল। সকলে তাতে সম্মত হল, মনস্থির করল — "এ সংসারে মা কী পায় নি, কী অভাব তার ছিল, কী পেলে মা-র সে অভাব থাকত না, আমরা এখন তাই ভাবছিলাম। মা-র এই পরবর্তী যাত্রায় আমরা বোধহয় মাকে সেই জিনিস দিতে চাইছিলাম যা এখানে দিতে পারিনি।"

এর পরে প্রতিটি সন্তানের নিজস্ব চেতনে মায়ের যে ছবি ও ভূমিকা ধরা আছে তার নিরিখে একাগ্র হয়ে উঠল তাদের আপন-আপন সন্ধান। বড়ো ছেলেকে দিয়ে শুরু হল এই স্মৃতিতর্পণ। ভাইবোনেদের অনুনয়ে সে নিজের হৃদয়ে লুকানো মায়ের অপূর্ণতার ছবিখানি মেলে ধরেছে। বিবাহযোগ্য ছেলের জন্য অপূর্ব সুন্দরী কনককে মা পছন্দ করে রেখেছিল। কিন্তু ছেলেই এই বিয়ে ঘটতে দিল না। কারণ সে জানত যে তারই বন্ধু অবনী ও কনকের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্ক ভেঙে তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে চায়নি সে। হয়তো কনককে মনে মনে ভালোও বেসেছিল—কিন্তু তার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আত্মত্যাগের ঔদার্য দিয়ে সে পেরেছিল নিজেকে সরিয়ে নিতে। এই সিদ্ধান্তে মা অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছিল। কষ্টও পেয়েছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু মায়ের মনটি যদি তার বড়ো ছেলের মত উদার হত, যদি মা ভালবাসার পাত্রপাত্রীকে তাদের মন নিয়ে উপলব্ধি করতে পারত, তাহলে তার এই বেদনা নিয়ে তাকে ইহলোক ত্যাগ করে যেতে হত না। মায়ের বড়ো ছেলে মাকে হৃদয়ের ভালোবাসা তথা আত্মত্যাগ উৎসর্গ করল পরলোকের পাথেয় রূপে।

দ্বিতীয় সন্তান বড়ো মেয়ে অনুপমা। অনুপমার জীবনে এক অপ্রত্যাশিত ট্র্যাজেডি নেমে এসেছে। তার দুর্ভাগ্যের বোঝা চিরকাল অন্তহীন তাকে বয়ে চলতে হবে—এই প্রচলিত সমাজ সংসারের রায়। আজ স্মৃতিতর্পণে বসে এই ভাগ্যনিপীড়িতা সহোদরার মুখ থেকে তার একান্ত ব্যক্তিগত আরও তথ্য পেল তার ভাইবোনেরা। মা নাকি বড়ো মেয়ের স্বামীকে ছেড়ে চলে আসা ভালো মনে মেনে নিতে পারেনি। নানাভাবে, শুধু স্বামী বলেই তার কাছে ফিরে যাবার জন্য মেয়েকে বকাঝকা এবং জোর করত মা। কিন্তু তার বদলে মায়ের যা করা উচিত ছিল বলে অনুপমা ভেবেছে তা হল—সাহস করে তথাকথিত পারিবারিক মর্যাদা ও সমাজপ্রথার বিরুদ্ধে গিয়ে মেয়েকে দ্বিতীয়বার সৎপাত্রস্থ করা। কেননা—'সংসারে এমন মানুষ ছিল যে আমায় বিয়ে করত।' শুধুমাত্র মায়ের সাহসের অভাবেই তার একটি সন্তানের জীবন অন্ধকার হয়ে রইল। এই ব্যর্থতা কি মায়ের চরিত্রের এক শোচনীয় অপূর্ণতা নয়? এই অপূর্ণতাকে মুছিয়ে দিতে হলে যা দরকার তা উচিত সাহস। মায়ের জন্য অঞ্জলিতে তার বড়ো মেয়ে এই 'উচিত সাহস' সাজিয়ে দিয়েছে।

পরের পালা ছোটো মেয়ে নিরুপমার। অসুস্থ অবিবাহিতা মেয়েটি স্বভাবচঞ্চল বলেই হয়ত মনস্থির করতে একটু সময় নিয়েছে। তারপর খানিকটা অগোছালোভাবেই কথা শুরু করেছে। রোগশয্যায় শুয়ে সে যখন নিঃসঙ্গ ও হতাশ্বাস, তখন তাকে তার বন্ধুরা সঙ্গ দেবার জন্য আসত। "বেশী আসত সুশান্ত, প্রায় রোজই। অনেকক্ষণ থাকত। আমায় ভোলাবার চেষ্টা করত, বলত, এ অসুখ কিছুই না। ...... মা কেন জানি এটা পছন্দ করত না, একেবারেই নয়। ..... একদিন মা আমার সামনে সুশান্তকে বলল, তুমি তো ডাক্তার নও; কেন অযথা ওসব কথা বল। ওকে বকিও না, বিরক্ত করো না। .... সুশান্ত তারপর থেকে আর আসত না।" নিরুপমার অসুখের মধ্যেও সুখের সংকেত এসেছিল, ডাক্তারিশাস্ত্রে যে নিদান নেই সেই নিদানের সন্ধান এনেছিল সুশান্ত। নিরুপমার মনে আশ্বাস ও ভরসা দিতে তার এই যে নিয়মিত রোগীর কাছে আসা, তাকে ভালো মনে নিতে পারেনি তার মা। সুশান্তর উপস্থিতি মায়ের কাছে মূল্যহীন ছিল বলেই নিরুপমার

সুস্থ জীবনের সব ভরসা শেষ হয়ে গেছে। তাই, নিজের উপলব্ধি থেকে তার মনে হয়েছে মায়ের অসম্পূর্ণতা তার মতো করে সে খানিকটা পূরণ করে দিতে পারবে যদি সে 'ভরসা' করার শক্তি মায়ের পরবর্তী চলার পথে যুক্ত করে দেয়।

এরপর বলার জন্য তৈরী হয়ে নিল ছোটো ছেলে — এই গল্পের উত্তমপুরুষ - কথক। তার বলবার কথা, মাকে দেবার জন্য সে মনের কোন্ জিনিসটিকে তুলে আনবে। মায়ের শেষ সন্তান বলে সংসারের পরতে পরতে ঘিরে থাকা মাকে সে দেখতে পায়নি তার অন্যান্য দাদা-দিদিদের মত করে। ব্যক্তিগত একান্ত কোনো ঘটনা বা অভিজ্ঞতায় জড়িয়ে না থাকলেও মাকে সে একটা সুযোগে খুব কাছে থেকে চিনেছে। বাবার মৃত্যুর পর এই অনভিজ্ঞ ছোটো ছেলেটিকে সঙ্গী করে মায়ের বেনারস-যাত্রার মূল উদ্দেশ্য যে স্বামীশোকসন্তপ্ত মহিলাটির মন জুড়ানো নয় তা ততদিন বড় হয়ে ওঠা ছোটোছেলেও বুঝে ফেলেছিল। বহুকাল আগে বাবার সঙ্গে এক অংশীদারী ব্যবসার অংশীদার শচীনজ্যাঠা তখন কাশীতে। দুঃখ-দুর্ভাগ্যে-দারিদ্র্যে তখন শচীনজ্যাঠা সপরিবার সেখানকার সরু নোংরা পাতকুয়োয় গলা পর্যন্ত ডুবে। মা এতই হিসেবী ছিল, মাত্র দুশো টাকা ধরিয়ে দিয়ে ঐ যুগ্ম ব্যবসার অংশীদারীত্ব থেকে শচীনজ্যাঠার স্বত্ব বাতিল করিয়ে নিল। ছেলে এতে আপত্তি জানালে মা কঠোরভাবে তা খারিজ করে — "অত স্বার্থত্যাগ আমি শিখি নি।" মায়ের দীনতা, কৃপণতার পরিচয় পেয়ে মর্মাহত হয়ে রয়েছে তার কনিষ্ঠ সন্তান। তাই আজ জননীর পথের পাথেয় হিসেবে সে বলে — "আমায় যদি কিছু দিতে হয় আমি মাকে স্বার্থত্যাগ দেব।"

সৎকারে একজন সন্তানের কৃত্য এখনও বাকি। সে তৃতীয় সন্তান, দ্বিতীয় পুত্র দীনু। দীনেন্দ্রর নিয়তি অন্ধত্বের অভিশাপ বয়ে এনেছে তার জীবনে। প্রত্যক্ষভাবে কর্মজীবন বা সংসার জীবনে সে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট হতে পারেনি। কিন্তু তার অন্তর্জীবনটুকুর মধ্যে সে অত্যন্ত গভীর করে জীবনকে উপলব্ধি করেছিল। অন্তরের নিখাদ উপলব্ধি দিয়ে মাকে সে সঠিকভাবে বুঝে নিয়েছিল। সাংসারিক ঝড়-বাদল, বিষয়-আশয়ের কূটকচালি কীভাবে মাকে গ্রাস করে তার স্বচ্ছদৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল, তা দৃষ্টিহীন কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিবান দীনেন্দ্র জানতো। তাই দীনুর মাতৃঅর্ঘ্য—"আমাকে যেমন একটা নির্বোধ স্যুটকেসঅলা অন্ধ করে দিয়ে গেল, তেমনি মাকে এই সংসারের শনিতে অন্ধ করেছিল। মা যে কত অন্ধ আমি জানতাম। .... এই অন্ধ চোখ মাকে আর দিতে ইচ্ছে করে না। মা আমার হৃদয়ের চক্ষু পাক।"

'জননী' গল্পটির মূল কাঠামো আপাতদৃষ্টিতে মৃত্যুকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায় যে আসলে জীবন-পর্বে হওয়া বা হয়ে ওঠার কিম্বা হয়ে উঠতে না পারার একটি প্রতীকী গল্প 'জননী'। লেখকের একটি সাঁওতাল পল্লীর ছবি দেখার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তিনি কল্পনার স্তর বেয়ে এক দার্শনিক চেতনালোকে নিয়ে গেছেন পাঠককে। সেদিক থেকে দার্শনিক গল্পও বলা যায় 'জননী'কে।

লেখকের স্বকীয় ভাবজগৎ এবং মননের বিশিষ্ট ভঙ্গি জননী গল্পে প্রতিফলিত। মানুষের অন্তর্নিহিত তীব্র অসহায় যন্ত্রণাকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে গেছেন তার উত্তরণের ঠিকানাতে। এই পথ চলতে বিমল কর কখনও নির্দিষ্ট লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি। উপন্যাস রচনার দক্ষ কারিগর ভুলে যাননি ক্ষণেকের জন্যও যে তিনি ছোটোগল্প লিখতে বসেছেন। উদাহরণত বলা যায়, বড় মেয়ে অনুপমার ব্যর্থ বিবাহোত্তর জীবনে হয়তো প্রেম এসেছিল —এই বিষয়টি পল্লবিত হলে তা উপন্যাসের শাখাকাহিনী হতে পারত। কিন্তু মাতৃস্মৃতিতে একাগ্র সন্তানদের সৎকার এখানে মূল বিষয়। তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গটুকুর বাইরে লেখক একটি শব্দও গ্রহণ করেননি। এভাবেই প্রতিটি সন্তানের জীবনানুষঙ্গ উপলক্ষ্য হয়ে এসেছে, লক্ষ্য নয়।

'জননী'-গল্পের মহামুহূর্তটি ঘনিয়েছে দীনেন্দ্রর মাকে তার অন্তশ্চক্ষু দানের সঙ্গে সঙ্গেই। সব

ছেলেমেয়ের তর্পণের উপসংহার যেন রচিত হয়েছে। সদ্যোমৃতা মায়ের অন্তিম সৎকার এভাবেই শেষ হয়েছে।

যদিও একটি সম্পর্ক-সংকেতে গল্পের নামকরণ, কিন্তু গল্পটি চরিত্রমুখ্য নয়, ভাবমুখ্য। আমাদের পার্থিব জীবনে পরমায়ুকাল সমাপ্ত করে প্রত্যেকেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাই। এই জীবনে আমাদের সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতাগুলি সম্পর্কে আমরা নিজেরা প্রায়শই সচেতন থাকি না। অথচ আমাদের একান্ত আপনজনেদের বিচারে তা ধরা পড়ে। সেই নিরীখটি থেকেই মায়ের সন্তানেরা তাদের আটপৌরে মাকে এক নির্দোষ পূর্ণাঙ্গ আদর্শ জননীরূপে পরলোকের পথে এগিয়ে দিতে চেয়েছে। যেন এক বৃত্তাকার সুসম্পূর্ণ জীবনমালিকায় গেঁথে দিয়েছে এক একটি পবিত্র পুষ্প। মা তখন হয়ে উঠেছেন জননী, মহিমময়ী। এই ভাবনা থেকেই গল্পটির নামকরণ।

২.৩.৯.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ‘‘সুবোধ ঘোষের ‘সুন্দরম্’—গল্পটি নানা দিক থেকে অভিনবত্বের দাবি রাখে।’’—এই অভিমতটির গুরুত্ব বিচার করো।

২। সুবোধ ঘোষের ‘সুন্দরম্’—গল্পের নামকরণের ক্ষেত্রে লেখকের অন্তর্দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য কোথায় তা গল্প ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বুঝিয়ে দাও।

৩। সুবোধ ঘোষের ‘সুন্দরম্’-এ আমাদের নান্দনিক চেতনা কীভাবে তির্যক দৃষ্টিতে প্রদর্শিত আলোচনা করো।

৪। ‘জননী’ গল্পটিতে লেখকের জীবনদর্শন কিভাবে প্রভাবিত করেছে তা আলোচনার দ্বারা ব্যক্তি করো।

৫। পাঁচ সন্তান তাদের আত্ম অনুসন্ধানের আলোয় কীভাবে ও কেন মৃত জননীকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছে, ‘জননী’ গল্প অবলম্বনে তা বুঝিয়ে দাও।

৬। বিমল করের ‘জননী’ গল্পটিতে ভিতরের দৃষ্টি বলতে কী বোঝানো হয়েছে—আলোচনা করো। আপাতদৃষ্টিতে মধ্যবিত্ত জননীর কার্যকলাপ অমানবিক হলেও শেষপর্যন্ত তা অন্য একটি দৃষ্টিকোণ খুঁজে পায়—কীভাবে?

পর্যায়গ্রন্থ - ৩

একক - ১০

বিন্যাসক্রম :

২.৩.১০.১ : লেখক পরিচিতি—রমাপদ চৌধুরী (১৯২২-২০১৮)

২.৩.১০.২ : ভারতবর্ষ (রমাপদ চৌধুরী)

২.৩.১০.৩ : লেখক পরিচিতি—অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১৯)

২.৩.১০.৪ : রাজার টুপি (অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়)

২.৩.১০.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.৩.১০.১ : লেখক পরিচিতি—রমাপদ চৌধুরী (১৯২২-২০১৮)

জন্ম ১৯২২ এ। খড়গপুর রেলকলোনীতে শৈশব কাটলেও পড়াশোনা প্রেসিডেন্সি কলেজে, কলকাতায়। কিছুকাল জীবিকা বা চাকরির প্রয়োজনে বাইরে থেকেছেন। কিন্তু মূলত সাহিত্যকর্ম ও সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনায় তাঁর পরিতৃপ্তি ও পরিচিতি। 'লালবাঈ' এর মতো ঐতিহাসিক কথা নিয়ে রোমান্টিক উপন্যাস, 'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ' নামে প্রকৃতি জগতে মিশে থাকা মানুষের কথা নিয়ে লেখা, সমকালীন যুবক-যুবতীদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে 'এখনই' — রমাপদ চৌধুরীর ভাবনার বিস্তার সম্পর্কে পাঠক এইসব লেখা পড়ে শ্রদ্ধাশীল হয়েছে। ছোটোগল্প এই লেখকের আর এক মাধ্যম। এতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। লেখার উপকরণ নিয়ে কোনো শুচিবায়ু নেই তাঁর। অসংখ্য লেখা অনর্গল তাঁর হাত থেকে বেরোয় না ঠিকই, কিন্তু যা লেখেন তাই শ্রেষ্ঠত্বের তকমা পেয়ে যায়। দরবারী, রেবেকা সোরেনের কবর, দিনকাল, ড্রেসিং টেবিল ইত্যাদি বিখ্যাত গল্পের সঙ্গে ভারতবর্ষ গল্পটিতেও জড়িয়ে আছে লেখকের গভীর বীক্ষণ, সমাজচেতনা ও মনন। লেখক আনন্দ পুরস্কার ও রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত।

২.৩.১০.২ : ভারতবর্ষ (রমাপদ চৌধুরী)

এই গল্পের কালিক প্রেক্ষিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়। স্থান রাঁচী-রামগড় রেলপথের ওপরে এক দেহাতী দরিদ্র, অনালোকিত গাঁ। অল্প কয়েক ঘর মাহাতোদের বাস সেখানে। পার্বত্য অঞ্চলের রুক্ষ ধূসরতা, মহুয়ার বন, খয়েরের ঝোপ, জলচুয়ানো ঝর্ণা ও মাহাতো-গাঁয়ের সবুজ ক্ষেত। সেখানকার মানুষ গুল্‌তি বা তীরধনুক নিয়ে খাটাশ মারে, নাটুয়া গান শোনে, হাঁড়িয়া খায়, খেতখামারে কাজ করে, ধনুকের ছিলার মত কখনো টানটান হয়ে রুখে দাঁড়ায়। এই ঋজু বলিষ্ঠ জীবন আর এই পার্বত্য অরণ্যপ্রকৃতি—দুইয়ে মিলে এক ক্লাসিক মহিমা সৃষ্টি করেছে।

তার বিপরীতে BF ৩৩২ আন্ডা হল্ট যেন যুদ্ধদীর্ণ আতঙ্কিত আজকের মানুষের নিয়ত সংগ্রামশীলতার একখানি নিষ্ঠুর দলিল। এই রেলপথে চিরকালই ট্রেন চলতো। সারাদিনে গুটি দুই প্যাসেঞ্জার ট্রেনের আসা-যাওয়া, মালগাড়ী কখনো। আবার সাম্প্রতিক কালের যুদ্ধের কারণে যুদ্ধবন্দী ও সৈন্যদের বহন করে স্পেশাল ট্রেনও যাতায়াত করছিল। এর মাঝে সংযোজন হল আন্ডা হল্টের। সৈন্য ও বন্দীদের প্রাতঃরাশ দেবার ব্যবস্থা হল মাহাতো গাঁ সংলগ্ন একটি জায়গায় হল্ট স্টেশনের সাময়িক পত্তন করে। ঠিকেদারের

অধীনে নিযুক্ত জনাচার কর্মচারী পূর্বনির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনে প্রস্তুত থাকত ব্রেকফাস্টের উপকরণ সমেত। ট্রেনভর্তি আরোহীর পাঁউরুটি, কফি, জোড়া ডিমসেদ্ধ। ছাড়ানো অসংখ্য ডিমের খোলার স্তূপ থেকেই হল্টের নাম আন্ডা হল্ট। আর ব্রেকফাস্টের প্রথম দুটি অক্ষর BF।

কিন্তু পাশাপাশি এই দুই বিপরীতধর্মী জীবনধারা কতদিন চলতে থাকা সম্ভব? মাহাতো গাঁয়ের সরল-সাধারণ প্রকৃতির সন্তানগুলি একটু একুট করে সংক্রমিত হতে থাকে যান্ত্রিক জগতের টানে। একজন দুজন করে তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। উৎসুক জনতার প্রতি দাম্ভিকের দাক্ষিণ্য প্রথমে ব্যর্থ হলেও বেশিদিন মাহাতো-গাঁ তার চারিত্র্যশক্তি ধরে রাখতে পারে না। শুধু একজন মানুষ, মাহাতোবুড়ো চাষ-আবাদ ছেড়ে, মাটির মানুষ মাটি মা-র কোল ছেড়ে বাণিজ্যিক হাতছানিতেও ধরা দেয়নি। ঠিকেদারের কর্মচারীর কাছ থেকে আসা প্রস্তাব — চিংড়ি, সরপুঁটি, মৌরলা বা ক্ষেতের সব্জি বিক্রির কথা প্রত্যাখ্যান করে সে বলে — 'খেতির কাজ ছেড়ে যাব নাই'। ওই লাইনের ওপর দিয়ে আরো ট্রেন যায়। সেগুলি আন্ডা হল্টে দাঁড়ায় না। গ্রামের লোকেরা বুঝে যায় যে সৈনিক ও যুদ্ধবন্দীদের ট্রেনই শুধু আন্ডা হল্টে থামে। তখনই শুধু লাইনের ধারে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে এসে দাঁড়ায় তারা।

ট্রেন আসে। সৈনিকেরা ব্রেকফাস্টের জন্য নেমে দেখে প্রকৃতির অপার্থিব সম্ভার এবং একই সঙ্গে তার বিপরীতে দেখে কাঁটাতারের ওপারে নেংটি ও খাটো শাড়ি পরা 'কালো কালো সরু সরু' শ্রীহীন স্ত্রী-পুরুষের সারি। হয়তো সহানুভূতি বা করুণায়, কিছুটা বা অহংকারে প্রথম একদিন এক আমেরিকান সৈনিক তার পকেটের মানিব্যাগ থেকে একটি চক্‌চকে আধুলি ছুঁড়ে দিয়েছিল। বিস্মিত লোকগুলি ট্রেন চলে যাবার পর ফিরে যাচ্ছিল। কারণ তাদের অভিজ্ঞতায় অনুগ্রহ দান ও অনুগ্রহ ভিক্ষা — এই ব্যাপারগুলি একেবারেই বেমানান। তাই এই হতদরিদ্র লোকগুলির চোখে আধুলির জন্য সামান্য আগ্রহও দেখা যায় না। কিন্তু 'বকশিস'—অনুগ্রহের দান সম্পর্কে তাদের চেতনা হয়। ক্রমে দেখা যায় যে সৈনিকদের ট্রেন আসছে টের পেলেই তারা কাঁটাতারের বেড়ার ধারে এসে ভিড় করতে শুরু করে। এমন কি উচ্চস্বরে সমবেত কণ্ঠে চেঁচায় —"সাব বকশিস, সাব বকশিস" খুচরো পয়সা ছুঁড়ে দেয় আমেরিকান সৈনিক। ট্রেন চলে গেলে লোভার্ত জনতা—মেয়ে পুরুষ নির্বিশেষে ঝাঁপিয়ে পড়ে রূপালী চাক্‌তির ওপরে। তখন একটিমাত্র বৃদ্ধ মাহাতো টাঙি জুতোর ওপরে শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে দৃঢ় প্রতিবাদ করে। তার গাঁয়ের মানুষদের স্বকীয় বৃত্তে ফিরিয়ে আনতে চেয়ে বলে ওঠে—"খবরদার।" কিন্তু এই বুড়োর কথা কেউ শোনে না। কারণ ততক্ষণে সেই মাহাতো-গাঁয়ের লোকেদের ওপরে নেমে এসেছে, অবক্ষয়ী লোভ। বুড়োর নিষেধ অগ্রাহ্য হয়, মুহূর্তে অদৃশ্য হয় সমস্ত ভিক্ষার দান।

এরপর এই ভিক্ষাবৃত্তি, যার জন্ম লোভ থেকে, তা ক্রমে উদ্ধত উলঙ্গ রূপ নেয়, তার কুশ্রিতা, হীনতা, জঘন্যতা সৈনিক ও অফিসারের মন্তব্যে ধরা পড়ে — অফুল, ব্লাডি বেগার্স। এই গল্পে ঠিকেদারের কর্মচারীরূপে উত্তম পুরুষ কথকের আহত চেতনা ক্ষোভ, রোষ ও অভিমান নিয়ে একমাত্র সান্ত্বনার আশ্রয় খোঁজে। ভিক্ষার্থীর ভিড়ে অনুপস্থিত মাহাতো-বুড়োর স্বাধীন সত্তার মধ্যে সেই আত্মসম্মানবোধের আশ্রয়। লেখক ভাবতে ভালোবাসেন "বুড়োটা ক্ষেতে দাঁড়িয়ে একা একা মাটি কোপাচ্ছে।" এই মাহাতো গাঁয়ের স্বধর্মভ্রষ্ট মানুষগুলির দিকে হতাশ চোখে তাকিয়ে লেখক শুধু অনুপস্থিত বৃদ্ধটির কথা ভেবে মনে মনে গর্ববোধ করতেন।

অবশেষে 'বন্দরের কাল হল শেষ'। আন্ডা হল্টের প্রয়োজনীয়তা ফুরোল, আর সেখানে ব্রেকফাস্ট রেডি রাখার দরকার নেই এই নির্দেশ পেয়ে ঠিকেদারের দল পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে নিচ্ছে। এমন সময় একটি সৈনিক বোঝাই ট্রেন আসতে দেখে গ্রামের সব লোক হাত বাড়িয়ে দিয়ে চিৎকার শুরু করল। এবং সেই ভিড়ের মধ্যে সেদিন দেখা গেল মাহাতো বুড়োকেও। সেও আর সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়েছে—"সাব

বখশিস”। তারা কেউ জানত না যে ট্রেন আর কোনদিন ওখানে থামবে না। “ফিরে তাকিয়ে দেখি ট্রেনটা বাঁক নিয়ে আন্ডা হল্টের দিকেই আসছে, জানালায় জানালায় খাকী পোশাক।”

আমরা বিব্রত বোধ করলাম, আমরা অবাক হলাম। তা হলে কি খবর পাঠাতেই ভুলে গেছে ভুরকুন্ডার আপিস? না, যে খবর শুনে এসেছি সেটাই ভুল?

ট্রেনটা যতই এগিয়ে আসছে ততই একটা অদ্ভুত গমগম আওয়াজ আসছে। আওয়াজ নয়, গান। একটু কাছে আসতেই বোঝা গেল সমস্ত ট্রেন, ট্রেন-ভরতি সৈনিকের দল পরস্পরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গলা ছেড়ে গান গাইছে।

বিভ্রান্তের মত আমি একবার ট্রেনটার দিকে তাকালাম। একবার কাঁটাতারের ভিড়ের দিকে। আর সেই মুহূর্তে চোখ পড়লে সেই মাহাতো বুড়োর দিকে। সমস্ত ভিড়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে মাহাতো বুড়োও হাত বাড়িয়ে চিৎকার করছে, সাব বকশিশ, সাব বকশিশ! উন্মাদের মতো, ভিক্ষুকের মতো তারা চিৎকার করছে। তারা এবং সেই মাহাতো বুড়ো। কিন্তু আমেরিকান সৈনিকদের সেই ট্রেনটা অন্য দিনের মতো এবারে আর আন্ডা হল্টেট এসে থামল না। প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলোর মতোই আন্ডা হল্টকে উপেক্ষা করে হুস করে চলে গেল।”

‘ভারতবর্ষ’ গল্পটিকে দেশ ও সমাজভাবনাশ্রয়ী গল্প বলা যায় ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে চিহ্নিত হয়ে আছে অসংখ্য তারিখ। কিন্তু ঐতিহাসিক গবেষণালব্ধ সেইসব সন তারিখ যার হদিশ দিতে পারে না, তাকে সত্যের অক্ষরে মানব অনুভূতির নিরিখে অভিব্যক্তি দেন সাহিত্যস্রষ্টা। ভারতবর্ষের সমাজজীবন তার চিরন্তন কৃষিসভ্যতা থেকে অনিবার্য ক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে কেমন করে উৎপাটিত হয়েছে তার একটি প্রতীকী চিত্র এই গল্পে।

মানবতার যে সংজ্ঞা, মনুষ্যত্বের যে মর্যাদাবোধ শান্ত-সহিষ্ণু সাধারণ ক্ষেতে খেটে খাওয়া মাহাতো গাঁয়ের মানুষদের স্বভাবধর্মের মধ্যে ছিল, বহির্বিশ্বের কলুষ স্পর্শে এসে, এক পরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়ে তারা যেন তার কাছে হেরে যেতে থাকল। বিজ্ঞান বলে, দুর্বলের মধ্যে রোগ সংক্রমণ ঘটে তাড়াতাড়ি। কার্যত দেখা গেল, কচি ছাড়ানো ভুট্টার মতো নিষ্পাপ সরল হাসিমুখ ছেলেটি, যার পরণে নেংটি, লোহার টুকরো বাঁধা ঘুনসি কোমরে পরে যে প্রকৃতির কোলের শিশুটির মতো মহিষের পিঠে চড়ে নিঃশঙ্ক বিচরণ করত, তারও চোখে ক্রমে ঘনিয়ে উঠেছে লোভ ও শঙ্কা। রাহুর করাল গ্রাসের মধ্যে ক্রমশ মাহাতো গাঁয়ের সমস্ত লোক আত্মবলি দিয়েছে। কিন্তু তখনও একটি মানুষ ছিল, ভারতবর্ষের নিষ্কাম কর্মযোগ সহজাতভাবেই যার অস্তিত্বে মিশে ছিল। আত্মার সুমহান গৌরবকে সে ধরে রেখেছিল একাই।

কিন্তু কতদিন? সভ্যতার বিষদাঁত, যান্ত্রিকতার অভিশাপ, মূল্যবোধের অবক্ষয় মাহাতো গাঁয়ের প্রতিটি বায়ুস্তরকে বিষিয়ে দিতে দেরি করে না। শেষ দৃশ্যে দেখি, বখশিশলোভী উন্মত্ত ভিক্ষার্থী জনতার সঙ্গে আত্মবিক্রয়ের অংশীদার হয়ে হাত বাড়িয়েছে মাহাতোবুড়োও। যেন সেই শান্তিময় কামনাশূন্য নির্বিরোধ পৃথিবীর সীমা লঙ্ঘন করে কন্টকিত যুদ্ধ ক্ষত বিক্ষুব্ধ জীবনে আত্মাহুতি দিয়েছে মাহাতো-গাঁয়ের শেষ মানুষটিও।

‘ভারতবর্ষ’ গল্পটির উপস্থাপনা ও বর্ণনাভঙ্গিতে লেখক কুশলী কলাকারের মতই ছোটোগল্পের উপযোগী ব্যঞ্জনাধর্মিতা এবং একমুখিনতা রক্ষা করেছেন। মাহাতো বুড়োকে আদিম কৃষিপ্রাণ প্রতিনিধি হিসেবে স্বল্পাক্ষরে সার্থক রূপ দিয়েছেন। নাগরিক জীবন থেকে অনেক দূরে প্রকৃতির কোলের মাঝখানে গল্পের প্রেক্ষিত মাহাতো গাঁ। তাকে ঘিরে বেড়া তৈরী হল কাঁটাতারের। এপারে রেল চলাচল, যুদ্ধবন্দী ও সৈনিকদের আনাগোনা, ওপারে মহাকাব্যের যুগের প্রাকৃতিক মানুষ Other side of the Hedge-এ

প্রকাশিত ফ্রস্টারের বিখ্যাত দর্শনেরই আর এক রূপ। দেশের গ্রামীন অর্থনীতি ভেঙে পড়ার বিধ্বংসী ছবিটি যেখানে সমাপ্ত হয়েছে, সেখানেই গল্পের চরম ক্ষণ, গল্পের শেষও। পুরোনো যা কিছু, তার শেষ বলতে আর কিছু থাকল না। ক্ষেতিতে চাষ করা সব মানুষগুলি ভিখিরি হয়ে গেল। এই দৃশ্য আরও তীব্র ও মর্মদাহী হয়ে উঠেছে ট্রেনটি না থামাতে। ট্রেনের চাকায় যেন নিষ্পিষ্ট হয়ে গেল মাহাতো-গাঁ তথা প্রতীকী ভারতবর্ষ তার যাবতীয় ঐতিহ্য সমেত।

গল্পের নামকরণে ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতাকেই ব্যঞ্জিত করতে চেয়েছেন লেখক। নির্লোভ, ত্যাগী ও কর্মব্রতী ভারতাত্মার সুমহান গৌরব 'ভারতবর্ষ নামে ধরা আছে। আজকের খণ্ডিত ও স্খলিত ভারতের জন্য বেদনাবোধ এই গল্পপাঠক সমস্ত ভারতীয়েরই অনিবার্য উপলব্ধি।

২.৩.১০.৩ : লেখক পরিচিতি—অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১৯)

জন্ম ১৯৩৪ সাল। অবিভক্ত ভারতের পূর্ববাংলায় জন্মেছিলেন। দেশ-ভিটেমাটি ছেড়ে এসে শৈশব থেকে প্রথম যৌবন পর্যন্ত অসম্ভব কষ্টে, গ্লানি, বিমুখতা সহ্য করে কেটেছে। কিন্তু শত ঝঞ্ঝা তাঁর অস্তিত্বের গভীরে থাকা মানুষটিকে বিপর্যস্ত করতে পারেনি। কত বিচিত্র পেশায় অভিজ্ঞতার দিগন্ত বিস্তৃত হয়েছে তাঁর। কখনো নাবিক রূপে সারা পৃথিবী পর্যটন, তো কখনও ট্রাক-ক্লীনারের কাজ। কখনও কারখানার ম্যানেজার, কখনো বা প্রকাশনা সংস্থার উপদেষ্টা। শিক্ষকতা করেছেন প্রাইমারি স্কুলে, হেডমাস্টারের দায়িত্বও পালন করেছেন। শেষ পর্বে সাংবাদিকতার জগতে তাঁর কর্মজীবন স্থিতিলাভ করে। এরই পাশাপাশি রচিত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়ে ওঠা অন্য এক রীতির গদ্যশৈলী। 'তাঁর গল্প পড়লে অনুভব করা যায় — তিনি না পলাতক, না উদাসীন। তাঁর চরিত্রগত গুণটিই হল মমতা, সমবেদনা, উদ্বিগ্নতা নিয়ে এই সমাজ ও সংস্কারকে দেখা।" নিজের লেখা গল্প সম্পর্কে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—গল্পগুলির মধ্যে যেমন মানবিক সম্পর্ক এবং সঙ্কটের কথা আছে, তেমনি আছে দায়হীন, দিশাহীন সমাজের কথাও।" উপন্যাস রচনায় অতীন সিদ্ধহস্ত। সমুদ্রমানুষ, নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে, অলৌকিক জলযান—মহাকাব্যপ্রতিম রচনা। আবার অজস্র ছোটোগল্পেরও রচয়িতা তিনি। রাজার টুপি, সাদা অ্যাম্বুলেন্স, নীল চোখ, ইহকাল বা মানুষের ব্যাভিচারের মত গল্প মানুষ চিরকাল মনে রাখবে। ছোটো বড়ো অনেক পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন এ পর্যন্ত। তার মধ্যে পড়ে মাণিক স্মৃতি পুরস্কার, বিভূতি স্মৃতি পুরস্কার, ভুয়ালকা পুরস্কার, বঙ্কিম পুরস্কার, তারাশঙ্কর স্মৃতি, মতিলাল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার, সর্বোপরি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার।

২.৩.১০.৪ : রাজার টুপি (রমাপদ চৌধুরী)

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় 'রাজার টুপি' গল্পে এক মধ্যবিত্ত মানুষ সতীশের সঙ্কটের রক্তাক্ত ছবি এঁকেছেন। একদিকে মানবিক মূল্যবোধে ঋদ্ধ তার অন্তর — অন্যদিকে সংসার ও কর্মক্ষেত্রের অপরিমেয় দাবির সামনে পড়ে' সেই মূল্যবোধের সঙ্গে আপোশ করতে বাধ্য হওয়া। তার প্রতিক্রিয়া থেকে মনের স্থিতি ও ভারসাম্য বিচলিত হয়ে যায়। যেমন হতে, যেমনটি থাকতে চায় সে, তেমন থাকা যায় না কিছুতেই। পরিস্থিতির হাতে বন্দী, স্বাধীনতাহীন এক মধ্যবিত্ত মানুষের মর্মবিদারী অসহায়তার কথাই ব্যক্ত হয়েছে 'রাজার টুপি' গল্পে।

সতীশ একজন শিক্ষিত, বিবেকবোধ এবং অনুভূতিসম্পন্ন ভদ্রলোক। একসময়ে সে ও তার স্ত্রী দুজনেই শিক্ষকতা করত কোনো মফঃস্বলে। তাদের দুটি শিশুসন্তান — কন্যা মিন্টু, পুত্র বাবুল। সুরমা কী

একটা অসুখে প্রায় শয্যাশায়ী, সংসারের হাল ধরে রাখার শক্তি তার রুগ্ন শরীরে সে পায় না। সতীশ এখন শিক্ষকতা ছেড়ে বড়ো শহরে এসে এক কোম্পানীর ম্যানেজারের কাজ নিয়েছে। এক বিশাল প্রাসাদোপম বাড়ির এক ফালি অংশ ভাড়ানিয়ে থাকে তারা। মস্ত বাগানবাড়ির মধ্যে আতঙ্ক হয়ে মনে জেগে থাকে একটি প্রকাণ্ড জলাশয়। রুগ্না মাকে এড়িয়ে দুষ্টু বাবুল যে-কোনোদিন জলে পড়ে গিয়ে চরম দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। এই আতঙ্কে কাঁটা হয়ে থাকে তার বাবা-মা।

অন্যদিকে সতীশের বৃদ্ধ পিতা-মাতা এবং অবিবাহিত বোনের, ছোটো ভাইদের একটি বড়ো দায়িত্ব সতীশ এড়িয়ে যেতে পারে না। অন্যদের তুলনায় তার চাকরির আয় সামান্য বেশি বলে তার মুখ চেয়ে থাকেন বাবা। বাড়িতে নিয়মিত টাকা পাঠানোর পরিমাণে সামান্য সংকোচন হলেই কড়া ভাষায় চিঠি আসে। বড়ো ভাই যতীন রেলে সামান্য চাকরি করে বলে তার প্রতি পিতৃদেবের সহানুভূতি। পুত্রসন্তানের পথ চেয়ে যতীন সম্প্রতি ষষ্ঠ কন্যার জন্ম দিয়েছে। এতে তাঁর কোনো বিরূপতা নেই। শুধু সতীশকে লক্ষ করেই তাঁর অব্যর্থ তীরগুলি নিক্ষিপ্ত "তুমি অবিবেচক হয়ে পড়েছ।....এই বৃদ্ধ বয়সে অনাহারে দিনযাপন করতে হবে ভাবলে কষ্ট লাগে। কল্যাণীর সম্বন্ধ এসেছিল। পাত্রপক্ষ কলকাতায় তোমার বাসার কাছেই থাকে। পাত্রপক্ষের খোঁজখবর নেবে। নিম্নে ঠিকানা দেওয়া থাকল।" সতীশের কোম্পানীর অবস্থা খারাপ হবার দরুণ তার রোজগার কমে গেছে একথা তার পরম আত্মীয়ও বুঝতে চান না।

এই সবের ওপরে আছে সতীশের অফিসের বিচিত্র জটিল অবস্থা। মালিক ও শ্রমিকের মাঝখানে সতীশের অবস্থান যেন শাঁখারির করাতের ওপরে। ভিন্নমুখী পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে সতীশ যে বন্দীর জীবনপীড়া ভোগ করতে থাকে তার নিপুণ চিত্র রয়েছে গল্পে।

'জলের মত রঙ ছিল সেদিন আকাশের।....পাখী ডাকছিল আকাশে। ভোরের সূর্য উঠে আসছে।' —এই উদীয়মান সূর্যের ঘড়ি গল্পের আরম্ভকাল। নিস্তরঙ্গ সকালটিতে ছোট্ট শিশু একলা একলা তার বাবার রথের মেলায় কিনে দেওয়া চারকামরার কাঠের রেলগাড়ি নিয়ে খেলছে। বড়ো চোখ বাবুলের। হাসলে গালে টোল পড়ে। কালো রঙ। মুখের ভিতর চোখ দুটোই সার। ছোটো করে ছাঁটা চুল এবং মুখশ্রীতে কেমন যেন জাদু আছে।

আত্মজের দিকে তাকিয়ে সতীশ স্বাভাবিক প্রসন্নতায় শুরু করতে পারল তার সকালবেলাটা। কেননা 'ভোর হলে সূর্য আপন মহিমায় যেমন আকাশে উঠে আসে, এই বাবুল, ছোট্ট বাবুল, দাপাদাপি করে এই সংসার ভরে তুলছিল।' পড়তে বসতে বলায় মায়ের সঙ্গে তার মান অভিমান। বাবা তাকে রাজার টুপি কিনে দেবে বলেও দেয়নি—এই তার না-পড়ার অজুহাত। ইতিমধ্যে বেলা গড়িয়ে যায়। সতীশকে সুরমা পড়তে দেয় বাবার সেই মোক্ষম চিঠিটি, অফিসে বেরোবার আগে স্মরণ করিয়ে দেয় কালো শ্যাওলাঅলা ভয়ঙ্কর জলাশয়ের কথা। বাবা হিসেবে ছেলেমেয়েকে সতীশ যেন নিষেধ করে যাট দুপুরে বেরোতে। অসুস্থ বলেই নিজে যেন সে নিয়ন্ত্রণের ভরসা পায় না। আর 'একটা জলাশয়ের দৃশ্য সতীশকে কেমন ভীত বিহ্বল করে রাখে। অফিসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে সতীশ। পথে এক প্রাচীন কুষ্ঠরোগী নারীকে নিয়মিত ভিক্ষা দেয়। পেছনে পড়ে থাকে তার ওতপ্রোত দায়িত্ব — সংসার —। পাখীর মত গলায় কে যেন বলে — 'বাবা তুমি আমায় রাজার টুপি কিনে দেবে না? তুমি আমাকে বড়ো মাঠে নিয়ে যাবে না?'

এরপর অফিস। সেখানে শুরু থেকেই নানারকম সঙ্কট ও সংঘাত। অত্যন্ত সচেতন থেকে, মাথা ঠাণ্ডা রেখে সাবধানে বিষয়গুলি নাড়াচাড়া করতে হয় তাকে। কর্তৃপক্ষকে বাঁচানো তার প্রাথমিক দায়িত্ব। সেখানে মানবতা কিম্বা বিবেকবোধকে জোর করে টুটি টিপে মারতে হয়। এই রকমই একটি ঘটনা ঘটে সেদিন। অকস্মাৎ কারখানায় এক দুর্ঘটনা ঘটে। তেওয়ারী নামের এক শ্রমিকের হাত উড়ে গেছে — কারণ পাঞ্চিং মেশিন খারাপ ছিল। মেশিনের ত্রুটির জন্য যদি দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে মালিকপক্ষকে মোটা টাকা

ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। মালিককে বাঁচাতে সতীশ দায়বদ্ধ। আবার মানুষ সতীশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত দরিদ্র শ্রমিকটির জন্য নিজের হৃদয়বোধের কাছে দায়বদ্ধ। মধ্যবিত্ত এক ছাপোষা মানুষের যে পিছুটান, তাতে তার চাকরি ও সংসার বাঁচাবার তীব্র ও নিরুপায় তাগিদে সতীশ মালিকের অনুকূলে প্রমাণ খুঁজতে থাকে। পাঞ্চিং মেশিনে চাবির ঘাট ক্ষয়ে যাওয়ায় তা নিয়মিত পড়ছিল না। এ নিয়ে মিস্ত্রী সুপারভাইজারকে রিপোর্ট করা সত্ত্বেও সমুচিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এসব জেনে ও বুঝেও সতীশ কারখানায় গিয়ে নির্দিষ্ট মেশিনের আশে পাশে পড়ে থাকা খাদ্যকণাকে ইস্যু বানিয়ে তোলে। কাজ করার সময় বেআইনীভাবে খাওয়া দাওয়া করছিল তেওয়ারী। এই অন্যমনস্কতার জন্য এমন দুর্ঘটনা। দায়ী শ্রমিকটি নিজেই। এই অজুহাত খাড়া করে মালিককে দায়মুক্ত করার পথ বের করে ফেলল সতীশ। কিন্তু সে নিজে নিজের কাছ থেকে দায়মুক্ত হতে পারছে না। সতীশ 'রিপোর্টে লিখল, কাজে অন্যমনস্কতা এবং দুর্ঘটনা। দুজন শ্রমিককে সাক্ষী নিয়ে রিপোর্ট লিখে দিতেই প্রাণের ভিতরে কেমন এক রক্তচোষা জীব উঁকি দিয়ে ফের রক্তের ভিতরে ডুবে গেল। যা হয়, প্রাণের চেয়ে মানের মূল্য বেশি, দুই মুখ তখন উঁকি দেয়—মিন্টু, বাবুলের মুখ। রক্তশোষা জীব যেন এবার ওদের তেড়ে যাচ্ছে। বাবুল একবার ছবিতে রাম-রাবণের যুদ্ধ দেখেছিল। যুদ্ধ দেখে বলেছিল বাবা আমি রাম সাজব। আমাকে রামের টুপি কিনে দেবে বাবা। রিপোর্টে সই করার পরই সতীশের মেজাজটা কেমন রুক্ষ হয়ে গেল। রথের মেলা থেকে রাজার টুপি কিনতে হবে সেকথা সে ভুলে গেল।”

যে কাজ সতীশ করতে বাধ্য হল, তা করতে তার অন্তরাত্মা সায় দেয়নি। তেওয়ারী বলে শ্রমিকটির স্ত্রীর কান্না সতীশের ব্যক্তিগত অনুভূতির কেন্দ্রটিকে বিক্ষিপ্ত করে দিচ্ছে। সেই যাতনা থেকে ক্রমশ যেন এক দৈত্য তার সত্তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পণ করেছে। তেওয়ারীর দুর্ঘটনা এবং আনুষঙ্গিক প্রতিক্রিয়ার পর আবার এক দুর্যোগ ঘনিয়ে এল অফিসে। বোনাস এবং মাইনে বৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিকেরা ঘেরাও করল সতীশের অফিস। অনেক কষ্টে, বুদ্ধি খাটিয়ে সহকারী অবিনাশবাবু ও বিনোদবাবুর সহায়তায় পুলিশ আনিয়ে বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পেল সতীশ। কিন্তু আজকের যাবতীয় ঘটনায় সে স্বস্তি পাচ্ছিল না। উদ্ধারকারী পুলিশের গাড়িতে বসে সে কেমন কাপুরুষের মত গলায় বলল — 'তেওয়ারীর বউটা খুব কাঁদছিল অবিনাশবাবু।'

তারপর ঘরে ফিরে আসা। কিন্তু পরিবেশ খুব ঘরোয়া নয়। রুগ্না স্ত্রীকে মমতা সম্ভাষণ করতে গিয়েও পারে না। শোনে তার দাদা যতীন এসেছে। পুলিশের সাহায্যে কাপুরুষের মত পালিয়ে আসার বেদনা ভুলতে পারে না সতীশ। ছেলে বাবুলকে পড়তে বসতে বলার সময়ও যথেষ্ট জোর পেল না। দাদার আসার কারণ অনুমান করতে থাকলে। — 'সম্বন্ধটার কি করলি? পাত্রপক্ষ পণ চাইছে। দাবী দাওয়া অনেক। এমন পাত্র ছাড়াও যাবে না।....' বাবুল তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে। পড়তে বসা দূরের কথা — তার দাপাদাপি যথেষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছে। যতীন বলেই চলেছে — 'সকলে তোমার আশায় আছে। তুমি মত না দিলে এ পাত্রটিও হাতছাড়া হবে।'

'সতীশের দুহাত তুলে চীৎকার করতে ইচ্ছা হল, আমাকে, তোমরা কি ভাবঙ্গ আমি কি চুরি করবঙ্গ আমাকে তোমরা চুরি করতে বলছ। আমার কি আয়! আমি কোথা থেকে এত টাকা পাব! সতীশ অথচ ক্ষোভে ও দুঃখে জবাব দিতে পারল না। সে মাথা নীচু করে বসে থাকল। এবং ধীরে ধীরে বলল, দেখি কি করতে পারি। দাদা চলে গেলে হতাশ মুখে ঘরে ঢুকল সতীশ।

সতীশের ক্লান্তি ও হতাশার জন্য দায়ী সারাদিনের ঘটে যাওয়া 'খণ্ড খণ্ড হঠকারী ঘটনা'। এর মাঝে আপন সত্তার মুখোমুখি দাঁড়ানোর মতো তার আত্মজ নিষ্পাপ শিশুসন্তানটির সামনে দাঁড়াবার শক্তি সে হারিয়ে ফেলেছে। বলিষ্ঠ জীবনভাবনা থেকে ছেলের জন্য মাথা উঁচু রেখে যা করতে পারত — তার অবশেষ আর বুঝি খুঁজে পাচ্ছে না। 'রাজার টুপি' কেনবার যোগ্য সে নয়। এই ভাবনা — 'কাপুরুষের

মত চোখ যার, যার মাথা উঁচু নয়, মেলা থেকে কি কার রাজার টুপি কিনবে?' নিজের প্রতি রাগ দমন করতে চেষ্টা করে সতীশ। নিজেকে প্রশমিত করে নেবার আগেই সুরমা অভিযোগ করে, সতীশের বারণ সত্ত্বেও দুই ছেলেমেয়ে দুপুরে বেরিয়েছিল, 'দেখবে কোন্‌দিন ওরা জলে ডুবে মরবে।' সতীশের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে এবার। 'সতীশের নিরন্তর এক ভয়'। ছুটন্ত বাবুলকে ঘর বারান্দা তাড়া করে ধরে ফেলে সে। আর বাবুল দেখে 'বাবা কেমন এক দৈত্য হয়ে গেছে। হাউ হাউ করে কাঁদে বাবুল। বলে বাবা আর যাব না! তুমি আমাকে মেরো না বাবা। — কিন্তু হায় কে কাকে রক্ষা করে? সতীশকে তার মানবিক শুভ সত্তা ধরে রাখতে পারল না। নিষ্ঠুরভাবে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করতে লাগল সে। সুরমা উঠে এসে ধরে ফেলল — 'তুমি কি পশু হয়ে গেছ?'....

সারাদিন ধরে পরপর এত ধরণের ঘটনার জন্য মানসিক চাপ — সৎ, কর্মনিষ্ঠ, দায়িত্বপরায়ণ, সংসার ও সন্তানবৎসল দরদী সতীশকে সত্যিই কি বাবুলের আঁকা রাজার টুপি মাথায় রামের নয় — মাথায় বসা কাক নিয়ে রাবণের ছবিটার সঙ্গেই মেলানো যাচ্ছে? অনুশোচনায় বেদনায় সতীশ মূক হয়ে যায়।

রাত বেড়েছে। সুরমা খেতে দিচ্ছে সতীশকে। ছেলেমেয়েকে আগেই খাইয়ে দিয়েছে সে। অসচ্ছল সংসারের নিয়ম মেনে নিরামিষ আহার্যের জায়গায় আজ পাতে মাছ থেকে আশ্চর্য হয় সতীশ। সুরমার কাছে শোনে দারোয়ানদের কাছ থেকে পুকুরে ধরা মাছ থেকে তিনটে বড়ো পুঁটি মাছ পেয়েছে বাবুল। সারাদিন ধরে বাবাকে সেই মাছ, সবচেয়ে বড়ো মাছটা খাওয়াবার জন্য কত তত্ত্বাবধান করেছে, সুপারিশ করেছে মায়ের কাছে। একথা শোনার পর সতীশের হৃদয়-বিদীর্ণ রক্তোচ্ছ্বাসে নিজেকে ধরে রাখা কঠিন হয় তার। 'সতীশ সেই মানুষের মত, হায় এক মানুষ — ক্রীতদাস প্রায় মানুষ, সতীশ বাবুলের পিঠে হাত দিতেই চাপ চাপ রক্ত। সে তার দুই নরকপ্রায় হাত নিয়ে ছুটে গেল — দ্যাখো সুরমা আমি কি করেছি।'

রাত বাড়ে। একলা সতীশ সারাদিনের ঘটনা পরপর বসে ভাবে। তার মাথার মধ্যে বসে থাকে তেওয়ারীর বউয়ের কান্না। হালভাঙা পালছেঁড়া এক ক্লিষ্ট মানুষ সতীশের নিজেকে বাবুলের ভাঙা রেলগাড়ীটার মত মনে হয়। কিন্তু রাত কাটে। ভোর হয়। নতুন সকাল আলোয় ভরিয়ে দেয় পৃথিবীর সব কিছুর মত সতীশেরও আনাচ-কানাচ। সে তৈরী করল নিজেকে বাবুলের জন্য রাজার টুপি কিনে আনার মত করে। সে যে ক্রীতদাস এ সংসারে তা আর মনে থাকল না। সে বাবুলকে কাঁধে নিয়ে পাতাবাহারের, গাছটার কাছে দাঁড়িয়ে ভোরের সূর্য দেখতে দেখতে..... আজ কি ভেবে দিক নির্ণয় শেখাতে থাকল।'

'রাজার টুপি' গল্পটিকে আত্মবোধমূলক তথা মনস্তাত্ত্বিক গল্প বলা যেতে পারে। মানসত্তার একান্ত আর্ততা এবং নিরন্তর অশুভ শক্তির সঙ্গে লড়াইয়ের পর জয়ীর ভূমিকায় আত্মপ্রতিষ্ঠা — এদিক থেকে দেখলে একে মানবিক মূল্যবোধের গল্প বললেও ভুল হয় না।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যক্তিজীবনের একান্ত উপলব্ধি থেকেই মমতা, সমবেদনা ও উদ্বেগাপন্ন সতীশের জীবনযাত্রার থেকে চব্বিশ ঘন্টার আবর্তনের সময়সীমাকে প্রতিফলিত করেছেন; তাতেই লেখকব্যক্তিত্বের স্বরূপ ধরা পড়েছে।

'রাজার টুপি'র রূপকটি সার্থকভাবে গল্পে ব্যবহৃত। একটি ছোটো ছেলের ওই খেলনার মতো জিনিসটি গূঢ় আবেদন সৃষ্টি করেছে সতীশের কাছে। নিজের সত্তাকে অমলিন রূপে ভাস্বর করবার জন্য সতীশ নিজের সঙ্গে যুঝেছে, মাঝে মাঝে পরাজয়ের গ্রাসে ধরা পড়লেও শেষ পর্যন্ত দিক্‌চিহ্নহীন অনন্ত-প্রসারিত জীবনে ও পৃথিবীতে সে নিজেকে খুঁজে পেয়েছে। এমনকি তার সন্তানকেও সযত্নে মেলে ধরবার জন্য সে হাত ধরে এগিয়ে দিয়েছে। তাই 'রাজার টুপি' তার অনায়ত্ত থাকেনি। গল্পের এই মহনীয় লগ্নেই এসেছে তার মহামুহূর্ত।

একদিনের সকাল থেকে পরদিনের সকাল পর্যন্ত সময়কে লেখক অত্যন্ত মুন্‌সিয়ানার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। চব্বিশ ঘন্টার টানাপোড়েনের মধ্যে সমাজ-সংসারও যেমন আছে, তেমনি আছে নির্মল প্রকৃতিও— যে প্রকৃতি তার বৃষ্টিধারা, চন্দ্রালোক, গাছগাছালিসমেত গল্পের চালচিত্রটি সাজিয়ে দিয়েছে।

২.৩.৯.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষের আত্মস্খলনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন ভারতবর্ষের ঐতিহ্যচ্যুতির যে ছবি রমাপদ চৌধুরীর 'ভারতবর্ষ' গল্পে চিত্রিত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২। রমাপদ চৌধুরীর 'ভারতবর্ষ' গল্পটির বিষয়বস্তুর নিরিখে গল্পটির নামকরণের সার্থকতা কোথায় তা বুঝিয়ে দাও।

৩। 'ভারতবর্ষ' একটি প্রতীকী গল্প'—মন্তব্যটির বিশষ ব্যাখ্যা করো।

৪। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাজার টুপি' গল্পটিতে আছে মধ্যবিত্ত মানুষের রক্তাক্ত ছবি।— মন্তব্যটির সারবত্তা প্রমাণ করো।

৫। 'রাজার টুপি'-তে মানবাত্মার উত্তরণ দেখাতে গিয়ে যে প্রতীক—রূপক-উপমা-চিত্রকল্পগুলির সহায়তা গ্রহণ করেছেন, তার যৌক্তিকতা বুঝিয়ে দাও।

৬। 'রাজার টুপি' গল্পে যে আত্মিক সংকটের পরিচয় পাওয়া যায়, তা নিজের ভাষায় বুঝিয়ে দাও।

পর্যায়গ্রন্থ - ৩

একক - ১১

বিন্যাসক্রম :

২.৩.১১.১ : লেখক পরিচিতি—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২)

২.৩.১১.২ : পলাতক ও অনুসরণকারী (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

২.৩.১১.৩ : লেখক পরিচিতি—দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৭৯)

২.৩.১১.৪ : অশ্বমেধের ঘোড়া (দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

২.৩.১১.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.৩.১১.১ : লেখক পরিচিতি—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২)

জন্ম ১৯৩৪। বাল্যকাল অবধি পূর্ববাংলায় কাটিয়ে চলে আসেন কলকাতায়। সেই থেকে কলকাতাই তাঁর যাবতীয় চিন্তন, মনন ও অনুভূতির লালনভূমি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রাথমিক পরিচিতি কবি হিসেবে হলেও সব্যসাচীর মতো তিনি গদ্য-পদ্য উভয় ক্ষেত্রেই অবিসংবাদী স্রষ্টা। কথাসাহিত্য অর্থাৎ উপন্যাস ও ছোটোগল্প রচনার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ বাংলা ভাষার পাঠককে বিস্মিত করে। 'আত্মপ্রকাশ' উপন্যাস লিখে তাঁর এই জগতে আত্মপ্রকাশ, আর এতেই আত্মপ্রতিষ্ঠাও। এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে— জীবন যে রকম, প্রতিদ্বন্দ্বী, অরণ্যের দিনরাত্রি, নবজাতক, পূর্ব-পশ্চিম, প্রথম আলো ইত্যাদি তাঁর বিশিষ্ট উপন্যাস। 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প' বাংলা গল্পসাহিত্যে অভিনব সংযোজন। নীললোহিত ও সনাতন পাঠক নাম নিয়ে সুনীল ভিন্নধর্মী রচনা লিখেও নিজের ব্যাপ্তি প্রমাণ করে দিয়েছেন। বর্তমান সংকলনের জন্য স্বয়ং লেখক কর্তৃক নির্বাচিত 'পলাতক ও অনুসরণকারী' একটি ভিন্ন স্বাদগ্রহণের সুযোগ করে দেয় গল্পপাঠককে। আনন্দ পুরস্কার ছাড়াও অন্য নানা সূত্রে পুরস্কৃত ও সম্মানিত হয়েছেন এই লেখক।

২.৩.১১.২ : পলাতক ও অনুসরণকারী (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

পলায়নপর এক যুবককে যেন ক্যামেরার লেন্সে চোখ রেখে দেখছেন স্রষ্টা—কলমের ছোঁয়ায় তার চিত্র-চরিত্র ফুটিয়ে তুলছেন একটু একটু করে — ক্রমান্বয়ে। অভিনবত্বপূর্ণ এবং চমকপ্রদভাবে লেখাটি শুরু হয়েছে। প্রথম শব্দটিই সংলাপ—'তুমি?' যাকে উদ্দেশ্য করে বলা, তার যেন ত্রস্তচকিত ভাব। সেই ছুটন্ত পলাতক-রবি। পিসীমার বাড়িতে এসে ঢুকে পড়েও স্বস্তি নেই পিছনে ধাওয়া করে আসা অস্তিত্বের জন্য। তারই মাঝে বৌদি জয়ন্তীর কাছে খাবার চায়—'আমার খুব খিদে পেয়েছে। মুড়িটুড়ি হলেই চলবে।' জয়ন্তী রবিকে কিছু প্রশ্ন করলে, তার ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলে, রবি এড়িয়ে যায়। মুড়ি-চানাচুর খেতে খেতে জানলার ধারে চলে আসে। "বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে। চোখ সরু করে চেয়ে রইল বাইরে। একটুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পেল তিনজন লোক পাশাপাশি হেঁটে আসছে, নিজেদের মধ্যে গল্পে মত্ত। এ বাড়ির কাছাকাছি এসে তারা একসঙ্গে মুখ তুলে তাকালো। নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এক মুহূর্ত। তারপর, যেন একটা সমবেত দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারা এগিয়ে আসতে লাগল এই বাড়ির দিকে।

রবি হাতের অর্ধসমাপ্ত মুড়ির বাটিটা ঠক্ করে নামিয়ে রাখল নিচে। দ্রুত বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বাড়ির কারুর কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে নেমে এল নিচে, বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। বেরিয়েই সে দৌড়োতে লাগল।

সেই তিনজন লোক এ বাড়ি পেরিয়ে এসে দেখতে পেল অপসৃয়মান রবির চেহারা। তারা ব্যস্ত হল না, কোনোরকম চাঞ্চল্যও প্রকাশ পেল না।

এক নং অনুসরণকারী বলল, এবারেও চলে গেল।

দুই নং অনুসরণকারী বলল, ঠিক আছে।

তিন নং অনুসরণকারী পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে চোখের সামনে রেখে বলল, এবার কোথায়, দম্দম্ না শ্রীরামপুর?

এক নং বলল, দম্দম্।

দুই নং বলল, তাহলে এখানকার ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা যাক্।

তিন নং কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলল, শীতটা বেশ জমিয়ে পড়েছে আজ। মোড়ের দোকানে দেখে এলাম গরম চপ ভাজছে।

এক নং তার কাঁধের ঝোলা থেকে একটা বোমা বার করে ছুঁড়ে মারল বাড়িটার দরজার ওপরে।

দুই নং বেশ সন্তুষ্টভাবে বলল, বাঃ, আওয়াজটা বেশ।

তিন নং বলল, তাড়াহুড়ো তো কিছু নেই, চলো, কয়েকটা চপ খাওয়া যাক্।'

নাটকের দৃশ্যপরম্পরা যেভাবে সাজানো হয়, অনেকটা সেইভাবে গল্পের এক একটি পর্ব যেন সংস্থাপিত হয়েছে। রবিকে অনুসরণ করে আসছে একটি তিনজনের দল। এই তিনজনের এই পরিচয়টুকুই শুধু পাঠককে দেওয়া জরুরী যে তারা পলাতক রবির অনুসরণকারীর ভূমিকা পালন করছে। তিনজনের মধ্যে সংলাপ বিনিময় সূত্রে এটুকু বোঝা যায় যে তারা রবির আপাত-অন্তর্ধানে বিচলিত হয়নি। রবির গতিবিধির সম্ভাব্যমাত্র নয়, সুনিশ্চিত ছক তাদের অধিগত। সেই ছক রবির চেয়ে তার অনুসরণকারীরাই আগে দিয়ে দেয় পাঠককে। দৃশ্যান্তরে দেখা যায় রবি তার এক বন্ধু চন্দনের বাড়ির বন্ধ দরজায় দাঁড়িয়ে তার নাম ধরে ডাকছে। সেই দরজার দিকে রবির একটি চোখ, তো তার অন্য চোখ গলির মোড়ের দিকে।

"—রবি ঝট্ করে পেছনে ঘুরে দাঁড়ালো। দুটো সাইকেল রিক্সা তখন বড়ো রাস্তাটায় সদ্য থেমেছে। দরজা খোলার জন্য অপেক্ষা করতে পারল না রবি, দৌড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সেই তিনজন এসে দাঁড়ালো বাড়িটার সামনে। ১নং বলল, ভেতরে ঢোকেনি, আমি দেখেছি।"

এরপর আবারও তিনজন কিছু বাক্যবিনিময়। রবির জীবনে যবনিকা টেনে দেবার কাজে নিযুক্ত দলটির মধ্যে কেউ অধরা রবির উদ্দেশ্যে বিষোদ্গার করে, কেউ নিজের জন্যই অনুকম্পা বোধ করে, কেউ বা আশ্রয়ভিখারী রবির সম্ভাব্য কিম্বা ফেলে-যাওয়া আশ্রয়গুলিতে বোমা মেরে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে।

পরের দৃশ্যে রবি শ্মশানে গঙ্গার ঘাটে সারারাত্রি মৃতদেহ নিয়ে আসা শ্মশানযাত্রীদের সঙ্গে কাটিয়ে দেয়। ভোরবেলাকার স্নানপুণ্যার্থীদের ভিড়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে আসে হাওড়া স্টেশনে। সেখান থেকে ট্রেনে শ্রীরামপুর। দমদমের পর শ্রীরামপুরই যে রবির আশ্রয়লক্ষ্য - তা আমরা অনুসরণকারীদের লিস্ট থেকে আগেই জেনে রেখেছি।

রবির বন্ধু সুশান্ত প্রথমে রবিকে এড়াতে চায়। তারপর কী ভেবে ঘরের ভেতরে নেয় তাকে। সুশান্ত এখন বিবাহিত, অফিসে চাকরি করে। ছন্নছাড়া রবির প্রতি তার মানবিক উত্তাপ মধ্যবিত্তের নির্লিপ্ত আত্মকেন্দ্রিকতাকে কিছুটা গলিয়ে দেয়।

সারাদিনটা রবি পড়ে পড়ে ঘুমোলো। অনেক দিনের ঘুম পাওনা ছিল তার। মাঝখানে উঠে একবার শুধু স্নান করে খেয়ে নিল। স্নান করল অনেকক্ষণ ধরে, খেতে বেশি সময় লাগল না।' ......ঘুম ভেঙে উঠে রবি দেখল বাইরটা অন্ধকার হয়ে গেছে। সন্ধ্যে এখন গাঢ়। সে আশ্রয় পেয়েছে ছাদের একটি ছোটো ঘরে, চটপট উঠে ছাদ থেকে উঁকি দিয়ে দেখে নিল চতুর্দিক। কেউ নেই।'

প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণায় কপালের দুপাশের রগ চেপে অন্ধকারে বসে থাকে রবি। সুশান্ত তাকে দু'-একদিন থাকবার কথা বলে। রবি জেদালো ভঙ্গিতে সদর্পে বলে ওঠে—'মাথার ওপর ছাদ না থাকলেও আমার কিছু আসে যায় না। ঘরের কথা চিন্তা করে আমি রাস্তায় বেরোইনি।' সুশান্তও কড়া গলায় বলে—'এবার আমাদের রাস্তা বদলাতে হবে। তুই যে পথে যাচ্ছিস, সেটাকে রাস্তা বলে না, এঁদো গলি।'

রবি একথায় রুষ্ট হয়। সুশান্তর শান্তিব্রতী সংসারী ভূমিকাকে ব্যঙ্গ করে। এমন সময় সুশান্তর স্ত্রী রূপা এসে সুশান্তকে বলে—'তোমাকে তিনজন লোক ডাকতে এসেছেন।'

রবি তড়াক করে চলে গেল ছাদের পাঁচিলের কাছে। সন্তর্পণে উঁকি দিয়ে ফিরে এসে শান্তভাবে বলল, তোদের বাড়ির পেছন দিক থেকে বেরুবার কোনো রাস্তা আছে?

সুশান্ত রবির হাত চেপে ধরে বলল, তুই চলে যাবি?

— একদম সময় নেই।

— তোকে যেতে হবে না। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলছি। অত ভয়ের কি আছে? — ভয় না, ঘৃণা। একদম সময় নেই।

ছাদের উল্টোদিকের পাঁচিল টপকে পাইপ ধরে ঝুলে পড়ল রবি। আর ওরা তিনজন বাড়ির নম্বর খুঁজে বের করছে, আলাপ চলছে তাদের নিজেদের মধ্যে ঃ

৩ নং বলল, হেঁটে হেঁটে পা ধরে গেল মাইরি।

১ নং বলল, গত বছর এই সময় আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। তাতে থ্রিল বেশি।......

২ নং বলল, এখানকার ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলা যাক্।

৩ নং বলল, তারপর বাড়ি গিয়ে ভালো করে ঘুমোবো। বাড়ির রান্না গরম গরম ভাত, মুসুরির ডাল আর আলুসেদ্ধ —

শেষ দৃশ্য। রবি ছুটছে। বেরাস্তা ধরে ছুটতে ছুটতে একজনকে দেখে জিজ্ঞেস করে স্টেশন কোন্‌দিকে। লোকটি তাকে রাস্তা চিনিয়ে সেদিক দিয়ে যেতে বলল। রবি অন্ধকার মাঠের মধ্যে দিয়েই যাবে—সহজ রাস্তা তার জীবন থেকে সে হারিয়ে ফেলেছে। 'পেছন দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে আর সামনের দিকে ছুটে যাচ্ছে রবি। শীতের রাত্তিরেও তার শরীরে ঘাম। হঠাৎ সে সামনের দেয়ালে ধাক্কা খেল।

দেয়াল নয়, তিনজন মানুষ। নিপুণ হাতে তারা রবিকে আঁকড়ে ধরে নিশ্চল করে দিল। রবিও ছটফট করল না, মুখ চাপা দিল শুধু।

১ নং রবির মুখ থেকে হাত সরিয়ে নেবার চেষ্টা করে বলল, কি রে রবি, চিনতে পারিস?

২ নং বলল, বর্ধনকে তোরা তিনজন —

৩ নং বলল, শালা অনেক ভুগিয়েছিস —

রবি কোনো কথা বলল না। যে-রবিকে সামান্যতম কোনও পারিবারিক প্রসঙ্গে শুধু এড়িয়ে যেতে দেখা গেছে, যাকে রুক্ষ, মেজাজী, ছন্নছাড়া এক দিক্‌ভ্রষ্ট বলে মনে হয়েছে — মরণের কোলে শেষ আশ্রয় নেবার সময় 'আকস্মিকভাবে তার মনে পড়ল, তার ছোটো বোনকে ছবি আঁকার এক বাক্স রং পেন্সিল পাঠাবার কথা ছিল — দু'দিন বার চিঠি লিখেছে —'

রং পেন্সিল এখানে রূপক। জীবনের সাত রঙ্‌ রবির কাছে ধরা পড়েনি। তার তারুণ্য, প্রাণশক্তি কোন্ কানাগলিতে ঘুরপাক খেয়ে অপচিত হল। অসম্পূর্ণ বিফল জীবনের শেষ মুহূর্তে সে কোনও স্লোগান দেয়নি, একটি আর্তস্বরও কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হতে দেয়নি। কিন্তু সে যে একজন দায়বদ্ধ পরিবারিক মানুষ, ছোটো বোনের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দাদা — এই কোমল আবেদনে পাঠকের সহানুভূতিতে তার স্থান চিহ্নিত হয়ে যায়।

লেখকের বক্তব্য শেষ করতে আরও কয়েক লাইন বাকি। হত্যাকাণ্ড সমাধা হলে আততায়ীরা শুনতে পায় দূরে এক কোলাহল। সেদিকে খেয়াল করে এরা কোনও ঝুঁকি না নিয়ে ছুটতে শুরু করল। পালাবার সুবিধের জন্য, তিনজন তিন দিকে।

"অবিলম্বে সেই দলটি এখানে এসে পৌঁছল। ভূতপূর্ব রবির দিকে এক পলক তাকাল শুধু, তারপর শোনা গেল একটা প্রতিজ্ঞার উচ্চারণ।

এই দলে ছিল ন-জন ব্যক্তি। এরা তিনজন করে তিনটে দলে ভাগ হয়ে ছুটতে শুরু করল তিন দিকে।

একটু আগে যে ছিল এক নং অনুসরণকারী, এখন সে এক নং পলাতক — তাকে যারা তাড়া করে আসছে তাদের মধ্যে এক নং অনুসরণকারী তিন নং অনুসরণকারীকে বলল, যাবে কোথায়? পকেট থেকে কাগজটা বার করো। দেখে নে।"

পলাতক ও অনুসরণকারী গল্পটির মধ্যে যদিও কোথাও কোনও রাজনীতির কথা প্রকাশ্যে আনা হয়নি, কিন্তু প্রাণরক্ষাকারী ও প্রাণহত্যাকারীর নিরন্তর ছুটে চলার এই ছবি আমাদের রাজনীতির ফাঁদে পড়া অবিমৃশ্যকারী আদর্শনিষ্ঠ যুবকদের কথা মনে পড়ায়। চোরাচালানী স্মাগলার কিম্বা ওয়াগণ ব্রেকারের জীবনও এমন অরক্ষিত, ত্রাসসঙ্কুল হয়, একথা আমরা জানি। কিন্তু রবি বা তার অনুসরণকারীদের সেই অর্থে সমাজবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করার মতো কোনো সঙ্কেত লেখক রাখেননি। এই সব যুবকেরা—আততায়ী ও আত্মরক্ষাকারীর ভূমিকা বদল করতে করতে যাদের অমূল্য সময় ক্ষীয়মান হতে থাকে—কোনো মুহূর্তে ফুরিয়ে যায়, তারা কি সত্যিই কোনো আদর্শকে শেষ পর্যন্ত অন্তরে লালন করতে পেরেছে? গল্পে অন্তত লেখক তার পরিচয় রাখেননি। তবুও একে রাজনৈতিক গল্প বলা যেতে পারে। বিশ শতকের সাত-আট দশকের বঙ্গদেশ যে ভয়ঙ্কর রক্তাক্ত বিপ্লবে তার মেধা ও হৃদয়বত্তায় শ্রেষ্ঠ সন্তানগুলিকে হারিয়েছে—বুঝতে ভুল হয়না — তাদেরই একজন রবি, তিনজন অনুসরণকারী, ক্রমশ যা নয়জন বা বহুগুণিত হয়ে গেছে।

আপাতদৃষ্টিতে রবির মৃত্যুতেই গল্পের ক্লাইম্যাক্স ঘনিয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু রবির মৃত্যুতে

পাঠকের রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষার বেদনাদীর্ণ অবসান ঘটলেও গল্পের আবেদন ধীরে ধীরে পাঠকের মনে যেখানে গিয়ে বিদ্ধ করেছে তা আরও সুদূরপ্রসারী সামাজিক ব্যাধির কেন্দ্র-উন্মোচন। হিংসার বদলে হিংসা কি নিদারুণ ভাবে সংখ্যাতীত হয়ে যায় তার উপলব্ধিতে নেমে আসে চরম মুহূর্ত।

গল্পটিতে আদ্যন্ত রবি চরিত্রটিকে লেখক এবং পাঠক অনুসরণ করে গেলেও শেষ পর্যন্ত এ গল্প চরিত্রমুখ্য নয়, ভাবমুখ্য। আরও টুক্‌রো কিছু চরিত্র-জয়ন্তী, পিসিমা, সুশান্ত বা রূপা ধর্তব্য নয়। কিন্তু উল্লেখ্য তিনজন অনুসরণকারী। এরা সমবেতভাবে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসাধক বলেই লেখক ইচ্ছে করেই এদের ব্যক্তিনাম দেননি। কিন্তু তাঁর অন্তর্দৃষ্টি এবং সুচারু শিল্পবোধের প্রশংসা করতেই হয়, যখন দেখি দু-তিনটি করে শব্দ কিম্বা বাক্য ব্যবহারের মধ্যেও তাদের চরিত্রায়ণ (Characterisation) ঘটে গেছে। ১ নং-এর যান্ত্রিক কর্তব্যনিষ্ঠা, ২নং এর বোমাবিলাস এবং ৩নং-এর হৃদয়বৃত্তি বা ব্যক্তিবোধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশি' নং টির অনুষঙ্গ মনে পড়ে আমাদের।

পথে-বিপথে, ঘাটে আঘাটায় অনির্দেশ্যভাবে ছুটে চলা তরুণদের বৈপরীত্যে সুশান্তর পরিবারের একটুক্‌রো ছবি প্রাসঙ্গিকভাবে গল্পে এসেছে। ছোটো পরিসরে রবির পিসিমা, বন্ধু চন্দন ও সুশান্তর পরিবারের চিত্রেও সংকেতিত হয়েছে সমকালীন সমাজজীবনের অস্থিতি ও আতঙ্কের বার্তা। সর্বোপরি একটি কেন্দ্রীয় চরিত্রের যে সমস্যা, তা আর মাত্র একজনের থাকেনি, সর্বাত্মক রূপ গ্রহণ করেছে।

পলাতক ও অনুসরণকারী নামটির মধ্যেই সমগ্র গল্পের ভাবনির্যাস। কালকের অনুসরণকারী আজ কিভাবে পলাতক এবং তার পলায়নপর্ব শেষ হয় যখন, জীবনের অন্তিম লগ্নও তখন ঘনিয়ে আসে। অনুসরণকারীরা তখন মৃতের দলের লোকদের লক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। ভূমিকা বদলে গিয়ে পালানোর জন্য দৌড়োতে থাকে তারা। হয়ে যায় পলাতক। পেছনে ধাওয়া করে মৃত্যু, অনুসরণকারীর নতুন দল। মৃত্যুকে নিয়ে এই চক্রবৃদ্ধির খেলা ফুটে উঠেছে গল্পের যথোপযুক্ত নামকরণে।

২.৩.১১.৩ : লেখক পরিচিতি—দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৭৯)

জন্ম ১৯৩৩। একটি রাজনীতিগত ঐতিহ্যসম্পন্ন ও সংস্কৃতিবান পরিবারে বেড়ে ওঠা এবং নিজস্ব প্রণোদনার ফলে দীপেন্দ্রনাথ ছিলেন সাংগঠনিক রাজনৈতিক কর্মী আবার সাহিত্যকর্মী। সাহিত্যকর্মী তিনি উভয় অর্থে—স্বয়ং সাহিত্যস্রষ্টা, আবার বিভিন্ন পর্বে ছাত্রাবস্থায় ও পরিণত বয়সে সংস্কৃতি সম্পাদক, একতা থেকে পরিচয় সাহিত্য-পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে বাংলা সাহিত্যজগতে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছেন। খুব অল্পবয়স থেকে শারীরিক সীমাবদ্ধতার কারণে তাঁকে অসীম কষ্ট সহ্য করে এগিয়ে যেতে হয়। বিস্ময়কর মনোবল এবং মানবিক শক্তির অমানবিক সমৃদ্ধিতে ভরা ছিল তাঁর অন্তরলোক। বিশ্বাস ও ভালোবাসা দিয়ে এই খর্বাকৃতি, প্রতিকূল শারীরিক অবস্থার শিকার মানুষটি যে ভাবে এত রকমের কাজ করে গেছেন, তা দৃষ্টান্তযোগ্য। কলেজে পড়ার সময় দীপেন্দ্রর গল্প সংকলন প্রকাশ পায়। 'আগামী' উপন্যাসও সেই যুগেই লেখা। মূলত ছোটোগল্প লিখেই 'দীপেন্দ্রনাথ বাঙালী পাঠককে একসময় কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন।' 'চর্যাপদের হরিণী', 'হওয়া না হওয়া', 'অশ্বমেধের ঘোড়া' এই তিনটি গল্পসংকলনের গল্পগুলির শাশ্বত মূল্য বাংলা সাহিত্যে দীপেন্দ্রনাথকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। কম্যুনিস্ট পার্টির এই হোলটাইমার রাজনীতিকে সংকীর্ণ স্বার্থান্ধ দৃষ্টিতে কখনোই মেনে নেননি। শুদ্ধ আবেগ যেমন তাঁর ধ্রুপদী সঙ্গীত ও শিল্পমনস্কতায়, সাহিত্যের লেখনীমূলে, তেমনই রাজনৈতিক কর্মসাধনায়। এমন একজন মানুষ (মাত্র ছেচল্লিশ বছরের জীবৎকাল) অকালে তিরোহিত হলে সেই ক্ষতি অপূরণীয় থেকে যায়।

২.৩.১১.৪ : অশ্বমেধের ঘোড়া (দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

'সমকালীনের ফ্রেমে চিরায়তকে ধরবার চেষ্টা' করাই এই গল্পে লেখকের উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছেন তিনি। এই গল্পের দুটি মাত্র চরিত্র—কাঞ্চন আর রেখা। পরস্পরকে ভালোবাসে ছাত্রজীবন থেকে। কিন্তু লেখকের যৌবনকাল অর্থাৎ বিশ শতকের ছয়ের দশকের প্রেক্ষিতে প্রেমের বিবাহ এদেশে তেমন গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। জাতের অমিল থাকলে তো কথাই নেই। সেই অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি পেয়ে, দুজনেই কিছু না কিছু জীবিকায় থেকেও পারিবারিক সম্মতি এবং অর্থনৈতিক সচ্ছলতার অভাবে সামাজিকভাবে তারা বিবাহবন্ধনে মিলতে পারছে না। গল্প যেখানে শুরু হয়েছে, সেখান থেকেই কাঞ্চন ও রেখার অনির্দেশ্য পথচলা, অন্তরে নিভৃত কষ্ট, অপূর্ণতার ক্ষোভ চেপে উভয়ত বানিয়ে বানিয়ে কথার খেলায় ক্লান্তি—আর তারই পুনরাবৃত্তি নিয়ে মাঝে মাঝে দেখা করার জন্য যুগপৎ আকাঙক্ষা ও হতাশা বোধ। তবু এই দিনটি তাদের জীবনের বিশেষ দিন। কেননা নিরুপায় রেখা তার বাবার আনা বিয়ের সম্বন্ধ নিরন্তর ভেঙে দিলেও নিজেকে সেই চাপের মুখ থেকে বাঁচাতে শেষ অস্ত্র হিসেবে রেজিস্ট্রি বিয়ের দলিল করে রাখতে চেয়েছিল। তারই জন্য গত বছর ঠিক এই দিনে রেখা ও কাঞ্চন কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সাক্ষ্য সহযোগে আইনি দম্পতি হয়েছে। তাদের ব্যবহারিক জীবনে এই বিবাহ কোনও তাৎপর্য কোনও পরিবর্তনই নিয়ে আসেনি। বরং পরিস্থিতির প্রতিকূলতায় অসহায় ক্ষোভে তারা ক্ষয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। এই দুই পূর্ণবয়স্ক নারী ও পুরুষ রুচিশীল এবং সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি সম্পন্ন বিদগ্ধ মানুষ। পরস্পরকে ভালোবেসে জাগতিকভাবে কামনা করে যেমন, তেমনি অন্তরঙ্গ চাওয়া-পাওয়া দিয়ে নিভৃত সংসার গড়ার বাসনা তাদেরও। তথাকথিতভাবে বিবাহিত হয়ে একবছর অতিক্রম করে যখন পরস্পর মুখোমুখি, তখনও কোনও সমাধান দূর দিগন্তেও দেখা যায় না। তবু বিশেষ দিন, পথচলতি ফুলবিক্রেতার অনুনয়ে ইচ্ছে হলেও সঙ্কোচিত কাঞ্চন পারল না ফুল কিনতে, রেখা আকস্মিকভাবে কাঞ্চনকে অবাক করে দিয়ে মালা কিনে নিল। কাঞ্চনের মনে তাদের বিয়ের কিছু স্মৃতি উঠে এল। সেদিন কোন্ বন্ধু মালা এনেছিল, কেউ সিঁদুর বার করে রেখাকে পরিয়ে দিতে পীড়াপীড়ি করেছিল—কিন্তু সেই প্রহসন বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। রেখাকে রুমালে ঘষে সিঁদুর তুলে ফেলতে হয়েছিল, কাঞ্চন মালা হাতে পরিহাস ও বিদ্রূপের লক্ষ্য হওয়ায় রাস্তায় তা ছুঁড়ে ফেলে এবং তা এক স্থবির বলদের ভক্ষ্য হতে দেখে অসহায়ভাবে নিজের হীনমন্যতা ও যন্ত্রণার মাঝে সহসা শুনতে পায় সানাই বাজছে কোথায়—আর এই পরিস্থিতিতেও তার সৌন্দর্য ও ভালোবাসায় স্নিগ্ধ সত্তাটি প্রফুল্লতার স্বাদ পায়। এ সবই গত বছরের স্মৃতি থেকে ভেসে আসা কথা। যে দিনটি আবার ফিরে এসেছে এক বছর পরে—সে দিনে কী করবে কাঞ্চন ও রেখা? রেখার হাতে টাট্‌কা সুগন্ধী ফুলের মালা। রাস্তায় চলতে চলতেই তাদের কথা—কিছু কথার জন্যই বলা অগভীর কথা। তারপর—'তারপর দুজনেই স্তব্ধ হয়ে খানিক পথ হাঁটল। রাস্তায় ব্যস্ততা বাড়ছিল, কারণ বৃষ্টি আসছে। অথচ পরিপার্শ্ব সম্পর্কে ওরা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। 'রেখা?'

'উঁ?'

'রেখা?'

'কি?'

'রেখা?'

এবার জবাব না দিয়ে রেখা হাসিমুখে কাঞ্চনের দিকে তাকাল। কাঞ্চন বলল 'জানো? ছেলেবেলায় মাকে এমনি অকারণে ডেকে জ্বালাতাম।'

রেখার হাসিমুখ মুহূর্তে শুকিয়ে গেল। মা'র নামে ওর বাড়ির কথা মনে পড়েছে। আমারও পড়ে। রেখা সম্পর্কে মা'র একটা চাপা স্নেহ লক্ষ করেছি। অনেক আগে রেখাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। মাত্র একবার। রেখার মার চেহারা মনেই পড়ে না। বাবাকেও না। রেখার ভাইবোনেরা এই চার-পাঁচ বছরে নিশ্চয়ই কত বদলে গেছে।

'আচ্ছা আমি যদি চিৎকার করে লোক জমিয়ে বলি, এই যে দেখছেন ভদ্রমহিলা—ইনি আমার ধর্মপত্নী তাহলে?'

'পাগল বলে ধরে নিয়ে যাবে এই আর কি।'

'তাহলে তো বেঁচে যাই'—কাঞ্চন হাসতে হাসতে বলল, কিন্তু দীর্ঘশ্বাস চাপতে পারল না।......কাঞ্চন বলল 'জানো এই কথার খেলা সত্যি আর ভালো লাগে না।' রেখা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। ভালো লাগে না। ভালো লাগে না। চুরি করে একটু সময় নেওয়া, দুটো কথা, এক পেয়ালা কফি, লম্পট নদীতীরে নির্জনতার ব্যর্থ অন্বেষণ, তারপর অক্ষম ক্লান্তি ও ক্ষোভে অপরিচিতের মতো ঘরে ফিরে যাওয়া। ....আমাদের বয়স বেড়ে যাচ্ছে, মনে মনে আমরা আরও দ্রুত বুড়িয়ে যাচ্ছি। অথচ সেই মৌলিক ছকের ওপর ঘুঁটির মতো এগোচ্ছি, পেছোচ্ছি। এ যুগের নিয়তিই হল বাল্য ও প্রৌঢ়তা-মধ্যিখানে বিশাল চড়ায় ইচ্ছা ও অভিজ্ঞতা, ভালো লাগা ও কর্তব্যের বিরোধে আমরা পোকার মতো গর্ত খুঁড়ে নিচে নামছি। অথচ সামনে সমুদ্র ছিল। হায় রে সমুদ্র। নিজেকে ফাঁকি দিচ্ছি কথায়, রেখাকে ফাঁকি দিচ্ছি কথায়।......"

ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল কাঞ্চন। রেখার কথায় সম্বিৎ ফিরে পেল, বৃষ্টি আসছে। মাথা বাঁচাবার তাগিদে খানিকটা অন্যমনস্কভাবে পাশ দিয়ে যাওয়া ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানকে ডেকে নিল। এই বৃষ্টির আভাস, তুলনায় জনবিরল রাজপথ এবং অনভ্যস্ত ঘোড়া-গাড়ি সবমিলিয়ে এই দুই সংস্কৃতিবোধ দীপিত প্রেমিক যুগলের চেতনায় অস্পষ্ট ভাবে ভেসে যেতে থাকল রবীন্দ্রগীতির সুর ও বাণী, শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত থেকে গহরভাই অনুষঙ্গ—রেখা যেন গত্যন্তর না দেখে তারই মাঝে দরকষাকষি করে ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে উঠে বসল। উল্টোদিকের গদিতে কাঞ্চন। অকল্পনীয়ভাবে আকস্মিক এই নিভৃত অবকাশ কেমন লাগছে কাঞ্চনের? অপ্রস্তুত, আড়ষ্ট কাঞ্চন "এতক্ষণে অনুভব করল চৌরাস্তার ভিড়ে ঘোড়ার গাড়িতে বসে সে অত্যন্ত কমপ্লেক্স বোধ করছিল।" তবুও আকস্মিক বলেই আর বৃষ্টি শুরু হওয়াতেই গাড়ির ভেতরে কাঞ্চনের মন কানায় কানায় ভরে উঠল। তার ব্যঞ্জনা নিম্নোধৃত বাক্যপুঞ্জে—সারেঙ্গিতে গাঢ় পুরুষালি ছড়ের টানে চন্দ্রকোষ বেজে উঠল। ...কড়ি মধ্যম সমুদ্রস্তম্ভের মতো কোমল ধৈবতে ভেঙে পড়ে কোমল গান্ধার ছুঁয়ে ষড়জে ফিরে এল। আর বৃষ্টি দ্রুত হল। চাকার শব্দ, ক্ষুরের শব্দ, বৃষ্টির শব্দ। মাঝে মাঝে সহিসের চাবুক বাতাসে একটা সূক্ষ্ম মীড় টেনে দিচ্ছে। অজস্র জলবিন্দু ওদের ভিজিয়ে দিল।

গাড়োয়ান পর্দা ফেলে দেবে কিনা জিজ্ঞাসা করায় কাঞ্চন বলল 'দাও'। গাড়ির ছাউনির উপরে তুলে রাখা চামড়ার পর্দা দুপাশ থেকে ঝুলে পড়তেই 'হঠাৎ তারা সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।' কথা খুঁজে পেল না দুজন। বিবাহবার্ষিকীর সন্ধ্যায় নব্য দম্পতির নিভৃত মিলনের আশ্চর্য এক অভাবিত পট রচিত হয়েছে। কিন্তু অমোঘ ভালো লাগায় স্পন্দিত হতে থাকলেও শুদ্ধ আত্মচেতনা থেকে কাঞ্চনের বিশ্লেষণ— 'আসলে আমরা দুজনেই আমাদের অনেক আকাঙ্ক্ষা পরস্পরের কাছে গোপন করে যাচ্ছি, নিজের কাছে মহৎ থাকার তাড়নায় পরস্পর ছদ্মবেশ পরেছি।'

রেখার অনুনয়ে কাঞ্চন কিছু বলতে গিয়ে ডাকল রেখাকে—'বউ?' শুনতে চাইল তার বউয়ের কাছ থেকে 'স্বামীন্' সম্ভাষণ। লজ্জা, আনন্দ ও সঙ্কোচের মধ্যে রেখা তার স্বামীকে ডেকে উঠল। অমনি লজ্জা পেয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে ঝির ঝির করে হেসে উঠল। "কাঞ্চন নাকে ভেজা মাটির গন্ধ পেল।

ছুঁতে ইচ্ছে করছে। খোঁপাটা খুলে একমুঠো ফুলের মতো চুলগুলো যদি রেখার মুখে বুকে ছড়িয়ে দি? হাতটা ধরব? কান পেতে রেখার হৃৎপিণ্ডের শব্দ যদি শুনতে পেতাম? আমার রক্ত, আমার মন বৃষ্টি হতে চায়। একটা কথা ধ্রুব বুঝেছি। বৈষ্ণব কবিরা যৌবন সম্পর্কে যে উল্লাস প্রকাশ করেছেন, তা মিথ্যে। আসলে যৌবন আমাদের লজ্জা, আমাদের যন্ত্রণা। আমি পারি না। পারি না এখানে রেখাকে অপমান করতে।”

দুটি শুদ্ধ হৃদয় পরস্পর মিলতে চায়। তাদের ঐকান্তিক ভালোলাগা কোনও পরিণামে পৌঁছোবার পথ পায় না। যৌবনের স্বরাট রূপ ঢাকা দিয়ে রাখা ছাড়া উপায় থাকে না—অনপেক্ষিত সেই যৌবন কুঁকড়ে থাকে পরিপার্শ্বের চাপে, আত্মিক শুদ্ধতা রক্ষার দায়ে। ‘আমি জানি রেখা কি চায়। আমি জানি আমি কি চাইছি। অশ্বক্ষুরের ধ্বনি চেতনা অবশ করছে। এই আমার শরীর গীর্জার উজ্জ্বল মোমবাতি, বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরে পড়ছে। অশ্বমেধ যজ্ঞের গর্বিত ঘোড়াটি ঘাড় বেঁকিয়ে আগুনের নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেল। আর দ্রাবিড়-কন্যা আর্য-ঘোড়সওয়ারের পায়ের তলায় হাহা করে কেঁদে উঠল।......সত্য যে, দিগ্বিজয়ী অশ্বের শোণিতে যজ্ঞের আহুতি পূর্ণ হয়।”

এমনই বিশ্লেষণে ক্লান্ত যখন কাঞ্চনের মনন, এই অসহায় বেদনায় যখন বিষাদক্লিষ্ট তার অনুভূতি, তখন রেখার মিনতি তাকে জাগ্রত করে — ‘এই মালাটা আমায় পরিয়ে দেবে’ — এটুকুই মাত্র প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে তার কাছে তার বধূর প্রার্থনা। এমন সময়ে গাড়ি নির্দিষ্ট জায়গায় এসে থেমেছে। মালা পরাবার মুহূর্তে পর্দাটা উঠেই আবার নেমে গেল। দুজনে নেমে এল তাড়াতাড়ি। গাড়োয়ানকে ভাড়া মিটিয়ে দিতেই সে চটে উঠে ডবল ভাড়া দাবী করল। কারণ? সেই ধূর্ত অশ্লীল গাড়োয়ানের পরের উক্তি যেন রেখা-কাঞ্চনের প্রেমে আমূল নখ-বসিয়ে দিল—“ফূর্তি করবেন, হোটেল ভাড়া ভি দিবেন না?”

“প্রায় ফিসফিস করে কাঞ্চন বলল, ‘কি বললে?’ জিভে তার কথা জড়িয়ে গেল। আর রেখা চমকে দুহাতে নিজের কান চেপে ধরতে যাওয়ায় মালাটা হাত থেকে রাস্তায় পড়ে গেল।

তারপর সম্পূর্ণ অপরিচিতের মতো দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে দ্রুত পায়ে তারা খানিকটা হেঁটেছিল। কিন্তু কাঁদেনি। কারণ একান্তে কাঁদবার মতো কোনো আশ্রয় তাদের জানা ছিল না।”

অশ্বমেধের ঘোড়া গল্পটি একাধারে প্রেমের গল্প আবার ইতিহাসগত ভাবে সময় ও মানুষের বুনটে বাঁধা এক বাস্তব দলিল। তবে তাও যৌবন আর ভালোবাসারই নির্মম নিরিক্ষা।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই দায়বদ্ধ লেখক, যিনি শিল্পচর্চা অর্থে জানতেন ইতিহাস সময় আর মানুষের প্রতি দায়িত্বপালন। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতবর্ষেরও ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের যে দ্রুত অনন্বয় ঘটে চলেছিল তার মূলে ছিল বিকৃত অর্থনীতির ফাঁদ। একজন শুদ্ধাত্মা মানুষ হিসেবে দীপেন্দ্রনাথ সার্বিকভাবে একে অনুধাবন করেছেন, চেষ্টা করেছেন সাধ্যমতো মানুষের স্খলনের পথগুলিকে চিহ্নিত করতে। শুদ্ধতাকামী মানুষের আত্মাকে রক্ষার জন্য নিজস্ব ধরণে নিরন্তন সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েও কীভাবে পরাজয় ঘটে তার জীবন্ত ছবি ‘অশ্বমেধের ঘোড়া’য় বিধৃত আছে। দেশ-কাল-সংস্কৃতি দ্বারা গঠিত লেখকের জীবনদর্শন প্রতিফলিত গল্পের প্রতিটি স্তরে। গল্পের আরম্ভ যদিও বিবরণাত্মক বা ন্যারেটিভ রীতিতে, কিছুক্ষণের মধ্যেই নায়ক কাঞ্চনের জবানীতে—তার অনুভূতি অথবা সংলাপের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে গল্পটি এগিয়ে গেছে। সমকালীন জীবন যখন বহুমুখী এবং জটিল, তখন তাকে বাস্তবতায় সঠিকভাবে ধরবার জন্য গল্পের প্রকরণে আধুনিকতা নিয়ে আসতে হয়েছিল। লেখকের কথায়—‘এই দেশেরই মাটিতে ছিল আমাদের আধুনিকতার শেকড়।....জগৎ জীবনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতাই, ঝুঁটি ধরে আমাদের বহুতল ও মাত্রাবিশিষ্ট বাস্তবতাকে চিনতে শেখাল।’ গল্পের বিষয়বস্তু প্রকাশ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি কিভাবে

'ছবি গান, নাটক, ফিল্ম-এর বিভিন্ন আঙ্গিক বা দেশি-বিদেশি সাহিত্য-ঐতিহ্য মূল সমস্যা ফোটাতে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে।

পুরাণের ঐতিহ্য দীপেন্দ্রনাথের মননে ও উপলব্ধিতে মিলেমিশে থাকে। বিশ্বব্যাপী একচ্ছত্র শক্তিমত্তা ও অধিকারের প্রতীক হয়ে যে অশ্ব ভুবনবিজয় করে ফেরে—তারই হত্যাকাণ্ডের পর সেই মাংস আহূতি দিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। এমন রীতির মধ্যে রয়েছে অনেক পরিহাস ও প্রহসন। আলোচ্য গল্পে দেহে-মনে পবিত্র, প্রেমের উপলব্ধিতে মাধুর্যময় চিত্তের অধিকারী কাঞ্চন ও রেখা তাদের যৌবনকে সার্থকতা দেবার কোনো পথ খুঁজে পায়নি। কী অপরিসীম আত্মিক সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা নিয়ে তাদের যৌবন ব্যর্থ হয়ে গেল। অবনমিত সমাজজীবনে সেই ব্যর্থতার ছবিও ফুটে ওঠে ঘোড়ার প্রতীকে। তেজোদৃপ্ত, বলশালী যৌবনস্বপ্ন যেভাবে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নিরন্তর মাথা কোটে- তাই যেন প্রতীকায়িত হয় ঘোড়ার আর একটি চিত্রকল্পে—"স্বর্গের উচ্চৈঃশ্রবা এখন ধর্মনিরপেক্ষ কলকাতার মাঠে পাটোয়ারী বুদ্ধিতে বাজী দৌড়ায়।"

২.৩.১১.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'পলাতক ও অনুসরণকারী' এদেশের তারুণ্যের ওপরে নেমে আসা এক বিপর্যয়ের সাক্ষ্য বহন করে।–আলোচনা করো।

২। 'পলাতক ও অনুসরণকারী' গল্পের আঙ্গিক ও প্রেরণায় কিছুটা নাট্যলক্ষণ রয়েছে।–এর ফলে গল্পটি কীভাবে শিল্পগুণান্বিত হয়েছে তা স্পষ্ট করো।

৩। 'অশ্বমেধের ঘোড়া' গল্পে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সামাজিক অভিঘাতে আর্ত সময়ের যে মর্মস্পর্শী ছবিটি তুলে ধরেছেন তা নিজের ভাষায় বিবৃত করো।

৪। 'এই কলকাতা দিন দিন আধুনিক হচ্ছে, বর্বর হচ্ছে, সূক্ষ্মতার নামে দড়কচা মেরে যাচ্ছে'।–এই উক্তির আলোকে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশ্বমেধের ঘোড়া' গল্পটির বক্তব্য বিষয় স্পষ্ট করো।

৫। 'অশ্বমেধের ঘোড়া' গল্প অবলম্বন করে গল্পকার দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা কতখানি সার্থকতা লাভ করেছে তার পরিচয় দাও।

পর্যায়গ্রন্থ - ৩

একক - ১২

বিন্যাসক্রম :

২.৩.১২.১ : লেখক পরিচিতি—সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮)

২.৩.১২.২ : পাড়ি (সমরেশ বসু)

২.৩.১২.৩ : লেখক পরিচিতি—সন্তোষ কুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫)

২.৩.১২.৪ : দুই রাত্রি (সন্তোষ কুমার ঘোষ)

২.৩.১২.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.৩.১২.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

২.৩.১২.১ : লেখক পরিচিতি—সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮)

জন্ম ১৯২৪। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে শক্তিমান লেখক হিসেবে স্বীকৃত। বাল্যকাল পূর্ববঙ্গে কাটলেও তারপর চলে এসেছেন এপার বাংলায়। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম, রাজনীতির জগতে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকা, বিভিন্ন ধরণের পেশায় নিযুক্ত হওয়া—এই সবকিছুর মধ্যে দিয়ে এক প্রখর, আত্মস্থ লেখকসত্তা বাংলা সাহিত্যে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। পরবর্তীকালে সাহিত্যরচনা তাঁর জীবিকা হিসেবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। "বাংলা সাহিত্যে কিংবদন্তীর নায়ক হলেন সমরেশ বসু"। স্বনামে বিভিন্ন পর্বে লেখা তাঁর উপন্যাসের মধ্যে বিশিষ্ট 'বি. টি. রোডের ধারে', 'গঙ্গা', 'জগদ্দল', 'বিবর-প্রজাপতি পাতক', মহাকালের রথের ঘোড়া', 'যুগ যুগ জিয়ে', 'তিনপুরুষ'। কালকূট ছদ্মনামে বাংলা কথাসাহিত্যে সংযোজন করেছেন মহার্ঘ একটি শাখা—

'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে', 'কোথায় পাব তারে', 'শাম্ব' যার মধ্যে অনন্য। অসংখ্য ছোটোগল্প সমরেশ বসুর খ্যাতির দিগন্ত আরও উজ্জ্বল করেছে। বিচিত্র রস ও উপকরণের সেইসব গল্পের মধ্যে পড়ে— 'স্বীকারোক্তি', 'ছেঁড়া তমসুক', 'মানুষ রতন', 'উরাতীয়া', 'নাচঘর', 'শহীদের মা'।

২.৩.১২.২ : পাড়ি (সমরেশ বসু)

নৈহাটী জগদ্দলের বস্তিজীবন থেকে সমরেশ বসু বাংলা সাহিত্যে অনাস্বাদিত রসের উপকরণ সংগ্রহ করে জোগান দিয়েছিলেন। পাঠক আশ্চর্য হয়ে মানবজীবনের ক্লেদ আর উত্তরণের ইতিবৃত্ত রচিত হতে দেখেছে 'বি. টি. রোডের ধারে' উপন্যাসে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথে, কিন্তু স্বকীয় প্রেরণা ও শক্তিতে বাস্তববাদকে সফল সিদ্ধিতে রূপদান করলেন সমরেশ। তাঁর ছোটোগল্পেও সেই বাস্তবরসের প্রতি আনুগত্য, মানবিক মূল্যবোধের প্রতি নিষ্ঠা। পাড়ি গল্পটি পড়তে গিয়ে অনিবার্যভাবে উল্লেখিত উপন্যাস মনে পড়ে— বিশেষত সূচনাপর্বের গঙ্গা ও গঙ্গাতীরের বর্ণনায়। "আশশেওড়া আর কালকাসুন্দের অবাধ বিস্তার চারিদিকে। মাঝে মাঝে বট-অশ্বত্থ-পিটুলি-সজনে, সব আপনি-গজানো গাছ দাঁড়িয়েছে মাথা তুলে। যেন নিচের কচি-কাঁচা ঝোপঝাড়গুলিকে খবরদারি করছে উঁচু মাথায়।

বনঝোপ নিয়ে হামা দিয়ে দিয়ে জমি উঁচুতে উঠেছে পুবে। একটু উত্তরে, উঁচুতে দেখা যায় একটি কারখানাবাড়ি। বাদবাকি হারিয়ে গেছে গাছের আড়ালে। আর পশ্চিমে মাটি নেমেছে গড়িয়ে গড়িয়ে। নামতে নামতে গড়িয়ে গেছে গঙ্গার জলে।

আষাঢ়ের গঙ্গা। অম্বুবাচীর পর রক্তঢল নেমেছে তার বুকে। মেয়ে গঙ্গা মা হয়েছে। ভারী হয়েছে, বাড় লেগেছে, টান বেড়েছে, দুলছে, নাচছে, আছড়ে আছড়ে পড়ছে। ফুলছে, ফাঁপছে, যেন আর ধরে রাখতে পারছে না নিজেকে। বোঝা যাচ্ছে আরো বাড়বে। স্রোত সর্পিল হচ্ছে। বেঁকেছে হঠাৎ। তাপর লাটিমটির মতো বোঁ করে পাক খেয়ে যাচ্ছে। স্রোতের গায়ে ওগুলি ছোটো ছোটো ঘূর্ণি। মানুষের ভয় নেই, মরণ নেই ওতে পশুর। শুকনো পাতা পড়ে, কুটো পড়ে। অমনি গিলে নেয় টপাস করে। বড়ো ঘূর্ণি হলে মানুষ গিলত। এই ঘূর্ণি ঘূর্ণি খেলা।.....

বর্ষার গঙ্গার এই ছবি, ছোটোগল্পের শিল্পরূপের দিক থেকে হয়ত একটু দীর্ঘই — কিন্তু গল্পের মূল ভাবের জন্য প্রয়োজনীয়। ভরা গঙ্গা — তার ওপরে ঘনিয়ে ওঠা মেঘের ঘটা। পরের স্তবকে আসে আকাশের চিত্র, আকাশে-নদীতে মিলে প্রকৃতির ভয়াল সুন্দর রূপ — "মেঘ জমেছে মেঘের পরে। বড়ো বড়ো মেঘের চাংড়া নেমে এসেছে মেঘের ঠোঁটে, ব্যাকুল ঢেউয়ের বুকে। নেমে এসেছে গাছের মাথায়। হাত বাড়িয়ে ছুঁতে আসছে আশশেওড়া কালকাসুন্দের লকলকে ডগা। বাতাসের ঘায়ে মেঘ দোমড়াচ্ছে, দলা পাকাচ্ছে। আবার ছড়িয়ে ছড়িয়ে আসছে নেমে"।

এই পটভূমিতে যে অঞ্চলের ত্রিসীমানায় জনমনুষ্য নেই—সেখানে দেখা যায় দুটি অল্পবয়সী মেয়ে-পুরুষ শুধু বসে'—বেঁটে ঝাড়ালো এক বটের তলায় — "এই আষাঢ় ঢলকানো গৈরিক গঙ্গা, এই জনশূন্য বনঝোপ, ওই মেঘভরা আকাশ, তার তলায় ওই দুটি। সহসা মনে হয়, পৃথিবীর সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মেয়ে আর পুরুষ বসে আছে ঝোপজঙ্গলের অসহায় আশ্রয়ে।"

এই দুটি ছেলেমেয়েকে বিহারের গহনগ্রাম থেকে কাজ ও নগদ রোজগারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শহুরে শিল্পাঞ্চলের ঝাড়ুদার-সর্দার নন্কু নিয়ে এসেছিল। মিউনিসিপ্যালিটির ভোট চুকে যেতেই এদের কাজও চুকে গেল। গাঁয়ে নাগিনপ্রসাদের শুয়োর-ভেড়া চরানো ও পেটভাতায় কাজের চেয়ে আকর্ষণীয় মনে হওয়াতে বাবুসাহেবকে কিছু না বলেই নগদ ষাট টাকা মাসে রোজগারের জন্য চলে এসেছিল। ষাটের জায়গায় পেয়েছে প্রায় অর্ধেক টাকা। তাও আবার দেড় মাস যেতেই ছুটি হয়ে গেলঙ্গ আর 'কাজ নেই তো খাওয়া নেই'। ধাঙড় বস্তির গরীব স্বজনেরা কোনো মতে দিন সাত খেতে দিয়েছে। কিন্তু তাদেরই বা কী সঙ্গতিঙ্গ "পরশু রাতে শেষবার খাওয়া পাওয়া গেছে। আর নয়।" অনিশ্চিত আসন্ন প্রতিটি মুহূর্ত, প্রাণরক্ষার জন্য যখন প্রান্তিক প্রয়োজনটুকুও অমিল, তখন লোকালয় ছেড়ে নির্জন এই নদীতীরে এসে বসে থাকা আর অসহায়ভাবে পরিস্থিতিকে ভুলে থাকতে চাওয়া ছাড়া আর কীই বা করতে পারে ওরা? "দুজনের হৃৎপিণ্ড দুটি পেটে এসে দম নিচ্ছিল। আর গায়ে গা রেখে দুটিতে জীইয়ে রাখছিল রক্তপ্রবাহ। গায়ে গা ঠেকিয়ে যেন রক্তে রক্তে সাহস সঞ্চয় করছিল। গা শুঁকে, চটকে, চেটে, বিকট ভয়কে মুখে থাবড়ি দিয়ে রাখছিল সরিয়ে। যে ভয়টা গা বেয়ে উঠে ওদের একেবারে শেষ করে দিতে চাইছিল। যেন ওদের ভয় ধরিয়ে দেওয়ার জন্যেই আকাশ কালো হয়ে নেমে আসছিল।" একটা জোয়ার, তারপর ভাটার টান এই নদীতীরে বসে দেখেছে ওরা। দীর্ঘ বিলম্বিত কিন্তু বেপরোয়া সময়ে আবার লেগেছে জোয়ার। ঠিক তেমন সময়ে ঘটল এমন কিছু যাতে এরা সচকিত হয়ে উঠে বসল। দুজন লোকের তত্ত্বাবধানে একপাল শুয়োর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে পুবের উঁচু দিক থেকে ঝোপজঙ্গল মাড়িয়ে এসে হাজির হল। বোঝা গেল নাদুসনুদুস, সোনার মাকড়ি কানে সমানের দুটো দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো এমন যে লোকটি, সেই সম্প্রতি ধাঙড় বস্তি ঘুরে শুয়োরগুলি কিনে এনেছে ওপারে নিয়ে বিক্রি করে লাভ করার উদ্দেশ্যে। সঙ্গী লোকটি

সামনের বস্তির ময়লাটানা গাড়োয়ান— কেনাবেচার সহকারী। এদের অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়ে দেহাতী ছেলেমেয়ে দুটি। পশুগুলিকে পথ দেখিয়ে নিয়ন্ত্রিত ভাবে ভরা আষাঢ়মাসের গঙ্গা পার করানো অত্যন্ত দুরূহ কাজ। রীতিমতো দক্ষতা এবং ভয়ঙ্কর পরিশ্রমসাধ্য এই অদ্ভুত কাজ করার লোক পাওয়াও সহজ নয়। কিন্তু প্রয়োজন বড়ো বালাই। ক্ষিদে আরও বালাই। শেষ খাওয়া যারা খেয়েছিল পরশু রাতে, তাদের ক্ষুধাসর্বস্ব অনুভূতিতেও যেন জোয়ারের দোলা লাগল, যখনই তারা একটি কাজের প্রস্তাব পেল। জীবন বিপন্ন করা কাজ হলেও, কাজের তুলনায় পারিশ্রমিক অন্যায় রকমে কম হলেও এই প্রস্তাবের কোনো বিকল্প নেই জেনে তারা মেনে নিল। এই কাজে লাগে একটি খালি নৌকা-'খবরদারি লাও।' কিন্তু সেটুকুও খরচ করতে নারাজ 'সোনার মাকড়ি'। সে তার হিসেবী অভিজ্ঞতায় বুঝে নিয়েছে যে বেগতিক ছেলেমেয়ে দুটি এতেই রাজি হয়ে যাবে। ঊনত্রিশ জানোয়ার দুজনে মিলে পার করিয়ে দেবে। মজুরি পাবে ঊনত্রিশ আনা—দুটাকারও কম। "ওরা পরস্পর চোখাচোখি করল আবার। আর সেই মুহূর্তে মনে মনে রাজি হয়ে গেল দুজনে। সেই মুহূর্তে ওদের নটরক্ত উঠল তোলপাড় করে। আঁকুপাঁকু করে উঠল অভুক্ত পেটের মধ্যে। পড়ে থাকাটা মনে হল মরে থাকার মতো। দুটিতে কাপড়ে কষুনি দিল।"

ঊনত্রিশ পশু, নির্বোধ কিন্তু সহজাত প্রাণচেতনায় বিপদআশঙ্কায় তারা জলে নামতে বিমুখ। তাদের নিয়ন্ত্রণ করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব হাতে একটি করে শুধু লাঠি-ছপ্‌টি নিয়ে দুজন অভুক্ত নির্জীব মানুষ প্রস্তুত হয়ে নিল। আবাল্য পশু বা ইতর প্রাণীদের সঙ্গে থাকার ফলে তারা জেনে গিয়েছিল জানোয়ারদের রীতি ও স্বভাব। দরিয়া যুঝতে যাচ্ছে, তাদের নিজেদের খালি পেট, কিন্তু পশুগুলির ভরপেট না হলে যেতে পারবে না। "উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করল, হুজুর, এদের খানা ভরপেট আছে তো? "আছে জেনে নিশ্চিন্ত। এবার তারা যথার্থ তত্ত্বাবধায়কের সুরে হাঁক দিল, সুর করে ডাকল মেয়েটি, তাতে পশুগুলির প্রত্যয় হল। জানোয়ারগুলি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল সোহাগী সংশয়ের সুরে। মাথা তুলল একে একে ঝুপসি ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে। ছুঁচলো মুখ তুলে যেন গন্ধ শুঁকে দেখল ডাকের ভাব। চকচক করে উঠল কুঁতকুঁতে গোল চোখগুলি। ঘেঁষাঘেঁষি করে এল সবাই গায়ে গায়ে। গায়ে গায়ে সবাই জড়ো হতে লাগল ওদের মাঝখানে।

উ - র্ - র্ - র্ - র্ - আ -উ - র্ - র্ - র্ - আ...........

আ - হুঃ! আ - হুঃ!

সোনার মাকড়ির সোনার দাঁত উঠল চক্‌চকিয়ে। গাড়োয়ানটা ঠিক জানোয়ারগুলির মতো গোল গোল চোখে তারিফ করতে লাগল মনে মনে, হ্যাঁ, ঠিক যেন শুয়োরের আদত বাপ-মা দুটি।

আর ওদের উপোসে মরণের ভয়টা যেন হারিয়ে গেল ওই সুরের মধ্যে। অভর পেটের ক্ষুধার যন্ত্রণাটা এক নতুন সংযমী ক্ষুধার রসে উঠল ভরে। খেতে পাওয়া যাবে সেই আশায় শক্ত হল হৃৎপিণ্ড। কাজ পাওয়া গেছে, কাজ করতে হবে আগে। কঠিন কাজ।"

জোয়ারের গঙ্গায় আকাশঢাকা মেঘের আর ঘোলা লাল জলের তরঙ্গের মাঝখান দিয়ে ঊনত্রিশটি জানোয়ারকে ওপারে উত্তরের শিবমন্দিরে পৌঁছে দিতে হবে। কাজটা শুরু করাই ভয়ানক কঠিন এই কারণে যে পশুগুলি প্রথমত জলে নামতে চায় না। তাদের সোহাগের ডাকে, তাড়া দিয়ে জলে নামানোমাত্র ভীষণ স্রোতে ভেসে যেতে থাকে। এভাবে চললে পার হাওয়া যাবে না। তখন একজন তাড়া দিয়ে জলে নামায়। অন্যজন সামনে এগিয়ে জলে পড়ে লাঠি দিয়ে ওদের মুখ ফিরিয়ে দিল ওপারের দিকে। জলে ও আকাশে চলেছে অদ্ভুত রহস্যময় সব প্রাকৃতিক তাণ্ডব। কখনো পুবের হ্যাঁচকা টান, কখনো দক্ষিণা বাতাস ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে জলে। মেঘগুলো দলা পাকিয়ে যেন নেমে আসছে কোথাও। এরই মাঝে শুয়োরগুলিকে নিয়ে জানা-অজানা বিচিত্র ভয়ের সম্ভাবনাকে জোর করে উড়িয়ে দিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে মনে মনে ছেলেটি

আর মেয়েটি। এরই মাঝে গঙ্গা মায়ের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছে লাঠি আর ছপ্‌টির ঘা জলে পড়ছে বলে। দলছুট হওয়া গাভীন শুকরীটিকে দলে ফিরিয়ে আনা, জলের তলায় কুমীর-হাঙরের আক্রমণের সদা আতঙ্কের সঙ্গে চলেছে জলের মধ্যে একটানা যুদ্ধ। তারই মাঝে দুজনে কাছাকাছি হলেই পুরুষটি মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করছে তার কষ্ট হচ্ছে কিনা - কখনও আবার তাও পারছে না ভয়ে 'যদি বলে নাই শক্‌তিঙ্গ আর পারছিনে। বিদায় দাও।' অমনি মনে পড়ে তাদের বিয়ের দিনের কথা। রামুয়ার বাজানো বাঁশির সুর যেন শুনতে পায়। হঠাৎ করে বিদ্যুৎঝলক পরমুহূর্তেই বজ্রপাতের শব্দ। জানোয়ারের মিছিল ভেঙে গেল। আবার তাদের একত্রিত করা। ঠাণ্ডা জলেও তাদের মাথা-হাত-পায়ের টানটান শিরা-পরিশ্রমের ঘাম ঝরে মিশে যাচ্ছে জলে। আবার বিপদ। গাভীর শুয়োরটা একটা ঘুর্ণির মধ্যে পড়ে গেছে। প্রাণ হাতে নিয়ে ছেলেটি সেই ঘূর্ণির দিকে লাঠি বাড়িয়ে দিল। লাঠি কামড়ে ধরে বেরিয়ে এল পশুটি। বেঁচে গেল। কিন্তু এত কষ্টের পরেও আরও কিছু ছিল তাদের নিয়তিতে। ডাঙার কাছাকাছি এসে ছেলেটি দেখে মেয়েটি জলে যেন ডুবছে। কাছে গিয়ে বুঝতে পারে স্রোতে তার ন্যূনতম লজ্জাবস্ত্রটি ভেসে গেছে। তাই জলের আড়াল নিয়ে ব্যথাতুর লজ্জায়, মেয়েটি নিজেকে গোপন করতে চাইছে। পুরুষ তার দায়িত্ব শেষ করে অর্থাৎ জানোয়ারগুলিকে তুলে দিয়ে এসে নিজের ছোটো কাপড়টা ছুঁড়ে দিল, নিজে কোমরের গামছাটা নিল পরে।

এরপরের দৃশ্য জলে নয়। সামান্য হলেও সেই মজুরির টাকায় রুটি-ভাজি দিয়ে দুদিন পর খেয়ে নিচ্ছে তারা। খেতে বসে মেয়েটির চোখে ঝরছে জল। তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে ছেলেটি। তারও পর সেই প্রাগৈতিহাসিক আবহাওয়ায় "ওদের রক্তেই ভাঁটা ছেড়ে জোয়ার এল। জ্বলন্ত কাঠটা খুঁচিয়ে দিল নিভিয়ে। তারপর দুজনে রক্তে রক্ত যোগ করে অনুভব করতে লাগল বাঁচাটা। শুধু কাছে ও দূরে কয়েকটি বিজলীবাতি বিচিত্র ঠেকতে লাগল এই প্রাগৈতিহাসিক আবহাওয়ায়।"

'পাড়ি' গল্পটি সমরেশ বসুর বাস্তব অভিজ্ঞতায় পাওয়া প্লট। ধর্মঘটী শ্রমিক দম্পতিকে সত্যিই একপাল শুয়োর পার করিয়ে দিতে দেখেছিলেন লেখক। গভীর মমত্বে নদীর ওপারে যখন পশুগুলিকে তারা নিয়ে গিয়েছিল, তার মধ্যে ফুটে উঠেছিল তাদের "জীবন সংগ্রাম, শ্রমের মহত্ত্ব, মানবিক সম্পর্কের অপ্রতিরোধ্য আবেগ।" গল্পটিকে তাই মানবিক রসের বা মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ গল্প বলা যায়।

'পাড়ি' গল্পে তথাকথিত মহেন্দ্রক্ষণ গল্পের একেবারে শেষে উপলব্ধ হয়। সুকঠিন জীবনসংগ্রাম, প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে তাকে হারিয়ে দিয়ে জীবনবোধের যে প্রতিষ্ঠা ওই কম বয়েসী অশিক্ষিত ছেলেমেয়েদুটির সহজ চেতনায় তা আমাদের মুগ্ধ করে। প্রাগৈতিহাসিক জীবনধারার মহৎ প্রেক্ষাপটে মানব-ইতরপ্রাণী সব একাকার-ফেঁপে ফুলে ওঠা নদীর জল, নিকষ অন্ধকার, হাওয়ার শণন এবং অঝোরে ঝরা বৃষ্টি। আধুনিক মননশীল এবং অবশ্যই বাস্তববাদী লেখক বলতে ভোলেননি দূরের বিজলীবাতির কথা যদিও তারা যেন এখানে 'বিচিত্র'—অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। শুধু শতাব্দীবাহিত হয়ে আসা 'তুলসীদাস' গুঞ্জরিত হয়েছে মিনতৃপ্ত পুরুষের কণ্ঠে "যুগ যুগ পর আয়ীলবনি পবনসুত মহাবীর-হই রামো।"

সমরেশ বসুর স্বকীয় জীবনভাবনা তাঁর অতুলনীয় ভাষায় অনুদিত। অন্তেবাসী ভুখা মানুষের মহনীয়তার বৈপরীত্যে ধনশালী শোষক ব্যাপারীর চরিত্র সূক্ষ্ম ও বিরল রেখায় এঁকেছেন। 'সোনার মাকড়ি' নামেই যেন লোকটির অব্যর্থ চরিত্রায়ণ। সামান্য আঁচড়ে ইতর প্রাণীর প্রতিও ওই ছেলেমেয়েদুটির ভালোবাসা—'রাগ হল, আবার মায়াও হল।...নিদারুণ সব খিস্তি করতে লাগল রাগে ও সোহাগে।' কিম্বা "এখন আর মানুষ দেখা যায় না। সব শুয়োর হয়ে গেছে। সাতাশের জায়গায় আটাশটা মাদী, আর দুটোর জায়গায় তিনটে মদ্দা হয়েছে।" 'গঙ্গা' উপন্যাসের লেখকের হাতে যেমন গঙ্গা চরিত্র, এখানে স্বল্প অবকাশেও তার আভাস আছে - "গঙ্গা, গঙ্গাময়ীঙ্গ যেন খিলখিল করে হাসছে, কলকল করে কীসব

বলছে।.....আসছিস? আসবি? তোরা ভুখা রয়েছিস আর আমি কত বড়ো হয়েছি। এই বলছে আর হাসছে।.....লাল হয়ে গেছে খুশিতে।"

'পাড়ি' ক্ষুদ্র একটি শব্দমাত্র গল্পের নামকরণে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এই শব্দের শক্তিই গল্পের চুম্বক। প্রতিকূল পৃথিবীতে ও পরিপার্শ্বে অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে গেলে দরকার একাগ্র আন্তরিকতায় নিরন্তর সংগ্রাম। কিন্তু তার সঙ্গে যদি কাজের জন্য ভালোবাসা যোগ হয়, যুক্ত হয় সততা ও নিষ্ঠা, তাহলে মানবজন্মের উদ্ভাসন ঘটে। সমস্ত সীমাবদ্ধতা লঙঘন করে শাশ্বত অস্তিত্বের দ্বারা অন্বিত হতে পারে মানুষ। তাই শুধু পার হওয়া নয়, সংগ্রামশীলতার মধ্যে দিয়ে জীবনকে মহত্তম জয়ে অধিষ্ঠিত করার বোধ সংহত হয়ে রয়েছে 'পাড়ি' নামকরণের মধ্যে।

২.৩.১২.৩ : লেখক পরিচিতি—সন্তোষ কুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫)

জন্ম ১৯২০ তে। সাংবাদিকতার জগতে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। আবার উপন্যাস এবং ছোটোগল্প লিখেও নিজস্ব একটি মৌলিক পদচিহ্ন রেখে গেছেন বাংলা কথাসাহিত্যে। 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ মুহূর্তে যে দৃঢ় পদক্ষেপ সুচিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে 'মুখের রেখা', 'জল দাও', 'শেষ নমস্কার', 'নানা রঙের দিন', 'সময় আমার সময়' ইত্যাদি উপন্যাসের মধ্যে সেই স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত অভিচারণা ক্রমশ আরও উজ্জ্বল রূপ পেয়েছে। শহুরে জীবন, মন ও মননের সূক্ষ্ম রণন, অনুভূতির বৈচিত্র্য ও ওঠাপড়ার কাব্যময় ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়েছে সন্তোষকুমারের বুদ্ধিদীপ্ত ও সংবেদনস্পর্শী গদ্যভাষায়। অজস্র গল্প লিখেছেন। আঙ্গিক-নিরীক্ষায় তাঁর গল্প বাংলা ছোটোগল্পে অভিনব মাত্রা যোজনা করেছে। 'সমস্ত গল্প' তাঁর বিশিষ্ট গল্প-সঙ্কলন। রবীন্দ্রপ্রেমী এই গল্পকার 'রবীন্দ্রচিন্তা', 'রবির কর' নামে রবীন্দ্র সাহিত্য ও রবীন্দ্র গল্পের আলোচনা করেছেন অন্যতর দৃষ্টিকোণ থেকে। আনন্দ পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার (বিশেষ), সাহিত্য আকাদেমি—এই ত্রিবিধ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন সন্তোষকুমার ঘোষ।

২.৩.১২.৪ : দুই রাত্রি (সন্তোষ কুমার ঘোষ)

সুধা ও নিরুপম গল্পের দুই চরিত্র। পরস্পরকে ভালোবাসে এই দুজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষ। কিন্তু এরা সামাজিক ভাবে বৈধ সম্পর্কের সীমার মধ্যে পড়ে না। সুধা বিবাহিতা। তার স্বামী উৎপলের বন্ধু নিরুপম সুধার প্রেমিক। পারিবারিক ও সামাজিক বাতাবরণের মধ্যে এই দুই নরনারী পরস্পর মিলবার আকাঙ্ক্ষার উন্মুখ হয়ে থাকলেও সেই সুযোগ আসে না। সামান্য ফাঁক-ফোঁকর কখনও পাওয়া গেলেও সেই সময়টুকু তাদের তৃপ্ত করতে পারে না। এই অবস্থায় আকস্মিকভাবে এক সুযোগ এসে গেল। উৎপল কোনও বড়ো পদের জন্য চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গেল দিল্লীতে। তাকে স্টেশনে বিদায় জানিয়ে নিরুপমের গাড়ীতে সুধা বেরিয়ে পড়ল বাঁধা গণ্ডি, চেনা শহরের সীমা ছাড়িয়ে নিরুপমেরই দায়িত্বে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে।

গল্পের প্রেক্ষাপট এটুকুই। কিন্তু গল্পটি এরকম মুখপাত করে নিয়ে শুরু হয়নি। লেখকের সুদক্ষ উপস্থাপনায় দেখা যায় সুধা ও নিরুপম শহরতলির কোনো হোটেলের ঘর থেকে মধ্যরাতেই ছিট্‌কে বেরিয়ে এসেছে। গাড়ীর ড্রাইভিং সীটে স্টিয়ারিং হাতে নিরুপম, অন্যপ্রান্তে জানলা ঘেঁষে সুধা। দুজনের মাঝে অপার শূন্যতা। বিচ্ছিন্ন দুই নরনারীর মধ্যে যোগাযোগের লুপ্ত সেতুকে যুক্ত করার লক্ষ্যে নিরুপম নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছে। নির্বিকার সুধার ক্লিষ্ট হতাশ ভঙ্গিতে নিরুপম কখনো বেদনার্ত, কখনও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে মনে মনে। তার ভাবনাগুলি ফুটে উঠছে উত্তম পুরুষের জবানীতে—"হাওড়া স্টেশনে উৎপলকে

উঠিয়ে দিয়ে আসবার পর থেকেই সুধার মধ্যে পরিবর্তনের ভাব টের পেয়েছিলাম, সতেজ ধরনটা আর নেই। গাড়িতে ফিরে এসে ও চুপ করে ছিল। একবার বলল, 'সারাদিন ঘোরঘুরি, ক্লান্ত লাগছে।' তার পরেই বলল, 'মনটা খারাপ লাগছে জানো। উৎপলটা একা চলে গেল। ট্রেন ছাড়ার পর হাত বাড়িয়ে বলছিল —ভালো থেকো, সাবধানে থেকো।' বারবার বলছিল।...একটু পরেই আমরা হোটেলটার বাইরে এসে থামলাম।"

যে সুধা এতদিন নিরুপমকে কোনও নির্জন অবকাশে একান্ত করে পেতে চেয়েছে, প্রকৃতই যখন তেমন একটি সুযোগ এল, তখন তার মানসিক অবস্থান আশ্চর্যভাবে ভিন্ন দিকে সরে গেছে। স্বামীর প্রতি মানবিক টান, সামাজিক বোধ থেকে নৈতিক স্খলনের জন্য আত্মগ্লানি সুধার আগ্রহকে স্তিমিত করেছে। নিরুপমের সঙ্গে হোটেলের ঘরে ঢুকেও সেই প্রতিক্রিয়া সে গোপন করতে পারেনি। নিরুপমের বেদনাক্ত স্মৃতি থেকে উঠে আসে তার স্বগত ভাবনা — ".....এখানে কেন, এখানে কী — সুধা বলে উঠেছিল। ....ছোকরা চাকরটা মুচকি হেসে দু প্লেট চা আর পকোড়া রেখে গেল। চমকে উঠে সুধা বলল 'এ কী'! খানিকটা চা চলকে ফেলল। সব স্বপ্ন টুকরো হয়ে যাচ্ছে, আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না, বিরক্ত গলায় বলে ফেললাম, 'সুধা তুমি এমন ভাব করছো যেন কিছুই জানো না। যেন—' ফুস করে বেলুনের বাতাস বের করে দেওয়ার মতো ভঙ্গিতে যোগ করলাম 'কচি খুকি'।

সুধা তখন ওর সম্পূর্ণ মুখ-পূর্ণিমা আমার মুখে স্থাপিত করে বলল, 'না, জানি। আমি খুকি নই। আমি বত্রিশ। তোমার প্রেমিকা। কিন্তু রক্ষিতাও কি?' চিৎকার করে বলে উঠলাম 'সুধা!' 'তবে কেন', সুধা বলে চলেছিল 'তুমি এখানে আমাকে এনেছ?' নিরুপম নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে বলে উঠেছিল যে, যাদের যাবার আর কোনও জায়গা নেই তারা কোথায় যায় 'কোথায় যাব ভেবেছিলে তুমি? মন্দিরে?' সুধা তার ভুল স্বীকার করে নিল এবং নিরুপমের ধৈর্য ও আত্মসম্মানকে তীব্র আঘাত করে বলে উঠল — 'এইখানেই তো, এই অপমানে। এই আধা-বেশ্যালয়ই আমার উপযুক্ত।' নিরুপম একথার পরে মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলল। সুধারও যেন রোখ চেপে গেল নিজেদের অসহায়তা ও নিষ্কলুষ ভালোবাসার অসম্মানে সে মরীয়া হয়ে যেন শোধ তুলতে চাইল নিজের, নিরুপমের, সমস্ত সমাজ-সংসারের ওপর। হোটেলের ঘরে এক নিরুত্তাপ, নিষ্প্রেম, পরিণামহীন মিলন রচিত হল। সন্তোষকুমারের অনবদ্য গদ্যভাষায় প্রেমমিলনকামী যুগলের সেই ব্যর্থতার মর্মদাহী রূপ প্রকটিত হয়েছে ঃ কী চাই আমি, কী নেব কী দেব, চাওয়া-পাওয়া দেওয়া-নেওয়া সব অন্ধকারে কাঠ ঠোকরানো, অন্ধ আর্ত দুটি কাঠঠোকরা পাখি, শরীর মানে কি একখণ্ড কঠিন কাঠ, কঠিন সাড়াহীন, সাড়াহীন কিন্তু জ্বলছে, রচিত চিতায় বিকট ফটফট যেন, তবু বারবার তাকে ছুঁচ্ছি, যত ছুঁচ্ছি, তত আমার সব কিছু ঝলসাচ্ছে। যখন আলো জ্বাললাম তখন আমার পাশে পোড়া কাঠ ছাড়া কিছু ছিল না।"

চিতা ও পোড়াকাঠ — মৃত প্রেমেরই উপমা-চিত্রকল্প। প্রথম রাত্রির মধ্যযামে প্রেমের সমাধি রচিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে; অথচ অমৃতময়ী নারীর বেদনাকে তার মরমী নায়ক (যে নিয়ে চলেছে ঘটনাধারা ও সম্পর্কসূত্রকে সম্পূর্ণ দায়িত্বে বহন করে) স্পর্শ করতে চাইছে। পূর্ণ বেগে গাড়ি চালিয়ে অভিশপ্ত রাত্রির, অন্ধকার অনুভূতিময় পরিপার্শ্বের কবল থেকে নতুন ভোরের আলোর আশীর্বাদে স্নিগ্ধ কমনীয়তায় অভিষিক্ত করতে চাইছে নিরুপম তাদের ভালোবাসাকে।

হিংস্র শহর, দমবন্ধ গহ্বরের বেড়াজাল ছেড়ে মুক্ত প্রান্তর, ছোটো লোকালয়ের মাঝখান দিয়ে দূরান্তরে যেতে যেতে ক্রমশ গত রাত্রির অভিজ্ঞতায় মাখানো ক্লেদ-অপঘাত-মৃত্যু থেকে নিরুপম ও সুধা ক্রমশ নতুন সকালে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। প্রকৃতির দিগন্তবিসারী আঙিনায় এক পশলা বৃষ্টির রম্য অভিষেকে তাদের সম্পর্কের বুঝি পুনরুজ্জীবন ঘটছিল। আরও অনেক দূর গাড়ি চালিয়ে এসে নির্জন নিস্তব্ধ অপরিচিত একটি স্থানে এসে থামল তারা। গাড়ির কেরিয়ারে রাখা খাদ্য থেকে ক্ষিদে মিটিয়ে নিরুপম ও সুধা ঘুরে ঘুরে

দেখতে থাকল জায়গাটা—ছোটো টিলার মত পাহাড়, দীর্ঘতম ঋষির মত বৃক্ষ, লম্বা ঘাস মাঝে মাঝে, একটি বড়ো ঝিল, এবং তারই মাঝে দাহ করার জন্য একটি শ্মশানও। ক্রমে বিকেলের রোদ পড়ে এল, আসন্ন হল আর একটি অমোঘ রাত্রি। যেহেতু বিগত রাত্রির ব্যর্থতার দায় পুরুষোচিত দায়িত্বে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে—আগামী রাত্রির সম্ভাবনাও নিরুপম নিজের অবচেতন মনের মধ্যে গড়ে নিচ্ছে ঃ অন্ধকার কখনও কখনও কালো কালো ফুলকির মতো নামে, কালো অথচ তপ্ত, অজস্র, অজস্র সেই অন্ধকারে নিরুপম বুঝতে পারল না, সুধার চোখের মনি জ্বলছে কি না। নিজের বুকে হাত দিয়ে টের পেল, হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুততর। আরও একটা পরীক্ষার সম্ভাবনা সে প্রত্যক্ষ করল। কী ঘটবে, এই রাত্রি কী দেবে, প্রাপ্তি কিংবা পুনরপি বঞ্চনা, নিরুপম যন্ত্রণায় মাথায় হাত দিল, সে আর ভাবতে পারছে না। .... অন্যদিকে সুধার শান্ত নির্ভার ও নির্ভীক আত্মস্থতাকে মনে হল বিশ্বাস আর সমর্পণের পূর্ণতা। এইভাবে জ্যোৎস্নাময় রাত্রি নিবিড় হয়ে নিদ্রিতা সুধার পাশে একাকী জাগ্রত পুরুষ নিরুপমের অস্তিত্ব ঘিরে স্নেহক্ষীরা জননী প্রতিমা রূপে ঘিরে রইল। এক অসীম আশ্বাস অকৃপণ বৃষ্টিধারার মতো নিরুপমকে স্বর্গীয় আনন্দে অভিষিক্ত করতে লাগল। সেই অনির্বচনীয় অনুভব ত্যাগ করে কোনও ইন্দ্রিয়সুখাকাঙ্ক্ষায় তার ইচ্ছেই হল না।

দ্বিতীয় সকালে, দ্বিতীয় রাত্রির পর নিরুপম ও সুধা ফিরে আসছিল তাদের অনিবার্য চর্যায়। চলার পথে সামান্য কয়েকটি বাক্যবিনিময়। গত রাত্রির মহৎ অনুভবের কথা। একটি অর্ধস্ফুট স্বপ্নের কথা—যা ভাষায় প্রকাশ করলে হয়তো গুরুত্ব বা সূক্ষ্মতা হারাবে, তাই অকথিত রয়ে গেল — 'কোনও মারণাস্ত্রে পৃথিবীটা ধুলো ধুলো হয়ে গেছে, কিন্তু আশ্চর্য তখনও জ্যোৎস্না আছে, আর সেই আলোয় ভালোবাসাও পরিব্যাপ্ত, ভাসছে।'

বহু আকাঙ্ক্ষিত মিলনের দুটি রাত্রির বৈপরীত্য দুই প্রেমিকযুগলের অনুভবে গাঁথা। 'আসলে আমরা জানিনা আমরা কি চাই'—সেই চাওয়াকে খুঁজতে বেরিয়ে প্রথম রাত্রির প্রাপ্তির পরিণতি হল বঞ্চনা। নিরুপমের প্রেমের প্রতি আস্থা ও পুরুষকারের উদ্যম তাকে পুনরপি অন্বেষার প্রেরণা দিল। সম্পূর্ণ অপরিকল্পিতভাবে তারা এসে ঠেকল আকস্মিক পরিপার্শ্বে। সেখান থেকেই উত্তরণের সূত্র আপনি এসে ধরা দিল। অনাবিল জ্যোৎস্নায় নির্জন একাকীত্বের মাঝে দ্বিতীয় রাত্রিতে দেহমিলনপিপাসা তাদের আর্ত করেনি —পরিপ্লুত প্রেমানুভবে, অকলঙ্ক শুভ্রতায় স্নাত হয়ে তারা ফিরে চলল নির্দিষ্ট গন্তব্যে।

'দুই রাত্রি' গল্পটি প্রেমের গল্প নিশ্চয়ই। তার সঙ্গে একে কাব্যধর্মী এবং দার্শনিক চেতনাসমৃদ্ধ গল্পও বলা যেতে পারে। নিষিদ্ধ প্রেম এই গল্পের দুই নরনারীকে অভিভূত করেছে। কিন্তু লেখকের আশ্চর্য দক্ষতায় এই 'নিষিদ্ধ' তকমা খসে গেছে প্রথম রাত্রির পর। প্রথম রাত্রিতে পরস্ত্রী সুধার কাছে অবৈধ সম্পর্কে যুক্ত হওয়াজনিত গ্লানিবোধ তার মানবিক শুদ্ধতার দ্যোতক। তাছাড়া শুধু দেহমিলনের জন্য লোকালয় ছেড়ে পালিয়ে হোটেলের ঘরে সম্ভোগলীলায় যে আত্মিক অবনমন ঘটে, তার হীনতা সুধা ও নিরুপমকে গ্রাস করেছিল। প্রথম রাত্রির দুর্বহ বেদনা নিয়ে তারা মধ্যরাতেই বেরিয়ে পড়েছিল অনির্দেশ্যভাবে। এখান থেকে নিষিদ্ধ নয়, প্রেম যে নিকষিত হেম, তারই মরীয়া অন্বেষা এই দুটি নরনারীকে চিরন্তন প্রেমিক-প্রেমিকা বলে চিনিয়ে দিয়েছে। তার পরিণাম শুধু ভাবগভীরতায়। 'পাওয়ার চরম চেহারাটা কি অত অগভীর হতে পারে?' এই আত্মবিশ্বাস তথা প্রেমে বিশ্বাস তাদের চরম প্রাপ্তির ঠিকানায় পৌঁছে দিয়েছে।

এই গল্পের ক্লাইম্যাক্স এসেছে চেকভের অধিকাংশ গল্পের সাদৃশ্যে। চমকে দিয়ে নয়, পাঠককে গল্প শেষে যেখানে গভীর অনুভূতিলোকে উত্তীর্ণ করেন লেখক, সেখানেই গল্পের চরম ক্ষণ চিহ্নিত হয়।

সন্তোষকুমার ঘোষের গদ্যভাষা ও শৈলীতে মিশে আছে স্নিগ্ধ কাব্যাভাস। প্রেমমনস্তত্ত্বের মতো জটিল বিষয়কে নিয়ে তিনি নিরীক্ষা করেছেন। মানবমনের রহস্যলোক থেকে শুরু করে প্রকৃতিলোকের

গহন ভাষাকে তিনি স্বচ্ছ-সংবেদনময় করেছেন; সেই রসায়নে যে দার্শনিক উপলব্ধিতে সঞ্জীবিত করেছেন গল্পটিকে, তার তুলনা মেলা ভার। এসবই সম্ভব হয়েছে লেখকের বিশিষ্ট শিল্পীব্যক্তিত্বের গুণে। স্বীকার করতেই হয়, রবীন্দ্রপ্রেমী সন্তোষকুমারের গল্পে অসীমের আর নির্বিশেষের ব্যঞ্জনা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গৃহীত হয়েছে।

'দুই রাত্রি' গল্পের নামকরণ প্রসঙ্গে লেখক স্বয়ং মন্তব্য করেছেন—'দুই রাত্রি নয়, আসলে একটাই রাত্রি'। বলা বাহুল্য, এই মন্তব্য গল্পটির বিষয় বা মূল ভাব বিষয়েও খাটে। বোঝা যায়, একরাত্রি ধরলে দ্বিতীয় বা শেষ রাত্রিই ধর্তব্য। কিন্তু প্রথম রাত্রি যদি ভূমিকা রচনা না করত, তাহলে দ্বিতীয়টির কোনও সম্ভাবনাই থাকত না। তাই প্রথম রাত্রিটিও মূল্যবান। অনুভবের শীর্ষে নিয়ে যাবার সোপানস্বরূপ। সেক্ষেত্রে স্রষ্টার বক্তব্যের এমন অর্থ করাই ঠিক হবে যে গল্পের বক্তব্যটি যে রাত্রির অভিজ্ঞতা-বর্ণনায় সত্য রূপে প্রতিপাদিত হয়েছে—সেটিই একতম। "সুতরাং 'দুই রাত্রি' নয়, আসলে 'এক রাত্রি'। যে রাত্তিরটা কুহকিনীর মতো মাঝে হাতছানি দিতেও পারে, না দিলেও ক্ষতি নেই। তবু ওরা থাকবে, ওরা বাঁচবে।"...

২.৩.১২.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'পাড়ি' গল্পের নামকরম কতখানি যুক্তিসঙ্গত হয়েছে বিচার করো।

২। "জীবন সংগ্রাম, শ্রমের মহত্ব, মানব সম্পর্কের অপ্রতিরোধ্য আবেগই গল্পটির মূল বিষয়।"–'পাড়ি' গল্প সম্পর্কে স্রষ্টা সমরেশ বসুর এই মন্তব্যটি ব্যাখ্যা করো।

৩। সমরেশ বসুর 'পাড়ি'–গল্পটি সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিক ও মাত্রা নিয়ে বৈচিত্র্যমন্ডিত হয়ে উঠেছে। গল্পটি বিশ্লেষণ করে মন্তব্যটির যথার্থতা সপ্রমাণ করো।

৪। ছোটোগল্প হিসেবে 'দুই রাত্রি' গল্পটির শিল্পসার্থকতা সম্পর্কে তোমার অভিমত লিপিবদ্ধ করো।

৫। মরে যাওয়া কামনা কীভাবে 'দুই রাত্রি' গল্পে বাঁচার গল্প হয়ে উঠেছে তা নিজের ভাষায় বুঝিয়ে দাও।

২.৩.১২.৬ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। সাহিত্যে ছোটোগল্প—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

২। ছোটোগল্পের কথা—রথীন্দ্রনাথ রায়

৩। বাংলা ছোটোগল্প—শিশিরকুমার দাস

৪। বাংলা ছোটোগল্প ও গল্পকার—ভূদেব চৌধুরী

৫। কালের পুত্তলিকা—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

৬। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য—গোপিকানাথ রায়চৌধুরী

৭। ছোটোগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ—বীরেন্দ্র দত্ত

৮। সুবোধ ঘোষ : কথাসাহিত্য—অরিন্দম গোস্বামী

৯। সন্তোষকুমার ঘোষ : জীবন ও সাহিত্য—অলোককুমার চক্রবর্তী

দ্বিতীয় পত্র

পর্যায়গ্রন্থ - ৪

চল্লিশোত্তর বাংলা প্রবন্ধ

(সংস্কৃতির রূপান্তর ঃ গোপাল হালদার)

একক - ১৩

বিশ্ববিপ্লব ও বিশ্বশান্তি

বিন্যাসক্রম :

২.৪.১৩.১ : ভূমিকা
২.৪.১৩.২ : গোপাল হালদার : জীবন
২.৪.১৩.৩ : বিশ্ববিপ্লব ও বিশ্বশান্তি
২.৪.১৩.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.৪.১৩.১ : ভূমিকা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে 'সংস্কৃতি' শব্দের চল বাংলায় ছিল না। তখন 'কৃষ্টি' শব্দটি কালচার শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হতো। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ বিষয়ে গবেষণা করতে লণ্ডনে গিয়ে এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর কাছ থেকে, মহারাষ্ট্রে 'সংস্কৃতি' শব্দের ব্যাপক প্রচলনের কথা জানতে পেরে দেশে ফিরে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 'কৃষ্টি' শব্দটি যেহেতু কৃষিকর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাই কালচারের বাংলা 'কৃষ্টি'র প্রতি রবীন্দ্রনাথের অস্বস্তি ছিল বরাবর। কৃষ্টির বদলে 'কালচার' অর্থে 'সংস্কৃতি' শব্দের ব্যবহারের সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের দেওয়া প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথ সানন্দে গ্রহণ করলেন। এরপর থেকে সংস্কৃতি শব্দের সর্বত্র এমন উদার প্রয়োগ। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রিয় ছাত্র গোপাল হালদার ১৯৪১ সালে একটা সম্পূর্ণ বই-ই লিখলেন 'সংস্কৃতির রূপান্তর'। এরপর 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ' ও 'বাঙালী সংস্কৃতি' প্রসঙ্গ সংস্কৃতি বিষয়ক এই গ্রন্থ তিনটি গত শতাব্দীর চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাট দশকের শিক্ষিত বাঙালীর অবশ্যপাঠ্য বিবেচিত ছিল।

গোপাল হালদারের মধ্যে স্বদেশী-চেতনার উন্মেষ ঘটে একেবারে শৈশবেই। তারপর ১৪ বছর বয়সে যোগ দেন যুগান্তর বিপ্লবী দলে। বাবার আলমারি থেকে বঙ্কিম গ্রন্থাবলী পড়ে 'আনন্দমঠ'-এ বুঁদ হয়ে ডুবে গেলেও এক সময় আবিষ্কার করেন, বঙ্কিমের 'হিন্দু জাতীয়তার' বল বৃদ্ধি করছেন। গান্ধীজি নোয়াখালি গেলে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় গান্ধীবাদে প্রাথমিক আকৃষ্ট হলেও স্বরাজ সম্পর্কে গান্ধীজির অস্পষ্ট ধারণা এবং রামরাজ্যের ভাবনা গোপাল হালদারকে পরবর্তীকালে গান্ধীবাদ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। সর্বোপরি সুভাষ বসু কংগ্রেস ত্যাগ করতে বাধ্য হলে তিনিও কংগ্রেস ত্যাগ করে সুভাষ চন্দ্রের ফরোয়ার্ড ব্লক পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ১৯৩৮-এ। পরবর্তীতে ১৯৪১-এ হিটলার সোভিয়েত আক্রমণ করলে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন গোপাল হালদার। তাঁর এই বারংবার রাজনৈতিক দর্শন পরিবর্তন, দ্বিধা ও নিষ্ক্রমণ বিষয়ে গভীর অনুসন্ধান করেছেন অনেক লেখকই।

গোপাল হালদার মৌলিক প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি সাহিত্য-সমালোচকের দায়িত্বেও সমান সৃজনশীল ছিলেন। তাঁর রচিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস কিংবা সতীনাথ ভাদুড়ী বিষয়ক গ্রন্থ পড়লে এ বিষয়ে তাঁর

মৌলিকত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের নামকরণ করেছেন 'বাংলা সাহিত্যের রূপ-রেখা'—'ইতিহাস', 'ইতিবৃত্ত' বা 'ইতিকথা' নয়। এই 'রূপরেখা' তিনি এঁকেছেন বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পটভূমিতে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চর্চার তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই অভিনব ও অনন্য।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বিশিষ্ট বাঙালীদের মতো গোপাল হালদার আত্মজীবনী লিখেছেন রূপনারায়নের কূলে।

২.৪.১৩.২ : গোপাল হালদার : জীবনী

'সংস্কৃতির রূপান্তর'-এর লেখক গোপাল হালদার ১৯০২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি বর্তমান বাংলা দেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার বিদ্গাঁঅও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সীতাকান্ত হালদার নোয়াখালি শহরে আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্রিটিশ ঘরানার উদারনীতি, গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের প্রতি সীতাকান্ত বাবু ছিলেন গভীর আস্থাশীল। ১৯৩২ সালে সীতাকান্ত হালদারের মৃত্যু হয়। গোপাল হালদারের স্বীকৃতি অনুযায়ী পিতাই তাঁর জীবনের 'আদর্শ'। এই 'আদর্শ মানুষের' আদলেই গোপাল হালদার তাঁর 'ভদ্রাসন' উপন্যাস মালায় 'ভাঙন', 'স্রোতের দীপ', 'উজানগঙ্গা' পর্বের জ্ঞানশঙ্কর চৌধুরীর চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন। সীতাকান্ত হালদারের চরিত্রের ছাপ 'ত্রিদিবা' উপন্যাসের নায়ক অমিতের পিতার চরিত্রেও লক্ষ করা যায়। গোপাল হালদার তাঁর মননের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল 'সংস্কৃতির রূপান্তর' (১৯৪১) পিতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে তাই লিখেছেন —

"বাংলা দেশের যে যুগ আজ শেষ হইয়াছে তাহার সংস্কৃতির শুভ্র ও সানন্দ প্রকাশ যাঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম আমার সেই পরলোকগত পিতৃদেব সীতাকান্ত হালদার মহাশয়ের চরণোদ্দেশে —"

গোপাল হালদারের মানস গঠনে তাঁর পিতার প্রভাব ছিল অনেকখানি। গোপাল হালদারের মা বিধুমুখী দেবী। তিনি ১৯৬২ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

গোপাল হালদারের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু বাড়ির লাগোয়া 'বঙ্গ-বিদ্যালয়ে'। সেখানে কিছুকাল পড়াশুনার পর ভর্তি হন আর. কে. জুবিলী স্কুলে। ১৯১৮ সালে জুবিলি স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে গোপাল হালদার কলেজীয় শিক্ষা গ্রহণের জন্য চলে আসেন কলকাতায়। ভর্তি হন স্কটিশচার্চ কলেজে —শুরু হয় হস্টেল জীবন।

এরপর ১৯১৯ সালে, কলকাতায় সতেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। এখান থেকেই গোপাল হালদারের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। এই সময় গোপাল হালদার কংগ্রেস সংগঠনের ঘনিষ্ঠ হন। রাজনীতির পাশাপাশি পড়াশোনা কিন্তু ঠিকঠাক চালিয়ে যান। অগিল্ভি হস্টেলের বন্ধু সজনীকান্ত দাস, পরিমল রায়, বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিধর চক্রবর্তী প্রমুখের সহযোগে সাহিত্য মজলিস গড়ে তোলেন এবং সাহিত্য সাধনায় উৎসাহী হয়ে পড়েন। এ সময়ে বেশ কিছু গল্প-প্রবন্ধ 'সবুজপত্র', 'ভারতবর্ষ' ও 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। অমৃতকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় ছদ্মনামে 'সবুজপত্রে' (মাঘ ১৩২৭/৭ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা) পত্রাকারে লেখা 'বাঙালী যুবক ও নন-কো-অপারেশন' রচনাটি সম্ভবত গোপাল হালদারের প্রথম মুদ্রিত রচনা। যাই হোক ১৯২৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম. এ. পাশ করেন। আইন পরীক্ষায়ও কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন এবং ১৯২৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ট্যাগোর ল অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন।

এম.এ. ও 'আইন' পাশের পর মনের মতন বৃত্তি খুঁজে না পেয়ে, গোপাল হালদার ১৯২৫ সালে,

নোয়াখালি শহরে ওকালতি শুরু করেন। কিন্তু ওকালতি তার ভালো লাগল না। বরং নোয়াখালির কংগ্রেস নেতা ক্ষিতীশ রায়চৌধুরী পরিচালিত 'দেশের বাণী'-তে যদ্দিচ্ছা কলম চালনার সুযোগ পেয়ে কিছুটা-বা স্বস্তিবোধ করলেন। লেখার গুণেই গোপাল হালদার প্রবাসী অফিস থেকে প্রকাশিত 'প্রবাসী', 'ওয়েলফেয়ার' ও 'মর্ডান রিভিউ'-এর লেখক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে যান।

১৯২৬ সালে তিনি নোয়াখালি ত্যাগ করেন। আশা, কলকাতার বৃহৎ জীবনে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির আড্ডায়-আসরে মুক্ত বায়ু গ্রহণ করে মনের স্বস্তি ফিরে পান। এই সালেই ভাষাতাত্ত্বিক আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে গোপাল হালদারের 'ইস্টবেঙ্গল ডায়ালেক্টস্'-এর উপর গবেষণা শুরু করেন। ১৯২৮ সালে পূজোর ছুটিতে গুরু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও দাদা রঙীন হালদারের সহযাত্রী হয়ে গোপাল হালদার দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণ তাঁর চিন্তা-ভাবনায় গভীর ছাপ ফেলে। প্রাচীন ভারতের শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই যে ভারতীয় সভ্যতার মর্মবাণী তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। এই শ্রদ্ধা এই উপলব্ধি আজীবন তাঁর সংস্কৃতি সাধনায় জাগ্রত থেকেছে।

এরপর তিনি রাজনৈতিক জীবনে ওতোপ্রতভাবে জড়িয়ে পড়েন। এক সময় তাকে দীর্ঘদিন এই কারণে জেলেও কাটাতে হয়। ১৯৩২-১৯৩৮—এই ছয় বছর তিনি কারাবাসে ছিলেন। তিনি জেলে বসেই সাহিত্যচর্চা, গবেষণা কর্ম ও মার্কসীয় মতাদর্শের চর্চায় মন প্রাণ সঁপে দেন। ১৯৪১ সালে ১লা জানুয়ারী একেবারে নতুন বছরের শুরুতে পার্টির কাছে সদস্যের আবেদন পত্র পাঠান।

১৯৮৩ সালের ১ আগস্ট, একটা চিঠিতে গোপাল হালদার লিখেছিলেন, —

"এই তো এ দেহ, বরাবর অন্তত ষাট বৎসরের রুম্যাটিক allergy-র (সর্দির) সুস্থির আশ্রয়।"

আসলে তাঁর শরীরস্বাস্থ্য কোনোদিনই শক্তপোক্ত ছিল না। দীর্ঘদিন তিনি রোগ ভোগ করেন। এরপর ১৯৯৩ সালের ৪-অক্টোবর (৩ অক্টোবর, রাত ১২টা ৩৫ মি.) কলকাতার এস.এস.কে.এম হাসপাতালে গোপাল হালদার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঐ দিন দুপুরের পর তাঁর মরদেহ ক্রিস্টোফার রোডের বাসভবন থেকে কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্যদপ্তর ভূপেশ গুপ্তভবনে আনা হয়। সেখানে শিল্পী, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁর শবদেহে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। বিকেলে কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

২.৪.১৩.৩ : বিশ্ববিপ্লব ও বিশ্বশান্তি

বিজ্ঞানের ইতিহাসের একটা নতুন অধ্যায় হল—আণবিক শক্তির আবিষ্কার। এই আণবিক শক্তি আবিষ্কারের ইতিহাস না জানলে, না বুঝলে মানুষের ইতিহাসেরও জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অবশ্য বিজ্ঞানের ইতিহাসও মানবোতিহাসের একটা অঙ্গ, মানুষের জ্ঞানযোগের ও কর্মযোগের একটা ক্রমাধিকৃত প্রকাশ। নিশ্চয়ই এই পথ একটানা অগ্রগতির পথ নয়, মানুষের সুবুদ্ধির অবাধ বিজয়ের কাহিনী নয়। আনবিক যুগের দুর্বুদ্ধিও সেইরূপ একেবারে নতুন জিনিস নয়। আগুনের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। কিন্তু আগুনের যদি অপপ্রয়োগ করা হয় তবে ধ্বংস নিশ্চিত। তাই বলে কি কেউ বলবে যে আগুনের কোনো কাজ নেই? তবে আনবিক শক্তির আবিষ্কারের বেলায়ই বা সে কথা খাটবে কেন? আসল কথা হল—দুর্বুদ্ধির হাতে তার প্রয়োগ অনেক মারাত্মক হয়ে ওঠে। এমনও নয় যে এই দুর্বুদ্ধি বা বিকৃতবুদ্ধি উন্মাদ পৃথিবীতে থাকবে না। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিকৃতির বিশেষ অবস্থায় সেই রকম হিটলারী-বুদ্ধির মানুষ জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে বসতে পারে, তাতো প্রমাণিত। আনবিক শক্তির আবিষ্কারের পরেও যদি সমাজ-

বিকৃতি দূর না হয়, তার ফলও খুব সাংঘাতিক হয়ে ওঠে রাষ্ট্রের পক্ষে। অতএব শুধু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের প্রবর্তনে নয়, সামাজিক বিকৃতির মূলোৎপাটনেই বিজ্ঞানের বিপ্লব সম্পূর্ণ হতে পারে। তার জন্য প্রয়োজন সামাজিক বিকৃতির শোধন—আর বিকৃত রাষ্ট্র ও সামরিক শক্তির হাত থেকে এই প্রলয়াগ্নি দূরে সরিয়ে রাখা। বৈজ্ঞানিক বিপ্লব এজন্যই আপেক্ষিক সত্য কথা, সামাজিক বিপ্লবের, অন্তত বহু পরিমাণে বিকৃত সামরিক বুদ্ধির দমনের, এবং সেই সঙ্গে নতুন মানবিক মঙ্গলবোধের তা মুখাপেক্ষী। যে সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে আনবিক বিজ্ঞানের জন্ম, সেই সামাজিক প্রয়োজন মেটানোর মত সার্থক আয়োজনে, তখনি অগ্রসর হতে পারবে যখন আনবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ হবে, যখন সাধারণভাবে মারণাস্ত্র ত্যাগ করে পৃথিবী দুর্বুদ্ধির ও নির্বুদ্ধিতার পথ বন্ধ করবে, এবং রাষ্ট্রনেতা ও যুদ্ধনেতাদের হাত থেকে সকল জাতি এই প্রহরণ কেড়ে নিতে পারবে—এক জাতির দ্বারা অপর জাতির শোষণ আর অস্ত্রবলে বজায় রাখা চলবে না।

আনবিক বিদ্যার সার্থকতার জন্যও এই বিশ্বশান্তি প্রয়োজন। বিশ্ববিপ্লবের ফলে বিশ্বশান্তি আসবে না, বিশ্ববিপ্লব আসবে বিশ্বশান্তির ফলে এই প্রশ্ন আণবিক শক্তি আবিষ্কারের পরে আজ এক বিপ্লবী জগতের বড়ো বিতর্ক, মতভেদেরও কারণ। এটা অনেকটা কুতর্ক। এই সব তর্কে না গিয়ে বরং বলা ভালো—বিশ্বশান্তির পথে যদি এক পা বাড়াই বিশ্ববিপ্লবের দিকেও আর এক পা বাড়ানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ও ঔপনিবেশিক শোষণের কবলমুক্ত সকল জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাতে বিশ্ববিপ্লবের সেইরূপ প্রথম পদবিন্যাস সুনিশ্চিত হচ্ছে। আবার বিশ্ববিপ্লবের এই পদস্থাপনা যদি সুদৃঢ় করতে হয়, তা হলে বিশ্বশান্তির দ্বিতীয় পদক্ষেপও তখনি প্রয়োজন—অর্থাৎ, চাই অবিলম্বে আণবিক অস্ত্র নিষেধ। তখনি আবার আসবে বিপ্লবের আরেক পদক্ষেপের সময়—প্রত্যেক জাতির আভ্যন্তরীণ আর্থিক বিকাশে ব্যক্তিগত মুনাফার পরিবর্তে সামাজিক সেবা ও সহযোগিতার নীতি ও পদ্ধতির প্রবর্তন, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থা। এই সব ব্যবস্থার কোনো একটিকে একান্ত বা নির্বিশেষ বলে গণ্য না করে পরস্পরের সহায়ক রূপেই দেখা সম্ভব, এবং তাই-ই খাঁটি দেখা। কারণ আণবিক যুগে অন্তত বিশ্ববিপ্লবের নামে 'আগে বিপ্লব পরে শান্তি' এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আঁকড়ে থাকা চলে না—লেনিনের নামেও নয়। অবশ্য পরাধীন কোনো জাতির স্বাধীনতার চেষ্টাকেও শান্তির নামে গৌণ করা উচিত নয়—সে প্রশ্নও ওঠে না। মূল উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রতিক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতি বুঝেই কৌশল স্থির করতে হবে। তাতে মতভেদও ঘটা সম্ভব। কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, শান্তির সাধনাকেই বিশ্ববিপ্লবের অঙ্গ করে তুলতে হবে। বিশ্বশান্তিই কি কম বড় বিশ্ববিপ্লব?

বিশ্বশান্তি বিশ্ববিপ্লবের পথকে প্রশস্ত করে দেয়, একথা মুনাফাবাদী ও শোষণধর্মী শক্তির খুব ভালো করে জানা। এজন্য মুনাফাবাদীরা শুধু সমাজতন্ত্র-বিরোধী নয়, তারা শান্তিবিরোধী ও যুদ্ধবাদী। পৃথিবীতে যুদ্ধ বা যুদ্ধের আতঙ্ক না থাকলে মারণাস্ত্র ব্যবসায়ীরা নিশ্চয়ই দেউলিয়া হবে। মারণাস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে মুনাফার জালে ফ্রি ওয়ার্লড-এর (মুক্ত পৃথিবীর), 'ফ্রি এনটার প্রাইজ' (অবাধ ব্যবসায়) অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। তথাকথিত 'ফ্রিডম অব্ কালচার' ও সেই 'শোষণের ফ্রিডমেরই' পক্ষপাতী। যুদ্ধ না থাকলে এ সবের দুর্দশা। মুনাফাতন্ত্রী সমাজব্যবস্থার পথে যুদ্ধ ও যুদ্ধাতঙ্ক তাই জীবন-মরণের প্রশ্ন। মারণাস্ত্রব্যবসায়ীরা অস্ত্রব্যবসাকে অন্যবিধ যন্ত্র-উৎপাদন শিল্পে ও ভোগ্য-উৎপাদন শিল্পে লাগালে পৃথিবী অবশ্য ভোগ্য ও কল্যাণপদ সমৃদ্ধিতে ভেসে যেতে পারে। কিন্তু সে পণ্য কেনার মত মানুষ থাকা চাই—যে দামে মানুষ তা কিনতে পারে, সেই দামে মুনাফাতন্ত্র কতটুকু বজায় থাকবে?

মুনাফা থাকলে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা খর্বিত থাকবে। সাধারণ মানুষের ক্রয়শক্তি বাড়াতে হলে শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি প্রয়োজন; মুনাফা বজায় থাকলে মজুরী বৃদ্ধিতে পণ্যমূল্য বৃদ্ধিও অবশ্যম্ভাবী। এবার প্রশ্ন হল—সে পণ্য কেনার সামর্থ থাকবে কজনের? মুনাফার পাপচক্রে অস্ত্র ব্যবসা ও প্রায় অন্য সমস্ত ব্যবসা এরকম মরণায়োজন রূপে বেড়ে চলেছে। তাই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে এরকম মুনাফাতন্ত্রী ব্যবস্থার

বিলোপ সুনিশ্চিত। শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হলেও মুনাফাতন্ত্রী দেশেও তখন অন্তর্বিপ্লব ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। এই সত্যটা স্পষ্টকণ্ঠে স্বীকার করতেও মুনাফাবাদীদের কারো কারো এখন বাধে না—শান্তিতে সমাজতন্ত্রীদের লাভ। কারণ তাদের উৎপাদন, বণ্টন, সেবা ও পালন সবই সামাজিক স্বার্থে চলে, মুনাফার উপর নির্ভর করে না। তাই শান্তি থাকলে বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ প্রয়োগে তাঁহাদের আর্থিক উদ্যোগের বিকাশমাত্রা দ্বিগুণ, চারগুণ হারে বেড়ে উঠবে। শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতায় সমাজতন্ত্র নিঃসন্দেহে ধনিকতন্ত্রকে পরাভূত করে দেবে। অন্যদিকে শান্তি থাকলে 'ফ্রি ওয়ার্লডে'র 'ফ্রি এনটারপ্রাইজ' অবশ্যম্ভাবী সংকটে জড়িয়ে বিপ্লবের মুখে গিয়ে পড়বে। একটি গুলিও সমাজতন্ত্রীদের নষ্ট করতে হবে না, মুনাফাতন্ত্রী সমাজ নিজের অভ্যন্তরীণ অন্তর্বিরোধে সমাজ বিপ্লবকে সুনিশ্চিত করে তুলবে। বিশ্বশান্তি তাই মুনাফাবাদী জগতের বিভীষিকা, জঙ্গীবাদী বিজ্ঞান, জঙ্গীবাদী সংস্কৃতি সাহিত্য শিল্প মুনাফাবাদীদের রক্ষাকবচ।

মার্কিন পুঁজিবাদ চতুর্দিকের অজস্র যুদ্ধঘাটি থেকে সমাজতন্ত্রী পৃথিবীর বুকের উপর সর্বদা বন্দুক ধরে বসে আছে, কিন্তু তাতেও মুনাফাতন্ত্রের দুশ্চিন্তা থেকে যাচ্ছে। এই সত্যি জেনে বুঝে ইউটু'র পরেও মুনাফাবাদী শক্তিসমূহের যুদ্ধায়োজনে সমাজতন্ত্রী শক্তিরাও আত্মরক্ষায় উদাসীন থাকতে পারে না। তবে কেন তারা যুদ্ধবাদী প্রচার নিষিদ্ধ করল? কেন শান্তির প্রচেষ্টাতেই সর্বস্ব পণ করল? প্রথমত, এটাই সমাজতন্ত্রী মতাদর্শ সম্মত; সমাজতন্ত্রী বিকাশেরও পরিপোষক। আর শেষ এবং প্রধান কারণ হল—আণবিক বোমা আবিষ্কারের পর যা অনস্বীকার্য—তা মানবতার নীতি। মানুষকে নিয়েই তো সাম্যবাদ—কোটি কোটি মানুষকে বলি দিয়ে সাম্যবাদ রচনা করতে হবে—এমন অমানুষিকতা সাম্যবাদে গ্রাহ্য নয়। সাম্যবাদ মানবতার উচ্চতর সাধনা, শ্রমিকশ্রেণীই সেই উচ্চতর মানবতার বাহক, পরিপোষক। কিন্তু সংস্কৃতির মহত্তর রূপান্তরেই সাম্যবাদের সার্থকতা।

কিন্তু প্রশ্ন হল সংস্কৃতির 'মহত্তর রূপের' অর্থ কি? কি সংস্কৃতির লক্ষ্য? উত্তর হল—'মানুষ'। এই উত্তরই এখন সোভিয়েত সংস্কৃতির মূলমন্ত্র 'সবার উপরে মানুষ সত্য'।

২.৪.১৩.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। গোপাল হালদারের অনুসরণে সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিরূপণ করে তার তিন অঙ্গের পরিচয় দাও।

২। সংস্কৃতির সঙ্গে জীবনের সংযোগ 'সংস্কৃতির রূপান্তর' প্রবন্ধে কীভাবে পরিস্ফুট হয়েছে–আলোচনা করো।

পর্যায়গ্রন্থ - ৪

একক - ১৪

মানবতার প্রতি বিশ্বস্ততা

বিন্যাসক্রম :

২.৪.১৪.১ : মানবতার প্রতি বিশ্বস্ততা

২.৪.১৪.২ : মানবতার পলিটিক্স ও মুনাফার পলিটিক্স

২.৪.১৪.৩ : সংস্কৃতির সংজ্ঞা এবং তিনটি অঙ্গের পরিচয়

২.৪.১৪.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.৪.১৪.১ : মানবতার প্রতি বিশ্বস্ততা

ধনতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সংস্কৃতির বিচার করলে দেখা যাবে, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, ইত্যাদির মধ্যেই নিহিত রয়েছে সংস্কৃতি। কিন্তু শুধুমাত্র 'কলাকৃতিত্ব' ও 'বিশুদ্ধ শিল্প নৈপুণ্য'—শব্দদুটি শিল্প সৃষ্টির দিক থেকে চরমতম পর্যায় নয়। এর মধ্যে রয়েছে এক অর্ধসত্য মায়াজাল। অনেক সময়ই দেখা যায় ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার ও ক্ষয়িষ্ণু জীবনবোধের খারাপ ফল হল এইরূপ 'কলাকৃতিত্ব'। শিল্পের অবশ্য একটি নিজস্ব মূল্য আছে। কেবলমাত্র বাইরের দৃষ্টিতে তা বিচার্য নয়—এই পুরাতন সত্য চিরদিনই সত্য। বিকৃত জীবনবোধের আবর্তে বণিকতন্ত্রের কলাকৃতিত্ব শুধু বিকৃতই নয় তার সঙ্গে বিষাক্তও। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন সোভিয়েত ইউনিয়ানের শিল্পকলার উৎকর্ষতার আদর্শ বিকৃত নয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে সমস্ত মানবজাতির কাছে একটিই মাত্র জিজ্ঞাসা ছিল তা হ'ল মানব সভ্যতা কতদিন টিকবে? কিভাবে টিকবে। কিন্তু মাত্র অল্প কিছুকাল হল যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে, সেই সোভিয়েত ইউনিয়ানের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর ছিল স্পষ্ট। তারা দেখিয়ে দিল একমাত্র সমাজতন্ত্রই এই সমূহ সমস্যার সমাধান করতে পারে। কারণ ফ্যাসীবাদ যে ভাবে সমগ্র বিশ্বকে করায়ত্ব করতে চলেছে তাতে সমগ্র মানব সমাজ-সভ্যতা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল তাদের অস্তিত্ব নিয়ে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধ পরিচালনা করে প্রধান ভূমিকা পালন করে। বিশ্বের ইতিহাসে অভূতপূর্ব আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করা সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যারা সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মিত্রশক্তি গঠন করে, তার অন্যতম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের পর পৃথিবীর শান্তি ও স্বাধীনতাকামী মানুষের পয়লা নম্বরের দুশমনে পরিণত হয়। যাই হোক সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু কথা হল — সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রথম মানবতাকে ফ্যাসিবাদের হাত থেকে বাঁচিয়ে মানবতার প্রতি বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছিল। আর এই মানবতার প্রতি বিশ্বস্ততার এটাই সোভিয়েত বিজ্ঞান, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতির পরম মন্ত্র। বিশ্ব সংস্কৃতিতে এই চিরন্তন সত্যকেই এই যুগে সোভিয়েত যেন নতুন করে মূর্ত করেছে। কুবার সংকটের আত্মসংযমেও তারই প্রমাণ মিলল। ফলে সোভিয়েত জগতে যুদ্ধ প্রচার নিষিদ্ধ।

২.৪.১৪.২ : মানবতার Politics ও মুনাফার Politics

জাতির মানবতার প্রেরণা ও মুনাফার প্রেরণা এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব প্রথমাবধি। প্রাবন্ধিক বলতে চেয়েছেন সোভিয়েত মানবভ্রাতৃত্ব ও মার্কিন ভ্রাতৃত্ব এই দুইয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় গঠিত দেশ। সেখানে ভূমি-প্রাচুর্যের অপ্রতুলতা রয়েছে, তার ভোগ্যবস্তুর আয়োজন এখনও বিভিন্ন দিকে সীমাবদ্ধ। জীবন মানে তারা শুধু যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় নিম্নস্ত তা নয়, সুইডেন, নরওয়ের তুলনায় ও ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় দরিদ্র ও নিম্নস্ত। শীতপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও সেখানে পশমের জামা ও চামড়ার জুতোও এখনো প্রত্যেকের সহজপ্রাপ্য নয়। তবে এমনটি মনে করার নয় যে তাদের ক্রয় করবার অর্থ নেই। আসলে তারা বিশ্বমানুষের শিক্ষার জন্য মহানব্রত গ্রহণ করেছে। মানব সৌভ্রাতৃত্বের বশবর্তী হয়ে অনুন্নত জাতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে আগ্রহী হয়েছে।

মার্কিন ঐশ্বর্যের তুলনায় সোভিয়েত রিক্ত, তা সত্ত্বে পিছিয়ে পড়া জাতির জন্য আর্থিক সাহায্যেই বা কেন তারা সাগ্রহে অগ্রসর হল—বিনা শর্তে, সামরিক উদ্দেশ্যেসিদ্ধিও দাবি করে না? আর এই উৎসাহ কতখানি আন্তরিক, কতখানি অকৃত্রিম তা বলা জন্য তিনি ভারতের ভিলাই, দুর্গাপুর, সুব্রত গড়, রাউঢ়কেল্লার বৈদেশিক বিনিয়োগের কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য—"মানবতার প্রেরণা ও মুনাফার প্রেরণাতে এইরূপই তফাৎ—না হইলে মার্কিন রাজ্যের তো পুঁজির পরিসীমা নাই; জার্মান বা ব্রিটিশ কারিগররাও বিদ্যায়; অভিজ্ঞতায়, শিক্ষাসংগঠনে, ঐতিহ্যে তো কাহারও অপেক্ষা ছোটো নন।"

তর্ক ওঠাই স্বাভাবিক যে, এসব মানবতার জন্য নয়, পলিটিক্সই এর অন্যতম। পলিটিক্সেপলিটিক্সের এই কাঠামোর জন্যই সোভিয়েতের এই আর্থিক সহায়তা নবজাত জাতিগুলির প্রতি, আর তাদের এই দরদ ভাষার জন্য ও সাহিত্যের জন্য। কমিউনিজম তত্ত্বে দীক্ষিত করার জন্য তাদের ছাত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্য। ব্রিটেনও সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির জন্য একটি বিশিষ্ট গবেষক পরিষদ গঠন করেছিল (British Society of Oriental and African Studies)। পরিষদটির বহুদিনের যত্নে শিক্ষার মান ও গবেষণার মান উন্নত হয়েছিল। এদের এই প্রয়াসকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার করে নিয়েও বলতে হয়, কোনো পলিটিক্স বা Policy-র জন্য তারা ব্রিটেনকে একটা 'লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়' গঠনের কথা বলল না বা সেই সম্পর্কে উৎসাহিত করল না। শিল্পায়নের কারুবিদ 'কৃষ্ণ বা শ্যামল' গোষ্ঠী গঠনের প্রেরণায়ও তারা নিশ্চুপ থেকে গেল। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক গোপাল হালদারের সপ্রতিভ বক্তব্য—"কারণ, তাহা ইমনীরিয়ালিস্ট পলিটিক্স শোষণের পলিটিক্স মানবস্বীকৃতির পলিটিক্স নয়।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। তারা গণতান্ত্রিক দেশ, মুক্ত পৃথিবীর নায়ক, মানবাধিকারের প্রবর্তক হওয়া সত্ত্বেও সেখানে কালো চামড়ার কৃষ্ণবর্ণের দুর্ভাগা জাতির জন্য কোনো শিক্ষার আয়োজন নেই। যে শিক্ষা আমাদের চেতনাকে সমৃদ্ধ করে, আত্মস্বাধীনতা অর্জনের শিক্ষা দেয় — তা থেকে তারা একশ শতাংশ বঞ্চিত। এমনকি প্রাবন্ধিকের আরো ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে, যে তারা এখনো সেই প্রয়াসে অগ্রসর না হয়ে শুধুমাত্র অপরিমেয় ঐশ্বর্য ও অসামান্য কারুবিদ্যার দিকেই লক্ষ রেখে চলেছে। তারা কোনো শর্ত ছাড়া কোনো পিছিয়ে পড়া তথা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। তাই প্রাবন্ধিক বলেছেন— "ইহারও কারণ পলিটিক্স—মার্কিনের মুনাফাবাদ ও জঙ্গীবাদের পলিটিক্স"।

একথা একান্তভাবে স্বীকার্য যে সবকিছুর পিছনে পলিটিক্স যুক্ত। তবে সেই নীতিরও আবার একাধিক দিক আছে। এবং সমাজ জীবনে তার অবশ্যই কুফল ও সুফল আছে। পলিটিক্সের উর্ধ্বেও একটি জিনিস থেকে যায়—সেটি মানবতা তথা সৌভ্রাতৃত্ব ও শুভবোধ। যার থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে সুস্থ সংস্কৃতির। সকল রাষ্ট্রই পলিটিক্যাল ভাবে মূর্তশক্তি। অ্যারিস্টটলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলা যায়, 'মানুষ শুধু পলিটিক্যাল জীব নয়।' তাই তাদের সুবিধা-অসুবিধাগুলিকে ভালো করে খতিয়ে দেখতে হবে।

মুনাফার পলিটিক্স মানুষকে টাকার অঙ্কে বিশ্বাস করতে শেখায়। সেখানে মানুষের কাছে সবকিছুর মাপকাঠি হয়ে ওঠে টাকা। কারণ—"মুনাফা শিকারের পলিটিক্স মুনাফার সংস্কৃতিতে মানুষ শিকারের সংস্কৃতিতে পরিণত করিয়া তোলে।"

অন্যদিকে—শোষণ-মুক্তির পলিটিক্স সৃজনমুখী সংস্কৃতিকে দেয় মানবতার দীক্ষা — পরিণত করে মানবভাতৃত্বের সংস্কৃতিতে, মানব-বিশ্বাসের সংস্কৃতিতে। স্বভাবতই বোঝা যায় প্রাবন্ধিকের মানব ভ্রাতৃত্বের সংস্কৃতি তথা মানব বিশ্বাসের সংস্কৃতির উপরই সম্পূর্ণই আস্থা। অর্থাৎ যে পলিটিক্স মানুষকে শিক্ষা দেয় তাই মানুষের কাম্য। তাই তিনি স্পষ্ট করে বলেন—"দুই-ই যদি পলিটিক্স হয়, তবে সেই পলিটিক্স মানবতার স্বপক্ষে তাহাই মানুষের জীবনদায়ী পলিটিক্স মুনাফা শিকারের পলিটিক্স তো মানুষ শিকারের পলিটিক্স—অমানুষিক পলিটিক্স।"

তুলনামূলক বিচারে একথা বলতে হয় ঐশ্বর্যের সংকল্প বিরাট হলেও সোভিয়েতের এখনও বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বৈজ্ঞানিক উদ্যোগের সবদিকে তারা এখনও সফলতা অর্জন করতে পারেনি। তবে কারু বিজ্ঞানে তারা মার্কিন, ব্রিটিশ, ফরাসীকে ইতিমধ্যেই পিছনে ফেলে দিয়েছে। তাই বলা যায় ভবিষ্যৎ তার বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিতভাবেই আসবে। ধনিকতন্ত্রের গণ্ডীটানা জায়গায় বদ্ধ থেকে তাদের বেশ কিছু ব্যাপারে ক্ষতি হচ্ছে, তারা বিবর্জিত হয়েও উঠেছে। ফলে স্বয়ংসন্তুষ্ট ও আহত আত্মমর্যাদাবোধ প্রশ্রয় পেয়েছে। সেই সঙ্গে অন্যের সম্বন্ধে সন্দেহ ও অবিশ্বাস জন্মেছে। তাই মার্কসবাদী প্রাবন্ধিক গোপাল হালদার বলেছেন—"তাহার অতি দ্রুতগঠিত সাংস্কৃতিক আয়োজনের মধ্যেও অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যাইতেছে,—যতটা তাহার ব্যাপ্তি আছে, ততটা গভীরতা জন্মায় নাই। আর্থিক বিকাশে ও আধ্যাত্মিক বিকাশে তাহার এক একদিকে যতটা উন্নতি, কোনো কোনো দিকে তেমনি শ্লথতা থাকিয়া গিয়াছে।"

সোভিয়েত মানব জীবনের অন্তর্নিহিত চাহিদাকে গুরুত্ব দেয়। বাইরে জাঁকজমক জমকালো ভাবকে তারা তোয়াক্কা করে না। মানব জীবনের Basic needs গুলি পেয়ে তারা সন্তুষ্ট থাকে, এবং এরই মাধ্যমে উন্নতির চরম শিখরে তারা পৌঁছাতে চায়। তাই দেখা যায়—"আজন্ম-মৃত্যু জীবনযাত্রার সকল বিভাগ সমাজতন্ত্রী কাঠামোতে বিধৃত বলিয়া সমাজতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ শত্রু আমলাতান্ত্রিক মূঢ়তা ও উগ্রতা ও প্রশাসনের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া বসিতে চাহে এবং বসেও।"

সমগ্র আলোচনা শেষে বলা যায়, মার্কিন সংস্কৃতির মতোই সোভিয়েত সংস্কৃতির একটি বড়ো সমস্যা—'কারুবিজ্ঞানের চাপে মানববিদ্যার অসমান বিকাশ'। এটা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে অবশ্যই আসবে। সমস্ত রকম প্রতিবন্ধকতা, ভুলত্রুটি, দোষগুণ থাকা সত্ত্বেও সোভিয়েতের সমাজ জীবন্ত, চলন্ত, বিবর্ধমান। একাধিক অসামঞ্জস্য সত্ত্বেও সোভিয়েত সংস্কৃতির এই প্রধান সত্যের মূলে নিহিত আছে এই সত্য—"মানবতায় বিশ্বাস, বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীন ও সার্বজনীন প্রয়োগ, বিশ্বমানবের মুক্তি, বিশ্বশান্তির দুশ্চর তপস্যা ...."

এটাই সোভিয়েতের মূল সাধনা। প্রাবন্ধিক মানব সভ্যতার এই অন্তর্নিহিত দিকটিকেই তুলে ধরেছেন। যেটি আজও আমাদের কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি।

২.৪.১৪.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। পুঁজিবাদের উদ্ভব এবং সংকট বলতে প্রাবন্ধিক কি বুঝিয়েছেন তা ব্যাখ্যা করো।

২। 'সংস্কৃতির রূপান্তর' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক 'মানবতার রাজনীতি' ও 'মুনাফার রাজনীতি' বলতে কি বুঝিয়েছেন?—আলোচনা করো।

পর্যায়গ্রন্থ - ৪

একক - ১৫

সংস্কৃতি র সংজ্ঞা এ বং তিনটি অঙ্গের পরিচয়

বিন্যাসক্রম :

২.৪.১৫.১ : সংস্কৃতির সংজ্ঞা এবং তিনটি অঙ্গের পরিচয়
২.৪.১৫.২ : রূপান্তরের মূলতত্ত্ব
২.৪.১৫.৩ : বিজ্ঞানের সাক্ষ্য
২.৪.১৫.৪ : ইতিহাসের সাক্ষ্য
২.৪.১৫.৫ : প্রস্তর যুগের বিবরণ
২.৪.১৫.৬ : কৃষির দান এবং ধাতুর আবিষ্কার
২.৪.১৫.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.৪.১৫.১ : সংস্কৃতির সংজ্ঞা এবং তিনটি অঙ্গের পরিচয়

'কৃষ্টি' শব্দটি অপেক্ষা 'সংস্কৃতি' শব্দটি কেন অধিকতর গ্রহণযোগ্য আমরা তা বুঝতে পারি। শেষ পর্যন্ত 'সংস্কৃতি' শব্দটি বাংলায় 'কালচার'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু 'সংস্কৃতি' কি? কাকে বলব 'সংস্কৃতি'? এই সব বিষয়ে কোনো দুজন আলোচক বা তাত্ত্বিক সম্পূর্ণ একমত হয়েছেন বা সবাই মিলে কোনো সর্ববাদী সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। মতের বৈভিন্নের একটা কারণ মানব প্রয়াসকে দেখার দৃষ্টিকোণ ও দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা। সংস্কৃতির সংজ্ঞার্থকে চিন্তাবিদ ও তাত্ত্বিকেরা কোনো সিদ্ধান্তের কি ধরনের মাত্রাভেদে গ্রহণ করেছেন, তা আমরা কয়েকটি সংজ্ঞা উদ্ধারেই অনুধাবন করতে পারি।

১. ওঁ শিল্পানি শংসন্তি দেবশিল্পানি। এযেতাং বৈ শিল্পানাম্ অনুকৃতীহ শিল্পম্ অধিগম্যতে...। শিল্পং হাস্মিন্নাধিগম্যতে ঘ এবং বেদ যদেব শিল্পানী। আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে।

এই শ্লোকটিকে ক্ষিতিমোহন সেন এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

ঐতরেয় বলেন, শিল্পীরা তাদের শিল্প সৃষ্টির দ্বারাই দেবতাদের স্তব করেছেন। সৃষ্টিতে যে (এই সব শিল্প) দেবশিল্প তারই অনুপ্রেরণায় শিল্পীদের যে এই সব শিল্প, তাই বুঝতে হবে। যিনি এইভাবে শিল্পকে দেখেছেন, তিনিই শিল্পের মর্ম বুঝতে পেরেছেন। শিল্পের দ্বারাই শিল্পীর যে উপাসনা, তাতে স্বর্গ বা মুক্তি মেলে না। তাই ফুল হল শিল্পের দ্বারা আপনার আত্মাকে সংস্কৃত করে তোলা সাধনার দ্বারা বিশ্বের দেবশিল্পের ছন্দে শিল্পী আপনাকে ছন্দোময় করে তোলে। (ভারতের সংস্কৃতি)

ম্যাথু আর্নল্ড 'কালচার' বা 'সংস্কৃতি'র ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন—

২. 'কালচার, হুইচ্ ইজ্ দি স্টাডি অব্ পারফেক্শন, লীডস্ আস টু কন্সীড্ ট্রু হিউম্যান পারফেক্শন, ডেভেলপিং অল সাইডস্ অব্ আওয়ার হিউম্যানিটি, অ্যাজ এ জেনারেল পারফেক্শন, ডেভেলপিং অল পার্টস্ অব্ আওয়ার সোসাইটি। (কালচার অ্যাণ্ড এনার্কি)

অর্থাৎ সোজা কথায় বলতে গেলে আর্নল্ডের মতে ঃ কালচার আমাদের নিরন্তর অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে আমাদের পূর্ণতার পথে নিয়ে যায়। মানবতার সামগ্রিক উন্নয়নের নামই 'সংস্কৃতি'। এই উন্নয়নের সাধনা আমাদের সমাজের যাবতীয় অংশকেই উন্নীত করে।

আর্ণল্ড সোজাসুজি বলেছেন—

৩. 'দি কালচার, উই রেকমেণ্ডেড, ইজ্ এবাভ অল, অ্যাজ ইনওয়ার্ড ক্রিয়েশন।' (কালচার অ্যাণ্ড এনার্কি)

অর্থাৎ, 'সংস্কৃতি সর্বোপরি আমাদের আভ্যন্তরীণ ও মানস জগতের সৃষ্টি।'

সংস্কৃতি বিষয়ে রুশ অধ্যাপক এ. আই. আর্নল্ড-এর মত অনেক বেশি সামাজিক সম্পর্ক নির্ভর। তিনি বলেছেন—

৪. কালচার ইজ্ দি এক্সপ্রেশন অব দোজ সোস্যাল রিলেশন্স বিটুইন দি পিপ্ল দ্যাট আর ডাইরেক্টেড টু ক্রিয়েটিং, এসিমিলেটিং, প্রিজার্ভিং অ্যাণ্ড ডিজএমিনেটিং মেটিরিয়াল অ্যাণ্ড স্পিরিচুয়াল ভ্যালুজ অ্যাণ্ড ইন্টারেস্টস্। ইট ইজ্ এ হিস্টোরিক্যালি ডেভেলপিং সিস্টেম অব্ স্পিরিচুয়াল ভ্যালুজ অ্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডার্ডস ক্রিয়েটেড বাই দি পিপ্ল, অ্যাট দি সেম্ টাইম ইট ইজ্ এ প্রসেস অব্ হিউম্যান ক্রিয়েটিভিটি কনডিশনড্ বাই দি মোড অব্ মেটিরিয়াল প্রোডাকশন, সোস্যালি সিগনিফিকেন্ট ইন ইটস্ এসেন্স, অ্যাণ্ড টেনডিং টু মাস্টারি অ্যাণ্ড অল্টারেশন অব্ দি ওয়ার্ল্ড। ইট ইজ্ এ সেন্সিটিভ ফাইন ইণ্ডিকেটর অ্যাণ্ড রেজাল্টট অব্ দি আইডিওলজিক্যাল অ্যাণ্ড মর্যাল ক্লাইমেট ইন্ সোসাইটি। (সূত্র ঃ কিঙ্কর মিত্র ঃ সংস্কৃতির সংগ্রাম)

সংস্কৃতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে গোপাল হালদার বলেছেন---

৫. সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি মানুষের প্রায় সমুদয় বাস্তব ও মানসিক কীর্তি ও কর্ম, তার জীবনযাত্রার আর্থিক সামাজিক রূপ, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান; তার মানসিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা, নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া আর নানা শিল্পসৃষ্টি। সমস্ত চারুকলা ও কারুকলা এই হল সংস্কৃতির স্বরূপ। (বাঙালীর সংস্কৃতির রূপ)

বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে গোপাল হালদার সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধান করেছেন

"বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যাঁহারা সংস্কৃতির বিচার করেন তাঁহারা দেখিতে পান সংস্কৃতির অর্থ এই — মানুষের জীবনসংগ্রামের বা প্রকৃতির ওপর অধিকার বিস্তারের মোট প্রচেষ্টাই সংস্কৃতি; আর সংস্কৃতির মূল ভিত্তিটিও অত্যন্ত বাস্তব জীবিকাপ্রয়াস সহজায়ত্ত করা।" (গোপাল হালদার ঃ সংস্কৃতির বিশ্বরূপ, পৃ-২০)

রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্টি' ও 'সংস্কৃতি'র মধ্যে যে সীমারেখা টানতে চেয়েছেন তা ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে 'কৃষ্টি' ও 'সংস্কৃতি'র মধ্যে যে রকম কোনো সীমানা নেই। বরং বলা যায়, সংস্কৃতির উদার আঙ্গিনায় কৃষ্টি নিজেই একটি অংশ।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্যের 'পরিপ্রশ্ন' বইটি থেকে রবীন্দ্রনাথের ১৯৩৮ সালে প্রদত্ত একটি সংস্কৃতি সম্পর্কিত বক্তৃতার অংশ উল্লেখ করতে পারি ঃ

৬. "যাকে সংস্কৃতি বলে তা বিচিত্র; তাতে মনের সংস্কার সাধন করে; আদিম খনিজ অবস্থা থেকে তার পূর্ণ মূল্য উদ্ভাবন করে নেয়।.... আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের

পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে, কেবলমাত্র তাই নয় সকল রকম কারুকার্য, শিল্পকলা, নৃত্য-গীত-বাদ্য, নাট্যাভিনয় এবং পল্লিহিত সাধনের জন্য যে সকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে স্বীকার করব।"

অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতির সীমানা বহুদূর পর্যন্ত—জীবনযাপনের সর্বত্র বিস্তৃত করে দিয়েছেন। আমাদের দৈনন্দিন, আমাদের যাবতীয় সৃজন প্রয়াস, আমাদের সামগ্রিক সামাজিক অস্তিত্বের মধ্যে তৈরী হয়ে যাওয়া যাবতীয় মূল্যবোধ ও সেই বোধজাত জীবন সংস্কৃতির তাৎপর্য সর্বত্র সঞ্চারমান। সংস্কৃতির সংজ্ঞা আলোচনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক বদরুদ্দিন উমর বলেছেন—

৭. জীবন চর্চারই অন্য নাম সংস্কৃতি। মানুষের জীবিকা, তার আহার, বিহার, চলাফেরা, শোক-তাপ, আনন্দ-বেদনার অভিব্যক্তি তার শিক্ষা ও সাহিত্য, ভাষা, তার দিন রাত্রির হাজার কাজকর্ম সব কিছুর মধ্যেই তার পরিচয়। (সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা)

১৯৭৪-এর ডাকা শহরে সংস্কৃতি বিষয়ক একটি আলোচনা চক্রে নীলিমা ইব্রাহিম বলেন—

৮. "কোনও একটা জাতির বা মানবগোষ্ঠীর দৈনন্দিন নিত্য প্রয়োজনীয় কাজ কর্ম থেকে শুরু করে তার চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশের সম্মিলিত রূপায়ণই ঐ জাতির গোষ্ঠীর সংস্কৃতি নামে সাধারণত অভিহিত করা হয়ে থাকে। এর দুটি ভিন্ন রূপ বা ভিন্ন চেতনা আমরা লক্ষ করি। প্রথমটি আত্মপ্রকাশ করে জাতির দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অবলম্বন করে। সংস্কৃতির দ্বিতীয় ধারায় আমরা লক্ষ করি ঐ সমাজের ব্যক্তি চেতনার সমষ্টিগতরূপকে বা তার চিন্তাসত্তার বহিঃপ্রকাশকে। সাংস্কৃতিক চেতনা ও জীবনবোধ মানব সমাজের বাস্তব ও অন্তর্জীবনের সমষ্টিগত রূপ।

আবার সংস্কৃতি কি? এই প্রসঙ্গে সর্দার ফজলুল করিম বলেছেন--

৯. "মানুষের কর্মময় জীবনই সংস্কৃতি। কর্মের মধ্য দিয়ে মানুষ যে ঐতিহ্য তৈরী করে তাই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।" (ঐ) (নন্দন, চৈত্র, ৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত সুনীল বসু রায়ের প্রবন্ধ)।

এই প্রসঙ্গে লেনিনের একটি উক্তি--

"নিরক্ষরতা দূর করা যথেষ্ট নয়, দরকার সোভিয়েত অর্থনীতি গড়ে তোলা, আর সে ক্ষেত্রে কেবল সাক্ষরতা দিয়েই বেশি এগোনো যাবে না। সংস্কৃতির একটি বিপুল উন্নয়ন আমাদের দরকার।" (সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৬৮)

অর্থাৎ শুধু জনশিক্ষা বা অর্থনীতিই সংস্কৃতি নয়, সংস্কৃতি এমন একটা জিনিস যা বিকশিত না হলে, উন্নত না হলে প্রগতি আটকে যায়, অর্থনীতির সফল রূপায়ণ সফল হয় না, স্বাক্ষরতা অর্থহীন হয়ে পড়ে। লেনিন তাই মনে করতেন—সংস্কৃতি হচ্ছে মানব সমাজের সার্বিক দক্ষতা ও একটি চেতনার স্তর, যা প্রতিফলিত হয় নানান ব্যবহারিক দক্ষতা প্রকাশের মধ্যে, অর্জিত জ্ঞানে, বিদ্যায়, শিক্ষায়। এটা একটা বিশেষ বিকাশমাত্র যা ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে আরো উন্নত স্তরে পৌঁছানোর জন্যে।

সংস্কৃতির তিনটি অঙ্গ ঃ

ঘরবাড়ি, ধনদৌলত, যানবাহন বা রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠানকেই শুধু সংস্কৃতি বলে না। সংস্কৃতি বলতে মানবসম্পদও, চিন্তা, কল্পনা, দর্শন, ধ্যানধারণা এই সবও বোঝায়। আসলে বাস্তব ও মানসিক সমস্ত 'কৃতি' বা সৃষ্টি নিয়েই সংস্কৃতি-মানুষের জীবন-সংগ্রামের মোট প্রচেষ্টার এই নাম।

এই জন্যই বৈজ্ঞানিক মতে, সংস্কৃতির মোট তিন অবয়ব বা তিন প্রকারের অবলম্বন আছে। প্রথমত, এর মূলভিত্তি সেই জীবন-সংগ্রামের বাস্তব উপকরণ সমূহ (material means); দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতির প্রধান আশ্রয় সমাজযাত্রার বাস্তব ব্যবস্থা (social structure); আর তৃতীয়ত, সংস্কৃতির শেষ পরিচয় মানবসম্পদ। সেই মানব সম্পদ এই হিসাবে সমাজসৌধের 'শিখরচূড়া' মাত্র (Superstructure), সহজ কথায় উপরতলার উপকরণ। তা হলে সাধারণভাবে আমরা যে মনে করি কাল্চার জাতিগত, দেশগত বা ধর্মগত, তাও যেমন একটি অর্ধসত্য, তেমনি সাধারণভাবে আমরা যে মনে করি কাল্চার অর্থ কাব্য, গান, চারুকলা, বড়জোর দর্শন বা বিজ্ঞান পর্যন্ত, তাও তেমনি আর একটি অর্ধ সত্য। আসলে, সংস্কৃতি সমাজদেহের শুধু লাবণ্যছটা নয়, তার সমগ্র রূপ। তাই সমাজের পরিচয় দিয়েই সংস্কৃতির পরিচয়।

সংস্কৃতির প্রথম অবয়ব ঃ বাস্তব উপকরণ

আমাদের তুলনায় নিশ্চয়ই সেই প্রস্তর যুগের বা তাম্র-প্রস্তর যুগের বা লৌহযুগের মানুষ ছিল 'অসভ্য'। কিন্তু জীবিকার উপাদান তবু তারা আয়ত্ব করছে। পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদানের সূত্রে ভাবভঙ্গি ছাড়াও অন্যরূপ প্রণালী (কণ্ঠধ্বনি) আয়ত্ব করে ফেলেছে, বিশেষ বিশেষ অর্থে একএকটা শব্দকে প্রয়োগ করে 'ভাষা' নামক অদ্ভুত মানসসম্পদেরও অধিকারী হয়েছে। এককথায়, এই দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক অগ্রগতির বলে জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হয়েছে। বৈজ্ঞানিক গণনায় তাই তাদেরও 'সভ্যতার' নাম আছে; উৎপাদনের উপাদান দিয়েই সেই নাম স্থিরীকৃত হয়। কারণ এদের সভ্যতার সাক্ষ্য, এদের বিচারের উপাদান — এদের ব্যবহৃত দ্রব্য, অস্ত্রশস্ত্র, আহার্য ও পানীয়-পাত্র, এদের শব-সৎকারের ব্যবস্থা প্রভৃতি। এইসব বস্তুরই আমরা সন্ধান পাই, এখনো অন্য উপায়ে এদের কথা জানার পথ নেই। প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই সব উপাদানের বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রামাণিক রূপও (টাইপ) চিনতে পারেন। কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলে একই কালে এইরূপ যত বিশেষ ধরণের (টাইপের) উপকরণ মেলে তার একযোগে তাঁরা নাম দেন সেই 'কালচার' বলে। যেমন সোয়ান নদীর উপত্যকার 'সোয়ান্ কালচার'—পাথরের একটা বিশেষ ধরণের কৃতি তাতে দেখা যায়।

এই সব বাস্তব উপকরণ থেকে আবার এদের সামাজিক বা মানসিক গঠনেরও একটা আভাস আমরা লাভ করতে পারি। আহার, শিকার প্রভৃতি একই উদ্দেশ্য সাধনে নানা উপকরণ ব্যবহৃত হচ্ছে, কিন্তু উপকরণের নির্মাণে ও ব্যবহারের রীতিতে একটি বিশিষ্ট সামাজিক ঐতিহ্যও হয়তো এক একটি অঞ্চলে গড়ে ওঠে। তার অনুসরণ করেই সেই বিশিষ্ট 'টাইপের' ছবি, কুঠার, বাসগৃহ, সমাধিস্থল প্রভৃতি নির্মাণ চলে। সেই সামাজিক ঐতিহ্যের আভাসও তাই উপকরণে নিহিত থাকে। আল্তিমারা ও দর্দঞ্রর গুহাচিত্র এই কারণেই এত গবেষণার বস্তু। কারণ, মানুষ ও তার জীবিকার উপকরণ, এই দুই যেমন মানুষের সমস্ত ইতিহাসের গোড়ার বস্তু, তেমনি সে উপকরণের প্রয়োগ সৌকর্যের জন্য মানুষ যে ব্যবস্থা গ্রহণ করে জীবিকার দায়ে মানুষে মানুষে সে সম্বন্ধ স্থাপন করে, যে যৌথ-বিন্যাস গঠন করে চলে—তারই নাম সমাজ। জীবিকার উপকরণ আর জীবনযাত্রার পরস্পরের সম্পর্ক দিয়েই সমাজের মুখ্য পরিচয়; ধর্ম, জাতি এই সব দিয়ে সমাজের নামকরণ এই জন্যই অবৈজ্ঞানিক এবং বিভ্রান্তিকর।

দ্বিতীয় অবয়ব : সামাজিক রূপ

এবার প্রশ্ন হল উপকরণ থেকে না হয় উৎপাদন প্রথা অনুমান করা গেল, আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক রূপও অনুমান করা গেল, কিন্তু তা থেকে সেই সমাজের মানুষের মনের হিসাব পাওয়া যাবে কি করে? এর উত্তর, মানুষের মানসিক সৃষ্টি যেখানে পাই না, সেখানেও মানুষের মানসিক গঠনের কিছু পরিচয় তার জীবনযাত্রার উপকরণ থেকে সংগ্রহ করতে পারি। যেমন, যে মানুষ পাথরের অস্ত্র দিয়ে শিকার করে খেত, তারা দল বেঁধে দুর্বল বা বৃদ্ধ পশুকে তাড়া করত, তারা সকলে মিলে দল বেঁধে খেত,

শিকারের খোঁজে ঘুরে বেড়াত। এদের মনে ক্ষিদে, পশু, শিকার, দল—এই সবই ছিল প্রধান কথা। কিন্তু যে মানুষ কৃষিকর্ম আবিষ্কার করেছে তার মনে নদী, মেঘ, ঋতু, জমির মালিকানা এ সব চিন্তাই প্রাধান্য পাবে। মানুষের মানসিক গঠনের অবশ্য আরো বেশি পরিচয় সংগ্রহ করতে পারি, তার সামাজিক ব্যবস্থা থেকে—তার পরস্পরের সম্বন্ধ, রীতিনীতি, আচার-বিচার, উৎসব অনুষ্ঠান জানলে।

যে মানবসম্পদকে আমরা বিশেষভাবে সংস্কৃতি বলে থাকি, দর্শন, কাব্য, চিন্তা, বিজ্ঞান প্রভৃতি—সে যুগে মানুষের সে সব রূপের খোঁজ পাইনা সেখানেও তার সংস্কৃতির স্বরূপ অনুমান করতে পারি—প্রথমত, সে যুগের জীবনযাত্রার উপকরণ থেকে, দ্বিতীয়ত, তার সামাজিক রূপ থেকে। কোনো যুগে জীবনযাত্রা কি —কি প্রধান উপকরণ দিয়ে নির্বাহ হত, তা জানলে আমরা বুঝতে পারি, সে যুগের সংস্কৃতি কোন্ স্তরে পৌঁছেছিল। জীবনযাত্রার উপকরণ দিয়ে এই পথে প্রধানত সংস্কৃতির বাস্তব রূপ অনুমান করতে পারি, কতকটা মানসিক ভাবনা-ধারণারও পরিচয় পাই। যেমন, পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে নব্যপ্রস্তর যুগের (নিয়েন্ডারথাল) মানুষও মৃত সন্তান ও আত্মীয়বর্গের সমাধির মধ্যে খাদ্য-পানীয় রাখত। তাতে বুঝতে পারি 'মানুষ মরে না', 'অমর'—এ রকম একটা ধারণা সেই পঞ্চাশ হাজার বছরের আগেকার মানুষের মনেও জন্মেছে। শুধু তা নয়, লাখখানেক বছর আগেকার মানুষ তার পাথরের অস্ত্রশস্ত্রকে এমন করে সযত্নে পালিশ করত, যে তা দেখে বোঝা যায়, শুধু শিকারের দায়ে নয়, নিজের মনেও জিনিসটি সুন্দর করবার প্রয়োজন সে অনুভব করতো। তারপর দেহসজ্জা, প্রসাধন প্রভৃতি উপকরণ দেখে 'অসভ্য' মানুষের এই মানসিক ভাবনা-ধারণার রুচি-রীতির অনেক হদিসই পাওয়া যায়। কিন্তু উপাদানের চাইতেও মানুষের মানসিক গঠনের স্থিরতর পরিচয় পাই সামাজিক রূপে সে যুগে এসে সংস্কৃতির এরকম ঐতিহাসিক উপাদান মেলে, অর্থাৎ যে যুগে সমাজব্যবস্থা জানা যায়, সেখানে আর বৈজ্ঞানিকের পক্ষে শুধু মাত্র জীবিকার উপকরণ দিয়ে সভ্যতার নামকরণ করা প্রয়োজন হয় না। সেখানে সমাজের সেই বিশেষ রূপ দিয়েই সেই সংস্কৃতিরও নামকরণ করা আরম্ভ হয়। যেমন, পশুচারিক (Pastoral) সভ্যতা, কৃষিমূলক (Agricultural) সভ্যতা। অবশ্য এই সব সভ্যতার বা সংস্কৃতিরও আরো স্তর বিভাগ করতে হয়। কারণ, প্রত্যেক সভ্যতার মধ্যেই আবার নূতন নূতন স্তর ক্রমশ দেখা দেয়। জীবিকা-প্রণালীর বিশেষ বিশেষ ভঙ্গির দ্বারা সেই সব স্তর বিভক্ত। সেই স্তর-ভেদের মূলেও আছে জীবিকার্জনের নূতন প্রয়োজনের চিরন্তন তাগিদ।

শেষ অবয়ব : মানব সম্পদ

যেখানে থেকে সামাজিক রূপের জ্ঞান আমাদের পক্ষে সুলভ, সেখান থেকে সংস্কৃতির মানব-সম্পদেরও আমরা প্রায়ই সন্ধান পাই। আচার-অনুষ্ঠানের বোঝা বয়ে কখনো চিত্র, কখনো গান, কখনো কোনো মূর্তি বা বিগ্রহ আমাদের সামনে সেই সব যুগের মানস ইতিহাস খুলে দেয়। নিজেদের শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি সংস্কৃতি-সম্পদের বিচারে আমাদের সামাজিক ও আর্থিক বিন্যাসকে আমরা বড় মনে করি না বটে, কিন্তু যখন এই সব প্রাচীন বা আদিম জাতির এই গীত, নৃত্যের বা চিত্রের হিসেব নিই, তখন আমরা উপলব্ধি করি, সেই সব মানবসম্পদ তাদের জীবনযাত্রা ও জীবিকাপ্রণালীর সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। পশুচারীর গান, নাচ বা কৃষিজীবির গান, নাচ, তার পশুপালন বা তার কৃষিকার্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিল। অধিকাংশ প্রাচীন কবিতা, গান, চিত্র, আখ্যায়িকা, এরূপ জীবিকা—প্রচেষ্টার সহায়ক হিসেবেই রচিত হয়েছে। ঐ সব মানস প্রয়াসে তখনকার জীবিকা প্রয়াস সবল ও সমৃদ্ধ হয়েছে, সংস্কৃতি পূর্ণতর হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গোপাল হালদার (১৯২০-১৯৯৩) বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক, চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক হিসেবেই পরিচিত। 'একদা', 'আর একদিন', 'স্রোতের দ্বীপ' প্রভৃতি মননশীল উপন্যাসগুলি তাঁরই লেখনী প্রসূত। তাঁর উপন্যাসগুলির মতো প্রবন্ধগুলিও যেমন কলাকৌশলের দিক থেকে স্বতন্ত্র।

তেমনই স্বতন্ত্র তাদের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ ও চিন্তার প্রগাঢ়তার দিক থেকে। তিনি ছিলেন ফ্যাসীবিরোধী লেখক সংঘের অন্যতম কর্মী এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তন্নিষ্ঠ সভ্য। গোপাল হালদার 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদনা করেন দীর্ঘদিন। তাঁর প্রবন্ধগুলি তথ্য, বিশ্লেষণ ও মনীষায় সমৃদ্ধ। 'সংস্কৃতির রূপান্তর' (১৯৪১) বাংলা চিন্তাশীল সাহিত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য রচনা। এই গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হয়, ন্যাৎসী বাহিনী তখন মস্কোর দুয়ারে, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ তখন অনেকেরই নিকট মনে হয়েছিল অনিশ্চিত। বিশ্ব সংকটের সেই বিশেষ মুহূর্তে মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতির মূল পরিচয় উদঘাটনই এই গ্রন্থের উপজীব্য। প্রসঙ্গক্রমে বিশ্ব ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষীয় সমাজে সংস্কৃতি ও সংস্কৃতির রূপান্তরের মূলতত্ত্বগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করতে পারি।

আলোচ্য প্রসঙ্গের সূচনাতেই প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন, সংস্কৃতির অর্থ সম্পর্কে। সংস্কৃতির অর্থ সম্পর্কে জানাতে গিয়ে তিনি বলেছেন, এই পৃথিবীতে মানুষের ছাড়া অন্য কোনো জীবকুলের সংস্কৃতি বলে কিছু নেই। অর্থাৎ মানুষ হিসেবে মানুষের যে আসল পরিচয় সেটাই সংস্কৃতি। প্রকৃতির প্রতিকূল পরিবেশে মানুষ তার বুদ্ধি এবং শক্তির জোরে প্রকৃতিকে অনুকূল করেছে, বোঝাপড়া করে টিকে থাকার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করেছে—প্রাবন্ধিক মানুষের এই 'কৃতি' কেই সংস্কৃতি বলেছেন। প্রকৃতির অন্ধদাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে বাঁচার প্রচেষ্টায় জীবিকা আয়ত্ব করেছে, প্রয়াস প্রযত্নে আয়ত্ব করা জীবিকার সাহায্যে মানুষ অন্য জীব থেকে উন্নত হয়েছে, স্বাতন্ত্র লাভ করেছে। প্রাবন্ধিকের মতে জীবিকাপ্রয়াস ও শ্রমশক্তির মধ্যে দিয়ে বিশ্ব প্রকৃতির সহযোগে মানব প্রকৃতির এই স্বরাজ—সাধনাই হল সংস্কৃতি এবং এটাই সংস্কৃতির মূল কথা।

প্রবন্ধ লেখক গোপাল হালদার জানিয়েছেন, সংস্কৃতি বলতে সাধারণ মানুষের প্রচলিত ধারণার কথা, সাধারণ মানুষ সংস্কৃতি বলতে কাব্য, গান, শিল্প, দর্শন, আচার-বিচার এবং বিজ্ঞানকেই বোঝে। তিনি এও জানিয়েছেন, সংস্কৃতি কখনো কালগত হয়, আবার কখনো দেশগত, আবার সম্প্রদায়গত, ধর্ম ও জাতিগতও হয়। কিন্তু এ সবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে সংস্কৃতি সম্পর্কে কোনো স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক ধারণা বা জ্ঞান জন্মায় না। তাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সংস্কৃতির অর্থসম্পর্কে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন —

"মানুষের জীবন — সংগ্রামের বা প্রকৃতির উপর

অধিকার বিস্তারের মোট প্রচেষ্টাই সংস্কৃতি।"

প্রাবন্ধিকের মতে সংস্কৃতি মনের বিলাস মাত্র নয়, মনের সৃষ্টি সম্পত্তি নয়। এই সংস্কৃতি একান্তভাবেই বাস্তব প্রয়োজনে সৃষ্টি, এবং মানুষের জীবন সংগ্রামে তা শক্তি জোগায়। সেই সঙ্গে বাস্তব উদ্দেশ্যকেও সিদ্ধ করে। আর সেই জীবনযাত্রার ঘাত-প্রতিঘাতেই সংস্কৃতির রূপ ও রং পরিবর্তিত হয়। জীবন যাত্রার সঙ্গে তাল রেখে সংস্কৃতি নতুন হয়ে ওঠে। জীবনের সঙ্গে সংস্কৃতির এই সম্বন্ধই প্রমাণ করে সংস্কৃতি নিশ্চল নয়, সংস্কৃতিরও রূপান্তর ঘটে।

২.৪.১৫.২ : রূপান্তরের মূলতত্ত্ব

সমস্ত পরিবর্তনের মূলতত্ত্বটি আমাদের জানা প্রয়োজন। কারণ, সমাজ পরিবর্তন হয় ও সংস্কৃতিরও পরিবর্তন হয় এই সত্যও মানলাম। কিন্তু কোন্ নিয়মে এবং কেন এই পরিবর্তন ঘটে তা আমাদের জানা প্রয়োজন। মানব সমাজের পরিবর্তন ঘটেছিল আদিমকাল থেকে। তাই সংস্কৃতির পরবর্তী রূপান্তর কোনো বিশেষ চেষ্টা সার্থক করবে না, তা নিস্ফল করবে তা বুঝতে প্রয়োজন রূপান্তরের তত্ত্বের। আমরা যদি এই সত্য না বুঝি তাহলে বুঝতে পারব না সোভিয়েত প্রয়াস কেন সার্থক হয় এবং ফ্যাসিস্ত প্রয়াস কেন ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে রাশিয়া-আফ্রিকা জাতিসমূহ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান ঘটিয়ে আর্থিক

স্বাধীনতার বুনিয়াদ গড়তে চাইছে। আবার কেনই বা সাম্রাজ্যবাদ বাধ্য হয়ে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, পৃথিবীর জাগ্রত জনশক্তির বিরুদ্ধে আণবিক যুদ্ধের আয়োজন করতে চলেছে।

এই সব কথাই পরিষ্কার হয়ে যায়, সভ্যতার রূপান্তরের মূলতত্ত্ব উপলব্ধি করলে। মূলতত্ত্ব নিয়ে বিচার ও বিতর্কের অন্ত নেই, কিন্তু শেষপর্যন্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বিচারের পরীক্ষায় এই তত্ত্ব প্রমাণিত।

২.৪.১৫.৩ : বিজ্ঞানের সাক্ষ্য

মানুষের সামাজিক জীবন এবং তার যা অন্তর্জগত এ সমস্তই বাস্তব নিয়ম মেনে চলে তা আধ্যাত্মিক নয়। প্রকৃতিতে বস্তুই প্রধান জিনিস, আর মানুষ এবং পৃথিবীও বাস্তব। বস্তুপ্রকৃতি জড় নয়, চঞ্চল, পরিবর্তনশীল এবং নতুন নতুন আবির্ভাবের উৎস। বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক সন্ধানে অথবা আবিষ্কারে বিশ্ব প্রকৃতির মূল উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, পজিট্রন, মিসোট্রন ইত্যাদি। এই সমস্ত পদার্থের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সৃষ্টি হয় নতুন বস্তু। যেমন হাইড্রোজেন-অক্সিজেনের দ্বন্দ্বে সৃষ্টি হয় জল—যা সম্পূর্ণ নতুন বস্তু। বিভিন্ন পর্যায় পেরিয়ে এই সমস্ত বস্তু পুরাতন হতে নতুন, বা নতুন হতে নতুনতর ধাপে উত্তীর্ণ হয় আকস্মিক রূপে, একটু বড় রকমের বাধা ডিঙিয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক উৎক্রান্তিতে। প্রাবন্ধিক মানব সমাজের এই উৎক্রান্তিকেই বিপ্লব বলেছেন। এর ফলেই সকল বিরোধের সাময়িক অবসান হয়ে নতুনের আবির্ভাব ঘটে এবং নতুনের বুক ফেটে নতুনতর কিছুর জন্ম হয়। প্রাবন্ধিক এই তত্ত্বকেই বলেছেন—'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ' বা 'ডায়েলেক্‌টিকাল মেটিরিয়ালিজম'। শুধু বিশ্ব প্রকৃতিতে নয় এই বাস্তব সত্যের প্রমাণ মানুষের ইতিহাসের প্রবহমান ধারাতেও পাওয়া যায়। আর এ কারণেই একে 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' বা 'হিস্টোরিক্যাল মেটিরিয়ালিজম' বলে।

প্রাবন্ধিক আরো বলেছেন যে, বস্তু থেকেই পৃথিবীতে প্রাণবীজ অর্থাৎ প্রোটোপ্লাজম সৃষ্টি হয়। প্রাণের আবির্ভাব এবং তার শিষ্যবর্গের গবেষণা এবং বিশ্লেষণের ফলে সাধারণ মানুষ জেনে গেছে। চেতনাহীন বস্তু থেকে সচেতন প্রাণীতে উৎক্রান্তি—প্রাণী জগতে এটাও একটা সুবৃহৎ বিপ্লব। বস্তু বিকাশের শেষদান হিসেবে মানুষ পেয়েছে চৈতন্যকে। আর এই চৈতন্যের বিকাশের মধ্যে দিয়েই প্রকৃতির দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে মানুষ প্রকৃতিকেই বন্দিনী করেছে। সংঘাতের মধ্যে দিয়ে সভ্যতা-সংস্কৃতির আরো নতুন হয়েছে, উচ্চতর স্তরে উঠে গিয়েছে। প্রাবন্ধিকের মতে এই উচ্চতর স্তরে উঠার পথই হল বিপ্লবের পথ। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে এই যে বিবর্তন বা রূপান্তরের বিভিন্ন তত্ত্ব জানা গেল, তার মধ্যে দিয়ে আমরা বুঝতে পারলাম, সংস্কৃতির রূপান্তরের অর্থাৎ উচ্চতর স্তরে উঠবার পথই হল সংকট এবং বিপ্লব—আর প্রবন্ধ লেখক বলেছেন যে, এই সংকট এবং বিপ্লবই হল ইতিহাসের সাক্ষ্য। প্রসঙ্গত প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন—

"মানুষের ইতিহাসটাই এইরকম। তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালা-গাঁথা। সৃষ্টির গতি চলে সেই আকস্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায়, দশকে দশকে, যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় ঝাঁপতালে লয়ে।"

২.৪.১৫.৪ : ইতিহাসের সাক্ষ্য

প্রাবন্ধিক সংস্কৃতির রূপান্তরের তত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সাক্ষ্য যেমন নিয়েছেন, তেমনি ইতিহাসের সাক্ষ্যকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, বিশ্ব নিয়মের পূর্বোক্ত মূল সূত্রটি অর্থাৎ বিজ্ঞানের সাক্ষ্যকে যাঁরা মানতে চান না, ইতিহাসের পাতায় এই উৎক্রান্তির সাক্ষ্যকে তাঁরাও স্বীকার করেন।

প্রাবন্ধিকের মতে মানুষের ইতিহাস মূলত শুরু হয় তার জীবিকা প্রয়াস হতেই। আর তার পরেই মানুষের ইতিহাস তার আত্মবিরোধের ইতিহাসে পরিণত হয়। অর্থাৎ সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায় এবং তখন শুরু হয় তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য বিরোধ। শ্রেণী বিভক্ত সমাজ এইভাবে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে দিয়ে প্রগতির পথে অগ্রসর হয়।

প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন, সাধারণ জীবেরা প্রাণধারণের জন্য নির্ভর করে নিজনিজ পরিবেশের উপর, তাই জীবজগতের বড় শাস্ত্র 'পরিবেশ-বিজ্ঞান' (Ecology), কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এই পরিবেশ বিজ্ঞান মানুষের নিজের গুণে রূপান্তরিত হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থ বিজ্ঞানে; অর্থাৎ (Ecology)-র স্থান নিয়েছে (Economics)। এর সূচনা হয়েছে আদিম মানুষের উন্নত দেহ লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে। মানুষ যেদিন থেকে তার দৈহিক শক্তি এবং বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করতে শিখেছে, সেদিন থেকেই জীবিকা-প্রচেষ্টার ও উন্নয়ন বা সংস্কার শুরু হয়েছে। প্রাবন্ধিকের মতে জীবিকা উন্নততর করার মধ্যে দিয়েও সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটে। তাই সংস্কৃতির রূপান্তরের ক্ষেত্রে জীবিকাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়, তার সাক্ষ্য ইতিহাসে পাওয়া যায়। প্রাবন্ধিকের কথায় —

"সংস্কৃতির গোড়াকার কথা তাই জীবিকা, অর্থাৎ আর্থিক উদ্যোগ। সেই জীবিকার তাড়নায় মানুষ তাহা আয়ত্ত করিবার উন্নততর উপায় সর্বদাই খোঁজে, সমাজ তাহার আর্থিক বুনিয়াদ বারে বারে বদলায়।"

শ্রেণীদ্বন্দ্বের ফলে যে শ্রেণী জয়ী হয়, সেই শ্রেণী পুরনো শ্রেণীর সমস্ত কিছু আত্মসাৎ করে নিজেদের উৎপাদন প্রথা চালু করে। এভাবে বার বার নতুন শ্রেণীর জয়ী হবার ফলে পুরনো শ্রেণীর অনেক সৃষ্টি চুরমার হয়ে যায়, তার ধ্যানধারণা, ভাবনাচিন্তা, সাহিত্য সুকুমার কলা, রস নিদর্শন, যা কিছু সমাজ সভ্যতার পরম গরিমা — তা সমস্তই ধ্বংস হয়ে যায়। আর নতুন ভিত্তি গড়ে ওঠে উন্নততর ভূমির ওপর। তবে পুরানো সংস্কৃতি, তার জ্ঞানবিজ্ঞান, তার বাস্তব ও মানসিক সৃষ্টির সারবস্তু সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না, প্রয়োজন মতো নতুনের সঙ্গে মিশে নবায়িত হয়ে ওঠে, নতুন সৃষ্টিতে, নতুন রূপে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। এই ভাবেই নতুন আর্থিক ব্যবস্থায় গড়ে ওঠে নতুন মানসসম্পদ এবং এই ভাবেই ঘটে পুরনো সংস্কৃতির রূপান্তর।

২.৪.১৫.৫ : প্রস্তর যুগের বিবরণ

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ইতিহাস মানুষের জীবন-জীবিকার হিসেব মত যুগে যুগে বিভক্ত হয়। সেই যুগের বিশেষ বিশষ জীবিকা অবলম্বন ও উৎপাদন প্রথানুসারে, যেমন—প্রাচীন প্রস্তর যুগ, নব্য প্রস্তর যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ, তাম্র যুগ, লৌহ যুগ ইত্যাদি। মূলত বাস্তব উপকরণের উপাদান থেকে এই সমস্ত নামকরণ। মানব সভ্যতার ইতিহাস সুদীর্ঘকালের ইতিহাস। বহু বছর পর্যন্ত প্রায় প্রাজ্ঞনরের (Hominids) ইতিহাস, চীন, জার্মান, আফ্রিকায় এদের করোটি এবং নানা চিহ্ন পাওয়া গেছে। তারপরে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে 'হোমো সেপিয়েন্স' বা সজ্ঞান-নৃজাতি। প্রস্তর যুগই মানব সভ্যতার প্রথম যুগ। এই যুগই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রাচীন প্রস্তর যুগ ও নব্য প্রস্তর যুগ। প্রাচীন প্রস্তর যুগের কাল প্রায় ২ লক্ষ বছর। ২ লক্ষ বা আড়াই লক্ষ বছর পূর্বে এই যুগ আরম্ভ হয়েছিল। এই সময়কালের মধ্যে আদি যুগ, মধ্যযুগ ইত্যাদি ভাগ রয়েছে। এই সময়কালের মধ্যে নানা প্রকার প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে তা আমাদের মনে রাখতে হবে। মানুষ প্রথমে কুঠার, ছুরি, বর্শা প্রভৃতির সাহায্যে ছোটো ছোটো দলবদ্ধ হয়ে শিকার করত। শিকারের পশু আগুনে ঝলসিয়ে আহার করতো। কখনো বা ফলমূল খেত। মানুষ নদী ও সমুদ্র থেকে মাছ ধরতেও শিখেছিল। মোটের উপর খাদ্য সংগ্রহ ছিল অনিশ্চিত। মর্গ্যান এই যুগটাকে বলেছেন 'স্যাভেজারির' যুগ।

বাংলায় ‘অসভ্য’ না বলে ‘নিষাদ’ সমাজের যুগ বলা হয়। মানুষের পরিবার বা সম্পত্তি কিছুই ছিল না। কাজে কাজেই সমাজ-সম্পর্ক ছিল জীবিকাগত ও মানুষবোধগত। তখন পর্যন্ত সমাজের শ্রেণী বিভাজন এবং শ্রেণী শোষণ দেখা যায়নি। সেই সময়টাকে বলা হয় আদিম সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা। তবু আমাদের মনে রাখতে হবে জীবন বিচ্ছিন্ন শিল্পচর্চা নয়, জীবনের দায়ে এক প্রকার জীবিকা চর্চা। প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের ‘ধর্মবোধ’ বা ‘মতাদর্শ’-এর এক বিশেষ পরিচয় এই ‘যাদুতে’। অজ্ঞতা, ভয় আর বিস্ময় থেকে আদিম মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে স্বভাবতই নিজেদের ভাগ্য বিধাতা, ভূত বা দেবতা বলেই নিজেই সন্তুষ্ট করতো। এখনো অসভ্য জাতির মধ্যে তাই-ই ধর্ম। সেই সন্তুষ্ট করবার একটা প্রাচীন কৌশল যাদু বা মন্ত্রতন্ত্র, জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে নিজ কামনার অনুরূপে মানুষ শুধু চিত্রে নয়, মন্ত্রতন্ত্রের সঙ্গে নাচে-গানে, নানা অনুকৃতিমূলক কাজে জীবজন্তু, বৃক্ষ-লতা-পাতা থেকে প্রকৃতির নানা ব্যবস্থাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে বাধ্য করত। যে ফল লাভ তাদের অভিষ্ট সেই ফল লাভ যেন ঐ অনুকৃতিমূলক প্রক্রিয়াতেই আয়ত্ব হয়, লক্ষ ও পদ্ধতি যেন অভিন্ন। এই রূপই ছিল তৎকালীন সময়ে মানুষের ধারণা।

প্রাচীন প্রস্তর যুগের তুলনায় নব্য প্রস্তর যুগের সময়কাল কম। প্রায় দশ-বার হাজার বছর পূর্বে এই যুগের সূচনা হয়েছিল। মর্গ্যানের ভাষায় ‘বর্বর’ জীবনকাল। এই যুগে মানুষ কৃষি বিদ্যাকে আয়ত্ব করে। ঘট ও পাত্র নির্মাণ করে, তার সঙ্গে পশুপালনও শুরু করে। আবার এই যুগের শেষে সূতো কাটা ও কাপড় বোনা শুরু হয়। এই সব কাজে মেয়েরাই ছিল মুখ্য। এই সময়কার সমাজে দুটি নতুন রূপ পেল। একটির বনিয়াদ কৃষিকাজ অন্যটি পশুপালন। কোনোটিরই বর্তমান সভ্যতায় গুরুত্ব হারায়নি।

২.৪.১৫.৬ : কৃষির দান এবং ধাতুর আবিষ্কার

মানব সভ্যতার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ যুগান্তকারী পরিবর্তন হল কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন। তাই পুরাতত্ত্ববিদেরা একে বলেন মানব সভ্যতার প্রথম বিপ্লব। কৃষির যখন আবিষ্কার হয়েছিল তখন মানুষ ছিল বর্বর জীবনের যুগে। ধাতু বা কাঠের খুন্তি বা পাথরের কোদালি দিয়ে বীজ বপন করত। এই ভাবেই চাষাবাদ চলতো। এই বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল নব্যপ্রস্তর যুগের শেষের দিকে। উত্তর আফ্রিকায়, দক্ষিণ ইউরোপ, পূর্ব এশিয়ার বিশাল নদ-নদীর তীরে এই কৃষিকাজ চলতো। পরবর্তীকালে মিশরের নীল নদ, টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস নদী, চীন দেশের হোয়াংহো, ইয়াংসি কিয়াং আর ভারতবর্ষের সিন্ধু নদের তীরে সভ্য জীবনের প্রথম জনপদগুলি গড়ে ওঠে। সেইসব সভ্য সমাজের সাধারণ নাম ‘এশিয়াটিক সমাজ’। দীর্ঘকালব্যাপী নব্য প্রস্তর যুগের নানা কেন্দ্রে মানব জীবনযাত্রা বিভিন্ন হাতিয়ার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছিল। এই সময়কালে মানুষের প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনে সমর্থ হল। সে যুগের চিন্তা ভাবনার কিছু কিছু সন্ধান আমরা পাই। তাদের সব সমাধিতে তার আড়ম্বরের আয়োজন দেখে।

জীবিকা অর্জনের সাফল্যের মধ্য দিয়ে ছোটো ছোটো গ্রাম পত্তন করে। প্রথম দিকে এই গ্রাম ছিল আত্মনির্ভর, শৃঙ্খলিত। কিন্তু এই নব্য প্রস্তর যুগের শেষে মানুষ পশুপালন ও কৃষিকাজ আয়ত্ত করে ঈষদুষ্ণ অঞ্চলেও এক একটি জায়গা স্থির করে ফেলল, অর্থাৎ গৃহস্থে পরিণত হল। জমি এবং পশু হল তার সম্পত্তি। এই অবস্থায় কৃষির প্রধান প্রয়োজন হল সেচ ব্যবস্থার, অর্থাৎ বৃষ্টি কিম্বা নদীর। তাই মেঘ বা ইন্দ্র-দেবশ্রেষ্ঠ, নীলনদ-দেবতা, গঙ্গা-দেবী, প্রাকৃতিক শক্তিগুলি ‘ভুত’, ক্রমে দেবতা রূপে স্থান নিল। আবার এর সঙ্গে সঙ্গে পূর্ত বিদ্যার প্রচলন হল। আর কৃষির ‘খণ্ড’ বুঝবার জন্য গ্রহ-নক্ষত্রর বিচার বা জ্যোতির বিদ্যার প্রচলন ঘটল। কৃষির প্রথম দিকে অবশ্য জমি-জমা সবই ছিল ‘জিন’ বা জনের সম্পত্তি। ‘জন’ বলিতে এক একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে বোঝানো হত, আর জনপদ বলিতে এক-একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বাসভূমিকে বোঝাতো।

ধাতুর আবিষ্কার ঃ

নব্য প্রস্তর যুগের অবসান ঘটল ধাতুর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। ধাতুর প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে পাথরের দ্রব্যাদি একেবারে লোপ পেল না। প্রস্তর যুগের অনেক জিনিষ থেকে গেল। বর্বর জীবনের প্রথমার্ধের অবসান হলেও শুরু হলো দ্বিতীয় পর্বের 'উচ্চতর বর্বর জীবনের' পালা। ধাতুর ব্যবহারের মধ্যে মানুষ প্রথম যে ধাতু ব্যবহার ও আবিষ্কার করল তা হলো তাম্রধাতু। পরবর্তীতে ব্রোঞ্চ এবং তার পরবর্তীতে লৌহ ধাতুর আবিষ্কার হল।

আনুমানিক ছয় হাজার বছর পূর্বে প্রাচ্যে প্রথম আবিষ্কার হল তামার। তামার আবিষ্কারের দেড় হাজার বছর পরে আসে ব্রোঞ্জ ধাতু। এই দুইয়ের ফলে সমাজ গঠনেও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বিশেষজ্ঞ কারিগরেই তামা ও ব্রোঞ্জের বস্তু নির্মাণ করতে পারে।

সমাজের বেশিরভাগ অংশ অবশ্যই চাষ, পশু শিকার এবং পশু পালনের মধ্য দিয়ে জীবন জীবিকা নির্বাহ করত। মানব সমাজের সামান্য অংশই দক্ষ কারিগর বা যাদুকর বলে খ্যাতি অর্জন করত। খনি থেকে ধাতু তুলে চুল্লীতে তা গলিয়ে, হাতিয়ার তৈরী করা শুরু করল। ধাতুর আবিষ্কারের ফলে মানুষের মধ্যে ধাতব যন্ত্রপাতির প্রতি প্রত্যাশা বেড়ে গেল। ফলে একদিকে ধাতুর বস্তু কৃষিতে এবং বস্ত্রবয়নে প্রয়োজন হতে লাগল। ফলে সমাজে বহু যন্ত্রপাতির কারিগর রূপে দেখা দিল সূত্রধর, রাজমিস্ত্রী, ভাস্কর, খোদাইকার, চর্মকার, স্বর্ণকার, মনিকার প্রভৃতি শ্রেণীর। সুতরাং সমাজে শ্রমবিভাজন দেখা গেল। সমাজেও পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি ঘটল। ধাতব যন্ত্র ব্যবহারের এই প্রথম দিককার হাজার বছরকে তাই পুরাতত্ত্ববিদ্রা বলেন বর্বর জীবনের "দ্বিতীয় বিপ্লবের" যুগ।

২.৪.১৫.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। সংস্কৃতির অঙ্গ বলতে কী বোঝায়? এই অঙ্গ কয় প্রকার? —অলোচনা করো।

২। সংস্কৃতির বিকাশে ইতিহাসের ভূমিকা নিরূপণ করো।

৩। সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিরূপণ করে তার তিন অঙ্গের পরিচয় দাও।

৪। সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সমম্পর্কে প্রাবন্ধিক গোপাল হালদারের ভাবনার বিস্তৃত পরিচয় দাও।

পর্যায়গ্রন্থ - ৪

একক - ১৬

সমাজতন্ত্রই ভবিষ্যৎ

বিন্যাসক্রম :

২.৪.১৬.১ : শ্রেণীবিভক্ত সমাজ

২.৪.১৬.২ : পুঁজিবাদের উদ্ভব, সংকট এবং বৈশিষ্ট্য

২.৪.১৬.২.১ : জাতীয়তাবাদ

২.৪.১৬.২.২ : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

২.৪.১৬.২.৩ : গণতন্ত্র

২.৪.১৬.৩ : সাম্রাজ্যবাদের সংকট

২.৪.১৬.৪ : সমাজতন্ত্রই ভবিষ্যৎ

২.৪.১৬.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.৪.১৬.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

২.৪.১৬.১ : শ্রেণীবিভক্ত সমাজ

সভ্যতার আদিযুগে আমরা দেখি পশুপালন ও কৃষিকর্মের ফলে যেমন পশু, শস্য, যন্ত্রপাতির জমির বৃদ্ধি হয়, তেমনি গোষ্ঠীর জনসংখ্যা বাড়ল। চাষের সুবিধার জন্য এক এক খণ্ড জমি এক এক গোষ্ঠীর হাতে গেল, পরে সেই গোষ্ঠী ভেঙে তার অংশ স্বরূপ পরিবারের হাতে জমির সত্ত্ব থেকে গেল। এদিকে তখন তাঁতে বস্ত্রবয়ন আরম্ভ হয়েছে। ধাতু গলিয়ে নতুন নতুন অস্ত্র এবং অলংকার তৈরী হয়েছে অর্থাৎ গৃহশিল্পের সূচনা হয়েছে। তবে যারা দরিদ্র, নিঃস্ব তারা ঐসব বস্ত্র ও যন্ত্র পায়না। পশুপালন, কৃষিকর্ম, কুটির শিল্প— এই সবের জন্য ক্রমেই দাসেদের প্রয়োজন বাড়ে।

এরপর দরকার হল শ্রমবিভাগ—কারণ কৃষির ও পশুপালনে উন্নতিতে উৎপাদন বেড়েছে, সকলের সব কাজ করার দরকার নেই। কুম্ভকার, কর্মকার, সূত্রধর প্রভৃতি বিশিষ্ট বৃত্তিধারী শ্রেণী যখন দেখা দিল, তখন উৎপাদন শক্তি আরও বৃদ্ধি পায়। এইভাবে শ্রমবিভাগের সঙ্গে শ্রেণীবিভাগও আরো পাকা হয়ে ওঠে। এই ব্যবস্থায় বহুদিন পর্যন্ত জমিও উৎপন্ন দ্রব্য তবু পরিবারগতই ছিল, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে গণ্য হয়নি।

এইভাবে পরিবারের আবির্ভব মানুষের মানসিক জীবনেও একটা বড়ো ঘটনা। আজ মানুষ পারিবারিক সম্পর্কের অপেক্ষা পবিত্র সম্পর্কের কথা কল্পনা করতে পারে না। কিন্তু প্রধানত টাকার আবির্ভাব হয় সমাজের আর্থিক পরিবর্তন ও বিন্যাসের তাগিদে। প্রাচীন সমাজ প্রায়ই ছিল মাতৃ প্রধান সমাজ। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহের যুগে নারী এঁটে উঠতে না পারায় শিশুর প্রাণরক্ষার্থে পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়। এইভাবেই মানব শিশুর পিতৃপরিচয়-এর প্রথম সূচনা হয়। আরো পরে নারীরও কর্তৃত্বের ধীরে ধীরে অপসারণ ঘটে, যুদ্ধ বিগ্রহ, জমি চাষ, ধাতু শিল্প তখন পুরুষসাধ্য কঠিন কাজ। অন্যদিকে শ্রমবিভাগের প্রসারে বিশিষ্ট

বৃত্তিধারীও দেখা যায়। ঐ সব কাজে নারীর স্থান হয় গৌণ। সংসারেও তাই তাদের স্থান গৌণ হয়ে পড়ে। প্রধান কাজ হয় রান্নাবান্না ও সন্তান ধারণ ও পালন করা।

তখন কৃষির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলে শিল্প, তখন ধীরে ধীরে জিনিসপত্রের বিনিময় আরম্ভ হয়। আরম্ভ হয় বেচাকেনা, লেনদেন। বর্তমান যুগের উৎপাদনের যা সব বড় লক্ষণ সেই পণ্যজাত এভাবেই সমাজে আসে। এই বিনিময়ের কাজটা সরাসরি এখনো কোথাও কোথাও চলে। এর পরের স্তরগুলি শ্রমবিভক্ত ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজের মধ্যে থেকে ক্রমে ফুটে বার হতে থাকে। বহিঃশত্রু থেকে রক্ষার জন্য পরিবারগুলি ঐক্যবদ্ধ হত, এখানেই কূল একত্র হত tribal বা উপজাতি। যুদ্ধের প্রয়োজনে তারা চাইল নেতা, যাদু শক্তির প্রয়োজনে পুরোহিত। অনেক প্রাচীন দেশে এরূপ বিভাগ ছিল যা শ্রেণীবিভাগকে পাকা ও অনড় করে রেখেছিল।

তারপর ধীরে ধীরে দেখা দিল দুটি শক্তি। এক ক্ষত্রিয় শক্তি, যুদ্ধ যার কাজ ও পুরোহিত শক্তি। প্রাচীন মিশরের মতো অনেক দেশে এই পুরোহিত শক্তি হতেন শাসক। শেষে শাসক থেকে সৃষ্টি হল রাজার। এবার রাজ্যের জন্ম হয়। ব্যবসায়ীদের স্থান এদের নীচে। আসল প্রভুশক্তি ক্ষত্রিয় আর পুরোহিতরা। বণিকেরা তাদের নীচে—তাদেরই সহযোগী, কিন্তু স্বশ্রেণীর নয়। পরাজিত, বন্দী, শোষিত দাসদের কাজ হল এই তিন শক্তির সেবা অর্থাৎ সকলের জন্য পরিশ্রম ও খাদ্য উৎপাদন। ক্ষত্রিয় শক্তির কাজ পররাজ্য লুণ্ঠন প্রভৃতি। একদল পরিশ্রম করবে অন্যদল তার ফলভোগ করবে—সমাজের মধ্যে এই একটা বৈষম্য ও বিরোধীতার সম্পর্ক এইভাবে আদিম সাম্যবাদ ভেঙে ‘সভ্য সমাজ’-এর যুগে পৌঁছতে পৌঁছতে স্থায়ী হয়ে গেল।

২.৪.১৬.২ : পুঁজিবাদের উদ্ভব, সংকট এবং বৈশিষ্ট্য

রোমের পতনের পরে পাশ্চাত্য জগতে অন্ধকার যখন চেপে বসেছে, তখন একটু একটু করে ইউরোপে যে সমাজ গড়ে ওঠে তাকে ‘ফিউডাল’ বা সামন্ত সমাজ বলে। দুটি শ্রেণীতে ফিউডাল সমাজ বিভক্ত ছিল — উপরে জমিদার স্বরূপ সামন্তরা আর নিচে সাধারণ সার্ফ বা ভূমিদাস কৃষক। ফিউডাল সমাজ তাই প্রধানত গ্রাম্য সমাজ, চাষী ও কারিগরের সমাজ। কিন্তু ক্রমশ এই সমাজব্যবস্থাতেও কারিগর কারবারীদের ব্যবসার প্রাধান্য লক্ষ করা গেল। বলাবাহুল্য, কালক্রমে ব্যবসায়ী বণিকেরাই কারিগর রেখে কারখানা গড়বে, পুঁজিপতি হিসেবে তারাই হবে শিল্পপতি, তৈরী করবে পুঁজিতন্ত্রের যুগ বা বুর্জোয়া যুগ। সামন্ততন্ত্রের অবসান হলে আসে বণিকতন্ত্রও বণিক-পুঁজিবাদের যুগ। তারই পরিণতি হল বুর্জোয়া ধনিকদের যুগ-শিল্পপতির পুঁজিতন্ত্র বা ইন্ডাসট্রিয়াল ক্যাপিটালিজমের প্রসার।

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের মধ্যে দিয়েই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উদ্ভব-প্রসার ঘটে। ষোড়শ শতাব্দীতে একদিকে বিজ্ঞানের আবিষ্কার নতুন নতুন কলকারখানা, শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। দীর্ঘকালের পচাগলা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন হয়ে পুঁজিবাদের উদ্ভব হয়। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় অনেক ভালো ব্যবস্থা হল পুঁজিবাদী ব্যবস্থা।

ব্রিটিশ বুর্জোয়া বণিকদের লুটকরা পুঁজি, শিল্প বিপ্লবের পুঁজি রূপে স্বীকৃতি পায়। এই সময় পৃথিবীতে শিল্পযুগের গোড়া পত্তন হল, কারণ বিজ্ঞানের আবিষ্কার, নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে পুঁজি নিয়োগের ক্ষেত্রভূমি দিন দিন প্রসারিত হল। ব্রিটেনের কারখানা বিস্তারের পুঁজিটা এসেছিল প্রধানত ভারতবর্ষের লুণ্ঠিত সম্পদ থেকে। বিদেশী বণিকই রাজা; আমাদের দেশের পুরানো হাতের কাজ বিলেতের কলের কাছে দাঁড়াতে পারলো না। দেশীয় শিল্পীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে গিয়ে হয় চাষী হল নয় কলের

মজুরে পরিণত হল। যন্ত্রের মালিক কলওয়ালার কাছে মজুর খাটতে গেলে মজুরদের নিজেদের উদরপূর্তির জন্য নিজেদের শ্রমশক্তি বাঁধা দিতে হয়। এটাই পুঁজিতন্ত্র বা বণিকতন্ত্র (Capitalism)। এই প্রথার যন্ত্র থাকে মালিকের হাতে, তা মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। যন্ত্রজাত উৎপাদিত পণ্য তৈরী হয় কারখানার শ্রমিকদের সমষ্টিগত পরিশ্রমের ফলে (Socialized Labour)। উৎপাদিত পণ্যের মোট মূল্য যা সর্বাংশে তা শ্রমিকের পরিশ্রমের সমতুল্য। কিন্তু মজুর পায় সেই মূল্য থেকে সামান্য অংশটুকু মজুরী রূপে। অবশিষ্টাংশ মালিক মুনাফারূপেই ভোগ করে। মুনাফাটা আসলে উদবৃত্ত শ্রমমূল্যের (Surplus Values)। অর্থাৎ মুনাফার অর্থ হল শ্রমিকের মেহনতির সেই শ্রমের ভাগ যা শ্রমিককে না দিয়ে মালিক নিজে আত্মসাৎ করে।

পুঁজিবাদের সংকট ঃ

ঊনবিংশ শতকে পুঁজিবাদের অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ ও প্রতিযোগিতা মূলক বিকাশের পর, সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পুঁজিবাদ প্রবেশ করে সাধারণ সংকটের মধ্যে দিয়ে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, এই পর্বে বিশ্ব পুঁজিবাদের সংকট হয়েছিল তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে। এর প্রথম পর্যায়টি ছিল ১৯২৩-২৪ সাল পর্যন্ত, দ্বিতীয় পর্যায়টি ছিল ১৯২৪-২৯ পর্যন্ত। তখন সংকট থেকে পুঁজিবাদের আংশিক পুনরুদ্ধার ঘটে। এই সময়টা ছিল পুঁজিবাদের অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীলতার সময়। তৃতীয় পর্যায়, অর্থাৎ ১৯২৯-৩৩; এই সময় চলে পুঁজিবাদী বিশ্বের মহামন্দার পর্যায়, গভীর সংকটের মধ্যে প্রবেশ করে পুঁজিবাদ, যার জের পড়ে প্রায় সর্বত্র।

পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ প্রচলিত উৎপাদন সংকটের মধ্যে দ্বন্দ্বের তীব্রতা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। ১৮৩৫ সাল থেকে ১৯২৮ সালের মধ্যে সারা বিশ্বে শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রশক্তির পরিমাণ ৬.৫ লক্ষ অশ্বশক্তি থেকে বেড়ে ৩৯ কোটি অশ্বশক্তিতে পৌঁছেছিল। কেবল ১৯১৩ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৪৭ বিলিয়ন ইউনিট ২০০ বিলিয়ন ইউনিটে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সবরকম শক্তি মেলালে ১৯২৭ সালের বিশ্বের মোট শক্তি উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৫০ কোটি অশ্বশক্তির সমান। ১ অশ্বশক্তি মানে প্রায় ৬ জন মানুষের পেশীশক্তির সমান ধরে নিয়ে দেখা যাচ্ছে দুনিয়ার আবার বৃদ্ধ-বণিতা প্রত্যেকটি মানুষ পিছু ৫ জন কৃতদাসের শক্তি মজুত ছিল। কিন্তু তাতে সাধারণ মানুষের অসহায়ত্ব কমেনি। ১৯১৩-২৮-এর মধ্যে বিশ্বের জনসংখ্যা মাত্র ১১.৬ শতাংশ বাড়লেও খাদ্যের রপ্তানীর পরিমাণ বেড়েছে ১৪৭ শতাংশ। তবু অনাহার ও বেকারী এই সময়কালে বেড়েছে বৈ-কমেনি। ১৯১৯ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা আমেরিকায় ৯.০৩ লক্ষ থেকে ৮.৭৪ লক্ষে নেমে এসেছে। ব্রিটেনে ১৯২৩-এর মধ্যে এটা ৮.৩৬ লক্ষ থেকে ৭.৮৯ লক্ষ কমে গিয়েছে। লক্ষ করা দরকার, এসব হল ১৯২৯-৩৩-এর বিশ্ব পুঁজিবাদী সংকটের শুরু হওয়ার আগের কথা। ১৯৩৩ সালে সারা পুঁজিবাদী দুনিয়ায় বেকার সংখ্যা ৫ কোটিতে এসে ঠেকেছিল। ১৯১৩-১৯২৮-এর মধ্যে সারা পুঁজিবাদী দুনিয়ার জাতীয় আয়ের যে অংশটা মজুরীর জন্য তার পরিমাণ কমতে লাগল। মুদ্রাস্ফীতি শ্রমজীবী মানুষের এই আয়টুকু শুষে নেয়। দেশের আভ্যন্তরীণ বাজার সংকুচিত। প্রথম মহাযুদ্ধের বাজার ভাগাভাগি করে নেওয়ার পর বাইরের বাজারও সীমিত হয়ে যায়। নভেম্বর বিপ্লবের ফলে পৃথিবীর ৬ ভাগের ১ ভাগ অংশ পুঁজিবাদের হাতছাড়া। ফলে সংকট তীব্রতর হল ১৯২৯ সালে সংকট এবং যুদ্ধ ও পররাজ্য গ্রাসের সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসীবাদী অভিযানের মধ্যে দিয়ে তার সমাধানের প্রচেষ্টা থেকে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হল সেই বিবরণে যাওয়ার আগে ১৯২৪-২৯-এর সাময়িক পুনরুদ্ধার স্থিতিশীলতার আসল চরিত্রটা বোঝা দরকার।

এই সময়টা ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেকার অবস্থার পুনরুদ্ধার করার জন্য বিশ্ব পুঁজিবাদের শেষ ও মরিয়া প্রচেষ্টার সময়। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পর দ্বন্দ্বগুলির তীব্রতা বৃদ্ধি, ইউরোপের কয়েকটি দেশে বিপ্লবী পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। রুশ বিপ্লব সম্পন্ন হলেও জার্মানী, অস্ট্রিয়া, ইতালী ইত্যাদি দেশে বিপ্লব

পরাস্ত হয়। বিপ্লবের আতঙ্কের খাঁড়া শাসকশ্রেণীর মাথার উপর ঝুলে থাকলো। এই উদ্ভুত অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে পুঁজিবাদের সংকট আরো তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করে।

শিল্পপতিরা পরশ্রমভোগী, শ্রমিকের উৎপন্ন পণ্য সস্তায় কিনে মুনাফা করে। শ্রমিককে তার শ্রমমূল্য আসলে ফাঁকি দেয়। প্রকৃতপক্ষে মুনাফা জিনিসটা শ্রমিকেরই উদ্বৃত শ্রম—শ্রমিকের যে পরিশ্রমের জন্য শ্রমিক মজুরী পায়না, তারই নাম মুনাফা। এই মুনাফার উপরই বুর্জোয়ার ঐশ্বর্য গড়া, বাণিজ্যগড়া, তার পুঁজি গড়া—গড়া এই বুর্জোয়া সভ্যতা। এই মুনাফার লোভই হল তার সমস্ত প্রয়াসের মূল কথা। প্রাবন্ধিকের মতে —

"সেই মুনাফার লোভে সে বাণিজ্যের নামে সাম্রাজ্য আয়ত্ব করে, মুনাফার লোভে বিজিতদের শিল্প নষ্ট করিয়া নিজের মাল চালায়, একচ্ছত্র মুনাফা ভোগের আশায় সে সেখানে একচেটিয়া বাজার দখল করিয়া লয়। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের উদ্ভব ও বিস্তারের ইতিহাসও ইহাই, এই মুনাফার শিকার।"

ভারতবর্ষে ইংরেজরা উপনিবেশ গড়ে তুলল—ব্যবসার স্বার্থে, সর্বোপরি নিজেদের স্বার্থে। ব্রিটিশ বুর্জোয়া বণিকের লুঠ করা ঐশ্বর্যের দ্বারাই ব্রিটিশ শিল্পবিপ্লবের প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগ্রহ হয়। তাতেই আবার পৃথিবীতে শিল্পযুগের গোড়াপত্তন হল। কারণ, বিজ্ঞানের ক্রম প্রসারিত জ্ঞান তখন কতগুলি নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে। ফলে জিনিস তৈরী করা যায় অনেক বেশি এবং অনেক তাড়াতাড়ি। মানুষ অপেক্ষা কলে কম খরচে বেশি মাল উৎপাদন হয়, এই কথা দাসপ্রথায় গ্রীস-রোম বা সমাজতন্ত্রী ভারতবর্ষ-চীনও বোঝেনি, কিন্তু ইংরেজ বুর্জোয়া বণিকেরা এই কথা বুঝেনি, কিন্তু ইংরেজ বুর্জোয়া বণিকেরা এই কথা বুঝেছিল ভালোভাবেই। তাই নতুন কলকারখানা বসাতে থাকল। ব্রিটেনের এই কারখানা বিস্তারের পুঁজিটা এসেছিল প্রধানত ভারতবর্ষের লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য থেকেই। বিদেশী বণিকই তখন এদেশের রাজা। আমাদের দেশের পুরানো হাতের কাজ বিলেতের কলের সামনে তখন আরো টিকতে পারল না —

"দেশীয় শিল্পীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হারিয়া গিয়া হয় চাষী হইতে চাহিল, নয় কলের মজুর হইতে লাগিল। যন্ত্রের মালিক কলওয়ালার কাছে মজুর খাটিতে গেলে মজুরদের নিজেদের উদরপূর্তির জন্য নিজেদের শ্রমশক্তি বাঁধা দিতে হয়। ইহাই পুঁজিতন্ত্র বা ধনিকতন্ত্র (Capitalism)।"

এই প্রথায় যন্ত্র থাকে মালিকের হাতে, তা মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। যন্ত্রজাত দ্রব্য তৈরী হয় কারখানার মজুরদের সমষ্টিগত পরিশ্রমে। অর্থাৎ এই তন্ত্রের সমীকরণটা দাঁড়ায় এই রকম —

উৎপন্ন দ্রব্যের মোট মূল্য = মজুরদের সমষ্টিগত পরিশ্রম

মজুরের প্রাপ্য = বেঁচে থাকার মতো মজুরী

মুনাফা = উৎপন্ন দ্রব্যের মোট মূল্য — মজুরদের মজুরী

মুনাফা = সমষ্টিগত পরিশ্রম — মজুরদের মজুরী

মুনাফা = উদ্বৃত শ্রমমূল্য

এদিকে যত কল বাড়ে, যত বেশি সংখ্যায় মজুর খাটে, যত বেশি মজুর কাজ দেয় — ততই এই মুনাফা ফেঁপে ওঠে। তাতে কল মালিকের পুঁজি আরো বাড়ে। আবার সেই পুঁজিতেই বসে নতুন কল-কারখানা। এই নিয়মে দেড়শত বছরে আজ ইতিহাসে যন্ত্রযুগের বিবর্তনে অতিকায় কারখানার পর্ব দেখা দিয়েছে—যন্ত্রই সেখানে প্রধান, মজুরও সংখ্যায় স্বল্প প্রয়োজন। প্রাবন্ধিক লিখেছেন —

"যুগ হিসাবে আজ সভ্যতার ইতিহাসে দেখা দিয়াছে কৃষিযুগের শেষে এই শিল্পযুগ। বুঝিতে হইবে—যন্ত্রবলের প্রসারে এখন আবার উৎপাদন শক্তির প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে এই মুনাফাদারীর হাত হইতে মুক্তি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা।"

অর্থাৎ সমাজ ও সভ্যতা রূপান্তরিত হতে চলেছে এটাই লক্ষণীয় বিষয়। প্রাবন্ধিক শুধুমাত্র পুঁজিবাদের উদ্ভবের ইতিহাসের অনুসন্ধানই করেননি, এই যুগের বিশেষ লক্ষণগুলি সম্বন্ধেও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। সভ্যতার ইতিহাসে পুঁজিবাদের স্বরূপ-লক্ষণকে স্পষ্ট করে সমাজে যে পরিবর্তন এসেছিল তা ব্যাখ্যা করেছেন। সেই বৈশিষ্ট্যগুলি হল —

২.৪.১৬.২.১ জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদ মানুষের সহজাত। কিন্তু এই জাতীয়তাবাদের আধিক্যেই মানুষ বাণিজ্য প্রসারের দায়ে পররাজ্যগ্রাসী হয়। এমনকি অধীন জাতির জাতীয়তাবোধেও বাধা দেয়। যেমন, ইংরেজ চেয়েছে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদকে চাপা দিতে; ওলন্দাজরা চেয়েছে ইন্দোনেশীয়ার জাতীয়তাবোধের উপর হস্তক্ষেপ করতে। এই যুগেই জাতীয়তাবোধ প্রকটভাবে দেখা দেয়।

২.৪.১৬.২.২ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য

পুঁজিবাদের প্রয়োজন ছিল মজুরদের। নবজাত বুর্জোয়া তখন বলেছিল, প্রত্যেকেই নিজের শ্রমশক্তি বিক্রি করার অধিকারী হোক—কেউ যেন অন্যের ক্রীতদাস বা ভূমিদাস বা গোলাম না থাকে। সামন্ত যুগে শিল্পী-কৃষকেরা দাসস্বরূপ ছিল। সামন্তযুগের ভূমিদাসদের এই রকম 'স্বাধীন' মজুরে পরিণত না করতে পারলে পুঁজিদার তখন কলের মজুরই পেত না। তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী হল পুঁজিদারেরা। পুঁজিদারের নিজের কাম্য ছিল ব্যক্তিগত মুনাফা, তাই নিজের শ্রম অর্জিত সম্পত্তিতেও প্রত্যেকেই অখণ্ড অধিকারী—এইরূপ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের নীতিতে তারা বিশ্বাস করতেন।

২.৪.১৬.২.৩ গণতন্ত্র

মানুষের অধিকারের দাবী নিয়ে বণিক-ধনিকেরা মধ্যযুগের সামন্ত ও যাজকদের পুরুষানুক্রমিক শাসন ব্যবস্থা উচ্ছেদ করেন। এবং সেই বণিকেরা ক্রমে রাষ্ট্রচালনায় নিজেরাই প্রধান পদ গ্রহণ করেন। জনগণের সাহায্য ছাড়া এই রাষ্ট্র ক্ষমতা আয়ত্ব করা যায় না। তাই তাঁরা জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক দায়িত্বশীল রাষ্ট্র স্থাপন করেন—এটাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। বুর্জোয়াদের এই গণতন্ত্রের অর্থ—রাষ্ট্রের চোখে সবাই সমান। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে এতে আর্থিক বৈষম্য বিদূরিত হবে, বরং ব্যক্তিগত থাকল। তাতে মনিব আর মজুরের ধনের বৈষম্য আরো বেড়ে গেল। ধনিক শ্রেণীর হাতেই অর্থের প্রাচুর্য—ফলে সমস্ত রকমের সামাজিক সুযোগ সুবিধা তারাই ভোগ করতে থাকল। অন্যপক্ষে দরিদ্র্য শ্রেণী, বঞ্চিত শ্রেণী, তাই বুর্জোয়া গণতন্ত্র সত্ত্বেও তারা খেতে পায় না, পরতে পায় না, লেখাপড়ার সুযোগ পায় না, পায় না রাজ্য পরিচালনায় নিজেদের অধিকার আদায় করতে। অর্থাৎ এই গণতন্ত্রে রাজনৈতিক গণতন্ত্র থাকলেও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র নেই। ধনিকের চালিত গণতন্ত্রের ভিতরের অবস্থাটা এরকমই। বলা যেতে পারে যতদিন ধনিকতন্ত্র আছে ততদিন প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

পুঁজিবাদের অন্তঃস্বরূপটিকে প্রাবন্ধিক স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তবুও বলা যায়, এই পুঁজিবাদের যুগ মধ্যযুগীয় দাসপ্রথা কিংবা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় অনেক উন্নত। কারণ এই পুঁজিবাদের ফলেই মানুষ গণতন্ত্রের অধিকার পেল, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে তার আস্থা ফিরে পেল। যদিও এই নীতি তারা নিজেদের স্বার্থেই গ্রহণ করেছে —

"তবু তাহাতে মানুষের অধিকার কিছুটা প্রসারিত হইয়াছে, সভ্যতা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।"

লেখকের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলেও দেখা যায় শ্রেণীর স্বার্থে এই সব সৎনীতি আবার পুঁজিতন্ত্র খর্ব করতেও বাধ্য হচ্ছে, এমনই ক্ষীয়মান পুঁজিতন্ত্র।

২.৪.১৬.৩ : সাম্রাজ্যবাদের সংকট

বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিতন্ত্রের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে—যা আমরা সবাই জানি। মুনাফার লোভে পরের দেশগুলিতে পুঁজিতন্ত্র প্রথম জয় করল। এরপর সেই দেশের শিল্প বণিকেরা অপরের শিল্প দ্রব্য বিনষ্ট করল এবং চালাতে লাগল নিজের দেশের দ্রব্য। বিজিত দেশের শিল্পীরা তখন বৃত্তি হারিয়ে হল চাষী, বাড়ল সেই দেশের হতভাগ্য চাষীর সংখ্যা। আবার সাম্রাজ্যের শোধনের সুবিধার জন্যই সাম্রাজ্যবাদী, সেই অধীন দেশ থেকে বেছে বেছে তৈরী করল তাদের এক তল্পিদার শ্রেণী, রাজা, জমিদার,তালুকদার, মুৎসুদ্দি। আর শেষে কেরানী। কিন্তু বিজিত দেশে প্রথমদিকে বিজেতা ধনিকতন্ত্র কলকারখানা করতে বাধা দিল—পাছে নিজের দেশের পণ্যজাতের সঙ্গে ঐ সব অধীন দেশের কলের মাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ঐ ভয়ে। সেখানকার তেল, কয়লা, পাট, তুলো প্রভৃতি মাল নিজেরা একচেটিয়া করে নিল। তা দিয়ে এই বণিকেরা নিজেদের কলকারখানায় কাপড় বুনে ঐ পরাধীন দেশেই একচেটিয়া চালান করে। একেই বলে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা।

এই অবস্থায় নিজের দেশে ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স কোম্পানী প্রভৃতিরা হয়ে পড়ল এইসব ব্যবসার মালিক। শোষণের নেশা বেড়ে গেল। অথচ শোষিতের রক্তাল্পতা দেখা যাচ্ছে। পরাধীন দেশের নিজের হাতে শিল্প নেই, আছে শুধু চাষী, সেই চাষের উপর সবাই নির্ভর করে—রাজা-জমিদার, মহাজন তো আছেই বড় মাইনের কর্মচারী আছে, বিলাতী পেনশন, ভাতা প্রভৃতিও আছে—এদের সব ধরনের এই লুটের বোঝা গিয়ে পড়ল দেশের উৎপাদকের ওপরে। কিন্তু কে সেই উৎপাদক। এরা মূলত চাষী, আর আছে কয়েকজন খনির ও কলকারখানার মজুর। এরা এই বোঝা বহন করতে করতে মুখ থুবড়ে পড়ে আর দেশের রাজস্ব জোগাতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদীর চালানো মালও কিনতে পারে না, আর পাওনাদারদের পাওনাও তারা মেটাতে পারে না।

সাম্রাজ্যের এই পরিস্থিতিতে পুঁজিতন্ত্র নানাভাবেই অচল হয়ে পড়েছে। কারণ —

প্রথমত, আন্তর্জাতিক জগতে পুঁজিবাদীদের জাতের মধ্যে রেষারেষি বাড়ছে তার ফলে যুদ্ধ বাঁধছে। শিল্পপ্রধান প্রতি জাতিই নিজের শিল্পকে রক্ষা করতে চায় অন্যের শিল্পের আক্রমণের হাত থেকে। তাই প্রতি রাষ্ট্রই শুল্কপ্রাচীরে নিজ নিজ দেশ রক্ষা করে। ফলে সব প্রকার ক্রয় বাণিজ্য বাধা পায়। ফলে ক্রমে আন্তর্জাতিক শুল্কদ্বন্দ্ব রূপে দেখা যায়।

দ্বিতীয়ত, শিল্পোন্নত দেশের ঘরের মধ্যেও পুঁজিবাদ মুনাফা জমিয়ে ক্রমেই স্ফীত হয়, অথচ বঞ্চিত মজুর দুর্দশাপন্ন থাকে। এতে দেশের ভেতরেও দুই শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ বাড়ে, শ্রেণীসংগ্রাম দেখা যায়। ফলে চিরন্তন দ্বন্দ্ব আবার দেখা যায়।

তৃতীয়ত, ক্রমেই নতুন যন্ত্র আবিষ্কারে মজুরদের বেকারের সংখ্যা বাড়ে, আর এই মজুরেরা যখন দেশে-বিদেশে সংখ্যায় বেশি তখন তারা বেকার হয়ে গেলে ক্রেতার সংখ্যাও কমে আসে। ফলে উন্নততর যন্ত্রে পণ্য বেশি উৎপন্ন হয়, কিন্তু পণ্য বিক্রি কম হয়। আর বিক্রি না হলে মুনাফা নেই—তাই পুঁজির মালিকরা তখন কল বন্ধ করে দেয়। এই ভাবে বেকার মজুর সংখ্যা বাড়ে, দেখা যায় আর্থিক সংকট।

এই কারণে উৎপাদন শক্তি প্রচুর বৃদ্ধি পেলেও মুনাফাতন্ত্রের চক্রান্তে সেই উৎপাদনের সার্থকতা সমাজ আজ ভোগ করতে পারছে না। তা হলে এই যুগের এই ঐশ্বর্য আয়ত্ব করতে নাকি প্রত্যেক মানুষের সপ্তাহে মাত্র চার ঘণ্টা পরিশ্রমই হয়তো যথেষ্ট। অবশ্য তাও ছিল ১৯৩০-৩৫ এর আমলের হিসাব। এর পরে যন্ত্র বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু পুঁজিবাদের জন্য চলছে এখনও পর্যন্ত উৎপাদন, বণ্টন,

বিনিময়ে একটা অরাজকতা। এর ফলে অর্থ সঙ্কট দেখা দিয়েছে, যুদ্ধ বেধেছে। অন্যদিকে জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম অপরাজেয় হয়ে উঠেছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের আয়ু শেষ হচ্ছে। ফলে পুঁজিতন্ত্রেরও দম ফুরিয়ে আসছে।

২.৪.১৬.৪ : সমাজতন্ত্রই ভবিষ্যৎ

বিশেষ একধরনের অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থা বোঝাতে, যেমন সমাজতন্ত্রের কথা বলা হয়, তেমনি বিশেষ একটা মতাদর্শ বোঝাতেও আমরা এই শব্দটির ব্যবহার করি। ১৮২৮ সালে প্রথম ফরাসী ভাষায় 'সোস্যালিজম' বা সমাজতন্ত্র শব্দটির ব্যবহার দেখা গিয়েছিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিশেষত ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদীদের তত্ত্ব আলোচনায় এই মতাদর্শটি ব্যাপকভাবে চালু হয়েছিল। সমাজতন্ত্র— শব্দটি চয়ন করে এই ধারণা ব্যাপকতা দেখা যায় ঊনবিংশ শতকে। কাল্পনিক সমাজবাদীরা যৌথ উৎপাদনের ভিত্তিতে ছোটো ছোটো সমাজতান্ত্রিক কলোনী গঠন করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। সমগ্র সমাজ পরিবর্তনের জন্য ব্যাপক কোনো কর্মকাণ্ড বা কর্মসূচী তাদের ছিলনা।

সমাজতন্ত্র হল কম্যুনিষ্ট-সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের প্রথম পর্যায়। সমাজতন্ত্রের সুচিহ্নিত বৈশিষ্ট্য উৎপাদনের উপায়গুলির সামাজিক মালিকানা, একটি পরিকল্পিত অর্থনীতি, মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণের অবসান। উৎপাদনী শক্তির বিদ্যমান স্তরের নিরিখে সমাজের সকল সদস্যের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদার সর্বোচ্চ পরিপূরণই এখানে উৎপাদনের লক্ষ্য।

পুঁজিতন্ত্রের বৈপ্লবিক উৎখাতের ফলশ্রুতি হিসেবেই সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে, সেজন্য প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির মান ও পুঁজিতন্ত্রের আওতায় অর্জিত শ্রমিকদের উৎপাদনী দক্ষতার স্তর কার্যত সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণে আরম্ভ-বিন্দু হিসেবে বিবেচ্য। এক্ষেত্রে পুঁজিতন্ত্রের যাবতীয় দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রের উত্তরাধিকার বর্তায় এবং উৎপাদন আরো বিকশিত হয়। তথাপি উৎপাদনের এই স্তর পর্যাপ্ত পরিমাণে ভোগ্য পণ্য উৎপাদনে সমাজের সকলের চাহিদার পূর্ণ পরিপূরণে সমর্থ হয় না।

১৯১৭-তে বিশ্ববিপ্লবের পাদপীঠ মাত্র একটি দেশে পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশে রচিত হয়েছিল সমাজতন্ত্রী ধারণা। তখন মাত্র বারো কোটি মানুষের জীবনের নবরূপদানে অধিকার পেয়েছিল। এখানে যুগোশ্লাভিয়া ও পূর্ব জার্মান গণরাষ্ট্র শুদ্ধ সমস্ত পূর্ব ইউরোপেই ৮টি রাষ্ট্রের সেই বিপ্লবী শক্তি-রাষ্ট্রশক্তি—তা সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত। সমগ্র বিশ্বময় কম-বেশি আজ সমাজতন্ত্র বিরাজমান। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন —

"সমাজতন্ত্রী পৃথিবীর এই শক্তিবৃদ্ধি এই যুগের প্রধান সত্য। এই সত্যের দ্বারাই পৃথিবীর রূপ মৌলিক ভাবে প্রভাবিত হইতেছে কি হইতেছে না, তাহা অবশ্য তর্ক সাপেক্ষ। কিন্তু এই পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষের জীবন যে আজ এই বৈপ্লবিক আদর্শে রূপান্তরিত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।"

অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারি, আজ পৃথিবীর সমস্ত বুদ্ধিজীবি তথা উন্নতিকামী মানুষ সমাজতন্ত্রের স্বপক্ষে। বলাবাহুল্য সমাজের মঙ্গলের জন্য তারা এই তত্ত্ব দ্বারা অনুপ্রাণীত।

বৈপ্লবিক রূপান্তরের অর্থ সকলের রূপহীনতা বা কারো বৈশিষ্ট্যহীনতা নয়। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আনাই সমাজতন্ত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য। তা সত্ত্বেও সোভিয়েত ও চীনের সমাজতন্ত্রী দলের মত পার্থক্য প্রকাশ্যেই আলোচিত। বর্তমান পৃথিবীর মূলগতি সম্বন্ধে সকলেই একমত যে, বৈপ্লবিক শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাস্তব জগৎ তমসাচ্ছন্ন থেকে ক্রমাগত সংস্কারের পথ বেছে নিচ্ছে।

নব নব রাষ্ট্রে বিপ্লবের প্রকাশ সশস্ত্র, নিরস্ত্র বা স্বল্পাধিক সশস্ত্র বা স্বল্পাধিক নিরস্ত্র প্রভৃতি নানা

পদ্ধতিতে হতে পারে। বিপ্লব রূপায়ণেও নানা বৈশিষ্ট্যের, নানা বৈচিত্র্যের উদ্ভব সম্ভব। শুধু স্মরণীয় এই যে—

"সমাজতন্ত্রী সৌভ্রাতৃত্ব অপরিহার্য, সায়েন্টিফিক্ সোস্যালিজ্‌মের আদর্শ ও মূলনীতিগত ঐক্য অন্যান্য অর্থাৎ রাষ্ট্রে চাই শ্রমিক ও সাধারণ মেহনতী মানুষের পূর্ণাধিপত্য; আর্থিক বিন্যাসে চাই উন্নততর উৎপাদন ও ব্যক্তির পরিবর্তে সমাজের সাধারণ মালিকানা; শিক্ষায় সংস্কৃতিতে বুদ্ধিজীবিদের সমাজবাদী দায়িত্ব পালন; মানবিক বোধের প্রসার।"

অবশ্য এই বৈশিষ্ট্যে কোথাও ব্যাঘাত ঘটে অসমান অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য কিংবা পারিপার্শ্বিক কারণে।

১৯১৭ থেকে ১৯৬৩—এই ছেচল্লিশ বছর সোভিয়েততন্ত্রের বিকাশ হওয়াতে সমাজতন্ত্রের মূল অবয়বটি সম্পর্কে আমাদের একটি সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায় তখন, কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলের তত্ত্বটি আর শুধুমাত্র আনুমানিকই থাকে না, তার যথার্থ প্রয়োগও দেখা যায়। চাষীরা কিংবা মজুরেরা উৎপন্ন দ্রব্যের অধিকারী হবে। সেখানে কোনো মালিকপক্ষ থাকবে না।

সমাজতান্ত্রিক ধারণার মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে আমরা নিম্নে সূত্রাকারে এভাবেই লিখতে পারি —

ক. সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজের সমাজতন্ত্রে উত্তরণের একটি বিষয়গত নিয়ম। পুঁজিতন্ত্রের মূল অসংগতি, অর্থাৎ উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র ও আত্মসাৎ-এর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যেকার অসংগতি এই বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার উৎস—শ্রম ও পুঁজির দ্বন্দ্ব তথা পুঁজিতন্ত্রের সাধারণ সংকটজাত অন্যান্য স্বকীয় অসংগতি এর স্রষ্টা। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিষয়গত প্রয়োজনীয়তা সাম্প্রতিক ভাবদর্শগত সংগ্রামের একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়।

খ. সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হল শোষকদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণী ও তার মিত্রদের শ্রেণী—সংগ্রামের তুঙ্গাবস্থা। প্রলেতারিয় বিপ্লবের পর্যায়ে উত্তীর্ণ একটি শ্রেণী সংগ্রামই কেবল সমাজতান্ত্রিক ধারায় সমাজের মৌলিক পরিবর্তন নিশ্চিত করতে পারে।

গ. সমাজতান্ত্রিক একই সঙ্গে একটি বিষয়গত প্রক্রিয়া এবং জনগণের সজ্ঞান ঐতিহাসিক কার্যকলাপের ফলশ্রুতি। এই বিপ্লবকে জনগণ তাদের বিজ্ঞানসম্মত ভাবাদর্শের অঙ্গীভূত করে এবং তারা মার্কসবাদী লেলিনবাদী পার্টির দ্বারা পরিচালিত হয়।

ঘ. সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হল পুরানো বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংস এবং নতুন ধরণের একটি রাষ্ট্র শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র—প্রতিষ্ঠার নিদর্শন।

ঙ. সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হল সামাজিক সম্পর্ক প্রণালীর বিপর্যয়ের ইতিহাসে একটি গোটা যুগ, উৎপাদন উপায়ের সামাজিক মালিকানাভিত্তিক নতুন সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার একটি যুগ মূলত, মানুষ ও তার সর্বোতমুখী বিকাশের যথাসম্ভব চাহিদা পূরণের লক্ষ্য মুখীন অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার একটি যুগ।

চ. প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি নীতি ও তার চূড়ান্ত বিজয়ের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত।

পরিশেষে বলা যায় সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রত্যেক সুস্থ সদস্য সেরা সামর্থ্য দিয়ে সচেতনভাবে সমাজের সুবিধার্থে কাজ করতে বাধ্য থাকে, সমাজ তার যোগ্যতা, পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী পারিশ্রমিক দেয়। এই সমাজতন্ত্রের ফলেই সমাজে বিকাশ উন্নতি ও প্রগতি অব্যাহত থাকবে।

২.৪.১৬.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। সাম্রাজ্যবাদ এবং তার সংকট সম্পর্কে আলোচনা করো।

২। সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের ভাবনার পরিচয় দাও।

৩। 'সংস্কৃতির রূপান্তর' গ্রন্থানুসরণে 'সাম্রাজ্যবাদের সংকট' সম্পর্কে লেখকের অভিমতের মূল্যায়ন করো।

৪। 'সমাজতন্ত্রই ভবিষ্যৎ'–'সংস্কৃতির রূপান্তর' গ্রন্থে লেখকের এই মন্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করো।

২.৪.১৬.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। গোপাল হালদার — 'সংস্কৃতির রূপান্তর', 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশনী।

২। ঐ — 'বাঙ্‌লা' সংস্কৃতির রূপ', 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশনী।

৩। ঐ — বাঙ্‌লা সাহিত্য ও মানব স্বীকৃতি ঐ

৪। অমিয় ধর — 'গোপাল হালদার'
'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' প্রকাশক—রমাকান্ত চক্রবর্তী, শ্রাবণ-১৪১১

৫। নন্দ গোপাল সেনগুপ্ত— 'সংস্কৃতির ধর্ম, ধর্ম ও সংস্কৃতি' পুস্তক বিপনী,
প্রকাশক — সাহিত্য প্রকাশ ১৯৯৪

৬। হায়াৎ মামুদ — 'সংস্কৃতি ও প্রসঙ্গান্তর'—'চেতনা'
প্রকাশক—শেখররঞ্জন রায়, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩

৭। মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল — 'সংস্কৃতির কথা' 'ন্যাশনাল বুক এজেন্সি'
প্রকাশক—সুনীল বসু, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩

৮। সম্পাদনা — শ্রী সুহাস চট্টোপাধ্যায় 'মার্কসবাদ ও নন্দনতত্ত্ব'
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ — জানুয়ারী ১৯৮৪

৯। মৃদুল দে — 'মানুষ সমাজ সভ্যতা', 'নবযুগ' এজেন্সি কল্যাণী সেপ্টেম্বর ২০০৭

১০। সম্পাদক — বিমান বসু 'মার্কসবাদী পথ', নভেম্বর ২০০৭
৩২ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা-১৬ প্রকাশিত

১১। মানব মুখার্জী — 'মানবতার দুই শত্রু সাম্রাজ্যবাদ ও সন্ত্রাসবাদ'—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
প্রকাশক — সলিল কুমার গাঙ্গুলী, অক্টোবর - ২০০১

১২। সম্পাদক — নারায়ণ চৌধুরী — 'সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি'
এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
প্রকাশক — জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায় — ফাল্গুন - ১৩৮৪

———

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম. এ তৃতীয় সেমেস্টার

তৃতীয় পত্র

বিশেষ পত্র ঃ বাংলা নাট্যসাহিত্য

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

(ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং)

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া - ৭৪১ ২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

পাঠ-প্রণেতা

অধ্যাপক ড. তাপস বসু — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস — বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামানিক — বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. সত্যকুমার গিরি — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ডিসেম্বর, ২০১৯

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও

নিউ স্কুল বুক প্রেস, ২ ডিক্সন লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১৪

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়-এর অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ-সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইনানুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের লেখক/পাঠ-প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of distance and reaching the unreached students are the threefold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellor has invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directoate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Sankar Kumar Ghosh, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of PGBOS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks is also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would especially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and co-ordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Director

Directorate of Open and Distance Learning

University of Kalyani

পাঠক্রম

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম
এম. এ. তৃতীয় সেমেস্টার

তৃতীয় পত্র

বিশেষ পত্র ঃ বাংলা নাট্যসাহিত্য

উনিশ শতকের নাটক

পর্যায় গ্রন্থ ঃ ১ কুলীনকুলসর্বস্ব – রামায়ণ তর্করত্ন (সময় ঃ ৪ ঘন্টা)

একক–১ ঃ কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকের কাহিনি-বহুমাত্রিক সমাজ-সমস্যার চিত্রশালা

একক–২ ঃ নারী চরিত্র

একক–৩ ঃ কুলীনকুলসর্বস্বে সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রভাব

একক–৪ ঃ সংলাপ

পর্যায় গ্রন্থ ঃ ২ সধবার একাদশী – দীনবন্ধু মিত্র (সময় ঃ ৪ ঘন্টা)

একক–৫ ঃ সধবার একাদশী নাটকের শ্রেণিবিচার

একক–৬ ঃ হাস্যরস

একক–৭ ঃ সংলাপ

একক–৮ ঃ চরিত্র বিচার

পর্যায় গ্রন্থ ঃ ৩ কৃষ্ণকুমারী – মধুসূদন দত্ত (সময় ঃ ৪ ঘন্টা)

একক–৯ ঃ ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে 'কৃষ্ণকুমারী'র সার্থকতা

একক–১০ ঃ ট্রাজেডি বিচার

একক–১১ ঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব

একক–১২ ঃ নারী ও পুরুষ চরিত্র

পর্যায় গ্রন্থ ঃ ৪ আলিবাবা – ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (সময় ঃ ৪ ঘন্টা)

একক–১৩ ঃ 'আলিবাবা' নাটকের অভিনয়

একক–১৪ ঃ 'আলিবাবা' নাটক রচনার প্রেরণা, মৌলিকতা এবং নৈতিক শিক্ষা

একক–১৫ ঃ মর্জিনা চরিত্র

একক–১৬ ঃ সংলাপ ও সংগীত

সূচিপত্র

তৃতীয় পত্র

বিশেষ পত্র ঃ বাংলা নাট্যসাহিত্য

উনিশ শতকের নাটক

তৃতীয় পত্র	একক	পাঠ প্রণেতা	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ-১	১	ড. সত্যকুমার গিরি	কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকের কাহিনি-বহুমাত্রিক সমাজ-সমস্যার চিত্রশালা	১
	২	ড. সত্যকুমার গিরি	নারী চরিত্র	১৫
	৩	ড. সত্যকুমার গিরি	কুলীনকুল সর্বস্বে সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রভাব	২১
	৪	ড. সত্যকুমার গিরি	সংলাপ	২৬
পর্যায় গ্রন্থ-২	৫	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	সধবার একাদশী নাটকের শ্রেণিবিচার	৩১
	৬	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	হাস্যরস	৩৬
	৭	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	সংলাপ	৪১
	৮	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	চরিত্র বিচার	৪৭
পর্যায় গ্রন্থ-৩	৯	অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামাণিক	ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে 'কৃষ্ণকুমারী'র সার্থকতা	৫১
	১০	অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামাণিক	ট্রাজেডি বিচার	৬৪
	১১	অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামাণিক	প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব	৬৯
	১২	অধ্যাপক ড. প্রবীর প্রামাণিক	নারী ও পুরুষ চরিত্র	৭৫
পর্যায় গ্রন্থ-৪	১৩	অধ্যাপক ড. তাপস বসু	'আলিবাবা' নাটকের অভিনয়	৮৩
	১৪	অধ্যাপক ড. তাপস বসু	'আলিবাবা' নাটক রচনার প্রেরণা, মৌলিকতা এবং নৈতিক শিক্ষা	৮৭
	১৫	অধ্যাপক ড. তাপস বসু	মর্জিনা চরিত্র	৯০
	১৬	অধ্যাপক ড. তাপস বসু	সংলাপ ও সংগীত	৯২

পর্যায়গ্রন্থ - ১

একক - ১

কুলীনকুলসর্বস্ব কাহিনি-বহুমাত্রিক সমাজ-সমস্যার চিত্রশালা

বিন্যাস ত্র(ম :

৩.১.১.১ বিষয় বাঙালীর কৌলীন্য প্রথা

৩.১.১.২ ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজে কৌলীন্য প্রথার বিকট রূপ

৩.১.১.৩ কৌলীন্যপ্রথা ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক প্রতিত্রি(য়া

৩.১.১.৪ কৌলীন্যপ্রথা-বিরোধী প্রথম প্রহসন 'কুলীনকুলসর্বস্ব'

৩.১.১.৫ উদ্দেশ্যমূলক নাটক হিসেবে কুলীনকুলসর্বস্ব

৩.১.১.৬ কুলীনকুলসর্বস্বের কাহিনী — বহুমাত্রিক সমাজ-সমস্যার চিত্রশালা

৩.১.১.৭ আদর্শ প্র(াবলী

৩.১.১.১ : বিষয় : বাঙালীর কৌলীন্য প্রথা

'কুলীন' শব্দের অর্থ সৎকুলে জাত, কুলমর্যাদাযুক্ত(, অভিজাত ব্যক্তি(। আর কৌলীন্য হল - (সং-) কুলীন +য। কিন্তু 'কৌলীন্য' শব্দটির ব্যুৎপত্তিবহির্ভুত আর এক অর্থপ্রকাশের শক্তি(আছে। এই রূঢ়ার্থটি হল, ব্রাহ্মণদের বিশেষভাবে চিহ্নি(ত কয়েকটি বংশে জাত ব্যক্তি(দেরই কুলীন বলা হয়। সামাজিক ভাবে এই কুলীনদের স্বতন্ত্র একটা মর্যাদা গড়ে উঠেছিল। বিবাহাদি বিষয়ের পৃথক রীতিনীতিতে কুলীনরা সুচিহ্নি(ত ছিল। এই রীতিনীতিই কৌলীন্যপ্রথা।

১৪৮৫-৮৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত ধ্রুবানন্দ মিশ্রের 'মহাবংশাবলী' একটি কুলজীগ্রন্থ। এছাড়াও আছে হরিহর মিশ্রের 'কারিকা', সর্বানন্দ মিশ্রের 'কুলতত্ত্বার্ণব', ধনঞ্জয়ের 'কুলপ্রদীপ' রামানন্দ শর্মার 'কুলদীপিকা' প্রভৃতি এই ধারার কুলজীগ্রন্থ। এই সব গ্রন্থসর্বত্র সঙ্গতিপূর্ণও নয়, কোথাও পরস্পর বিরোধীও। এগুলির ঐতিহাসিকতা নিয়ে নানা সঙ্গত প্র(াও উত্থাপন করেছেন পণ্ডিতবর্গ। তবুও কুলজী গ্রন্থগুলির একটা বিষয়ে সহমত ল(করা যায়। আদিশূর নামক গৌড়ের জনৈক রাজা একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কনৌজ থেকে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করে আনেন যজন কার্য সম্পাদনের জন্য। অন্যদিকে ঐতিহাসিকদের আরও প্র(া, বঙ্গদেশে আদিশূর নামের সত্যিই কোনো রাজা ছিলেন কিনা? ঐতিহাসকগণ এই রাজার রাজত্বকাল সম্পর্কে কোনো ভাবেই যেমন নিশ্চিত নন, তেমনি কুলজীকারগণেরও এ বিষয়ে নানা মতপার্থক্য। লালমোহন বিদ্যানিধি তাঁর 'সম্বন্ধনির্ণয়ে' এবং নগেন্দ্রনাথ বসু 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে' আদিশূরের কুলজী প্রদত্ত যে সময়গুলি উল্লেখ করেছেন, তাতে ঐক্যের কোনো আভাস মাত্র নেই। এই সময়গুলি হল — ৬৫৪, ৬৭৫, ৮০৪, ৮৬৪, ৯১৪, ৯৫৪, ৯৯৪ এবং ৯৯৯ শকাব্দ। তবে ঈ(রচন্দ্র বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে জনপ্রিয় মতটির উল্লেখ করেছেন। 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা, এতদ্বিষয়ক বিচার' গ্রন্থে। মতটি হল — ৯৯৯ শকাব্দে আদিশূরের আমন্ত্রণে আলোচ্য পঞ্চব্রাহ্মণ বাংলাদেশে আসে। রাজ-পৃষ্ঠপোষিত এই পঞ্চব্রাহ্মণের বংশ কালে কালে দ্রুত বিস্তারলাভ করে। কিন্তু এই সব বংশের অধস্তনগণ পারিবারিক শাস্ত্রীয় যাজনিক বিদ্যা ও আচারের ঐতিহ্য বিস্মৃত হন। লালমোহন বিদ্যানিধির মতে আদিশূরের বংশধর বলে কথিত সেনবংশীয় রাজা

বল্লাল সেন (আনুমানিক—১১৫৮-১১৯১) দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গুণের তারতম্য অনুসারে এই ব্রাহ্মণদের বংশধরগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত(করেন। কনৌজাগত পাঁচ ব্রাহ্মণের উত্তরপু(ষদের মধ্যে আটগাঁইয়ের ঊনিশ জনের মধ্যে আচার-বিনয়-বিদ্যাদি নয়টি গুণ ল(করে তাঁদের কুলীন মর্যাদা দান করেন। চৌত্রিশ গাঁইয়ের বংশধরগণ শ্রোত্রিয় হিসেবে পরিচিত হন। বাকি চৌদ্দ গাঁইয়ের বংশধরগণ সদাচারী ছিলেন না বলে গৌণ কুলীন হিসেবে আখ্যায়িত হন।

নয়টি গুণের নিরিখে কৌলীন্য নিরূপনের প্রসঙ্গ থেকে মনে হয়, বল্লাল সেন কৌলীন্যকে বংশগত বিষয় হিসেবে নয়—ব্যক্তি(গত গুণের বিষয় হিসেবেই গণ্য করেছিলেন। না হলে আট গাঁইয়ের মাত্র উনিশ জন সদস্য সে মর্যাদা পেতেন না, অন্যান্য সব সদস্যই সমান মর্যাদা পেতেন। কিন্তু কালত্র(মে কৌলীন্য ব্যক্তি(গত গুণের বিষয় না হয়ে, পারিবারিক মর্যাদার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। নয়টি গুণ নয়, একটি গুণই—'আবৃত্তি' অর্থাৎ সমান উৎকৃষ্ট গৃহ থেকে কন্যা গ্রহণ বা এসব গৃহে কন্যাদান কৌলীন্যের একমাত্র মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। প্রথা হয়ে দাঁড়ায়, কুলীনরা কেবল কুলীন পরিবারের সঙ্গেই বৈবাহিক আদান-প্রদান করবেন। পরিস্থিতি বিশেষে শ্রোত্রিয়-কন্যা গ্রহণ অনুমোদিত হয়, কিন্তু শ্রোত্রিয়কে কন্যাদান নিষিদ্ধ হয়। গৌণকুলীনের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কও কুলনাশক বলে গণ্য হয়। এ-রীতি ভঙ্গ হলে কুলীনরা বংশজে পরিণত হন। বংশজের কন্যা গ্রহণ করলেও কুলীনরা বংশজে পরিগণিত হন। এভাবেই কুলীন শব্দ পরিবারের বিবাহ-রীতির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়। আসলে বিবাহ বিষয়ক একটিমাত্র রীতি পালন করেই কুলীনরা নিজেদের মর্যাদা র(ার পথ গ্রহণ করে।

বল্লাল সেন কৌলীন্য মর্যাদা প্রবর্তন করার কিছুকালের মধ্যেই কুলীনদের মধ্যে নবগুণের ধারণা ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যায়। ফলে কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্তনের সময় থেকে দশপু(ষের মধ্যে ১৪৮০-৮১ খ্রিস্টাব্দে সেকালের বিখ্যাত ঘটক দেবীবর পুনরায় কৌলীন্য প্রথার সংস্কার করেন। বল্লাল সেন গুণের বিচারে কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্তন করেছিলেন, দেবীবর দোষের তারতম্য অনুসারে কুলীনদের ৩৬টি মেলে বিভক্ত(করেন। আর নির্দিষ্ট মেলের মধ্যেই বৈবাহিক সম্বন্ধকে সীমাবদ্ধ রাখার বিধান দেন। এই সংস্কারের দ্বারা দেবীবর অধিকতর সামাজিক অব(য় রোধ করতে চেয়েছিলেন।

একথা ঠিক যে, দেবীবরের সংস্কার কুলীনদের সামাজিক প্রতিপত্তি র(ায় সাহায্য করেছিল। কিন্তু এর ফলে আর একধরনের সামাজিক ব্যাধির জন্ম হয়। সমাজে বহুবিবাহ প্রথা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় দেখা যেত, বিশেষ গাঁই ও গোত্রের অনেক কন্যার জন্য বিধিমিতো একজনই বর পাওয়া যাচ্ছে। এ অবস্থায় কৌলীন্য র(ার জন্য এক কুলীন পাত্র একাধিক কুলীন কন্যার পাণিগ্রহণ করতো। কৌলীন্য প্রথার সঙ্গে বহুবিবাহের সামাজিক ব্যাধি এভাবেই যুক্ত(হয়ে পড়ে।

বল্লাল সেন, ল(ণ সেন এবং শেষে দেবীবরের কৌলীন্যপ্রথা সংস্কারের মধ্যদিয়ে সমাজে যে বহুবিবাহ প্রথার উদ্ভব ঘটে তা হিন্দু শাস্ত্রে নিষিদ্ধই ছিল। 'বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার, দ্বিতীয় পুস্তক'-এ বিদ্যাসাগর সে কথা আমাদের স্পষ্ট করেই জানিয়েছেন। কিন্তু এই বহু বিবাহের সামাজিক প্রবণতা ব্রাহ্মণ সমাজে দুষ্ট(তের মতো বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়ায়।

এই সঙ্গে আর এক সামাজিক প্রতিত্রি(য়া দেখা দেয়। যে ১৯ জনকে রাজসম্মান হিসেবে কুলীন মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল, তাদের সামাজিক প্রতিপত্তি অনেক বৃদ্ধি পায়। এতে অকুলীন ব্রাহ্মণরা কুলীনদের শ্রদ্ধা অথচ ঈর্ষার চোখে দেখতে শু(করে। অথচ তাদের কুলীন মর্যাদা লাভের পথও খোলা ছিল না। কুলীনরা সমান অথবা তদুচ্চ বংশে কন্যা গ্রহণ করবেন — এটাই ছিল বিধি। কিন্তু অকুলীন শ্রোত্রিয়, বংশজ এবং গৌণ কুলীনগণ অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে কুলীন পাত্রে কন্যাদানের চেষ্টা করতেন — কিছু (ে ত্রে সফলও হতেন। এই ভাবে অকুলীনের কুলমর্যাদা বৃদ্ধির পথ কিছুটা উন্মুক্ত(হয়।

এই প্রচেষ্টায় অকুলীনদের প(অবস্থাটা বিশেষ অনুকুলও ছিল। রাজসন্মানে সম্মানিত কুলীনগণ সমাজে একটা অতিরিত্ত(সুবিধা আদায় করার অবস্থানে অবস্থিত ছিল। এই বর্ধিত সুযোগ-সুবিধা তাদের কালে কালে অলস ও বিদ্যাহীন করে তুলেছিল। ফলে তারা সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বেঁচে থাকার উপায় হিসেবে কেবল কৌলীন্যের মূলধনটুকুই ছিল। সামাজিক উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য কুলীনরা দ্রুত অর্থনৈতিকভাবে শত্তি(হীন হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় অকুলীনরা মোটা অর্থ নিয়ে এগিয়ে আসে কুলীন পাত্রে কন্যাদান করে নিজেদের কুলমর্যাদা বাড়িয়ে নিতে।

গোড়াতে নিয়ম ছিল শ্রোত্রিয়কে কন্যা দান করলে, কিংবা গৌণকুলীনের ও বংশজের কন্যা গ্রহণ করলে কুলীন বংশজে পরিণত হবে। কিন্তু সমাজ কালত্র(মে এ বিষয়ে আরও একটু উদার হয়ে উঠলো। কৌলীন্যের নিয়ম ভাঙলে, তাঁরা ভঙ্গ কুলীনের মর্যাদা পাবেন। চার পু(ষ পর্যন্ত কৌলীন্যের অধিকারী বিবেচিত হবেন। বিশেষ করে তিন পু(ষ পর্যন্ত ভঙ্গকুলীনের বিয়ের বাজারদর বেশ চড়াই থাকতো। শ্রোত্রিয়, বংশজ এবং ভঙ্গকুলীনগণ ভঙ্গকুলীনকে কন্যাদান করা বেশ সম্মানের বিষয় বলে মনে করতেন। এই সুযোগে ভঙ্গকুলীন পাত্র নিজের কুলভাঙার (তিপূরণ হিসেবে নিজের দারিদ্র্য মোচন করতো চড়া অঙ্কের অর্থপণ নিয়ে। আর বহু সংখ্যক বিয়ে করে। সমাজের আর এক ব্যাধি, পণপ্রথা এভাবেই আত্র(মণ শানাতে থাকে। বিবাহ একশ্রেণীর কাছে ব্যবসায়ে পরিণত হয়। অষ্টদশ শতাব্দীতে ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই সামাজিক ব্যাধি প্রকট আকার ধারণ করে। ঊনবিংশশতাব্দীর মাঝামাঝি শু(হয় এর বি(দ্ধে প্রতিত্রি(য়া। আমাদের আলোচ্য রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ (১৮৫৪) তারই প্রথম নাট্য প্রতিত্রি(য়া।

৩.১.১.২ : ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজে কৌলীন্য প্রথার বিকটরূপ

অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বিবাহ-ব্যবসা কুলীনদের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠলেও তা আরও উৎকট আকার ধারণ করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। কুলীনরা বিয়ে করার সময় এককালীন পণ যেমন নিতেন, পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন উপল(অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যেই তাঁরা বিয়ে করতেন। নিজের ব্যয় নির্বাহের জন্য এরা (শ্বশুর বাড়ি যেতেন। ‘কুলমর্যাদা’ অর্থাৎ নগদ টাকা হাতে না পেলে এঁরা (শ্বশুরবাড়িতে বসতেন না, স্নানাহার কিছুই করতেন না। স্ত্রীর সঙ্গে কথাও না বলে চলে যেতেন। অনেকদিন পরে কুলীন জামাই (শ্বশুরবাড়ি এলে (শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে প্রাণপণে খুশি করার চেষ্টা করতো। প্রথমে জামাইয়ের হাতে ‘কুলমর্যাদা’ হিসেবে যে অর্থ তুলে দেওয়া হতো, তাতে জামাই কখনো খুশি হতো, আবার খুশি হতোও না। রাতে শোওয়ার আগে জামাই স্ত্রীর কাছে টাকা চাইত। ১২৭৮ সালের পৌষ সংখ্যার ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’ থেকে জানা যায় কুলীন স্ত্রীরা বছরের পর বছর চরকা কাটা টাকা জমিয়ে রাখতো স্বামীর মন পাওয়ার আশায়। তবুও স্বামীর মন টাকার পরিমাণ দেখে খুশি হতো না। প্রকৃতপ(বিয়ে করাটা যখন জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে গণ্য হয়, তখন ব্যবসায়ীর মতো সবরকম বিবেক-বিবেচনা বিসর্জন দিয়ে কুলীন স্বামী লাভের জন্য স্ত্রীর সঙ্গে যে-কোনো অন্যায়ই করতো। পূর্বোত্ত(পত্রিকার ১২৭৩ সালের ভাদ্র সংখ্যা থেকে জানা যায়, এক বালক তার চেয়ে বয়সে বড় তিন বোনকে এবং ১২৭৮ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে জানা যায়, অন্য এক বালক একই সঙ্গে তিন বোন এবং তাদের এক পিসিকে বিয়ে করে। অথবা ১২৭২ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা থেকে জানা যায় এক অতিবৃদ্ধ মৃত্যুর মাত্র সাতদিন আগে একটি বিবাহ করে।

আগেই বলেছি, টাকার লোভে যে কুলীনরা কুল(য় করতো, বেশি সংখ্যায় বিয়ে করে তারা সেই কুল(য়ের (তিপূরণ করে নিত। অপরপ(অকুলীন কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যত্তি(রাও এঁদের সন্ধানে থাকতো। ফলে বহু বিবাহের ব্যবসা রমরমিয়ে উঠেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে। ১৮৭১ সালে প্রকাশিত বহুবিবাহ গ্রন্থে বিদ্যাসাগর দুটি তালিকা প্রকাশ করেন। এ-তালিকায় নয়টি কুলীনের নাম পাওয়া যায় যারা পঞ্চাশ

থেকে বিরাশিটি পর্যন্ত বিয়ে করেছিল। পঁচিশ থেকে চুয়াল্লিশটি বিয়ে করেছিল এমন চৌদ্দ জন এবং দশ থেকে তেইশটি বিয়ে করেছিল বাষট্টিজন। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর প্রকাশিত 'সমাচার দর্পন' পত্রিকা থেকে জানা যায়, বালিতে একজন কুলীনের মৃত্যুতে তার একশত স্ত্রী বিধবা হন। সব চেয়ে বেশি সংখ্যক বিয়ের কথা উল্লেখ করেছেন কৃষ(মোহন বন্দ্যোপাধায়। তিনি শুনেছিলেন এক ব্যত্তি(১৮০টি বিয়ে করেছিলেন। এ-সব প্রমাণ থেকে বলা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশে কৌলীন্যের ব্যাধি নানা সামাজিক সংকট সৃষ্টি করছিল — কখনো তা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতার কন্যাকে পাত্রস্থ করার সংকট, কখনো বহুবিবাহ, কখনো পণপ্রথার সংকট। অবশ্য তার পরেও, বিংশ শতাব্দীর সীমাতেও সে ব্যাধির প্রতাপ কিছু পরিমাণে থেকে গিয়েছিল।

হিন্দুর শাস্ত্র মতে কন্যা 'অষ্টম বর্ষে গৌরী ভবেৎ' — অর্থাৎ আট বছরের মধ্যে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। তাই কন্যা একটু বড় হলেই অভিভাবকগণ মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠতেন। কিন্তু দেশাচার মতে অকুলীন পাত্রে কন্যাদান করা চলে না। আবার সমক(বা উচ্চতর বংশীয়ের হাতে কন্যাদান করতে হলে যে উচ্চ অঙ্কের পণ দিতে হয়, তারও সঙ্গতি নেই। আাবার কন্যাকে সারাজীবন অবিবাহিত রাখাও গু(তর পাপকার্য। এ অবস্থায় অভিভাবকগণ বহু বিবাহিত কোনো কুলীন বৃদ্ধ বা মধ্যবয়স্ককে তাদের কন্যা বা একসঙ্গে কয়েকটি কন্যাকে বিয়ে করার অনুরোধ জানাতো অপে(াকৃত অল্প পণে। এ ভাবে কুলীন পিতা-মাতা নিজেদের দায়িত্ব থেকে মুত্ত(হতেন। অন্যদিকে মৃত্যুপথযাত্রী কুলীনও বহু কন্যার পাণিগ্রহণ করে জীবনের অন্তিম পুর্ণ অর্জন করতো।

এই ধরনের বিবাহ পদ্ধতির ফলে কুলীন কন্যাদের শুধু অনূঢ়ত্ব ঘোচানো ছাড়া অন্য কোনো সান্ত্বনা লাভ হতো না। ঊনিশ শতকের সংবাদ-সাময়িক পত্রিকাগুলি থেকে জানা যায়, শুভদৃষ্টির পর কুলীন স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর আর কোনোদিন দেখা হয়নি। আবার দেখা হলেও যথেষ্ট অর্থের অভাবে স্বামী-স্ত্রীর বাক্যালাপ হয়নি। এ জন্য কুলীন স্ত্রীরা, স্বামী থাকা সত্ত্বেও, বিধবার মতো জীবনযাপন করতে বাধ্য হতো। আবার প্রাপ্তবয়স্ক কুলীনকন্যা বিয়ে না হওয়ায় আত্মহত্যা করতো, অসম বয়সের বিবাহেও আত্মহত্যার চেষ্টা ঘটতো। বিয়ের পরে কুলীন কন্যাদের বেশির ভাগকেই পিতৃগৃহে দিন যাপন করতে হতো। সন্তানের জন্মদানও সেখানেই। ফলে তাদের জীবন পরগৃহে যাতনায়, অবহেলায়, নির্যাতনে ভরে উঠতো। K.M. Banerjee তাঁর The Kulin Brahmins of Bengal গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন, কৌলীন্যই ছিল 'Cruel engine of female misery and degradation'. আবার এই কৌলীন্য প্রথাই ছিল প্রকারান্তরে ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজে অসংখ্য বিধবার দুঃসহ জীবন যাপনের মূল কারণ। মৃত্যুপথযাত্রী কুলীন এক সঙ্গে বহু কন্যার পাণিগ্রহণ করতো — ফলে সৃষ্টি হতো অসংখ্য বিধবা। ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধির মূলে ছিল এই কৌলীন্য প্রথা।

আবার কুলীন স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘকাল, কোনো কোনো ((ত্রে সারাজীবন স্ত্রীর দেখা হতো না বলে, সমাজের ব্যভিচারের ঘটনা ব্যাপক আকার ধারণ করে। এ বিষয়ে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত পাই ১৮৪২ সালের 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠি থেকে। চিঠিটি কোনো মহিলার লিখিত কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও বিষয়বস্তুর তৎসময়ের বাস্তবতায় সন্দেহ নেই। প্রকাশিত চিঠিতে এক কুলীন স্ত্রী জানিয়েছেন, তিন বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। ষোল বছর বয়সের সময় একদিন তাঁর স্বামী হঠাৎ এসে উপস্থিত হন। বৃদ্ধ, কুৎসিতদর্শন সেই স্বামী। কিন্তু তারই সঙ্গে ত(ণী স্ত্রীকে সহবাস করতে হয়। এরপর স্বামীর সঙ্গে তাঁর আর দেখা হয়নি। কিন্তু যৌবনের স্বাদ পেয়ে তিনি আর সৎ থাকতে পারেননি। এ ধরনের ব্যাভিচারের ফলে অবৈধ গর্ভসঞ্চারের ঘটনা ঘটতো ব্যাপকভাবে। কখনো বহু অর্থমূল্য দিয়ে স্বামীকে স্ত্রীর সঙ্গে রাত্রিবাস করিয়ে গর্ভকে বৈধতা দেওয়া হতো। আবার কখনো গর্ভবতী আত্মহত্যা করতো বা বিষ খাইয়ে হত্যা করা হতো। আবার কখনো মিথ্যাচার করা হতো। কন্যার মা-বোনেরা সকালে রটনা করতো জামাই এসেছিল

রাতে। কিন্তু কাজ থাকায় খুব ভোরে বেরিয়ে যেতে হয়েছে। এইভাবে জারজ সন্তানের সামাজিক বৈধতা সৃষ্টি হতো, অবৈজ্ঞানিকভাবে গর্ভপাতের ব্যবস্থাও ছিল — তাতে কখনো কখনো সন্তানসম্ভবার মৃত্যুও ঘটতো। মোটকথা এই কৌলীন্যপ্রথা সমাজকে নানাভাবে বিষাত্ত(করে তুলেছিল। বেশ্যাপল্লীগুলিও রমরমিয়ে উঠছিল ঘর থেকে বেরিয়ে আসা ব্যাভিচারী কুলীন স্ত্রীলোকের দৌলতে।

৩.১.১.৩ : কৌলীন্যপ্রথা ও উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক প্রতিত্রি(য়া

১৮৫০-এর আগে কৌলীন্যপ্রথা নিয়ে কোনো সামাজিক আন্দোলনের নজির আমরা পাইনা। কৌলীন্য ও বহুবিবাহ নিয়ে মিশনারীরাই প্রথম বি(দ্ধে প্রচারে নামেন। পরে রামমোহন প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভা এ-নিয়ে আলোচনা করলেও কোনো আন্দোলন সংগঠিত হয়নি। ইয়ং বেঙ্গলেরা তাদের পত্রপত্রিকায় কৌলীন্য ও বহুবিবাহের বি(দ্ধে মত প্রকাশ করলেও আন্দোলন সংগঠিত করেনি। তবে এই সব আলোচনা থেকে জনমত একটা গড়ে উঠছিল। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বরে প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ' থেকে জানা যায়, দেশের মানুষ কৌলীন্যপ্রথা বিলোপের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হচ্ছিল —"....হিন্দুরা এই অনুমান করেন যে ভারতবর্ষের মধ্যে রাজাজ্ঞাত্র(মেতে যেমন এই নিয়ম স্থাপিত হয় তেমন বর্তমান দেশাধিপতির অজ্ঞাতেও তাহা স্থগিত হইতে পারে।" তবে এ বিষয়ে 'সমাচার দর্পণ' - এ একটা দ্বিধার কথাও ব্যত্ত(হয়েছিল। সমকালীন সরকার প্রজাদের 'দুঃখ রহিত' ও 'সুখের বৃদ্ধি' করতে চেষ্টা করলেও কৌলীন্যপ্রথা রদে "...এই আশঙ্কা যে উত্ত(ব্যবহার দেশের মধ্যে এমত বদ্ধমূল হইয়াছে যে তাহার একেবারে সমূলোৎপাটন করা অসাধ্য এবং আমাদের বোধ হয় এতদ্বিষয়ে অনেক ব্যাঘাত আছে।"

কিন্তু এই ব্যাঘাত সত্ত্বেও সরকারের সাহায্যে বহুবিবাহ রদ করার কথা সেদিন সমাজ যে ভাবতে শু(করেছিল, ইতিহাস হিসেবে এইটিই গু(ত্বপূর্ণ। কৌলীন্য এবং তার হাত ধরে বহুবিবাহসহ আরো বহু সামাজিক সমস্যায় সেদিনের সমাজ জর্জরিত হয়ে উঠছিল। এক কুলীন বহু কন্যার পাণিগ্রহণ করায় অন্য ব্যত্তি(র প(বিবাহ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এই সব বাস্তব অবস্থার কথা ভেবে সেদিন মানুষ রীতিমতো চিন্তিত হয়ে উঠেছিল এবং তার প্রতিকারের কথা ভাবছিল। এই ভাবেই তৈরী হচ্ছিল সংগঠিত আন্দোলনের পথ।

আমরা জানি, দেশের শি(িত ও সচেতন মানুষ বহুবিবাহের বি(দ্ধে প্রথম সরকারের কাছে আবেদন করেন ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু সমাচার দর্পণে তারও বহু আগে বিষয়টির প্রয়োজনীয়তার কথা উঠে এসেছে। পরবর্তীকালে দেশের মধ্যে এই মনোভাব আরো বেশি সোচ্চার হয়ে ওঠে। এ-নিয়ে আপামর জনসাধারণ বহুবিবাহের সামাজিক সমস্যা নিবারণের জন্য সরকারের কাছে আবেদনে আগ্রহী হয়ে উঠলেন (সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র- (৩য়) বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, ১৯৬৪ পৃ. ৫৭১)

বহুবিবাহের বি(দ্ধে যাঁরা ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কিশোরীচাঁদ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামাপ্রসাদ রায় প্রমুখের নাম করতে হয়। ১৮৫৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর সরকারের কাছে বহুবিবাহ রদের আবেদন জমা পড়ে। কিন্তু বহু বিবাহের প(ে ও সেদিন আবেদন করা হচ্ছিল নানা দিক থেকে। তবে বর্ধমানের রাজা সহ বহু প্রভাবশালী ব্যত্তি(ও বিদ্যাসাগরের স্বা(রিত বহুবিবাহ রদের আবেদন পত্রটি অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ। এই আন্দোলনের অংশ হিসেবে রমাপ্রসাদ রায় বহুবিবাহ নিরোধক একটি বিলের খসড়াও তৈরী করেছিলেন। সরকারের প(থেকে গ্রান্ট এটিকে আইন হিসেবে পাশ করার আশাও দিয়েছিলেন। কিন্তু সিপাহি বিদ্রোহের ফলে সরকার আর এ বিষয়ে আগ্রহী হয়নি।

সমস্যাটি নিয়ে কয়েকবছর পরে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য দেবনারায়ণ সিংহ আবার তোড়জোড় শু(করেন। কিন্তু তিনি সদস্য থাকতে থাকতে যে বিল উত্থাপন করতে পারেননি। খসড়া বিল

সহ তিনি এ বিষয়ে সরকারের কাছে আবেদন করেন ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে সে-বছর আরো বহু আবেদন এই বিষয়ে জমা পড়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সিসিল বীডনের কাছে। কিন্তু বিডন তখন কিছুই করতে পারেননি।

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ বহুবিবাহ প্রথা লোপের আন্দোলনে একটি উল্লেখযোগ্য বছর। এ বছরের প্রথম মাসে রাজা রাধাকান্ত দেব বহুবিবাহ প্রথার পক্ষে সরকারের কাছে একটি আবেদন পত্র পাঠান। ১৮৬৬ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে বহুবিবাহ রদের জন্য পাঠানো হয় আর একটি আবেদন পত্র। মহারাজ সতীশচন্দ্র ও অন্যান্য ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একটি আবেদনপত্র ডেপুটেশনের মাধ্যমে লেফটেনেন্ট গর্ভনর বীডন সাহেবের হাতে দেওয়া হয় ১৯ মার্চ, ১৮৬৬। বীডন সাহেবের আবেদন সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করে আইনে পরিণত করার আশ্বাসও দেন। এরপর বর্ধমানরাজের স্বাক্ষরসহ আরো একটি আবেদনপত্রও জমা দেওয়া হয়। তাই এই ১৮৬৬ সালকে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়নের দাবিতে যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বছর হিসেবে আমরা উল্লেখ করছি।

বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনে 'সনাতন ধর্মরক্ষিনী সভা'র ভূমিকাও ছিল সদর্থক। বিদ্যাসাগর এই সভাকেই সাহায্য করতে রচনা করেছিলেন বহুবিবাহ সংক্রান্ত তাঁর প্রথম পুস্তক। সোমপ্রকাশের পৃষ্ঠায় বহু ব্যক্তির মতামতের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বাদবিতণ্ডা জমজমাট হয়ে ওঠে এবং বহুবিবাহ সংক্রান্ত আন্দোলন তীব্রতা লাভ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশক বহুবিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে বাদবিতন্ডায় সংক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। আবার এই আন্দোলন কেবল দেশের রাজধানী কলকাতাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল না পূর্ববঙ্গে কুলীন হওয়া সত্ত্বেও রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় নেতৃত্বে সংগঠিত হচ্ছিল বহুবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথা বিরোধী আন্দোলন। কিন্তু শেষপর্যন্ত এই আন্দোলন সফল হয়নি। এর প্রধান কারণ বিদেশী শাসক সিপাহি বিদ্রোহের পরে আর এদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চায়নি। তাছাড়া কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহপ্রথা রদের ব্যাপারে সমাজের সর্বাংশের মানুষ সাড়া দেয়নি। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ কৌলীন্যের ও বহুবিবাহের ভয়াবহতা নিয়ে উদ্বিগ্ন হলেও আর্থিক ক্ষতি নিশ্চিত জেনে এ-পথে পা বাড়াননি। ফলে এই আন্দোলন শেষপর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি।

৩.১.১.৪ : কৌলীন্যপ্রথা বিরোধী প্রথম প্রহসন 'কুলীনকুলসর্বস্ব'

আমরা আগের আলোচনায় লক্ষ করেছি, ১৮৫৪ সালে প্রথম সরকারের কাছে কৌলীন্যপ্রথার বহুবিবাহ রীতি রদ করার জন্য আবেদন জমা পড়ে। এ-নিয়ে তখনো কোনো সামাজিক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু এ বছরই রামনারায়ণ তর্করত্ন রচনা করেন বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নামের এক নাটক। কেউ আবার একে সামাজিক রঙ্গচিত্র কিংবা সামাজিক নাটক হিসেবেও অভিহিত করেছেন। যে নামেই কুলীনকুলসর্বস্বকে চিহ্নিত করিনা কেন, তার প্রহসনধর্মী বৈশিষ্ট্যকে আমরা কেউ-ই অস্বীকার করতে পারবো না। এই বিষয় নিয়ে রামনারায়ণের আগে অন্য আর কোনো নাট্যপ্রচেষ্টা ছিল না। কিন্তু নাট্যবিষয় কিংবা নাটকের নামকরণ — কোনোটিই নাট্যকারের নিজস্ব উদ্ভাবনা নয়। আগের আলোচনায় দেখেছি, কৌলীন্য প্রথার বিষ সমস্ত সমাজ-জীবনকে তিক্ত করে তুলছিল। পত্র-পত্রিকা বা অন্যভাবে তার প্রকাশও ঘটছিল নানা ভাবে। এই পরিস্থিতি ১৮৫৩ সালে রংপুরের কুন্ডী গ্রামের জমিদার কালীচরণ চৌধুরী 'সম্বাদ ভাস্কর'- সহ অন্যান্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন, কৌলীন্যপ্রথাহেতু কুলীন কামিনীগণের যে দুর্দশা ঘটেছে, সে বিষয় 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নামে একখানি নাটক রচনা করে, রচয়িতাদের মধ্যে যিনি সর্বোৎকৃষ্টতা প্রমাণ করতে পারবেন, তিনি তাঁকে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দেবেন। সুতরাং এ নাটকটি যে তীব্র কোনো সামাজিক আন্দোলনের কারণে রচিত হয়েছে, এমন নয়। আবার নাট্যকারের আত্মপ্রেরণার ফল হিসেবেও এ নাটক রচিত হয়নি। বাইরে থেকে এক উদ্দেশ্যমূলকতার চাপই প্রহসনটির জন্মমূলে বর্তমান।

৩.১.১.৫ : উদ্দেশ্যমূলক নাটক হিসেবে কুলীনকুলসর্বস্ব

'কুলীনকুলসর্বস্ব' আস্বাদনের অবকাশে আমরা একটি শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হই। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে পাশ্চাত্যে সাহিত্য সম্পর্কে একটি মতবাদ প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বিশেষ করে রোম্যান্টিক যুগের জার্মান লেখকগণ, যাঁদের মধ্যে কান্ট, শেলিং, গ্যেটে, শিলার প্রমুখ ছিলেন—তাঁরা সকলেই মনে করতেন শিল্পের (ে ত্রটি অন্যনিরপে(স্বশাসিত এক বিষয়। শিল্পেই শিল্পের পূর্ণতা। তা কোনো তত্ত্বের প্রতিপাদন করবে না, কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য তার থাকবে না, কোনো নৈতিক শি(াও তার কাছ থেকে পাওয়ার নয়। আবার অস্কারওয়াইল্ডও এ তত্ত্বের প্রবল সমর্থক ছিলেন।

কিন্তু আমাদের দেশে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে রামনারায়ণ 'কুলীনকুলসর্বস্ব' রচনার মধ্যদিয়ে সামাজিক সমস্যার নাট্যরচনায় যখন আবির্ভূত হলেন, তখনো প্রবল কোনো আন্দোলন কৌলীন্যপ্রথাকে ঘিরে গড়ে ওঠেনি। ফরমায়েসী রচনা হিসেবে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' রচিত হলেও সামাজিকবর্গ এটিকে সাদরে গ্রহণ করেছিল এবং এটির একাধিক সংস্করণ মুদ্রিতও হয়েছিল। এখানেই নাটকটির ঐতিহাসিক গু(ত্ব। কুলীনকুলসর্বস্বের উদ্দেশ্যমূলকতা নিয়ে কোনো প্র(েই ওঠেনা। এর উদ্দেশ্য নিয়ে নাট্যকার কোথাও কোনো রাখঢাক করেননি। প্রহসনের বিজ্ঞাপনেই রামনারায়ণ কালীচন্দ্র রায়ের ঘোষিত পঞ্চাশটাকা পুরস্কারের কথা জানিয়েছেন। কাহিনীর উদ্দেশ্যমূলকতার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, নাটকটি ছয় ভাগে বিভক্ত(। প্রথমে কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায় মেয়েদের বিবাহ অনুষ্ঠান। দ্বিতীয় অংশে ঘটকের কপট ব্যবহারের রহস্যজনক উপস্থাপন ও নানা প্রস্তাব। তৃতীয় অংশে কুল-কামিনীদের আচার-ব্যবহার। চতুর্থ অংশে শুত্র(বিত্র(য়ীর দোষনির্দেশ। পঞ্চম অংশে নানা রহস্য ও পঞ্চাননের বিয়োগ বা বিয়োগ ব্যথার বর্ণনা। ষষ্ঠ অংশে বিবাহ নির্বাহ। এই বর্ণনাত্র(মকে সামনে রেখে নাট্যকার যা করতে চেয়েছেন তা লেখকের নিজের কথাতেই যেতে পারে — "ইহা কেবল রহস্যজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া তাৎপর্য গ্রহণ করিলে কৃত্রিম কৌলীন্য প্রথায় বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা সম্যক্ অবগত হওয়া যাইতে পারে।" কাজেই লেখদের কাহিনী রচনার পেছনে যে উদ্দেশ্য, তা সমাজের এক দুরবস্থা সম্পর্কে পাঠকের চেতনাকে উদ্বোধিত করা — এ বিষয়ে কোনোমাত্র সন্দেহ থাকে না।

লেখকের চরিত্র-চিত্রণ থেকেও উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা অনুভব করা যায়। নাট্যচরিত্রগুলি — কুলপালক, বিবাহ-বণিক, অধর্ম-(চি, উদরপরায়ণ, অভব্যচন্দ্র। এইসব চরিত্রের নামকরণ থেকেই বোঝা যায় নাটকের স্পষ্ট উদ্দেশ্য। উপকাহিনীগুলোও উদ্দেশ্য নিয়েই সৃষ্টি। কুলপালকের চারটি মেয়ের বিবাহ সমস্যা নিয়ে মূল কাহিনী গঠিত। কিন্তু ফুলকুমারী, বিবাহ বণিক প্রভৃতির কাহিনীও কৌলন্যপ্রথার বিষ-পরিণামকে উদ্ঘাটিত করেছে। এতে রামনারায়ণ সমাজের বাল্যবিবাহের মতো সমাজ-সমস্যাগুলিকেও আত্র(মণ করেছেন। এছাড়া অর্থলোভী ঘটকদের নীচতা, ব্রাহ্মণদের ঔদরিকতা পুরোহিতদের মুর্খতা প্রভৃতিকেও রামনারায়ণ রঙ্গ-রসের ভিয়েনে চাপিয়ে আমাদের কাছে পরিবেশন করেছেন। বিবিধার্থ সংগ্রহে (মাঘ, ১৭৭৬ শকাঙ্ক) রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন "তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় পরম চাতুর্যের সহিত সামান্য বিবাহের উদ্যোগে অনেকগুলি প্রসঙ্গ একত্রিত করিয়া অনেক ব্যক্তি(র চরিত অতি পরিপাটি রূপে বিন্যস্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে কন্যাকর্তা কুলপালকই প্রসঙ্গবিধায়ে সর্ব্বপ্রধান(তাহার বর্ণনা পাঠে কন্যাদিগের দুঃখে অথচ কুলাভিমান র(ার্থে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কন্যাভারগ্রস্ত কুলীনের মূর্ত্তি মনের মধ্যে অবিকল উদিত হয়, কোনো অংশে কিছু মাত্র ত্রুটি বোধ হয় না।......যশোদা ও ফুলকুমারীর কথোপকথনে যে ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে এমত পাষাণহৃদয় কেহ নাই, যে একবারে মহাপাপীয়সী কৌলীন্যপ্রথার উৎসেদার্থে একাগ্রচিত্ত না হয়(তদুত্ত(জামাতার ন্যায় নরাধম কি ভূমন্ডলে আর আছে।" 'প্রবাসী' পত্রিকায় (১ম খণ্ড,

আশ্বিন, ১৩৩৮) প্রিয়রঞ্জন সেন এই প্রহসনটি সম্পর্কে একটি চমৎকার মূল্যায়ন করেছেন। তিনি বলেছেন, নাটকটি পড়ে তাঁর অনেক কথা মনে হয়েছে। এতে হাস্যরসের উপাদান এত প্রচুর যে, কুলীন কুলের দুঃখদৈন্যে দুর্দ্দশার ছবিই শুধু লেখকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, কৌলীন্য ব্যবস্থায় মধ্যে যে প্রচন্ড অসঙ্গতি রয়েছে, তা দেখে তর্করত্নমহাশয় হাস্যসম্বরণ করতে পারেননি। কুলসর্বস্ব কুলীনের ব্যাখ্যা নাট্যকার করেদিয়েছেন — 'কু'তে লীন, কুলীন, অর্থাৎ কুত্রি(য়াসত্ত(। তাই সমালোচকের মতে, আর অনুকম্পা করবেন কাকে, দুঃখবোধ করবেন কার জন্য? সমালোচক সেনের আরও কথা— "গ্রন্থকার নিজে ছিলেন দা(ি ণাত্য বৈদিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত(, — বল্লালী প্রথার সহিত তাঁহার সমাজের কোনোও সম্পর্ক ছিল না, তিনি তাঁহার অধীন ছিলেন না, তাই বোধ হয় তাঁহার দৃষ্টি খুলিয়াছিল ভাল — বংশগত কুসংস্কারে মলিন হয় না।"

কিন্তু আমাদের ধারণা, আপন সমাজের সঙ্গে বল্লালী প্রথার সম্পর্ক না থাকাটাই রামনারায়ণের কৌলীন্য বিরোধী রচনার একমাত্র দৃষ্টি উন্মোচনকারী কারণ নয়। এর পেছনে আরো একাধিক কারণ থাকাটাই স্বাভাবিক। যে বাস্তবতার বোধ, লেখকের আন্তরিকতা ও পরিবেশনের স্বতঃস্ফূর্ততা পাঠক সমাজকে মুগ্ধ করেছিল তা রামনারায়ণের নিজেরই প্রতিভার শক্তি(। আবার কৌলীন্য বিরোধী মনোভাব রামনারায়ণ কেবল নিজের মস্তিষ্কপ্রসূত প্রেরণা বলেই লাভ করেননি, এর পেছনে নিজের হৃদয়-প্রেরণাকেও অস্বীকার করা যাবে না। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় যথার্থই বলেছেন, 'এই বিষয়ের প্রতি লেখকের সহানুভূতি ও এই বিষয়ে তাঁহার প্রত্য(ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা না থাকিলে যেমন তাঁহার রচনার পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্যতাও হইত না, তেমনি ইহা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও কোনো স্থায়ী কীর্তিও রাখিয়া যাইতে পারিত না।" এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচক ড. অজিতকুমার ঘোষের আর একটি মন্তব্যকেও আমরা সমচিত ভেবে রামনারায়ণের এই সামাজিক নাটক রচনার কারণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। তিনি 'রামনারায়ণ তর্করত্ন রচনাবলী'র ভূমিকায় লিখেছেন — "কেন রামনারায়ণ সামাজিক নাটক রচনা শু(করলেন... গৌণ কারণ হল, পুরস্কার প্রাপ্তির আশা।....কিন্তু সামাজিক নাটক লেখার মুখ্য প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর প্রগতিশীল সমাজভাবনা এবং বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত প্রবল সমাজ আন্দোলন থেকে। রামনারায়ণ বিদ্যাসাগরের ব্যক্তি(ত্ব, উদার প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী ও সমাজসংস্কার-প্রচেষ্টার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি ছাত্রাবস্থায় বিদ্যাসাগরের ছাত্র (সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নকাল ১৮৪৩-১৮৫৩) এবং বিদ্যাসাগরের অধীনে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক ছিলেন (অধ্যাপনা কাল ১৮৫৫-১৮৮২)।" মোটকথা রামনারায়ণ যে শিল্পের জন্য তত্ত্ব থেকে তাঁর নাটক রচনা করেননি, বহুমুখী সমাজ সমস্যার মুখে দাঁড়িয়ে, তাকে রঙ্গরসের ভিয়ানে চাপিয়ে সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যকে হৃদয়ে লালন করে নাটকটি রচনা করেছেন এতে সন্দেহমাত্র নেই।

৩.১.১.৬ : কুলীনকুলসর্বস্ব কাহিনী — বহুমাত্রিক সমাজ-সমস্যার চিত্রশালা

বন্দ্যঘটীয় কেশব চত্র(বর্তীর বংশধর কুলীন ব্রাহ্মণ কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চার মেয়ে — জাহ্নবী, শাম্ভবী, কামিনী ও কিশোরীর বিবাহ সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে এ নাটক। ত্র(মানুসারে মেয়েদের বয়স ৩২-৩৩, ২৬-২৭, ১৪-১৫ ও ৮। মেয়েদের বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাওয়ায় কুলপালক চিন্তিত ও সমাজ-নিন্দিত। কিন্তু যথাযোগ্য কুলীন পাত্র না পেলে তো আর মেয়েদের বিয়ে দেওয়া যায় না। তাছাড়া কুলপালক মনে করেন, 'বিবাহ নির্বাহ বিধির ঘটনা'। কিন্তু এ ভাবে শান্তিতেও থাকা যায় না। চিন্তাগ্রস্ত হয়ে তাঁর নিজের কথা — "আমি কন্যাভারগ্রস্ত হইয়া রাহুগ্রস্ত দিনকরের ন্যায় চিন্তায় ৗিণকায় হইতেছি(কুলকুণ্ডলিনী কবে আমাকে কুলে আনিবেন কবে কুল র(া করিবেন।"

দু'জন ঘটক — শুভাচার্য ও অনৃতাচার্য কুলপালকের মেয়েদের বিয়ের দায়িত্ব নিয়েছে। এদের মধ্যে শুভাচার্য শুভবুদ্ধি সম্পন্ন, ন্যায়নীতির দ্বারা চালিত হয়। কিন্তু অনৃতাচার্য স্বার্থপর, মূর্খ, নীতিহীন, হীনপ্রতারক।

অনেক স্পষ্ট স্বীকার করে তিনি কুলপালকের মেয়েদের জন্য একটি ভাল পাত্রের সন্ধান নিয়ে এসেছেন, সে আবার 'বিষু(ঠাকুরের বংশোৎপন্ন, ফুলের মুখোটী।' পাত্রের গুণের শেষ নেই, বয়সও বেশি নয় — মাত্র ষাট। ঘটকের পরামর্শে নগ্ন না থাকলেও তাড়াহুড়ো করে বিয়ের দিন ঠিক করা হল। আশঙ্কা, পাছে পাত্র হাতছাড়া হয়ে যায়।

কুলপালকের স্ত্রী মেয়েদের বিয়ের কথা শুনে খুশিতে মেয়েদের ডাকাডাকি শু(করেন। খবর শুনে বড় মেয়ে জাহ্নবী বলে, আর কতকালই বা সে বাঁচবে, বুড়ো বয়সে কেন এসব 'ধেড়ে রোগ'। মেজো মেয়ে চাপা ত্রে(াধে বলে, 'ও মা তুই কি কুল র(া কর্ব্বি, তবে জাতি র(া কে কর্ব্বে মা?' সেজো মেয়ে মায়ের কথা বি(াসই করতে চায়না। কারণ এর আগে অনেক বার এ কথা বলে ছলনা করা হয়েছে। ছোট মেয়ে পাড়ায় খেলা করছিল। খবর শুনে সেও ছুটে এলো। জানতে চাইল, বিয়ে কাকে বলে মা? 'তাকি আমি খাব?'

বিবাহের আয়োজন চলতে থাকে — পাড়ার প্রতিবেশিনীরা জমতে থাকে — ভীড় জমে পুরোহিতদের। আবার কন্যাদের প্রতিত্রি(য়া জানা যায়। জাহ্নবীর প্র(— 'এখন আইল পান্থ সন্তাপ পাইয়া। উহাকে শীতল তবে করিব কি দিয়া।' শাম্ভবী সামান্য আশাবাদী। সে বলে, 'হোক্না দেখা যাক।' কামিনী ও কিশোরী বয়সোচিত কৌতুহলে বর দেখতে ছুটে যায়। ফিরে আসে নিরাশ হয়ে। শাম্ভবীর প্র(ের উত্তরে কামিনী বরের কথায় জানায় — 'তামাক টানিতে মরে কাশিতে কাশিতে। বোধ হয় হয় গয়া এবার কাশিতে।' এবার সকলে মিলে পিতার কাছে আপত্তি জানাবে বলে শাম্ভবী প্রস্তাব দেয়। কিন্তু এ সময়ে এমন প্রস্তাব কোনো লাভ হবে না তারা বুঝতে পারে। বিয়ের আসরে বরকে আরো ভালভাবে দেখা যায়। পুরোহিত ধর্মশীল ও ঘটক অনৃতাচার্যের মধ্যে যে বরের রূপগুণের আলোচনা হয়, তা থেকে জানা যায় — 'দেখিতে সুন্দর বর দাদ সবগায়।' আর বসন্ত রোগে তার এক চ(ু নষ্ট হয়ে গেছে — 'দ(িণ নয়ন কেন দেখিতে না পাই।' কিন্তু তবুও বিয়ে হল। কুলপালক এই কুলীন বরের হাতেই একসঙ্গে নিজের চার মেয়েকে সপে দিল নিজের কুলমর্যাদা অ(ুন্ন রাখতে। কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য তার বাস্তবতা গুণ। কিন্তু শুধু বাস্তবতার অনুসরণে নাটকের কোনো চরিত্র সার্থকতা লাভ করতে পারে না। সাহিত্যতো ফটোগ্রাফি নয়। সাহিত্যে চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলতে বাস্তবতাকে ভিত্তি করতে নিশ্চয়ই কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবতাটাই সাহিত্য নয়। তার জন্য প্রয়োজন শিল্পীর গভীর জীবনরস-রসিকতা।

এই নিরিখে কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকে আমরা যে-সব পু(ষ চরিত্র পেয়েছি তাদের মধ্যে প্রায় সব চরিত্রই সমাজবাস্তবতার কোনো-না-কোনো একটি দিক সম্পর্কে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে। যেমন কুলপালক, কুলধন, শুভাচার্য, সুধীর, অনৃতাচার্য, ধর্মশীল, তর্কবাগীশ, অধর্ম(চি, বিবাহবণিক, উদর-পরায়ণ, বিরহী-পঞ্চানন, বিবাহ-বাতুল, অভব্যচন্দ্র প্রভৃতি। কৌলীন্যপ্রথার বাস্তাবতাকে, এই সব চরিত্রের নামকরণের মধ্যে যে-সব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, নাট্যকার সেগুলির একান্ত বি(াসযোগ্য রূপায়ণ ঘটিয়েছেন নাটকে। কিন্তু এরা শিল্পীর সহানুভূতিতে কেউই প্রায় সিঞ্চিত হয়ে ওঠেনি। হয়তো এর মধ্যে কিছুটা ব্যতিত্র(ম কুলপালক।

কুলপালকের চরিত্রই এ নাটকে প্রধান পু(ষ চরিত্র। রাজেন্দ্রলাল মিত্র যথার্থই বলেছেন "...কন্যাকর্ত্তা কুলপালকই প্রসঙ্গবিধায়ে সর্ব্বপ্রধান(তাহার বর্ণনা পাঠে কন্যাদিগের দুঃখে দুঃখিত অথচ কুলাভিমান র(ার্থে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কন্যাভারগ্রস্ত কুলীনের মূর্ত্তি মনের মধ্যে অবিকল উদিত হয়, কোনো অংশে কিছুমাত্র ত্রুটি বোধ হয় না।" বল্লাল সেনীয় কৌলীন্য প্রথার প্রকোপে বাঙালী হিন্দু সমাজে যে ভয়ঙ্কর অধোগতি নেমে এসেছিল, ঊনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত যার বিষময় ফল সমাজে পুরোমাত্রায় বর্তমান ছিল, তারই একটি বাস্তব ও হৃদয়বিদারক চিত্র নাটকটিতে ফুটে উঠেছে। এই প্রথার যূপকাষ্ঠেই কুলপালক তাঁর চারটি মেয়েকে

একই সঙ্গে বলি দিয়েছেন। নি(পায়ভাবেই তাঁকে এ কাজ করতে হয়েছে। যে সমাজ কেবল প্রথার দাসত্ব করে, সে সমাজে মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের অবকাশ থাকে না। কুলপালক যা করেছেন, তা জগতে কোনো পিতারই কাম্য হতে পারে না। কুলপালকওতো তা চাননি। কিন্তু এই প্রথাকে লঙ্ঘন করে বি(দ্ধে যাওয়ার মতো (মতাও ব্যত্তি(বিশেষের সব সময় থাকেনা — কুলপালকেরও ছিল না। এখানেই কুলপালকের জীবনের ট্র্যাজেডি। ছাত্র তর্কবাগীশের সঙ্গে ধর্মশীলের আলাপ আলোচনাকালে এই সত্যটিকেই তুলে ধরেছেন — "আমার যজমান কুলপালক বাঁড়ুয্যে, তিনি বল্লালকৃত কুলকল্লোলে পতিত(তাঁহার চারিটি কন্যা(তন্মধ্যে কনিষ্ঠ কন্যাটির কেবল কন্যা কাল আছে, তৃতীয়টি যুবতী, দ্বিতীয়া আর জ্যেষ্ঠা তারা অনূঢ়াবস্থায়ই যৌবনযাপন করিয়াছে। তিনি এতাবদিবস সমযোগ্য কুলীন বর প্রাপ্ত হন নাই। কুলভঙ্গ ভয়ে তাহাদের বিবাহ দিতেও পারেন নাই।"

নাটকের সূচনায় কুলপালককে দেখা যায় 'কন্যাভারগ্রস্ত' হয়ে তিনি বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন। তিনি প্রায় অসুস্থ। বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হওয়া মেয়েদের কথা ভাবতে গিয়ে তিনি বলেন — 'বিবাহ নির্বাহবিধি — বিধির ঘটনা'। কিন্তু এ তো তার বি⁄াসের উৎস থেকে যতটা উৎসারিত আত্মকথন, তার চেয়েও বেশি তার জীবনযুদ্ধে পরাজিত হওয়ার যন্ত্রণা থেকে উচ্চারিত। সমাজ-শত্তি(র কাছে পরাজিত দুর্বল ব্যত্তি(সত্তার গূঢ় অভিব্যত্তি(। আবারও তাঁকে বলতে শুনি — আমি বন্দ্যঘটীয় কেশব চত্র(বর্তীর সন্তান, প্রধান কুলীন, আমার কন্যাদিগের বিবাহ হয় নাই।' এই উত্তি(রও ব্যঙ্গার্থ আত্ম(-ঘোর ঘোষণা নয়, দুর্বিসহ কৌলীন্য প্রথার প্রতি ধিক্কার জ্ঞাপন। কথাটা আরও স্পষ্ট করে তিনি বলেন —'...আঃ পোড়া দেশীয়দিগের কি দুরন্ত প্রথা! অতি মন্দ অতি মন্দ, এমন দেখিনাই।' কিন্তু সেদিনের সমাজে কৌলীন্যপ্রথার বি(দ্ধে কুলপালকের মতো ব্যত্তি(র বি(ুদ্ধ মন বিদ্রোহের পথ খুঁদে পায়নি। পরাজিত অসমর্থ কুলপালক তাই শেষপর্যন্ত আত্মসমর্থনের গলিঘুঁজি খুঁজে বেড়ায়। প্রতিবেশী কুলধনের কাছে তাই নিজের দুর্ভাগ্যের সমর্থনে যুত্তি(জাল বিস্তার করে বলে — "আমার মেয়েদের বিবাহ হইতে কিছু বিলম্ব হইয়াছে, তা এমন কি কা(হয় না, ...তা বিলম্বই বা কি, বৈদিক ব্রাহ্মণের ন্যায় কি গর্ভে গর্ভে বিবাহ দিব? দেশের লোকেরা তাহা বিবেচনা করে না, নিরপরাধে আমাকে নিন্দাবাদ প্রদান করিতেছে।' এই অস্থির অসুস্থ মানসিকতা নিয়েই পিতা কুলপালককে ষাট বছরের এক বৃদ্ধ কুলীন বর, যার সর্বাঙ্গে দাদ, মুখে বসন্তের দাগ এবং ডান চোখে কানা— তারই সঙ্গে চারটি মেয়ের বিয়ে দিতে হয়েছে। এই যে নিজের ইচ্ছার বি(দ্ধে সমাজ-শত্তি(র জবরদস্তি — এবং সেই জবরদস্তিতে রত্ত(াত্ত(হৃদয় কুলপালক বাস্তবের তথ্য থেকে নাটকের ট্রাজিক চরিত্রে পরিণত হয়েছে। এঁর জন্য সামাজিকবর্গের গভীর সহানুভূতি জাগ্রত হয়।

কুলধন চরিত্রটি এ নাটকে অত্যন্ত সং(প্ত সময়ের জন্য আবির্ভূত হলেও সে মানসিকতায় কুলপালকের মতোই। তাকেও কৌলীন্যপ্রথার বিষবাষ্পে আহত হতে হয়েছে। কুলধন মুখোপাধ্যায় কুলপালকের প্রতিবেশী — পরস্পর পরস্পরের সমব্যথী। এই বিবেচনায় কুলপালক নিজের মেয়েদের যথাসময়ে বিয়ে দিতে না পারার জন্য কুলধনের সমর্থন খোঁজে — ভাই তুমি বিবেচনা করো দেখি সমযোগ্য পাত্র না পাইলে' 'যার তার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে চিরন্তন কুলে জলাঞ্জলি দিব?' দেশাচারের নিন্দা করেও তার বি(দ্ধে এঁরা বিদ্রোহ করতে পারেন না। কুলীনকুলধন মুখোপাধ্যায়ও সমব্যথীর কাছে নিজের মর্মবেদান প্রকাশ করে নিজের মেয়ের বয়স সম্পর্কে বলেন, — 'বয়েস বড় অধিক নয়, সেদিন ঠিকুজি খুলিয়া দেখিলাম, বলি দেখি মেয়েটার বয়েস কত, তা ভাই বুঝিতে পারিলাম না, ঠিকুজিখানা জীর্ণ হয়েছে, আঁকর বোঝা যায় না, তা নাই গেল, সে তার বড় পিসীর বইসী'। তাই কুলপালকের মতোই পিতা কুলধনকেও কৌলীন্যপ্রথার দেশাচারে সমান ভাবেই পীড়িত হতে হচ্ছিল।

অধর্ম(চি চরিত্রটি সেদিনের কৌলীন্যপ্রথাকে কেন্দ্র করে সমাজের বাস্তবকে নানা মাত্রায় আমাদের সামনে প্রত্য(বৎ করে তুলেছে। কিন্তু পূর্বে আলোচিত কুলপালক ও কুলধন চরিত্র দুটি সমাজ-শাসনের

যূপকাষ্ঠে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেমন নি(পায় ভাবে আত্মসমর্পনে বাধ্য হয়েছে এবং সে কারণে লেখক ও পাঠক উভয়ের কিছুপরিমাণে হলেও সহানুভূতি আকর্ষণে সফল হয়েছে, এ চরিত্রটি এবং অন্যান্য পু(ষ চরিত্রগুলি, তেমন নয় নিরঙ্কুশ ভাবে কৌলীন্য প্রথার ও আনুষঙ্গিক নানা সামাজিক সংকটের বিষ এরা বহন করেছে এবং লেখক ও পাঠকের সহানুভূতি থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়েছে। তাই সামাজিক সমস্যার তথ্যকে নিপুনভাবে ধারণ করেও এ চরিত্রগুলি চরিত্র হিসেবে রক্ত(-মাংসের সজীবতা অর্জন করতে পারেনি। অধর্ম(চি এই ধরনের চরিত্রগুলির মধ্যে প্রধানভাবে আলোচ্য। বিবাহ-বণিক অধর্ম(চির পিতা। তাকেও একই সঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখতে হয়। কারণ পিতা-পুত্র উভয়ে মিলে চরিত্রের একটি বিশেষ টাইপকে আমরা প্রত্য(করি।

কৌলীন্য প্রথার সুযোগ নিয়ে কোনো কোনো কুলীন বিবাহকে একটি লাভজনক ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। 'বিবাহ-বণিক' নামটির মধ্যেই চরিত্রের বিবাহ-ব্যবসায়ী স্বরূপটি ধরা পড়েছে। ছাত্র তর্কবাগীশকে গু(ধর্মশীল কুলীনদের সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে বলেছেন — কুলীন মহাত্মারা ধর্মাধর্মের প্রতি নেত্রপাত করেন না, অর্থ পাইলে পরমার্থ বোধে সকল দু(্(য়াই করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের বয়োবিবেচনা, গুণ পর্যালোচনা, সৌন্দর্যাভিলাষ, জাতি বিনাশশঙ্কা লোকাপবাদ ভয়, কিছুই নাই(অর্থলোভে এক ব্যক্তি(একশত পর্যন্ত পরিণয়ে প্রণয়বদ্ধ করেন, কাহার বা বিবাহ-ব্যাপারে আলস্য নাই।" এখানে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের কুলের ল(ণ ঘটক অনৃতাচার্যের ভাষায় স্মরণ করা যেতে পারে —

দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে নিবাস (বশুর-ঘরে
মাদকেতে আমোদ বিস্তর।
সন্ধ্যার নাহিক গন্ধ গায়ত্রীর আট্ক্যা বন্ধ
সদানন্দ-পূর্ণ কলেবর।।
মুখে সদা বেরিগুড্ তুড়ি দিয়া বলে হুট্
হাস্য আস্যে দোষে সাধুজনে।
বড় ভক্তি(পাঁচালিতে কে আঁটিবে বাচালিতে
এই নয় গুণ লও গণে।।

কুলীন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের এই চারিত্রিক টাইপটিকে পিতা বিবাহ-বণিক ও পুত্র অধর্ম(চির চরিত্রে নাট্যকার মূর্ত করে তুলেছেন।

বিবাহ-বণিক বহু সংখ্যক বিবাহ করেছেন। সেদিনের কুলীন ব্যক্তি(রা যেমন সংখ্যাধিক্যের জন্য সব (বশুরবাড়ির কথা মনে রাখতে পারতো না বলে খাতায় লিখে রাখতো, বিবাহ-বণিকও তাই করতো। টাকার প্রয়োজন দেখা দিলে খাতা বের করতো এবং ঠিকানা মতো জায়গায় গিয়ে হাজির হতো। বিবাহ-বণিকেরও একদিন টাকার প্রয়োজন হল। তার স্বগতোক্তি(— "আমার কিছু টাকা চাই, কোথা যাই, বেলাও অনেকটা হয়েছে, নিকটে কি কোনো (বশুরবাড়ি নাই? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, যেন মনে হচ্ছে, এখান হইতে এক ত্রে(াশ হইবে বিমলাপুর, সেখানে বুঝি একবার বে হয়েছিল। (চিন্তা করিয়া) আমিই সেথায় বে করেছি না পুত্রের বে দিছি? ভাল মনে হচ্ছে না, — পুত্রকে ডেকে জিজ্ঞাসা করিব? (কিঞ্চিদ্ভাবিয়া) না, আমার কাছে তো ফর্দ আছে তাই দেখি না দেখি না কেন? (ফর্দ খুলিয়া) হাঁ, এই যে ১২৪২ সাল ৩রা মাঘ, বিমলাপুরের কমলন্যায়লেঙ্কারের কন্যাকে আমিই বে করিছি, হু, দেখেছ? লেখা পড়া রাখা ভাল, মনে করে কত রাখা যায়?"

কুলীনদের এই পাইকারী হারে বিয়ে করার ফলে স্বামীর কর্তব্য পালনের প্রশ্নই উঠতো না। সধবা হয়েও কুলীন কন্যারা বৈধব্যের যন্ত্রণাই ভোগ করতেন। এর ফলে বিবাহিতা কুলীন মেয়েদের অনেকেই ব্যভিচারে লিপ্ত হতেন এবং প্রচুর জারজ সন্তানের জন্ম হতো। বিবাহ-বণিকদের মতো কুলীনদের আচরণে এই আর এক সমাজ-সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন। বহুদিন আগে 'মহিলা'র বিয়ে হলেও, স্বামীকে তিনি একদিনের জন্যও কাছে পাননি। তাই তাঁর প্রশ্ন — 'সেও আমার নয়ন পথে কখন পতিত হল না, তাহাদ্বারা দুঃসহ যৌবন যাওনা হইতে নিস্তার পেলেম না, তবে সে কি পতি? তাকে পতি বলবো কেন? তাই মহিলা তার নিজের পথ বেছে নেয়— 'ভাবনা কি? কত লোক আছে।....এমন সুখের সময় কেন দুঃখে কাটাবো? তুই ও আমার মতে আয়, কেন যৌবন বিফল করিতেচিস্?"

মাধবীরও একই দশা। তার নিজের কথায় —

দুরন্ত বসন্তকাল এযে যুবতীর কাল
কাল পেয়ে কি কাল ঘটায়।
পতিত বিচ্ছেদ-বাণ   কত আর সহে প্রাণ
বুঝি ত্রাণ নাহি ইথে পায়।।

তাই মাধবীও শেষ পর্যন্ত মহিলার মতানুবর্তিনী হয়। অর্থগৃধ্নু বিবাহ-বণিকরা সেদিন নিজেদের আচরণের মধ্যদিয়ে যেমন সমাজকে ব্যাভিচারী করে তুলছিল তেমনি বিয়ে করা বৌদের কাছ থেকে তাদের শ্রমে ঘর্মে অর্জিত সুতো কাটায় সামান্য অর্থটুকুও কোনোরকম দায়িত্ব পালন না করে শোষণ করে নিচ্ছিল। এই নাটকের চতুর্থ অঙ্কে বিবাহ-বণিকের আচরণের মধ্যদিয়ে সেই সামাজিক সত্যটিও স্পষ্টতা লাভ করেছে। এই অঙ্কে বিবাহ-বণিক ভাবছেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণ-শ্বশুরালয়ে গিয়ে হয়তো কিছুই পাওয়া যাবে না। হঠাৎ তার মনে হল — 'ভাল, ব্রাহ্মণীর কাটনাকাটাও কি কিছু নেই? দেখে আসিনে কেন?

এবার পুত্র অধর্মরুচির প্রসঙ্গে আসা যাক্। পিতার উপযুক্ত পুত্র সে। সেদিনের কুলীন সমাজের আদর্শস্থানীয় প্রতিনিধি। ঘর-জামাই অধর্মরুচি ধর্মশীলের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছে, শ্বশুরবাড়ীতে তার বাস। ধর্মরুচি প্রশ্ন করেছে — '...কি ব্যবসায় করেনৎ' অধর্মরুচির উত্তর — 'আমার বিবাহ ব্যবসা, আর কি ব্যবসা?' পুনরায় ধর্মরুচির প্রশ্ন — 'বিবাহ ব্যবসায়ে কি দেহযাত্রা নির্বাহ হয়? অধর্মরুচির উত্তর — 'হাঁ, হয়ে থাকে। মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেন আমাদিগকে যে নিষ্কর তালুক দিয়া গেছেন, তার হাজাশুকো নাই — তাতেই আমরা সুখে আছি। আমরা রাজারও রেয়েত নই, সেধেরও ঘাতক নই, আপনি কি কুলীনচ্ছেলের বিষয় জানেন না?'

এই কথার প্রসঙ্গে ধর্মরুচি অধর্মরুচির বিয়ের সংখ্যা জানতে চাইলে উত্তরদেয় —"আমাদের কুলীনেচ্ছলে অনেক বে করে থাকে, কিন্তু আমি ধর্মভীত অধর্মরুচি মুকুয্যে, আমি অধিক করি নাই।' তবুও ধর্মরুচি সংখ্যাটা জানতে চাইলে উত্তর পায় — 'আমি সাড়ে আঠার গণ্ডা বৈ আর বে করি নাই, কতগুলো বে কল্যে কি হবে? আমাদ্দাদা মহাশয় চারিকুড়ি পোনেরটা বে করেছেন, এখন তিনি অন্তদন্ডহীন হয়েছেন, তবু পেলে ছাড়েন না।' নিজেকে ধর্মভীত বলে দাদা মহাশয়ের চেয়ে নিজের বিবাহ-সংখ্যার ন্যূনতা উচ্চারণ করতে গিয়ে চরিত্রটি মঞ্চে যেভাবে উদ্ঘাটিত হয়, তাতে দর্শক-সাধারণ আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। এক কুলীন পুরুষ বহু নারীর পাণিগ্রহণ করে তাদের প্রতি স্বামীর কোনো কর্তব্যই পালন করতো না। এমন কি স্ত্রীর কাছে অদর্শনীয়ই হয়ে থাকতো। যুবতী স্ত্রীরা দীর্ঘ অথবা চিরকালের মতো বিরহ যাপনে বাধ্য হতো। এই ঘটনার একটা মর্মান্তিক দুঃখের দিক যেমন আছে। তেমনি এই-সব যুবতী নারীদের কারো কারো ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ঘটনাও অবান্তর নয়। এই নাটকে তেমন ঘটনার কথা অধর্মরুচি চরিত্রের মধ্যদিয়ে আমরা

কিছুটা অনুমান করতে পারি। আবার কুলীনরা এ জাতীয় ব্যভিচারকে মোটেই অসাধারণ কিছু বলে মনে করতো না। এটা ছিল তাদের কাছে জল-ভাতের মতো।

অধর্ম(চি তার এক কন্যার জন্ম সংবাদ পেয়ে বিব্রত বোধ করছে। পিতার কাছে বলছে—'কি বলবো বাবা, লজ্জা হয়(সে দেশে প্রায় তিন বছর যাই নাই(তাই বলি মেয়েটা হল।' কিন্তু অধর্ম(চির লোকচো(যিনি বাবা (বিবাহ-বণিক) তিনি তো এ ব্যাপারে অনেক বেশি অভিজ্ঞ। তাই পুত্রকে সান্তনা দিয়ে বলে — '(উচ্চহাস্য করিয়া) বাপু হে! তাতে (তি কি? আমি তোমার জননীকে বিবাহ করিয়া তথায় একবারও যাই নাই, একেবারে তোমার সঙ্গে সা(াৎ হয়। তা বাপু! আমরা কুলীনের ছেলে, আমাদের ওরকম হয়ে থাকে, তাতে (তি কি?' অগত্যা অধর্ম(চিও হয়তো পিতার দেওয়া ব্যভিচার সংত্র(ান্ত এই ধারনার দী(ায় দী(িত হয়ে উঠেছিল। অধর্ম(চির নিজের উক্তি(তেই এ দী(ার আরো ব্যাপক সাধন অভিজ্ঞতা ব্যক্ত(হয়েছে। অবৈধ গর্ভ-সঞ্চার হলে বাস্তবে তার প্রতিকার কেমন করে করা হতো, সে সম্পর্কে অধর্ম(চি বলেছে — অবৈধ গর্ভ হলে আত্মীয়েরা এসে জামাইকে নিয়ে যেতো এবং জামাই দশ-বিশ-তিরিশ টাকার বিনিময়ে অবৈধ গর্ভ তার সম্ভূত বলে স্বীকার করে নিতেও দ্বিধাবোধ করতো না। সব মিলিয়ে কৌলীন্যপ্রথার যাবতীয় বিষময় পরিমাণ সেদিনের সমাজের বাস্তব ছিল, তার প্রায় সবটাই এই আদর্শ কুলীন চরিত্রটির চিত্রায়নে নাট্যকার ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এই কৌলীন্যপ্রথার প্রতি যেহেতু নাট্যকারের সহমর্মিতা ছিল না, সে-কারণে অধর্ম(চি চরিত্রটি নাট্যকারের সহানুভূতি বঞ্চিত হয়ে অনেকটা তথ্যচিত্রের আকার ধারণ করেছে।

ঘটক চরিত্র হিসেবে এ নাটকে আমরা দু'ধরনের ঘটক পেয়েছি। বিবেকসম্পন্ন শুভাচার্য যেমন ছিলেন, তেমনি অনৃতাচার্যরাও ছিল। কিন্তু অনৃাচার্যের মতো ধূর্ত ঘটকদের কাছে সেদিনের রমরমিয়ে ওঠা বিবাহ-ব্যবসায়ে শুভাচার্যরা ঠাঁই পাননি। চরিত্র হিসেবে তাই শুভাচার্যরা দানাও বেঁধে উঠতে পারেনি। তবে এ নাটকের ঘটনাকাল মাত্র দুদিনের। এই স্বল্প কালপরিধীতে বহু চরিত্রের আমদানি ঘটেছে বলে কোনো চরিত্রই উপযুক্ত(আয়তনে বিকাশ লাভ করেনি। তার মধ্যে পূর্বালোচিত চরিত্রগুলি সামান্য আলোচনার যোগ্য হয়ে উঠেছে। এখানে আমরা অনৃতাচার্যের যে সামান্য পরিচয় পেয়েছি, তার স্বার্থপরতা ও হীন প্রতারকের ভূমিকা চমৎকার ফুটেছে। অনৃতাচার্য নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে —'আমার গুণের কথা কতো কহিব—আমি সাবর্ণ গৃহে কত শত কৈবর্তকন্যা ঢালাইয়েছি(শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বরে (ত্রিয় কন্যা, বিষু(ঠাকুরের বংশে বৈষ(ব কন্যা, শিব চত্র(বর্তীর সন্তানে পদ্মরাজ দুহিতা ঘটায়েছি, আর কানা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর, এ সমস্ত ত আমার শরীরের আভরণ।' এ ছাড়া অর্থের লোভে বিবাহের প(নিষিদ্ধ দিনেও বিবাহ ঘটাতে এরা পিছপা ছিল না। সপ্তশালকের মতো অশুভ দিনে — যেদিনে বিবাহ হলে স্ত্রী বিধবা হয়, সেদিনেও কুলপালকে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে অনৃতাচার্য আত্মপ(সমর্থন করেছে।

এই নাটকে নাট্যকারের সহানুভূতির অভাবে বেশিরভাগ পু(ষ চরিত্র মোটেই সার্থকতা লাভ করেনি। কিন্তু নারীচরিত্রগুলি নাট্যকারের সহানুভূতিতে ধন্য হয়েছে। বিদ্যাসাগর শিষ্য রামনারায়ণ কৌলীন্য প্রথার মতো দুর্বিষহ সামাজিক প্রথায় আমাদের দেশের নারীর যে-ভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছিল তাতে নিজের সমস্ত সহানুভূতিকে (উজাড় করে) দিয়েছেন।

৩.১.১.৭ : আর্দশ প্র(াবলী

১। বাঙালী সমাজে কৌলীন্যপ্রথার যে বিভীষিকা দেখা দিয়েছিল, তার ঐতিহাসিক সূত্রের সন্ধান দাও এবং কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকে সেই বিভীষিকার যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তার সং(িপ্ত পরিচয় দাও।

২। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কৌলীন্য প্রথার যে বিকট রূপ দেখা যায় তার পরিচয়সহ 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের বিষয়বস্তুতে সেই সময়ের যে প্রতিফলন ঘটেছে তা সং(পে আলোচনা করো।

৩। সামাজিকভাবে কৌলীন্যপ্রথাকে ঘিরে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রতিত্রি(য়া এবং রামনারায়ণের নাট্যরচনার ইতিহাস সং(পে আলোচনা করো।

৪। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' প্রথম কৌলীন্য প্রথা বিরোধী বাংলা নাটক' — আলোচনা করো।

৫। উদ্দেশ্যমূলক নাটক হিসেবে 'কলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের মূল্যায়ন করো।

৬। 'কুলীনকুলসর্বস্বের কাহিনী বহুমাত্রিক সমাজ-সমস্যার চিত্রশালা' — আলোচনা করো।

————

পর্যায়গ্রন্থ - ১

একক - ২

নারী চরিত্র

বিন্যাস ত্র(ম :

৩.১.২.১ নারী চরিত্র

৩.১.২.২ নারী সমাজ-নিগড়ের বিপরীত অভিমুখে

৩.১.২.৩ আদর্শ প্র(াবলী

৩.১.২.১ : নারী চরিত্র

কুলপালকের চার কন্যা **জাহ্নবী, শাম্ভবী, কামিনী** ও **কিশোরী**। এ নাটকের মূল কাহিনী এই চার কুলীন কন্যার বিবাহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এরা চার সহোদরা একই কৌলীন্যপ্রথার বিষময় পরিণামের বলি। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য এই চারটি রূপায়নে নাট্যকার রামনারায়ণের শক্তি(কে চমৎকার ভাবে ল(করেছেন —"এই চারিটি সহোদরা, একই সুখ-দুঃখের অধীন, একই দুর্ভাগ্যের অধিকারিণী, একই অবস্থায় দাসী(কিন্তু রূপায়ণের ভিতর দিয়া নাট্যকার চারিটি চরিত্রকেই একাকার করিয়া ফেলেন নাই — ইহাই নাট্যকারের প্রধান কৃতিত্ব, এখানেই নাট্যকারের চরিত্রসৃষ্টির প্রতিভার পরিচয়।" আসলে নাট্যকার চার বোনের মধ্যে বয়সের যে ব্যবধান, সেই ব্যবধান অনুসারে বিয়ে ব্যাপারটির প্রতি তাদের পৃথক-পৃথক প্রতিত্রি(য়া প্রকাশ করে নাটকে চরিত্র হিসেবে তাদের স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন। আকস্মিকভাবে ঠিক হওয়া বিয়ের কথা বিয়ের দিন সকালে জননী তাদের জানালে, চারজনের মধ্যে চার রকম প্রতিত্রি(য়া দেখা গেল। বড় বোন জাহ্নবীর বয়স ৩২। পরের তিনজনের বয়স যথাত্র(মে ২৬,১৬, ও ৮ বছর। তাই বিয়ের ব্যাপারে প্রত্যেকের প্রতিত্রি(য়া অপরের থেকে ভিন্ন। জাহ্নবীর প্রতিত্রি(য়া সেদিনের অতিত্র(ান্ত যৌবনা কুলীন কন্যাদের মতো। এই বয়সে বিয়ে একটা অর্থহীন ব্যাপার। জাহ্নবীর কাছেও তাই। যে আশা ও স্বপ্ন নিয়ে একটি মেয়ে বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে, জাহ্নবীর আর সেই বয়স নেই। সে সহজেই বিয়ের ব্যাপারটাকে বিদ্রূপ করে বলতে পেরেছে —'কেন আর বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ।' তার মনে হতে থাকে মৃত্যুর মুখে পৌঁছে যমরাজের সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে। কিন্তু তবুও অনূঢ়া নাম ঘোচানোর জন্য কুলীন কুমারীরা উৎসুক হয়ে থাকতো। জাহ্নবীর (েত্রেও তাই — মনের ভেতরে ভেতরে যে একটা সান্তনা লাভও করে, হয়তো খানিকটা আনন্দও।

জাহ্নবীর পরের বোন **শাম্ভবী**। জাহ্নবী অপে(া সে ছয় বছরের ছোট। এই বয়সের ব্যবধানে শাম্ভবীর মনের কি প্রকারান্তর ঘটা সম্ভব তা রামনারায়ণ যথার্থ ভাবেই অনুধাবন করেছেন। মধ্যযৌবনে উপনীত শাম্ভবীর চোখে তখনো ভোগের স্বপ্ন লেগে আছে। কিন্তু এতবড় সুখবরটায় তার বি(াস হয়না। মাকে সাবধান করে দিয়ে সে বলে —

"বল্লাল বলে, কুলীন বামনের মেয়ের কপালে বেনাই। তা দেখিস্, সাবধান, সাবধান। ব্রাহ্মনী। বাছা, এখন কি বল্লাল আছে! সে যে অনেক দিন মরেচে। শাম্ভবী। সে বলে কি হবে মা! তাচ্চেয়ে তার চেলা বড়, তারা মেলা বেড়াচ্চে' দেখিস।" কিন্তু তারপরেও যখন সে শুনলো, পিতা তাকে কুলর(া করেই বিয়ে দিচ্ছে, তখন সে নির্লজ্জের মতো জননীকে জিজ্ঞাসা করেছে — "ও মা, তুই কি কুলর(া কর্ব্বি,

তবে জাতি র(া কে কর্ব্বে মা।' জাহ্নবী যে আশঙ্কার কথা আর মনে স্থান দেয়নি, শান্তবীর মনে এখনো সেই অশঙ্কার কথা জেগে আছে। কুল র(িত না হলেও কুলের বেড়া ভেঙে একদিন সে জাতর(া করবে। জননী এ কথার উত্তর দিতে পারে না — কন্যার কাছে (মা প্রার্থনা করে নীরব হয়ে যায়। শান্তবী তার দিদিকে দেখে কোনোদিন মনে করতে পারেনি যে, তার বিয়ে হবে বা তার দিদি জাহ্নবীর বিয়ে হবে। কিন্তু রক্ত(-মাংসের লালসা তার দেহে-মনে জেগেই আছে। সেই জন্যই কুলর(া অপে(া জাতির(ার কথা তার মনে হয়। বিবাহ একেবারে না হউক, তা তার কাম্য নয়। তাই যখন হচ্ছে, তখন "আচ্ছা হউক, দেখা যাউক(এ কথাই সে বলে। এর বেশী তার আর কোনো প্রতিক্রি(য়া দেখা যায় না।

নতুন যৌবনপ্রাপ্ত কুলপালকের তৃতীয় কন্যা কামিনী বিয়ের কথায় চঞ্চল ও উচ্ছসিত হয়ে ওঠে। বলে- "শুনিয়া এ' শুভকথা হয়েছি চঞ্চল।" ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য কামিনীর এ সময়ের মানসিক অবস্থাকে চমৎকার ভাবে বি(-ষণ করে বলেছেন — 'যে বয়সে মুখের কথা হয় কাব্য, পথ চলা হয় নৃত্য, কামিনীর এখন সেই বয়স। সংসারের কোনো আঘাতই তাহার গায়ে লাগে না, সেই জন্য আপনা হইতেই তাহার মুখ দিয়া কবিতা বাহির হইয়া আসিল। দেহের মধ্যে তাহার সদ্য যৌবনের বিকাশ হইলেও, অন্তরে সে এখনও শিশু। তাই বর সম্পর্কে তার বিচিত্র কৌতুহল। বরের বয়স কতো, কোথায় বাড়ি, দেখতে কেমন ইত্যাদি খবর সে নানাভাবে সংগ্রহ করে। কিন্তু তারও মনে হয়, পাছে এ বিয়ের প্রস্তাবও পূর্ববর্তী প্রস্তাবগুলির মতো মিথ্যা আ(াসে পরিণত হয়। কামিনী। না মা, তোর কথায় আর বি(াস নেই, তুই এমন করে আমায় কতবার ভুলিয়েছিস।

ওমা আর ভুলাইলে কি হবে তা বল।

কাপড় ঢাকাতে কোথা থাকে গো অনল..

সহিতে না পারি আর কর গো উপায়।

কতকাল ভুলাইয়া রাখিবি আমায়।।

ব্রাহ্মণী   না মা, এবার মিছা নয়, সত্যি গো সত্যি।

কামিনী। ও মা? সত্যি যদি তবে বর কি এসেছে? বাসা দিছিস কোথায়

মা? চুপি চুপি দেখতে গেলে হয় না, (তি কি মা?

শেষপর্যন্ত কনিষ্ঠা কিশোরীকে সঙ্গে নিয়ে সে বর দেখতে গেল। বরের সম্পর্কে যে স্বপ্ন তার মনে জেগে উঠেছিল, রূঢ় বাস্তবের আঘাতে তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। বরের মূর্ত্তি দেখে সে বারবার শিহরিত হয়ে উঠতে লাগল। তার কোমল হৃদয়ের উপর বাস্তবের এই রূঢ় আঘাতে দর্শকেরাও বুঝি শিহারিত হল। লেখক ও পাঠকের সমবেত সহানুভূতিতে সুন্দ্র চরিত্রসৃষ্টির নজির হয়ে রইল কামিনী।

কুলপালকের সর্বকনিষ্ঠা কন্যা কিশোরী। বয়স তার আট বছর। এই কন্যাটির চরিত্র অপর তিন বোনের তুলনায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জ্যেষ্ঠ জাহ্নবী বিবাহিত জীবন সম্পর্কে বিগতস্পৃহ, শান্তবীর চোখে বিবাহ 'আশা মরীচিকার জাল' বিস্তারকারী, কামিনীর বিবাহ সম্পর্কে কোনো পূর্ব-সংস্কার নাই, আছে অদম্য কৌতুহল। কিন্তু কিশোরী বিবাহ সম্পর্কে সেই সামান্য কৌতুহলটুকুও বর্জিত। সকালে ঘুম থেকে উঠে সে পাড়ার সঙ্গিনীদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা খেলে বেড়াতো। বিয়ের খবর জানতে মা ও বোনেরা যখন ডাকাডাকি শু(করলো, তখন সে মার কাছে শুনলো— 'আজ আমাদের বাড়ীতে এক শুভকর্ম্ম হবে।' কিশোরী কিছুই জানেনা। তাই শুভকর্ম্মটি কি সে জানতে চাইল। ব্রাহ্মণী জানালো — 'আজি তোদের 'বে' হবে।' ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজে বাল্যবিবাহ ছিল আর এক ব্যাধি। রামনারায়ণ এই চরিটির মধ্যদিয়ে সেই সামাজিক ব্যাধিটিকেও নাট্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত(করেছেন। এক সরল শিশুকন্যার ওপর সামাজিক প্রথার যে নিষ্ঠুর নির্মম

নিয়তির নাটকীয় বৈপরীত্য সৃজন রামনারাণের অসাধারণ শক্তি(সত্তার পরিচয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিশোরী মাকে জিজ্ঞাসা করেছে 'বে' কারে বলে মা।' এই নাটক রচনার বহুকাল পরে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে কপালকুন্ডলার মুখে এমনই এক প্র(' বি-বা-হ' উচ্চারণ করিয়ে ছিলেন। কিন্তু এ নাটকে কিশোরীর প্র(ের উত্তরে মা তাকে বুঝিয়ে বলেছে, 'বে কাকে বলে জানিসনে বাছা! প্রধান সংস্কার।' এ উত্তরে কি কিশোরীর কিছু বোঝার উপায় ছিল। বিবাহ ব্যাপারটাযে নিজের থেকে না বোঝে তাকে কি এমন ভাবে কিছু বোঝানো যায়? কিশোরীও কিছুই বুঝলো না। বুঝলে না বলেই আবার প্র(করলো—'ও মা! তাকি আমি খাব।' কিশোরী তার শিশু প্রকৃতিতে বিয়েকে খাদ্যবস্তু ভেবেছে যথার্থভাবেই। মা আবার তাকে বুঝিয়ে বলেছে বিবাহ খাদ্যবস্তু নয়। আজ তার বড়দি, মেজদি ও ছোড়দিরও বিয়ে হবে একই সঙ্গে । কিশোরীর আবার প্র(— 'ওমা! তবে তোর হবে না? পরিবারের সব মেয়ের যদি বিয়ে হয়, তবে তার মারও বিয়ে একসঙ্গে কেন হবে না তা কিশোরীর কাছে বোধ্য নয়। কৌলীন্যের নামে এই যে সরলপ্রাণ শিশুকন্যাটির বলিদানকে এমন দৃশ্যগ্রাহ্য করে তোলার মধ্যদিয়েই রামনারায়ণ তাঁর নাট্যশক্তি(র পরিচয় ইতিহাসে অ(য় করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। এক কানা খোঁড়া ষাট বছরের বৃদ্ধের সঙ্গে এই শিশুকন্যার বিবাহ-বন্ধনের সমাজ প্রচলতা, অত্যন্ত হৃদয়হীন ব্যক্তি(র প(ও কল্পনা করা অসম্ভব। অথচ এই-ই ছিল সেদিনের বাস্তবতা। রামনারায়ণের শিল্পী হিসেবে সমস্ত সহানুভূতিই সেদিন কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল এই হতভাগ্য কন্যা-চরিত্রগুলির ওপর।

ফুলকুমারী চরিত্র রামনারায়ণের আর একটি শক্তি(শালী সৃষ্টি। কৌলীন্যপ্রথার বহুমাত্রিক বিষত্রি(য়াকে দেখানোর যে উদ্দেশ্য নিয়ে নাট্যকার এ নাটকটি সৃষ্টি করেছিলেন, এ চরিত্রটি তার অন্যতম ফসল। কুলীন কন্যার বিবাহ হওয়া নিয়ে যে সমস্যা সমাজে ছিল, সে-সমস্যা কুলপালকের চারকন্যার কাহিনীর মধ্য দিয়ে আমরা ল(করেছি। কিন্তু বিবাহিত কন্যার জীবনও যে কৌলীন্য প্রথার নিষ্ঠুরতায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছিল, তা এই ফুলকুমারী চরিত্রটির মধ্যদিয়ে প্রত্য(হয়ে উঠেছে। ফুলকুমারী চরিত্রটি আঁকতে গিয়ে নাট্যকার কেবল কৌতুক ও কৌতূহল দিয়েই তাকে আঁকেননি, তার বঞ্চিত জীবনের হাহাকারকে তিনি উপলব্ধি করেছেন ও দর্শকদের উপলব্ধি করাতে পেরেছেন, তাতেই তাঁর সার্থকতা।

স্বামীসঙ্গ বঞ্চিত ফুলকুমারীর জীবনে একদিন এলো, যে-দিন স্বামী তার কাছে এসে উপস্থিত হল। খবর শুনে ফুলকুমারী নিজেকে ব্যক্ত(করেছে — "সে কথা শুনিয়া ভাসি সুখের সাগরে, পথ না দেখিতে পাই আনন্দের ভরে।" ফুলকুমারীর বয়সের প(দীর্ঘদিন স্বামীসঙ্গ বঞ্চিতা নারীর এমন আনন্দে উচ্ছ্বাসে ভরে ওঠাটাই স্বাভাবিক। বঞ্চনার কথা ভুলে এই মুহূর্তে কুলীনকন্যা (ণিকের অতিথি স্বামীকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হল। আসন্ন রাতটিকে ঘিরে তার কতো সাধ, কতো স্বপ্ন-কল্পনা। অন্যদিকে —

শশব্যস্ত হল সবে জামাই দেখিয়া।
বাহিরে বসিতে দিল গালিচা পাতিয়া।।
ধনুর্ভঙ্গ পণে কহে সবা বিদ্যমানে!
ব্যাভার পাইলে তবে পা ধোব এখানে।।
শুনিয়া জননী মোর বড়ই দুঃখিনী।
খাড়ু বাঁধা দিয়া কিছু আনিল আপনি।।

জামাই পা ধুলেন বটে, কিন্তু ব্যাভার মনের মতো হল না। তাই 'ইহা খায় উহা ফেলে নবাবি করিয়া'। রাতে শোয়ার ঘরে গিয়ে জামাই স্ত্রীকে বলে —

শীঘ্র করি অর্থ মোর হাতে দেও আনি।

নতুবা অনর্থ হবে বুঝ অনুমানি।।

ফুলকুমারী কাট্‌না কাটা কড়ি থেকে শু(করে, নিজের সঞ্চিত যা-কিছু ছিল, সবই স্বামীকে দিল। কিন্তু এই অল্প অর্থে-স্বামী সন্তুষ্ট হল না। সে (শ্বশুরের টোলে গিয়ে, দরমা পেতে রাত্রিযাপন করে সকালে চলে গেল। কান্নায় ফেটে পড়ল ফুলকুমারী —

মম সম অভাগিনী আছে কোনো্ দেশে।

হাতে দিয়ে নিধি বিধি হরে নিল শেষে।।

কুলপালকের গৃহে চার কন্যার যখন বিয়ের আয়োজন চলছে, তখন এই ফুলকুমারী চরিত্রের অবতারণা করে নাট্যকার অবিবাহিত কুলীন কন্যাদের সমস্যার সঙ্গেই বিবাহোত্তর কুলীন নারীর সমস্যাকে যুত্ত(করে সমাজে কৌলীন্যপ্রথার সমস্যাকে তার বহুব্যাপ্ত চেহারায় আমাদের কাছে ধরে দিয়েছেন। উত্তরকালের বাংলা সাহিত্যে এই চরিত্রটির প্রভাব সম্পর্কে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় মন্তব্য করেছিলেন—"ফুলকুমারীর চরিত্রটিই বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের শ্যামা-চরিত্রের ভিত্তি।"

একটি **জননী** ও একটি **শিশুচরিত্র** এই নাটকে আছে যা সমালোচকের কথায় 'বিশেষভাবে ল(করিবার যোগ্য।' এ দুটিতে কৌতুকধর্মিতা, মতপ্রচারের উদ্দেশ্য বা প্রহসন রচনার কোনো ল(ণই নেই। জননী ও শিশুর চিরন্তন বাৎসল্যই এখানে ফুটে উঠেছে। শিশুটির পিতা একান্তই আত্মপরায়ণ, দ(িণালোভী উদরপরায়ণ। এর বিপরীতে জননী সুমতির চরিত্রটি হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল। কুলপালকের মেয়েদের বিয়েতে উদরপরায়ণের নিমন্ত্রণ হয়েছে শুনে শিশুটি পিতার সঙ্গে নিমন্ত্রণ খেতে যাওয়ার বায়না ধরেছে। জননী সুমতি স্বামীর কাছে অনুরোধ করছে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু উদরপরায়ণ একান্ত আত্মসুখপরায়ণ। শিশু পুত্রের জন্য তার কোনো কর্তব্যবোধ কাজ করে না। তাই সে পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায় না। বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও সে আপত্তি জানিয়েছে পুত্রকে নিয়ে যেতে। তখন তার স্ত্রী সুমতি শেষ অস্ত্রটি প্রয়োগ করে শিশুকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছে — 'ভাল মন্দ সামগ্রী খেতে পায় না, নে যাও, খেয়ে আসবে।' কিন্তু এতেও উদরপরায়ণের মন টলেনি। শিশুটিকে চপেটাঘাত করে সে চলে গেছে ফলার খেতে। এখানে শিশু চরিত্রটি যেমন সজীব, জননী চরিত্রটিও তাই। হয়তো অপরিসর অসম্পূর্ণ এই চরিত্র দুটি। কিন্তু শিশু চরিত্র হিসেবে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের আগে রামনারায়ণেই তার সূচনা বলে একটি অতিরিত্ত(গু(ত্ব এই দুই চরিত্র চিত্রণে নাট্যকারের প্রাপ্য।

কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটকের সমস্যা যে কোনো ব্যত্তি(বিশেষের সমস্যা নয়, সমগ্র সমাজের সমস্যা, নাট্যকার সেই বোধকে ফুটিয়ে তুলতে অপরিসরে হলেও বহু চরিত্রের আমদানি করেছেন। এরকম একটি চরিত্র **যশোদা**। কুলপালকের চার কন্যাকে এক ষাট বছরের কানা খোঁড়া বরের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা ছিল আরও কঠিন। এরচেয়ে অতিবৃদ্ধ বরে, এবং আরও অধিক সংখ্যক মেয়েকেও তখন একই সঙ্গে সম্প্রদান করা হতো। যশোদা এবং তার অন্য দুবোনকে যে বরের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তার বয়সের সমান পাহাড় পর্বতও কম। যশোদা বলেছে —

ভগিনী আমার ছয় আমারে নে সাত হয়

সবার বিবাহ একদিনে।....

পাইয়া সুযোগ্য ঘর বলি মোরা সেই বর

অতঃপর সে পায় পঞ্চত্ব।

তখনি বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হই সপ্তস্বসা

কিবা কব কুলের মহত্ত্ব।।

সুলোচনা চরিত্রটির মধ্যদিয়ে কুলপালকের কনিষ্ঠা কন্যা কিশোরীর বিবাহ নিয়ে যে সমস্যাটিকে তুলে ধরা হয়েছে, তার বিপরীত আর এক সমস্যাকে তুলে ধরেছেন রামনারায়ণ। সুলোচনা কুলপালকের মেয়েদের বুড়ো বরের কথা শুনে আশ্চর্য বোধ করেনি। সে বলেছে, 'বুড়ো বর? এতো ভাল, মন্দ কি?' কিন্তু পর(ণেই বোঝা যায় সুলোচনা কেন এমন বুড়ো বরকেও ভাল বলছে —

কি জানিবে ওলো ধনি   এ বর মাথায় মণি

মোর পতি দেখে বুক ফাটে,

বয়স খাতালে পর   নাতি ভেবে এ সে জ্বর

কোল শোভা হয়ে রাত কাটে।

কিন্তু চিরবিরহিনী চন্দ্রমুখীর মনে হয়, স্বামী কোনোদিন না আসার চেয়ে, নাতির বয়সী স্বামী থাকাও ভালো, কেন না সে তো বড়ো হয়ে একদিন স্বামীর দায়িত্ব পালন করতে স(ম হবে।

৩.১.২.২ : নারী : সমাজ নিগড়ের বিপরীত অভিমুখে

সমাজ সেদিন নানা কঠিন নিগড়ে নারীর জীবনকে বন্দী করতে চাইলেও জীবনের ধর্ম সে নিগড়কে ছিন্ন করে নিজের গতিতে এগিয়ে চলার চেষ্টা করবে — তাকে থামিয়ে রাখা ছিল অসম্ভব। সমাজের বাস্তবেও তাই ঘটেছে। **যশোদার** সাত বোনের এক দিনে বিধবা হওয়া কথা আমরা আগেই বলেছি। এই বিধবাদের কোনো শুভানুষ্ঠানে যোগ দেওয়া বারণ ছিল। সে-কারণে মর্মান্তিক যন্ত্রণা নিয়ে তাদের দিন কাটতো। কিন্তু **রসিকার** মতো বিধবারা বেছে নিত অন্য পথ —

নবীন যুবতী আমি   মরেছে আমার স্বামী

তবু কভু দুঃখ নাহি জানি।....

তৃষিত পথিকগণ   এসে করে আকিঞ্চন

যদি পায় মোর ঘরে বাসা।

নাহি যায় অন্যস্থান   করে সবে অবস্থান

এমন আমার ভালবাসা।

কুলপালকের মেয়েদের বিয়ের দিনে, সখিদের কাছে নিজের দুঃসহ বেদনার বর্ণনা দিতে গিয়ে **যমুনা** বলেছে —

বাপের প্রদান ঘর   নাহি মিলে যোগ্যবর

কুলের বড়ই আঁটাআঁটি।

মনে সদা এই চাই   বাহির হইয়া যাই

পড়ে কুলে কালি পরিপাটি।।

আইবুড়ো থেকে মোর   বয়স হইল ভোর

নুড়ো দিই মুখে বল্লালের।।

হেমলতাও বলেছে —

যৌবন দুঃসহ ভার সহিতে না পারি আর
শরীরে কত জ্বালা সয়।
বয়স্ হইল বিশ ইচ্ছা হয় খাই বিষ
মনে মনে কত রীষ হয়।।...
মনেতে ভেবেছি সার সুধিব বল্লালি ধার
কুলে জলাঞ্জলি দিয়া পরে।।

সমাজের নিয়ম-নিগড়কে ছিন্নকরার আরও দু-একটি নারী চরিত্র এ নাটকে রামনারায়ণ অঙ্কন করেছেন। যেমন বহুদিন পূর্বে **মহিলা** নামের এক নারীর বিবাহ হয়ে থাকলেও, স্বামীকে তিনি একদিনের জন্যও কাছে পাননি। তাই তাঁর প্রশ্ন — 'সেত আমার নয়ন পথে কখন পতিত হল না, তাহা দ্বারা দুঃসহ যৌবন যাতনা হইতেও নিস্তার পেলেম না, তবে সে কি পতি?' শেষপর্যন্ত মহিলা তার নিজের পথ নিজে বেছে নেয় —'ভাবনা করি? কত লোক আছে.....এমন সুখের সময় কেন দুঃখে কাটাবো?' **মাধবীরও** একই দশা—

দুরন্ত বসন্ত কাল   এ যে যুবতীর কাল
কাল পেয়ে কি কাল ঘটায়।
পতির বিচ্ছেদ-বাণ   কত আর সহে প্রাণ
বুলি ত্রাণ নাহি ইথে পায়।

অবশেষে মহিলার পথেই মাধবীর ত্রাণ ঘটে। কিন্তু এসব চরিত্রকে ঠিক চরিত্রের পূর্ণ আয়তনে আমরা পাইনা। এরা সবাই মিলে যেন এক বহু বর্ণময় চরিত্রের রামধনু।

৩.১.২.৩ : আর্দশ প্রশ্নোবলী

১। 'কুলীনকুলসর্বস্বে'র পুরুষ চরিত্রগুলি লেখকের সহানুভূতি বঞ্চিত হয়ে সৃষ্টি হিসেবে ব্যর্থ হয়েছে—আলোচনা করো।

২। 'কুলীনকুলসর্বস্বে'র নারী চরিত্রগুলির তুলনামূলক সার্থকতার কারণ নির্দেশ করে কয়েকটি নারী চরিত্রের পরিচয় দাও।

৩। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকে এমন কয়েকজন নারীর পরিচয় পাওয়া যায়, সেদিনের সমাজ-নিগড়ের বিপরীত অভিমুখে যাত্রা করেছিল। এদের পরিচয় দাও।

৪। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকে চরিত্রদের নামকরণে কোনো বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে কি? এই সব নামকরণ নাটকটির পক্ষে কতখানি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে তা বুঝিয়ে দাও।

৫। কুলপালক পিতাদের দুরবস্থার বর্ণনা দিয়ে সামাজিক নাটক রূপে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' কতটা সার্থক—তা বিচার করো।

৬। নারী চরিত্রগুলি উপস্থাপনায় রামনারায়ণ তর্করত্ন যে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা তাঁর 'কুলীন কুলসবস্ব'—নাটকের প্রেক্ষিতে আলোচনা করো।

———

পর্যায়গ্রন্থ - ১

একক - ৩

কুলীনকুল সর্বস্বে সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রভাব

বিন্যাস ত্র(ম :

৩.১.৩.১ কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক-না-প্রহসন

৩.১.৩.২ কুলীনকুলসর্বস্বে সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রভাব

৩.১.৩.৩ আদর্শ প্র(াবলী

৩.১.৩.১ : কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক না প্রহসন

নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন নিজের রচনার নাম দিয়েছিলেন 'কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক'। কিন্তু সমসাময়িক কালের পত্রিকা — হিন্দু প্রেট্রিয়ট (১৯ই মার্চ, ১৮৭৫ খ্রিঃ) কুলীনকুলসর্বস্বকে প্রহসন বলেই উল্লেখ করেছে — "Friday, The 13th March....The EDUCATIONAL GAZETTE States that the Well-Known farce of koalino Kooloshorbushya was acled in the private residence of a Baboo in Calcutta with great success." পরে আমরা দেখেছি, ড. সুশীলকুমার দেও 'কুলীনকুলসর্বস্ব'কে (১৮-৫৪) সমসাময়িক বাঙলার সমাজজীবনের বাস্তবতা নিয়ে রচিত প্রথম প্রহসন বলে মনে করেছেন। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়' (পৃ.২৬) ড. দে লিখেছেন, "এই নাটকটি.....তৎকালীন সমাজ বিশেষের চিত্র স্বরূপ......বাঙ্গালা ভাষায় সামাজিক বিষয় লইয়া এই প্রথম নাটক রচনার চেষ্টা, ইহা ঠিক নাটক না হইলেও সামাজিক রঙ্গচিত্র হিসাবে সুন্দর হইয়াছে।" ফলে নাট্যকার 'নাটক' হিসেবে 'কুলীনকুলসর্বস্ব'কে চিহি(ত করলেও, সেই সাময়িক পত্রের যুগ থেকে শু(করে একালের কোনো কোনো সমালোচক পর্যন্ত তার নাটকীয়তাকে স্বীকার করেননি। ফলে, আমাদের সামনে প্র(টি গু(ত্বের সঙ্গে এসে দাঁড়ায়।

প্রহসনের মুখ্য উদ্দেশ্য দর্শকদের জন্য সরল অনাবিল ও আন্তরিক হাস্যকৌতুক পরিবেশন করা। এরকম হাস্যকৌতুকময় দৃশ্য আমরা মধ্যযুগে ইংরেজী miracle play মধ্যে দেখেছি, শেক্সপীয়রের The Taming of the shrew, The comedy of Errors. সোমারসেট মম-এর Home and Beauty কিংবা বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের 'কল্কি অবতার', জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ জলযোগ ও অলীকবাবু এবং রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুন্ঠের খাতা' ও শেষর(ায় পাই। এই ধরনের রচনা ইংরেজীতে Farce, ইতালীয়তে Farse, ল্যাটিনে Farcita নামে পরিচিত। ইংরেজী ভাষায় ব্যবহৃত শব্দটির সমার্থক পরিভাষা হিসেবে বাংলা ভাষায় আমরা প্রহসন শব্দটি ব্যবহার করি। 'অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্য তত্ত্ব' গ্রন্থে সাধনকুমার ভট্টাচার্য জীবনের অতিলঘুরূপ বা comic aspect of life -এর পর্যালোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'জীবনের রূপকে মোটামুটিভাবে....তিনটি বৃত্তের দ্বারা সীমায়িত করে দেখা যেতে পারে। প্রথম বৃত্তে — জীবনের ট্র্যাজেডির রূপ, দ্বিতীয় বৃত্তে জীবনের ট্র্যাজিক— কমেডি-এর সিরিয়াস কমেডি রূপ(তৃতীয় বৃত্তে — জীবনের কমিক বা হাস্যোদ্দীপক রূপ। "ফার্স বা প্রহসন হচ্ছে জীবনের এই তৃতীয় বৃত্তেরই নাট্যরূপায়ন। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে — "a form of comedy in dramatic art, the object of which is to excite laughter by ridiculous situations and incidents." A. Nicall তাঁর Dramatic Theory -তে এর পরিচয় দিয়েছেন— This

situation....is of the most exaggerated and impassible kind, depending upon the coarsest and rudest of imprabable incongruities.”

প্রহসন নাট্যশিল্পের কমেডির পর্যায়ভুক্ত(। সার্থক কমেডি বা শ্রেষ্ঠ নাট্যশিল্পের জগতে এর প্রবেশাধিকার নেই। ট্র্যাজেডি বা কমেডিতে মানুষ্যজীবনের যে গভীরতর সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়, প্রহসনে তা প্রত্যাশিত নয়। অবশ্য জীবনসত্যের রূপায়ন (মতা ট্র্যাজেডিতে ও কমেডিতে সমান নয়। কমেডি ট্র্যাজেডির তুলনায় নিম্নস্তরের রচনা। অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডি সম্পর্কে বলেছেন — “is an imitation of action that is serious, complete and of certain magnilude.” কমেডি সম্পর্কে তিনি বলেছেন “an imitation of characters of a lower type.” যা স্থূল, অসঙ্গত ও পারমার্থ বঞ্চিত, প্রহসনের কারবার তাকেই নিয়ে। এসব নিয়ে একটি হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দর্শকদের আনন্দ দেওয়াই প্রহসনের উদ্দেশ্য। কিন্তু অনেক(েত্রে এই আনন্দদানের উদ্দেশ্যের পেছনে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যও থাকে। সে উদ্দেশ্য সমাজ বা ব্যক্তি(জীবনের কোনো অন্যায়-অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গ করার ল(্য। তবে প্রহসনে ব্যঙ্গ যতই তীব্র হোক না কেন, এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে একটা লঘু ও কৌতুকময় আবহ। সাধারণত প্রহসনের পরিসর খুব ছোট হয়। এই সং(িপ্ততাই ট্র্যাজেডি বা কমেডির আঙ্গিকের দিক থেকে প্রহসনকে পৃথক করে। সং(িপ্ত পরিসরের মধ্যে প্রহসন সমাজের কোনো অন্যায় ও অসঙ্গতির উপরে লঘু বিদ্রুপ বর্ষণ করে। এই কারণেই প্রহসনের মধ্যে সূক্ষ্ম চরিত্র সৃষ্টির সুযোগ পাওয়া যায় না। এর প¬টের মধ্যেও জটিলতা বা বিস্তৃতি থাকে না। এজন্যই প্রহসন উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের স্তরে পৌঁছোতে পারে না।

প্রহসনের এই সব বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণে রেখে আমরা যখন ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’- কে বিচার করতে যাই, তখন প্রহসনের বহু ল(ণই এর মধ্যে দেখতে পাই। কুলীনকুলসর্বস্বের বিষয়বস্তু হল কৌলীন্য প্রথার দোষ ও অসঙ্গতিকে হাস্যরসাত্মক দৃশ্যাবলীর মধ্যদিয়ে দেখিয়ে এর নিন্দা করা হয়েছে। লেখক বিজ্ঞাপনে বলেছেন — “পুরাকালে বল্লাল ভূপাল, আবহমান প্রচলিত জাতি মর্যাদা মধ্যে স্বকপোলকল্পিত কুলমর্যাদা প্রচার করিয়া যান, তৎপ্রথায় অধুনা বঙ্গস্থলী যেরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনো প্রস্তাব লিখিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী ছিলাম.....।” অতএব কৌলীন্য প্রথাকে বিদ্রুপ করার ল(নিয়ে যে এটি রচিত তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। এরকম সামাজিক বিষয় প্রহসনের বিষয়বস্তুরই উপযোগী। এ নাটকে মাত্র দুদিনের ঘটনায় বহু চরিত্র আমদানি করা হয়েছে। তাই এর পরিসরগত সং(িপ্ততাও প্রহসনের মতোই। এই স্বল্প পরিসরে প্রত্যেকটি চরিত্রের ত্রি(য়া পরিপূর্ণ আয়তনে বিকাশের সুযোগ পায়নি— যথোপযুক্ত(জটিলতাও তাদের নেই। কাহিনী গ্রন্থনায়ও কোনো জটিলতা নাই — যেমনটি হয়ে থাকে প্রহসনে। ‘কুলনীকুলসর্বস্ব’ নাটকের মূল কাহিনী কুলপালকের পরিবারকে কেন্দ্র করে। এই পরিবারের চরিত্রগুলি বিচিত্র ঘটনা ও ত্রি(য়ার মধ্যদিকে বিকশিত হয়ে ওঠেনি। এরা কেউই জীবনে বিচারভ্রান্তির জন্য কিংবা স্বকীয় কোনো চারিত্রিক দুর্বলতার কারণে দুঃখ ভোগ করেনি বলে জীবনের কোনো গূঢ় তাৎপর্যকে এরা প্রকাশ করতে পারেনি। এদের জীবনের যে দুঃখ-কষ্ট তা সমস্তটাই প্রতিবিধানহীন এক সামাজিক বিধানের কারণে ঘটেছে। এই পরিবারের বাইরের যেসব চরিত্র নাট্যকার চিত্রিত করেছেন, তারাও সবাই টাইপ চরিত্র। তারা সমাজের এক-একটা শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে টাইপ চরিত্রে পরিণত হয়েছে। আবার চরিত্রগুলির রূপায়ণে নাট্যকারের কৌতুক ও ব্যঙ্গও প্রকাশিত হয়েছে। সুস্থ ও স্বাভাবিক মূল্যবোধের চরিত্র প্রায় নেই বল্লেই চলে। দু' একজন যাওবা আছে, যেমন— শুভাচার্য, গ্রহাচার্য — এরাও সজীব চরিত্র হয়ে উঠতে পারেনি।

প্রহসনের ল(ণের সঙ্গে ‘কুলীনকুলসর্বস্বে’র এই সব বৈশিষ্ট্য যেমন মিলে যায়, তেমনি এ নাটকটি সর্বার্থে লঘু-রসাত্মকও হয়ে ওঠেনি। এইখানেই ‘কুলীনকুলসর্বস্বের’ বৈশিষ্ট্য নাটক-না-প্রহসন’ — এ নিয়ে বিচার বিভ্রাটের কারণ দেখাদিয়েছে।

আগেই আলোচিত হয়েছে, এ নাটকের নারী চরিত্রগুলি সং(িপ্ত পরিসরে উপস্থাপিত হয়েও

লেখকের সহানুভূতিকে ধন্য করেছে, তারা পু(ষ চরিত্রগুলির মতো বহিরঙ্গ ত্রি(য়ার মধ্যদিয়ে পরিস্ফুট টাইপ চরিত্র হয়ে ওঠেনি। তারা সামাজিক অন্যায় ও অবিচারে জর্জরিত হয়েছে, অতৃপ্ত হৃদয় কামনায় (তবি(ত হয়েছে। তারাও হয়তো কখনো রঙ্গরসিকতায়, কখনো খেদে ও বিলাপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবুও তারা প্রহসনের চরিত্রের মতো হাস্যকৌতুক সর্বস্ব নয়। বাংলা নাটকের ঐতিহাসিক ড. অজিতকুমার ঘোষ যথার্থই বলেছেন — "তাহারা হাস্যকৌতুকের রঙীন ফেনা তুলিয়া মুহূর্তের মধ্যে শেষ হইয়া যায় না, তাহারা আমাদের চিত্ততলে ভাবনা ও বেদনার গভীর স্থায়ী স্থানলাভ করে।" এ ল(ণ প্রহসনের ল(ণ নয় — উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যসৃষ্টির ল(ণযুক্ত(।

ড. অজিতকুমার ঘোষ এই প্র(াটির মীমাংসা করে লিখেছেন — কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক না প্রহসন? নিশ্চয়ই প্রহসন নহে। নাট্যকার ইহাকে নাটক বলিয়াছেন, শুধু তাহাই নহে, অন্তঃপ্রকৃতি এবং রসের স্থায়ী আবেদনের দিক দিয়া বিচার করিয়া ইহাকে গম্ভীর ও ক(ণ রসাশ্রয়ী নাটকই বলিতে হয়। এ কথা সত্য অনৃতাচার্য, অধর্ম(চি, বিবাহবণিক উদরপরায়ণ প্রভৃতি টাইপ চরিত্রের মিথ্যাচার, ভ্রষ্টতা, লোভ, বিকৃতি ইত্যাদি আমাদের ঘৃণামিশ্রিত কৌতুক উদ্রেক করে। কিন্তু ইহাদের, আপাত কৌতুকজনকতার তলদেশে ইহাদের স্বভাব ও আচরণের যে ঘৃণ্যতা বিদ্যমান তাহা আমাদের স্থায়ী ধিক্কারবোধ জাগ্রত করে। স্ত্রীচরিত্রগুলির সরস আলাপ ও রঙ্গরসিকতা আমাদের আপাত আনন্দ দেয়। কিন্তু সেই আনন্দের তরঙ্গাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে গভীর বেদনা ও সহানুভূতির পলিমাটি আমাদের চিত্তে সঞ্চিত হইতে থাকে। সুতরাং এ নাটকের বাহ্য তরল হাস্যধারার একটি কৃত্রিম আবরণের তলায় (োভ ও বেদনার ঘনীভূত প্রবাহ বিদ্যমান। সে জন্য আমাদের (ণকালীন হাসির আলো মুহূর্ত মধ্যে সমস্যার গু(মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। এ নাটককে হাস্যরসাত্মক নাটক কিংবা প্রহসন বলা চরম ভ্রান্তি মাত্র।"

৩.১.৩.২ : কুলীনকুলসর্বস্বে সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রভাব

সংস্কৃত-বিদ্যায় পারঙ্গম নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন তাঁর 'কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক' রচনায় সংস্কৃত নাটকের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ উভয় বৈশিষ্ট্যের প্রভাবকেই গ্রহণ করেছেন। বি(-ষণের মুখে আমরা এই প্রভাবকে স্বীকার করার স্বরূপটি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারি।

বহিরঙ্গ গঠনরীতির দিক থেকে কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকটি সংস্কৃত নাটকেরই মতো ছয়টি অঙ্কে সমাপ্ত। নাটকটির আরম্ভে নান্দী ও প্রস্তাবনা এবং শেষ অংশে ভরতবাক্য সংযুক্ত(হয়েছে। সংস্কৃত নাটকের নান্দীর দেববন্দনার মতো 'শিশু শশী শোভে ভালে বপু বিভূষিত কালে' শীর্ষক শিববন্দনাটি যুক্ত(আছে। সংস্কৃত নাটকের 'নান্দ্যন্তে সূত্রধার'-এর রীতি মেনে এ নাটকেও সূত্রধার প্রবেশ করেছে। সূত্রধারকে নটীর সম্বোধনও সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুসারী। নটী সূত্রধারকে সম্বোধন করে বলেছে — 'আর্যপুত্র! এই আমি আসিলাম, আজ্ঞা ক(ণ, কি করিব।' সূত্রধার নটীকে নির্দেশ দিয়েছে — '..... সজ্জন-সমাজে সঙ্গীত আরম্ভ কর।' সূত্রধার নটীর গান শুনে বলেছে—"প্রিয়ে! সাধু সাধু, উত্তম সঙ্গীত করিয়াছ, তোমার কণ্ঠনির্গলিত, রাগরাগিনীসঙ্কলিত, রসভাবপূর্ণ মধুর সঙ্গীতশ্রবণে সমস্ত সামাজিক লোক একতানান্তঃকরণে চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় হইয়া রহিয়াছেন, ইহারা প্রথমতঃ তোমার লোকাতীত রূপলাবণ্য নিরী(ণেই মুগ্ধপ্রায় ছিলেন, এ(ণে তোমার অসামান্য সঙ্গীতনৈপুণ্যে যে কি পর্যন্ত আ(াদিত হইয়াছেন, তাহা বাক্‌পথাতীত।" এখানে 'বাক্‌পথাতীত'-এর প্রভাব ল(করার মতো, যা লেখক নিজেই শব্দটির উল্লেখ করেছেন। সূত্রধারের উক্তি(তে রাজা, রাজ্য ও কবির নাম উল্লেখ করা সংস্কৃত নাটকের রীতি। এ নাটকেও সেই একই রীতির মান্যতা আমরা ল(করবো। সূত্রধার রাজার উল্লেখের মতোই এ নাটকের পোষ্টা জমিদার ও নাট্যকারের নাম উল্লেখ করে বলেছে—"...সম্প্রতি রঙ্গপুরান্তর্গত কুন্ডী-নগরনিবাসী যশোরাশী শ্রীল শ্রীযুক্ত(কালীচন্দ্র চতুর্ধুরীণ মহোদয়ের মতানুসারে শ্রীযুক্ত(

রামনারায়ণ তর্করত্ন মধুর সাধু ভাষায় যে ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ নামক অপূর্ব নাটক রচনা করিয়াছেন। তৎপ্রস্তাব দ্বারা সমীহিত সিদ্ধ করিব।” সূত্রধারের উক্তি(তে নাট্যকারের কথামুখের তথা নাট্যবস্তুর উপস্থাপনা হয় সংস্কৃত নাটকে। এখানে অনুরূপ রীতি অনুসৃত হয়েছে। ‘বিবাহ নির্ব্বাহবিধি বিধির ঘটনা’—সূত্রধারের এই কথার সূত্রধরে কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছেন। এও সংস্কৃত নাট্যরীতির কথোদ্ঘাত প্রস্তাবনারই অনুসৃতি। নেপথ্য থেকে শু(হয়েছে কুলপালকের সংলাপ — ‘সাধু, ভরতপুত্র সাধু, প্রজাপতি নির্বন্ধ ব্যতীত কখন বিবাহ ব্যাপার সমাধা হয় না।’ আর মঞ্চে উপস্থিত হয়ে নিজের স্বগতোক্তি(শু(করেন,—“বিবাহ নির্বাহবিধি বিধির ঘটনা” সত্যকথা, যথার্থ, মিথ্যা নয়, সংগত বটে। আমি বন্দ্যঘটীয় কেশব চক্র(বর্তীর সন্তান, প্রধান কুলীন, আমার কন্যাদিগের বিবাহ হয় নাই, অদ্যাবধি বিধি তাহাদিগের প্রতি প্রতিকুল থাকায় সমযোগ্য পাত্র প্রাপ্ত হইতেছি না, তাহাতেই নিতান্ত চিন্তিত আছি। .... কন্যাভারগ্রস্ত হইয়া চিন্তা-নিমীলিত নয়নে বিনিদ্রাবস্থায় যামিনী যাপন করি। হায় কি ক্লেশ!” এই অংশের সঙ্গে ড. অজিতকুমার ঘোষ মনে করেন মুদ্রারা(সের আরম্ভের মিল আছে। এই নান্দীও প্রস্তাবনা অংশ সংস্কৃত নাটকের রীতি হওয়ায়, পাশ্চাত্য রীতির নাটকে যেমন নাট্যোৎকণ্ঠা আদ্যোপান্ত বজায় থাকে, সংস্কৃতে তেমন থাকেনা। কারণ বিষয়বস্তু আগেই দর্শকদের জানা হয়ে যায়। কুলীনকুলসর্বস্ব’ নাটকে দেখা যায় গদ্য এবং পদ্য দুই ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে। বিষয় অনুসারে ভাষারীতির স্বাতন্ত্র্যও ল(ণীয়। পদ্য বলতে তখনকার দিনে প্রচলিত পয়ার-ত্রিপদীর ব্যবহার ঘটেছে। এ (ে ত্রেও সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রয়োগ ঘটেছে। পদ্য সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে পরো(বিবৃতির (ে ত্রে। যেমন রসিকার মুখে কুলপালকের কন্যাদের বিয়ের বর্ণনা, ফুলকুমারীর আত্মকাহিনীর বর্ণনা, ফলারের বর্ণনা। পদ্য সংলাপের আরো ব্যবহার হয়েছে আত্মগত বেদনার উচ্ছ্বাসে, খেদ ও বিলাপে এবং প্রকৃতি বর্ণনায়। কামিনী কিংবা মাধবীর বসন্ত প্রভাবিত মানস প্রতিত্রি(য়া বর্ণনায়ও পদ্য সংলাপ। নারীদের পতিনিন্দা ও বিবাহ সভায় আগত বৃদ্ধ বরের বর্ণনায়ও সেই পদ্যরীতির ব্যবহার। এই যে বিষয় অনুসারে ভাষায় রীতিগত বৈচিত্র্য, তা সংস্কৃত নাট্যরীতির অনুসারী। নাট্যশাস্ত্রে অতিভাষা, আর্যভাষা, জাতিভাষা ও যোন্যন্তরী চার রকম ভাষায় কথা বলা হয়েছে। অতিভাষা দেবতাণের ভাষা, আর্যভাষা রাজগণের ভাষা, জাতিভাষা সাধারণ মানুষের এবং যোন্যন্তরী ভাষা মানবেতর প্রাণীর ভাষা। জাতিভাষা আবার দুরকম — সংস্কৃত ও প্রাকৃত। কিন্তু ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ নাটক যেহেতু বাংলা ভাষায় রচিত নাটক, তাই পাত্রপাত্রীর ভাষাকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় বিভক্ত(করার উপায় নেই। তাই নাট্যকার তাঁর মাত্রাজ্ঞান দিয়ে এই দুইভাষার ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্যকে এ নাটকে সঞ্চার করতে পরেছেন। সংস্কৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য সংস্কৃত শব্দবহুল, সমাসবদ্ধ পদযুক্ত(, চিত্রময় এবং সাধুত্রি(য়াযুক্ত(ভাষায় নির্মাণে ফুটিয়ে তুলেছেন। অন্যদিকে প্রাকৃত ভাষার বৈশিষ্ট্যকে আয়ও করেছেন তদ্ভব শব্দ সমাসহীন পদ ও চলিত ত্রি(য়াযুক্ত(ভাষা ব্যবহার করে। কুলপালক, শুভাচার্য ধর্মশীল প্রভৃতি শিষ্টজনেরা সংস্কৃতানুসারী ভাষায় কথা বলেছে, অন্যদিকে অধর্ম(চি, উদরপরায়ণ। বিবাহবণিক, অভব্যচন্দ্র প্রভৃতি অশিষ্ট জনেরা প্রাকৃতানুসারী ভাষায় কথা বলেছে। আবার ভরত যে ভাষাকে বিভাষা বলেছেনস ভৃত্য ভোলা সেই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেছে। ভাষা ব্যবহারের এই রীতি সংস্কৃত নাটকেরই মতো।

সংস্কৃত নাটকে সন্ধ্যা কি মধ্যাহ্ন(সময় বোঝানোর জন্য সংস্কৃত (ে-াকের ব্যবহার করা হতো। এ নাটকেও সেই একই রীতির ব্যবহার—

সূর্য্যের আতপে আর পৃথিবীর তাপে।
নাহিক ক্লেশের লেশ আছি মনস্তাপে।।
আবার — গগন হইতে রবি অনল সদৃশ ছবি
পড়িল পশ্চিম জলধিতে।

সংস্কৃত নাটকে একই মঞ্চে বিভিন্ন দৃশ্যের অবতারনা করা হতো, যা এ নাটকেও করা হয়েছে। যেমন চতুর্থ অঙ্কে ভোলা মঞ্চে প্রবেশ করে বলেছে 'এই মোর ঝীয়ের ঘর'। সেই একই দৃশ্যে 'তবে যাই' বলে সে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে বলে — "ঐ পু(ত ঠাকুরের বাড়ি দেক্‌কে পাচ্ছি, শালার বামুন কদ্দুরে ঘর বানিয়েচে?" একই মঞ্চে ভোলার বিচরণের মধ্যে বিভিন্ন স্থান কল্পনা, ঐ একই দৃশ্যে ধর্মশীল পুরোহিতের উক্তি(—"এই যে কুলপালকের বাড়ি চল প্রবিষ্ট হওয়া যাক।" এও সেই সংস্কৃত নাট্যপদ্ধতির ফল।

'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে পঞ্চাননের মুখে আমরা 'শরীর লোহিত বর্ণ স্থলিত গমন'। প্রভৃতি যে (্লেকটি পাই, কিংবা ঐ দৃশ্যে অভব্যচন্দ্রের মুখে যে (্লে-যাত্মক সংলাপ পাই তাও সংস্কৃত নাট্যরীতির অনুসারী। এরকম শিষ্ট পদের ব্যবহার সংস্কৃত নাটকের রীতি ছিল।

একথা হয়তো ঠিক যে, হাস্যরস সৃষ্টিতে এ নাটকে সর্বত্র সু(চির মুখ র(ি‌ত হয়নি। কিন্তু অ(্লীলতা কোথাও স্থান পায়নি। ষষ্ঠ অঙ্কে অভব্যচন্দ্রের মুখ দিয়ে যে হাস্যকোতুক সৃষ্টি করা হয়েছে, তার আদর্শ শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' নাটক। অভব্যচন্দ্র নিজের পুরাণ জ্ঞান জাহির করে বলেছে—

পুরাণে নবীন বিদ্যা হয়েছে আমার।
রাবণ উদ্ধরে কহে শুন সমাচার।।

ইতিহাসজ্ঞানও তার কম কিছু যায়না

শ্রীমন্ত করিয়া কোলে বেহুলা নাচনী।
রথের তলায় ওই দেখলো সজনী।।
পঞ্চানন বলে সত্যপীরের বারতা।
ব্যাধের রমনী আমি হবে মোর সতা।।

ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টিতে অবশ্য রামনারায়ণ সংস্কৃতানুসারী হতে পারেননি। কারণ বিখ্যাত কোনো কাহিনী নিয়ে তিনি নাটক রচনা করেননি। বিষয়বস্তু সবসময় এ নাটকে সংহত হয়নি, সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী বহু উপকাহিনী জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সংস্কৃত রীতি অনুসারে এ নাটকে নিন্দনীয় বিষয়ের প্রকাশ ঘটলেও এটি প্রহসন হয়ে ওঠেনি। কারণ প্রহসনে দুটি বা একটি অঙ্ক থাকে।

নাটকটির বিষয় অনুসারে চরিত্র নির্মিত হয়েছে বলে রাজবংশজাত চরিত্র নিয়ে এ নাটক রচনা সম্ভব হয়নি। কৌলীন্যপ্রথার কুফল দেখাতে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষকে নিয়ে এ নাটক রচিত হয়েছে। সংস্কৃত রূপকের প্রকরণশ্রেণীর সঙ্গে এ নাটকে মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

৩.১.৩.৩ : আর্দশ প্র(্নাবলী

১। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক না প্রহসন? আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

২। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকে সংস্কৃত নাট্যরীতির কিভাবে অনুসৃত হয়েছে আলোচনা করো।

৩। 'কুলীনকুলসর্বস্ব'-র নাট্য গঠনে নাট্যকারের কৃতিত্ব এবং ব্যর্থতা নিরূপণ করো।

৪। "'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকটিতে সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়।"—এই অভিমতটি দৃষ্টান্তসহ বিচার করো।

৫। সূচনাপর্বের প্রথম বাংলা মৌলিক নাটকরূপে 'কুলীনকুলসর্বস্ব'-এর সাফল্য ও ব্যর্থতাগুলি নিরূপণ করো।

————

পর্যায়গ্রন্থ - ১

একক - ৪

সংলাপ

বিন্যাসক্রম :

৩.১.৪.১ সংলাপ

৩.১.৪.২ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.১.৪.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩.১.৪.১ : সংলাপ

ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের সংলাপ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা উদ্ধার করছি —

প্রথমেই বলা ভাল, প্রস্তুতি পর্বের বাংলা নাটকে সংস্কৃত তৎসম শব্দের আধিক্য ছিল। তারাচরণ শিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ কিংবা মধুসূদন ইংরাজি জেনেও সংস্কৃত গন্ধী সংলাপ চরিত্রের মুখে বসিয়েছেন। তার উপর রামনারায়ণ সংস্কৃত পণ্ডিত এবং ইংরাজির সঙ্গে অপরিচিতও। কাজেই এই প্রথম পর্বের নাটকে যে যে বিষয়গুলি কুলীনকুলসর্বস্বর নাট্যসংলাপকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, সেগুলি হল—

ক. এই নাটকে কোনো 'Scene'-এর ব্যবহার নেই, আছে কেবল অঙ্ক বিভাগ।

খ. নাট্যকারের কথায় 'ইহা কেবল রহস্যজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে।'

গ. গল্পের মধ্যে নাট্যকার নানা হাস্যরসের প্রয়োগ করায় ট্র্যাজেডি ও হিউমারের সমন্বয়।

কুলীনকুলসর্বস্বের শুরুতে প্রথমে নন্দী। সূত্রধার এখানে প্রকাশ্য সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকারের পরিচিতি ছিল। তারপরই নটীর গান। এখানে সংলাপ ও সঙ্গীতের মেলবন্ধন ঘটেছে। সূত্রধার এবং নটীর কথাবার্তায় বিবাহ নিয়ে যে সমস্যা উঠে এসেছে তাই পরবর্তীস্তরে কুলপালক-পরিবারের বিবাহ সমস্যায় প্রসারিত হয়েছে। এই Turning point না থাকলে নাট্যসংলাপে গতি আসতে পারত না। কাজেই নাট্যসূচনার সংলাপ অবশ্যই শিল্পোত্তীর্ণ হয়েছে। অতঃপর কুলপালকের সঙ্গে উপস্থিতি ও স্বগতোক্তি পরবর্তী নাট্যপ্লটের সূচক —

কুলপালক — 'বিবাহ নির্ব্বাহবিধি বিধির ঘটনা' সত্য কথা, যথার্থ মিথ্যা নয়, সঙ্গত বটে। আমি বন্দ্যঘটীয় কেশব চক্রবর্তীর সন্তান, প্রধান কুলীন, আমার কন্যাদিগের বিবাহ হয় নাই, অদ্যাবধি বিধি তাহাদিগের প্রতি প্রতিকূল থাকায় সমযোগ্য পাত্র প্রাপ্ত হইতেছে না, তাহাতেই নিতান্ত চিন্তিত আছি। দেখ, আমার সংসার রাজসংসার বলিলেও বলা যায়, কিছুই অনটন নাই, কাহারও দ্বারস্থ হইতে হয় না, কিন্তু দেখ দেখি দৈব বিড়ম্বনা, কিছুতেই মনস্তুষ্টি হইতেছে না; কন্যাভারগ্রস্ত হইয়া চিন্তা

নিমীলিত নয়নে বিনিদ্রাবস্থায় যামিনী যাপন করি। হায় কি ক্লেশ। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন 'হ্রস্ব গৃহাঃ স্থূলটা যাব গোধুমশালিনঃ। প্রলযেহপি ন সীদন্তি যদি কন্যা না জায়তে।' ইহা যুক্তি(সিদ্ধ বটে, কন্যাজন্মই গৃহস্থাশ্রয়ীর অশেষ ক্লেশদায়ক। বিশেষতঃ অস্মাদৃশ কুলীন সন্তানদিগের। প্রত্যুত দেখ বিধাতার কি বিড়ম্বনা। আমার গৃহে কন্যাচতুষ্টয় অবতীর্ণ হইয়াছেন। এক কন্যাই কুলীনদিগের বিপৎ-পরম্পরা সম্পাদন করে, অধিকের কথা কি বলিব?

১৮৫৪ সালে লেখা এ নাটকের প্রথম অভিনয় হয় রামজয় বসাকের বাড়িতে, ১৮৫৭ সালের মার্চে। সেই অভিনয়ে কলকাতায় সাড়া পড়ে যায়, ফলে ১৮৫৮-র মার্চে, গদাধর শেঠের বাড়ীতে নাটকের তৃতীয় অভিনয়ের সময় রঙ্গভূমি পরিপূর্ণ হয়েছিল বলে 'সংবাদ প্রভাকর' জানাচ্ছে। এই জনপ্রিয়তার পিছনে কুলপালকের বিভিন্ন সংলাপ অন্যতম কারণ। তখনকার দিনে এমন অজস্র কুলপালক ছিল, যাদের যে কোনো ভাবে, মেয়েদের সুখের কথা না ভেবেই, কুলর(ার প্রয়োজনে, তাদের বিয়ে দিত। হতে পারে, নাট্যতত্ত্ববিদ্দের বিচারে, কুলপালক এক প্রতিবাদহীন, তীব্র দ্বন্দ্বহীন চরিত্র, কিন্তু তার ট্র্যাজেডির তো সীমা নেই। একথাও ঠিক নাটকে কুলধন নামে আর এক পিতা মানসিকভাবে কিছুটা প্রতিবাদী, কিন্তু কুলপালকের সংলাপ খুঁটিয়ে দেখলে তার অন্তর্দ্বন্দ্বও অবশ্যই চোখে পড়বে —

কুলপালক – কে হে? বন্ধু নাকি, এত রদ্দুরের বেলা মেলা কি বক্চোহে, কেন এত রাগত কেন?

কুলপালক – বলি, ভাই তোমার দেশের খুরে দন্ডবৎ, এমন দেশ কোথাও দেখি নাই।

কুলধন – যথার্থ ভাই, এ দেশে খাদ্য কিছুই পাওয়া যায় না(হাট নাই, তরকারির মধ্যে পুঁইশাগ, গব্যের মধ্যে তেঁতুল, দেশে থাকাই দুঃসাধ্য।

কুলপালক – না, তা না হে।

কুলধন – তবে, দেশের প্রতি ত্যক্ত(কেন?

কুলপালক – আমার মেয়েদের বিবাহ হইতে কিছু বিলম্ব হইয়াছে, তা এমন কি কা(হয় না, সংসার করিতে হইলে সকলেরি কি সকল কর্ম্ম সময়ে হইয়া থাকে, কিছুতেই কি বিলম্ব হয় না? তা বিলম্বই বা কি, বৈদিক ব্রাহ্মণের ন্যায় কি গর্ভে গর্ভে বিবাহ দিব? দেশের লোকের তাহা বিবেচনা করে না, নিরপরাধে আমাকে নিন্দাবাদ করিতেছে, ভাই তুমি বিবেচনা কর দেখি সমযোগ্য পাত্র না পাইলে কেমনে বিবাহ দি? কি এখন যার তার সঙ্গে বিবাহ দিয়া চিরন্তন কুল জলাঞ্জলি দিব?

সমস্যাসঙ্কুল পরিবেশেও নাট্যকার Satire-এর ব্যবহার করায় হাসি-কান্নার যুগলবন্দী ঘটেছে উপরের সংলাপে। 'কুলীনকুলসর্বস্বে' হাস্যরস প্রয়োগের সময়, দুই বিপরীত মানসিকতার ঘটক নাট্যকার হাজির করে, কুলীন পরিবারের কন্যার দুঃখদীর্ণ রূপটি নির্মমভাবে ফুটিয়েছেন। সংলাপই এ(ত্রে তাঁর সাফল্যের হাতিয়ার —

শুভাচার্য্য – আমি শুভাচার্য্য শর্ম্মা, রাঢ়দেশীয় ত্রিপুরাপুরে নিবাস, কলিকাতার ঘোষাল, সুগৃহীত নাম, আর্য্যকুলাচার্য্যের পুত্র, পশ্যের সন্তান।

অনৃতচার্য্য — অহং ঘটক, অনৃতাচার্য্য চূড়ামণি। তোমার পিতামহের নাম কি হে?

শুভা — মহাশয়। আপনি ঘটক চূড়ামণি, আপনার অবিদিত কিছুই নাই, আপনিই বলুন।

অমৃত — (ঈষৎ হাস্য করিয়া) শুনিবে। বাপুহে বংশাবলি ত আমার নয়নপথে রহিয়াছে। আমরা তেমন ঘটক নই, ফাঁকিজুকি নাই। চণ্ডীপুরে কিনুরাম ঘোষাল বাস করিতেন, কেমন তেমন ঘটক নই, ফাঁকিজুকি নাই। চণ্ডীপুরে কিনুরাম ঘোষাল বাস করিতেন, কেমন সত্য কি না?

শুভা — বলুন্ শুনা যাউক।

অনৃ — সেই কিনুরামের পুত্র হরিনাথ, হরির পুত্র মহেশচন্দ্র পুত্র নিমাইচরণ, নিমাইয়ের পুত্র বলরাম ও রামরাম, বলরাম নিঃসন্তান। রামরামের পুত্র গোকুলচন্দ্র, তাঁহার পুত্র কেশব, শঙ্কর ও গঙ্গাধর, তন্মধ্যে গঙ্গাধর নিঃসন্তান, শঙ্করের পুত্র শ্যামসুন্দর, তাঁহার পুত্র বৈদ্যনাথ, তিনিও নিঃসন্তান(অতএব গঙ্গাধর ও শঙ্করের বংশ নাই। কেশবের পুত্র হরিহর ও কবিবর, কবিবর মাতামহ সম্পর্কে গৌহাটিতে বাটী করিয়াছিলেন, হরিহরের পুত্র মাধবচন্দ্র, তিনি ত্রিপুরাপুরে উঠিয়া যান, সেই মাধবের পাঁচ পুত্র — শঙ্করাচার্য্য, ব্যাসাচার্য্য, জ্ঞানাচার্য্য, ধর্ম্মাচার্য্য ও কুশলাচার্য্যই তোমার পিতামহ, কেমন পাইয়াছ কি না? আমি কি জানি না ‘পঞ্চগোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই, ইহা ছাড়া বামন নাই’। আমার অবিদিত কোনো ঘর আছে?

শুভ — আপনকার পিতৃঠাকুরের নাম শুনিতে ইচ্ছা করি।

অনৃ — আঁ, কি বলো হে? কালি রাত্রে নিদ্রা হয় নাই, বড় গ্রীষ্ম।

শুভা — মহাশয়ের পিতার নাম কি?

অনৃ — বড় মশা।

শুভা — (উচ্চৈঃস্বরে) বলি আপনি কার পুত্র?

অনৃ — অধিক দিন হইল আমার পিতৃঠাকুরের পরলোক হইয়াছে।

শুধু ক(ণ নয় হাস্যরসেও যে জাত শিল্পী ছিলেন রামনারায়ণ দুই ঘটকের সংলাপে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। অনৃতাচার্য্যদের মতো লোভী ঘটকের সংসারে বেশি, এরা অর্থ ছাড়া কিছুই জানে না। এদের ধর্মাধর্মভাব নেই, তাই কুলপালকের কন্যার জন্য সে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে পাত্র হিসেবে হাজির করায়। বিপরীতে শুভাচার্য্যরা সংখ্যায় অঙ্গুলিমেয়। নাট্যকার এই সৎ ঘটকের সংলাপকে আরও (ুরধার এবং (-ষাত্মক করলে দর্শকরা আরও আনন্দ পেতো, সন্দেহ নেই। সেই আনন্দের খোরাক আছে উদরপরায়ণের কিংবা বিবাহবাতুলের সংলাপে। বেশ কটি নারী চরিত্র আছে, যাদের সংলাপে কোথাও চমৎকারিত্ব, কোথাও অতিরিক্ত(ভাঁড়ামি।

ক. শাম্ভবীর সংলাপের বিদ্রোহিনী নারীর পরিচয় আছে — ‘তা চল না ভাই, ঘরে তো বাবাকে বলি এমন বে দিলেই হয় না?’

খ. যশোদা পরিণত বয়স্কা, বিধবা। অল্পবয়সী পতিপরিত্যক্তা কন্যাদের প্রতি পরম মমতায় যেন সে বলে —

বল্লাল হইয়া কাল দিয়াছে কুলে শাল
সামাল সামাল ডাক ছাড়ি।
না হল বাসনা পূর্ণ কেবল বৈধব্য তূর্ণ
মন্ত্রের প্রভাবে উদম্ রাঁড়ি।।

ত্রিপদী ছন্দের সংলাপ না হলে, চরিত্রটি যেমন আরও বৈচিত্র্যময় হতো তেমনি নাটকও গতিময় হতো। পয়ার ছন্দে উচ্চারিত ফুলকুমারীর সংলাপেও এই ত্রুটি দেখি। আবার এর বিপরীতটাও পাই ছন্দে রচিত ভোলার স্বগতোক্তির মধ্যে। তার কারণ পদ্য থেকে সরাসরি আঞ্চলিক কথ্য সংলাপে ঢুকে —

ভোলা — (স্বগত) মোগার কপালে দুক্ নেকেচে গোঁসাই।
খাটি খাটি মনু এই বষ্ঠি পাই নাই।।
বসি ঘরে প্যাট ভরে খাতি নাই পাই।
চাকুরি ঝকমারি কাম করি মুই তাই।।

ঐ ওত্তরের বাড়ির মুই খ্যানাকাট্টে গেহালাম, এস্তে এস্তেই বড়মোশাই বল্যে 'ওরে ভোলা, তুই যা, পুটে ঠাকুরের ডাকি অন্', তা এই মুই অদ্দুরে থাকি আলাম, তামুক্ খাতিও পালাম্ না, এট্টু জিরতিও পালাম না, তাই ত মোদের বৌ বলেহালো, বলে, 'চাকুরি না কুকুরি', তা খাতিপত্তি পাই নে, না করে কি কর্ব্বো? মুনিব যা বলে তা না কল্যে মেইনে দেবে কেন? খ্যাদারে দেবে যে, তাই যাচ্চি, আসি তবে তামুক খাব। (কিঞ্চিৎ গমন করিয়া) ঐ ঝাঃ কেচ্চেখানা ভুলি আলাম, দাদাঠাকুর বল্যে 'এসবের এট্টা থোঁরের গাচ অনিস্' তা কি দি কাট্‌বো? আবার ফিরি যাব? (চিন্তা করিয়া) না বেনে, পদেদ্ধারে মোর ঝীয়ের ঘর, সেইন্থেই ন্যাবো। (কিয়দ্দুর গিয়া) এই মোর ঝীয়ের ঘর এখন ঝী মোর হেতা নেই তা বীন্‌কে ডাকি। (প্রকাশ্যে) ও বীন্! বীইন্! একবার তোগার কেচ্চে খান দিবি? (আকাশে কর্ণ দিয়া) আঁ কি বল্লি? হেরিয়ে গেছে?

সুতরাং যতই সংস্কৃতগন্ধী সংলাপ বর্তমান নাটকে থাকুক না কেন, চরিত্রানুগ সংলাপ অবশ্যই বৈপরীত্ব সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, রামনারায়ণ যদি আরও দু-দশক পরে কলম ধরতেন তাহলে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্বে'র সংলাপ আরও ঝরঝরে হতো। তবে চপলা-সুলোচনা- চঞ্চলার সংলাপে উনিশ শতকের নারীদের কথ্য সংলাপে যে নিপুন নিদর্শন রামনারায়ণ টেনেছেন তাতে নাটকের জনপ্রিয়তায় নিহিত উৎস বোঝা যায়।"

৩.১.৪.২ : আর্দশ প্রশ্নাবলী

১। কৌলীন্যপ্রথা কিভাবে সামাজিক ব্যভিচারের জন্ম দিয়েছিল 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক অবলম্বনে তার পরিচয় দাও।

২। ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ নাটকের সংলাপগত বৈশিষ্ট্যগুলি দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করো।

৩। ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’ নাটকটিতে প্রথম মৌলিক নাটক রূপে চিহ্নিত করা যায় কি? তোমার উত্তরের সমর্থনে দৃষ্টান্ত এবং যুক্তি দাও।

৪। ‘কুলীনকুলসর্বস্ব’–নাটকটির নামকরম কতদূর সার্থক হয়েছে তা, আলোচনা করে দৃষ্টান্ত সহযোগে বুঝিয়ে দাও।

৩.১.৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক — সম্পাদনা শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, সা(র প্রকাশনী, ১৯৭৭।

২। বাংলা নাটকের ইতিহাস — ড. অজিতকুমার ঘোষ, প্রথম দে’জ সংস্করণ জানুয়ারী-২০০৫।

৩। রামনারায়ণ তর্করত্ন রচনাবলী, মুখবন্ধ — ড. অজিতকুমার ঘোষ, সাহিত্যলোক

৪। বাংলা প্রহসনের আলোকে উনিশ শতকের বাঙলা ও বাঙালী সমাজ — মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৮৫।

৫। সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক — গোলাম মুরশিদ বাংলা একাডেমি ঢাকা, ১৯৮৪ - ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

————

পর্যায়গ্রন্থ - ২

একক - ৫

সধবার একাদশী নাটকের শ্রেণিবিচার

বিন্যাস ত্র(ম :

৩.২.৫.১ সধবার একাদশী -- কাহিনী

৩.২.৫.২ দীনবন্ধু মিত্র জীবন ও নাট্য ভাবনা

৩.২.৫.৩ সধবার একাদশী শ্রেণীবিচার

৩.২.৫.৪ আদর্শ প্র(োবলী

৩.২.৫.১ সধবার একাদশী – কাহিনী

"তিনি নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া
অনেক খোশগল্প সংগ্রহ করিয়াছেন,
এবং সেইগুলি পুস্তক মধ্যে প্রবেশ
করাইয়াছেন।"

রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এই উক্তি(দীনবন্ধু সম্পর্কে যথার্থই প্রযোজ্য। সত্যিই দীনবন্ধু নানা অভিজ্ঞতাকে তাঁর নাটকে নিয়ে এসেছেন। অন্যান্য নানা নাটকের মতো সধবার একাদশীও তাঁর জ্বলন্ত প্রমাণ। 'সধবার একাদশী'র কাহিনীটি তিনটি অঙ্কে গঠিত। প্রতিটিতে আবার অনেকগুলি করে খণ্ড বা গর্ভাঙ্ক আছে। সং(পে কাহিনীটি এরকম —

❑ প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মদ্যপান নিবারণের সামাজিক প্রচেষ্টা, ধনীপুত্র অটলের অধঃপতন, নকুল ও নিমচাঁদের মদ্যপান নিবারণী সভা নিয়ে আলোচনা প্রভৃতি ঘটনা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

এখানে আছে, অটলের ব্যক্তি(গত জীবন, তার অধঃপতন, বেশ্যা কাঞ্চনের প্রতি তার আসক্তি(এবং অটলের ব্যক্তি(গত ও পারিবারিক জীবন বর্ণনা।

❑ দ্বিতীয় অঙ্ক

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে চারটি দৃশ্য আছে।

প্রথম দৃশ্য

এখানে আছে, অটলের স্ত্রী কুমুদিনী ও বোন সৌদামিনীর কথোপকথন। অটলের বিকৃত (চি, কাঞ্চনের প্রতি অনুরাগ। এখানে আলোচিত হয়েছে রামমাণিক্যের স্ত্রী ভাগ্যধরী ও ভোলার গর্ভবতী স্ত্রীর প্রসঙ্গও। এই দৃশ্যে কুমুদিনী বঞ্চিতা, অপমানিতা নারীরূপে নিজেকে প্রতিপন্ন করেছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

এটি নাটকের বড় দৃশ্য। এখানে আছে মদের বিরাট আসরের বর্ণনা। কাঞ্চনের প্রতি বিকৃত আসক্তি(, অটল, ভোলা ও রামমাণিক্যের মদের আড্ডা ও ইয়ার্কির বর্ণনা।

তৃতীয় দৃশ্য

এখানে আছে, রাজপথের বর্ণনা, নানা শ্রেণীর লোকের ভীড়ের পরিচয় ও মাতাল হয়ে অ(শ্লীল আচরণের চিত্র। দারোয়ান, দাসী, দুজন বারবিলাসিনী, সার্জন ও পাহারাওয়ালা প্রমুখ লোক সমাগমে এই দৃশ্যটি পূর্ণ।

চতুর্থ দৃশ্য

গোকুলবাবুর বাড়িতে পারিবারিক বৈঠকের আলোচনা, অটলকে সৎপথে ফেরানোর জন্য জীবনচন্দ্রের পরিবারসহ কাশী গমনের উদ্যোগ ও ব্যর্থতা এই দৃশ্যের বর্ণনীয় বিষয়।

❑ **তৃতীয় অঙ্ক**

নাটকের তৃতীয় অঙ্কে আছে তিনটি দৃশ্য।

প্রথম দৃশ্য

নকুলে(শ্বরের বাড়ির মদের আড্ডার বর্ণনা। নিমে দত্ত, নকুল, রামমাণিক্য, কাঞ্চন প্রমুখের সমাগমে এই দৃশ্যে ভীড় জমে উঠেছে। তবে, অটল এই দৃশ্যে নেই। কিন্তু, তার প্রসঙ্গ কিছুটা হলেও এখানে আছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অটলের বৈঠকখানার বর্ণনা আছে। কাঞ্চন-অটলের কথাবার্তা দিয়ে এই দৃশ্য শু(হয়েছে। কাঞ্চন নকুলের কাছে যাওয়ায় অটল রাগে গলায় ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছে। আর, কাঞ্চন খুনোখুনিতে ভয় পেয়ে পারিবারিক ঈর্ষা থেকে বাঁচতে পালিয়ে গেছে। এই দৃশ্যে নিমচাঁদের তাৎপর্যমণ্ডিত দীর্ঘ সংলাপ ল(ণীয়।

তৃতীয় দৃশ্য

দৃশ্যটি হাস্যকর ও ঘটনাচঞ্চল। অটল হিজড়ে দিয়ে খুড়শাশুড়িকে চুরি করার মতলব করেছিল। কিন্তু, হিজড়ে ভুল করে অটলের স্ত্রী কুমুদিনীকে ধরে আনলে ঘটনা অন্যদিকে মোড় নেয়। এর ফলে রামধন রায় জুতোপেটা করে অটল আর নিমচাঁদকে। আর, অটল মদের উপর সব দোষ চাপিয়ে দেয়। বেশ্যাসক্তি(র কথা না ভেবে সাময়িক অনুশোচনা করে নিজেকে পবিত্র প্রমাণ করতে চায়। কিন্তু, একটু পরেই সব ভুলে নিমচাঁদকে নিয়ে মদ্যপান করে অটল মার খাওয়া ব্যথা দূর করতে বাগানে চলে যায়।

উপরের আলোচনায় 'সধবার একাদশী'তে যে কাহিনীবিন্যাস তুলে ধরা হল, তাতে বোঝা যায় কোনো সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট কাহিনীধারা এতে নেই। তবে শেক্সপীয়রের নাটকের মতো 'unity of impression' দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'তে আছে।

৩.২.৫.২ : দীনবন্ধু মিত্র জীবন ও নাট্য ভাবনা

সাহিত্যিক দীনবন্ধু মূলত নাট্যকার। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে (চৈত্র, ১২৩৬) নদীয়ার চৌবেড়িয়ায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কালাচাঁদ মিত্র। শৈশবে তাঁর নাম ছিল গন্ধর্ব নারায়ণ। লেখাপড়ায় তিনি ছিলেন প্রখর মেধাবী। প্রথম জীবনে তিনি শি(কতা করতেন। পরে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে পাটনাতে পোস্টমাস্টার হন।

বদলির চাকরি হওয়ায় তিনি নদীয়া ও ঢাকায় আসেন। এই দুই অঞ্চলের মানুষদের দুঃখ, যন্ত্রণা ও অধঃপতনকে কেন্দ্র করে তিনি একটার পর একটা নাটক লেখেন। নীলকরদের অত্যাচারের প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি লেখেন—'নীলদর্পণ'। আর, নারীদের দুঃখযন্ত্রণাকে তুলে ধরেন 'সধবার একাদশী'তে। পূর্ববঙ্গের পরিচয় উঠে এসেছে 'লীলাবতী', 'নবীন তপস্বিনী'তে আর 'সধবার একাদশী'তে উল্লেখ করেছেন বিত্র(মপুরের কথা।

পোস্ট অফিসের কর্মে দীনবন্ধু বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। তাই বিভিন্ন লোকের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল প্রবল। কিন্তু এই তীব্র সহানুভূতিই দীনবন্ধুর রচনার দোষগুণের কারণ ছিল। কেননা, সামাজিক অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতির যে কোনো একটির অভাব হলেই দীনবন্ধুর রচনা ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে। বঙ্কিমবাবু বলেছেন —

> *"ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতা ও প্রবল এবং সর্বব্যাপী সহানুভূতি দীনবন্ধুর কাব্যের দোষ-গুণের কারণ।"*

তবুও দীনবন্ধু সমসাময়িক সমাজে, জীবন ও ঘটনাকে তাঁর রচনায় তুলে ধরেছেন। ব্রাহ্মধর্ম, বিধবা বিবাহ, কৌলীন্য প্রথা, সমকালের সাহিত্য, গানবাজনা সবকিছুই দীনবন্ধুর রচনায় দেখা গেছে।

ঊনিশ শতকে যে সময়ে দীনবন্ধুর আবির্ভাব ও নাট্য রচনার প্রয়াস দেখা গিয়েছিল তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সংঘাত ও ইয়ং বেঙ্গলদের আবির্ভাব ঘটেছিল। সমাজে তখন ছিল বিধবা-বিবাহ আন্দোলন, ব্রাহ্মধর্মের প্রসার, ঘরজামাই প্রথা ও মদ্যপান। দীনবন্ধু এগুলোকে আশ্রয় করেছেন তাঁর নাটকে। যেমন - মদ্যপানের কুপ্রভাব দেখানো হয়েছে 'সধবার একাদশী'তে।

নাট্যরচনার (্ত্রে দীনবন্ধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সব লেখকের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। প্রধানত ঈ(্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন তাঁর গু(। আবার, ভারতচন্দ্রের প্রতিও তাঁর ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। মাইকেল মধুসূদনের প্রভাব দীনবন্ধুতে সব থেকে বেশিমাত্রায় পড়েছিল। মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রভৃতি নাটক থেকে দীনবন্ধু ঋণ নিয়ে রচনা করেছিলেন — 'সধবার একাদশী', 'জামাই বারিক' প্রভৃতি নাটক।

আবার, শেক্সপীয়র, মিলটন, বায়রন, পোপ, বেকন প্রমুখর মতাদর্শও দীনবন্ধুকে নাট্যরচনায় প্রণোদিত করেছিল।

আসলে ঊনিশ শতকের বাবু কালচারের আমলে গঠিত সমাজের নানা দুর্নীতি দীনবন্ধু নিখুঁতভাবে এঁকেছেন। বাবু কালচার রপ্ত করতে গিয়ে মদ ও বেশ্যাসত্তি(প্রবলভাবে গ্রহণ করে সমাজকে কলুষিত করে কিছু সংখ্যক মানুষ। 'সধবার একাদশী'তে সেটা তিনি দা(ণভাবে দেখিয়েছেন। ঊনিশ শতকের নানা দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচারী সমাজের যাবতীয় ঘটনা দীনবন্ধুকে নাট্য রচনায় প্রণোদিত করে। সামাজিক মানুষের অব(য় ও বিদেশী দ্বারা আত্র(ান্ত ভারতবাসীর নির্মম পীড়ন ও অত্যাচারিত অবস্থা দীনবন্ধুকে আহত করে। অসাধারণ ব্যঙ্গবিদ্রূপের মাধ্যমে তিনি তাঁর লেখায় এ সবকিছু তুলে ধরেছেন। দীনবন্ধুর সাফল্য আর পুরস্কার এইখানেই।

৩.২.৫.৩ সধবার একাদশী শ্রেণীবিচার

'সধবার একাদশী' দীনবন্ধুর উল্লেখযোগ্য রচনা। তবে, এটি নাটক না প্রহসন তা নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই। ড. সুকুমার সেন নাটকটিকে 'প্রহসন' বলে দাবি করেচেন। আবার, গিরিশচন্দ্রের মতে 'সধবার একাদশী' একটি 'সমাজচিত্র'। মনে রাখতে হবে — প্রহসনও সমাজচিত্রেরই প্রতিফলন। তবে, এটি আসলে কোন্ শ্রেণীর রচনা তা বিচার্য বিষয়।

মনে রাখতে হবে, প্রহসনে (Farce) ব্যঙ্গবিদ্রূপ থাকে , থাকে সমাজের ও ব্যক্তি(র নানা দোষ-ত্রুটির বর্ণনা। সেই হিসাবে ‘সধবার একাদশী’ কে প্রহসন বলা যেতে পারে। কেননা, মদ্যপান ও মদ্যপ ব্যক্তি(দের সম্পর্কে নানা ব্যঙ্গবিদ্রূপ এখানে আছে। মদ্যপানের প্রভাবে ব্যক্তি(চরিত্র দোষে দুষ্ট হয়েছে। যেমন— অটল কাঞ্চনকে গু(ত্ব দিয়েছে নিজের স্ত্রীর থেকেও বেশি। আবার কাঞ্চনকে নিয়ে অ(ীল আচরণও করেছে।

তবু, ‘সধবার একদশী’কে প্রহসন বলা যেতে পারে না। কেননা, নাটকের প্রথমে মদ্যপান ও মদ্যপ ব্যক্তি(দের নিয়ে নানা ব্যঙ্গাত্মক উক্তি(হলেও নাট্য ঘটনা যতই এগিয়েছে, দেখা গেছে চরিত্রের নিঃসঙ্গতা ও একাকীত্ব। নিমচাঁদের ব্যর্থ জীবনের হাহাকার তার মদ্যপানের সব কালিমাকে ম্লান করে দিয়েছে। আবার, অটল-রামমাণিক্যের জীবনও তীব্র হতাশা ও বিষাদে ভরপুর। তাই, প্রহসন না বলে ট্র্যাজেডিও বলেছেন কোনও কোনও সমালোচক।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ‘সধবার একাদশী’কে সমাজচিত্র বলেছেন। কেননা, এই নাটকে সমকালীন শি(ত যুবক ও ধনীর আদরে বেড়ে ওঠা কুপথগামী সন্তানদের জীবনচিত্র আঁকা হয়েছে। যেমন — অটল ধনী জীবনচন্দ্রের আদরে একেবারে বাঁদর হয়ে উঠেছে। সুন্দরী স্ত্রী কুমুদিনীকে ত্যাগ করে বেশ্যা কাঞ্চনকে সে গু(ত্ব দিয়েছে। মাকে ব্ল্যাকমেল করে বাবার টাকা পয়সা হাতের মুঠোয় নিয়ে সে যথেচ্ছাচার করেছে। শুধু তাই নয়, সে নিজে মদ খেয়ে নষ্ট হয়েছে, পাশাপাশি অন্যকেও সে মদ্যপ হতে সাহায্য করেছে।

আবার প্রহসনের বৈশিষ্ট্যই হল চরিত্রের দোষত্রুটি সংশোধন করে দেওয়া। কিন্তু নিমচাঁদ আর অটল প্রচণ্ড মার খাওয়ার পরও বাগানে গেছে মদ খেতে। অর্থাৎ ওরা নিজেদের সংশোধন করতে পারেনি। তাই, রামগতি ন্যায়রত্নের মতে —

“ ‘সধবার একাদশী’তে যা দেখানো হয়নি(
অতএব তা ‘প্রহসন’ পদবাচ্য হতে পারে না,
‘সমাজচিত্র’ হতে পারে মাত্র!”

অভিযোগের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে বলা যায় — প্রহসনের বৈশিষ্ট্যেই দীনবন্ধু মদ্যপানের কুপ্রভাব, বিকার ও লাম্পট্য ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় বুঝিয়েছেন। যেমন — নিমচাঁদের উক্তি(গুলি ব্যঙ্গবিদ্রূপে মেশানো, একইসঙ্গে কৌতুককরও বটে। —

ক. এক ব্যাটা বড়ো মানুষের ছেলে মদ ধরলে দ্বাদশটি মাতাল প্রতিপালন হয়।

খ. মদ কি ছাড়বো! আমি ছাড়তে পারি বাবা, ও আমায় ছাড়ে কই ?

তাই, ‘সধবার একাদশী’ প্রহসনের পর্যায়েও পড়ে একথা বলা যেতেই পারে। অনেকে ‘সধবার একাদশী’কে ট্র্যাজেডি বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এ যুক্তি(মানা হয়নি। কেননা, নিমচাঁদের বেদনা, হতাশা ও গ(নি দেখে আমাদের মনে সমবেদনা জাগ্রত হলেও নিমচাঁদকে ট্র্যাজিক চরিত্র বলা যায় না। কেননা, ট্র্যাজিডিতে নায়ক চরিত্রের শোচনীয় পরাজয় ও পতন দেখানো হয়। সেই হিসাবে, নাটকের নামক নিমচাঁদ ‘পতিত’ হয়নি। কেননা নাটকের শু(তেই সে সুস্থ জীবন ছেড়ে অধঃপতনে গেছে। বরং নিমের আচরণ হাসির আবহাওয়া রচনা করেছে ও কমেডির পরিবেশ তৈরি করেছে।

কমেডি আর প্রহসনের মধ্যে মূল পার্থক্য হল জীবনদৃষ্টির তারতম্য। ‘সধবার একাদশী’ বিষয় আলোচনায় আমরা ল(করেছি, দীনবন্ধুর জীবনদৃষ্টির অনন্যতা। কারণ জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ নিয়ে জীবনের একটি পরিপূর্ণ রূপকে নাট্যকার এখানে তুলে ধরেছেন। সুতরাং কমেডির প্রথম শর্ত এখানে উপস্থিত।

আবার, কমেডিতে চরিত্রের অসঙ্গতি দেখানো হয়। তবে চরিত্রটি বাস্তবধর্মীও হয়। সেই হিসেবে 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদ চরিত্রটির মধ্যে অসঙ্গতি যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি তার বিবেক দংশন, বংশের আভিজাত্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হওয়া, সংযম মনোভাব গ্রহণ প্রভৃতির মধ্যে সে বাস্তব হয়ে উঠেছে।

আবার কমেডির ল(ণ অনুযায়ী বিভিন্ন 'টাইপ' চরিত্রের উদ্ভব 'সধবার একাদশী'তে হয়েছে। যেমন — অটল, কেনারাম, রামমাণিক্য, ভোলা প্রমুখ। এরা প্রত্যেকে প্রধান চরিত্রের পাশে থেকে হাসির পরিমণ্ডল রচনা করেছে। তাই, এটি ট্র্যাজেডি না হয়ে হয়েছে কমেডি।

দীর্ঘ আলোচনার পর আমরা বুঝতে পারি, ট্র্যাজেডির মধ্যে যে 'pity' ও 'fear' থাকে, তা 'সধবার একাদশী'তে নেই। এখানে হাসি আছে, ব্যঙ্গ আছে, চরিত্রের অসঙ্গতি ও দোষত্রুটি আছে। তাই, 'সধবার একাদশী' প্রহসন ও কমেডির মেলবন্ধনে হয়ে উঠেছে এক অভিনব নাটক — যা বাইরে প্রহসন, ভিতরে কমেডি।

৩.২.৫.৪ আদর্শ প্র্োবলী

১। 'সধবার একাদশী' প্রহসনে হাস্যরস কতটা? আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

২। 'সধবার একাদশী'–নাটক না প্রহসন? বিশ্লেষণ করো।

৩। 'সধবার একাদশী' কী জাতীয় রচনা? ট্রাজেডি, কমেডি, প্রহসন, সমাজচিত্র অথবা অন্যকিছু? তোমার অভিমত যুক্তিসহ প্রতিষ্ঠা করো।

————

পর্যায়গ্রন্থ্ - ২

একক - ৬

হাস্যরস

বিন্যাস ত্র(ম :

৩.২.৬.১ সধবার একাদশী নামকরণ

৩.২.৬.২ সধবার একাদশী হাস্যরস

৩.২.৬.৩ আদর্শ প্র(াবলী

২.২.৬.১ : সধবার একাদশী নামকরণ

"নামে কি আসে যায়।"

নামকরণ সম্পর্কে শেক্সপীয়র এই মত পোষণ করলেও 'কাব্যের উপে(তা'য় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন —

"নামকে যাঁরা নাম মাত্র মনে করেন
আমি তাঁদের দলে নই।"

বুঝতে পারি, রবীন্দ্রনাথ নামকরণের ওপর যথেষ্ট গু(ত্ব দিতেন। সেখানে কখনও ভাবের হীরকদ্যুতি, কখনও ব্যঞ্জনা, কখনও বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্যকেই রবীন্দ্রনাথ বেশিরভাগ (ে ত্রেই রচনার শিরোনাম করতে চেয়েছেন। আর, এ(ত্রে তিনি প্রমাণ করেছেন নামকরণ আসলে একটা শিল্প।

আমাদের সৌভাগ্য রবীন্দ্রনাথের পর আধুনিক উত্তরসূরীরাও রবীন্দ্র প্রদর্শিত পথেই চলতে শু(করেন। এ(ত্রে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রও তার ব্যতিত্র(ম নন। বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে যে নাম বদলায়, ছাদ বদলায় তা দীনবন্ধু ধরতে পেরেছিলেন। প্রমাণ তাঁর 'সধবার একাদশী'।

মনে রাখতে হবে, 'সধবার একাদশী' নামকরণটির পিছনে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটির বিশেষ প্রভাব আছে। নাটকটির শেষে নিমচাঁদের গাওয়া একটি গীতাংশ থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। বলতেই পারি, মধুসূদনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন দীনবন্ধু।

আমরা জানি, বিধবারা একাদশী পালন করে। কিন্তু সধবারা করে না। অর্থাৎ সধবা হয়েও যে একাদশী পালন করে সে আসলে মনে প্রাণে নিজেকে বিধবা বলে মনে করে। নাটকে আমরা তিনটি সধবা রমণীকে দেখতে পাই, যারা সুখী নয়। সধবা হয়েও বিধবার মত স্বামীসঙ্গ সুখ থেকে তারা বঞ্চিতা। তাই, নিজেদের বিধবা মনে করে তারা একাদশী পালন করেছে।

নাটকে আমরা দেখতে পাই, নিমচাঁদের স্ত্রী বেশ সুন্দরী। কিন্তু, নিমচাঁদকে কোনও বন্ধনে আটকে রাখতে পারে না সে। ঘরে থাকতে চায় না নিম। অটল তাকে স্ত্রীর কাছে যেতে অনুরোধ করলেও সে যায় না। বরং স্ত্রীর প্রসঙ্গে নিম বলে —

"Thou sticketh a dagger in me"

আবার সতী-সাবিত্রীর মত স্ত্রীকে ছেড়ে অটল বার বাড়িতে বারাঙ্গনা সেবায় দিনরাত কাটিয়ে দেয়।

স্ত্রীর কথা সে একবারও ভাবতে চায় না। মদ্যাসক্ত(হয়ে স্ত্রীর মনোযন্ত্রণার কারণ ঘটিয়ে বেশ্যাগৃহে সুখে দিন কাটাতে থাকে অটল। তাই, অটলের স্ত্রী কুমুদিনী ও নীলের স্ত্রী দুজনের স্বামী থেকেও স্বামী হারার মতো দিন কাটাতে থাকে। সধবা হয়েও বৈধব্য জীবনকে যেন ওরা বরণ করে নিতে বাধ্য হয়। কেননা, সধবা হয়েও ওরা তো স্বামী সহবাস সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে বিধবার মতো কাতরভাবে জীবন কাটাচ্ছে। তাইতো অটলের স্ত্রী কুমুদিনী নিদা(ণ কষ্টে জানিয়েছে —

"আমি গলা দড়ি দে মরবো।"

আবার, স্বামী থেকেও না পাওয়ার বেদনায় স্বামীর মরণ কামনা করে সে।

"এক মরে যায়, জানলুম আপদ গেল, চোখের
উপর এ পোড়ানি সহ্য হয় না — রাত
দিন মদ খেয়ে নেচে বেড়াবে।"

তাই, কুমুদিনী ও অটলের স্ত্রী দুজনেই সধবা হয়েও নিজেদের বিধবা মনে করেছে।

নিমচাঁদ ও অটলচাঁদের মতো জীবনযাত্রা অতিবাহিত করেছে নকুলবাবু ও ভোলাচাঁদ। তবে, এরা নিম বা অটলের মতো অত উচ্ছৃঙ্খল নয়। অটলের বোনের স্বামীসুখের কথা প্রে(াপটে রেখে নকুলবাবু ও ভোলাচাঁদের স্ত্রী দীর্ঘ(াস ফেলেছে। আর রামমাণিক্য তো নিজের স্ত্রী ভাগ্যধরীকে সতীসাধ্বী জেনেও মদ আর মেয়েমানুষে প্রচণ্ডভাবে আসক্ত(হয়েছে। তাই, এই রমণীদেরকে বিধবার পর্যায়ভুক্ত(করা যায়। কেননা, স্বামী থেকেও তারা বৈধব্যময় যন্ত্রণা ও গ¬ানিময় জীবন অতিবাহিত করছে।

কাজেই, বুঝতে পারি — দীনবন্ধু উপরোক্ত(বঞ্চিতা নারীদের মাধ্যমে সেদিনের সেই বিপথগামী পু(ষ সমাজকে আঘাত হানতে চেয়েছেন। অন্তঃপুরের কান্না ও মর্মজ্বালার বিষবাস্পে জর্জরিত হয়ে রমণীদের জীবনও পু(ষসমাজকে নিয়ে যে ট্র্যাজেডি সংঘটিত হয়েছিল, তার প্রতি সহানুভূতি দেখাবার জন্যই দীনবন্ধু তাঁর এই নাটকের নামকরণ করেছেন 'সধবার একাদশী'।

সামাজিক দিক থেকে বলা যায়, 'সধবার একাদশী' সমাজের পচনের বি(দ্ধে আঘাত করছে। মদ্যপান ও বারাঙ্গনার প্রতি আসক্তি(যুবক সম্প্রদায়কে শেষ করে চলেছে। ওদের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে দিয়েছে। সভ্যতার এই অব(য়, পু(ষ সমাজের এই নীচতা সধবা রমণীদের একাদশী পালনের মতোই যন্ত্রণাদায়ক।

আসলে, মদের প্রভাবেই নারীসক্ত(হয়ে ওঠে পু(ষেরা, তবে নিজেদের অসংযমী মনোভাবও এর জন্য দায়ী। একজন মাতালের কাছে মদ যে সঞ্জীবনী সুধা। অথচ মদের প্রভাবেই সমাজ নষ্ট হয়, পু(ষেরা বেশ্যালয়ে যায়। ঘরের স্ত্রী হয় উৎপীড়িতা, সঙ্গহীনা। তাই, মদ সধবাদের সর্বনাশ। কেননা, এই মদের জন্য নারীকে মরতে হয়েছে, নিজের বৈধব্য কামনা করতে হয়েছে। তাইতো, নাটকের শেষে অটল নিমকে মদ খাওয়ার জন্য বাগানে যেতে বললে নিমচাঁদ জানিয়েছে —

"মৃতদেহে হলো মম জীবন সঞ্চার।
মাতালের মান তুমি, গণিকার গতি,
সধবার একাদশী, তুমি যার পতি।"

সুতরাং বলতেই পারি, 'সধবার একাদশী' নামকরণটি ব্যঞ্জনাধর্মী। নাট্যকার এই নামকরণের মধ্য দিয়ে পরিবার ও সমাজ জীবনের সংকট ও যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেছেন। তাই, নামকরণটি হয়েছে শিল্পমণ্ডিত ও একইসঙ্গে সার্থক।

৩.২.৬.২ সধবার একাদশী হাস্যরস

"দীনবন্ধুর নাট্যকল্পনা যেখানে সার্থক
হইয়াছে, সেখানেই দেখিতে পাই যে
তাহার মূলে রহিয়াছে অকিঞ্চিৎকর
কৌতুকপ্রিয়তা, নয় প্রকৃত হাস্যরস।"

[ড. সুশীলকুমার দে]

সমালোচকের এই বক্ত(ব্যের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি, দুঃখকথার পাশাপাশি হাস্যরসকেও গু(ত্ব দিতেন দীনবন্ধু। তাঁর 'সধবার একাদশী'তেও বিরাট জায়গা করে নিয়েছে এই হাস্যরস। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে বিচার করে দেখা গেছে এখানে রয়েছে বিভিন্ন রকমের হাস্যরস। যেমন —

- ❖ Humour — বাইরে হাসি, ভিতরে কান্না।
- ❖ Wit — বিদ্যুৎ চমকের মত হাসি।
- ❖ Satire — তিরস্কারমিশ্রিত হাসি।

ড নির্মলেন্দু ভৌমিক 'সধবার একাদশী'তে দেখেছেন চারপ্রকারের হাস্যরস —

- ❖ দৈহিক ভঙ্গিগত হাস্যরস।
- ❖ বাচনভঙ্গী ও ভাষাগত হাস্যরস।
- ❖ পরিস্থিতি ও ঘটনাজাত হাস্যরস।
- ❖ চরিত্রগত হাস্যরস।

'সধবার একাদশী'র প্রধান চরিত্র নিমচাঁদের উক্ত(িতে সব হাসিরই যেন ফোয়ারা উড়েছে। এখানে ব্যঙ্গ, বেদনা, কৌতুক সবই যেন এক সারিতে এসে বসেছে। যেমন —

অটল — আমি এখন ঘরে বসে পড়ি।

নিম — মদের দোকানের ক্যাটালগ?

অটল — ঘরে পড়ল বুঝি বিদ্যে হয় না?

নিম — তুমি যে ভাব ধরেচ, বিদ্যেও হবে সুন্দরও হবে।

আবার কেনারামকে নিমচাঁদ যে সমস্ত কথা বলেছে, তাতে হাস্যরস জমে উঠেছে। নিম কেনারামকে জানিয়েছে —

"বাবা, সুকতলার জোরে ঘটিরাম
ডেপুটি হয়েছে, বিদ্যার জোরে হয়নি।"

নির্মল হাসি সৃষ্টি হয়েছে রামমাণিক্যের বাঙাল কথাবার্তায়।

ক. "বাঙাল বাঙাল কর ক্যান? বাঙ্গাল
সায়োরে ভাসে আসচে নাকি?"

খ. "বাণ্ডিল খাইমু তো বতোল চিবায়ে খাইমু।

দ্যাহো, দ্যাহো, বতোলে কি কিছু রাক্‌চি —"

গ. "হালা দুইটা মোটোর দিবার পারেন না,

ক্যাবোল বাঙ্গাল কইবার পারেন।"

ঘ. "জোবর তো — এত পান কর্‌বার পারমু ক্যান?"

ভোলার ভুল ইংরেজি শুনেও আমরা না হেসে পারি না ভোলা বলেছে —

ক. "ইউ নো মাই ফাদার ইন্‌ল সার" —

"আই সান্‌ ইন্‌লা সার্‌।"

খ. "আই ইট ইন প্রেজেন্স ফাদার ইন্‌লা?"

গ. "বেলিমেন্ট সার, প্রেগ্‌নান্ট সার্‌ —"

নিমচাঁদ রাতদিন মদ্যপান করে। মদ ছাড়ার কথা বললে সে খেদোক্তি(করে। আর তাতে হাস্যরসের সন্ধান পাওয়া যায়।

মদ ছাড়ার কথায় নিম বলে —

"মদ কি ছাড়বো! আমি ছাড়তে পারি

বাবা, ও আমায় ছাড়ে কই।"

নিমচাঁদের এই খেদের কথায় আমরা না হেসে থাকতে পারি না।

আবার রামমাণিক্য নিমচাঁদকে মদ খাওয়ার জন্য ধিক্কার দিলে নিমচাঁদ বলে —

"আমরা তো মদ মারি, আপনি যে

মাতাল মারেন।"

এই বুদ্ধিদীপ্ত উক্তি(হাসির উদ্রেক করেছে এই নাটকে।

নিমচাঁদ আর অটলচাঁদের কথোপকথনের মধ্যেও কিছু হাস্যরসের দেখা মেলে। যেমন —

অটল — আমি বেঁচে উঠিচি।

নিমচাঁদ — ফাঁসী কাষ্ঠের সৌভাগ্য।

নারী চরিত্রের কথাবার্তার মধ্যে দিয়েও কিছু হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া গেছে। অটলের প্রতি তাঁর মায়ের অত্যধিক স্নেহ হাস্যরসের যথার্থ পরিবেশ রচনা করেছে। হাসির পরিচয় জমে উঠেছে কাঞ্চনের পরিচয় বর্ণনার মধ্যে দিয়ে। কাঞ্চনকে দেখে নিম বলেছে —

"উনি ত্রিদশাধিপতির প্রধানা নর্তকী,

শাপভ্রষ্টে তরণীধামে বারবিলাসিনীরূপে

জন্মগ্রহণ করেছেন, ওকে তুমি

'কাঞ্চন' বলে সম্বোধন কল্যে"

তবে, নাটকের শ্রেষ্ঠ হাস্যরসাত্মক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে। ব্রান্ডির বোতলকে দ্বিতীয় প(্ের স্ত্রীরূপে কল্পনা করে নিমচাঁদ জানিয়েছে —

"ছোটো রানীর কি রূপলাবণ্য —
গোলাঙ্গিনী, শ্যামাবরণা, লম্বাগ্রীবা
ব(ঃস্থলে ভারি পয়োধর কি মনোহর!

এই বর্ণনা শুনে গম্ভীর মানুষও উচ্চস্বরে হেসে ওঠে।

প্রসঙ্গত বলি, যে সব রীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করে দীনবন্ধু 'সধবার একাদশী'তে হাসির আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন, তা তাঁর অন্য অনেক নাটকেও দেখা গেছে। তবে, 'সধবার একাদশী'র যে বিশেষত্ব তা হল উইট ও হিউমারের মেলবন্ধন এখানে ঘটেছে। একইসঙ্গে ক(ণ হাস্যরসের প্রয়োগও।

৩.২.৬.৩ আদর্শ প্র(াবলী

১। 'সধবার একাদশী' নাটকে নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো।

২। 'সধবার একাদশী' প্রহসনে হাস্যরসের অবতারণা কতখানি আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

৩। 'সধবার একাদশী' নাটকটির নামকরণে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মন্তব্যটি কতদূর সার্থক বুঝিয়ে বলো।

৪। 'সধবার একাদশী' নাটকটিতে কৌতুক রসের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করো।

————

পর্যায়গ্রন্থ - ২

একক - ৭

সংলাপ

বিন্যাস ত্র(ম :

৩.২.৭.১ সধবার একাদশী সংলাপ

৩.২.৭.২ 'সধবার একাদশী' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা'র তুলনামূলক আলোচনা

৩.২.৬.৩ আদর্শ প্র(াবলী

৩.২.৭.১ সধবার একাদশী সংলাপ

আমরা জানি, সংলাপ নাটকের প্রাণ। নাট্যকার সংলাপের ভাষাতেই চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ও বিবর্তনকে তুলে ধরেন। চরিত্রের মুখে সংলাপ বসিয়ে নাট্যকার কাহিনীর সূচনা, অগ্রগতি সাধন ও চরিত্রের সুস্থ সংগঠন রূপায়ণ করেন। তাই, নাটকের বিষয় ও চরিত্র উপযোগী সংলাপ না থাকলে নাটকে অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও তা ব্যর্থ হয়ে যায়। আর, মহৎ শিল্পীরা তাঁর শিল্পকর্মে এই সংলাপকে প্রাণবন্ত করার চেষ্টা করেন, যাতে তাঁর শিল্পকর্ম সার্থক হয়।

দীনবন্ধু মিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল চরিত্রানুযায়ী সংলাপ সৃষ্টি করা। স্বাভাবিক, কৃত্রিমতাশূন্য মুখের ভাষাকেই তিনি সংলাপ রূপে ব্যবহার করেছেন। এ(ে ত্রে (চি বা শালীনতার দিকে তিনি তাকাননি। 'সধবার একাদশী', তাই সংলাপে হয়ে উঠেছে জীবন্ত।

নিমচাঁদ 'সধবার একাদশী'র প্রধান চরিত্র। তাই, আমরা প্রথমে নিমচাঁদের সংলাপ নিয়ে আলোচনা করছি।

নিমচাঁদ শি(িত। প্রথম দর্শনেই বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপে সে দর্শকের মন কেড়ে নিয়েছে। বাংলার সাথে কিছু ইংরেজি শব্দ মিশিয়ে কথা বলে নিম প্রমাণ করেছে সে শি(িত ও ইয়ং বেঙ্গলদের স্বভাব করায়ত্ব করেছে। তার প্রত্যুৎপন্নমতি স্বভাব ও সংলাপে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। কাঞ্চনকে দেখে সে বলেছে —

> "উনি ত্রিদশাধিপতির প্রধানা
> নর্তকী, শাপভ্রষ্ঠে ধরণীধামে বার
> বিলাসিনীরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন,
> ওকে তুমি 'কাঞ্চন' বলে সম্বোধন কল্যে।"

আবার নিমচাঁদের বিচ(ণতাও টের পাওয়া যায়। কাঞ্চন প্রসঙ্গে সে যখন বলে —

> "পুণ্য পুঞ্জ পন্ড দেবি স্বৈরিনী!
> ধর্ম অর্থ কাম মো(বৈরিণী!"

নিমচাঁদ মদ খায় সত্য। কিন্তু, সংলাপের মধ্য দিয়ে নিজের প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপও বর্ষণ করেছে সে। অটল মধুসূদনের কাব্য পড়ে, অথচ মদ খায়, বেশ্যাগৃহে যায়। তাই, নকুল অটল মদ খায় কিনা জানতে চাইলে নিম বলে —

"পানায়, খায় না।"

তবে নিজের প্রতি ঘৃণাও নিমের সংলাপের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়েছে —

"আমি সকলের ঘৃণাস্পদ, আমি
জঘন্যতার জলনিধি, আমি আপনার
কুচরিত্রে আপনি কম্পিত হই।"

কৌতুকময় সংলাপও আমরা নিমচাঁদের মুখে শুনেছি। রামমাণিক্য নিমকে মদ খাওয়ার জন্য ধিক্কার জানালে নিম বলেছে —

"আমরা তো মদ মারি, আপনি
যে মাতাল মারেন।"

রামমাণিক্য ও ভোলাচাঁদের সংলাপে বিশেষত্ব আছে। বাংলা ভাষার সার্থক প্রয়োগ এই নাটকে যেমন ঘটেছে, তেমনি রামমাণিক্যের সংলাপে পূর্ববঙ্গীয় ভাষা দা(ণে সার্থকতা পেয়েছে। বাঙাল ভাষায় রামমাণিক্য একে একে জানিয়েছে —

১। "হালা দুইটা মোটোর দিবার পারেন না,
ক্যাবোল বাঙ্গাল কইবার পারেন।"

২। "পুঙ্গির বাই বাঙ্গাল কর্যা মস্তক
গুরাই দিচে। বাঙ্গাল কউস ক্যান ?
এতো অকাদ্য কাইচি, তবু কলকত্বার
মত হবার পারচি না, ...।"

৩। "জোবর তো — এত পান করবার
পারমু ক্যান।"

আর, ভোলা ভুল ইংরেজি সংলাপ ব্যবহার করে চরিত্রটিকে আলাদাভাবে হাজির করেছে। যেমন—

"আই ইন প্রেজেন্স ফাদার ইন্ ল ?"

কিম্বা —

"ইয়োর ডটার ইজ নাইন মন্থেস, ইয়োর
ডটার ইন নাইন মন্থেস স্যার।"

ভোলার এই সংলাপের মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় — ভোলা যেমন কৌতুকপ্রিয়, তেমনি অসম্পূর্ণ চরিত্রও। 'সধবার একাদশী'তে ইংরেজি সংলাপের পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে হিন্দি সংলাপ। অযোধ্যা সিংহ ও রঘুবীর রায়ের সংলাপ তার জ্বলন্ত প্রমাণ। যেমন —

অযোধ্য — হামারা লিলাট্ যে ভগবান
অ্যাছা দুখ লিখা হায়।

রঘুবীর — মন্ মে ধীর রাখ ভাইয়া, লিলাট
মে যো লিখা যা হো গিয়া।

অনেকগুলি হিন্দি কবিতা বা গানও 'সধবার একাদশী'তে আছে। যেমন রঘুবীর গেয়েছে —

"বিজু বন মিলে না লাকড়ি, সায়র -
মিলে না নীর, -
পড়ে উপাস্ কুবের ঘর যৌবিপচ্ছ রঘুবীর।"

কিম্বা

"বধিক বধে মৃগবান ছোঁ।
(ধ্‌রে দেহেও বাতায়,
অৎহিৎ অনহিৎ হোতা হায়
তুলসি দ্বরদিম পায়।"

এই হিন্দি সংলাপ শুনে সমালোচক জানিয়েছেন —

"এই প্রথম বাংলা সাহিত্যে
বিশেষতঃ বাংলা নাটকে হিন্দী
সংলাপের আবির্ভাব।"

[দীনবন্ধু মিত্র কবি ও নাট্যকার
মিহির কুমার দাস]

এবার মেয়েদের সংলাপে আসি। মেয়েদের সংলাপে ঘরোয়া বা লৌকিক ভাষাভঙ্গীর প্রকাশ ঘটেছে। —

সৌদামিনী — "তা ভাই দুধের সাধ তো
ঘোলে মেটে না, তা নইলে আমি
না নয় তোকে দুদিন দিই।"

কুমুদিনী — "তুই আর কাটা ঘায়ে
নুনের ছিটে দিসনে, তুই যে
ভাতার কামড়া তুই আবার অন্য
লোককে দিবি - - - - ।"

মেয়েলি বাক্‌ভঙ্গীও 'সধবার একাদশী'তে দেখা গেছে। যেমন —

দূর মড়া(
তুই ভাই(
হ্যা লা(ইত্যাদি।

মনে রাখতে হবে, বেশ কিছু ছড়া বা কবিতা সংলাপের সঙ্গে ‘সধবার একাদশী’তে দেখা গেছে। যেমন কুমুদিনী তার দুঃখ বোঝানোর জন্য সৌদামিনীকে জানিয়েছে —

“বলো দ্যাওরা রে এর ব্যাওরা কি?
নোন্দায়ের কোলে কেন শোয়না ঠাকুরঝি।”

সার্জেন্ট নিমচাঁদকে ধরলে নিমচাঁদ ছড়া কাটে —

“কড়ি দিয়ে কিনলেম,
দড়ি দিয়ে বাঁধলেম,
হাতে দিলেম মাকু,
একবার ভ্যা করো তো বাপু।”

বড়লোক অটলের টাকায় মদ খেয়ে নিমচাঁদ জানায় —

“আনাড়ির ঘোড়ালয়ে অপরেতে চড়ে,
ধনবানে কেনে বই, জ্ঞানবানে পড়ে।”

কাঞ্চন মূলতানে গায় —

“চলো লো সজনী সবে সরোজ কাননে যাই
সুশীতল সমীরণে জীবন জুড়াই।”

আবার, অনেক সময় নিমচাঁদ আর অটলচাঁদ মিলে রাইম রচনা করেছে —

অটল — “জানি! জানি!
আমি কি জানি?”

নিমচাঁদ — “জানি! জানি!
আমি কি জানি?
দাও পাণি।”

এছাড়াও দীনবন্ধু ‘সধবার একাদশী’তে ব্যবহার করেছেন — নানা প্রবাদ-প্রবচন(যা সংলাপকে প্রাণবন্ত করেছে। রয়েছে সংস্কৃত (্-াকও —

“রথে চ বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।”

বুঝতে পারি, দীনবন্ধু মিত্রের ‘সধবার একাদশী’ সংলাপে এইসব সংলাপ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। চরিত্রের মুখে উপযোগী সংলাপই দীনবন্ধু তুলে দিয়েছেন। আর তাতে বৃদ্ধি পেয়েছে ‘সধবার একাদশী’র সার্থকতা।

৩.২.৭.২ ‘সধবার একাদশী’ ও ‘একেই কি বলে সভ্যতা’র তুলনামূলক আলোচনা

মধুসূদন দত্তের দুটি উল্লেখযোগ্য প্রহসন হল ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ ও ‘বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ’। ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ রচিত হওয়ার ছয় বছর পরে রচিত হয় ‘সধবার একাদশী’। দুটি প্রহসন আলোচনার মধ্যে দিয়ে প্রহসন রচয়িতা হিসাবে মধুসূদন দত্তের মূল্য বিচার করা যেতে পারে। কারণ দুটি

প্রহসনই যেন একে অপরের পরিপূরক। একটি প্রহসন আলোচনার মধ্যে দিয়ে মধুসূদনের মূল্য বিচার করা ঠিক হবে না। দুটি প্রহসনকে পাশাপাশি রেখে বিচার করা হল।

‘একেই কি বলে সভ্যতা’র সঙ্গে ‘সধবার একাদশী’ প্রহসনের মিল

১। প্রহসন দুটির বিষয় এক। এখানে সমাজের বাবুশ্রেণীর লোকের চরিত্র চিত্রণ করা হয়েছে। তথাকথিত আধুনিক ইংরেজি শি(ায় শি(েত এবং সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তি(দের মাদক সেবন ও বেশ্যালয়ে যাওয়া এইসব নিয়েই লেখা।

২। দুটি প্রহসনেই মাতাল এবং লম্পটদের উন্মত্ত জীবনের কথাই বর্ণিত।

৩। পারিবারিক দিক দিয়েও বিষয়গত মিল আছে। পারিবারিক গঠনও উল্লেখনীয়। পরিবারের সন্তানদের নষ্ট হয়ে যাওয়ার বিষয়টি বেদনাদায়ক।

৪। দুটি প্রহসনই ব্যঙ্গমূলক। ব্যাঙ্গাত্মক রচনার গুণগুলি এখানে বর্তমান।

৫। প্রহসন দুটির কেন্দ্রবিন্দু হল কলকাতা শহর। উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন ও বাবুদের শখের পরিচয় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। রাস্তায় বহু লোকের সমাবেশ ঘটিয়ে কলকাতা শহরের বাস্তব রূপটি চিত্রিত হয়েছে।

৬। এখানে গৃহস্থ নারীদের অবহেলা করা হয়েছে।

৭। প্রহসন দুটি মূল চরিত্র সেভাবে দেখা যায় না। তবে টাইপ চরিত্রগুলি অত্যন্ত প্রাণবন্ত।

৮। ভাষাগত মিল দেখা যায়। এখানে কলকাতার কথ্যভাষাকে কেন্দ্র করেই সংলাপ গড়ে উঠেছে। নানারকম স্তরের মানুষকে আলাদা করা হয়েছে তাদের সংলাপের মাধ্যমে। বিভিন্ন পেশার মানুষের মধ্যেও সংলাপের বৈচিত্র্য ল(করা যায়।

প্রহসন দুটির অমিল —

১। ‘সধবার একাদশী’ প্রহসনের ছোট বড় দৃশ্য মিলে মোট নয়টি। অর্থাৎ প্রহসনটি আয়তনে বড়। ‘একেই কি বলে সভ্যতায়’ চারটি ছোট দৃশ্য নিয়ে গঠিত। অর্থাৎ এটি আয়তনে ছোট।

২। ‘সধবার একাদশী’তে উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলি মিলে মোটামুটিভাবে বলা যায়। ‘একেই কি বলে সভ্যতায়’ আয়তনে ছোট হওয়ার জন্য চরিত্রসংখ্যাও কম। উল্লেখযোগ্য চরিত্র পাঁচ।

৩। ‘সধবার একাদশী’ প্রহসনের মধ্যে যে নাটকীয় ভাব থাকা দরকার তা আছে। অনেক দৃশ্যে মাতলামি, বখামি ও লাম্পট্যের চিত্র ফুটে উঠেছে। ‘একেই কি বলে সভ্যতায়’ এখানে মাত্র একটি দৃশ্যে মাতলামি, বখামি ও লাম্পট্যের চিত্র আছে।

৪। ‘সধবার একাদশী’তে আধুনিক সমাজের নতুন শি(েত বিভিন্ন স্তরের মানুষের মনোবিকৃতির প্রতি সুদৃঢ় আত্র(মণ ও কটা(করা হয়েছে। ‘একেই কি বলে সভ্যতায়’ এই প্রহসনে জোরালো ভাবে কোনও দৃষ্টিপাত করা হয়নি। নব্য শি(েত পথভ্রষ্টদের প্রতি সাধারণভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

৫। ‘সধবার একাদশী’তে অনেক চরিত্রের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ‘একেই কি বলে সভ্যতায়’ মাত্র তিনটি চরিত্রকে আলোকপাত করেছে।

৬। ‘সধবার একাদশী’তে নিমচাঁদ চরিত্রটিকে যথেষ্ট গু(ত্ব দেওয়া হয়েছে। ‘একেই কি বলে সভ্যতায়’ সেরকম কোনও চরিত্র নেই।

উপরে যে পার্থক্যগুলি দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে প্রথম প্রহসনটি বেশি নাটকোচিত গুণসম্পন্ন। শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে প্রথম ‘সধবার একাদশী’। তবে দুটি প্রহসনকে পাশাপাশি রেখে বিচার করলে দেখা যায় ‘একেই কি বলে সভ্যতা’র দ্বারা ‘সধবার একাদশী’ প্রভাবিত হয়েছে। যদিও প্রথম প্রহসন ‘একেই কি বলে সভ্যতা’র ছয় বছর পরে ‘সধবার একাদশী’ রচিত হয়েছে। তবুও একে অপরের পরিপূরক।

৩.২.৭.৩ আদর্শ প্র(্নাবলী

১। সংলাপ রচনায় দীনবন্ধু ‘সধবার একাদশী’তে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন— বি(্-ষণ করে বুঝিয়ে দাও।

২। ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ ও ‘সধবার একাদশী’ প্রহসন দুটির তুলনামূলক আলোচনা করো।

————

পর্যায়গ্রন্থ - ২

একক - ৮

চরিত্র বিচার

বিন্যাস ত্র(ম :

৩.২.৮.১ সধবার একাদশী চরিত্র বিচার

৩.২.৮.২ আদর্শ প্র(াবলী

৩.২.৮.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩.২.৮.১ সধবার একাদশী চরিত্র বিচার

প্রত্যেক মহৎ নাট্যকারই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ও বিবর্তনকে তুলে ধরেন। শিল্পী তাঁর আপন শিল্পপ্রতিভার আলোকে চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলেন। দীনবন্ধু মিত্র ছিলেন এরকমই একজন নাট্যশিল্পী। উচ্চপদস্থ কর্মচারী দীনবন্ধু সকল লোকের সঙ্গে অবাধভাবে মেলামেশা করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাই বলেছেন —

"লোকের সঙ্গে মিশিবার তাঁহার অসাধারণ শক্তি(ছিল (

তিনি আ(াদপূর্বক সকল শ্রেণীর সঙ্গে মিশিতেন।"

তাই 'সধবার একাদশী'তে আমরা পেয়েছি অসংখ্য চরিত্র। এরা কেউ ভদ্র, কেউ অ(ীল, কেউবা অসম্পূর্ণ। নিম্নে এদের সম্পর্কে সং(প্ত আলোচনা করা হল।

নিমচাঁদ

'সধবার একাদশী'র প্রধান চরিত্র নিমচাঁদ। নিমচাঁদের কাছে সব চরিত্র ম্লান হয়ে গেছে। বাক্‌চাতুর্য, বুদ্ধিদীপ্ততা, সরসতা ও বিদ্যাবুদ্ধির গুণে নিমচাঁদ হয়ে উঠেছে অসাধারণ।

নিমচাঁদ অটলের ভাল বন্ধু। পাপপুণ্যের হিসাব নিম করে না। সে মদ্যপান করে। ঘরে সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও বেশ্যালয়ে যায়। সে যে শি(ত তা তার কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সহজেই অনুধাবন করা যায়। কথায় কথায় ইংরেজি উদ্ধৃতি সে উচ্চারণ করে। ইংরেজি শাণিত ভাষায়, যুক্তি(র প্রাবল্যে ও বুদ্ধিদীপ্ততায় প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধকে সে আঘাত করেছে। সকলের ভণ্ডামিকে, মিথ্যাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সমাজকে সে তীব্র-তী(((-ষ ও উচ্চহাস্যে বিদ্রূপ করেছে।

জানি, মদের জন্য নিম আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়েছে। তবে, নিজের পতনের জন্য আ(পও তার মধ্যে দেখা গেছে —

"আমি সকলের ঘৃণাস্পদ, আমি
জঘন্যতার জলনিধি, আমি আপনার
কুচরিত্রে আপনি কম্পিত হই।"

বুঝতে পারি, ট্র্যাজিক স্পর্শ নিমচাঁদ পেয়েছে।

অটল

অটল 'সধবার একাদশী'-র অন্যতম চরিত্র। সে বাবু কালচার আয়ত্ত করতে চায়। স্ত্রী কুমুদিনী জানায় —

"কিসে লোকে বাবু বলবে, কেবল তাই দেখে।"

বাবু হতে গিয়ে অটল মদ খেয়েছে, বারবিলাসিনীর ঘরে গিয়েছে স্ত্রীকে ছেড়ে। ন্যায়নীতি বোধ, বিবেক সবকিছু সে মদ আর বেশ্যাতে বন্ধক রেখেছে।

দুষ্টু বুদ্ধি অটলের যথেষ্টই আছে। মা বাবার দুর্বলতার সুযোগ সে সহজেই নিয়েছে। আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে মাকে সে করায়ত্ব করেছে। আর মায়ের সাহায্যে বাবাকে হাতের মুঠোয় এনে প্রচুর অর্থ ও চরম উচ্ছৃঙ্খলতার অবাধ অধিকার সে ছিনিয়ে নিয়েছে।

অটল নিমচাঁদের বিশিষ্ট বন্ধু। নিমকে সে নানা কাজে সাহায্য করেছে। এককথায় চরিত্রটি একটু স্বাতন্ত্র্য।

গোকুলবাবু

গোকুল ভদ্র চরিত্র। সে সচ্চরিত্র, পত্নীপ্রেমিক, পরোপকারী, জনসেবক ও ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত(। ন্যায়-নীতিবোধ তার মধ্যে যথেষ্ট আছে। তাই তো আগে মদ খেলেও 'মদ্যপান নিবারণী সভায়' নাম লেখানোর পর সে আর মদ খায় না।

গোকুল বুদ্ধিমান ও বিচ(ণ। সে জানে অটলকে মদ থেকে বিরত করা যাবে না। তবুও সে আত্মীয় জীবনচন্দ্রের অনুরোধে অটলকে মদ খেতে নিষেধ করেছে। এর মধ্য দিয়ে গোকুলের মানবিকতার পরিচয় পাওয়া গেছে।

জীবনচন্দ্র

জীবনচন্দ্র অটলের পিতা। তিনি সমাজে মান্যগণ্য এবং ধনবান। অটলের অধঃপতনে তিনি ব্যথিত। গোকুলের সহায়তায় পুত্রকে ভালো করার চেষ্টা তিনি করেছেন। কিন্তু ব্যর্থ হলে পুত্রকে বাঁচাতে কাশী যাবার কথা ভেবেছেন।

জীবনচন্দ্রের মধ্যে পিতার কর্তব্য ও দুঃশ্চিন্তা দুই-ই আছে। অটলের মদ খাওয়া দেখে তিনি হতাশ হয়েছেন। আবার মদ ছেড়ে দিলে দুরারোগ্য রোগ হবে শুনে ভয়ও পেয়েছেন।

জীবন স্ত্রৈন্য। নিজের হৃদয়ের দুর্বলতা তার মধ্যে গোপনে থাকেনি। তবে বাৎসল্য প্রেম ও পত্নীপ্রেমে চরিত্রটি অসাধারণ।

রামমাণিক্য

দীনবন্ধু রামমাণিক্য চরিত্রের মধ্য দিয়ে Dramatic Relief ঘটিয়েছেন। চরিত্রটি নির্মল হাসির উদ্রেক করেছে।

রামমাণিক্য কলকাতার সভ্য হবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার বাঙ্গাল কথাবার্তা তা হতে দেয়নি। সে অটল ও নিমচাঁদের মতো হবার কথা ভেবেছে এবং এ জন্য প্রচুর মাতলামি করেছে। তবে ভিতরে ভিতরে একটা হীনমন্যতায়ও সে ভুগেছে।

রামমাণিক্য স্ত্রৈন্য নয়, তবে পত্নী ভাগ্যবরীর প্রতি তার বি(াস অবিচল। চরিত্রটি বেশ আকর্ষণীয়।

ভোলাচাঁদ

অটলের প্রাণের বন্ধু ভোলাচাঁদ। ভোলা কথায় কথায় ভুল ইংরেজি বলে। আড্ডার আসরের প্রবীণদের সে ফাদার-ইন-ল সম্বোধন করে। আবার নিজের স্ত্রীর সন্তান-সম্ভাবনাকে সে অ্লীল ভাষায় অনায়াসেই বলতে পারে। এক কথায় চরিত্রটি বেশ হাস্যকর।

নকুলে্বর

নকুলে্বর হাইকোর্টের উকিল। সে মদ খায়, আবার বেশ্যা বাড়িতেও যায়। অটলও তারমধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। তবে, নিমকে সে যথেষ্ট মূল্য দেয়। মদের আড্ডায় সে নিমের কথাকে মান্য করে। তার মধ্যে কিছুটা সুস্থিরতা আছে। আবার তার আচরণও বেশ স্বাভাবিক।

কেনারাম

কেনারাম বাবু কালচারের প্রতিনিধি। সে সত্যবাদী হাকিম। কিন্তু, ভী(, নীতিবর্জিত ও মূর্খ।

কুমুদিনী

কুমুদিনী অটলের স্ত্রী। সুন্দরী। কিন্তু, অটল তাকে ছেড়ে অন্য মেয়েমানুষে আসক্ত(। এর জন্য কুমুদিনীর বেদনার শেষ নেই। ননদিনী সৌদামিনীর সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তার জীবনযন্ত্রণার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামী থেকেও সে স্বামীসঙ্গসুখ বঞ্চিতা। তাই বারবার সে স্বামীর মৃত্যু কামনা করেছে। আ(প করে বলেছে —

“এক মরে যায়, জানলুম আপদ গেল

চোখের উপর এ পোড়ানি সহ্য হয় না—”

সমকালীন সমাজজীবনের বঞ্চিতা নারীরূপে স্থান পেয়েছে কুমুদিনী। সত্যিই তাকে দেখলে ক(ণা হয়।

সৌদামিনী

সৌদামিনী অটলের আদরের বোন। সে খুব ভালো মেয়ে। অতীব ভদ্র, নম্র। সে স্বামী সোহাগিনী। বৌদির জন্য তার সহানুভূতি অপরিসীম। দাদা অটলকে সে ঘৃণা করে। কামনা করে অমন স্বামী যেন আর কারও না হয়। এককথায় চরিত্রটি বেশ উপভোগ্য।

অটলের মা

অটলের মা (ুদ্র চরিত্র। পুত্রের মনোরঞ্জনের জন্য সে র(িতাকেও বাড়িতে রাখতে চেয়েছে। স্বামীকেও সে পুত্রের সব কথা শুনতে বাধ্য করেছে। কেন না, সে ভয় পেয়েছে তার একটিমাত্র পুত্র যদি আত্মহত্যা করে। অটলের মায়ের এই বাৎসল্য প্রেমই চরিত্রটিকে অনন্য করে তুলেছে।

কাঞ্চন

কাঞ্চন ‘সধবার একাদশী’র অন্যতম নারী চরিত্র। বারবিলাসিনী রূপে তার খ্যাতি আছে। অটল আর নিমচাঁদকে সে বন্দী করে রেখেছে তার জালে।

তবে দেহবিক্রি(তার পেশা হলেও কাঞ্চন কিন্তু মানবিকতা বর্জিত নয়। সে সর্বনাশী সত্য, তবে পেটের দায়ে এ কাজ করতে সে বাধ্য হয়েছে। অটলের প্রতি কাঞ্চনের দুর্বলতা প্রবল। অটল একদিন তার কাছে না গেলে সে কষ্ট পায়। অটলের মাথাযন্ত্রণা হলে গোলাপ জল দেয়। অটলের প্রতি ভালোবাসার

টানে সে বলে—

"আমায় ভাই ঘরের মাগ করে
তুলেছে, কারো কাছে যেতে দেয়
না। ওর মায়ের জন্যে আমি
ভাই এত সহ্য করি।"

বুঝতে পারি, কাঞ্চন বহুচারিনী হয়েও একচারিনী হয়েছে অটলের ভালোবাসার জোরে। বস্তুত দীনবন্ধুর সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়নি কাঞ্চন।

৩.২.৮.২ আদর্শ প্র(্নাবলী

১। 'সধবার একাদশী' নাটকে নিমচাঁদ চরিত্রে মধুসূদনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় কি? তোমার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দাও।

২। 'সধবার একাদশী'-তে নাট্যকাহিনী নিয়ন্ত্রণে নারী চরিত্রগুলির অবদান কতটা ব্যাখ্যা করো।

৩। 'সধবার একাদশী' নাটকে নিমচাঁদ চরিত্র চিত্রণে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের কৃতিত্ব নিরূপণ করো।

৪। সমকালীন সমাজ জীবনের প্রেক্ষিতে নিমচাঁদ চরিত্র বিশ্লেষণ করো।

৩.২.৮.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। ড. অজিত ঘোষ 'নাটকের কথা' সাহিত্যলোক (১৯৯৬) কলকাতা।

২। ড. (্ত্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সধবার একাদশী' পুস্তক বিপণি (১৯৭৫) কলকাতা।

৩। ত(ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সধবার একাদশী' ক(ণা প্রকাশনী (২০০৭) কলকাতা।

৪। নির্মলেন্দু ভৌমিক সম্পাদিত 'সধবার একাদশী' শিলালিপি (১৯৯৭) কলকাতা।

৫। মিহিরকুমার দাস 'দীনবন্ধু মিত্র কবি ও নাট্যকার' বুকল্যান্ড প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।

৬। শ্রী বৈদ্যনাথ শীল 'বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা' এ. কে. সরকার এণ্ড কোং (১৯৭৬), কলকাতা।

৭। ড. অজিত কুমার ঘোষ 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' দে'জ পাবলিশিং (১৯৯৭), কলকাতা।

————

পর্যায়গ্রন্থ - ৩

একক - ৯

ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে 'কৃষ্ণকুমারী'র সার্থকতা

বিন্যাস ত্র(ম :

৩.৩.৯.১ ভূমিকা
৩.৩.৯.২ নাট্যকার মধুসূদন ও নাট্যবৈশিষ্ট্য
৩.৩.৯.৩ ঐতিহাসিক নাটক — সংজ্ঞা-স্বরূপ বৈশিষ্ট্য
৩.৩.৯.৪ ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে লেখা কিছু গ্রন্থ
৩.৩.৯.৫ কৃষ্ণকুমারী নাটকের কাহিনী ও মধুসূদন
৩.৩.৯.৬ কৃষ্ণকুমারী নাটকের গঠনকৌশল
৩.৩.৯.৭ ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে 'কৃষ্ণকুমারী'র সার্থকতা
৩.৩.৯.৮ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.৩.৯.১ : ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন মূলত কবি হিসেবে, বিশেষত অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক হিসেবেই খ্যাত। তিনি বাংলা থিয়েটার ও নাটকের ক্ষেত্রে এক বিশেষ যুগে যে প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন সেকথা সচরাচর আলোচিত হয় না; সর্বোপরি তাঁর কাব্যপ্রতিভা নাট্যপ্রতিভাকে ক্ষুন্নতো করেইনি বরং তা আরও সমৃদ্ধ করেছে।

মধুসূদন দত্তের নাট্যরচনার প্রথম প্রেরণা বেলগাছিয়া নাট্যশালা ও তার পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ যেমন, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখেরা। বেলগাছিয়া নাট্যশালা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠার পর নতুন বাংলা নাটকের চাহিদা বিশেষভাবে উপলব্ধ হয়। উদ্যোক্তারা তৎকালীন যুগের খ্যাতনামা নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নকে শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' নাটক বাংলায় অনুবাদ করে তা বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনয়ের জন্য দেন। ইউরোপীয় ও অবাঙালি দর্শকদের কাছে নাটকটি উপভোগ্য করে তোলার জন্য তারা 'রত্নাবলী'র ইংরেজি অনুবাদ মুদ্রণের মনস্থ করেন। মধুসূদনের অকৃত্রিম বন্ধু এবং উক্ত নাট্যশালার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক গৌরদাস বসাকের মধ্যস্থতায় 'রত্নাবলী' অনুবাদ করতে গিয়েই মধুসূদনের মনে প্রথম নাট্যচিন্তা জাগ্রত হল। এ প্রসঙ্গে মধুসূদনের জীবনচরিত রচয়িতা যোগীন্দ্রনাথ বসু মন্তব্য করেছেন—

"রত্নাবলীর এই ইংরেজী অনুবাদ হইতে মধুসূদন তাঁহার জীবনের গন্তব্যপথ প্রাপ্ত হইলেন।"

(মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত ঃ পৃ-১৫৯)

একদিন 'রত্নাবলী'র রিহার্সাল দেখতে দেখতে মধুসূদন গৌরদাসবাবুকে বললেন—"দেখ, কি দুঃখের বিষয় যে, এই একখানা অকিঞ্চিৎকর নাটকের জন্য, রাজারা এত অর্থব্যয় করিতেছেন।" গৌরদাসবাবু শুনে বললেন—"নাটকখানা যে অকিঞ্চিৎকর তাহা আমরাও জানি; কিন্তু উপায় কি? বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় নাটক আমরা অভিনয় করি, ইহা অবশ্যই তোমার ইচ্ছা নয়। ভাল নাটক পাইলে,

আমরা 'রত্নাবলী' অভিনয় করিতাম না, কিন্তু ভাল নাটক বাংলা ভাষায় কোথায়?" মধুসূদন বললেন, "ভাল নাটক? আচ্ছা, আমি রচনা করিব?"

শুরু হল নাট্যরচনা। তিনি অনুভব করেন সংস্কৃত নাটকের নিরস আক্ষরিক অনুবাদ কখনই প্রকৃত নাটক সৃষ্টির উপযোগী হবে না। উপরন্তু তিনি দর্শকদের মৌলিক বাংলা নাটকের প্রতি আগ্রহের কথা স্মরণ রেখেই প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) রচনা করেন। 'শর্মিষ্ঠা'র প্রস্তাবনায় শুধু বাংলা নাটকের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থাই প্রকাশ পায়নি, ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকারদের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাও প্রকাশ পেয়েছে, তিনি লেখেন—

"... ... কোথায় বাল্মীকি ব্যাস কোথা তব কালিদাস
কোথা ভবভূতি মহোদয়?
অলীক কুনাট্যরঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।"

(জীবন চরিত ঃ পৃ-১৭২)

'শর্মিষ্ঠা' নাটক লেখার অনেক আগে থেকেই মধুসূদন দত্ত গ্রীক ও ইংরেজি নাটক বিশেষত শেক্সপীয়রের নাটকের সঙ্গে খুবই পরিচিত ছিলেন।

তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) গ্রীক পুরাণের ছায়াপাতে রচিত হয়েছে। 'পদ্মাবতী'র আখ্যায়িকাটি যদিও গ্রিক পুরাণ থেকে পরিগৃহীত তথাপি মধুসূদন দত্ত একে এমন দেশিরূপ দান করেছেন, তাঁর অনুকরণাংশও মৌলিক বলে মনে হয়।

অতঃপর রাজপুতদের ইতিহাস নিয়ে তিনি লিখলেন 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১)। রচিত হল বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি নাটক। এছাড়া তিনি 'রিজিয়া' ও 'মায়াকানন' (১৮৭৪) নামে দুখানি নাটক রচনা করেন। ১৮৬০ সালের গোড়াতেই পুরো ইউরোপীয় ধাঁচে রচনা করলেন 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা?' নামক দুটি প্রহসন। বলা বাহুল্য যে, এই দুটি প্রহসনই প্রথম বাংলা সাহিত্যের সার্থক প্রহসন।

৩.৩.৯.২ : নাট্যকার মধুসূদন ও নাট্যবৈশিষ্ট্য

মধুসূদন মূলত নিজের পায়ের ওপর অর্থাৎ কোনো কিছুর দাসকতা না করে মৌলিক নাটক রচনায় উৎসাহী হন। তাঁর নিজস্ব চিন্তা ভাবনা ছিল নাট্যাদর্শের প্রতি; কখনই সংস্কৃত নাটকের দাসসুলভ মনোভাব তাঁর ছিল না। তিনি বলেছেন—

"I shall look to the great dramatist of Europe for models."

তিনি জোর দিয়ে বলেন—

"আমি একটা নেকটাই বা ওয়েস্টকোট ধার করতে পারি গোটা স্যুট কখনোই নয়।"

অর্থাৎ ইউরোপীয় আদর্শকেও তিনি হুবহু অনুসরণ করবেন না। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'য় স্বাধীন পথ ও অনুবর্তী হয়ে চলতে পারেননি, কারণ তাঁর দর্শকের অধিকাংশই পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শের সঙ্গে বেশি পরিচিত নন, বরং সংস্কৃত নাট্যাদর্শই তাঁদের কাছে অনেক পরিচিত।

(ক) মধুসূদনই প্রথম নাট্যকার যিনি ইংরেজি নাট্যাদর্শ অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন এবং তাঁর প্রথম দুটি নাটকে ইংরেজি নাট্যাদর্শ প্রয়োগ করেন। প্রথমে তিনি সফল না হলেও পরবর্তীতে তিনি সফল হন।

(খ) ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক কাহিনিকে আশ্রয় করে তিনি নাটকের পরিধিকে আরো বিস্তৃত করেন। বিভিন্ন দেশের পুরাণ কাহিনিকে তিনি দেশীয় রূপদান করেন। দেশের লোককে বিদেশের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত করার মহান প্রচেষ্টা তাঁর নাটকে মেলে।

(গ) গণসংগ্রামের রূপ তাঁর নাটকেই প্রথম দেখা যায়। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে জমিদারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদের রূপ দেখতে পাওয়া যায়। এর ফলেই পরবর্তী নাট্যকাররা এই আদর্শ গ্রহণ করেন।

(ঘ) একটা পূর্ণাঙ্গ আখ্যান কাহিনি যে নাটকের পক্ষে প্রয়োজন তা তিনি প্রথম অনুভব করেন। নাটকীয় দ্বন্দ্ব, সংঘাত-এর ফলপ্রসূত ব্যক্তিজীবনের ওঠানামা তাঁর নাটকে লক্ষ করা যায়।

(ঙ) জাতীয় চেতনা গঠনের ক্ষেত্রে যে বিশেষ শক্তি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে তা হল দেশপ্রেম। এই দেশপ্রেমকে তিনি নাটকের মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন।

(চ) যুগের অস্থিরতা, জাতির কোন্দল, পারস্পরিক কলহ, ঈর্ষা, নারী লোলুপতাকে তিনি নাটকের মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন।

(ছ) নাটক লেখা হয় মুখ্যত অভিনয়ের উদ্দেশ্যে। সাহিত্য বা কাব্য হিসেবে তার অন্যতর আবেদন থাকতে পারে, কিন্তু মঞ্চ ও দর্শকের প্রয়োজনেই নাটকের সৃষ্টি। এ সত্য মধুসূদন জানতেন। তাই তিনি নাটকাভিনয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ জোর দেন।

(জ) মধুসূদনের নাটকে মানুষ, তুচ্ছ, ক্ষুদ্র নয়, দেবতার হাতে নিছক ক্রীড়নক নয়। সে অমিত শক্তি, অপার বীর্যের অধিকারী।

৩.৩.৯.৩ : ঐতিহাসিক নাটক-সংজ্ঞা-স্বরূপ বৈশিষ্ট্য

ইতিহাস শব্দটি থেকে উদ্ভব হয়েছে 'ঐতিহাসিক' শব্দটি। ইতিহাস শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'এই রূপ ছিল' (ইতি হ আস)। এই 'ছিল'র মধ্য দিয়ে অতীতকালের আভাস পাওয়া যায়। ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে—

> "ইতিহাস-এর ক্ষেত্র এখন একটু ব্যাপকভাবে ধরা হয়— জাতির সর্বাঙ্গীণ সংস্কৃতির বিকাশের কথা তাহার ইতিহাসের মধ্যেই আজকাল গৃহীত হইয়া থাকে। ... কোনো জাতির বা মানব সমাজের ইতিহাস হইতেছে, তাহার সভ্যতার ও সংস্কৃতির ইতিহাস।"
>
> (ইতিহাস ও সংস্কৃতি; সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষণের অংশ বিশেষ)

অ্যারিস্টটল কাব্য ও ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করবার জন্য বলেছেন—

> "Poetry is something more Philosophic and of greater important than history, since its statements are of the nature rather of universal, where as those of history are singulars."

'Universal' বা 'সর্বজনীন' কথাটির ব্যাখ্যাকালে তিনি বলে দেন যে, কাব্যে কোনো এক ব্যক্তির

সম্ভাব্য ও অপরিহার্য পরিণাম কার্যে বা ঘটনাবলীতে বর্ণিত হয় কিন্তু ইতিহাসে থাকে অনুষ্ঠিত কার্যের বিবরণ। আলকিবাইডেস যা করেছেন অথবা তাঁর প্রতি যা অনুষ্ঠিত হয়েছে তা ইতিহাসের বিষয়। ইতিহাসে থাকে তথ্যের অপক্ষপাত প্রাচুর্য, কিন্তু কবিকে তা থেকে সত্য নির্বাচন করতে হয়। এই নির্বাচনকে আশ্রয় করে তিনি নতুন করে সৃষ্টি করেন। গ্রীসের নাট্যকারগণ প্রচলিত কাহিনি নিয়ে নাটক লিখেছেন কিন্তু সেই কাহিনিকে তাঁরা নতুনভাবে বিন্যস্ত করেছেন। যে কাহিনি ছিল খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত তার মধ্যে ধারাবাহিকতা ও পারম্পর্য এনে এবং কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত করে তাঁরা আখ্যানের (plot) বৃত্ত রচনা করেছেন। ইতিহাসের সুপরিচিত কাহিনি গ্রহণ করলেও কবিকে তা সম্ভাব্য ও অপরিহার্য ঘটনা ধারায় সুবিন্যস্ত ও পরিণাম দান করতে হয়। অ্যারিস্টটলের বক্তব্য হল—

> "And if he should come to take a subject from actual history, he is none the less a poet for that."

'ঐতিহাসিক নাটক' কথাটির অর্থ খুবই ব্যাপক। সি. এফ. টুকার ব্রুক লিখেছেন—

> "The term History Play is difficult of precise theoretic limitation; and in proctise, the differentiation of the strict members of this new type from those plays on historical subjects which follow the more conservative rules of comedy or tragedy is a take approaching impossibility....."
>
> (The Tudor Drama : Chapter - IX ... The History Play)

যেহেতু কবি আপনার যুক্তি ও কল্পনাবলে সত্যকে প্রকাশ করেন, বিক্ষিপ্ত তথ্যরাজি থেকে চরিত্রের স্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত করেন এবং কাহিনির মধ্যে ধারাবাহিকতা এনে দেন, সেইহেতু ইতিহাসের তুলনায় কাব্যকে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ বলে অ্যারিস্টটল বলেছেন।

ঐতিহাসিক প্রকৃত বৃত্তান্তকে প্রকৃত রূপে গ্রহণ করে বর্ণনা করতে সচেষ্ট হন। কিন্তু যা প্রকৃত তাও লেখকগণের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়ে থাকে। অসাধারণ লোককে প্রকৃতভাবে জানা আরো কঠিন। অতীত বৃত্তান্ত থেকে তাঁর যথার্থ প্রতিকৃতি নির্মাণ করা কঠিন, কেননা সেই ক্ষেত্রে লেখককে প্রমাণ ও অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়। 'কৃষ্ণচরিত্র' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, ইতিহাসমাত্রই বহুল পরিমাণে লেখকের অনুমান ও পাঠকের বিশ্বাশের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কবির অনুমান ঐতিহাসিকের অনুমান অপেক্ষা প্রকৃত ইতিহাসের অর্থাৎ সার্থক সত্যের কাছাকাছি। কবি চিত্রকরের ন্যায় শুধু বহিরঙ্গ রূপ নয়, অন্তরঙ্গ পরিচয় ও ব্যক্ত করেন। ইতিহাস বহিরঙ্গ ঘটনা বর্ণনায় সীমাবদ্ধ থাকে।

ঐতিহাসিক পক্ষপাতপুষ্ট না হলে তথ্যসমূহ পাঠ, নির্বাচন, তুলনামূলক আলোচনা ও যুগ-পরিচয়ের আলোকে যা অনুমান করেন তা বিচারবুদ্ধি আশ্রিত সিদ্ধান্ত। কবি যে প্রকৃত ইতিহাসের সমীপবর্তী হন তার কারণ হল যে, তিনি ইতিহাসের কাহিনিটিকে নতুন করে বিন্যস্ত করেন। উপরন্তু, কবির দৃষ্টি থাকে ইতিহাসের চরিতরসমূহের উপর। তাদের জীবনের আলোকে ঘটনাবলী নতুন তাৎপর্য লাভ করে থাকে।

সাহিত্যের যে কোনো বিভাগে আমরা সমগ্র মানুষকে প্রত্যাশা করে থাকি। সাহিত্যের মধ্যে শেক্সপীয়রের নাটকে, দুর্দু এলিয়টের নভেলে, সুকবিদের কাব্যে সেই প্রচ্ছন্ন মনুষ্যত্ব মুক্তিলাভ করে। তারই সংঘাতে আমাদের মন আগাগোড়া জেগে ওঠে; 'আমরা আমাদের প্রতিহত হাড়গোড় ভাঙ্গা ছাইচাপা অন্দ্বহীন জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করি।'

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করে নিই যে, সাহিত্য পাঠের আনন্দের কারণ হল যে, আমরা তার মধ্যে আমাদের নতুন করেও সম্পূর্ণরূপে জানতে পারি। যেহেতু ঐতিহাসিক উপন্যাস

যুগনায়ক অর্থাৎ কালের সারথীদের কাহিনী বর্ণনা করে, যাদের উত্থান-পতনের সঙ্গে জাতির ভাগ্য বিজড়িত, তাদের পরিচয় সম্ভূত 'রসাবেগ আমাদিগকে অত্যন্ত নিকটে আসিয়া আক্রমণ করে'। ক্ষণকালের জন্য তাঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আমাদেরকে জীবনের ক্ষুদ্র পরিধি থেকে মুক্তিদান করে থাকে। আমরা কালগত ব্যবধান 'ভুলিয়া তাহাদের জীবনধারার সহিত একাত্মতা স্থাপন করিয়া বসি।' একে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের প্রকৃত রসাস্বাদ বলেছেন।

ইতিহাসে অনেক সময় শুষ্ক ইন্ধনের ন্যায় রাশীকৃত তথ্য পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কবির কাব্যে সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আসলে ঐতিহাসিকের লক্ষ থাকে যুগের অভিপ্রায় ও প্রবহমান ধারাকে প্রকাশ করবার দিকে, কিন্তু কবি মানব-জীবনগত সত্যকে প্রকাশ করে রসসৃষ্টি করতে চান। যেহেতু তিনি তথ্যসমূহ সুবিন্যস্ত করে ইতিহাসের ধারা ও মানব চরিত্রকে পরিপুষ্ট করতে চান সেই অর্থে তিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। এই কারণে বাল্মীকি রাম-চরিত্রের অজ্ঞতা হেতু তাঁর কাহিনি রচনা করবার জন্য আশঙ্কা প্রকাশ করলে, দেবর্ষি নারদ তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, 'ঘটে যাহা সব সত্য নহে, যা রচিবে সেই সত্য হবে'। যুক্তি ও কল্পনাবলে সত্যকে উদ্ধার করে প্রকাশ করা হল কবির ধর্ম। এই সত্য হল জীবনাশ্রিত রূপ ও রসের সত্য। রসসৃষ্টি ঐতিহাসিক উপন্যাসের একমাত্র উদ্দেশ্য ও এইহেতু ঔপন্যাসিক ইতিহাসের উপকরণ ব্যবহার করে থাকেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, আলঙ্কারিকগণ প্রকার নয় প্রকর মূল রসের কথা বলেছেন, কিন্তু সেগুলি ছাড়াও আরও অনেকগুলি মিশ্ররস আছে। এদের একটাকে ঐতিহাসিক রস নাম দেওয়া যায়। এই রস মহাকাব্যের প্রাণস্বরূপ। ইতিহাসের সংশ্রবে এসে উপন্যাসে যে এক বিশেষ রস সঞ্চারিত হয় তার প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ থাকে। সুতরাং মহাকাব্যে ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের আকর্ষণ হল ঐ রস সৃষ্টি।

ইতিহাসে বর্ণিত পাত্র-পাত্রীগণ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনাবর্ত থেকে বহুদূরে অবস্থিত। তাঁরা আমাদের অভিজ্ঞতার বহির্বর্তী। ইতিহাসে বর্ণিত প্রকৃত ঘটনাবলীর সঙ্গে তাঁদের যুক্ত করে দিতে পারলে সহজে তাঁরা আমাদের বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু এদের সামগ্রিক পরিচয়ের জন্য শুধু ব্যক্তিরূপে নয়, অতীতে যে বৃহৎ রঙ্গভূমিতে তাঁরা কার্যকলাপ করেছেন তারও পরিচয় ও উপলব্ধি অত্যাবশ্যক। ইতিহাসে তাই যুগের পরিবেশ প্রয়োজন। আবার একইকালে চরিত্রের ব্যক্তিরূপ ও বিশ্বরূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলে তা প্রকৃত রসাস্বাদের কারণ হয়।

যে ঐতিহাসিক রসের কথা বলা হয়েছে তা ব্যক্তির রূপ ও স্বরূপকে আশ্রয় করে উদ্ভূত হয়ে থাকে। ইতিহাসের ঘটনাবলীর সম্পর্কে এসে মানবজীবন ও চরিত্রসমূহ সুখ-দুঃখে আলোড়িত হয়ে ওঠে। এর ফলে যে বিষামৃত উদ্ভূত হয় তাই ঐতিহাসিক রস। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে নির্মলকুমারীর কাছে ঔরঙ্গজেবের নিজের নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যতাবোধকে ব্যক্ত করবার মধ্যে তাঁর চরিত্রের মানবিক দিকটি উদ্‌ঘাটিত হয়ে আমাদের রসবোধকে তৃপ্ত করেছে। ইতিহাসাশ্রিত ঘটনাবলীর নায়কদ্বয় ঔরঙ্গজেব ও রাজসিংহ তাঁদের সংঘর্ষের ফলে ভারতব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূচনা করেছিলেন। তাই ইতিহাসকে কেন্দ্র করে, যেখানে মানবস্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে তাই আস্বাদনযোগ্য সাহিত্যের রস হয়েছে। আবার অন্যদিকে জেবউন্নিসা, মবারক ও দরিয়াকে কেন্দ্র করে যে আবর্ত, আবেগ ও ব্যাকুলতা উপন্যাসের পরিণাম অংশকে কারুণ্যে পূর্ণ করে তুলেছে তার রসাবেদন সমধিক। ইতিহাসের উচ্চচূড় রথের জয়যাত্রার মহিমা আমাদের মনে বিস্ময়বোধকে সচকিত করে তোলে সন্দেহ নেই; কিন্তু তার রথচক্রতলে পিষ্ট মানবাত্মার আর্তধ্বনি গগনতলে উচ্ছ্বসিত হয়ে সেই উদ্ধত রথচূড়াকে অতিক্রম করে যায়। মানবজীবনের এই পরিচয়কে আশ্রয় করে ঐতিহাসিক রসের উদ্বোধন ঘটে থাকে।

মধুসূদন নিজেও এই সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে একটিপত্রে লিখেছেন—

"For you must remember that the play is a historical one, and to introduce bottles and political discussions. Would be to astonish the weak sense of the audience and the reader"

ঐতিহাসিক নাটক বলে তার মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের অবতারণা ঘটলে মানবজীবন ভিত্তিক রসাবেদন যে বিঘ্নিত হবে এই সম্পর্কে মধুসূদন সচেতন ছিলেন। যদিও মঞ্চের তাগিদে তিনি তাঁর এই নাটকটি রচনা করেছিলেন, তথাপি এর পেছনে শিল্পীপ্রাণের উৎকণ্ঠা থাকায় ইতিহাসের তথ্য ও মানব সত্য এই দুই ধারা মিলিত হয়ে রসের পূর্ণতা এনেছে।

ইতিহাসের তথ্যকে অস্বীকার করবার উপায় নাট্যকারের বা ঔপন্যাসিকের থাকে না। কিন্তু তিনি সেই তথ্যাদি থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন করেন এবং তাদের যথাযথ সন্নিবেশের ফলে তিনি যুগ অভিপ্রায়কে প্রকাশ করে থাকেন। ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের এইক্ষেত্রে সাদৃশ্য থাকলেও, সাহিত্যস্রষ্টা ব্যক্তিজীবনকে আশ্রয় করে রস পরিণামের দিকে মনোনিবেশ করে থাকেন। ইতিহাসে বর্ণিত যে কোনো আখ্যায়িকা গ্রহণ করলে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। ইতিহাসের প্রবাহ যেখানে যুগাবসান থেকে যুগান্তরের দিকে প্রবাহিত, সেই অংশকে নির্বাচন করে তিনি যেমন তাকে চিত্তবিস্ফোরক দূরত্ব দান করেন এবং কৌতূহল ও আকর্ষণ সৃষ্টি করেন, তেমনি তার মধ্যে অবস্থিত চরিত্র সমূহের মানবরূপ প্রকাশিত করে থাকেন। এইক্ষেত্রে সাহিত্যস্রষ্টার অভ্রান্ত যুক্তিবোধ, তথ্যের প্রতি নিষ্ঠা, ইতিহাস চেতনা ও কল্পনা শক্তি একযোগে কাজ করে থাকে।

কল্পনারূপে যা আখ্যাত তা নিছক মনের খেয়ালীপনা নয়। এই সৃষ্টিকারী কল্পনাশক্তির বলে সাহিত্যস্রষ্টা বিচ্ছিন্ন ঘটনারাজির মদ্যে পারম্পর্য স্থাপন করে তাদের তাৎপর্য ও চরিত্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে থাকেন। শেক্সপীয়রের মধ্যে এই অপূর্ব গুণ ছিল, কিন্তু তাঁর সমসাময়িক নাট্যকার যেন জনসন বোমের ইতিহাস অবলম্বনে রচিত Sejanus-His fall নাটকে তথ্যের প্রতি সুবিচার করলেও সেই তথ্যসমূহকে প্রাণরসে মানবিক ও জীবন্ত করে তুলতে পারেননি।

ইতিহাসে বর্ণিত চরিত্রসমূহের মধ্যে আমরা বস্তুভিত্তিক বহিরঙ্গ পরিচয় পাই। সেখানে ঘটনাসমূহ অপরিহার্য কার্যকারণের সূত্রে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের মনকে জাগিয়ে তোলে না। চরিত্রসমূহেরও উচ্চচূড় রথে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আমাদের সচকিত করে, কিন্তু অভিভূত করতে পারে না। সাহিত্যস্রষ্টা এদের প্রাণরসে সঞ্জীবিত করে তোলেন।

'নাট্যশাস্ত্র' প্রণেতা আচার্য ভরত বহুদিন আগেই আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন নাটক হল দৃশ্যশ্রব্য ক্রীড়নীয়ক। আধুনিক যুগে এই আঙ্গিকটির বেশ কয়েকটি বিভাগ বেড়েছে। তার মধ্যে একটি হল—ঐতিহাসিক নাটক। নামেই প্রকাশিত হচ্ছে এর একদিক ইতিহাস, অন্যদিক নাটক। ইতিহাসের উপাদানকে আশ্রয় করে নাটকটি গড়ে উঠেছে। ক্রিস বালডিকের ভাষায়—

"History play, a play representing events drawn wholly or partly from recorded history," (Chiris Baldick : Oxford concire dictionary of Literary Terms, 1996)

বিশিষ্ট সমালোচক হাডসন বলেছেন—

"For to be truly an historical drama a work should not adhere to the literal truth of history in such a sort as to hinder proper dramatic life, that is the law of the drama are here paramount to the facts of history." (W.H. Hudson — An Introduction to the study of Literature.)

ইতিহাসের তথ্যকে অন্ধ অনুসরণ করলে নাটক হয় না, ইতিহাস হয়। আবার প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসকে পদে পদে লঙ্ঘন করলে ইতিহাসের সঙ্গে সংস্রব থাকে না, নাটক হয়। আসলে ঐতিহাসিক নাট্যকারের কাজ ইতিহাসের বৃন্তে মানবজীবনের ফুল ফোটানো।

তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, নাট্যকার ইতিহাসকার নন। তাঁর কাজ, ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে, ঐতিহাসিক পরিস্থিতির জীবনের যে রসরূপ নিহিত আছে, সেই রূপকেই ফুটিয়ে তোলা। সমাজজীবনের বা ব্যক্তিজীবনের ইতিহাস দ্বারা নাট্যকারের কল্পনা নিয়ন্ত্রিত একথা সত্য, কিন্তু নিয়ন্ত্রিত পরিধির মধ্যে কল্পনার স্বাধীন সাধনার অধিকার তাঁর অবশ্যই আছে। ইতিহাস নাট্যকারকে আলম্বনবিভাব (পাত্র-পাত্রী) ও উদ্দীপনাবিভাব (দেশ-কাল-পরিস্থিতি) যোগালেও নাট্যকার নাটকের আসলটুকু অর্থাৎ অনুভাবাদি নিজেই সৃষ্টি করে থাকেন। আর সেই সৃষ্টির মহিমাতেই নাট্যকারের কবিকীর্তি। তবে 'ঔচিত্য' অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি আবস্যক হয় ঐতিহাসিক নাটকের পক্ষে অত্যাবশ্যক। ঐতিহাসিক নাটকে ঔচিত্যবোধ আপত্তিজনকভাবে ক্ষুণ্ণ বলে ঐতিহাসিকত্বের ভাবশুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায় এবং তা বাস্তবিকই দোষাবহ। ঐতিহাসিক নাটকের পক্ষে অবাস্তবতা বড় দোষই বটে। এই কারণে খাঁটি ঐতিহাসিক নাটকে, ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্র কল্পনা বিষয়ে অতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার—অর্থাৎ ঘটনা বা চরিত্র এমন না হয় যাতে তাদের সত্যতা সম্বন্ধেই পদে পদে সন্দেহ জাগে। ঐতিহাসিক নাটকের পক্ষে ঔচিত্যহানি অনুপেক্ষণীয় বিচ্যুতি। বিশেষত উপস্থাপ্য যুগটি বর্তমানের যত সন্নিহিত অথবা যুগটির ইতিহাস যত সুপরিব্যক্ত উপস্থাপনা তত বাস্তবানুগ হওয়া দরকার এবং যুগ যত ব্যবহিত এবং যত অস্পষ্ট, তার উপস্থাপনায় কল্পনার অবসর তত বেশি। প্রত্যেক যুগেই এক একটা ঔচিত্যবোধের পরিমণ্ডল থাকে এবং কোন্‌টি উচিত বা কোন্‌টি অনুচিত, সেই ঔচিত্যবোধের অনুপাতেই বিচার করা হয়। এক যুগের অনুচিত, অন্য যুগের অনুচিত হতে পারে; ঐতিহাসিক নাটক রচনাকারীকে এ কথা যেমন মনে রাখতে হবে, তেমনি যে যুগের ইতিহাস বা জীবনকে তিনি রূপ দেবেন সেই বিশেষ যুগের আচার বিচার, রীতি-নীতি, বাস্তববোধ প্রভৃতিকেও অবশ্যই অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করবেন। যে নাট্যকার তাঁর রচনায় যুগের আবহাওয়াটি যত নিখুঁতভাবে ব্যক্ত করতে পারেন, ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে তার সৃষ্টির মর্যাদা তত বেশি। বলা বাহুল্য, যথাযথ ইতিহাসবৃত্তকে উক্তি-প্রত্যুক্তিবন্ধে উপস্থাপিত করাই যথেষ্ট নয়, সার্থক ঐতিহাসিক ব্যক্তির বা ঘটনার বাস্তবিক এবং সার্থক রসরূপ।

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যেতে পারে ঐতিহাসিক নাটকের শ্রেণীবিভাগের কথা। সি. এফ. টুকার ব্রুক, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদের ইতিহাসমূলক নাটকগুলোকে নিম্নলিখিত পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—

১। মিশ্ররসের নাটক। গঠনে অতি শিথিল।

২। চরিতমূলক নাটক, বিখ্যাত চরিত্রের ঘটনার উপস্থাপনা।

৩। ট্র্যাজিক। ঐতিহাসিক।

৪। জাতীয় ভাব প্রধান ঐতিহাসিক নাটক।

৫। ইতিহাসের রোম্যান্টিক উপস্থাপনা।

ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকারকে কতকগুলি শর্ত মেনে চলতে হয়—

১। সমসাময়িক জীবনের বিষয়বস্তু ও বাস্তব চরিত্রসমূহের পরিবর্তে নাট্যকার অতীত ইতিহাসের কোনো একটি সময় পরিধি বেছে নেবেন, যার প্রতি প্রকাশ পায় লেখকের বিস্ময়, শ্রদ্ধা ও প্রেমমুগ্ধতা।

২। নাটকে বর্ণিত যুগের প্রতি তথা ঘটনার প্রতি তাঁর আস্থা থাকা চাই। সেইসময় কালের রীতি-

নীতি, আচার-ব্যবহার-সংস্কার, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সকল বিষয়ে নাট্যকারকে সচেতন থাকতে হয়। নইলে নাটকটি ঐতিহাসিক নাটকের সংজ্ঞা থেকে বিচ্যুত হতে পারে।

৩। ঐতিহাসিক নাটকের নায়ক-নায়িকা তথা প্রধান কুশীলব সকলেই ইতিহাসের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। তাঁরা কেউ আপন কীর্তিবলে কীর্তিমান; আবার কেউ অপকীর্তির দরুন অপযশপ্রাপ্ত, নিন্দিত। এইসব চরিত্রের রূপায়ণে নাট্যকারকে ইতিহাসের প্রতি যথাসম্ভব বিশ্বস্ত থাকতে হয়।

৪। কালানৌচিত্য দোষের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও নাট্যকার কিছু কল্পকাহিনি সৃষ্টি করতে পারবেন।

৫। ইতিহাসাশ্রিত চরিত্রগুলির ঐতিহাসিকতা যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখেও তাদের যথেষ্ট প্রাণবন্ত করে তোলা ও নাটকের জীবনভাবনা ব্যক্ত করার ক্ষমতাই ঐতিহাসিক নাট্যকারের কাছে প্রত্যাশিত।

৬। ইতিহাসের বাস্তবতা ও কল্পনার সম্ভাব্যতার মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য চাই যা কাহিনি ও চরিত্রকে বিশ্বাস্য করে তুলবে।

৭। ঐতিহাসিক নাটকের কারবার ইতিহাসের বিশাল পটভূমিতে আবর্তিত জীবনের উত্থান-পতন নিয়ে। ইতিহাসের সামাজিক-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আবেগ-আলোড়ন এই জাতীয় নাটকের কুশীলবদের দেয় বিস্তৃতি, কখনো বা অতিমানবিক উচ্চতা।

৮। ঐতিহাসিক নাটকের চরিত্রগুলি নিছক ব্যক্তিপরিচয়ের পোশাক খুলে ফেলে মহাকালের অন্বীভূত হয়ে যায়; একটি বিশেষ স্থান ও কালের সীমা অতিক্রম করে নাটক পায় বিশ্বজনীন ব্যঞ্জনা।

৯। ইতিহাসের দাবি ও নাট্যকারের দাবি—দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য যত্নবান হতে হবে, যাতে ঐতিহাসিক পরিবেশটি সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হবে আবার নাট্যকারের জীবনবোধও প্রকাশিত হবে।

৩.৩.৯.৪ : ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে লেখা কিছু গ্রন্থ

"যে পথ দিয়া উহার অশ্বারোহী পুরুষটি অশ্বচালনা করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃতপক্ষে রোমান্সের রাজপথ; এবং বঙ্গ উপন্যাসে প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রই এই রাজপথের রেখাপাত করিয়াছিলেন।" —শ্রীকুমারবাবুর উক্তি যে সম্পূর্ণ সত্য তার প্রমাণ আমরা পাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভেতর দিয়ে। যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা ভাষায় উপন্যাস রচনার সূত্রপাত হয়। হ্যানা ক্যাথারিন, মুলেন্স, ভূদেব মুখোপাধ্যায় কিংবা প্যারীচাঁদ মিত্রের কথা স্মরণ রেখেও একথা বলা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই বাংলা উপন্যাস প্রথম সার্থক রূপ লাভ করেছিল। বঙ্কিমের হাতেই প্রথম বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্ম হয়।

বলাবাহুল্য যে, ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭)-এ ইতিহাস নিয়ে লেখা উপন্যাসের স্বাদ পাওয়া যায়। এছাড়া বাংলা গদ্য সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১), মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজাবলী' (১৮০৮), উইলিয়াম কেরীর 'ইতিহাসমালা' (১৮১২), রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম' (১৮০৫) প্রভৃতি গ্রন্থে ইতিহাসের আনাগোনা লক্ষ করা যায়।

বঙ্কিমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রমেশচন্দ্র দত্ত লিখলেন 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' (১৮৭৮), 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' (১৮৭৯)—দুটিই ঐতিহাসিক উপন্যাস। প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়', স্বর্ণকুমারী

দেবীর 'মিবার রাজ' (১৮৭৭) এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে উপন্যাস রচনা করেন। এ ছাড়াও ইতিহাস নিয়ে বহুলেখকই বহু উপন্যাস, গল্প, কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন।

৩.৩.৯.৫ : কৃষ্ণকুমারী নাটকের কাহিনী ও মধুসূদন

মধুসূদন রামনারায়ণ বসুকে একটি পত্রে বলেছিলেন যে, টডের ইতিহাসে প্রথম খণ্ডের ৪৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত কাহিনি তিনি নাটকে গ্রহণ করেছেন। ১৮৬০ সালে পুনর্মুদ্রিত টডের প্রথম খণ্ডে এই কাহিনি ৩৬৫-৩৬৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

রানা ভীমসিংহ ১৭৭৮-১৮২৮ সাল পর্যন্ত মেবারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সম্রাটরূপে তাঁকে যেমন ভাগ্যের বিপর্যয় বহন করতে হয়েছে, তেমনি পিতা হিসেবেও তাঁকে চরম দুঃখ পেতে হয়েছে। একদিকে জয়পুররাজ অন্যদিকে মারবার রাজ কৃষ্ণকুমারীকে বিয়ে করতে চেয়েছে। মেবারের সঙ্কটকে আরো ঘনীভূত করে দিয়েছে মহারাষ্ট্রীয়দের বারংবার আক্রমণ। রাজকুমারী কৃষ্ণাকে নিয়ে যে বিরোধ, পরিণামে তা হেলেনকে নিয়ে গ্রিস-ট্রয়ের বিরোধের মত কৃষ্ণার জীবন ও দুই রাজশক্তিকে ধ্বংস করল।

সিন্ধিয়ার অর্থনৈতিক দাবি জয়পুর গ্রহণ না করায় তিনি রাজা মানসিংহের পক্ষ অবলম্বন করলেন। তিনি মেবারের রানাকে জয়পুরের প্রতিনিধিকে বিদায় দিতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তার দাবি অগ্রাহ্য হওয়ায় তিনি জয়পুরের সৈন্যদলসহ নিজের সৈন্যদল ও কামান নিয়ে আরাবল্লীতে গিরিআবর্ত পথে ঢুকে মেবারের বাইরে শিবির স্থাপন করলেন। রানার আর জয়পুর প্রতিনিধিকে বিদায় না দেবার কোনো উপায় রইল না। রানার সঙ্গে সিন্ধিয়ারাজের একলিঙ্গদেবের মন্দিরে দেখা হল।

বিয়েতে বাধা পাওয়ায় ও শুভকাজে অসমাপ্তি ঘটায় জয়পুররাজের সন্দে মানসিংহের যুদ্ধ বাঁধল। যুদ্ধে রাজা মানসিংহ পরাভূত হলেন এবং জয়পুররাজ তার রাজধানী দখল করলেন। শেষে মারবারের সর্দারগণ রাঠোর বংশের অসম্মানে আহত হয়ে জয়পুর বাহিনী পরাজিত করেন এবং জয়পুর রাজ জগৎসিংহ অসম্মানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন।

পাঠান সর্দারের নির্দেশে রানা ভীম সিংহের সামনে কোনো পথ দেখতে না পেয়ে কন্যা কৃষ্ণকুমারীকে হত্যার নির্দেশ দেন। বিনা অপরাধে নিষ্পাপ কুমারীর প্রাণবিসর্জন গ্রিকরাজ আগামেমনন দুহিতা ইফিগেনিয়ার কাহিনি স্মরণ করিয়ে দেয়। তিন-তিনবারের চেষ্টার ফলে শেষে 'কুসুমরস মিশ্রিত অহিফেন'-এ কৃষ্ণার মৃত্যু হয়। টড লিখেছেন—

> "She slept! a sleep from which she never awoke."

কৃষ্ণার মা খাদ্যত্যাগ করলেন, শোকে অভিমানে তার মৃত্যু হল। অজিত সিংহের কাছ থেকে এই সংবাদ শুনে নিষ্ঠুর পাঠানসর্দারও তাকে লাঞ্ছিত করল।

মধুসূদন ইতিহাসে বর্ণিত ঘটনাসমূহকে পরিবর্তন করেননি, বা বিকৃতও করেননি। উদয়পুরের দুরবস্থা যা ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে তা মধুসূদনও একইরকমভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন—রানা ভীমসিংহ মন্ত্রীকে বলেছেন—

> "দেখ আমার ধনাগার অর্থশূন্য; সৈন্য বীর শূন্য সুতরাং আমি অভিমন্যুর মতন এ সপ্তরথীর মধ্যে নিরস্ত্র হয়েছি।"

কৃষ্ণার বিয়ে উপলক্ষ্য করে জয়পুর ও মারবারের মধ্যে দ্বন্দ্ব, মহারাষ্ট্রীয় দল কর্তৃক দেশে বিপর্যয় সৃষ্টির সম্ভাবনা, জয়পুরের রাজদূতকে বিদায় দেওয়ায় জয়পুর রাজের ক্রোধ, মানসিংহের বিরুদ্ধে ধনকুল সিংহকে

সমর্থন ও উভয় দলের সম্মিলিত সৈন্যদলসহ উদয়পুর আক্রমণের আয়োজন, মানসিংহের পক্ষে যবনপতি আমীর খাঁ ও মহারাষ্ট্রপতি মাধবজীর যোগদান ইতিহাস বর্ণিত এই তথ্যসমূহ মধুসূদন তাঁর নাটকে যথাযথভাবে গ্রহণ করেছেন।

বলাবাহুল্য যে, 'কৃষ্ণকুমারী' রচনাকালের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ'-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। তাই কবিসুলভ আচরণ বা ভাব পরিমণ্ডলে তিনি ছিলেন। দুটি গ্রন্থের মধ্যেই তার জীবন জিজ্ঞাসার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র পৌরুষদীপ্ত রাবণ তথা ইন্দ্রজিৎ চরিত্রের পরাভব কবির মনকে অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু রামায়ণের করুণ রসের তুলনায় হোমারের বীররসকে অনেকটা প্রাধান্য দিয়েছিলেন। সন্দে তিনি মানব জীবনকে প্রত্যক্ষ ট্র্যাজিকরস যা মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট' ও শেক্সপীয়রের নাটকগুলি পাঠ করে পেয়েছিলেন তার উপর ভর করেই নাটক রচনায় উৎসাহী হয়েছিলেন।

রাবণের হাহাকারের মধ্যে যেমন মেঘনাদবধ কাব্যের শেষ হয়েছে, তেমনি রানাভীমসিংহের শোকাবেগ, আত্মবিস্মৃতি ও উন্মত্ততা তথা বলেন্দ্র সিংহের বিলাপের মধ্য দিয়ে নাটকের শেষ হয়েছে। আগেই বলেছি যে, একই পরিবেশের মধ্যে থেকে মধুসূদন মহাকাব্য ও নাটক রচনা করেছেন। ফলে লঙ্কার মর্মন্তুদ চিত্র আমরা যেমন প্রত্যক্ষ করি, তেমনি উদয়পুরের নগ্নরূপটিও আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়।

একটা জাতির যে পতনোন্মুখ চেহারা মধুসূদনকে ব্যথিত করেছিল তাই একদিকে 'মেঘনাদ বধ কাব্যে' অন্যদিকে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে ফুটে উঠেছে।

নাটকের প্রয়োজনে মধুসূদন কিছু কাল্পনিক চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন বা কিছু ঐতিহাসিক চরিত্রকে নিজের কল্পনার রঙে রাঙিয়ে তুলেছেন। এক্ষেত্রে বলা যায় না তিনি মূল কাহিনি থেকে সরে এসেছেন। টডের ইতিহাসে জগৎসিংহের রক্ষিতার নাম কর্পূরমঞ্জরী। মধুসূদন তাঁর নাম শুধু পরিবর্তন করেননি, তার মধ্যে নিজের অধিকার রক্ষার প্রয়াসে ঈর্ষার প্রাবল্য দেখিয়ে কৃষ্ণার নিষ্পাপ চরিত্রের সন্দে বৈপরীত্য প্রদর্শন করেছেন।

ধনদাস ও মদনিকার কাহিনি তিনি নাটকের প্রয়োজনে তথা দর্শককে 'Dramatic relief' দেবার জন্য এনেছেন। ট্র্যাজেডি ও কমেডি দুটি ধারার মিশ্রণ তাঁর নাটকে দেখা যায়। আসলে নাট্যকার মধুসূদন মূল কাহিনি থেকে সরে না গিয়ে 'ইতিহাসের সত্য' ও 'মানব সত্য'-এর মধ্যে মিলন ঘটিয়েছেন। যেমনটি করেছিলেন ঔপন্যাসিক বঙ্কিম তাঁর (মধুসূদনের) নাটক রচনার প্রায় তিন দশক পরে 'রাজসিংহ' উপন্যাসে।

৩.৩.৯.৬ : কৃষ্ণকুমারী নাটকের গঠনকৌশল

'কৃষ্ণকুমারী'র গঠনকৌশল আলোচনার আগে আমরা বুঝে নেব নাটকের নির্মাণ বা গঠন বলতে কি বোঝায়। নাটকের গঠন প্রসন্দে অ্যারিস্টটল ছটি অন্দের কথা বলেছেন। এই ছটি অন্দ বিশেষত ট্র্যাজেডির জন্য অ্যারিস্টটল বলেছিলেন। কিন্তু শুধু ট্র্যাজেডি নয়, যে কোনো নাটকের পক্ষেই প্রাথমিকভাবে দরকার এই ছটি অন্দের। সেগুলি হল—১। কাহিনিবৃত্ত ২। চরিত্র ৩। অভিপ্রায় ৪। সংলাপ ৫। দৃশ্য এবং ৬। সংগীত। অ্যারিস্টটলের উক্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শিশির কুমার দাশ এদের অন্তরন্দ আর বহিরন্দ এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন—

> "ট্র্যাজেডির তিনটি বহিবঙ্গ ঃ ভাষা, সংগীত ও দৃশ্য; তিনটি অন্তরঙ্গ কাহিনি, চরিত্র ও অভিপ্রায়। এদের মধ্যে সংগীত ও ভাষা হল অনুকরণের মাধ্যম, দৃশ্য হল পদ্ধতি, আর কাহিনি চরিত্র ও অভিপ্রায় হল বিষয়।" (কাব্যতত্ত্ব ঃ অ্যারিস্টটল)।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের ক্ষেত্রে দেখা যায় মধুসূদন শেক্সপীয়রের রীতি অনুযায়ী নাটকটিকে পাঁচটি অঙ্কে ভাগ করেছেন। প্রথম অঙ্কে—দুটি, দ্বিতীয় অঙ্কে—তিনটি, তৃতীয়াঙ্কে—তিনটি, চতুর্থাঙ্কে—তিনটি, পঞ্চমাঙ্কে তিনটি, মোট ১৪টি গর্ভাঙ্কে নাটকটিকে বিভক্ত করেছেন।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকটির প্লট বা কাহিনি অতীতের কাহিনি। একটি বিশেষ ঐতিহাসিক পটভূমিতে তৈরি হচ্ছে এ নাটকের সংকট, সেই পরিপ্রেক্ষিতটির বিষয়ে পাঠক বা দর্শকের স্পষ্ট ধারণা তৈরি না হলে নাটক তার তাৎপর্য হারাতে বাধ্য।

নাটকটির শুরু হয়েছে এক 'suspense'-এর মধ্যে দিয়ে। জয়পুরের রাজগৃহে। প্রথম থেকেই নাটকটিকে কে বিষাদময় পরিণতিতে পৌঁছে দেবার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে যায় জয়পুরের দূত ধনদাসের সাহায্যে। তারপর আস্তে আস্তে নানা দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরের পৌঁছে নাটকটি করুণ পরিণতিতে পৌঁছায়।

মধুসূদন গর্ভাঙ্কের বৈচিত্র্য পছন্দ করতেন। আবার স্থান ও কালের ঐক্য সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

> "Yet I like to preserve unity of place and as for as I can, that of Time also."

এই নাটকে পাঁচটি অঙ্কে ১৪টি গর্ভাঙ্ক দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম অঙ্কের স্থান জয়পুর, দ্বিতীয়াঙ্কের—তৃতীয়াঙ্কের—উদয়পুর, চতুর্থাঙ্কের—জয়পুর, পঞ্চমাঙ্কের স্থান—উদয়পুর। তা হলে নাটকটিতে স্থান-কালের খুব বেশি হেরফের নাট্যকার করেননি।

নাটকে পুরুষ চরিত্রের সংখ্যা ছয়—ভৃত্য, রক্ষক, দূত, সন্ন্যাসী বাদ দিয়ে। স্ত্রী চরিত্রের সংখ্যা পাঁচ। স্থান এবং কালগত পটভূমি বিস্তৃত নয়, চরিত্র সংখ্যা কম। মোটের ওপর একটিই ঘটনা অবলম্বন করে নাটকীয় দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। আবার শেক্সপীয়রীয় রীতিতে দৃশ্য পরিকল্পনা ও মঞ্চভাবনা দেখা যায়, যা নাটকের গঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদান। Plot বা কাহিনি বৃত্তের পাশাপাশি আমরা sub-plot বা উপকাহিনিও এই নাটকে দেখতে পাই। বিলাসমতী-মদনিকা-ধনদাসের উপাখ্যান যা কিনা মূল কাহিনির সন্দ্বে সম্পৃক্ত। মূলত বিশেষ কোনো তাৎপর্য বা কাহিনিকে জটিল এবং আরো বেশি নাটকীয় করে তুলতে মধুসূদন এই উপকাহিনির অবতারণা করেছেন।

প্রাচীন গ্রীক নাটকের কিছু কিছু উপাদান ব্যবহার করলেও নাট্য নির্মাণের ক্ষেত্রে মধুসূদন শেক্সপীয়রকেই অনুসরণ করেছিলেন।

নাটকের গঠন সংলাপ বিশেষ ভূমিকা পালন করে, মূলত সেই সময় মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ ঘটান তাঁর কাব্য-কবিতায়। আর তাঁর আগে তেমনভাবে কোনো নাট্যকারই সংলাপে কোনো আদর্শ ঠিক করতে পারেননি। তবে 'কৃষ্ণকুমারী' লেখার আগে দুটি ব্যঙ্গ নাটক লিখে সংলাপের ক্ষেত্রে খানিকটা স্থিতিস্থাপকতা আনতে পেরেছিলেন। দীনবন্ধু মিত্রের মত সাধুভাষা সম্বলিত আড়ষ্ট গদ্য প্রয়োগ তিনি করেননি। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মুখে তিনি তাদের উপযুক্ত ভাষা প্রয়োগ করেছেন।

নাটকের গানগুলি নাটকটি গঠনে সাহায্য করেছে। মোট পাঁচটি গান আছে নাটকে। গানগুলি খুবই প্রথাগতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং গানগুলি গাওয়া হয়েছে নেপথ্যে থেকে, যা নাটকের গতির পক্ষে সহায়ক মনে হয় না। তবে নাট্য গঠনের সহায়ক অঙ্গ হিসেবে গানগুলির মূল অপরিসীম।

যাইহোক, শেষে বলা যায় যে, নাট্যকার মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারীর গঠনকৌশলের ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও প্রথম ইউরোপীয় ধাঁচের নাটক রচনাতে তিনি সফল।

৩.৩.৯.৭ ঃ ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে ‘কৃষ্ণকুমারী’র সার্থকতা

বাংলা নাটকের গতিহীন যুগে মধুসূদনের আবির্ভাব। সমকালীন কোনো নাট্যকারই সংস্কৃত নাটকের বাতাবরণের বাইরে এসে দাঁড়াতে পারেননি। অনুবাদাশ্রয়ী শ্লথ গতিসম্পন্ন নাটক দর্শক মনকে তৃপ্ত করতে পারছিল না। নাটকে নাট্যরস সৃষ্টির প্রয়াস তাঁদের মধ্যে তেমন ছিল না। এমতাবস্থায় মধুসূদন নাটক রচনা শুরু করেছিলেন সমকালীন নাট্যমঞ্চের ‘অলীক কুনাট্য’ লক্ষ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রেনেসাঁসের জাগরণ ঘটে বাংলা সাহিত্য জগতে। আর রেনেসাঁসের সন্দে আসে ঐতিহ্য চেতনা, অতীত জিজ্ঞাসা। মধুসূদন এই প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে টডের ‘Annals and Antiquitees of Rajasthan’ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে লেখেন— ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটক। এ প্রসন্দে ড. সুকুমার সেন বলেছেন—

> “ইতিহাস হইতে আখ্যান বস্তু গ্রহণ করিয়া লেখা বাংলা নাট্যরচনার মধ্যে কৃষ্ণকুমারী নাটক প্রথম।”

(বান্দালা সাহিত্যের ইতিহাস ঃ ২য় খণ্ড)

আমাদের আলোচ্য ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকের ঐতিহাসিকতা বিচারের পূর্বে ঐতিহাসিক নাটকের সংজ্ঞা স্বরূপ সম্পর্কে দু-চার কথা বলে নেব।

যে নাটকের মূল কাহিনি, প্রধান প্রধান ঘটনা ও চরিত্রগুলি ইতিহাস থেকে গৃহীত এবং নাট্যকারের সৃজনশীল পরিকল্পনা সহযোগে বা মানবিক গুণে মণ্ডিত হয়ে শিল্পমূল্য রসোত্তীর্ণ হয় তাকেই আমরা ঐতিহাসিক নাটক বলি। ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে আগে আলোচনা হয়েছে, সেজন্য ঐতিহাসিক নাটকের বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে আলোচনা করব না। শুধুমাত্র আমরা নাটকটিতে কতখানি ইতিহাস রেখাপাত করেছে তা আলোচনা করব।

নাট্যকার মধুসূদনকে অভিনেতা কেশবচন্দ্র গন্দোপাধ্যায় রাজপুত জীবনের ইতিহাস নিয়ে নাটক লিখতে অনুরোধ করেছিলেন। মধুসূদন ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটক লিখে রাজনারায়ণ বসুতে চিঠিতে লেখেন—

> “The plot is taken from Tod, Vol-I page-461, I suppose you are well acquainted with the story of the unhappy princess Kissen Kumari.”

সুতরাং তিনি যে, ‘টডের রাজস্থান’ গ্রন্থ থেকেই তাঁর নাট্যকাহিনি নির্বাচন করেছিলেন একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কিন্তু এই ঐতিহাসিক অনুশীলন কতদূর সার্থক হয়েছে তা বিচার্য। যেখানে ইতিহাসের বিচ্যুতি তা নাটকের প্রয়োজনে ঘটেছে তবে তিনি কোনো ঘটনাকে বিকৃত বা পরিবর্তিত করেননি।

টডের বিবরণ থেকে জানা যায় ১৭৭৮-১৮২৮ সাল পর্যন্ত রানা ভীমসিংহ মেবারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে সবদিকে দিয়েই মেবারের ইতিহাস দুর্ভাগ্যজনক। চন্দ্রাবৎ ও মঞ্চাবৎদের দ্বন্দ্বে মেবারের রণশক্তি ঐক্য ও মাহাত্ম্য হারিয়েছিলেন। নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্ব মেটাবার জন্য রানা মহারাষ্ট্রীয়দের আহ্বান জানালেন। অতি সহজেই উদয়পুরে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হল; তাদের দাবির টাকা মেটাতে গিয়ে রাজার রাজকোষ শূন্য হল। সামন্তদের উপরে অন্যায় অর্থনৈতিক শোষণ চলতে লাগলো, এই ঐতিহাসিক দুরবস্থার পটভূমিতে কৃষ্ণকুমারীর বেদনাদায়ক পরিণতির ঘটনাটি অনুষ্ঠিত হয়। জয়পুর রাজের সঙ্গে তাঁর বিবাহের সম্বন্ধ স্থিরিকৃত হয়েছিল এবং সেই শুভ সম্বন্ধকে দৃঢ় করবার জন্য জয়পুর থেকে সেনাদল উদয়পুরে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু মারবাররাজ মানসিংহ কর্তৃক সে বিষয়ে ঘোরতর প্রতিবাদ এল। তারই আন্তরিক অভিলাষ যে তিনি কৃষ্ণকুমারীকে বিবাহ করেন। ফলে একটি ভয়াবহ যুদ্ধের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অন্যান্য মারাঠা দস্যুরা দুপক্ষে যোগ দিল। এতে ভীমসিংহ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন এবং কৃষ্ণকুমারীর

মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠল। পিতার আদেশে তিন-তিনবারের চেষ্টায় মৃত্যুলাভ করল। এছাড়া জয়পুর রাজ্যের রক্ষিতা কর্পূরমঞ্জরীর ভূমিকাও এই বিরোধের মূলে সর্বাপেক্ষা বেশি ইন্ধন জুগিয়েছিল। বলেন্দ্র সিংহ প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্রের উপস্থিতি নাটকটিকে ঐতিহাসিক নাটকের গৌরব এনে দিয়েছে। অর্থাৎ যে কাহিনি 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের ভিত্তি সেই টডের বর্ণনা অংশে কোনো অনৈতিহাসিকতা নেই।

পঞ্চমাঙ্ক সমন্বিত এই নাটকে সর্বত্রই ইতিহাসের যোগসূত্রতা লক্ষ করা যায়। যদিও এই নাটকে কিছু কল্পিত চরিত্র রয়েছে কিন্তু তারাও নাটকের ঐতিহাসিক রসসৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। নাটকের প্রাণশক্তি যে, দ্বন্দ্বময়তা তাকে এখানে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কৃষ্ণকুমারীর পাণিগ্রহণের আশায় বিভিন্ন রাজাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি এবং পরিণতিতে কৃষ্ণকুমারীর করুণ আত্মহনন এই নাটকের প্রধান উপজীব্য।

নাটকে কিছু বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়। নাট্যকার কিছু কল্পিত চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন ঘটনাগত অসঙ্গতি দূর করবার জন্য বা ঘটনার মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টি করার জন্য। যেমন—মানসিংহ এবং জগৎসিংহের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইতিহাস সমর্থন করলেও তাদের মধ্যে শত্রুতার কোনো উপলক্ষ্য ইতিহাস আমাদের দেয়নি। আবার তিনি মদনিকা ও ধনদাস নামে দুটি কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন এই দ্বন্দ্ব ঘনীভূত করবার জন্য। কৃষ্ণকুমারী সম্পর্কে অজ্ঞ জগৎসিংহকে তার পাণিপ্রার্থী করে তোলবার কৃতিত্ব যেমন ধনদাসের তেমনি সুকৌশলে অন্য এক রাজপুত রাজা মানসিংহকে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টেনে এনেছে মদনিকা। এদের সৃষ্টি করে মধুসূদন নাট্যপ্রবাহে জটিলতা ও লঘু হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। ফলে তারা আকর্ষণীয় চরিত্র হলেও নাটকের শিল্পমূল্য কিছুটা ব্যাহত করেছে।

শেষে বলা যায়, নানা ত্রুটি সত্ত্বেও মধুসূদন টডের ইতিহাস থেকে মেবারের এমন এক সঙ্কটপূর্ণ অধ্যায় নির্বাচন করেছেন যা তার চরম দুর্ভাগ্যের কাহিনি ব্যক্ত করেছে। এর মধ্যেও নাটকটিতে তিনি ইতিহাসকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। পাশাপাশি নিজের কল্পনাকেও প্রাধান্য দিয়েছেন, এবং ঐতিহাসিক নাটক বলতে আমরা যা বুঝি নাটকটিতে তার সবগুণই বর্তমান। এছাড়াও মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী'র আদর্শে অনেক নাট্যকর ঐতিহাসিক নাটক রচনাতে উৎসাহ দেখিয়েছেন।

৩.৩.৯.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। নাট্যকার মধুসূদন দত্তের নাট্যবৈশিষ্ট্য আলোচনা করে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের গোত্র নির্ণয় করো।

২। ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে কৃষ্ণকুমারীর যৌক্তিকতা বিচার করো।

৩। কৃষ্ণকুমারী নাটকে মধুসূদন মূল কাহিনীকে কতখানি অনুসরণ করেছেন আলোচনা করো।

৪। ঐতিহাসিক নাটকের সংজ্ঞা স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখাও কৃষ্ণকুমারীতে কতখানি 'ইতিহাস' ও 'কল্পনার' মেলবন্ধন ঘটেছে।

৫। কাহিনী, চরিত্র, পরিণতি—এই তিন দিক থেকে আলোচনা করে 'কৃষ্ণকুমারী' যথার্থ ঐতিহাসিক নাটক কি না জানাও।

————

পর্যায়গ্রন্থ - ৩

একক - ১০

ট্রাজেডি বিচার

বিন্যাস ত্র(ম :

৩.৩.১০.১ ট্র্যাজেডি বিচার

৩.৩.১০.২ সংলাপ

৩.৩.১০.৩ নামকরণ

৩.৩.১০.৪ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.৩.১০.১ : ট্র্যাজেডি বিচার

ট্র্যাজেডি সম্পর্কে সমালোচকরা বলেন—

> "It is a story of exception calamity of man in high stage leading to his death arising pity and fear."

অর্থাৎ কোনো সম্ভাবনাপূর্ণ চরিত্রের সাধারণ বিপর্যয়জনিত পতন বা করুণ পরিণতি হলে ট্র্যাজেডি সৃষ্টি হয় যা দর্শক ও পাঠকচিত্তে ভীতি ও করুণার সঞ্চার ঘটিয়ে থাকে। এই জাতীয় বিয়োগান্ত নাটকের পরিণাম গ্রিক ট্র্যাজেডি অনুযায়ী বহিরঙ্গ প্রভাবেও হতে পারে যেখানে মূলত faith বা নিয়তিবাদ ট্র্যাজেডির অন্যতম কারণ। অন্যদিকে শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডি ও চরিত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা বা ত্রুটি ট্র্যাজেডির মূল কারণ। তাই শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির এমন একজন—Who has done and suffer something terrible.

উপরোক্ত এই আলোচনার ভিত্তিতে আমরা যদি 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকটির মধ্যে প্রবেশ করি তাহলে দেখতে পাব উদয়পুরের রাজকুমারী কৃষ্ণার সৌন্দর্য, যৌবনের উচ্ছ্বলতা কিভাবে তাকে চরম বিপদের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। সুন্দরী কৃষ্ণকুমারী একই সঙ্গে একদিকে জগৎসিংহ, অন্যদিকে মানসিংহ উভয়ের দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে তার জীবনের সবথেকে ব্যথাবহ ঘটনা হল এই যে তিনি পিতার দিকে তাকিয়ে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে দুজনের মধ্যে থেকে যে কোনো একজনকে জীবনসাথী বানানোর দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে পারেননি। এখানেই তার চরম ট্র্যাজিক পরিণতি। নিষ্পাপ কৃষ্ণকুমারী নিয়তির তপ্তস্পর্শে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভীমসিংহের নির্দেশে মনের কামনা বাসনা সমস্ত কিছুকে নিবারিত করে এক মর্মান্তিক পরিণতির শিকার হয়েছে। শুধু তাই নয়, নাটকের শেষদৃশ্যে কাকা বলেন্দ্র সিংহের কাছ থেকে যখন কৃষ্ণকুমারী জানতে পেরেছে যে তার পিতাই তাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছে, তখন তার সেই আর্তি

> "কাকা আমার পিতার ও কি এই ইচ্ছা।"

এই উক্তি দর্শক চিত্তকে নাড়া দিয়েছে এবং সাথে সাথে তার আত্মহত্যা ট্র্যাজেডির পথ রচনা করেছে।

অন্যদিকে ভীমসিংহের অক্ষমতায় সৃষ্ট এক জটিল পরিস্থিতিতে কৃষ্ণার আত্মহত্যা। ফলস্বরূপ মহিষী অহল্যার মৃত্যু, পিতা ভীমসিংহকে কম দগ্ধ করেনি। এই চরম পরিস্থিতিতে ভীমসিংহের শোকোন্মত্ততা যে

গভীর কারুণ্য সৃষ্টি করেছিল তার আবেদন সমগ্র রাজপরিবার থেকে বিস্তৃত রাজ্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছে এবং দেশ ও জাতির জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি কৃষ্ণকুমারী নাটকে ট্র্যাজেডির বীজ নিহিত আছে। একদিকে কৃষ্ণকুমারী অন্যদিকে ভীমসিংহ এই দুজনের দ্বারা সৃষ্ট নাটকের জটিল আবর্ত এক অনিবার্য দুঃখ পরিণতির দিকে অলঙ্ঘ আকর্ষণে নাটকটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু তথাপি সমালোচকদের মতানুযায়ী 'কৃষ্ণকুমারী' সার্থক ট্র্যাজেডি হয়ে উঠতে পারেনি। তার কারণ—

প্রথমতঃ নাট্যসাহিত্যের অদ্বিতীয় সমালোচক নিকল তাঁর 'Theory of Drama' গ্রন্থে একটি চমৎকার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন পুরুষ চরিত্রই সবসময় ট্র্যাজেডির নায়ক হয়ে থাকে। তাঁর মতে কোমলভাবাপন্ন দুর্বলচিত্ত নারী ট্র্যাজেডির মধ্যে অপ্রধান ও প্রভাবহীন।

দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণার মৃত্যু ট্র্যাজেডির রীতি অনুযায়ী দর্শক মনে 'pitty'-র সৃষ্টি করলেও 'fear' অর্থাৎ ভয়ের সৃষ্টি করেনি। কেননা চরিত্রটির আত্মরক্ষার কোনো প্রয়াস ছিল না। এমনকি 'Doing and suffering'-ট্র্যাজেডির এই অনিবার্য বৈশিষ্ট্যও কৃষ্ণার চরিত্রে নেই।

তৃতীয়তঃ কন্যার মৃত্যুতে অহল্যা বাঈ-এর শোকগ্রস্ত মৃত্যু ট্র্যাজেডির পরিবেশকে লঘু করে দিয়েছে।

চতুর্থতঃ একদিকে কৃষ্ণার মৃত্যু অন্যদিকে স্ত্রী অহল্যার মৃত্যু ভীম সিংহকে ট্র্যাজিক চরিত্রের এক বিশাল আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দাবি জানায় কিন্তু সে ক্ষেত্রেও দেখা যায় ট্র্যাজেডির নায়ক হিসেবে যে কর্মকুশলতা তার মধ্যে থাকা উচিত ছিল তা অনুপস্থিত।

পঞ্চমতঃ নাটকের প্লট বিন্যাসের ক্ষেত্রেও মধুসূদন নাটকটিকে দ্বন্দ্বমুখী করার যে সুযোগ ছিল সেদিকে নজর দেননি। ঘনঘন নাটকীয়তা সৃষ্টির পরিবর্তে অলৌকিক স্বপ্ন দৃশ্য যোজনা নাট্যপ্লটে অন্তত ট্র্যাজেডির রসসৃজনে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করেছে।

ষষ্ঠতঃ সর্বোপরি ট্র্যাজেডিধর্মী নাটকে দর্শকচিত্তকে Relief দেওয়ার জন্য যেভাবে কমেডির অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়, মধুসূদন সেখানেও ব্যর্থ।

আলোচনার উপসংহারে এসে বলা যায় যে, ট্র্যাজেডির যোগ্যনায়িকা হিসাবে গড়ে তোলার জন্য টডের ইতিহাস থেকে সবে এসে নাট্যকার মধুসূদন কৃষ্ণার আত্মহত্যা ঘটালেও চরিত্রটির আত্মসমর্পণ ট্র্যাজেডির রস পূর্ণ করেছে। অন্যদিকে ভীমসিংহ চরিত্রের নিষ্ক্রিয়তা নাটকে ট্র্যাজেডির বীজকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করেছে। ফলস্বরূপ ভীম সিংহ যেমন পুরোপুরি কিংলিয়র হয়ে উঠতে পারেনি। কৃষ্ণাও তেমনি ইফিগনিয়া হয়ে উঠতে পারেনি। তবে একথাও ঠিক এই নাটকটি বাংলা সাহিত্যে মৌলিক ট্র্যাজেডি রচনার প্রথম প্রয়াস। সুতরাং অপূর্ণতা তো থাকবেই। আর তাই প্রস্তুতিপর্বে নানা অপূর্ণতা সত্ত্বেও নাটকে নানা ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে যতটুকু ট্র্যাজেডি ছিল তার সার্থক রূপদানের প্রয়াস অবশ্যই প্রশংসারযোগ্য। আর তাই উৎকৃষ্ট ট্র্যাজেডি না হলেও প্রথম ট্র্যাজেডি নাটক হিসেবে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের গুরুত্ব অপরিসীম।

৩.৩.১০.২ : সংলাপ

সংলাপ হল নাটকের প্রাণ। সংলাপের মধ্য দিয়েই নাট্যকার নাটকের বিষয় ও চরিত্রবিন্যাস করেন। সংলাপের সাহায্যে ঘটনার উপস্থাপন, অগ্রগতি সাধন এবং চরিত্রের সংহত রূপায়ণ নাটকে নাট্যকার ফুটিয়ে তোলেন। সেই কারণে অ্যারিস্টটল নাটকের পরিকাঠামো নির্মাণে সংলাপকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব

দিয়েছেন। নাট্যসমালোচক এ. নিকল তাঁর ‘Theory of Drama’ গ্রন্থে নাটকের সংলাপ সম্পর্কে বলেছেন—

> “It is through the dialogue alone as interpreted by the actors, that he can convay his story to the assembled audience.”

সুতরাং নাটকের বিষয় ও চরিত্রোপযোগী সংলাপ ব্যবহৃত না হলে নাটকের অন্য অনেকগুণ থাকা সত্ত্বেও তা ব্যর্থ হয়ে যায়। আর নাটক যদি হয় জীবনধর্মী ঘটনা ও বাস্তব চরিত্রের সম্মিলন তা হলে সংলাপকেও হতে হবে জীবন্ত, স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম। ভবানী গোপাল সান্যাল যথার্থই বলেছেন—

> “নাটকের শুধু বাহন নহে, ইহার প্রাণ হইল সংলাপ। ইহার মাধ্যমে যে রূপচরিত্রের রূপ প্রকাশিত হয়, তেমনি নাটকের গতিও সঞ্চারিত হইয়া থাকে।”

নাট্যকার মধুসূদন দত্ত নাটকের সংলাপের গুরুত্ব বিষয়ে অবহিত ছিলেন। পূর্বে সংলাপের ক্ষেত্রে তিনি যে নাট্যধর্ম বজায় রাখতে পারেননি, সে সম্পর্কে তিনি কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে লিখেছেন—

> “I often, forget the real in search of the poetical.”

তিনি ড. জনসনের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছিলেন—

> “Style is to be probable sought in the common intercourse of life, among those who speak only to be understood, without the ambition of elegance.”

পূর্ববর্তী দুটি নাটক ‘শর্মিষ্ঠা’ ও ‘পদ্মাবতী’র তুলনায় ‘কৃষ্ণকুমারী’র ভাষা সরল, সংযত ও চরিত্রানুগ হয়েছে। রামনারায়ণ বা দীনবন্ধু মিত্র ভাষার এই জাতীয় প্রয়োগ ক্ষমতা দেখাতে পারেননি। মধুসূদন ভাব অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করেছেন, আবার সেই ভাষাকে বিভিন্ন চরিত্রে মানস প্রবণতার সঙ্গে সমন্বিত করেছেন। অনেকক্ষেত্রে সাধুভাষারও প্রয়োগ দেখা যায় কিন্তু তা উপমা সমন্বিত হলেও কৃত্রিম হয়ে ওঠেনি।

দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে রানা ভীম সিংহ ভারতভূমির হতশ্রী অবস্থা ও তার বিরূপ ভাগ্যের প্রতিকূলতার পরিচয় দিয়ে বলেছেন—

> “হায়ঙ্গ হায়ঙ্গ যেমন কোনো লবনাম্বতরঙ্গ কোনো সুমিষ্ট বারি নদীতে প্রবেশ করে তার সুস্বাদ নষ্ট করে, এ দুষ্ট যবন ... সেই রূপ এ দেশের সর্বনাশ করেছে।”

কোনো কোনো স্থানে অলংকৃত ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। মানসিক আবেগের বাণীবহ হলে তখন এ ভাষাকে কৃত্রিম বলে মনে হয় না। শেক্সপীয়রও তাঁর ট্র্যাজেডির নায়কদের ক্ষেত্রে এই জাতীয় ভাষা ব্যবহার করেছেন। রানা ভীমসিংহ বলেছেন—

> “কোনো কোনো সাগরে ঝড় অনবরতই বইতে থাকে; তা এ দেশেরও কি সেই দশা ঘটলঙ্গ”

তবে কাব্য সংলাপে যে অলংকৃত ভাষাকে স্বাভাবিক ও আবেগবহ বলে মনে হয়, গদ্য সংলাপে তা মন্থরতা সৃষ্টি করে অথচ গদ্যের ভাষাতেও ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা যায়। প্রতীক নাটকের ক্ষেত্রে যে সহজে এটা করা চলে তা রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন। তিনি ভাষাকে করেছেন সুরাশ্রয়ী ও রূপাশ্রয়ী।

মধুসূদন তাঁর নাটকে ট্র্যাজেডির গাম্ভীর্য সৃষ্টির জন্য অলংকৃত তৎসম শব্দপূর্ণ গদ্যভাষা ও লঘুদৃশ্যে কথ্যভাষা ব্যবহার করেছেন। কথ্যভাষার উপরে তিনি খুব প্রসন্ন ছিলেন না। প্যারিচাঁদ মিত্রের ব্যবহৃত কথ্যভাষাকে তিনি মেছুনীদের ভাষা বলে বিদ্রূপ করেছেন। কিন্তু শিল্পীরূপে এই সজীব ভাষাকে তিনি তাঁর প্রহসনদ্বয়ে ও কৃষ্ণকুমারী নাটকে স্থান দিয়েছেন।

মধুসূদনের সংলাপের বড় বৈশিষ্ট্য হল যে, তিনি চরিত্রানুগ সংলাপ ব্যবহার করেছেন। পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে জগৎসিংহ এবং ভীমসিংহ দুজনেই রাজ চরিত্র; কিন্তু একজন বিলাসী এবং সুখী, অপরজন জীবনের ভারে ক্লান্ত এবং বিষাদাচ্ছন্ন। দুটি চরিত্রের সংলাপের মধ্যে মধুসূদন আশ্চর্যজনকভাবে উভয়ের এই পার্থক্যকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। রাজকার্যে মনোনিবেশের জন্য মন্ত্রীর দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে জগৎ সিংহ বলেছেন—

> "আহার, নিদ্রা, সময় বিশেষে আরাম এ সকল না হলে আমার জীবন রক্ষা করা দুষ্কর। তা দেখ, আমার এখন কিঞ্চিৎ অলস ইচ্ছা হচ্যে। এ সকল পত্র না হয় সন্ধ্যার পর দেখা যাবে, তাতে হানি কি?"

এই সংলাপের সঙ্গে তুলনীয় মহারাষ্ট্রাধিপতির সঙ্গে সন্ধির সংবাদপ্রাপ্তির পর ভীম সিংহের উক্তিটি—

> 'হায়ঙ্গ হায়ঙ্গ আমি ভুবন বিখ্যাত শৈলরাজের বংশধর, আমাকে একজন দুষ্ট, লোভী গোপালের ভয়ে অর্থ দিয়া রাজ্য রক্ষা করতে হল? ধিক্ আমাকেঙ্গ এ অপেক্ষা আমার আর কি গুরুতর অপমান হতে পারে?"

তবে বিভিন্ন জায়গায় সংলাপের দুর্বলতা লক্ষ করা যায়। এই নাট্যিক সংলাপের দুর্বলতাও 'কৃষ্ণকুমারী'কে সর্বাঙ্গ সুন্দর হতে দেয়নি। সঠিক ভাষা না হলে যন্ত্রণাদগ্ধ ট্র্যাজেডিও হয় না, অর্থাৎ ট্র্যাজেডির সংলাপ রচনায় যে মাত্রাজ্ঞান শেক্সপীয়রের ছিল মধুসূদনের ছিল না, তবুও বলা যায় কোনো আদর্শকে সামনে না পেয়েও মধুসূদন সংলাপ রচনায় যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা অনস্বীকার্য।

৩.৩.১০.৩ : নামকরণ

সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামকরণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নামকরণের মধ্য দিয়ে স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যকে ব্যঞ্জিত করেন। নামকরণ বিভিন্নভাবে হতে পারে; কখনো হয় ব্যক্তি নির্ভর বা চরিত্র নির্ভর, আবার কখনো নামকরণ হয় ব্যঞ্জনাধর্মী। আমাদের আলোচ্য বিষয় হল 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের নামকরণ কতখানি সার্থক ও অর্থবহ।

নাটকটির নামকরণ করা হয়েছে একটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে। 'কৃষ্ণকুমারী' ভীম সিংহের কন্যা। নাটকটি তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। নাটকের প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত তার সক্রিয় উপস্থিতি। নাটকের প্রথমে তার শরীরী উপস্থিতি না থাকলেও ধনদাস ও জগৎ সিংহের কথোপকথন মূলত তাকে কেন্দ্র করেই। নাটকের মূল সংকটও তাকে ঘিরেই। জগৎ সিংহ ও মানসিংহ—উভয়েই তার পাণিপ্রার্থী হওয়ায় যে চরম সংকটের সৃষ্টি হয়—মূলত তাই নাটকটির মূল বিষয়বস্তু।

আবার নাটকের বিভিন্ন অঙ্কে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে কৃষ্ণার মানসিক অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। নাটকটি সমাপ্ত হয়েছে তার আত্মহুতির মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ নাটকের মূল ভাবকেন্দ্রে রয়েছে কৃষ্ণকুমারী। তাই নাটকটির নামকরণ যথাযথ ও অর্থবহ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

৩.৩.১০.৪ ঃ আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ‘কৃষ্ণকুমারী’কে সার্থক ট্র্যাজেডি বলা যায় কি? উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দাও।

২। ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকের নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

৩। ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকের সংলাপ রচনায় মধুসূদনের কৃতিত্ব বিচার করো।

৪। ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকে আবেগের অতিশয্য ট্রাজেডির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এই অভিমত কতদূর গ্রহণযোগ্য?

৫। ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকে ট্রাজেডি কার—রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীর না সমগ্র রাজপুত জাতির?—আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

————

পর্যায়গ্রন্থ - ৩

একক - ১১

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব

বিন্যাসক্রম ঃ

৩.৩.১১.১ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব
৩.৩.১১.২ রাজপুতদের ভগ্নদশা
৩.৩.১১.৩ উপকাহিনী
৩.৩.১১.৪ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.৩.১১.১ : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব

মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের বিষয়বস্তু টডের রাজস্থান কাহিনির অনুরূপ। তিনি যে টডের রাজস্থানের কাহিনি অবলম্বন করেই এই নাটক রচনা করেছিলেন, সেকথা তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একটি পত্রে উল্লেখ করেছেন—

> "The plot is taken from Tod. Voll P - 461. I Suppose you are well acquainted with the story of the unhappy princess Kissen Kumari."

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে মধুসূদন পাশ্চাত্য নাট্যদর্শের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করলেও নানা অংশে বিভিন্ন সংস্কৃত নাটক ও সাহিত্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই নাটকে পৌরাণিক প্রসঙ্গ ও উপমা ব্যবহৃত হয়েছে সর্বত্র। ধনদাস জগৎসিংহকে তার বংশগৌরব ও গুণের কথা স্মরণ করে দিয়ে বলেছেন—

১। "জনক রাজা কি দাশরথিকে অবহেলা করেছিলেন?"

মানসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা শুনে জগৎসিংহ বলেছেন—

২। 'দুরাত্মা রাবণ কি বৈদেহীর উপযুক্ত পাত্র?"

এইভাবে 'ইন্দ্রকুলের চূড়ামণি", 'বিধাতার লীলা', 'মদন কেতু', 'সখি', 'কৃষ্ণবিনে এ পোড়া প্রাণ আর বাঁচে না', 'সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যু' প্রভৃতি পৌরাণিক প্রসঙ্গ বারবার এসেছে এই নাটকের বিভিন্ন অঙ্কে। কোথাও কোথাও সংলাপে সংস্কৃতানুসারী ভাষাভঙ্গী, উপমাদি প্রয়োগ, শব্দ ব্যবহারে তৎসমের অতি প্রবণতা বাগ্‌ভঙ্গীতে পরোক্ষ জটিলতা, মন্থরতা লক্ষ করা যায়—যা সংস্কৃত নাট্যাদর্শের কথা মনে করিয়ে দেয়। এছাড়া আগস্তের সমুদ্রপান, হিমালয় গৃহে পার্বতীর জন্ম, অর্জুন কর্তৃক মৎস্যচক্রভেদ, কৃষ্ণকর্তৃক রুক্মিণী হরণ ইত্যাদি রামায়ণ মহাভারতের বিভিন্ন প্রসঙ্গ এসেছে বারে বারে। এছাড়া এই নাটকে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ না দেখিয়ে বিবৃতিধর্মী করে তোলায় নাট্যকাহিনি যে ধীর ও মন্থর হয়েছে তাও সংস্কৃত নাটকের প্রভাবজাত বলেই মনে হয়।

চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও এদেশীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। মধুসূদন ভবভূতি রচিত 'মালতী-মাধবী' নাটকের কপালকুণ্ডলার নামানুসারে এই নাটকের তপস্বীনির নাম দিয়েছেন কপালকুন্ডলা। এ নাটকের প্রধান নারী কৃষ্ণকুমারীর চরিত্র রচনার সময় মধুসূদনের মনের মধ্যে সংস্কৃত নাটকের মুগ্ধা নায়িকার আদর্শ জেগেছিল। দশ রূপক নামে নাট্যতত্ত্বের লেখক ধনঞ্জয় মুগ্ধা নায়িকার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—

"মুগ্ধা নববয়ঃ কামা রতৌ বামা মৃদুঃ ক্রুধি।"

অর্থাৎ নব বয়ঃ প্রাপ্তা রতিবিমুখ এবং ক্রোধেও মৃদুস্বভাবা নায়িকাকে বলা হয় মুগ্ধা। ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ড. সীতানাথ আচার্য এবং ড. দেবকুমার দাস জানাচ্ছেন—

> — "কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিতে স্থিতা যে নায়িকার অন্তরে সদ্য কামাভাবের উন্মেষ ঘটে, রতি বিষয়ে যে বিমুখ, অভিমানবশত নায়কের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েও যে কোমলস্বভাবা, তাকে মুগ্ধা নায়িকা বলা হয়।"

মদনিকা ও বিলাসবতী চরিত্রটি শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিকম্'-এর মদনিকা ও বসন্তসেনার আদর্শে চিত্রিত। 'মৃচ্ছকটিকম্'-এর মদনিকার ন্যায় এই মদনিকাও চতুরাং, দয়াবতী ও কিঞ্চিত ক্রূরস্বভাবা।

সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের ছায়া এ নাটকে ধনদাসের উপর পড়েছে বলে মনে হয়। তবে তার চরিত্রের মধ্যে যে দুষ্টবুদ্ধির অস্তিত্ব রয়েছে তার ফলে তথাকথিত বিদূষক থেকে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে।

ভারতীয় আদর্শানুযায়ী এই নাটকের কৃষ্ণার চরিত্রের মধ্যে যে ব্যক্তি লক্ষণ ও বিশিষ্টতা ফুটে উঠেছে তা কোমল পেলবতায় একেবারে কালিদাসের শকুন্তলার মত। বৃক্ষলতাদির সঙ্গে শকুন্তলার মত কৃষ্ণার আন্তরিক সম্পর্ক।

মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের বিষয় আহরণ করেছিলেন টডের গ্রন্থ থেকে এবং টডের গ্রন্থে কাল্পনিকতা কম বেশি থাকলেও অন্তত কৃষ্ণকুমারী আখ্যানে কল্পনার সুষমা ও আদর্শবাদের আরোপ ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে সময় কৃষ্ণকুমারী জীবননাট্য রাজপুতানায় অভিনীত হয়, সেই সময়ে টড রাজপুতানাতেই অবস্থান করেছেন এবং সেদিক দিয়ে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটককে বাস্তবজীবনাশ্রয়ী নাটক বললেও ভুল হবে না। সেজন্যই বোধহয় নাটকের মধ্যে জীবন সংরাগের তীব্রতা এত প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রথমেই এই নাটকে গ্রীকপ্রভাব উল্লেখ করা যেতে পারে প্রসিদ্ধ নাট্যকার ইউরিপিদিসের 'ইফিগেনিয়া ইন অলিস' নামক নাটকের সঙ্গে 'কৃষ্ণকুমারী'র কাহিনি অংশের কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। এই কাহিনির সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর সাদৃশ্য অন্তত দুটি বিষয়ে—১। ইফিগেনিয়ার মত কৃষ্ণাও পিতার আদেশে নিহত হয়, ২। উভয়ের মৃত্যুর জন্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দায়ী। তবে মিলের চেয়ে অমিলের দিকটিও কম নয়, যেমন—ট্রয় যুদ্ধজয়ের সহেগ ইফিগেনিয়ার কোনো দিক থেকে কিছুই যোগ ছিল না। তার হত্যাসাধনের পেছনে ছিল—দৈবাচার্যের ভবিষ্যৎবাণী ও যুদ্ধজয়ের জন্য দেবতাকে তুষ্ট করবার চেষ্টা, অপরপক্ষে দুর্বল মেবারের উপর যে রাজনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসছিল তা কৃষ্ণকুমারীকে কেন্দ্র করেই। অবশ্য এখানেও কৃষ্ণকুমারী কিছুমাত্র দায়ী ছিল না। এই দিক থেকে এই কাহিনীর সঙ্গে মিল আছে।

রোমান ইতিহাসের কুমারী ভার্জিনিয়া কাহিনির সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। জার্মান নাট্যকার লেসিন (LESSING)-এর ইমিলিয়া গ্যালোটি (Emilia Galotti) নাটকের সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর চরিত্রগত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। Emilia-র সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীকে Prince-চরিত্রের সঙ্গে জগৎসিংহের Marinelli-র সঙ্গে জনদাসের এবং কাউন্টেস্সের সঙ্গে বিলাসবতী ও মদনিকার মিল দেখে মনে হয় মধুসূদন Emilia Galotti-র অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন।

তবে কৃষ্ণকুমারী নাটকে সবচেয়ে বেশি প্রভাব শেক্সপীয়রের। বিশেষ করে চরিত্র ও নাট্যধর্মের দিক থেকে তিনিই সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছেন। নারীচরিত্র সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার ব্যতিক্রম ও ইউরোপীয় মানবধর্মকে নাটকে ব্যবহার সবই এসেছে শেক্সপীয়রের নাট্যাদর্শ থেকে।

শেক্সপীয়রের সুপ্রসিদ্ধ নাটক 'The Life and Death of King John' নাটকের ফিলিপ দি ব্যাস্টার্ড

চরিত্রের অনুকরণে এই নাটকের বলেন্দ্রসিংহের চরিত্রটি রচিত হয়েছে। মধুসূদন নিজেও তা এক পত্রে স্বীকার করেছেন—

"I wish Bullender to be serious and light like 'Bastard' in king John."

ফিলিপ চরিত্রের লঘু পরিহাস প্রবণতাও তার তীক্ষ্ণ রাজনীতি ও রণনীতিবোধ, সাহস ও বীরত্ব, সহৃদয়তা মানবতা এ সবই বলেন্দ্র সিংহের মধ্যে পাওয়া যায়।

শেক্সপীয়রের ইয়াগোর সাদৃশ্যে ধনদাস চরিত্রটি রচিত হয়েছে বলে মনে হয় কিন্তু ইয়াগোর মত ধনদাস চরিত্রে জটিলতা নেই।

এছাড়া মদনিকা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, যে পুরুষোচিত গুণ তারও প্রেরণা পাশ্চাত্য নাটক থেকে এসেছে। শেক্সপীয়র রচিত 'As you like it' নাটকের স্ত্রী চরিত্র 'Gonymede' ও 'Merchant of Venice' নাটকের Portia চরিত্রের সঙ্গে এ নাটকের মদনিকা চরিত্রের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে অলৌকিকতার ব্যবহার প্রসঙ্গে কোনো কোনো সমালোচক শেক্সপীয়রের পরিকল্পিত হ্যামলেটে পিতার প্রেতদর্শন ও ম্যাকবেথে ভোজসভায় ব্যাঙ্কোর সাক্ষাৎকার দৃশ্য উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই তুলনা আরোপিত। কৃষ্ণকুমারীর স্বপ্নে পদ্মিনীর আদেশলাভ, অনেক পরিমাণেই গ্রীক নাটকের দৈবাদেশ। গ্রীক নাট্যবিশারদ গিলবার্ট মারে মন্তব্য করেছেন—

"The heroic saga, the normal stuff of tragedy was all more or less supernatural, and the greeks accepted, and even enjoyed, the instruction of frankly supernatural beings, of oracles and hieroilogol."

কৃষ্ণকুমারী নাটকেও ('Oracles')-এর ব্যবহার লক্ষ করি।

৩.৩.১১.২ : রাজপুতদের ভগ্নদশা

বাংলা নাটকের এক চরম সংকটময় মুহূর্তে মধুসূদনের আবির্ভাব। সমকালীন সকল নাট্যকারই তথা সংস্কৃত নাটকের নেশায় বুঁদ। তাছাড়া অনুবাদাশ্রয়ী শ্লথগতিসম্পন্ন নাটক দর্শক মনকে তৃপ্ত করতে পারছিল না। এই সময় মধুসূদন নবসৃষ্টির সাধনায় ব্রতী হলেন। প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনই প্রথম (বাংলা নাটকে) রাজস্থান গ্রন্থকে সাহিত্যসৃষ্টির উপকরণের আধার রূপে বেছে নিলেন। এরপরে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতকের প্রথম দিকে বাংলা নাটক ও উপন্যাসে রাজস্থান গ্রন্থ থেকে প্রচুর কাহিনি গৃহীত হয়েছে। রাজ-রাজার বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনি বাঙালিকে স্বদেশ প্রাণতায় দীর্ঘকাল উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী'তে যে কাহিনিটি বেছে নিলেন তা টডের মেবার কাহিনির একেবারে শেষদিকে রাজপুত জাতির ভগ্নদশার কথা। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একপত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন—

"The plot is taken from Tod, Vol-I, P-461. I suppose you are well acquainted with the story of the unhappy princess Kissen Kumari."

রাজস্থান গ্রন্থে বহু আকর্ষণীয় ঘটনার মধ্যে মধুসূদন কৃষ্ণকুমারীর কাহিনিটি কেন বেছে নিলেন আমরা সেই আলোচনায় আসতে পারি।

মেবারের অবস্থা তখন চরমভাবে সংকটময়। সমগ্র মেবারে পতনের ছায়া নেমে এসেছে। মেবারের পূর্ব গৌরব অতীত স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়েছে। রাজশক্তি ও অর্থ-সামর্থের দিক থেকে ক্রমে এতদূর

অধঃপতিত হয়েছিল যে বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে বিপন্মুক্ত করতে স্বয়ং রাজাকে নিরপরাধ কন্যার মৃত্যুর ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। শক্তাবৎ-চন্দ্রাবৎদের কলহ, সেই কলহ দমনে মারাঠাদের আহ্বান। মহারাষ্ট্রীয়দের রাক্ষসী ক্ষুধায় প্রভূত অর্থ সম্পদের অঞ্জলি প্রদান—এইসব রাজনৈতিক ঘটনার জটাজালে মেবার মুমূর্ষ হয়ে পড়েছিল। যার ফলস্বরূপ অল্প কিছুকাল পরেই ইংরেজ রাজশক্তির কাছে ঘটে চরম পরাজয়।

মেবারের এই বিপন্নতার ইতিহাস মধুসূদনকে আলোড়িত করেছিল। মধুসূদন তখন 'মেঘনাদবধ' কাব্য লিখছিলেন, তাঁর সমগ্র কবি আত্মা এমনকি গোটা ব্যক্তি-অস্তিত্বও যেন ঐ মহাকাব্যের সুরে বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। স্বর্ণলঙ্কার চরম পতনের দিনগুলি ধরা পড়েছিল তার কল্পনায়, পরম গৌরবের উজ্জ্বল কাল নয়। এর মধ্যে কবির জীবন চেতনা প্রতিফলিত।

স্বর্ণলঙ্কার রাবণ ভগ্নলঙ্কার মাঝখানে বসে বেদনার্ত হয়ে উঠেছিল। শত্রুর আক্রমণে আত্মীয়স্বজনের বিনাশে, ভ্রাতার বিশ্বাসঘাতকতায় লঙ্কার গৌরব নিত্য ক্ষীয়মান। ঠিক একই সময়ে মেবারের কাহিনি থেকে নির্বাচিত কললেন এমন একটি অধ্যায় যেখানে মেবারের পূর্ব গৌরব অতীতের ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে বাস্তব শুধু ক্ষীণ শক্তি ও অর্থহীন দুরবস্থা। ভীম সিংহের কথায়—

"... আমার আর এক দণ্ডের জন্যেও প্রাণ ধারণ করতে ইচ্ছা করে না। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হায়ঙ্গ হায়ঙ্গ আমি ভুবন বিখ্যাত শৈলরাজের বংশধর, আমাকে একজন দুষ্ট, লোভী গোপালের অর্থ দিয়ে রাজ্যরক্ষা করতে হল?" ধিক আমাকে! এ অপেক্ষা আমার আর কি গুরুতর অপমান হতে পারে?" (২/১)

এ বেদনাবানী রাবণের অগ্নিগর্ভ বেদনাবাণীকে স্মরণ করিয়ে দেয়—

হায় ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে।
... ...
একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিদে, দেউটি,
... ...
তবে কেন আর আমি থাকিবে এখানে?"

—লঙ্কাপুরী বিদেশাগত রাজসৈন্যদের দ্বারা বেষ্টিত। মেবার ও মহারাষ্ট্রীয় এবং পাঠান সৈন্যদের দ্বারা উপদ্রুত, জয়পুরী এবং মারাঠা সেনাবাহিনীর সংঘাতস্থল হওয়ায় বিপর্যস্ত। মধুসূদনের যে মন মেঘনাদবধ কাব্য রচনায় মগ্ন সেই মন প্রায় সমজাতীয় কাহিনি নির্বাচনে হৃদয়ের সাড়া পেয়েছে।

মেঘনাদ বধের ট্র্যাজেডির ভিত্তি রাবণের চরিত্র তার অন্তর্বেদনা। পুত্রশোকাতুরা রাবণের বীর্যবন্ত চরিত্রের সন্দে ভীমসিংহের তুলনা চলে না। কিন্তু ভীমসিংহ ও প্রাণাধিক কন্যা কৃষ্ণার মৃত্যুতে বেদনাদীর্ণ। তাছাড়া সবপ্রিয় মেঘনাদের মৃত্যু যেমন মেঘনাদবধ কাব্যের বেদনাকেন্দ্র তেমনি সকলের স্নেহধন্য অতি কমনীয় প্রকৃতির কৃষ্ণার মৃত্যুকে আশ্রয় করেই এই নাটকের করুণরস তথা ট্র্যাজিক আবেদন উৎসারিত।

মেঘনাদবধ কাব্য এবং কৃষ্ণকুমারী নাটকের কাহিনি অংশ এত পৃথক অথচ এদের মধ্যে দুটি দিকে রয়েছে গুরুতর সাদৃশ্য। এই কারণেই মেঘনাদবধ রচনাকালে তিনি (রাজপুতদের ভগ্নদশা) কৃষ্ণকুমারী ছাড়া অন্য কোনো কাহিনি রাজস্থান গ্রন্থ থেকে নির্বাচন করতে চাননি।

৩.৩.১১.৩ : উপকাহিনী

অ্যারিস্টটলের মতে কোনো কাহিনিকে নাট্যরূপ দিতে গেলে ঘটনা বা পরিস্থিতি কল্পনাই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। কারণ, নাটক আসলে জীবনেরই দৃশ্যরূপের অনুকরণ। মধুসূদনও এই সত্যকে সামনে রেখে তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচনা করেছেন। টড বর্ণিত কৃষ্ণকুমারীর উপাখ্যানটিকে নাট্যরূপ দেবার পূর্বে সর্বপ্রথমেই তিনি কল্পনা করেছিলেন যে, নাটকটি ট্র্যাজেডি হবে। এখন এই ট্র্যাজেডিকে তিনি কিভাবে রূপ দিতে পেরেছেন, তা-ই বিচার্য। প্রথমেই লক্ষণীয় যে, মধুসূদন এই নাটকটিকে একটি গাঢ় পিনদ্ধ ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি রূপেই অঙ্কিত করতে ইচ্ছুক ছিলেন। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন—

> "I have made the list of dramatist personse as short as I could, for I wish to leave no loop hole for our Manager to escape through 'Fancy' only 5 or 6 males and but 4 females in a Historic Tragedy."

কিন্তু কেশব গন্দোপাধ্যায়ের অনুরোধ (you suggest on under plot) তিনি নাটকটিকে জটিল বৃত্ত (complex plot) নাটকরূপেই রচনা করেন। সে কারণেই নাটকের মধ্যে বিলাসবতী মদনিকা-ধনদাসের উপকাহিনিটি এসেছে। টডে যা উল্লেখমাত্র ছিল, মধুসূদন তাকেই নাটকের মূল কাহিনির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। আধিকারিক বৃত্তের (main plot) সন্দে প্রাসন্দিক বৃত্তের (sub-plot) এই মেলবন্ধন নাটকটিকে গঠনের দিক থেকে 'Romantic' অভিধায় চিহ্নিত করেছে, নাট্যগঠনের এই কৌশল মধুসূদন সম্ভবত শেক্সপীয়রের নাট্যগঠনের আদর্শ থেকেই আহরণ করেছেন।

ঐতিহাসিক নাটক বা ঐতিহাসিক উপন্যাসে অনেক সময় দেখা যায়, মূল কাহিনির সমান্তরালে বিভিন্ন উপকাহিনির সমাবেশ ঘটে। এই কাহিনিগুলি মূল কাহিনিকে সমৃদ্ধ করে ও ঘটনাপ্রবাহকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে 'রাজসিংহ' উপন্যাসের কথা। এখানেও মূল কাহিনির সমান্তরাল দুটি উপকাহিনি দেখা যায়। ক. মবারক-দরিয়া-জেবউন্নিসার কাহিনি, খ. মানিকলাল নির্মলকুমারী ঔরঙ্গজেব-এর কাহিনি। বস্তুতপক্ষে ইতিহাসের প্রবল গতিবেগের মধ্যে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির বৈপরীত্যে এই উপকাহিনিগুলির মধ্যেই মানব হৃদয় ও চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

'কৃষ্ণকুমারী' নামক ঐতিহাসিক নাটকটিতেও একটি উপকাহিনি দেখা যায়। সেটি হল ধনদাস-বিলাসবতী ও মদনিকার উপকাহিনি। বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, এই উপকাহিনিটি মূল কাহিনির অগ্রসরে কতটা সহায়তা করেছে।

ধনদাস রাজসহচর, বিলাসবতী জগৎসিংহের উপপত্নী তার সখি মদনিকা। বস্তুত নাটকটির ঘটনা সংঘাত মূলত এই তিনটি চরিত্র দ্বারাই সৃষ্ট। জগৎ সিংহের মনে কৃষ্ণকুমারী সম্পর্কে আগ্রহ ও কৌতূহল সৃষ্টি করে ধনদাস। জগৎসিংহ কৃষ্ণকুমারীর প্রতি আকৃষ্ট হলে বিলাসবতী ঈর্ষান্বিত হয়। সে এই বিবাহ রদ করার উদ্দেশ্যে মানসিংহের কাছে কৃষ্ণকুমারীর নামে এক অনুরাগ পত্র পাঠায়। একাজে তাকে সহায়তা করে সখী মদনিকা। সে মানসিংহের দূতী হয়ে কৃষ্ণকুমারীকে গিয়ে জানায়, তার প্রতি মানসিংহের অনুরাগের কথা। ফলে কৃষ্ণকুমারীর মনে মানসিংহের প্রতি অনুরাগের সঞ্চার ঘটে।

অর্থাৎ, দুই রাজা কৃষ্ণকুমারীকে লাভ করার আশায় যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, সেই বিরোধের বীজ বপন করে এই তিনটি চরিত্র। জগৎসিংহের নির্বোধ ও কামাশক্ত চরিত্রটিও এই চরিত্রগুলিই পরিস্ফুট করে তোলে।

অর্থাৎ, আমরা দেখলাম এই উপকাহিনিটি মূল ঘটনাপ্রবাহে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তাই উপকাহিনিটির সংযোজনায় মধুসূদন দত্ত যে সফল তা দ্বিধাতীত ভাবেই বলা যায়।

৩.৩.১১.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করো।

২। ‘কৃষ্ণকুমারী’র কাহিনি নির্বাচনে রাজপুতদের ভগ্নদশাকে বেছে নেওয়া হল কেন?

৩। ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকে অনৈতিহাসিক দুটি চরিত্রের ভূমিকা নিরূপণ করো।

————

পর্যায়গ্রন্থ - ৩

একক - ১২

নারী ও পুরুষ চরিত্র

বিন্যাস ত্র(ম :

৩.৩.১২.১ নারী চরিত্র
- ৩.৩.১২.১.১ কৃষ্ণকুমারী
- ৩.৩.১২.১.২ বিলাসবতী
- ৩.৩.১২.১.৩ মদনিকা
- ৩.৩.১২.১.৪ অহল্যাবাঈ
- ৩.৩.১২.১.৫ তপস্বিনী

৩.৩.১২.২ পুরুষ চরিত্র
- ৩.৩.১২.২.১ ভীমসিংহ
- ৩.৩.১২.২.২ জগৎসিংহ
- ৩.৩.১২.২.৩ বলেন্দ্রসিংহ
- ৩.৩.১২.২.৪ ধনদাস
- ৩.৩.১২.২.৫ মন্ত্রী

৩.৩.১২.৩ আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.৩.১২.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩.৩.১২.১ : নারী চরিত্র

৩.৩.১২.১.১ : কৃষ্ণকুমারী

নাটকের প্রধান চরিত্র কৃষ্ণকুমারী। উদয়পুরের রাজকুমারীর সৌন্দর্যই তাকে চরম বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। সুন্দরী কৃষ্ণকুমারী একইসন্দে একদিকে জগৎসিংহ অন্যদিকে মানসিংহ উভয়ের দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছে। এবং এক্ষেত্রে তার জীবনের সবথেকে ব্যথাবহ ঘটনাটি হল এই যে তিনি পিতার দিকে তাকিয়ে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে এই দুজনের মধ্য থেকে যে কোনো একজনকে জীবসাথী বানানোর দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে পারেনি। এখানেই তাঁর চরম ট্র্যাজিক পরিণতি নিষ্পাপ কৃষ্ণকুমারীর নিয়তির তপ্তস্পর্শে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভীমসিংহের নির্দেশে মনের কামনা বাসনা সমস্ত কিছুকে নিবারিত করে এক মর্মান্তিক পরিণতি তাকে গ্রাস করেছে। শধু তাই নয়, নাটকের শেষ দৃশ্যে কাকা বলেন্দ্র সিংহের কাছ থেকে যখন কৃষ্ণকুমারী জানতে পেরেছে যে তার পিতাই তাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছে, তখন তার সেই আর্তি 'কাকা আমার পিতারও কি এই ইচ্ছা'—এই উক্তি দর্শকচিত্তকে নাড়া দিয়েছে এবং সাথে সাথে তার আত্মহত্যা ট্র্যাজিক চরিত্রের পথ রচনা করেছে।

কৃষ্ণকুমারী এই বিষাদাত্মক নাটকের নায়িকা। নাট্যকাহিনির পরিণতি সম্বন্ধে লেখকের ধারণা আগে থেকে সুস্পষ্ট ছিল বলে, কৃষ্ণকুমারী চরিত্রটিকে পূর্বাপরই বিষাদে আচ্ছন্ন করে চিত্রিত করেছেন। পিতা

ভীমসিংহের সংসার অনিশ্চয়তা ও অশান্তি দ্বারা বিক্ষুব্ধ, বাহ্য বিক্ষোভের তাড়নায় ভীমসিংহ তার পারিবারিক জীবনকে উপেক্ষা করে চলতে বাধ্য হয়েছেন। রাজকুমারী কৃষ্ণার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারেই রাজাকে তাই অভিমানক্ষুব্ধ অভিযোগ শুনতে হয়—

"পিতা, আপনি অনেকদিন আমার উদ্যানে পদার্পণ করেন নাই, তা আজ একবার চলুন।"

ভীমসিংহ কন্যার আবদার সেদিন আর উপেক্ষা করতে পারেননি। কিন্তু এর মধ্যে থেকে তাদের রাজপরিবারের চিত্র সকলের স্পষ্ট হয়ে উঠল। রাজপ্রাসাদের অন্তরালে অধিকাংশ কুমারী রাজকন্যা যে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়, কৃষ্ণার জীবনেও তার বিশেষ ব্যতিক্রম ছিল বলে মনে হয় না। এই নিঃসঙ্গতা থেকেই তার মনে বিষাদের ভাব সঞ্চারিত হয়েছিল এবং এই বিষাদমগ্ন ভাবই তার জীবনের করুণ পরিণতির পক্ষে সহায়ক হয়েছে। কৃষ্ণার চরিত্র যদি সদাপ্রফুল্ল ও হাস্যময় হতো, তাহলে তার জীবনের পরিণতিও স্বতন্ত্র হতো। স্নেহসম্পর্কহীন নিঃসঙ্গ জীবনে সে নিরবচ্ছিন্ন বিষাদের ভার বহন করে গিয়েছে।

মধুসূদন কৃষ্ণকুমারীকে পরিপূর্ণ সহানুভূতি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, সে জন্যই তার সৃষ্টিও সার্থক হয়েছে, কারণ, সহানুভূতি ভিন্ন কোনো চরিত্রসৃষ্টিই সার্থক হতে পারে না। কৃষ্ণার জীবনের নিরবচ্ছিন্ন বিষাদ, কাতরতা থেকেই দেখতে পাওয়া যায় যে, তার চরিত্রের মধ্যেই আত্মহত্যা করবার প্রবৃত্তি সমাহিত হয়েছিল। কৃষ্ণকুমারী চরিত্র প্রসঙ্গে বিশিষ্ট নাট্য সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন—

> "বাংলা নাটকে 'কৃষ্ণকুমারী'র মধ্যেই সুসঙ্গত চরিত্র সৃষ্টির সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে বাংলায় যে সকল নাটক রচিত হইয়াছে, তাহাদের বিষয়বস্তু সাধারণত গুরুত্ব বর্জিত হওয়ার জন্য তাহাতে সমগ্রভাবে কোনো চরিত্র সৃষ্টি সুসঙ্গতি লাভ করিতে পারে নাই।" (বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, পৃষ্ঠা - ২১৬)।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের নামকরণ প্রমাণ করে এ নাটকের কেন্দ্রে রয়েছে কৃষ্ণাচরিত্র। কিন্তু নাটকের শেষে কৃষ্ণকুমারী যখন বিষপানে আত্মহত্যা করে, তার জননী যখন তার অনুসরণ করে এমনকি নিষ্ঠুর আমির যখন সেই কাহিনি শুনে বিস্মিত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধ সংলাপ উচ্চারণ করে, তখন দর্শকদের মন ট্র্যাজিক রসের প্রভাবে ভেসে যায় না। কেননা কৃষ্ণকুমারীর জীবনে একদিকে উদয়পুর রাজ্যের বিপুল বংশগরিমা, অন্যদিকে ভীমসিংহের মধ্যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টির যে সুযোগ তা মধুসূদন পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেননি। তার এই দ্বিধার কারণই শেক্সপীয়রের ট্র্যাজিক চরিত্রের মত কৃষ্ণকুমারী চরিত্রের সাফল্য এনে দিতে পারেনি।

সমগ্র আলোচনা শেষে বলা যায় মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকটি বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক। তাই নাটকটির ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি আছে একথা সত্য। তা সত্ত্বেও মধুসূদন দত্ত কৃষ্ণকুমারী চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় রেখেছেন এবং তাকে ঘিরে নাটকের নামকরণও শিল্পসম্মত ও সার্থক হয়েছে।

৩.৩.১২.১.২ : বিলাসবতী

বিলাসবতী চরিত্রটি অঙ্কনে মধুসূদন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করেছেন। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিকম্' নাটকের বারবিলাসিনী বসন্তসেনা যেমন পণ্যানারী হয়েও চারুদত্তের প্রতি তার হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রেম নিবেদন না করে থাকতে পারেনি, তেমনি 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের বিলাসবতী চরিত্রটিও রূপোপজীবিনী হয়েও জগৎসিংহের সমস্ত চরিত্রদোষ সমেতই তাকে হৃদয় দান করেছে।

বিলাসবতীকে পাওয়া যায় জয়পুরের পটভূমিতে। এ নাটকে তার একটি জীবন ইতিহাসের ইঙ্গিত আছে। চরিত্রটি রচনায় মধুসূদনের প্রধান কৃতিত্ব হল তিনি বিলাসবতীকে শুধুমাত্র বারাঙ্গনা যেমন করতে চাননি, তেমনি একনিষ্ঠা সরলা প্রেমিকাও করে রাখেননি। জগৎ সিংহের জন্য তার হৃদয় যেমন সতী নারীর

মত কাঁদে, অন্যদিকে ধনদাস বা ক্ষমাপ্রার্থী রাজার সঙ্গে কথোপকথনে তার বারান্ধনাসুলভ ভাবভঙ্গি বেরিয়ে আসে। বলা যায়, ভালোবাসায় কোমল, অতীত জীবনের স্মৃতিতে বেদনাময় আবার আক্রমণের মুহূর্তে তীক্ষ্ণ এই নারী যথেষ্ট পরিমাণে নাটকীয় হয়ে উঠেছে। এই নাটকে শেষপর্যন্ত বিলাসবতীরই জয় হয়। জগৎ সিংহ তার কাছে ফিরে আসে, অর্থাৎ তার ভালোবাসাকে সম্মান করেন মধুসূদন। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

৩.৩.১২.১.৩ ঃ মদনিকা

মদনিকা বিলাসবতীর সহচরী, সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় যে এ চরিত্রটিও বিলাসবতীর মত রূপোপজীবিনী। কিন্তু চরিত্রটিকে মধুসূদন ভিন্নভাবে পরিকল্পিত করেছিলেন। তার প্রমাণ, কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে মদনিকা চরিত্রটি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, 'That মদনিকা will play the Deuce with ধনদাস।

নাটকে মদনিকার আবির্ভাব ঘটে প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে। এছাড়াও বিভিন্ন অঙ্কের বিভিন্ন গর্ভাঙ্কে তাকে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোনো প্রবল সংকটের সময় অনুপস্থিত, অর্থাৎ সে নাটকের কেন্দ্রবিন্দু নয়।

প্রথম আবির্ভাবেই তার বাইরের পরিচয় পাওয়া যায়। সে বিলাসবতীর সখী। বিলাসবতীকে সেই কৃষ্ণার খবর দেয়, সে বাইরের খবর রাখে। তার দু-একটি সংলাপে বোঝা যায় সে বিলাসবতীর পুরোপুরি বিপরীত। যে সমাজ পটভূমিতে বিলাসবতী বা কৃষ্ণকুমারী আত্মসমর্পণ করে সেখানে মদনিকা যেন নাট্যকাব্যের প্রতিবাদ।

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক থেকে দেখা যায় পুরুষের ছদ্মবেশে মদনমোহন নাম গ্রহণ করে মদনিকা। আবার কৃষ্ণকুমারীর মত সরলা মেয়ের মনে কিভাবে সে প্রেম জাগায় তা-ও লক্ষ করার বিষয়।

বস্তুত মদনিকার মত কৌশলী চতুর কোনো চরিত্র, যে সব সমস্যার সমাধান করতে পারে অপরিসীম বুদ্ধি দিয়ে নাট্যসাহিত্যে এমন চরিত্র মেলা ভার। চরিত্রটির এই অসাধারণত্ব প্রকাশ করাতেই মধুসূদনের কৃতিত্ব।

৩.৩.১২.১.৪ : অহল্যাবাঈ

মহিষী অহল্যাবাঈ সম্পর্কে মধুসূদন মন্তব্য করেছেন—

> "The queen of such an unfortunate prince, as the Rana Bheem Singh connot but be sad and grave."

উদরপুরের রানা হিন্দুকুলসূর্য কিন্তু তিনি রাহুগ্রস্ত। স্বামীও রাজ্যের বিপর্যয় মহিষীকে উদ্বিগ্ন ও বিষাদময় করে তুলেছি। স্বামীর অশান্তিতে তার জীবনও অশান্ত হয়েছে। বাঁচার ইচ্ছাশক্তি তার মধ্যে আর নেই। মহারাষ্ট্রপতির ত্রিশ লক্ষমুদ্রার বিনিময়ে রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ রানার মুখে শুনে তিনি আশ্বস্ত হয়ে কৃষ্ণার বিয়ের কথা তাকে বলেছেন এবং ভীমসেনের প্রণয়িনী পদ্মিনীদেবীর কথা উল্লেখ করে অজ্ঞাতসারে বিয়োগান্ত পরিণামের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করেছেন। নাট্যকার মহিষীর স্বাধ্বী স্ত্রী ও জননীমূর্তি অঙ্কিত করেছেন। তাই স্বামীর প্রতি উদ্বেগপূর্ণ কর্তব্যনিষ্ঠা ও কন্যার প্রতি বাৎসল্য, তার চরিত্রকে পূর্ণতা দিয়েছে। জগৎসিংহের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবে তিনি আনন্দিত হয়েছেন এবং মা-র মতন স্নেহে চোখের জল ফেলেছেন। তিনি বলেছেন—

> "মহারাজ, আমার এ কোকিলটি এ বনস্থলী ছেড়ে গেলে কি আর আমি বাঁচব।"

আবার মানসিংহের প্রতি কন্যার অনুরাগের কথা তপস্বিনীর মুখে শুনে তিনিও রানাকে অনুরোধ

করেছেন তাকে কন্যাদান করতে। কিন্তু জয়পুর ও মরুদেশের রাজদ্বয়ের প্রতিযোগিতার সূত্রধরে যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হবার সম্ভাবনা আছে এবং মানসিংহের পক্ষ মহারাষ্ট্রপতি সমর্থন করায় রানার ও রাজ্যের বিপদ ঘনীভূত হয়েছে, ভীমসিংহের কাছে এই কথা জেনে মহিষী নিজের কলাপকে দায়ী করে কান্না করেছেন। রানা আক্ষেপের সুরে বলেছেন যে, তার হৃদয়নিধি কৃষ্ণা থেকে তার সর্বনাশের সূচনা হতে চলেছে। এই কঠিন কথা শুনে জননীর হৃদয় আলোড়িত হয়েছে। তিনি বলেছেন,

> "বাছা, কেনই বা তোর এ অভাগিনীর গর্ভে জন্ম হয়েছিল।"

শেষ দৃশ্যে কৃষ্ণার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং কন্যার মৃত্যুর জন্য রানাকে দায়ী করে, শোকে ও অভিমানে নিজেও মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। শুধু বলে গেলেন—

> "তোমার হাতে আমার কৃষ্ণার রক্ত লেগে রয়েছে। মহারাজ, আমি তোমার কাছে এ জন্মের মতন বিদায় হলেম।"

৩.৩.১২.১.৫ : তপস্বিনী

তপস্বিনী সংসারত্যাগী সন্ন্যাসিনী হলেও রানার পরিবারের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও এই সূত্রে তাদের ভাগ্যের সন্দে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে মহিষীকে বলেছেন যে, তিনি চির উদাসিনী। ভবসংসারের কল্লোল তার কর্ণকুহরে প্রায়ই প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু ধর্মজীবনে উদাসিনী হলেও মানবিক বৃত্তির দিক থেকে তিনি রাজমহিষীর অন্তরঙ্গ সখী ও কুমারী কৃষ্ণার পরম হিতৈষিণী। রাজপরিবারের দুঃখের অংশ তিনি গ্রহণ করেছেন ও তাদের চরম বিপর্যয়ের দিনে তিনি শোকাতুরা হয়ে কান্না করেছেন। তিনি তার হৃদয়কে সুখদুঃখে বিগতস্পহ করতে পারেননি, সন্ন্যাস জীবনের কৃচ্ছসাধনা তার চিত্তবৃত্তিকে শুষ্ক করতে পারেনি। তিনি স্বগতোক্তিতে বলেছেন—

> "আমি ভেবেছিলাম, যে অনিদ্রা, নিরাহার, কঠোর তপস্যা, এসকল সংসার মায়া-শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দান করে। তা কৈ? আমি যে মুক্তিলাভ করেছি, এমনও কোনোমতেই বোধ হয় না।"

বিধাতা যে হৃদয়বৃত্তি মানুষকে দান করেন তাকে নির্মূল করা যায় না। সেই হেতু সংসার ছাড়লেও দুঃখ মনকে অভিভূত করে, শোকে হৃদয় সন্তপ্ত হয়।

তিনি প্রথম থেকে অহল্যাবাঈ ও ভীমসিংহকে সান্ত্বনাদানের প্রয়াস করেছেন। রানার দুঃখের কথা শুনে তাকে বলেছেন যে, বিপুল রাজকুল কখনো শ্রীভ্রষ্ট হবে না। যেহেতু সংসারে তখনও একপদে ধর্ম আছে, সেইহেতু পুরুষোত্তম, পুণ্যভূমি ভারতকে বিস্মৃত হবে না। জগৎসিংহের সঙ্গে কৃষ্ণার বিবাহ প্রস্তাবে তিনি সুখী হয়েছেন, আবার তার কাছ থেকে মানসিংহের প্রতি অনুরাগের কথা জানতে পেরে রানাকে তার হাতে কন্যাকে সম্প্রদান করতে অনুরোধ করেছেন। রানা দুই রাজার প্রতিদ্বন্দ্বিতাই রাজ্যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হবার কথা বলে কৃষ্ণাকে দায়ী করলে, মহিষী কাঁদতে থাকে। তখন এই তপস্বিনীই তাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। আবার, কৃষ্ণার কাছে পদ্মিনীর আবির্ভাবের কথা জেনে তাকে সেই স্থান থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গেছেন। রাজ্যের সম্ভাব্য বিপদের ইঙ্গিত তিনি আগেই স্বপ্নযোগে পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই কথা কারো কাছে তিনি বলেননি। পঞ্চমাঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে মহিষীর দুঃস্বপ্নের কাহিনি শুনে তিনি তাকে বলেছেন যে, স্বপ্নে মন্দ দেখলে তার ফল ভাল হয়ে থাকে। কৃষ্ণার মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে তিনি কান্না করেছেন ও মহিষীর জীবনাবসান যে বিধাতার বিড়ম্বনার জন্য এ ভেবে তিনি নিজেকে সংযত রাখতে পারেননি। তপস্বিনী চরিত্রের মাধ্যমে মধুসূদন অলৌকিকতার রহস্য ও রোমান্সের মাধুর্যকে বাস্তব জীবন-জিজ্ঞাসার সন্দে যুক্ত করে দিয়েছেন।

৩.৩.১২.২ : পুরুষ চরিত্র

৩.৩.১২.২.১ : ভীমসিংহ

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথম দৃশ্যে প্রথম ভীমসিংহের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। রাজভৃত্যের মাধ্যমে কতগুলি চিঠি প্রেরণ করে স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে ভীমসিংহের যাত্রা শুরু হয়—'হে বিধাতা একেই কি লোকে রাজভোগ বলে?' তার এই প্রথম উক্তিতেই আমরা বুঝতে পারি যে তিনি রাজ্যরক্ষার সঙ্কটে পড়েছেন এবং তা সৃষ্টি হয়েছে তার একমাত্র সুন্দরী কন্যা কৃষ্ণকুমারীকে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ একদিকে কন্যা কৃষ্ণকুমারী এবং অন্যদিকে রাজ্যের চরম সংকট—এই দুই ভিন্ন আবর্তের মধ্য দিয়েই চরিত্রটির সূত্রপাত।

আপাতদৃষ্টিতে লীয়রের সঙ্গে ভীমসিংহের সাদৃশ্য দেখা যেতে পারে। দুজনেই অসহায় ও দুর্বল। কিন্তু লীয়র রাজ্যহারা ও কন্যাদ্বয় কর্তৃক বিতাড়িত তিনি বলেছেন—

> "You see me here, you gods, a poor old man, As full of grief as age; wretched in both."

গ্লস্টার তার উন্মত্ত দশা দেখে বলেছেন, 'O ruined piece of nature' ভীমসিংহ লীয়রের মত বৃদ্ধ ও অশক্ত নন। তিনি রাজসিংহাসনেও অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি নিজেকে সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি নিজে তার অসহায় নিষ্ক্রিয় জীবন সম্পর্কে সচেতন। তিনি পঞ্চমাঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে মন্ত্রীকে বলেছেন—

> "হায়, এ শৈলরাজের বংশে আমার মতন কাপুরুষ আর কে কবে জন্মগ্রহণ করেছে? ব্যাধের ভয়ে শৃগাল গহ্বরে প্রবেশ করে, কিন্তু সিংহের কি সে রীতি?"

তিনি মুখে এই কথা বললেও ক্ষত্রিয় বীরের মত আচরণ পালন করতে পারেননি, ঘটনাবলীর স্রোতে আত্মসমর্পণ করেছেন।

চরিত্র হিসেবে জগৎসিংহের ঠিক বিপরীত প্রান্তে রাখা যায় ভীমসিংহকে। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক থেকে জানা যায় ভীমসিংহ রাজপুতানার একজন পরিচিত মানুষ। সূচনাপূর্ব থেকে বিষণ্ণ মনে হয়। তার বীরত্বজ্ঞাপক সংলাপ নাটকে নেই। বস্তুতঃ তিনি যেন একজন গৃহস্থ মানুষ। যে কন্যাকে স্নেহ করে, স্ত্রীর প্রতি যত্নবান, একজন সাধারণ মানুষ। রাজনৈতিক সংকটের মুখে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত তিনি নিতে পারেন না। অসহায়ভাবে তার সামনে আত্মসমর্পণ করেন।

৩.৩.১২.২.২ : জগৎসিংহ

জগৎসিংহকে নাট্যকার ভীমসিংহের বিপরীত চরিত্ররূপে গড়ে তুলেছেন। প্রতিনায়কের মর্যাদা যে জগৎসিংহের প্রাপ্য নয় তা তার একটি পত্রপাঠ করলেই আমরা বুঝতে পারি। তিনি লিখেছেন—

> "I have tried to represent Juggut Sing as I find him in History, a some what silly and voluptuous fellow."

চরিত্রটিকে নাটকে শারীরিকভাবে পাওয়া যায় মোট তিনটি দৃশ্যে—১/১, ৪/১-২ গর্ভাঙ্কে। জগৎসিংহ খুব বেশিবার আসেন না আমাদের সামনে, কিন্তু তাঁর প্রভাব নাট্যঘটনার ওপর সর্বব্যাপী ছায়া ফেলেছে।

প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কটি এই চরিত্রের Exposition-পর্ব। এই দৃশ্যেই তার চরিত্রের সেই সকল গুণগুলি বেরিয়ে আসে যা নাট্যকাহিনীকে প্রভাবিত করেছে। এই অংশে এক লম্পট, নারীলোলুপ, অগ্র

পশ্চাৎ বিবেচনাহীন। রাজকার্যে অমনোযোগী এক রাজার চেহারা উঠে আসে। জগৎসিংহকে আবার দেখা যায় চতুর্থ অঙ্কের প্রথম ও দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে। এখানে নাট্যঘটনা অনেক দূরই অগ্রসর হয়েছে। এখানে দেখা যায় যুদ্ধের উদ্যোগকারী জগৎসিংহকে। বস্তুতপক্ষে জগৎসিংহ চরিত্রটি নেতিবাচক চরিত্র হিসেবে নাটকে স্থান পেয়েছে।

৩.৩.১২.২.৩ : বলেন্দ্রসিংহ

বলেন্দ্রসিংহ রাজভ্রাতা ও সেনাপতি। ভীমসিংহের পিতার অবৈধ সন্তান বলেন্দ্রসিংহকে টড বলেছেন— 'যৌয়াণ দাস' এবং তিনি ভীমসিংহের 'natural brother' এই বলেন্দ্রসিংহ সম্পর্কে মধুসূদনের উক্তি—

> "I wish Ballender to be serious and light, like the 'Bastard in King John."

তবে শেক্সপীয়রের নাটকে যে ক্ষেত্রে 'Philip the Bastard' 'Robert Poulconbridge'-এর 'half brother' সে ক্ষেত্রে বলেন্দ্র ভীমসিংহের পিতার অবৈধ সন্তান।

অবৈধ সন্তান হয়েও কৃষ্ণকুমারী নাটকে এই দুর্বলচিত্ত পুরুষদের মধ্যে একটি চরিত্রই জ্যোতিতে ভাস্বর, সেটি হল বলেন্দ্রসিংহ। টডের কাহিনীর পরিচয় মধুসূদন একেবারেই বদলে দিয়েছেন।

বলেন্দ্রসিংহকে প্রথম দেখা যায় তৃতীয়াঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে। এর পরই তাকে দেখা যায় পঞ্চমাঙ্কে দুটি দৃশ্যে প্রবল সংকটের মধ্যে।

শেষ অঙ্কের দুটি দৃশ্যে বলেন্দ্র সিংহের যে পরিচয় আমরা পাই, তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য মধুসূদন আগের দুটি দৃশ্যেই তার প্রস্তুতি নিয়েছেন। এখানে তিনি যেন একজন চপল, পরিহাসপ্রিয়, প্রাণবান মানুষ, রাজপুরুষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারেও তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। আবার কৃষ্ণকুমারীর হত্যার আদেশ পালন করতে রাজি হওয়া ও কার্যক্ষেত্রে তাকে বাস্তবে পরিণত করতে না পারার মধ্যে তার মানবিকতা বোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

৩.৩.১২.২.৪ : ধনদাস

অর্থলোলুপ চরিত্র হিসেবে ধনদাসকে আমরা নাটকে প্রত্যক্ষ করি। ইয়াগো চরিত্রের সাদৃশ্যে নাট্যকার ধনদাসকে গড়ে তুলতে চাননি। অত্যন্ত চতুর এই চরিত্রটিকে মধুসূদন অত্যন্ত স্বাধীনভাবে অঙ্কন করেছেন। মদনিকাকে বাদ দিলে একমাত্র এই চরিত্রটিকে আমরা জয়পুর এবং উদয়পুরে সক্রিয় দেখতে পাই। রাজার সহচররূপে থেকে তার একমাত্র কর্ম ছিল অর্থ সংগ্রহ। তার কথায়—

> "আমরাও রাজ অনুচর; তা আমরা যদি রাজপূজায় অর্থলাভ না করি, তবে আর কিসে করব।"

আবার অসৎ, দুষ্ট, অন্যকে বিপদে ফেলতে সে ছিল সিদ্ধহস্ত। তবে নাট্যকার নাটকে গাম্ভীর্যের সন্দে হাসির যে সংমিশ্রণ ঘটাতে চেয়েছেন সে ক্ষেত্রে এই চরিত্রটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

চরিত্রটির সন্দে ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের বিদূষক চরিত্রের মিল লক্ষণীয়। ধনদাস মধুসূদনের তথা উনিশ শতকীয় বাংলা নাটকের স্মৃতিধার্য চরিত্রায়ন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

৩.৩.১২.২.৫ ঃ মন্ত্রী

অপ্রধান চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মন্ত্রী চরিত্র। এই নাটকে দুজন মন্ত্রী চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে। একজন নারায়ণমিশ্র জগৎসিংহের মন্ত্রী ও অপরজন সত্যদাস রানা ভীমসিংহের মন্ত্রী। এই দুজন মন্ত্রীই প্রায়

একরকম আচরণের পরিচয় দিয়েছেন। নাটকের মূল কার্যের অংশীভূত হওয়ায় মেবারের মন্ত্রী সত্যদাস কিছু গুরুত্ব অর্জন করেছেন। টড তার নাম দিয়েছেন সতীদাস। আলস্যপরায়ণ, ইন্দ্রিয়াসক্ত রাজা জগৎসিংহ তার মন্ত্রীকে দেখে বিরক্ত হন। কারণ তিনি তার বিশ্রামের ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে চান। রাজা কৃষ্ণার পাণিপ্রার্থী হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে মন্ত্রী মরুদেশের রাজা মানসিংহের কথা বলেন। এতে রাজা রেগে গিয়ে তাকে বলেন—

"আমি এ রাজকন্যাকে বরণ করবো।"

ধনদাসের সঙ্গে মন্ত্রী সৈন্যসামন্ত পাঠাতে চাননি কারণ অর্থের অপব্যয় তিনি করতে চাননা। রাজা তাতে কান দেননি। ধনদাসের দৌত্যকার্য ব্যর্থ হবার পরে মন্ত্রীর কথায় রাজা বুঝতে পারে যে, বিয়ে উপলক্ষে গোলযোগ সৃষ্টি করে অর্থ উপার্জন করা ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য। মন্ত্রী রাজাকে নানাভাবে যুদ্ধ থেকে সরে আসার পরামর্শ দিয়েছেন। তুচ্ছ অগ্নিকণা থেকে যে ঘোরতর দাবানল সৃষ্টি হয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, সেকথা চিন্তা করে মন্ত্রী ভয় পেয়েছে। রাজাও সমগ্র দেশের মন্দলের কথা ভেবে মন্ত্রী রাজাকে 'বিষম কাণ্ডে প্রবৃত্ত' না হবার কথা বলেছেন, কিন্তু জগৎসিংহ অপযশের ভয়ে তার পরামর্শ গ্রহণ করেননি। মন্ত্রী আক্ষেপের সুরে বলেছে। 'বিধাতার নিবন্ধকে কে খণ্ডন কত্যে পারে'। নারায়ণ মিশ্রকে কোনো গুরুতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়নি, কিন্তু রানার মন্ত্রী সত্যদাসকে ভীমসিংহের কুলমর্যাদা ও উদয়পুরের সমূহ বিপদের দায়িত্ব প্রতিপালন করতে হয়েছে। কুমারী কৃষ্ণাকে নিয়ে জয়পুর ও মরুদেশের রাজার মধ্যে যে সংঘর্ষ অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল তার প্রতিক্রিয়া উদয়পুরের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠবে। আবার তাদের এই বিরোধের সুযোগ নিয়ে মহারাষ্ট্রপতি ও নবাব আমীর খাঁ নিজেদের লালসা ও লোভ চরিতার্থ করবার জন্য উদয়পুরের সর্বনাশ সাধনে বদ্ধপরিকর হল। অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির চিঠি পেলে রানা যখন বিচলিত ও বলেন্দ্রসিংহ কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তখন মন্ত্রী কৃষ্ণাকে বিসর্জনের সমর্থন জানিয়ে বলেছেন—

"এ রোগের এই ভিন্ন আর কোনো ঔষধ নাই।"

তিনি রানাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, উদরপুর রাজবংশের সতী ললনাগন গণ বংশের মানরক্ষায় অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে দেহত্যাগ করেছেন। যিনি নরপতি তিনি প্রজাগণের পিতাস্বরূপ। বহুজনের হিতের জন্য একজনকে বিসর্জন দিতে তার কুণ্ঠাবোধ করা কর্তব্য নয়। মন্ত্রী বিচলিত পিতৃহৃদয়কে এই বলে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছেন—'যে বিধাতা হতে শোকের সৃষ্টি হয়েছে, তিনিই আবার সেই শোককে অল্পজীবী করেছেন।' সুতরাং শোক চিরস্থায়ী নয়। মন্ত্রী পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে বলেছিলেন যে, রাজকুমারীর মৃত্যু ভিন্ন পরিত্রাণলাভের কোনো উপায় নেই। তিনি রানাকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন এই বলে—

"মহারাজ, এ সকল বিধাতার ইচ্ছা বৈ ত নয়।"

রানার উন্মত্ত অবস্থা, কৃষ্ণার আত্মহনন ও মহিষীর মৃত্যু মন্ত্রীকেও বিচলিত করেছে। তিনি বলেন্দ্রসিংহকে বলেছেন—

"আমি চিরকাল এই বংশের অধীন, আমাকে কি শেষে এই দেখতে হল।"

এছাড়াও তিনি তাঁর শোক সামলে কর্তব্যপালন বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছেন ও রাজার ভাইকেও কর্তব্যকর্মে অবহিত করবার জন্য প্রয়াস করেছেন।

৩.৩.১২.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'ধনদাস-বিলাসবতী-মদনিকা'—উপকাহিনিটি মূল কাহিনিকে কতটা সাহায্য করেছে তা আলোচনা করো।

২। 'কৃষ্ণকুমারী' চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো। কৃষ্ণকুমারী চরিত্রসৃজনে লেখকের দক্ষতার পরিচয়া দাও।

৩। অপ্রধান নারী চরিত্রগুলি সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪। ভীমসিংহ কি ট্র্যাজিক চরিত্র? আলোচনা করো।

৫। অপ্রধান পুরুষচরিত্রগুলি কি প্রয়োজনীয় নাটকের পক্ষে? ব্যাখ্যা করো।

৬. 'কৃষ্ণকুমারী'র গঠন কৌশল সবিস্তারে আলোচনা করো।

৭। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের নায়ক কে? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

৮। বিলাসবতী–ধনদাস–মদনিকা–'কৃষ্মকুমারী' নাটকে কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে? তোমার অভিমত লিপিবদ্ধ করো।

৩.৩.১২.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস — ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য

২। বাংলা নাটকের ইতিহাস — ড. অজিত কুমার ঘোষ

৩। নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা — ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য

৪। নাট্য আকাদেমী পত্রিকা (৩য় খন্ড)

৫। সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসন্দ ড. কুন্তল চট্টোপাধ্যায়

৬। কৃষ্ণকুমারী — মূল নাটক

৭। কৃষ্ণকুমারী — ড. সৌমিত্র বসু সম্পাদিত

৮। কৃষ্ণকুমারী — ড. ভবানী গোপাল সান্ন্যাল সম্পাদিত

৯। কৃষ্ণকুমারী — ড. অলোক রায় সম্পাদিত

১০। কৃষ্ণকুমারী — ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

১১। কৃষ্ণকুমারী — ড. অজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

১২। সংলাপ ও ভিন্ন প্রসন্দ — ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩। বাংলা নাটকের টেকনিক — শ্রী চিত্তরঞ্জন লাহা

১৪। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস — ড. ক্ষেত্রগুপ্ত

১৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস — ড. দেবেশ কুমার আচার্য; (আধুনিক যুগ)

১৬। মাইকেল মধুসূদনের জীবন-চরিত্র — যোগীন্দ্রনাথ বসু

১৭। বাংলা নাটকে শেক্‌সপীয়ারের প্রভাব — ড. ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮। ইতিহাস ও সংস্কৃতি — ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯। নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার — ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য

২০। নাটকের কথা — অজিত কুমার ঘোষ

————

পর্যায়গ্রন্থ - ৪

একক - ১৩

'আলিবাবা' নাটকের অভিনয়

বিন্যাসত্র(ম

৩.৪.১৩.১ প্রসঙ্গ -- (িরোদপ্রসাদ

৩.৪.১৩.২ 'আলিবাবা' নাটকের অভিনয়

৩.৪.১৩.৩ 'আলিবাবা' নাটকের নামকরণ

৩.৪.১৩.৪ আদর্শ প্র(াবলী

৩.৪.১৩.১ প্রসঙ্গ — (িরোদপ্রসাদ

গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা যখন মধ্যগগনে, বঙ্গরঙ্গমঞ্চ যখন তাঁর দ্বারা শাসিত, তখন বাংলা নাটকের আঙিনায় আত্মপ্রকাশ (ীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের (১৮৬৩-১৯২৭)। গিরিশচন্দ্র এবং দ্বিজেন্দ্রলালের প্রায় সমকালে জনপ্রিয় হয়ে ওঠার অবকাশ (ীরোদপ্রসাদের ছিল কম। তবু পঞ্চাশটিরও বেশি নাটকের রচয়িতা (ীরোদপ্রসাদ প্রধানত দুজন দিকপাল নাট্যনির্দেশক এবং অভিনেতার হাত ধরে একসময় নাটক-নাট্যভিনয়ের জগতে তুঙ্গে পৌঁছেছিলেন। সেই দুজন নাট্যব্যক্তি(ত্ব হলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং শিশির ভাদুড়ি। যে নাটকগুলিসূত্রে এই জনপ্রিয়তা, সেগুলি হল 'আলিবাবা' (১৮৯৭), 'আলমগীর' (১৯২১) 'নরনারায়ণ' (১৯২৬)।

রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপনা ছেড়ে যিনি নাটককে ভালোবেসেই নাট্যরচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন, তিনি যে পঞ্চাশটিরও বেশি নাটক লিখবেন সেটিই স্বাভাবিক। সমকালীন রঙ্গমঞ্চ কর্তৃপ(ের নির্দেশে বা দর্শক(চির কাছে কখনো বিভ্রান্ত হয়ে, আবার কখনো বিভিন্ন চরিত্রাভিনেতার অনুরোধ রাখতে গিয়ে যে নাটকগুলি তিনি রচনা করেছেন তা মঞ্চসাফল্যের মুখ দেখেনি। তবু নাটককে যেহেতু তিনি জীবিকার বাহন করেছিলেন, তাই আমৃত্যু নাটক রচনায় ছিলেন নিরলস।

(ীরোদপ্রসাদ ২৪ পরগনা জেলার খড়দহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১২ এপ্রিল ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে, ব্রাহ্মণ পরিবারে। পারিবারিক পদবী ছিল ভট্টাচার্য, 'বিদ্যাবিনোদ' তাঁর প্রাপ্ত উপাধি, বিদ্যাচর্চা ও নাটক রচনার সূত্রে। বিজ্ঞানের ছাত্র (ীরোদপ্রসাদ তৎকালীন জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনসটিটিউশনস বর্তমানে যা স্কটিশচার্চ কলেজ, সেখানে রসায়নের অধ্যাপনা করেছেন ১৮৯২ থেকে ১৯০৩ পর্যন্ত সাহিত্যপাঠ এবং সাহিত্যরচনার প্রতি তীব্র ঝোঁক থাকায় অধ্যাপনার জীবন তাঁকে স্বস্তি দেয়নি। শেষপর্যন্ত সাহিত্যিক হওয়ার এবং নাট্যকার রূপে যশলাভের তীব্র বাসনায় অধ্যাপনা বৃত্তি ছেড়ে দেন। বি. এ. পরী(া দেবার তিন বছর আগেই তাঁর প্রথম সাহিত্যকীর্তি 'রাজনৈতিক সন্ন্যাসী' (১৮৮৫) প্রকাশিত হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই কবিতা লেখালেখির শু(। পরিণত যৌবনে উপন্যাসও রচনা করেছেন, কিন্তু নাট্যকার রূপেই তাঁর সর্বাধিক স্বীকৃতি। আমরা আগেই জানিয়েছি, ছোট-বড়-মাঝারি সব মিলিয়ে তাঁর রচিত নাটকের সংখ্যা ৫০টিরও বেশি।

তাঁর রচিত নাটকগুলি সামাজিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, রঙ্গনাট্যে বিভাজিত ।

সামাজিক নাটক—ফুলশয্যা (১৮৯৪), প্রেমাঞ্জলি (১৮৯৬), প্রমোদরঞ্জন (১৮৯৮), কুমারী (১৮৯৯)

পৌরাণিক নাটক — সাবিত্রী (১৯০২), সপ্তম প্রতিমা (১৯০২), রঘুবীর (১৯০৩), বৃন্দাবন বিলাস (১৯০৩), বভ্রুবাহন, বিদুরথ (১৯২৩), রাধাকৃষ(, নরনারায়ণ (১৯২৬), ভীষ্ম (১৯১৩), রামানুজ।

ঐতিহাসিক --- বঙ্গের প্রতাপাদিত্য (১৯০৩), আলমগীর (১৯২১), চাঁদবিবি, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, বাংলার মসনদ, নন্দকুমার, পদ্মিনী, রাজা অশোক, খাঁজাহান, বাদশাজাদী, গোলকুণ্ডা, বঙ্গে রাঠোর।

রঙ্গনাট্য — আলিবাবা (১৮৯৭), আলাদীন, আবু হোসেন ইত্যাদি।

ীরোদপ্রসাদ, রচিত নাটকগুলি সেই সময়ে স্টার, কোহিনূর, এমারেল্ড, ক্লাসিক, রয়াল বেঙ্গল, মিনার্ভা, অরোরা, মনোমোহন, কর্নওয়ালিস, আলফ্রেড (মিত্র থিয়েটার), নাট্যমন্দির প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চে ১৮৯৫ থেকে ১৯২৬ - এর মধ্যে অভিনীত হয়েছিল।

বাঁকুড়া জেলার বিক্না গ্রামে ৪ জুলাই ১৯২৭-এ তাঁর মৃত্যু হয়।

৩.৪.১৩.২ 'আলিবাবা' নাটকের অভিনয়

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ১৬ এপ্রিল এমারেল্ড থিয়েটার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে ক্লাসিক থিয়েটারের পথ চলা শু(হয় অমরেন্দ্রনাথ দত্তের অভিভাবকত্বে। ক্লাসিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠার (ে ত্রে বিশিষ্ট নাট্যনির্দেশক এবং নাট্যাভিনেতা, অমরেন্দ্রনাথ যথেষ্ট চিন্তাভাবনা, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করলেও মঞ্চে অভিনীত কোনো নাটকই তেমন জনপ্রিয় হচ্ছিল না। যার ফলে মঞ্চসাফল্যও আসছিল না এবং অর্থাগমও ঘটছিল না। বারবার নাটক পরিবর্তন করা সত্ত্বেও সাফল্য না আসায় শেষ পর্যন্ত তিনি রঙ্গরস এবং নাচ-গানের সম্মিলনে একটি নাটক মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেই সূত্রেই ীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা'র সন্ধান তিনি পান এবং এই নাটকের মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে শুধু সাফল্য নয়, অর্থাগমও ঘটে প্রচুর। জনপ্রিয়তা পান নাট্যকার ীরোদপ্রসাদ। জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছয় ক্লাসিক থিয়েটার, সমকালীন অন্যান্য রঙ্গালয়গুলির সাফল্যকে পিছনে ফেলে। একই সময়ে প্রমথনাথ দাস রচিত 'আলিবাবা' (১৮৯৭) মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হচ্ছিলো। ক্লাসিক এবং মিনার্ভা দুই থিয়েটারে একই বিষয়ের নাটক অভিনীত হওয়ায় 'তীব্র' প্রতিযোগিতার মধ্যে দর্শক সমাগম ক্লাসিকে কম হচ্ছিলো। এ প্রসঙ্গে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের জীবনীকার রমাপতি দত্ত (হরীন্দ্রনাথ দত্ত) জানিয়েছেন — 'দ্বিতীয় রাত্রি হইতে বিত্র(য় কমিয়া গিয়া তৃতীয় ও চতুর্থ রজনীতে দুইশত-আড়াইশত টাকায় গিয়া ঠেকিল। কিন্তু ত্র(মে দর্শকগণ যখন বুঝিলেন যে, কোথাকার আলিবাবা-র অভিনয় শ্রেষ্ঠ তখন হইতে আর দেখিতে হইল না। ক্লাসিকের বিত্র(য় ত্র(মাগত বাড়িতে বাড়িতে পাঁচশো, সাতশো, বারোশো, পনেরোশো, আঠারোশো শেষে বাইশশো পর্যন্ত গিয়া দাঁড়াইল, আর এদিকে মিনার্ভা থিয়েটার উঠিয়া (বন্ধ হয়ে গেল) শেষে ৩১ মার্চ ১৮৯৮ তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিত্র(য় হইয়া গেল।' (রঙ্গালয়ে, অমরেন্দ্রনাথ পৃষ্ঠা ১৫৬-১৫৭)

ীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা' অমরেন্দ্রনাথ দত্তর নির্দেশনায়, নতুন ভাবনাচিন্তায় এবং সার্বিক অভিনয় -- নাচগান ইত্যাদির মাধ্যমে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসুর নৃত্য পরিকল্পনায় এবং আবদালার ভূমিকায় অভিনয় এবং নৃত্যপরিবেশন এই নাটকের জনপ্রিয়তার কারণ। একথা বলার অপে(া রাখে না যে, মর্জিনা ও আবদালার নাচ-গান এবং রঙ্গরস সমৃদ্ধ অভিনয় সং(-ষ্ট নাটকটির মুখ্য আকর্ষণ। মর্জিনার ভূমিকায় কুসুমকুমারীর নৃত্য এবং অভিনয় দর্শকচিত্তকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। আলিবাবার পুত্র হুসেনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ যদিও মূল কাহিনীতে এবং ইংরেজিতে অনুদিত কাহিনীতে (বাটন অনূদিত) হোসেনের অবস্থান ছিল কিছুটা পৃথক এবং স্বল্প। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ এই চরিত্রটিতে অভিনয়

করবেন বলেই চরিত্রটির পরিচয়ের পরিবর্তন ঘটান এবং নাটকে তাঁর অবস্থানও দীর্ঘ হয়। হুসেনের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় দেখে দর্শক মুগ্ধ হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে অমরেন্দ্রনাথের জীবনীকার জানিয়েছেন, "আলিবাবা অভিনয় আজি পর্যন্ত সমস্ত থিয়েটারেই হইয়াছে। বহু অভিনেতা পুনরায় এই হুসেনের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে — কিন্তু, অমরেন্দ্রনাথের মতো তেমনটি কাহারো হয় নাই। যাহারা অমরেন্দ্রনাথের হুসেনের ভূমিকায় অভিনয় দেখিয়াছেন এবং অভিনেতাদের ওই ভূমিকায় অভিনয় দেখিয়াছেন তাহারা নিশ্চই উপলব্ধি করিয়াছেন অমরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরে ও সাত্ত্বিকতায় এক অদ্ভুত অভিনব, অননুকরনীয় ভাব উদ্ভাসিত।"

'আলিবাবা' নাটকটি এবং অভিনয়কে নিয়ে একটি বিতর্ক আছে। 'আলিবাবা' নাটকের সমকালেই 'আলিবাবা' নামক আর একটি নাটকের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর রচয়িতা রূপে প্রমথনাথ দাসের নাম পাওয়া যায়। প্রমথনাথ দাসের রচিত 'আলিবাবা' মিনার্ভা থিয়েটারে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বরে প্রথম অভিনীত হয়। আলিবাবার অভিনয় প্রসঙ্গে বাংলার রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান (শঙ্কর ভট্টাচার্য) গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে -- সম্ভবত এই নাটকটি অতুলকৃষ(মিত্রের রচনা। আগেই প্রসঙ্গটি উল্লেখিত (নবাব সৈয়দ আমীর হোসেন, প্রিন্স বক্তি(য়ার শাহ্ এবং নবাব আব্দুল শোভান চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং উপস্থিতিতে মিনার্ভায় এই 'আলিবাবা' নাটকটি অভিনীত হয়েছিল।

এই তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, মিনার্ভা এবং ক্লাসিকে একসঙ্গে আলিবাবা অভিনীত হয়েছিল --ক্লাসিকের আলিবাবার রচয়িতা ছিলেন (ীরোদপ্রসাদ আর মিনার্ভার আলিবাবার রচয়িতার নাম প্রমথনাথ দাস — কিন্তু, রঙ্গমঞ্চ বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন যে, নাটকটির রচয়িতা অতুলকৃষ(মিত্র। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই বিতর্কের সম্পর্কে জানিয়েছেন — 'ইহার পূর্বে ((ীরোদপ্রসাদ 'আলিবাবা' নাটকটি রচনার পর স্টার থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য তৎকালীন ম্যানেজার অমৃতলাল বসুর কাছে যান। কিন্তু, অমৃতলাল নাটকটি অভিনয়ের অযোগ্য বিবেচনা করেন) শ্রীযুক্ত((ীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার 'আলিবাবা'-র পাণ্ডুলিপি আমায় দেখাইয়াছিলেন, রঙ্গালয়ের অভিনয়োপযোগী পরিবর্তন করিয়া শ্রীমান অমরেন্দ্রনাথ ও পরিবর্তিত পাণ্ডুলিপি আমার নিকট আনেন(আমার সামান্য সাহায্যও লন।' এই সামান্য সাহায্য হল আলিবাবার প্রথম গানটি —'বাজে কাজে মিন্‌সেকে আর যেতে দেব না।' অতুলকৃষ(মিত্র দাবি করেছেন — 'তিনি আলিবাবা কাটিয়া-ছাঁটিয়া ও তাহাতে প্রায় ৩০খানি গীত রচনা করিয়া অমরবাবুকে অভিনয়ের জন্য অনুরোধ করেন। গিরিশবাবুর নিকটে ঐ আলিবাবা পড়াইয়া শুনানো হয়, তাতে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন ও ২খানি গান বাঁধিয়া দেন ও অমরবাবু ২খানা গান দিয়া অভিনয় করিতে আরম্ভ করেন।' এই তথ্য যদি ঠিক হয় তাহলে 'আলিবাবা' গীতিনাট্যের ৩৬টি গানের মধ্যে ৩৪টি অন্যের লেখা—একথা প্রমাণিত হয়। কিন্তু, (ীরোদপ্রসাদ নাট্যগীত, রচনায় যথেষ্ট পারঙ্গম ছিলেন, তাই, 'আলিবাবা'-র সিংহভাগ গান অতুলকৃষ(মিত্রের লেখা এ কথা আমাদের প(গ্রহণ করা কঠিন। আর একটি তথ্য, (ীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা'-র মঞ্চসাফল্যে, উৎসাহিত হয়ে প্রমথনাথ দাস যে, 'আলিবাবা' নামক নাটকটি রচনা করেন তার উৎসর্গপত্রে অতুলকৃষ(মিত্রের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন — 'আপনার সাহায্য ও যত্নে আলিবাবা গীতিনাট্যখানি প্রকাশ করিয়াছি। আপনি আমাকে ভালোবাসিয়া থাকেন এবং আমার আবদার সহিয়া থাকেন বলিয়া, এই নীতিনাট্য খানির সমস্ত দোষ মার্জনা করিবেন।' অবাক হওয়ার মতো ঘটনা হল (ীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা'-র সঙ্গে এই 'আলিবাবা'-র কাহিনীগত মিল আছে শুধু নয় — দুটি নাটকের গানের ভাষাতেও যথেষ্ট মিল আছে। অতুলকৃষ(সম্ভবত প্রমথনাথ দাসের 'আলিবাবা'-র গানগুলি রচনা করেছিলেন বলেই আমাদের ধারণা। জনপ্রিয়তায় (ীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা' তুলনাবিহীন। আজও চলচ্চিত্র, নাটক, গীতিনাট্য — সব(ে ত্রেই (ীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা'রই প্রাধান্য। জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে নকলনবিশ প্রচেষ্টা যে শেষ পর্যন্ত সার্থক হয় না(বরং সমকালে এবং কালস্রোতে হারিয়ে যায়, গুড়িয়ে যায়, অপর 'আলিবাবা' রচনা সম্পর্কে এই কথাই বোধহয় যথেষ্ট।

আলিবাবা নাটকের অভিনয় থেকে অমরেন্দ্রনাথ ল(াধিক টাকা লাভ করেছিলেন সেই সঙ্গে নাট্যকার ৗরোদপ্রসাদেরও খ্যাতি-স্বীকৃতির দরজা উন্মোচিত হয়েছিল বিশেষভাবে, একথা বলার অপে(া রাখে না।

৩.৪.১৩.৩ 'অলিবাবা' নাটকের নামকরণ

'আলিবাবা' নাটকের নামকরণ প্রসঙ্গে নানা অভিযোগ আনা যায়। সমালোচকেরা বলে থাকেন, আলিবাবা অপে(া মর্জিনা এবং আবদালা চরিত্র দুটি অনেক বেশি সত্রি(য়, গোটা নাটকে তাদের ভূমিকাও গু(ত্বপূর্ণ(বিশেষত মর্জিনার মত অবিস্মরণীয় চরিত্র থাকা সত্ত্বেও আলিবাবার নামে নাটকের নামকরণ হওয়া যথার্থ নয়। যদিও মূল আরব্য কাহিনীর নাম -- 'আলিবাবা ও চল্লিশ চোর'। কিন্তু ৗরোদপ্রসাদের নাটকের কাহিনীর ভিত্তিতে আলিবাবার ভূমিকা আমাদের আকৃষ্ট করে না। এই কাহিনী থেকে বিভিন্ন সময়ে যে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে সে(ত্রে নামকরণে পরিবর্তন বিশেষভাবেই ল(নীয়। 'মর্জিনা-আবদালা' বা 'আবদাল্লা' নামই প্রাধান্য পেয়েছে বিশেষভাবে। আলিবাবা নামকরণের (েত্রে চল্লিশ দস্যু চোর-এর কথা যুত্ত(হয়েছে, বিষয়টিকে জোরদার করতে, গু(ত্ব দিতে।

দ্বিস্তরে বিন্যস্ত কাহিনীতে চল্লিশ দস্যু বা ডাকাতদের সঙ্গে সংযুক্তি(আলিবাবার মাধ্যমে। গরিব কাঠুরে, ভাগ্যের বিড়ম্বনায় আলিবাবা জঙ্গলে গিয়ে অকস্মাৎ সেই ধনরত্নে পরিপূর্ণ গুহার হদিশ পায়। গুহায় প্রবেশের পর গরীব আলিবাবার লোভ বাঁধ ভাঙে। বেশ কয়েকটি বস্তায় ধনরত্ন সহ গুহা থেকে বেরিয়ে গাধার পিঠে চাপিয়ে বাড়িতে পৌঁছে ফতেমার মুখোমুখি হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। 'ওমরাহ' ভাই কাশেম, ভ্রাতৃবধূ সাকিনার চর্তুগুণ লোভের অনুসারী হয়ে কাহিনীর পরিণতিতে দেখা গেল — (ক) কাশেমের মৃত্যু (হত্যা), (খ) সাকিনার আলিবাবাকে বিবাহ, (গ) ত্রি-খণ্ডিত কাসেমের মৃতদেহ চর্মকার মুস্তাফার সাহায্যে মর্জিনার জোড়া লাগানো, (ঘ) দস্যু দলপতির মোস্তাফার সাহায্যে আলিবাবার সন্ধান, চোখ বাঁধা অবস্থায় আলিবাবার বাড়ি পৌঁছানো (ঙ) চল্লিশজন দস্যুসহ দস্যুদলপতির আলিবাবাকে মেরে প্রতিশোধ নিতে উপস্থিত হওয়া (চ) মর্জিনা ও আবদালার যৌথ প্রচেষ্টায়-বুদ্ধিমত্তায় দস্যুদের পরাজয় — মৃত্যুমুখে পতিত এবং দস্যুসর্দার কর্তৃক মর্জিনাকে সমস্ত ধনসম্পত্তি দান। নাটক শেষ।

নাটকের প্রথম স্তর বা ভাগে আলিবাবা নিষ্প্রভ, তুলনায় দ্বিতীয় স্তরে (বা ভাগে) খানিকটা সত্রি(য়তার দেখা পেলেও বুদ্ধিদীপ্তি, বিপর্যস্ত ভাগ্যকে অতিত্র(মণের দুরন্ত সাহস, পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই, সমগ্র ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ এবং পরিণতিতে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ — কোনোটাই তার মধ্যে ল(করা যায় না, কোনোভাবেই না। অতএব — নামকরণে তার প্রাধান্য মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না। বরং 'মর্জিনা আবদালা' যুৎসই। প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত প্রতি ঘটনার সঙ্গে তাদের সংযুক্তি(, পরিণতিতে চিত্তচমৎকারী ভূমিকা, নাচ-গান — যা এই নাটকের অন্যতম উপজীবী তা তো তারাই করেছে। তাদের নামে নামকরণে তাই কোনো দ্বিধা থাকাও উচিত নয় কারো।

৩.৪.১৩.৪ আদর্শ প্র(াবলী

১। আলিবাবা' নাটকের নামকরণ যথার্থ হয়েছে কি? আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

২। 'আলিবাবা' নাটকে রঙ্গরসের বিষয়টি পরিস্ফুটিত করো।

৩। উপযুক্ত নাট্য ঘটনার দৃষ্টান্ত দিয়ে 'আলিবাবা' নাটকটির কৌতুকরসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করো।

————

পর্যায়গ্রন্থ - ৪

একক - ১৪

‘আলিবাবা’ নাটক রচনার প্রেরণা, মৌলিকতা এবং নৈতিক শিক্ষা

বিন্যাস ত্র(ম

৩.৪.১৪.১ ‘আলিবাবা’ নাটক রচনায় প্রেরণা, মৌলিকতা এবং নৈতিক শি(া।

৩.৪.১৪.২ আদর্শ প্র(াবলী

৩.৪.১৪.১ ‘আলিবাবা’ নাটক রচনায় প্রেরণা, মৌলিকতা এবং নৈতিক শি(া

আরব্য উপন্যাসের কাহিনী থেকে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন সময়ে নানা প্রেমকাহিনী, রূপকথার কাহিনী রচিত হয়েছে। স্বভাবতই সেই কাহিনীগুলি ছোট-বড় সকলের কাছেই সমাদৃত হয়েছে। সং(-ষ্ট কাহিনীগুলির মধ্যে আছে -- **লায়লা মজনু, সয়ফুল - বদিউজ্জমাল, আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপ, আলিবাবা ও চল্লিশ চোর** ইত্যাদি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ইসলামধর্মী লেখকেরা এইসব বিষয় অবলম্বনে কাব্যরচনা করেছেন আর আধুনিককালে রচিত হয়েছে নাটক। গিরিশচন্দ্র প্রথম নাট্যকার যিনি আরব্য-পারস্য কাহিনী থেকে নাটকের বিষয় খুঁজে নিয়েছেন। তাঁর রচিত ‘আবুহোসেন’, ‘আলাদিন বা আশ্চর্য প্রদীপ’, ‘পারস্য প্রসূন’ বা ‘পারিসানা’, ‘মায়াত(’, ‘মোহিনী প্রতিমা’, ‘ফনীরমণি’ ইত্যাদি রঙ্গগীতিনাট্যরূপে শুধু বিখ্যাতই নয় — সেই সঙ্গে মঞ্চ সফলও।

(ীরোদপ্রসাদ গিরিশচন্দ্রের ‘আলাদিন’ এবং ‘আবুহোসেন’ রঙ্গগীতিনাট্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রথমে ‘আলিবাবা’ ও পরে ‘আলাদিন’ (১৯০৭) রচনা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আরব্য উপন্যাসের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেন স্যার রিচার্ড ফ্রান্সিস বার্টন (১৮২১-৯০) (— কিন্তু তার দশখণ্ডে রচিত এই বড়মাপের অনুবাদকর্মটি ভিক্টোরীয় যুগে খুবই আপত্তিকর ছিল। বার্টন-এর আগে আর যারা সং(-ষ্ট কাহিনী অনুবাদ করেছিলেন তাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রখ্যাত এডওয়ার্ড উইলিয়ম লেন (১৮০১-১৮৭৬)। তাঁর অনুবাদের সময়সীমা ১৮৩৮ থেকে ১৮৪০। তাঁর ‘আলিবাবা’ নাটকটি পড়ে বোঝা যায় যে, স্বতন্ত্র উৎস থেকে তিনি কাহিনী নির্মাণ করেছেন। যেমন কাশেমের পুত্র তথা আলিবাবার ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা বার্টন বলেছেন যার সঙ্গে মর্জিনার বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু, এডওয়ার্ড উইলিয়ামের অনুবাদে কাশেমের কোনো পুত্রের কথা উল্লেখিত হয়নি বরং আলিবাবার উল্লেখ আছে। (ীরোদপ্রসাদ তাঁর নাটকে হুসেনকে আলিবাবার পুত্ররূপে চিহি(ত করেছেন।

আরব্য উপন্যাসের কাহিনী প্রধানত রূপকথা (Fairytales) । তবে নীতিকথা (Fables)’র বিষয়টি কিন্তু উপে(িত হয়নি। কল্পিত কাহিনী সৃষ্টিতে এর কোনো জুড়ি নেই। তাই শতাব্দীর পর শতাব্দী, বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষ এই কাহিনী পাঠ করে বা চলচ্চিত্রে অথবা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখে আকর্ষণের গভীর বাতাবরণে পৌঁছয়।

এইসব রূপকথার কাহিনীতে সবই সম্ভব। তাই আজ যে রাজা, কাল সে নিঃস্ব ফকির হয়ে যেতে পারে। একরাত্রের জন্য সাধারণ আবু হোসেন বাদশা বনে অভিপ্সিত সবকিছুর বাস্তবায়ন ঘটাতে এগিয়ে যায়। ‘সবকিছু’র মধ্যে আছে — অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনা নিরসন। ঘুষখোর দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষদের চরম শাস্তি, সুস্থ জীবনায়নে, আইনের শাসনে জনসাধারণের কল্যাণই সেখানে মুখ্যস্থান জুড়ে থাকে। আলাদিন

আশ্চর্য প্রদীপ হাতে পেলে যা খুশি তাই করতে পারে। একইভাবে গরিব কাঠুরে আলিবাবা চল্লিশজন ডাকাত / চোর - এর সঞ্চিত ধনরত্নের সন্ধান পায়, ইচ্ছেমতো তার খানিকটা বাড়িতে এনে বিত্তশালী হবার প্রচেষ্টা চালায়। ওই চল্লিশজনের প্রতিহিংসার হাত থেকে মর্জিনা ও আবদালার অসম্ভব প্রয়াসে সে এবং পরিবার-পরিজন বাঁচে । দলনেতা সহ চল্লিশজন দস্যুর অপমৃত্যু ঘটে।

'আলিবাবা' নাটকের এই হল মূল কাহিনী। আলিবাবার মোহর-ধনরাশি প্রাপ্তির পর দুঃখ-দুর্দশা দূর হয়। ত্রীতদাসীবৃত্ত থেকে মর্জিনার মুক্তি(ঘটে। কাশেমের কাছ থেকে সে মর্জিনাকে কিনে নেয়। পরে প্রেমের পরিণতি মর্জিনার বিবাহ হয় আলিবাবার পুত্র হুসেনের সঙ্গে। কাশেম লোভের বলয়ে প্রত্যাবর্তনের পথ খুঁজে না পাওয়ায় অবশেষে মৃত্যু হয়। তার দেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে টাঙিয়ে রাখে দস্যুরা। দস্যুদের হাতে কাশেমের চার খণ্ডের মৃতদেহ চর্মকারি মোস্তাফা জোড়া দেয়। মর্জিনার ভূমিকা প্রধান হয়ে ওঠে সব(ত্রেই। সাকিনা আলিবাবাকে বিবাহ করে। সকলে তা মানেও। সর্দার সহ আলিবাবার বাড়িতে দস্যুরা আলিবাবাকে মারতে এলে মর্জিনার বুদ্ধি — সত্রি(য় ভূমিকা -- সকলের প্রশংসা পায়। আলিবাবা বেঁচে যায়, সর্দার সহ দস্যুদের মৃত্যু ঘটে। লোভ-মোহ-দম্ভ-অহংকার -- রাতারাতি ধনী - বিত্তশালী হলে, জীবনাচারণে প্রভেদ ঘটে -- প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির এইসব দিকগুলি নীতিশি(ার (Fbles) বিষয় হয়ে ওঠে। দস্যু সর্দারের অজস্র ধনরত্ন 'বেটি' মর্জিনাকে দান করে যায়। মর্জিনা তা গ্রহণ করে মানবকল্যাণ এবং প্রকৃত ধর্মচর্চার কাজে নিয়োজনে সংকল্পবদ্ধ হয়। নাটকও শেষ হয়।

'আলিবাবা' নাটকে মোট তিনটি অংক এবং অংকগুলি দৃশ্যে বিভাজিত তা যথাত্র(মে ছয়, ছয় এবং সাত। অপেরাধর্মী এই গীতিনাট্যে গানের সংখ্যা — ৩৬টি। গিরিশচন্দ্রের ভাষ্য অনুযায়ী এই জাতীয় নাটক হল — রঙ্গনাট্য। গিরিশচন্দ্র রঙ্গনাট্যে রঙ্গরসকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (িরোদপ্রসাদ রঙ্গের সঙ্গে যুক্ত(করেছেন মানবিক রস। সেই সঙ্গে জীবন জিজ্ঞাসার বিষয়টি আলোকিত হয়েছে। এরই অনুষঙ্গে নীতিশি(ার দিকটিও (লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু -- এইসত্য) প্রাধান্য পেয়েছে। সাকিনা কাশেমের ভূমিকা, আচরণকে দর্শক যেমন মেনে নিতে পারে না, আমরাও পারি না। নাট্যকারও পারেননি। তাই কাশেমের মৃত্যু নিয়ে প্র(া ওঠে না। প্র(া ওঠে আলিবাবার মর্জিনাকে বিবাহ প্রসঙ্গে। এই ভাবনা আরব্য উপন্যাসে নেই, গিরিশচন্দ্রের নাটকে নেই। এখানে আছে দার্শনিক মনের হদিশ মেলে অর্থবিত্তকে কেন্দ্র করে। যা ভোগের, তাই আবার ত্যাগের সামগ্রী হয়ে ওঠে। তিনটি দৃষ্টান্ত -- (ক) আলিবাবা ধনসম্পত্তি পাওয়ার পর মর্জিনাকে বলে --- 'আমরা অনেক টাকা পেয়েছি, তার নেশা আমরা কেউ বরদাস্ত করতে পারছি না—টাকাগুলো তুই নিবি? (খ) ডাকাত সর্দার বলেছে -- 'টাকা কি আর ভোগ হবে বলে রোজগার করছি? খোদার খাজাঞ্চিখানা, আমরা তাঁর জমিনদার। কতকাল ধরে আমাদের এই গুপ্তভাণ্ডারে ধন সঞ্চয় হচ্ছে, আমাদের মধ্যে কে জানে? একজনের পর একজন, তারপর আর একজন, এইরকম কত হাত ফিরে, শেষে এই ধনাগারে ধনসঞ্চয়ের ভার আমাদের হাতে পড়েছে। তারপর আমাদের হাত থেকে হাত বদলে, এই ভার দুনিয়ার, শেষ পর্যন্ত চলে যাবে।' (গ) মর্জিনা দস্যু সর্দারের সব ধনরত্নে মালিক হবার আহ্বান সত্ত্বেও জানায় — '.... আমার ধনে কাজ কি? আমি তোমার নামে সেই ধন কাছে গচ্ছিত রাখবো।' ... এটি নীতিশি(ার বিষয়। তাহলে সং(েপে দাঁড়াচ্ছে মূল্যবোধ-নৈতিক শি(া বিষয়গুলি — (অ) লোভ-লালসা নয় (আ) কাউকে কখনও ঠকানো - প্রবঞ্চনা করা অনুচিত। (ই) অকস্ম্যাৎ অর্থ প্রাপ্তিতে মাথা ঘুরে গেলে চলবে না। মতি-স্থিতি ও সুপরিচলানার প্রয়োজন (ঈ) সৌভ্রাতৃত্ব সবসময় কাম্য। (ঙ) ঈর্ষা কখোনই কাম্য নয়।

আরব্য উপন্যাসের আলিবাবা ও চল্লিশ ডাকাতের কাহিনী 'আলিবাবা' নাটকে একদিকে যেমন সং(প্ত হয়েছে, তেমনি আবদালা-মর্জিনা মুস্তাফা আর হুসেন কাহিনীকে টেনে বাড়ানো হয়েছে। নৃপেন্দ্র চন্দ্র বসু ও কুসুমকুমারীর নাচ-গানের জন্য আবদালা ও মর্জিনা বিশেষভাবে পরিকল্পিত হয়েছে। আর

অমরেন্দ্রনাথকে গু(ত্ব দিতে গিয়ে হুসেন চরিত্রটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এ কথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। নাটকে কিছুটা বোকা, কিছুটা একরোখা, কখনো লাজুক কখনো প্রগল্‌ভ রোমান্টিক নায়কের ভূমিকায় হুসেনের উপস্থিতি নাটকের শেষে পট পরিবর্তন এবং সিংহাসনে হুসেন ও মর্জিনা (সিংহাসনের তলে আবদালা) দু-পাশে ফতিমা ও সাকিনা। এই সঙ্গে 'চাঁদ চকোরে' অধরে অধরে/গিয়ে সুধা প্রাণ ভরে' - গানটির সংযোজন রোমান্টিক কমেডিতে নাট্য পরিণতি ঘটিয়েছে। নাট্যকার এছাড়াও অতিরিত্ত(যে চরিত্রগুলি সংযোজিত করেছেন তা হল কাশেমের ইয়ারগণ, ফতিমার প্রতিবেশিরা এবং শেষ দৃশ্যে হাকিম। এছাড়া আমরা দেখতে পাই 'চিচিং ফাঁক' শব্দটির উদ্ভাবন। ী্রোদপ্রসাদ বনে-জঙ্গলের মধ্যে গুপ্তদুয়ার খোলার (্ত্রে 'চিচিং - ফাঁক' শব্দটির উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন(কিন্তু নাট্য অভিধানে গিরিশচন্দ্রকে এর উদ্ভাবক বলা হয়েছে। আমরা জানি, আরব্য উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদে সকলেই পাহাড়ের গুপ্ত দুয়ার খোলা ও বন্ধ করার মন্ত্র রূপে। 'সিসেম' (Sesame) এবং বার্টনের অনুবাদে সিম্‌সিম্ (Simsim) অর্থাৎ তিলের গাছ বা তিলের কথা বলেছেন। 'Open sesame', 'Shut Sesame' ইংরেজি অভিধানে এমন এই অর্থেই স্থান পেয়েছে। কিন্তু কাসিম শব্দটি ভুলে 'Open Barley' থেকে শু(করে নানা ধরণের শস্যকনার নাম করেছে। আমরা নাট্যসংলাপে ফিরে যেতে পারি — সেখানে উদ্‌ভ্রান্ত কাশেমের মুখে শোনা যায় — 'মানুষ খেতে না পেলে কি করে? খাই খাই। খাই খাই ফাঁক খোলে না ত। কি কল্লুম -- সর্বনাশ কল্লুম? মানুষ খেতে না পেলে কি করে? -- ওই তো করে -- আবার কি করে? দে দে -- না না তাও ত নয়(হা হা -- তাও যে নয় গো! ওরে বাবা কি কল্লুম। খেতে না পেলে কি করে? মোট বয় চাকর হয় -- চুরি করে, বাটপাড়ি করে -- আমার মাথা করে, মুণ্ড করে, -- ওরে বাবারে, কি কল্লুম রে!' অন্যদিকে 'না না, সেটা যে একটা ফলের নাম -- ফাঁক ফাঁক, ঢেঁড়স ফাঁক, রাই ফাঁক, সর্ষ ফাঁক, তিল ফাঁক, --মস্‌নে ফাঁক -- আল্লার দোহাই ফাঁক। ফাঁক, ফাঁক, ফাঁক (উন্নতভাবে পরিভ্রমণ) গম ফাঁক, অড়র ফাঁক, মটর ফাঁক, ভুট্টা ফাঁক! এখানে 'চিচিঙ্ ফাঁক', এবং 'Open, Sesame' দুটি শব্দ যেন কাসেমের মনের মধ্যে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। আসলে কাশেমের মনে নয়, নাট্যকারের মনে।

৩.৪.১৪.২ আদর্শ প্র্োবলী

১। 'আলিবাবা' নাটকটিতে নৈতিকতার যে দিকগুলি উন্মোচিত হয়েছে তা দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করো।

২। আরব্য উপন্যাসের কাহিনী নিয়ে রচিত 'আলিবাবা' নাটকে মূল্যবোধ ও নীতিশিক্ষার কোন্ কোন্ দিকগুলি প্রাধান্য পেয়েছে—দৃষ্টান্তসহ বুঝিয়ে দাও।

————

পর্যায়গ্রন্থ - ৪

একক - ১৫

মর্জিনা চরিত্র

বিন্যাস ত্র(ম

৩.৪.১৫.১ মর্জিনা চরিত্র

৩.৪.১৫.২ বিপরীতমুখী চার চরিত্র

৩.৪.১৫.৩ আদর্শ প্র(াবলী

৩.৪.১৫.১ মর্জিনা চরিত্র

মর্জিনা বাংলা নাটকের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে অবিস্মরণীয় চরিত্র। নারী-পু(ষের ভেদ রেখা না টেনেই একথা বলা যায়। মর্জিনার মধ্যে যে চারিত্রিক গুণ-অবস্থান-বৈশিষ্ট্যগুলি সূর্যের প্রাখর্যে দীপ্যমান সেগুলি — (ক) সৌন্দর্য। অন্তরে বাহিরে সুন্দরী সে, (খ) নৃত্যগীত পটিয়সী, (গ) বাক্‌পটুতা, (ঘ) প্রত্যুৎপন্নমতি বা উপস্থিত বুদ্ধি, (ঙ) ভাগ্যের বিড়ম্বনায় কাশেম-সাকিনার দাসী হয়েও তার বুক জুড়ে ছিল অনন্তপ্রেম, সেই প্রেমেই ডুব দিয়ে হুসেন জীবনের অর্থ (meaning) খুঁজে পেয়েছে, (চ) সাহসী এবং চাতুর্যের আশ্রয়ে তৎপর (ছ) সকলের নির্ভরশীলতা তার উপর, (জ) সর্বোপরি মানবিকতা পরিপূর্ণ তার হৃদয়, তাই ন্যায়-নীতির প(পাতী, অন্যায় - অত্যাচারে প্রতিবাদী, (ঝ) দার্শনিক প্রত্যয়, (এ() সার্বিক জীবনের, (Total Life) বার্তাবাহী, অপরিসীম জীবনাবেগ (Life Force)।

এই দশটি বৈশিষ্ট্যের, দশটি দৃষ্টান্ত আমরা অনায়াসেই তুলে ধরব। মর্জিনা স্বপ্ন দেখতেও জানে, দেখেও। তাই প্রথম অঙ্কের, প্রথম দৃশ্যের শু(তেই সে জানিয়ে দেয় আবদালাকে — 'যে দিন বেগম হব, সে দিন তোকে হাজার কোড়া লাগাব।' আবদালা প্রতি উত্তরে ব্যঙ্গ করলে সে প্রত্যয়ের সঙ্গে জানায় — 'আমি কি বেগম হতে পারি না?' অথবা 'আমি বেগম হয়েছি জেনে রাখ।'

এ শুধু উচ্চাকাঙ্(া নয়, নিজের ত্র(ীতদাসী জীবন থেকে মুক্তি(ও উত্তরণের অভীপ্সা। মর্জিনার বর্ণনা, তার চলাফেরার প্রতি নজর দিলে আমরা তার সৌন্দর্য প্রত্য(করি। সে নৃত্যগীতে পারঙ্গম। নাটকের সূচনা, তার ও আবদালার নৃত্যগীতের মাধ্যমে। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে, হুসেনের জিজ্ঞাসার উত্তরে সে জানায়, — 'ভালবাসি কিনা জিজ্ঞাসা কচ্ছ? ..... একটু একটু বাসি বৈ কি।' দস্যু সর্দারকে চিনতে জানতে না পেরে তৃতীয় অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে আলিবাবা 'দরবেশ' বলে উল্লেখ করলে, মর্জিনাই বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে জানায় — 'সে কি দরবেশ? বি(াস হয় না। নইলে নেমক খায় না কেন? কি করি — একটা ভাল মানুষকে কি শেষকালে হত্যা করে বসবো? ভালমানুষ কখনই নয়। ডাকাত, সেই ডাকাত(ভোল বদলেছে — নইলে নেমক খায় না কেন, প্রতিজ্ঞা করেছে যে আলির জান না নিয়ে নেমক খাব না। তাই এসেছে, তাই হুসেনের সঙ্গে যেচে আলাপ করেছে — উপযাচক হয়ে দোস্তি পাতিয়েছে। উপযাচক হয়ে বিনা স্বার্থে কেউ কি কারও সঙ্গে ভাব করে? কই তাত দেখিনি। ডাকাত — আলবাৎ ডাকাত। কি করি? ডাকাত তাতে আর সন্দেহ নেই — তবে কেমন ক'রে আলির প্রাণ র(া করি? ঈ(র, আর একবার সহায় হও — যদি নিরপরাধ হয়, আমার হাত নিস্পন্দ কর(যদি দস্যু হয় — হাতে বজ্রের বল দাও।'

প্রত্যুপন্নমতিত্বের পরিচয় নানাভাবে পাওয়া গেছে। মুস্তাফাকে চোখ বেঁধে বাড়িতে নিয়ে এসে কাসেমের খণ্ডিত দেহ জোড়া লাগিয়েছে। চোখ বেঁধে আনার কারণ যাতে সে অন্য কাউকে বা দস্যুদের বাড়ির হদিশ না দিতে পারে। আবার আবদালার সঙ্গে যুক্তি(করে পিপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে থাকা দস্যুদের গরমতেল ঢেলে হত্যা করেছে এবং আলিবাবা ও হুসেনের প্রাণ বাঁচিয়েছে। হুসেনের সঙ্গে তার প্রেম, ভবিষ্যতে তাকে গৃহবধূ করার তীব্র বাসনায় আলিবাবা কাসেমের কাছ থেকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে দাসীত্ব থেকে মুক্ত(করে। মর্জিনার মধ্যে স্বভাবতই কৃতজ্ঞতার প্রতিসরণ। দস্যু সর্দার তাকে সব ধনরত্ন দান করে দিলে, নির্লোভী মর্জিনা দার্শনিক প্রজ্ঞা নিয়ে জানায় — 'আর আমার ধনে কাজ কি? আমি তোমার নামে সেই ধন খোদার কাছে গচ্ছিত রাখব। ম(ভূমিতে পথিকের জন্য কূপ খনন করবো। (ুধার্তের জন্য দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে অন্নসত্রের ব্যবস্থা করব? আর জলহীন দেশে দীর্ঘ সরোবর খনন করে দেব। আর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, সমস্ত ধর্মের জন্য রেখে দেব।' এভাবেই সবকিছুর মধ্য দিয়ে মর্জিনা, নাটকে সকলের এবং আমাদের কাছেও চলমান জীবনে অত্যন্ত আপনজন হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে বড় কথা এমন প্রাণের বেগ (life force) প্রাণতপস্যা এবং বহুমুখীতা বাংলা নাটকে আর কোনো নারীর মধ্যে দেখা যায় নি।

৩.৪.১৫.২ বিপরীতমুখী চার চরিত্র

ফতিমা ও সাকিনা এবং আলিবাবা ও কাশেম — পরস্পর বিরোধী চরিত্র। দুই সহোদর এবং তাদের দুই পত্নি বিপরীত মে(তে অবস্থিত। ফতিমা 'সহজ সরল।' আলিবাবা কষ্ট করে যে কাঠ কেটে আনে ফতিমা তা বিক্রি(করে। এরমধ্যে দিয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহ হয়। সাকিনা কাঠ কেনার সময় নানাভাবে ফতিমাকে ঠকায়। সে বোঝে না। মর্জিনা ইন্দিতে বোঝানোর চেষ্টা করেও পারে না। আলিবাবা ডাকাতদের সঞ্চিত ধনরত্ন গুহা থেকে নিয়ে আনার পর তার আনন্দ-উল্লাস-চিৎকার এবং হরিভাবে প্রায় সবটাই জানাজানি হয়ে যায়। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে, যখন তাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে তখনও তার সারল্য জটিলতার দিকে সরে যায়নি। অতীত জীবনকে আলিবাবা সহজে ভুলে গেলেও ফতিমা পারে না। আবার কাশেমের মৃত্যুর পর সাকিনার সঙ্গে আলিবাবার বিবাহ হলে সে (ুব্ধ হয় আবার অচিরেই সেই 'নিকাহ' মেনেও নেয়। একসময়ে যে শোষণ করেছে -- বিদ্রূপ করেছে -- তাকে 'সতীন' রূপে পাশে নিয়ে চলতে ফতিমার কোনো অসুবিধাই হয় না।

তেমন আবদালার জন্য আমাদের কষ্ট হয়। তার জীবনের কোনো পরিবর্তন সূচিত হয় না। মোস্তাফা, দস্যু সর্দার নিজের নিজের (েত্রে স্বাভাবিক। তবে হুসেন আরো সক্রি(য় হলে, নাট্যরস আরো ঘনীভূত হত। রসরঙ্গের দিক থেকে সংলাপ, নাচ - গান এবং কিছু কিছু আচরণ স্মরণীয়। মর্জিনা - আবদালা, আলিবাবা - ফতিমা, কাসিম — প্রমুখের (েত্রে এই রসরঙ্গ মূর্ত হয়েছে নানা সময়ে।

৩.৪.১৬.২ আদর্শ প্র(াবলী

১। 'মর্জিনা' বাংলা নাটকের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় চরিত্র। — আলোচনা করো।

২। ফতেমা ও সাকিনা এবং আলিবাবা ও কাশেম চরিত্রদুটির বিপরীতমুখীতার বিষয়টি আলোচনা করো।

৩। মর্জিনা 'আলিবাবা' নাটকের সবচেয়ে সক্রিয় এবং উজ্জ্বল চরিত্র। এই অভিমতটির যথার্থতা বিচার করো।

————

পর্যায়গ্রন্থ - ৪

একক - ১৬

সংলাপ ও সংগীত

বিন্যাস ত্র(ম

৩.৪.১৬.১ 'আলিবাবা' নাটকের জনপ্রিয়তার কারণ

৩.৪.১৬.২ সংলাপ ও সংগীত

৩.৪.১৬.৩ আদর্শ প্র্নোবলী

৩.৪.১৬.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩.৪.১৬.১ 'আলিবাবা' নাটকের জনপ্রিয়তার কারণ

বিশিষ্ট ফরাসী নাট্যকার তথা উপন্যাসিক ভিক্টর হুগো নাটকের অভিনয় দেখতে আসা দর্শকদের চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন —

(ক) বোদ্ধা দর্শক -- যারা সম্পূর্ণ নাটকটিই চিন্তাভাবনা নিয়ে প্রত্য(করে।

(খ) রসিক দর্শক -- যারা নাটক দেখতে এসে নাটকের হৈ-হুল্লোড় রঙ্গ-ব্যঙ্গ দেখতেই বেশি পছন্দ করে।

(গ) নৃত্যগীতে আকৃষ্ট দর্শক -- এরা নাচ - গান বিশেষত মহিলাদের অর্থাৎ অভিনেত্রীদের নাচ-গানের প্রতিই আকর্ষণ বোধ করে।

(ঘ) সর্বশেষ দর্শকেরা হল চটুল, নারীর যৌন আবেদনই তাদের কাছে প্রধান। অভিনেত্রী দেখার জন্যই তারা ভিড় জমায়, ভিক্টর হুগো কর্তৃক শ্রেণী বিভাজিত এই দর্শকদের দেশ-কাল নির্বিশেষে সর্বত্রই প্রত্য(করা যায়।

ীরোদপ্রসাদ রচিত এবং অমরেন্দ্রনাথ দত্ত অভিনীত ও নির্দেশিত 'আলিবাবা'-র জনপ্রিয়তার কারণগুলি খুঁজতে গেলে দর্শকদের এই শ্রেণীবিভাজনের কথা আমাদের মাথায় রাখতেই হয়। 'আলিবাবা' -- নাটকটি দেখতে উপরে বর্ণিত এই চারশ্রেণীর দর্শকই আসত এবং আমোদ প্রমোদের সবটুকু নিংড়ে নিয়ে বাড়ি ফিরত। এছাড়াও ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত 'আলিবাবা',-র অভিনয়ে মঞ্চসজ্জা, সুর-সংগীত সংযোজন - নৃত্য পরিকল্পনা-পরিবেশনা-পরিচালনা সর্বোপরি অমরেন্দ্রনাথ, কুসুমকুমারী, নৃপেন্দ্রনাথ সহ সকলের দাপুটে অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, সেই সময়ে রঙ্গরস সমৃদ্ধ গীতিনাট্য আর কোনো মঞ্চে অভিনীত হচ্ছিল না। তাই, দর্শকেরা ক্লাসিকে এসে নাটক দেখার সঙ্গে সঙ্গে অতিরিত্ত(অন্যান্য বিষয়গুলি প্রত্য(করায় এই নাটকের জনপ্রিয়তা ত্র(মাগতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক কিংবা চেনাজানা সামাজিক নাটক দেখতে দেখতে দর্শকেরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আর একটি বড় কথা, আরব্য কাহিনী থেকে গৃহীত 'আলিবাবা'-র নাট্যবস্তু গৃহীত হয়েছিল, মূল কাহিনীটি রূপকথা। চলমান বাস্তবের প্রাত্যহিকতার ̄ানি ঘোচাতে দর্শকেরা কাহিনী আশ্রয়ী এই অপেরাধর্মী রূপকথার নাটকে বেশি আনন্দ পেয়েছিল। মিনার্ভায় অভিনীত 'আলিবাবা', ক্লাসিকে অভিনীত 'আলিবাবা'-র কাছে জনপ্রিয়তায় হেরে গিয়েছিল এই কারণে। প্রচুর অর্থব্যয়ে

অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিককে সজ্জিত করেছিলেন। দর্শকদের আনুকূল্যও উপচে পড়েছিল। অর্থাগমের বিষয় -- সে তো ইতিহাস, তার কথা আগেই উল্লেখিত।

৩.৪.১৬.২ সংলাপ ও সংগীত

পাশ্চাত্যের সমালোচকেরা সংলাপকে (Dialogue) নাটকের প্রাণ বলে অভিহিত করেছেন। ভারতীয় নাট্য সমালোচকেরা সংলাপকে এতটা গু(ত্ব না দিলেও সংলাপের অপরিহার্যতাকে স্বীকার করেছেন। এটা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না যে, নাটকের কাহিনী বয়ন এবং চরিত্রচিত্রণ সংলাপ ছাড়া হতে পারে। আমাদের আলোচ্য 'আলিবাবা' নাটকের সংলাপ প্রসঙ্গে জ(রী কয়েকটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন —

(ক) এটি একটি গীতিনাট্য।

(খ) শুধু গীতিনাট্য বললেও সম্পূর্ণ বলা হয় না সেই সঙ্গে নৃত্যও যুক্ত(হয়েছে।

(গ) এককথায় বরং বলা চলে অপেরাধর্মী নাটক।

(ঘ) প্রথাগত নাট্যধারার মাঝে দর্শকদের আনুকূল্য লাভে ক্লাসিক থিয়েটারের মালিক এমন অপেরাধর্মী নাটকই বেছে নিয়েছিলেন কেননা তাঁর ল(্য ছিল - অর্থাগম আর তা সম্ভব হয়েছিল দর্শকদের ব্যাপক উপস্থিতির মধ্যদিয়ে।

(ঙ) দর্শকেরা আপ্লুত হয়েছে, কখনও আবিষ্ট থেকেছে, আবার কখনও বিস্ময়ের ঘোরে থেকেছে, এই নাটকের নাচ, গান, অভিনয় আবদ্ধ দৃশ্য -- মঞ্চ, পোষাক-আসাক সবকিছু দেখা ও শোনার মধ্য দিয়ে।

মৌলিক বাংলা নাটক রচনার (ে ত্রে রামনারায়ণ তর্করত্নের (কুলীনকুলসর্বস্ব, ১৮৫২) সময় থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর পরে এই নাটকটি রচিত হয়েছে। স্বভাবতই নাট্যকার কাহিনী, দর্শকদের আনুকূল্য, ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং স্বতোচ্ছল অভিনয়ের জন্য সংলাপের (ে ত্রে চলিত ভাষা — অবশ্যই মুখের ভাষাকে (কথ্য ভাষা) বিশেষভাবে ব্যবহার করেছেন। যে সময় এই নাটকটি রচিত হচ্ছে সেই সময় বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষার পত্তন হয়নি। সবে বঙ্কিমযুগের শেষ, রবীন্দ্রনাথ গল্প-উপন্যাসে সাধুভাষা ব্যবহার করছেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকে চলিত ভাষা ব্যবহার করলেও তা তৎসম-অর্ধতৎসম, তদ্ভব শব্দবহুল। বিবেকানন্দ বললেন — বাঙালির ভাষা-বাংলা ভাষা-বাংলা সাহিত্যের ভাষা মৌখিক হতে হবে। বিশেষ করে তিনি উত্তর কোলকাতায় 'ককনি' ভাষাকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছিলেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'বাঙ্গলা ভাষা' নিবন্ধে এর স্বপ(ে তাঁর যুক্তি(গুলি আমরা শুনেছি। কালীপ্রসন্নর ভাষা স্ল্যাং বা সাহিত্যের ভাষা হতে পারেনি — বিদ্বৎজনেরা এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। আর ১৯১৪তে প্রমথ চৌধুরি যে বীরবলীয় ভাষা প্রকাশ করলেন, তাতে কোথায় যেন প্রাণের অভাব। কিন্তু ১৮৯৭তে রচিত 'আলিবাবা' নাটকে (ীরোদপ্রসাদ এমন ঝরঝরে বাংলা ভাষা ব্যবহার করেছেন যা আমরা আগে শুনতে পাইনি। তাতে তৎসম তো ছিলই না, অর্ধতৎসমও নয়। আধুনিক কথ্য, চলিত ভাষা যা কিনা বাংলা সংলাপের খাতে প্রাণের প্রবাহ বইয়ে দেয়। দেশজ শব্দের আকছার ব্যবহার অবশ্যই ল(ণীয়। এর ফলে 'আলিবাবা' নাটকের সংলাপ তীব্র গতিসম্পন্ন হয়েছে। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে কাহিনী দ্রুতবেগে ছুটে গেছে। প্রসঙ্গত আমরা দৃষ্টান্ত দিতেই পারি(যার মধ্যে সংলাপের উপরিল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে।

আলিবাবা আস্তে-আস্তে, গোল ক'র না - গোল ক'র না .....

ফতিমা অ্যাঁ অ্যাঁ! আস্তে কইব? মোহর! সেকিগো? আমাদের মোহর কিগো? তুমি যে অবাক করলে গো! আমরা দিন আনি, দিন খাই, কোনো দিন বা পাই, না পাই, আমাদের মোহর কিগো? তুমি ডাকাতি করতে শিখেছ নাকি ? (২/৪)

'আলিবাবা' নাটকটির মধ্যে কৌতুকরস যেমন পুরোপুরি উপস্থিত, তেমনি উপস্থিত গীতিময়তা। সেই সঙ্গে গু(ত্ব পেয়েছে দার্শনিক ভাবনা। সংলাপের মধ্যে এই তিনটি বিষয় আমরা বিশেষভাবে ল(করি। প্রসঙ্গত তিনটি দৃষ্টান্ত আমরা দিতেই পারি।

(ক) কাশেম সেটা তোমার অদৃষ্টে নয় — আমার অদৃষ্টে, আমাকে সাদী করেছিলে তাই তোমার বাপের ছেলে হয়নি। নইলে আর কারো হাতে পড়লে ছেলে ছেড়ে ছেলের চোদ্দপু(ষ হয়ে যেত। আমার নসীবে ওমরাওগিরি আছে আমি মরে মরেও ওমরাও হতুম। (কৌতূকরসের প্রকাশ)

(খ) মরজি্না

ছি ছি এত্তা জঞ্জাল

এত্তা বড় বাড়ি এস্‌মে এত্তা জঞ্জাল।

হর্‌দম্‌ লাগতা ঝাড়ু তববি অ্যায়সা হাল্‌।।

. . . .

ময়লা মনিম মেরা - লেংরা বেচাল।

দিল্‌ ময়লা বিবি মেরা হাজির হামেহাল।।

আবদালা সারা ঝট্‌পট্‌ কাম করনেওয়ালা সাঁচ্চা সমজদার বহুৎ খোসমেজাজি রাজি বিবি মালিক মহলাদার।।

এইভাবে ছত্রে ছত্রে নাট্যকাহিনী এগিয়েছে কখনও সংগীতে, আবার কখনও বা কৌতুকে। (১/১)

(গ) এই নাটকের সংলাপে দার্শনিকতার প্রকাশ অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

ডাকাত সর্দার টাকা কি আর ভোগ হবে বলে রোজগার করছি ? খোদার খাজাঞ্চি খানা। আমরা তাঁর জমিনদার। কতকাল ধরে আমাদের এই গুপ্ত ভান্ডারে ধন সঞ্চয় হচ্ছে, ... । তারপর আমাদের হাত থেকে হাত বদলে, এভার দুনিয়ার শেষপর্যন্ত চলে যাবে।'

সংলাপ সৃষ্টিতে, সংগীত সংযোজনে (িতিপ্রসাদ সার্থক তা বিশদভাবে বুঝিয়ে বলার অপে(া রাখে না।

৩.৪.১৬.৩ আদর্শ প্র(াবলী

১। সংযোজিত গান এবং সংলাপ কিভাবে নাট্যকাহিনীর সহায়ক হয়ে উঠেছে?

২। 'আলিবাবা' নাটকটির জনপ্রিয়তার কারণগুলি লিপিবদ্ধকরো।

৩। ‘আলিবাবা’ নাটকে সংযোজিত গান এবং সংলাপ কিভাবে সার্থক নাটকীয় মুহূর্ত রচনা করেছে; চরিত্রকে প্রাণ দিয়েছে। কয়েকটি উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সহযোগে তা বুঝিয়ে দাও।

৪। অপেরাধর্মী নাটকরূপে ‘আলিবাবা’ নাটকের জনপ্রিয়তার কারণগুলি বিশ্লেষণ করো। এই নাটকটি রচনার ক্ষেত্রে ক্ষীরোদপ্রসাদ কীভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন?

৩.৪.১৬.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস — আশুতোষ ভট্টাচার্য।

২। সংলাপ ও ভিন্ন প্রসঙ্গ -- রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। রঙ্গালয়ে ইতিহাসের উপাদান - ১-৩ খন্ড — শংকরলাল ভট্টাচার্য।

৪। বাংলা নাটকের ইতিহাস - আজিতকুমার ঘোষ।

৫। রঙ্গালয়ে অমেন্দ্রনাথ -- রমাপতি দত্ত (হরীন্দ্রনাথ দত্ত)।

৬। ‘কথাসাহিত্য’ পত্রিকা (সুমথনাথ ঘোষ এবং গজেন্দ্রকুমার মিত্র সম্পাদিত)। চৈত্র সংখ্যা, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ (ি রোদপ্রসাদ সংত্র(ান্ত নানা আলোচনা)।

৭। ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকা, আষাঢ়, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ (ি রোদপ্রসাদ সংত্র(ান্ত নানা আলোচনা)।

৮। ‘কালিকলম’ পত্রিকা, ফাল্গুন, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।

৯। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস — সুকুমার সেন, ৩য় খণ্ড।

১০। নাট্যাভিনয়ে ইতিহাস — অজিতকুমার ঘোষ।

১১। রঙ্গালয়ে ত্রিশবছর — অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১২। বাংলা নাটক ঐতিহ্য ও আধুনিকতা — তাপস বসু।

১৩। সংলাপ ও ভিন্ন প্রসঙ্গ -- রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৪। নাট্য আকাদেমী পত্রিকা — ৪

———

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সি বি সি এস) কার্যক্রম

এম. এ. তৃতীয় সেমেস্টার

তৃতীয় পত্র

বিশেষ পত্র : ভাষাবিজ্ঞান

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

(ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং)

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া - ৭৪১ ২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

পাঠ-প্রণেতা

অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস – বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. আদিত্য কুমার লালা – বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস – বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. বাণীরঞ্জন দে – বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

ড. শ্রাবন্তী পান – সহকারী অধ্যাপক (চুক্তিভিত্তিক), বাংলা বিভাগ,
(ডি ও ডি এল) কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ডিসেম্বর, ২০১৯

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও

নিউ স্কুল বুক প্রেস, ৩/২ ডিক্সন লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১৪

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়-এর অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ-সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইনানুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের লেখক/পাঠ-প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of distance and reaching the unreached students are the threefold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellor has invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directoate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Sankar Kumar Ghosh, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of PGBOS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks is also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would especially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and co-ordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

পাঠক্রম

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম এম. এ. তৃতীয় সেমেস্টার

তৃতীয় পত্র

বিশেষ পত্র : ভাষাবিজ্ঞান

পর্যায় গ্রন্থ ঙ্ম ১ ভাষাবিজ্ঞান (সময় ঙ্ম ৪ ঘন্টা)

- **একক–১** ঙ্ম ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান
- **একক–২** ঙ্ম অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যপুনর্গঠন
- **একক–৩** ঙ্ম ভাষা-সংযোগ, ভাষাঋণ
- **একক–৪** ঙ্ম পৃথিবীর ভাষাবংশসমূহ

পর্যায় গ্রন্থ ঙ্ম ২ ভারতীয় আর্য ভাষার ইতিহাস ও যুগবিভাগ (সময় ঙ্ম ৩ ঘন্টা)

- **একক–৫** ঙ্ম প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা
- **একক–৬** ঙ্ম মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা
- **একক–৭** ঙ্ম নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা

পর্যায় গ্রন্থ ঙ্ম ৩ বাংলা ভাষার ইতিহাস (সময় ঙ্ম ৪ ঘন্টা)

- **একক–৮** ঙ্ম বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ
- **একক–৯** ঙ্ম প্রাচীন বাংলার কাল সীমা, নিদর্শন, বৈশিষ্ট্যসমূহ
- **একক–১০** ঙ্ম মধ্য বাংলার কাল সীমা, নিদর্শন, বৈশিষ্ট্যসমূহ
- **একক–১১** ঙ্ম আধুনিক বাংলার কাল সীমা, নিদর্শন, বৈশিষ্ট্যসমূহ

পর্যায় গ্রন্থ ঙ্ম ৪ বাংলা উপভাষা ঙ্মসাধারণ পরিচয় ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (সময় ঙ্ম ৫ ঘন্টা)

- **একক–১২** ঙ্ম রাঢ়ী উপভাষা
- **একক–১৩** ঙ্ম বরেন্দ্রী উপভাষা
- **একক–১৪** ঙ্ম বঙ্গালী উপভাষা
- **একক–১৫** ঙ্ম কামরূপী উপভাষা
- **একক–১৬** ঙ্ম ঝাড়খণ্ডী উপভাষা

সূচিপত্র

তৃতীয় পত্র

বিশেষ পত্র : ভাষাবিজ্ঞান

তৃতীয় পত্র	একক	পাঠ প্রণেতা	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ-১	১	অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস	ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান	১–২২
	২	অধ্যাপক ড. বাণীরঞ্জন দে	অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যপুনর্গঠন	২৩–৩৪
	৩	অধ্যাপক ড. বাণীরঞ্জন দে	ভাষাসংযোগ, ভাষাঋণ	৩৫–৪১
	৪	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	পৃথিবীর ভাষাবংশসমূহ	৪২–৬২
পর্যায় গ্রন্থ-২	৫	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা	৬৩–৬৬
	৬	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা	৬৭–৭০
	৭	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা	৭১–৭৪
পর্যায় গ্রন্থ-৩	৮	অধ্যাপক ড. আদিত্য কুমার লালা	বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ	৭৫–৭৯
	৯	অধ্যাপক ড. আদিত্য কুমার লালা	প্রাচীন বাংলার কাল সীমা, নিদর্শন, বৈশিষ্ট্যসমূহ	৮০–৮৩
	১০	অধ্যাপক ড. আদিত্য কুমার লালা	মধ্য বাংলার কাল সীমা, নিদর্শন, বৈশিষ্ট্যসমূহ	৮৪–৯০
	১১	অধ্যাপক ড. আদিত্য কুমার লালা	আধুনিক বাংলার কাল সীমা, নিদর্শন, বৈশিষ্ট্যসমূহ	৯১–৯৪
পর্যায় গ্রন্থ-৪	১২	ড. শ্রাবন্তী পান	রাঢ়ী উপভাষা	৯৫–১০১
	১৩	ড. শ্রাবন্তী পান	বরেন্দ্রী উপভাষা	১০২–১০৩
	১৪	ড. শ্রাবন্তী পান	বঙ্গালী উপভাষা	১০৪–১০৬
	১৫	ড. শ্রাবন্তী পান	কামরূপী উপভাষা	১০৭–১০৯
	১৬	ড. শ্রাবন্তী পান	ঝাড়খণ্ডী উপভাষা	১১০–১১২

তৃতীয় পত্র

পর্যায় গ্রন্থ - ১

ভাষাবিজ্ঞান

একক - ১

ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান

বিন্যাস ক্রম :

৩.১.১.১ : ভাষার ব্যাকরণ—বাঙ্ মীমাংসা ও ভাষাবিজ্ঞান সংজ্ঞা, পার্থক্য বিশ্লেষণ

৩.১.১.২ : ভাষা উদ্ভবের তত্ত্ব

৩.১.১.৩ : ব্যাকরণের বিষয়

৩.১.১.৪ : বাঙ্ মীমাংসা ও ভাষাবিজ্ঞান

৩.১.২.৫ : ভাষাবিজ্ঞানের দুই শাখা—ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান

৩.১.২.৬ : ভাষাবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা

৩.১.২.৭ : ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক তুলনা

৩.১.২.৮ : ভাষার শ্রেণিবিভাগ

৩.১.২.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩.১.২.১০ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩.১.১.১ : ভাষার ব্যাকরণ—বাঙ্ মীমাংসা ও ভাষাবিজ্ঞান সংজ্ঞা, পার্থক্য বিশ্লেষণ

ভাষা মানুষের ভাব বিনিময়, সংযোগ, সম্পর্ক নির্ণয়ের এক অভূতপূর্ব শক্তি। তথ্যসঞ্চয়, বিন্যাস উপস্থাপনের আশ্চর্য এই শক্তি মানুষকে অন্যান্য পশু-প্রাণীকুল থেকে স্বতন্ত্র করেছে। ভাষা মানুষের চিন্তাকে নির্দিষ্টতা দেয়—আবেগাত্মক মনোবৃত্তির আদান প্রদানের সহায়তা দান করে। ভাষা মানুষকে সমাজগঠনের প্রেরণা দিয়েছে। ভাষা অন্তত দুজনের মত বিনিময়, ভাব বা আবেগাত্মক সংযুক্তির ভূমিকা নেয়। ভাষা পরিবার গঠনে সাহায্য করেছে—পরিবার থেকে কোম (clan), কোম থেকে জনগোষ্ঠী (ethnicity), জন থেকে সমাজ (society) তৈরি করতে সাহায্য করেছে।

ভাষা আসলে এক ধরনের প্রতীকের নির্মাণ ও বির্নিমাণ।—code বা চিহ্ন; codification বা চিহ্নায়ন, আর decodification তাৎপর্য নির্ণয়। ভাষায় দুটি দিক : ১। মৌখিক আর ২। লেখ্য রূপ। মৌখিক ভাষাই আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের মূল বিবেচ্য। লেখ্যরূপের ভাষা আসলে সাহিত্যিক নির্ভর হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। মৌখিক ভাষার মতো জীবন্ত নয় লেখ্য ভাষা। মৌখিক ভাষা ক্রমান্বয়ে নিত্যনতুন রূপ পরিগ্রহ করে—নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সংযোগে মৌখিক ভাষা নির্দিষ্টতা লাভ করে লেখ্যভাষার মারফৎ। তার দ্বারা তৈরী হতে থাকে ভাষার রীতিনীতি বিন্যাসভঙ্গির বিধিবদ্ধতা। ভাষার এই বিধিবদ্ধতাই ব্যাকরণ।

ভাষার সংজ্ঞা : ভাষাকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে পণ্ডিতরা নানা রকম সংজ্ঞা বা বিবেচনা এনেছেন। তাদের মধ্যে সর্বসম্মত কোনো সংজ্ঞা এখনও স্থির হয়নি। ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত স্টুরটেভাস্ট এইচ. ইউগার-এর 'An Introduction to Linguistic Science'-এর একাংশে প্রদত্ত সংজ্ঞাটি অনেকেই গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করতে চান। ইডগারের সংজ্ঞা—

'A Language is a system of arbitary vocal symbols by which member of a social group co-operate and interact.'

ভাষা হল কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর পরস্পর সংযোগ ও সহযোগিতার উদ্দেশ্যে তৈরি হওয়া আকস্মিকতার মারফৎ তৈরি উচ্চারণ-প্রতীকের বিধিবদ্ধ রূপ। —মোটামুটি এই হল ইউগার-এর কথা। মানুষ বাগযন্ত্রের মাধ্যমে এসব উচ্চারণ-প্রতীক অর্থ ও তাৎপর্য তৈরি করতে না পারলে—তাকে পুনঃ পুনঃ একই অর্থে ব্যবহার করতে না পারলে ভাষা হয়ে উঠবে না উচ্চারণ-প্রতীক বা vocal symbols. হাততালি, শিস, জিভের সাহায্যে পশুপাখির ডাকের নকল, বস্তুর সাহায্যে তৈরি করা শব্দকে ভাষা বলা হবে না। গৃহপালিত কুকুরকে ডাকতে বা প্ররোচিত করার জন্য মানুষ কিছু শব্দ ব্যবহার করে, পাখি তাড়াতে, গরু চরাতে, লাঙ্গল দেবার সময়, গোরু বা ঘোড়ার গাড়ি চালানোর সময় ব্যবহৃত শব্দাবলির কোনো না কোনো সীমিত তাৎপর্য নিশ্চয় আছে, কিন্তু এসবকে ভাষা বলা যায় না। সুতরাং arbitrary -বিশেষণটি কিছুটা রহস্যজনক, এর ভেদ ও তাৎপর্য সন্ধান জরুরি।

ভঙ্গি নয়—ভাষা হল বাগযন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত ধ্বনি বা উচ্চারণ যা পুনঃ পুনঃ একই অর্থে একই ভাবে একজন ও সমাজবদ্ধ সমস্ত মানুষ ব্যবহার করতে পারেন। অন্যথায় তাকে ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।

উচ্চারিত ধ্বনি বাগযন্ত্রের দ্বারা উপস্থাপিত বা সৃষ্ট হলেও সর্বদা ভাষা হিসেবে গণ্য নাও হতে পারে। 'শিশুর অস্ফুট চিৎকার' বা 'পাগলের অর্থহীন ধ্বনি'-কে অধ্যাপক রামেশ্বর শ' ভাষা বলে স্বীকার করেননি। তাঁর মতে 'ধ্বনি যদি কোনো ভাবের বাহন বা প্রতীক না হয়, তা হলে তাকে ভাষা বলা যায় না।' (দেখুন ঞ্জ ড. রামেশ্বর শ' ঞ্জ সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, ৯ পৃঃ)। ভাষা তাই শুধু ধ্বনি নয় Sound-এর সঙ্গে নির্দিষ্ট ভাবের আশ্রয় করে সেই ধ্বনি। একে বলতে হবে meaning.-এর প্রথমটিকে বলতে পারি আকার বা আদল—form আর দ্বিতীয়টিকে বলতে পারি আশ্রিত অন্তর্বস্তু — content.

ফার্দিনান্দ দে সেস্যুরে ভাষাকে বলেছেন 'a system of sign that express ideas' (Course in General Linguistics); তৃতীয় পরিচ্ছেদ; ম্যাকগ্রো-হিল বুক কোম্পানি; নিউ ইয়র্ক, টোরোন্টো, লন্ডন; ১৯৬৬ মূল বই-জেনেভা থেকে জুলাই ১৯১৫-তে প্রকাশিত। অর্থাৎ ভাষা হল চিহ্নায়ন পদ্ধতির সাহায্যে ভাব প্রকাশের রীতি। সেস্যুরের মতে ভাষার একাংশে ব্যক্তিগত উচ্চারণ, অন্য অংশে ভাব প্রকাশ বা অনুভবের সামাজিক উপাদান। একটি ছকের দ্বারা বিষয়কটিকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন সেস্যুরে। ছকটি এই ঞ্জ

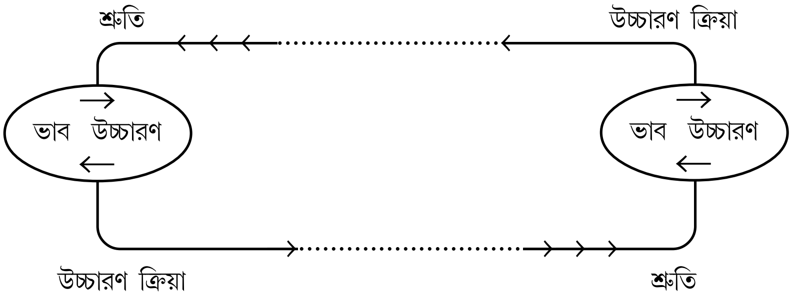

সেস্যুরে ভাবকে concept উচ্চারণকে sound image, উচ্চারণ ক্রিয়াকে phonation আর শ্রুতিকে audition বলেছেন। ভাষা এই দুই-এর মিশ্রণে পূর্ণতা পায়। ব্যক্তি থেকে সমাজ, ভাব থেকে মনস্তত্ব—সর্বাতিশায়ী ক্ষেত্র হিসেবে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে ভাষা।

স্টুরটেভান্ট যে বলেছেন ভাষার প্রথম উপকরণ ধ্বনি প্রতীককে কোনো 'কার্যকারণগত সুনির্দিষ্ট নিয়ম'-এ বাঁধা পায় না—তাকে রহস্যময় বলেছি। একে 'মানুষের খেয়াল অনুসারে নির্বাচনের উপরে' নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। উদাহরণ হিসেবে ড. রামেশ্বর শ' নানান ভাষা থেকে জলের প্রতিশব্দ এনেছেন। তাঁর মতে বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত ভাষার *জল*, গ্রীক *হুদর*, লাতিন *আকোয়া*, ইংরেজী *ওয়াটার*, ফরাসী ও বা জার্মান ভাষার—হিন্দী, উর্দু *পানী*—কোনোটিই জল নামক তরল পদার্থটির সঙ্গে কোনো কার্যকারণ সূত্রের কোনো অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তিনি দেখতে পাননি। ধ্বনি সমষ্টিগুলো সম্পূর্ণ কার্যকারণ সূত্রহীন—arbitrary.

বহু শব্দ কিন্তু অনুকারী বা ধ্বন্যাত্মক। ঝড়, কল্লোল, বৃষ্টি, রিমঝিম, ঝংকার, টংকার, গর্জন—প্রভৃতি বহু শব্দ নিশ্চয় অনুকারী। বাস্তব পরিবেশের অনুকরণ এসব শব্দে খুবই স্পষ্ট। সব ভাষাতেই এরকম আছে। এসব ক্ষেত্রে ধ্বনিকে arbitrary বলা যায় না।

ভাষাকে যখন অক্ষরমালার দ্বারা উপহার দেওয়া হয়—যখন ধ্বনিরূপ চিত্রধর্ম লাভ করে, দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতীক বা চিহ্নায়ন চলতে থাকে তখনও কোনো কোনো সময় কার্যকারণ সূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব। বাহ্মী হরফে চিত্রলিপির ইঙ্গিত লক্ষ করেছেন কোনো কোনো লিপি তত্ত্ববিদ। যেমন ম-উচ্চারণের চিত্র প্রতীকটি ছিল ४-এর মতো। ক-উচ্চারণের চিত্র প্রতীকটি ছিল (†)-এর মতো। বহ্‌লারের মতে এই শব্দগুলির দ্বারা সবথেকে বেশি যে পদগুলি ব্যবহৃত হত তার সঙ্গে চিহ্নগুলির সম্পর্ক আছে। ম ছিল মৎস্য রূপ (४), ক ছিল কর্তার (†)। একই ভাবে ধনুক-এর রূপ ধ-এর চিহ্ন প্রতীক D-এর মধ্যে থাকে। D বা ▢। এটি অনেকটাই ধনুকের মতো। কারণ ধ-উচ্চারণে সব থেকে পরিচিত চিহ্নটি ধনুকের স্মৃতিচিহ্নিত। সুতরাং সবক্ষেত্রেই ধ্বনিকে, ধ্বনিপ্রতীক বা অক্ষরকে arbitrary বলা চলে না।

ভাষার শব্দ আর অর্থ কোনো নির্দিষ্ট মৌখিক সম্পর্ক নাও রাখতে পারে তবে তা কোনোকালেই কোনো যুক্তি অবলম্বন করেনি—একথা মানা যায় না। অর্থ পরিবর্তনশীল। অর্থ প্রাথমিক যুক্তি থেকে ক্রমেই নতুন নতুন তাৎপর্য অবলম্বন করতে পারে। মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ে—এই বাক্য উপস্থাপনের সময় মুষল নিক্ষেপ করা, আদিম ধরনের যুদ্ধসংস্কৃতি পরিবেশ স্মরণে আসে। সময় বদলে গেছে অর্থের তাৎপর্য থেকে গেছে আদিম সংস্কৃতির ঘেরাটোপে। শব্দের দেশ-কাল-পাত্র পরিচ্ছন্ন রূপও পাওয়া যায়—সাম্প্রদায়িক চেহারাও স্পষ্ট হতে পারে। 'ফ্রেঞ্চ লিভ'—অনুমোদন হীন ছুটি। শব্দবন্ধটি ইংরেজীতে চালু—ইংরেজদের গোপন ফরাসী জাতি সম্পর্কে, তাদের কর্ম সংস্কৃতি সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ফল। বাঙ্গালি হিন্দু এখন জল অর্থে পানি ব্যবহার করে না—বাঙালি মুসলমান পানি ছাড়া জল ব্যবহার করতে চায় না। অথচ দুটি শব্দই তৎসম—সংস্কৃত আগত।

ধ্বনি (Sound)-র সঙ্গে শ্রুতিমাধুর্য শিল্পগৌরব লক্ষ করেছেন কেউ কেউ। রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত'-ব্যাখ্যান থেকে ড. রামেশ্বর শ' অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ শিখেছিলেন : .... 'সেই প্রাচীন ভারতখণ্ডটুকুর নদী-গিরি-নগরীর নামগুলিই বা কী সুন্দর। অবন্তী বিদিশা উজ্জয়িনী বিন্ধ্য কৈলাস দেবগিরি রেবা সিপ্রা বেত্রবতী। নামগুলির মধ্যে একটি শোভা সম্ভ্রম শুভ্রতা আছে।' (প্রাচীন সাহিত্য)। ড. রামেশ্বর শ'-এর বিচিত্র সংযোজন : এখানে 'দর্শন', 'অবন্তী', 'বিদিশা', 'উজ্জয়িনী' প্রভৃতি নামের বদলে যদি 'খাগড়া', 'খড়্গপুর', 'হাবিবপুর', 'হোটর' ইত্যাদি নাম ব্যবহার করা হত তবে সেই শোভা, সেই সম্ভ্রম, শুভ্রতা ফুটে উঠত না। কিংগ 'বেরা', 'সিপ্রা', 'বেত্রবতী'-র বদলে 'খ'রে, 'মাথাভাঙা', 'কাঁসাই' নাম ব্যবহার করলে নদীকে বোঝাত বটে, কিন্তু নদীর সঙ্গে যুক্ত সেই যুগের শ্রী-সৌন্দর্যটুকু ধরা পড়ত।' (সাধারণ

ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, উক্ত ১২ পৃষ্ঠা)। এরপর ড. শ' এসেছেন শব্দ অর্থের 'প্রসঙ্গগত' সম্পর্ক— Contextual meaning'-এর কথায়। এরপরই তাঁর সিদ্ধান্ত ধ্বনির সঙ্গে অর্থের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই—একথা মাননীয় নয়। অথচ একটু আগেই তিনি 'vocal symbol'-এর 'arbitrary' সম্পর্কের কথা সমর্থন করেছেন। আসল কথা—শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক বহু সময়ই ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না। তা বলে বলা যায় না—এসম্পর্ক নিতান্তই আপতিক।

৩.১.১.২ : ভাষা উদ্ভবের তত্ত্ব

ভাষা উদ্ভবের ক্ষেত্রে কয়েকটি তত্ত্ব বিকশিত হয়েছে। তত্ত্বগুলির মধ্যে চারটি প্রধান। যথা :

১. প্রকৃতি-প্রত্যয় তত্ত্ব — Root Theory

২. আপতিক বা আকস্মিকতার তত্ত্ব — Anomalist Theory

৩. সাদৃশ্য সন্ধান তত্ত্ব — Analogist Theory

৪. বিধিনির্দেশ তত্ত্ব — Theory of System

প্রকৃতি-প্রত্যয় তত্ত্বটি ভারতীয় বৈয়াকরণ পাণিনি ও তাঁর অনুগামীদের। পাণিনি দেখিয়েছেন প্রত্যেক শব্দের উৎসে কোনো না কোনো সংক্ষিপ্ত ধাতু বা অর্থবীজ আছে। শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় বা প্রকৃতি-প্রত্যয় করলে এই অর্থবীজের প্রসার বা বিস্তার লক্ষ করা যায়। যে-কোনো শব্দের গভীরে ধাতুর এই অর্থ বীজ থাকা ও তা ব্যাখ্যার মাধ্যমে ভাষার উদ্ভবের একটি ধারণা স্পষ্ট হয়।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন ধাতুগুলির মূল বা সরল রূপ ক্রমে গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের মারফৎ পরিবর্তিত হতে থাকে। বদ্ ধাতুর গুণ বদতি, বশংবদ প্রভৃতি শব্দে, বৃদ্ধি (অর্থাৎ স্বর-যোগ) যথা—বাদ, অনুবাদ, সংবাদ, বিবাদ প্রভৃতি শব্দে বিবর্তিত হয়েছে। একইভাবে যজ্ ধাতুর যজতি, যজ্ঞ প্রভৃতি শব্দে, বৃদ্ধি যাজক, যাগ, যাজ্ঞিক প্রভৃতি শব্দে ঘটেছে। তাঁর সিদ্ধান্ত 'ধাতুর দ্বয়ের গুণ-বৃদ্ধি-সম্প্রসারণত্মক পরিবর্তন সংস্কৃতের ন্যায় ভারতের বাহিরের তাবৎ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় মিশে। এই রূপ পরিবর্তন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।' ('বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৫০, ৮২ পৃঃ)। এভাবেই প্রকৃতি প্রত্যয় তত্ত্ব বা Root Theory বিকশিত হয়েছে। এ বিষয়টি ড. রামেশ্বর শ' তাঁর উক্ত গ্রন্থে একটু সংক্ষেপে সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ ভাবে ব্যবহার ও ব্যাখ্যা করেছেন। রাম ও রাবণ-এর অর্থ ব্যাখ্যান করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রক্তকরবী' নাটক বিষয়ক আলোচনায় । তাকে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন ড. শ'। (দেখুন — ১২ পৃঃ)। এভাবে ধাতুর প্রকৃতি প্রত্যয়ের গুণ বৃদ্ধি সম্প্রসারণের তাত্ত্বিক কাঠামোটি ঠিকমত ব্যাখ্যা করা যায় না।

আপতিক বা আকস্মিকতার তত্ত্ব হল ধ্বনি আর অর্থের খেয়ালখুশি মতো নির্বাচনের—'arbitrary'-প্রয়োগের তত্ত্ব। এই দৃষ্টিতে গোটা বিষয়টি যুক্তির ধার ধারে না—এ হল anomaly, আর ভাষার উৎসে শব্দ (sound) আর অর্থ (meaning)-এর কোনো রকম সঙ্গতি রক্ষা করতে না পারার বিষয়টিকে এই তত্ত্ব প্রাধান্য দেয়। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখার মতো ব্যাপার ভাষায় থাকে। কিন্তু অধ্যাপক রামেশ্বর শ' যেভাবে বিষয়টি এনেছেন, তা খুব অর্থবহ মনে হচ্ছে না। যথা :............ 'আধুনিক সমাজে সবচেয়ে বীভৎস অসুর প্রকৃতির লোকেরও নাম রামচন্দ্র হতে পারে। কিংবা কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন খুবই শোনা যায়। সেসব ক্ষেত্রে অবশ্য শব্দের অন্তর্নিহিত শক্তিটি চাপা পড়ে যায়।' ('সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান

ও বাংলা ভাষা'; ১৩ পৃঃ)। অধ্যাপক শ' এই ব্যাখ্যায় শব্দের অন্তর্নিহিত শক্তি চাপা পড়ে যাওয়ার জন্য নামের অনর্থ বা ব্যক্তি চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে দায়ী করেছেন—এসব কথা দিয়ে ভাষার কোনো রহস্যভেদ হয় না। তাছাড়া রামচন্দ্র নাম রাখার সময় ঐ মানুষটির আত্মীয়স্বজন তো জানতেন না সে 'অসুর প্রকৃতির' হবে! ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে এরকম উদাহরণ বিভ্রান্তিকর সন্দেহ নেই। বস্তুত ভাষা শুধু শব্দ নির্ভর নয়। শব্দ পদে পরিণত হয়—পদ অন্বিত হয় বাক্যে। বাক্য থেকে ভাবপ্রকাশ হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম শব্দের অর্থ তাৎপর্য ও অনর্থপাত খুব বেশি বিবেচনার যোগ্যই নয়। আপতিক বা আকস্মিকতার তত্ত্ব (Anomalist Theory)-এর বিচার এভাবে অসম্ভব।

সাদৃশ্য সন্ধান তত্ত্ব বা Analogist Theory তত্ত্বটি Anomalist Theory-র সম্পূর্ণ বিপরীত। এই তত্ত্ব অনুসারে ভাষা উদ্ভূত হয় সাদৃশ্য থেকে। সদৃশ্য বা analogy থেকে তত্ত্বটিকে Theory of Analogy বা Analogist Theory বলা হয়। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—'চট্, সাঁ, টক্‌টক, থরথর, ছট্‌ফট, হিজিবিজি—ইত্যাদি অনুকারী শব্দ দেশী শব্দ। এগুলি অজ্ঞাতমূল। (দেখুন ঃ 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা', উক্ত; ৫৫ পৃঃ)। অনুরূপ বেশ কিছু শব্দই ভাষার আদি রূপটি গড়ে তোলে। কিছু শব্দ তৈরি হয় হাবভাব উচ্চারণ ভঙ্গির সঙ্গে মিলে মিশে। মাথা নাড়া, হাত তোলা, পা ছোঁড়া, ঠোঁট নাড়া—জিভ কাটা বা ঐরকম কিছু শব্দ কিভাবে উচ্চারণ করা হয় তার ইঙ্গিতও এই শব্দ গুলিতে থাকে। আর এর সঙ্গে ব্যক্তির ভাবভঙ্গি অনুকরণ করা হয়ে থাকে। Analogist-রা মনে করেন ভাষা উদ্ভবের পিছনে মানুষের পিছনে মানুষের এরকম চিন্তা বা ব্যবহারের অনুসরণ বা সাদৃশ্যের বিশেষ ভূমিকা থাকে।

বিধি নির্দেশ তত্ত্ব বা Theory of System-এর পক্ষপাতীরা মনে করেন ভাষা যেহেতু ভাব প্রকাশ তাই ভাব প্রকাশের সঙ্গে বিধি বা রীতির ভূমিকা যথেষ্ট। বিধি বা system, রীতি বা manner ভাষার সঙ্গে রীতি বিধি অর্থাৎ শব্দবিন্যাসের নির্দিষ্ট পদ্ধতির ভূমিকা বিদ্যমান। রাম ভাত খায়, পাখি আকাশে ওড়ে, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি হিসেবে পরিচিত। — বাক্য তিনটিতে এক বিশেষ ধরনের পদবিন্যাস মানা হয়েছে। কর্তা কর্ম ক্রিয়া-র পরস্পর যোজ্যতার রীতি। ভাষাবিজ্ঞান অনুসারে S O V (Subject Object Verb)-এর ক্রমিক বিন্যাসরীতি আবিষ্কৃত হওয়া— তা একটি সমাজে সর্বাঙ্গীন মান্যতা লাভ করা, প্রভৃতি পূর্বশর্ত ঠিকমত মান্য না হলে ভাষার কোনো প্রয়োজনই থাকে না। অর্থবোধ, তাৎপর্য বা উদ্দেশ্য স্পষ্ট করার জন্য এই system বা manner -টি উদ্ভূত হওয়া স্বীকৃত পাওয়া জরুরি। যেকোনো ভাষার ক্ষেত্রে এই রীতিনীতি বিধি বা পদ্ধতির প্রয়োজনটি লক্ষিত হয়। ভাষা উদ্ভূত হওয়ার এই ব্যাখ্যা যাদের তাদের মতটি এভাবে বিকাশ লাভ করেছে। এই তত্ত্বকে Theory of System বা manner বলা হয়। শব্দ নয় অন্বিত পদ ও বিন্যস্ত ভাবকে এই তত্ত্বে ভাষার আদি বলে স্বীকার করা হয়।

সামাজিক উপযোগিতার তত্ত্ব ভাষা উদ্ভবের পরবর্তী তত্ত্ব। ভাষা সমাজের উপযোগিতা অর্থাৎ Social utility কে প্রাধান্য দিতে চায়। বস্তুত ভাষার প্রধান ক্ষেত্রই হল সামাজিক উপযোগিতা — মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তৈরী করার ক্ষেত্রে ভাষার এই ভূমিকাটি সকলেই স্বীকার করবেন। ১৯৭০-এ প্রকাশিত ডব্লু লাবোভ-এর বই 'The Study of Language in its Social Context'-এ বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ভাষা বিবর্তনে সমাজ-সম্বন্ধ নিবিড়। লাবোভ-এর সিদ্ধান্ত ঃ 'Linguestic and Social structure are by no means co-extensive'. ভাষাবিজ্ঞান আর সামাজিক সংগঠনের সম্পর্ক পরস্পর পরিপূরক। এই ধারণা থেকেই ভাষা উদ্ভবের ক্ষেত্রে Theory of Social utility গড়ে উঠেছে। স্টুরটেভান্ট-এর উল্লেখিত সংজ্ঞায় এই প্রসঙ্গ এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে ভাষার মারফৎ সমাজের সদস্যররা পরস্পর সহযোগিতা ও সংযোগ স্থাপন করে—'by which the member of a social group co-operate and interact'.

ভাষার এই আদি প্রয়োজনটি মনে রেখেই ভাষার উদ্ভব সম্পর্ককে সামাজিক উপযোগিতা তত্ত্ব (Theory of Social utility) গড়ে উঠেছে।

ড. সুকুমার সেন ভাষার একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে ঃ 'মানুষের উচ্চারিত, অর্থবহ, বহুজন বোধ্য ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা।' (ভাষার ইতিবৃত্ত, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা, ত্রয়োদশ সংস্করণ, ১৯৭৯; ২ পৃঃ)। কিছু পরে প্রায় এই সংজ্ঞাটিই অন্যরকম ভাবে উত্থাপন করেছেন সুকুমার বাবু। যথা ঃ 'ধ্বন্যারূঢ় প্রতীক দ্যোতনাই ভাষার স্বরূপ লক্ষণ'। (ঐ; ৩ পৃ:)।

৩.১.১.২.১ : ভাষার ব্যাকরণ, বাঙ্ মীমাংসা ও ভাষাবিজ্ঞান

সংজ্ঞা পার্থক্য বিশ্লেষণ

ভাষা বিশ্লেষণকে ব্যাকরণ নামে অভিহিত করা হয়। ব্যাকরণ অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Grammar. Grammer বলতে বোঝানো হয়—ভাষার অন্তর্গত বাক্য রচনার সময় শব্দ ব্যবহারের রূপান্তরের নিয়ম সম্পর্কে তত্ত্বালোচনা; 'the rules in a language for changing the form of words and joining them into sentences.' (দেখুন : Sally Wehmeier-সম্পাদিত 'Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English', Oxford University Press প্রকাশিত; ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০০০; 599 পৃ:)। ব্যাকরণ রচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা। যে ভাষা চলমান, বহমান — নিত্যনতুন ভাষা পরিস্থিতির মধ্যে ভাঙ্গাগড়ার অনন্ত প্রবাহের মাধ্যমে সমাজ শরীর তরঙ্গ তুলছে — ব্যাকরণ তার মধ্যে একটি বিধিবদ্ধতা আরোপ করার চেষ্টা করে।

ভাষা বিশ্লেষণের সাধারণ নাম ব্যাকরণ। তবে ব্যাকরণ সাধারণভাবে রক্ষণশীল। ভাষার শুদ্ধ রূপ নিয়ে ব্যাকরণের কারবার। শুদ্ধ রূপটির তাৎপর্য ব্যাকরণের লক্ষ্য। শুদ্ধ বা মার্জিত রূপ বলতে বোঝানো হয় একটি নির্দিষ্ট আদর্শ। ভাষা কখনই সেই আদর্শকে স্পর্শ করে না — আদর্শটি বৈয়াকরণের মনে বাস করলেও করতে পারে। ভারতীয় আর্যভাষার ক্ষেত্রে বিষয়টির প্রমাণ পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'। ব্যাকরণটি প্রচলিত হবার সময় সংস্কৃত ভাষার অস্তিত্ব ছিল না। প্রাকৃতের প্রচলিত রূপের মধ্যে শুদ্ধ ও মার্জিত রূপটি ভেবে পাণিনি সংস্কৃত ভাষার প্রচলন ঘটালেন। ভাষাকে রীতির নিয়ম শৃঙ্খলে বদ্ধ করে প্রথম ভাষা পরিকল্পনা (Language Planning)-র নিদর্শন পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'। মতটি স্বীকার করলেও অধ্যাপক মনসুর মুসা লিখেছেন এরকম ভাষা পরিকল্পনা পৃথিবীর হাজার দেড়েক ভাষাসংস্থার কার্যকলাপে লক্ষিত হয়। (দেখুন : "ভাষা পরিকল্পনা"-প্রবন্ধ, 'ভাষা পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ'-গ্রন্থভুক্ত, মুক্তধারা, ঢাকা; ১৯৮৪; ১০৪ পৃ:)।

ব্যাকরণ ভাষাকে শাসন করতে চায়—সংস্কার করতে চায়। প্রাকৃতকে সংস্কৃত করাই ব্যাকরণের লক্ষ্য। এই জন্য ব্যাকরণকে Normative Grammar নামে অভিহিত করা হয়। ভাষায় শুদ্ধ রূপ বা norm রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ভাষার ব্যাকরণ রচিত হয়। H. C. Wyld Normative Grammar-এর বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে ভাষার বেঠিক রূপ নির্ধারণ করার অধিকার বৈয়াকরণের থাকা উচিত নয়।

উইল্ড-এর মতে ভাষা মানুষের মনোভাব প্রকাশ করলেই তার কাজ সম্পন্ন হয়, সুতরাং অশুদ্ধ রূপ বলে কিছু হতে পারে না। সুতরাং ব্যাকরণবিদ-রা যখন ঠিক বা ভালো বলে কিছু নির্দেশ দেন তখন তা ঠিক কাজ হয় না। 'grammarians have absolutely no authority to prescribe what is 'right' or 'wrong' but can merely state what is the actual usage এভাবে দেখলে ব্যাকরণের কাজ ভাষার রীতি নিয়ম নির্দিষ্ট করা — ঔচিত্যের ধারণা প্রয়োগ করে নীতি নির্ধারণ ব্যাকরণের উদ্দেশ্য নয়। ভাষার

যে রূপ 'বাস্তবে প্রচলিত আছে তা বিশ্লেষণ করাই বৈয়াকরণের উদ্দেশ্য।' (ড. রামেশ্বর শ' : 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা'; উক্ত, ২১ পৃ:)। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত ব্যাকরণকে বাস্তব ব্যাকরণ বা Positive Grammar নামে অভিহিত করতে চান আধুনিক বৈয়াকরণরা।

ভারতীয় ব্যাকরণবিদরা রক্ষণশীল। তাঁরা মনে করেছেন ব্যাকরণের উদ্দেশ্যে ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণ, তাঁদের মনে হয়েছে বৈদিক আর্যভাষা ছিল বিশুদ্ধ—কালের প্রবাহে তা অশুদ্ধ হয়ে গেছে। স্থান ও কালের বিবর্তনে ভাষার এই প্রাকৃত রূপ তাঁরা পছন্দ করেননি। তাঁরা 'বৈদিক ভাষা'কে 'দেবভাষা' বলে শ্রদ্ধা করতেন আর দেবভাষার রূপ অপরিবর্তিত রাখার জন্য রচনা করলেন ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণকে সেক্ষেত্রে ঐতিহ্য-অনুশাসিত বা Traditional Grammar বলে অভিহিত করা হয়। যুগগত পরিবর্তন তাদের চোখে বিকৃতি। এই বিকৃতি রোধ করার জন্য ভারতীয় সংস্কৃত ব্যাকরণগুলি রচিত হয়েছে।

পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'-কে Traditional Grammar বলে গ্রহণ করলে কালোত্তীর্ণ প্রতিভা পাণিনি সামর্থ্য ও বিশ্লেষণবুদ্ধিকে সঠিক অর্থে সম্মান জানানো অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে ভাষা বিশ্লেষণে পাণিনির বহুমাত্রিক সাফল্য সে সময়ের পক্ষে কল্পনাতীত ছিল। যুক্তিশীলতা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির চমৎকারিত্বে পাণিনি সংস্কৃত ভাষাকে বাস্তব ব্যাকরণের মতো বিশ্লেষণ করেছিলেন।

অধ্যাপক সুকুমার সেন ব্যাকরণকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। তাঁর মতে—'ব্যাকরণের আলোচনা তিন ভাবে হয়।' (১) বর্ণনামূলক ব্যাকরণ (Descriptive Grammar), (২) ঐতিহাসিক ব্যাকরণ (Historical Grammar) এবং (৩) তৌলন বা তুলনামূলক ব্যাকরণ (Comparative Grammar)। (পশ্য : 'ভাষার ইতিবৃত্ত'; তৃতীয় অধ্যায়; ২৩ পৃ:)। ড. রামেশ্বর শ' এই মত মানেন না। তাঁর মতে এই বিভাজনের একটি অন্যটির সঙ্গে মিলে মিশে আছে। একে বলা যেতে পারে 'overlapping'। বস্তুত তুলনামূলক ব্যাকরণ 'ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক উভয় দৃষ্টিতেই' আলোচিত হতে পারে। বিভিন্ন ভাষার মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাষাগুলির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়—বংশলতা genealogical table তৈরি সেই ভাষালোচনার লক্ষ্য ছিল। কোনো নির্দিষ্ট ভাষা থেকে ক্রমে অন্য ভাষার বিকাশ ও পরিণতি বিশ্লেষণের জন্য এই ব্যাকরণগুলি একই সঙ্গে তুলনামূলক, ঐতিহাসিক আবার বর্ণনাত্মকও। সুতরাং এই তিনভাগে ব্যাকরণকে বিভক্ত করা যায় না।

বস্তুত তুলনামূলক ব্যাকরণ ব্যাকরণের কোনো পৃথক ধারা বলে স্বীকার করছেন না ড. রামেশ্বর শ'। তাঁর মতে তুলনামূলক পদ্ধতি সব ধরনের ব্যাকরণের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত করা সম্ভব। ধারা হিসেবে তুলনামূলক পদ্ধতিকে তিনি গ্রহণ করতে চান না। (সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা; উক্ত; ২৭ পৃ:)।

নির্যাস কথা হল ভাষা বিশ্লেষণ বা ব্যাকরণের পদ্ধতিগত বিভিন্নতা এই :

১. নির্দেশমূলক ব্যাকরণ (Normative Grammar)

২. বিধি নিষেধমূলক ব্যাকরণ (Prescriptive Grammar)

৩. শুদ্ধিবাদী, আদর্শ ব্যাকরণ (Purist / Ideal Grammar)

৪. ঐতিহ্যানুগত ব্যাকরণ (Traditional Grammar)

৫. বাস্তব ব্যাকরণ (Positive Grammar)

আধুনিক ব্যাকরণ বোধ অনুসারে বাস্তব ব্যাকরণই ভাষার বাস্তব বা প্রকৃত বিচার করে থাকে। ড. সুকুমার সেন 'চলিত ভাষার ব্যাকরণ-কাঠামো' হিসেবে যে বাংলা চলিত ভাষার 'ব্যাকরণ অর্থাৎ স্বরূপ নির্দেশ' করেছেন, তাকে বাস্তব ব্যাকরণ হিসেবে গণ্য করতে হয়। (দেখুন : ভাষার ইতিবৃত্ত'; ৩৯৯ পৃ:)।

৩.১.১.৩ : ব্যাকরণের বিষয়

ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ব্যাকরণের লক্ষ্য ভাষার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ। এজন্য ব্যাকরণের আলোচনার মূল ক্ষেত্র চারটি। যথা :

১. ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)

২. রূপ বিচার (Morphology)

৩. পদবিধি বা বাক্যরীতি (System) আর

৪. শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics)।

('ভাষার ইতিবৃত্ত' : ড. সুকুমার সেন; ২৪ পৃ:)।

ড. রামেশ্বর শ' শব্দার্থতত্ত্বকে ব্যাকরণের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেননি। (উক্ত; ৩৯ পৃ:)। পরে অবশ্য একটি সারণীতে (উক্ত; ৫১ পৃ:) শব্দার্থতত্ত্বকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি।

ধ্বনিতত্ত্বকে ড. সুকুমার সেন ধ্বনিবিজ্ঞান বলতে চান। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন—ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics), ধ্বনিবিচার (Phonemics) আর ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)। ড. রামেশ্বর শ'-এর মতে ব্যাকরণের বিষয়টি ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)। ধ্বনিতত্ত্বের তিনটি অংশ যথা :

১. ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics)

২. স্বনিম বিজ্ঞান বা ধ্বনিবিচার (Phonemics)

৩. স্বনিমপ্রক্রিয়া বিজ্ঞান (Phonology)

ড. সুকুমার সেন আর ড. রামেশ্বর শ' এর স্ব-স্ব সংজ্ঞা নির্ণয় ও বিচার কিঞ্চিৎ সমস্যাজনক। বিষয়টির সমাধান হওয়া দরকার।

বাগধ্বনির তিনটি স্তর। ধ্বনি উদ্ভব, উচ্চারণ, তরঙ্গ সৃজন, শ্রবণ এই রকম বেশ কয়েকটি স্তর পার না হলে বাগধ্বনির ধারণা হয় না। তিনটি স্তর নিয়ে ভাষার আলোচনা খুবই প্রয়োজনীয়। এগুলির সম্পর্কে ধারণা স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হওয়া দরকার।

ধ্বনি উচ্চারণ অর্থাৎ articulation হবার ক্ষেত্রে বাগযন্ত্রের নানা অংশের সঙ্গে (Organs of Speech or Vocal organs-এর) ধ্বনিতরঙ্গ, (Sound waves) তৈরী হওয়া শ্বাসবায়ুর যাত্রা, ঘর্ষণ, স্পৃষ্ট হওয়া পূরিত হওয়া—প্রভৃতিকে ঠিকমতো বুঝে নেওয়া উচ্চারণ মূলক স্বনবিজ্ঞান অর্থাৎ Articulatory Phonemics-এর আলোচ্য। এটি ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে শারীরবিদ্যা (Physiology)-রও বিষয়।

মুখাবয়ব থেকে ভাষা বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ার পর ধ্বনিতরঙ্গ বা Sound Waves তৈরী হয়। এই বিষয়ে মান, মাত্রা ও রূপ বিষয়ে আলোচনা মূলত Acoustics-এর। ধ্বনিতরঙ্গ বিজ্ঞান তথা Acoustics-এর ক্ষেত্রটি পদার্থবিদ্যা (Physics)-এর অন্তর্গত।

উচ্চারণ মূলক স্বনবিজ্ঞান আর ধ্বনিতরঙ্গ বিজ্ঞান-এর সঙ্গে সংগীতের সম্পর্ক নিবিড়। তবে ভাষাবিজ্ঞান সংগীতের মতো বিশেষ (Particular)-নিয়ে আলোচনা করে না—তার লক্ষ্য নির্বিশেষ বা সাধারণ (General)। তাছাড়া সংগীত হল প্রয়োগমূলক—ভাষাবিজ্ঞান ও ব্যাকরণ ব্যাখ্যামূলক।

বাগধ্বনির তৃতীয় স্তর ধ্বনির শ্রবণ বা audition. একে বলতে হয় শ্রুতিমূলক স্বনবিজ্ঞান তথা শ্রবণ

মূলক ধ্বনিবিজ্ঞান (Auditory Phonetics)। এ বিষয়টিও শারীরিক—শ্রবণযন্ত্রের ক্রিয়াশীলতার সঙ্গে এর যোগ নিবিড়। শারীরবিদ্যা (Phisiology)-র সঙ্গে এই শ্রবণমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান তথা Auditory Phonetics-এর সম্পর্ক আছে।

ধ্বনিতত্ত্ব (Phonetics), ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonology) আর ধ্বনিবিচার (Phonmics)-এর যথেচ্ছ ব্যবহারের দিকে চোখ পড়েছে ভাষাতাত্ত্বিক ফ্রান্সিস নেলসন-এর। তিনিও সমাধান করার চেষ্টা করেছেন এইভাবে। — 'Phonology is a converterm embracing phonetics and phonemics.' (দেখুন : 'The Structure of American English', নিউইয়র্ক, ১৯৫৮; ১ম পরিচ্ছেদ)।

ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনার জন্য ধ্বনি বা স্বন (Speech sound বা phone), পূরক-স্বন (Allophone), মূল ধ্বনি অর্থাৎ ধ্বনিতা বা স্বনিম (Phoneme)-এর আলোচনা করা হয়। সাধারণভাবে লিপি চিহ্নিত ধ্বনিগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ মূল ধ্বনি বা স্বনিম। রাম, পাখি, মধু, শ্যাম—শব্দগুলির মধ্যে রাম ও শ্যাম একটি মূলধ্বনি বা স্বনিম। পাখি, মধু—র স্বনিম সংখ্যা দুই—'পা', ও 'খি', 'ম' ও 'ধু'।

কিছু কিছু উচ্চারণ লিপির দ্বারা সঠিকভাবে প্রকাশ করা যায় না। উদাহরণ হিসেবে বলি : *বেলা যে পড়ে এল জলকে চল*। আর 'সাগর বেলা'-আর উক্ত 'বেলা' একভাবে উচ্চারিত হয় না। একে বলা হয় Allograph. আনুরূপে ড. সুকুমার সেন দেখিয়েছেন 'উল্‌টো' আর 'আল্‌তা' ধ্বনি দুটির অন্তর্গত ল্ উচ্চারণ একরকম নয়। এই পার্থক্যকে বোঝানো হয় পূরক-স্বন বা Allophone-এর দ্বারা। Allophone-কে কেউ কেউ উপধ্বনি বলেছেন।

রূপবিচার অর্থাৎ Morphology. ভাষার রূপ বিচার করার সময় মূল রূপ বা রূপিম অর্থাৎ morpheme-এর আলোচনা করা হয়। মূল রূপ বা রূপিম বলতে বোঝায় ভাষার সংক্ষিপ্ততম অর্থযুক্ত রূপ বা একক। ('Smallest meaningful unit')। রূপিম আর তার পরিবেশগত বৈচিত্র নির্ণয় করাকে morphemics বা রূপিমবিদ্যা বা রূপিম বিজ্ঞান বলা হয়।

মূল রূপ থেকে শব্দের গঠন কী ভাবে হয়? শব্দ আর ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি, প্রাতিপাদিক, অনুসর্গ, উপসর্গ বা প্রত্যয় যোগ করার তাত্ত্বিক আলোচনা রূপ প্রক্রিয়াতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব অর্থাৎ morphology-র মূল আলোচ্য বিষয়।

বাক্যতত্ত্ব বা বাক্যরীতি—Syntax, একাধিক মূলরূপ বা শব্দ একত্র মিলিত হয়ে মনের কোনো ভাব প্রকাশ করলে বাক্য বা Sentence রচিত হয়। প্রত্যেক ভাষার বাক্যের মূল রূপগুলি সাজানোর নির্দিষ্ট রীতি আছে। পদবিধি বা বাক্যরীতির মাধ্যমে সেই নিয়মগুলি ঠিকমত খুঁজে নেওয়া বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে বাক্যতত্ত্ব বা Syntax-এর ক্ষেত্রটি তৈরি হবে।

রূপতত্ত্ব বা বাক্যতত্ত্বকে পৃথক ক্ষেত্রে বিচার না করে একসঙ্গে ব্যাকরণের অন্তর্গত করে আলোচনা করার পক্ষপাতী কোনো কোনো পণ্ডিত। তাঁরা মনে করেন রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব ব্যাকরণেরই দুটি উপবিভাগ।

ভাষা আলোচনা তথা ব্যাকরণের চতুর্থ বিষয়টি হল শব্দার্থতত্ত্ব বা Semantics. ভাষার প্রকাশ-রূপের বিবেচনার তিনটি দিক ভাষার মূল; যথা—ধ্বনি, শব্দ আর বাক্য। এগুলির উপর ভিত্তি করে ধ্বনিতত্ত্ব রূপতত্ত্ব আর বাক্যতত্ত্ব—গড়ে উঠেছে। ভাষার অন্য প্রান্ত হল উপলব্ধির। ভাষা কেবল প্রকাশ করে না—তা শ্রোতা (বা পাঠক)-র মনে কিছু উপলব্ধির সঞ্চার করে। একেই বলতে পারি অর্থ—meaning. শব্দের অর্থগত তাৎপর্য বিচার ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। কালের ক্রমাগতির সঙ্গে ধ্বনি পরিবর্তিত হয়। অর্থেরও

বিবর্তন হয়। অর্থ প্রসারিত হয়, সংশ্লিষ্ট হয়, সঞ্চারিত হয়, আমূল অর্থান্তর ঘটে যায়। সন্দেশ শব্দার্থ ছিল সংবাদ, বর্তমান অর্থ দাঁড়িয়েছে সুসংবাদ-স্মারক মিষ্টদ্রব্য। 'পেনা' শব্দটি মূলে ছিল ইতালীয় অর্থ ছিল পাখির পালক। পেন শব্দার্থ কলম। শব্দার্থ বিচারের বিষয়টিকে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীরা ব্যাকরণের অন্তর্গত করতে চান না।

শব্দার্থ তত্ত্বকে কাল ও সমাজের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করতে হয়। ঐতিহাসিক আর সামাজিক পটভূমিতে অর্থ বিবর্তিত হয়। সর্বত্র শব্দের অর্থ সমান ভাবে বিবর্তিত হয় না। হিন্দী ভাষায় সন্দেশ শব্দের অর্থ এখনও সংবাদ।

৩.১.১.৪ : বাঙ্ মীমাংসা ও ভাষাবিজ্ঞান

বাঙ্ মীমাংসা হল ভাষাতত্ত্ব। মধ্যযুগের ব্যাকরণ আলোচনা ক্রমে ভাষাতত্ত্ব বা Philology-নামক তত্ত্ববিদ্যা হিসেবে গড়ে উঠেছে। ভাষাতত্ত্বে ভাষার উদ্ভব বিকাশ ও তুলনার দিকে বেশি মনোনিবেশ করে। এই তত্ত্ববিদ্যাটি বিকশিত হয়েছে জার্মান ভাষাতাত্ত্বিকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তকে অবলম্বন করে। জার্মান ভাষাতাত্ত্বিকরা মনে করতেন বেদ-পূর্ব একটি ভাষাগোষ্ঠী ছিল। এই আদি আর্য ভাষাগোষ্ঠীর উদ্ভব ও বিকাশের তত্ত্বটি প্রমাণ করার জন্য তার খুঁজতে চেয়েছেন আর্যভাষাভাষীদের একালে বিভিন্ন ভাষা উপকরণের তুলনামূলক আলোচনার মারফৎ। এশিয়া মাইনর অঞ্চল থেকে দক্ষিণ-পূর্বে ভারত পর্যন্ত একটি বৃহৎ প্রব্রজন (racial migration) আর পশ্চিমে ইউরোপের নানা দেশে আর একটি জাতিগত প্রব্রজন (racial migration)-এর কল্পনা ও প্রস্তাব করলেন তাঁরা। ভারতে আগত আর্য ভাষাভাষীদের ইন্দো-ইরানীয় আর ইউরোপে আগত ভাষাভাষীদের তাঁরা ইন্দো-ইউরোপীয় বলে অভিহিত করতে চাইলেন।

এই তত্ত্ববিদ্যায় সামান্য কিছু কালোচিত ও ভৌগোলিক পার্থক্য ছাড়া ভাষাগুলির মধ্যে শব্দ-বাক্য-গঠনে আশ্চর্য মিল। ড. সুকুমার সেন-এর ভাষা : 'যে বিলুপ্ত মূল ভাষা হইতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলি উদ্ভূত হইয়াছিল তাহার কোনো নিদর্শন অদ্যপি পাওয়া যায় নাই। তবে এই বংশের প্রাচীন ভাষাগুলির তৌলন আলোচনা হইতে এই মূল ভাষার মোটামুটি রূপ যে কেমন ছিল তাহা ধারণা করা হইয়াছে।' ('ভাষার ইতিবৃত্ত' : উক্ত; ৮০ পৃ:)।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'বাঙ্গালা ভাষার জ্ঞাতি-স্থানীয় ভাষা'-র সন্ধান দিতে গিয়ে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা সমূহের যে তত্ত্ব তল্লাশ করেছেন তার মারফৎ একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষাতাত্ত্বিক মানচিত্র গড়ে তোলা যায়। তাঁর মতে আদি আর্যভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার শাখা ছিল এই কটি। যথা :

১. টিউনিক বা জার্মানিক

২. হেল্লেনিক বা গ্রীক

৩. আর্মেনিক

৪. আলবানীয়

৫. ইন্দো-ইরানীয়

৬. হিত্তী বা কানিসীয়

৭. কেলতিক

৮. ইতালিক

৯. তোখারীয়

১০. শ্লাবিক

১১. বালতিক

—এগুলির মধ্যে হিত্তী বা কানিসীয় এবং তোখারীয় ভাষা মৃত। কেলতিক আর ইতালিকের উৎস যে শাখা, তার সন্ধান মেলেনি। যাই হোক টিউনিক বা জার্মানিক ভাষা থেকে গথিক-ভাষা উদ্ভূত হয়, সে ভাষার চিহ্ন এখন মেলে না। তবে সেই বিলুপ্ত ভাষাগোষ্ঠী থেকে ইউরোপে ইংরেজী, জার্মান, ডাচ, ডেনমার্ক (ড্যানিশ), নরওয়ে (নরওয়েজিয়ান), সুইডেন (সুইডিশ)—এই ছটি জীবন্ত ভাষার বিকাশ ঘটেছে। কেলতিক ভাষা থেকে ওয়েলশ ও ব্রেতন (অর্থাৎ গ্রেট বৃটেনের ওয়েলশ আর বৃটেনের পুরোনো ভাষা) উদ্ভূত হয়েছে। আর আইরিশ ও গেলিক ভাষার বিকাশও ঘটেছে কেলতিক ভাষা থেকে। ইতালিক ভাষা থেকে লাতিন, লাতিন থেকে ফরাসী, ইতালীয়, স্পেনীয়, পোর্তুগীজ, প্রভেন্সাল, কাতালান, রুমানীয় প্রভৃতি বেশ কটি ভাষার বিকাশ ঘটেছে। হেল্লোনিক বা গ্রীক ভাষা থেকে প্রাচীন গ্রীক ও আধুনিক গ্রীক ভাষা বিকশিত হয়। শ্লাব ভাষা আর বালতিকের একটি সাধারণ উৎস ছিল—সে ভাষা এখন নিশ্চিহ্ন। শ্লাব ভাষা থেকে রুশ, চেখ, পোল, বুলগার, যুগোশ্লাব ভাষা উদ্ভূত। বালতিক ভাষা থেকে লিথুআনীয় ও লেট ভাষার উদ্ভব হয়েছে। আর্মেনিক ভাষা থেকে আর্মানী ভাষার উদ্ভব হয়েছে।

ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠী থেকে প্রথমে তিনটি ভাষাগোষ্ঠীর জন্ম হয়। ইরানীয় আর্য, দরদীয় আর্য আর ভারতীয় আর্য। ইরানীয় আর্য থেকে প্রাচীন পারসীক আবেস্তি ভাষা। আর আবেস্তি ভাষা থেকে পহলবী ও আধুনিক পারসীক, পশ্‌তু, বালুচী, কুর্দী প্রভৃতি ভাষার বিকাশ ঘটেছে। ভারতীয় আর্যভাষার প্রথম প্রকাশ বৈদিক ভাষায়। এর থেকে তিনটি ভাষা বিকশিত হয়েছে যাথা সংস্কৃত, পালি আর প্রাকৃত। প্রাকৃত ভাষা থেকে আজকের সমস্ত ভারতীয় ভাষা এবং সিংহলী ভাষার উদ্ভব ঘটেছে।

ভাষাতত্ত্ব ক্রমে অন্য ভাষাগোষ্ঠীর বিচার করতে চেয়েছে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন অস্ট্রিক (Auostric) বা দক্ষিণ দেশীয় ভাষাগোষ্ঠীর বিন্যাস। দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী, ভোট-চীন ভাষাগোষ্ঠী। এগুলির মধ্যে আছে অনেকগুলি দেশী-বিদেশী ভাষাগোষ্ঠী যেমন :

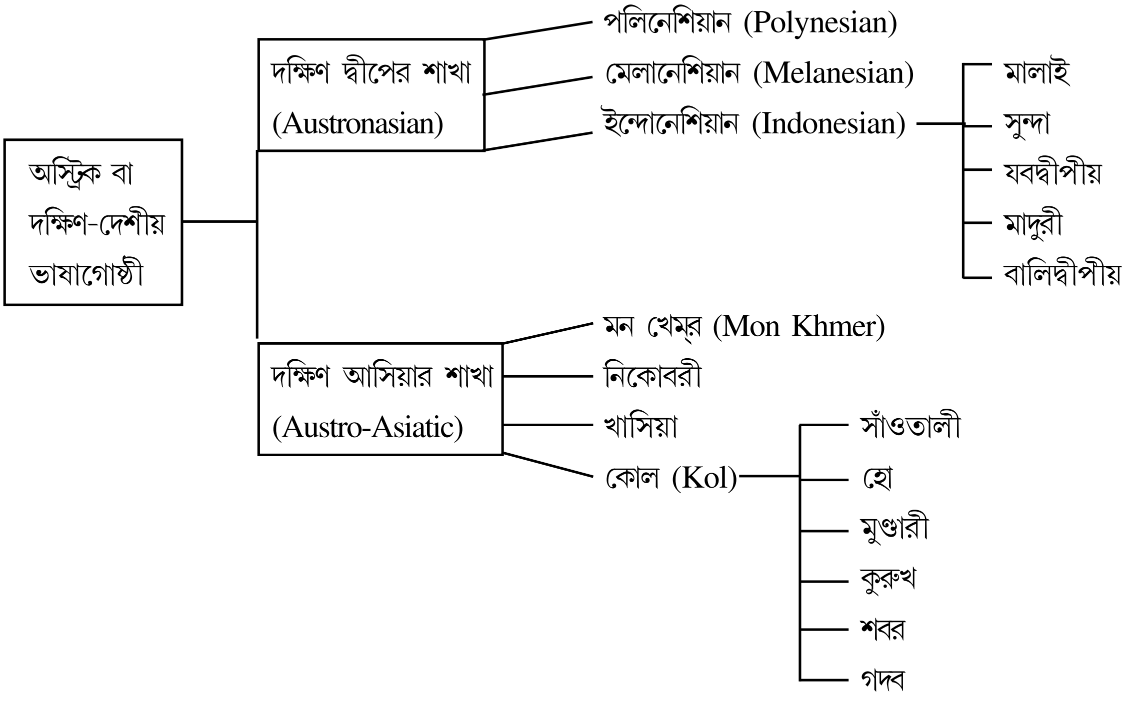

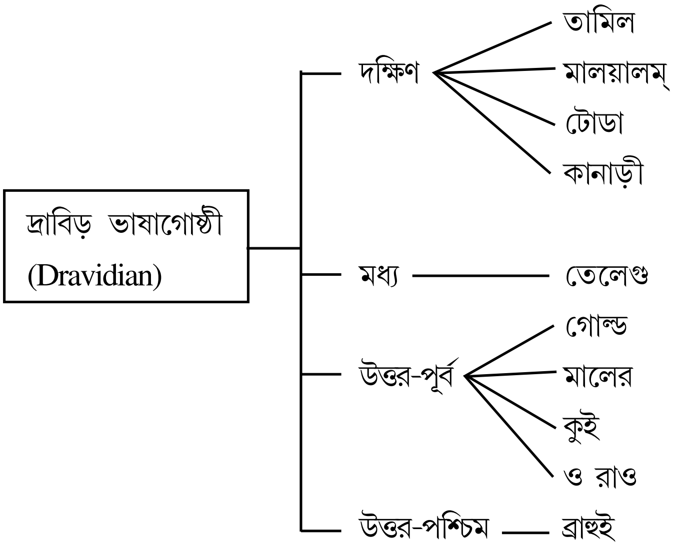

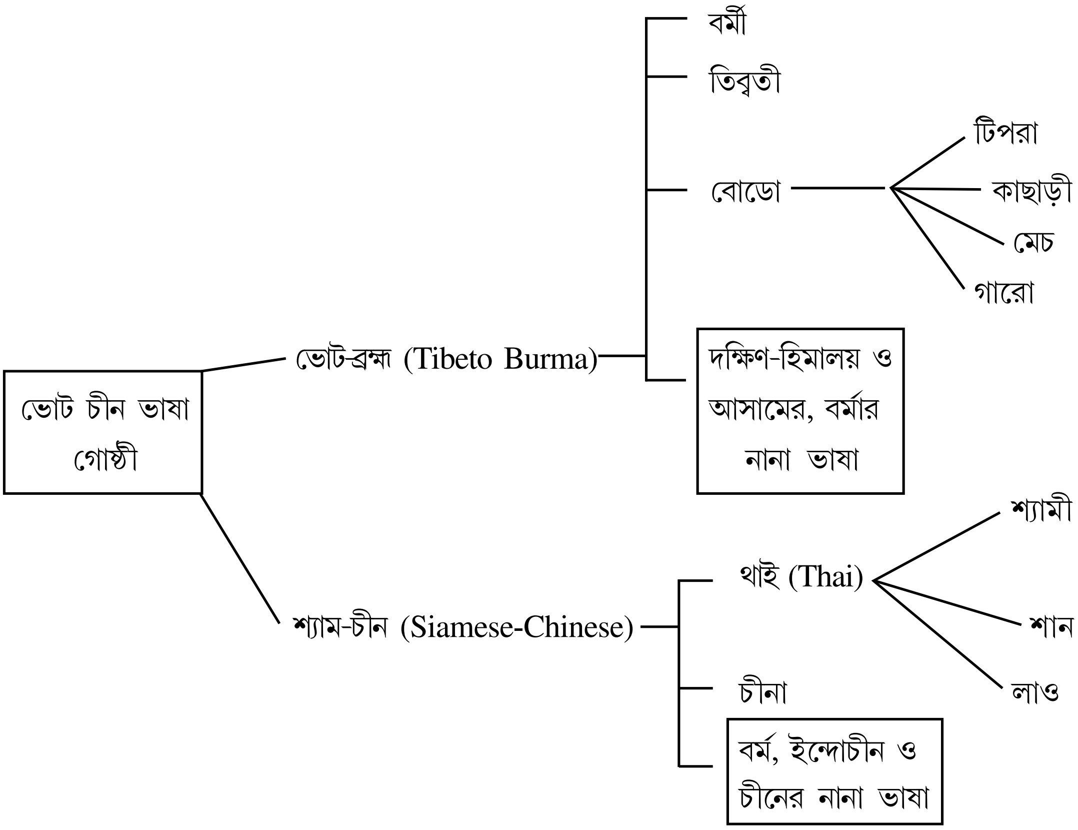

ড. সুকুমার সেন পৃথিবীর সমস্ত ভাষাগোষ্ঠীর উপর আলোচনা করে দেখিয়েছেন আরও কিছু ভাষা-বংশের পরিচয়। যেমন—

১. সেমীয়-হামীয় (Semitic-Homitic) : এই ভাষাবংশ দুটি বিভাগে বিভক্ত। সেমীয় আর হামীয়। অনেকে অবশ্য এই ভাষাবংশকে একটিই বলে ধরেন। সেমীয় শাখার অন্তর্গত ভাষাগুলি এইরকম :

সেমীয়
- পূর্বী উপখাশা : আসীরীয়, আক্কাদীয় বা বাবিলেনীয়
- পশ্চিমা উপশাখা : কনানীয়, কিনীসীয়, আরামীয়, হিব্রু
- দক্ষিণ উপশাখা : আরবী, আবিসীনিয়ায় ভাষাসমূহ

এই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে হিব্রু আর আরবী গুরুত্বপূর্ণ। হিব্রুতে বাইবেলের আদি পুস্তক (Old Testament) আর আরবীতে কোরান রচিত হয়েছে। ভাষা দুটির বিশ্বব্যাপী প্রভাব যথেষ্ট।

হামীয়
- প্রধান মিশরীয় : কপটিক
- বেবের : লিবিয়ার কিছু ভাষা
- কুশীয় : সোমালিল্যান্ডের কিছু ভাষা

কপটিক ভাষা সপ্তদশ শতাব্দীতে লুপ্ত হয়ে যায়। মিশরে প্রকাশিত হয় অরবী।

২. বান্টু। এই ভাষাগোষ্ঠী পশ্চিম, মধ্য আফ্রিকায় প্রচলিত। সোয়াহিলী (swahili), কাফির (Kaffir), জুলু (Zulu) প্রভৃতি ভাষা বান্টু (Bantu) ভাষাগোষ্ঠীর।

৩. ফিন্নো-উগ্রীয় (Finno-Ugric) : এই ভাষার অন্তর্গত ভাষার মধ্যে ফিনিস (Finnish, ফিনল্যান্ডের ভাষা), লাপ্পোনিক (Lapponic), এস্তোনিয়ার (Esthonian, এস্তোনিয়ার ভাষা), হাঙ্গেরিয়ান বা মাজ্যার (Hungarian বা Magyar — হাঙ্গেরির ভাষা প্রধান)।

৪. তুর্ক-মঙ্গোল-মাঞ্চু ভাষাগোষ্ঠী। এই ভাষাগোষ্ঠীর তিনটি প্রধান শাখা।

তুর্ক-তাতার :
- তুর্ক (Turkish)
- তাতার (Tartar)
- কিরঘিজ (Kirghiz)
- উজবেগ (Uzbeg)

মঙ্গোল : মঙ্গোলিয়া সহ রাশিয়ার নানা অংশের ভাষা

মাঞ্চু :
- তুঙ্গুস (Tunguse)
- মাঞ্চু (Manchu)

তুঙ্গুস সাইবেরিয়া অঞ্চলে আর মাঞ্চু চীনের উত্তর পূর্ব মাঞ্চুরিয়ায় বিশেষভাবে প্রচলিত।

৫. ককেশীয় ভাষায় বংশ। এর আধুনিক সময়ের উল্লেখযোগ্য ভাষা জর্জিয়ান (Georgian, জর্জিয়ার ভাষা)।

৬. এসকিমো (Esquimo) ভাষা বংশের অন্তর্গত প্রধান ভাষা হল গ্রিনল্যান্ডের আলেউশিয়ান (Aleutian)।

৭. আমেরিকান আদিম অধিবাসীদের ভাষাবংশ। এগুলি মূলত আটটি উপশাখায় বিভক্ত। যথা :

(১) আলগানকুইয়ান (Algonquian)

(২) আথাবাসকান (Athabascan)

(৩) ইরোকুইয়ান (Iroquoian)

(৪) মুসকোজীয়ান (Muskogean)

(৫) সিওউয়ান (Siouan)

(৬) পিমান (Piman)

(৭) শোশোনীয়ান (Shoshonean)

(৮) নাহুয়াটলান (Nahuatlan)

নাহুয়াটলান ভাষা প্রাচীন আজটেক সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করছে। ড. সুকুমার সেন লিখেছেন—'আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভাষাও ইংরাজী, ফরাসী অথবা স্পেনীয় ভাষার দ্বারা দূরীকৃত হইয়াছে।' ('ভাষার ইতিবৃত্ত', উক্ত; ৮০ পৃ:)। ব্রাজিলে এই তিনটি ইউরোপীয় ভাষা প্রচলিত হয়নি, এখানকার সাধারণ ভাষা পোর্তুগীজ।

বাঙ্ মীমাংসা তথা ভাষাতত্ত্ব (Philology) আসলে প্রাচীন ভাষার অধ্যয়নে নিবিষ্ট থাকে। তার লক্ষ্য ভাষার আদিরূপটি আবিষ্কার করার চেষ্টা। সেই রূপটি বোঝা গেলে তা থেকে কেমন করে আধুনিক ভাষাগুলি রূপান্তরিত হচ্ছে তার সন্ধান করে ভাষাতত্ত্ব। ভাষা উৎস, বংশ পরিচয় আর অন্যান্য ইতিহাস ভাষাতত্ত্বের আলোচ্য। এজন্য কেউ কেউ ভাষাতত্ত্বকে সাংস্কৃতিক ভাষাবিজ্ঞান (Cultural Linguistics) অভিহিত করতে চান।

অন্য পক্ষে 'ভাষাবিজ্ঞান (Linguistics)-এর লক্ষ্য ভাষার গঠন (Structure) আর ক্রিয়া (function)-র আলোচনা। ভাষার যে রূপ ভাষাবিজ্ঞান দেখাতে চায় তা একক, মৌখিক, এককালীন। কী ছিল সেই ইতিহাস ভাষাবিজ্ঞানের লক্ষ্য নয়—কেমন হয়েছে ভাষার চলমান রূপ, তাকে বুঝে নেওয়াই ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার পরিধি।

ভাষাবিজ্ঞানের চারটি স্তর লক্ষ করা যায়। যুক্তি কাঠামো গড়ে তোলার এই চারটি স্তর যথাক্রমে : কার্যকারণ বা cause, ফল অর্থাৎ effect, প্রতিক্রিয়া বা reaction আর সাধারণীকরণ বা generalisation. একই ধরনের পরিস্থিতিতে যখন একই রকম ফল দেখা যায়, বিশেষত ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সেই কার্যকারণ ও ফল ব্যাখ্যা করতে চায় ভাষাবিজ্ঞান। ক্রমে প্রতিক্রিয়ার একটি সাধারণ ব্যাখ্যা তৈরি হতে থাকে। আর এইভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ ভবিষ্যদ্বাণী করার মতো বিদ্যায়তনিক অনুমিতি (academic hypothesis) গড়ে ওঠে। দুয়েকটি উদাহরণ নেবার চেষ্টা করছি।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার বিষম যুক্ত ব্যঞ্জন যুক্ত শব্দ মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার সমীকৃত হয়। রেফ্ চিহ্ন অর্থাৎ র-শব্দের অর্ধব্যঞ্জন ধ্বনি লুপ্ত হয়। মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় এই ধ্বনিলোপের জন্য একটি স্বরধ্বনির দীর্ঘতা দেখা যায়। বেশিরভাগ সময় রেফ-পূর্ব স্বরধ্বনি দীর্ঘতা পায়। আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষায় এই দীর্ঘতা-স্পষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে বিষম যুক্ত ব্যঞ্জন সমীভূত হবার পর যে দ্বিত ধ্বনি তৈরি হয়েছিল তার একটি ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হয়। যথা :

কর্ম > কম্ম > কাম

চর্ম > চম্ম > চাম

কর্ম ও চর্ম শব্দ দুটি একই ধরনের স্বনিম-যুক্ত। র + ম এই বিষম যুক্তব্যঞ্জন দ্বিতীয় পর্যায়ে ম্ + ম এই সমীকৃত যুক্তব্যঞ্জন আর তৃতীয় পর্যায়ে একটি ব্যঞ্জন-লোপ ঘটল। এই ব্যঞ্জন ধ্বনিটি লুপ্ত হবার পর পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির দীর্ঘতা (অ স্থলে 'আ') লক্ষ করা গেল। একে ভাষাবিজ্ঞানেরর সিদ্ধান্ত বা অনুমিতি (academic hypothesis) বলা হয়। একে সূত্রাকারে বলা হয় ক্ষতিপূরক দীর্ঘীভবন (Compensatory lengthening)।

অন্য কিছু শব্দযুগ্মে রেফ্ না থাকলেও যুক্ত ব্যঞ্জনগুলি বিষম ছিল, পরের স্তরে সেগুলি সমীকৃত হয়েছে, তৃতীয় স্তরে সেগুলিরও প্রথম স্বরধ্বনিটির দীর্ঘতা লক্ষ করা যায়। যেমন :

পত্র > পত্ত > পাত → পাতা

ছত্র > ছত্ত > ছাত → ছাতা

এখানে পাত ছাত এর পরও আর একটি স্বরধ্বনির দীর্ঘতা দেখা যাচ্ছে—পাতা ছাতা। পাত পাতা, ছাত ছাতা দুটি শব্দই প্রচলিত। বিশেষ অর্থে এই দুটি শব্দ গড়ে ওঠার কার্য কারণ পূর্ববর্তী ভাষাবিজ্ঞানের সূত্র (Linguistic Law) দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

ভাষাবিজ্ঞানকে নতুন করে কার্যকারণ, ফল, প্রতিক্রিয়া আর ব্যাখ্যানের পর সাধারণীকরণের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী (Prediction) আর বিদ্যায়তনিক অনুমিতি (academic hypothesis) করতে করতে এগোতে হয়। নতুন নতুন ভাষাবিজ্ঞানের সূত্র (Linguistic Law) গড়ে তুলতে হয়। বিজ্ঞানের যে-কোনো শাখার মতোই ভাষাবিজ্ঞান বিদ্যাশৃঙ্খলা (discipline) হিসেবে গড়ে ওঠে এই নিত্যনতুনকে স্বীকার করার প্রগতিশীলতা (Progressiveness) আর সক্রিয়তা (dynamism)-র কারণে।

যে-কোনো সমাজবিজ্ঞানের মতোই সাধারণ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সাধারণ (general) আসে বিশেষ (particular) থেকে। এই বিশেষ কার্যকারণগুলি সাজিয়ে ক্রমশ আরোহ মূলক (inductive) পদ্ধতিতে কখনো অবহোর মূলক (deductive) পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত ও সূত্রে উত্তীর্ণ হওয়া ভাষাবিজ্ঞানের কার্যপদ্ধতি। এদিক থেকে বাঙ্ মীমাংসা বা ভাষাতত্ত্বের তুলনায় ভাষাবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করতে হয়।

ভাষাতত্ত্ব আর ভাষাবিজ্ঞান কখনো কখনো একইরকম ক্ষেত্র খুঁজে নিতে পারে। ভাষাতত্ত্ব আলোচনার সীমায় ভাষার বর্তমান স্তরের বিবরণ। তখন তা ভাষাবিজ্ঞানের মতোই সক্রিয়। অতীত স্তরের বিবরণটি দুইভাগে বিভক্ত হতে পারে। ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্র সেদিক থেকে এই রকম :

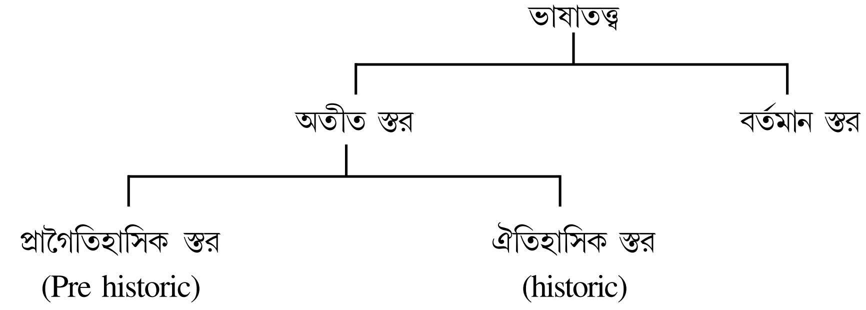

ভাষাবিজ্ঞানও অনুরূপ সন্ধান করতে পারে। একে বলা যেতে পারে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান। শব্দ অবলম্বন করে অতীতকে স্পষ্ট করার চেষ্টা হয় এর মাধ্যমে। এর নাম ব্যক্তিবৃত্তীয় ভাষাবিজ্ঞান (Linguistic Ontology)। কখনও কোনো জনগোষ্ঠীর অতীত কালটি পুনর্গঠন করার চেষ্টা করে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান—এর নাম জাতিবৃত্তীয় ভাষাতত্ত্ব (Linguistic Phylogeny)।

৩.১.১.৫ : ভাষাবিজ্ঞানের দুই শাখা—ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান

ভাষাবিজ্ঞানকে পণ্ডিতেরা দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত করতে চান—এককালিক (Synchronic) আর কালক্রমিক (Diachronic)। এককালিক বা Synchronic Linguistics-কে অন্যভাবে বিচার করে বলা হয় বর্ণনামূলক বা Synchronic Linguistics. কালক্রমিক বা Diachronic Linguistics-এর অন্য নাম ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান Historicial Linguistics.

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু কথা ইতিপূর্বে লিখেছি।

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে লিখতে গিয়ে চারলি এফ হকেট তাঁর 'A Course in Modern Linguistics' গ্রন্থে জানিয়েছেন কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে (at a given time), ভাষার বৈশিষ্ট্য (design of the language) সমূহের বিশ্লেষণ করতে চায় বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান। কোনো জনগোষ্ঠী (Community)-র ভাষা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য সন্ধান ও ব্যাখ্যানই এই ভাষাবিজ্ঞানের শাখাটির মূল লক্ষ্য। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির ভাষা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য (interpersonal) কিংবা নানা গোষ্ঠীর পার্থক্য সন্ধান (intergroup differences) এই শাখার আলোচ্য বিষয় নয়।

যখন ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির ভাষা ব্যবহার, বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর পার্থক্য নির্দেশ করতে চায় বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান—তখন তাকে এককালিক ভাষাবিজ্ঞান (Synchronic Linguistics)-এর বিষয় বলে মনে করেছেন চারলি এফ হকেট। ১৯৬৮-তে লেখা উক্ত গ্রন্থে তিনি লিখেছেন এই ভাষাবিজ্ঞানের শাখা (Synchronic Linguistics)-এর লক্ষ্য : 'the systematic study of inter-personal and inter-group differences of speech habit', অর্থাৎ বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ব্যক্তির ভাষা ব্যবহারের বিধিবদ্ধ আলোচনা। এভাবে এককালিক ভাষাবিজ্ঞান উপভাষাতত্ত্ব (dialectology)-এর দিকে ঝুঁকে পড়ে।

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের কিছু পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্য আছে। এগুলি হল :

১. অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন (Internal Reconstruction) : ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলিকে একত্রিত করার মধ্য দিয়ে ভাষার ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, শৈলী ও প্রয়োগ-এর রীতি মতো সন্নিবেশ ঘটানো এর লক্ষ্য।

২. বাহ্য পুনর্গঠন বা তুলনামূলক পদ্ধতি (External Reconstruction or Comparative Method) : প্রাপ্ত তথ্য, উপকরণের বর্গীকরণ ও তুলনা এই রীতির লক্ষ্য।

৩. উপভাষাগত ভূগোল (Dialect Geography) : কোনো নির্দিষ্ট ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন উপভাষা ব্যবহার স্থানিক ও অন্যস্থানের তুলনায় বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা উপভাষাতত্ত্বের প্রাথমিক লক্ষ্য। এই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য ব্যাপক ক্ষেত্র সমীক্ষা করা প্রয়োজন।

৪. শব্দভাণ্ডারের অবক্ষয় ও নতুন শব্দ সৃষ্টির পরিসংখ্যান (Glotto chronology, Lexico statistics)। এই পদ্ধতির মূল কথা কোনো ভাষার শব্দভাণ্ডার কেমন করে বদলে যায়—পূর্ববর্তী শব্দগুচ্ছ সরে নতুন শব্দগুচ্ছের প্রচলন হতে থাকে তার বিচার এই পদ্ধতির লক্ষ্য। বস্তুত অভিধানতত্ত্বের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। বিষয়টি অভিধানের শব্দের পরিসংখ্যান নয়—পরিবর্তের ছবিটি বোঝার নিবিড় চেষ্টা। 'পীরিতি' শব্দটি ভাংলা ভাষায় মধ্য যুগে যেমন ছিল এখন তেমন নেই। পীরিতি শব্দটি ধ্বনি পরিবর্তনের দ্বারা পীরিত-এ পরিণত হয়েছে। পীরিত-এর অর্থেরও অবক্ষয় ঘটেছে।

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান কী ভাবে তথ্যসঞ্চয় ও বিন্যাস করে? প্রথমেই তাকে বেছে নিতে হবে একটি নির্দিষ্ট কাল পরিধিতে ভাষার কয়েকটি একক বা উপকরণ। এগুলি হচ্ছে এইরকম :

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান
- স্বনিম Phoneme
- রূপিম/মূলরূপ Morpheme
- শব্দ Word
- বাক্য Sentence
- স্তবক/অনুচ্ছেদ বিচার
  - ছন্দ Rhetoric
  - অলঙ্কার Prosody
    - শৈলী বিজ্ঞান (Stylistics)

প্রথমে ধ্বনিমূল, স্বনিম (Phoneme)-বিচার, বিন্যাস ও তার তথ্য সঞ্চয় করতে হবে। বাংলা ভাষার মূল ধ্বনিগুলির তালিকা নির্ণয়, উপধ্বনি বা allophone সনাক্ত করতে হবে।

অর্থপূর্ণ মূল সংক্ষিপ্ত রূপ Morpheme. এগুলিকে বিন্যস্ত করলে ভাষার চরিত্রলক্ষণ স্পষ্ট হয়। শব্দ প্রায়ই একটি বা একাধিক Morpheme-এর সম্মিলিত রূপ। কেমন করে, কোনো কোনো যুক্তিতে এই সব Morpheme একত্রিত হচ্ছে শব্দে পরিণত হচ্ছে, তা বুঝে নেওয়া, বিন্যস্ত করা এই পর্যায়ের আলোচ্য।

বাক্যে শব্দ অবিকৃতভাবে থাকে না। বিভক্তি, কারকের চিহ্ন, নানা রকম বিন্যাসের নির্দিষ্ট রীতি মানা না হলে বাক্য তৈরি হয় না। বাক্যের অর্থ প্রকাশ পায় উক্ত রীতিগুলি ঠিকমত মানলে।

ভাষার বাক্য বিচ্ছিন্নভাবে থাকে না। একসঙ্গে প্রচুর বাক্য পরস্পরিত হয়ে কিছু ভাব বা উপলব্ধির কথা প্রকাশ করা—উপস্থাপিত ও সঞ্চারে করা ভাষার লক্ষ্য। স্তবক বা অনুচ্ছেদ-এর রচনা পদ্ধতি আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের নতুন একটি ক্ষেত্র তৈরী করেছে—শৈলীবিজ্ঞান তথা Stylistics. এই ক্ষেত্রটি অবশ্য বর্ণনা মূলক ভাষাবিজ্ঞানের সীমাকে অনেক পরিবর্তিত বিস্তৃত করে এনেছে। ভাষার এককালিক (Synchronic) মৌখিকতা (Speech habit) অপেক্ষা Stylistics-এর লক্ষ্য সাহিত্য কর্ম।

রুশ অবয়ববাদী (Structuralist)-রা কবিতার ভাষা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছেন ভাষার সাধারণ রীতি পদবিন্যাস অর্থাৎ Syntax-এর নিয়ম ঠিকমতো না মানাই যেন কবিতার লক্ষ্য। ভাষার এই আলঙ্কারিক ছন্দিত প্রকাশরীতি সমাজের মধ্য থেকে উঠে আসে না। ব্যক্তিগত প্রতিভার প্রকাশ বৈশিষ্ট্য বিবৃত করার চেষ্টা করে শৈলীবিজ্ঞান (Stylistics)।

৩.১.১.৬ : ভাষাবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা

আধুনিককালে ভাষাবিজ্ঞানের কিছু নতুন শাখার বিকাশ ঘটেছে। যথা :

১. ভৌগোলিক ভাষাবিজ্ঞান (Geolinguistics)

২. অবয়ববাদী ভাষাবিজ্ঞান (Structural Linguistics)

৩. অণু ভাষাবিজ্ঞান (Micro Linguistics)

৪. সমাজ ভাষাবিজ্ঞান (Socio Linguistics)

এই বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানের শাখাগুলি মূলত বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত।

৩.১.১.৭ : ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক তুলনা

একদিক থেকে দেখলে এই দুই শাখা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। একসময় ছিল ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ ভাবার যুগ। হেরমান পাউল মনে করেছিলেন ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান ছাড়া ভাষাবিজ্ঞান আলোচনা অর্থহীন। পরবর্তী সময়ে ভাবা হয়েছে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান ছাড়া ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা অপ্রয়োজনীয়—অসম্পূর্ণ। ভাষাবিজ্ঞানী জেলমস্লেভ এইরকম মত প্রকাশ করেন যে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান বলে যা আলোচিত হয় তা আসলে ভাষাবিজ্ঞানই নয়—এ হল ইতিহাস আর সমাজতত্ত্বের মিশ্রিত একটি বিচিত্র রূপ।

ইদানীং দেখা যাচ্ছে এই দুটি বিদ্যাশৃঙ্খলার মধ্যে সম্পর্ক নিবিড়। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান বাদ দিয়ে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে না। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ প্রণালীকে এড়াতে পারে না। ভাষাবিজ্ঞানের এই দুই শাখা পরস্পরিত—এ দুটির মধ্যে বিনিময়ের যথেষ্ট সুযোগ বিদ্যমান। এই দুই শাখা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক।

৩.১.১.৮ : ভাষার শ্রেণিবিভাগ

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান, বাঙ্ মীমাংসা তথা ভাষাতত্ত্ব যেভাবে ভাষার শ্রেণীবিভাগ করেন তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মান আছে। তুলনামূলকভাবে ভাষাগুলিকে দেখতে চান তারা। শেষপর্যন্ত বর্গ বা বংশক্রমে সজ্জা করা হয়। ভাষার শ্রেণিবিভাজনের এই রীতির কিছু উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। একে বলতে হয় বংশানুগত শ্রেণি বিশ্লেষণ, Genealogical Classification.

এর সঙ্গে ভাষা মানচিত্র রচনা—ভাষার এক স্থান থেকে অন্যভাবে যাত্রা তার ফলাফল প্রভৃতি বিষয়কেও ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত করা সম্ভব। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। পূর্বী হিন্দী বা ভোজপুরী ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী সস্তা শ্রমিক হিসেবে পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ার পর তাদের ভাষা ব্যবহার যৎকিঞ্চিৎ বদলালেও মূল রূপটি প্রায় অবিকৃত আছে। ফলে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ—ত্রিনিদাদ বা সুরিনাম, ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপ মরিশাস, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ ফিজি—সর্বত্রই ভোজপুরী ভাষার বিকাশ লক্ষ করা যায়। আফ্রিকার জনগোষ্ঠীগুলি মার্কিন দেশে নিজেদের ভাষা ব্যবহারকে রক্ষা করতে পারেনি। ভাষার অন্তর্গত উপভাষাগুলির বিচার ক্ষেত্রেও ভৌগোলিক শ্রেণিবিভাজনের রীতির প্রচলিত বৈশিষ্ট্যগুলি সন্ধান ও বিন্যাস করা হয়। ড. সুকুমার সেন লিখেছেন : ‘ভাষা-বিভাজনের সর্বাপেক্ষা সহজ উপায় হইতেছে মোটামুটিভাবে ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে তালিকা করা। ইহাকে বলে ভৌগোলিক শ্রেণিবিভাগ (Geographical Classification)।’ (ভাষার ইতিবৃত্ত; ৭৬ পৃ:)। তিনি অবশ্য এই শ্রেণিবিভাগকে খুব গুরুত্ব দিতে চাননি। তাঁর মতে—এই ‘শ্রেণিবিভাগের কোনো অতিরিক্ত উপযোগিতা নাই’, নেই কোনো বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য। এর সামান্য ‘ঐতিহাসিক মূল্য’ তিনি স্বীকার করেছেন কেবল।

ফার্দিনান্দ দে স্যেসুরে ‘geographical diversity’-কে খুব অযৌক্তিক, উপযোগিতাহীন বলে ধরেন নি। নানা গোষ্ঠীর ভাষা কেমন করে এক একটি অঞ্চলে পাশাপাশি এসে পড়ে—তা কেবল ঐতিহাসিক নয় ভৌগোলিক ভাষা-বিজ্ঞানের রীতিতে বিবেচনার যোগ্যও বটে। স্যেসুরে লিখেছেন : ‘newcomers may superimpose their language on the in digenous language. For instance, in South Africa, two successive colonizations introduced Dutch and English, which now exist alongside several Nergo dialects’ (Courses in general Linguistics; উক্ত; 194 পৃ:)। একইভাবে মেক্সিকোতে স্প্যানিশ আর স্থানীয় ভাষাগুলি সহাবস্থান করে। শেষ পর্যন্ত স্যেসুরে ‘unbroken chain of linguistic zones’-কে

গুরুত্ব দিয়েছেন, দেখিয়েছেন ভাষার মধ্যে কেমন করে provincialism বিকশিত হয়। উপভাষা থেকে ভাষার বিকাশ ঘটে। এ সমস্ত কেবল মূল্যহীন আলোচনা নয়।

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান অনুসারে ব্যাকরণের মান অনুযায়ী রূপতাত্ত্বিক শ্রেণি বিশ্লেষণ করে ভাষার শ্রেণিবিভাগ করে—একে বলতে হয় Morphological Classification. ভাষার ব্যাকরণ অনুযায়ী শব্দের রূপান্তরিত হওয়া বিন্যাসভেদে অর্থান্তর ঘটা প্রভৃতি বিষয়ে এরা ভাষার শ্রেণিবিভাগ করার পক্ষপাতী। এই বিভাজন রীতিতে এই ধরনের শ্রেণিবিন্যাস ঘটা সম্ভব। যথা :

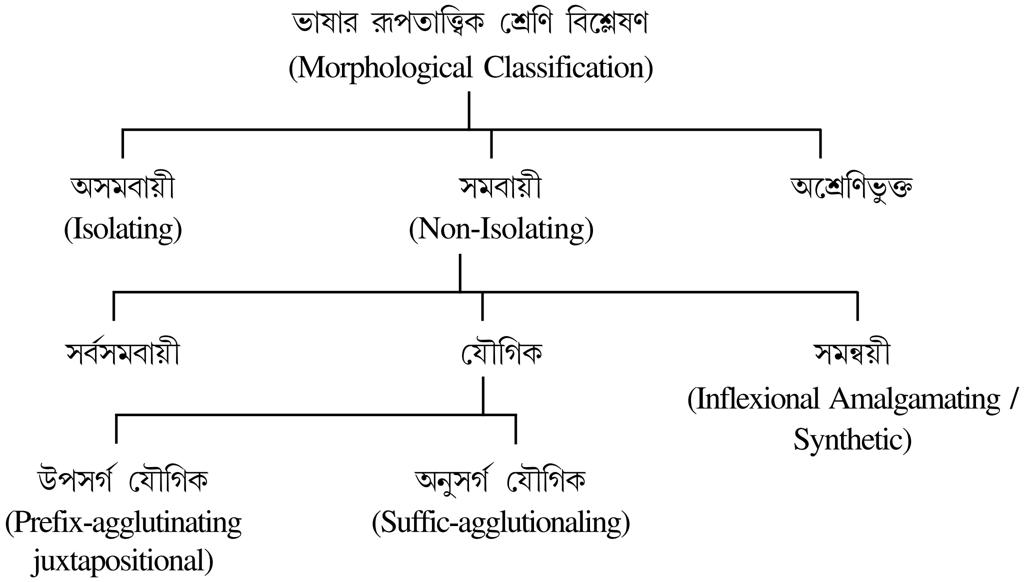

যে ভাষাগুলির শব্দ নির্বিকার, কেবল শব্দসজ্জার উপর নির্ভর করে ভাববিন্যাস বা প্রকাশের তারতম্য সেই ভাষার শ্রেণী অসমবায়ী বা Isolating—চীনা ভাষা এই রীতির। ভাষাটিতে শব্দের পরিবর্তন হয় না। তবে সুর বা tone-এর তারতম্য আছে। বস্তুত সুরের তারতম্যেই চীনা ভাষার ভাব ব্যক্ত হয়।

সর্বসমবায়ী ভাষার ক্ষেত্রে বাক্য শব্দ একাকার। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভাষাগুলিকে এই পর্যায়ে আলোচনা করা সম্ভব।

কিছু ভাষার শব্দে উপসর্গ যোগ করে নতুন নতুন অর্থ তৈরি করা যায় কোনো কোনো ভাষায় অনুসর্গ যোগ করে অর্থ তাৎপর্যের পার্থক্য বৈচিত্র্য সৃজন সম্ভব। কোনো ভাষা আবার অনুসর্গ, উপসর্গ ছাড়াও নতুন নতুন উপাদানে শব্দের রূপান্তর ঘটিয়ে ভাষ্য বদলে যায়।

এক আধটি ভাষাকে এগুলির কোনো বর্গ বা শ্রেণিতেই ফেলা যায় না। যেমন জাপানী ভাষা।

ড. সুকুমার সেন উপসর্গ-যৌগিক ভাষার উদাহরণ হিসেবে মধ্য আফ্রিকার বান্টু ভাষার কথা বলেছেন। অনুসর্গ-যৌগিক ভাষার উদাহরণ হিসেবে তামিল আর সমন্বয়ী ভাষার উদাহরণ হিসেবে আরবী এবং সংস্কৃত ভাষাকে ধরতে চান। অনুসর্গ-উপসর্গ agglutination-কে স্যেসুরে ইচ্ছাকৃত বা সক্রিয় বলে মানেন নি—তাঁর মতে 'agglutination is neither willful nor active' ('Course in general Linguistics', উক্ত 1977 পৃ:)। একে নিছক যান্ত্রিক (mechanical) কিংবা স্বতোৎসারিত (takes place spontaneously) বলে মনে করেছেন। ভাষার এই বিবেচনায় ভাষা এককালিক হলেও ঐতিহ্য সম্মত বলে প্রতিভাত হয়।

প্রশ্নাবলী	সূত্র সংস্থান	অনুষঙ্গ কথা

৩.১.১.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। ভাষাকে প্রতীকের নির্মাণ ও বিনির্মাণ বলার কারণ বিশ্লেষণ করুন।

২। ভাষা কাকে বলে? ভাষার কোনো সর্বজন গ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্ণয় করা যায় কিনা—দেখান।

৩। ভাষাকে চিহ্নায়ন বলার কারণটি বিশ্লেষণ করুন।

৪। ভাষার শব্দ আর অর্থের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট যৌক্তিক সম্পর্ক রাখা যায় কিনা বিচার করুন।

৫। ভাষা উদ্ভবের ক্ষেত্রে যে তত্ত্বগুলি বিকশিত হয়েছে তার পরিচয় প্রদান করুন।

৬। ধাতুরূপ বদলের ক্ষেত্রে গুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রসারণের বৈশিষ্ট্যগুলির উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৭। আপতিক বা আকস্মিকতার তত্ত্ব (Anomalist theory) আর সাদৃশ্য সন্ধান তত্ত্ব (Theory of Analogy)-বলতে কী বোঝায় আলোচনা করুন।

৮। বিধিনির্দেশ তত্ত্ব (Theory of System বা Manner) বলতে কী বোঝায়, আলোচনা করুন।

৯। ভাষা উদ্ভবের ক্ষেত্রে সামাজিক উপযোগিতার তত্ত্ব (Theory of Social utility) বলতে কী বোঝায় আলোচনা করুন।

১০। ভাষার ব্যাকরণ, বাঙ্ মীমাংসা বা ভাষাতত্ত্ব এবং ভাষাবিজ্ঞান-এর সংজ্ঞাদান করুন, পার্থক্য বিচার করুন।

১১। ব্যাকরণের মধ্যে ভাষা পরিকল্পনা (Language Planning)-র উপাদান মেলা সম্ভব কিনা আলোচনা করুন।

১২। ব্যাকরণ ক' রকম হতে পারে? Normative Grammar, Positive Grammar আর Prescriptive Grammar বলতে কী বোঝায়?

১৩। ব্যাকরণের বিষয় কী কী হতে পারে—আলোচনা করুন।

১৪। ধ্বনিতত্ত্ব কাকে বলে? ধ্বনিতত্ত্বের অংশগুলি কী কী—আলোচনা করুন।

১৫। ধ্বনির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুসারে ধ্বনিতত্ত্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশ্লেষণ করুন।

১৬। ধ্বনিতত্ত্ব আর ধ্বনিবিচার—Phonetics আর Phonemics-এর মিশ্রিত বিচারই ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonology)—মতটি সমর্থন করা যায়?

১৭। পূরক স্বন বা Allophone বলতে কী বোঝায়?

১৮। মূল ধ্বনি বা স্বনিম (Phoneme) বলতে কী বোঝায়?

১৯। মূল রূপ বা রূপিম (Morpheme) হল ভাষার সংক্ষিপ্ততম অর্থযুক্ত রূপ—আলোচনা করুন।

২০। বাক্যতত্ত্ব কাকে বলে? বিশ্লেষণ করুন।

২১। রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বকে পৃথক ভাবে আলোচনা করতে চান না কেউ কেউ। তাঁদের মতামত স্পষ্ট করুন।

২২। শব্দার্থ তত্ত্ব বলতে কী বোঝায় আলোচনা করুন।

২৩। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর সাধারণ পরিচয় দিন।

২৪। ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠীর সাধারণ পরিচয় বাঙ্গালা ভাষার স্থান নির্ণয় করুন।

২৫। অস্ট্রিক বা দক্ষিণ দেশীয় ভাষাগোষ্ঠীগুলির সাধারণ পরিচয় প্রদান করুন।

২৬। দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষাগুলির সাধারণ পরিচয় প্রদান করুন।

২৭। ভোট চিন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষাগুলির পরিচয় প্রদান করুন।

২৮। সেমীয়-হামীয়, বান্টু, ফিন্নো-উগ্রীয়, তুর্ক-মঙ্গোল মাঞ্চু ভাষাগোষ্ঠীর বিবরণ প্রদান করুন।

২৯। ককেশীয়, এসকিমো, আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভাষাবংশগুলির সাধ্যমত পরিচয় প্রদান করুন।

৩০। বাঙ্ মীমাংসা বা ভাষাতত্ত্বকে কী কারণে সাংস্কৃতিক ভাষাবিজ্ঞান (Cultural Linguistics) বলা যায়?

৩১। ভাষাবিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে চারটি স্তর—এগুলির পরিচয় দিন।

৩২। ভাষাবিজ্ঞান আলোচনা পদ্ধতির দ্বারা সারস্বত অনুমিতি গড়ে তোলেন, কী ভাবে? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৩৩। ক্ষতিপূরণ দীর্ঘীভবন বলতে কী বোঝায়?

৩৪। ভাষাবিজ্ঞানকে প্রগতিশীল ও সক্রিয় বিদ্যাশৃঙ্খলা বলার কারণ বিশ্লেষণ করুন।

৩৫। বাঙ্ মীমাংসার চেয়ে কি কি কারণে ভাষাবিজ্ঞান অনেক বেশি বিজ্ঞানধর্মী?

৩৬। ভাষাতত্ত্ব ভাষা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কীভাবে অতীত ও বর্তমান স্তরকে সমান গুরুত্ব প্রদান করতে পারে?

৩৭। ব্যক্তিবৃত্তীয় ভাষাবিজ্ঞান (Linguistic Ontology) আর জাতিবৃত্তীয় ভাষাবিজ্ঞান (Linguistic Phylogemy) বলতে কী বোঝায়?

৩৮। ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান বলতে কী বোঝায়?

৩৯। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় কি কি হতে পারে—আলোচনা করুন।

৪০। এককালিক ভাষাবিজ্ঞান কীভাবে উপভাষাতত্ত্বের দিকে ঝুঁকে পড়ে—আলোচনা করুন।

৪১। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা করুন।

৪২। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের উপকরণ বিচার করা। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান কেমন করে শৈলী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে?

৪৩। ভাষাবিজ্ঞান থেকে আধুনিক সময়ে যে সব নতুন নতুন শাখা তৈরি হয়েছে তার পরিচয় দিন।

৪৪। ভাষাবিজ্ঞানের দুই শাখা—ঐতিহাসিক আর বর্ণনামূলক; এই দুই শাখার সম্পর্ক ও তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৪৫। ভাষার শ্রেণিবিভাগ বলতে কী বোঝায়?

৪৬। ভাষার ভৌগোলিক শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে ড. সুকুমার সেন ও ফার্দিনান্দ দে স্যেসুরের মতামত স্পষ্ট করুন।

৪৭। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান অনুসারে ভাষার শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

৪৮। অনুসর্গ উপসর্গ সম্পর্কে স্যেসুরের মতটি জানান।

৪৯। সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন ঃ (ক) সুর বা tone (খ) Provintialism

৫০। রুশ অবয়বাদীদের চিন্তা শৈলীবিজ্ঞানে কীভাবে সাহায্য করেছে?

৩.১.১.১০ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। ড. রামেশ্বর শ' ঃ 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা'; পুস্তক বিপণি, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ।

২। Ferdinand de Saussure : 'Course in General Linguistics', Mcgraw Hill Book Company, New York, Toronto, London, Wade Baskin - কর্তৃক অনুদিত। 1966. মূল বই, জুলাই ১৯১৫।

৩। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা'; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৫০।

৪। ড. সুকুমার সেন : 'ভাষার ইতিবৃত্ত'; ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা, ত্রয়োদশ সংস্করণ, ১৯৭৯।

৫। Sally Wehmeier : 'Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English'; Oxford University Press; ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০০০।

৬। ড. মনসুর মুসা : 'ভাষা পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ'; মুক্তধারা ঢাকা; ১৯৮৪।

একক - ২

অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যপুনর্গঠন

বিন্যাস ক্রম :

৩.১.২.১ : ভাষাচর্চার পূর্বধারা

৩.১.২.২ : ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান (Historical Linguistics)

৩.১.২.৩ : ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতি কী

৩.১.২.৪ : ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতির উদ্ভব ও বিকাশ

৩.১.২.৫ : ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পর্ব, পদ্ধতি ও উপযোগিতা

৩.১.২.৬ : অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন (Internal Reconstruction)

৩.১.২.৭ : বাহ্যিক পুনর্গঠন বা তুলনামূলক পুনর্গঠন (External Reconstruction or Comparative Reconstruction)

৩.১.২.৮ : গ্রীমের সূত্র (Grimm's Law)

৩.১.২.৯ : গ্রাসমানের সূত্র (Grassman's Law)

৩.১.২.১০ : ভার্নারের সূত্র (Verner's Law)

৩.১.২.১১ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩.১.২.১২ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩.১.২.১ : ভাষাচর্চার পূর্বধারা

প্রাচীনকালে ভাষাচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল গ্রিস ও ভারতে। শুধুমাত্র সূত্রপাত-ই নয়, এই দুই প্রাচীন সভ্যতায় জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো এই ক্ষেত্রেও চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। প্লেটো (৪২৭-৩৪৮ খ্রিষ্টপূর্ব) তাঁর গ্রন্থে 'ডাইঅ্যালগ্স্' (Dialogues) এর 'ক্রাতুলোস' (Kratulos) অধ্যায়ে শব্দের উৎস নিয়ে আলোচনা করে ভাষাচর্চার পথ খুলে দেন। তাঁর পরে তাঁর শিষ্য অ্যারিস্টটল (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) কাব্যতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ 'পোয়েটিক্স্' (poetics)-এর তিনটি অধ্যায়ে ভাষাকে পর্যায়ক্রমে Letter, Syllable, Conjunction, Article, Noun, Verb, Case ও Speech—এই অংশসমূহ বিন্যস্ত করে বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু প্লেটো বা অ্যারিস্টটল—কেউই ভাষাচর্চাকে জ্ঞানচর্চার একটি পৃথক শাখা রূপে বিবেচনা করেননি। পরবর্তীকালে এথেন্সের স্টোইক (stoic) দর্শনগোষ্ঠীর সদস্যরা দর্শনশাস্ত্রেরই অন্তর্গত একটি পৃথক জ্ঞানচর্চার শাখা রূপে ভাষাচর্চকে বিবেচনা করেন। ভাষাচর্চা করতে গিয়ে তাঁরা ধ্বনি, শব্দরূপ-ক্রিয়ারূপ এবং শব্দের বুৎপত্তি বিষয়ে আলোচনা করেন। এরপর আলেকজান্দ্রীয় গোষ্ঠীভুক্ত লেখকদের হাতে গ্রিকভাষার কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচিত হয়। এই ব্যাকরণ রচয়িতাদের মধ্যে দিওনুসিওস থ্রাক্স (খ্রিষ্টপূর্ব ২য় শতক), আপোলোনিওস্ দুস্কোলাস্ (খ্রিষ্ট ২য় শতক) ও তাঁর পুত্র হেরোদিয়ানুস উল্লেখযোগ্য। থ্রাক্স রূপতত্ত্বের, আপোলোনিওস্ বাক্যতত্ত্বের এবং হেরোদুয়ানুস স্বরাঘাত ও অবিভাজ্যধ্বনি সম্পর্কে প্রথম বিধিবদ্ধ আলোচনা করেন।

গ্রিক বৈয়াকরণদের হাতে গ্রিক ব্যাকরণের যে পূর্ণাঙ্গ রূপ গড়ে উঠেছিল সেই কাঠামো অনুসরণ করে রোমানরা লাতিন ভাষার চর্চা ও ব্যাকরণ রচনা করতে থাকেন। ভারো (খ্রিষ্ট পূর্ব ১ম শতাব্দী), কুইন্তিলিয়ানুস (খ্রিষ্ট ১ম শতাব্দী), দোনাতুস (খ্রিষ্ট ৪র্থ শতাব্দী), প্রিস্কিয়ানুস (খ্রিষ্ট ষষ্ঠ শতাব্দী) প্রমুখ রোমানের হাতে লাতিন ব্যাকরণেরও একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ গড়ে উঠে। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছুটা বর্ণনামূলক রীতিতে রচিত প্রিস্কিয়ানুসের ব্যাকরণ 'ইন্সতিতুতিওনেস গ্রামাতিকা এ (Institutiones Gramaticae)। একসময় ব্যাকরণটি ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ রচনার পথিকৃৎ হয়ে যায়। ফরাসী, ইতালীয়, স্পেনীয় প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক ইউরোপীয় ভাষার ব্যাকরণ প্রিস্কিয়ানুসের ব্যাকরণের আদর্শেই রচিত। এই পর্বে একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল, ইতালীয় ব্যাকরণের নিয়ম মেনে ব্যাকরণ রচিত না হলে সে ব্যাকরণ অশুদ্ধ। এইভাবে বিধিবদ্ধ নিয়মে যে ব্যাকরণ চর্চা হচ্ছিল তা প্রকৃতপক্ষে নির্দেশমূলক ব্যাকরণ চর্চার ধারা। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এই ধারা সমস্ত মধ্যযুগেই ব্যাকরণ চর্চার অবলম্বন ছিল। অর্থাৎ দেখা গেল, ইউরোপে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভাষাবিদ্যার যাত্রা শুরু হয়ে আংশিক বর্ণনামূলক ধারা অবলম্বন করে এক পর্বে তা নির্দেশমূলক ব্যাকরণ রচনার ধারায় পরিণতি পায়।

ভারতে ভাষা সংক্রান্ত ভাবনার সূত্রপাত হয়েছিল বৈদিক গ্রন্থগুলির (খ্রিঃ পূঃ ১৫০০-৬০০) 'সংহিতা'-র মধ্যেই। যদিও সেখানে বিস্তৃত আলোচনা নয়, ভাষা-সংক্রান্ত কিছু বিক্ষিপ্ত উক্তিমাত্র পাওয়া যায়। 'ব্রাহ্মণ'-এ ধ্বনির উচ্চারণ, সন্ধি, পদ, বিভক্তি, বচন ও ক্রিয়ার কাল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনাও দেখা যায়। ভাষা-সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ ধারাবাহিক আলোচনা শুরু হয় 'বেদাঙ্গ'-র মধ্যে। 'জ্যোতিষ' ও 'কল্প' ছাড়া অন্য চারটি 'বেদাঙ্গ'—শিক্ষা, নিরুক্ত, ব্যাকরণ ও ছন্দ মূলত ভাষার বিভিন্ন দিকের আলোচনা। 'শিক্ষা'-য় ধ্বনির প্রকৃতি, উচ্চারণ, স্বরাঘাত প্রভৃতি দিক আলোচিত হয়েছে। 'নিরুক্ত' শব্দের বুৎপত্তি নির্ণয় ও শব্দকোষ বিষয়ক গ্রন্থ। 'ছন্দ' ছন্দ-বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থ। 'ব্যাকরণ' মূলত ভাষার রূপতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ। তবে পরে পরে ভাষার বিবিধ দিক এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

ভারতে প্রথম যে ব্যাকরণ গ্রন্থটি পাওয়া যায় সেটি পাণিনি রচিত 'অষ্টাধ্যায়ী'। এই কারণে পাণিনিকেই আদিতম ব্যাকরণবিদ্ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু পাণিনি-ই তাঁর পূর্বে আবির্ভূত শৌণিক, কাশ্যপ, গার্গ্য, ভরদ্বাজ, গালব প্রমুখ ব্যাকরণবিদের নাম করে গিয়েছেন। যদিও তাঁদের কোনো ব্যাকরণ গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। পাণিনির আবির্ভাব কাল নিয়ে বিতর্ক থাকলেও অধিকাংশের মতে তিনি খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বেই তাঁর সংস্কৃত ব্যাকরণটি রচনা করেছিলেন। 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণটি সাতরকমের সর্বমোট চার হাজার সূত্র নিয়ে রচিত। ব্যাকরণটির রচনাপদ্ধতি অনেকখানি এককালিক-বর্ণনামূলক (Synchronic-descriptive)। কারণ তিনি ভাষার উদ্ভব বিবর্তন—এসব সম্পর্কে আলোচনা না করে সংস্কৃত ভাষার এককালেরই রূপ বিশ্লেষণ করেছেন। আধুনিককালে ভাষাবিজ্ঞানের বর্ণনামূলক ধারা এই রীতিরই সদৃশ। একালের বর্ণনামূলক ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী, লিওনার্দো ব্লুমফিল্ড পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন—"......... the grammar of Panine ...., is one of the greatest monuments of human intelligence". (Language).

পাণিনির পরবর্তীকালে পাণিনির ব্যাকরণের আবর্তের মধ্যেই ভারতের ভাষাচর্চা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাঁর ব্যাকরণের সূত্রের, ভাষ্য, তস্য, ভাষ্য, তাঁর সূত্রের বিরোধিতা ও সমর্থন—এসবেই ব্যাকরণ, রচনার ধারা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। মৌলিক ভাবনার সাহায্যে নতুন ধরনের ব্যাকরণ প্রচেষ্টা ছিল না বললেই চলে। পাণিনির পরে কাত্যায়ন (আনুমানিক খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী) তাঁর 'বার্তিক'-এ পাণিনির দেড় হাজার সূত্রের বিরোধিতা করে নিজস্ব সূত্র দেন। কাত্যায়নের পরে পতঞ্জলি (খ্রিষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতক) তাঁর 'মহাভাষ্য'—এ প্রাঞ্জল ভাষায় কাত্যায়নের সূত্রগুলি খণ্ডন করে পাণিনির সূত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। পাণিনির ব্যাকরণের অন্য সূত্রেরও তিনি ভাষ্য দিয়েছেন। এর অনেক পরে আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম-

ষষ্ঠ শতকে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাকরণ গ্রন্থ রচিত হয়, যার নাম 'বাক্যপদীয়'। এর রচয়িতা ভর্তৃহরি। এই ব্যাকরণটি পদ্যবন্ধে রচিত। ভর্তৃহরি এই ব্যাকরণে ভাষার রূপগত বিশ্লেষণ নয়, ভাষার দার্শনিকতত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী ছিলেন। এরকম দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সমস্ত ব্যাকরণই পাণিনির আদর্শ অবলম্বনে রচিত। পাণিনির আশ্রয়ে এই যে বৈয়াকরণ সম্প্রদায়, এর বাইরে ভারতে আরো কতকগুলি ভাষা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। যেমন ঐন্দ্র সম্প্রদায়, চান্দ্র সম্প্রদায়, জৈনেন্দ্র সম্প্রদায়, শাকটায়ন সম্প্রদায়, হেমচন্দ্র সম্প্রদায়, কাতন্ত্র সম্প্রদায়, সারস্বত সম্প্রদায়, মুগ্ধবোধ সম্প্রদায়, নব্য ন্যায় সম্প্রদায় প্রভৃতি। মূলত প্রবক্তা বা প্রধান বৈয়াকরণের নামানুসারেই সম্প্রদায়গুলির নামকরণ হয়েছে। এইসব ভাষা সম্প্রদায় কখনো পাণিনির ব্যাকরণের জটিলতা বর্জন করে ব্যাকরণের মূল বিষয়গুলিকে সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য করে তুলেছে, কখনো পাণিনির ব্যাকরণকে সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য করে তুলেছে, কখনো পাণিনির ব্যাকরণকে সংক্ষিপ্ত করেছে, কখনো কোনো সম্প্রদায় ভর্তৃহরির আদর্শকে গ্রহণ করেছে ইত্যাদি। অর্থাৎ মৌলিকত্ব বিশেষ কিছু নাই বললেই চলে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই ব্যাকরণচর্চার ধারায় শুধুমাত্র সংস্কৃত ভাষা নয়, পালি ও প্রাকৃত ভাষাকেও স্থান দেওয়া হয়েছিল। প্রাকৃত ব্যাকরণগুলির মধ্যে বররুচির 'প্রাকৃত-প্রকাশ' (খ্রিঃ ৫ম শতক), লক্ষ্মীধর (১৬শ শতক)—এর 'ষড়ভাষা চন্দ্রিকা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পালি ব্যাকরণগুলির মধ্যে কচ্চায়ন (খ্রিঃ ৮ম শতক)—এর ব্যাকরণ, মোগ্‌গল্লয়ান (১২শ শতক) এর ব্যাকরণ এবং অগ্‌গবংস (১২শ শতক) রচিত 'সদ্দনীতি' গুরুত্বপূর্ণ।

পাণিনি থেকে শুরু হয়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগ পেরিয়ে আধুনিক যুগের প্রারম্ভ পর্যন্ত ভারতে ভাষাচর্চার এই যে ধারা, তা লক্ষ করলে দেখা যায়, ভারতে ভাষাচর্চা শুধু হয়েছিল বর্ণনামূলক পদ্ধতিতেই; কিন্তু পরবর্তীকালে কখনো কখনো তাতে দার্শনিক তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ভারতীয় ভাষাচর্চা ইউরোপীয় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভাষাচর্চার মতোই কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্দেশমূলক হয়ে উঠেছিল।

৩.১.২.২ : ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান (Historical Linguistics)

ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় কোনোও ভাষার উৎস, ইতিহাস ও ক্রমবিবর্তনের রূপরেখা নির্ণয় করা হয় তাকে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান বলে।

৩.১.২.৩ : ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতি কী ?

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ভাষাবিদ্যা চর্চার যে পদ্ধতিগত ধারা প্রাচীন ও মধ্যযুগে ছিল, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নতুন ধারার সূচনা হয় ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতির সাহায্যে। ভাষাবিজ্ঞান চর্চার যে পদ্ধতিতে কোনো ভাষার উৎস নির্ণয়, বিবর্তনের ধারা পর্যালোচনা ও সমগোত্রীয় ভাষাসমূহের প্রেক্ষিতে পরিবর্তনের লক্ষণ বিচার-বিশ্লেষণ করে সাধারণ সূত্রে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা থাকে তাকেই ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতি বলে।

যেহেতু ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতিতে একটি ভাষার প্রাচীনরূপ থেকে আধুনিক রূপ পর্যন্ত স্তরগুলির পর্যালোচনা করা হয় তাই অনেকে এটিকে কালক্রমিক ভাষাবিজ্ঞান (Diachronic Linguistics)—এর সঙ্গে এক করে ফেলেন। কারণ, কালক্রমিক ভাষাবিজ্ঞানেও একটি ভাষার স্তর-পরম্পরায় বিবর্তন লক্ষ করা হয়। কিন্তু এই দুটি পদ্ধতির কিছু পার্থক্য রয়েছে। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতিতে ভাষাস্তরগুলির প্রতিটি পর্যালোচনায় এককালিক বর্ণনাকে (Synchronic description) অবলম্বন

করা হয়, কালক্রমিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতিতে তা হয় না। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতি ও তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক (comparative philology) পদ্ধতির মধ্যেও পার্থক্য খুব কম। অনেক সময় তাই এদের একটি পদ্ধতি ধরে ঐতিহাসিক তুলনামূলক পদ্ধতিও বলা হয়। এই দুই পদ্ধতির ভাষাচর্চার মূল বিষয় প্রায় এক। দুটি পদ্ধতিতেই ভাষার মধ্যে রক্ষিত প্রাচীন উপাদানগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, ভাষার মধ্যে তুলনাত্মক আলোচনা করা হয়। কিন্তু দুটি পদ্ধতিরও লক্ষ্য এক নয়। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতিতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কালে কালে ভাষার অভ্যন্তরীণ গঠন, পরিবর্তন—ধ্বনিগত, রূপগত, সংগঠনগত, অর্থগত ইত্যাদি সবদিকেই লক্ষ করা হয়। এমনকি তার সমাজপ্রেক্ষিত, লোকমনস্তত্ত্ব ইত্যাদিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। একারণে সমাজভাষাবিজ্ঞান, মনোভাষাবিজ্ঞান সহ এককালিক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার নানা ক্ষেত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। এভাবেই ভাষার পরিবর্তনের কারণ বুঝতে চাওয়া হয়, ব্যাখ্যা দেওয়া হয় এবং সাধারণ সূত্র উদঘাটন করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। অন্যধারে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে বিভিন্ন ভাষা বা ভাষার বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্তরের সাধারণ উপাদানগত বৈশিষ্ট্য তুলনা করে তারা কোনো ভাষা-পরিবারে আছে, তাদের ভাষাবংশ সাধারণ কী না—এসব খোঁজা হয়। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতিতে প্রাথমিক পর্যায়ে এইসব রীতি অনুসৃত হয়।

৩.১.২.৪ : ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতির উদ্ভব ও বিকাশ

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অষ্টাদশ শতকে। আর বিকশিত হয়েছে সম্পূর্ণ উনিশ শতক জুড়ে। এ সময় ভাষাচর্চার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলতে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতিকেই বোঝাত। এই পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিক শুরুর ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক বক্তৃতার ভূমিকা ছিল। সেই বক্তৃতাটি স্যার উইলিয়াম জোন্স (১৭৪৬-১৭৯৬) ১৭৮৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি কলকাতার 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'-এর একটি সভায় প্রদান করেন। সংস্কৃত, লাতিন, গ্রিক ও জার্মান ভাষাগুলি সম্পর্কে সে বক্তৃতায় তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি ভাষাবিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন—"সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনত্ব যাই হোক না কেন, এর সংগঠন বিস্ময়কর। এই ভাষা গ্রিকের চেয়ে উৎকৃষ্ট, ল্যাটিনের চেয়ে ঐশ্বর্যময় এবং উভয় ভাষার চেয়েই সুচারু-পরিশীলিত। তবুও, এই ভাষা উভয় ভাষার সঙ্গেই ক্রিয়ামূল ও শব্দরূপে এক সুগভীর সম্পর্কে সম্পর্কিত, যা কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। এদের মধ্যে সম্পর্ক এত নিবিড় যে এই তিনটি ভাষা নিরীক্ষার সময় কোনো ভাষাবিজ্ঞানীই বিশ্বাস না করে পারবেন না যে এরা এক অভিন্ন উৎস থেকে উদ্ভূত, যে উৎস হয়তো এখন বিলুপ্ত।" অবশ্য জোন্সের এই পর্যবেক্ষণের পূর্বেও কেউ কেউ সংস্কৃতের সঙ্গে কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ করেছিলেন। যেমন, অনেক পূর্বে ষোড়শ শতকের শেষভাগে সাস্‌সেত্তি সংস্কৃত ও ইতালীয় শব্দের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য লক্ষ করেন। ১৭৬৭ সলে জেসুইট ধর্মযাজক কোরদো সংস্কৃত ও লাতিন শব্দসম্ভারের অনেক ঐক্য খুঁজে পান। এন. বি. হালহেড তাঁর 'এ গ্রামার অফ্ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' ("A grammar of the Bengal Language" (১৭৭৮)-এর ভূমিকায় লিখেছেন— "আমি সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে ফারসী ও আরবী এবং এমনকি লাতিন ও গ্রিক শব্দের সাদৃশ্য দেখে বিস্মৃত হয়েছি।" এইসব ক্রমিক পর্যবেক্ষণ এবং জোন্সের বিখ্যাত বক্তৃতার পর ইউরোপে তুলনামূলক ভাষা-গবেষণায় জোয়ার আসে। এঁদের মধ্যে অধিকাংশ ভাষাবিদ ছিলেন জার্মান এবং সংস্কৃতজ্ঞ। তাঁরাই প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির সঙ্গে জার্মানিক ভাষাবংশের ভাষাগুলির সম্পর্ক প্রদর্শন করেন। তাঁদের চর্চার পদ্ধতি ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতি। যেহেতু জার্মানিক ও ভারতীয় আর্য ভাষাবংশের ভাষাগুলিই এই গবেষণায় প্রধান অবলম্বল হয়ে উঠেছিল তাই আর্য ভাষাবংশের নাম-ই হয়ে যায় ইন্দো-জার্মানিক ভাষাবংশ। বর্তমানে এই ভাষা বংশটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ নামেই পরিচিত।

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতির যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলনামূলকতা, তার আধুনিকরূপে ও মূলনীতি নির্মিত হয়েছিল ফ্রিডরিশ শ্লেগেল (১৭৭২-১৮২৯) ও অ্যাডলফ শ্লেগেল (১৭৬৭-১৮৪৫) ভ্রাতৃ দ্বয়ের প্রচেষ্টায়। ফ্রিডরিশ-ই প্রথম 'তুলনামূলক ব্যাকরণ' (Comparative Grammar) কথাটি প্রয়োগ করেন। পরে এই কথাটি 'তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব' অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। এই 'তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব'-কে অবলম্বন করেই ক্রমে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও প্রণালি উদ্ভাবিত হয়। এই ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতিকে সুস্পষ্ট রূপ দান করেন রাসমুস রাস্ক (১৭৮৭-১৮৩২), ফ্রানৎজ বপ্ (১৭৯১-১৮৬৭), গ্রীম ভ্রাতৃত্বয়—য়্যাকব গ্রীম (১৯৭৫-১৮৬৩) ও ভিলহেল্ম গ্রীম (১৭৮৬-১৮৫৯) প্রমুখ। পরবর্তীকালে এই পদ্ধতিকে সমৃদ্ধ করেন আউগুস্ট শ্লেইসার (১৮২৩-১৮৬৮), হেরমান গ্রাসমান (১৮০৯-১৮৭৭), কার্ল-ভার্নার (১৮৪৬-১৮৯৬) প্রমুখ। উনিশ শতকের শেষ পর্বে-ঐতিহাসিক-তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নব্য ব্যাকরণবিদরা (junggrammatiker)-রা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আরো দৃঢ়ভাবে প্রয়োগ করেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন কার্ল-ব্রুগম্যান (১৮৪৯-১৯১৯), হেরমান অশ্‌হ্‌টহফ (১৮৪৭-১৯০৯) প্রমুখ।

ঐতিহাসিক-তুলনামূলক পদ্ধতির এই সব ভাষাবিজ্ঞানীর—অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল জার্মান ভাষায়। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম ও বাংলায় অনুদিত নাম দেওয়া যায়। যেমন, ফ্রিডরিশ শ্লেগলের 'ভারতীয় ভাষা ও প্রজ্ঞা' (১৮০৮) [Uber die sparche und weisheit der. India], রাসমুস্ রাস্কের 'প্রাচীন নর্স বা আইসল্যান্ডীয় ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে অনুসন্ধান (১৮১৮), [Undersogelse om det gamle nordiske eller islandske sprogs oprindelse], ফ্রানৎজ্ বপ্-এর 'গ্রিক, লাতিন, ফারসি ও জার্মান ভাষার ধাতুরূপ প্রণালীর সঙ্গে তুলনাসহ সংস্কৃত ভাষার ধাতুরূপ প্রণালী" (১৮১৬) [Uber das conjugation-system der sanskritsprache in vergleichung mit jenem der Griechischen, Lateinnischen, piersischen und Germanischen Sparche], য়্যাকব গ্রীমের জার্মানীয় ব্যাকরণ' (১৮১৯) (Deutsche grammatik], ব্রুগম্যান ও ডেলবুকের 'ইন্দো-জার্মান ভাষাসমূহের তুলনামূলক ব্যাকরণের রূপরেখা (পাঁচখণ্ড, ১৮৮৬—১৯০০) [Grundress der Vergleichenden Grammatik der idg sprachen] প্রভৃতি। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতি মাত্র এক শতকে এতখানি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল কারণ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশে প্রাচীন ভাষার সংখ্যা ছিল বেশি। শুধুমাত্র তাই নয়, এই ভাষাগুলির উন্নত ব্যাকরণ ছিল। তাই ভাষাগবেষকদের যেমন উপাদানের অভাব ছিল না তেমনি ভাষাগুলির বর্ণনামূলক বৈশিষ্ট্য জানার পথ উন্মোচিত ছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এই পদ্ধতিতে অন্যান্য ভাষাবংশগুলির চর্চা এরকমভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেনি।

৩.১.২.৫ : ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পর্ব, পদ্ধতি ও উপযোগিতা

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতিতে ভাষাচর্চার দুটি সুনির্দিষ্ট পর্ব আছে—প্রাগৈতিহাসিক পর্ব (Pre-historic period) ও ঐতিহাসিক পর্ব (Historic period)। ঐতিহাসিক পর্বের চর্চায় ইতিহাসের নানা উপাদান অর্থাৎ প্রাচীন পুঁথি, শিলালিপি প্রভৃতি প্রমাণাদির সাহায্য নেওয়া হয়। অর্থাৎ লিপিবদ্ধ দলিল (Written Records) থেকে ভাষার রূপ ও বিবর্তন বুঝে নেওয়ার প্রয়াস চালানো হয়। ঐতিহাসিক পর্বের উপাদানগুলিকে আভ্যন্তরীণ প্রমাণ (Internal evidence) ও বাহ্যিক প্রমাণ (External evidence)—এভাবে পৃথক করা যায়। লিপিবদ্ধ দলিলগুলিতে লিপির ব্যবহার-কৌশল, রৈখিক ও চিত্রাদি বিষয়, শব্দসম্ভার এবং ভাষাবৈশিষ্ট্য অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য-প্রমাণ। অপরদিকে ঐতিহাসিক লিখনগুলির বিষয়বস্তু, একই কালে বিভিন্ন প্রান্তে প্রাপ্ত-প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, বিভিন্ন লিপির ভাষাবৈচিত্র্য, বিভিন্ন কালে প্রাপ্ত লিপির ভাষাবৈচিত্র্য—এসব বাহ্যিক সাক্ষ্য প্রমাণ।

প্রাগৈতিহাসিক পর্বে যুক্তির সাহায্যে অনুমানকে ভিত্তি করে ভাষার অতীত রূপ গঠনের গবেষণা-প্রণালীকে অবলম্বন করা হয়। ভাষার পরিবর্তনের ধারা পর্যবেক্ষণ করে যে সূত্র আবিষ্কৃত হয় সেই সূত্রের নির্ভরে ভাষার প্রাচীন রূপ গঠনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। এইভাবে প্রাগৈতিহাসিক ভাষারূপ গঠনের পদ্ধতিকে পুনর্গঠন (Reconstruction) বলা হয়। যে ভাষারূপটি এর ফলে গড়ে উঠে তাকে পুনর্গঠিত রূপ (Reconstructed From) বলে। এই প্রাগৈতিহাসিক ভাষারূপ গঠন এবং ভাষাসমূহের মধ্যে বংশগত বা পারিবারিক সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য, শ্রেণীকরণের জন্যে চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়—

(১) আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন (Internationl Reconstruction)

(২) বাহ্যপুনর্গঠন বা তুলনামূলক পদ্ধতি (External Reconstruction or comparative method)

(৩) উপভাষাগত ভূগোল (Dialect Geography) এবং

(৪) শব্দের অবক্ষয় ও নতুন শব্দ সৃষ্টি বিষয়ক পরিসংখ্যান (Glotto-chronology or Lexico-statistics)

এই পদ্ধতিগুলিকে ভাষাবিজ্ঞানী হকেট ভাষার ইতিহাসচর্চার পরোক্ষ পদ্ধতি (Indirect technique) বলেছেন।

'শব্দের অবক্ষয় ও নতুন শব্দ সৃষ্টি বিষয়ক পরিসংখ্যান'-এর সাহায্যে দুটি সম্পর্কিত ভাষার পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র হয়ে যাবার সময় নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়। সে ক্ষেত্রে সম্পর্কিত দুটি ভাষার মূল শব্দসম্ভার (basic-core vocabulary)—এর সাদৃশ্য বিচার করা হয়। কত শতাংশ শব্দ সদৃশ তা লক্ষ করে ভাষা দুটির পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার কাল অনুমান করা হয়। সাদৃশ্যে পরিমাণ যত বেশি হয় বিচ্ছিন্নতার কাল তত কম বলে ধরে নেওয়া হয়। 'উপভাষাগত ভূগোল' রীতিপদ্ধতিতে সামাজিক স্তরভেদে যে সামাজিক উপভাষা (Social Dialect) এবং অঞ্চলভেদে যে আঞ্চলিক উপভাষা (Regional Dialect) গড়ে ওঠে সেগুলির মধ্যে রক্ষিত বিভিন্ন প্রাচীন উপাদান, বিশেষ উচ্চারণ রীতি, বিশেষ শব্দ বা শব্দরূপ ইত্যাদি বিচার করে ভাষাবিস্তারের ইতিহাসের উপাদান সন্ধান করা হয়। পার্থক্য বেশি হলে, নিজস্ব সাহিত্যে সমৃদ্ধ হলে উপভাষাগুলি একসময় পৃথক পৃথক ভাষায় পরিণত হয়। 'উপভাষাগত ভূগোল' রীতি-পদ্ধতিতে কোন্‌গুলি একই ভাষার উপভাষা ছিল। তা সন্ধান করে তাদের উপাদান সূত্রেই মূল ভাষার রূপটি গড়ে তোলা হয়। অন্য দুটি পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

৩.১.২.৬ : আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন (Internal Reconstruction)

আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন যে-কোনো ভাষার প্রাগৈতিহাসিক স্তরের রূপ গঠনের বহু প্রচলিত পদ্ধতি। এই পদ্ধতির প্রথম প্রয়োগ করেন ভাষাবিজ্ঞানী হেরমান গ্রাসমান। এই পদ্ধতি সৃষ্টির পিছনে একটি সুস্পষ্ট ধারণা ছিল, তা হল, যে-কোনো ভাষার মধ্যে সেই ভাষার পূর্ববর্তী স্তরগুলি নিজস্ব কিছু কিছু চিহ্ন বিভিন্ন দিক থেকে রেখে যায়। এই চিহ্নগুলি বিশ্লেষণ করে পূর্ববর্তী স্তরের ভাষারূপটি উদ্ধার করা সম্ভব। এইভাবে যেমন ভাষার পূর্বরূপের পুনর্গঠন করা যায় তেমনি স্তর-পরম্পরায় ভাষার বিবর্তনও লক্ষ করা যায়। গ্রাসমান সংস্কৃত ও গ্রিক ভাষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির ব্যবহার করে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পুনর্গঠনের পথ দেখান। তাঁর সূত্রানুসারে—প্রত্নইন্দো-ইউরোপীয় (proto-Indo-European) কোনো শব্দের পরপর দুটি ধ্বনি কিংবা পরপর দুটি অক্ষরের (syllable) প্রারম্ভিক ধ্বনি মহাপ্রাণ হলে অথবা কোনো অক্ষরের (syllable) শেষ মহাপ্রাণ ধ্বনিত হলে সংস্কৃত ও গ্রিকে পরপর দুটি মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রথমটি এবং অক্ষরান্তের মহাপ্রাণ ধ্বনিটি অল্পপ্রাণে

পরিণত হয়। এই সূত্রটিকে 'গ্রাসমানের সূত্র' (১৮৬৩) বলা হয়। যেমন * 'ভোধতি'—এই অনুমিত মূল ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দটিতে পরপর দুটি অক্ষর (syllable)—'ভো' ও 'ধ' দুটি ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি 'ভ' ও 'ধ' দিয়ে শুরু হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় শব্দটি হয়ে যায় 'বোধতি'। অর্থাৎ দুটি মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রথমটি পরিবর্তিত হয়ে অল্পপ্রাণ ধ্বনি 'ব'-'তে' পরিণত হয়েছে। গ্রিক ভাষা থেকে গ্রাসমান অনেক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যেমন, দুটি গ্রিক শব্দ 'thriks' (চুল) এবং 'trikhos' (চুলের)। প্রথমটি কর্তৃপদ এবং দ্বিতীয়টি সম্বন্ধ পদ। গ্রাসমান সিদ্ধান্ত করেন প্রাক-গ্রিক শব্দটির আদিরূপ ছিল * 'thrikh'। এই শব্দটির গ্রিকে রূপান্তরিত কর্তৃপদ 'thriks' এ 'kh' অল্পপ্রাণ 'k'—এই মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনটি অক্ষরের শেষে অবস্থিত ছিল। তাছাড়া 'S' যুক্ত হলে পূর্ববর্তী মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন অল্পপ্রাণ হয়। আবার সম্বন্ধপদ 'trikhos'—এ 'th' অল্পপ্রাণ 't' হয়েছে। কারণ অক্ষরের মধ্যে পরপর দুটি মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন থাকায় প্রথমটি অল্পপ্রাণ হয়েছে। এই কারণে পরবর্তী মহাপ্রাণ 'kh' এখানে রক্ষিত হয়েছে।

আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন পদ্ধতিতে ধ্বনি সংগঠনের মূলটি অনুসন্ধান করা হয়। কোনো ধ্বনি অপগত হলে আভ্যন্তর প্রমাণ থেকেই উদ্ধার করা যায়। ভাষাবিজ্ঞানী ফার্দিনান্দ দে স্যোসুর লক্ষ করেছেন, অধিকাংশ প্রত্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ধাতুর গঠন কাঠামো ব্যঞ্জন-এ—ব্যঞ্জন (c-e-c)। এখানে ব্যঞ্জনটি যে-কোনো হতে পারে। যেমন, 'bher' (c-e-c), 'sed' (c-e-c) প্রভৃতি। সাধারণভাবে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে কিছু সংখ্যক ভিন্ন ধরনের ধাতুরূপের গঠন দেখা যায়। যেমন, এ ব্যঞ্জন (ec-), অ-ব্যঞ্জন (ac-), ও ব্যঞ্জন (oc-), ব্যঞ্জন এ (ce :-), ব্যঞ্জন অ (ca :-) অথবা ব্যঞ্জন ও (co-); শেষের তিনটি সর্বদা দীর্ঘ স্বরধ্বনি। স্যোসুর অনুমান করেন এই ব্যতিক্রমী ধাতুগুলি ব্যঞ্জন—এ—ব্যঞ্জন (c-e-c)—এই সাধারণ গঠনই ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সুনিশ্চিতভাবে কিছু প্রত্নব্যঞ্জন ভাষা থেকে লুপ্ত হয়েছে। এই লুপ্ত ব্যঞ্জনগুলি প্রতিবেশী স্বরধ্বনির প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করেছে। এভাবেই এ (e) হয়েছে 'অ' (a) অথবা 'ও' (o)। তারপর সে সবগুলি অন্তর্হিত হয়ে অগ্রবর্তী স্বরধ্বনিটিকে দীর্ঘায়িত করেছে। সমস্ত ব্যতিক্রমী ধাতু যে সুনির্দিষ্ট ধ্বনি পরিবর্তনের ফল তা এই বিশ্লেষণে ধরা পড়ে। এই ধ্বনিপরিবর্তনের সূত্র দিয়ে প্রকৃত ধাতুরূপটি পুনর্গঠিত করা যায়। স্যোসুরের এই পর্যবেক্ষণটি 'ল্যারিংজিয়াল হাইপোথেসিস্' (laryngeal hypothesis) নামে খ্যাত। স্যোসুরের সিদ্ধান্ত অবশেষে প্রতিষ্ঠা পায় হিত্তাইট (Hittite) ভাষা আবিষ্কারের পর। কারণ সেখানে এই ধরনের কিছু প্রত্নব্যঞ্জন রক্ষিত ছিল। কুরিলোভিয়েজ (Kurylowieg) হিত্তাইট ভাষা নিয়ে কাজ করে স্যোসুরের মত সমর্থন করেন।

আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন পদ্ধতিটি কেবলমাত্র ভাষার আভ্যন্তরীণ তথ্যের উপর নির্ভর করে থাকে। আভ্যন্তরীণ তথ্য থেকে কিভাবে পুনর্গঠন হয় তা ভারতীয় ভাষা থেকে দেওয়া যাক। যেমন, ভারতীয় আর্যভাষার মধ্যস্তরের একটি প্রাকৃত 'মাগধী'—তে নলে, লাজা বা 'ধীবল' শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এগুলির পূর্বরূপ ভাষার প্রাচীন স্তর থেকে পাওয়া যায়। যথা—'নরঃ', 'রাজা' বা 'ধীবর'। অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষেত্রেই মাগধী প্রাকৃতে র > ল হয়েছে। এবার ধরা যাক, মাগধীতে 'চালু' শব্দটি পেলেও প্রাচীন স্তরে এর কোনো রূপ পাওয়া গেল না। কিন্তু ভাষার অন্যান্য আভ্যন্তরীণ দৃষ্টান্ত থেকে সহজেই রূপটি পুনর্গঠিত করা যায়। সেটি হবে 'চারু'।

আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন পদ্ধতিতে পুনর্গঠিত রূপটি যে প্রকৃতই পূর্ববর্তী স্তরের ভাষায় ছিল, তা নাও হতে পারে। এই পদ্ধতিতে যথাযথ রূপ যে সব সময়ই গঠন করা সম্ভব হয়, এমনও নয়। ভ্রান্তির সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। যেমন, 'জলদ'—অর্থাৎ যে জল দান করে, 'বারিদ'—অর্থাৎ যে বারি দান করে, 'করদ'—অর্থাৎ যে কর দান করে। এই সাধারণ সাদৃশ্য দেখে 'দ'—এর অর্থ 'দান করা' বোঝা যায়। কিন্তু সেই সাদৃশ্যে 'রুদ' এই শব্দের 'রু' অর্থে 'গতি' বা 'হিংসা' এবং 'দ' অর্থে 'দান করে' ধরলে ভুল হবে। কারণ 'রুদ'— এর অর্থ 'রোদন করা'। একারণেই আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন পদ্ধতি পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি নয়।

৩.১.২.৭ : বাহ্যিক পুনর্গঠন বা তুলনামূলক পুনর্গঠন (External Reconstruction or Comparative Reconstruction)

বাহ্যিক পুনর্গঠন বা তুলনামূলক পুনর্গঠন পদ্ধতিতে দুই বা ততোধিক সম্পর্কিত ভাষার সম উপাদানগুলির তুলনামূলক বিচার থেকে ভাষার পূর্ব কালবর্তী রূপের পুনর্গঠন করা হয়। কোনো ভাষাগুলিকে 'সম্পর্কিত' ভাষা বলে ধরা হবে তার কোনো সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ করা যায় না। তবে যে ভাষাগুলির মধ্যে শব্দসম্ভারের যথেষ্ট সাদৃশ্য ও 'ব্যাকরণে যথোপযুক্ত মিল' থাকে এবং কিছু ক্ষেত্রে যে ভাষাগুলিতে একই ধরনের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের পরিচয় থাকে সেই ভাষাগুলিকেই 'সম্পর্কিত' ভাষা বলা যেতে পারে। রাসমুস রাস্ক এ সম্পর্কে বলেছেন, যদি একাধিক ভাষার মধ্যে অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলির ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকে বা যদি একটি ভাষার ধ্বনি নিয়মিতভাবে অন্য কোনো ভাষায় রূপান্তরিত হতে দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে ঐ দুটি ভাষা একই উৎসজাত এবং মৌলিক সম্পর্কে অন্বিত।

এই পদ্ধতিতে সম্পর্কিত ভাষাগুলির তুলনা করতে গিয়ে প্রথমে বিভিন্ন উপাদান নিয়ে তাদের তুলনা করা হয়। এক্ষেত্রে সম্পর্কবাচক শব্দগুলির দিকে প্রথমে লক্ষ করা হয়। পরে পরে অন্য ধরনের শব্দও বিচার্য হয়। একাধিক ভাষার শব্দের মধ্যে যদি রূপগত বা অর্থগত সাদৃশ্য পাওয়া যায় তবে তাদের সহোদর শব্দ (cognates words) বলা যাবে। যেমন, 'ভাই'-বাচক শব্দ সংস্কৃতে—'ভ্রাতার', গ্রিকে—'ফ্রাতের', গথিকে—'ব্রথার', ল্যাটিন 'ফ্রাতের', ইংরাজীতে 'ব্রাদার' এই শব্দগুলি সব 'সহোদর শব্দ'। এইভাবে শব্দসহ বিভিন্ন উপাদানের তুলনামূলক বিচারের সাহায্যে একই বংশের এক স্তরের সহোদর ভাষাগুলিকে চিহ্নিত করা হয়। আরো গভীরে একই স্তরের এক পরিবারভুক্ত ভাষাগুলিকে নির্দিষ্ট করা হয়। একই পরিবারভুক্ত ভাষাগুলির মধ্যে তুলনামূলক বিচার করে তাদের প্রাচীন মূল রূপ নির্ণয় করা হয়। সেই স্তরের অন্য ভাষা-পরিবারের যে মূল রূপগুলি ছিল তাদের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করে ভাষার প্রাচীনতর রূপটি সন্ধান করা হয়। এইভাবে, বংশের উৎস-ভাষাতে পৌঁছে তার রূপ পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা করা হয়। যেমন, আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষায় বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া একই পরিবারভুক্ত। এর পূর্ববর্তী স্তরে পূর্বী মাগধী অপভ্রংশ ছিল। এই স্তরে তার সহোদর ভাষা পশ্চিমা মাগধী অপভ্রংশ, এদের পূর্বস্তর মাগধী প্রাকৃত। যার সহোদর ভাষা অর্ধমাগধী। এদের পূর্ব স্তর প্রাচ্য প্রাকৃত। প্রাচ্য প্রাকৃতের সহোদর ভাষা প্রাচ্যমধ্যা। উত্তরা-পশ্চিমা ও দক্ষিণ-পশ্চিমা। এইভাবে ক্রমশ ভাষার উৎসের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। তুলনাত্মক পথে এগিয়ে গিয়ে এইভাবে প্রত্নভাষা পুনর্গঠনের পথিকৃৎ আউগুস্ট শ্লেইসার। তিনিই প্রথম প্রত্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পুনর্গঠনের প্রয়াস চালান। সহোদর ভাষাগুলির তুলনামূলক বিচার করতে গিয়ে দেখতে হয় একই উপাদান প্রতিটি ভাষায় কি রূপ নিচ্ছে আর সেই পরিবর্তন ধারাবাহিক কিনা। যেমন, ইতালিক ভাষা-পরিবারের লাতিন ভাষায় 'আট' অর্থে একটি শব্দ 'octo' [অক্তো], ফরাসিতে 'huit' [উ্যইং(ৎ)], ইতালীয়তে 'otto' [অত্তো], স্পেনীয় 'ocho' [ওৎসো]। তাহলে দেখা যাচ্ছে লাতিনে যা উচ্চারণে 'ক্ত', তাই ফারসীতে 'ইৎ', ইতালীয়তে 'ত্ত', স্পেনীয়তে 'ৎস'। এইভাবে একটি ভাষার উচ্চারণ যদি অন্যভাষাগুলিতে বারে বারে একই রকম সুশৃঙ্খলভাবে পরিবর্তিত হয় তবে বুঝতে হবে বিষয়টি নিয়মাধীন।

৩.১.২.৮ : গ্রীমের সূত্র (Grimm's law)

য়্যাকব গ্রীম তাঁর 'ডয়ট্শে গ্রামাটিক' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে জার্মানিক ভাষাগুলির ধ্বনি-পদ্ধতির সঙ্গে অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ধ্বনি পদ্ধতির তুলনায় সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করেন সেগুলির মধ্যে যে ধ্বনিগত রূপান্তর দেখা যায় তা সুশৃঙ্খল নিয়মাধীন পথেই ঘটে। গ্রীমের পূর্বে রাস্ক জার্মানিক শাখারই

প্রাচীন নর্স বা আইসল্যান্ডীয় ভাষার উদ্ভব লক্ষ করতে গিয়ে এই বিষয়টি প্রথম খেয়াল করেন। কিন্তু গ্রীম-ই প্রথম এই ধ্বনি পরিবর্তন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে এসে একটি সূত্র নির্মাণ করেন যাকে তিনি 'Sound shift' বলেছেন, তাই (Gremm's law) নামে পরিচিত। সূত্রটি এইরকম—মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে জার্মানিক ভাষায় ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি (voiced aspirated sound) ঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনিতে (voiced unaspirated plosive), ঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি (voiced unaspirated plosive) অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনিতে (voiceless unaspirated plosive) এবং অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি (voiceless unaspirated plosive) অঘোষ মহাপ্রাণ উষ্মধ্বনিতে (voiceless aspirated fricative) পরিণত হয়েছে।

অর্থাৎ ইন্দো-ইউরোপীয় অন্য শাখার জার্মানিকে ধ্বনি পরিবর্তন এইভাবে হয় ঃ

(১) ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি bh, dh, gh

ঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি b, d, g

যেমন, ইন্দো-ইউরোপীয় একটি ভাষা সংস্কৃতের 'bhavami' শব্দটির জার্মানিক শাখার গথিক ভাষায় রূপ 'beon', ইংরেজিতে 'be'।

(২) ঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি b, d, g—অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি p, t, k

যেমন, সংস্কৃতে 'দশ' বা 'গ্রিকে' 'dcka'-র জার্মানিক শাখার গথিক ভাষায় রূপ 'taihun'।

(৩) অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি p, t, k—অঘোষ মহাপ্রাণ উষ্মধ্বনি f, θ, x

যেমন, সংস্কৃতে 'পিতৃ' বা গ্রিকে 'pater' শব্দটি জার্মানিক শাখার গথিকে হয়েছে 'fadar'।

গ্রীমের সূত্রে দুটি স্তরে 'sound shifting' এর কথা বলা হয়েছে। প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার তুলনায় জার্মান ভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনির যে পরিবর্তন তাকে বলা হয়েছে 'first sound shifting'। আর জার্মান ভাষার তুলনায় সপ্তম শতকের কাছাকাছি সময়ে ওল্ড-হাই-জার্মান ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন হল 'Second sound shifting'। প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার 'A' (= Aspirate) অর্থাৎ ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি (স্পর্শধ্বনি ও উষ্মধ্বনি-bh, dh, gh এবং f, θ, x) জার্মানিক ভাষায় পরিবর্তিত হয়েছে 'M' (= Neduak) এ অর্থাৎ ঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনিতে (b, d, g)। সেখান থেকে ওল্ড-হাই-জার্মান ভাষায় হয়েছে 'T' (T = Tamues) অর্থাৎ অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি (p, t, k)। আবার, প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয়তে 'M' হয়েছে জার্মানিক ভাষায় 'T' আর ওল্ড-হাই-জার্মানে 'A'। এবং প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয়তে 'T' হয়েছে জার্মানিক ভাষায় 'A', ওল্ড-হাই-জার্মানে 'M'।

এই দ্বিস্তরীয় ধ্বনিপরিবর্তনের বিষয়টি একটি ত্রিভুজের সাহায্যে স্পষ্ট করা যায়। (bh, dh, gh এবং f, θ, x)।

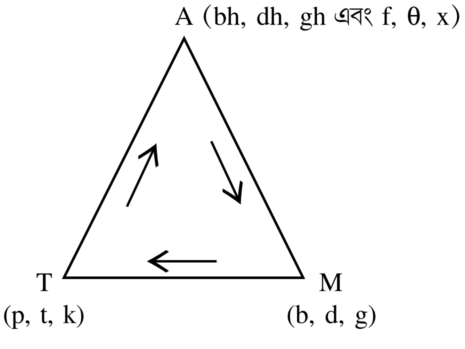

ত্রিভুজের যে-কোনো একটি বিন্দুকে যদি প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা ধরা হয় তবে পরবর্তী বিন্দুটি হবে জার্মানিক। আর শেষ বিন্দুটি হবে ওল্ড-হাই-জার্মানিক। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক ঃ (A) প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় একটি ভাষা গ্রিকে 'thygater' > (M) প্রাচীন জার্মানিক ভাষা গথিকে 'daughter' > (T) ওল্ড-হাই-জার্মানিক ভাষায় 'toher'। পরিবর্তিত ধ্বনি ক্রমটি এরকম $\theta > d > t$।

গ্রীম স্বয়ং তাঁর 'Sound-shifting' তত্ত্বের ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট ব্যতিক্রমের কথাও বলেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হল—

(i) 'sk', 'st', 'sp'—এসব থাকলে 'S' Sound-shifting-এর ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। যেমন, সংস্কৃত-asti > গথিক-ist > ওল্ড-হাই-জার্মান-ist

(ii) Kt, pt-এসব থাকলে t অপরিবর্তিত থাকে। যেমন, সংস্কৃত—napta > ওল্ড-হাই-জার্মান—nift এছাড়াও 'Sound-Shifting'—এর ক্ষেত্রে নানা অনিয়ম—বিচ্যুতি সহজেই লক্ষ করা যায়। যেমন, সংস্কৃতে 'bhratar' (ভ্রাতার) শব্দটি গথিকে হয়েছে 'brodar' (ব্রথার) আর ওল্ড-হাই-জার্মানে হয়েছে 'bruoder' (ব্রুওডার)। গ্রীমের সূত্রানুযায়ী ধ্বনি পরিবর্তন bh > b > p হয়নি।

৩.১.২.৯ : গ্রাসমানের সূত্র (Grassman's Law)

গ্রীমের সূত্রে অসংখ্য অনিয়মের মধ্যে কয়েকটির প্রতি হেরমান গ্রাসমান দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন এবং সূত্র উপস্থাপিত করেন। তিনি বলেন, গ্রিক ও সংস্কৃতে যদি পরপর দুটি অক্ষরের (Syllable) আরম্ভ মহাপ্রাণ ধ্বনিতে হয় তবে প্রথমটির অল্পপ্রাণ উচ্চারণ হবে। যদি দুটি মহাপ্রাণ ধ্বনি একটি অক্ষরের (Syllable) মধ্যে থাকে, তাহলেও প্রথমটি তার মহাপ্রাণতা হারাবে। অর্থাৎ দুটি মহাপ্রাণধ্বনি পাশাপাশি থাকে না। যেমন, সংস্কৃতে dhadhami (ধধামি)-র স্থানে পাওয়া যায় dadhami (দধামি)। এর থেকে ধরে নেওয়া যায় সংস্কৃতের প্রাথমিক ধ্বনিগুলি ও প্রত্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ধ্বনিগুলি প্রকৃতপক্ষে এক ছিল। গ্রাসমানের এই সূত্রের সাহায্যে গ্রীমের সূত্রের অনেক ব্যতিক্রম যে প্রকৃতপক্ষে ব্যতিক্রম নয় তা ব্যাখ্যা করা যায়।

৩.১.২.১০ : ভার্নারের সূত্র (Verner's Law)

গ্রাসমানের সূত্রের পরেও গ্রীমের সূত্রের অনেক ব্যতিক্রমের ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছিল না। সেই সমস্যার সমাধানে আসেন ওলন্দাজ ভাষাবিজ্ঞানী কার্ল ভার্নার। তিনি "An exception to first-consonant shift" প্রবন্ধ একটি সূত্র দেন, যা গ্রীমের সূত্রের সংশোধনী-'ভার্নারের সূত্র' (Verner's Law) নামে পরিচিত।

তিনি বলেন, শ্বাসাঘাতের অবস্থানের উপরে 'Sound-shifting' নির্ভর করে। যেমন, প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় থেকে p, t, k ধ্বনিগুলি গথিকে গ্রীমের সূত্র অনুসারে পরিবর্তিত হয় তখনই, যখন শ্বাসাঘাত এই ব্যঞ্জনগুলির অব্যবহিত পূর্বে পড়ে। কিন্তু যদি শ্বাসাঘাত পরে পড়ে তবে ধ্বনির পরিবর্তন (sound-shift) দ্বি-স্তরীয় হয়ে যায়। অর্থাৎ 'p, t, k' থেকে 'bh, dh, gh' না হয়ে 'b, d, g' হয়ে যায়।

যেমন, সংস্কৃত (প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার প্রতিনিধি)—'Satam' > গথিক (প্রাচীন জার্মান ভাষার প্রতিনিধি), hund, অর্থাৎ 't' ধ্বনি 'dh' না হয়ে 'দ' হয়েছে।

ভার্নারের সূত্রটি সংক্ষেপে এইরকম—

যদি অব্যবহিত পূর্বধ্বনিতে শ্বাসাঘাত না পড়ে তবে শব্দের মধ্যে বা শেষে অবস্থিত আন্তঃস্বরীয় অঘোষ মহাপ্রাণ উষ্মধ্বনি ঘোষমহাপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়।

ধ্বনি সূত্রের সাহায্যে লুপ্ত শব্দের পুনর্গঠন :

গ্রীমের ধ্বনিসূত্র ও তার পরিপূরক গ্রাসমান ও ভার্নারের সূত্রের সহায়তায় লুপ্ত শব্দের পুনর্গঠন সম্ভব হয়। একটি শব্দ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যায়। চতুর্থ শতকে প্রাপ্ত একটি গথিক শব্দ 'fadar'। প্রত্ন জার্মানে শব্দটি সম্ভবত ছিল 'fader'। কারণ অন্য ভাষায় যেখানে 'er', গথিকে শ্বাসাঘাতের অভাবে সেখানে 'ar' হয়। এখন দেখতে হবে 'fader' শব্দটি মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় কি ছিল।

সূত্র অনুসারে জার্মান ভাষার 'f' = ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা 'p' (সংস্কৃত পিতা, গ্রিক Pater)। দ্বিতীয় ধ্বনি সম্ভবত হ্রস্ব অ (১)। কারণ ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষায় এটিই বেশি ব্যবহৃত মতো। অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় যেখানে 't' থাকে সেখানে জার্মান ভাষায় 'θ' হয়, কিন্তু এখানে ধ্বনিটি শ্বাসাঘাতহীন স্বরধ্বনির পর আসার ভার্নারের সূত্র অনুযায়ী জার্মান ভাষায় 'θ' না হয় 'd' হওয়ার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় আর 'θ' বিকল্প 'd' ইন্দো-ইউরোপীয়তে নিশ্চিতভাবে 't' হবে। অন্যান্য সমশব্দ থেকে স্পষ্ট হয় শেষ দুটি ধ্বনি নিশ্চিতভাবে 'e' ও 'r'। তাই মূল ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দটির পুনর্গঠিত রূপ কল্পনা করা যায় 'pdter'।

৩.১.২.১১ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। ইউরোপে প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভাষাচর্চার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। আধুনিক পাশ্চাত্য ভাষাচর্চা পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বে ভারতে যে ব্যাকরণ চর্চা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো ঃ পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, ভর্তৃহরি।

৪। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করো।

৫। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতির সঙ্গে কালক্রমিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতি ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব পদ্ধতির সম্পর্ক ও পার্থক্য আলোচনা করো।

৬। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতির উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লেখো।

৭। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতির উদ্ভবের সঙ্গে কলকাতার সম্পর্ক কী? এই পদ্ধতির চারজন বিজ্ঞানীর নাম ও তাঁদের গ্রন্থের নামের বাংলা অর্থ লেখো।

৮। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় কী কী পর্ব আছে? পর্বগুলির অধ্যয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে বলো।

৯। টীকা লেখো : ঐতিহাসিক পর্ব, প্রাগৈতিহাসিক পর্ব।

১০। আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন পদ্ধতি বলতে কী বোঝো দৃষ্টান্তসহ লেখো।

১১। টীকা লেখো : 'ল্যারিংজিয়াল হাইপোথেসিস্', গ্রাসমানের সূত্র।

১২। বাহ্যিক পুনর্গঠন বা তুলনামূলক পুনর্গঠন [External Reconstruction or Comparative Reconstruction] পদ্ধতি কি আলোচনা করো।

১৩। টীকা লেখো—‘সম্পর্কিত ভাষা’, ‘সহোদর শব্দ’।

১৪। গ্রীমের সূত্রটি আলোচনা করো। এই সূত্রে কি ধরনের ব্যতিক্রম দেখা যায়?

১৫। ‘গ্রাসমানের সূত্র’ ও ‘ভার্নারের সূত্র’ দুটি লেখো। এগুলির প্রয়োজনীয়তা কি ছিল?

১৬। ধ্বনিসূত্রের সাহায্যে লুপ্ত শব্দের পুনর্গঠনের উদাহরণ দাও।

৩.১.২.১২ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। আজাদ, হুমায়ুন : তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান।

২। Lehmann, Winfred P : Historical Linguistics.

৩। Arlotto, Anthony : Introduction to Historical Linguistics.

৪। Giles, P : A short Manual of Comparative Philology.

একক - ৩

ভাষা-সংযোগ ও ভাষাঋণ

বিন্যাস ক্রম :

৩.১.৩.১ : ভাষা-সংযোগ (Language-Contact)

৩.১.৩.২ : ভাষাঋণ (Borrowing)

৩.১.৩.৩ : ভাষাঋণের কারণ

৩.১.৩.৪ : ভাষাঋণের শর্তসমূহ

৩.১.৩.৫ : ভাষাঋণের প্রকারভেদ (Kinds of Borrowing)

৩.১.৩.৬ : প্রক্রিয়া অনুসারে ভাষাঋণ

৩.১.৩.৭ : উপাদানগত বিচারে ভাষাঋণের প্রকারভেদ

৩.১.৩.৮ : ভাষাঋণ বিচারের ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব

৩.১.৩.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩.১.৩.১০ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩.১.৩.১ : ভাষা-সংযোগ (Language-Contact)

যদি কোনো কারণে একটি ভাষা অন্য একটি ভাষার সংস্পর্শে এসে একে অপরের উপর এমন প্রভাব ফেলে যে সেই সব ভাষাভাষী মানুষ সচেতন বা অসচেতনভাবে নিজ নিজ ভাষায় অপর ভাষাটির উপাদান ব্যবহার করে বা উচ্চারণভঙ্গি গ্রহণ করে তবে বুঝতে হবে ভাষা-সংযোগ ঘটেছে।

ভাষা-সংযোগ বিভিন্ন কারণে ঘটতে পারে। দুটি ভাষাভাষী গোষ্ঠীর মানুষ প্রান্ত এলাকায় একে অপরের সংস্পর্শে স্বাভাবিক নিয়মেই আসে। তখন ভাষা দুটির পারস্পরিক প্রভাব পড়ে, ভাষা-সংযোগ ঘটে। এক ভাষাভাষীর মানুষ অন্য এক ভাষাভাষী গোষ্ঠীকে পরাভূত করে সেখানে আধিপত্য বিস্তার করলে ভাষা-সংযোগ সম্ভব হয়। একটি ভাষা সম্প্রদায় কোনো কারণে উদ্বাস্তু হয়ে অন্য ভাষা এলাকায় বসতি স্থাপন করলে তাদের ভাষার সঙ্গে নতুন এলাকার ভাষার সংযোগ অবশ্যম্ভাবী হয়। ব্যবসায়িক কারণেও দুটি ভাষার সংযোগ ঘটতে পারে। আধুনিক কালে গণমাধ্যমও ভাষার সঙ্গে ভাষার সংযোগ ঘটাচ্ছে। এছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোনো মানুষ তার কথোপকথনে মাতৃভাষার সঙ্গে তাঁর শেখা ভাষার সংযোগের প্রতিফলন ঘটাতে পারে।

ভাষা-সংযোগের ফলাফল মামুলি পর্যায় থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। সাধারণভাবে এক ভাষাভাষী মানুষ সংযোগে আসা ভাষা থেকে সাধারণস্তরে কিছু সংখ্যক শব্দ ঋণগ্রহণ করে। এসবকে বলে ভাষাঋণ (borrowing); এবং যে সব শব্দ গ্রহণ করা হয় সেগুলিকে বলে ঋণ শব্দ (Loan words)। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয় এমন বিষয় বা বস্তুর নাম, যে বিষয় বা বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ পরিচিত ছিল না। যেমনভাবে বাংলা ভাষী মানুষ ইংরেজি ভাষা থেকে পেয়েছে ট্রেন, স্টেশন, কম্পিউটার প্রভৃতি। আবার কোনো ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ অন্য একটি প্রভাবশালী ভাষার শব্দ ব্যবহার করে নিজের গুরুত্ব

ও সম্মান বৃদ্ধি করতে চায়। এভাবেও 'শব্দঋণ' ঘটে থাকে। যেমন হয়েছিল নর্মানদের ইংল্যান্ড জয়ের পর। প্রাচীন ইংরেজি শব্দকে স্থানচ্যুত করে এভাবেই হাজার হাজার নর্মান-ফ্রেঞ্চ শব্দ স্থান করে নেয়। যেমন 'army' শব্দটি দেশীয় ইংরেজি শব্দ 'here' কে সংশ্লিষ্ট অর্থ প্রকাশক ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত করেছে। কিংবা 'andwhta'-কে সরিয়ে দিয়েছে 'face'।

কিন্তু সংযোগের প্রভাব আরো অনেক গভীর হতে পারে। এমনকি ভাষার ব্যাকরণ এবং উচ্চারণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। যেমন, 'কেলটিক' ভাষা পরিবারের 'ব্রেটন' ভাষায় ফরাসি ভাষার প্রভাবে অলিজিহ্বা ধ্বনি (uvular sound) 'r' এসেছে এবং নিজস্ব মূলধ্বনি (phoneme) 'h' হারিয়েছে। কারণ ফরাসি ভাষায় 'r' আছে, 'h' নেই। গঠনগত পরিবর্তনেরও অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। ইথিওপিয়ার সেমেটিক ভাষাগুলির মধ্যে অনেকগুলির ক্রিয়া (verb)-কর্তা (subject)-কর্ম-(object)-বাক্যের এই নিজস্ব ক্রম বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়েছে পার্শ্ববর্তী 'কুশীয়' (cushitic) ভাষাসমূহের প্রভাবে। 'কুশীয়' ভাষায় বাক্যক্রম-কর্তা (subject)-কর্ম (object)-verb (ক্রিয়া)।

ভাষা সংযোগের ফলে অনেক সময় 'মিশ্রভাষা' (Mixed Language) সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রধানত ইংরেজি ভাষা ও অল্প পরিমাণে স্পেনীয় ও পর্তুগিজ ভাষার উপাদান মিশ্রিত হয়ে মিশ্রভাষা বীচ-লা-মার সৃষ্টি হয়েছে। ইংরেজি ও চিনা ভাষার মিশ্রণে নতুন ভাষা হয়েছে 'পিজিন'। অবশ্য সব সময় মিশ্রভাষার সৃষ্টি হয় না। আসতে পারে দ্বি-ভাষিকতা (Billingualism), বহুভাষিকতা (multi-lingualism)।

পৃথিবীর প্রায় সব ভাষা, তা প্রাচীন বা আধুনিক যে কালেই হোক, অন্য কোনো ভাষার সংযোগের চিহ্ন বহন করে। এমনও দেখা যায়, এক চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে ভাষা-সংযোগের কারণে একটি ভাষা তার নিজস্ব ভাষাভাষীদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে। তারা মাতৃভাষা ছেড়ে প্রভাবশালী ভাষাটি গ্রহণ করেছে। এই ভাষা পরিবর্তনের কারণে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর ভাষাটি লোপ পায়। একেই ভাষামৃত্যু (Language death) বলে। যেমন, কেলটিক শাখার 'কর্নিশ' ভাষাটি লুপ্ত হয়েছে। ভাষাভাষীরা গ্রহণ করেছে ইংরেজি ভাষা।

৩.১.৩.২ : ভাষাঋণ (Borrowing)

য়্যাকব গ্রীমের ধ্বনিসূত্রের পরিপূরক রূপে গ্রাসমান ও ভার্নারের সূত্র নির্মিত হওয়া সত্ত্বেও গ্রীমের সূত্রের সব ব্যতিক্রমগুলি ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব হয়নি। নব্যব্যাকরণবিদেরা ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সেই সব ব্যতিক্রমের পুনর্বিচারে ভাষাঋণ (borrowing) এর দিকে দৃষ্টি দেন।

যখন দুটি ভাষাভাষী গোষ্ঠী কোনো কারণে একে অপরের সংস্পর্শে আসে তখন স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে একটি ভাষা অন্য ভাষা থেকে উপাদান গ্রহণ করে যদি স্বীকরণ করে নেয় তবে সেই প্রক্রিয়াকে ভাষাঋণ (borrowing) বলে। এই প্রক্রিয়ায় যে ভাষা থেকে উপাদানটি গ্রহণ করা হয় তাকে দাতা ভাষা (donor language) এবং যে ভাষা উপাদানটি গ্রহণ করে তাকে গ্রহীতা ভাষা (borrowing language) বলে। যে উপাদানটি গ্রহণ করা হয় তাকে গৃহীত আদর্শ (model) বলে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে 'ঋণ' বা 'দান' শব্দটিতে অনেকে আপত্তি জানিয়েছেন। যেমন ভাষাবিজ্ঞানী হগেন। কারণ হিসেবে তিনি জানিয়েছেন, এই উপাদান গ্রহণের ক্ষেত্রে উত্তমর্ণের সম্মতির প্রয়োজন হয় না, সে ভাষার কোনো ক্ষতি হয় না, বা ঋণ পরিশোধের কোনো ব্যাপার থাকে না। কিন্তু অন্য বিষয়ে ঋণের ক্ষেত্রে এই দিগগুলির কোনোটি কোনোটি থাকে।

৩.১.৩.৩ : ভাষাঋণের কারণ

দুটি ভাষাভাষী গোষ্ঠী ভৌগোলিক অবস্থানের কারণ, ব্যবসায়িক সূত্রে, সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে, রাজনৈতিক কারণে পরস্পরের সংযোগে আসতে পারে। তখন একটি ভাষা থেকে অন্য ভাষাটি নিজের ঘাটতি পূরণের জন্যে, মানোন্নয়নের জন্যে ভাষাঋণ করতে পারে। অনেকক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত সহজে উচ্চার্য, সমার্থক উপাদান গ্রহণের কারণেও ভাষাঋণ হয়। অনেকক্ষেত্রে একটি ভাষার কোনো কোনো শব্দ বহু ব্যবহারের কারণে ক্লিশে হয়ে যায়। তখন তার বিকল্প পেতে ভাষাঋণ একটি প্রধান উপায়। যেমন, 'দাবি' ব্যবহার না করে 'demand' বা 'claim' শব্দ বাংলাভাষীদের প্রায়ই বলতে শোনা যায়।

৩.১.৩.৪ : ভাষাঋণের শর্তসমূহ

প্রথমত : ভাষাঋণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ভাষা সংযোগ। মূলত দুটি ভাষা সংলগ্ন ভৌগোলিক এলাকায় থাকলে ব্যবসায়িক কারণে কিংবা রাজনৈতিক অধিকারের কারণে এক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী অন্য কোনো ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর ভূখণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করলে এই ভাষা সংযোগ হয়। এছাড়া ভাষা সংযোগের অন্যান্য অনেক কারণ আছে। কিন্তু যে ভাবেই হোক, ভাষা সংযোগ ঘটলে তবেই ভাষাঋণ সম্ভব। যেমন, ইংরেজরা প্রথমে ব্যবসায়িক কারণে ও পরে রাজনৈতিক কারণে ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল বলেই বাংলা, হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষার সংযোগে আসে। ফলে ভারতীয় ভাষাগুলি অনেক পরিমাণে এবং অন্যদিকে ইংরেজি এই ভারতীয় ভাষাগুলি থেকে কিছু পরিমাণে ভাষাঋণ গ্রহণ করেছে।

দ্বিতীয়ত : ভিন্ন ভাষা থেকে উপাদান গ্রহণের মনোভাব (motive) ভাষাঋণের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। হকেট মনে করেন এই মনোভাব (motive) সামাজিক সম্মানলাভের এবং অভাব পূরণের কারণে হয়ে থাকে। এছাড়া ভাষায় অভিনবত্ব আনার মনোভাবও এর পিছনে থাকতে পারে। সামাজিক সম্মান লাভের জন্যে বাংলাভাষীরা প্রায়ই ইংরেজি ভাষা থেকে ঋণকৃত ইংরেজি শব্দ বলে। যেমন, আজকাল 'ব্যবসায়ী' পরিচয় না দিয়ে অনেকে 'বিজনেস ম্যান' বলেন। অভাব পূরণের জন্যে বাংলাভাষায় 'রোমান্টিক'-এর মতো ভাববাচক, 'ট্যাক্সি'-র মতো বস্তুবাচক প্রভৃতি শব্দ ইংরেজি ভাষা থেকে ঋণ করা হয়েছে। অভিনবত্ব আনার কারণে বাংলা ভাষায় হিন্দী ভাষা থেকেও শব্দঋণ নেওয়া হয়েছে। যেমন, 'আবহাওয়া'-র স্থানে 'বাতাবরণ', 'অনবরত'-র স্থানে 'লাগাতার' ইত্যাদি।

৩.১.৩.৫ : ভাষাঋণের প্রকারভেদ (Kinds of Borrowing)

ভাষাঋণ প্রধানত দু-ধরনের হতে পারে—অবিমিশ্র ঋণ (Unmixed Borrowing) ও মিশ্র ঋণ (Mixed Borrowing)। কোনো ভাষার উপাদান অবিমিশ্রভাবে অন্যভাষায় গৃহীত হলে তাকে অবিমিশ্র ঋণ বলে। যেমন, 'প্রভিডেন্ট ফান্ড', 'পেনশন', 'ওভারব্রীজ', 'প্ল্যাটফর্ম' ইত্যাদি শব্দগুলি ইংরেজি থেকে অবিকৃতভাবে গৃহীত হয়েছে। সে কারণে এগুলি অবিমিশ্র ভাষাঋণ। আবার, যদি কোনো ভাষায় অন্য ভাষা থেকে উপাদান গ্রহণ করে তার অংশবিশেষের সঙ্গে নিজস্ব উপাদান জুড়ে দেওয়া হয় তবে সে ঋণ প্রক্রিয়াকে মিশ্র ভাষাঋণ (mixed Borrowing) বলে। যেমন, ইংরেজি 'প্রফেসর'-এর সঙ্গে বাংলা 'ঈ' প্রত্যয় যোগ করে বাংলা ভাষার শব্দ হয়েছে 'প্রফেসারী'। কিংবা ফারসি উপাদান 'ফি' সংযোগে বাংলায় 'ফি-বছর' শব্দ ইত্যাদি। এই ধরনের শব্দগুলি ভাষার সঙ্কর শব্দ (Hybrid word) রূপে চিহ্নিত।

৩.১.৩.৬ : প্রক্রিয়া অনুসারে ভাষাঋণ

এছাড়া কোনো প্রক্রিয়ায় উপাদান গ্রহণ করা হয়েছে সেই বিচারেও ভাষাঋণের শ্রেণিকরণ করা যায়।

(১) **প্রত্যক্ষ ঋণ** (Direct Borrowing) : এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় উপাদান যখন সরাসরি অবিকৃতভাবে গৃহীত হয় তখন তাকে প্রত্যক্ষ ঋণ বলে। যেমন, 'ইউক্যালিপটাস', 'রেল', 'ফুটবল' ইত্যাদি শব্দগুলি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় প্রত্যক্ষ ঋণ।

(২) **সাহজিক ঋণ বা আত্মস্থীকৃত ঋণ** (Naturalised or Adopted Loan) : এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় উপাদান যদি এমনভাবে গৃহীত হয় যে উপাদানটি দ্বিতীয় ভাষার গঠন প্রকৃতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়ে যায়, তার প্রকৃত স্বরূপটিও বোঝা না যায়, তবে তাকে সাহজিক ঋণ বা আত্মস্থীকৃত ঋণ (Naturalised or Adopted Loan) বলে। এই ধরনের উপাদানগুলিকে তখন গ্রহণকারী ভাষার নিজস্ব শব্দ বলে মনে হয়। যেমন, ইংরেজি 'Lord' > বাংলা 'লাট', ইংরেজি 'Hospital' > বাংলা-হাসপাতাল, ইংরেজি 'sentry' > বাংলা-'সান্ত্রী' ইত্যাদি।

(৩) **অনূদিত ঋণ** (Loan translation) : অনেক সময় একটি ভাষা থেকে আরেকটি ভাষা শুধুমাত্র শব্দ নয়, শব্দগুচ্ছ বা বাক্যাংশ, এমনকি বাক্যকে পর্যন্ত প্রথম ভাষার গঠনরীতির অনুসরণে নিজস্ব উপাদানের সাহায্যে অনুবাদ করে নেয়। ফলে এমন হয়, মূল উপাদানটি গ্রহণকারী ভাষারই হয়, কিন্তু গঠনরীতিটি হয় প্রদানকারী ভাষার। এই ধরনের ঋণকে অনূদিত ঋণ বলে। যেমন, ইংরেজি 'wrist-watch' থেকে 'হাতঘড়ি', ইংরেজি 'University' থেকে 'বিশ্ববিদ্যালয়', 'টেলিফোন' থেকে 'দূরভাষ' ইত্যাদি শব্দ বাংলা ভাষায় অনূদিত ঋণ।

(৪) **অর্থ পরিবৃত্তি** (Loanshift) : যখন কোনো ভাষা অন্য একটি ভাষার নতুন কোনো জিনিস বা ভাববিষয়ক শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং তা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বোঝে, তখন যদি গ্রহীতা ভাষা দাতা ভাষার শব্দটি গ্রহণ না করে নিজস্ব কোনো অপ্রচলিত বা পুরানো শব্দকে তার বর্তমান অর্থ থেকে বিচ্যুত করে নতুন জিনিস বা ভাবটি প্রকাশের প্রয়োজনে ব্যবহার করে তবে সেই প্রক্রিয়াকে অর্থপরিবৃত্তি বলে। যেমন, 'Radio' বস্তুটির প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ 'আকাশবাণী'-র মূল অর্থ 'দৈববাণী'-কে গুরুত্বহীন করে দিয়ে 'রেডিও' অর্থে প্রয়োগ করেছেন। একইভাবে 'Citizen' অর্থে, নাগরিক, 'Chancellor' অর্থে 'আচার্য' ইত্যাদি।

(৫) **উচ্চারণ ঋণ** (Pronounciation Borrowing) : যখন একটি ভাষার কোনো উপাদানের উচ্চারণ ভঙ্গি অনুসরণে আরেকটি ভাষার একই অর্থপ্রকাশক উপাদানের উচ্চারণ পরিবর্তিত হয় তখন তাকে উচ্চারণ ঋণ বলে। অর্থাৎ দাতা ভাষার উপাদানটি ঋণ করা হয় না, কেবলমাত্র তার উচ্চারণ ভঙ্গিটি ঋণ করা হয়। যেমন, 'সংস্কৃত' শব্দটি ইংরেজি ভঙ্গিতে অনেক সময় উচ্চারণ করা হয় 'স্যাংস্কৃৎ'। এটি উচ্চারণ ঋণের দৃষ্টান্ত। 'রায়' পদবীকে 'রয়', 'বর্ধমান'-কে 'বার্ডওয়ান', 'মেদিনীপুর'-কে মিড্‌নাপুর' উচ্চারণ ইত্যাদিতে আছে ইংরেজি উচ্চারণভঙ্গি। তাই এগুলিও উচ্চারণ ঋণ।

৩.১.৩.৭ : উপাদানগত বিচারে ভাষাঋণের প্রকারভেদ

যে-কোনো ভাষা ধ্বনি থেকে বাক্য, শব্দসম্ভার থেকে সম্পূর্ণ ব্যাকরণগত কাঠামোতে যেমন তার পূর্ববর্তী ভাষাস্তরের উত্তরাধিকার থাকে তেমনি থাকে অনেক কৃতঋণ উপাদান। এই কারণে ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান থেকে বৃহত্তর উপাদান পর্যন্ত বিচার করে ভাষাঋণের প্রকারভেদ করা যায়। যথা—

(১) **শব্দগত ঋণ** : ভাষার উপাদানগুলির মধ্যে শব্দগত ঋণই সবচেয়ে বেশি। পূর্ব আলোচনায় তার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। এই শব্দগত ঋণ বিভিন্ন পথে হতে পারে :

(ক) সাংস্কৃতিক শব্দঋণ : এক ভাষাগোষ্ঠী অন্য ভাষাগোষ্ঠীর দ্বারা সাংস্কৃতিক বিষয়ে প্রভাবিত হলে সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শব্দও গ্রহণ করে। একেই সাংস্কৃতিক শব্দঋণ বলে। যেমন, বাংলায় ইউরোপীয় বিশেষত ব্রিটিশ সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলা ভাষায় এসেছে বেশ কিছু ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক শব্দ। যেমন, আধুনিক যান্ত্রিক উপাদানের নাম শব্দ—টেলিভিশন, টেলিফোন ইত্যাদি। প্রশাসনিক শব্দ—মিনিস্টার, অ্যাডভোকেট, মেয়র ইত্যাদি। ধর্মীয় শব্দ—চার্চ, বিশপ, ব্যাপটাইজ ইত্যাদি।

(খ) জ্ঞান জাগতিক শব্দ ঋণ : যে সব শব্দ বিদ্যাচর্চার প্রয়োজনে খুব সচেতনভাবে একটি ভাষা থেকে অন্য একটি ভাষায় গৃহীত হয় সেই শব্দগুলিকে জ্ঞান জাগতিক শব্দঋণ (Learned Words Loan) বলে। বিশেষত বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দগুলি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। যেমন—'হাইড্রোজেন', 'প্রোটন', 'ইলেকট্রন' ইত্যাদি। এছাড়া 'স্যোসালিজম্', 'অ্যানথ্রোপলজি' ইত্যাদি শব্দও এই শ্রেণির। এই ধরনের ঋণকৃত শব্দ সাধারণত সাধারণ মানুষ ব্যবহার করে না।

(২) **ধ্বনিগত ভাষাঋণ** : একটি ভাষা যদি অন্য কোনো ভাষা থেকে মূলধ্বনি (phoneme), যুক্তধ্বনি, এমনকি ধ্বনি ব্যবহার বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে তবে সেই বিষয়টিকে ধ্বনিগত ভাষাঋণ বলে। এ ধরনের ঋণগ্রহণ খুব বেশি হয় না। তবে দৃষ্টান্ত যে দুর্লভ তা নয়। যেমন, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় এক সময় মূর্ধণ্যধ্বনি ছিল না। পরে অন্য ভাষা বাংলা থেকে ধ্বনিটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় গৃহীত হয়। ইংরেজিতে 'sk'—এই যুক্তব্যঞ্জনটি পূর্বে ছিল না। পরে স্ক্যান্তিনেভিয়ান ভাষা থেকে এই যুক্তব্যঞ্জনটি এসেছে। কোনো দেশের সরকারি প্রধান ভাষার ধ্বনি বৈশিষ্ট্য অপ্রধান ভাষার উচ্চারণরীতিতেও সহজেই এসে যায়। যেমন, হিন্দী ভাষার উচ্চারণ ভঙ্গিতে বাংলা ভাষার 'বন্ধ' হয়ে যায় 'বন্ধ্'।

ধ্বনিগত ঋণের ক্ষেত্রেও দেখা যায় ঋণ অধমর্ণ ভাষার কতকদের সব স্তরে সমানভাবে হয় না। কথকদের মধ্যে যারা শিক্ষিত ও উচ্চারণে দক্ষ তারা একরকমভাবে আর যারা অশিক্ষিত বা অদক্ষ তারা নিজের মতো করে ঋণগ্রহণ করে। যেমন, ইংরেজি 'violin' শব্দটি জাপানি ভাষী ইংরেজি জানা লোক বলে 'vairin'। যদিও তাদের নিজস্ব জাপানি ভাষায় 'v' ধ্বনিটি নেই। আর যারা কম শিক্ষিত লোক তারা 'v'-র পরিবর্তে হয় 'w' বা 'b' ব্যবহার করে। শব্দটি তারা উচ্চারণ করে 'wairoin' বা 'baiorin'।

(৩) **রূপগত ভাষাঋণ** : রূপগত ভাষাঋণও পরিমাণে কম দেখা যায়। রূপগত ভাষাঋণ বলতে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ ইত্যাদি গ্রহণকে বোঝানো হয়। বাংলা ভাষায় এমন ধরনের ঋণ সহজেই দেখা যায়। 'আনা', 'গর', 'দান', 'বাজ' ইত্যাদি প্রত্যয়গুলি ফারসি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে।

(৪) **বাক্যগত ভাষাঋণ** : বাক্যগঠনে কোনো একটি ভাষার বিশেষ রীতি যদি আরেকটি ভাষায়-প্রভাব ফেলে বা সম্পূর্ণ গৃহীত হয় তবে তাকে বাক্যগত ভাষাঋণ বলা যায়। যেমন, ইথিওপিয়ার সেমেটিক ভাষাগুলির কোনো কোনোটির বাক্যগঠনের (ক্রিয়া-কর্তা-কর্ম) নিজস্ব পদ্ধতি পার্শ্ববর্তী কুশীয় (cushitic) ভাষাসমূহের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। উনিশ শতকের বাংলা বাক্যের গঠনে ইংরেজি বাক্যগঠন প্রণালীর প্রভাব স্পষ্ট। পরে তা কমে এলেও সে প্রভাব থেকে মুক্তি ঘটেনি। 'এবং' দিয়ে বাক্যের আরম্ভ, অব্যয় পদকে ক্রিয়ার পরে বসানো, ইংরেজির মতো খণ্ডবাক্য (clasue) সজ্জাপ্রয়োগ—এসব বাক্যগত ভাষাঋণের নিদর্শন।

৩.১.৩.৮ : ভাষাঋণ বিচারের ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব

ভাষাঋণের নিদর্শন সূত্রে ভাষাতত্ত্বগত এবং ঐতিহাসিক অনেক সিদ্ধান্তে আসা যায়। বিশেষত যে সব ক্ষেত্রে 'অন্তরঙ্গ ভাষাঋণ' (intimate borrowing) হয়। 'অন্তরঙ্গ ভাষাঋণ' বলতে বোঝায় একই ভৌগোলিক ভূখণ্ডে বসবাসকারী এবং একই শাসনাধীন জনসম্প্রদায়ের এক ভাষাগোষ্ঠী থেকে অন্য ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাঋণ। এই ধরনের ভাষাঋণে অনেক সময় ক্ষমতাশালী বা রাজভাষাটি (upper language) অধীনস্থ ভাষাগোষ্ঠীর (lower language) ভাষা হয়ে যায়। আর অধীনস্থ ভাষাটি লুপ্ত হয়ে যায়। ক্ষমতাশালী ভাষাটিতে অধীনস্থ ভাষার বেশ কিছু চিহ্নও থেকে যায়। একারণেই আমেরিকার ইংরেজিতে লুপ্ত হয়ে যাওয়া একাধিক রেড ইন্ডিয়ান ভাষার ছাপ থেকে গিয়েছে। বিশেষত স্থান নামে। যেমন—ম্যাসাচুসেট্‌স, মিচিগান, চিকাগো প্রভৃতি। কেলটিকদের ভূখণ্ড ইংরেজরা অধিকার করলে তাদের অধিকাংশ লোক ইংরেজি ভাষা গ্রহণ করে। কিছু কেলটিক ভাষা লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু বেশ কিছু স্থান-নামে কেলটিক শব্দ থেকে গিয়েছে। যেমন, লন্ডন, টেমস্‌, ডোভার প্রভৃতি। এইসব ভাষাঋণের সূত্রে ভাষাবিজ্ঞানীরা লুপ্ত ভাষাগুলির প্রকৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারেন। ভাষাগুলির লুপ্তিকাল নির্ণয় করতে পারেন। ভাষা সংযোগের কালও নির্ণয় করতে পারেন। আবার হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতির পরিচয়, বিভিন্ন জিনিসের ব্যবহার শুরুর ইতিহাসও জানা যেতে পারে। যেমন, ইংরেজরা কেলটিক ভাষীদের সংস্পর্শে এসে 'Cake' শব্দটি পেয়েছে। সিদ্ধান্ত করা যায় তার পূর্বে ইংরেজরা 'Cake' ব্যবহার করত না।

'অন্তরঙ্গ ভাষাঋণ' ছাড়াও দুটি ভাষা এলাকার সংলগ্নতা বা দুটি ভাষার ব্যবসায়িক রাজনৈতিক সম্পর্কেও ভাষাঋণ হয়। যদিও তাতে 'অন্তরঙ্গ ভাষাঋণ' এর মতো ভাষা লোপ করে দেবার ঘটনা সাধারণত ঘটে না। তবে এই ধরনের ভাষাঋণ বিচার করে কোনো ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে কোনো ভাষাগোষ্ঠীর সম্পর্ক নিকট, কোন্ কোন্ ভাষার সংযোগ বেশি ছিল বা আছে, তা বোঝা যায়। যেমন, বাংলা ভাষায় তামিল ভাষার চেয়ে হিন্দী ভাষা থেকে ভাষাঋণ অনেক বেশি। এর থেকে অনুধাবন করা যায় বাংলা ও হিন্দী ভাষার সংযোগ এবং আদানপ্রদান বাংলা ও তামিল ভাষার মধ্যে সংযোগ এবং আদানপ্রদানের চেয়ে বেশি। এই সমস্ত প্রকৃতির ভাষাঋণ থেকেই ভাষাগুলির আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক নিয়ে সিদ্ধান্তে আসা যায়। একভাষা থেকে আরেক ভাষায় নিয়মিত ধ্বনি পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

৩.১.৩.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'ভাষা-সংযোগ' কী আলোচনা করো।

২। টীকা লেখো—'মিশ্রভাষা', 'ভাষামৃত্যু', 'শব্দঋণ', ভাষা-সংযোগে ভাষার গঠনগত পরিবর্তন।

৩। প্রক্রিয়াগতভাবে ভাষাঋণ কত প্রকারের দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করো।

৪। টীকা লেখো : প্রত্যক্ষ ঋণ, আত্মস্থীকৃত ঋণ, অনূদিত ঋণ, অর্থ পরিবৃত্তি, উচ্চারণ ঋণ।

৫। উপাদানগতভাবে ভাষাঋণ কতপ্রকার আলোচনা করো।

৬। টীকা লেখো : শব্দগত ঋণ, ধ্বনিগত ঋণ, রূপগত ঋণ, বাক্যগত ঋণ।

৭। ভাষাঋণ বিচারের ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা করো।

৮। টীকা লেখো : 'অন্তরঙ্গ ভাষাঋণ', ভাষাঋণের বিচারে ভাষা সংযোগের সিদ্ধান্ত।

৩.১.৩.১০ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। আজাদ, হুমায়ুন : তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান।

২। Lehmann, Winfred P : Historical Linguistics; An Introduction.

৩। Arlotto, Anthony : Introduction to Historical Linguistics.

৪। Giles, P : A short Mankal of Comparative Philogy.

৫। Hagun, Einar : Analysis of Linguistic Borrowing; Collected in the P Ecology of Language.

৬। Ullmann, Stephen : The Principals of Semantics.

একক - ৪

পৃথিবীর ভাষাবংশসমূহ্

বিন্যাস ক্রম :

৩.১.৪.১ উৎস ও শ্রেণিবিভাগ

৩.১.৪.২ ভাষাবংশ সমূহের বি(-ষণ
৩.১.৪.২.১ প্রস্তাবনা

৩.১.৪.৩ বৈশিষ্ট্য

৩.১.৪.৪ শ্রেণিবিভাগ

৩.১.৪.৫ ধ্বনিতালিকা (স্বর, অর্ধস্বর, অর্ধব্যঞ্জন, ব্যঞ্জন)

৩.১.৪.৬ ধ্বনিপরিবর্তনের সূত্র

৩.১.৪.৭ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের গু(ত্ব

৩.১.৪.৮ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশকে আর্য বলার কারণ

৩.১.৪.৯ আদর্শ প্র(্নাবলি

৩.১.৪.১০ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩.১.৪.১ : পৃথিবীর ভাষাবংশসমূহের উৎস ও শ্রেণিবিভাগ

ভাষা মানুষের পরম সম্পদ। এই ভাষার মাধ্যমে মানুষ তার ব্যক্তি(ক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবের আদানপ্রদান ঘটায়। সারা পৃথিবীতে মোট ভাষার সংখ্যা প্রায় ছয় থেকে সাত হাজারের মতো। তবে সঠিক সংখ্যা কত তা বলা সম্ভব নয়। পৃথিবীর এই সমস্ত ভাষাকে তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে (শব্দ, ধাতুরূপ ও ধ্বনিরূপ) বিভাজিত করা হয়। যেমন— অশ্রেণিবদ্ধ ভাষা ও শ্রেণিবদ্ধ ভাষা।

পৃথিবীর যে সমস্ত ভাষার মধ্যে শব্দ, শব্দভাণ্ডার, ধ্বনিরূপ, ধাতুরূপগত সাদৃশ্য থাকে তাদের শ্রেণিবদ্ধ ভাষা বলা হয়। আর অশ্রেণিবদ্ধ ভাষাগুলির মধ্যে কোনও সাদৃশ্য নেই।

শ্রেণিবদ্ধ ভাষাগুলিকে বেশ কিছু ভাষাবংশে বিভক্ত(করা হয়েছে। যেমন—

(ক) ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo-European)

(খ) সেমীয়-হামীয় (Semito-Hamitic)

(গ) বান্টু (Bantu)

(ঘ) ফিন্নো-উগ্রীয়/উরালীয় (Finno-ugrian)

(ঙ) তুর্ক-মঙ্গল-মাঞ্চু (Turko-Mongol-Manchu)

(চ) দ্রাবিড় (Dravidian)

(ছ) অস্ট্রিক (Austick)

(জ) ভোট চিনীয় (Tibetan-Chinese)

(ঝ) ককেশীয় (Cucasian)

(এ() উত্তর পূর্ব-সীমান্তীয় (Hyperborean)

(ট) এসকিমো (Eskimo)

(ঠ) আমেরিকার আদিম ভাষা (American Indian Language)

এ ছাড়াও কিছু অপ্রধান ভাষাবংশ আছে। সেগুলি হল—

ক. লা-তি (La-ti)

খ. পাপুয়ান (Papuan)

গ. আন্দামানী (Andamani)

ঘ. তাসমানি (Tasmanian)

ঙ. বুশম্যান, হটেনটন্ট ইত্যাদি।

৩.১.৪.২ : ভাষাবংশ সমূহের বি(েষণ

ইন্দো-ইউরোপীয়

৩.১.৪.২.১ প্রস্তাবনা

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাবংশের মধ্যে সর্বাপে(া উল্লেখযোগ্য ইন্দো-ইউরোপীয়। শুধু ভৌগোলিক বিস্তারেই নয়, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিতে এই ভাষাবংশের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাগুলি পৃথিবীতে প্রাধান্যলাভ করেছে। বৈদিক সংহিতার মন্ত্র, রামায়ণ-মহাভারত, ইলিয়াড-ওডিসি, কালিদাসের কাব্য নাটকাদি, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের প্রাচীন সাহিত্যকীর্তি। তাছাড়া আধুনিক ভাষার মধ্যে ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি, বাংলা, হিন্দি ইত্যাদি ভাষা। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশেরই অন্তর্গত। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে কতগুলি স্তরের মধ্য দিয়ে ত্র(মবিবর্তনের ধারায় বাংলা ভাষা রূপান্তরিত হয়েছে।

যে মূলভাষা থেকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের উদ্ভব, তা এখনও জানা যায়নি। কারণ মূলভাষাটি বিলুপ্ত। তবে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের প্রাচীন ভাষাগুলি বি(েষণ করলে মূলভাষার স্বরূপ সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। তাছাড়া এই ভাষাবংশের আদি পীঠস্থান সম্পর্কে দুটি মতও প্রচলিত আছে। জানা যায় আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল মধ্য ইউরোপে। অনেকে বলেন দ(িণ রাশিয়ার উরাল পর্বতের পাদদেশে। এই ভাষাবংশের ভাষাভাষী মূলজাতি এখান থেকে পরবর্তীকালে ভারতবর্ষ ও ইউরোপের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। অনুমান করা হয় ২৫০০ খ্রি পূর্বাব্দের কাছাকাছি কোনও সময়ে মূলভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের প্রাচীন ভাষাগুলির জন্ম হয়েছিল।

প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কোনও প্রমাণ বা লিখিত নিদর্শন নেই। প্রধানত তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের সহায়তায় এর একটি যুক্তি(সিদ্ধ আনুমানিক ভাষা কাঠামো গড়ে তোলা যায়।

মনে রাখতে হবে, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারে আছে দুটি প্রধান ভাগ। যথা—

ক. পশ্চিমী ভাগ বা কেন্তুম বর্গ

খ. পূর্ব ভাগ বা সতম্ বর্গ।

পশ্চিম ভাগের ভাষাগুলিতে ১০০ সংখ্যাটিকে কেন্তুম বা মেন্ত শব্দ থেকে উৎপন্ন কোনও শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়। আর সতম বর্গের ভাষাগুলিতে সতম্ বা তদজাত শব্দ ব্যবহার করা হয়। কেন্তুম বর্গে আছে জার্মানিক, গ্রীক, কেলতিক, রোমানিক ইত্যাদি ভাষাগুচ্ছ। আর সতম বর্গের ভাষাগুচ্ছের উল্লেখযোগ্য ভাষাগুলি হল — আর্মেনীয়, আলবেনীয়, বালতো স্লাভিক, ইন্দো-ইরানীয় ইত্যাদি। ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগুচ্ছের একটি প্রধান ভাষা প্রাচীন ইরানীয় ভাষা—আবেস্তান, মধ্য ইরানীয় ভাষা ও নব্য ইরানীয় ভাষা। ইরানীয় শাখার অন্য কতগুলি ভাষাও আছে। যেমন — তাজিক, পুশতু, আজার-বাইজানীয় ইত্যাদি ভাষা। প্রাচীন ভারতীয় আর্য, মধ্য ভারতীয় আর্য বা পালি, প্রাকৃত-অপভ্রংশ, অবহট্ঠ ও নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলি (মারাঠি, সিন্ধি, পঞ্জাবি, হিন্দি) ইন্দো-ইরানীয় থেকেই সৃষ্ট। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের সমৃদ্ধ প্রাচীন ভাষাগুলি হল গ্রিক, সংস্কৃত, লাতিন, গথিক ইত্যাদি। পৃথিবীর প্রাচীনতম নিদর্শন 'ঋগ্বেদ সংহিতা' ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশেরই প্রাচীন নিদর্শন বলে অনেকে মনে করেছেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাবংশের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ। পৃথিবীর উন্নততর ভাষাগুলি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী থেকেই উদ্ভুত। আনুমানিক ২৫০০ খ্রি পূর্বাব্দে দ(ি ণ রাশিয়ার উরাল পর্বতের পাদদেশে এই ভাষার জন্ম। এই ভাষাবংশ থেকে জাত অনেকগুলি আধুনিক ভাষা। যেমন—ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি, ইটালীয়, (শীয়, বাংলা, হিন্দি ইত্যাদি। এই সমস্ত ভাষার সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সমৃদ্ধি বিস্ময়কর। এ ছাড়াও এই ভাষাবংশের মানুষেরা বর্তমানে পৃথিবীতে সংখ্যায় বেশি। এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত(ভাষাগুলি পৃথিবীতে সর্বাধিক প্রচলিত ও উন্নত।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারকে কতকগুলি ভাষার সমন্বয় হিসেবে ধরা হয়। এই পরিবারের ভাষাগুলি এশিয়া থেকে আইসল্যান্ড পর্যন্ত এক বিশাল স্থানে ছড়িয়ে আছে মোটামুটি দশটি শাখায় বিভক্ত(হয়ে এবং এইগুলিই নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আধুনিক ভাষার জন্ম দিয়েছে। এই পরিবারের সদস্য হল— (ক) গ্রীক (খ) জার্মানিক (গ) লাতিনিক (ঘ) বাল্‌তো-স্লাভিক গোষ্ঠী (ঙ) কেল্‌টিক (চ) তুখারীয় (ছ) আরমেনীয় (জ) আলবেনীয় (ঝ) ইন্দো-হিট্টীয় (এ() ইন্দো-ইরানীয়। তবে এই ইন্দো-ইরানীয় শাখা থেকেই উত্তর ও উত্তর পূর্ব ভারতের প্রধান ভাষাগুলির আত্মপ্রকাশ।

মনে রাখতে হবে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারে আছে দুটি প্রধান ভাগ। যথা— (১) পশ্চিমী ভাগ বা কেন্তুম বর্গ ও (২) পূর্ব ভাগ বা সতম্ বর্গ। পশ্চিমী ভাগের ভাষাগুলিতে ১০০ সংখ্যাটিকে কেন্তুম বা সেন্ত শব্দ থেকে উৎপন্ন কোনও শব্দ দিয়ে বোঝানো হয় আর সতম বর্গের ভাষাগুলিতে এ(ে ত্রে সতম বা তদ্‌জাত শব্দ ব্যবহার করা হয়। কেন্তম বর্গের ভাষাগুচ্ছের মধ্যে আছে জার্মানিক, রোমানিক, কেলতিক ও গ্রীক ভাষাসমূহ। আর সতম বর্গের ভাষাগুচ্ছে আছে বালতো-স্লাভিক, আর্মেনিয়, আলবেনীয় ও ইন্দো-ইরানীয়। এই ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগুলিকে দ(ি ণ-পশ্চিম ভাষা বলা হয়। এই গুচ্ছের একটি প্রধান ভাষা হল প্রাচীন ইরানীয় ভাষা আবেস্তান, মধ্য ইরানীয় ভাষা বা পেহলবী ও নব্য ইরানীয় ভাষা বা পারসিয়ান। ইরানীয় শাখার অন্য ভাষাগুলি হল তাজিক, পুশতু, আজার-বাইজানীয় ইত্যাদি। ইন্দো-ইরানীয় থেকে সৃষ্টি অন্য প্রধান ভাষাগুচ্ছের নাম প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা বৈদিক, মধ্য-ভারতীয় আর্য বা পালি, প্রাকৃত-অপভ্রংশ অবহট্ঠ ও নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলি হল মারাঠি, সিন্ধি, পঞ্জাবি, হিন্দি, উর্দু ইত্যাদি।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের সমৃদ্ধ প্রাচীন ভাষা হল গ্রীক, সংস্কৃত, লাতিন, গথিক ইত্যাদি। কেউ কেউ মনে করেন এই বংশের প্রাচীন ভাষায় পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ 'ঋকবেদ সংহিতা' রচিত।

সেমীয়-হামীয়

পশ্চিম এশিয়ার এক গু(ত্বপূর্ণ ভাষা পরিবার হল সেমীয়-হামীয়। এর দুটি শাখা-সেমীয় ও হামীয়। সেমীয় ভাষাগুচ্ছের প্রধান প্রধান ভাষা হল হিব্রু ও আরবি। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট লেখা হয় হিব্রুতে। মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত(আরবি ভাষা। হামীয় ভাষাগুচ্ছের প্রধান ভাষা 'মিশরী'। বর্তমানে লুপ্তভাষা বলা চলে।

অনেক ভাষাতত্ত্ববিদ্ এই সেমীয়-হামীয় ভাষা পরিবারটিকে স্বতন্ত্র বংশে ধরে থাকেন। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের পর এই ভাষা বংশের কথাই বেশি আলোচিত। এই ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষা পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকার উত্তর অংশের নানা স্থানে প্রচলিত থাকায় এর নতুন নামকরণ করা হয়েছে 'এ্যাফ্রো-এশীয়' ভাষা।

বান্টু

দ(ণ আফ্রিকার দুটি প্রধান ভাষা হল জুলু ও বান্টু। আফ্রিকার যেখানে সেমীয়-হামীয় ভাষা প্রচলিত নয়, সেখানে বান্টু ভাষাই প্রচলিত। এই ভাষার গোষ্ঠীভুক্ত(উপভাষার সংখ্যা অনেক। অনেকে মনে করেন জুলু ও বান্টু ভাষাগুচ্ছেরই অন্তর্ভুক্ত(ভাষা সোয়াহিলি, কাফির, লুবা ইত্যাদি।

ফিন্নো-উগ্রীয়

ইউরোপে আরও একটি ভাষা পরিবারের ভাষা ব্যবহৃত। এই পরিবারটির নাম ফিন্নো-উগ্রীয় ভাষা পরিবার। এর অন্তর্ভুক্ত(ভাষাগুলি হল ফিনল্যান্ডের ভাষা ল্যাপ, ফিন্নীয়, এস্তোনিয়ার ভাষা এস্থোনীয়ান ও হাঙ্গেরীর ভাষা হাঙ্গেরীয় ইত্যাদি। এই ভাষাগুলি উরাল ভাষা নামেও পরিচিত।

তুর্ক-মঙ্গল-মাঞ্চু

মধ্য এশিয়ার তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু ভাষা পরিবার বিস্তৃত। এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত(সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভাষা তুর্ক ভাষা। এই ভাষা তুরস্কের জগতাই, মধ্য এশিয়ায় কিরাগজস্থান, উজবেকিস্থান অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। মোঙ্গলিয়ার কিছু অংশে প্রচলিত মোঙ্গল ভাষা ও মাঞ্চুরিয়ায় প্রচলিত মাঞ্চু ভাষা এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত(। এই ভাষা পরিবারকে একসঙ্গে 'উরাল-আলতাই' ভাষাগোষ্ঠীও বলা হয়। তবে এই ভাষা পরিবারের তুর্কী ভাষা 'ওসমানলি' সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা হলেও মঙ্গোলিয়ার খুব অল্পসংখ্যক লোকই 'মঙ্গল' ভাষা ব্যবহার করে। আর 'মাঞ্চু' ভাষার ব্যাপকতা শুধু মাঞ্চুরিয়া ও সাইবেরিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

দ্রাবিড়

দ্রাবিড় ভাষা দ(ণ এশিয়ার একটি গু(ত্বপূর্ণ ভাষা পরিবার। এর মধ্যে প্রধান চারটি অনার্য ভাষা তামিল, তেলেগু, কানাড়ি ও মালায়ালম। এই পরিবারের ছোটো ভাষাগুলি হল টুলু, টুডু ও কুড়্গু। সিংহল ও উত্তরাপথের দু-একটি স্থানে এই দ্রাবিড় ভাষাগুচ্ছের প্রচলন আছে। বেলুচিস্থানের পার্বত্য অঞ্চলে 'ব্রাহুই' ভাষাও এই পরিবারের অন্তর্গত। এ ছাড়া ভারতের অন্যান্য ভাষাতেও দ্রাবিড় ভাষার প্রভাব রয়েছে।

অস্ট্রিক

দ(ণ এশিয়া থেকে দ(ণ-পূর্ব এশিয়া ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হয়ে পলিনেশিয়া, মেলানেশিয়া পর্যন্ত ছড়ানো আর একটি গু(ত্বপূর্ণ ভাষা পরিবারকে বলা হয় অস্ট্রিক ভাষা পরিবার। এই বংশের দুটি শাখা (ক) অস্ট্রো-এশিয়াটিক ও (খ) অস্ট্রোনেসীয়া।

অস্ট্রো-এশিয়াটিকের আবার দুই শাখা— (১) মোন্-খমে্র ও (২) কোল মুণ্ডা। অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগুলির একটি প্রধান ভাষা খাসিয়া। এটি মেঘালয় রাজ্যের প্রধান ভাষা। আর মুণ্ডিক শাখার ভাষা সাঁওতাল, মুণ্ডা ও হো এই শাখারই গু(ত্বপূর্ণ।

অস্ট্রোনেসিয়ান ভাষাগুলিও দুই শাখায় বিভত্ত(। যথা — মেলানেশিয়ান ও মালয়োপলিনেশিয়ান। মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপে মালয়োপলিনেশিয়ান ভাষাগুচ্ছের ভাষাগুলি অবস্থিত। আর মালয়োপলিনেশিয়ান ভাষাগুলি মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও দ(িণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলিতে অবস্থিত। নিউজিল্যান্ডের আদিম উপজাতি মাওরিদের ভাষাও অস্ট্রিক ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুত্ত(।

ভোট চিনীয়

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের পরপরই নাম করতে হয় ভোট চিনীয় ভাষা পরিবারের। ভাষাবিজ্ঞানে এই পরিবারটিকে বলা হয় সিয়ামিজ-চাইনিজ ভাষা। এই পরিবারের তিনিটি শাখার ভাষাগুলি হল—চিনের চিনীয় ভাষা, শ্যামদেশ বা থাইল্যান্ডের সিয়ামিজ ভাষা ও ভারতে প্রচলিত তিব্বতী-বর্মী গোষ্ঠীর বর্মী ভাষা। তবে প্রথম শাখার চিনা ভাষাই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ভাষা। হিমালয়ের পাদদেশে প্রচলিত লেপ্চা, গারো, নাগা, কুকি প্রভৃতি ভাষা ভোট চিনীয় ভাষার অন্তর্ভুত্ত(।

ককেশীয়

ককেশাস পর্বতমালার আশেপাশের ভাষাগুলিকে বলা হয় ককেশীয় ভাষা। এই পরিবারের ভাষাগুলি ছোট ছোট ভাষাগুচ্ছের পরিবার। অনেকে বলেন কৃষ(সাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ককেশীয় ভাষা প্রচলিত। এই পরিবারের প্রধান ভাষার নাম জর্জিয়ান।

উত্তরপূর্ব সীমান্তীয়

বেরিং প্রণালীর আশেপাশে বরফঢাকা উত্তর-পূর্বে হাইপারসবোরিয়ান বা উত্তর-পূর্ব সীমান্তে এই ভাষা পরিবারটি অবস্থিত। এদের মধ্যে প্রধান ভাষা হল চুচকি ভাষা। উত্তর-পূর্ব সীমান্তের খুব কম সংখ্যক লোকই এই ভাষায় কথা বলে।

এসকিমো

চির তুষারাবৃত উত্তর পশ্চিমে ও উত্তর কানাডা, গ্রিনল্যান্ড, উত্তর স্ক্যান্ডিনেভিয়া ও উত্তর (শ দেশের মানুষদের মধ্যে প্রচলিত ভাষাগুলি ‘এসকিমো’ ভাষা পরিবারের অন্তর্গত। বলা যায় গ্রিনল্যান্ড থেকে আলেউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত ভূভাগে এস্কিমো বংশের ভাষাগুলির বিচরণ (ে ত্র।

আমেরিকার আদিম ভাষা

উত্তর ও দ(িণ আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভাষাসমূহ এই ভাষাপরিবারের অন্তর্ভুত্ত(। জানা যায়, আগে আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের একটি নির্দিষ্ট ভাষা ছিল। কিন্তু তাদের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাষা লুপ্ত হয়েছে। তবে ওই আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এখনও যারা টিকে আছে, সেই আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ভাষাগুলি এই ভাষাবংশের অন্তর্ভুত্ত(হয়েছে। এগুলিকে এককথায় বলা হয় আমেরি ইন্ডিয়ান ভাষা পরিবার। এই পরিবারের সদস্য ভাষাগুচ্ছকে আটটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা —

(১) আলগংকীয়ান (Algonquian)

(২) আথাবাসকান (Athabascan)

(৩) ইরোকোয়ীয়ান (Iroquoian)

(৪) মুসকোজীয়ান (Muskogean)

(৫) সিওউয়ান (Siouan)

(৬) পিমান (Piman)

(৭) শোশোনীয়ান (Shoshonean)

(৮) নাহুয়াটলান (Nanhuatlan)

এদের মধ্যে নাহুয়াটলান ভাষার অন্তর্গত ছিল প্রাচীন মেকসিকোর সুউন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভাষা আজটেক। এই সমস্ত ভাষার মধ্যে কিন্তু অনেক ব্যবধান ছিল। যেমন — দ(িণ আমেরিকার উন্নত-সংস্কৃতির বাহক ইনকারদের ভাষার সঙ্গে আজটেকদের ভাষার কোনোরকম মিল ছিল না।

উপরের সমস্ত ভাষা সাদৃশ্যের ভিত্তিতে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু অনেক অশ্রেণিবদ্ধ ভাষাও ছিল। যেমন — ইতালির ভাষা এট্রুস্কান। প্রাচীন কালের ভাষাবিজ্ঞানীরা সাদৃশ্যের অভাবে জাপান, কোরীয়, বাস্ক, বুশম্যান ও হটেন্‌টট ইত্যাদি ভাষাকেও অশ্রেণিবদ্ধ ভাষা বলেছিলেন।

যাই হোক ভারতে প্রচলিত ভাষাগুলিকে প্রধানত চারটি পরিবারে ভাগ করা হয়েছে। যথা—

১। নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহ

২। দ্রাবিড় পরিবারের ভাষাসমূহ

৩। অস্ট্রিক পরিবারের ভাষাসমূহ

৪। তিব্বতী-বর্মী ভাষাগুচ্ছের ভাষাসমূহ।

তিব্বতী-বর্মী ভাষাগুচ্ছটি উত্তর-পূর্ব ভারতের নানা রাজ্যে বসববাসকারী মানুষদের মধ্যে প্রচলিত। এই গুচ্ছে ছোট ছোট অনেক ভাষা আছে, যার মধ্যে প্রধান হল তিব্বতী ভাষা ও মণিপুরী ভাষা। তবে তিব্বতীবর্মী ভাষাগুচ্ছ আসলে সিয়ামিজ চাইনিজ ভাষা পরিবারের অন্তর্গত।

তবে ভাষার এই বংশানুগত শ্রেণিবিভাগ ছাড়াও রূপতত্ত্বানুগত শ্রেণিবিভাগ আছে। এ(েত্রে ভাষাকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা — (১) অসমব্যয়ী বা আইসোলেটিং ও সমবায়ী বা নন আইসোলেটিং। অসমবায়ী শ্রেণির ভাষা হল চিনীয় ভাষা। আবার সমবায়ী ভাষা তিন রকমের। যথা — সর্বসমবায়ী, সমন্বয়ী ও যৌগিক ভাষা। সর্বসমবায়ী ভাষাগুলির মধ্যে ফেলা হয়েছে আমেরিকার আদিম ভাষাগুলি। যৌগিক ভাষাগুলিও দুরকম। যথা — উপসর্গ যৌগিক ও অনুসর্গ যৌগিক। উপসর্গ যৌগিক ভাষাগুলির মধ্যে বান্টুকে ফেলা হয় আর অনুসর্গ যৌগিক ভাষাগুচ্ছের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তামিল ও তুর্কী ভাষা। আর সমন্বয়ী ভাষাগুচ্ছের মধ্যে পড়ে সংস্কৃত, আরবি, হিব্রু, গ্রীক, লাতিন ইত্যাদি ভাষা।

৩.১.৪.৩ : বৈশিষ্ট্য

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের ভাষাগুলি বি(-ষণ করলে নানা বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে —

১. ইন্দো-ইউরোপীয় রূপতত্ত্বের বিচারে (-িষ্ট যোগাত্মক ভাষা।

২. এই ভাষায় শব্দের সঙ্গে প্রত্যয় বিভক্তি(যুক্ত(হত। সে কারণে এই ভাষাকে ‘প্রাত্যয়িক’ ভাষা বলা হয়। তবে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় প্রত্যয়, সঙ্কেত চিহ্(ের দ্বারা ব্যবহার করা হত।

৩. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় প্রত্যয় বহির্মুখী। যদিও আরবি-আদি-সেমিয় হামীয় গোষ্ঠীর ভাষায় প্রত্যয় অন্তর্মুখী।

৪. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল প্রত্যয় - বিভত্তি(র বৈচিত্র্য। এই ভাষাবংশ থেকে একাধিক ভাষা জন্ম নিয়েছে। এই ভাষাগুলি পরবর্তীতে স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করেছে এবং স্বাধীনভাবে প্রত্যয়-বিভত্তি(যুত্ত(করে নিয়েছে। ফলে এই বংশের ভাষাগুলির মধ্যে প্রত্যয়-বিভত্তি(র বিশেষ বৈচিত্র্য ল(করা যায়।

৫. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ধাতুমূলগুলি একা(রযুত্ত(ছিল। ধাতুর সঙ্গে কৃৎপ্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয় বিভত্তি(যুত্ত(হয়ে পদ গঠিত হত। এই পদই বাক্যে ব্যবহৃত হত।

৬. এই ভাষাবংশের ভাষাগুলিতে প্রত্যয়যুত্ত(ধাতুকে শব্দ বলা হত। এই শব্দের সঙ্গে পু(ষবাচক বিভত্তি(যুত্ত(করে পদ গঠন করা হত।

৭. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সমাসবন্ধন। তবে সমাসবদ্ধ শব্দে বিভত্তি(র চিহ্(লুপ্ত হয়েছিল। দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহারও দেখা যেত। যেমন—গ্রীকের উপশাখা ওয়েলস ভাষায় দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার ল(করা যায়।

৮. ধাতুর দ্বিত্বসাধন বা ধাতুর শেষে প্রত্যয় যুত্ত(করাও ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তবে প্রত্যয়গুলি মূলত তিনটি ধ্বনি যোগে গঠিত হয়েছিল।

৯. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় শব্দের আগে উপসর্গ ব্যবহার করা হত। কোনও কোনও (ে ত্রে শব্দের অর্থ পরিবর্তনের জন্য উপসর্গ ব্যবহার করা হত। যেমন—গ্রীক, লাতিন, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষায় উপসর্গ যোগ করে শব্দের অর্থের পরিবর্তন করা হত। তবে শব্দের সঙ্গে উপসর্গ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধযুত্ত(ছিল না।

১০. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল অপশ্রুতি বা স্বরত্র(মের পরিবর্তন। অর্থাৎ গুণবৃদ্ধি সম্প্রসারণ। স্বরত্র(মের এই পরিবর্তন অনেক(ে ত্রে ঘটেছিল। যেমন —

ক. ভাষার প্রস্বর (accent) অপশ্রুতির মূলে ছিল। কিন্তু প্রত্যয় বিভত্তি(লোপ পাওয়ার ফলে শুধু স্বরত্র(মের পরিবর্তনের মধ্যেই প্রস্বরের বিলুপ্তি চিহ্(থেকে গেছে।

খ. শব্দমধ্যে স্বরবর্ণের পরিবর্তন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ঘটেছে। যেমন—‘যজ্’ ধাতু থেকে ‘য(’ ইত্যাদি।

গ. ইংরেজি শব্দেও এই অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ল(করা যায়, যেমন—buy, bought ইত্যাদি।

১১. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় তিন প্রকার পু(ষ ছিল। যথা—উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পু(ষ।

১২. এই ভাষায় বিশেষ্যের কারক ছিল আটটি (সম্বন্ধ পদ ও সম্বন্ধ পদ যোগে)।

১৩. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় লিঙ্গ ছিল তিন প্রকার। তবে লিঙ্গভেদ মূলত সচেতন ও অচেতন ভেদে হত। তাছাড়া কোনও লিঙ্গভেদ ছিল না।

১৪. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় দুটি বাচ্য ছিল। যথা—(ক) আত্মনেপদ। (খ) পরস্মৈপদ। তবে দুটি বাচ্য থাকলেও পাঁচটি ভাব ছিল।

১৫. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ত্রি(য়ার কাল চার প্রকার ছিল। তবে ত্রি(য়ার কাল সময়বাচক ছিল না। কেবল রীতি নির্দেশক রূপেই কাল প্রচলিত ছিল।

এ ছাড়াও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের ভাষাগুলির আরও কতগুলি ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যও আছে। যেমন—

১. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় স্বরধ্বনির সানুনাসিকতা বজায় ছিল না।

২. ণ্, ম্ ইত্যাদি অর্ধব্যঞ্জন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় অন্য কোনও ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আনুনাসিক ব্যঞ্জনের কাজ করেছিল।

৩. এই ভাষায় শব্দ গঠনের জন্য একাধিক ব্যঞ্জক একসঙ্গে যুক্ত হত। তবে মূলস্বর একাধিক থাকলেও, কখনোই তা যুক্ত হয়নি।

৪. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় পৃথক স্বরধ্বনির ব্যবহার অপ্রয়োজনীয় ছিল। যেমন—'Kmtom'

৫. বিভিন্ন প্রকার আদি প্রত্যয় যেমন— শাতৃ-শানচ্ এবং বিভিন্ন প্রকার অসমাপিকা ক্রিয়াও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের ভাষাগুলিতে ব্যবহৃত হত।

৬. সর্বনামের ব্যবহারও এই ভাষায় ছিল। তবে বিশেষণ ও সর্বনামকে আলাদা ভাবে দেখা হয়নি। সর্বনামের মধ্যে বিশেষণকে যুক্ত করা হয়েছিল।

৭. অব্যয়ের পরিবর্তনও এই ভাষায় হয়েছিল। এ ছাড়া বিশেষ্যের ব্যবহারও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ছিল, এইরকম অনুমান করা হয়।

৮. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় সুরের প্রয়োগ যেমন ছিল তেমনি ভাষা ছিল সঙ্গীতাত্মক।

৩.১.৪.৪ : শ্রেণিবিভাগ

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী মানুষ অর্থাৎ মূল আর্যজাতি ভারতবর্ষ ও ইউরোপের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ার সময় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে ১০টি প্রাচীন শাখার জন্ম হয়। যেমন —

১. ইন্দো-ইরানীয় (Indo-Iranian)

২. আর্মেনীয় (Armenian)

৩. বালতো-স্লাভিক (Balto-Slavic)

৪. আলবানীয় (Albanian)

৫. গ্রীক (Greek)

৬. ইতালিক (Italic)

৭. কেলতিক (Celtic)

৮. জার্মানিক বা টিউটনিক (Germanic/Teutonic)

৯. তোখারীয় (Tokharian)

১০. হিত্তীয় (Hittio)

ইন্দো-ইরানীয়

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের সমৃদ্ধ প্রাচীন ভাষা হল ইন্দো-ইরানীয় ভাষা। এই ভাষাবংশের একটি দল প্রথমে ইরানে ও পরে ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের জন্যে ইউরোপ থেকে আসে। এই ভাষার মধ্যেই সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন কাঠামোটি পাওয়া যায়।

ইরানীয় ভাষা শাখার প্রাচীন স্তরটি (খ্রি পূ ৩০০) প্রাচীন ইরানীয় নামে পরিচিত। এই প্রাচীন ইরানীয় ভাষার আবার দুটি স্তর ল(্যণীয়। যথা— আবেস্তান ও ফারসি। 'আবেস্তান' ফেরাসট্রিয়ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পবিত্র গ্রন্থ। এটি ৬০০ খ্রি পূর্বাব্দে রচিত প্রাচীনতম কবিতা। আবেস্তান ভাষার সঙ্গে ঋগ্বেদের ভাষার মিল আছে। আর প্রাচীন ফারসির নমুনা দেখা যায় দারিয়ুস ও খারেকসের অনুশাসনে। তবে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ইন্দো-ইরানীয় ভাষার দুটি স্তর আবেস্তান ও প্রাচীন ফরাসির সম্পর্ক আছে।

ইন্দো-ইরানীয় শাখার মধ্য স্তরটির (৩০০ খ্রি পূ —৯০০খ্রি) পাহলভী বা মধ্য ফারসি ভাষাটি ইরানের পূর্বদিকে 'সোগদিয়ান' ও দ(িণে 'সাকা' কথ্যভাষারূপে প্রচলিত ছিল। বর্তমানে ইরানীয় ভাষার বিভিন্ন শাখা ইরান ছাড়াও পা(র্শ্ববর্তী নানা অঞ্চলে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন — পাকিস্তানের বালুচি ভাষা, আফগানিস্তানে ব্যবহৃত পশতু, ইরানে ব্যবহৃত ফারসী, ইরাকে ব্যবহৃত কুর্দিশ, উত্তর ককেশাসে ব্যবহৃত ওসেসিক ইত্যাদি ভাষা ইন্দো-ইরানীয় ভাষাশাখার অন্তর্ভুক্ত(। বর্তমানে আবার ইরানীয় ভাষার পরিবর্তে তুরস্কীয় ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে অনেক স্থানে। কারণ তুরস্কীয় ভাষা ইরানীয় ভাষার স্থান দখল করেছে।

ইন্দো-ইরানীয় ভাষার যে শাখাটি ভারতে প্রবেশ করে তাকে বলা হয় আর্যভাষা। ইন্দো-ইরানীয় ভাষাভাষীরা নিজেদের 'আর্য' হিসেবে পরিচয় দিত। সেই কারণে ইন্দো-ইরানীয় ভাষাকে 'আর্যভাষা' মনে করা হত। এই ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনে আর্যশাখার প্রভাব আছে। যেমন —

১. ইন্দো-ইরানীয় ভাষায় মূল ভাষার হ্রস্ব এবং দীর্ঘ (অ,এ,ও) পরিবর্তিত হয়েছে 'অ' এবং 'আ' তে।

২. এই ভাষার অতি হ্র স্ব (অ) - 'ই' কারে পরিণত হয়েছে।

৩. হ্র স্ব ও দীর্ঘ 'এ' কার এবং 'ঈ' কারের পরবর্তী কণ্ঠ ও কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্গের ধ্বনি 'চ' বর্গের ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

অর্থাৎ, বোঝা যাচ্ছে আর্যভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের রীতি ইন্দো-ইরানীয় শাখায় অনুসৃত। তাছাড়া বলা হয় আর্য শাখারই দুটি প্রধান শাখা— ইরানীয় আর্য ও ভারতীয় আর্য। ভারতীয় আর্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'ঋগ্বেদ সংহিতা' (খ্রি পূ ১২০০)। ভারতীয় আর্যভাষায় লেখা হয়েছিল বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি। এই শাখার আধুনিক ভাষা বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া, অসমিয়া, গুজরাটি, মারাঠী ইত্যাদি।

আর্মেনীয়

এই ভাষার নমুনা পাওয়া যায় পঞ্চম শতকে। দ(িণ ককেশাস ও পশ্চিম তুরস্কের কিছু অঞ্চলে এই ভাষা প্রচলিত ছিল। তবে এশিয়া মাইনর অঞ্চলে (আনু খ্রি পূ ৭ম-৮ম) আর্মেনীয় ভাষার প্রাচীন রূপটি পাওয়া যায়। আধুনিক আর্মেনীয় ভাষা আর্মেনীয়ার বাইরে অনেক দেশে প্রচলিত আছে। এ্যাকেডিয়ান ও গ্রীকদের নানা বিবরণী থেকে জানা যায় আর্মেনিয়ানী আর্মেনিয়ায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। ধর্মসংত্র(ান্ত নানা বর্ণনা আর্মেনিয়ানরা আর্মেনীয় ভাষায় রচনা করেন। এই ভাষা বর্তমানে লিখিত ভাষা হিসেবে প্রচলিত থাকলেও এবং ভাষাতাত্ত্বিক পরিবর্তন পরবর্তীকালে খুব কমই হয়েছে। তবে এই ভাষা উনিশ শতক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

আর্মেনীয় ভাষার দুটি স্তর ল(করা যায়। যথা —

ক. পূর্বাঞ্চলীয় আর্মেনীয়।

খ. পশ্চিমীয় আর্মেনীয়।

পূর্বাঞ্চলীয় আর্মেনীয় ভাষা রাশিয়া ও ইরানে প্রচলিত ছিল। আর পশ্চিমীয় আর্মেনীয় তুরস্কে। আর্মেনীয় ভাষার একটি শাখা হল হিট্টীয়। এই শাখার কিছু কিছু প্রভাব বর্তমানেও ল(করা যায়। হিট্টীয় শাখার ধ্বনিপরিবর্তনের কিছু রীতি ল(ণীয়। যেমন —

ক. এই ভাষায় কয়েকটি বিশিষ্ট শব্দের আদিতে ইন্দোহিট্টীয় কণ্ঠনালীয় ধ্বনির রেশ 'হ' কার রূপে থেকে গেছে। যেমন —

হব হিট্টীয় 'হুহহস' ল্যাটিন 'আবুস্' থেকে এসেছে।

বালতো-স্লাভিক

গত এক হাজার বছর থেকে এই ভাষা প্রচলিত। বালতো-স্লাভিক শাখার দুটি উপশাখা হল —

ক. বাল্তিক

খ. স্লাভিক

বালতিক উপশাখার উল্লেখযোগ্য ভাষা লিথুয়ানীয়। এরপর বলতে হয় লাটবিয়ায় লেট ভাষার কথা। তবে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের সকল আধুনিক ভাষার মধ্যে লিথুয়ানীয় সবচেয়ে প্রাচীন। লিথুয়ানীয় ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় ষোড়শ শতকে। লিথুয়ানীয় ভাষার বৈশিষ্ট্য হল —

ক. সংস্কৃতের অপাদান ছাড়া অন্যান্য কারক এই ভাষায় র(িত হয়েছে।

খ. স্বরাঘাত ও সম্প্রসারিত প্রত্যয়ের ব্যবহার এই ভাষায় সংর(ণশীলতা এনেছে।

বাল্তিক উপশাখার আরেকটি ভাষা হল প্রাচীন প্রুশীয়। এই ভাষায় প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় ষোড়শ ও অষ্টাদশ শতকের দিকে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বে প্রুশীয় ভাষা যথেষ্ট গু(ত্ব পেয়েছে। কারণ এই ভাষায় স্বরধ্বনিগুলি সব র(িত ছিল।

আরেকটি সৃজ্যমান বাল্তিক ভাষা হচ্ছে ল্যাটাভিয়ান বা লেটিস। এই ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় ষোড়শ শতক থেকে। এর ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হল —

১. এই ভাষায় স্বরাঘাত নেই।

২. বহুরূপমূলের সম্প্রসারিত প্রত্যয়ও এখানে সংযুক্ত(হয় না।

তবে বালতিক শাখার লিথুয়ানীয় ও ল্যাটাভিয়ান উভয় ভাষারই অনেকগুলি উপভাষা আছে। বর্তমানে এই দুই প্রকার ভাষা ব্যবহারকারী মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে কয়েকল(মাত্র।

বালতো-স্লাভিক শাখার অপর একটি উপশাখা (-াভীয়। নবম শতকে এই শাখার নিদর্শন পাওয়া যায়। (-াভীয় ভাষাভাষীরা একসময় বসবাস করত পোল্যান্ড ও পশ্চিম সেভিয়েত ইউনিয়নে। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে রোমান সাম্রাজ্য বুলগেরিয়াতে এই ভাষা বিস্তারলাভ করেছিল। মূলত খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার চলে এই ভাষাতেই। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে খ্রিস্টান মিশনারী সাইরিল ও মেথোডিয়াস কর্তৃক (-াভীয় ভাষায় বাইবেল অনুদিত হয়। রাশিয়ার খ্রিস্টানরা বুলগেরীয় ভাষাকে সরকারি ভাষা রূপে গ্রহণ করেছে। রোমান সাম্রাজ্যে যেমন ল্যাটিন ভাষা ছড়িয়ে পড়েছিল, তেমনি রোমানদের (-াভীয় ভাষা পূর্ব ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

বর্তমানে (-াভীয় ভাষার তিনটি শাখা দেখা যায়। যেমন —

ক. দ(ি ণ (-াভীয় ভাষা।

খ. পশ্চিম (-াভীয় ভাষা।

গ. পূর্ব (-াভীয় ভাষা।

দ(ি ণ (-াভীয় ভাষার মধ্যে পড়ে বুলগেরীয়, সার্বো-ত্রে(ায়েশান, (ে-াভেনীয় ইত্যাদি ভাষা। পশ্চিম (-াভীয় ভাষার মধ্যে চেক, (ে-াভাক, পোলিশ, ওয়েন্ডিস ইত্যাদি ভাষা ভুক্ত(হয়েছে। আর পূর্ব (-াভীয় ভাষার অন্তর্ভুক্ত(ভাষাগুলি হল গ্রেট রাশিয়ান, হোয়াইট রাশিয়ান ও ইউত্রে(নিয়ান ইত্যাদি।

কালগত পার্থক্যের জন্য অনেক (ে ত্রে বালতো ও (-াভীয় ভাষার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করা কঠিন হয়েছে। কিন্তু অনেকে এই দুটি শাখাকে মিলিয়ে বালতো-স্লাভিক ভাষা বলে থাকেন। এই ভাষারই শ্রেষ্ঠ উপশাখা বুলগেরীয়। এই ভাষাতেই নবম শতকে বাইবেলের অনুবাদ করা হয়। বালতো-স্লাভিক শাখার একটি সাহিত্যসমৃদ্ধ ভাষা হল (শ ভাষা। এটি সোভিয়েত রাশিয়ার প্রধান ভাষা।

আলবানীয়

অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের পূর্ব উপকূলে আলবানীয় শাখার আধুনিক ভাষাটি বর্তমানে প্রচলিত আছে। এই ভাষার প্রাচীনতম শাখা সপ্তদশ শতকেও প্রচলিত ছিল।

আলবানীয় ভাষার দুটি উপভাষা আছে। একটি উত্তরাঞ্চলে ‘গেগ’ নামে প্রচলিত। অন্যটি দ(ি ণের ‘তোস্ক’ নামে প্রচলিত। তোস্ক উপভাষাটি গ্রিস ও ইতালিতেও প্রসারিত। তবে আলবানীয় ভাষার আদি অবস্থান নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। উত্তর আলবানীয় প্রাচীনকালে ইলিরিয়ের অংশ ছিল। পরবর্তীকালে (-াভদের দ্বারা আলবানীয় শাখাটি সমৃদ্ধ হয়। সাধারণভাবে বলা হয় বলকান অঞ্চলে আলবানীয় ভাষাভাষী মানুষরা বসবাস করে। ফলে আলবানীয় ভাষা বলকান অঞ্চলেই প্রসারিত ছিল। এ ছাড়াও গ্রিসের রাজধানী এথেন্স, দ(ি ণ ইতালি ও সিসিলিতেও আলবানীয় ভাষা ব্যবহার হতে থাকে। পঞ্চদশ শতকেও প্রাচীন আলবানীয় ভাষার নিদর্শন মেলে। তবে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে এই আলবানীয় শাখাটি সবচেয়ে বেশি বিকৃত হয়েছে বলা হয়। এই শাখার প্রাচীন ও আধুনিক ভাষায় ল্যাটিন, গ্রীক, স্লাভিক, ইতালি, তুর্কি প্রভৃতি নানা ভাষার শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

গ্রীক

খ্রি পূ দু-হাজার বছর আগে অনার্য জাতি গ্রিস সংলগ্ন দ্বীপপুঞ্জ ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বসবাস শু(করে। ফলে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের গ্রীক শাখাটি গ্রিস, এশিয়া মাইনর, সাইপ্রাস দ্বীপ, ইজিয়ান উপসাগরের দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রাচীন গ্রীক ভাষা দুভাগে বিভক্ত(। যথা—(ক) পশ্চিমাঞ্চলীয়, (খ) পূর্বাঞ্চলীয়।

পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রীক আবার দু-ভাগে বিভক্ত(। যথা—(ক) উত্তর-পশ্চিম (খ) ডোরিক।

পূর্বাঞ্চলীয় গ্রীক ভাষাটি হল আটিকা। এশিয়া মাইনরে ব্যবহৃত আটিক আয়োনিক ভাষাটি। আর দ্বিতীয় উপশাখা অর্থাৎ ডোরিক ভাষাটি হল বেওটিয়া ও থিসালির আয়োনিক ভাষা। যাই হোক, ড্রেনট্রিস ও জন চ্যাডউইকের দ্বারা জানা গেছে খ্রি পূ চতুর্দশ শতকে গ্রীক ভাষার নিদর্শন পাওয়া গেছে। তাছাড়া হোমারের মহাকাব্য ‘ইলিয়ড’ ও ‘ওডিসি’-তে গ্রীকের প্রাচীনতম রূপটির নিদর্শন পাওয়া গেছে। ইউরোপীয় সংস্কৃতির (ে ত্রে প্রাচীন গ্রীক ভাষা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। অনুমান করা হয় ত্র(ীট দ্বীপের একটি প্রত্নলেখে গ্রীক ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গেছে।

গ্রীক ভাষার অনেকগুলি উপভাষা আছে। যেমন—

১. আত্তিক ইত্তনিক।

২. দোরিক।

৩. আর্কাদিয়ান-সাইপ্রিয়াণ।

৪. আয়োলিক।

৫. উত্তর-পশ্চিমা গ্রীক প্রভৃতি।

গ্রীক ভাষায় আরও দুটি উপভাষার নাম উল্লেখ করতে হয়। নাম সাইপ্রাস ও পোলোপানিসে। তবে আত্তিক-ইওনিক উপভাষাটি গ্রীক ভাষার সবচেয়ে সমৃদ্ধ ভাষা। আবার গ্রীক ভাষার বিভিন্ন উপভাষার মিশ্রণে সাধু গ্রীক ভাষার উদ্ভব হয়েছে। যার নাম কোইনে। গ্রিসে 'কোইনে' উপভাষাটি কথ্য ভাষার পরিণত হয়েছে।

ইতালিক

গ্রীক ভাষার পরেই উল্লেখ করতে হয় ইতালিক ভাষা। বহিরাগতরা যেমন গ্রিসে গ্রীক ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল, তেমনিভাবেই ইতালিতে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে ইতালিক ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটে। ইতালিক ভাষার প্রধান শাখা হল লাতিন। লাতিন ভাষা কেন্তুম্‌গুচ্ছের মধ্যে পড়ে। ইতালির লাতিউম প্রদেশে এই ভাষা প্রচলিত ছিল। আবার রোমেও পরবর্তীতে লাতিন ভাষা প্রধান হয়ে ওঠে। রোমের বাইরেও এই ভাষা বিস্তৃত হয়। তবে ইতালিক ভাষার এই প্রধান শাখাটির নিদর্শন খ্রি পূ ষষ্ঠ শতাব্দীতেই পাওয়া যায়।

লাতিন ছাড়াও ইতালিক ভাষার আরও দুটি শাখা পাওয়া যায়। যথা—১. আসকান, ২. আমব্রিয়ান।

আর লাতিনকে বলা হত ল্যাটিন ফালিসফন। তবে লাতিন ভাষার প্রসারিত হওয়ায় আসকান ও আমব্রিয়ান ভাষাটি প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছিল বলা যায়। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম দুই শতাব্দীতে আসকান ভাষার প্রত্নলিপি পাওয়া যায়। আর আমব্রিয়ানের নিদর্শন বিশেষ পাওয়া যায়নি। গ্রীক ভাষার মতো ধ্বনিপরিবর্তনের রীতি আসকান ও আমব্রিয়ান ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—

১. গ্রীক ভাষায় কণ্ঠৌষ্ঠ্য 'ক' বর্গ 'প' বর্গে পরিণত হয়। আসকান-আমব্রিয়ান ভাষাতেও তাই হয়।

কিন্তু লাতিনে একটু পরিবর্তন ল(করা যায়। যেমন—'Qwist' শব্দটি আসকানে হয়েছে 'পিস', আমব্রিয়ানে 'পিসি'। কিন্তু লাতিনে হয়েছে 'কিস'।

ইতালিক ভাষার প্রধান শাখাটি হল লাতিন। এই ভাষা থেকেই পরবর্তীতে রোমান্‌স ভাষাগুলির উদ্ভব হয়েছে। যেমন—ইতালির ইতালিক ভাষা, স্পেনের স্পেনীয় ভাষা, পোর্তুগালের পোর্তুগিজ ভাষা, ফ্রান্সের ফরাসি ভাষা, সুইজারল্যান্ডের রেটোরোমেক ভাষা ইত্যাদি।

খ্রি পূ দ্বিতীয় শতকে আসকান ও প্রথম শতকে আমব্রিয়ানের কিছু লিপিমূলক নিদর্শন পাওয়া গেলেও ফলসিকান সম্পর্কে কোনও তথ্য প্রাচীনকালে পাওয়া যায়নি। এগুলি ছাড়াও ইতালিক শাখার আরও একটি উপশাখা পাওয়া যায়। যার নাম ভেনেটিক। উত্তর-পূর্ব ইতালিতে এই শাখাটির ভাষা এক সময় প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে শুধুমাত্র অনুশাসনেই এই ভাষাটিকে জীবিত থাকতে দেখা যায়। লাতিন শাখাটি আবার দুটি ভাগে বিভক্ত(। যেমন—১. চলতি লাতিন, ২. ধ্রুপদী লাতিন।

রোমান সাম্রাজ্যের সর্বত্রই চলতি লাতিন ভাষা প্রচলিত ছিল। কিন্তু, ধ্রুপদী লাতিন লিখিত ভাষারূপে স্বীকৃত ছিল অনেক আগে থেকেই।

কেলতিক

ইতালিক ভাষার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কেলতিক ভাষার অনেক বৈশিষ্ট্যের মিল পাওয়া যায়। মূলত ইউরোপে একসময় কেলতিক ভাষার বহুল ব্যবহার ছিল। সেন্টরা এই ভাষা ব্যবহার করত। ইউরোপেই এই ভাষার ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু অনেকেই ইউরোপ ছেড়ে পরবর্তীকালে স্পেন, উত্তর ইতালি ও এশিয়া মাইনর প্রভৃতি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। এদের পরবর্তী বংশধররা ফ্রান্স, আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডেও বসতি স্থাপন করে। ফলে কেলতিক ভাষার প্রাধান্য ত্র(মশ কমে আসে। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রত্নলিপিই কেলতিক ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন।

কেলতিক ভাষাকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—ক. ব্রাইথনিক খ. গয়ডলিক।

ব্রাইথনিক ভাষায় আবার অনেকগুলি উপভাষা আছে। যেমন—গলিস, ওয়েলস, কর্নিশ, ব্রেটন প্রভৃতি। গলিস ছাড়া ব্রাইথনিক ভাষার সবকটি উপভাষাই ইংল্যান্ডে প্রচলিত ছিল। গলিস বিলুপ্ত ভাষায় পরিণত হয়েছে অনেক আগে। কেলতিক ভাষার সর্বাপে(া উল্লেখযোগ্য উপভাষা বলা যায় 'ওয়েলস' ভাষাটিকে। অষ্টম শতকে এই ভাষাটির নিদর্শন পাওয়া যায়। এই একই সময়ে ব্রেটন উপভাষাটিরও নিদর্শন মেলে। ব্রেটন এখনও ব্রিটেনে প্রচলিত আছে। কিন্তু ব্রাইথনিক শাখার কর্নিশ উপভাষাটি বিলুপ্ত হয়েছে অষ্টাদশ শতক থেকেই।

কেলতিক ভাষার গয়ডলিক শাখাটিরও দুটি উপভাষা আছে। যেমন—ক. আইরিশ খ. ম্যাংস।

আইরিশ ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রত্নলিপিতে। এ ছাড়া অষ্টম শতাব্দীতে লিখিত কিছু গ্রন্থেও আইরিশ ভাষার নিদর্শন মেলে। স্কটল্যান্ডে আইরিশ ভাষাটির আগমন ঘটেছিল পঞ্চম শতকেই, তবে নাম পরিবর্তিত হয়ে। ভাষাটি 'স্কটস গেলিক' নামে স্কটল্যান্ডে পরিচিত হয়েছিল। আয়ারল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ ভাষা হিসেবে আইরিশ ভাষাটি এখনও জীবিত। 'ম্যাংস' ভাষাটি একসময় আইল অব ম্যান অঞ্চলে প্রচলিত ছিল ঠিকই, কিন্তু বর্তমানে এটি একেবারে লুপ্ত।

অনেক ইতালিক ও কেলতিক ভাষাকে একটি জোড় বলে মনে করেন। কারণ ইতালিক ও কেলতিক দুটি শাখার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। অনুমান করা হয়, মূল ভাষা থেকে আলাদা আলাদা ভাবে না বের হয়ে কেলতিক ও ইতালিক ভাষাটি একই সঙ্গে জন্ম নেয় এবং পরবর্তীতে দুটি শাখায় পরিণত হয়। যে কারণে কোনও কোনও ভাষাতাত্ত্বিক এই দুটি শাখাকে আলাদা করে না দেখে 'ইতালো-কেলতিক' শাখা নামে একটি ভাষায় পরিণত করে দেখিয়েছেন। আসলে কেলতিক ভাষাটি ইউরোপে ব্যাপক প্রসারলাভ করলেও ইতালিক ও টিউটনিক ভাষার প্রভাবে বিলুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে। বর্তমানে কেলতিক শাখার প্রধান আধুনিক ভাষাটি হল আয়ারল্যান্ডে ব্যবহৃত 'আইরিশ ভাষা'। যেটি বর্তমানেও একইভাবে আয়ারল্যান্ডে প্রচলিত। আর সবগুলিই বিলুপ্তপ্রায় ভাষায় পরিণত হয়েছে।

জার্মানিক বা টিউটনিক

রোমানরা জার্মান ও কেলতিক ভাষা সম্পর্কে ইতিবাচক মত পোষণ করেন না। কারণ জার্মান ভাষার রূপমূলটি কেলতিক ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রাচীন জার্মান ভাষার নিদর্শন চতুর্থ শতকের আগে পাওয়া যায়নি। পূর্ব জার্মানিক শাখায় খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে 'বুল্‌ফিলা' বাইবেলের অংশবিশেষের অনুবাদটিই হল জার্মানিক শাখার প্রাচীনতম নিদর্শন। তবে পূর্ব শাখায় আধুনিক ভাষা নেই। আর পশ্চিম শাখা নামে একটি শাখারও অস্তিত্ব জার্মানিক ভাষায় পাওয়া যায়। জার্মানিক শাখা তিনটি ভাগে বিভক্ত(ছিল।

যেমন— ১. পূর্ব জার্মান ভাষা। ২. উত্তর জার্মান ভাষা। ৩. পশ্চিম জার্মান ভাষা।

পূর্ব জার্মানিক ভাষার কোনও আধুনিক শাখা নেই। কিন্তু উত্তর জার্মানিক ভাষার আধুনিক শাখাটি হল সুইডেনের ভাষা 'সুইডিশ্' ও আইসল্যান্ডের ভাষা 'আইসল্যান্ডিক'। স্ক্যান্ডিনেভিয়ানদের সম্প্রসারণের সময় জার্মানিক ভাষা আবার দুটি শাখায় বিভক্ত(হয়ে পড়ে। যথা—

১. সুইডিস, ভেনিস ও গাটনিস সংযোগে গঠিত পূর্বনস।

২. নরওয়েজিয়ান ফ্যারোইস ও আইসল্যান্ডীয় সমন্বয়ে গঠিত পশ্চিম নর্স।

এ ছাড়াও জার্মানিক ভাষার পাঁচটি শাখা ল(করা যায়। যথা—

১. হাই জার্মান, ২. ফ্যাংকোনিয়ান, ৩. লো জার্মান, ৪. ফ্রিশিয়ান ৫. ইংরেজি।

তবে মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে জার্মান ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'ইদ্দিস' নামে স্বতন্ত্র একটি উপভাষার জন্ম হয়েছে।

হাই জার্মান ভাষাটি আট শতকের পূর্বে উত্তরাঞ্চলের জার্মানীয় উপভাষায় প্রভাব ফেলেছিল। আর দ(ণাঞ্চলে প্রচলিত ছিল স্যাকসন ভাষাটি। এই ভাষাটিই লো জার্মান ভাষার রূপ গ্রহণ করেছিল পরবর্তীকালে। ত্রয়োদশ শতক থেকে নেদারল্যান্ডের সমুদ্রবর্তী অঞ্চল, দ্বীপে ও পশ্চিম জার্মানিতে ফ্রিশিয়ান উপভাষাটি ব্যবহৃত হয়। আর ইংরেজি ভাষাটি জার্মান থেকে স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃত হয় সপ্তম শতকে। প্রাচীন ইংরেজির নিদর্শন হিসেবে ধরা হয় 'কায়ভমনের স্তোত্র' ও 'বিউলফে'। এগুলি সাতশো পঞ্চান্ন খ্রি আগের রচনা বলে একে অনুমান করা হয়। প্রাচীন ইংরেজির আবার তিনটি উপভাষা ছিল। যথা—

১. কেলতিক, ২. স্যাকসন ৩. এ্যাংলিয়ান।

উল্লেখ্য এ্যাংলিয়ানও দুটি শাখায় বিভক্ত(ছিল। যথা—হামব্রিয়ান ও মার্সিয়ান। ষোড়শ শতক থেকে ইংরেজি বহুলভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। মূলত পশ্চিম জার্মানিক শাখাটি থেকেই আধুনিক ইংরেজি জার্মান ও ওলন্দাজ ভাষার জন্ম হয়েছে। জার্মান ভাষাটি বিশেষ ধ্বনিপরিবর্তনের কারণে ইংরেজি ও ওলন্দাজ ভাষা থেকে আলাদা হয়ে গেছে।

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, জার্মানিক শাখায় ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষার স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনগুলি পরিবর্তিত হয়ে গেছে। গ্রীম এই পরিবর্তনের সূত্রগুলি প্রথম দেখিয়েছেন। পরবর্তীকালে গ্রাসম্যান, ভার্নার প্রমুখ এই ভাষার অনেক সূত্র দিয়েছেন। **গ্রীমের সূত্রে বলা হয়েছে**—

মূল ভাষার বর্গের চতুর্থ, তৃতীয় এবং প্রথম ধ্বনি জার্মানিক শাখায় যথাত্র(মে বর্গের তৃতীয়, প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।

গ্রাসম্যানের মতে, বিষমীভবন জার্মানিক ভাষায় দেখা যাচ্ছে। আসলে জার্মানিক ভাষায় মূলভাষার কোনও পদে পাশাপাশি দুই অ(রে মহাপ্রাণ ধ্বনি থাকলে, তাদের মধ্যে একটি অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়।

ভার্নারের মতে, মূল ভাষার পদটি একা(র না হলে ব্যঞ্জনধ্বনির আগের অ(রে স্বর না থাকলে বর্ণের প্রথম ধ্বনি ও 'স' জার্মানিক শাখায় যথাত্র(মে বর্গের তৃতীয় ধ্বনি 'জ'-তে পরিণত হবে।

এই ধ্বনিপরিবর্তনগুলির জন্যই জার্মানিক ভাষা স্বতন্ত্র ভাষা রূপে চিহ্নি(ত হয়ে আছে। তাছাড়া পশ্চিম জার্মানিক শাখাটির আধুনিক একটি ভাষা হল ইংরেজি, যা বর্তমানে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও মুখ্য ভাষা।

তোখারীয়

উনিশ শতকে তোখারীয় শাখার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায়। চিনের অন্তর্গত তুর্কিস্থানে এই ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে কতগুলি পুঁথি ও প্রত্নলেখের সন্ধান মেলে। অনূদিত এগুলি খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়েছিল। এই প্রত্নলেখগুলি থেকে জানা যায় তুখার বা তুষার জাতির ভাষা ছিল তোখারীয়। চীনা তুর্কীয় বৌদ্ধদের রচনায় তুখারীয় ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন আছে। আর গ্রন্থের রচনাকাল অনুমান করা হয় অষ্টম শতক।

তোখারীয় ভাষাটি দুই ভাগে বিভক্ত(। যথা—

১. পূর্ব অঞ্চলের ভাষা ২. পশ্চিম তোখারীয়।

পূর্ব অঞ্চলের তোখারীয় শাখাটি 'তোখ্‌রী' নামে পরিচিত। আর পশ্চিম তোখারীয় ভাষাটি 'কুচিয়ান' নামে।

তোখারীয় ভাষাটি যদিও এশিয়ায় অবস্থিত, কিন্তু বালতো-স্লাভিক, আর্মেনীয় ও ইন্দো-ইরানীয় শাখার সঙ্গে সম্পৃক্ত(নয়। তবে কেলতিক ও ইতালিক শাখার সঙ্গে এই ভাষার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

তোখারীয় ভাষার একটি বিশেষ ধ্বনি পরিবর্তনের রীতি ল(করা যায়। সেটি হল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় শিস্‌ধ্বনি হিসেবে ব্যবহৃত হয় যে ধ্বনিগুলি, সেগুলি তোখারীয় ভাষার অন্য ধ্বনি হিসেবে ব্যবহৃত। যেমন—তোখারীয় ভাষায় 'ক' ধ্বনিটি পশ্চাৎ স্বরধ্বনির পূর্বে সংর(িত হয়েছে।

যাই হোক তোখারীয় ভাষাটি বর্তমানে লুপ্ত। পণ্ডিতদের অনুমান সপ্তম শতকের পর থেকেই এই ভাষাটি লুপ্ত হতে শু(করে। বর্তমানে তোখারীয় ভাষা থেকে সৃষ্ট কোনও আধুনিক ভাষার পরিচয় মেলে না।

হিত্তীয়

তোখারীয় ভাষার মতোই হিত্তীয় ভাষাটি সম্প্রতিই আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শনটি এশিয়া মাইনরের কাপাদোকিয়া প্রদেশের বাণমুখ লিপিতে পাওয়া যায়। খ্রি পূ বিংশ শতক থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে এগুলি লিখিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। অনেকে আবার মনে করেন হিত্তীয় ভাষাটি মূল আর্য ভাষার সমসাময়িক কালের স্বতন্ত্র একটি ভাষা। ইন্দো-ইউরোপীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত(নয়। তবে ১৯১৫ সালে বি. হ্রোজনী হিত্তীয় ভাষাকে ইন্দো-ইউরোপীয়ের বংশধর বলে সনাক্ত(করেন। ভাষাতাত্ত্বিক জে. কুরিলোয়িজ হিত্তীয় ভাষার ধ্বনিপরিবর্তন বিচার করে প্রমাণ করেছেন, সসিউর ১৮৭৯ সালে যে ধ্বনির প্রস্তাব করেন, তার সঙ্গে হিত্তীয় ভাষার ধ্বনির পরিবর্তনগুলি যথেষ্টই মেলে। অনেক ভাষাতাত্ত্বিক হিত্তীয় ভাষাকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কন্যাভাষা বলেই মেনে নিয়েছেন।

হিত্তীয় ভাষা থেকে আরও দুটি সম্পর্কিত ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা দুটি হল—

১. লুইয়িআন

২. প্যালাইক

লুইয়িআন ও প্যালাইক ভাষা ছাড়াও লিসিয়ান ও লিডিয়ানের সঙ্গেও হিত্তীয় ভাষার মিল পাওয়া গেছে।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের একটি রীতি হিত্তীয় ভাষায়ও দেখা গেছে। যেমন— হিত্তীয় ভাষায় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কণ্ঠ্যধ্বনি সংর(িত। তবে হিত্তীয় ভাষার ব্যাকরণ ইন্দো-ইরানীয় ও গ্রীক ভাষার তুলনায় অনেক সরল। মনে রাখা দরকার হিত্তীয় ভাষাটির নিদর্শনই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাটির অস্তিত্ব যে ৩০০০ খ্রি পূর্বে ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

নিম্নে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে সৃষ্ট ভাষাগুলির বর্গীকরণ করা হল

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ
(আর্য ভাষা)

- কেন্তুম্ গোষ্ঠী
  - গ্রীক ↓ হেলেনিক, ডোরিক, আয়োনিক, আত্তিক
  - ইতালীয় ↓ রোমান, স্পেনীয়, পর্তুগীজ, ফরাসী, (মানীয়
  - কেলতিক ↓ আইরিশ, স্কচ-গেলিক, ওয়েল্শ, ব্রেটন
  - টিউটনিক ↓ জার্মান, ইংরেজি, ওলন্দাজ, সুইডিস্, নরওয়েজীয়, ডেনিস্
  - হিত্তীয় ↓ লুইয়িআন, প্যালাইক
  - তুখারীয়
- সতম্ গোষ্ঠী
  - আলবানীয় ↓ ইলিরীয়, ভেনিসীয়, গেগ্, টস্ক
  - বাল্তোস্লাভিক ↓ বালতিক, স্লাব, লিথুয়ানীয়, বুলগারীয়, (শ, লেত্তিক, চেক, পোলিশ
  - আরমানীয় ↓ ফ্রীজীয়, আরারাত, স্তাম্বুল
  - ইন্দো-ইরানীয় (আর্য) ↓
    - ইরানীয় ↓ বালুচি, পশতু, ফারসী, কুর্দিশ, ওসেসিক, তুরস্কীয়
    - দরদীয়
    - ভারতীয় ↓ বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া, মারাঠী, পঞ্জাবি

৩.১.৪.৫ : ধ্বনিতালিকা (স্বর, অর্ধস্বর, অর্ধব্যঞ্জন, ব্যঞ্জন) :

স্বরধ্বনি

হ্রস্ব অ/*a*/, এ/e/, ও/o/, ই/i/, উ/u/

দীর্ঘ আ/ ā /, এ//, ও//, ঈ/i/, ঊ//

অতিহ্রস্ব অ/১/

মোট ১১টি স্বরধ্বনি।

অর্ধস্বর য়/y/, অন্তঃস্থব (ব)/w/

মোট ২টি অর্ধস্বর।

অর্ধব্যঞ্জন

হ্রস্ব ঋ/r/, ঌ//

দীর্ঘ ৠ//, ৡ//

হ্রস্ব ন/n/, ম/m/

দীর্ঘ ন//, ম//

মোট ৮টি অর্ধব্যঞ্জন।

ব্যঞ্জনধ্বনির তালিকা

স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন

পুরঃ কণ্ঠ্য ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্

কণ্ঠ্য বা পশ্চাৎ কণ্ঠ্য ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্।

(q, qh, g, gh, n)

কণ্ঠৌষ্ঠ্য ক্ব, খ্ব, গ্ব, ঘ্ব, ঙ

(qw, qwh, gw, gwh, nw)

দন্ত্য ও দন্তমূলীয় ত্, থ্, দ্, ধ্, ন্

(t, th, d, dh, n)

ঔষ্ঠ্য প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্,

(p, ph, b, bh, m)

কম্পিত ব্যঞ্জন র/r/

পার্শ্বিক ব্যঞ্জন ল/l/

উষ্ম ব্যঞ্জন পুর কণ্ঠ্য, পশ্চাৎ কণ্ঠ্য, কণ্ঠৌষ্ঠ্য [ক., (খ্.), গ. (ঘ.), (x, ‘y’]

দন্ত্য ও দন্তমূলীয়—স্(ɀ) [জ, ত,(থ), দ(ধ), (২, θδ]

৩.১.৪.৬ : ধ্বনিপরিবর্তনের সূত্র :

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের ধ্বনি তালিকাটি পুনরায় গঠিত হয়েছে। মূলত অনুমানের উপর নির্ভর করে বর্তমান ভাষা থেকে অতীত ভাষার উৎস সন্ধান করা হয়েছে। ধ্বনি পরিবর্তনের ((ত্রে উৎস ভাষার কোন্ কোন্ ধ্বনি পরবর্তী ভাষায় কিভাবে দাঁড়িয়ে আছে তা ব্যাখ্যা করার জন্য ভাষাবিজ্ঞানীরা কয়েকটি ধ্বনিপরিবর্তনের সূত্র উদ্ভাবন করেছেন। যথা—

ক. গ্রীমের সূত্র।

খ. গ্রাসম্যানের সূত্র।

গ. ফেরনেরের সূত্র বা ভার্নারের সূত্র।

ঘ. কোলিৎজ-র সূত্র

গ্রীমের সূত্র

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার উৎস ভাষার ধ্বনি জার্মানিক শাখার ভাষায় কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, তা গ্রীমের সূত্রে আলোচিত হয়েছে। সূত্রটি তিনটি অংশে বিভক্ত(। ইয়াকব গ্রীম 'ডয়ট্স-শে গ্রামাটিক' বইটিতে সূত্রগুলি লিখেছেন। সূত্রগুলি বি(-ষণ করলে দেখা যায়—

১. বর্গের চতুর্থ ধ্বনিগুলি (ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ) সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি। কিন্তু ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার এই সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলি মহাপ্রাণতা হারিয়ে তৃতীয় ধ্বনি হবে। উদাহরণ—

ঘ, ধ, ভ > গ, দ, ব

২. অনুরূপভাবে তৃতীয় ধ্বনির রূপান্তর হয়েছে এইভাবে গ, দ, ব > ক, ত, প। অর্থাৎ জার্মানিক ভাষায় অঘোষ ধ্বনি রূপান্তরিত হয়েছে অঘোষে।

৩. প্রথম ধ্বনি ক, ত, প > খ, থ, ফ হলে অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ উষ্ম ধ্বনিতে পরিণত হয়।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে গ্রীমের সূত্র অনুসারে ধ্বনির ((ত্রে তিনটি বিষয় আসছে। যথা—

ক. মহাপ্রাণ হীনতা।

খ. অঘোষীভবন।

গ. উষ্মীভবন।

মনে রাখতে হবে গ্রীমের সূত্রই ছিল ঐতিহাসিক তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রথম পদ(প।

গ্রাসম্যানের সূত্র

গ্রীমের সূত্র সব শব্দের ((ত্রে প্রযোজ্য নয়। কয়েকটি ((ত্রে এর ব্যতিত্র(ম দেখা গেছে। তাই গ্রাসম্যান কিছু নতুন সূত্র উদ্ভাবন করেন। এখানে দেখা যায়—১. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কোনো শব্দের পাশাপাশি দুই অ(রে মহাপ্রাণ ধ্বনি থাকলে তার একটি ধ্বনি গ্রীক এবং ইন্দো-ইরানীয় শাখায় অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেমন—ইন্দো-ইউরোপীয় একটি শব্দ হল—'Bhendhe'। এটি থেকে সংস্কৃতে 'বনধ্' এবং গ্রীকে 'পেনত' শব্দটি এসেছে। এখানে দেখা যাচ্ছে 'ভ' ও 'ধ' দুটি মহাপ্রাণ ধ্বনি। এর মধ্যে প্রথমটি হল 'ভ'। আর এই 'ভ' সংস্কৃতে 'ব' এবং গ্রীকে তা 'প' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ পাশাপাশি দুই অ(রের মহাপ্রাণ ধ্বনির একটি অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।

গ্রীমের সূত্র অনুসারে জানা যায় মূল আর্যভাষা বা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মহাপ্রাণ ঘোষবৎ স্পর্শধ্বনি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার জার্মানিক শাখায় পরিবর্তিত হলেও অন্যান্য শাখা, যেমন—সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন ইত্যাদি ভাষায় অপরিবর্তিত থাকার কথা। কিন্তু গথিকে যেখানে 'ব' থাকে, সেখানে সংস্কৃতে 'ভ' হতেও পারে। আবার গথিকে যেখানে 'ব' থাকে, সংস্কৃতে যেখানে 'ব' ই হয়েছে এমন উদাহরণও পাওয়া যায়। গ্রীম বলেছেন, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় 'ব' এর স্থানে 'ভ' ছিল। তাহলে জার্মানিক শাখায় 'ভ' পরিবর্তিত হলেও সংস্কৃত বা অন্যান্য শাখায় কোনও পরিবর্তন হবে না। সে(ত্রে 'ভ'ই হবে। কিন্তু সংস্কৃতে 'ভোধতি' শব্দটির পরিবর্তে 'বোধতি' শব্দটি পাওয়া গেছে। অর্থাৎ 'ভ' এর পরিবর্তে 'ব'। এ(ত্রে গ্রীমের সূত্রের ব্যতিত্র(ম ঘটছে। এই ব্যতিত্র(মকেই দেখিয়েছেন গ্রাসম্যান।

ভার্নারের সূত্র

গ্রীমের সূত্রে আরও একটি ব্যতিত্র(ম বিশেষভাবে ল(করা যায়। সেই ব্যতিত্র(মটি ব্যাখ্যা করেছেন কার্ল ভার্নার। এই সূত্রটি ভার্নারের সূত্র নামেই পরিচিত। গ্রীমের সূত্রে বলা হয়েছে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পর্শধ্বনি জার্মানিক শাখায় মহাপ্রাণ অঘোষ উষ্মধ্বনিতে পরিবর্তিত হওয়ার কথা। কিন্তু গ্রীক, লাতিন, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষায় এই পরিবর্তন হবে না। সেই অনুসারে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় 'septm' থেকে সংস্কৃতে হয়েছে 'সপ্ত', গ্রীকে হয়েছে 'hepta', লাতিনে 'septem'। কিন্তু জার্মানিক ভাষা গথিকে 'sifum' হবার কথা থাকলেও 'sibum' হয়েছে। অর্থাৎ গ্রীমের সূত্রেরও ব্যতিত্র(ম আছে। গ্রাসম্যানের সূত্রেও কিছু ব্যতিত্র(ম আছে। যেটি অবশ্য এখানে প্রযোজ্য নয়। ফলে দেখা যাচ্ছে গ্রীম ও গ্রাসম্যানের সূত্র সর্ব(ত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে না। বিশেষত গ্রীমের সূত্র সব শব্দে খাটে না। এর ব্যতিত্র(ম দেখা যায়। এই ব্যতিত্র(মকেই ভার্নার ব্যাখ্যা করেছেন। ভার্নারের সূত্রে বলা হয়েছে—

১. প্রত্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার শব্দটি যদি একটি অ(রের না হয় এবং ব্যঞ্জনধ্বনির আগের অ(রে যদি স্বরধ্বনি না থাকে, তাহলে বর্গের প্রথম ধ্বনি বর্গের তৃতীয় ধ্বনিতে পরিণত হবে। যেমন—ক, ত, প এবং স জার্মান ভাষাগুলিতে হয়েছে গ, দ, ব।

২. স (s) জার্মান শাখার ভাষাগুলিতে জ (z) হয়ে যাবে।

৩. প্রত্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ব্যবহৃত 'ত' আধুনিক ও প্রাচীন ইংরেজি ভাষায় আলাদা আলাদা রূপে ব্যবহৃত হবে। যেমন—

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার 'Klutos' (ক্লুতোস) প্রাচীন ইংরেজিতে হয়েছে 'Hlud' এবং আধুনিক ইংরেজিতে হয়েছে 'loud'। এখানে ত (t) হয়েছে দ(d)-তে।

কোলিৎজর সূত্র

গ্রীমের সূত্র, গ্রাসম্যানের সূত্র ও ভার্নারের সূত্র ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ধ্বনি জার্মানিক ভাষায় কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করেছে। কিন্তু কলিৎজর ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ধ্বনি সংস্কৃত বা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন—

১. প্রত্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কোনও শব্দে দীর্ঘ 'ঈ' ধ্বনির পরে কণ্ঠ্য বা কণ্ঠোষ্ঠ ধ্বনি থাকলে তা সংস্কৃত বা প্রাচীন ভারতীয় আর্যে 'চ' বর্গের ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন—জ্বীবোস > সংস্কৃতে জীবস এবং প্রাচীন পারসিক ভাষায় জীব।

প্রত্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের ((ত্রে এই চারটি সূত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৩.১.৪.৭ : ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের গু(ত্ব

পৃথিবীতে যে সমস্ত ভাষাবংশ আছে, তাদের মধ্যে সর্বোত্তম হল ইন্দো-ইউরোপীয়। বিখ্যাত বিখ্যাত আধুনিক ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এই ভাষাবংশের গু(ত্ব অপরিসীম। যেমন—

১. আনুমানিক ২৫০০ খ্রি পূর্বাব্দে দ(িণ রাশিয়ার উরাল পর্বতের পাদদেশে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার জন্ম। কিন্তু বর্তমানে এই ভাষার ব্যপ্তি সারা পৃথিবীতে। এই ভাষাবংশের ভাষাগুলি একসময় সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিল। যেমন—প্রাচীন ভারতে বৈদিক ভাষা গ্রিসে গ্রীক ভাষা, পশ্চিম তুরস্কে আর্মেনীয় ভাষা, ইউরোপে কেলতিক, চিনের তুর্কিস্থানে তোখারীয়, জার্মানিতে জার্মানিক প্রভৃতি ভাষা।

২. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের প্রাচীন ভাষাগুলির সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি অভাবনীয়। যেমন—গ্রীক ভাষাটির একটি উপভাষা হল ইত্তলিক। এই ভাষাতেই হোমারের 'ইলিয়ড-ওডিসি' রচিত হয়েছে। এই বংশের ভাষা বৈদিকে লেখা হয়েছিল বেদ-উপনিষদ, সংস্কৃতে লেখা হয়েছিল 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'।

৩. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের আধুনিক ভাষাগুলি পৃথিবীতে সর্বাধিক প্রচলিত ও উন্নত। যেমন— ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি, স্প্যানিস, বাংলা, হিন্দি ইত্যাদি।

৪. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের অন্তর্ভুক্ত(ভাষাগুলির সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সমৃদ্ধি বিস্ময়কর।

৫. রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের ভাষাগুলি পৃথিবীতে বিশিষ্ট ভাষা।

৬. পৃথিবীর প্রাচীনতম নিদর্শন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের ভাষা থেকেই জাত। এইরকম অনুমান করা হয়। যেমন—বৈদিক ভাষার ঋগ্বেদ সংহিতা।

৭. এই ভাষাবংশের মানুষেরা বর্তমানে সংখ্যায় বেশি। যেমন—ইংরেজি, হিন্দি, জার্মান, ফরাসি, বাংলা ভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যাই বেশি। এই বংশের আধুনিক ভাষাগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রভাষা।

৩.১.৪.৮ : ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশকে আর্য বলার কারণ

পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাবংশগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ। 'ইন্দো' শব্দটিতে 'India' বোঝায়। আর ইউরোপীয় বলতে সমগ্র ইউরোপকে বোঝায়। অর্থাৎ India দেশ আর ইউরোপ হল মহাদেশ। সুতরাং ইন্দো-ইউরোপীয় এই নামটি ঠিক গ্রহণযোগ্য নয়।

আবার 'ইন্দো' বলতে শুধুমাত্র India বা ভারতকেই বোঝায় না। কারণ শুধুমাত্র ভারতেই ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাবংশের ভাষাগুলি ছড়িয়ে নেই। ভারতের বাইরে ইরানেও এই ভাষা প্রচলিত আছে। সেই কারণে এই ভাষাবংশের নামকরণ করা হয়ে থাকে 'ইউরো এশীয়'। কিন্তু এই মতও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সমগ্র ইউরোপে এই ভাষা প্রচলিত নেই। তবে সমগ্র জার্মানিতে এই ভাষা প্রচলিত আছে। তাই এই ভাষাকে 'ইন্দো-জার্মানিক' ভাষাও বলা হয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানী শ্র্যাডার এই নাম দিয়েছেন।

কিন্তু 'ইন্দো-ইউরোপীয়' বা 'ইউরো এশীয়' নামটি যেমন সকলের কাছে গ্রহণীয় হয়নি, তেমনি 'ইন্দো-জার্মানিক' কথাটিও নয়। কারণ এখানেও দেখা যাচ্ছে ভারত একটি দেশ কিন্তু জার্মানিও একটি দেশ।

তাই এই ভাষাটিকে 'বৈদিক - জার্মানিক' বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এই নামটিও গ্রহণীয় হয়নি। সুকুমার সেনের মতে ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাবংশের ভাষাগুলি ভারত, ইউরোপ ও তার মধ্যবর্তী স্থানে প্রচলিত। কিন্তু এই সব স্থানের লোকেরা নিজেদের 'আর্য' বলে পরিচয় দেন। সুতরাং তাদের মুখে ব্যবহৃত হওয়ায় এই ভাষাটিকেও 'আর্যা' ভাষা বলা হয়। ভাষাবিজ্ঞানী ম্যাক্সমুলারের মতে আর্য বিজ্ঞানসম্মত ভাষা। কোনও নির্দিষ্ট জাতির ভাষা নয় এটি। পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই ভাষা ছড়িয়ে আছে। সুতরাং ব্যাপক অর্থে ইন্দো-ইউরোপীয়কে আর্য বলাই ঠিক হবে।

৩.১.৪.৯ : আদর্শ প্র(াবলি

১। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ বলতে কী বোঝো? এই ভাষাবংশের বৈশিষ্ট্য লিখে গু(ত্ব বিচার করো।

২। ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্য ভাষার পরিচয় দাও। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের শ্রেণিবিভাগ করে উদাহরণসহ প্রত্যেক শ্রেণির সং(প্ত পরিচয় দাও।

৩। মূল আর্যভাষার সং(প্ত ইতিহাস লিখে ওই ভাষার স্বর ও ব্যঞ্জনের পরিচয় দাও।

৪। পৃথিবীর ভাষাবংশসমূহের ঐতিহাসিক বর্গীকরণ করো।

৫। পৃথিবীর ভাষাবংশসমূহের উৎস নির্ণয় করে উদাহরণসহ শ্রেণিবিভাগ করো।

৬। পৃথিবীর ভাষাবংশসমূহের বি(-ষণ করো।

৩.১.৪.১০ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' (১৪০৩)—ড. রামে(র শ, পুস্তক বিপণি।

২। 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৬)—সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৩। 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' (১৯৯৭)—আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, নয়া উদ্যোগ।

৪। 'ভাষাতত্ত্ব' (১৩৯৬)—রফিকুল ইসলাম, উজ্জ্বল বুক স্টোরস্।

৫। 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৮)—মহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মাওলা ব্রাদার্স।

৬। 'ভাষাবিদ্যা পরিচয়' (২০০২)—অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জয়দুর্গা লাইব্রেরি।

৭। 'ভাষা পরিত্র(মা' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ২০০২)—অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার, দেজ পাবলিশিং।

৮। 'ভাষা দেশ-কাল' (২০০০)—পবিত্র সরকার, মিত্র ও ঘোষ।

৯। 'ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী' (১৯৯৮)—রফিকুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি।

১০। 'ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা' (২০০৪)—অনিমেষকান্তি পাল, বামা পুস্তকালয়।

১১। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (২০০২)—সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

১২। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (সমাজভাষা, ২০০৩)—সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

১৩। 'বাংলা গদ্য স্টাইলিস্টিকস্' (২০০১)—নবেন্দু সেন, মহাদিগন্ত।

১৪। 'ফলিত ভাষাবিজ্ঞান' (১৯৯৭)—ভূদেব বি(াস ও ভবদেব বি(াস, তাহেরপুর কবিতা কুটির।

১৫। 'শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৮)—অপূর্ব দে, মডার্ন বুক এজেন্সি।

১৬। 'সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৪)—আশিস দে, পুস্তক বিপণি।

————————

পর্যায় গ্রন্থ - ২

ভারতীয় আর্য ভাষার ইতিহাস ও যুগবিভাগ

একক - ৫

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা

বিন্যাস ক্রম :

৩.২.৫.১ ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাস ও যুগবিভাগ

৩.২.৫.২ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা

৩.২.৫.৩ ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য

৩.২.৫.৪ রূপগত বৈশিষ্ট্য

৩.২.৫.৫ ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য

৩.২.৫.৬ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩.২.৫.৭ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩.২.৫.১ : ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাস ও যুগবিভাগ

পৃথিবীর ভাষাবংশগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইন্দো-ইরানীয় ভাষাবংশ। এই ভাষাবংশেরই অন্তর্ভুক্ত(ভাষাগুলিই পৃথিবীতে সর্বাধিক প্রচলিত। ইউরোপের প্রায় সমস্ত ভাষা, ভারত ও ইরানের প্রধান প্রধান ভাষাগুলি এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত(। এই ভাষাগোষ্ঠীরই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শাখা হল আর্যভাষা। এই আর্যভাষা থেকেই ইরান ও ভারতের প্রধান ভাষাগুলির উৎপত্তি ঘটেছে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর দুটি শাখা হল কেন্তম ও সতম্। কেন্তম গোষ্ঠীর প্রধান ভাষাগুলি হল গ্রীক, লাতিন, কেল্‌টিক, জার্মানিক ইত্যাদি। আর সতম্ গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষাগুলির মধ্যে হল আলবানীয়, বাল্‌তো-স্লাবিক ও ইন্দো-ইরানীয় বা আর্যভাষা। আনুমানিক ১৫০০ খ্রি পূর্বাব্দে ইন্দো-ইরানীয় ভাষার যে শাখাটি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, তাকে ভারতীয় আর্যভাষা বলা হয়। সেই প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি এই ভাষার যে বিবর্তন ঘটেছে, তাকে প্রধান তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা —

(ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (খি পূ ১৫০০ - খ্রি পূ ৬০০)

(খ) মধ্যভারতীয় আর্যভাষা (খ্রি পূ ৬০০ - খ্রি পূ ৯০০)

(গ) নব্য ভারতীয় আর্যভাষা (খ্রি ৯০০ থেকে বর্তমান কাল)

৩.২.৫.২ : প্রাচীন ভারতের আর্যভাষা

এই আর্যভাষার দুটি স্তর। প্রথম বা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় ঋগ্বেদের প্রাচীনতম সূত্রগুলিতে। অনেকে মনে করেন এই সূত্রগুলি খ্রিস্টের জন্মের দুই-আড়াই হাজার বছর আগেকার লেখা। তবে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীনত্ব সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে বিংশ শতাব্দীর

প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে তুরস্কের কাপ্‌পাদোকিয়া প্রদেশের বোগাজকোই অঞ্চলে বহু প্রত্নলেখ অবস্থিত হয়েছে, যেগুলি সুপ্রাচীন কিউনিফর্ম ও হিয়েরোগ্‌-ফ বা চিত্র লিপিতে লিখিত ছিল। এগুলির অধিকাংশের ভাষা ছিল হিট্টীয়। কিছু কিছু সংখ্যক প্রত্নলেখে প্রাচীন ইন্দো-ইরানীয় ভাষা ও প্রাচীন হিট্টীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল খ্রিস্টের জন্মের দেড় হাজার বছর আগেকার।

অনুমান করা হয়, প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার দুটি রূপ ছিল। যথা — সাহিত্যিক রূপ ও কথ্যরূপ। প্রাচীনতর সাহিত্যিক রূপের দ্বারা ধর্মসাহিত্য রচিত হয়েছিল। বিশেষত ঋগ্বেদের সংহিতা, পরে 'বেদ' গুলি বৈদিক ভাষায় লেখা হয়েছিল। বৈদিক ভাষাই ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচীন সাহিত্যিক রূপ। অর্থাৎ এটিই প্রথম সাধুভাষা। প্রাচীনকালের বৈদিক ভাষা ছিল মূলত বৃহত্তর জনসাধারণের মুখের জীবন্ত ভাষার উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই ভাষার অপর নাম ছান্দস ভাষা।

আর দ্বিতীয় অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কথ্যরূপ অপে(াকৃত নবীনতর। এটি সেকালের শিষ্টভাষা অর্থাৎ শি(িত ব্যক্তি(র ব্যবহারের এবং লৌকিক আখ্যান উপখ্যানের ভাষা। তবে বিশেষজ্ঞরা কেউ কেউ মনে করেন কথ্যরূপের তিনটি প্রধান আঞ্চলিক ভেদ গড়ে উঠেছিল। যথা — প্রাচ্য, উদীচ্য ও মধ্যদেশীয়।

ক. 'প্রাচ্য' — পূর্ব ভারতের অযোধ্যা, উত্তর-ভারতের পূর্বাঞ্চল, বিহার ইত্যাদি স্থানে অবস্থিত।

খ. 'উদীচ্য' — উত্তর পশ্চিম ভারত ও উত্তর পাঞ্জাবে অবস্থিত।

গ. 'মধ্যদেশীয়' — পশ্চিম ভারতের মধ্যদেশ দিল্লী, মীরাট, মথুরা প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থিত।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ওই তিনটি কথ্যরূপ (প্রাচ্য, উদীচ্য ও মধ্যদেশীয়) ছাড়াও আর একটি কথ্য রূপ ছিল, যার নাম 'দা(িণাত্য'। মহারাষ্ট্র বা দা(িণাত্যে অবস্থিত ছিল এই কথ্যরূপটি। এগুলি সবই কথ্যরূপের আঞ্চলিক উপভাষা। এদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল দ্রুত পরিবর্তিত হওয়া। তাই প্রাচীন ভারতীয় আর্যের কথ্যরূপ দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে।

তখন অনেকেই বৈদিক তথা দেবভাষার এই পরিবর্তনকে বিকৃতি মনে করেছিলেন। তাই ভাষার শুদ্ধ মার্জিত রূপের আদর্শ রচনা করার জন্যে ব্যাকরণ রচনা করেন অনেকে। ব্যাকরণের নিয়ম মেনে ভারতীয় আর্যভাষার একটি শুদ্ধরূপ গঠিত হল। সেটি হল সংস্কৃত। মূলত যে ভাষাতে বেদ লেখা হয়েছে, তাকে বলা হয় বৈদিক ভাষা। আর পাণিনির সংস্কার করা আর্য ভাষা হল সংস্কৃত। তবে বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা হল প্রাচীন ভাষার দুটি সাধুরূপ। তবে কথ্যরীতির ভাষা বা মুখের ভাষা এর পিছনে অবশ্যই ছিল।

বৈদিক যুগের ভারতীয় আর্যভাষাই হল প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার নিদর্শন। এই প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি এবারে আলোচনার পালা।

৩.২.৫.৩ : ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য

ক. প্রাচীন বৈদিক ভাষায় 'ঌ' কার ধ্বনির প্রচলন ছিল। কিন্তু বৈদিক যুগের শেষে ওই 'ঌ' কার ধ্বনি লোপ পেতে থাকে। শুধু 'ঌ' কার ধ্বনি নয় — ঋ, ঋৃ এ, ঐ প্রভৃতি স্বরধ্বনিও বেদের পরবর্তী যুগে লোপ পেয়েছে।

খ. বৈদিক ভাষায় মূর্ধন্য ধ্বনির ব্যবহার খুবই কম ছিল। তবে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে মূর্ধন্য ধ্বনির ব্যবহার একটু বেশিই ছিল।

গ. বৈদিক ভাষায় স্বরাঘাতের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই স্বরাঘাতের ফলেই শব্দের অর্থও

পরিবর্তিত হত। স্বরধ্বনির এই পরিবর্তন তিনটি ত্র(মে হত। যথা—গুণ দীর্ঘ সম্প্রসারণের দ্বারা।

ঘ. বৈদিক ভাষায় দুটি ধ্বনির সম্ভাব্য স্থানে সন্ধি হতোই বৈদিক সংস্কৃতে সন্ধি গভীরভাবে বাধ্যতামূলক ছিল না। যেমন — মনীষা + অগ্নি = 'মনীষা অগ্নি' এখানে সন্ধি করা হলেও চলত, না হলেও চলত। কিন্তু ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃতে সন্ধি ছিল বাধ্যতামূলক।

ঙ. বৈদিক ভাষাই যুক্ত(ব্যঞ্জনের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার ছিল। যেমন — ত্র(, র্দ্ধ, ৎস্ন ইত্যাদি। কিন্তু মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় অনেক যুক্ত(ব্যঞ্জন সমীভূত হয়ে গেল এবং নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় ওই যুক্ত(ব্যঞ্জন একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছিল।

৩.২.৫.৪ : রূপগত বৈশিষ্ট্য

ক. বৈদিক ভাষায় শব্দরূপের বৈচিত্র্য ছিল অনেক বেশি। যেমন- 'নর' শব্দের দ্বিবচনে ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃতের প্রথমা ও দ্বিতীয় বিভক্তি(তে একটি রূপ 'নরৌ' পাওয়া গেলেও বৈদিকে আরও একটি রূপ 'নরা' পাওয়া যেত।

খ. বৈদিকে ত্রি(য়ার ভাব ছিল পাঁচটি। যথা — নির্দেশক (Indicative), অনুজ্ঞা (Imperative), অভিপ্রায় (Subjective), সম্ভাবক (Optative) এবং নির্বন্ধ (Injunctive)।

গ. মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মতো প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বা বৈদিক ভাষার ত্রি(য়ার পাঁচটি কাল ছিল। যথা— লট্ (Present), লৃট (Future), লঙ (Imperfect Past), লিট্ (Past Perfect) ও লুঙ্ (Aorist)। এ ছাড়া এখানে অতীত কালের তিনরকম প্রয়োগ ছিল। যথা — অসম্পন্ন (লঙ), সামান্য (লুঙ) ও সম্পন্ন (লিট)।

ঙ. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় কারকের সংখ্যা ছিল আটটি। যথা — কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণ, সম্প্রদান কারক, অপাদান কারক, অধিকরণ কারক, সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদ। ভিন্ন ভিন্ন কারকের বিভক্তি(ও আলাদা আলাদা ছিল।

চ. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় দীর্ঘ সমাসের প্রয়োগ নেই। দুই পদের মাত্র সমাস হত। পরে সংস্কৃতে সমাসের ব্যবহার খুব বেড়ে গেলে বহু পদময় সমাস সৃষ্টি হয়।

ছ. বৈদিক ভাষায় শর্তৃ, শানচ্ ইত্যাদি প্রত্যয় যোগে ত্রি(য়াগত বিশেষণ সৃষ্টি করা হত। যেমন — $\sqrt{}$ যজ > যজমান।

জ. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মতই বৈদিক ভাষায় তিন প্রকার লিঙ্গের ব্যবহার ছিল। যথা — পুং লিঙ্গ, স্ত্রী লিঙ্গ ও ক্লীব লিঙ্গ। তবে লিঙ্গভেদ অনুসারে লিঙ্গভেদ না হয়ে প্রকৃতি নির্দিষ্টভাবে হত।

ঝ. শব্দরূপেও বৈচিত্র্য ছিল প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায়। বচনকে তিন ভাগে এখানে ভাগ করা হয়েছিল। যথা — একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন। তবে শব্দরূপের থেকে ত্রি(য়ারূপে বৈচিত্র্য প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় বেশি ছিল। বাচ্যকে দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা — কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্য। এ ছাড়া অসমাপিকা পদের ব্যবহার ও বৈদিক ভাষায় ছিল। পু(ষ ছিল তিন প্রকার। যথা — উত্তম পু(ষ, মধ্যম পু(ষ ও প্রথম পু(ষ।

ঞ. বৈদিক শব্দরূপে অতিরিক্ত পদও ছিল।

ট. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় উপসর্গ শুধু ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েই ব্যবহৃত হত না। স্বাধীনপদ রূপেও উচ্চারিত হত।

ঠ. বাক্যে কোন্ পদ আগে, কোন্ পদ পরে বসবে সে সম্বন্ধে কোনও বাঁধাধরা নিয়ম প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় ছিল না। এখানে কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে ধাতু ও শব্দ থেকে নতুন পদ গঠিত হত।

৩.২.৫.৫ : ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার অক্ষরমূলক ছন্দ প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ অক্ষরের সংখ্যা বিচার করে ছন্দ নির্ণয় করা হত। তবে পরবর্তীতে যে মাত্রামূলক ছন্দরীতির প্রয়োগ দেখা যায়, তার সঙ্গে এই অক্ষরমূলক ছন্দের একটা পার্থক্য ছিল। মাত্রামূলক ছন্দ পদ্ধতিতে অক্ষরের সংখ্যা অনুসারে নয়, অক্ষর উচ্চারণের কাল বা মাত্রা অনুসারে ছন্দ নির্ণয় করা হত।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার মধ্যে পরবর্তী স্তরের অনেক শব্দ ও বাক্রীতি এসেছে, যেগুলিকে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় নিজস্ব বলে গ্রহণ করা যায়নি। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিস্তার আসলে প্রাচীন ভারতীয় আর্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সংস্কৃত প্রাচীন ভারতীয় আর্যের মধ্যেও আছে এবং প্রাকৃত স্তরেও এসেছে।

৩.২.৫.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। ভারতীয় আর্যভাষার সময়কাল কত?

২। ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাস ও যুগবিভাজন করো।

৩। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো।

৪। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার রূপগত বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

৫। এই পর্বের ছন্দগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দাও।

৩.২.৫.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। ড. রামেশ্বর শ, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৩৯০, পৃষ্ঠা ৫৪৬।

২। ড. শ্রীকুমার বিশ্বাস, ভাষাবিজ্ঞান পরিচয়, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃষ্ঠা ১১৪।

৩। সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৯৬), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৪। মহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, মাওলা ব্রাদার্স।

৫। অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভাষাবিদ্যা পরিচয়, জয়দুর্গা লাইব্রেরি।

———————

একক - ৬

মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা

বিন্যাস ক্রম :

৩.২.৬.১ মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা

৩.২.৬.২ ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য

৩.২.৬.৩ রূপগত বৈশিষ্ট্য

৩.২.৬.৪ ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য

৩.২.৬.৫ আদর্শ প্রশ্নোবলি

৩.২.৬.৬ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩.২.৬.১ : মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা

বৈদিক ও সংস্কৃত ছাড়াও প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার একটি কথ্যরূপ লোকমুখে প্রচলিত ছিল। এই কথ্যরূপটি প্রায় হাজার বছর ধরে কালে কালে পরিবর্তিত হয়েছে। এই কথ্যরূপের কিছু কিছু নিদর্শন আছে অবৈদিক নানা শাস্ত্র ও পুরাণে। এ ছাড়া বৌদ্ধদের ব্যবহৃত গাথা ভাষাতেও এই কথ্যরূপের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সব বুদ্ধবচনের ভাষা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার খুব কাছাকাছি হলেও বৌদ্ধিক বা সংস্কৃত নয়। বৌদ্ধরা এই ভাষার নাম দিয়েছেন পালি। এটি লিখিত সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীতে বৌদ্ধ শাস্ত্রের ভাষা হিসেবে এখনও নানা দেশে এ ভাষার চর্চা করা হয়। তবে এর প্রাথমিক রূপের ভিত্তি ছিল সমকালীন ও প্রাচীন ভারতীয় কথ্যভাষা থেকে আলাদা। অর্থাৎ এই সময় থেকে ভারতীয় আর্যভাষীর অন্য এক যুগের সূচনা হিসেবে ধরা হয়। এই যুগটির নাম দেওয়া হয় 'মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার যুগ' । ৬০০ খ্রি পূর্বাব্দ থেকে ৯০০ খ্রি পর্যন্ত এই যুগের বিস্তৃতিকাল।

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রথম ভাগে পালি ভাষার উদ্ভব ঘটে। পালি ভাষা সাধুরীতির সাহিত্যিক ভাষা হওয়া সাধারণের জন্য উপযুক্ত(হয়নি। তবে বুদ্ধদেবের 'সকায় নি(ত্তিয়া' পালি ভাষায় রচিত। অনুমান করা হয় অর্ধ-মাগধী প্রাকৃত ভাষা থেকে পালি ভাষার উদ্ভব ঘটে।

মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার মধ্যভাগে সাহিত্যিক প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব ঘটে এবং তৃতীয় স্তরের ভাষা অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ এই দুটি ধারায় বিবর্তিত হতে থাকে। সুতরাং বোঝা যায় মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার কাল বিস্তৃত। এই কালের মধ্যে ভারতীয় আর্যভাষার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এই কারণে এই যুগটিকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। যথা —

(ক) প্রাচীন বা প্রথম স্তর

(খ) মধ্য বা দ্বিতীয় স্তর

(গ) অন্ত্য বা তৃতীয় স্তর

১. মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার — প্রথম স্তরের কালসীমা খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত অর্থাৎ প্রথম স্তরটি ছয়শো বছর স্থায়ী হয়েছিল।

২. মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার মধ্যস্তরের কালসীমা খ্রিস্টিয় প্রথম থেকে ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ দ্বিতীয়-পর্যায়টিও ছশো বছর স্থায়ী হয়েছিল।

৩. মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার তৃতীয় স্তরের কালসীমা খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টিয় দশম শতক পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ এই তৃতীয় পর্যায়টি চারশো বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রধান ভাষা হল প্রাকৃত ভাষা। তবে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত, মিশ্র সংস্কৃত ও পালিও এই যুগে পড়ে। সংস্কৃত নাটকে নারী ও নিম্নশ্রেণির পু(ষের সংলাপে প্রাকৃত ভাষ্য ব্যবহৃত হয়েছে। জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিও এই প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। প্রাকৃত ব্যাকরণগুলি এই প্রাকৃত ভাষাকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছে। যথা — (ক) মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃত (খ) শৌরসেনী প্রাকৃত (গ) মাগধী প্রাকৃত (ঘ) পৈশাচী প্রাকৃত ও (ঙ) অর্ধমাগধী প্রাকৃত। ব্যাকরণবিদদের মতে মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃত হল মূলত প্রাকৃত। সংস্কৃত নাটকের নারী চরিত্রের গানগুলি মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃত ভাষায় রচিত গাথা-সপ্তসতী ইত্যাদি গ্রন্থের ভাষাও এটি।

শৌরসেনী প্রাকৃত হল সংস্কৃত নাটকের নারী ও পু(ষ চরিত্রগুলির সংলাপের ভাষা। শুরসেন অঞ্চল অর্থাৎ বর্তমান মথুরা অঞ্চলে এই ভাষার প্রচলন ছিল। এই ভাষা শক্ ও হুনদের শাসনকার্যে ব্যবহৃত হত। সংস্কৃতের সঙ্গে এর যোগ ছিল নিবিড়।

মাগধী প্রাকৃতও সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত হত। তবে নিচু জাতির চরিত্রগুলির মুখে এই মাগধী প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হত। এই ভাষা ছিল মূলত হাস্যরসাত্মক। অ(্ব ঘোষের নাটকে এই মাগধী প্রাকৃতের ব্যবহার দেখা গেছে। এরই অন্তর্গত ভাষা হল শাকারী, চাণ্ডালী, শাবরী ইত্যাদি।

পৈশাচী প্রাকৃত ছিল লোকসাহিত্যের ভাষা। আভিধানিক অর্থে পিশাচদের মুখের ভাষা পৈশাচী প্রাকৃত। তাই সংস্কৃতের মতো উঁচুমানের সাহিত্যে এটি জায়গা পায়নি। অবশ্য গুণাঢ্য তাঁর ‘বৃহৎ কথা’ গ্রন্থটি পৈশাচী প্রাকৃত ভাষায় রচনা করেন।

জৈনদের গ্রন্থগুলি অর্ধমাগধী প্রাকৃতে লেখা। তাই অর্ধমাগধী প্রাকৃতকে কেউ কেউ বলেন জৈনপ্রাকৃত। এটি মাগধীর প্রতিবেশী ভাষা বলেই অনেকে মনে করেন। জৈন ব্যাকরণবিদ্রা মনে করেন অর্ধমাগধী শাস্ত্রের ভাষা।

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রাকৃতের অন্ত্যস্তর হল অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ। এই ভাষাই নব্য ভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব ঘটিয়েছে। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার এই শেষস্তরকে কেউ কেউ বলেছেন অপভ্রংশের স্তর। কেউ বলেছেন অপভ্রষ্ট বা অর্বাচীন অপভ্রংশের স্তর। এই অর্বাচীন অপভ্রংশ ভাষা থেকেই উত্তর-ভারতের নানা অঞ্চলে রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, মৈথিলি, হিন্দি, পাঞ্জাবী, গুজরাটি, মারাঠী ও কোঙ্কনী প্রভৃতি নব্য ভারতীয় ভাষার উদ্ভব ঘটেছে। এই অপভ্রষ্ট ভাষাগুলির মধ্যে কতগুলি ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আছে। সুকুমার সেন অপভ্রষ্ট ভাষাগুলির মধ্যে চৌদ্দোটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। যেমন — এই ভাষায় কর্তা ও কর্মের বিভক্তি(নেই। এই ভাষার শব্দরূপ সবই একবচনের মতো নয়। তবে দু’একটি প্রাচীন প্রয়োগে কখনও কখনও বহুবচনের চিহ্(পাওয়া যায়। এই ভাষার শব্দরূপে লিঙ্গভেদ নেই। অবহট্‌ঠ ভাষার তিন প্রকারের কারক দেখা যায়। যথা — মুখ্যকারক দুটি (যথা — কর্তা ও কর্ম) আর একটি গৌণকারক। এখানে সর্বনামের বহুবচনের পদ কম পাওয়া যায়। এই ভাষার ত্রি(য়াপদ। এ ছাড়া এই ভাষায় মাত্রামূলক ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়। এখানে যুগ্মব্যঞ্জন খানিকটা সরল ভাবে উচ্চারিত হয়। সমাসের প্রয়োগ ও অর্বাচীন অপভ্রষ্ট ভাষায় কম দেখা যায়।

উপরে যে সব মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার কথা বলা হল সেগুলি ছাড়া ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতকেও কালের বিচারে মূলত মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার যুগে ফেলা যায়। যদিও ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে এগুলিকে প্রাচীন ভারতীয়

আর্যভাষার মধ্যে ফেলা যায়। তবে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার প্রথম স্তরের পালি ভাষার বিবর্তন প্রাকৃতের মতো নয়। মৌর্য সম্রাট অশোকের অনুশাসনের সময় পাহাড়ের গায়ে বা স্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ লিপিগুলিতে এই পালি ভাষায় নিদর্শন পাওয়া যায়।

৩.২.৬.২ : ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য

ক. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষারই ‘ঌ’ মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় আর রইল না।

খ. মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় পদের শেষে অবস্থিত অনুস্বার (ং) র(িত হয়েছে। যেমন— নবম্ > নরং।

গ. এই পর্বে দুই স্বরের মধ্যবর্তী একক ব্যঞ্জন অল্পপ্রাণ হয়ে লোপ পেয়েছে। কখনও কখনও শ্রুতিধ্বনি হিসেবে ‘য়’ বা ‘ব’ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন —

সকল > সঅল - সঅল সমাহিঅ।

ঘ. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার যৌগিক স্বর মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় একক স্বরে পরিণত হয়েছে। যেমন — অয় > এ

ঙ. মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় যুক্ত(ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্বস্বরে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন — দীর্ঘ > দিগ্‌ঘ।

চ. এই পর্বে সংযুক্ত(ব্যঞ্জনের মধ্যে শুধু (এর পরিবর্তন আলাদা ভাবে হয়েছে। এটি ‘কখ’ বা ‘চছ’ ও হয়েছে। যেমন — বৃ(> বৃক্‌খ।

ছ. মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় পদের শেষে অনুস্বার র(িত হলেও পদের শেষে ‘অ’ কারের পর অবস্থিত বিসর্গ (ঃ) লোপ পেয়েছে। এবং বিসর্গ কখনও ‘ও’ কার হয়েছে। আবার কখনও হয়েছে ‘এ’ কার। যেমন — জনঃ > জন ইত্যাদি।

জ. এ ছাড়া মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় পদের প্রথমে অবস্থিত সংযুক্ত(ব্যঞ্জন দু-রকম ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। যথা—কখনও দুটি ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে একটি লোপ পেয়েছে, আবার কখনও বা সংযুক্ত(ব্যঞ্জনের মাঝখানে স্বরধ্বনি এসে সেই ব্যঞ্জনকে আলাদা করেছে।

৩.২.৬.৩ : রূপগত বৈশিষ্ট্য

ক. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় তিন প্রকার বচন ছিল। যথা — একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন। কিন্তু মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় দ্বিবচন লোপ পেয়ে একবচন ও বহুবচনের রূপ রইল।

খ. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় বিশেষ্য ও সর্বনামের পার্থক্য থাকলেও মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় বিশেষ্য কখনও কখনও সর্বনামের মতো উচ্চারিত হয়েছে।

গ. প্রাচীন ভারতীয় আর্যে বহুবচনে প্রথমা ও দ্বিতীয়ায় স্বরান্ত শব্দের রূপ পুংলিঙ্গে পৃথক হলেও মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় এই পার্থক্য লুপ্ত হয়েছিল।

ঘ. মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় সব ধাতুরই রূপ ছিল ভ্বাদিগণীয় ধাতুর মতো। যদিও প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ত্রি(য়ার ধাতু ছিল ত্বাদি, দিবাদী প্রভৃতি।

ঙ. এই পর্বে ক্রিয়ারূপের আত্মনেপদ লোপ পেয়ে গেল। সর্বক্ষেত্রে শুধু ব্যবহৃত হতে লাগল পরস্মৈপদ।

চ. মধ্য ভারতীয় আর্যে লঙ্, লুঙ ও লিট্ — এই তিন প্রকার অতীত কালের মধ্যে লিট্ লোপ পেয়েছিল।

ছ. এই পর্বে পাঁচটির পরিবর্তে ক্রিয়ার ভাব হয়ে গেল তিনটি। যথা — নির্দেশক, অনুজ্ঞা ও সম্ভাবক। কিন্তু লুপ্ত হল ক্রিয়ার অভিপ্রায় ও নির্বন্ধ ভাব।

জ. মধ্য ভারতীয় আর্যে এই কারকের বিভক্তি চিহ্ন লোপ পেল। ফলে বাক্যে পদবিন্যাস অবস্থানের উপর অনেকটা নির্ভর করল।

৩.২.৬.৪ : ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য

এই পর্বে আর্যভাষায় মাত্রামূলক ছন্দের ব্যবহার দেখা গেল। অর্থাৎ অক্ষরের সংখ্যা নয়, অক্ষর উচ্চারণের কাল-পরিমাপ মাত্রার উপরে ছন্দের বিন্যাস নির্ভর করত। কবিতার চরণগুলি মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় বিষমমাত্রিক ও সমমাত্রিকের শেষস্তরে চরণের শেষে মিল দেখা গেল।

এখান থেকে নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সূত্রপাত ঘটেছে। কেউ কেউ আবার মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার তিনটি স্তরের মধ্যে শেষ স্তরকেই চিহ্নিত করেছে প্রত্ননব্য ভারতীয় আর্যভাষার (Proto-Neo-Indo Aryan) স্তর বলে।

৩.২.৫.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাস বর্ণনা করো।

২। এই পর্বের আর্যভাষার ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো।

৩। এই পর্বের আর্যভাষার রূপগত বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

৪। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার স্বরূপ বর্ণনা করো।

৫। এই পর্বের ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক গুরুত্ব আলোচনা করো।

৩.২.৫.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। ভাষার দেশ কাল–পবিত্র সরকার।

২। ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী–রফিকুল ইসলাম।

৩। বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত–মহম্মদ শাহীদুল্লাহ

৪। ভাষাবিদ্যা পরিচয়–অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

৫। ভাষাতত্ত্ব–রফিকুল ইসলাম।

————————

একক - ৭

নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা

বিন্যাস ক্রম :

৩.২.৭.১ নব্য ভারতীয় আর্যভাষা

৩.২.৭.২ ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য

৩.২.৭.৩ রূপগত বৈশিষ্ট্য

৩.২.৭.৪ ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য

৩.২.৭.৫ আদর্শ প্র্নোবলি

৩.২.৭.৬ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩.২.৭.১ : নব্য ভারতীয় আর্যভাষা

নব্য ভারতীয় আর্যভাষার বিস্তৃতিকাল অনুমান করা হয় ৯০০ খ্রি থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত। আগের যুগেই প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব ঘটেছিল। পাণিনি তাঁর 'অষ্টাধ্যয়ী' ব্যাকরণের মাধ্যমে আর্যভাষার সংস্কার করেন। অবশ্য পাণিনির ব্যাকরণের ভাষা সংস্কৃত ছিল, যা মানুষের মুখের ভাষা হতে পারেনি। তাই প্রাকৃত ভাষা ছিল প্রাকৃতজনের ভাষা। ভারতীয় আর্যের কথ্যরূপের মধ্যে ছিল প্রাচ্য, উদীচ্য ও মধ্যদেশীয় ভাষা। এগুলিই বিবর্তিত হয়ে প্রাকৃত ভাষার জন্ম দিয়েছিল। আর মুখের প্রাকৃত থেকেই হল সাহিত্যের প্রাকৃত। এই সাহিত্যের প্রাকৃতের পাঁচটি শাখা ছিল যথা —

(ক) মহারাষ্ট্র প্রাকৃত

(খ) পৈশাচী প্রাকৃত

(গ) শৌরসেনী প্রাকৃত

(ঘ) অর্ধমাগধী প্রাকৃত

(ঙ) মাগধী প্রাকৃত

এই সব প্রাকৃতকে ভিত্তি করে একটা বিশিষ্ট কথ্যরীতির ভাষা গড়ে ওঠে। এই ভাষাগুলিই অপভ্রংশ ও অবহট্ট নামে পরিচিত। এর থেকেই পরবর্তীতে বিভিন্ন নব্য ভারতীয় আর্যভাষা সমূহের উৎপত্তি হয়েছে। যেমন— মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত থেকে মারাঠী, গুজরাটী ও রাজস্থানী ইত্যাদি নব্য ভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব হয়েছে। পৈশাচী প্রাকৃত থেকে এসেছে পূর্বী ও পশ্চিমা পাঞ্জাবী ইত্যাদি নব্য ভারতীয় আর্যভাষা। শৌরসেনী প্রাকৃত থেকে বঙা(, নেপালী, কনৌজ ইত্যাদি। অর্ধমাগধী থেকে বাখেলী, ছত্রিশগড়ী ইত্যাদি নব্য ভারতীয় আর্যভাষা। এ ছাড়া মাগধী প্রাকৃতের দুটি উপশাখা থেকে যথাত্র(মে মৈথিলী, ভোজপুরী, মগহী (পশ্চিম শাখা) ও বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া (পূর্ব শাখা) ইত্যাদি নব্য ভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব ঘটিয়েছে।

সুতরাং নব্য ভারতীয় আর্যভাষার একটি সং(প্ত বিবরণ দিলে দেখা যাবে, এই ভাগের মধ্যে পড়ছে নিম্নলিখিত ভাষাগুলি। যেমন — প্রথমেই কা্মীরি ভাষা, যেটি কা্মীরের প্রধান ভাষা। পাঞ্জাবী ভাষার পশ্চিমা পাঞ্জাবী ও পূর্বী পাঞ্জাবী হল নব্য ভারতীয় আর্যভাষা। বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত সিন্ধু প্রদেশের

ভাষা সিন্ধী (ফার্সি লিপিতে লেখা) হল নব্য ভারতীয় আর্যভাষা। গুজরাট, মারাঠা ও গোয়া অঞ্চলের কোঙ্কনী ভাষা মারাঠী ভাষার উপভাষা হিসেবে গণ্য হলেও এগুলি স্বতন্ত্র ভাবে নব্য ভারতীয় আর্যভাষা হিসেবেই পরবর্তীতে পরিচিত হয়েছে। হিমালয়ের পশ্চিমে ও মধ্যাঞ্চলেও কয়েকটি নব্য ভারতীয় আর্যভাষা অবস্থিত। যেমন — নেপালী, মৈথিলী, কুমায়ুনী ও গাড়োয়ালী ভাষা। এ ছাড়া ভারতীয় রাষ্ট্র ভাষা হিন্দি নিঃসন্দেহে নব্য ভারতীয় আর্যভাষা। হিন্দির দুটি ভাগ, যথা (ক) পুর্বী হিন্দি বা কোশলী ভাষাগুচ্ছ, যার মধ্যে আছে অবধী, বাখেলী ও ছত্তিশগড়ী ভাষা। (খ) পশ্চিমা হিন্দি বা খড়ী কেলী, যার মধ্যে পড়ে বঙ্গা(, কথ্য হিন্দুস্থানী, ব্রজভাষা, কনৌজী প্রভৃতি ভাষা। মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরী, ওড়িয়া, বাংলা ও অসমিয়া এই ছয়টি ভাষা তো নব্য ভারতীয় আর্যভাষাই।

এ ছাড়া দুটি বহির্ভারতীয় ভাষাকেও নব্য ভারতীয় আর্যভাষা হিসেবে ধরা হয়। যথা — শ্রীলঙ্কা বা সিংহলের ভাষা সিংহলী ও যাযাবরদের ভাষা জিপসী বা রোমনি। অনুমান করা হয় প্রাচ্য প্রাকৃতের একটি শাখা খ্রি পূ ৪০০ অব্দে সিংহলে চলে যায়। এই শাখা থেকেই 'সিংহলী' ভাষার সৃষ্টি। মাগধীর পূর্বরূপ থেকে এর বিবর্তন হয়েছিল বলে একে মাগধী গোষ্ঠীর ভাষাও বলা হয়। আর উত্তর-পশ্চিম ভারতের একটি আর্যশাখা ভারতের বাইরে গিয়ে 'জিপসী ভাষা' সৃষ্টি করেছে। এই ভাষাটি পৈশাচী গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত(। বর্তমানে ইউরোপের নানা দেশ। যেমন— আর্মেনীয়া, তুরস্ক ও সিরিয়ায় এই 'জিপসি' ভাষা প্রচলিত। এই ভাষায় প্রচুর বাংলা শব্দ, ইউরোপ ও এশিয়ার শব্দ ঢুকে গেছে।

৩.২.৭.২ : ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য

ক. মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার যুগ্মব্যঞ্জন নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সরল হয়েছে এবং পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়েছে। যেমন — নচ্চ > নাচ, পক্ক > পাক ইত্যাদি। তবে পাঞ্জাবীতে যুগ্মব্যঞ্জন থেকেই গেছে। যেমন — রত্ত, কর্ম্ম্। আবার সিন্ধীতে পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়নি। যেমন — রতু ইত্যাদি।

খ. নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় নাসিক্য যুক্ত(ব্যঞ্জনের নাসিক্য ব্যঞ্জনটি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে আনুনাসিক করে স্বস্থানে লুপ্ত হয়েছে। ফলে যুক্ত(ব্যঞ্জন সরল হয়েছে ও আনুনাসিক স্বরধ্বনিটি দীর্ঘ হয়ে গেছে। যেমন — সন্ধ্যা > সএ(ঝা, দন্ত > দাঁত।

কিন্তু সিন্ধীতে নাসিক্য যুক্ত(ব্যঞ্জন রয়েই গেছে। যেমন—

হস্ত > হত্থ্ (পাঞ্জাবী)

হস্ত > হত্থু (সিন্ধী)

গ. এই পর্বে পদান্তে অবস্থিত স্বরধ্বনি প্রায়ই লুপ্ত অথবা বিকৃত হয়েছে। যেমন—দধি > দহী।

তবে ওড়িয়া ভাষায় এই নিয়ম অনেকটা র(ি ত।

ঘ. নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় স্বরমধ্যবর্তী স্পর্শ ব্যঞ্জনের এর পরিণতি মোটামুটি তিন রকমের। যথা —

১. সন্ধি সূত্রে — গঅ + ইল্ল > গেল (বাংলা, অসমীয়া ইত্যাদি)

২. একটির লোপ হয় — ঘৃত > ঘিঅ > ঘি (বাংলা, হিন্দি, পাঞ্জাবী ইত্যাদি)

৩. দ্বিঘরে পরিণত হয় — মধু > মউ > মৌ (বাংলা)

৩.২.৭.৩ : রূপগত বৈশিষ্ট্য

ক. নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় পদান্তের স্বরধ্বনি লুপ্ত হওয়ার জন্য লিঙ্গ পার্থক্যের চিহ্(ও লুপ্ত হয়েছিল, যেমন—গুজরাটি ও মারাঠিতে ক্লীবলিঙ্গ রয়ে গেল। যেমন—দধি > দহি। সিংহলীতে নতুন করে দুটি লিঙ্গের সৃষ্টি হল। যথা—সপ্রাণ ও অপ্রাণ। আর হিন্দিতে নতুন করে স্ত্রীলিঙ্গের জন্য বিভক্তি(এল।

খ. এই পর্বে স্বরধ্বনির পরিবর্তনের ফলে প্রাচীন শব্দরূপের সব চিহ্(লুপ্ত হয়ে গেল। ফলে অনুসর্গজাত কিছু শব্দ, নতুন কারক বিভক্তি(হিসেবে যোগ হল। অবশ্য কর্তৃকারক, করণকারকের বিভক্তি(রয়েই গেল। আবার সম্বন্ধ পদের একবচন ও বহুবচনের বিভক্তি(রয়ে গেল কোনও কোনও (ে ত্রে। যেমন—সংস্কৃত চৌরস্য > চুরস-কা(মীরি, চোরেস-জিপসী

গ. নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় কারক মুখ্যত দুই প্রকার। যথা—মুখ্যকারক ও গৌণকারক। মুখ্য কারকে শূন্য বিভক্তি(। আর গৌণকারকে ষষ্ঠী বা সপ্তমী বিভক্তি(যোগ করে তার অনুসর্গ যোগ করা হল। কর্মকারক ও কর্তৃকারকে বিভক্তি(আগেই এক হয়ে গিয়েছিল।

ঘ. এই পর্বে ভাষাগুলির মধ্যে কাল ও ভাবের মধ্যে কেবল কর্তৃবাচ্য, কর্ম-ভাব-বাচ্যে অনুজ্ঞা ভাবের রূপগুলি বজায় আছে। ভবিষ্যৎ কালের রূপও কোনও কোনও (ে ত্রে রয়ে গেছে। প্রায় সব(ে ত্রে নিষ্ঠা প্রত্যয় যোগে ও ইংরেজি যোগে অতীত কালের পদ নির্মিত হয় ও শর্তৃ প্রত্যয় যোগে ভবিষ্যৎ কালের রূপ গঠন করা হয়েছে।

ঙ. এই পর্বে বাক্যের মধ্যে কর্তা, কর্ম প্রভৃতি পদের স্থান প্রায় নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। এই স্থান পরিবর্তন করলে বাক্যের অর্থ বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারে। যেমন—মানুষ কোনও কোনও বন্যপ্রাণী খায়। এখানে কর্তা—মানুষ, বাক্যের আদিতে বসেছে। কিন্তু যদি বলা হয় কোনও কোনও বন্যপ্রাণী মানুষ খায় এখানে কর্তার বদল হয়ে যাওয়ার ফলে বাক্যের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

চ. এখানে মুখ্যকারকে একবচন ও বহুবচনের পার্থক্যসূচক বিভক্তি(গুলি প্রায় সব ভাষাতেই লুপ্ত হয়েছে। ফলে বহুত্ববোধক শব্দ অথবা সম্বন্ধপদের বহুত্ববাচক বিভক্তি(কাজে লাগানো হয়ে থাকে। অবশ্য সিন্ধ্রী, মারাঠী ও পশ্চিমা হিন্দিতে এর ব্যতিত্র(ম নিয়ম দেখা যায়।

ছ. এই পর্বে একাধিক ধাতুর সংযোগে গঠিত যৌগিক ত্রি(য়ারূপ দেখা দিল।

যেমন—$\sqrt{}$ কর + ইয়া (ঐ + $\sqrt{}$ আছ্ + এ = করেছে। এখানে 'কর' ও 'আছ' দুটি ধাতু মিলে একটি ত্রি(য়া গঠিত হয়েছে।

জ. নব্য ভারতীয় আর্যে পূর্বাঞ্চলের ভাষাগুলিতে কর্মবাচ্যের রূপ বদলে কর্তৃবাচ্যের রূপ পেয়েছে। যেমন—অস্মাভিঃ পুস্তিকা পঠিতা (কর্মবাচ্য) > আমি পুঁথি পড়ি (কর্তৃবাচ্য)

৩.২.৭.৪ : ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য

নব্য ভারতীয় আর্যভাষার ছন্দ মাত্রামূলক ও সমাপিকা। তার সঙ্গে অন্ত্যানুপ্রাস এসেছে। অতি আধুনিককালে গদ্যছন্দের ব্যাপক প্রচলনের ফলে সমমাত্রিক অনুপ্রাস যুক্ত(ছন্দোরীতির অবশ্য অচল হয়ে গেছে। মোট কথা বাংলার (ে ত্রে মাত্রাবৃত্ত, দলবৃত্ত, অমিত্রা(র, মিত্রা(র, পদ্য ইত্যাদি ছন্দের আগমনে সমৃদ্ধ।

৩.২.৭.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাস নির্ণয় করে যুগবিভাজন করো।

২। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বলতে কী বোঝো? এই ভাষার বৈশিষ্ট্যাবলী লেখো।

৩। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সময়সীমা অনুযায়ী এর স্তর বিভাজন করো।

৪। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

৫। নব্য ভারতীয় আর্যভাষা বলতে কী বোঝো? এই ভাষার সময়সীমা ও নিদর্শন উল্লেখ করে বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

৩.২.৭.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' (১৪০৩) — ড. রামেশ্বর শ, পুস্তক বিপণি।

২। 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৬) — সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৩। 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' (১৯৯৭) — আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, নয়া উদ্যোগ।

৪। 'ভাষাতত্ত্ব' (১৩৯৬) — রফিকুল ইসলাম, উজ্জ্বল বুক স্টোরস্।

৫। 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৮) — মহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মাওলা ব্রাদার্স।

৬। 'ভাষাবিদ্যা পরিচয়' (২০০২) — অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জয়দুর্গা লাইব্রেরি।

৭। 'ভাষা পরিক্রমা' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ২০০২) — অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার, দেজ পাবলিশিং।

৮। 'ভাষা দেশ-কাল' (২০০০) — পবিত্র সরকার, মিত্র ও ঘোষ।

৯। 'ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী' (১৯৯৮) — রফিকুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি।

১০। 'ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা' (২০০৪) — অনিমেষকান্তি পাল, বামা পুস্তকালয়।

১১। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (২০০২) — সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

১২। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (সমাজভাষা, ২০০৩) — সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

১৩। 'বাংলা গদ্য স্টাইলিস্টিকস্' (২০০১) — নবেন্দু সেন, মহাদিগন্ত।

১৪। 'ফলিত ভাষাবিজ্ঞান' (১৯৯৭) — ভূদেব বিশ্বাস ও ভবদেব বিশ্বাস, তাহেরপুর কবিতা কুটির।

১৫। 'শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৮) — অপূর্ব দে, মডার্ন বুক এজেন্সি।

১৬। 'সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৪) — আশিস দে, পুস্তক বিপণি।

————————

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

বাংলা ভাষার ইতিহাস

একক - ৮

বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

বিন্যাস ক্রম :

৩.৩.৮.১	মূল আর্যভাষাবংশ ও তার শ্রেণিবিভাগ
৩.৩.৮.২	কেন্তুম্ ও সতম্ ভাষাবর্গ
৩.৩.৮.৩	বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ত্র(মবিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস
৩.৩.৮.৪	আদর্শ প্র(্নাবলি
৩.৩.৮.৫	সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩.৩.৮.১ : মূল আর্যভাষাবংশ ও তার শ্রেণিবিভাগ

পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষা সেই সুদূর প্রত্নভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্যভাষাবংশ থেকে সৃষ্ট। এই সুদূর প্রাচীন ভাষার সৃষ্টি কোনো্ ভাষা থেকে এর নিদর্শন আজও অনাবিষ্কৃত। আবার এই ভাষাগোষ্ঠীর মানুষদের প্রকৃত অবস্থান কোথায় ছিল তাও পারস্পরিক মতভেদে কন্টকিত। একদল পণ্ডিত মনে করেন এই ভাষাগোষ্ঠীর বাসস্থান ছিল মধ্য এশিয়ায়, অন্যদলের ধারণা এঁদের বাসস্থান ছিল মধ্য ইউরোপ। আবার সাম্প্রতিককালে কিছু তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় এখনকার পণ্ডিতেরা মনে করেন রাশিয়ার ইউরাল বা উরাল পর্বতের দ(িণে, দ(িণ-পূর্ব রাশিয়া ও কিরগিজস্থানের ঊষর অঞ্চলই ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর আদি বাসস্থান।

আনুমানিক ২৫০০ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই ভাষাগোষ্ঠীর অধিবাসীগণ ত্র(মে উপরে কথিত অবস্থান থেকে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এরূপে প্রায় দীর্ঘ হাজার বছর অতিত্র(ান্ত হয়ে এই ভাষাগোষ্ঠী স্বতন্ত্র চিহি(ত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আহরণ করে ভারাত্র(ান্ত হয়ে পড়ে এবং এই ভাষাগোষ্ঠী থেকে ১০টি ভাষাশাখার সৃষ্টি হয়। এগুলি হল--ইন্দো-ইরানীয়, কেলতিক, ইতালিক, জার্মানিক বা টিউটনীয়, গ্রীক, আর্মেনীয়, আলবানীয়, বালতোস্লাভিক, তুখারীয় এবং হিত্তিয়।

৩.৩.৮.২ : কেন্তুম্ ও সতম্ ভাষাবর্গ

ভাষাবিজ্ঞানীরা উপরের এই দশটি ভাষা শাখাগুলিকে একটি বিশেষ ধ্বনির সাম্য ও বৈষম্যের ভিত্তিতে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন--কেন্তুম্ বর্গ ও সতম্ বর্গ।

কেন্তুম্ বর্গ মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পুরঃকণ্ঠ্য স্পৃষ্টধ্বনি পরবর্তীকালে গ্রীক, ইতালিক, কেলতিক, টিউটনিক, তোখারীয় এবং হিত্তিয় ইত্যাদি ভাষাশাখায় পশ্চাৎকণ্ঠ বা স্নিগ্ধতালব্য হয়ে গেছে । এই সাদৃশ্যের কারণে এই ভাষা শাখাগুলিকে কেন্তুম্ বর্গের অন্তর্ভুক্ত(করা হয়েছে।

সতম্ বর্গ মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পুরঃকণ্ঠ্য স্পৃষ্টধ্বনি পরবর্তীকালে ইন্দে-ইরানীয়, বালতোস্লাবিক, আলবানীয় ও আর্মেনীয় ইত্যাদি ভাষায় শিস্ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। এই সাদৃশ্যের কারণে এই ভাষাশাখাগুলিকে সতম্ বর্গের অন্তর্ভুক্ত(করা হয়েছে।

সত্ম বর্গের শাখাগুলির মধ্যে প্রাচীন সাহিত্যে বিশেষ সমৃদ্ধ হল ইন্দো-ইরানীয় ভাষা। এই ভাষা শাখা আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে দ্বিধাবিভক্ত(হয়ে এর এক অংশ প্রবেশ করে ইরান, অপর অংশ ভারতে। ইরানে যে শাখাটি প্রবেশ করে তার প্রাচীনতম ভাষা নিদর্শন পাওয়া যায় প্রাচীন পারসিক ধর্মগ্রন্থ ‘আবেস্তা’ ও হখামেনীয় সম্রাটদের প্রাচীন প্রত্নলিপিতে। অন্যদিকে ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীনতম ভাষা নিদর্শন পাওয়া যায় ঋক্‌বেদে। স্বাভাবিকভাবেই ভাষাবৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ইরানীয় আবেস্তা ও বেদের ভাষা নিবিড় সাদৃশ্যে সম্পৃক্ত(।

৩.৩.৮.৩ : বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ত্র(মবিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস

ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন ঋক্‌বেদের রচনাকাল কখন তা নিয়ে মতভেদ আছে। তবে মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতক থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত এই গ্রন্থ রচনার সময়সীমা নির্দেশ করা হয়ে থাকে। বেদের চারটি অংশ---ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। প্রত্যেক বেদের আবার চারটি করে ভাগ-সংহিতা (মূলমন্ত্রভাগ), ব্রাহ্মণ (যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধি-নিয়ম এবং ব্যাখ্যা), উপনিষদ (আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্ব) এবং আরণ্যক (গূঢ়তর দার্শনিকতত্ত্ব)। এর মধ্যে ঋক্‌বেদের সংহিতা অংশ প্রাচীনতম। কোনো কোনো ভাষাবিদ্ মনে করেন, ‘এই সংহিতা অংশই হল প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রামাণ্য দলিল’[১]। কিন্তু এর অন্যমতও আছে। “বেদ, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ লইয়া প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য দর্শনের যে নির্দশন পাই, তাহাই বৈদিক আর্যভাষা। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বলতে আমরা বৈদিক ভাষা ও পরবর্তীকালের সংস্কৃত ভাষা, উভয় ভাষাকে গণ্য করিয়া থাকি।”[২] তবে মনে হয় প্রথম মতটির সারবত্তা বেশি। ভারতে আগমনকালে আর্যদের ভাষা ছিল বৈদিক ভাষা, বৈয়াকরণ পাণিনি যাকে ‘ছান্দস’ বলে অভিহিত করেছেন। কালত্র(মে এই বৈদিক বা ছান্দস ভাষার পরিবর্তন হতে থাকে। নানাবিধ লৌকিক বিকৃতি থেকে বৈদিক আর্যভাষাকে র(া করার জন্য তখন প্রচলিত আর্যভাষার যে সংস্কার সাধন করা হয়েছিল তাই সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃত তাই একটি কৃত্রিম ভাষা। এর ব্যতিরেকে সে সময় জনগণ যে জীবন্ত ভাষায় পারস্পরিক মনের ভাব আদান-প্রদান করতেন সেটিই প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা।

প্রকৃতির দিক থেকে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা ছিল ‘dynamic’ বা গতিশীল । গতিশীল এই জীবন্ত ভাষা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে লোকমুখে ত্র(মশ পরিবর্তিত হয়ে চলছিল। এবং আনুমানিক ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দেই এই ভাষার কথ্যরূপের চারটি আঞ্চলিক পৃথক রপ (প্রাচ্য, উদীচ্য, মধ্যদেশীয় ও দা(ি ণাত্য) গড়ে উঠেছিল। এতে র(ণশীল বৈদিক সংস্কৃতির ধারক ব্যক্তি(বৃন্দ দেবভাষার (বেদের ভাষাকে তাঁরা দেবতার ভাষা বা দেবভাষা বলে মনে করতেন) বিকৃতি হয়ে যাচ্ছে বলে মনে করে এই ভাষাকে একটি নিয়মের সূত্রে বাঁধার জন্য ব্যাকরণ রচনার প্রয়োজন অনুভব করলেন। পাণিনি ছিলেন এই দলের পুরোধা। তিনি ছিলেন পঞ্চম খ্রিস্টপূর্বাব্দের উদীচ্য অঞ্চলের কথ্যভাষী অধিবাসী। তাঁর সময়ে শি(িত বিদগ্ধ আর্যদের কেন্দ্রভূমি ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল মধ্যদেশ। পাণিনি তাই এই মধ্যদেশের বিদগ্ধ ও শি(িত আর্যদের মুখে ব্যবহৃত শুদ্ধ আর্যভাষাকে ভিত্তি করে তার সঙ্গে নিজের বসবাস এলাকার উদীচ্য উপাদান মিশিয়ে পঞ্চম

খ্রিস্ট পূর্বাব্দে তাঁর 'অষ্টাধ্যয়ী' ব্যাকরণে শুদ্ধ সংস্কৃতের রূপটি বিধিবদ্ধ করেন। 'মূলত পাণিনি কর্তৃক মার্জিত এই সংস্কৃতই সংকীর্ণ অর্থে 'সংস্কৃত ভাষা' যা সাধারণত ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃত বা লৌকিক সংস্কৃত নামে পরিচিত'[৩]। স্বাভাবিকভাবেই পাণিনি নির্দেশিত সংস্কৃত ভাষা বৃহত্তর প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে সরে এসে একটি কৃত্রিম ভাষায় পরিণত হয়ে যায়। অন্যদিকে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার চারটি আঞ্চলিক কথ্যরূপ (প্রাচ্য, উদীচ্য, মধ্যদেশীয় ও দা(ণাত্য) লোকমুখে স্বাভাবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে অগ্রসর হয়ে অন্য স্তর মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছয়।

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় পরিবর্তনের প্রথম স্তরে 'প্রাচ্য' এই কথ্যরূপ থেকে দুইরকম কথ্যরূপ প্রাচ্যা প্রাকৃত ও প্রাচ্য-মধ্য প্রাকৃতের জন্ম হয়। এই সময় আগের স্তরে সরে যাওয়া সংস্কৃত ভাষা ত্র(মশ সাহিত্যের ভাষারূপে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তাহলে বলা যায় ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃত যখন সাহিত্যের ভাষারূপে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তখন বৃহত্তর জনসাধারণের মুখের ভাষা ছিল প্রাকৃত ভাষা। স্বাভাবিকভাবেই তাই জনসাধারণের এই জীবন্ত ভাষাস্রোত থেকে সংস্কৃত যত দূরে গেছে ততই তা নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে মৃত ভাষায় পরিণত হয়েছে। তাই অ(্বঘোষ, কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, মাঘ, বিশাখ দত্ত, শূদ্রক, বাণভট্ট প্রমুখ প্রতিভাবান কবি ও নাট্যকার সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যচর্চা করলেও এ ভাষা খোলস ছেড়ে আর বেরিয়ে আসতে পারেননি। কাজেই মধ্য ভারতীয় আর্যভাষান্তরের প্রথম ভাগে জনসাধারণের মুখের ভাষা প্রাকৃতেরই বিবর্তন ঘটেছে। প্রাকৃত ভাষার বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তরে প্রাচ্যা প্রাকৃতের কথ্যরূপ থেকে মাগধী সাহিত্যিক প্রাকৃতের জন্ম হয়েছে। অতঃপর বিবর্তনের তৃতীয় স্তরে মাগধী সাহিত্যিক প্রাকৃতের কথ্যরূপ থেকে জন্ম নিয়েছে অপভ্রংশ এবং অপভ্রংশের শেষ স্তরে তা পরিবর্তিত হয়েছে অবহট্‌ঠে। এরপর মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা তৃতীয় যুগ অর্থাৎ নব্য ভারতীয় আর্যভাষার যুগে প্রবেশ করে।

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় প্রাচ্যা থেকে জাত মাগধী প্রাকৃত এবং মাগধী প্রাকৃত থেকে মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের জন্ম অনুমান করা যায়। কিন্তু মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের কোনো লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায়নি। ড পরেশচন্দ্র মজুমদার তাই বাংলা ভাষা আদর্শ কথ্য প্রাকৃত থেকে সৃষ্টি বলে মনে করেন। কিন্তু গ্রীয়ার্সন, ড সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভাষাতত্ত্ববিদ মনে করেন মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে। বর্তমানকালে প্রায় প্রত্যেকেই এই মতটি মেনে নিয়েছেন। সুতরাং বলা যায় নব্য ভারতীয় আর্যভাষান্তরে মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের কথ্যরূপ বিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে।

নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় প্রথম স্তরে মাগধীগোষ্ঠীর (মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের) কথ্যভাষাগুলি দুটি শাখায় বিভক্ত(হয়---পশ্চিমা শাখা ও পূর্বী শাখা । পূর্বী শাখার কথ্য ভাষা থেকে আবার দুটি উপভাষার জন্ম হয় ওড়িয়া এবং বঙ্গ-অসমিয়া। বঙ্গ-অসমিয়া শাখা আবার পরবর্তীতে বিভক্ত(হয়ে দুটি ভাষার জন্ম দেয় বাংলা ও অসমিয়া। আনুমানিক ৯০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময় বাংলা ভাষা জন্মলাভ করে। জন্মকাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষার বিকাশকে তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে --- প্রাচীন বাংলা, মধ্য বাংলা ও আধুনিক বাংলা। প্রাচীন বাংলার সময়সীমা (আনুমানিক ৯৫০-১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ), মধ্য বাংলার সময়সীমা (আনুমানিক ১৩৫০-১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ) এবং আধুনিক বাংলার সময়সীমা (১৭৬০—আজ পর্যন্ত)। এই বিকাশ পর্বে বাংলা ভাষায় প্রতি স্তরে স্বাতন্ত্র্যচিহি(ত নানা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পরের এককে সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

ছকের সাহায্যে বাংলা ভাষার উদ্ভবের এই ইতিহাসকে নির্দেশিত করলে দাঁড়ায় এরকম

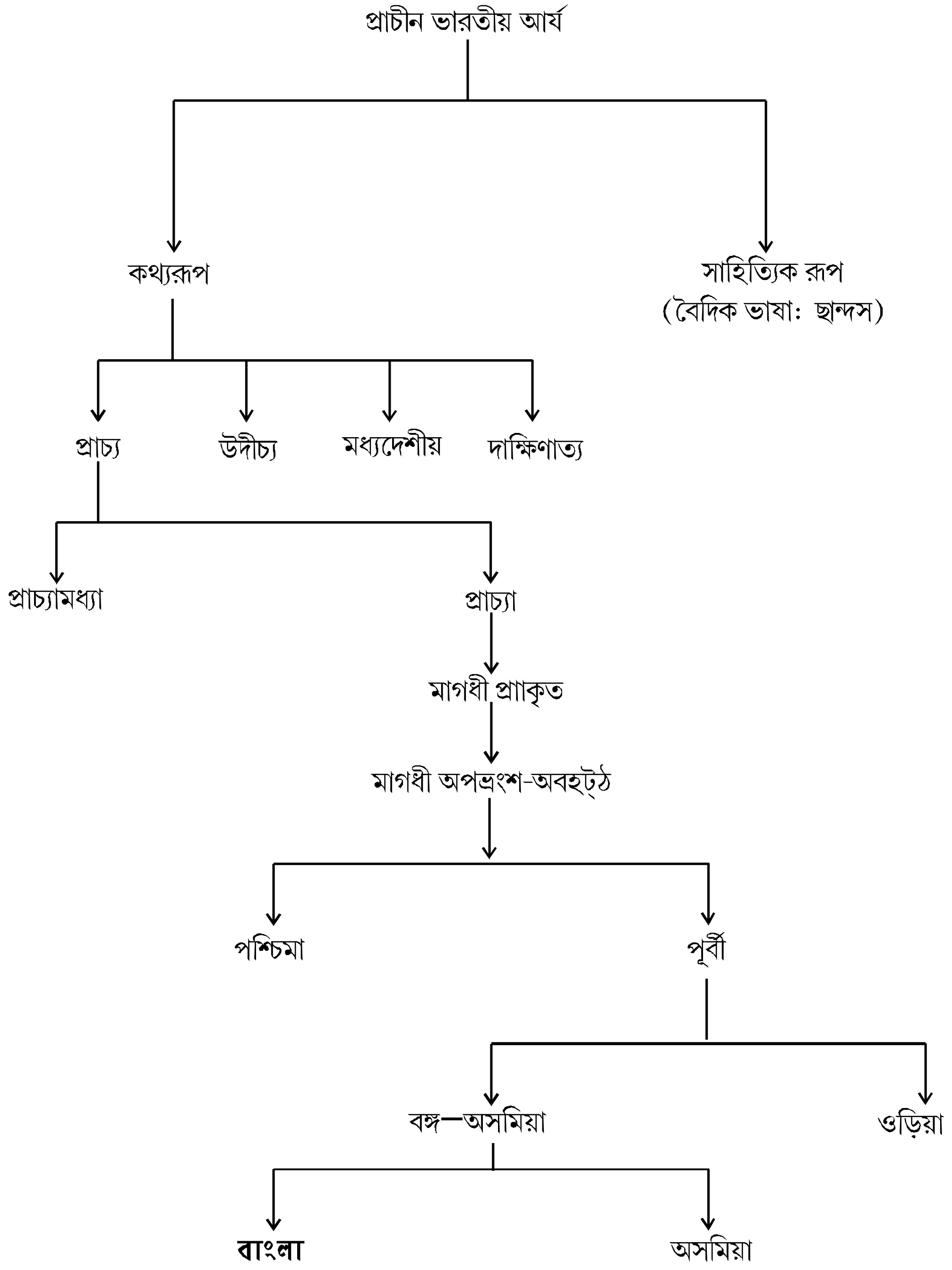

৩.৩.৮.৪ : আদর্শ প্র্শ্নাবলি

১। বাংলা ভাষা উদ্ভবের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করো।

২। ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে যেভাবে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে নব্য ভারতীয় আর্য হিসেবে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে সংক্ষেপে সেই ইতিহাসের পরিচয় দাও।

৩.৩.৮.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা -- ড রামেশ্বর শ পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৩৯০, পৃষ্ঠা--৫৪৬।

২। ভাষাবিজ্ঞান পরিচয় -- ড শ্রীকুমার বিশ্বাস, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৬৮, পৃষ্ঠা--১১৪।

৩। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা -- ড রামেশ্বর শ, পৃষ্ঠা--৫৫৩।

একক - ৯

প্রাচীন বাংলার কাল, সীমা, নিদর্শন, বৈশিষ্ট্যসমূহ

বিন্যাস ক্রম :

৩.৩.৯.১ বাংলা ভাষার স্তরবিন্যাস
৩.৩.৯.২ প্রাচীন বাংলা ভাষার কালসীমা ও নিদর্শন
৩.৩.৯.৩ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
৩.৩.৯.৪ আদর্শ প্র্নোবলি
৩.৩.৯.৫ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩.৩.৯.১ : বাংলা ভাষার স্তরবিন্যাস

সাম্প্রতিককালে একদল পণ্ডিত বাংলাভাষার উদ্ভবকালকে দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে একটু পিছিয়ে অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতে হয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগের পর থেকেই খাঁটি বাংলার নিদর্শন আমাদের হাতে এসেছে। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলি অপভ্রংশের ছত্রছায়া ত্যাগ করে স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। এবং মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা, ওড়িয়া, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষা জন্মলাভ করেছে। তারপর থেকে বাংলা ভাষা আজ অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ত্র(মশ জীবন্ত ভাষা রূপে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। প্রায় ১১০০ বছরের এই পথ পরিত্র(মায় বাংলা ভাষা নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। ভাষার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন ও পরিবর্তন ঘটেছে। ভাষার এই ভাষা ল(ণের স্বাতন্ত্র্যচিহি(ত বৈশিষ্ট্যগুলিকে অনুধাবন করে ভাষাতাত্ত্বিকেরা বাংলা ভাষাকে তিনটি স্তরে---আদি বা প্রাচীন বাংলা, মধ্য বাংলা ও আধুনিক বাংলা। এবং মধ্য বাংলাকে দুটি উপস্তরে আদিমধ্য বাংলা ও অন্তমধ্য বাংলায় ভাগ করেন। ভাষাল(ণের ভিত্তিতে বাংলাভাষার শ্রেণিবিন্যাসটি হল এরকম

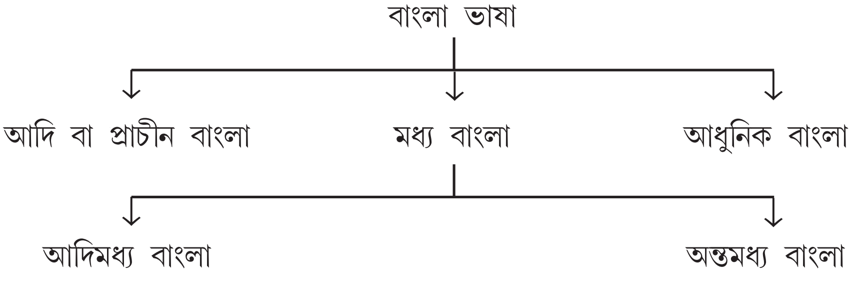

৩.৩.৯.২ : প্রাচীন বাংলা ভাষার কালসীমা ও নিদর্শন

কালসীমা

আনুমানিক ৯৫০ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। বাংলাদেশে তুর্কি আত্র(মণ হয় আনুমানিক ১২০২-১২০৪ খ্রিস্টাব্দে, এরপর থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১৫০ বছর বাংলাদেশে কোনও সাহিত্যচর্চার নিদর্শন পাওয়া যায় না। রাজনৈতিকভাবে অস্থির এই সময়কালে ছড়া ও ব্রতকথার আঙ্গিকে কিছু মৌখিক

সাহিত্যচর্চা হলেও তার লিখিত কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। তাই সাহিত্যচর্চার এই বন্ধ্যাকালকে অনেকে অন্ধকার যুগ বলে অভিহিত করেছেন। এরপরে বাংলাদেশে আবার সাহিত্যচর্চা শু(হয় সুলতান হুসেন শাহের সিংহাসনে অধিষ্ঠানের পর থেকে। আর তখন বাংলা ভাষা বিবর্তনের দ্বিতীয় ধাপে এসে উন্নীত হয়। সুতরাং প্রাচীন বাংলা ভাষার সময় পর্বকে যদি ৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ধরাও যায় তাহলেও বিন্দুমাত্র ভুল হয় না।

নিদর্শন

প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় চর্যাপদে, বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ রচিত 'অমরকোষ টীকাগ্রন্থে'-র প্রায় ৪০০-এরও বেশি বাংলা প্রতিশব্দে, ধর্মদাস রচিত 'বিদগ্ধ মুখমণ্ডল' গ্রন্থে এবং ল(ণ সেনের রাজসভায় প্রাপ্ত 'সেখশুভদয়া' গ্রন্থের গানে ও ছড়ায়।

৩.৩.৯.৩ : ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ধ্বনিগত

(১) প্রাচীন বাংলায় প্রাকৃতের স্তরে সমীভূত যুক্ত(ব্যঞ্জনের সরলীকরণ ঘটেছে এবং পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়েছে। যেমন সং জন্ম > প্রা জন্ম > প্রা বা জাম। উদাহরণ "জামে কাম কি কামে জাম।"

তবে চর্যার বানানে সর্বদা এই দীর্ঘীকরণের নিয়ম র(ি ত হয়নি। যেমন মধ্যেন > মজ্ঝেন > মঝেঁ। (এখানে মাঁঝে হয়নি।)

(২) প্রাচীন বাংলায় পদের শেষের স্বরধ্বনি বজায় থাকল। যেমন ভনতি > ভণই। উদাহরণ "লুই ভণই গু(পুচ্ছিঅ জান"।

(৩) পদের মধ্যে একাধিক সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনির মধ্যে 'য়-শ্রুতি' ও 'ব-শ্রুতির' আগম ঘটল। যেমন সং অমৃত > অমিঅ > অমিয় + আ = অমিয়া।

(৪) শব্দের আদিতে অবস্থিত আদ্য 'অ-কার' দীর্ঘীকৃত হয়ে 'আ'-কার হয়ে গেল। যেমন সং চন্দ্র > প্রা চন্দ্র > প্রা. বা. চাঁদ।

(৫) স্বরভক্তি(র ব্যবহার দেখা গেল। যেমন গ্রাহক > গরাহক।

('অ' স্বরধ্বনি যুক্ত(ব্যঞ্জনকে ভাগ করেছে।)

(৬) প্রাচীন বাংলায় মধ্যস্বরলোপ ও অন্ত্যস্বরলোপের দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল। মধ্যস্বরলোপ কিমপি > কিম্পি (মধ্যস্বর 'অ' লুপ্ত।) অন্ত্যস্বরলোপ সং ধরতি > প্রা. ধরই > প্রা. বা. ধর। (অন্ত্যস্বর 'ই' লুপ্ত।)

(৭) বর্ণ বিপর্যয়েরও উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন মৃণাল > মোলাণ। ('ণ' এবং 'ল' বর্ণ স্থান পরিবর্তন করেছে।)

(৮) স্বতোনাসিক্যীভবনের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন করহু = কর + হু = করহুঁ (হুঁ - স্বতোনাসিক্যীভবন।)

(৯) সমীভবনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন ঃ নিশ্চল > নিচ্চল (দুটি বিষমব্যঞ্জন সমব্যঞ্জনে পরিণত।)

(১০) প্রাচীন বাংলায় ঘোষীভবনের উদাহরণ পাওয়া যায়।

যেমন প্রা জুকতি > প্রা বা জুগতি। (এখানে ঘোষধ্বনি 'জ' এর প্রভাবে অঘোষধ্বনি 'ক' পরিবর্তিত হয়ে ঘোষধ্বনি 'গ'-এ পরিণত হয়েছে।)

(১১) স্বরসঙ্গতির উদাহরণও পাওয়া যায়। যেমন উজ্জলিত > উজ্জলিঅ > উজলি > উজোলি। (এখানে 'ই', 'অ' এই দুই পৃথক স্বরধ্বনি প্রায় একই রকম স্বরধ্বনি 'উ', 'ও'-তে পরিণত হয়েছে।)

রূপগত

(১) প্রাচীন বাংলায় দুইরকম লিঙ্গের ব্যবহার পাওয়া যায় । এই সময় বিশিষ্ট স্ত্রীপ্রত্যয় ছিল 'ই' এবং 'ঈ'। যেমন 'নাবী'। উদাহরণ ঃ "সোনে ভরিলী ক(ণা নাবী।" আর পুংলিঙ্গ বিশিষ্ট প্রত্যয় ছিল 'আ'। যেমন ঃ 'হরিণা'। উদাহরণ "অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।"

(২) শব্দরূপে একবচনে ও বহুবচনে কোনো পার্থক্য ছিল না। সমষ্টিবাচক শব্দ ব্যবহার করে একবচন ও বহুবচনের ভেদ বোঝানো হত। যেমন পারগামি লোঅ, বিদুজন লোঅ।

(৩) কর্তায় ও মুখ্যকর্মে কোনো বিভক্তি(চিহ্ন(দেখা যায় না।

(৪) এ-এঁ-তেঁ-এঁতে-তে এই সব বিভক্তি(বিভিন্ন কারকে ব্যবহৃত হত । যেমন এঁ বিভক্তি(।

করণ কারকে বেগেঁ, "ভবনই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।"

অধিকরণে ঘরেঁ, "সাসু ঘরেঁ খালি কোঞ্চা তাল।"

অপাদানে কূলেঁ, "কূলেঁ কূল মা হোই রে মূঢ়া উজুবাট সংসারা।"

(৫) বিভক্তি(র বদলে সাঙ্গেঁ, দিআঁ, সম ইত্যাদি অনুসর্গের ব্যবহারও ছিল ল(করার মতো।

(৬) দু-একটি (ে ত্র ছাড়া বহুবচনবোধক পৃথক সর্বনাম পদ নাই বললেই চলে।

(৭) সাধারণত তিনরকম অসমাপিকা ত্রি(য়া ব্যবহৃত হত।

প্রথমত অসমাপিকা ত্রি(য়া যেখানে সংযোজক বা Conjunctive যেখানে অতীতের 'ল' প্রত্যয়হীন পদগুলি ব্যবহৃত হত । যেমন "দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই"।

দ্বিতীয়ত অসমাপিকা ত্রি(য়া যেখানে ভাবার্থক সেখানে ভাবে সপ্তমী হলে বা তৃতীয়া জাত হলে 'ইলে' প্রত্যয়যুক্ত(হত। যেমন চড় + ইলে > চড়িলে।

তৃতীয়ত অসমাপিকা ত্রি(য়া যেখানে তুমার্থক ও শত্রর্থক সেখানে শতৃ প্রত্যয় জাত 'অন্তে' প্রত্যয় যুক্ত(হত। যেমন বুড় + অন্তে = বুড়ন্তে।

(৮) প্রাচীন বাংলায় নএ(র্থক, সংযোগমূলক বা নির্দেশক, নিশ্চয়াত্মক, সম্বোধনসূচক ইত্যাদি ভাবে বিশেষ বিশেষ ধরনের অব্যয় পদের ব্যবহার ছিল।

নএ(র্থক ভাবে---ন, নাহী ইত্যাদি। উদাহরণ "দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।"

সংযোগসূচক বা নির্দেশকভাব---ই, ঈ, বি ইত্যাদি । উদাহরণ "জো সে বুধী সোই নিবুধী।"

নিশ্চয়াত্মক অব্যয়--হ, হো ইত্যাদি। উদাহরণ "তে তিনিতে তিনি তিনি হো ভিন্না।"

সম্বোধনসূচক অব্যয়---হে, রে, আল, লো ইত্যাদি। উদাহরণ "বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।"

৯। নামধাতুর ব্যবহার ছিল। যেমন উর্দ্ধ > উত্ত > উভ + ইল = উভিল।

১০। অতীত বাচক ভাব বোঝাতে 'ইল' 'ইলা' প্রত্যয় যুত্ত(হত। যেমন কনলা--কৃত + ইলা (অতীত বাচক) = কনলা

বাক্যগঠনগত

প্রাচীন বাংলার বেশিরভাগ উদাহরণ পাওয়া যায় গানে, ছড়ায় ও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত একধরনের ছন্দবদ্ধ পদে। এই পদগুলি সরল (একটি মাত্র উদ্দেশ্য + একটি বিধেয়) ও মিশ্র (একটি প্রধান বাক্য + একটি অপ্রধান বাক্যাংশ) বাক্যের দ্বারা নির্মিত।

সরল বাক্য---'কাআ ত(বর পঞ্চবি ডাল"।

মিশ্রবাক্য--"লুই ভণই গু(পুচ্ছিঅ জান"।

প্রাচীন বাংলায় জটিল বাক্যের ব্যবহার প্রায় চোখেই পড়ে না।

ছন্দগত

প্রাচীন বাংলায় মাত্রাবৃত্ত, অপভ্রংশ যুগের পাদাকুলক এবং চৌপাই ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ডঃ নীলরতন সেন মনে করেন সম্ভবত এই ছন্দোবন্ধগুলি থেকেই পরবর্তীকালের বাংলা কাব্যে পয়ার, লঘু ত্রিপদী বা মহাপয়ার এবং দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ জন্মলাভ করেছিল।[১]

৩.৩.৯.৪ : আদর্শ প্র্োবলি

১। বাংলা ভাষার স্তরবিন্যাস করো।

২। প্রাচীন বাংলার সময়কাল ও নিদর্শন লেখো।

৩। প্রাচীন বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্রগুলি লেখো।

৪। এই পর্বের বাংলা ভাষার রূপতাত্ত্বিক সূত্রগুলি লেখো।

৫। প্রাচীন বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দাও।

৩.৩.৯.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকারণ — সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

২। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা — ড. রামেশ্বর শ।

৩। ভাষার ইতিবৃত্ত — সুকুমার সেন।

৪। প্রসঙ্গ ঞ্জ বাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড) — সুখেন বিশ্বাস।

৫। ভাষাবিজ্ঞান ঞ্জ তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ — সুখেন বিশ্বাস।

একক - ১০

মধ্য বাংলার কাল, সীমা, নিদর্শন, বৈশিষ্ট্যসমূহ

বিন্যাস ক্রম :

৩.৩.১০.১ মধ্য বাংলা ভাষার কালসীমা ও নিদর্শন

৩.৩.১০.২ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আদিমধ্য বাংলা ভাষা

৩.৩.১০.৩ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অন্ত্যমধ্য বাংলা ভাষা

৩.৩.১০.৪ আদর্শ প্র্নোবলি

৩.৩.১০.৫ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩.৩.১০.১ : মধ্য বাংলা ভাষার কালসীমা ও নিদর্শন

কালসীমা

মধ্য বাংলার আনুমানিক স্থিতিকাল মোটামুটি ১৩৫০ থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৭৬০ সালে। এদিকে ল(রেখে অনেকে কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর সালটিকে মধ্যযুগের সমাপ্তি লগ্ন বলে মনে করেন। অন্যদিকে সুকুমার সেন প্রমুখ সমালোচক মনে করেন,---"শুধু ভাষার পরিবর্তনের কথা মনে রাখিলে অন্ত্য-মধ্য-উপস্তরের শেষ সীমা ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ ধরাই সঙ্গত। তবে সেই সঙ্গে সাহিত্যে ব্যবহারের দিকেও ল(রাখিলে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ ধরিতে হয়।"[২] তাই যদি হয় তবে মধ্য বাংলার স্থিতিকাল দাঁড়ায় মোটামুটি ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সাড়ে চারশো বছরে বাংলা ভাষাবৈশিষ্ট্যের ল(ণীয় পরিবর্তন ঘটেছিল। সেই পরিবর্তনের চিহ্(ধরে বাংলা ভাষার এই পর্বকে দুটি উপপর্বে ভাগ করা হয়েছে আদিমধ্য পর্ব (১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ) ও অন্ত্যমধ্য পর্ব (১৫০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)।

নিদর্শন

মধ্যযুগের প্রথম পর্বের ভাষার নমুনা পাওয়া যায় বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ(কীর্তন' কাব্য ও কানা হরিদত্তের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে। আর দ্বিতীয় পর্বের ভাষার নমুনা পাওয়া যায় বৈষ(বপদাপলী, সমকালীন মঙ্গলকাব্য, লোককাব্য, শাক্ত(পদাবলী ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে।

৩.৩.১০.২ : ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আদিমধ্য বাংলা ভাষা

ধ্বনিগত

১। মধ্য বাংলার এই পর্বে পদের আদিতে অবস্থিত 'অ' বিবৃত উচ্চারিত হত বলে 'অ' বেশিরভাগ (েত্রে 'আ' রূপে লেখা হত।

যেমন আনুমতি, আতি ইত্যাদি।

(াসাঘাতহীনতার জন্য মধ্যস্বর ও অন্ত্যস্বর অনেক (েত্রেই লোপ পেল।

২। 'আ'-কারের পরে অবস্থিত 'ই' ও 'উ' ধ্বনির গৌণতা প্রাপ্তি এবং পাশাপাশি দুই স্বরধ্বনির মধ্যে দ্বিস্বরতা প্রাপ্তি আদিমধ্য বাংলায় প্রথম দেখা গেল।

যেমন বড়াই > বড়াই্ ,

আউলাইল > আউ্লাই্ল।

৩। নাসিক্যের সঙ্গে যুক্ত(মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন আদিমধ্য বাংলায় লুপ্ত হলো।

যেমন কাহ্ন > কান।

৪। প্রাচীন বাংলার তুলনায় আদি মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় স্বরসঙ্গতির উদাহরণ বৃদ্ধি পেল। যেমন যেমন- এখনী >এখুনী

ভেড়ি > ভিড়ি।

৫। অপিনিহিতির ব্যবহার বৃদ্ধি পেল। যেমন আসিহ > আইস।

৬। স্বরসংকোচনের উদাহরণ পাওয়া গেল। যেমন পৈসী > পসি।

৭। শ্রুতিধ্বনির সংখ্যা আগের থেকে বৃদ্ধি পেল।

যেমন আইলা > আয়িলা,

গোয়ালা > গোবালা।

৮। হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বরে এবং জ/য, ন/ণ, শ/ষ/স এর উচ্চারণে কোনো পার্থক্য থাকল না।

৯। হ্ম (= মহ), হ্ন (=ন্হ) প্রভৃতি সংযুক্ত(বর্ণের মহাপ্রাণতার লোপ ঘটল। যেমন আহ্মি > আমি।

১০। ধ্বনিপরিবর্তনের দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাখোয়াল, ঘাটোয়াল, বেশোআর ইত্যাদি বহুশব্দ প্রাচীনত্বের পরিচয় বহন করেছে। যেমন প্রাকৃত অ + ওষ্ঠ্যবর্ণ আ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'ওআ' কিন্তু পরে তা 'আ'-তে পরিণত।

রূপগত

১। এই পর্বের ভাষায় লিঙ্গানুশাসনের দাপট অনেকটা কমে গেল। প্রাচীন বাংলায় প্রাণীবাচক, গুণবাচক, বস্তুবাচক সবরকম শব্দে, সব জাতীয় বিশেষণে এমন কি সর্বনাম বিশেষণে ও কৃদন্ত ক্রিয়াপদে লিঙ্গভেদ প্রযুক্ত(হত এবং 'ঈ' প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গ করা হত। কিন্তু এখানে কেবলমাত্র প্রাণীবাচক শব্দে লিঙ্গভেদ প্রযুক্ত(হতে থাকলো। যেমন কোঁঅলী, পাতলী বালী।

২। বচনের দাপটও এই পর্বে অনেকটাই কমে গেল। কেবলমাত্র সর্বনাম পদের ক্ষেত্রে বহুবচনবাচক শব্দ 'রা' এর ব্যবহার শুরু হল।

৩। বক্তার প্রতিমুখ্য ও অভিমুখ্য বোঝাতে 'গিয়া' ও 'সিয়া' এই দুই অসমাপিকা ক্রিয়াপদের অনুসর্গ রূপে ব্যবহার প্রচলিত ছিল। যেমন দেখ গিয়া।

৪। এই পর্বের কারকে নিম্নলিখিত বিভক্তির ব্যবহার ছিল।

- কর্তৃকারকে ও কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি।
- গৌণকর্ম ও সম্প্রদানে ক, কে, রে ইত্যাদি বিভক্তির ব্যবহার ছিল।
- করণকারকে বিভক্তি ছিল শূন্য, এ, এঁ ইত্যাদি।

- অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি(র বদলে 'হৈতে' অনুসর্গের ব্যবহার ছিল।
- অধিকরণ কারকে বিভক্তি(ছিল---এ/এঁ, ক, ত, তে, ই ইত্যাদি।
- সম্বন্ধ পদে বিভক্তি(ছিল এর, ক, কার, রে ইত্যাদি।

৫। সর্বনামজাত বিশেষণ ও ক্রি(য়াবিশেষণের ব্যবহার এই পর্ব থেকেই শু(হয়।

৬। 'এনা' 'কেনা' 'যেনা' 'সে না' ইত্যাদি 'না' যুক্ত(সর্বনাম মূলের প্রয়োগ এই পর্ব থেকে শু(হয়। যেমন "যেনা দিগেঁ গেলা চক্র(পাণী।"

৭। বাংলা ভাষায় সর্বনাম ও সর্বনাম স্থানীয় বিশেষণ ও ক্রি(য়াবিশেষণ পদকে মূল হিসেবে গ্রহণ, বিভিন্ন কারক বিভক্তি(যোগে পদগঠনরীতির সূত্রপাত হয় এই পর্ব থেকে। অন্ত্যমধ্য বাংলায় এর সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বেড়েছে।

৮। প্রাচীন বাংলায় যৌগিক ক্রি(য়ার উচ্চারণ পাওয়া যায় না। আদিমধ্য যুগ থেকে 'আছ' ধাতুযুক্ত(যৌগিক ক্রি(য়াপদের প্রয়োগের যথার্থ সূচনা ঘটে।

৯। প্রাচীন বাংলাভাষার অপভ্রংশগন্ধী ক্রি(য়াবিভক্তি(গুলি পরবর্তীকালে অনেকাংশেই বর্জিত হয়েছে বা যেটুকু র(িত হয়েছে তাও বিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত হয়েছে। এই বিবর্তনের ধারায় আদিমধ্য পর্বের রূপগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন প্রাচীন বাংলা--'ই' (প্রথম পু(ষ) > আদিমধ্য বাংলা--'ই' 'এ' > অন্তমধ্যবাংলা 'এ'।

১০। কর্মভাববাচ্যের অনুজ্ঞার 'ইউ' বিভক্তি(র প্রয়োগ প্রাচীন বাংলার মতো এই পর্বেও মেলে কিন্তু এর পরের ধারায় তা সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়েছে। যেমন সখি সব বুইল রাধা লুড়িউ সিনানে।

বাক্যগত

প্রাচীন বাংলার মতো এই পর্বে সরল ও মিশ্র বাক্যের ব্যবহার ল(করা যায় এবং বাক্যে অল্পসংখ্যক আরবি-ফারসী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে।

ছন্দগত

ষোড়শ মাত্রিক পাদাকুলক চতুষ্পদী থেকে চতুর্দশ অ(র বিশিষ্ট পয়ার ছন্দের উৎপত্তি ও পরিণতি ঘটে এই পর্ব থেকে। কালক্র(মে পয়ার ছন্দই আদিমধ্য বাংলার প্রধান ছন্দে পরিণত হয়। এছাড়া নানা ছাঁদের ত্রিপদী, একাবলী প্রভৃতি ছন্দেরও ব্যবহার এই পর্বে ল(করা যায়।

৩.৩.১০.৩ : ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অন্তমধ্য বাংলা ভাষা

ধ্বনিগত

(১) 'অ'-কারের উচ্চারণের বিভিন্ন পরিবর্তন অন্ত্যমধ্য বাংলা ভাষার এক উল্লেখযোগ্য ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য।

- এই পর্বে পদের অন্তে একক ব্যঞ্জনের পরে অবস্থিত 'অ'-কার লোপ পেয়েছে । যেমন "কোনের্ ভিতর্ কুলবধূ কান্দ্যা আকুল্ তথা।"

  তবে এর ব্যতিক্র(মও ছিল। যেমন "তৈল বিনে কৈল স্নান করিল উদক পান
  শিশু কান্দে ওদনের তরে।"

- যুক্ত(ব্যঞ্জনের পর 'অ'-কার লোপ পায়নি । যেমন "অন্নবস্ত্র কতেক যোগাব বারো মাস।"

(২) এই পর্বের ভাষায় প্রথম দিকের উচ্চারণে 'হ'-শ্রুতির প্রাচুর্য ছিল।

যেমন যেমন "অযোধ্যার পতি রাম বন্দো দুর্বাদল শ্যাম

প্রণমহ কৌশল্যা নন্দন।"

(৩) স্বরভক্তি(র ব্যাপক ব্যবহার দেখা গেল।

যেমন "ষোল শ বেন্যার মাঝে রাখিব খেয়াতি।"

উদাহরণ খ্যাতি > খেয়াতি (এখানে 'এ' স্বরধ্বনি যুক্ত(ব্যঞ্জনকে ভেঙে দিয়েছে।)

(৪) স্বরভক্তি(র ব্যবহার দেখা যায়।

যেমন "সভে দেবে ভক্তি(মতি প্রতি ঘরে নানা মুতি

রত্নময় সকল প্রাসাদে"।

মতি > মুতি। (এখানে 'ই' স্বরের প্রভাবে 'অ'-স্বর 'উ' স্বরে পরিণত হয়েছে।)

(৫) উচ্চারণে স্বরসঙ্কোচের প্রবণতা ছিল ল(ণীয়।

যেমন "বিপদ শুনিয়া বলিছে বানিয়া

কেন বা বাণিজ্যে আনু"।

আইনু > আনু (স্বরসঙ্কোচের নিয়মে এরকম পরিবর্তন হয়েছে।)

(৬) অপিনিহিতির বহুল ব্যবহার ছিল।

যেমন "তোমার আজ্ঞায় সাগর রাইখ্যাছে তখন।"

রাখিয়াছে > রাইখ্যাছে।

এখানে 'রাখিয়াছে'-তে যে 'ই'-কার 'খ'-এর পরে আছে 'রাইখ্যাছে'-তে তা র-এর আগে উচ্চারিত হয়েছে। কাজেই 'রাইখ্যাছে' অপিনিহিতির উদাহরণ।

(৭) বিষমীভবনের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়।

যেমন "অমৃত নএ(ান এড়ি দেবী বিষ নএ(ানে চায়।"

নয়ন > নঅন > নএ(ান।

এখানে বিষমীভবনের নিয়ম অনুযায়ী মধ্যবর্ণে 'আ' শব্দের আগমন ঘটেছে এবং আদি ও অন্ত্যবর্ণ অনুনাসিক হওয়ার জন্য মধ্যবর্তী বর্ণে অনুনাসিকের ধ্বনি সংত্র(ামিত হওয়ায় নঅন > নএ(ান হয়েছে।

(৮) বর্ণ বিপর্যয়ের প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার দেখা যায়।

যেমন "মনসার হটে তার সাত ডিঙ্গা বুড়ে।"

(এখানে 'ডুব' বর্ণ বিপর্যয়ে 'বুড়' (বুড়ে) হয়েছে।)

(৯) অনেক জায়গায় অল্পপ্রাণ বর্ণ মহাপ্রাণে পরিণত হয়েছে।

যেমন "এতেক শুনিয়া সভে করিল গমন।"

সর্ব > সব্ব > সব (সভে)।

(এখানে দ্বিত্বব্যঞ্জন লুপ্ত হওয়ার জন্য পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘোচ্চারিত না হওয়ায় অবশিষ্ট অল্পপ্রাণ বর্ণ মহাপ্রাণ বর্ণে পরিণত হয়েছে।)

(১০) মধ্যস্বরলোপের দৃষ্টান্ত অন্ত্যমধ্য বাংলায় বেশ পাওয়া যায়।

যেমন "রান্ধিবে মুস্‌রি ডাল দিবে টাবা জাল"।

মুসুরি > মুস্‌রি।

(= ম্ + উ + স্ + উ + র্ + ই) > (ম্ + উ + স্ + র্ + ই) (এখানে 'উ' মধ্যস্বরধ্বনি লুপ্ত।)

রূপগত

(১) নামধাতুর প্রচুর ব্যবহার ল(করা যায়।

যেমন "হাথে গুয়া বন্দে বিশাই শিরে বন্দে পান।

আরতি মাথাল্য রে মনসা বিদ্যমান।।"

এখানে 'মাথাল্য' নামধাতু। এর অর্থ মাথায় করল বা গ্রহণ করল।

(২) কাব্যভাষাকে সংস্কৃতগন্ধী করে তোলার মানসে 'বাচাইলে' 'ঘুরেন' 'কহি' 'বলিবে' ইত্যাদি শব্দের জায়গায় 'ত্রাণ কৈলে' 'করেন ভ্রমণে' 'নিবেদন করি' 'করিবে সম্ভাষণ' প্রভৃতি যৌগিক নামধাতুর ব্যবহার ছিল ল(করার মতো।

(৩) নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টির জন্য এই পর্বে অনেক অর্থহীন শব্দও ব্যবহৃত হত।

যেমন "বনমধ্যে একে(্বরী সঙ্গে কেহ নাই।"

একে(্বর = (এক + ঈ(্বর)

এই 'ঈ(্বর' শব্দটি অর্থহীন, শব্দালঙ্কার রূপে ব্যবহৃত।

(৪) বিশেষ্যের উপর জোর দেওয়ার জন্য বিশেষ্যের আগে 'অ' উপসর্গ ব্যবহার করা হত।

যেমন অকুমারী > অ + কুমারী,

অভরসা > অ + ভরসা।

(৫) ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার হত।

যেমন "আকাশে ধুমধুমি বাজে বাদ্য ঘন ঘন।"

দুন্দুভি > ধুম্‌ধুমি।

(৬) বিসর্গ সন্ধির ব্যবহার ছিল।

যেমন "শাশুড়ি বল্যাছে মোরে দুর(র বাণী।"

দুর(র > দুঃ অ(র (এখানে কঠিন কথা অর্থে ব্যবহৃত।)

(৭) বহুবচন বোঝানোর জন্য নীচের নিয়ম অনুসরণ করা হত।

- বিভিন্ন ধরনের প্রত্যয় যুক্ত(করা হত।
- সংখ্যাবাচক শব্দ যোগ করা হত।

যেমন "সপ্ত অ(্ব রথে নিয়োজিত।"

- বহুত্ববোধক শব্দ ও পদ যোগ করে।

যেমন শব্দ "ব্যাস আদি যত কবি তোমার চরণ সেবি
প্রকাশিল আগম পুরাণ।"
পদ "বহু পশুগণ আসিয়া তখন
রাজারে করে গোহারি।"

- আম্রেড়িত ত্রি(য়া বিশেষণ প্রয়োগ করে।

যেমন "ঝলকে ঝলকে রক্ত(উঠে তার তুণ্ডে।"

- কখনো বা গোলা যোগ করে।

যেমন "কল্য খাইবে অন্নগোলা থুইয়াছে বাসি।"

(৮) কর্তৃকারকের 'আহ্মে' ও 'তোহ্মে' সর্বনাম দুটি এই পর্বে এসে 'আমি' ও 'তুমি'-তে পরিণত হল এবং একবচনে তাদের প্রয়োগ নির্দিষ্ট হয়ে গেল।

(৯) উত্তম পু(ষ ও মধ্যম পু(ষের সর্বনাম পদে 'মু' 'তু' ইত্যাদির ব্যবহার ছিল।

যেমন "তুর ঘরে জন্মেছে মাণিক লখিন্দর।"
মু > মুই,
তু > তুই, তুর।

(১০) উত্তম পু(ষের রূপ ছিল এরকম পাঁও, জাঁও ইত্যাদি ।

যেমন "তোর যদি লাগ পাঁও যমের দ্বারে পাঠাও
মাথা ভাঙ্গো হেমতাল দিয়া।"
পাঁও > আমি পাই,
যাঁও > আমি যাই।

(১১) এই পর্বের কাব্যে বিচিত্র প্রত্যয় ল(করার মতো।

- 'আলি' (শুদ্ধ বাংলা প্রত্যয়)।

যেমন "চণ্ডীরে নিদ্রালি দিয়া বাহিরে গেলা হর।"
নিদ্রা + আলি = নিদ্রালি।

- 'আই' (স্নেহার্থবোধক প্রত্যয়)।

যেমন "শিবাই নাচেরে মুখেতে গীত গাহে।"
শিব + আই = শিবাই।

(গ) 'ইয়া' (বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়)।

যেমন "হালিয়া বছাইর পুরে দিল দরসন।"
হাল + ইয়া = হালিয়া।

- 'আলা' (দেশী প্রত্যয়ের ব্যবহার)।

যেমন "কিতাব কোরান পড়ি করে কাজিয়ালা।"

কাজি + আলা = কাজিয়ালা।

- 'উয়া' প্রত্যয়।

যেমন "নাগের বাদুয়া মোর (শ্বশুর সদাগর।"

বাদ + উয়া।

- 'ইল' প্রত্যয়।

যেমন "নেতার বচনে পদ্মা নেউটিল হিয়া"।

নেউটিল > নেউট + ইল। (ফিরিল অর্থে ব্যবহৃত)

বাক্যগঠনগত

সরল, মিশ্র বাক্য ব্যবহার আগে থেকেই হত এই পর্বে এসে ক্বচিৎ যৌগিক বাক্যের ব্যবহার দেখা গেল। এছাড়া ভাষার শব্দভাণ্ডারে প্রচুর আরবি, ফারসি শব্দ এবং কিছু তুর্কি শব্দ ও প্রত্যয় গৃহীত হল।

ছন্দগত

পয়ার ছন্দ ব্যাপক বিস্তারলাভ করে। সাধারণ কাহিনীমূলক রচনা থেকে উচ্চাঙ্গের দার্শনিক রচনা (চৈতন্যচরিতামৃত) সর্বত্রই পয়ার ছন্দের স্বচ্ছন্দ বিচরণ ল(করা যায় । এছাড়া বিভিন্ন রীতির ত্রিপদী ছন্দ, মাত্রাবৃত্ত ও (াসাঘাত প্রধান ছন্দেরও ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত বৈষ(বকবিতায় অপভ্রংশের চতুষ্পদী ছন্দের ব্যবহারও এই পর্বে ছিল উল্লেখনীয়।

৩.৩.১০.৪ : আদর্শ প্র(োবলি

১। মধ্য বাংলা ভাষার কালসীমা লেখো।

২। এই পর্বের বাংলা ভাষার নির্দর্শনগুলির উল্লেখ করো।

৩। আদি মধ্য বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

৪। অন্ত মধ্য বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

৫। মধ্য বাংলা ভাষার স্বরূপ বিশ্লেষণ করো।

৩.৩.১০.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। ভাষার ইতিবৃত্ত – সুকুমার সেন।

২। বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড) – পরেশচন্দ্র মজুমদার।

৩। সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা – ড. রমেশ্বর শ।

৪। বাংলা ভাষা শু্ধ রূপে প্রয়োগে – ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস

৫। ভাষাবিজ্ঞান পরিচয় – ড. শ্রীকুমার বিশ্বাস।

একক - ১১

আধুনিক বাংলার কাল, সীমা, নিদর্শন, বৈশিষ্ট্যসমূহ

বিন্যাস ক্রম :

৩.৩.১১.১ আধুনিক বাংলা ভাষার কালসীমা ও নিদর্শন

৩.৩.১১.২ আধুনিক বাংলা ভাষার বিশেষ ভাষা বৈশিষ্ট্য

৩.৩.১১.৩ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৩.৩.১১.৪ আদর্শ প্র(োবলি

৩.৩.১১.৫ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩.৩.১১.১ : আধুনিক বাংলা ভাষার কালসীমা ও নিদর্শন

কালসীমা

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময়সীমাকে আধুনিক বাংলা ভাষার কালসীমা ধরা হয়। অনেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময় সীমাকে আধুনিক বাংলা ভাষার কালসীমা বলে মনে করেন।

নিদর্শন

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্যসাহিত্য থেকে বর্তমান সময়ের সব রচনাতেই আধুনিক বাংলা ভাষার নমুনা পাওয়া যায়।

৩.৩.১১.২ : আধুনিক বাংলা ভাষার বিশেষ ভাষা বৈশিষ্ট্য

পৃথিবীর সব উন্নত মানুষের ভাষারই দুটি করে রূপ থাকে---লেখ্যরূপ ও কথ্যরূপ, এই পর্বের বাংলা ভাষাতেও দুটি রূপ পরিল(িত হয়। আধুনিক কালের আগে বাঙালি দৈনন্দিন কাজকর্মে যে গদ্যভাষা ব্যবহার করতেন এই সময়কালে তাকে সাহিত্যের আঙিনায় বরণ করে নেন। ফলে আধুনিক যুগের বাংলায় গদ্য সাহিত্যের সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীকালে আবার সাহিত্যে ব্যবহৃত গদ্য সাহিত্যের দুটি রীতি গড়ে ওঠে সাধুরীতি ও চলিতরীতি। অর্থাৎ আধুনিক যুগের লেখ্যভাষায় সাধু ও চলিত রীতির উদ্ভব হচ্ছে একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক যুগে বাংলা কথ্যভাষাও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। বাংলাদেশের কয়েকটি বৃহৎ অঞ্চলের কথ্যভাষায় নানারূপ স্বাতন্ত্র্য পরিল(িত হয়। এই স্বাতন্ত্র্য চিহি(ত ভাষাভঙ্গীকে উপভাষা নামে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ নানারকম উপভাষার উপস্থিতি আধুনিক বাংলা ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৩.৩.১১.৩ : ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ধ্বনিগত

(১) এই পর্বের বাংলা ভাষায় অপিনিহিতির প্রচুর ব্যবহার দেখা গেল এবং অপিনিহিতির পরবর্তী ধাপ অভিশ্রুতির সূচনা ঘটল।

যেমন রাখিয়া > রাইখ্যা > রেখে।

(= র্ + আ + খ্ + ই + য়্+ আ) > (= র্ + আ+ ই + খ্ + য়্ + আ) > (= র্ + এ + খ্ + এ)

এখানে 'রাখিয়া'তে যে 'ই'-কার 'খ'-এর পরে আছে 'রাইখ্যা' তে তা 'খ' এর আগে উচ্চারিত হয়েছে । ধ্বনিপরিবর্তনের এই নিয়মকে বলে অপিনিহিতি। আবার অপিনিহিত স্বরধ্বনি 'ই'-এর প্রভাবে পূর্ববর্তী 'অ' ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে 'রেখে'তে 'এ' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। 'আ' > 'এ' ধ্বনির এই পরিবর্তনকে বলে অভিশ্রুতি।

(২) আধুনিক চলিত ভাষায় স্বরসঙ্গতির ব্যাপক ব্যবহার সূচিত হল। অর্থাৎ আধুনিক চলিত বাংলায় শব্দের মধ্যে পাশাপাশি বা প্রায় কাছাকাছি অবস্থিত দুটি স্বরধ্বনি স্বরসঙ্গতির প্রত্রি(য়ায় সমীভূত হয়ে একই রকম বা প্রায় একই রকম স্বরধ্বনিতে পরিণত হয়।

যেমন উঠান > উঠোন,

রূপা > রূপো।

(৩) 'অ'-কারান্ত কোনো কোনো নিজন্ত ধাতুর রূপ অনিজন্ত হয়ে দাঁড়াল।

যেমন পেলা বা ফেলা > ফেল্।

(৪) তদ্ভব শব্দে পদমধ্যবর্তী 'ঢ়' > 'ড়' হল এবং অন্ত 'হ' লুপ্ত হল।

যেমন বাঢ়াই > বাঢ়ে > বাড়ে।

(৫) সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনি দ্বিস্বর ধ্বনিতে পরিণত হয় ।

যেমন আইল > এলো।

রূপগত

(১) এই পর্ব থেকে 'ইয়া' যুত্ত(অসমাপিকার জায়গায় কখনও কখনও পূর্বক শব্দটি যোগ করে অসমাপিকার ভাব বোঝানো শু(হল ।

যেমন 'দেখিয়া'র জায়গায় হল দর্শন পূর্বক।

(২) সংস্কৃত বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে 'কর' ধাতু যোগ করে যুত্ত(ত্রি(য়াপদের ব্যাপক ব্যবহার শু(হল। যেমন শ্রবণ করা, আশীর্বাদ করা ইত্যাদি।

(৩) নামধাতুর ব্যাপক ব্যবহার শু(হল।

(৪) সাধুভাষায় যৌগিক ত্রি(য়াপদের বহুল ব্যবহার শু(হল।

যেমন ধ্যান করা, উপবেশন করা ইত্যাদি।

(৫) সমাপিকা ত্রি(য়াপদের পরে নএ(র্থক 'না' শব্দের ব্যবহার শু(হল। যেমন আসে না, খায় না ইত্যাদি।

(৬) কারক বিভক্তি(র অর্থজ্ঞাপনের জন্য অনুসর্গের ব্যবহার হতে থাকল।

(৭) সংযোজক অব্যয় হিসেবে 'এবং' 'ও' এর ব্যাপক ব্যবহার শু(হল। সুকুমার সেন মনে করেন 'ও' ফারসী 'ব' (wa) থেকে এসেছে। এই দুই অব্যয়ের (ে ত্রে 'এবং' সাধারণত দুটি বাক্যকে এবং 'ও' দুটি পদকে যুক্ত(করেছে। অবশ্য এই নিয়মের ব্যতিত্র(মও ছিল।

বাক্যগঠনগত

(১) আগে বাক্যে না বোঝাতে 'না' শব্দটি ত্রি(য়াপদের আগে বসত,

যেমন "আমার শপতি লাগে, না যাইও ধেনুর আগে"।

কিন্তু আধুনিক বাংলায় বিশেষ করে গদ্যভাষায় 'না' শব্দটি ত্রি(য়াপদের পরে বসতে থাকল। তবে কবিতায় এই রীতি সম্পূর্ণভাবে বলবৎ হয়নি।

(২) অসমাপিকা ত্রি(য়া ব্যবহার করে একাধিক বাক্যকে একটি বাক্যে পুনর্গঠন করা হতে থাকল।

যেমন তার বাড়ীতে গিয়ে সেখানে এই বিচিত্র ব্যাপার দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

(৩) সংযোজক অব্যয় ব্যবহার করে যৌগিক বাক্য গঠন করা হতে থাকল।

(৪) এই যুগে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির নিবিড় যোগ সাধিত হওয়ায় রচনায় ও নির্মাণশিল্পে পাশ্চাত্য প্রভাব বাড়তে থাকল। ফলে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন শব্দভাণ্ডারে বাংলা শব্দভাণ্ডার পরিপূর্ণ হতে থাকল এবং সব কিছুর সমবায়ে বাংলা ভাষার নিজস্ব চরিত্র দৃঢ়মূল হয়ে উঠতে থাকল।

ছন্দগত

কবিতার ছন্দরীতির (ে ত্রে পয়ার, ত্রিপদী, অ(রবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ইত্যাদি ছন্দের পাশাপাশি অমিত্রা(র, গৈরিশছন্দ ও গদ্যছন্দের উদ্ভব হল।

৩.৩.১১.৪ : আদর্শ প্র(াবলি

১। বাংলা ভাষার আদি ও মধ্যযুগের সাতটি মুখ্য বৈশিষ্ট্যের পারস্পরিক আলোচনা করো।

২। বাংলা ভাষার ত্র(মবিকাশের আলোচনায় কী কী স্তর স্বীকৃত হয়? এই স্তরটির মধ্যে যে যে বৈশিষ্ট্যের জন্যে একটি স্তর থেকে অন্য একটি স্তরকে স্বতন্ত্র বলে চিহ্নি(ত করা হয়—তাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করো।

৩। প্রাচীন বাংলার নিদর্শন কোথায় পাওয়া যায় তা নির্দেশ করে প্রথম পর্বের ভাষার ল(ণগুলি লিপিবদ্ধ করো।

৪। বাংলা ভাষার মধ্যযুগের দুটি উপবিভাগের কারণ কী ? ভাষাগত বৈশিষ্ট্যসহ তাদের পরিচয় দাও।

৫। আধুনিক বাংলা ভাষা বলতে কী বোঝো? এই পর্বের ভাষার কালপর্বের নিদর্শনসহ বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

৬। সাধু ও চলিত ভাষা বলতে কী বোঝো? সাধু ও চলিত ভাষার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

৩.৩.১১.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। ড নীলরতন সেন, চর্যাগীতিকোষ, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা--ষ।

২। ড সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা--১৭৯।

৩। অতীন্দ্র মজুমদার, ভাষাতত্ত্ব, কলকাতা, ১৯৬৩, পৃষ্ঠা--৯০।

৪। Prof. Suniti Kumar Chatterji, Language and Literature of Modern India, Calcutta, 1963, Page-73.

৫। George Abraham Grierson, Linguistic Survey of India, Vol. V, Delhi, reprint 1968, Page–130.

৬। Prof. Suniti Kumar Chatterji, Language and Literature of Modern India, Page–98.

৭। George Abraham Grierson, Linguistic Survey of India, Page–188.

৮। Ibid, Page-72.

৯। ড সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, পৃষ্ঠা--১৮৮।

১০। তদেব, পৃষ্ঠা--১৮৮।

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

বাংলা উপভাষা ঞ্ঝ সাধারণ পরিচয় ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

একক - ১২

রাঢ়ী উপভাষা

বিন্যাস ক্রম :

৩.৪.১২.১ ঞ্ঝ ভূমিকা

৩.৪.১২.২ ঞ্ঝ উপভাষা কী?

৩.৪.১২.৩ ঞ্ঝ উপভাষার সাধারণ পরিচয়

৩.৪.১২.৪ ঞ্ঝ উপভাষার শ্রেণিবিভাজন

৩.৪.১২.৫ ঞ্ঝ রাঢ়ী উপভাষা

৩.৪.১২.৬ ঞ্ঝ অবস্থান

৩.৪.১২.৭ ঞ্ঝ ধ্বনিগত দিক দিয়ে রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য

৩.৪.১২.৮ ঞ্ঝ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৩.৪.১২.৯ ঞ্ঝ নিদর্শন

৩.৪.১২.১০ ঞ্ঝ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩.৪.১২.১১ ঞ্ঝ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩.৪.১২.১ ঞ্ঝ ভূমিকা

ড. সুনীতিকুমর চট্টোপাধ্যায়ের অনুসরণে বলা যায়, মনের ভাব-প্রকাশের জন্য বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনো বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দ সমষ্টিকে ভাষা বলে। অর্থাৎ যে জনসমষ্টি একই ধরনের ধ্বনিসমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপের দ্বারা নিজেদের মধ্যে ভাববিনিময় করে ভাষাবিজ্ঞানীরা তাকে একটি ভাষা সম্প্রদায় "A Group of people who use the same system of speech signals is a speech community" যেমন একটি ধ্বনিসমষ্টি হল–'আমরা বই পড়ি'। এক্ষেত্রে ইংরেজরা যে ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহার করবে তা হল–'We read book', জার্মানরা বলবে–'Wir lesen Bücher', ফরাসীরা বললে–'Nors lisons des livres', হিন্দী ভাষীরা বলবে–'हम किताव पढ़ते हैं'। সুতরাং দেখা যাচ্ছে একই ধরনের ধ্বনিসমষ্টি দিয়ে সমস্ত জনমানবের ভাবপ্রকাশ চলে না। এই সূত্রেই ভিন্ন জনসম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন ভাষাসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। আবার একই ভাষা সম্প্রদায় যে ভাষার মাধ্যমে ভাববিনিময় করে, সেই ভাষারণ রূপ সর্বত্র সম্পূর্ণ এক নয়। যেমন, আমরা জানি পূর্ববাংলা (বর্তমান বাংলাদেশ) এবং পশ্চিম বাংলায় বাংলা ভাষাই প্রচলিত হলেও এই দুই বাংলার উচ্চারণ ও ভাষারীতি এক নয়। একই ভাষার মধ্যে এই যে আঞ্চলিক পার্থক্য একে বলা হয় আঞ্চলিক উপভাষা।

৩.৪.১২.২ ☐ উপভাষা কী?

বঙ্গদেশের তথা বঙ্গভাষী অঞ্চলের আয়তন অতিবৃহৎ বলেই মৌখিক ভাষায় অঞ্চলভেদে বহু বিচিত্র রূপ পরিলক্ষিত হয়। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে গড়া 'উপভাষা'র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মেরিও পেই ও গয়নার ফ্রাংক 'A dictionary of Linguistics' গ্রন্থে বলেছেন—'A Specific form of a given language, spoken in a certain locality or geographic area, showing sufficient differences from the standard on literary form of that language, as to pronunciation, grammatical construction and idiomatic usage of words, to be considered a distinct entity yet not sufficently distinct from other dialects of the language to be regarded as a different languge' (1970 : P 56)।

অর্থাৎ উপভাষা হল কোনো নির্দিষ্ট জনসম্প্রদায়ের দ্বারা ব্যবহৃত ধ্বনিগত, রূপগত ও বাক্যগঠনগত বৈশিষ্ট্য সমন্বিত ভাষা যা সেই ভাষার অন্তর্গত অন্য জনসম্প্রদায় দ্বারা ব্যবহৃত ভাষা থেকে সুপষ্ট স্বাতন্ত্র্য বর্ধমান অথচ পরস্পর বোধগম্য। উপভাষা সাধারণত অঞ্চল ভেদে হয়। তাই আমরা দেখব, 'কোনো অঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যখন একটা বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে বসবাস করেন তখন ভৌগোলক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও পেশাগত কারণে চলিত ভাষার বিভিন্ন ধারিক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং বিভিন্ন অঞ্চলের চলিত ভাষার পাশাপাশি তার ব্যতিক্রমধর্মীরূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অতএব উপভাষা হচ্ছে চলিত ভাষার একটা উপরূপ যা চলিত ভাষার চেয়ে কম ভাষাভাষীদের অঞ্চলে নিজস্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, (১৯৯৭, পৃ. ১৪২)।

৩.৪.১২.৩ ☐ উপভাষার সাধারণ পরিচয়

বাংলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত উপভাষাসমূহের সংখ্যা নিয়ে পণ্ডিতমহলে প্রচুর মতভেদ দেখা যায়। একসময় স্যার জর্জ এব্রাহাম গ্রীয়ার্সন তাঁর বহুখণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থ 'Linguistic survey of India'-র পঞ্চম খণ্ডে বাংলার আঞ্চলিক উপভাষা-বিভাষাসমূহের যে বিবরণ দিয়েছেন, তার সংখ্যা প্রায় চল্লিশটি। আবার কেউ কেউ যেমন, 'রাঢ়ী-বঙ্গালী-বরেন্দ্রী-কামরূপী' এই চারটি মাত্র উপভাষার কথা বলেছেন। তবে ড. সুকুমার সেন কৃত উপভাষা বিভাগই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। তিনি বাংলার পাঁচটি উপভাষা যথা—রাঢ়ী, বঙ্গালী, কামরূপী, বরেন্দ্রী, ঝাড়খণ্ডী। প্রত্যেক উপভাষার নিজস্ব ধ্বনিগত, রূপগত, ও বাক্যগঠনগত বৈশিষ্ট্য বর্তমান। উপভাষার আঞ্চলিক স্বাতন্ত্রসূচক বৈশিষ্ট্য হল যদি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তখন একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন পরস্পরের বোধগম্যতা হারিয়ে ফেলে এবং পূর্ণ সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত মর্যাদা পায় ও স্বতন্ত্র ভাষা রূপে স্বীকৃতি লাভ করে। যেমন বাংলা, ওড়িয়া ও অসমিয়া ভাষা একসময় একটি ভাষার (যাকে মাগধী অপভ্রংশ হিসেবে অনুমান করা হয়) উপভাষারূপে গণ্য ছিল। পরবর্তীকালে তিনটি পৃথক ভাষারূপে স্বীকৃত হয়।

উপভাষা যে শুধু আঞ্চলিক হতে হবে এমন কোনো কথা নয়। সামাজিক উপভাষা (Social dialect) অর্থাৎ সমাজের শিক্ষিত, অশিক্ষিত, স্ত্রী, পুরুষ ভেদে পার্থক্য হতে পারে। পেশাগত জীবিকা ভেদেও ভাষা ভিন্ন হতে পারে। মুচির মুখের ভাষার সঙ্গে জেলে, কুমোর ইত্যাদি মানুষের মুখের ভাষার পার্থক্য থাকতে পারে। বয়সের তারতম্যে উপভাষার ব্যবহার ভিন্ন হয়। শিশু, যুবা, পূর্ণ বয়স্ক ও বৃদ্ধদের মুখের ভাষার মধ্যে ধ্বনিগত, শব্দগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

অন্যদিকে সমাজের ইতরশ্রেণি ও অপরাধীদের নিজস্ব সংকেত ভাষা থাকে। যাকে অপার্থ ভাষা (Cont) বা সংকেত ভাষা (Code Language) বলে। যেমন—

"গণেশ যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, 'পটাশদার কোনো দোষ নেই। যত দোষ ওই বদে শালার। ও-ই পটাশদাকে ডেকে অপমান করেছে। বাপ তুলে খিস্তি দিয়েছে। আমি শুনেছি। পটাশদা তাই মাঝরাতে বড় খোকা ঝেড়ে দিয়েছে দু'খানা—"

—এখানে 'বোমা' অর্থে 'বড় খোকা' কোনো কোনো জায়গার অপরাধ জগতের সংকেতপূর্ণ ভাষার নিদর্শন।

এরকম গোপন ব্যবহারে প্রয়োজনে সৃষ্ট সংকেত শব্দ বা সংকেত ভাষা ছাড়াও ইতর বা অভদ্র জনের মধ্যে এখন কিছু শব্দ ও শব্দগুচ্ছ প্রচলিত থাকে যার ব্যবহার সমাজের শিক্ষিত ভদ্রজনের মধ্যে নিন্দনীয় বলে বিবেচিত হয়। একে ইতর শব্দ (Slong) বলে। যেমন—মাল খাওয়া (মদ্য পান করা); বাঁশ দেওয়া (গোপনে পরের ক্ষতি করা); ল্যাঙ দেওয়া (গোপনে পরের ক্ষতি করে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত করা); চাম্‌চে (পরের তোষামোদকারী বা অনুগামী); বডি ফেলা (ঘুমানো বা শুয়ে পড়া) ইত্যাদি। ইতর শব্দ কিছুদিন ব্যবহারের পর ক্রমশ ভদ্রসমাজেও স্থান পায়, তখন আর তা ইতর শব্দ থাকে না। যেমন—হাতানো (আত্মসাৎ) ইত্যাদি।

ভদ্র—ইতর নির্বিশেষে সর্বসাধারণের দ্রুত উচ্চারণ ও ব্যবহারের সুবিধার জন্য অনেক সময় কোনো বড় শব্দের অংশবিশেষ কেটে বাদ দিয়ে শুধু তার একটা অংশকেই গোটা শব্দের অর্থে ব্যবহার করা হয়। একে খণ্ডিত শব্দ (Clipped Word) বলে। এর প্রয়োগ আমরা চলিত ভাষা অধিক লক্ষ্য করি। যেমন—মিনি (Minimum), ম্যাক্সি (Maximum), এন্‌থু (Enthusinsm), কং-ই (কংগ্রেস-ই), মাইক (মাইক্রোফোন), ফোন (টেলিফোন), কংগ্রাট্‌ (Congratulation), ভেজ (Vegetarian) ইত্যাদি।

এরকম দ্রুত ব্যবহারের সুবিধার জন্য অনেকসময় আবার একাধিক শব্দে গঠিত একটি নামকে বা পদগুচ্ছকে এমনভাবে ছোট করা হয় যে তাতে শুধু একটিমাত্র শব্দের অংশ বিশেষ নেওয়া হয় না, একাধিক শব্দের প্রথম বর্ণ বা অক্ষরটি নিয়ে সেগুলি যোগ করে একটি শব্দহি গড়ে তোলা হয়। একে মুণ্ডমালা শব্দ (Acrostic Word) বলে। যেমন—ওয়াবকুটা = WBCUTA (West Bengal College and University Teacher's Association), ইউনেস্কো = Unesco (United Nations Education Scientific and Cultural Organization), নেফা = NEFA (North-Eastern Frontier Area), সিপিএম = CPM (Communist Party Marxist) ইত্যাদি। এই প্রয়োগ সাধু ও চলিত ভাষা এবং উপভাষা সবক্ষেত্রেই চলে।

কোনো একটি অঞ্চলের উপভাষা যদি সামাজিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, সাহিত্যিক, শিক্ষাগত, আইন-আদালত, বক্তৃতা, সংবাদ ও বেতারে ব্যবহৃত ও সাংস্কৃতিক মর্যাদা, মূল্য ও গুরুত্ব বহন করে তাহলে সেই আঞ্চলিক উপভাষা আদর্শ ভাষা (Standard Language) রূপে পরিগণিত হয়। যেমন—পশ্চিমবঙ্গে, কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভাষা সবদিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন তাই ঐ অঞ্চলের উপভাষাকে 'আদর্শ বা মান্য চলিত বাংলা' বলা হয়।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি একই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষার নানান্তর, নানা পার্থক্য থাকে। —ভাষার রূপ জটিল ও বিচিত্র। একটি সমাজে ভাষার এইসব জটিল রূপকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণিবিভক্ত করেছেন ভাষাবিজ্ঞানী ব্লুমফিল্ড—

(১) আদর্শ সাহিত্যিক ভাষা (Literary Standard), (২) আদর্শ চলিত ভাষা (Colloquial Standard) (৩) প্রাদেশিক আদর্শ ভাষা (Provincial Standard), (৪) ইতরজনের ভাষা (Sub-Standard) (৫) আঞ্চলিক উপভাষা (Local Dialect)।

৩.৪.১২.৪ ☐ উপভাষার শ্রেণিবিভাজন

একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই শ্রেণিবিভাগ পুরোপুরি গ্রহণীয় নয় এবং সব ভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন—বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে আদর্শ চলিত ভাষাও প্রাদেশিক আদর্শ ভাষা—এরকম দুটি শ্রেণিবিভাগের উপযোগিতা নেই। ভাষার এই বিভিন্ন স্তরবিভাগ ও বিভাজন নিয়ে সমানভাবে যথেচ্ছ গবেষণা হয়নি। তবে এটা স্পষ্ট যে সামাজিক উপভাষা নিয়ে বর্তমানে গবেষণা হচ্ছে। কিন্তু তা কোনোভাবেই পূর্ণাঙ্গ নয়। আঞ্চলিক উপভাষার দিকেই ভাষাবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি ও আকর্ষণ বেশি। তাই আঞ্চলিক উপভাষার একটি মোটামুটি স্পষ্ট সর্বজনগ্রাহ্য মানচিত্র রচিত হয়েছে। নিম্নে তা রেখাচিত্রের মাধ্যমে—

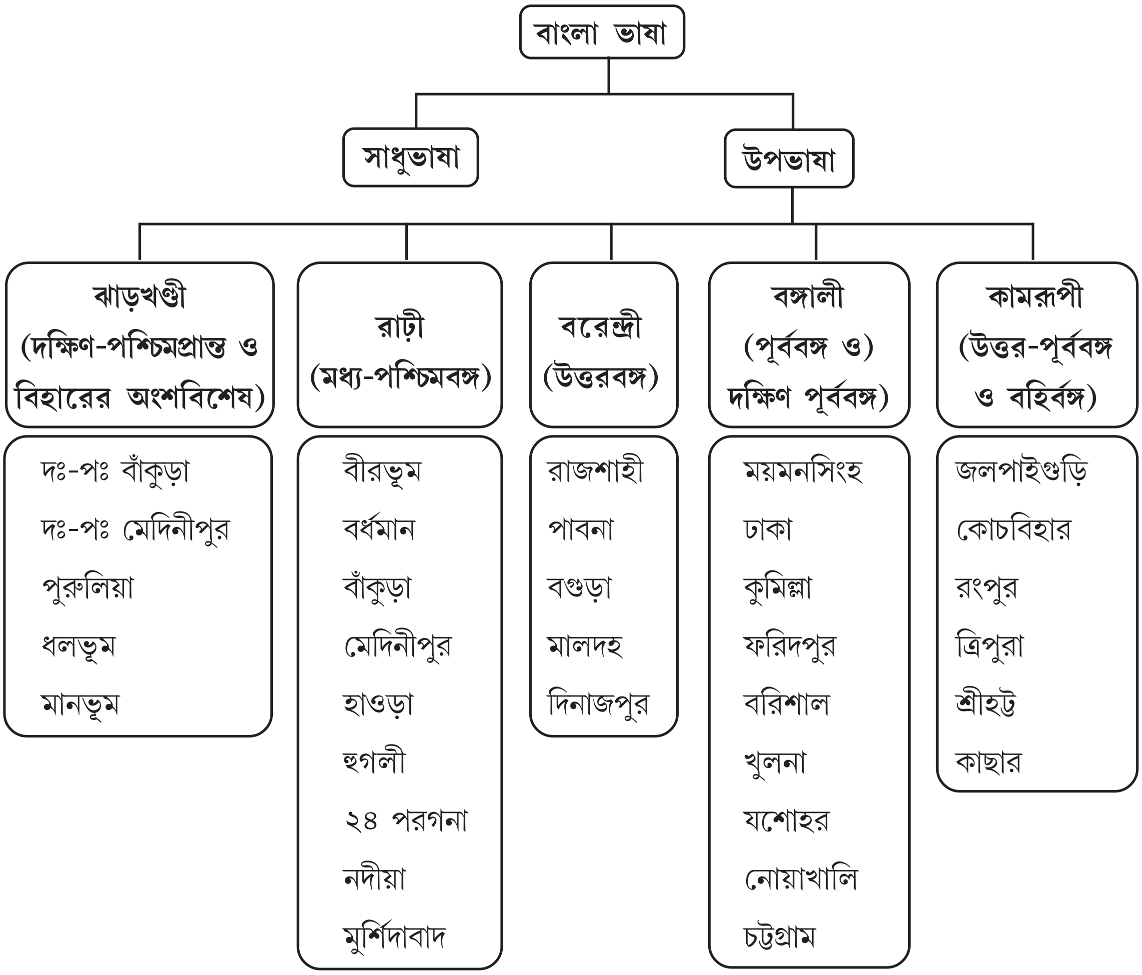

৩.৪.১২.৫ ☐ রাঢ়ী উপভাষা

এক একটি উপভাষার অভ্যন্তরেও আবার নানা আঞ্চলিক পার্থক্য গড়ে উঠতে পারে। এক একটি উপভাষার (Dialect) মধ্যেও যে নানা আঞ্চলিক পৃথক রূপ গড়ে উঠে তাকে বিভাষা (Sub-dialect) বলে। বাংলার উপভাষাগুলির মধ্যে রাঢ়ী ও বঙ্গালীর বিস্তার খুব বেশি। এই জন্য রাঢ়ী ও বঙ্গালী দুইয়ের অভ্যন্তরে একাধিক বিভাষা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের প্রধান উপভাষা (Dialect) রাঢ়ী।

৩.৪.১২.৬ ☐ অবস্থান

মোটামুটিভাবে রাঢ়ী অবস্থান মধ্য পশ্চিমবঙ্গে। সূক্ষ্ম বিচারে রাঢ়ীর বিভাগ ৪টি। ১) পূর্ব-মধ্য ☐ কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, (২) পশ্চিম-মধ্য ☐ বর্ধমান, বীরভূম, হুগলী, বাঁকুড়া (দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত ব্যতীত), ৩) উত্তর-মধ্য ☐ মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ৪) দক্ষিণ-মধ্য ☐ উত্তর-পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। এই রাঢ়ী উপভাষারই শিষ্ট মার্জিত রূপ সাহিত্যে 'শিষ্ট চলিত ভাষা' রূপে প্রচলিত। আদর্শ বা মান্য চলিত ভাষা কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভাষা দিয়ে গঠিত।

৩.৪.১২.৭ ☐ ধ্বনিগত দিক দিয়ে রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য

ক. 'অ' স্থলে 'ও'-কার প্রবণতা রাঢ়ী উপভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ☐ ই, উ, ক্ষ এবং খ ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনের পূববর্তী [অ]-এর উচ্চারণ [ও] হয়। যেমন, অতি > ওতি, বধূ > বোধু, লক্ষ > লোক্‌খো, সত্য > শোত্তো। ন ধ্বনির পরবর্তী অ [ও] রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন, বন = বোন, মন = মোন ইত্যাদি। কিন্তু 'অ'-কারের এই 'ও'-াকর প্রবণতা সর্বত্র লক্ষ্য করা যায় না; যেমন 'দল'-এর উচ্চারণ 'দোল' হয় না।

খ. অপনিহিতির সম্পূর্ণ বর্জিত এবং তৎস্থলে অভিশ্রুতির প্রয়োগ—যেমন করিয়া > কইর‌্যা > করে, বলিয়া > বইল্যা > বলে, রাখিয়া > রাইখ্যা > রেখে ইত্যাদি।

গ. স্বরসঙ্গতির ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ—যথা, বিলাতি > বিলিতি, দেশি > দিশি, পূজা > পূজো, ধূলা > ধুলো, রূপালী > রুপুলি ইত্যাদি।

ঘ. নাসিক্যীভবনের পাধান্য ☐ শব্দমধ্যস্থ নাসিক্য ব্যঞ্জন যেখানে লোপ পেয়েছে সেখানে পূর্ববর্তী স্বরের নাসিক্যীভবন ঘটেছে। যেমন—বন্ধ > বাঁধ, চন্দ্র > চাঁদ ইত্যাদি।

ঙ. স্বতোনাসিক্যীভবনের প্রভাব লক্ষ্যণীয় ☐ কোথাও কোথাও নাসিক্য ব্যঞ্জন না থাকলেও স্বরধ্বনি স্বতোনাসিক্যীভবন দেখা যায়। যেমন—পুস্তক > পুথি > পুঁথি। এখানে পুস্তক শব্দে কোনো নাসিক্য ব্যঞ্জন নেই; তা সত্ত্বেও 'উ' স্বরধ্বনিটি অনুনাসিক হয়ে 'উ' উচ্চারিত হয়।

চ. শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত থাকলে শব্দের অন্তে অবস্থিত মহাপ্রাণ ধ্বনি (বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ) স্বল্পপ্রাণ (বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ) উচ্চারিত হয়। যেমন—দুধ > দুদ্, মাছ > মাচ্, বাঘ > বাগ্ ইত্যাদি।

ছ. শব্দের অন্তে অবস্থিত অঘোষ ধ্বনি (বর্গের প্রথম, দ্বিতীয় বর্ণ ইত্যাদি) কখনো কখনো সঘোষ ধ্বনি (বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ ইত্যাদি) হয়ে যায়। যেমন—ছত্র > ছাত > ছাদ, কাক > কাগ। ব্যতিক্রম—রাত্রি > রাত। অন্যদিকে শব্দের অন্তে অবস্থিত সঘোষ ধ্বনি কখনো কখনো অঘোষ হয়ে যায়। যেমন—ফারসী গুলাব > গোলাপ ইত্যাদি।

জ. 'ল' ধ্বনি কোথাও কোথাও 'ন' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন—লবণ > নুন, লংকা > নংকা, লাউ > নাউ, লুচি > নুচি, লৌহ > নোয়া ইত্যাদি।

ঝ. শব্দমধ্যস্থ 'হ' কারের লোপ প্রবণতা—তাহার > তার, কহি > কই।

ঞ. দ্বিমাত্রকতা এবং ব্যঞ্জনদ্বিত্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যথা—পাগল + আ > পাগ্‌লা, বাদল + আ > বাদলা, কিছু > কিচ্ছু, ছোট > ছোট্ট, বড় > বড্ড, সবাই > সব্বাই, সকলে > সক্কলে ইত্যাদি। প্রান্তিক বিভাষায়—হবে > হব্‌বে।

৩.৪.১২.৮ ❑ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ক. কর্তৃকারকের বহুবচনে ‘গুলি’ এবং কর্তৃকারক ছাড়া অন্য কারকে বহুবচনে ‘দের’ বিভক্তি যোগ হয়। যেমন—ছেলেগুলো ফুটবল খেলছে। কর্মকারক—আমাদের বই দাও। করণকারক—তোমাদের দ্বারা একাজ হবে না।

খ. সাধারণ সকর্মকে ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে মুখ্য কর্ম ও গৌণ কর্ম। ক্রিয়ার প্রসঙ্গে ‘কি?’—এই প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া যায় তা মুখ্য কর্ম আর ‘কাকে?’—এই প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া যায় তা গৌণ কর্ম। রাঢ়ীতে গৌণ কর্মের বিভক্তি হচ্ছে—‘কে’ এবং মুখ্য কর্মে কোনো বিভক্তি যোগ হয় না। যেমন—আমি রামকে (গৌণ কর্ম) টাকা (মুখ্য কর্ম) ধার দিয়েছি। রাঢ়ীতে সম্প্রদান কারকেও ‘কে’ বিভক্তির ব্যবহার করা হয়। যেমন—দরিদ্রকে অর্থদান করো।

গ. অধিকরণ কারকে ‘এ’ এবং ‘তে’ বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যেমন—ঘরে যাও। বাড়িতে থাক।

ঘ. সদ্য অতীত কালের প্রথম পুরুষের অকর্মক ক্রিয়ার বিভক্তি হল—ল, সকর্মকের বিভক্তি—লে। যথা—সে গেল। সে বললে।

ঙ. সদ্য অতীত কালের উত্তম পুরুষের বিভক্তি—লাম/লুম। যেমন, বললাম/বললুম, খেলাম/খেলুম।

চ. মূল ধাতুর সঙ্গে $\sqrt{\text{আছ}}$ > ছ যোগে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠন। যেমন—করিতেছি > করছি, করিয়াছি > করেছি, করিতেছিলাম > করছিলাম, করিয়াছিলাম > করেছিলাম।

৩.৪.১২.৯ ❑ নিদর্শন

একজন লোকের দুটি ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে ছোটটি বাপকে বললে, বাবা, আপনার বিষয়ে মধ্যে যে ভাগ আমি পাব, তা আমাকে দিন। তাতে তাদের বাপ তাঁর বিষয় আশয় তাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। (Suniti Kumar Chatterjee, Languages and Literatures of Modern India 1963, P.73)।

৩.৪.১২.১০ ❑ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। উপভাষা কী?

২। ভাষা ও উপভাষার পার্থক্য নিরূপণ করো।

৩। উপভাষার সংজ্ঞা দাও।

৪। উপভাষার সাধারণ পরিচয় দাও।

৫। বাংলা উপভাষা কয়প্রকার ও কী কী?

৬। রাঢ়ী উপভাষার ভৌগোলিক সীমা নির্দেশ করে এর পরিচয় দাও।

৭। রাঢ়ী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণসহ আলোচনা করো।

৮। উদাহরণসহ রাঢ়ী উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

৯। নিদর্শনসহ রাঢ়ী উপভাষা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা করো।

৩.৪.১২.১১ ❑ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। ভাষতত্ত্ব—রফিকুল ইসলাম।

২। বাঙালির ভাষাচিন্তা – সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা – অনিমেষকান্ত পাল।

৪। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা – ড. রামেশ্বর শ।

৫। ভাষার ইতিবৃত্ত—সুকুমার সেন।

৬। বাংলা ❑ ভাষাবিজ্ঞান অভিধান – অলিভা দাক্ষী।

৭। ভাষা ❑ প্রয়োগে ব্যবহারে – অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস।

৮। বাংলা ভাষা ❑ রূপে প্রয়োগ – ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত।

একক - ১৩

বরেন্দ্রী উপভাষা

বিন্যাস ক্রম :

- ৩.৪.১৩.১ ঞ্ঝ অবস্থান
- ৩.৪.১৩.২ ঞ্ঝ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
- ৩.৪.১৩.৩ ঞ্ঝ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
- ৩.৪.১৩.৪ ঞ্ঝ নির্দেশন
- ৩.৪.১৩.৫ ঞ্ঝ আদর্শ প্রশ্নাবলি
- ৩.৪.১৩.৬ ঞ্ঝ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩.৪.১৩.১ ঞ্ঝ অবস্থান

উত্তরবঙ্গের উপভাষা বরেন্দ্রী ও পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা রাঢ়ীর মধ্যে পার্থক্য খুবই কম, কারণ এ দুটি প্রথমে একটিই উপভাষা ছিল। পরে উত্তরবঙ্গের ভাষায় পূর্ববঙ্গের উপভাষা বঙ্গালীর ও বিহারের ভাষা বিহারীর প্রভাব পড়ায়, উত্তরবঙ্গের ভাষায় কিছু স্বাতন্ত্র্য গড়ে উঠে এবং একটি স্বতন্ত্র উপভাষার সৃষ্টি হয়। উত্তর বাংলার প্রাচীন বরেন্দ্রভূমিতে অর্থাৎ মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, রাজশাহি, পাবনা, বগুড়ায় এই উপভাষা প্রচলিত।

৩.৪.১৩.২ ঞ্ঝ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ক. স্বরধ্বনি রাঢ়ীর সঙ্গে প্রায় অভিন্ন। আনুমানিক স্বরধ্বনিও রক্ষিত আছে। যথা–কাঁটা, চাঁদ, পাঁচ ইত্যাদি।

খ. স্বরধ্বনি অপরিবর্তিত থাকলেও অ্যা ধ্বনির ব্যবহার আছে। যথা–অ্যাক (=এক), এখন (=অ্যাখন), দেন (=দ্যান) ইত্যাদি।

গ. সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি অর্থাৎ বর্গের চতুর্থ বর্ণ (যেমন–ঘ্, ঝ্, ঢ্, ধ্, ভ) শুধু শব্দের আদিতে বজায় আছে, শব্দের মধ্য ও অন্ত্য অবস্থানে প্রায়ই অল্প প্রাণ হয়ে গেছে। যেমন– বাঘ > বাগ্

ঘ. বঙ্গালী উপভাষার প্রভাবে জ ধ্বনি কখনও কখনও জ [Z] ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেমন–জল > জ়ল, জামা > জ়ামা।

ঙ. রাঢ়ীতে সাধারণত শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত পড়ে, কিন্তু বরেন্দ্রীতে শ্বাসাঘাত অতখানি সুনির্দিষ্ট স্থানে পড়ে না।

চ. শব্দের আদিতে ‘র’ ধ্বনির আগম ও লোপ এই উপভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যথা, আত > রাত, রস > অল, রামবাবু > আমবাবু।

৩.৪.১৩.৩ ☐ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ক. অধিকরণ কারকে কখনও কখনও 'ত' বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা, ঘরত > ঘরে, বাড়িত > বাড়িতে।

খ. সামান্য অতীতকালে নাম বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন, খেলাম, গেলাম ইত্যাদি।

গ. বহুবচনের চিহ্নগুলি–গিলা এবং তির্যক কারকের বিভক্তি–দের।

ঘ. গৌণ কর্মে–'কে' ও 'ক' বিভক্তি যথা, হামাক দাও।

ঙ. ভবিষ্যৎকালে বঙ্গালী উপভাষার মতো উত্তমপুরুষের ম, মু বিভক্তি। যেমন, যামু, খামু।

৩.৪.১৩.৪ ☐ নির্দশন

[মালদহ]

"য়্যাক জন মানুষের দুটা ব্যাটা আছ্লো। তার ঘোর বিচে ছোট্কা আপনার বাবাক্ কহনে, বাব, ধন-করির যে হিস্যা হামি পামু, সে হামাক্ দে। তাৎ তাঁই তার ঘোরকে মালমাত্তা সব ব্যাঁটা দিলো।" (G.A Grierson, Linguistic Survey of India, Vol.-V. Part-I, Delhi, 1968, P.130)

৩.৪.১৩.৫ ☐ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। উপভাষা কাকে বলে?

২। উপভাষার শ্রেণিবিভাগ করো।

৩। বরেন্দ্রী উপভাষার অবস্থান নির্দেশ করো।

৪। বরেন্দ্রী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

৫। বরেন্দ্রী উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

৬। বরেন্দ্রী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক আলোচনা করো।

৭। বরেন্দ্রী উপভাষার নিদর্শনসহ, এই উপভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

৩.৪.১৩.৬ ☐ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। ভাষাবিদ্যা পরিচয় – অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

২। ভাষার ইতিবৃত্ত – সুকুমার সেন।

৩। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা – ড. রামেশ্বর শ।

৪। বাংলা ভাষাবিজ্ঞান অভিধান – অলিভা দাক্ষী।

৫। ভাষা ☐ প্রয়োগে ব্যবহারে – অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস।

একক - ১৪

বঙ্গালী উপভাষা

বিন্যাস ক্রম :

৩.৪.১৪.১ ঙ্ম অবস্থান

৩.৪.১৪.২ ঙ্ম ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৩.৪.১৪.৩ ঙ্ম রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৩.৪.১৪.৪ ঙ্ম নির্দেশন

৩.৪.১৪.৫ ঙ্ম আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩.৪.১৪.৬ ঙ্ম সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩.৪.১৪.১ ঙ্ম অবস্থান

বঙ্গালী উপভাষা এত বিস্তৃত অঞ্চলে প্রচলিত এবং তার মধ্যে বৈচিত্র্য এত বেশি যে একে একটি মাত্র উপভাষায় গুচ্ছবদ্ধ করলে এর স্বরূপ নির্ণিত হবে না। এদের অন্তত দুটি গুচ্ছে বিভক্ত করলে ভালো হয়। একটা অংশ—ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোর, নদীয়ার অংশবিশেষ ও পশ্চিম শ্রীহট্ট। অন্য অংশটি—নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, কাছার ও পূর্ব শ্রীহট্ট। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু বিভ্রান্তির অবকাশ থেকে যায়।

৩.৪.১৪.২ ঙ্ম ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ক. বিপর্যস্ত বা অপনিহিতি স্বর রক্ষিত আছে। অর্থাৎ শব্দমধ্যে অবস্থিত। 'ই' বা 'উ' তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের পূর্বে সরে আসে। এই প্রক্রিয়াকে বলে অপনিহিতি। বঙ্গালী উপভাষার এই অপনিহিতির ফলে সরে আসা স্বরধ্বনি রক্ষিত আছে। যেমন—করিয়া > কইর‍্যা, রাখিয়া > রাইখ্যা, বাক্য > বাইক্ক, যজ্ঞ > জইগ্গ, রাক্ষস > রাইক্খস্ ইত্যাদি।

খ. অনুনাসিক ধ্বনিটি বর্তমান থাকে ও পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি সানুনাসিক হয় না। ফলে নাসিক্যীভবনের প্রক্রিয়া বঙ্গালীতে দেখা যায় না। যেমন—চন্দ্র > চন্দ > চাদ, পঞ্চ > পাচ, হংস > হাস ইত্যাদি।

গ. মহাপ্রাণ ঘোষ স্পৃষ্ট ধ্বনি (ঘ, বন, ঢ, ধ, ভ) কণ্ঠনালীর স্পর্শযুক্ত তৃতীয় ধ্বনিতে অর্থাৎ 'অবরুদ্ধ' ধ্বনিতে পরিণত হয়। ঘা > গা, ভাত > বাত, ঘর > গর, ধান > দান ইত্যাদি।

ঘ. চ, ছ, জ প্রভৃতি ঘৃষ্টধ্বনি (affricate) বঙ্গালীতে প্রায় উষ্মধ্বনি (Fricative/Spirant) রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন, চ > ৎস, ছ > স, জ > জ় (Z)। কাগজ > কাগজ়, চাল > ৎসাল, গাছ > গাস।

ঙ. শ, ষ, স স্থানে 'হ' উচ্চারিত হয়। যেমন—সকলে > হগলে, শিয়াল > হিয়াল, সে > হে, সময় > হময় ইত্যাদি।

চ. ড়, ঢ় প্রভৃতি তাড়িতধ্বনি, কম্পিতধ্বনি 'র' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—বাড়ি > বারি, আষাঢ় > আষার।

ছ. শব্দের আদিতে ও মধ্যে ‘হ্’ স্থানে ‘অ’ উচ্চারিত হয়। যেমন–হয় > অয়।

জ. উচ্চ মধ্য অধসংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি ‘এ’ বঙ্গালীতে নিম্নমধ্য অধর্বিবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি ‘অ্যা’ রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন–দেশ > দ্যাশ্।

ঝ. উচ্চমধ্য অর্ধসংবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি ‘ও’ উচ্চরিত হয় উচ্চ সংবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি ‘উ’ রূপে। যেমন–লোক > লুক, সোদপুর > সুদপুর, দোষ > দুষ। ঞ. শ্বাসাঘাতের কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই।

৩.৪.১৪.৩ ❑ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ক. সকর্মক অকর্মক নির্বিশেষে কর্তৃকারকে ‘এ’ বিভক্তি হয়। যথা, মায়ে ডাকে, বাবায় আইছে, দাদায় কইলো।

খ. সমর্কক ক্রিয়া প্রসঙ্গে ‘কি?’–এই প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া যায় তাকে মুখ্য কর্ম বলে। এবং ‘কাকে?’ এই প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া যায় তাকে গৌণ কর্ম বলে। বঙ্গালীতে গৌণ কর্মে ও সম্প্রদান কারকে ‘রে’ বিভক্ত যোগ হয়। যেমন–আমারে দাও, তারে পয়সা দেও।

গ. অধিকরণ কারকে–‘ত’ বিভক্তি, যথা–বাড়ীত থাকুম।

ঘ. কর্তৃকারক ছাড়া অন্য কারকে বহু বচনের বিভক্তি হল–‘গো’ যেমন–আমাগো খাইতে দিবা না?

ঙ. লগে, দিয়া, সাথে প্রভৃতি অনুসর্গের ব্যবহার। যথা, তার লগে, মোর সাথে।

চ. ক্রিয়ারূপের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল–রাঢ়ীতে যেটা সাধারণ বর্তমানের রূপ বঙ্গালীতে সেটা ঘটমান বর্তমান অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–মায়ে ডাকে (অর্থাৎ মা ডাকছে)।

ছ. বহু বচনের প্রত্যয় গুলাইন, রা, তির্যক কারকে বহুবচনে–গোর বা-রার প্রত্যয় যথা, তাগোরে, আমবার, তোমাগোর।

জ. সদ্য অতীতে উত্তম পুরুষের বিভক্তি–নামে, মধ্যম পুরুষে–লা, তুচ্ছার্থে–লি, প্রথম পুরুষে–লো/ল্ এবং সম্মানার্থে–লাইন/লেন।

ঝ. উত্তম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যৎকালের বিভক্তি উম > মু, যথা, যামু।

ঞ. মধ্যম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যৎকালের বিভক্তি বা, যথা–তুমি খাবা না?

ট. রাঢ়ীতে অতীতকালের ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত নঞর্থক অব্যয় যেখানে ‘নি’, বঙ্গালীতে সেখানে ‘নাই’। যেমন–তুমি যাও নাই? (তুমি যাও নি?)

ঠ. আসমাপিকার সাহায্যে গঠিত যৌগিক ক্রিয়ার সম্পন্নকালের মূল ক্রিয়াটি আগে বসে, অসমাপিকা ক্রিয়াটি পরে বসে। যেমন–রাম গ্যাসে গিয়া (= রাম চলে গেছে)।

৩.৪.১৪.৪ ❑ নির্দশন

ঢাকা (মানিকগঞ্জ) ❑ য়্যাক্জনের দুইডী ছাওয়াল্ আছিলো। তাগো মৈদ্দে ছোটডি তার বাপেরে কৈলো, বাবা, আমার বা'গে যে বিত্ত ব্যাসাদ্ পরে, তা আমারে দাও। তাতে তিনি তান্ বিষয় সোম্পত্তি তাগো মৈদ্দে বাইটা দিল্যান।” (G.A Grierson, Linguistic Survey of India, Vol.-V. Part-I, 1968, P. 206)

৩.৪.১৪.৫ ঃ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। বঙ্গালী উপভাষার ভৌগোলিক সীমানা নির্দেশ করো।

২। বঙ্গালী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণ সহ আলোচনা কর।

৩। বঙ্গালী উপভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণ সহ লেখো।

৪। রাঢ়ী ও বঙ্গালী উপভাষার তুলনামূলক আলোচনা করো।

৫। বঙ্গালী উপভাষার নির্দশনসহ বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রানুসারে লেখো।

৩.৪.১৪.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ – সুনীতিকুমার চট্টপাধ্যায়।

২। ভাষার ইতিবৃত্ত – সুকুমার সেন।

৩। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা – ড. রামেশ্বর শ।

৪। বাংলা ভাষাবিজ্ঞান পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড) – পরেশচন্দ্র মজুমদার।

৫। প্রসঙ্গ ঃ বাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড) – অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস।

একক - ১৫

কামরূপী উপভাষা

বিন্যাস ক্রম :

৩.৪.১৫.১ ঞ্জ অবস্থান

৩.৪.১৫.২ ঞ্জ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৩.৪.১৫.৩ ঞ্জ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৩.৪.১৫.৪ ঞ্জ নির্দেশন

৩.৪.১৫.৫ ঞ্জ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩.৪.১৫.৬ ঞ্জ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩.৪.১৫.১ ঞ্জ অবস্থান

উত্তর পূর্ববঙ্গের উপভাষা হল কামরূপী। কামরূপ উপভাষার সঙ্গে বরেন্দ্রীর সাদৃশ্য তুলনায় কম। বঙ্গালী উপভাষার সাদৃশ্য অধিকতর।

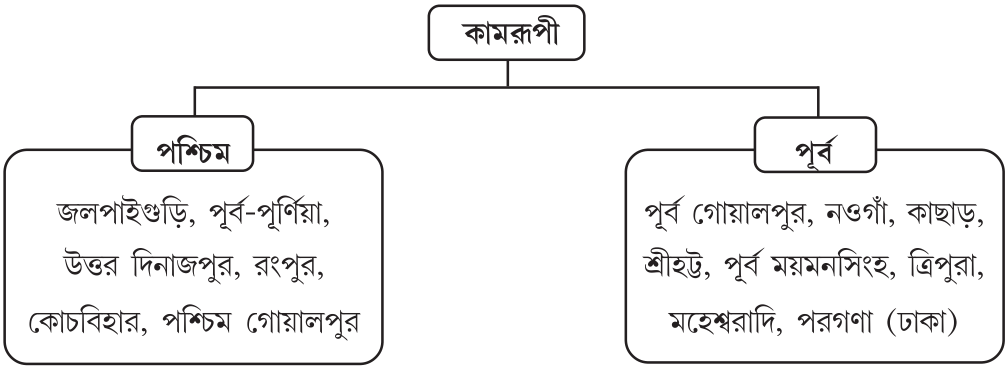

৩.৪.১৫.২ ঞ্জ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ক. সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি অর্থাৎ ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ শুধু শব্দের আদিতে বিদ্যমান (যেমন ধারল, ভরা), মধ্য ও অন্ত্য অবস্থানে প্রায়ই পরিবর্তিত হয়ে অল্পপ্রাণ হয়ে যায়। যেমন—সমঝা—সমঝি > সমজাসমজি।

খ. ও > উ রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন—ছোট > ছুডু, তোর > তুর, চোর > চুর, গোয়ালা > গুয়ালা, জ্যোতিষ > জ্যাতিষ।

গ. শ্বাসাঘাতের ফলে শব্দের আদিতে অ > আ যেমন অম্বল > আম্বল, অষ্ট > আষ্ট, লম্বা > লাম্বা, অবস্থা > আবস্থা।

ঘ. পদান্তস্থিত অ > ও যেমন বাসিত > বাইতো, হইত > অইতো।

ঙ. শব্দের আদি অক্ষরস্থিত অ কখনও উ হয়। যেমন ডগা > ডুগা, সমুদ্র > সুমুদ্র, ক্ষতি > খতি, বক্ষ > বুক্ক ইত্যাদি।

চ. শব্দের আদিস্থিত অ্যা (এ) কখনও অ হয়। যেমন—এখন > অখন, এতগুলো > অতগুলো, অতাল, এতক্ষণ > অতক্ষণ ইত্যাদি।

ছ. শব্দমধ্যস্থিত অ > উ রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন বাসন > বাসুন, এমন > এমুন, আসন > আসুন, নলক > লুলুক ইত্যাদি।

জ. শব্দের অন্তে অবস্থিত 'অ' অনেক সময় 'উ' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন, তুচ্ছ > তুচ্ছু, সুদ্ধ > সুদ্দু, ছোট > ছুডু, দুঃখ > দুঃখু, দুষ্ট > দুষ্টু ইত্যাদি।

ঝ. চ, জ, স/শ > ৎস্, জ়, হ কিন্তু গোয়ালপাড়া ওরংপুরের উচ্চারণে স রক্ষিত আছে।

ঞ. বঙ্গালি উপভাষার মত ড় > র, কিন্তু কোচবিহারের উচ্চারণে ড় ধ্বনি রক্ষিত আছে।

ট. কখনও প > ব যেমন সুপারি > সুবারি ইত্যাদি।

ঠ. শব্দমধ্যস্থিত প ধ্বনি ফ (f) উষ্ণ ধ্বনিরূপে উচ্চারণ দেখা যায়। যেমন, আপদ > আফদ, আপনার > আয়নার ইত্যাদি।

ড. কখনও ন > ল যেমন নীল > লীল, ননী > লনী ইত্যাদি।

৩.৪.১৫.৩ ঞ্ঝ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ক. তির্যক কারকের বহুবচনের বিভক্ত 'গুলা' হয়।

খ. কর্মকারকে 'ক' বিভক্তি হয়। যথা, মোক দিয়া দাও।

গ. অপাদান কারকের অনুসর্গ 'থাকি' যুক্ত হয়।

ঘ. অধিকরণ কারকের বিভক্তি হল 'ত'। যেমন পাছত—পাছ্যৎ (পশ্চাতে)।

ঙ. সম্বন্ধে পদের বিভক্ত হল—'র', 'ক'—বাপোক (বাপের), ছাগলের।

চ. সামান্য অতীতে উত্তম পুরুষে—নু এবং প্রথম পুরুষে ইল বিভক্তি দেখা যায়। যথা, সেবা কন্নু (সেবা করলাম), কহিল (বলল), ধরিল (ধরল)।

ছ. ভবিষ্যৎকালে উত্তম পুরুষের বিভক্তি ম/মু। যেমন—'মুই', 'হাম'।

জ. ভবিষ্যৎকালে মধ্যম পুরুষের বিভক্তি (অতীতেও) 'উ'।

ঝ. নঞর্থক বাক্যে না ক্রিয়াপদের পূর্বে বসে। যথা—না দেখিস্।

৩.৪.১৫.৪ ঞ্ঝ নির্দশন

কোচবিহার ঞ্ঝ একজনা মান্সির দুই কোনা বেটা আছিল। তার মদ্দে ছোট জন উয়ার বাপোক্ কইল, 'বা' সম্পত্তির যে হিস্যা মুই পাইম্ তাক্ মোক্ দেন। তাতে তাঁয় তার মালমাত্তা দোনো ব্যাটাক্ বাটিয়া—চিরিয়া দিল্।" (G.A Grierson, Linguistic Survey of India, Vol.-V. Part-I, 1968, P. ......)

৩.৪.১৫.৫ ☐ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। কামরূপী উপভাষার অবস্থান নির্ণয় করো।

২। কামরূপী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ্য করো।

৩। কামরূপী উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

৪। উপভাষা কাকে বলে? শ্রেণিবিভাজন করে কামরূপী উপভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

৫। নির্দশন সহ কামরূপী উপভাষার বিবরণ দাও।

৩.৪.১৫.৬ ☐ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত—মহম্মদ জহীদুল্লাহ।

২। ভাষা পরিক্রমা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ২০০২)—অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার।

৩। ভাষা দেশ কাল—পবিত্র সরকার।

৪। ভাষাবিদ্যা পরিচয়—অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য।

৫। ভাষার ইতিবৃত্ত—সুকুমার সেন।

৬। আধুনিক ভাষাতত্ত্ব—আবুল কালাম মনজুর।

একক - ১৬

ঝাড়খণ্ডী উপভাষা

বিন্যাস ক্রম :

৩.৪.১৬.১ ঞ্ঝ অবস্থান

৩.৪.১৬.২ ঞ্ঝ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৩.৪.১৬.৩ ঞ্ঝ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৩.৪.১৬.৪ ঞ্ঝ নির্দেশন

৩.৪.১৬.৫ ঞ্ঝ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩.৪.১৬.৬ ঞ্ঝ সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩.৪.১৬.১ ঞ্ঝ অবস্থান

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তবঙ্গ—পুরুলিয়া, বিহারের কিছু অংশ যথা মানভূম, ধলভূম, সিংভূম, দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়া, দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুরে ঝাড়খণ্ডী উপভাষা প্রচলিত। এই উপভাষা রাঢ়ী উপভাষারণ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপ।

৩.৪.১৬.২ ঞ্ঝ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ক. সানুনাসিক স্বরধ্বনির প্রাচুর্য ঝাড়খণ্ডী উপভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। যেমন, উঁট, হাঁতি, চাঁ, হুইছে ইত্যাদি।

খ. ও-কারে অ-কার প্রবণতা লক্ষণীয়। যেমন– লোক > লাক, চোর > চর, বোক > বকা, রোগা > রগা।

গ. অপিনিহিতি ও বিপর্যাসের ফলে শব্দের মধ্যে আগত স্বরধ্বনির ক্ষীণ উচ্চারণ থেকে যায়। তার লোপ বা অভিশ্রুতিজনিত পরিবর্তন হয় না। যথা, সন্ধ্যা > সাঁইবন, কালি > কাইল, রাতি > রাইত ইত্যাদি।

ঘ. অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনিরূপে উচ্চারণ প্রবণতা। যথা, আমাকে > হামাক, পতাকা > ফত্‌কা, দূর > ধূর।

ঙ. 'র' এবং 'ন' স্থানে 'ল' ধ্বনির উচ্চারণ। যথা—নাতিপুতিরা > নাতিপুতিলা, লোকেরা > লকলা ইত্যাদি।

৩.৪.১৬.৩ ⊔ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ক. নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তি ব্যবহারের রীতি সংস্কৃতে ছিল। এই রীতি অনুসারে বাংলাতেও নিমিত্তার্থে ব্যবহৃত বিভক্তিকে যদি চতুর্থী বিভক্তি বলি তবে বলতে পারি এই বিভক্তি–'কে' ঝাড়খণ্ডীতে ব্যবহৃত হয়। যেমন–বেলা যে পড়ে এল জলকে (জলের নিমিত্ত > জল আনতে) চল।

রাঢ়ীতে এসব ক্ষেত্রে বিভক্তি ব্যবহৃত হয় না। অনুসর্গ (জন্যে, নিমিত্ত হেতু) ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

খ. নামধাতুর বহুল ব্যবহার ঝাড়খণ্ডী উপভাষার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন–এবার শীতে ভারি জাড়াবে। (নামধাতু 'জাড়') 'হমর ঘরে চর সাঁধাইছিল (সিঁধিয়েছিল)।

গ. অধিকরণ কারকে বিভক্তি হল 'কে'। যেমন–আঁইজ রাঁইতকে ভারি জাড়াবে।

ঘ. অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন হল–নু, নো, রু। যথা–মায়ের লে মাউসীর দরদ (মায়ের থেকে মাসির দরদ)।

ঙ. ক্রিয়াপদে স্বার্থিক 'ক' প্রত্যেয়ের ব্যবহার হয়। যেমন–যাবেক, খাবেক, খাবেক নাই?, খাবেক নাই?

চ. সম্বন্ধেপদে ও অধিকরণে শূন্যবিভক্তি অর্থাৎ বিভক্তিহীনতা দেখা যায়। যেমন–সম্বন্ধ ⊔ 'ঘাটশিলা, (ঘাটশিলার) শাড়ী কুনি (কুনির) মনে নাই লাগে।'

অধিকরণ ⊔ 'রাইত (রাতে) ছিলি ঘাটশিলা টাইড়ে'

ছ. যৌগিক ক্রিয়াপদে 'আছ' ধাতুর বদলে 'বট' ধাতুর ব্যবহার কোথাও কোথাও দেখা যায়। যেমন–কবি বটে।

জ. নেতিবাচক বাক্যে নঞর্থক অব্যয় সমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসে। যেমন–চুনটুকু কেনে নাই দিলি (চুনটুকু কেন দিলি না?)।

৩.৪.১৬.৪ ⊔ নির্দশন

মানভূম ⊔

"এক লোকের দুটা বেটা ছিল, তাদের মাঝে ছুটু বেটা তার বাপ্‌কে বল্লেক, 'বাপ্ হে, আমাদের দৌলতের যা হিস্বা আমি পাব তা আমাকে দাও। ততে তার বাপ আপন দৌলৎ বাখরা করে তার হিস্বা তাকে দিলেক।" (G.A Grierson, Linguistic Survey of India, Vol.-V. Part-I, 1968, P. 72)

৩.৪.১৬.৫ ⊔ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। উপভাষার শ্রেণিবিভাগ করে ঝাড়খণ্ডী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করো।

২। ভৌগোলিক অবস্থান নিদের্শন করে ঝাড়খণ্ডী উপভাষার লক্ষণগুলি আলোচনা করো।

৩। ঝাড়খণ্ডী উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণসহ বর্ণনা করো।

৪। ঝাড়খণ্ডী উপভাষার নিদর্শনসহ এই ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণসহ আলোচনা করো।

৩.৪.১৬.৬ ❑ সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ – সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

২। বাংলা ভাষা পরিক্রমা – পরেশচন্দ্র মজুমদার।

৩। ভাষা দেশ কাল – পবিত্র সরকার।

৪। তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান – হুমায়ুন আজাদ।

৫। বাঙালির ভাষাচিন্তা – সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

৬। ভাষা ❑ প্রয়োগে ব্যবহারে – অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস (সম্পাদিত)।

৭। ভাষাবিজ্ঞান ❑ তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ – অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস (সম্পাদিত)।

৮। বাংলা ভাষা ❑ রূপে প্রয়োগে – শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত।

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম.এ. তৃতীয় সেমেস্টার

তৃতীয় পত্র

বিশেষ পত্র : রবীন্দ্র সাহিত্য

পাঠ সহায়ক উপাদান

KALYANI UNIVERSITY

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

(ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিসট্যান্স লার্নিং)

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া – ৭৪১ ২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক ড. কল্যাণী শঙ্কর ঘটক, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপিকা ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয়

ডিসেম্বর ২০১৯

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও

নিউ স্কুল বুক প্রেস, ৩/২, ডিক্সন লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১৪ হইতে মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত, মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়-এর অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভূক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইনানুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের লেখক/পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Note

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role- satisfying distance learners' needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon'ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners' end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Sankar Kumar Ghosh, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers- who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Date: 24.03.2018

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani,
Kalyani, Nadia,
West Bengal

পাঠক্রম

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম
এম.এ. তৃতীয় সেমেস্টার

তৃতীয় পত্র

বিশেষ পাঠ : রবীন্দ্র সাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ : ১ পূরবী কাব্যগ্রন্থ (সময় : ৪ ঘন্টা)

একক ১ : পূরবী কাব্য রচনার পটভূমি

একক ২ : পূরবী, মাটির ডাক, পঁচিশে বৈশাখ

একক ৩ : তপোভঙ্গ, আগমনী, লীলা সঙ্গিনী

একক ৪ : বকুল বনের পাখি, সাবিত্রী, লিপি, শেষ বসন্ত

পর্যায় গ্রন্থ : ২ প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থ (সময় : ৪ ঘন্টা)

একক ৫ : শেষপর্যায়ের কবিতা ও প্রান্তিক

একক ৬ : পাঠ্য কবিতাগুলির বিশ্লেষণ

একক ৭ : প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের মৃত্যুচেতনা

একক ৮ : প্রান্তিক কাব্যে কবির জীবনতৃষ্ণা

পর্যায় গ্রন্থ : ৩ রাজা নাটক (সময় : ৪ ঘন্টা)

একক ৯ : রাজা নাটকের বৌদ্ধ উপাদান

একক ১০ : রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও 'কুশজাতক'

একক ১১ : রাজা নাটকের বস্তুসংক্ষেপ

একক ১২ : নাট্যবিশ্লেষণ

পর্যায় গ্রন্থ : ৪ তাসের দেশ (সময় : ৪ ঘন্টা)

একক ১৩ : তাসের দেশ নাটকের সারসংক্ষেপ

একক ১৪ : গীতিনৃত্যনাট্য

একক ১৫ : ইচ্ছামন্ত্র : বন্ধনমোচনের অভিযান

একক ১৬ : তাসনারী ও রাজপুত্রদের ভূমিকা

সূচীপত্র

তৃতীয় পত্র

বিশেষ পাঠ : রবীন্দ্র সাহিত্য

চতুর্থ পত্র	একক	পাঠ প্রণেতা	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ-১	১	অধ্যাপক ড. কল্যাণী শঙ্কর ঘটক	পূরবী কাব্য রচনার পটভূমি	১-৫
	২	অধ্যাপক ড. কল্যাণী শঙ্কর ঘটক	পূরবী, মাটির ডাক, পঁচিশে বৈশাখ	৬-১৩
	৩	অধ্যাপক ড. কল্যাণী শঙ্কর ঘটক	তপোভঙ্গ, আগমনী, লীলা সঙ্গিনী	১৪-২১
	৪	অধ্যাপক ড. কল্যাণী শঙ্কর ঘটক	বকুল বনের পাখি, সাবিত্রী, লিপি, শেষ বসন্ত	২২-৩০
পর্যায় গ্রন্থ-২	৫	ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়	শেষপর্যায়ের কবিতা ও প্রান্তিক	৩১-৩৩
	৬	ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়	পাঠ্য কবিতাগুলির বিশ্লেষণ	৩৪-৪২
	৭	ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়	প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের মৃত্যুচেতনা	৪৩-৪৫
	৮	ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়	প্রান্তিক কাব্যে কবির জীবনতৃষ্ণা	৪৬-৪৯
পর্যায় গ্রন্থ-৩	৯	অধ্যাপক ড. কল্যাণী শঙ্কর ঘটক	রাজা নাটকের বৌদ্ধ উপাদান	৫০-৫২
	১০	অধ্যাপক ড. কল্যাণী শঙ্কর ঘটক	রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও 'কুশজাতক'	৫৩-৫৫
	১১	অধ্যাপক ড. কল্যাণী শঙ্কর ঘটক	রাজা নাটকের বস্তুসংক্ষেপ	৫৬-৬৬
	১২	অধ্যাপক ড. কল্যাণী শঙ্কর ঘটক	নাট্যবিশ্লেষণ	৬৭-৭১
পর্যায় গ্রন্থ-৪	১৩	অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক	তাসের দেশ নাটকের সারসংক্ষেপ	৭২-৭৮
	১৪	অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক	গীতিনৃত্যনাট্য	৭৯-৮১
	১৫	অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক	ইচ্ছামন্ত্র : বন্ধনমোচনের অভিযান	৮২-৮৪
	১৬	অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক	তাসনারী ও রাজপুত্রদের ভূমিকা	৮৫-৮৮

পর্যায়গ্রন্থ -১

পূরবী কাব্যগ্রন্থ

একক -১

পূরবী কাব্য রচনার পটভূমি

বিন্যাস ক্রম

৩.১.১.১ : ভূমিকা

৩.১.১.২ : 'পূরবী' রচনার পটভূমি

৩.১.১.৩ : 'পূরবী' কাব্যের পরিচয়

৩.১.১.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩.১.১.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩.১.১.১ : ভূমিকা

বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ নানান উপলক্ষ্যে ও প্রয়োজনে বহুবার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছিলেন। সমগ্র জীবনে তিনি একাদশবার বিশ্ব পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন এবং এশিয়া-ইউরোপ আফ্রিকা-আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশের উল্লেখযোগ্য দেশে বিশ্বকবি হিসেবে সম্বর্ধিত ও অভিনন্দিত হয়েছিলেন। 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা রচনার পটভূমিতে ছিলো চিরচঞ্চল, গতিশীল ও 'সুদূরের পিয়াসী রবীন্দ্রনাথের বিদেশ যাত্রার আমন্ত্রণ ও বিশ্ববোধ। প্রাত্যহিক প্রথানুগ জীবনের ক্লান্তিকর স্থিরাবস্থা যখনই তাঁর কবি-আত্মাকে পীড়িত করতো, তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন স্থান পরিবর্তনের জন্য। তিনি বেরিয়ে পড়তেন স্থান পরিবর্তনের জন্য। তিনি বেরিয়ে পড়তেন পথে-প্রান্তরে, দেশে-দেশান্তরে, পাহাড়ে-সমুদ্রে, বিশ্বভুবনের ঘাটে ঘাটে, বিশ্বপ্রকৃতির অনিঃশেষ সৌন্দর্যলোকে। মানসিক স্থবিরত্ব কবিকে কখনোই বাঁধা ঘাটে আটকে রাখেনি, মুক্তি খুঁজেছে নিখিল মানবলোকে। সেই আবেগেই একদিন বলেছিলেন—

"দেশে দেশে মোর ঘর আছে
আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়
তারে লব আমি বুঝিয়া।"

সমগ্র বিশ্বমানবতার অন্তঃপুরে ঘর বাঁধতে চেয়েছিলেন ভবিষ্যতের বিশ্বপথিক বিশ্বকবি। কেবল মানুষের মধ্যে নয়, অনন্ত নিসর্গলোকে ভেসে বেড়ানোর উচ্ছ্বসিত আবেগ তাঁকে সংকীর্ণ কুটির প্রাঙ্গণ থেকে বাইরের বহুধা-প্রসারিত জীবন-আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল করেছিলো—

"নিমেষতরে ইচ্ছা করে
বিকট উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে
জীবন-উচ্ছ্বাসে—
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ
মদ্যসম করিতে পান
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ
উর্দ্ধ্ব নীলাকাশে।

থাকিতে নারি ক্ষুদ্রকোণে
আম্রবনচ্ছায়ে
সুপ্ত হয়ে লুপ্ত হয়ে
গুপ্ত গৃহবাসে।" ('দুরন্ত আশা' (মানসী))

এই উন্মাদনা, এই মাদকতা, দেশ-দেশান্তর ব্যাপ্ত করবার দুর্নিবার আশা কবিজীবনের বোধনকাল থেকেই লক্ষ্য করা গেছে। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' (প্রভাতসংগীত) কবিতায় তারই উদ্‌ঘোষণ—

"আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।"

অহং-এর সীমানা ছড়িয়ে আত্মমুক্তির নিরন্তর কল্পনায় ভেসে চলার, ব্যক্তি জীবনে বিশ্ব-জীবনকে—বিশ্বাত্মাকে উপলব্ধির প্রেরণা কবির অসংখ্য কবিতায়, গানে, চিঠিপত্রে, প্রবন্ধে, আভাষণে বহুবার উচ্চারিত ও প্রকাশিত হয়েছে। 'পূরবী'-পর্বের রবীন্দ্র মানসে ক্ষণে ক্ষণে সেই ভাবনার ছায়াকবির আবাল্য-পোষিত ভবঘুরে মনটিকে যেন নবরূপে হাজির করে।

৩.১.১.২ : 'পূরবী' রচনার পটভূমি

'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের পটভূমিতে আছে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৩৩১ বঙ্গাব্দে (১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৪) দক্ষিণ আমেরিকার পেরু দেশের সরকার রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের দেশে আতিথ্য গ্রহণের আবেদন জানালে তিনি তাতে সম্মতি দান করেন। যাত্রার তোড়জোড় ও মানসিক প্রস্তুতি চলতে তাকে। পেরু-সরকার চেয়েছিলেন, গুরুদেব তাঁদের দেশের স্বাধীনতা লাভের শতবর্ষ-উদ্‌যাপন উৎসবের বিশেষ স্মরণীয় দিনটিতে জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর ভাষণ দান করুন। নতুন দেশ দেখা ও সে দেশের মানুষকে চেনা-জানার এমন অপূর্ব সুযোগকে কবি হাতছাড়া করলেন না। কেন না আগেই বলেছি যে কবি মানসের ইচ্ছার কথা, সেইটেই তাঁকে সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার অভিমুখী করতে চাইলো। পেরু যাত্রার পূর্বে শান্তিনিকেতনে একটি ভাষণে কবি যে কথা বলেছিলেন তাতে তাঁর অন্তরে লুকিয়ে থাকা চিরপথিক তথা বিশ্বপথিক সত্তাটির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।—

"মানুষ ঘরছাড়া জীব, মানুষ পথিক।... সে যে চিরপথিক।... যে জাতির চলার পাথেয় ফুরোল, চলার সাধনায় যার জড়ত্ব এল, সে-জাতি তার গতির শেষে দুর্গতিতে এসে ঠেক্‌ল। ভয়ে ভয়ে সে জাতি তার সঞ্চয়ের খোঁটায় নিজেকে বাঁধলে—সেই বন্ধনে তার বিনাশ।" কবির এই ভাষণ তাঁর নিরন্তর চলা-ফেরা ও দেশ দেখবার ইচ্ছারই প্রতিধ্বনি।

যাইহোক ১৯শে সেপ্টেম্বর যাত্রার দিন স্থির হল। কবির বয়স তখন ৬৩ বৎসর। অসুস্থ কবি, সবে নিফ্লুয়েঞ্জা থেকে উঠেছেন। দেহ দুর্বল, মনও অশান্ত। রেকম অবস্থাতেই কবি সমুদ্রপথে সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। মাদ্রাজ থেকে সিংহলের কলম্বো হয়ে ইউরোপগামী জাহাজ ধরবেন, স্থির হ'ল। কবির সঙ্গী হলেন রবীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী ও তাঁদের তিন বছরের পালিতা কন্যা নন্দিনী। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য ও রবীন্দ্রানুরাগী শান্তিনিকেতনের মালয়ালী যুবক বিজয় বাসু। পরে ফ্রান্সে কবি-বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিলেন দক্ষিণ আমেরিকায় কবির প্রস্তাবিত সফরসঙ্গী লেমহার্স্ট। কবির দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রার বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁর জীবনী-সংগ্রাহক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বর্ণনার কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা যাক—

"দক্ষিণ আমেরিকায় কবির গন্তব্যস্থান পেরু। পেরু যাইবার কথা হইলে, কবির ইচ্ছা হইয়াছিল যুরোপ হইতে কিউবা হাভানা হইয়া পানামা খালের মধ্য দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পড়িবেন ও কলোয়া বন্দরে নামিয়া আন্দিজ পর্বতমালা পার হইয়া রাজধানী লিমা-য় পৌঁছিবেন। কিন্তু এ পথ নানা অসুবিধার জন্য পরিত্যক্ত হয়। কবির কল্পনাবিলাসী মন একবার রাশিয়া হইতে প্যান-সাইবেরিয়ান রেলপথ দিয়া ভ্রমণের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। যৌবনে গোরুর গাড়ি করিয়া গ্রাণ্ডট্রাংক রোজ (শেরশাহ-সড়ক) ধরিয়া উত্তরভারত ভ্রমণের ইচ্ছা এখানে স্মরণীয়।" (রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, ৩য় খণ্ড, বিশ্বভারতী ৩য় সং, পৃষ্ঠা-২০৯)

ইতোমদ্যে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ-আমেরিকার অ্যাংলো-স্যাক্সন ও নর্ডিক জাতির দেশে ঘুরেছেন কিন্তু ফ্রান্স ছাড়া ান্য কোনো লাতিন জাতির দেশ তখনো পর্যন্ত তাঁর দেখা হয়নি। তাছাড়া স্পেনিশ সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গেঁও পরিচয় নিবিড় হয়নি। সুবিশাল

দক্ষিণ আমেরিকা এশিয়াবাসীর কাছে প্রায় অজানা বললেই চলে। নতুন মানুষ ও নতুন দেশ দেখবার জন্য কবির অদম্য কৌতূহল। তাই তিনি সাদরে পেরুর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। এবার প্রভাবতকুমারের বর্ণনা তুলে ধার যাক—

"কলিকাতা হইতে মাদ্রাজের পথে কলম্বো গিয়া য়ুরোপগামী জাহাজ ধরিতে হইবে। পথের ঘটনা বিশেষ কিছু নাই এক অভ্যর্থনার উপদ্রব ছাড়া। কবির সহযাত্রী সুরেন্দ্রনাথ কর লিখিতেছেন, "দিনরাত্রি-যখনই হোক বড়ো স্টেশন এলেই লোকের ভিড় এসে গুরুদেবকে ফুল মালা খাদ্য উপহার দিয়েছে; শেষটা বড়ো অসহ্য হয়ে উঠেছিল; সব জানালা বন্ধ করে দিতাম যে রাত্রে আর কেউ জ্বালাবে না; কিন্তু গভীর রাত্রি হোক আর শেষ রাত্রিই হোক, ঠিক লোকেরা এসে দরজা ধাক্কা দিয়ে ঘুম থেকে গুরুদেবকে উঠিয়ে মালা, খাবার দিয়ে তবে ছাড়ত;মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙ্গে দেখি ভিতর যত পারে লোক ঢুকেছে। গুরুদেব দাঁড়িয়ে অকূল পাথারে ভাসচেন গাড়ি না ছাড়লে নিস্তার পেতেন না।"

এবার শরীর খুব খারাপ লইয়া কবি বিদেশ যাত্রা করিয়াছেন। মাদ্রাজ হইতে লিখিতেছেন, "ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নানা ঘূর্ণিপাকের আঘাতে দেহ মন ভেঙ্গেছিঁড়ে বেঁকে চুরে গিয়েছিল, ক্লান্তি ও অবসাদের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে সে বেরিয়েছিলালমা।" (রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, ৩য় খণ্ড, বিশ্বভারতী সং, পৃষ্ঠা-২১০) এরপর জীবনী সংকলক প্রভাতকুমারের মন্তব্য—

"কিন্তু এই অবসন্ন দেহে কাব্যলক্ষ্মীর যে অনুগ্রহলাব করিলেন, তার সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে; সে হইতেছে কাব্যে 'পূরবী' ও গদ্যে 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়েরী (যাত্রা)।' (সূত্র পূর্ববৎ, পৃ-২১০)

সঙ্গী-সাথীসহ কবি কলম্বো থেকে ইউরোপগামী জাপানী জাহাজ 'হারুনা মারু'তে উঠলেন ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯২৪। কবির এ সময়কার মনোভাবটি ধরা পড়েছে এইভাবে—

"অনেকবার দূরদেশে যাত্রা করেছি, মনের নোঙরটা তুলতে খুব বেশি টানাটানি করতে হয়নি। এবার সে কিছু যেন জোরে ডাঙা আঁকড়ে আছে।... তবু মনে জানি, ঘাটের থেকে দূরে গেলেই এই পিছুটানের বাঁধন খসে যাবে। তরুণ পথিক বেরিয়ে আসবে রাজপথে।"

যাইহোক পেরু যাত্রার চার মাস পরে মাঘ মাসের গোড়ার দিকে কবি ইতালি হয়ে দেশে ফিরে আসেন (৫ই ফাল্গুন, ১৩৩১)। ২৬ শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ থেকে ২৪শে জানুয়ারী ১৯২৫—এই চার মাস কবি দেশের বাইরে ছিলেন। এরমধ্যে বেশির ভাগ সময় কাটে আর্জেন্টিনায়, পক্ষকাল ইতালিতে। পূরবীর বেশির ভাগ কবিতা এই চার মাসের অন্তর্বর্তীকালের রচনা। বলা বাহুল্য, কবির পক্ষে শেষমেষ পেরুতে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয়নি, কেননা যাবার পথেই হঠাৎ তিনি অসুস্থা হ'য়ে পড়েন। দীর্ঘ ক্লান্তিকর সমুদ্রযাত্রার ধকল সইতে না পারার জন্যেই তাঁর এই অসুস্থতা। ডাক্তারের পরামর্শে-কিছুকালের জন্য আর্জেন্টিনার অদূরে সান ইসিদোর (San Isidore) নামক একটি রম্য বাগান বাড়িতে কবির বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো নাম্নী এক বিদুষী সেরাপরায়ণা রমণীর উপর কবির পরিচর্যার ভার অর্পণ করা হয়। ওকাম্পোর পুরো নাম সিগনোর ভিক্টোরিয়া দ্য এস্ত্রেদা। (Signore Victoria de Estrada) স্নেহময়ী ও সেবাব্রতী এই তরুণীর পরিচর্যায় কবি অচিরকালেই দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ফিরে পান। সেবা ও পরিচর্যাসূত্রে ভিন্ন দেশের এই তরুণীটির সঙ্গে তার স্নেহমিশ্রিত সখ্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কবি তাঁকে স্নেহভরে 'বিজয়া'—এই মিষ্টি ভারতীয় নাম উপহার দেন। তাঁকে তিনি নিজের দেওয়া নামেই ডাকতেন। দেশে ফিরে 'পূরবী' কাব্য গ্রন্থটি তাঁর নামেই উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে লেখেন 'বিজয়ার করকমলে।' (আর্জেন্টিনায় কবির স্থিতিকালের রোজনামচা ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানবার জন্য দ্রঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-এর 'রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য-প্রবেশক' (বিশ্বভারতী, ৩য় সং-১৩৯৭, পৃ-২১৯-২২৮) এবং 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ' (১ম সং) — শঙ্খ ঘোষ।

৩.১.১.৩ : 'পূরবী' কাব্যের পরিচয়

পূরবী কাব্য মূলতঃ দুটি পর্বে বিভাজিত ও সম্পূর্ণ। প্রথম পর্বের শিরোনাম 'পূরবী'। 'পূরবী' নাম কবিতা থেকে 'বকুল-বনের পাখি' পর্যন্ত একগুচ্ছ কবিতা এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় পর্বের শিরোনাম 'পথিক'। এই পর্বে ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণকালে রচিত কবিতাগুলি স্থান পেয়েছে (১৩৩১)। গোড়ার দিকে পূরবী—প্রসঙ্গে 'সঞ্চিতা' নামে তৃতীয় একটি পর্বের কথা কেউ কেউ বলেছেন। কিন্তু সঞ্চিতা পর্বের কবিতাবলীতে পূরবী কাব্যের মূল ভাব ও সুর অনুপস্থিত থাকায় পরবর্তী পরিমার্জিত সংস্করণে ঐ অংশ পরিত্যক্ত হয়। তাই 'পূরবী' ও 'পথিক' পর্বের কবিতাগুলি নিয়েই বর্তমানের 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থ সংকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে পূরবীতে এমন কিছু সংখ্যক কবিতা আছে যেগুলির রচনাকাল পূরবী গ্রন্থ পরিকল্পনার আগে অথবা পরে। যেমন 'পলাতক।' কাব্যগ্রন্থের 'শেষগান' কবিতাটি। এই কবিতাটিই আবার 'পূরবী' গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় নাম-কবিতার (প্রথম কবিতা) সন্মান পেয়েছে 'পূরবী' নামে। এই নামটিই কবির কাছে গ্রন্থের ভাব ও অর্থদ্যোতনা প্রকাশের উপযোগী মনে হওয়ায় তিনি কাব্যের প্রথম কবিতার নামেই গ্রন্থের শিরোনাম দেন 'পূরবী'। বর্তমান কাব্যে অনুরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কিন্তু এহো বাহ্য।

রবীন্দ্রানুরাগী পাঠক মাত্রেই জানেন যে বিশ্ব কাব্যকুঞ্জের মধুকর রবীন্দ্রনাথ যে কবিতা-কুসুম চয়ন করেছিলেন তা দিয়ে রচিত হয়েছিলো তার কাব্য-মালঞ্চ। বস্তুত কবি-রত্নাকর রবীন্দ্রনাথ যে বিচিত্রচারী নানা রবীন্দ্রনাথের একখানি মালা। তার প্রতিটি কাব্যকুসুম আপন বর্ণে সৌন্দর্যে সৌরভে সেই মালার ঐশ্বর্য ও গৌরব বর্ধন করেছে। কবি জীবনের উন্মেষ পর্ব থেকে সমাপ্তি ক্রমবিকাশের ধারায় যে পরিণতির দিকে এগিয়েছিলেন, তাতে প্রতিটি কাব্যগ্রন্থ ও তার কবিতাবলী স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল সুন্দর হয়ে উঠেছে; একপ্রকার অন্তর্লীন ভাবরস ও উপলব্ধির ক্রম-পরম্পরা রক্ষা করে আরম্ভ ও শেষের মধ্যে সঙ্গতি স্থাপন করেছে প্রতিটি কাব্যগ্রন্থকে এক একটি পুষ্পের প্রতীক রূপে গ্রহণ করলে সেগুলি দিয়ে যে অপূর্বসৃষ্ট সুন্দর মালাখানি তিনি রচনা করেচিলেন তাতে ভাব-ভাষা-রসবোধ ও উপলব্ধির নিবিড় রসঘন রূপ রবীন্দ্র কবিতাকে অমরত্ব দান করেছে।

সমগ্র রবীন্দ্র কাব্যে কয়েকটি বিশেষ ভাব-তত্ত্ব, জীবনদেবতাতত্ত্ব, গতির দর্শন, মৃত্যুচেতনা, জন্ম-মৃত্যুর নিবিড় ঐক্য প্রভৃতি রাবীন্দ্রিক অনুভূতির অভিব্যক্তি তাঁর সকল কাব্যে কোনো না কোনোভাবে শিল্পরসে সমুজ্জ্বল হয়েছে। ফলে কেবল কাব্যে বা গানে নয়, সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যে কবির কয়েকটি মৌলিক প্রত্যয় বিভিন্নভাবে প্রত্যাবৃত্ত হয়েছে। এক একটি ভাব কোনো বিশেষ একটি কাব্যে শেষ হয়ে যেন শেষ হয়না, পরবর্তী কাব্যধারার মধ্যেও তার রেশটুকু বর্তমান থাকে। এমনিকরে পূর্বাপর কাব্যের ঐতিহ্য পরম্পরার মধ্য দিয়ে গতিশীল হয়ে কবিচেতনা। তাই রবীন্দ্র কবিজীবনের যে-কোনো একটি পর্বে রচিত কাব্যকে কখনোই বিক্ষিপ্ত, সংযোগসূত্রহীন কিম্বা আকস্মিক বলা চলে না। তারা যেন একই রবীন্দ্রনাথের ক্রমিক ভাব ও মানস পরিক্রমার সুষম প্রকাশ। আত্মপ্রকাশের দুর্মর আকঙ্ক্ষায় আপন অনুভূতিকে সমগ্রতা দানের প্রয়াস এত গভীর, এত নিবিড়, এত সুদূর ও মধুরভাবের পরিণতি। রবীন্দ্রনাথের মতো জগতের খুব কম প্রতিভার মধ্যেই দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে তিনি শেলী, কীটস গ্যেটে, হুইটম্যান প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত কবি-দার্শনিকদেরও সহজেই অতিক্রম করে যান। সংকোচনশীল নয়, সম্প্রসারণশীল কবি-ব্যক্তিত্ব হিসেবেই তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভা।

'পূরবী'র প্রকাশকাল ১৯২৫। তার আগে রবীন্দ্রনাথ মেন কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন যাদের প্রকাশ-রূপের অন্তর্নিহিত ভাব ও সুরের রেশ ঐতিহ্যসূত্রে 'পূরবী'র সঙ্গে মিসেছে। কাব্যগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'বলাকা' (১৯১৬), 'পলাতকা' (১৯১৮), 'শিশু ভোলানাথ' (১৯২২)। কবির বিশেষত্ব এই যে এক একটি কাব্য রচনার মুহূর্তে তিনি আদ্যন্ত একই ভাব ও সুরের বলয়ে অবস্থান করতেন। সেই ভাব-সুরের বিচিত্র প্রকাশরূপ লক্ষ্য করেই কবিচেতনার স্বরূপ নির্ণয় করা সহজ হোতো। ১৯১৬ থেকে ১৯২৫ সালের আগে পর্যন্ত কবিতাগুলির মধ্যে কবি যেসকল ভাবকে বাণীমূর্তি দান করেছিলেন সেগুলিকে সংক্ষেপে এইভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। 'বলাকা'র উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তারুণ্যের বন্দনা (দ্রঃ বলাকা ১ ও ৪৪ সংখ্যক কবিতা), গতিতত্ত্ব বা গতিবাদ অথবা গতির দর্শন (দ্রঃ 'বলাকা'র ৩,৩৬ সংখ্যক কবিতা), আনন্দ-বেদনামেদুর স্মৃতিচারণা (নষ্টালজিয়া)—প্রেমের অবিনশ্বরত্ব (দ্রঃ বলাকা— ৭ ও ৩২ সংখ্যক কবিতা) মৃত্যুচেতনা (দ্রঃ বলাকা- ৩৭ ও ৪৫ সংখ্যক কবিতা) ও ছন্দোনিরীক্ষা (মুক্তবন্ধ ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা)। 'পলাতকা'র মূল আকর্ষণ অসম পদ্যছন্দে গল্পরসসৃষ্টি ও বিশিষ্ট দার্শনিক উপলব্ধি—জগতের সবকিছুই পরিবর্তশীল ও চিরপলাতক। জগতের কোনো কিছুকেই যেন চিরকালের জন্য ধরে রাখা যায় না। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানব প্রকৃতির নিবিড় আকর্ষণের বিষয়টি পলাতকা'র গল্পরস সিক্ত কবিতাগুলির অন্যতর বিশিষ্টতা যার পরিণতি সমান সমালোচনা (দ্রঃ "নিষ্কৃতি" কবিতা) ও জন্ম-মৃত্যুর সরণি বেয়ে শূন্যতা থেকে, অপূর্ণতার ুপলব্ধিতে—

"আমি চাই সেইখানে মিলাইতে প্রাণ
যে সমুদ্রো আছে নাই পূর্ণ হয়ে রয়েছে সমান।"

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, প্রতিটি ব্যক্তিমানবের অন্তরে লুকিয়ে থাকে চিরন্তন এক শিশু। জীবনের খরদুঃখ তাপের মাঝখানে এই শিশুটি আছে বলেই মানুষ সকল ব্যর্থতা, যাতনা, বঞ্চনা প্রভৃতি দুঃখসময়ের দুর্দৈবগুলিকে সহজে আত্মস্থ ও অতিক্রম করতে পারে। মানব জীবনে এই চিরন্তন শিশু ভোলানাথকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন অনুভব করে 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি'তে তিনি লিখেছিলেন—

"আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই শিশুভোলানাথ লিখতে বসেছিলুম। ...প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আমি ... আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে-লোকান্তরে বিস্তৃত। এই জন্যে কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাট্‌লুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।" ভোলানাথ শিব যেমন চিরনতুন সৃষ্টির খেলায় মগ্ন, ধ্বংসের মধ্যেই তাঁর সৃষ্টির লীলা, তেমনি আমাদের শিশু ভোলানাথটিও খেলা ভাঙ্গার খেলায় আনন্দে মাতোয়ারা। আত্মভোলা মহেশ্বর আর আপনভোলা নির্মল শিশু স্বরূপধর্মে তাদের মধ্যে এই নিবিড় আত্মীয়তার যোগসূত্রটি কবি আপন অন্তরে অনুভব করে লিখেছিলেন—

"সৃষ্টির মূলে এই লীলা—নিরন্তর এই রূপের প্রকাশ। সেই প্রকাশের অহেতুক আনন্দে যখন যোগ দিতে পারি, তখন সৃষ্টির মূল আনন্দে গিয়ে মন পৌঁছয়। সেই মূল আনন্দ আপনাতে আপনি পর্যাপ্ত, কারো কাছে তার জবাবদিহি নেই।" (পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি) শিশুর উদ্দেশ্যহীন খেলা, ভাঙ্গা-গড়া, চলা-ফেরা সব কিছুতেই আনন্দ, আনন্দ নতুন সৃষ্টিতে। "পরমেশ্বর যেমন সৃষ্টির লীলায় শূন্য আকাশকে পূর্ণ করেন, শিশুও তেমনি পথকে মুক্তির আনন্দে পূর্ণ করে। অহেতুক লীলায় শিশু ভোলানাথের সঙ্গে মহেশ্বরের যোগ আছে।" (রবিরশ্মি-পশ্চিমভাগ ১ম সং, পৃ.২৩১—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) 'পূরবী' পর্বের অনেক কবিতাতে কবি পূর্ব সৃষ্ট শিশু ভোলানাথের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন। 'পূরবী' পর্বের অনেক কবিতাতে কবি পূর্ব সৃষ্ট শিশু ভোলানাথের উত্ত রাধিকার বহন করে, চলেছেন। 'পদধ্বনি', 'পথ' প্রভৃতি কবিতাগুলি প্রসঙ্গত স্মরণ্য।

'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথ'—দুটি গ্রন্থের একটি অপরটির পরিপূরক। কবি এই দুই কাব্যের অন্তরের চির শিশুটিকে কৌতুকে, মাধুর্যে-সৌন্দর্যরসে পূর্ণ করে দেখেছেন। পূরবীর কবিতাতে তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কবির অভিব্যক্তি—

"শুধু শিশু বোঝে মোরে, আমারে যে জানে ছুটি ব'লে,
ঘর ছেড়ে আসি তাই চ'লে।
নিষেধ বা অনুমতি মোরে মাঝে না দেয় পাহারা,
আবশ্যক নাহি রচে বিবিধের বস্তুময় কারা,
বিধাতার মতো শিশু লীলা দিয়ে শূন্য দেয় ভ'রে,
শিশু বোঝে মোর।" (পথে—পূরবী)

৩.১.১.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'পূরবী' কাব্যের প্রকাশকাল কত?

২। কাব্যটি রচনার প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে বিবৃত করো।

৩। 'পূরবী' কাব্যটির সাধারণ পরিচয় দাও।

৪। 'পূরবী' কাব্যে-কবিতার মনোভাবের বর্ণনা দাও।

৩.১.১.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। পূরবী (বিশ্বভারতী সং) — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২। রবীন্দ্র রচনাবলী (সমগ্র — বিশ্বভারতী সং)।
৩। যাত্রী (বিশ্বভারীত সং) — রবীন্দ্র ঠাকুর।
৪। রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য-প্রবেশক (তৃতীয় সং-বিশ্ব ভারতী) — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
৫। রবি-রশ্মি (২য় খণ্ড, পশ্চিমভাগে, ১ম সং) —চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৬। রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ (৩য় সং) —প্রমথনাথ বিশী।
৭। রবীন্দ্র-সরণী (৫ম মুদ্রণ) — প্রথমনাথ বিশী।
৮। রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত ২য় সং) — কল্যাণীশঙ্কর ঘটক।
৯। ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ (১ম সং) শঙ্খ ঘোষ।
১০। মহাকবি কালিদাসের সমগ্র রচনাবলী (ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী-সম্পাদিত ১ম সং)।

একক -২

পূরবী, মাটির ডাক, পঁচিশে বৈশাখ

বিন্যাস ক্রম

৩.১.২.১ : পূরবী

৩.১.২.২ : মাটির ডাক

৩.১.২.৩ : পঁচিশে বৈশাখ

৩.১.২.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩.১.২.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩.১.২.১ পূরবী

'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা পূরবী। আগেই উল্লেখ করেছি, পূরবী গ্রন্থ পরিকল্পনার অনেক আগেই কবিতাটি রচিত হয়েছিলো। কবিতাটির শিরোনাম ছিলো 'শেষ গান।' অন্য এক কাব্যের বিশেষ একটি কবিতা ভিন্ন শিরোনামে পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতা হয়ে ওঠার নজির রবীন্দ্রনাটকের ক্ষেত্রে সুলভ হলেও (যেমন 'যক্ষপুরী' থেকে 'রক্তকরবী', 'রাজা' থেকে 'অরূপরতন' প্রভৃতি) কাব্যের ক্ষেত্রে বিরল। একটি কবিতা একটি কাব্যের শিরোনাম হতে বাধা নেই। কিন্তু 'শেষ গান' থেকে 'পূরবী' এবং কাব্যেরও শিরোনাম হয়ে ওঠা একটু আশ্চর্যের বই কি! নাটক কিম্বা উপন্যাসের ক্ষেত্রে শিরোনাম পরিবর্তন ও রূপান্তরণের পেছনে যে সকল কারণ থাকে (যেমন গণচাহিদা, সংক্ষিপ্তকরণ, আদর্শায়ন, ব্যঞ্জনাধর্মিতা প্রভৃতি) সেগুলির অনেকাংশই এখানে অনুপস্থিত। কেন না 'শেষ গান' (পলাতকা)—এই পুরো কবিতাটি আদ্যন্ত কোনো পরিবর্তন না করে 'পূরবী' নামে পূরবী কাব্যগ্রন্থে হুবহু উদ্ধৃত হ'লো—এ বিস্ময়কর।

তবে বিস্ময়কর হলেও কারণটা অনুমান করতে বাধা নেই। মনে হয়, "পূরবী'র কবিতাগুলি রচনা ও গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত কবির মনে বাবপ্লাবন ও সাময়িক ভাবদৈন্যের যে নৈরাশ্য-পীড়িত দ্বন্দ্ব আলো-আঁধারি পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলো, 'পলাতকা' থেকেই তার সূচনা এবং তার পরিণতি 'শেষ গান' কবিতায়। সুতরাং কবিতাটির ভাব ও ব্যঞ্জনার সার্ধম্য লক্ষ্য করেই বোধকরি কবি 'শেষগান'-কে আরও ব্যঞ্জনাধর্মী করে 'পূরবী'তে উত্তীর্ণ করে দিতে কোনো দ্বিধা বা সংশয় পোষণ করেননি।

যাইহোক বর্তমান কবিতার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে অবশ্যই পূরবী-রচনার পটভূমি-কেন্দ্রিত অধ্যায়টি স্মরণে রেখে অগ্রসর হতে হ'বে। ষাট-উত্তীর্ণ কবি মনের টানা-পোড়েনের দোলায় ভাবাবেগের স্রোত মাঝে মাঝে মন্দগামিনী হ'য়েছে। জোয়ার শেষে ভাটার টানে দুকূল প্লাবিনী স্রোতোধারা যেমন ধীরে ধীরে ক্ষীণতোয়ায় পরিণত হয়, বালির চড়া ক্ষীণ জলধারাকে যেমন গ্রাস করে ফেলে, তেমনিভাবে জীর্ণ, জরাক্লিষ্ট নৈরাশ্যপীড়িত কবিও জীবন পরিক্রমায় স্বাভাবিক চলার ছন্দ হারিয়ে ফেলেন। মাঝে মাঝে কবির মনে হয়, কাব্যরসের সঞ্চিত অফুরন্ত উৎস ধারা বুঝি ভাঁটার টানে শুকিয়ে যাওয়া মরা নদীতে পরিণত হ'তে চলেছে, কবিজীবনের এই মন্দাভাব কাব্যসৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দধারা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেছে। ক্ষণিকের সংশয়, ক্লান্তি, বেদনা ও বিষণ্ণতার হাত থেকে কীভাবে আত্মশক্তির প্রবল বিশ্বাসে বার্ধক্যের মরুপ্রান্তরে নতুন প্রাণাবেগের বন্যায় মরুদ্যান সৃষ্টি করে আত্মমুক্তির আনন্দে মেতে উঠলেন, অগণিত ভক্তিপাঠক পাঠিকাবৃন্দকে নতুন আলোর সন্ধান দিয়ে জাগ্রত নন্দিত করলেন, তারই উজ্জ্বল অভিজ্ঞান পূরবীর 'পূরবী' ও পথিক-পর্বের কবিতাগুলি। 'পলাতকা' ও 'শিশু ভোলানাথ' পর্বের সংশয় চিরতরে অস্তমিত হ'ল পূরবীর উজ্জীবন আশ্বাসে।

পূরবী সায়ংকালে গেয় রাগ বিশেষ, মতান্তরে দিনশেষের গোধূলির রাগ। অস্তায়মান সূর্যের শেষ রশ্মিলেখায় পূর্বদিগন্ত তখনও রক্তিমাভ, সন্ধা ধীরে ধীরে ছায়া বিস্তার করছে—এমন আলো-অন্ধকারের বিচিত্র খেলায় মানুষের মন যেন কেপ্রকার বেদনার, বিষণ্ণতার মূর্ছনায় আপ্লুত হয়। ফেলে আসা দিনস্মৃতির তর্পণ আনন্দ-বেদনামেদুরতার আবেশে মনকে আচ্ছন্ন করে। তেমনই স্মৃতিচারণার ছবি ও গান 'পূরবী' কবিতাটিকে কবি আত্মার সমীক্ষণে ভাস্কর করে তুলেছে।

জীবন পরিক্রমার এক বিশেষ লগ্নে পৌঁছে আত্মসমীক্ষামগ্ন কবি যখন জীবনের আশা-নিরাশা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসেব কষতে বসেন, তখন মনে হয়, তাঁর অগণিত ভালোবাসার জন—আত্মীয়-স্বজন পরিজন যাঁরা স্নেহ-মমতা-প্রীতি-ভালোবাসা দিয়ে তাঁর অন্তরকে ভরিয়ে তুলেছিলেন। সেই সকল আপনজন—কাছের মানুষ কবিচেতনার বিকাশে প্রেরণাশক্তিরূপে যে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের সেই দানকে আজ জীবনের পড়ন্ত বেলায় তিনি পরম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বারংবার স্মরণ করেছেন—

"যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে; এই জীবনের সকল সাদা-কালো
যাদের আলো-ছায়ার লীলা; সেই যে আমার আপন মানুষগুলি
নিজের প্রাণের স্রোতের পরে আমার প্রাণের ঝরনা নিল তুলি;
তাদের সাথে একটি ধারায় মিলয়ে চলে, সেই তো আমার আয়ু,
নাই সে কেবল দিন-গণনার পাঁজির পাতায়, নয় সে নিশ্বাস-বায়ু।"

কবির সেই 'আপন মানুষগুলি' জীবন-মরণের সীমানা ছাড়িয়ে তাঁকে আনন্দরসের জগতে—কবি-মানবে পৌঁছে দিয়েছিলেন বলেই তিনি কখনো তাঁদের বিস্মৃত হননি। তাঁদের আনন্দে কবির আনন্দ, তাঁদের দুঃখে কবির দুঃখ। তিনি বেশ অনুভব করতে পারেন, তাঁদের প্রতিদিনের, প্রতিনিমেষের অবদানের কথা। একটি ফুল যেমন করে প্রতিমুহূর্তের, প্রতিদিনের রসসঞ্চয়ে ফলে পরিণত হয় তার অপরিণত দশা থেকে সুপুষ্ট রসপূর্ণ সুপক্ক ফলে, তেমনি কবিও তাঁর প্রিয়জনের নিত্য সাহচর্যে, ভালোবাসা ও অভিজ্ঞতার দানে পাথেয় সংগ্রহ করে পূর্ণ করি তুলেন তাঁর আনন্দরসমধুর কাব্যের পেয়ালা। একটি উৎপ্রেক্ষায় অতীত ও বর্তমানের মিলনে জীবনে পূর্ণতার ভাবটি প্রকাশ করে কবি লিখেছেন—

"তাদের বাঁচায় আমার বাঁচা আপনসীমা ছাড়া বহুদূরে;
নিমেষগুলির ফল পেকে যায় নানা দিনের সুধার রসে পুবে;
অতীত কালের আনন্দরূপ বর্তমানের বৃন্তদোলায় দোলে—
গর্ভ হ'তে মুক্ত শিশু তবুও যেন মায়ের বক্ষে কোলে
বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের বাঁধন দিয়ে।"

শিশু মাতৃজঠর থেকে মুক্ত হলেও সদ্যোজাত সেই শিশুর সঙ্গে মাতৃত্বের বন্ধন শিথিল হয়না। মায়ের বুকে-কোলে-বেড়ে ওঠা সেই শিশু ও তার মায়ের মিলনের সেতু নিবিড় প্রেমের বাঁধন। ঠিক তেমনি শিশু-রবীন্দ্রনাথ আর বড়ো হয়ে ওঠা কবি রবীন্দ্রনাথ এদের সংযোগ সেতুরূপে অবস্থান করেছিলেন যে সকল স্বজন-পরিজন, তাঁদের সবার কথা আজ খুব বেশি করে মনে পড়ে। মনে পড়ে আর উতলা-উন্মনা হন কবি। কেন না তাঁর পরিচিত সেই আপনজনের অনেকেই আজ ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে 'সূর্য-আলোর অন্তরালের দেশে' হারিয়ে গেছেন। সেই বেদনা কবি-জীবনে বয়ে এনেছে রিক্ততা-শূন্যতা ও বিশীর্ণতার বোধ।

কিন্তু 'রিক্তশীর্ণ জীবন'বহন করেও তিনি আত্মস্থ হওয়ার সাধনায় শক্তি সঞ্চয়ে লিপ্ত হয়েছেন। যাঁরা পরলোকে তাঁদের জন্য শ্রদ্ধা ও সমবেদনা উজাড় করে দিয়েও বাস্তব সত্যকে দুহাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করেনে। বর্তমান ও জীবিতদের সঙ্গে নিয়েই কবি আরও একবার সকল দৈন্য, রিক্ততা, শীর্ণতা-শূন্যতার মাঝখান থেকে রসদ সংগ্রহ করে প্রাণৈশ্বর্যে নবজীবনের রসে সঞ্জীবিত হতে চান। জীবনরসিক, প্রকৃতি-প্রেমিক কবি সূর্য-চন্দ্র-তারা, জন-হাওয়া-মাটির সঙ্গে আত্মার সংযোগ স্বীকার করে শেষ বেলায়—অবেলায় 'পূরবী' রাগে নতুন সুরে, নবীন তানে মনোবীণার তারগুলিকে বেঁধে নিতে চান। যে রোমান্টিক আবেগে একদিন অল্পবয়সে কাব্যরসে জগৎকে প্লাবিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন, আরব-বেদুইনের দেশে ঘোড়া ছুটিয়ে জীবনস্রোতকে আকাশে ঢেলে দেবার স্বপ্ন দেখেছিলেন, আজ জীবনের পড়ন্ত বেলায়ও তিনি ফিরে পেতে চাইলেন সেই শৈশব-যৌবনের রঙ-রস উচ্ছলতা, রোমান্স-প্রেম-সৌন্দর্যাশ্রিত জীবনমুখরতাকে, সেই স্বপ্ন, সেই দীপ্ত আবেগ অস্তাচলগামী অরুণরাগের মতো, নির্বাপিতপ্রায় দীপশিখার মতো আর একবার ঝলসে উঠে ঝলমল করে দিয়েছে আমাদের চিত্ত—

"তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের অপরাহ্ন-বেলায়
তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো,—
বলে নে ভাই, "এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া এই ভালো এই ভালো।
এই ভালো আজ এ সঙ্গমে কান্না-হাসির গঙ্গা-যমুনায়

ঢেও খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।
এই ভালো রে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে
পুণ্য ধরার ধূলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে।
এই ভালো রে ফুলের সঙ্গে আলোর জাগা, গান গাওয়া এই ভাষায়,
তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে পড়া নূতন প্রাতের আশায়।"

রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ করে নতুন প্রভাতের আলোয় চিত্ত জাগরণের আশা ব্যক্ত করে কবি নবজীবনানন্দের স্বাদ পেতে চাইলেন। তাঁর এই প্রত্যাশার গানকে পরিণামী সিদ্ধান্তে তাই বিষাদ-সংগীত বলে মনে হয় না। পূরবী কবিতাটি াামার বিবেচনায় বিষণ্ণ কবি-আত্মার হারিয়ে-যাওয়া, ফুরিয়ে যাওয়ার বেদনার ম্লান কখনোই নয়, বরং তা 'ভস্ম অপমান-শয্যা' থেকে পুষ্পধনুর নবজাগরণের মতো নব আনন্দে জেগে ওঠার, বেঁচে ওঠার গান—জীবন-সংগীত। সেই সঙ্গীতের সুষমা দীর্ঘ মিশ্রবৃত্তের সুষম ছন্দে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাটিও হ'য়ে উঠেছে ভাবরসঋদ্ধ ও প্রসাদগুণে ভরা।

৩.১.২.২ মাটির ডাক

পূরবী কাব্যগ্রন্থের পূরবী-পর্বের উল্লেখযোগ্য একটি কবিতা 'মাটির ডাক'। পেরু যাত্রার পথে অসুস্থ কবি যাত্রা স্থগিত রেখে আর্জেন্টিনার অদূরে 'San Isidore' নামক রম্য বাগানবাড়িতে কিছুকালের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর সেবা ও পরিচর্যার ভার গ্রহণ করেন Signore Victoria de Estrada বা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো নামে বিদুষী তরুণী। তাঁর সেবা ও সাহচর্যে কবি স্বপ্নকালের মধ্যেই খানিকটা সুস্থ হয়ে ওঠেন।

স্বভাবতই সুদূর প্রবাসে ক্লান্ত কবিমন দেশের জন্য উতলা হতে থাকে। যে কবি পরম উসাহের আবেগে বলেছিলেন, 'দেশে দেশে মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া', যিনি মনোধর্মে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'-এর আদর্শে অবিচল—সেই বিশ্বপ্রিয়, বিশ্বপ্রেমী কবির মনে স্বদেশের আলো-হাওয়া-আকাশ-জল-মাটি, সবুজ গাস, গাছপালা প্রভৃতির প্রতি আকর্ষণ নিবিড় হ'তে থাকে। কথায় বলে 'দূরহুক দূর গৈলেঁ দোগুণ পীরিতি।'—অর্থাৎ দূরে বহুদূরে—দেশান্তরে গেলে মানুষের মনে নিজের পরিবেশ—স্বজন পরিজনদের প্রতি আকর্ষণ বহুগুণিত হয়। কবির ক্ষেত্রেও তাই সত্য হয়ে উঠেছিলো। দীর্ঘকাল শ্যামজন্মদে বঙ্গভূমি তথা ভারতের বাইরে থাকার জন্য কবি যে অনেকটাই স্বদেশ-কাতর তথা গৃহ-কাতর (Home Sick) হয়ে পড়েছিলেন। দেহ-মনের এই রকম বিচলনের মুহূর্তে কবি যে নিজের মাতৃভূমি ও প্রকৃতিকে কতো গভীরভাবে ভালোবাসেন যার কাছে অন্য যে-কোনো প্রকার স্নেহ ভালোবাসার আকর্ষণ ফিকে হয়ে যায়, তার পরিচয় যেন নতুন করে আবিষ্কার করলেন—

"আজকে খবর পেলাম
মা আমার এই শ্যামল মাটি,
অন্নে ভরা শোভার নিকেতন।"

এই আত্ম-আবিষ্কার—বলা যেতে পারে আত্ম-বিস্ফারের আনন্দকে কবি কীভাবে প্রকাশরূপ দিয়েছেন 'মাটির ডাক' কবিতাটির ধারাবাহিক আলোচনায় তা স্পষ্ট হ'তে পারে।

কবিতাটি মোট ৪টি সংখ্যাক্রমে বিধৃত। প্রতিটি সংখ্যা এক একটি বড়ো স্তবকের সমাহার। সুতরাং 'মাটির ডাক' চারটি বড়ো স্তবকের সমন্বয়ে গঠিত একটি দীর্ঘ কবিতা। কলাবৃত্ত ছন্দের সমঞ্জস্য ব্যবহারে সমৃদ্ধ ভাবরসঘন একটি উজ্জ্বল-সুন্দর কবিতা এই 'মাটির ডাক'। ভারতের মহাবাণী— 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'—স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্। রবীন্দ্রনাথের এই ভারতীয় সংস্কার ও প্রবাসজীবনের গৃহ-কাতরতার মিশ্র ফল এই 'মাটির ডাক' কবিতাটি।

প্রবাসে স্বদেশ ও স্বজনের স্মৃতিচারণার আনন্দে মাতোয়ারা কবি স্মরণ করেছেন প্রকৃতির অযোচিত দাক্ষিণ্য ও অন্তহীন ঋতুবৈচিত্র্যের কথা। ফাল্গুন মাসে শালবনে যেদিন খ্যাপা হাওয়ার উদ্দাম লীলায় বিপুল ব্যাকুলতার মধ্যে শুরু হ'য়ে যেতো মাতন, সেদিন কোন্ মন্ত্র বলে দিকে-দিগন্তরে কচি পত্রোদগমে অরণ্যে অরণ্যে সাড়া পড়ে যেতো, কবির মনে হোতো বসন্ত সমাগমের আহ্বানবাণী যেন তিনি অন্তরের নিভৃতে গুহায়িত হৃদয়কুঞ্জছায়ার অনুভব করতে পারছেন। তা না হলে কিশলয়ে কিশলয়ে সাড়া জাগানো বসন্ত বাতাসে তাঁর সর্বাঙ্গ শিহরিত হ'বে কেন? আবার ফাল্গুন পেরিয়ে ঋতুপ্রকৃতিতে যেদিন শরতের আবির্ভাব ঘটতো,

সূর্যোদয়ের রাঙা আলোয় নদীতীরের ফসল-খেতে কচি ধানের খাম খেয়ালি খেলায়' 'নীল আকাশের কূলে কূলে' যেন সবুজ সাগর দুলে উঠতো—সবুজের ঢেউ খেলে যেতো, কবি অনুভব করতেন ঋতুপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁর অভিন্ন আত্মীয়তা। তা না হলে শরতে সবুজের এই সমারোহে অবগাহনের জন্য তাঁর অভিন্ন আত্মীয়তা। তা না হলে শরতের সবুজের এই সমারোহে অবগাহনের জন্য তাঁর মন উতলা হবে কেন? আত্মবিস্তৃতির অতল থেকে মুক্তির জন্য তাই কি কবিপ্রাণ প্রকৃতির যজ্ঞশালায় আশ্রয়প্রার্থী?—

"সেদিন আমার হত মনে
ঐ সবুজের নিমন্ত্রণে
যেন আমার প্রাণের আছে দাবি;
    তাই তো হিয়া ছুটে পালায়
    যেতে তারি যজ্ঞশালায়,
    কোন্ বুলে হায় হারিয়েছিল চাবি।" (১ম স্তবক)

জননী ও জন্মভূমির প্রতি কবির নাড়ির টান। আকাশে-বাতাসে দিবারাত্র যেন তাদের আহ্বান তাঁর অন্তরে নাড়া দেয়। যে জননীর কোলে তাঁর মর্তজীবনে আবির্ভাব, সেই মায়ের স্নেহাঞ্চল থেকে দূরে থাকার বেদনায় তাঁর হৃদয় ভরে থাকে। তাঁর মনে হয়, কেউ যেন জোর করে তাঁকে মায়ের বুক থেকে কেড়ে নিয়ে গিয়ে নানান পাকে জড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু বিচ্ছেদের বেদনায় লীন তাঁর অন্তরাত্মা মা ও ছেলের এই ছাড়াছাড়ি সইবে না, সইতে পারে না, উল্টে বরং শুরু হ'বে তার প্রতিক্রিয়া এবং সে অবশ্যই ফিরে ফিরে চাইবে আপন মাকে।' মায়ের প্রতি সন্তানের এই আকর্ষণের বোধ কবির মগ্নচেতনায় একপ্রকার অকারণ বেদনা ও শূন্যতাজাত ব্যাকুলতার সৃষ্টি করেছে। সেই ব্যাকুলতা শূন্যহৃদয় কবিকে করে তুলেছে অস্থির চঞ্চল, করে তুলেছে মাতৃস্নেহবিলাসী—

"শুনে আমি ভাবি মনে,
তাই ব্যথা এই অকারণে
প্রাণের মাঝে তাই তো ঠেকে ফাঁকা,
তাই বাজে কার করুণ সুরে
"গেছিস দূরে, অনেক দূরে"
কী যেন তাই চোখের' পরে ঢাকা।
তাই এতদিন সকল খানে
কিসের অভাব জাগে প্রাণে
ভালো করে পাইনি তাহা বুঝে;
        ফিরেছি তাই নানামতে
        নানান হাটে, নানান পথে
        হারানো কোল কেবল খুঁজে খুঁজে।" (২য় স্তবক)

মাতৃকোলের এই পিপাসা কবিকে গর্ভধারিণী জননীর সঙ্গে জীবধাত্রী মাটি-মাকে অভিন্ন করে দেখতে শিখিয়েছে, তার জীবনদায়ী ঐশ্বর্যের প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল করেছে। কবিচিত্তে হয়েছে পরম সত্যের উদ্বোধন—

"আজকে খবর পেলেম খাঁটি—
মা আমার এই শ্যামল মাটি,
অন্নে ভরা শোভার নিকেতন;
অভ্রভেদী মন্দিরে তার
বেদী আছে প্রাণদেবতার,
ফুল দিয়ে তার নিত্য আরাধন।
এইখানে তার অঙ্ক-মাঝে
প্রভাতরবির শঙ্খ বাজে;
আলোর ধারায় গানের ধারা মেশে,

এইখানে সে পূজার কালে
সন্ধ্যারতির প্রদীপ জ্বালে
শান্ত মনে ক্লান্ত দিনের শেষে।”

দূর প্রবাসে কবির মনে যখনই দেশের স্মৃতি, মাটি-মার স্মৃতি জাগ্রত হয়, উদ্বেল হয় তাঁর অন্তর। জননী বসুন্ধরার স্নেহনিবিড় সান্নিধ্য থেকে অর্থোপার্জনের নেশায় দূরে চলে গিয়ে সম্পদের সাশ্রয় হয়তো হয়। কিন্তু ধনের গোলক ধাঁধায় ঘুরে মরার মাঝখানে সৃষ্টি হয় এক বিরাট শূন্যতার। ফলে পথ ভ্রষ্ট, লক্ষ্যহারা কবি কবিসৃষ্টির ধ্রুবপথ বিস্মৃত হন। তাই ‘কাজ ফলে না অবকাশের মাঝে।’ (স্তবক-৩) তৎসত্ত্বেও অলোক সামান্য সৃজনীশক্তির অধিকারী, কল্পনাবিলাসী কবি দেশপ্রকৃতি ও দেশ জননীর প্রতি যে নিবিড় নৈকট্য অনুভব করেন তাতেই ছুটে যায় সকল প্রতিবন্ধকতার কৃত্রিম মানস-শিকল। মুক্তি সুখের উল্লাসে, ধরিত্রী মার পাত পেড়ে অন্ন-বিতরণে, ঋতুবৈচিত্র্যে বিশ্বপ্রকৃতির অফুরন্ত ঐশ্বর্যের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে যেন ‘বিশ্বজনের প্রাণ’কে স্পর্শ করেন। দূরে ও নিকটের ব্যবধান ঘুচে গিয়ে উদাসীন কবিপ্রাণ পূর্ণ হয় পরম প্রাপ্তির আনন্দে—

“ কী ভুল ভুলেছিলেম আহা,
সব চেয়ে যা নিকট, তাহা—
সুদূর হয়ে ছিল এতদিন,
কাছেকে আজ পেলেম কাছে—
চারিদিকে এই যে ঘর আছে
তার দিকে আজ ফিরল উদাসীন।”

আসলে দূর নিকট বলে কিছুই নেই। ‘বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর?’—এই মহান বিশ্ববোধের সঙ্গে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সহযোগ ঘটলে বিশ্বের যে-কোনো প্রান্তে বাস করেও স্বদেশের—প্রিয়তম মাতৃভূমির প্রতি গভীর টান অনুভব করা সম্ভব। আপন-পর, কাছ-দূর-কেন্দ্রিক ধারণা মানসিক বোধের ভ্রান্তিময় দুর্বলতারই প্রকাশ যাকে পরমপ্রীতি, পরম আত্মীয়তায় সহজেই অতিক্রম করা যায়— এমন একটা অনুভবের প্রতিফলন ঘটেছে ‘মাটির ডাক’ কবিতায়। তাছাড়া স্থান-কাল-পাত্র যাইহোক না, জননী ও জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা কোনো দিন মন থেকে, স্মৃতি থেকে মুছে যায় না, মরে না—এই বোধটিও কবিতাটিকে একটি বিশেষ মাত্রা দিয়েছে।

৩.১.২.৩ : পঁচিশে বৈশাখ

১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ (৭ই মে, ১৮৬১) রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। নিজের আবির্ভাব দিনটিকে স্মরণকরে কবি অন্ততঃ দুটি কবিতা রচনা করেছিলেন। তার একটি ‘পূরবী’র ‘পঁচিশ বৈশাখ’, এবং দ্বিতীয়টি আরও চোদ্দ বছর পরে লেখা ‘সেঁজুতি’ কাব্যের ‘জন্মদিন’ (১৯৩৮)। দুটি কবিতার ভাবধর্ম এক হ’লেও উপস্থাপন ও প্রকাশশৈলীর বৈচিত্র্য কবিতা দুটিকে স্বতন্ত্র মাত্রা দিয়েছে। ‘সেঁজুতি’র কবিতাগুলি ‘প্রান্তিক’- পর্বের রচনা এবং সেগুলিতে প্রান্তিক কাব্যে বর্ণিত কবিভাবনার ছায়া বর্তমান যার পরিণতি যুদ্ধ বিধ্বস্ত পৃথিবীর ‘রণরক্তবিফলতা’য় পীড়িত, মানবাত্মার অপমানে ব্যথিত সন্তপ্ত কবির প্রতিবাদী সত্তার জাগরণে—

“বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে।” (প্রান্তিক, ১৮ সংখ্যক কবিতা)

প্রান্তিকের এই আবহ ‘সেঁজুতি’র জন্মদিন’ কবিতায় জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে ছায়া বিস্তার করেছে। কিন্তু পূরবী’র ‘পঁচিশে বৈশাখ’ কবিতাটি তার অনেক বছর আগে ভিন্ন পটভূমিতে লেখা বলে দুটি কবিতার তৌল বিশ্লেষণ এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে প্রেক্ষিত যাইহোক, জন্মদিনকে কেন্দ্র করে ভাবের আবেগে উদ্বেল কবির নষ্টালজিয়া দু’টি কবিতাতেই অল্প-বিস্তর আবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে ‘পঁচিশে বৈশাখ’ কবিতাটির মূল ভাব-রসের বিশ্লেষণ আমাদের আলোচ্য।

‘পঁচিশে বৈশাখ’ পাঁচটি বড়ো স্তবকে সম্পূর্ণ একটি নিটোল কবিতা। জন্মদিনটির উপর মানবীয় সত্তাচেতনা আরোপ করে

সমাসোক্তি অলঙ্কারের ঔজ্জ্বল্যে কবি ঋদ্ধ করেছেন কবিতাটিকে। জন্মদিন—সে যেন নিজেই একটি চরিত্র। প্রতি বছর এই বিশেষ দিনটিতে কবির আবির্ভাবের মাহেন্দ্রক্ষণটিকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই যেন দূত রূপে তাঁর আবির্ভাব।—

"রাত্রি হল ভোর।
আজি মোর
জন্মের স্মরণপূর্ণ বাণী,
প্রভাতের রৌদ্র-লেখা লিপিখানি
হাতে করে আনি,
দ্বারে আসি দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।"

কবির জন্মদিনের মাহেন্দ্রক্ষণটি স্মরণের তুলিতে চিত্রপটে আঁকা ছবির মতো জীবন্ত হয়ে উঠেছে। পূর্ব দিগন্তে অরুণালোক উঁকি দিচ্ছে। সেই আলো পড়েছে গাছের মাথায় পত্র-পল্লবের উপরে আর তাদের ম্লানছায়া পড়েছে নীচে। সমগ্র বনভূমিকে ম্লান করে দিয়েছে সেই ছায়া। মনে হচ্ছে যেন চারিদিকে ছড়িয়েছে বিষণ্ণ ভৈরবীর করুণ মূর্ছনা। ধীরে ধীরে সেই আলো শাল-তাল-শিরীষের মিলিত মর্মর ধ্বনি জাগরিত করে বনান্তের ধ্যান ভেঙ্গে দিলো। এ যেন রিকত সন্ন্যাসীর উদার ললাটে আঁকা তিলকরেখার মতোই বিকশিত প্রথম অরুণ-কিরণ। পঁচিশে বৈশাখের এমনি এক সূর্যালোকিত দিনে শিশু রবির আবির্ভাব। এই বিশেষ দিনটি-ফিবছর নতুন বেশে, নতুন বৈচিত্র্যে, নতুন তাৎপর্যে-মণ্ডিত হয়ে ফিরে আসে কবির কাছে। সেই প্রিয় দিনটিকে বরণ করে নেবার জন্যে প্রকৃতিলোকে সাড়া পড়ে যায়। জেগে ওঠে আতাম্র আমের বন, শিহরিত হয় তরুণ তালের গুচ্ছ, কাল বৈশাখীর মত্ত মেঘের বন্ধনহীন বেগে উড়ে যায় শুকনো পাতা। কিন্তু কালবৈশাখীর উন্মত্ত ঝড়ো হাওয়ায় যার চঞ্চলতা, সেই দিনটিই আবার কবির কাছে ধরা দেয় একান্তে, নিভৃতে, নীলকান্ত আকাশের উপরে উচ্ছলিত সুধার পেয়ালার মতো আনন্দরসে পূর্ণ পৃথিবীর এক প্রৌঢ় মানবশিশুর কাছে। উদিত সূর্যের রঙে উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের উত্তরীয় দিয়ে ঢাকা প্রাণ দেবতার নিজের হাতে পাঠানো সুসজ্জিত উপহারের ডালি নিয়ে তাঁর আবির্ভাব—

"আর সে একান্ত আসে
মোর পাশে
পীত উত্তরীয়তলে লয়ে মোর প্রাণদেবতার
স্বহস্তে সজ্জিত উপহার—
নীলকান্ত আকাশের থালা
তারি' পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পেয়ালা।" (১ম স্তবক)

আজ সকালে সেই শুভ দিনটি যেন অনন্ত সমুদ্রের শঙ্খনাদ ধ্বনিত করে ফিরে এসেছে কবির কাছে। তাঁর নির্ঘোষ তিনি যেন ঘনঘন শুনতে পান আপন হৃদয়ের মধ্যে। জন্ম-মৃত্যুর যে দিগ্বিলয়-চক্ররেখা জীবনকে ঘেরাটোপে আটকে রেখেছিলো, নিমেষে তা অদৃশ্য হয়, আর শূন্যতা মহাকালের বাঁশরীর তানে শুভ্র আলোর মালায় ঢাকা পড়ে। সেই আলো, অন্তহীন সংগীতের সেই মূর্ছনা আলোকিত করে তাঁর হৃদয়কে প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রীতে, চিত্তে তারই ঝংকার, সুরবৈচিত্র্যে তারই অনুরণন ও অনুভব। (২য় স্তবক)

জন্মদিনের মঙ্গলদূত পূর্বদিগন্তের নীচে পৃথিবীতে নেমে এসে শান্ত হাসিতে ভরিয়ে দেন কবির অন্তর, কানে কানে জন্মদিনের গূঢ়ার্থ প্রকাশিত করে নবজীবনের, নবজাগরণের মন্ত্র শুনিয়ে দিয়ে উদ্বোধিত করেন তাঁকে—

"অম্লান নূতন হ'য়ে অসংখ্যের মাঝখানে
এক দিন তুমি এসেছিলে
এ নিখিলে
নবমল্লিকার গন্ধে,
সপ্তপর্ণ-পল্লবের পবন হিল্লোল-দোল-ছন্দে,
শ্যামলের বুকে,

নির্নিমেষ নীলিমার নয়ন সম্মুখে।
সেই যে নূতন তুমি,
তোমারে ললাট চুমি
এসেছি জাগাতে
বৈশাখের উদ্দীপ্ত প্রভাতে।" (৩য় স্তবক)

জন্মদিনের অর্থ আরও তাৎপর্যমণ্ডিত করে তিনি বলেছিলেন, জন্মের প্রথম শুভক্ষণটি আবার নতুন হয়ে ধরা দিক কবির কাছে। তাঁর কবিচেতনাকে আড়াল করেছে 'শীর্ণ নিমেষের যতো ধূলিকীর্ণ জীর্ণ পত্ররাজি'—সে সকল নিঃশেষে দূরে সরে যাক নবজাগ্রত প্রভাতে। নবীন কবি যেন প্রথম জন্মদিনটিকে অক্ষয় করে তুলতে পারেন প্রতি পলে জেহেগ ওঠা ঝর্ণাধারার মতো, প্রতিক্ষণে উতলে ওঠা সমুদ্র তরঙ্গের মতো। ভস্ম থেকে 'দীপ্ত হুতাসনের' মতো সকল জীর্ণতার,সকল মালিন্যের, সকল বাধার আবরণ ভেদ করে, নবোদিত সূর্যের তেজ ধারণ করে তাঁর নব জাগরণ পূর্ণ হোক—

'হে নূতন,
হোক তব জাগরণ,—
ভস্ম হতে দীপ্ত হুতাসন।" (৪র্থ স্তবক)

নব জাগরণের নতুন দিনে কুজ্ঝাটিকা উদ্ঘাটিত করে সূর্যপ্রভাস্বর রবিকবির প্রকাশ হোক। বসন্তের আবির্ভাবে সমগ্র বনভূমির বৃক্ষশাখাগুলি যেমন মুহূর্তে কিশলয়ে ভরে ওঠে, তেমনিভাবে সকল রিক্ততাকে অতিক্রম করে আপনাকে প্রকাশ-ঐশ্বর্যে পূর্ণ করে তুলুন কবি। জন্মদিনের নতুন আলোয় জীবনের জয় ঘোষিত হোক, তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হোক অন্তরের অক্লান্ত বিস্ময়।"—

"ব্যক্ত হোক জীবনের জয়,
ব্যক্ত হোক, তোমা মাঝে অক্লান্ত বিস্ময়।"

উদয় দিগন্তে শুভ্র শঙ্খধ্বনির মধ্যে কবি আপন চিত্তের মাঝে শুনতে পেলেন পঁচিশে বৈশাখের পদধ্বনি, শুনতে পেলেন তাঁর চিরনূতনকে আবাহনের বাণী—

"উদয়-দিগন্তে ঐ শুভ্রশঙ্খ বাজে।
মোর চিত্তমাঝে
চির-নূতনের দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।" (৫ম স্তবক)

বস্তুত 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটি পূণ্য জন্মদিনের স্মরণ-উৎসব উপলক্ষ্য করে নবজাগরণের আনন্দে ও উজ্জীবনমন্ত্রে কবির উদ্বোধিত হওয়ার বাণীরূপ। একটু নাটকীয় ভাবে, মিশ্রছন্দে মুক্তবন্ধের দোলায় চিরনূতনকে বরণ করে নব জীবনের আনন্দে মেতে ওঠবার প্রত্যাশায় সমুজ্জ্বল কবিতাটি।

৩.১.২.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'পূরবী'র নাম কবিতা অবলম্বনে কবিতাটির ভাববস্তু ও কবি মানসিকতার পরিচয় লিপিবদ্ধ করো।

২। 'মাটির ডাক' কবিতায় প্রকাশিত কবির প্রকৃতিপ্রীতি ও দেশচেতনার পরিচয় দাও।

৩। "আজকে খবর পেলেম খাঁটি—
মা আমার এই শ্যামল মাটি,
অন্নে ভরা শোভার নিকেতন;"—কোন্ কবিতায় কবি একথা বলেছেন? কথাটির তাৎপর্য বিশদ করো।

৪। 'পূরবী' পর্বের আবহে 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটির ভাব-তাৎপর্য উপস্থাপন করো।

৫। 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটির চির নূতনের আবাহন ও উজ্জীবন মন্ত্র। — আলোচনা করো।

৩.১.২.৫ সহায়ক গ্রন্থাবলী :

১। পূরবী (বিশ্বভারতী সং) — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২। রবীন্দ্র রচনাবলী (সমগ্র — বিশ্বভারতী সং)।
৩। যাত্রী (বিশ্বভারীত সং) — রবীন্দ্র ঠাকুর।
৪। রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য-প্রবেশক (তৃতীয় সং-বিশ্ব ভারতী) — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
৫। রবি-রশ্মি (২য় খণ্ড, পশ্চিমভাগে, ১ম সং) —চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৬। রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ (৩য় সং) —প্রমথনাথ বিশী।
৭। রবীন্দ্র-সরণী (৫ম মুদ্রণ) — প্রথমনাথ বিশী।
৮। রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত ২য় সং) — কল্যাণীশঙ্কর ঘটক।
৯। ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ (১ম সং) শঙ্খ ঘোষ।
১০। মহাকবি কালিদাসের সমগ্র রচনাবলী (ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী-সম্পাদিত ১ম সং)।

একক -৩

তপোভঙ্গ, আগমনী, লীলা সঙ্গিনী

বিন্যাস ক্রম

৩.১.৩.১ : তপোভঙ্গ

৩.১.৩.২ : আগমনী

৩.১.৩.৩ : লীলা সঙ্গিনী

৩.১.৩.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩.১.৩.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩.১.৩.১ : তপোভঙ্গ

মহাকবি কালিদাসের অমরকাব্য ‘কুমারসম্ভব’-এর ভাবছায়া কবিতাটি রচিত। তারকাসুরের অত্যাচার- জর্জরিত দেববৃন্দ দেবলোকের কল্যাণের জন্য উমা মহেশ্বরের মহামিলন কামনা করেছেন। ‘পর্যাপ্ত যৌবনপুঞ্জে অবনমিতা উমা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার’ মতো ললিত দেহ-লাবণ্য নিয়ে ধ্যানমগ্ন ধূর্জটির চরণে-প্রতা হয়েছেন। কামদেব মদন ও তাঁর সহচর-সখা সন্তের সহায়তায় চারদিকে অকাল বসন্তের সমারোহ ঘটেছে। কুমারজন্মের জন্য উমা-মহেশ্বরের মলনের আয়োজন সম্পর্ণ হয়েছে। মহাদেবের ধ্যান ভাঙ্গলো, কিন্তু তাঁর রোষের আগুনে সৌন্দর্যের দেবতা মদন পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন। সুলজ্জিতা উমা মহেশ্বর মিলনের অন্তরায় নিজের রূপকেই ধিক্কার দিলেন—

“তথা সমক্ষং দহতা মনোভবং
পিনকিনা ভগ্নমনোরথা সতী।
নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী
প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা।” (কু.স.৫/১)

উপেক্ষিতা অনাদৃতা পার্বতী এবার দুঃখব্রত ও তপশ্চর্যার পথ গ্রহণ করলেন—

“ইয়েষ সা কর্তুমবন্ধ্যরূপতাং
সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ।
অবাপ্যতে বা কথমন্যথা দ্বয়ং
তথাবিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ।।” (কু.স. ৫/২)

তারপর কল্যাণী উমা তপের দ্বারা শুদ্ধা ও জ্যোতির্ময়ী হয়ে মহাদেবের পূজায় নিজেকে অর্ঘ্য দিলেন। শুভফলও পেলেন তিনি, লাভ করলেন শিবের মতো পতি। জয় হলো তাঁর অলোকসামান্য প্রেমসাধনার। তাঁর নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, দুঃখসাধন, ত্যাগ প্রভৃতি প্রেমতপস্যার বিরল ঐশ্বর্য দেবাদিদেবের প্রেমঘন করুণাঘন দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। স্বতঃপ্রণোদিত মহাদেব দেবতার সামগ্রিক কল্যাণের জন্য স্বভাববিরুদ্ধ সংসারধর্ম পালনে সম্মত হলেন এবং তপঃপূতা উমার পাণিগ্রহণ করলেন। অর্থাৎ প্রেমের কাছে যোগীশ্বর-মহেশ্বর শিবের পরাজয় ঘটলো। যথার্থ প্রেম সে সহজলভ্য নয়, বহু তপস্যার, বহু সাধনার ধন—‘কুমারসম্ভব’ কাব্যে উমার তপস্যা অংশে (দ্রঃ কু.স. পঞ্চম সর্গ) কালিদাস তা আমাদের দেখিয়েছেন। এই কাব্যে প্রেমের স্বরূপ ও তার ঐশ্বর্য প্রতিষ্ঠাই কবির অভিপ্রেত ছিলো। বিবাহ সংসারধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ এবং সেই ধর্মের প্রেম-সৌন্দর্য ও মঙ্গলের আদর্শ ওতঃপ্রোত হয়ে আছে ভারতীয় সংস্কারে। ধর্ম-সৌন্দর্য প্রেম ও মঙ্গলের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকলে তার পরিণামে কল্যাণময় আনন্দময় ফল দান করে। কুমারসম্ভব কাব্যের ব্যাখ্যায় প্রেম সম্পর্কিত এমনই এক উপলব্দির কথা উল্লেখ করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ—“ধর্মের অর্থই সামঞ্জস্য, এই সামঞ্জস্য সৌন্দর্যকেও রক্ষা করে, মঙ্গলকেও রক্ষা করে এবং সৌন্দর্য ও মঙ্গলকে অভেদ করিয়া একটি আন্দময় সম্পূর্ণতা দান করে।” (দ্রঃ কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা—প্রাচীন সাহিত্য) উমা-মহেশ্বরের প্রেম ও মঙ্গলমিলনের অনুষঙ্গ কুমারসম্ভবের

অনুসরণে রবীন্দ্রকাব্যে-প্রবন্ধে -উপন্যাসে চিঠিপত্রে বিভিন্ন প্রসঙ্গে নানাভাবে উঁকি দিয়েছে। (এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য দ্রঃ 'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য'—'কুমারসম্ভব ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ—কল্যাণীশঙ্কর ঘটক) উমা-মহেশ্বরের বিবাহকেন্দ্রিক বিষয়টি অনুভূতি ও পরায়ণ ও সংবেদনশীল কবিচিত্তে কয়েকটি প্রশ্ন উদ্রিক্ত করেছে—

'..... ভব-ভবানীর প্রেমগাথা
নিরাসক্ত নিরাকাঙ্ক্ষ ধ্যানাতীত মহাযোগীশ্বর
কেমনে দিলেন ধরা সুকোমল দুর্বলসুন্দর
বাহুর করুণ আকর্ষণে, কিছু নাহি যাঁর
তিনি কেন চাহিলেন—ভালোবাসিলেন নির্বিকার—
পরিণয় পাশ।...." ইত্যাদি (উৎসর্গ—২৬ সংখ্যক কবিতা)

'তপোভঙ্গ' কবিতাটির রসবিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কুমারসম্ভ কাব্য ও পূরবী পর্বের পটভূমি সমানভাবে বিবেচনা করে আলোচনায় অগ্রসর হতে হবে। মনে রাখতে হবে, কুমারসম্ভবের ভাবছায়ার অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্যের প্রবন্ধে ভারতীয় প্রেমসংস্কারের ঐশ্বর্য ও মহত্বের উপর অশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 'তপোভঙ্গ' কবিতার ধূর্জটির ধ্যানমগ্নতা ও ধ্যানভঙ্গের গূঢ় তাৎপর্য বিশ্লেষণের পশ্চাতেও অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে সেই আদি ও অকৃত্রিম প্রেমের আদর্শ। সেই আদর্শই উমা-মহেশ্বরের মিলন সাধন করেছে এবং সেই মঙ্গল মিলনের রাগ-অনুরাগ মিশ্রিত বিচিত্র ছবিটি ধরা পড়েছে মহেন্দ্রপ্রেরিত দূত কবির অন্তর্দৃষ্টিতে। 'তপোভঙ্গ' স্মৃতিচারণার আবেশে মুখর কবিতা। কবিতাটি নবচেতনা ও জীবনরসে সঞ্জীবিত। প্রৌঢ়ত্বের আশাহত কবিমনে নতুন করে যৌবনকে ফিরে পাওয়ার আশা জেগেছে। কুমারসম্ভবের শিবের মতো কবিরও আপাতবার্ধক্যের আবরণ আসলে তাঁর যৌবন-মানসকে নতুন করে ফিরে পাবার একটা সাময়িক ছলনা মাত্র।

বস্তুত কবির কাছে যিনি শিব (শিবম্), তিনি সুন্দর (সুন্দরম্)। কবি শিবের পূজারী, সুতরাং সুন্দরেরও পূজারী। শিব মহেশ্বর হলে কি হয়, তিনি যে আবার সুন্দর। এক সময়ে যুবা কবি ভোলানাথের যৌবনচঞ্চল দিনগুলি রঙে-রসে চারুলতায় প্রাণোচ্ছলতায় ভরে দিয়েছিলেন। আজ তাঁর বার্ধক্যে ভোলানাথ যেন তাঁকেই ভুলে ছলনাময় তপস্যায় মগ্ন। অথচ যৌবনের স্বপ্নরঙিন দিনগুলিতে ধ্যানতন্ময় ধূর্জটির তপোভঙ্গের চক্রান্তে কোনা এক যুগে মহেন্দ্রপ্রেরিত কবি-দূত রূপে তিনি তাতে যোগ দিয়েছিলেন। যুগে যুগে কবিগণইতো সব ছেড়ে সুন্দরের, ভীষণের-ভয়ঙ্করের আহ্বানে সাড়া দিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে এসেছেন। বর্তমান কবি শিরোমণিও তার ব্যক্তিক্রম নন। তাই ধূর্জটির তপোভঙ্গে কবিরূপে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকার কথা সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করতে তাঁর দ্বিধা নেই—

"তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র-সন্ন্যাসী,
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবন।
দুর্জয়ের জয়মালা পূর্ণ করে মোর ডালা,
উদ্দামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।
ব্যথার প্রলোপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী।
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহল কোলাহল আনি
মোর গান হানি।" ('তপোভঙ্গ'—পূরবী)

প্রণয়ের দেবতা মদন আর প্রেমিক কবি ধর্মের দিক থেকে অভিন্ন। পুষ্পধনুর মতো কবির গানও বসন্তের মাধুরীকে ভাষাদান করেছে। সেইজন্য তপোভঙ্গের চক্রান্তে কামদেব ও কবি—দুজনেই পেয়েছেন শাস্তি। কামের পরিণতি হরকোপানলে দগ্ধ অঙ্গারে, আর কবির—তারুণ্যের অবরোধে। মহাকাল শিব যেন কবির সুধারসের পেয়ালাটিকে আপন জটার অন্তরালে সঙ্গোপনে লুকিয়ে রেখেছেন। তিনিও চান একান্ত ভাবে ধরা দিতে চিরসুন্দরের কাছে—যে সুন্দর ধ্যান-তপস্যা যোগে সুন্দর। কল্যাণী উমার কাছে ধরা দেবার জন্যই বোধহয় তাঁর কপট ছদ্মবে। বিনাশের মধ্যেই তাঁর সৃষ্টির আহ্বান। সেই আহ্বানকে সফল করে তুলবে কে? কবির ছন্দোময়ী বাণী। মহাকাল শিবের মনোগত অভিপ্রায়টি কবির মাধ্যমে চরিতার্থতা লাভ করে বলেই তাঁর সঙ্গে কবিসত্তার একটি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। কবিরা যে চিরসুন্দরের দূত। সেইজন্য বর্তমান কবিরও বিশ্বাস, তাঁর যৌবনরসে‌ুচ্ছল অতীত দিনগুলি পরিণত বয়সেও আবার ফিরে আসবে। মহাকালের ছলনার ভান ও তাঁর মূল অভিপ্রায়টি তিনি ঠিকই বুঝে ফেলেছেন। সুতরাং

চিরযুবাও চিরজীবীত্বের অধিকার নিয়েই অমর কবির আসনটি তিনি লাভ করবেন না কি?—

'হে শুষ্কবল্কলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব—
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
ছদ্মরণবেশে।
বারে বারে পঞ্চশরে অগ্নিতেজে দগ্ধ করে
দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি বারে বারে বাঁচাইবে শেষে।
বারে বারে তারি তূণ সম্মোহনে ভরি দিব ব'লে
আমি কবি সঙ্গীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চলে
মৃত্তিকার কোলে।" ('তপোভঙ্গ'—পূরবী)

'কুমারসম্ভব'—এর উমার তপস্যার গৌরবময় কাহিনীটি রবীন্দ্রভাবনার স্পর্শে কেমন সমুন্নত মহিমা লাভ করেছে! তবে শিবের ধ্যানতন্ময়তার তাৎপর্য কালিদাস কোথাও স্পষ্ট করে বলবার চেষ্টা করেননি—রবীন্দ্রানুভবে সেই তাৎপর্য স্পষ্ট হয়েছে। যেমন 'তপোভঙ্গ' কবিতায় কবিতাটির গূঢ়ার্থ, তার মর্মবাণীটি যেন কবি আবিষ্কার করে ফেলেছেন। কোনো ভাষ্যকার, কোনো ব্যাখ্যাতা যার সন্ধান পাননি, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সান্দ্র অনুভূতিতে তা ভাব-রসঘন প্রকাশরূপে সমুজ্জ্বল হয়েছে। কবি খুব ভালো করেই বুঝেছেন যে ছলনাময় শিব সুন্দরের কাছে পরাভব স্বীকার করে ধরা দেবার জন্যই ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন—

"জানি জানি বারংবার প্রেয়সীর পীড়িত প্রার্থনা
শুনিয়া জাগিতে চাও আচম্বিতে, ওগো অন্যমনা,
তাই তুমি ধ্যানচ্ছলে বিলীন বিরহতলে
উমারে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্তদুখদাহে।" ('তপোভঙ্গ'—পূরবী)

দুখের পরিণতি আনন্দে। মিলনের মধু লগ্নটিকে সার্থক করে তুলতে মাঝে যেন ইচ্ছা করেই একটি দুঃখ-সাধন অধ্যায়ের সৃষ্টি—যেটি সাময়িক, যেটি নিতান্তই রুদ্রের ছলনা। উমাকে দুঃখ দিয়ে শিব যেন মিলনের ক্ষণটিকে আরও দীপ্ত, আরও সুন্দর করে তুলেছেন। বলা বাহুল্য, বিনাশের পথে রুদ্রের সৃষ্টির মিলনের ক্ষণটিকে আরও দীপ্ত, আরও সুন্দর করে তুলেছেন। বলা বাহুল্য, বিনাশের পথে রুদ্রের সৃষ্টির ইঙ্গিত অথবা দুঃখের ছদ্মবেশে মিলন অভিসার কিম্বা আনন্দের জয়যাত্রা—এইরূপ তত্ত্ব-দর্শন উপনিষদ্ ও কুমারসম্ভব-এর ভাবছায়াশ্রিত রাবীন্দ্রিক অনুভবের উজ্জ্বল প্রকাশ। সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে এই তত্ত্ব দর্শনলালিত ভাবনাটি বিস্তারলাভ করেছে এবং প্রত্যয়ের মহিমা অর্জন করেছে।

'তপোভঙ্গ' কবিতাটি আরও বিশেষ একটি কারণে রবীন্দ্রকাব্যধারায় উল্লেখযোগ্য। কবিতাটিতে যুগ-যুগান্তরে ব্যাপ্ত রূপান্তরিত কবি আদর্শের পরিচয় আছে। কবির অনুভবে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে—

'ভগ্ন তপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি
দেখি আমি যুগে যুগে, বীণাতন্ত্রে বাজাই ভৈরবী—
আমি সেই কবি।"

"কবিরূপে রবীন্দ্রনাথ যে জন্ম-জন্মান্তর ধরে সৌন্দর্যের আরতি করে এসেছেন। বৈদিক যুগ থেকে কালিদাসের যুগ, কালিদাস থেকে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত নানা রূপান্তর-জন্মান্তরের ভিতর দিয়েও তাঁর সেই সুন্দর-বন্দনার অপরিবর্তিত রূপটি চির বিরাজমান। যেন সর্বকালের কবিদের ভাবসমন্বয় ঘটেছে একক কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে।" ('রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য'—২য় সং, পৃ ২১৮—কল্যাণীশঙ্গর ঘটক)

তাই যেন মিলনের মধুমাসটিকে সর্বার্থেই পূর্ণ করে তোলবার জন্য যুগে যুগে ডাক পড়েছে কবির। বার্ধক্যের সন্ন্যাসের ছদ্মবেশ ছাড়িয়ে কাব্যের ইন্দ্রজালে মহাকালকে বরবেশে সাজিয়ে দিতে হয়েছে কবিকে। আর তাতেই বর্তমান প্রৌঢ় বয়সেও যেন মহাকালের দরবারে কবির চিরযৌবনের অধিকার পাকা হয়েছে। তখন স্বয়ং উমার সম্মতিতে সুন্দরের পূজায় কবির অন্তরেও বিরাজ করেছে চিরশান্তি—আত্মপ্রসাদ—

"কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি-পানে—
সে হাস্যে মন্দ্রিল বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনিগানে
কবির পরাণে।" (তপোভঙ্গ—পূরবী)

কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্য রবীন্দ্র রসপুষ্টিতে কেমনভাবে সহায়ক হয়েছে তার একটি অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই 'তপোভঙ্গ' (পূরবী) কবিতাটি।

৩.১.৩.২ আগমনী

'আগমনী' কবিতাটি চিরযৌবনের, চির নবীনের আবাহন-গীতি। প্রকৃতি জগতে শীতের জড়তা-মন্থর আবহে যখন কাঁপনলাগা বাতাস বইতে থাকে, শুরু হয়ে যায় শুষ্ক-বিশীর্ণ জীর্ণ পত্ররাজির ঝরে পড়ার পালা — তার পায়ের ধ্বনি আমরা অনেকেই শুনতে পাইনা সত্য কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতি তাকে স্বাগত জানাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না। বসন্তের উতল হাওয়ায় গাছে গাছে কচি পত্রোদগম পুপমঞ্জুরীর আবির্ভাব, দোয়েল-শ্যামা-কোকিল-কপোতের সুমধুর কণ্ঠরব সোচ্চার কণ্ঠে জানিয়ে দেয় তার আগমন বার্তা—শিহরিত আমলকী বনের মর্মরধ্বনি তারই সংকেত। কীভাবে তার আগমন ঘটলো? চিত্তবিমোহন উৎপ্রেক্ষার লহরী তুলে সেই মাহেন্দ্রক্ষণটিকে আশ্চর্য সুন্দর প্রকাশরূপ দিয়েছেন কবি—

"গোপনে এল, স্বপনে এল, এল সে মায়া-পথে,
পায়ের ধ্বনি নাহি।
ছায়াতে এল, কায়াতে এল, এল সে মনোরথে
দখিন হাওয়া বাহি
অশোক বনে নবীন পাতা
আকাশ পানে তুলিল মাথা,
কহিল, "এসেছ কি?"
মর্মরিয়া থরথর কাঁপিল আমলকী।"

চিরনবীনের, চির সবুজের, চির তারুণ্যের ও চির যৌবনের বার্তাবহ সৌন্দর্যের দেবতা পুষ্পধনু-সহচর ঋতুরাজ বসন্তকে স্বাগত জানাতে আলোড়ন পড়ে গেছে নিখিল বিশ্বপ্রকৃতিতে। কিন্তু প্রকৃতিরাজ্যের সেই মহোৎসবে মানবচিত্ত কতখানি দেয়? প্রকৃতিতে যার উজ্জ্বল আভাস—মন তাকে গ্রহণ করতে পারে কই? বাইরের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে যার আগমন মনের মধ্যেও তার ছায়া। প্রকৃতি ও মানবমন এক হলে তবেই না বসন্তরূপী নবীনের পৃথিবীতে আগমন সার্থক। সুতরাং অন্তর দিয়ে তাকে বরণ করে নিতে না পারলে, অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত না হলে কাছের জিনিসকে দূরের বলেই মনে হয় এবং মনের মধ্যে ধন্দ সৃষ্টি হয়—

"অবুঝ তোরা, তাহারে বুঝি
দূরের পানে ফিরিস খুঁজি।
বাহিরে আঁখি বাঁধা,
প্রাণের মাঝে চাহিস না যে তাই তো লাগে ধাঁধা।"

অথচ প্রকৃতির দিকে চেয়ে দেখো, যারা সেই নবীনকে বরণ করে নিতে পেরেছে সেই কনকচাঁপা, বনমল্লিকার কী অভূতপূর্ব দ্বিধাহীন আনন্দ-উল্লাস! —

"পুলকে কাঁপা কনকচাঁপা বুকের মধু-কোষে
পেয়েছে দ্বার নাড়া,
এমন করে কুঞ্জভরে সহজে তাই তো সে
দিয়েছে তারি সাড়া।
সহসা বনমল্লিকা যে
পেয়েছে তারে আপন মাঝে,
ছুটিয়া দলে দলে
"এই যে তুমি, এই যে তুমি" আঙ্গুল তুলে বলে।"

সংবেদনশীল প্রৌঢ় কবিচিত্তও প্রকৃতির এই আনন্দ মহোৎসবে নেচে উঠেছে। মানসপদ্মে তিনিও চির নবীনের আগমনী শুনতে পেয়েছেন, প্রৌঢ়ত্বের আবরণ উন্মোচিত করে যৌবনের আনন্দোল্লাসে মেতে উঠেছেন, অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছে সৌরভে, শোভা-সম্পদে পূর্ণ তাঁর প্রবর্তনা—

"ওদের সাথে জাগরে কবি,
হৃৎকমলে দেখ্ সে ছবি,
ভাঙুক মোহঘোর।
বনের তলে নবীন এল, মনের তলে তোর।।"

তাই পূরবীরাগে সুরভাঁজতে অভ্যস্ত কবি সকল বিমর্ষতা-বেদনা, অবসাদ-জরা-মালিন্য-উত্তীর্ণ ভাবের জগতে শেষবারের মতো ভোরের নবীন আলোয় নবজাগরণ ও জীবনের আনন্দে আর একবার দুলে উঠতে চান। নবীন বসন্তের শুভ আগমনে তাঁর চিত্তলোক অতীতের আনন্দময় যৌবনোচ্ছল দিনগুলির মতো রঙে-রসে-মাধুর্যে-সুষমায় সৌন্দর্যে পূর্ণ হয়ে উঠুক। আত্মবিশ্বাসী কবির শেষবারের মতো প্রার্থনা, সেই উদ্বোধিনী বাণী—

"আলোতে তোর দিক না বরে ভোরের নব রবি
বাজ্‌রে বীণা বাজ্।
গগন কোলে হাওয়ার দোলে ওঠ্‌রে দুলে কবি,
ফুরাল তোর কাজ।
বিদায় নিয়ে যাবার আগে
পড়ুক টান ভিতর বাগে,
বাহিরে পাস ছুটি।
প্রেমের ডোরে বাঁধুক তোরে বাঁধন যাক টুটি।"

—এই উজ্জীবন-আশ্বাসেই কবিতাটি সমাপ্তি।

৩.১.৩.৩ : লীলা সঙ্গিনী

বিশ্বস্রষ্টার মহান সৃষ্টির লীলা-নিকেতন এই পৃথিবী। সকল মহৎ সৃষ্টিকর্মের পশ্চাতে স্রষ্টা পুরুরে সঙ্গে এক লীলা-সহচরীর কল্পনা সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতির মতো অবিচ্ছেদ্য। এ নিতান্তই ভারতীয় সংস্কার। ভাববিলাসী কবির জীবনেও সৃষ্টিলীলার পেছনে এক অনিন্দিতা সহচরীর আবির্ভাব বাস্তব। তাঁরই কল্পরূপ অপরূপা বৈচিত্র্যময়ী লীলাসঙ্গিনী।

লীলাসঙ্গিনী কবির নিত্যলীলার সহচর। জীবনসাধনার নানান বাঁকে, নানা রূপে, নানা সময়ে কবিজীবনে সেই রঙ্গময়ীর আসা-যাওয়া। হয়তো কবিজীবনের বিচিত্র লগ্নে আবির্ভূতা রক্তমাংসের কোনো মানবীর ভাবরূপকেই তিনি সঙ্গিনী, সহচরী, প্রেরণাদাত্রী সৃজনের দেবীর আসনে বসিয়েছেন। রবীন্দ্র কবিজীবনের বিভিন্ন পর্বে যে নারীর বিচিত্র বেশে আগমন তাঁকে কবি সমসাময়িক আত্মভাবচেতনার আবহে ভিন্ন ভিন্ন নামোপাধি ভূষিত করেছেন। কবির বহিরঙ্গ জীবনের একদা ভালোলাগা ও ভালোবাসার পাত্রী কবিকল্পনার সান্দ্রতায় ভিন্নরূপ, ভিন্ন ভাব ও ভিন্নমাত্রাভূষিতা হয়েছেন। বাহ্যিক জীবনের সঙ্গিনীদের ভাবনির্যাস থেকে কবির অন্তর্জীবনে তৈরি হয়েছে মানবী ও দেবীর মিলিত ভাবরূপ। এক একটি কাব্যের আবহে এই নারীর নাম ও উপাধি, গুণগত ঐশ্বর্যমহিমা বিকশিত হয়েছে। কখনো তিনি কবির প্রেয়সী— 'আজন্ম-সাধন-ধন' সুন্দরী 'কবিতা, কল্পনালতা' (মানসসুন্দরী—সোনারতরী), কবির কৈশোর জীবনের 'প্রথম প্রেয়সী', তাঁর 'ভাগ্যগগনের সৌন্দর্যের শশী', 'নবীন বালিকা মূর্তি' খেলার সাথী, তিনিই আবার মানবী অস্তিত্বের ভাবময় সুবাস 'মানসসুন্দরী'। সেই একই মানবী-বালিকা 'চিত্রা'র পরিণত ও সমুন্নত কল্পনায় কবিসৃষ্টির প্রেরণাময়ী আদিসৃষ্টি 'জীবনদেবতা'। বাইরের জগতে যিনি বিচিত্ররূপিণী, ছলনাময়ী নারী, যিনি আপনার সৌন্দর্য ও মোহ বিস্তারের মধ্যে দিয়ে কবিকে আচ্ছন্ন-আবিষ্ট করেন, তিনিই আবার কবির অন্তর্জগতে শুধু তাঁরই একান্ত আপনার জন দেবী যিনি কবির সকল অন্তরাকাশ আলোকিত করে বিরাজমান কবি-জীবনের অধিষ্ঠাত্রী—তাঁর 'জীবনদেবতা'— 'অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা-একাকী/তুমি অন্তর ব্যাপিনী।' (জীবনদেবতা—চিত্রা)।

কবি জীবনের বিচিত্র-লীলার সহচরী যিনি নানাভাবে, নানারূপে, নানা রঙ্গরসে কবি-অন্তরকে নিয়ত আলোড়িত করে সুধাবর্ষণ করে চলেছেন, তিনিই কবির 'জীবনদেবতা।' ইনি বাইরের বহুজনপূজ্যা কোনো লৌকিক মানবী কিম্বা দেবী নন, কেননা, তাঁর অধিষ্ঠান কেবল কবির হৃদয়ের অন্তঃপুরে—আপন প্রকৃতির মধ্যে। কবিকল্পনার অধিষ্ঠাত্রী এই দেবীর লীলী একান্তই কবির আত্মস্বরূপের মধ্যে। মহাকবি দান্তের যেমন, বিয়াত্রিচে, ভাববিহারী কবি শেলীর যেমন 'Intellectual Beauty' তেমনি রবীন্দ্রনাথের মানসসুন্দরী অথবা কবির অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তি জীবনদেবতা। গ্রীক সৌন্দর্যের দেবী Afrodites (আফ্রোদিতে)-এর সঙ্গেও তার মিল। কবিজীবনে এই জীবনদেবতার বিচিত্র লীলার কথা স্মরণ করে 'আত্মপরিচয়'-এ কবি লিখেছেন — "…. যে শক্তি আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে, সমস্ত ঘটনাকে তাৎপর্যদান করিতেছে, আমার রূপ-রূপান্তর জন্ম-জন্মান্তরকে এক সূত্রে গাঁথিতেছে, যাহার মধ্য দিয়া বিশ্বচরাচরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করিতেছি, তাহাকেই জীবন দেবতা' নাম দিয়া লিখিয়াছিলাম—

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম?"

'জীবনদেবতা' কবির অন্তরে কবি। অন্তর্লীন এই সত্তাটির কথা স্মরণ করে আত্মপরিচয়—এ তিনি লিখেছেন, "এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া বিশ্বের সাহিত তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না। আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন—সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে। সেই জন্য এই জগতের তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে এমন একটা পুরাতন ঐক্য অনুভব করিতে পারি, সেইজন্য এতবড়ো রহস্যময় প্রকাণ্ড জগৎকে অনাত্মীয় ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় না।" (আত্মপরিচয়—বিশ্বভারতী, জুন-১৯৫৭ পৃ. ১২)

'চিত্রা' কাব্যের জীবনদেবতা তত্ত্বে দৃশ্য জগতে কবির চোখে দেখা নারীর যে ভাবরূপ-তারই আর এক প্রকার উত্তরণ 'পূরবী'র লীলাসঙ্গিনী'। সমগ্র বিশ্বসৃষ্টিকে অবলম্বন করে কবির যে লীলা তারই ভাবমূর্তি এই লীলা সহচরী—কখনো মানবী, কখনো সৌন্দর্যের দেবী—কখনো 'মানসসুন্দরী'— 'জীবনদেবতা' আবার কখনো বা 'লীলাসঙ্গিনী'। কবিতাটির মমার্থ বিশ্লেষণের মধ্যে লীলাসঙ্গিনী তত্ত্বটি অল্পবিস্তর স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। 'পূরবী' পর্বের নষ্টালজিক প্রৌঢ় কবির জীবন রসায়নের অন্যতম উপাদান এই লীলাসঙ্গিনীকে আশ্রয় করে কবি ফেলে আসা জীবনের বিষামৃত আস্বাদন করতে চেয়েছেন। এককালের জীবনসহচরী মানবীকে মহাকালের পটভূমিকায় স্থাপন করে কবি 'জীবনদেবতার আরও আদর্শায়িত উত্তরণ ঘটিয়েছেন 'লীলা সঙ্গিনী'তে।

কবির লীলাসঙ্গিনী যে সবসময় তাঁর নর্মসহচরী হ'য়ে কাছে কাছে থেকেছেন আর সৃষ্টির খেলায় যোগ দেবার জন্য কাজের কক্ষকোণে তাঁকে আহ্বান জানিয়েছেন এমনও নয়। তাঁর লীলা রহস্যময়তার আবরণে মোড়া, কখনো দৃশ্য, কখনো অদৃশ্য, অনেকটা যেন চতুয়া নায়িকার মতো— 'সে যে পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায় ডাকদিয়ে যায় ইঙ্গিতে।' প্রবীণ কবির স্মৃতি বাসরে কখনো জাগ্রতা, কখনো বিস্মৃতির গোধূলি আলোকে গুহায়িত চেতনার আড়ালে হারিয়ে যাওয়া এই লীলা সঙ্গিনীর আবির্ভাব কোনো নির্দিষ্ট নিয়মে দিন-ক্ষণ বিচার করে নয়, আকস্মিকভাবে, হঠাৎ। তাই একদিন অতীত দিনের স্মৃতিচারণরত কবির মনোগহনে তাঁর স্মৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং পরম বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি বহির্দুয়ারে তাঁর নিঃশব্দ আগমনে সচকিত হ'য়ে ওঠেন। তাঁর মনে হয়—

"দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহিরে
মনে হ'ল যেন চিনি, —
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলাসঙ্গিনী?
কাজ ফেলে মোরে চলে গেলে কোন্ দূরে,
মনে পড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে?
ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে —
বাজাইলে কিঙ্গিণী।
বিস্মরণের গোধুলিক্ষণের
আলোতে তোমারে চিনি।" (১ম স্তবক)

স্মৃতির অতল থেকে লীলা সঙ্গিনীর অস্পষ্ট ছবি কবির চিত্তদুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তাঁর মনে পড়ে গেছে তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সেই রহস্যময়ী নন্দিনীর বিচিত্রখেলা, রোমান্সের মধুমাখা আবেশ—

"মনে আছে সে কি সব কাজ, সখী,
ভুয়ায়েছ বারে বারে।
বন্ধ দুয়ার খুলেছ আমার
কঙ্গণ-ঝংকারে।
ইশারা তোমার বাতাসে বাতাসে বেসে
ঘুরে ঘুরে যেত মোর বাতায়নে এসে,
কখনো আমের নবমুকুলের বেশে
কভু নবমেঘভারে।
চকিতে চকিতে চল-চাহনিতে
ভুলায়েছ বারে বারে।" (২য় স্তবক)

ঋতু-প্রকৃতির আবর্তনে নিখিল বিশ্বপ্রকৃতির বিশাল প্রাঙ্গণে কবির সঙ্গে লীলা সঙ্গিনীর লীলার আহ্বান স্মরণের তুলিতে আঁকা হ'য়ে যায়—

"বর্ষাশেষের গগন—কোণায় কোণায়,
সন্ধ্যামেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায়—
নির্জনক্ষণে কখন অন্যমনায়
ছুঁয়ে গেছ থেকে থেকে,
কখনো হাসিতে কখনো বাঁশিতে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।।" (স্তবক ৪)

লীলাময়ী সঙ্গিনীর পুনরাবির্ভাব নানা প্রশ্ন জাগিয়েছে কবির মনে। অতীতেও সেই মানসী প্রতিমা ত্াঁর সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে 'লীলাম্বরের তলে' হাতছানি দিয়ে অকাজের কাজে সাড়া দেবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। আজও কি সেই রঙ্গময়ীর পুরাতন ছল। কাজ ভোলাবার জন্যই বারেবারে কাজের কক্ষকোণে আহ্বান! —

'কাজ ভোলাবারে ফেরো বারে বারে
কাজের কক্ষকোণে।' (স্তবক-৪)

লীলাসঙ্গিনীর সেই আহ্বানে সংশয় জাগ্রত হ'লেও মানসপ্রতিমাগুলিকে সাজিয়ে নেবার মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন কবি। কল্পনা-পটে রসের তুলি বুলিয়ে, নেশার বরণে রঙ মিশিয়ে সেই মোহিনীর অসময়ের আহ্বানে সাড়া দিতে হ'বে কি?—এই প্রশ্নজড়িত সংশয়ের কারণ ঐশ্বর্যদীপিত যৌবনের মাধুর্যসম্পদ বঞ্চিত কবির প্রৌঢ় বয়সের মানসদৈন্য ও অবসাদ। মহাকাল যা হরণ করেন তাকে আবার প্রবীণ কবি ফিরিয়ে আনবেন কোন্ মন্ত্রবলে-এই প্রশ্ন—

"দেখো না কি, হায় বেলা চলে যায়,
সারা হয়ে এল দিন।
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ।
এত দিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,
হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশি,
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিঃশ্বাসি
গানহারা উদাসীন।
কেন অবেলায় ডেকেছ খেলায়
সারা হয়ে এল দিন।" (স্তবক-৫)

কাল্পনিক জীবন সন্ধ্যায় গানহারা উদাসীন কবি অবেলায় হলেও আর একবার সেই পুরানো দিনের হাস্যোচ্ছল-লোকে ফিরে যেতে চান লীলাসঙ্গিনীর সাহচর্যে। তাঁর সঙ্গে কবির শেষ খেলা শুরু হ'বে নিশীথ-অন্ধকারে' অমাবস্যার পারে আলোকিত তারকাপুঞ্জের মাঝে। দিনের আলোয় যে প্রেমের লীলা মালতী লতার সৌরভে নীরবে-নিঃশব্দে হৃদয়ের গোপন অন্তঃপুরে আজ অবেলায় তারই পুনরাবৃত্তি হোক রাতের অন্ধকারে নক্ষত্রদীপিত গগনতলে। দিন শেষ হয়ে রাত্রি সমাগত হলেও সেই রহস্যময়ী, গোপন-রঙ্গিণী, রস-তরঙ্গিণীর ছোঁয়ায় তাঁর চিত্তলোক আলোড়িত নন্দিত। কবি হৃদয়ে শেষবারের মতো তরঙ্গ তুলে তারপর সেই প্রিয়তমা যদি হারিয়ে যান, ভালোবাসা ও আত্মবিশ্বাসের জোরে তিনি তাঁকে ঠিকই চিনে নেবেন। কবিতাটির শেষ স্তবকটিতে কবির সেই উজ্জীবন আশ্বাসে পূর্ণ বসন্তরাগ।

৩.১.৩.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'তপোভঙ্গ' কবিতার ভাববস্তু বিশ্লেষণ করো এবং কবিতাটিকে মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের 'অভিনব রসভাষ্য' বলা যায় কিনা তা বুঝিয়ে দাও।

২। 'তপোভঙ্গ' কবিতা অবলম্বনে মহাদেবের তপোভঙ্গের চক্রান্তে কবির ভূমিকার স্বরূপ বিশদ করো।

৩। 'আগমনী' কবিতাটি চির নবীনের আগমনী গান'। — আলোচনা করো।

৪। 'বনের তলে নবীন এল মনের তলে তোর।' — 'আগমনী' কবিতানুসরণে উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

৫। 'লীলাসঙ্গিনী' কবিতায় লীলাসঙ্গিনীর স্বরূপ বিশ্লেষণ করে কবির মনোধর্মের পরিচয় দাও।

৬। 'বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ'। — 'লীলাসঙ্গিনী' কবিতানুসরণে উক্তিটির ভাব-তাৎপর্য বিশদ করো।

৩.১.৩.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। পূরবী (বিশ্বভারতী সং) — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২। রবীন্দ্র রচনাবলী (সমগ্র — বিশ্বভারতী সং)।
৩। যাত্রী (বিশ্বভারীত সং) — রবীন্দ্র ঠাকুর।
৪। রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য-প্রবেশক (তৃতীয় সং-বিশ্ব ভারতী) — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
৫। রবি-রশ্মি (২য় খণ্ড, পশ্চিমভাগে, ১ম সং) —চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৬। রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ (৩য় সং) —প্রমথনাথ বিশী।
৭। রবীন্দ্র-সরণী (৫ম মুদ্রণ) — প্রথমনাথ বিশী।
৮। রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত ২য় সং) — কল্যাণীশঙ্কর ঘটক।
৯। ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ (১ম সং) শঙ্খ ঘোষ।
১০। মহাকবি কালিদাসের সমগ্র রচনাবলী (ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী-সম্পাদিত ১ম সং)।

একক -৪

বকুল-বনের পাখি, সাবিত্রী, লিপি, শেষ বসন্ত

বিন্যাস ক্রম

৩.১.৪.১ : বকুল-বনের পাখি

৩.১.৪.২ : সাবিত্রী

৩.১.৪.৩ : লিপি

৩.১.৪.৪. : শেষ বসন্ত

৩.১.৪.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩.১.৪.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩.১.৪.১ : বকুল বনের পাখি

'বকুল-বনের পাখি' রোমান্টিক গীতিকবি রবীন্দ্রনাথের অনন্ত-প্রসারিত কল্পনার এক সুচারু আলেখ্য। কবিতাটিতে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের কলতান, নিঃসীম নীলিমায় অবাধে আনন্দে ভেসে চলা প্রভৃতি ধর্মগুলির সঙ্গে নিজের কবি-আত্মার মিল খুঁজে পেয়েছেন কবি। তাই বকুল-বনের পাখিটি যেন ভাববিহারী কবির আবাল্য দোসর। কালের ব্যবধান সেই সখ্য, সেই হৃদ্য সম্পর্কে বাধা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে কী না তা যাচাই করে নেবার জন্য তার প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন কবি—

"শোনো শোনো ওগো, বকুল- বনের পাখি,
দেখো তো, আমায় চিনিতে পারিবে না কি?
নই আমি কবি, নই জ্ঞান-অভিমানী,
মান-অপমান কী পেয়েছি নাহি জানি,
দেখেছ কি মোর দূরে-যাওয়া মনখানি,
উড়ে যাওয়া মোর আখি?
আমাতে কি কিছু দেখেছ তোমারি সম,
অসীম-নীলিমা-তিয়াষি বন্ধু মম"

'অসীম-নীলিমা-তিয়াষি বন্ধু' বকুল-বনের পাখিটির সঙ্গে কবির আবাল্য সখ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো প্রকৃতির নিবিড় সংস্পর্শে, সূর্যালোকে বাতাসের প্রাণকাড়া চাঁপার গন্ধে, সহজ রসের ঝর্ণাধারায়, সহজ সুখে গান গাওয়ার মধ্য দিয়ে। কখনো কখনো এমনও হ'তো — ঘর ছাড়া বন্ধু পাখিটির মতো তিনিও তো খোলা মনে খোলা হাওয়ায় সব কাজ ফাঁকি দিয়ে আকাশের বুক-ছোঁওয়া কল্পনার ভেলা ভাসিয়ে দিতেন। কখন যে বেলা চলে যেতো তার হুঁশটুকু বুঝি থাকতো না। তাঁর অধীর মনের মাঝে অনুভূত হ'তো শ্যামল ধরিত্রীর নাড়ীর স্পন্দন। সেসব কথা কি সেই ছোটোবেলার খেলার সাথী বকুল-বনের পাখিটির মনে পড়ে? সেকি নিঃসংশয়ে তাঁকে চিনে নিতে পারে?

আরও কতো স্মৃতিই না কবিমনে ভর করেছে। প্রৌঢ় জীবনের পড়ন্ত বেলায় বাল্যস্মৃতির তর্পণে আপন স্বভাবধর্ম ও কবিধর্মের সঙ্গে বনবিহারী পাখিটির ভাবঘন, আনন্দঘন মিল তিনি খুঁজে পেয়েছেন। আজ যখন তিনি দেশ ছেড়ে সূদূর প্রবাসে, তখনো যে সেই অতীতের স্মৃতিগুলি চিত্তে ভিড় জমায়। তাঁর মনে পড়ে আষাঢ়ের জলভারনত মেঘ, কলস্বনা স্রোতস্বিনী। তারা সব হয়তো তেমনই আছে, কিন্তু তিনি দূর-প্রবাসী! তাদের সবার সঙ্গে মিলে যে কবিসত্তার বিকাশ সেকথা মনে করে বেদনায় আচ্ছন্ন তাঁর চিত্ত। আর সকলে তাঁকে—তাঁর ছেলে বেলাকে ভুলে ভুলুক, কেবল প্রিয়বন্ধু বকুল-বনের পাখিটি যেন তাঁকে না ভোলে। সে যে তাঁকে ভুলবে না — এই আত্মপ্রসাদ অভিমানী কবিচিত্তকে কৌতূহলী ও জিজ্ঞাসু করে তুলেছে—

"বালক গিয়েছে হারায়ে, সে কথা লয়ে
কোনো আঁখিজল যায় নি কোথাও বয়ে?"

এর সদুত্তর যাইহোক, বকুল-বনের পাখিটির সঙ্গে তাঁর সে মিতালির সম্পর্ক এই বার্ধক্যেও কবিমনে অটুট, তার মৃত্যু নেই। ধরার খুশি, ধরার আনন্দে উচ্ছল পাখিটির কলগান যেমন সর্বত্র বিরাজমান তেমনি তাদের সবার সঙ্গে ঐক্যসূত্রে ঐকতান সৃষ্টি করেছেন কবি নিজেও। তাইতো বকুল-বনের পাখিটির সঙ্গে রাখিবন্ধনে আবদ্ধ হ'তে চান তিনি। তাঁর বিশ্বাসী কবিমন বিষণ্ণ বিদায় বেলায় আশ্বস্ত হতে চেয়েছেন এই ভেবে যে জীবন-সমুদ্রের ঘাটে ঘাটে শেষ তরিটি ভাসিয়ে দেবার আগে তিনি জেনে যাবেন, তাঁর সকল গানের 'সুরের সুরার সাকী' বন্ধু বকুল-বনের পাখি আজও তাঁকে ভোলেনি এবং স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে সে তাঁর শেষের সুরের পেয়ালা ভরে দেবে। এই স্বস্তির আনন্দে বর্তমানের খ্যাতি-কীর্তি, কর্ম-যশ প্রভৃতি সব হেলায় তুচ্ছ করে, গানের পাখায় ভর করে তিনি যে উড়ে যেতে চান অনন্ত আকাশে, মুক্ত দিগন্তে, অনন্ত বিশ্বলোকে। তাঁর প্রার্থনা, সাথী বকুল বনের পাখি তাঁর ললাটে এঁকে দিক মুক্তির টীকা—

"শোনো শোনো ওগো, বকুল-বনের পাখি,
মুক্তির টীকা ললাটে দাও তো আঁকি।
যাবার বেলায় যাব না ছদ্মবেশে,
খ্যাতির মুকুট খসে যাক নিঃশেষে,
কর্মের এই বর্ম যাক না ফেঁসে,
কীর্তি যাক না ঢাকি।
ডেকে লও মোরে নামহারাদের দলে
চিহ্নবিহীন উধাও পথের তলে।"

আভিজাত্যের অহংকার-মুক্ত কবি নামহারা সাধারণ ব্যক্তির মতোই সহজ সরল পথে কোনো পিছুটান না রেখেই সন্ধ্যায় ঝরে পড়া ফুলের মতো, রাত-ভোরের তারার মতো, হাওয়ার মতো বনের গন্ধ হ'য়ে গান গাইতে গাইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করতে চান। তাঁর সেই অবসর যেন সহজ হয়, সুন্দর, আনন্দময় হয়, যেন বেণুপল্লব-মর্মন্তরিত সংগীতের মূর্ছনায় দিনান্তের শেষ সোনালী সূর্যের আলোয় মিলিয়ে গিয়ে তাঁর প্রস্থান পর্বটি উজ্জ্বলতর ও স্মরণীয় হয়।

কবিতাটির শেষ স্তবকে বিদায়-বেলার বিষণ্ণতা মৃত্যুর আবহ রচনা করেছে। জন্ম-রোমান্টিক গৌরবোজ্জ্বল কবির এমন অনাড়ম্বর শেষ-বিদায়ের কল্পনা তাঁর নিরহংকার, স্বভাববিনয়ী, স্নিগ্ধ কবিব্যক্তিত্বকেই মহিমান্বিত করেছে।

৩.১.৪.২ : সাবিত্রী

সাবিত্রী কথাটির মূল অর্থ সবিতৃ > সবিতা বা সূর্যদেব সম্বন্ধিনী গায়ত্রা—সূর্যের তেজ বা আলো। যুগভেদে ও কালভেদে শব্দটি বহু অর্থদ্যোতনা নিয়ে ধরা দিয়েছে। কখনো তিনি সূর্যকন্যা, কখনো ব্রহ্ম পত্নী গায়ত্রী, কখনো বা দেবী সরস্বতী। বহ্নিপুরাণ অনুসারে তিনি বেদ-প্রসবিতা সাবিত্রী—পদটিকে গ্রহণ করেছেন।

ঋগ্বেদে সূর্যকে স্থাবর-জঙ্গম জগতের আত্মারূপে কল্পনা করা হয়েছে। তিনি জাতবেদা—অগ্নি। অগ্নি থেকেই জগতের আলো, অন্নপ্রাণ সকলের উদ্ভব। এমনকি পরমজ্ঞানের আশ্রয়ও তিনি—'বেদাস্ত্বদর্থং জাতা বৈ জাতবেদাস্ততোহ্যসি'। (মহা.২.৩১.৪২) এবং 'উৎপন্ন সর্ববস্তুবিষয়জ্ঞানাগ্নি।' (ঋগ্বেদ-১০.১৫.১৩) ঈশোপনিষদে তিনি পূষণ্—জগৎপোষক সূর্য। বুঝতে অসুবিধা হয় না, সাবিত্রী পদটি যখন 'গায়ত্রী' মন্ত্রে আবৃত্ত, তার মধ্য দিয়েই বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে সবিতৃ দেবতার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কটি বলা হয়ে গেছে—

"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গোদেবস্য ধীমহি
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ?। (ঋগ্বেদ-৩.৬২.১০)

অর্থাৎ যিনি ভূলোক-ভুবনলোক ও স্বরলোক ব্যাপ্ত করে প্রকাশিত, যিনি আমাদের ধীসকল দান করেছেন—সবিতৃদেবের সেই বরণী তেজকে ধ্যান করি (ধারণ করি)। সকল বস্তু, সকল বিষয়, সকল জ্ঞান সাবিত্রী (সূর্যের আলোক)-সঞ্জাত। আলো না থাকলে জড় অথবা জীব—কোনো জগতেরই অস্তিত্ব থাকতো কিনা সন্দেহ। আবাল্য উপনিষদীয় ভাবপরিমণ্ডলে লালিত-বর্ধিত কবি বিশ্বসৃষ্টির বিকাশে সূর্যদেবতার অবিস্মরণীয় অবদানকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে গ্রহণ ও স্বীকার করেছেন। বস্তুত সূর্যই পৃথিবীর প্রভু।

তিনি আলো দান করেন বলেই জড় ও জঙ্গম জগতের অস্তিত্ব টিকে আছে। সূর্য ও তার আলোকে অভিন্ন জেনেও বোধের বিকাশ ও ভাববস্তুকে স্ফুটোজ্জ্বল প্রকাশরূপ দানের জন্য তাঁর দ্বৈতসত্তা কল্পনা। শক্তিমান সূর্য এবং তার শক্তি আলো। সকল তেজ, সকল আলোর আধার তিনি। রবীন্দ্রজীবনে বহু রচনায়, আভাষণে জগৎরক্ষায় সূর্যদেবতার অকৃপণ দাক্ষিণ্যের কথা স্মরণ করেছেন তিনি। এমনকি সূর্যকে আপন সত্তার (রবি) প্রতিরূপে স্থাপন করে তার সঙ্গে সখ্যের সম্পর্ক কল্পনা করেছেন। প্রসঙ্গত 'যাত্রী' গ্রন্থের 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি' প্রবন্ধে বিশ্বজীবনে সৃষ্টিরক্ষায় সূর্যের আলোর ভূমিকা বিস্তারিতভাবে আলোচনা ও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। 'সাবিত্রী' কবিতা-পাঠের ভূমিকাস্বরূপ 'যাত্রী' প্রবন্ধগ্রন্থ থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করা গেল।—

'সূর্যের আলোর ধারা তো আমাদের নাড়ীতে নাড়ীতে বইছে। আমাদের প্রাণমন, আমাদের রূপ-রস, সবই তো উৎসরূপে রয়েছে ঐ মহা জ্যোতিষ্কের মধ্যে। সৌরজগতের সমস্ত ভাবীকাল একদিন তো পরিকীর্ণ হ'য়ে ছিল ওরই বহ্নিবাষ্পের মধ্যে। আমাদের দেহের কোষে কোষে ওই তেজই তো শরীরী; আমার ভাবনার তরঙ্গে তরঙ্গে ঐ আলোই তো প্রবহমান। বাইরে ওই আলোরই বর্ণচ্ছটায় মেঘে মেঘে পত্রে পুঙ্গে পৃথিবীর রূপ বিচিত্র; অন্তরে ঐ তেজই মানস-ভাব ধারণ করে আমাদের চিন্তায়-ভাব নায়-বেদনায়-রাগে-অনুরাগে রঞ্জিত। সেই এক জ্যোতিরই এত রং, এত রূপ, এত ভাব, এত রস। ঐ যে জ্যোতি আঙুরের গুচ্ছে গুচ্ছে এক এক চুমুকে মদ হ'য়ে সঞ্চিত, সেই জ্যোতিই তো আমার গানে গানে সুর হ'য়ে পুঞ্জিত হ'লো। এখনি আমার চিত্ত হতে এই যে চিন্তা ভাষার ধারায় প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে, সে কি সেই জ্যোতিরই একটি চঞ্চল স্বরূপ নয়, যে জ্যোতি বনস্পতির শাখায় শাখায় স্তব্ধ ওঙ্কার-ধ্বনির মতো সংহত হ'য়ে আছে। ....আমাদের ঋষি প্রার্থনা করেছেন—তমসো মা জ্যোতির্গময়—অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাও। চৈতন্যের পরিপূর্ণতাকে তারা জ্যোতি বলেছেন। তাঁদের ধ্যানমন্ত্রে সূর্যকে তাঁরা বলেছেন—ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ—আমাদের চিত্তে তিনি ধীশক্তি ধারাগুলি প্রেরণ করেছেন। ঈশোপনিষদে বলেছেন—হে পূষণ্ তোমার ঐ ঢাকা খুলে ফেলো, সত্যের মুখ দেখি, — আমার মধ্যে যিনি, সেই পুরুষ তোমার মধ্যে।" (যাত্রী)

রবীন্দ্রনাথ চিলি যাবার পথে হারুণা মারু জাহাজে বসে এক মেঘলা দিনের আবহে 'সাবিত্রী' কবিতাটি রচনা করেছিলেন। কবিতাটির মূল ভাববস্তু যা তার অনেকটাই যেন ব্যাখ্যার আকারে বলা হয়ে গেছে 'যাত্রী' প্রবন্ধ-গ্রন্থের উদ্ধৃত অংশে। কাব্যে যা প্রকাশিত হয়েছে, তারই প্রাঞ্জল গদ্য ভাষারূপ যেন 'যাত্রী'র লেখায়। একটু পল্লবিত করে তিনি আরও যা লিখেছেন তাকে 'সাবিত্রী' কবিতার ভাষ্য রচনা বললে অত্যুক্তি হ'বে না। কবি লিখেছেন—

"এই বাদলার অন্ধকারে আজ আমার মধ্যে যে ছায়াচ্ছন্ন বিষাদ, সে ঐ ব্যাকুলতারই একটি রূপ। সেও বলছে—হে পূষণ্, তোমার ঐ ঢাকা খুলে ফেলো, তোমার জ্যোতির মধ্যে আমার আত্মাকে উজ্জ্বল দেখি, অবসাদ দূর হোক। আমার চিত্তের বাঁশীতে তোমার আলোকের নিঃশ্বাস পূর্ণ করো, —সমস্ত আকাশ আনন্দের গানে জাগ্রত হ'য়ে উঠুক। আমার প্রাণ যে তোমার আলোকেরই একটি প্রকাশ, আমার দেহও তাই। আমার চিত্তকে তোমার জ্যোতিরঙ্গুলি যখনই স্পর্শ করে, তখনি তো ভূর্ভুব স্বঃ দীপ্যমান হয়ে ওঠে। মেঘে মেঘে কোমাপ যেমন নানা রং, আমার ভাবনায় ভাবনায় তোমার তেজ তেমনি সুখ-দুঃখের কত রং লাগিয়ে দিচ্ছে। একই জ্যোতি বাইরের পুষ্প-পল্লবের বর্ণে-গন্ধে এবং অন্তরের রাগে-অনুরাগে বিচিত্র হ'য়ে ঠিক্‌রে পড়ছে। প্রভাতে সন্ধ্যায় তোমার গান দিকে-দিগন্তে বেজে ওঠে। তেমনি তোমারই গান আমার কবির চিত্ত গলিয়ে দিয়ে ভাষার স্রোতে নিত্য ঘাত-প্রতিঘাতে তার এত নৃত্য, এত গান, এত ডাঙা, এত গড়া—তারই সারথ্যে যুগ-যুগান্তরের এমন রথযাত্রা। তোমার তেজের উৎসের কাছে পৃথিবীর অন্তর্গূঢ় প্রার্থনাই তো গাছ হ'য়ে, ঘাস হ'য়ে আকাশে উঠ্‌ছে, বলছে—অপাবৃণু, ঢাকা খুলে দাও। এই ঢাকা খোলাই তার প্রাণের লীলা, এই ঢাকা খোলা থেকেই তার ফুল-ফল। এই প্রার্থনাই আদিম জীবাণুর মধ্যে দিয়ে আজ মানুষের মধ্যে এসে উপস্থিত। মানুষের প্রাণের ঘাট পেরিয়ে, মানুষের চিত্তের ঘাটে পাড়ি দিয়ে চলল। মানুষের ইতিহাস বল্‌ছে—অপাবৃণু, —ঢাকা খোলো। জীব বলছে— আমার মধ্যে যে সত্য আছে তার জ্যোর্তিময় পূর্ণস্বরূপ দেখি। হে পূষণ্, হে পরিপূর্ণ, তোমার হিরন্ময় পাত্রের আবরণ ঘুচুক, তার অন্তরের রহস্য প্রকাশিত হোক— সেই রহস্য আমার মধ্যে তোমার মধ্যে একই।" (যাত্রী)

'সাবিত্রী' কবিতাটিতেও একই ভাবনার কাব্যরূপ সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। সূর্যকে বন্ধু রূপে আহ্বান করে কবির অনুনয় — অশ্রুবাষ্প ভরা দুর্যোগের মেঘকে সৌরতেজ রূপ খড়গাঘাতে বিদীর্ণ করে তাঁর আলোকদীপ্ত সত্যের প্রকাশ হোক, সকল অন্ধকার-বিদারণ সাবিত্রীর মর্মকোষে সঞ্চিত জ্যোতির কনকপদ্মখানি বিকশিত হোক উদ্বোধিনী বাণীরূপে। কনকপদ্ম-নিঃসৃত সেই আলোকে জন্মের প্রথম প্রত্যূষটি উজ্জ্বল-রক্তিম হয়ে উঠেছিলো প্রীতি-চুম্বনে। সেই চুম্বন, সেই আলোর স্পর্শ কবিচিত্তে যে 'জ্বালার তরঙ্গ' — অগ্নিপ্রবাহ সৃষ্টি করেছিলো তারই আবেগে সুখ দুঃখ, আনন্দ-বেদনাশ্রিত তাঁর সকল সৃষ্টি। বস্তুত প্রাণে-প্রাণে,

প্রকৃতির অন্তহীন বৈচিত্র্যে কবির যে সৃজনলীলা তা তো তাঁর বন্ধু সূর্যেরই দান। সাবিত্রীর অকৃপণ দানেই পূর্ণ হয়ে উঠেছে তাঁর ছিন্নতন্ত্রী প্রাণীবীণা। তাঁর জ্ঞাত-অজ্ঞাত সকল কল্পনা অনুভব, সকল সৃষ্টিরসের উৎসইতো প্রিয়বন্ধুর শক্তি সাবিত্রী। সেই কৃতজ্ঞতা থেকে বিস্ময়বিমুগ্ধ কণ্ঠে তিনি মুক্তির গান গেয়েছেন—

"তেজের ভাণ্ডার হতে কী আমাতে দিয়েছ যে ভরে
কেহ বা সে জানে?
কী জাল হতেছে বোনা স্বপ্নে স্বপ্নে নানা বর্ণডোরে
মোর গুপ্ত-প্রাণে?
তোমার দূতীরা আঁকে ভুবন-অঙ্গনে আলিম্পনা।
মুহূর্তে সে ইন্দ্রজাল অপরূপ রূপের কল্পনা
মুছে যাক সরে।
তেমনি সহজ হোক হাসি -কান্না ভাবনা-বেদনা,
না বাঁধুক মোরে।"

এই যে মুক্তির গান তার মূর্ছনা ব্যাপ্ত হোক নিখিল বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বজীবনের সর্বত্র—অরণ্যের স্পন্দিত পল্লবে, শ্রাবণ-বর্ষণে উপলঘর্ষণে মুখরিত নির্ঝরের 'মঞ্জির-গুঞ্জন-কলরবে', বসন্তের বৈভবে, 'ঝঞ্ঝামদিরামত্ত বৈশাখের তাণ্ডবলীলায়। তারপর ঝঞ্ঝাশেষে শূন্য দিগন্তে বিলীন হয়ে যাক তার মূর্ছনা কোনো চিহ্ন না রেখে।

শরৎ সূর্যের সোনালি আলোয়, শিশিরস্নাত বসুন্ধরার হাসি-অশ্রুতে উন্মন-চঞ্চল কবিচিত্তের সমস্ত আকুলতা বিচিত্র রাগিণীর মূর্ছনা সৃষ্টি করে ধেয়ে চলেছে বৈরাগ্যের শূন্যলোকে। কবি যেন জীবনের পড়ন্ত বেলায় সেই শিশুকালের মতোই প্রিয়বন্ধুব—সমপ্রাণ সখার আলোর প্রত্যাশী। বৈদিক ঋষিকবির মতো তাঁর কণ্ঠেও উচ্চারিত হয় কাতর অনুনয়—"হে পূষণ্, হে জগৎপোষক সূর্য! সরিয়ে নাও তোমার আবরণ, দেখাও তোমার চিরজ্যোতির্ময়, তেজোময়রূপ যে রূপের ছটায় অগ্নিউৎসবধারায় ধৌতহোক, নির্মল হোক, প্রশান্ত হোক অশান্ত হৃদয়। তার পর গোধূলিলগ্নে তোমার রক্তরাগ দিয়ে কপালে একটি সিন্দুররেখা এঁকে দিয়ো; সন্ধ্যাতারার স্নিগ্ধ আলোকবিন্দু দিয়ে কপালে একটি টিপ পরিয়ে দিয়ো। দিনের শেষে যাত্রা থেমে গেলেও সেই সুগম্ভীর সঙ্গীতধ্বনি বাজতে থাকুক সিন্ধু তরঙ্গের তালে তালে।" —

"দাও খুলে দাও দ্বার, ওই তার বেলা হ'ল শেষ
বুকে লও তারে।
শান্তি-অভিষেক হোক, ধৌত হোক সকল আবেশ
অগ্নি-উৎসধারে।
সীমন্তে, গোধূলি-লগ্নে দিয়ো এঁকে সন্ধ্যার সিন্দুর,
প্রদোষের তারা দিয়ে লিখো রেখা আলোক-বিন্দুর
তার স্নিগ্ধ ভালে।
দিনান্ত সংগীতধ্বনি সুগভীর বাজুক সিন্দুর
তরঙ্গের তালে।"

রবীন্দ্র রোমামিটকতার একটি কমনীয় উজ্জ্বল সুন্দর রূপ প্রত্যক্ষ করা গেল কবিতাটির শেষ স্তবকে। পৃথিবী থেকে শেষ বিদায়ের আগে সত্যসন্ধ ঋষিকবির মতো তিনিও আলোক সমুদ্রে সত্যের সন্ধানী। তাঁর সমগ্র সত্তাচেতনাকে আলোর তরঙ্গে বিলীন করে দিয়ে মুক্তিপিপাসু তিনি। এখানে ঋষিকবির মৃত্যুপূর্বকালীন প্রার্থনার সঙ্গে রবীন্দ্রানুভবের একটুখানি পার্থক্য নজরে পড়ছে। উপনিষদের ঋষির কাছে যিনি সতস্বরূপ ব্রহ্ম তিনি সূর্য নন, সূর্য তাঁরই অন্যতর শক্তিবিশেষ। অগ্নি, সূর্য, মেঘ (ইন্দ্র), বায়ু ও মৃত্যু সকলই যাঁর দ্বারা পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত তিনিই ব্রহ্ম —

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়ত্তপতি সূর্য্যঃ
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।" (কঠ -৬/৩)

ঈশোপনিষদের ঋষিকন্ঠনিঃসৃত বাণীতেও এর সমর্থন মেলে। মৃত্যুপথযাত্রীর অন্তিম প্রার্থনা —

"হিরন্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং।
তৎ তং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।" (ঈশ -১৫)

—[হিরন্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের দ্বার আচ্ছন্ন। হে পূষণ্ (জগৎ-পোষক সূর্য), সরিয়ে নাও তোমার কুহেলির আচ্ছাদন। তোমার যে সত্যস্বরূপ তাকে আমি দর্শন করি।] এখানে হিরন্ময় আবরণরূপ সূর্যের আলো আর সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম এক নন। ঈশ্বরের সত্যস্বরূপ দর্শন করতে হলে তার আগে আলোকস্নানে পবিত্র হও। ভাবখানা যেন অনেকটা এই রকম। 'সাবিত্রী' কবিতায় কবি সাবিত্রীকে কখনো ঈশ্বর বা ব্রহ্মরূপে চিহ্নিত করেন নি। বরং ব্যক্তিজীবনেও ও বিশ্বজীবনের লক্ষকোটি তরঙ্গে নেচে ওঠবার জন্য, নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য সূর্যশক্তি আলোর সর্বপ্রকাশক ভূমিকাটিকেই মহিমাভূষিত করেছেন। বলা বাহুল্য, বন্ধু সূর্যের সর্ববিধ্বংসী খরতাপ নয়, স্নিগ্ধ কমনীয় জীবনদায়ী আলো—সাবিত্রীকেই কবি বন্ধুত্বের বরমাল্য সমর্পণ করেছেন। তাতে কবিতাটি বিশেষ ভাবঋদ্ধ ও তাৎপর্যবহ হয়ে উঠেছে।

৩.১.৪.৩ : লিপি

লিপি কবিতাটির ভাব-উৎস হারুনামারু জাহাজে পেরুযাত্রী কবির এক বিশেষ দিনের সময়ের অনুভব। ৩রা অক্টোবর ১৯৪২ সালের ঘটনা। সবে সকাল, সূর্যের আলো তখনো স্পষ্ট ফোটেনি। জাহাজ থেকে দূরে সমুদ্রতীরের ছবি দেখতে মগ্ন কবিচিত্তে হঠাৎ গুণ গুণ করে ওঠে ছন্দে গাঁথা কবিতার কয়েকটি ছত্র—

"হে ধরণী কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন'
একই লিপি পড়ো বারে বারে?

কবি বুঝতে পারেন, হঠাৎ জাগা এই কয়েকটা পংক্তি ভেতরে ভেতরে যেন বিশেষ কোনো ভারকে প্রকাশরূপ দিতে চাইছে; পংক্তি ক'টি যেন সেই অভাবিত আগন্তুক কবিতার ধ্রুবপদ। এরপর 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করা যাক—

"সমুদ্রের দুইতীরে যে-ধরণী আপনার নানান-রঙা আঁচলখানি বিছিয়ে দিয়ে পূবের দিকে মুখ করে একলা বসে আছে ছবির মতো দেখ্‌তে পেলুম তার কোলের উপর একখানি চিঠি পড়ল খ'সে কোন্ উপরের থেকে। সেই চিঠিখানি বুকের কাছে তুলে ধ'রে সে একমনে পড়তে বসে গেল, ... আমার কবিতার ধুয়ো বলছে, প্রতিদিনই সেই একই চিঠি। সেই একখানির বেশি আর দরকার নেই। সেই ওর যথেষ্ট। সে এত বড়, তাই সে এত সরল সেই একখানিতেই সব আকাশ এমন সহজে ভরে গেছে।'

ধরণী পাঠ করছে কত যুগ থেকে। সেই পাঠ-করাটা আমি মনে-মনে চেয়ে দেখ্‌ছি। সুরলোকের বাণী পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে, কণ্ঠের ভিতর দিয়ে, রূপে রূপে বিচিত্র হ'য়ে উঠল বনে বনে হল গাছ, ফুলে ফুলে হল গন্ধ, প্রাণে হ'ল নিঃশ্বসিত। সেই সুন্দর, সেই ভীষণ; সেই হাসির ঝিলিকে ঝিকিমিকি, সেই কান্নার কাঁপনে ছলছল।

এই চিঠি পড়াটাই সৃষ্টির স্রোত, —যে দিচ্ছে আর যে পাচ্ছে, সেই দুজনের কথা এতে মিলেছে, সেই মিলনের রূপের ঢেউ।.... এতেই দুলে উঠ্‌ল সৃষ্টিতরঙ্গ, বিচলিত হ'লো ঋতুপর্যায় ....যাকে চোখে দেখা যায় না, সেই উত্তাপ কখন মাটির আড়ালে চলে যায়; মনে মনে ভাবি একেবারেই গেল বুঝি। কিছুকাল যায়, একদিন দেখি মাটির পর্দা ফাঁক করে দিয়ে একটি অঙ্কুর উপরের দিকে কোন্ এক আর-জন্মের চেনা-মুখ খুঁজ্‌ছে। যে উত্তাপটা ফেরার হয়েছে বলে সেদিন রব উঠ্‌ল সেই তো মাটির তলার অন্ধকারে সেঁধিয়ে কোন্ ঘুমিয়ে পড়া বীজের দরজায় বসে বসে ঘা দিচ্ছিল। এমনি করেই কত অদৃশ্য ইশারায় উত্তাপ এক হৃদয়ের থেকে আর এক হৃদয়ের ফাঁকে ফাঁকে কোন চোর-কোঠায় ঢোকে; সেখানে কার সঙ্গে কি কানাকানি করে জানিনে; তারপরে কিছুদিন বাদে একটি নবীন বাণী পর্দার বাইরে এসে বলে 'এসেছি।' ['পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' (যাত্রী)]

আর কথা বিস্তারের প্রয়োজন নেই। ধরণীর বিরহলিপি .... অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য খোদ কবি যেভাবে প্রকাশ করেছেন সেই আলোকে 'লিপি' কবিতার মমার্থ তুলে ধরা যেতে পারে। আমাদের বোধের জন্যই কবির ভাববস্তুকে মোটামুটি দুটি পর্বে ভাগ

করে দেখানো যেতে পারে। প্রথম পর্বে ধরণীর বিরহ সূর্য থেকে কেন তার ব্যাখ্যান ও বিরহিনী নায়িকার প্রিয়তম-প্রেরিত ভাবলিপির পাঠ উদ্ধারের বর্ণনা এবং দ্বিতীয় পর্বে যুগ-যুগান্তর ধরে সেই লিপির মর্মোদ্ধারে বিশ্বের কবিকুলের ব্যস্ত-ভূমিকা।

উপস্থাপনা সূত্রে যে তথ্য উপস্থাপিত হযেছে তাতে ধরণী কে বিরহিনী নায়িকা যিনি প্রতিদিন প্রিয়তমের লেখা চিঠিখানি বুকে নিয়ে তার পাঠে তন্ময় হয়ে রযেছেন। সুদীর্ঘ সে চিঠি, বারংবার পাঠ করেও যেন তার শেষ হয় না, আশা মেটে না। তাই রোজই চলে আত্মবিস্মৃতা নায়িকার বিপ্রলম্ভের সান্ত্বনা লিপিপাঠ; সে পাঠের বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। প্রভাতের মর্মবাণীতে ভরা সেই লিপিটির উদয়াস্ত পাঠে তাই তাঁর এতো আগ্রহ, এতো গোপনীয়তার আশ্রয় গ্রহণ। কিন্তু তাতেও যেন তাঁর তৃপ্তি নেই। কবিমনে প্রশ্ন জাগে, কেন তাঁর এই তৃপ্তিহীন পত্রপাঠ? মনে মনে তার একটা সম্ভাব্য উত্তরও খুঁজে পেয়েছেন তিনি। বহুযুগে আগে কোনো এক শুভক্ষণে বাষ্পের গুণ্ঠন যেদিন খসে পড়েছিলো, সেই দিনই তো তিনি উন্মুখ হ'য়ে আকাশের দিকে বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়েছিলেন। তখন তাঁর সামনে ফুটে উঠেছিলো 'অমর-জ্যোতির মূর্তি।' রোমাঞ্চিত বুকে নিঃশব্দে তিনি তাঁকে বরণ করে নিয়েছিলেন। সেই আলোকবরণ মন্ত্রধ্বনি পর্বতের শিখরে শিখরে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলো, নৃত্যমত্ত সাগরের কল্লোলে তারই উল্লাস-ধ্বনি, ঝঞ্ঝার উন্মত্ত আবেগে বনে-বনান্তরে তারই জাগরণী। প্রথম দর্শনের বিস্ময় এখনো তাঁকে রোমাঞ্চি করে। প্রতি ধূলিকণা তৃণকণা, তৃণরাজি সেই আলোকবরণ মন্ত্রে, বিস্ময়ে আন্দোলিত হয়ে ঊর্ধ্বে চেয়ে 'পুষ্পে পর্ণে গন্ধে বর্ণে' সেই বিস্ময়ের প্রতিভাস লক্ষ্য করে আনন্দে নেচে ওঠে। দিকে দিকে প্রাণের উল্লাস, প্রলয়ে সৃজনে, রূপে-রূপান্তরে, জীবন-মৃত্যুর দোলায় সুখ দুঃখের বাঁধনে সর্বত্রই সেই বিস্ময়ের ঘোর, সেই আলোকেরই জয়ধ্বনি।

একদিকে সদ্যোজাত ধরণী অন্যদিকে আলোর দেবতা প্রাণপ্রিয় আলোকপুঞ্জের দেবতা (সূর্য)—প্রিয়তমা ও প্রিয়, বধূ ও বর পরস্পর মিলন-পিয়াসী। কিন্তু তাঁরা মিলতে পারছেন না কেননা তাঁদের মাঝখানে অনন্ত নীলাকাশ। তাই কি বিচ্ছেদের লবণাক্ত অশ্রু নীলাকাশ রূপ খাতায় উপর ঝরে পড়ে, রচিত হয় আলোর অধিপতি (সূর্যদেবতা)—প্রেরিত লিপি। এই লিপির অন্তর্লীন তাৎপর্য আজও অজানা। আকাশ থেকে নেমে অগ্নিঅক্ষরে লেখা সেই চিঠির পাঠোদ্ধার আজও শেষ হ'ল না। মর্ম যাই হোক, সেই আলো অগ্নিময়ী বাণীরূপে জীবধাত্রী বিশ্বজননীর মর্মকোষে—নিসর্গলোকে, বিশ্বজীবনে ব্যাপ্ত হয়ে গেছে—

"তোমাদের মাঝখানে আকাশ অনন্ত ব্যবধান;
উর্ধ্ব হ'তে তাই নামে গান।
চিরবিরহের নীল পত্রখানি' পরে
তাই লিপি লেখা হয় অগ্নির অক্ষরে।
বক্ষে তারে রাখো,
শ্যাম আচ্ছাদনে ঢাকো;
বাক্যগুলি
পুষ্পদলে রেখে দাও তুলি,—
মধুবিন্দু হ'য়ে থাকে নিভৃত গোপনে;
পদ্মের রেণুর মাঝে গন্ধের স্বপনে
বন্দী করো তারে;
তরুণীর প্রেমবিষ্ট আঁখির ঘনিষ্ঠ অন্ধকারে
রাখো তারে ভরি;
সিন্ধুর কল্লোলে মিলি নারিকেল পল্লবে মর্মরি,
সে বাণী ধ্বনিতে থাকে তোমার অন্তরে;
মধ্যাহ্নে শোনো সে বাণী অরণ্যের নির্জন নির্ঝরে।।

প্রথম পর্বের এখানেই সমাপ্তি।

দ্বিতীয় পর্বের সূচনায় বিরহিনী ধরণী সূর্যালোকপ্রেরিত সেই চিঠির উত্তর রচনায় উন্মনা। তাঁর সেই প্রয়াস চলেছে তো চলেছেই—অন্তহীন দেশ-কালব্যাপী তাঁর সেই প্রয়াস। অতৃপ্তির বেদনার আগুনে বারংবার তাঁর লেখা এবং পরক্ষণেই তা ছিঁড়ে ফেলা। এইভাবেই যুগ-যুগান্তর কেটে যায়—

"বিরহিণী, সে-লিপির যে উত্তর লিখিতে উন্মনা
আজো তাহা সাঙ্গ হইল না।
যুগে যুগে বারম্বার লিখে লিখে
বারম্বার মুছে ফেলো, তাই দিকে দিকে
সে ছিন্ন কথার চিহ্ন পুঞ্জ হয়ে থাকে;
অবশেষে একদিন জ্বলজ্জটা ভীষণ বৈশাখে
উন্মত্ত ধূলির ঘূর্ণিপাকে
সব দাও ফেলে
আত্মবিদ্রোহের অসন্তোষে।
তারপরে আরবার বসে বসে
নূতন আগ্রহে লেখো নূতন ভাষায়।
যুগ-যুগান্তর চলে যায়।"

বিরহিণী ধরণীর মনের গোপন অন্তঃপুর-সংবাদ তাঁর ভাব ভাষা প্রত্যাশা—সবকিছু উপলব্ধির জন্য যুগে যুগে কত শিল্পী-কবিদের যে সে লিপির অনুশীলন তার অন্ত নেই। বর্তমান কবিও সেই একই পিঁড়িতে নিয়েছেন তাঁর আসন। বিরহিণীর ইঙ্গিত, বসনপ্রান্তের ভঙ্গি, অশ্রুসজল দৃষ্টি প্রভৃতি বিরহাবস্থা প্রকাশক যা কিছু তা যদি আজ কবির হৃদয় বীণার তারে ঝংকার তোলে, ভাবে-ভাষায় ছন্দে অলঙ্কারে যদি তিনি তাঁর অন্তরের গোপন কথা, বিপ্রলম্ভের দীর্ঘশ্বাস, কঙ্কণ-কিঙ্কিণীতে সদর্থকভাবে প্রকাশরূপ দিতে পারেন তবে কবি হিসেবে তাঁর জীবন সার্থক হ'বে। মর্তের বিচ্ছেদপাত্রে বসুধা স্বর্গ থেকে মিলনের যে সুধাপাত্রটিকে সংগোপনে রক্ষা করে চলেছেন সেই আলোকমালায় স্নান করে তিনিও যেন বেদনার সুতীব্র দাহকে ছন্দে-সুরে-গানে তেজোময় বাণীরূপ দান করতে পারেন। বসুধা ও তার দয়িত আলোরপ্রভ—সকল আলোর অধীশ্বর সূর্যের মিলনের সুধা কবির বাণীতে মূর্ত হোক, সফল হোক—এই প্রার্থনা—

"দূর হতে আলোকের বরমাল্য এসে
খসিয়া পড়িল তব কেশে,
স্পর্শে তারি কভু হাসি কভু অশ্রুজলে
উৎকণ্ঠিত আকাঙ্ক্ষায় বক্ষতলে
ওঠে যে ক্রন্দন,
মোর ছন্দে চিরদিন দোলে যেন তাহারি স্পন্দন।
স্বর্গ হ'তে মিলনের সুধা
মর্ত্যের বিচ্ছেদ-পাত্রে সংগোপনে রেখেছ বসুধা,
তারি লাগি নিত্যক্ষুধা,
বিরহিণী ওয়ি,
মোর সুরে হক জ্বালাময়ী।"

ভাবৈশ্বর্য ছাড়াও ছন্দোবৈচিত্র্য, ছন্দসজ্জা 'লিপি' কবিতার শৈলীনির্মাণে অভিনব মাত্রা যোজনা করেছে।

৩.১.৪.৪ : শেষবসন্ত

'শেষ বসন্ত' 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের 'পথিক' পর্বের অন্তর্গত একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। কবিতাটি বুয়েনাস এয়ারিস-এ বসে লেখা, রচনাকাল—২১শে নভেম্বর, ১৯২৪। পূরবী পর্বের আবহটি পটভূমিকা রূপে আদ্যন্ত বর্তমান এই কবিতায়। ভাবঋদ্ধতা, ভাষাসৌষ্ঠব, ছন্দোমাধুর্য এবং অনুপ্রাস-উৎপ্রেক্ষা ও বিরোধাভাস প্রভৃতি শব্দালংকার ও অর্থালংকার নিপুণ ব্যবহার কবিতাটিকে বাবঘন রসমাধুর্যে উজ্জ্বল একটি সুন্দর কবিতায় পরিণত করেছে। মিশ্রবৃত্ত বা পয়ার ছন্দে লেখা কবিতাটির ভাববস্তু বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি দাঁড়ায় এইরূপ —

উপস্থাপনাতেই কবি স্মরণ করেছেন তাঁর অন্তর্যামী জীবনদেবতা মানসসুন্দরী লীলাসঙ্গিনীকে। প্রার্থনা করেছেন, দিনশেষের আগেই ফাল্গুনের রৌদ্রকরোজ্জ্বল বসন্তমেলায় ফোটা বসন্তের ফুলগুলি শুধু এবারের মতো একসঙ্গে কুড়োতে যাবেন—

"শুধু এবারের মতো
বসন্তের ফুল যত
যাব মোরা দুজনে কুড়াতে।"

শুধু একবারের মতো কেন তার কারণটিও ব্যাক্যা করেছেন কবি। কবির লীলাসঙ্গিনী কোনো বাস্তব রমণীর আদর্শায়িত ভাবরূপ। তিনি শাশ্বতী—কবির চিরকালের চেনা প্রেয়সী সঙ্গেই তো তাঁর জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী লীলা। ("লীলাসঙ্গিনী' কবিতালোচনা প্রসঙ্গে বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে।) মহাকালের প্রবাহে সীমায়ত জীবন নিয়ে মানবের লীলা। কিন্তু মূর্ত জীবনসঙ্গিনীই যকন জন্মান্তর সৌহৃদ্যে চিরকালের বিমূর্তপ্রেয়সী, তখন তাঁর জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। চিরন্তনী একটি ভাবের প্রবাহই যেন জন্ম-জন্মান্তরে নারীরূপ ধরে কবির সঙ্গে প্রেমের, সখ্যের বন্ধনে বাঁধা পড়েছে। সেই নারীরই ভাবরূপ কবির মানসসুন্দরী-অন্তর্যামী-জীবনদেবতা-দোসর প্রভৃতি।

পূরবীর যুগে কবিমনের সাময়িক বিষাদ-অবসাদ-অসুস্থতা তাঁকে জীবনের পরিণামী সত্যের মুখোমুখি করেছিলো। মনে হয়েছিলো তাঁর জীবনলীলার শেষপর্বে দিনশেষের শেষ ছায়াখানি তিনি দেখতে পেয়েছেন, যেন পূরবীর ছন্দে 'শেষরাগিণীর বীণ' তিনি শুনতে পেয়েছেন। কবির সেই সাময়িক দৌর্বল্যকেন্দ্রিত কল্পনা-বিলাস মৃত্যুর ছায়ায় বিলীয়মান অস্তিত্বের শেষটুকু নিয়ে শেষবারের মতো সকল দুঃখ-দৈন্য-দ্বিধা-দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ আনন্দরসে অবগাহন করবার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল হয়েছে। তাই তাঁর প্রত্যাশা—শেষ বসন্তের সমারোহে যৌবনের ফোটফুলগুলি লীলা সঙ্গিনীর সঙ্গে এক সাথে শেষ বারের মতো কুড়িয়ে প্রেমের গৌরব, সৌন্দর্যের তৃষ্ণাকে অপার মহিমা-ভূষিত করে যাবেন। চিরন্তনী—শাশ্বতী তো প্রতিজীবনেই তাঁর লীলার সাথী। কিন্তু মহাকাল তো তাঁকে নির্দিষ্ট পরমায়ু দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাই জীবসীমার মধ্যেই তিনি প্রিয়তমার সঙ্গে বসন্তের রঙে, বসন্তের রসে, সৌন্দর্যে উচ্ছলতায় আনন্দে মেতে উঠে জীবনের শেষ খেলাটুকু খেলতে চান। তাঁর এ সময়ের রোমান্টিক আবেগটুকু কী সুন্দর ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন কবি!—

"বেলা কবে গিয়াছে বৃথাই
এত কাল ভুলে ছিনু তাই।
হঠাৎ তোমার চোখে
দেখিয়াছি সন্ধ্যালোকে
আমার সময় আর নাই।
তাই আমি একে একে গণিতেছি কৃপণের সম
ব্যাকুল সংকোচ ভরে বসন্তশেষের দিন মম।"

বসন্তশেষের এই দিনটিকে কবির অক্ষয় করে রাখার চেষ্টা যে কতো আন্তরিক অসংশয়িত তা যেন প্রিয়তমা অনুভব করেন। দিনশেষে শেষবিদায়ের ক্ষণটি তাঁর বেদনাশ্রুতে ভরে উঠবে এমন প্রত্যাশা নিয়ে তিনি যুগল—মিলনের কথা ভাবেননি; বরং দয়িত-দয়িতার শেষবিদায় ক্ষণের করুণারসে ভরা হৃদয়ের ছবিটি স্মৃতিপটে অক্ষয় হয়ে থাকুক—এই তাঁর কামনা। প্রেম-সম্ভোগ তথা সৌন্দর্যরসসম্ভোগের এমন নির্মল রূপচ্ছবি তো দুর্লভ। পাতার আড়াল থেকে বিকেলের শেষ আলোটুকু এসে প্রিয়তমার কালো কেশ কিছুক্ষণের জন্য হলেও ঝলসে দিক। এই আবেগ থেকে নিঃসারিত কবিমনের অভিব্যক্তিটুকু কাব্যসৌন্দর্যে অতুলনীয়!—

"ফিরিয়া যেয়ো না শোন শোন,
সূর্য অস্ত যায় নি এখনো।
সময় রয়েছে বাকি;
সময়েরে দিতে ফাঁকি
ভাবনা রেখো না মনে কোনো।
পাতার আড়াল হ'তে বিকাশের আলোটুকু এসে
আরো কিছুক্ষণ ধরে ঝলুক তোমার কালো কেশে।"

এই রোমান্টিক আবেগ তাঁর অন্তরে জাগ্রত করেছে অতীত লীলার কতো না অমলিন ছবি। প্রিয়তমার সুমধুর হাসি, অকারণ নির্মল উল্লাসে বনসরসীর তীরে ভীরু কাঠবিড়ালিটিকে হঠাৎ করে ভয় পাইয়ে দেওয়া প্রভৃতি স্মৃতির আবরণ উন্মোচিত করে তাঁর চঞ্চল চরণের গতিকে মন্থর করে দিতে চান না কবি। তারপর যখন পাখিদের নীড়ে ফেরা শুরু হবে—অস্ফুট কাকলিতে মুখর হ'বে চারিদিক, গোধূলি-বাঁশরির সর্বশেষ সুরটিও মিলিয়ে যাবে 'বেণুবনচ্ছায়াঘন সন্ধ্যায়', তার ছবিটিও ধীরে ধীরে বিলীন হ'য়ে যাবে—তখন রাত্রি ঘনিয়ে এলে বাতায়নে গিয়ে বসবে তুমি। প্রিয়তমা! এই সব আনন্দ-উজ্জ্বল রসমধুর স্মৃতি—সব পিছনে ফেলে তাঁকে চিরকালের জন্য ছেড়ে যাবেন তিনি। আর হয়তো কোনো দিন ফিরে দেখা হবে না তাঁদের। 'ভোবে-গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালাখানি'—প্রেমের সেই স্মারকটিকে তিনিও যেন ফেলে দেন। সেই মুহূর্তেও তাই হোক তাঁর শেষ স্পর্শ—শেষ বিদায়ের বাণী যা স্মৃতির অক্ষয় মন্দিরে নিত্যলোকে চির অম্লান, চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে—

"রাত্রি যবে হ'বে অন্ধকার
বাতায়নে বসিয়ো তোমার।
সব ছেড়ে যবা, প্রিয়ে,
সুমুখের পথ দিয়ে,
ফিরে দেখা হবে না তো আর।
ফেলে দিয়ো ভোরে-গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালাখানি।
সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী।"

—জীবের মধ্যে অনন্তের এই অনুভবকে—এমন গভীর অনুরাগদীপ্ত প্রকাশকে 'সৌন্দর্য-সম্ভোগ' ছাড়া আর কীইবা বলা যায়? কবি নিজেও অন্যত্র বলেছেন—"জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করার অন্য নাম ভালোবাসা, প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য-সম্ভোগ।" "শেষ বসন্ত" কবিতাটি তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

৩.১.৪.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি —

১। 'বকুল-বনের পাখি' কবিতার মূল বক্তব্য পরিস্ফুট করো এবং প্রসঙ্গত পাখিটির সঙ্গে কবিধর্মের যোগসূত্রটি তুলে ধরো।

২। 'সাবিত্রী' কবিতাটি কবির একটি বিশেষ তত্ত্বভাবনার রসভাষ্য। —আলোচনা করো।

৩। 'লিপি' কবিতায় প্রতিফলিত কবি ভাবনার স্বরূপ ব্যাখ্যা করো।

৪। 'শেষ বসন্ত' কবিতার মূল বক্তব্য উপস্থাপন করো। প্রসঙ্গত কবিতাটির সঙ্গে পূরবী-পর্বের আবহ কিভাবে ক্রিয়াশীল তা বুঝিয়ে দাও।

৫। 'পূরবী'র অধিকাংশ কবিতাই 'শেষরাগিণীর বীণ নয়' বরং নবরাগে জেগে ওঠার আনন্দগান—উজ্জীবন-মন্ত্র। —আলোচনা করো।

৩.১.৪.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। পূরবী (বিশ্বভারতী সং) — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২। রবীন্দ্র রচনাবলী (সমগ্র — বিশ্বভারতী সং)।

৩। যাত্রী (বিশ্বভারীত সং) — রবীন্দ্র ঠাকুর।

৪। রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য-প্রবেশক (তৃতীয় সং-বিশ্ব ভারতী) — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

৫। রবি-রশ্মি (২য় খণ্ড, পশ্চিমভাগে, ১ম সং) —চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬। রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ (৩য় সং) —প্রমথনাথ বিশী।

৭। রবীন্দ্র-সরণী (৫ম মুদ্রণ) — প্রথমনাথ বিশী।

৮। রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত ২য় সং) — কল্যাণীশঙ্কর ঘটক।

৯। ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ (১ম সং) শঙ্খ ঘোষ।

১০। মহাকবি কালিদাসের সমগ্র রচনাবলী (ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী-সম্পাদিত ১ম সং)।

পর্যায় গ্রন্থ-২
প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থ
একক-৫
শেষ পর্যায়ের কবিতা ও প্রান্তিক

বিন্যাস ক্রম

৩.২.৫.১ : রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কবিতা

৩.২.৫.২ : শেষপর্যায়ের কবিতা ও প্রান্তিক

৩.২.৫.৩ : আদর্শ গ্রন্থাবলি

৩.২.৫.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩.২.৫.১ : রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কবিতা—

রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থেই প্রথম যেন আভাস পাওয়া গেল, কবি অনুভব করেছেন এই মর্ত্যধাম থেকে তাঁর বিদায়ের বেলা আসন্ন হয়ে পড়েছে, তাই তিনি বলেছেন 'বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিনীর বীণ।' বিশেষ করে এই কাব্যের 'পথিক'—অংশে সেটা একটু গভীরভাবে ধরা পড়ে। তবে একথাও ঠিক যে, 'ইমনে আজ বাঁশি বাজে মন যে কেমন করে,' তা সত্ত্বেও দক্ষিণ আমেরিকা গমন ও প্রত্যাগমনের মধ্যে প্রচুর কবিতা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, হয়তো গানের পালা শেষ করে দিতে হবে এবার, এ কথা মনে করেই। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যেও সৃষ্টির এই নবস্ফূর্তি অব্যাহত ছিল। প্রচুর কবিতা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ এবং যেসব কথা আগে বলতে হয়তো সঙ্কোচ ছিল, যেসব কথাও বলতে পেরেছেন অক্লেশে। অনেক শৈশব-স্মৃতি উঠে এসেছে, অনেক তুচ্ছ কথাও এখন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 'পরিশেষ' (১৯৩২) কাব্যগ্রন্থে জীবনের কত স্মৃতি যে মুখর হয়ে উঠেছে তার শেষ নেই, তবে সেই সঙ্গে পরমায়ু যে শেষ হয়ে আসছে, এর একটা রোমান্টিক বোধও প্রায়ই প্রকাশিত হয়েছে। কখনো বলেছেন—

> "সব লেখা লুপ্ত হয়, বারংবার লিখিবার তরে
> নূতন কালের বর্ণে। জীর্ণ তোর অক্ষরে অক্ষরে
> কেন পট রেখেছিস পূর্ণ করি। হয়েছে সময়
> নবীনের তুলিকারে পথ ছেড়ে দিতে।"

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে (১৩৩৯) কবিতাকে 'বেড়াভাঙ্গা স্বাধীনতা' দেবার জন্য কবি নিয়ে এলেন গদ্য ছন্দ এবং সেই গদ্য ছন্দেই রচনা করলেন 'শেষ সপ্তক' (১৩৪২) এবং 'পত্রপুট' (১৩৪৩)। পুরনো স্মৃতি নিয়ে গল্পের মতো কবিতার সংখ্যা এসব কাব্যগ্রন্থে অনেক বেশি।

এরপর যেসব কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে কবির— 'বীথিকা' (১৩৪২), 'পত্রপুট' (১৩৪৩), 'শ্যামলী' (১৩৪৩)—সর্বত্রই মৃত্যু সম্বন্ধে একটা রোম্যান্টিক চিন্তা এসে পড়েছে। 'শেষ সপ্তকে' বলেছেন—

> 'পঁচিশে বৈশাখ চলেছে
> জন্মদিনের যাত্রাকে বহন করে
> মৃত্যুদিনের দিকে।'

'পত্রপুট' কাব্যগ্রন্থে বলেছেন :

> 'এখনো মেটেনি আশা ;
> এখনো তোমার স্তন-অমৃত-পিপাসা
> মুখেতে রয়েছে লাগি।'

'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থে পাই :

'মানুষের যাবার দিনের চোখ
বিশ্ব থেকে নিকিয়ে নেবে রং
মানুষের যাবার দিনের মন
ছানিয়ে নেবে রস।'

এমনকী 'ছড়ার ছবি' (১৯৩৭) কাব্যগ্রন্থেও কবি বলেছেন :

'কিন্তু যখন চেয়ে দেখি সামনে সবুজ বনে
ছায়ার চরছে গোরু,
মাঝ দিয়ে, তার পথ গিয়েছে সরু,
ছেয়ে আছে শুকনো বাঁসের পাতায়,
হাট করতে চলে মেয়ে ঘাসের আঁটি মাথায়,
তখন মনে এই বেদনাই বাজে
ঠাঁই রবে না কোনো কালেই ঐ যা-কিছুর মাঝে।'

৩.২.৫.২ : শেষ পর্যায়ে কবিতা ও প্রান্তিক —

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কবিতায় মৃত্যু সম্বন্ধে যে রোম্যান্টিক ভাবনার ছায়াপাত ঘটেছিল, 'প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থে তা একেবারে বাস্তব আকার ধারণ করেছে, কারণ মৃত্যু এখন আর কবির কাছে দার্শনিক সত্য নয়, জীবনের অভ্রান্ত ও অনিবার্য সত্য। ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অত্যন্ত কঠিন অসুখে পড়েছিলেন কবি। সেরে উঠবার কোনো আশা ছিল না। এই জীবন-মৃত্যুর আলোছায়ার মধ্যেই সেপ্টেম্বর মাসে তিনটি কবিতা লিখেছিলেন। কিছুটা আরোগ্য লাভের পর অক্টোবর মাসে লিখলেন আরো পাঁচটি এবং তারপর জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়াবার বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচ্ছন্ন রূপ দিলেন ডিসেম্বর মাসে লেখা সাতটি কবিতায়। এই পনেরোটি কবিতা এবং তৎসহ আরো তিনটি (এই সময়ের লেখা নয়—১৪-সংখ্যক কবিতা লেখা হয়েছে ১৫ বৈশাখ ১৩৪১ সাল, ১৫-সংখ্যক কবিতা লেখা হয়েছে ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ সাল এবং ১৬-সংখ্যক কবিতা লেখা হয়েছে ৭ বৈশাখ, ১৩৪১ সালে)। মোট আঠারোটি কবিতা নিয়ে ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর 'প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থ। কবিতাগুলির শিরোনাম ছিল না, সংখ্যা দিয়েই এগুলি চিহ্নিত হয়েছিল।

'প্রান্তিকের' কবিতাগুলিতে এই পৃথিবীতে কবি কী পেয়েছেন, কী করেছেন তার একটা মূল্যায়নের চেষ্টা যেমন আছে, তেমনি আছে তিনি যে প্রতিদিনের কান্নাহাসির জীবনচর্চায় অনিবার্যভাবেই আর থাকবেন না, সে সম্বন্ধে তাঁর অনুভূতি। একটা ব্যাপার এখানে উল্লেখ করা দরকার, সেটি হল, মৃত্যু এবং জীবনাবসানের মধ্যে আধ্যাত্মিক চিন্তা এসেছে অত্যন্ত কম। সাধারণভাবেই রবীন্দ্রনাথ কোনো প্রচলিত ধর্মমত বা dogma-তে বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু গীতাঞ্জলি-পর্বে পরাণসখা, পান্থজনসখা, ঈশ্বর, তুমি, ত্রিভুনেশ্বর ইত্যাদি অভিধায় একরকম ভাবে একটা আরোধ্যের উপলব্ধি অন্তত গড়ে উঠেছিল। 'বলাকা' কাব্য থেকেই কবির মনে সে ধর্মের উপলব্ধি কিছুটা ফিকে হতে শুরু করে। একে ধর্মে বা আধ্যাত্মিকতার অবিশ্বাস ঠিক বলা যাবে না, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ জীবনবোধের প্রতি আরো দৃঢ় বিশ্বাস বলা যায়। এই চেতনারই প্রকাশ আমরা 'প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থে দেখি। ফলে এখন আর 'মৃত্যু অমৃত করে দান' বা 'মরণের তুঁহু মম শ্যামসমান' নয়, জন্মান্তরের ভাবনায় উল্লসিতও নন কবি—চলে যে যেতে হবে, এই পরম সত্যকে যত রকম ভাবে পারেন মেনে নেবার চেষ্টা করেছেন, মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছেন। যতই তা করেছেন ততই ফেলে আসা জীবন তাঁর কাছে মধুময় হয়ে উঠেছে।

৩.২.৫.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি —

১। প্রান্তিক কাব্যের প্রকাশকাল কত?

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ পর্যায়ের দুটি কাব্যের নাম লেখোয

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে প্রান্তিক কাব্যের স্থান মূল্যায়ন করো।

৩.২.৫.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা — উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

২। রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ — প্রমথনাথ বিশী

৩। রবি জীবনী — প্রশান্ত কুমার পাল

৪। রবিন্দ্র জীবনী — প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

একক-৬

পাঠ্য কবিতাগুলির বিশ্লেষণ

বিন্যাস ক্রম

৩.২.৬.১ : প্রান্তিক কাব্যের কবিতাগুলির ব্যাখ্যা

৩.২.৬.১.১ : ১-সংখ্যক কবিতা

৩.২.৬.১.২ : ২-সংখ্যক কবিতা

৩.২.৬.১.৩ : ৩-সংখ্যক কবিতা

৩.২.৬.১.৪ : ৪-সংখ্যক কবিতা

৩.২.৬.১.৫ : ৫-সংখ্যক কবিতা

৩.২.৬.১.৬ : ৬-সংখ্যক কবিতা

৩.২.৬.১.৭ : ৭-সংখ্যক কবিতা

৩.২.৬.১.৮ : ৮-সংখ্যক কবিতা

৩.২.৬.১.৯ : ৯-সংখ্যক কবিতা

৩.২.৬.১.১০ : ১০-সংখ্যক কবিতা

৩.২.৬.১.১১ : ১১-সংখ্যক কবিতা

৩.২.৬.১.১২ : ১২-সংখ্যক কবিতা

৩.২.৬.১.১৩ : ১৩-সংখ্যক কবিতা

৩.২.৬.১.১৪ : ১৪-সংখ্যক কবিতা

৩.২.৬.১.১৫ : ১৫-সংখ্যক কবিতা

৩.২.৬.১.১৬ : ১৬-সংখ্যক কবিতা

৩.২.৬.১.১৭ : ১৭-সংখ্যক কবিতা

৩.২.৬.১.১৮ : ১৮-সংখ্যক কবিতা

৩.২.৬.২ : আদর্শ গ্রন্থাবলি

৩.২.৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩.২.৬.১ : প্রান্তিক কাব্যের কবিতাগুলির ব্যাখ্যা —

‘প্রান্তিক’ কাব্যগ্রন্থের একেবারে শেষ কবিতাদুটির সুর অন্যান্য ষোলটি কবিতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। দুটি কবিতাই লেখা হয়েছিল একই দিনে, পঁচিশে ডিসেম্বর, অর্থাৎ বড়োদিনে। প্রথমটির রচনাস্থান হিসাবে শান্তিনিকেতন এবং কাল হিসাবে ২৫.১২.৩৭ তারিখ দেওয়া আছে, দ্বিতীয়টিতে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ‘খ্রীস্ট-জন্মদিন।’ আমরা কবিতাগুলির স্বতন্ত্র আলোচনা আগে করে নেব।

৩.২.৬.১.১ : ১-সংখ্যক কবিতা —

অন্ত্যমিলহীন মহাপয়ার ছন্দোরূপে লেখা এই কবিতায় কবি মৃত্যুকে যেন স্পষ্ট দেখেছেন এবং তার ফলে নিজের অনুভূতির কী পরিবর্তন ঘটেছে তা বোঝবার চেষ্টা করেছেন।

কবি অনুভব করেছেন মৃত্যুদূত এসেছিল 'বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের অন্তরাল' থেকে। জীবনের প্রান্তে যত ধূলি ছিল মলিনতা ছিল, ব্যথার দ্রাবক রস সব ধুয়ে দিয়েছে তা। জীবনকে নিঃশব্দে যে তা মার্জনা করে চলেছিল, কবির এ কথায় তাঁর 'পাপের মার্জনা' প্রবন্ধটির কথা আমাদের মনে পড়ে। কবির এই রোগতপ্ত মস্তিষ্কে মনে হযেছে যেন বিধাতার নব নাট্যভূমিতে এক নতুন নাটক অভিনয়ের জন্য যবনিকা উন্মোচিত হয়েছে। বিপুল অন্ধকারে জেগে উঠেছে এক আলোর তর্জনী। অসীম তন্দ্রাকে বিদীর্ণ করে আলোকের এক শিহরণ চমকিত করে দিয়েছে কবিকে—যেন শূন্য অন্ধকারের গূঢ় নাড়িতে জ্যোতির ধারা প্রবাহিত হয়েছে।

এই আকস্মিকতা এবং বিভ্রম কেটে যেন সত্য দর্শন হয়েছে এবার কবির। তিনি বুঝতে পেরেছেন তাঁর মধ্যে নতুন এক শুভ্র চৈতন্যের জন্ম হয়েছে। অতীতের যে দেহ এতদিন তিনি বহন করে নিয়ে চলেছিলেন তা যেন 'ত্রস্ত হয়ে পড়ে/দিগন্ত-বিচ্যুত।' এই দেহ থেকে মুক্তিলাভ করে কবি যেন মুক্তি পেয়েছেন অন্তরাকাশে, 'সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে' যে 'অলোক আলোকতীর্থ' সেখানেই যেন উপনীত হযেছেন তিনি।

অর্থাৎ এই কবিতায় আসন্ন মৃত্যুর জন্য কোনো দুঃখ নেই, কবি কল্পনা করে নিয়েছেন এবার এক নতুন জীবননাট্য শুরু হবে, এই আলোকিত উদ্ভাসন তারই সংকেত।

৩.২.৬.১.২ : ২-সংখ্যক কবিতা —

আটপংক্তির ছোট এই ২-সংখ্যক কবিতাটিও অন্ত্যমিলবর্জিত একটি মহাপয়ার। প্রথম কবিতার অনুভূতিই এখানে সঞ্চারিত হয়েছে প্রায় অভিন্নভাবে। মৃত্যুক অতি প্রসন্নচিত্তে যাতে গ্রহণ করতে পারেন সেই জন্যই তাকে 'আলোকের দান' হিসাবে দেখেছেন। এই আলোকের দানে এ জীবনের যত আবর্জনা রাশি —'আজন্মকালের ভিক্ষাঝুলি', 'ক্ষুধিত অহমিকার/উঞ্ছবৃত্তি -সঞ্চিত' সব জঞ্জাল দগ্ধ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, কবি বিশ্বাস করেন নতুন এক সূর্যোদয় আসন্ন—পূর্ব সমুদ্রের পারে আছে এক অপূর্ব উদয়াচলচূড়া, এক অমর্ত্য প্রভাতের অরুণকিরণে মিলে যাবে এই মর্ত্যের প্রান্তপথ।

বোঝা যায়, মৃত্যুকে অদূরে ছায়া বিস্তার করতে দেখে কবি মনে মনে সান্ত্বনার আলোক খুঁজে নেবার চেষ্টা করেছেন।

৩.২.৬.১.৩ : ৩-সংখ্যক কবিতা —

প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের ৩-সংখ্যক কবিতাটি মহাপয়ারে রচিত অন্ত্যমিলহীন একটি সনেট। সমগ্র কবিতার মধ্যে অবশ্য কোনোরকম বিভাজন নেই, ভাবের কোনো পরিবর্তনও নেই—একই ভাব প্রবাহিত হয়ে চলেছে সমস্ত কবিতায়।

সামগ্রিকভাবে দেখলে একেও কবির মনের সান্ত্বনামূলক কবিতাই বলতে হবে, কারণ এখানেও মৃত্যুর পর এখন এক স্থানে উপনীত হবার স্বপ্ন কবি দেখেছেন যেখানে বিশ্বস্রষ্টার পাশে তাঁর নিজের আসন পাতা থাকবে। এই জন্মের সঙ্গে কবির 'স্বপ্নের জটিল সূত্র' ছিঁড়ে গিয়েছে, এটা কবি অনুভব করেছেন। কিন্তু এরপর কী! কবির মনে হয়েছে, এবার সামনে যে পথ, তা চলে গিয়েছে 'অতিদূর নিঃসঙ্গের দেশে।' কিন্তু সেখানে রয়েছেন 'মহা-এক' — অবশ্যই তিনি বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, কবি নিজেও এখন একাকী বলে তাঁর মনে হয়েছে সেই মহা-এক যেন এখন ডাক পাঠিয়েছেন এই একাকীকে। এবার সেই একাকী-নিঃসঙ্গতার পথে যাবার জন্য পৃথিবীতে বহু সঙ্গলব্ধ কবি যেভাবে তার নিন্দা করে নিঃসঙ্গতার প্রশংসা হয়েছেন তাতেই বোঝা যায় কবি কৃত্রিমভাবে এক ধরনের সান্ত্বনা খুঁজে নিতে চাইছেন, তা নাহলে বলতেন না—

> 'জানিলাম একাকীর নাই ভয়,
> ভয় জনতার মাঝে; একাকীর কোনো লজ্জা নাই,
> লজ্জা শুধু যেথা-সেথা যার-তার চক্ষুর ইঙ্গিতে।'

যাই হোক, এর পর বিশ্বসৃষ্টিকর্তা যখন কবিকে ডাক দিয়েছেন তাঁর পাশে আসন করে নিতে, তখন কবি 'ধ্বংসোন্মুখ মলিন জীর্ণতা' পেছনে ফেলে সেখানে নতুন জীবনছবি আঁকবার জন্যে এগিয়ে যাবেন, এমন কথাই বলেছেন।

৩.২.৬.১.৪ : ৪-সংখ্যক কবিতা —

৪-সংখ্যক এই কবিতাটি প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের একটি তাৎপর্যপূর্ণ কবিতা। অন্ত্যমিলহীন মহাপয়ারে লেখা এই কবিতার শেষেও মৃত্যুর পরপারে 'শুকতারা-নিমন্ত্রিত আলোকের উৎসবপ্রাঙ্গণে-'র কথা আছে, কিন্তু এখানে একেবারে আন্তরিক একটি অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে অকৃত্রিমভাবে। সেই কারণেই এর একটি বিশেষ মূল্য আছে।

কবি এই কবিতায় বলেছেন, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনুভব করেছিলেন দেবতার আপন স্বাক্ষর তাঁর হৃদয়ে আঁকা আছে। তিনি সত্য অনুভব করতে পারেন এবং তা প্রকাশেও ক্ষমতাও তাঁর আছে। সেই অনুভূতি থেকেই সারাজীবন তিনি সৃষ্টি করে গিয়েছেন প্রচুর কবিতা, কিন্তু জীবনের উপান্তে এসে বুঝতে পারছেন দেবতার সেই আশীর্বাদ আজ মিলিয়ে গিয়েছে, কবির কাব্য 'আজ পণ্যসামগ্রী - প্রচুর পাঠক এবং সমালোচক নানারকম ভাবে তার যে মূল্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে সেই মূল্যেই তাঁর আদি উপলব্দির সত্য আজ বিক্রীত পণ্যের ধুলোয় ভূলুণ্ঠিত। কবি তাঁর এই মৃত্যু-পরোয়ানাকে আশীর্বাদ মনে করেছেন এই কারণে যে, এই ধাক্কা খেয়েই তিনি আজ এ সত্য উপলব্দি করেছেন যে দেবতার আশীর্বাদকে তিনি সারা জীবন ধরে শুধু পণ্যসামগ্রী করে তুলেছেন। মৃত্যুর পরোয়ানা যেন সিন্ধুপারে বেজে ওঠা আরতিশঙ্খের ধ্বনি—কবিকে তা বুঝিয়ে দিয়ে গেল এই সব বেচাকেনা, আশা-প্রত্যাশার কোলাহল কত কুৎসিত। পরের মুখেই তাঁর রচনার স্বাদ গৃহীত হয়েছে এতদিন, পরের মুখই তার মূল্য নির্ধারণ করেছে। সেই দীনতা থেকে কবি আজ মুক্ত। এখন 'একাকীর একতারা' হাতে কবি প্রবেশ করবেন সেই সংগীতমন্দিরে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যা তিনি পেয়েছিলেন। কবির আনন্দ সেইখানেই—

> 'আদিম সৃষ্টির যুগে
> প্রকাশের যে আনন্দ রূপ নিল আমার সত্তায়
> আজ ধূলিমগ্ন তাহা, নিদ্রাহারা রুগ্ন বুভুক্ষার
> দীপধূমে কলঙ্কিত। তারে ফিরে নিয়ে চলিয়াছি
> মৃত্যুস্নানতীর্থতটে সেই আদি নির্ঝরতলায়।'

মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের গান 'তোমার এই ঝর্ণাতলার নির্জনে'। কবি আবার সেই খান থেকে শুরু করবেন, এই ভেবেই তাঁর আনন্দ। জীবনটাকে পণ্য করে তুলেছিলেন, এবার আলোকের ঝর্ণাধারায় ধুয়ে জীবনকে আবার নতুন করে শুরু করতে পারবেন, বিশ্বাসের এই জোরে কবিতাটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

৩.২.৬.১.৫ : ৫-সংখ্যক কবিতা —

প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের ৫-সংখ্যক কবিতাটি অন্ত্যমিলহীন মহাপয়ার রীতির একটি সনেট। কবি যে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন এবং সেই প্রস্তুতির পথে বাধা হিসাবে কারা উপস্থিত, সে বিষয়ে আন্তরিক অনুভূতি এই কবিতায় উন্মোচিত করেছেন।

কবি মনে করেন মৃত্যু মান চির পথিকের ভারমুক্তি—'বাঁশিতে বেজেছে ধ্বনি, আমি তারি হব অনুগামী।' কিন্তু কবিকে সেভাবে ভারমুক্ত হতে দিচ্ছেনা তাঁর অতীত। মৃত্যু যখন কবির সামনে মেঘমুক্ত শরতের আকাশ উন্মুক্ত করতে চায় তখন পেছন থেকে ছুটে আসে জীবনের সমস্ত অকৃতার্থতা আর অতৃপ্ত তৃষ্ণা। অনেক কিছু করার বাসনা ছিল মনে, করা হয়ে ওঠেনি, ছায়ামূর্তি এবং প্রেতমূর্তির মতো তারা এখন সঙ্গ নিয়েছে কবির। একদিন কবি যত পেরেছেন কবিতার ফুল ফুটিয়েছেন, আজ 'পুষ্পরিক্ত মৌনী বনে' 'বাসাছাড়া মৌমাছির গুন গুন গুঞ্জরণ' অর্থাৎ অতৃপ্ত আশার কথা বারা বার মনে ফিরে আসাকে তিনি প্রশান্ত মৃত্যুর পথে প্রবল বাধা বলেই মনে করেছেন। কবি তাই এই অতীত, এই 'পশ্চাতের সহচর'-কে মিনতি করেছেন এই বন্ধন ছিন্ন করার জন্য, কারণ তা তাঁর মরণের অধিকার হরণ করে রেখেছে। কবির আকুল প্রার্থনা :

> 'বেদনার ধন যত, কামনার রঙিন ব্যর্থতা,
> মৃত্যুরে ফিরায়ে দাও।'

৩.২.৬.১.৬ : ৬-সংখ্যক কবিতা —

৬-সংখ্যক দীর্ঘ কবিতাটিও মহাপয়ার রীতিতে রচিত এবং এখানেও কবি কোনো অন্ত্যমিল দেননি। কবিতাটি ভাবের দিক থেকে স্পষ্টই দু-ভাগে বিভক্ত, কবিতার আঙ্গিকেও এই বিভাগ দেখানো হয়েছে। কিন্তু ভাবগত ভাগ এতই পরস্পরবিরোধী যে সন্দেহ হয় এটি একই কবিতার দুটি অংশ কিনা।

কবিতার প্রথমভাগে মৃত্যুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন কবি। অতীতের অসম্পূর্ণতার কথা চিন্তা করে, যে রিক্ততা বা নিঃস্বতায় জীবন পূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি, তার কথা এই মৃত্যুর মহামহিম মুহূর্তে স্মরণ করার অর্থ জগৎলক্ষ্মীর অসম্মান। কারণ মৃত্যু মানে হচ্ছে মুক্তি, মৃত্যু মানে 'সহজে ফিরিয়া আসা সহজের মাঝে।' মৃত্যু এক ছেদ নয়, সে এক মহাপরিপূর্ণতা, এবং কবি বিদায়ের আসন্ন মুহূর্তে প্রকৃতিতে সেই পূর্ণতার ছবিই দেখতে পাচ্ছেন। যেসব বনস্পতি দেখতে পাচ্ছেন সামনে, ব্যগ্র শাখা ঊর্ধ্বে তুলে 'মহা অলক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়ে চলেছে, তার পল্লবে পল্লবে কম্পমান আনন্দ কবিও অনুভব করতে পারছেন। সেই পূর্ণতার আনন্দই পুষ্পে পুষ্পে, পাখিদের কলকাকলিতে মুখর। এতদিন জীবনে যত আবর্জনা কবি জমিয়ে তুলেছেন, এতদিন যত সফল বাণী তিনি রচনা করতে পেরেছেন — গৈরিক বসনের এক সন্ন্যাসী সব গ্রহণ করবার জন্য দ্যুলোক -ভূলোক জুড়ে এক কমণ্ডলু প্রসারিত করে দিয়েছে। কবি তা বুঝতে পারছেন এবং তাঁর বর নিজের অন্তরে পেয়েছেন বলেই অন্তর আজ পূর্ণ সেই অনুভবের আনন্দে। তাঁর বিদায়ের প্রাক্-মুহূর্তেও তাই তিনি পুলকিত এই প্রকৃতির আনন্দিত পূর্ণতার ছবিতে। দলে দলে আজ প্রজাপতি তার পাখা কাঁপিয়ে শেফালির কানে কানে নীরব আকাশবাণী শোনাচ্ছে, তার বীজন কবির শিরায় শিরায় তুলছে শিহরণ অর্থাৎ জীবনের ধন সব সমর্পণ করে কবি মৃত্যুর পূর্ণতার তারে মনপ্রাণ বেঁধে নিয়েছেন।

কবিতার পরবর্তী স্তবকেই কবির কণ্ঠে রীতিমতো হতাশা সুর। যে মৃত্যুকে তিনি এত মহান ভাবে দেখিয়েছেন, এখানে তাকেই বলছেন 'সর্বহর' অথাৎ সর্বস্ব হরণকারী, যাকে আলোকের উৎসব বলে এসেছেন বার বার, তাকে এখন বলছেন অন্ধকার এবং যার আনন্দিত আবির্ভাব তাঁকে পুলকিত করেছে, তাকে এখানে বলেছেন 'দস্যুবৃত্তি'। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবি আকুল মিনতি করে বলেছেন—

> 'পশ্চিমে যাবার মুখে
> বর্জন কোরো না মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মতো।'

এখন তিনি প্রার্থনা করেন 'দিনান্তের সর্বদানযজ্ঞে' সমস্ত আহুতি দেবার আগে যেন 'জীবনের শেষপাত্র' সে উজ্জ্বসিত করে দেয়। প্রবল অন্ধকারকে সম্বোধন করে কবি বলছেন 'চরম আলোর/অজস্র ঐশ্বর্যরাশি সমুজ্জ্বল সহস্ররশ্মির'— যেন দান করে যায় কবিকে।

৩.২.৬.১.৭ : ৭-সংখ্যক কবিতা —

৬-সংখ্যক কবিতার প্রতিক্রিয়াতেই যেন ৭-সংখ্যক কবিতাটি রচিত, অন্তত তার শেষাংশ কবিকে যে বিব্রত করেছে সে কথা আমরা বুঝতে পারি। এই দীর্ঘ কবিতাটিও মিলহীন মহাপয়ার। দৃশ্যত দুটি ভাগ আছে—প্রথম তিনটি পংক্তির বিভাগে আগেকার বক্তব্যকে ধিক্কার দিয়েছেন এবং পরবর্তী দীর্ঘ অংশে এতক্ষণ পর্যন্ত যে সুরে কথা বলেছেন, তার সম্পূর্ণ ভিন্নস্বরে গেয়েছেন জীবনের জয়গান। আসন্ন মৃত্যু নয়, সমস্ত জীবনই এখন তাঁর কাছে মূল্যবান।

প্রথম স্তবকে কবি বলেছেন, 'বিকারের রোগীর' মতো কীসব 'অকৃতজ্ঞতার বৈরাগ্যপ্রলাপ' তিনি বকে গিয়েছেন! অর্থাৎ ভিক্ষুকের মতো তাঁকে বর্জন না করার কথা, জীবনের শেষপাত্র উচ্ছলিত করে দেবার ভিক্ষা তাঁর অত্যন্ত অযৌক্তিক মনে হয়েছে। সেই জন্যেই কবিতার পরবর্তী দীর্ঘ স্তবকে তিনি বলেছেন, সমস্ত জীবনে যা তিনি পেয়েছেন তা তাঁর গৌরব, তাঁর ঐশ্বর্য —এই জীবনের দানেই তিনি পূর্ণ। এখন মৃত্যুর সম্মুখীন হতে তাঁর কোনো ভয় নেই, কারণ তিনি জেনেছেন জীবন আরো বড়ো। জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত তাঁর কাছে এখন বরণীয় মনে হচ্ছে। নিজের আনন্দ, নিজের দুঃখ সব তাঁর সম্পদ। আনন্দও যেমন উপভোগ করেছেন, দুঃখও উপভোগ করেছেন। বুকের রক্ত দিয়ে এঁকেছেন মানসী অনুভূতির ছবি কতদিন হয়ে গেল, তবু স্বপ্নের মতো নিজের হৃদয়ে তার সূক্ষ্মরেখ স্পর্শ এখনো অঙ্কিত আছে। মহাকালের বুক থেকে কবি কুড়িয়ে নিয়েছেন কত অব্যক্ত মাধুরী, মনে বাতাস তারা সুরভিত করে তুলেছে। একেবারে কৈশোরে সরস্বতীর যে বরমাল্য রচনা করেছেন, কবি জানেন তা সার্থক হয়নি, বাণীদেবীর কণ্ঠভূষণ

হয়ে উঠবার যোগ্যতা তা অর্জন করেনি। সেই অস্ফুট কলিকাও কিন্তু মূল্যহীন নয়। সমস্ত জীবন দিয়ে কবি রচনা করেছেন পুষ্প মুকুট। সেখানে অযাচিত প্রেমের অমৃতরস আছে, বহু সাধনাতেও সিদ্ধিলাভ হয়নি এমন ব্যর্থ প্রয়াস আছে। জীবনের প্রতি পর্বে বাহিত হয়ে এইভাবে অপরূপ অনির্বচনীয়কে তিনি বচনের অঙ্গীভূত করতে চেয়েছেন। কিছু পেরেছেন, কিছু পারেন নি। কিন্তু 'জীবনের ধন কিছুই যাবেনা ফেলা', কবি বলেন—

'আজি বিদায়ের বেলা
স্বীকার করিব তারে, সে আমার বিপুল বিস্ময়।'

তাই জীবনের দেবতার জয়গানই কবি গেয়েছেন এই কবিতায়, তাঁকে 'অস্তিত্বের সারথি' আখ্যা দিয়ে বলেছেন, জীবনের রণক্ষেত্র যেমন বহুবার তিনি কবিকে পার করিয়েছেন, মৃত্যুর সংগ্রামশেষে নতুন যাত্রায় নিয়ে যেতেও যেন তেমনি ভাবেই সাহায্য করেন তিনি তাঁকে।

৩.২.৬.১.৮ : ৮-সংখ্যক কবিতা —

৮-সংখ্যক ছোট এই কবিতা একই ছন্দরূপে অন্তমিল বর্জন করে লেখা এখানে কবির বক্তব্য একমুখী। এ জন্মে কবি তাঁর যে পরিচয় গড়ে তুলেছিলেন তিল তিল করে, এখন মৃত্যুর শাসনে তা সমস্তই অবলুপ্ত হতে চলেছে, তিনি বুঝতে পারছেন। রঙ্গমঞ্চে একে একে সব দীপ নিবে গেল যেমন সভাতল শান্ত হয়ে আসে, কবির চিত্তও যেন তেমনি নিঃশব্দের তর্জনী-সংকেতে শান্ত হয়ে এসেছে। একটা বিশেষ নাটকে অভিনয় করবার জন্য এক বিশেষ চরিত্রের রূপসজ্জা নিয়ে যেন তিনি সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিলেন, আজ এই মুহূর্তে যেন তা নিরর্থক মনে হচ্ছে। কবিকে ঘিরে এতদিন কত রকমের তকমা, কত রকমের মতবাদ, কতরকম ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল, আজ সমস্তই মুছে গেল। কবি মনে করেছেন তাঁর নিগূঢ় পূর্ণতার কাছেই তাঁর খণ্ডিত পরিচয় আত্মসমর্পণ করল। 'সূর্যাস্তের অন্তিম সৎকারে' বাধামুক্ত আকাশে তারাদীপ্ত আত্মপচিয় যেন ঘটেছে কবির।

৩.২.৬.১.৯ : ৯-সংখ্যক কবিতা —

প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের এই ৯-সংখ্যক কবিতাটি কবির আরোগ্যলাভের পরে লেখা। প্রায় আড়াই-তিন মাস পরে লেখা বলে কবির উপলব্ধি অনেক সংহত ও শান্ত ভঙ্গীমায় প্রকাশ পেয়েছে। কবিতার আঙ্গিক অবশ্য অভিন্ন আছে—অন্ত্যমিলবর্জিত মহাপয়ার।

কবি এই কবিতায় যেন এক নির্মোহ বস্তুবাদী দৃষ্টিতে নিজেকে দেখতে চেয়েছেন, যদিও শেষপর্যন্ত সেই দৃষ্টি বজায় থাকেনি, কবি তাঁর আত্মনিবেদনের ভঙ্গিতে ফিরে এসেছেন। কবি যেন দেখতে পাচ্ছেন, জীবনীশক্তির অপরাহ্ন বেলায় অবসন্ন চেতনা নিয়ে ভেসে চলেছেন তিনি কালিন্দীর স্রোতে। ভেসে চলেছে কবির এতদিনের অনুভূতিপুঞ্জ, এতদিনের বেদনা, আজন্মকালের স্মৃতির সঞ্চয়, আর তাঁর বাঁশি। বাঁশি কবির কাছে এক অতি পরিচয় প্রতীক, কারণ তাঁর গোপন কথা শুধু বাঁশি জানে, বাঁশিই জানে। কালিন্দীর স্রোত তার কালো জলে সব কিছু ঢেকে নিতে পারে। সেই স্রোতে ভাসতে ভাসতে কবি পেরিয়ে আসেন তাঁর পরিচিত ভূমি, তরুচ্ছায়া-অলিঙ্গিত লোকালয়। সন্ধ্যা-আরতির শব্দ এখন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর, ঘরে ঘরে দ্বার রুদ্ধ হয়ে এসেছে। নেমে আসে অন্ধকার, এক মহানিঃশব্দের কাছে কবির আত্মবলিদান সারা হয়। এক 'কৃষ্ণ অরূপতা' দেখা দেয় এবং অন্তহীন তামিস্রায় কবির দেহ বিন্দু হয়ে কোথায় মিলিয়ে যায়।

নিজের এই নিশ্চিহ্নতা কবি নিজেই প্রত্যক্ষ করেছেন, তাও তিনি মৃত্যুকে মহত্ত্বহীন বলতে পারেন নি। যে সূর্য তাঁর জীবনদীপ প্রজ্জ্বলিত করেছেন, এবার তাঁরই উদ্দেশে তিনি বলেছেন, তিনি তাঁর রশ্মি সংবরণ করে নিয়েছেন, এবার মৃত্যর অন্ধকারের মধ্যে যেন তিনি প্রকাশ করেন—তাঁর সেই কল্যাণময় রূপ যাতে প্রত্যক্ষ করা যায় সেই পুরুষকে, যিনি সূর্য এবং কবির সঙ্গে অভিন্ন, দুয়ের একাত্ম রূপ।

৩.২.৬.১.১০ : ১০-সংখ্যক কবিতা—

১০-সংখ্যক এই কবিতায় কবির বক্তব্য সামান্যই। জীবনের অন্য খেলায় কবি যখন মেতেছিলেন, অকস্মাৎ এসেছিল মৃত্যুদূত, প্রস্তুত ছিলেন না কবি, তাই মৃত্যুর মহিমাময় রূপ অনুভব করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তিনি সন্ত্রস্থ হয়েছেন, শঙ্কিত হয়েছেন। কিন্তু কবি কথা দিয়েছেন, এবার তিনি প্রস্তুত, মৃত্যুকে তার স্বমহিমাময় বরণ করে নেবার মতো মানসিকতা এখন তিনি অর্জন করেছেন।

এই প্রস্তুতি ছিলনা বলেই মৃত্যুকে পুরোপুরি অন্ধকারের আগ্রাসন বলে কবির মনে হয়েছিল। মৃত্যুর মধ্যেও যে আলোক সঞ্চিত আছে, অন্তরের অনুভূতি দিয়ে যা প্রত্যক্ষ হয়ে যায়, তা কবি বুঝতে পারেন নি। কারণ, কবির অহংবোধ তখন তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল। মৃত্যুর আলোকিত সত্তা বোঝাবার কোনো অবকাশই কবির ছিল না, কারণ আমি-ময় কবি তখন জীবনের রঙ্গভূমিতে চরম কবিত্বের শিরোপা নেবেন বলেই উন্মুক্ত ছিলেন। সেই জন্যই মৃত্যু তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তার সত্তায় নিয়ে যাবার মতো অবস্থায় কবি ছিলেন না। কিন্তু এখন কবি প্রস্তুত, তাই তিনি বলেছেন—

'চরিতার্থ হবে শেষে
জীবনের শেষ মূল্য, শেষ যাত্রা, শেষ নিমন্ত্রণ।'

৩.২.৬.১.১১ : ১১-সংখ্যক কবিতা —

১১-সংখ্যক কবিতাও কবি নিজের জীবননাট্যের কলমুখর পর্ব এবার শেষ করে শান্ত মনে পরমশান্তের ধ্যান করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। তিনি বলেছেন, জনতার চাটুবাক্যে প্রলুব্ধ হয়ে সারাজীবন নানাভাবে তো জনতাদেবীর পূজা করেছেন, তাই খ্যাতির প্রাঙ্গণে তাঁর আসনও হয়ে গিয়েছিল পাকা। কিন্তু বচনের অর্ঘ্য রচনা করে সেই খ্যাতি অর্জন তো অনেক হল, এবার তো জীবননাট্য শেষ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। প্রস্তুত যে হতেই হবে, তার ইশারা কবি পেয়ে গিয়েছেন। ভৈরবের স্পর্শ তিনি পেয়েছেন, অন্তরের অন্দরমহলে এখন তিনি অনুভব করেন সে আর-এক ঐশ্বর্যের জগৎ। সেই জগতের ইশারায় সাড়া দেবার জন্য কবি এখন প্রস্তুত। এ জীবনে যত বিচ্ছিন্ন ভাবনা এসেছিল, স্রোতের শ্যাওলার মতো যারা চেতনার হাওয়ায় ঘুরে বেড়িয়েছে, কবি যাদের রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন, তাদের কথা যদি লোকে ভুলেই যায়, তাতেই বা ক্ষতি কী! এ জন্যেও কবি প্রস্তুত, তাই তিনি বলেছেন—

'অনামিক স্মৃতিচিহ্ন তারা
খ্যাতিশূন্য অগোচরে রবে যে অস্পষ্ট বিস্মৃতি।'

৩.২.৬.১.১২ :১২-সংখ্যক কবিতা —

প্রান্তিক কাব্যের একটি অসাধারণ কবিতা এই ১২-সংখ্যক মহাপয়ার। বক্তব্য হয়ত এর আগের কবিতাগুলিতেও কিছু কিছু আভাসিত হয়েছে, কিন্তু এত সহজ সরল অথচ গভীরভাবে, এমন নিবিড় স্পষ্টতার তাঁর মনোভাব সম্ভবত আগে প্রকাশ পায়নি। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, এবার শেষের অবগাহন সাঙ্গ করতে বলছেন কবি মনকে। সারাজীবন কাব্যসাধনায় মূল্য পেয়েছেন অনেক, কিন্তু সে মূল্য বুকে আঁকড়ে ধরে রাখতে বারণ করেছেন নিজেকে, কারণ সে বাইরে থেকে দেওয়া দান, অন্তরে তাকে টেনে নিতে গেলে বিপত্তি ঘটে। বাইরের মূল্য যে স্বর্ণমুদ্রায় দেওয়া হয়, বার বার ব্যবহারে তার ক্ষয় হয়, শেষে সোনার কলঙ্করেখাই সম্বল হয়। স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ থেকে, উপলব্ধি থেকে যা লিখেছেন এতদিন, তা বনের ফলের মতোই মাটিতে পড়ুক এবং মাটিতে মিশে যাক — এর বেশি তাকে নিয়ে ভাববার আর দরকার নেই।

একথা আজ স্পষ্ট যে কুসুমের মাস শেষ হয়ে গিয়েছে, ফুল ফোটাবার সময় আর এখন নেই কবির; কিন্তু সেই সঙ্গে যেন শেষ হয়ে যায় লোকের মুখে চাটুকারিতা শোনা আর তাই শুনে মনে মনে আন্দোলিত হওয়ার বাসনা। যা এতদিন দান করা হয়েছে তার জন্য এখনো পুরস্কারের প্রত্যাশা যেন না থাকে। কিন্তু সত্য অনুভব হৃদয়ে ছিল, তা কবি প্রকাশ করেছেন সারা জীবন ধরে। এখন প্রত্যেকটি কাজের মূল্য আশা করলে সেই সত্য অনুভবেরই অপমান ঘটবে। সব কিছুই ত্যাগ করতে হয়, আর শেষ ত্যাগ হবে শংসা কুড়োবার সেই ভিক্ষাঝুলি। এখন আর নতুন করে সম্মানের প্রত্যাশা করতে কবি বারণ করেছেন নিজেকেই, এখন অপেক্ষা করতে হবে এক নবজীবনের, কবি মনে করেন নবপ্রভাবের অরুণজ্যোতির তিলক নিয়ে তা অপেক্ষা করে আছে।

৩.২.৬.১.১৩ : ১৩-সংখ্যক কবিতা—

স্বল্পায়তন ১৩-সংখ্যক কবিতায় কবি একটি নতুন কথা বলেছেন। নতুন অর্থ তিনি কখনো এমন কথা বলেননি, এমন নয়; প্রান্তিক কাব্যে এ কথা কবির মুখে আমরা প্রথমে শুনলাম। কবি বলছেন, তিনি অনন্ত কালের এক যাত্রী। এবারের

যাত্রালগ্নের শুরুতেই এক পরম আশীর্বাদ তিনি পেয়েছিলেন সূর্যসনাথ এই পৃথিবীতে রূপের জগতের সঙ্গে তাঁর গাঁটছড়া বাধা হয়ে গিয়েছিল। ভূলোকের কবি হয়েও দূর আকাশের ছায়াপথের আলোকে তিনি ধরণীর শ্যামল ললাটে চুম্বন করতে দেখেছেন, ভূলোক-দ্যুলোক এক সঙ্গে বাঁধা পড়েছিল তাঁর কবিতায়। জন্মের সেই পূণ্য মুহূর্তকে সম্মানিত করেছিল 'মহাকালযাত্রী মহাবাণী', কিন্তু যাত্রা তো কবির শেষ হয়নি—সামনে এখন যাত্রাপথ অনন্ত এবং এ এক অদ্ভূত যাত্রা, এক মহাবিস্ময়, যে সেখানে কবির সঙ্গে কেউ নেই, সেখানে তিনি একাই যাত্রী।

৩.২.৬.১.১৪ : ১৪-সংখ্যক কবিতা—

সম্ভবত এই ১৪-সংখ্যক কবিতা প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ কবিতা। এই কবিতায় কবি অন্ত্যমিল ব্যবহার করেছেন। মহাপয়ার রীতিতে লেখা এই সনেট এমন শান্ত স্নিগ্ধ একটি প্রণতি কবির জীবনদেবতার প্রতি এই প্রণামের গাঢ়ত্ব আমাদের মুগ্ধ করে। সংস্কৃত আলংকারিকরা যে শান্তরসের কথা বলেছেন, এই কবিতার সিদ্ধিও সেই শান্তরস।

কবি বুঝেছেন এবার তাঁর বিদায় নেবার সময় হয়েছে। মন অশান্ত থাকলে দু-ভাবে এর প্রকাশ হতে পারে—মর্ত্যজীবনের প্রতি প্রবল প্রীতিতে কবির মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতে পারে, অথবা মৃত্যুর মহিমাময় রূপ কল্পনা করে তাতে নিজেকে মিলিয়ে দেবার আধ্যাত্মিক বিহ্বলতা থাকতে পারে। এই দুটি ব্যাপারই তাঁর কবিতায় আমরা লক্ষ করেছি। কিন্তু ওয়র্ডসওয়ার্থ যে emotions recollected in tranquility -র কথা বলেছেন, এখানে সেই tranquil বা পরম প্রশান্ত চিত্তটিকে আমরা আবিষ্কার করি। এখানে মর্ত্য-জীবনের প্রতি পরম প্রীতিই আছে, কিন্তু বিহ্বলতা নেই; যেতে হবেই এ কথা কবি জানেন,তার জন্য অনুরাগ বা বীতরাগ কোনোটাই নেই।

কবি শুরুই করেছেন এই বলে, 'যাবার সময় হল বিহঙ্গের।' তিনি ভবিষ্যতের ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন স্পষ্ট এবং ওই বিহঙ্গের রূপকেই তা বলেছেন—পাখির বাসা হবে শূন্য, যত হাসিগান সেখানে ছিল, ধূলায় পড়ে অরণ্যের আন্দোলনে মিশে যাবে। ঝরে পড়া শুকনো পাতা আর ফুলের সঙ্গেই কবি উড়ে চলে যাবেন অস্তসিন্ধুপারে। যাবেন তো নিশ্চয়ই, কিন্তু এই জীবনের মধুর ও বেদনার মুহূর্তগুলি কি তিনি ভুলতে পারেন! এই বসুন্ধরার এত দিনের নিবিড় আতিথ্য কি ভোলা যায়। কখনো আম্রমুকুলের গন্ধে ফাল্গুনের বাতাস বিভোর করেছে তাঁকে, কখনো অশোকের মঞ্জরী তাঁরই কাছে চেয়েছে প্রীতিরসের স্পর্শ, কবি তাও দিয়েছেন। বেদনাও সহ্য করতে হয়েছে অনেক, বাস্তব পৃথিবীতে বাস করতে গেলে তা মেনে নিতেই হবে। এই সব নিয়েই প্রাণের সম্মানে কবি ধন্য। তাই এপারের যাত্রা যে মুহূর্তে সত্যিই থেমে যাবে, পেছন ফিরে শুধু একটা নম্র নমস্কার জানিয়ে যাবেন তিনি, বলেছেন, 'বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধিদেবতারে।'

৩.২.৬.১.১৫ : ১৫-সংখ্যক কবিতা—

প্রান্তিকের এই ১৫-সংখ্যক কবিতা বেশ কয়েক বছর আগের লেখা। অন্ত্যমিলযুক্ত মহাপয়ার রূপকৃতিতে রচিত এই কবিতায় কিন্তু মৃত্যুকে রোমান্টিক দৃষ্টিতেই দেখা হয়েছে। প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের কবিতা হিসাবে এর অন্তর্ভুক্তির কারণ দুটি—প্রথমত এটি মৃত্যুচিন্তা প্রকাশক কবিতা, দ্বিতীয়ত কবি নিজেকে এই স্থান কাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, নিজের অস্তিত্বকেও নিজের পর্যবেক্ষণের বিষয় হিসাবে দেখতে চেয়েছেন।

কবি প্রথমেই ঘনমেঘে ঢাকা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার বর্ণনা দিয়ে কবিতা শুরু করেছেন, বলেছেন সূর্যের দ্বারা রুদ্ধ করেছিল দৈত্যের মতো পুঞ্জ মেঘভার। যে সময় আলোক-উদ্ভাস দেখার কথা সে সময় এই ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশ দেশে, আলোকের এই ম্লান অসম্মান দেখে সমস্ত দিগন্ত ছিল অশ্রুবাষ্পে আকুল। নীচে গাছের একটি পাতাও যে কাঁপেনা, সে যেন প্রকৃতির স্তব্ধ আঁখির পাতা।

অকস্মাৎ কী যে একটা হয়ে যায় কবি বুঝতে পারেন না, কোথায় যেন বেজে ওঠে জয়শঙ্খ এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গগনপ্রাঙ্গণে হেসে ওঠে শরৎ। মেঘজাল ছিন্ন করে জ্যোতিষ্কণা বিচ্ছুরিত হয় চতুর্দিকে। যেন মনে হয় এ পুরনো পৃথিবী নয়, এক নবীন পৃথিবীর জন্ম হল যেন এই মাত্র। নিজেকেও কবি এই পৃথিবীতে নবীন আগন্তুক হিসাবেই ভাবেন। ভাবীকালের এক তীর্থযাত্রী যেন তিনি, কালের স্রোতে এসে পড়েছেন এখানে। এ এক আশ্চর্য দেখা —

'আপনারে দেখি আমি আপন বাহিরে, যেন
অপর যুগের কোনো অজানিত'।

অদ্ভুতভাবে কবির মনে হয় সর্বদেহ মন থেকে এতদিনের অভ্যাসের জাল যেন ছিঁড়ে গিয়েছে। এসেছে এক ছুটির দিন, মুক্তির দিন এবং এই মুক্তির চাবিকাঠি ছিল মৃত্যুর হাতে—সে-ই কবির পুরনো জন্মের জীর্ণ উত্তরীয় উড়িয়ে দিয়ে গেছে। এতদিনে যেন পাওয়া গেল অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্য। কবি এই মৃত্যুবাহিত নতুন জন্মে সংসার যাত্রার প্রান্তে এসে নিজের বুকের মধ্যে পথিকচিত্তের মুক্তিমন্ত্র শুনতে পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠেছেন। মৃত্যুকে তিনি বাসাংসি জীর্ণাণির মন্ত্রেই দেখতে পেয়েছেন এখানে।

৩.২.৬.১.১৬ : ১৬-সংখ্যক কবিতা—

প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের শেষ দুটি কবিতায় যে ভিন্ন সুর বেজেছে তার আলোচনা আমরা স্বতন্ত্রভাবেই করবো, কিন্তু তার আভাস যেন কয়েকবৎসর আগে এই ১৬-সংখ্যক পথিক, সেই পথিক হিসাবে ইতিহাসের শিক্ষার কথাই কবি এখানে বলেছেন। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কত পুরাণপ্রসিদ্ধ জাতি লুপ্ত হয়ে গেছে, কত বিরাট বিরাট কীর্তি ধূলিসাৎ হয়েছে, গর্বোদ্ধত জাতির প্রতাপ অপমানে একশেষ হয়েছে। একদা যারা বিজয়োল্লাসে সকলকে পদানত করে রাখতো তাদের স্থান হয়েছে পথের ধূলায়, ভিখারিদের সঙ্গে একসঙ্গে। পথের প্রকৃতিই হচ্ছে এই যে, কোনো পদচিহ্নই সে ধরে রাখেনা। আজ যার পদচিহ্ন বড়ো স্পষ্ট মনে হয়, কালই তার পদচিহ্ন মিলিয়ে যায়। সব কিছুই অনিত্য, মহাতরীও সমুদ্রে ডুবে যায়, মানুষ তার সমস্ত ক্ষুধা-তৃষ্ণা কামনা-বাসনা ও ভালোবাসা নিয়ে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে—তবু কেন কবি জানেন না, 'অসীমের হৃৎস্পন্দন তরঙ্গিছে মোর দুঃখে সুখে।'

৩.২.৬.১.১৭ : ১৭-সংখ্যক কবিতা—

প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতাদুটি লেখা হয়েছিল একই দিনে—২৫ ডিসেম্বর অর্থাৎ বড়োদিনে। দুটি কবিতাতেই কবি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দিয়েছেন। প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের মূল সুরের সঙ্গে এর অমিল আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু যাবার দিনে সত্য কথা বলার সৎসাহস কবি অর্জন করেছেন, দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন—এইভাবে বিচার করলে এই সুর মূল সুরের পরিপূরকই বলতে হবে।

এতদিনে কবির চৈতন্য হয়েছে, একথা কবি বলেছেন। এক দুঃসহ অনুভূতি তাঁকে ব্যথিত করেছে, তাঁর মনে হয়েছে পৃথিবী এখন 'কোন নরকাগ্নিগিরি গহ্বর' হয়ে উঠেছে। দিকে দিকে মানুষের অপমান ঘটছে, তাদের অমঙ্গলধ্বনিই শোনা যাচ্ছে সর্বত্র এবং তাতে কালিমালিপ্ত হচ্ছে পৃথিবীর বায়ু। যুদ্ধ লিপ্সু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির রণহুঙ্কারকে তার মনে হয়েছে 'আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা', 'বিকৃতির কদর্য রূপ'। একদিকে যখন আকশচুম্বী স্পর্ধা, ক্রূরতার বিষাক্ত ছোবল, বলদর্পী রণহুঙ্কার, অন্যদিকে বিপন্নকে আশ্বাস দেবার কদর্য ছলনা। রাষ্ট্রনায়করা ঠোঁটে ঠোঁট চেপে একে অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র শানিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধলিপ্সু জাতির আর্থিক সম্পদে পুষ্ট সাময়িক বাহিনী যথেছ্ আচরণ করছে, তাদের বোমারু বিমান নরমাংসলোলুপ শকুনিকেও লজ্জা দিয়ে আরো প্রবল প্রতাপে মানুষের সংহারযজ্ঞে নেমে পড়েছে।

কবি বিধাতার কাছে শক্তি চেয়েছেন, কণ্ঠে তিনি যেন কবিকে দেন বজ্রবাণী, যাতে এইসব শিশুঘাতী, নারীঘাতী শক্তির বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ ঘোষণা করতে পারেন। কবি এ ভবিষ্যৎবাণী করেছেনে যে নিজেদের ভস্মীভূত চিতার আগুনই হবে তাদের শেষ পরিণতি।

৩.২.৬.১.১৮ : ১৮-সংখ্যক কবিতা—

প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের অতিক্ষুদ্র এই শেষ এবং ১৮-সংখ্যক কবিতাটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মন্ত্রে পরিণত হয়েছে এখন। দানশক্তির সঙ্গে সংগ্রামের জন্য যারা ঘরে ঘরে প্রস্তুত হচ্ছেন, কবি বলিষ্ঠ কণ্ঠে তাঁদের আহ্বান জানিয়েছেন। আগের কবিতায় এই শক্তি তিনি বিধাতার কাছে প্রার্থনা করেছেন, এই কবিতায় সেই শক্তির পরিচয় তিনি দিয়েছেন।

৩.২.৬.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি —

১। 'প্রান্তিক' কাব্যের কবিতাগুলির মধ্যে সুরের ঐক্য আছে কিনা বিচার করো।

২। 'প্রান্তিক' কাব্যের শেষ দুটি কবিতায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে কবির যে বিদ্রোহ ধ্বনিত হয়েছে তা বিশদ করো।

৩। 'প্রান্তিক' কাব্যের ৭-সংখ্যক কবিতার সূচনায় কবি বলেছেন — 'এ কী অকৃতজ্ঞতার বৈরাগ্য প্রলাপ ক্ষণে ক্ষণে,' — কী অকৃতজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাকে অকৃতজ্ঞ কেন বলা হয়েছে বুঝিয়ে দাও।

৪। কবিতা হিসাবে 'প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থে কোনটি শ্রেষ্ঠ বলে তোমার মনে হয়, রসগ্রাহী আলোচনায় তা বুঝিয়ে দাও।

৩.২.৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। রবীন্দ্র রচনাবলী — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২। আনন্দ সর্বকাজে — অমিতা সেন

৩। রবীন্দ কাব্য প্রবাহ — প্রমথনাথ বিশী

৪। রবীন্দ্র জীবনী — প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

একক-৭

প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের মৃত্যুচেতনা

বিন্যাস ক্রম

৩.২.৭.১ : প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের মৃত্যুচেতনা
৩.২.৭.২ : আদর্শ গ্রন্থাবলি
৩.২.৭.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩.২.৭.১ : প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের মৃত্যুচেতনা —

প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে দেখেছেন দুরকম ভাবে, অথবা আরো ভালো ভাবে বলতে গেলে তিন রকমভাবে — এক রোমান্টিক দৃষ্টিতে তাকে মহিমাময় করে, অজ্ঞাতপরিচয় বিচ্ছেদকে সহ্য করে নেওয়ার জন্য কিছু মহিমময় করে, এবং অতি প্রশান্তভাবে মৃত্যুকে এক স্বাভাবিক ও অনিবার্য পরিণতি হিসাবে স্বীকার করে।

রোম্যান্টিক দৃষ্টির পরিচয় পাই কবির ১, ৫, ৯ ও ১৫ -সংখ্যক কবিতায়। ১-সংখ্যক কবিতায় কবি মৃত্যুকে জীবনের চেয়ে বড়ো আসন দিয়েছেন, বলেছেন—

'বন্ধমুক্ত আপনারে লভিলাম
সুদূর অন্তরাকাশে, ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে'
অলোক আলোকতীর্থ সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে।'

৫-সংখ্যক কবিতায় অকৃতার্থ অতীত এবং অতৃপ্ত তৃষ্ণার হাত থেকে মুক্তি পাবেন বলে কবি মৃত্যুকে বরণ করে নিতে উন্মুখ — 'বাঁশিতে বেজেছে ধ্বনি, আমি তারি হব অনুগামী।' বরং জীবনের যেসব প্রতিবন্ধকতা তাঁকে সেখানে যেতে বাধা দিচ্ছে তাদের প্রতিই তার অসন্তোষ। সে অসন্তোষ ধরা পড়েছে এই ধরনের পংক্তিতে —

'পশ্চাতের সহচর, ছিন্ন করো স্বপ্নের বন্ধন;
রেখেছ হরণ করি মরণের অধিকার হতে
বেদনার ধন যত, কামনার রঙিন ব্যর্থতা,
মৃত্যুরে ফিরায়ে দাও।'

৯-সংখ্যক কবিতায় এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার যে বেদনা, অস্পষ্টভাবে তার আভাস পাওয়া গেলেও মৃত্যুকে আরো মহিমময় দৃষ্টিতেই কবি দেখেছেন, তাই আলোকের দেবতা সূর্যকে সম্বোধন করে কবি বলেছেন—

'হে পূষন্, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।

১৫-সংখ্যক কবিতায় কবি মৃত্যুকে সূর্যের সমমর্যাদা দান করেছেন। মৃত্যু যখন নিজেকে প্রকাশ করেনি, দৈত্যের মতো পুঞ্জিত মেঘ যেন 'ছায়ার প্রহরীব্যূহে' সূর্যকে ঘিরে রেখেছিল। কিন্তু মৃত্যুর আবির্ভাব যেই ঘটেছে, বেজে উঠেছে জয়শঙ্খ, চরাচরে আনন্দের উচ্ছ্বসিত শিহরণ জেগেছে। কবি নিজেও তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বলে উঠেছেন—

'আদি মুক্তিমন্ত্র গায়
আমার বক্ষের মাঝে দূরের পথিকচিত্ত মম,
সংসারযাত্রার প্রান্তে সহমরণের বধূসম।'

আর-এক ধরনের কবিতাতেও মৃত্যুবন্দনা আছে, কিন্তু সেখানে কবির বিচ্ছেদের যন্ত্রণা একেবারে প্রচ্ছন্ন নয়। বোঝা যায়,কবি এই অনিবার্য বিচ্ছেদকে মানিয়ে নেবার জন্য একধরনের সান্ত্বনা খুঁজছেন যা বাস্তব অভিজ্ঞতার সূত্রে তাঁর কাছে আসেনি, এসেছে

ভাববাদী কল্পনায়। যেমন ২-সংখ্যক কবিতাতেও মৃত্যুর 'অমর্ত্য প্রভাতে'-র কথা আছে, অরুণকিরণের বন্দনা আছে, তবু যখন কবি বলেন—

'ওরে ভিক্ষু, তোর আজন্মকালের ভিক্ষাঝুলি
চরিতার্থ হোক আজি, মরণের প্রসাদবহ্নিতে'—

আমরা দেখি কোথাও একটা ব্যথার কাঁটা ছিন্ন বুকে বিদ্ধ হয়ে আছে।

৩-সংখ্যক কবিতায় কবি যে নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, তা আরো স্পষ্ট। যে বাস্তব পৃথিবী তাঁকে সাধুবাদ দিয়েছে, প্রশংসায় ভরিয়ে তুলেছে, প্রচুর সংবর্ধনা দিয়েছে, সেই পৃথিবীর জনতার চেয়ে মৃত্যুর একাকীত্বকে তিনি অনেক মহীয়ান বলে ঘোষণা করেছেন—

'জানিলাম একাকীর নাই ভয়
ভয় জনতার মাঝে; একাকীর কোনো লজ্জা নাই,
লজ্জা শুধু যেথা-সেথা যার-তার চক্ষুর ইঙ্গিতে।'

৪-সংখ্যক কবিতাতেও মৃত্যুকে অনেক উঁচু স্থানে বসাবার চেষ্টা আছে, কারণ এ সংসারে খ্যাতি অর্জন করতে নিয়ে 'সহস্রের পরীক্ষাচিহ্নিত তালিকায়' নাম ওঠাতে হয়েছে, অনেক বেচাকেনা করতে হয়েছে, 'পরের মুখের মূল্যে' নিজেকে মূল্যবান করে তুলতে হয়েছে। এর ফলে একেবারে জন্মের প্রথম শুভক্ষণে প্রকাশের যে আনন্দ কবির ছিল, আজ তা ধূলিমগ্ন, 'নিদ্রাহারা রুগ্ন বুভুক্ষার/ দীপধূমে কলঙ্কিত।' তারপরই সেই পরমের সঙ্গে হবে কবির মিলন, কারণ সেই প্রথম প্রকাশের আনন্দকে

'ফিরে নিয়ে চলিয়াছি
মৃত্যুস্নান তীর্থতটে সেই আদিনির্ঝরতলায়।'

মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের গান—

'তোমার ওই ঝর্ণাতলার নির্জনে
মাটির এই কলস আমায় ভাসিয়ে দিলাম কোনখানে।'

সংসারের পণ্যশালায় নিজের পরিচয় তুলে ধরতে কবিকে যে 'নানা চিহ্নে নানা বর্ণপ্রসাধনে সহস্রের কাছে' সহস্র রকম করে তুলে ধরতে হয়েছিল, ৮-সংখ্যক কবিতাতেও তা বলেছেন। এখন মৃত্যুর মধ্যে তিনি খুঁজে পাবেন 'আপনাতে আপনার নিগূঢ় পর্ণতা।

এই পূর্ণতার সান্ত্বনা ১০-সংখ্যক কবিতাতেও আছে এবং কবির আনন্দের আতিশয্য দেখেই মনে হয় কবি নিজেকে ভোলাবার চেষ্টা করেছেন—

'কবির বাণী পরিপক্ক ফলের মতন
নিঃশব্দে পড়িবে খসি আনন্দের পূর্ণতার ভারে
অনন্তের অর্ঘ্যডালি'-পরে। চরিতার্থ হবে শেষে
জীবনের শেষ মূল্য, শেষ যাত্রা, শেষ নিমন্ত্রণ।'

কয়েকটি কবিতায় আছে শান্তভাবে মৃত্যুর আসন্ন রূপকে ধ্যান করার চেষ্টা। এই সমাহিত দৃষ্টির সঙ্গে মৃত্যু সম্বন্ধে রোমান্টিক ভাবালুতার তফাৎ কোথায়, সেটা ধরা পড়বে যদি প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের ললাট-টীকা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের পংক্তি তিনটি স্মরণ করি। পূরবী কাব্যগ্রন্থের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

'অস্ত সিন্ধুকূলে এসে রবি
পূরব দিগন্তপানে
পাঠাইল অন্তিম পূরবী।'

এই সমাহিত ভঙ্গি খুঁজে পাই আমরা ৬-সংখ্যক কবিতায়। কবির অনিঃশেষ তপস্যা, প্রাণরসে উচ্ছ্বসিত সারস্বত সাধনা আজ সব গ্রহণ করার জন্য দ্যুলোকে ভুলোকে মৃত্যু তার কমণ্ডলু বাড়িয়ে দিয়েছে। তাকে সব দিতে হবে কবি জানেন, তার জন্য কবির

দুঃখ নেই, কারণ দিতে হয় এটাই নিয়ম, তিনি তা বোঝেন। সত্যই বোঝেন যে, গানেও সে কথা কবি আগে বলেছেন—

'আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি,
আমার যত বিত্ত প্রভু, আমার যত বাণী।'

১১-সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন, কলরবমুখর খ্যাতির প্রাঙ্গণ থেকে এবার উঠে আসার সময় হয়েছে। অন্তরে গভীরে শুনতে পেয়েছেন কবি ভৈরবের আহ্বান। কবি তাকেও বরণ করে নেবেন; তবে এমন আশা করেন না মৃত্যু তাঁকে অমর করে রেখে দেবে। অনামিক স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাকবে কবির কীর্তি — 'খ্যাতিশূন্য অগোচরে রবে যেন অস্পষ্ট বিস্মৃতি।'

আরো স্পষ্ট করে এ কথা বলেছেন ১২-সংখ্যক কবিতায়। সেখানে কবির বক্তব্য, এবার শেষের আবগাহন সাঙ্গ' করতে হবে। সংসারকে অনেক দিয়েছি, সংসার চিরদিন আমাকে মনে রাখবে, এ রকম প্রত্যাশা ত্যাগ করতে হবে এই মুহূর্তে। কারণ যে মানুষ সত্যিই ধনী, সে তার অন্তরেই ধনী, বাইরের পৃথিবী তাকে কী মূল্য দিল তাই দিয়ে তার প্রকৃত মূল্য যাচাই হয় না। বাইরের খ্যাতি এবং মূল্য যত দিন যায় তত কমে আসে। কবি নিজেকে বলেন, তোমার অন্তরের সম্পদ খুশি হয়ে যা প্রকাশ করেছে, বনের ফুল ও ফলের মতো বনেই ঝরে যাক তা,—

'জীবনে যা-কিছু তব সত্য ছিল দান
মূল্য চেয়ে অপমান করিয়ো না তারে';

এরপর মৃত্যু এসে হাত বাড়ালে জীবনের সেই সামান্য সঞ্চয় তুলে দিতে হবে তার হাতে— 'এ জনমে শেষ ত্যাগ হোক তব ভিক্ষাঝুলি'। এই রকম শান্ত সমাহিত অথচ গভীর অনুভবের কবিতাই এ কাব্যগ্রন্থের সম্পদ।

৩.২.৭.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি—

১। 'প্রান্তিক' কাব্যে মৃত্যুকে আসন্ন দেখে কবির মনে তাৎক্ষণিক যে প্রতিক্রিয়া ঘটেছে তার পরিচয় দাও।

২। 'প্রান্তিক' কাব্যের মৃত্যুচেতনা সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩.২.৭.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি—

১। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা — নীহার রঞ্জন রায়

২। এসেছে রবির কর — হীরেন চট্টোপাধ্যায়

৩। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কবিতা — ধীরানন্দ ঠাকুর

একক-৮

প্রান্তিক কাব্যে কবির জীবনতৃষ্ণা

বিন্যাস ক্রম

৩.২.৮.১ : প্রান্তিক কাব্যের জীবনতৃষ্ণা
৩.২.৮.২ : প্রান্তিক কাব্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতি বিষোদ্‌গার
৩.২.৮.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি
৩.২.৮.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩.২.৮.১ : কবির জীবনতৃষ্ণা

প্রান্তিক কাব্য রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচেতনার জন্য বিশিষ্ট হলেও কয়েকটি কবিতায় জীবনরসের রসিক কবির জীবনতৃষ্ণার যে গভীর স্পর্শ পাই তাও আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। এই রূপে রসে গন্ধে ভরা পৃথিবীকে কবি কী চোখে দেখেছেন, কত ভালোবেসেছেন এবং কীভাবে তাঁর ভালোলাগার ডালি সাজিয়ে তুলেছেন সে তো আমরা অনেকেই জানি। সুতরাং মৃত্যুর আশঙ্কা যখন চরম সত্য হয়েই দেখা দেয় তখন আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় সেই ভালোবাসার ধন তাঁর অন্তরে যে অদৃশ্য প্রীতির সূত্রে কীভাবে বাঁধা পড়তে চাইবে, তা অনুমান করা যায়।

৭-সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন, জীবনে তিনি অনেক আনন্দ পেয়েছেন, দুঃখও পেয়েছেন অনেক। অনেক মানসীর ছবি এঁকেছেন বুকের রক্তে, দুঃখনাগিনীকে ব্যথার বাঁশির সুরে খেলিয়েছেন। তারা হয়তো অনেক দূরের স্মৃতি, কিন্তু হৃদয়ের চিত্রশালায় আজও অমলিন। আসলে একটু-একটু করে সমস্ত জীবন দিয়ে রচনা করেছেন একটি পুষ্পমালিকা। যা পেয়েছেন যা পাননি, সমস্তই তাঁর জীবনের সম্পদ। কবি মৃত্যুক মহীয়ান না করে জীবনের সেই মাধুরীকে স্মরণ করেই বলেছেন :

> ‘আজি বিদায়ের বেলা
> স্বীকার করিব তারে, সে আমার বিপুল বিস্ময়।
> গাব আমি, হে জীবন, অস্তিত্বের সারথি আমার’,

যা-গাইবেন তা জীবনেরই গান, মৃত্যুর নয়। কবির এই কথায় আমরা তাঁর পুরনো বাণীই শুনতে পাই— ‘জীবনের ধন কিছুই যায়না ফেলা।’ অথবা তাঁর সেই কবিতা—

> ‘যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই,
> যা দেখেছি যা পেয়েছি, তুলনা তাই নাই।’

গানে কবি বলেছিলেন ‘জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে/বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে’। ১৩-সংখ্যক কবিতাতেও শুনি সেই কথা। তার সঙ্গে দেখা করার জন্য একা যেতে হয় :

> ‘তোমার সন্মুখদিকে
> আত্মার যাত্রার পন্থ গেছে চলি অনন্তের পানে,
> সেথা তুমি একা যাত্রী, অফুরন্ত এ মহাবিস্ময়।’

গানে এ কথাও আছে— ‘যে পথে যেতে হবে, সে পথে তুমি একা।’

১৪-সংখ্যক কবিতায় জীবনের জয়গানে কবি মুখর :

> ‘কত কাল এই বসুন্ধরা
> আতিথ্য দিয়েছে ; ....
> সব দিয়ে ধন্য আমি
> প্রাণের সন্মানে।’

সেই জন্যই মৃত্যুকে বন্দনা কবি করেননি এ কবিতায় এবং অন্য কাউকে নমস্কার করার কথাই স্পষ্ট করে বলেছেন—

‘এপারের ক্লান্ত যাত্রা গেলে কবি,
ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর নম্র নমস্কারে
বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধিদেবতারে।’

৩.২.৮.২ : সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতি বিষোদ্‌গার

‘প্রান্তিক’ কাব্যগ্রন্থ কবির মারাত্মক অসুস্থতা এবং ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভের সময় লেখা বলেই মৃত্যুচেতনা এবং সারাজীবনের হিসাব নিকাশের একটা ব্যাপার তার মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থের শেষ তিনটি কবিতাকে কিছুটা অভিনবই বলা যায়। তার মধ্যে ১৬-সংখ্যক কবিতায় অবশ্য কবির আগ্রাসন এত স্পষ্ট নয়, কিন্তু ১৭-সংখ্যক ও ১৮-সংখ্যক কবিতায় যে ভাষায় তিনি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেছেন তাতে একটু বিস্মিতই হতে হয়।

কারণ পরে অনুমান করা যাবে, আপাতত একটুকু মনে করা যাক যে জীবনের প্রথম প্রহরে, এবং শেষ প্রহরেও, এ জাতীয় কবিতা রবীন্দ্রনাথ একেবারে লেখেননি এমন নয়। একবার একথা বলেছিলেন ‘প্রশ্ন’ কবিতায়—

‘যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিবাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছে? তুমি কি বেসেছ ভালো?’

একেবারে শেষ পর্বের কবিতাতেও এই ধরনের প্রতিবাদ বা দিনবদলের পালার ঈঙ্গিত পাওয়া যায়। ‘জন্মদিনে’ কাব্য গ্রন্থের ১৬-সংখ্যক কবিতায় বলেছেন :

‘দামামা ঐ বাজে,
দিন বদলের পালা এল
ঝোড়ো যুগের মাঝে।’

২২-সংখ্যক কবিতাতেও বলেছেন :

‘আসিবে বিধির কাছে হিসাব চুকিয়ে—দেওয়া দিন।
অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের চূর্ণীভূত পতনের কালে
দরিদ্রের জীর্ণ দশা বাসা তার বাঁধিবে কঙ্কালে।’

‘শেষলেখা’ কাব্যগ্রন্থে লিখেছেন ‘ঐ মহামানব আসে’ — সেকি দিনবদলের পালাকে মনে করেই, কে জানে! ১৪-সংখ্যক কবিতায় এ কথাও বলেছেন —

‘দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে;
একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু
কষ্টের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট ভঙ্গি যত—
অন্ধকারে ছলনায় ভূমিকা তাহার।’

‘প্রান্তিক’ কাব্যগ্রন্থের ১৬-সংখ্যক কবিতায় আছে শুধু এক অস্পষ্ট আভাস, কবি জানিয়েছেন —

‘দেখেছি অবমানিত ভগ্নশেষ
গর্বোদ্ধত প্রতাপের; অন্তর্হিত বিজয় নিশান
বজ্রাঘাতে স্তব্ধ যেন অট্টহাসি; বিরাট সম্মান
সাষ্টাঙ্গে সে ধুলায় প্রণত।’

তবে ১৭-সংখ্যক কবিতায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং স্বৈরতন্ত্রী শাসকদের প্রকৃতি একেবারে পুরোপুরি অনাবৃত করে দিয়েছেন—

'দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
মত্ততার নির্লজ্জ হুংকার, অন্যদিকে ভীরুতার
দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ'।

কবি বিধাতার কাছে শক্তি চেয়েছেন যাতে উচ্চকণ্ঠে তিনি ধিক্কার জানাতে পারেন অশুভ পশুশক্তির বিরুদ্ধে—

'শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আন বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা-' পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন'।

১৮-সংখ্যক কবিতায় কবির প্রতিবাদ সংহত স্ফটিক হয়ে জ্বল জ্বল করছে—

'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোগাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।'

এই বিদ্রোহের মধ্যে এমন এক তেজ ছিল, শোষক স্বৈরাচারী শক্তির প্রতি প্রতিবাদের এমন অকৃত্রিম শক্তি ছিল যে এ কবিতা এ যুগের কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকেও আবিষ্ট করেছিল। 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় তিনি বলেছেন—

'তাই আজ আমারো বিশ্বাস,
"শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।"
তাই আমি চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে,
দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে।।

প্রশ্ন হচ্ছে দীর্ঘ কাব্যজীবনে রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে এত কম মন্তব্য করেছেন কেন, প্রান্তিকের মতো কাব্যগ্রন্থে কেনই বা এ কথা বলতে গেলেন। আমাদের মনে হয়, কবির 'ছোট ইংরেজ - বড়ো ইংরেজ' তত্ত্ব এর জন্য খানিকটা দায়ী। তিনি বিশ্বাস করতেন, সে বানিয়া ইংরেজ শাসনকর্তা হিসেবে এখানে রাজত্ব করছে তারা প্রকৃত ইংরেজ নয়, ছোট ইংরেজ। প্রকৃত ইংরেজ বা বড়ো ইংরেজ আছে ইংলন্ডে, যারা সংস্কৃতি, সভ্যতা, সাহিত্য-শিল্পে পৃথিবীর সেরা। 'মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ, একথাও তিনিই বলেছিলেন। তাহলে 'প্রান্তিক' কাব্যে তাঁর বিশ্বাস টলে গেল কী করে! আমাদের ধারণা বিশ্বাস অনেক আগেই টলেছিল, কিন্তু এক বিশাল ভাবমূর্তির অধিকারী 'গুরুদেব' এ বিষয়ে বিশেষ মন্তব্য করতে চাননি। এখন মর্ত্যভূমি থেকে বিদায়লগ্ন যখন আসন্ন, তখন তাঁর মনে হয়েছে সত্য কথা এবার উচ্চারণ করা দরকার। সত্য ভাষণে কোনো দিনই কুণ্ঠিত হননি তিনি, এখনও তা হবার কোনো কারণ ছিল না।

দ্বিতীয় কারণও একটি ছিল। মহাযুদ্ধের সঙ্কেত বা পূর্বাভাষ রবীন্দ্রনাথের মতো 'ঋষিকল্প' কবিরা পান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই তিনি 'শঙ্খ' কবিতায় জানিয়ে দিয়েছেন, 'তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে, কেমন করে, সইব!' এবারেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল আসন্ন, কবি অন্তর্গত রক্তস্রোতে তার আগাম সংকেত পেয়েছেন। এবং সেই কারণেই এবার, তিনি কবি হিসাবে তাঁর দায়বদ্ধতা স্বীকার করেছেন, তাঁর সুস্পষ্ট ভূমিকা তিনি পালন করেছেন, নিজের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন এই অশক্ত শরীরেও। আমরা যারা মনে করি তিনি গজদন্তমিনারে বাস করতেন এবং পৃথিবীর সমস্যা এড়িয়ে, কেবল সৌন্দর্যের সাধনা করে গিয়েছেন, তাদের উদ্দেশ্যে এই কবিতা কে সমুচিত উত্তর বলে মনে করা যেতে পারে।

৩.২.৮.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'প্রান্তিক' কাব্যের স্থান নির্ধারণ কর।

২। 'প্রান্তিক' কাব্যে মৃত্যুকে আসন্ন দেখে কবির মনে তাৎক্ষণিক যে প্রতিক্রিয়া ঘটেছে তার পরিচয় দাও।

৩। 'প্রান্তিক' কাব্যের কবিতাগুলির মধ্যে সুরের ঐক্য আছে কিনা বিচার কর।

৪। 'প্রান্তিক' কাব্যের কয়েকটি কবিতায় কবির তীব্র জীবনপিপাসা প্রকাশ পেয়েছে। কবিতাগুলি অবলম্বনে এই জীবনপিপাসার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।

৫। 'প্রান্তিক' কাব্যের মৃত্যুচেতনা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৬। 'প্রান্তিক' কাব্যের শেষ দুটি কবিতায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে কবির যে বিদ্রোহ ধ্বনিত হয়েছে তা বিশদ কর।

৭। 'প্রান্তিক্' কাব্যের ৭-সংখ্যক কবিতার সূচনায় কবি বলেছেন—'এ কী অকৃতজ্ঞতার বৈরাগ্য প্রলাপ ক্ষণে ক্ষণে',
কী অকৃতজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাকে অকৃতজ্ঞতা কেন বলা হয়েছে বুঝিয়ে দাও।

৮। কবিতা হিসাবে 'প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থে কোনটি শ্রেষ্ঠ বলে তোমার মনে হয়, রসগ্রাহী আলোচনায় তা বুঝিয়ে দাও।

৩.২.৮.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। কাব্যে রবীন্দ্রনাথ	:	বিশ্বপতি চৌধুরী
২। রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ (২)	:	প্রমথনাথ বিশী
৩। রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা	:	উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
৪। রবীনদ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কবিতা	:	ধীরানন্দ ঠাকুর
৫। চিত্রগীতময়ী রবীনদ্রনাথ	:	ক্ষুদিরাম দাস
৬। আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ	:	আবু সয়ীদ আইয়ুব
৭। এসেছে রবির কর	:	হীরেন চট্টোপাধ্যায়

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

রাজা নাটক

একক — ৯

রাজা নাটকের বৌদ্ধ উপাদান

বিন্যাস ক্রম

৩.৩.৯.১ : ভূমিকা

৩.৩.৯.২ : 'রাজা' নাটকের বৌদ্ধ উপাদান

৩.৩.৯.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩.৩.৯.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩.৩.৯.১ : ভূমিকা —

'রাজা' নাটকের প্রকাশকাল ১৯১০। একই কালপর্বে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উপন্যাস 'গোরা' প্রকাশিত হয়। 'রাজা' নাটকের আখ্যানভাগ বৌদ্ধ গল্পকথা থেকে সংগৃহীত। মূল বৌদ্ধ আখ্যানটি মহযানী ধর্ম সম্প্রদায়ের রচনা-সংকলন 'মহাবস্তু - অবদান' -এর অন্তর্গত 'কুশ-জাতক'-এর কাহিনী থেকে নেওয়া। তবে 'বৌদ্ধ-সংস্কৃত' নামক মিশ্রভাষা (Hybrid Language) লেখা মূল গল্পটি পাঠের াবসর নাট্যকারের হয়েছিলো বলে মনে হয় না। কেননা নাটকের ভাব-উৎসরূপে তিনি যার উল্লেখ করেছিলেন তা মূলগ্রন্থের নয়, মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্র-অনূদিত মূল কাহিনীর সংক্ষিপ্ত ইংরেজি অনুবাদ। রাজেন্দ্রলাল ১৮৮২ সালে তাঁর বিখ্যাত বৌদ্ধকাহিনী সংকলন 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal (Calcutta – 1882) প্রকাশ করে সুধী সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তাঁর গ্রন্থপ্রকাশের ফলে মহাযানী বৌদ্ধসাহিত্যের অমূল্য রত্নভাণ্ডারের সন্ধান মেলে এবং অনাদৃত বৌদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রতি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায়ের অনুরাগ ও শ্রদ্ধাবোধ বাড়তে থাকে। এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বৌদ্ধসাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুশীলনে সাহিত্য সৃষ্টি করে তিনি যেন প্রাচীন ভারতের একটি লুপ্তপ্রায় যুগকে পুনরুদ্ধার করেছেন। তাঁর অনেক উল্লেখযোগ্য কবিতা ও নাটক-নাটিকা বৌদ্ধ কাহিনীর অথবা ভাবছায়ার অনুসরণে রচনা। কিন্তু অনুসরণ-তাঁর মতো মহান প্রতিভার ক্ষেত্রে কখনো নিছক অনুকরণে পর্যবসিত হয়নি। বরং তা তাঁর অলোকসামান্য সৃজনশীল প্রতিভার প্রাণবত্তায় নতুন সৃষ্টির মহিমা অর্জন করেছে। 'রাজা' নাটকটি এই স্তরের সর্বোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'রাজা' নাটকের ভাব-উৎস 'মহাবস্তু - অবদান'-এর অন্তর্গত 'কুশজাতক' (The story of Kusa)। 'মূল মহাবস্তু - অবদান' -এ কুশজাতকের বৈচিত্র্যময় কাহিনীটি সুদূর-বিস্তৃত।' (বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় লেখা মূল কাহিনীর জন্য দ্রঃ 'অবদান সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ' (২য় সং) — কল্যাণীশঙ্কর ঘটক)

৩.৩.৯.২ : 'রাজা' নাটকের বৌদ্ধ উপাদান —

রবীন্দ্রনাথ 'কুশজাতক'-এর যে অংশ থেকে 'রাজা' নাটকের বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছেন তার বস্তুসংক্ষেপ করলে বিষয়টি দাঁড়ায় এইরূপ—

বারাণসীর মহারাজা সুবন্ধুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। মহারাজা ইক্ষ্বাকু ও তাঁর প্রধানা মহিষী অলিন্দার সন্তান কুশ বা শুদ্ধকুশ। অত্যন্ত কুৎসিৎ-কদাকার ও কুদর্শন হলেও রাজা কুশ অশেষ গুণশালী, সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ও অতুলনীয় বিক্রমের অধিকারী। যৌবনে পদার্পণ করলে মহারাণী অলিন্দা তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা করেন। তাঁর সুকৌশলে কাহ্নকুব্জরাজ মহেন্দ্রকের রুচিরা-সুন্দরী কন্যা সদর্শনার সঙ্গে কুশের বিবাহ হয়। পাশে কুশের কুরূপ সুদর্শনা দেখে ফেলে এই আশঙ্কায় কুল-প্রথার দোহাই দিয়ে তিনি একটি অন্ধকার গৃহনির্মাণ করান। এই আলোহীন গৃহেই কুশ ও সুদর্শনার মিলন ঘটতো। কখনো বাইরের আলোতে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে

দেখতে পেতো না। ফলে তাদের আসল চেহারা পরস্পরের কাছে অচেনাই থেকে যেতো। এই অদ্ভুত কুলপ্রথার বিরুদ্ধে সুদর্শনার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তার স্বামী মহারাজ কুশের বৈদগ্ধ্য ও বীরত্বের গল্প শুনে শুনে তাঁকে নিজের মতো করে কাছে না পাওয়ার বেদনায় অভিমানে তার অন্তর ক্ষুব্ধ হ'তে থাকে। তার মনে প্রশ্ন জাগে, রাণী হয়েও স্বামীসন্দর্শনের সৌভাগ্য থেকে তাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে কেন?

তাই তিনি অধীর হয়ে প্রিয়তমকে দিনের আলোয় দেখতে চান। সত্য প্রকাশ হয়ে পড়বার ভয়ে অলিন্দা অগত্যা কুশের বৈমাত্র ভাই সুদর্শন কুশদ্রুমকে সিংহাসনে বসিয়ে জানালা দিয়ে সুদর্শনাকে কুশদর্শনের পরামর্শ দেন। নকল মহারাজা প্রিয়দর্শন কুশকে (কুশদ্রুম) দেখে সুদর্শনা খুশি হন। কিন্তু তাঁর পাশেই রাজছত্রধারী কুৎসিৎ আসল কুশকে দেখে বিরক্ত হন। অবশেষে সত্য প্রকাশিত হয়। আসল কুশের বীভৎস চেহারা দেখে অসহ্য ঘৃণায় ও আতঙ্কে সুদর্শনা রাজধানী ত্যাগ করে পিত্রালয় কাহ্নকুব্জে যাত্রা করেন!

সুদর্শনার অদর্শন কুশের মনে তীব্র বিরহের সঞ্চার করে। তাঁর ভ্রাতৃপ্রতিম একজনকে সাময়িকভাবে সিংহাসনে বসিয়ে একটি বীণা হাতে নিয়ে তিনি সুদর্শনার উদ্দেশ্যে কাহ্নকুব্জ যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছে শিল্প ও কলা বিদ্যায় অশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে কুশ রাজবাড়ীর পাকশালায় কাজ পান। সেখানে ছদ্মবেশে থেকে সুদর্শনার মন জয় করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

সুদর্শনার স্বামীগৃহত্যাগের খবর চারদিকে রটে যায়। কাহ্নকুব্জের পার্শ্ববর্তী সাত রাজ্যের সাতজন রাজা স্বামীপরিত্যাগিনী সুদর্শনাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। তাঁরা প্রত্যেকেই সুদর্শনার পাণিপ্রার্থী। সুতরাং মহারাজা মহেন্দ্রক (সুদর্শনার পিতা) অচিরকালেই কন্যার স্বয়ম্বর আহ্বান না করলে তাঁরা রাজ্য আক্রমণ করবেন—এমন ভয় দেখান। ভীষণ সংকটে পতিত মহারাজা মহেন্দ্রক সুদর্শনাকে সুতীব্র তিরস্কারে জর্জরিত করে বলেন যে এই বিপর্যয়ের জন্য সুদর্শনাই দায়ী। তাই আসন্ন বিপন্মুক্তির উপায়ান্তর না পেলে তিনি নিজের কন্যাকেই সাতটুকরো করে সাত রাজাকে উপহার দেবেন— "যদি মে এতেষাং সপ্তানাং কোটি হেঠাং উৎপাদয়িস্যতি সপ্তখণ্ডানি কৃত্বা তেষাং সপ্তানাং রাজ্ঞামেকমেকং খণ্ডং দাস্যামি।" (মহাবস্তু—কুশজাতক-৪৮৬) মহারাজের এই কঠোর প্রতিজ্ঞায় ভীত-সন্ত্রস্ত মহারাণী ও সুদর্শনার কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন মুহূর্তে প্রবল প্রতাপশালী মহারাজা কুশের কথা স্মরণে আসে। কুশ যে ছদ্মবেশে রাজবাড়ীর পাকশালায় সুপকার হয়ে আছে সুদর্শনা তা জানতেন। আসন্ন বিপদ থেকে ত্রাণের জন্য তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন অনুভব করে অভিমান বিসর্জন দিয়ে তিনি মহারাজের কাছে রাজবাড়ীতে কুশের উপস্থিতির কথা পিতাকে জানিয়ে দেন। মহাবীর কুশকে যথোচিত সমাদরে বরণ করে নেন মহারাজ। অনুরোধ করেন বর্তমান বিপদ থেকে তাঁর সাম্রাজ্য রক্ষা করতে। যেই কথা সেই কাজ।

মহাবীর কুশ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করে যুদ্ধে যাত্রা করেন। তাঁর বিক্রমের কাছে পরাভূত সাতরাজাকে বন্দী করে তিনি শ্বশুর মহারাজ মহেন্দ্রকের সম্মুখে হাজির করেন। এই সকল বন্দীকে কঠোর শাস্তি দানের কথা উঠলে কুশের মধ্যস্থতায় তার সাত শ্যালিকাকে সাতজনের হস্তে সমর্পণ করা হয়। শত্রুতা মিত্রত্বে পরিণত হয় জামাতা কুশের বীরত্ব ও উপস্থিত বুদ্ধির গুণে। স্বামীর বীরত্বেও শৌর্যে মুগ্ধা সুদর্শনা নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং তাঁর সঙ্গেই পতিগৃহে যাত্রা করেন।

পথিমধ্যে একটি তটিনীর স্বচ্ছ জলে নিজের কদাকার চেহারার প্রতিবিম্ব দর্শনে মর্মাহত কুশ জলে ডুবে আত্মহননের চেষ্টা করেন। এমন সময়ে স্বয়ং ইন্দ্র স্বশরীরে সেখানে উপস্থি হয়ে 'জ্যোতীরস' নামে দুর্লভ একছড়া মণিমালা তাঁকে উপহার দেন। ইন্দ্র এও জানিয়ে দেন, "যত খুশি ইচ্ছা এটি পরলেই তুমি পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর পুরুষ হবে, আবার খুলে ফেললেই তোমার রূপ লুকিয়ে পড়বে।" কুশও যথাদিষ্টভাবে সেই মণিমালা পরিধান করেন। অতঃপর সুদর্শনা তাঁর স্বামীকে সুন্দর-শোভন ও স্বর্গীয় সৌন্দর্যে বিভাসিত দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।

বুদ্ধ ছিলেন সেই কুশ, কাহ্নকুব্জরাজ মহেন্দ্রক (সুদর্শনার বাবা) ছিলেন মহানাম, অলিন্দা মায়া, সুদর্শনা যশোধরা এবং সেই বিদ্রোহী সাত রাজা ছিলেন মার ও তার সঙ্গীরা।*

ড. রাধাগোবিন্দ বসাক-সম্পাদিত 'মহাবস্তু-অবদান' গ্রন্থের 'কুশজাতক'-এর আখ্যান রাজেন্দ্রলাল-অনূদিত কাহিনী থেকে সামান্য পৃথক।

*[মূল বৌদ্ধ গল্পের বাংলা রূপান্তর - এর জন্য দ্রঃ 'অবদান সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ' (২য় সং) — কল্যাণীশঙ্কর ঘটক।]

৩.৩.৯.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। ‘রাজা’ নাটকের উৎস বর্ণনা করো।

২। ‘রাজা’ নাটকে বৌদ্ধ উপাদানের গুরুত্ব নির্ণয় করো।

৩। ‘রাজা’ নাটকের বৌদ্ধ উপাদানের যথাযথ মূল্যায়ন করো।

৪। ‘রাজা’ নাটকের মূল উৎস সংক্ষেপে লেখো।

৩.৩.৯.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা — উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

২। রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ — প্রমথনাথ বিশী

৩। বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম — স্বামী বিদ্যারণ্য

একক — ১০

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও 'কুশজাতক'

বিন্যাস ক্রম

৩.৩.১০.১ : রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও 'কুশজাতক'-এর ইংরেজি অনুবাদের বাংলা রূপান্তর

৩.৩.১০.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩.৩.১০.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩.৩.১০.১ : রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও 'কুশজাতক' -এর ইংরেজি অনুবাদের বাংলা রূপান্তর —

মনীষী রাজেন্দ্রলাল মহাবস্তু-অবদান-এর অন্তর্ভুক্ত 'কুশ জাতক'-এর যে সংক্ষিপ্ত ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন তার বাংলা তর্জমা অতঃপর উদ্ধার করা যেতে পারে—

ভগবান বুদ্ধ তখন রাজগৃহে। ভিক্ষুগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তিনি মারকে ধ্বংস করেছিলেন। প্রত্যুত্তরে বুদ্ধ তাঁদের কাছে কুশ-কাহিনী বিবৃত করেন। (কুশ-কাহিনীর মূলকথা কুশজাতকে বর্ণিত গল্পের সঙ্গে অভিন্ন।)

এক সময়ে সুবন্ধু নামে রাজা বারাণসীতে রাজত্ব করতেন। অকস্মাৎ একদা বিস্ময়করভাবে তাঁর শয়নকক্ষে ইক্ষু চারা প্রাদুর্ভূত হল। ইক্ষুগুলির মধ্যে একটি এতই নয়নাভিরাম হয়েছিল যে মহারাজা কয়েকজন জ্যোতিষাচার্যকে আহ্বান করে নিশ্চতভাবে জানতে চান সেই ইক্ষুচারাটি আসলে কি। তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করেন, ঐ ইক্ষু চারা থেকে মহারাজের পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করবে। যথাকালে ইক্ষুচারাটি বাঁশগাছের মতো বেড়ে ওঠে। একদা প্রাতঃকালে ইক্ষুচারাটি থেকে একটি শিশু প্রাদুর্ভূত হয় এবং তার নাম রাখা হয় ইক্ষবাকু বা ইক্ষুসম্ভূত। রাজান্তঃপুরের প্রধান মহিষী শিশুটিকে পালন করেন। সুবন্ধুর মৃত্যু হলে ইক্ষুবাকু রাজা হন। তাঁর বহু মহিষীর মধ্যে প্রধানা ছিলেন অলিন্দা। পরিণত বয়স পর্যন্ত মহারাজা নিঃসন্তান ছিলেন। সন্তান কামনায় তিনি পূতাত্মা ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তাঁরা পরামর্শ দিলেন, জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রতি পক্ষকালের মধ্যে তিনরাত্রি রাজ-অন্তঃপুর খোলা রাখা হোক। অলিন্দা ব্যতীত সকল রমণী স্বাধীনতার এই সুযোগ গ্রহণ করলেন এবং নিশাকালে অন্তঃপুরের বাইরে যথেচ্ছ যেতে লাগলেন। সুবন্ধুর কোন নিকট আত্মীয় ত্রায়স্ত্রিংশ সুরলোকে ইন্দ্রত্ব লাভ করেছিলেন। ইক্ষুবাকুর এই বিগর্হিত ও লজ্জাজনক পরিস্থিতি দেখে তাঁর মনে ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের সঞ্চার হল। তিনি নিজেকে এক নোংরা, জরাজীর্ণ, কাশরোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণে পরিণত করে (অর্থাৎ কষ্টের ভান করে) রাজসমীপে উপনীত হন এবং তাঁর ক্রীড়ার (পরিচর্যার) নিমিত্ত রাণীদের একজনকে প্রার্থনা করেন। মহারাজ তাঁকে অন্তঃপুরিকাদের মধ্য থেকে অভিরুচি অনুযায়ী একজনকে বেছে নিতে বললে তিনি অলিন্দা দেবীকে পছন্দ করেন। প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও প্রধানা মহিষী অলিন্দাকে রাজপ্রাসাদ থেকে বলপূর্বক আকর্ষণ করে তিনি শহরতলীর একটি প্রাচীন, পরিত্যক্ত অট্টালিকাতে নিয়ে আসেন। অলিন্দাকে বৃদ্ধের দেহ মার্জনা করতে হত এবং তাঁর সামনে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়াতে হত। কিন্তু তিনি কখনও তাঁর শারীরিক শুচিতা নষ্ট করতে সম্মতি দিতেন না।

প্রাতঃকালে ইন্দ্র ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করেন এবং তাঁর আচরণে সন্তোষ প্রকাশ করেন। অলিন্দার দৃঢ়চিত্ততার পুরস্কারস্বরূপ তিনি তার হাতে কিঞ্চিৎ ঔষধ প্রদান করেন এবং বলেন— "এই ঔষধ তোমার বন্ধ্যাত্ব মোচন করবে। তোমার ইচ্ছানুযায়ীই আমি তোমাকে এই বর দান করছি। এই ঔষধচূর্ণ জলে গুলে সেই দ্রবণ পান করবে। তোমার সন্তান হবে কর্মশীল ও তেজস্বী। কিন্তু যেহেতু তুমি আমার ভালোবাসার আহ্বানে সাড়া দাওনি, সে দেখতে হবে কুৎসিত কিন্তু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন।"

অলিন্দা স্বামীর কাছে সকল ঘটনা বিবৃত করলেন। মহারাজা সকল অন্তঃপুরিকাদের জন্যই ঐ ঔষধ ব্যবহারের ব্যবস্থা করে দিলেন। ঔষধমিশ্রিত দ্রবণ পরিমাণে অত্যন্ত স্বল্প হল। এদিকে অন্তঃপুরিকাদের সংখ্যা এত বেশি যে তাঁদের ঔষধ-পরিমাপক পাত্রে হোমিওপ্যাথি-মাত্রায় কুশের সুতীক্ষ্ম অগ্রভাগ দ্বারা ঔষধ ভাগ করে দেওয়া হল। মহারাজ পাঁচশত সন্তান লাভ করলেন। তিনি কুশতৃণসংশ্লিষ্ট রাজপুত্রদের 'ইন্দ্রকুশ' 'দেবকুশ ' ইত্যাদিক্রমে নাম রাখলেন। অলিন্দার কুৎসিত ছেলেটির নাম হল 'কুশ'। অবশ্য কেউ কেউ তাকে 'শুদ্ধকুশ'ও বলতেন। মহারাজ কুশকে পছন্দ করতেন না। ভবিষ্যতে সে যাতে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হতে না পারে মহারাজা তার জন্য সচেষ্ট হন। কিন্তু প্রত্যেকবারই কুশের তেজস্বিতা ও সক্রিয়তার জন্য সেই সকল উদ্যম ব্যর্থতায়

পর্যবসিত হয়। একদিনের ঘটনা। মহারাজা (ইক্ষবাকু) বৃহদাকার একতাল মিষ্টান্নস্তূপের অন্তরালে ক্ষুদ্র একতাল মিষ্টদ্রব্য লুকিয়ে রাখেন এবং বলেন, তাঁর পুত্রদের মধ্যে যে সেটি খুঁজে বের করতে পারবে, সেই রাজা হবে। সবার শেষে কুশকে সুযোগ দেওয়া হল এবং সেই বারেই অতি সহজে সে সফল হল। অন্য আরেক দিনের ঘটনা। মহারাজা পুত্রদের ডেকে বললেন, তাদের মধ্যে যে সবার আগে খাবার খেয়ে শেষ করেবে তাকেই তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করবেন। অপর সকলে তাদের কাছে খাবার দেবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু কুশ নিজেই খালি মেঝের উপর খাবার নিয়ে খেল এবং মহারাজার দ্বিধাচলতা সত্ত্বেও তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত হল। কুশের মধ্যে রাজসুলভ লক্ষণ প্রত্যক্ষ করে, তার সিংহাসন-আরোহণের প্রত্যাশা ব্যর্থ করতে দৃঢ়সংকল্প হয়ে মহারাজা তাঁর সমূহ সম্পদ গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রাখলেন এবং মৃত্যুর সময় প্রহেলিকা বা হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষায় বলে গেলেন কোথায় তিনি সেই সকল সম্পদ লুকিয়ে রেখেছেন। মহারাজা ভেবেছিলেন কুশ প্রহেলিকার সমাধান করতে পারবে না এবং অন্য যে-কোনো রাজপুত্র সেই সম্পদ পাবে এবং রাজ্যও লাভ করবে। প্রহেলিকা সমাধান করে কুশ নিজের অধিকারে সকল সম্পদ সংগ্রহ করলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে, একটি প্রহেলিকা ছিল এইরূপ—যোজনানিধি অথবা অষ্টমাইল সঞ্চয়। কিন্তু কুশ 'যুজ্' শব্দ থেকে অনুমান করলেন যোয়াল কথাটি এবং যেখানে ঘোড়া থাকে সেই আস্তাবলের কিয়দংশ খনন করে নিধি বা সম্পদ লাভ করলেন।

কাহ্নকুব্জের অন্তর্গত ভদ্রকসত্-এর উপজাতিদের রাজা মহেন্দ্রকের এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। কুশের রাজ্যপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অলিন্দা নিজে গিয়ে সেই রাজকুমারীর সঙ্গে কুশের বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। বিবাহ-ব্যবস্থা পাকা হল। কিন্তু অলিন্দার মনে ছিল শঙ্কা, পাছে না সুন্দরী বধূমাতা এত বিকৃতদেহী (কুৎসিত) স্বামীকে দেখে আত্মাহুতি দিয়ে বসে। তাই তিনি ভূগর্ভে একটি বাসগৃহ নির্মাণ করালেন এবং কুলপ্রথার ধুয়া তুলে নবদম্পতীকে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানকার কক্ষগুলিতে কোনো আলো দেওয়া হল না। অন্ধকার বাসরকক্ষে নবদম্পতী মধুযামিনী যাপন করল। কিন্তু রাজবধূ সুদর্শনা স্বামী সন্দর্শনের জন্য ক্রমশঃ অস্থির হয়ে পড়ল এবং আলোকসন্নিধানে বর-বধূর সাক্ষাৎকারের জন্য শ্বশ্রুমাতাকে বারংবার অনুরোধ করতে লাগল। কদাকার স্বামীকে সুদর্শনা যাতে স্বচক্ষে দেখতে না পায় তার জন্য অলিন্দা তাঁর সৎপুত্রদের একজনকে কুশপরিচয়ে সিংহাসনে বসালেন। আর স্থূলোষ্ঠ স্থূলোদর, বিকৃতশির আসল কুশ হলেন নকল কুশের মাথার ছত্রধারক।

নকল স্বামীকে দেখে সুদর্শনা সুপ্রীত হল কিন্তু অতীব কৃষ্ণকায়, কদাকার ব্যক্তিটিকে রাজচ্ছত্র ধারণ করতে দেওয়ার জন্য বিরক্তি প্রকাশ করল। রাজ্যোদ্যানে পরিভ্রমণের সময় সে দানবসদৃশ কুশের কাছ থেকে ছুটে পালাল।

কিয়ৎকালের মধ্যেই সে তার ভুল সংশোধন করে নেয়। নগরের এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড থেকে হস্তী-উদ্যান রক্ষা পায় কেবল মহারাজার কর্মতৎপরতায়। বেশ কিছুকাল ধরে কুশের নাম জনসাধারণের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে থাকে। তারা মহারাজা কুশের কৃষ্ণবর্ণ ও সুদীর্ঘ আয়তচক্ষুর যে বর্ণনা দেয় তা থেকে সুদর্শনা ভুল বুঝতে পারে। অদ্ভুত বিস্ময় ও বেদনার সঙ্গে সে বুঝতে পারে, হস্তী-উদ্যানে সে যে দানবটাকে দেখেছিল সেই-ই তার আসল স্বামী। তৎক্ষণাৎ সে কাহ্নকুব্জে যাবার জন্য শ্বশ্রুমাতার সম্মতি প্রার্থনা করে। তিনি সম্মতি দিলে নিজের লজ্জা গোপন করবার জন্য সে কাহ্নকুব্জের পথে যাত্রা করে।

পত্নীবিরহ সহ্য করতে না পেরে মহারাজ কুশ তাঁর এক সৎভাইকে অন্তর্বর্তীকালের জন্য রাজপদে অধিষ্ঠিত করে বীণা হাতে নিজেই উত্তর দিকে যাত্রা করেন। কাহ্নকুব্জে পৌঁছেই তাঁর প্রথম কাজ হল মহানগরীতে তাঁর উপস্থিতির কথা সুদর্শনার গোচরে আনা। অচিরকালেই রন্ধনকলায় অশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়ে তিনি রাজবাড়ীতে পাকশালার কর্মে নিযুক্ত হন। সেখানে সঙ্গোপনে তিনি অবাধ্য স্ত্রীকে বসে আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। কিছুতেই তাকে মানানো গেল না।

ইতোমধ্যে সুদর্শনার স্বামীগৃহত্যাগ ও প্রকারান্তরে স্বামীত্যাগের কলঙ্কজনক সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল। কাহ্নকুব্জরাদের অধীনস্থ সাতজন সামন্তরাজ সুদর্শনার পাণিপ্রার্থী হতে চাইলে মহারাজা তাঁদেরর প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলেন। এই কারণে তাঁরা পরস্পর মিলিত হয়ে একযোগে রাজধানী অধিকার করতে অগ্রসর হলেন। প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ মহারাজ অবাধ্য কন্যাকে সুতীব্রভাবে তিরস্কার করে ভয় দেখিয়ে বললেন, আসন্ন সংঘর্ষে পরাস্ত হলে তাকে সাতটুকরো করে কেটে সাতজন সামন্তরাজাকে উপহার দেবেন। এই ভয়ঙ্কর ভৎর্সনায় ভীত-সন্ত্রস্ত সুদর্শনা উদ্ধারলাভের জন্য প্রায় পরিত্যক্ত স্বামীর সন্নিধানে পাকশালায় যান। তিনি (মহারাজ কুশ) শপথ করেন, তাঁকে রক্ষার জন্য তাঁর পিতার পক্ষ নিয়ে লড়াই করবেন। পাকশালার রাঁধুনী যে তাঁর জামাতা (কুশ) একথা কাহ্নকুব্জরাজকে জানানো হল। তিনি অবিলম্বে তাঁকে (কুশকে) বরণ করতে অগ্রসর হলেন এবং পূর্বকৃত অবহেলা সম্পূরণের জন্য পুনঃপুনঃ অশেষ সম্মান প্রদর্শন করতে লাগলেন।

হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করে মহীবীর কুশ শত্রুদের প্রতি ধাবিত হলেন এবং প্রারম্ভেই এমন গুরুগম্ভীর ভয়ঙ্কর নাদ করলেন যে শত্রুরা ভয়ে নিস্তেজ হয়ে আত্মসমর্পণ করে তাঁর হাতে বন্দী হলেন। কুশের অনুরোধে মহারাজা (কাহ্নকুব্জরাজ) পরাজিত সাতজন নরপতির প্রত্যেককে একটি করে কন্যা সম্প্রদান করলেন। অতঃপর কাহ্নকুব্জে কয়েকদিন বিজয়োৎসব অনুভব করে বিনীত স্ত্রীসহ কু নিজ রাজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পথিকমধ্যে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর স্বচ্ছ জলে নিজের বিকৃতদর্শন অবয়বের প্রতিচ্ছায়া দেখে তিনি অতীব মর্মাহত হন এবং জলে ডুবে আত্মবিসর্জন দিতে চান। ঠিক তখনই (দেবরাজ) ইন্দ্র স্বশরীরে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হন এবং তাঁকে 'জ্যোতীরস' নামে একছড়া দুর্লভ মণিমালা উপহার দিয়ে বলেন, "এটি পরিধান কর। এটি পরলেই তুমি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর পুরুষ হবে। আর যখন তুমি নিজের পূর্বস্বরূপ ফিরে পেতে চাইবে, এই মণিমালাটিকে কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলো, তাহলেই তোমর রূপ লুকিয়ে পড়বে।" কুশ সেই মণিমালা পরিধান করেন। সুদর্শনাও স্বামীকে স্বর্গীয় সৌন্দর্যে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।

বুদ্ধ ছিলেন সেই কুশ কাহ্নকুব্জরাজ মহেন্দ্রক (সুদর্শনার পিতা) ছিলেন মহানাম,অলিন্দা মায়া, সুদর্শনা যশোধরা এবং সেই বিদ্রোহী সাতরাজা ছিলেন মার ও তাঁর সঙ্গীগণ।

'কুশজাতক'-এর কাহিনীর সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের অনুবাদ মিলিয়ে পড়লে একটু আশ্চর্যই হতে হয়। কারণ এর আগে আলোচিত অনেকগুলি কাহিনীর ইংরেজি অনুবাদে আমরা যা পাইনি, আলোচ্য অনুবাদে এই অভাব পূর্ণ হয়েছে। অনুবাদক হিসেবে রাজেন্দ্রলাল এক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

সার্থক অনুবাদকের নিকট পাঠকের দুটো প্রত্যাশা — নিষ্ঠা ও পরিমিতবোধ। 'কুশজাতক'-এর মতো অতিকথনে মন্থর সুদীর্ঘ, জটিল কাহিনীর এমন প্রাঞ্জল ইংরেজি অনুবাদকের নিষ্ঠা ও পরিমিতিবোধের জন্য মূল কাহিনীর একই ধরনের ঘটনাবৃত্ত ও উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক নাটকীয় অংশগুলি স্বাভাবিকভাবেই পরিহৃত হয়েছে। তাছাড়াও সংক্ষিপ্তির আশ্রয়ে মূল কাহিনীর নির্যাসটুকু উপহার দিতে গিয়ে তিনি প্রকৃত প্রয়োজনীয় অংশগুলির একটিও বর্জন করেন নি এবং কদাপি কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। ফলতঃ একনজরে কুশজাতক-এর আকর্ষণীয় কাহিনী ইংরেজি অনুবাদে অধিকতর সহজ-সরল ও উপভোগ্য হয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা রাজেন্দ্রলালের বৌদ্ধ-কাহিনী সংক্রান্ত যতগুলি অনুবাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, তাদের অনেকগুলির ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখ করেছি। কিন্তু এদিক থেকে কুশজাতক-এর অনুবাদ most perfect, ব্যতিক্রম বললেও চলে।

৩.৩.১০.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'রাজা' নাটকের কাহিনিগত উৎস লেখো।

২। 'রাজা' নাটকের কাহিনিগত মূল উৎসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩। কুশজাতকের কাহিনী ও রবীন্দ্রনাথের 'রাজা'র মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা লিপিবদ্ধ করো।

৩.৩.১০.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা — উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

২। রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ — প্রমথনাথ বিশী

৩। বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম — স্বামী বিদ্যারণ্য

একক — ১১

'রাজা' নাটকের বস্তুসংক্ষেপ

বিন্যাস ক্রম

৩.৩.১১.১ : 'রাজা' নাটকের বস্তুসংক্ষেপ

৩.৩.১১.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩.৩.১১.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩.৩.১১.১ : 'রাজা' নাটকের বস্তুসংক্ষেপ —

অতঃপর রবীন্দ্রসৃষ্ট রাজা নাটকের বিষয়বস্তু আলোচনা ও বিশ্লেষণ করলে মূল মহাবস্তু-অবদান ও রাজেন্দ্রলাল-অনূদিত কাহিনীর সঙ্গে তার মিল ও স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হ'বে। কুশজাতকের কাহিনীর অনুষঙ্গে ২০ টি ভাগে বিন্যস্ত করে রবীন্দ্রনাথ রাজা নাটকের কাহিনী উপস্থাপিত করেছেন। ১, ২ ইত্যাদি ক্রমে সংখ্যাদ্বারা সূচিত প্রতিটি বিভাগকে এক একটি নাটকীয় দৃশ্য হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। রাজা নাটকের কাহিনিবৃত্ত নিম্নরূপ—

৩.৩.১১.১.১ : অন্ধকার ঘর : রানী ও তাঁহার দাসী সুরঙ্গমা —

নাটকের প্রথম দৃশ্যে অন্ধকার ঘরে রানী সুদর্শনা দাসী সুরঙ্গমাকে জিজ্ঞাসা করেন—'আলো, আলো কই। এ ঘরে কি একদিনও আলো জ্বলবে না।' প্রত্যুত্তরে সুরঙ্গমা বলে, 'রানী মা, তোমার ঘরে ঘরেই তো আলো জ্বলছে — তার থেকে সরে আসবার জন্যে কি একটা ঘরেও অন্ধকার রাখবে না।' সুরঙ্গমার কথার মানে তিনি বুঝতে পারেন না। অন্ধকার ঘরটি সম্পর্কেও তাঁর অফুরন্ত কৌতূহল। সুরঙ্গমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "বল্‌তো এ ঘরটা আছে কোথায়? কোথা দিয়ে এখানে আসি, কোথা দিয়ে বেরোই, প্রতিদিনই ধাঁধা লাগে।" সুরঙ্গমা জানায়, "এ ঘর মাটির আবরণ ভেদ করে পৃথিবীর বুকের মাঝখানে তৈরি। তোমার জন্যেই রাজা বিশেষ করে করেছেন।" সুদর্শনার কাছে না হলেও সুরঙ্গমার অনুভবে অন্ধকার ঘরের তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাণীকে সে বলে — "আলোর ঘরে সকলেরই আনাগোনা — এই অন্ধকারে কেবল একলা তোমার সঙ্গে মিলন।" সুদর্শনার মন এতে শান্তি পায় না। তাঁর আলোর পিপাসা তীব্র হয়ে ওঠে — "না না, আমি আলো চাই—আলোর জন্যে অস্থির হয়ে আছি। তোকে আমি গলার হার দেব যদি একদিন আলো আনতে পারিস।" সুরঙ্গমা দীনতা প্রকাশ করে বলে —"আমার সাধ্য কী মা — যেখানে তিনি অন্ধকার রাখেন আমি সেখানে আলো জ্বালব।"

সুদর্শনার দাসী হলেও সুরঙ্গমা রাজার বিশেষ অনুরাগিণী ভক্ত। যৌবনে সে যখন নষ্ট হয়ে যেতে বসেছিল তখন রাজাই তাকে উদ্ধার ক'রে অন্ধকার ঘরে দাসী করে দেন। তার মা ছিল না। রাজা পিতাকে নির্বাসন করে দিলে রাজার উপর তার প্রচণ্ড রাগ হয়। অনেক কষ্টকর অভিজ্ঞতায় রাজা সম্পর্কে তার ধারণা হয় — 'উঃ কী নিষ্ঠুর! কী অবিচলিত নিষ্ঠুরতা!' রাজার এই অবিচলিত নিষ্ঠুরতার পরও তাঁর প্রতি সুরঙ্গ মার এত ভক্তি কি করে হল, রানী জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, "কী জানি মা। এত অটল, এত কঠোর বলেই এর নির্ভর, এত ভরসা। নইলে আমার মতো নষ্ট আশ্রয় পেত কেমন করে।" এর পর আকস্মিক ভাবেই সুরঙ্গমার মনের পরিবর্তন ঘটে। তার সমস্ত দুরন্তপনা হার মেনে একদিন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তখন সে অনুভব করে — 'যত ভয়ানক ততই সুন্দর!'

এতকাল রাজাকে আলোয় দেখবার সৌভাগ্য হয়নি সুদর্শনার। তাঁর বড়ো সাধ, রাজার রূপকে আলোতে দেখেন। সুরঙ্গমার কাছে রাজার রূপ কেমন জানতে চাইলে সে জবাব দেয় — "আমি সত্যি বলছি রানী, ভালো করে বলতে পারবো না। তিনি কি সুন্দর — না, লোকে যাকে সুন্দর বলে তিনি তা নন।" সুরঙ্গমার কথায় বিস্মিতা সুদর্শনা বলেন — 'বলিস কী! সুন্দর নন?' সুরঙ্গমা জবাব দেয় —'না রানীমা! সুন্দর বললে তাঁকে ছোট করে বলা হবে।' সুরঙ্গমার হেঁয়ালিপূর্ণ কথায় তাঁর ব্যাকুলতা আরও বেড়ে যায়। 'সুন্দর' কথাটির তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে সুরঙ্গমা আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলে — "বাপের বাড়িতে অল্প বয়সে অনেক পুরুষ দেখেছি,

তাদের সুন্দর বলতুম। তারা আমার দিনরাত্রিকে, আমার সুখদুঃখকে কী নাচন নাচিয়ে বেড়িয়েছিল সে আজও ভুলতে পারিনি। আমার রাজা কি তাদের মতো? সুন্দর! কক্‌খনো না।" এই সুন্দরের প্রতি ভক্তিতেই সুরঙ্গমা নিজের সার্থকতা অনুভব করে। তার এই যুক্তিবিচারহীন অন্ধ ভক্তি দেখে সুদর্শনা আকাঙ্ক্ষা আরও বেড়ে যায়— 'যিনি সুপুরুষের শ্রেষ্ঠ তাঁকে দেখব এ লোভ কি ছাড়া যায়!' হঠাৎ অন্ধকার ঘরে বাইরের হাওয়ার গন্ধ ভেসে আসে। সুরঙ্গমা টের পায় রাজার আগমনী— 'বড় দরজাটা খুলেছে — তিনি আসছেন, ভিতরে আসছেন।' সুরঙ্গমা কেমন করে এসব জানতে পারে সুদর্শনা কিছুই বুঝতে পারে না। তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে — "কী জানি মা। আমার মনে হয় যেন আমার বুকের ভিতরে পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আমি তাঁর এই অন্ধকার ঘরের সেবিকা কিনা, তাই আমার একটা বোধ জন্মে গেছে—আমার বোঝবার জন্যে কিছুই দেখবার দরকার হয় না।" সুরঙ্গমা নানা ভাবে সুদর্শনাকে যে-কথা বোঝানোর চেষ্টা করে তার মর্মার্থ হল, রাজাকে বাইরে দেখবার প্রলোভন ত্যাগ করে অন্তরমাঝে উপলব্ধির চেষ্টা করা উচিত। এতে সুদর্শনা তাঁর অসহায়তা ব্যক্ত করলে সুরঙ্গমা রাজার প্রতি ভালোবাসায় নিঃসর্ত আত্মসমর্পণের কথা উল্লেখ করে।

অতঃপর অন্ধকার কক্ষে রাজা-রানীর নিভৃত সাক্ষাৎকার। রানী রাজাকে প্রশ্ন করেন— 'তুমি আমাকে আলোয় দেখা দিচ্ছ না কেন।' রাজা উত্তর দেন— 'আলোয় তুমি হাজার জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে দেখতে চাও? এই গভীর অন্ধকারে আমি তোমার একমাত্র হয়ে থাকি না কেন।" সুদর্শনার অভিমান, সবাই রাজাকে দেখতে পায় আর রানী হয়ে তিনি তাঁকে দেখতে পাবেন না। রাজা বলেন, 'এ সমস্ত ভুল, মূঢ় যারা তারা মনে করে দেখতে পাচ্ছি।' সুদর্শনা জিদের বশে বলেন, 'তা হোক, আমাকে দেখা দিতেই হবে।' রাজা বলেন— 'সহ্য করতে পারবে না, কষ্ট হবে।' সুদর্শনা বলেন, "অন্ধকারেই তিনি বুঝতে পারেন তাঁর রাজা কতো সুন্দর, কতো আশ্চর্য! আর আলোতে তিনি তাঁকে বুঝতে পারবেন না?" বাইরে যখন রাজার বীণা বাজে তখন তিনি নিজেকে সেই বীণার গান বলে মনে করেন। রাজার সুগন্ধ উত্তরীয়টা যখন তাঁর গায়ে এসে ঠেকে তখন মনে হয়, তাঁর সমস্ত অঙ্গ বাতাসে ঘন আনন্দের সঙ্গে মিশে গেল। তাই রাজাকে দেখতে তিনি অবশ্যই তাঁকে সইতে পারবেন। রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন— 'আমার কোনো রূপ কি তোমার মনে আসে না?' সুদর্শনা বলেন— 'একরকম করে আসে বৈ কি! নইলে বাঁচব কী করে?' রাজা জিজ্ঞাসা করেন— 'কি রকম দেখেছে?' সুদর্শনা বলেন— 'ঋতুপ্রকৃতির অন্তহীন রূপবৈচিত্র্যের মধ্যেই বারে বারে তিনি তাঁকে দেখেছেন।' রাজা বলেন, "এত বিচিত্ররূপে দেখছ, তবে কেন সব বাদ দিয়ে কেবল একটি বিশেষ-মূর্তি দেখতে চাইছ। সেটা যদি তোমার মনের মতো না হয় তবে তো সমস্ত গেল।" সুদর্শনা বলেন, 'মনের মতো হবে নিশ্চয়ই জানি।' রাজা বলেন, "মন যদি তার মতো হয় তবেই সে মনের মতো হবে। আগে তাই হোক।" সুদর্শনা বলেন—"সত্যি বলছি, এই অন্ধকারের মধ্যে যখন তোমাকে দেখতে না পাই অথচ তুমি আছ বলে জানি, তখন এক একবার কেমন একটা ভয়ে আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে।" রাজা বলেন— 'সে ভয়ে দোষ কী। প্রেমের মধ্যে ভয় না থাকলে তার রস হালকা হয়ে যায়।"

সুদর্শনা রাজার কাছে জানতে চান, অন্ধকারের মধ্যে তিনি তাঁকে দেখতে পান কিনা। কেমন করে তিনি দেখতে পান, কী দেখেন জিজ্ঞাসা করলে রাজা জবাব দেন— "দেখতে পাই, যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার।" রূপের প্রশংসায় সুদর্শনার মন ভরে ওঠে। কিন্তু নিজের রূপ তো নিজে নিজেই অনুভব করা যায় না। তাই রাজা তাঁকে বলেন— "নিজের আলোয় দেখা যায় না — ছোটো হয়ে যায়। আমার চিত্তের মধ্যে যদি দেখতে পাও তো দেখবে, সে কত বড়ো। আমার হৃদয়ে তুমি যে আমার দ্বিতীয়; তুমি সেখানে কি শুধু তুমি।" রাজার এ সকল কথায় সুদর্শনার অন্তর বিগলিত হলেও চিত্ত প্রশমিত হয় না। রাজার কথাগুলি তাঁর কাছে মনে হয় জন্ম-জন্মান্তর ধরে শোনা অনাদিকালের গান। সে-গান রাজা শুধু তাঁকেই শুনিয়েছেন না অন্য কাউকে, যে তার চেয়েও অনেক সুন্দর—তাই নিয়ে রানীর সংশয়। রাজার গানে সেই আলোকসুন্দরীকে তিনি দেখতে পান কিন্তু সে তাঁর নিজের মধ্যে অথবা রাজার মধ্যে তা তিনি বুঝতে পারেন না। তাঁর ইচ্ছা, রাজা যেমন করে তাঁকে দেখছেন তেমনি করেই নিমেষের জন্য তাঁর কাছে একবার নিজেকে দেখিয়ে দিন। তাঁর সংবেদনশীল মন অন্ধকারের রাজাকে ভয় করে। কঠিন কালো লোহার মতো, ঘুমের মতো, মূর্ছার মতো, মৃত্যুর মতো অন্ধকারে রাজার সঙ্গে তাঁর মিলন অসম্ভব ভেবে সে বলে, — "না না, হবে না মিলন; হবে না। এখানে নয়, এখানে নয়। যেখানে আমি গাছপালা পশুপাখি মাটি পাথর সমস্ত দেখছি সেইখানেই তোমাকে দেখব।" রানীর জিদ দেখে রাজা বলেন— "আচ্ছা দেখো, কিন্তু তোমাকে নিজে চিনে নিতে হবে, কেউ তোমাকে বলে দেবে না।" সুদর্শনা সোৎসাহে বলে ওঠেন— "আমি চিনে নেব, চিনে নেব, লক্ষলোকের মধ্যে চিনে নেব। ভুল হবে না।" রাজা বললেন— "'আজ বসন্ত পূর্ণিমার উৎসবে তুমি তোমার প্রাসাদের

শিখরের উপর দাঁড়িয়ো—চেয়ে দেখো — আমার বাগানে সহস্র লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা কোরো।” রানী জিজ্ঞাসা করেন—‘তাদের মধ্যে দেখা দেবে তো? রাজা জবাব দেন—‘বার বার করে সকল দিক থেকেই দেখা দেব।’

এরপর অন্ধকার ঘরে সুরঙ্গমার প্রবেশ। রাজা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন বসন্ত-পূর্ণিমার উৎসবের কথা। সেই আনন্দোৎসবে তিনি তাকে যোগ দিতে বলেন। প্রভুর আহ্বানে সে সম্মতি জানালে রাজা তার কাছে রানীর অভিপ্রায় প্রকাশ করেন—‘রানী আজ আমাকে চোখে দেখতে চান।’ সুরঙ্গমা জিজ্ঞাসা করেন, কোথায় দেখবেন। রাজা উত্তর দেন — “যেখানে পঞ্চমে বাঁশি বাজবে ফুলের কেশরের ফাগ উড়বে, কোথায় দেখবেন। রাজা উত্তর দেন—“যেখানে পঞ্চমে বাঁশি বাজবে ফুলের কেশরের ফাগ উড়বে, জ্যোৎস্নার ছায়ায় গলাগলি হবে—সেই আমাদের দক্ষিণের কুঞ্জবনে।” সুরঙ্গমা সংশয় প্রকাশ করেন, “সে লুকোচুরির মধ্যে কি দেখা যাবে। সেখানে যে হাওয়া উতলা, সবই চঞ্চল। চোখে ধাঁধা লাগবে না?” রাজা রানীর কৌতূহলের কথা উল্লেখ করলে সুরঙ্গমার স্পষ্ট জবাব—“কৌতূহলের জিনিস হাজার আছে—তুমি কি তাদের সঙ্গে মিলে কৌতূহল মেটাবে? তুমি আমার তেমন রাজা নও।” রানীকে সে বলে, ‘রানী তোমার কৌতূহলকে শেষকালে কেঁদে ফিরে আসতে হবে।’ একটি গানে সংকেতে সুরঙ্গমা রানীকে বোঝাতে চেয়েছে যে পরম ঈপ্সিতকে লাভ করতে হয় হৃদয়ের অন্তপুরে। হৃদয়ে প্রেমের বাঁশি বাজলে তিনি আপনি এসে ধরা দেন। বাইরে থেকে তাঁকে দেখতে চাওয়া বিড়ম্বনা। ‘কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে যায়,’ গানে এই ভাবেরই প্রকাশ।

৩.৩.১১.১.২ : পথ —

নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্য পথ। এই দৃশ্যে কয়েকজন পথিক প্রহরীকে উৎসবে যাবার জন্য পথের নিশানা জিজ্ঞাসা করেছে। প্রহরী বলেছে— “এখানে সব রাস্তাই রাস্তা। যে দিক দিয়ে যাবে ঠিক পৌঁছবে। সামনে চলে যাও।” এই কথা শোনার পর জনার্দন-ভবদত্ত -কৌণ্ডিল্য প্রমুখ পথিক রাজার দেশের উল্টো নিয়ম—খোলা ব্যবস্থা সম্পর্কে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়। কথা প্রসঙ্গে তারা নিজেদের দেশের নিয়ম-শৃঙ্খরলার কড়াকড়ি—ভালোমন্দ প্রভৃতি নিয়ে গর্বিত বোধ করে, আবার বক্রোক্তির মাধ্যমে পরস্পরকে কটাক্ষও করে। তাদের প্রস্থানের পর বালকগণকে নিয়ে রঙ্গমঞ্চে ঠাকুরদার আবির্ভাব। বসন্তোৎসবের দিনে সব রাস্তাই গানে ভাসিয়ে চলার আহ্বান ঠাকুরদার কণ্ঠে— ‘আজি দখিন দুয়ার খোলা — এসো হে, এসো হে, এসো হে / আমার বসন্ত এসো’ ইত্যাদি।

রাজ্যের প্রজারা রাজাকে কোন দিন চোখে দেখেনি। রাজা আদৌ আছেন কিনা এই নিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা ও সংশয়ের অন্ত নেই। বিরূপাক্ষ ও বিশ্ববসু এমনই দুজন নাগরিক। দেশের রাজার জনগণকে দর্শন না দেওয়ার কারণটা বিরূপাক্ষের কাছে পরিষ্কার। বিশ্ববসুকে সে মৃদুস্বরে বলে—‘রাজাকে দেখতে বড় বিকট, সেই জন্যে পণ করেছে কাউকে দেখা দেবে না।’ কিন্তু সংশয় ঘোচে না।

এদিকে ঠাকুরদাকে টানাটানি করে নিয়ে একদল লোকের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ। বসন্তোৎসবে যোগদানের জন্য ঠাকুরদা সুন্দরভাবে সেজেছেন। কবিকেশরী তাঁকে নিয়ে গান বেঁধেছেন যাতে তাঁর অপরূপ, আত্মভোলা, পরমরসিক স্বরূপটি উদ্ভাসিত। ঠাকুরদা উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হবার আগেই রাস্তার ওপর সভা জমিয়ে বসেন। বসন্তোৎসবে সমাগত দেশবিদেশের লোক রাজার নাস্তিত্ব নিয়ে কানাঘুষো করলে ঠাকুরদা রাজ্যের সর্বত্র তাঁর রাজার অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করলেন। উৎসবে লৌকিক বহু রাজার উপস্থিতি, তাঁদের হাতি-ঘোড়া লোক-লস্করের তাড়ায় উৎসব পশু হতে বসে। কিন্তু ঠাকুরদার রাজা এর ব্যতিক্রম। তিনি নিজে জায়গা জোড়েন না, সবাইকে জায়গা ছেড়ে দেন। ঠাকুরদার কণ্ঠে কবিকেশরীর ‘আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে’ গানে রাজার সত্য স্বরূপটি পরিস্ফুট হয়, যার মধ্যে আছে পরম মুক্তির চরম আনন্দ। সেই আনন্দের সঙ্গে যুক্ত হওয়াতেই জীবনের পূর্ণতা। জনৈক ব্যক্তি ঠাকুরদাকে বলেন, ব্যক্তি বিশেষকে গালাগালি দিলে তার শাস্তি আছে। কিন্তু রাজাকে দেখতে পাইনা বলে অনায়াসে তার সম্পর্কে যা-খুশি বলে বেড়ালেও তাকে শাস্তি দেবার কেউ নেই। ঠাকুরদার সাংকেতিক ভাষায় রাজার মানবিক সুখ-দুঃখের অতীত নির্বিকার সত্তার পরিচয় ফুটে ওঠে। তিনি বলেন, “ওর মানে আছে। প্রজাদের মধ্যে যে রাজাটুকু আছে, তাঁরই গায়ে আগাত লাগে, তার বাইরে যিনি, তাঁর গায়ে কিছুই বাজে না। সূর্যের যে তেজ প্রদীপে আছে, তাতে ফুঁটুকু সয় না। কিন্তু হাজার লোকে মিল সূর্যে ফুঁ দিলে সূর্য অম্লান হয়েই থাকেন।”

ইতোমধ্যে বিশ্ববসু ঠাকুরদার কাছে অভিযোগ করে বলেন, বিরূপাক্ষ রটিয়ে বেড়াচ্ছে যে রাজা কুৎসিত দেখতে, তাই তিনি দেখা দেন না। ঠাকুরদা বলেন, ‘বিরূপাক্ষ আয়নাতে যেমন নিজের মুখটি দেখে, রাজার চোহারা তেমনি ধ্যান করে।’

এদিকে বিদেশি দল পুনরায় রঙ্গমঞ্চে ফিরে আসে। কৌণ্ডিল্য-জনার্দন-ভবদত্ত প্রমুখের সংলোপে রাজার অস্তিত্বে সংশয় দৃঢ়মূল হয়। ভবদত্ত বলে 'দেখ ভাই কৌণ্ডিল্য, আসল কথাটা হচ্ছে, এদের মূলেই রাজা নেই। সকলে মিলে একটা গুজব রটিয়ে রেখেছে।" কিন্তু এদেশের নিয়ম-শৃঙ্খলা, উৎসবের আনন্দ, প্রজাদের মিলন প্রভৃতি দেখে জনার্দনের কোনও সংশয় থাকে না যে এরাজ্যের একজন রাজা আছেন। এ নিয়ে ভবদত্ত ও কৌণ্ডিলের সঙ্গে তার বিরোধ। এ স্বাভাবিক। কারণ বাস্তববোধের সীমারেখা আর রাজা বা ঈশ্বর সম্পর্কীয় বোধের সীমারেখা এক নয়। রাজা বা ঈশ্বর আমাদের প্রাণের মানুষ। অন্তর্দৃষ্টিতে তাঁর স্বরূপ ধরা পড়ে। বাউল দলের 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে, তাই হেরি তায় সকল খানে' গানে এই অনুভবেরই প্রকাশ।

রঙ্গমঞ্চে একদল পদাতিকের আবির্ভাব ঘটে। তাদের মধ্যে ভীষণ ব্যস্ততা। দ্বিতীয় পদাতিক ঘোষণা করে, তাঁদের রাজা আসছেন। প্রথমে পদাতিক একথায় সন্দেহ প্রকাশ করলে সে বলে, 'মহারাজ আর গোপন থাকবেন না, তিনি স্বয়ং উৎসব করবেন।' কিংশুকফুল আঁকা রাজার নিশান উড়তে দেখে পদাতিকদের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিতীয় পদাতিকের কথা মেনে নেয়। এই রাজা ব্যক্তিটি যে বাস্তবের কোন মেকি রাজা নন, অন্তরাজ বা অন্তর্দেবতা, দ্বিতীয় পদাতিকের মত কুম্ভ তা বোঝে না। আর এক পথিক মাধব, রাজা বা ঈশ্বর আছেন কি নেই—এ নিয়ে তর্কে লিপ্ত হতে চায় না। নিজের মধ্যে সে একটা মীমাংসা করে নেয় যাকে মধ্যপন্থীর ঈশ্বর-মীমাংসা বলা যেতে পারে। সে বলে; "আমি এই বুঝি রাজা সত্যি হোক মিথ্যে হোক মেনে চলতেই, হবে। আমরা কি রাজা চিনি যে বিচার করব। অন্ধকারে ঢেলা মারা—যত বেশি মারবে একটা না একটা লেগে যাবে। আমি তাই একধার থেকে গড় করে যাই — সত্যি হলে লাভ; মিথ্যে হলেই বা লোকসান কী।" রাজবেশধারী নকল রাজাকে দেখে কুম্ভর সন্দেহ হয়। মীমাংসার জন্য সে ঠাকুরদার সন্ধানে ছোটে। ঠাকুরদা তাকে বলেন, লোক দেখিয়ে মনোরঞ্জন করা তাঁর রাজার কর্ম নয়। তাঁর রাজা সকলের সঙ্গে মিশে থাকেন বলে দশের সঙ্গে তাঁকে আলাদা বলে চেনাই যায় না। কুম্ভ রাজার পতাকায় কিংশুক ফুল অঙ্কিত হওয়ার কথা বললে ঠাকুরদা তার ভুল ধরিয়ে দিয়ে বলেন, তাঁর রাজার ধ্বজায় পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র আঁকা। ভিক্ষুক রাজাকে যেমন চিনতে পারে না তেমনি লোভীরা নকল রাজার জৌলুস দেখে তাকেই আসল রাজা মনে করে। কিন্তু রাজভক্তি তথা ঈশ্বরীয় ভক্তিতে উন্মাদ না হলে তাঁকে যে পাওয়া যায় না, সুখ-দুঃখের অনুভূতিহীন আত্মভোলা এক পাগলের গাওয়া 'তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই'— গানে তা ব্যক্ত হয়।

৩.৩.১১.১.৩ : কুঞ্জবনের দ্বার : ঠাকুরদা ও উৎসব বালকগণ —

এই দৃশ্যে উৎসবরত বালকগণকে ঠাকুরদা বলেন, "ওরে দরজার কাছে এসেছি, এবার খুব কষে দরজায় ঘা লাগা।" 'আজি কমলমুকুলদল খুলিল" গানের মধ্যে দিয়ে ঠাকুরদা 'মানসসরসে রসপুরকে' সকলকে মেতে ওঠার আহ্বান জানান।

এদিকে রঙ্গমঞ্চে অবন্তী-কাঞ্চী প্রভৃতি দেশের রাজগণ উপস্থিত। রাজার বনে উৎসবে আত্মাভিমানী অবন্তীরাজ ও কোশলরাজ বিশেষ সম্মান ও অভ্যর্থনা প্রত্যাশী। কাঞ্চীরাজ বলেন, জোর করে জায়গা নিজেরা তৈরি করে নেবেন। কোশলরাজের সন্দেহ হয়, এখানে রাজা নেই, একটা ফাঁকি চলে আসছে। রাজা ফাঁকি হলেও 'মহিষী সুদর্শনা নিতান্ত ফাঁকি নয়।' — সেই লোভেই অবন্তীরাজ ও কোশলরাজ এদেশে এসেছেন — মনের এই গোপন অভিপ্রায় তাঁরা প্রকাশ করে ফেলেন। এমন সময় নিশান উড়িয়ে নকল রাজবেশী সেদিকে আসেন। এই ভণ্ড নকল রাজার ছদ্মবেশে নিজেকে সেই রাজ্যের রাজা বলে প্রচার করেন। কাঞ্চীরাজ ভণ্ড রাজবেশীকে স্বপক্ষে টেনে নেন।

অন্যদিকে কুম্ভ ও অকিঞ্চনের দলের সঙ্গে ঠাকুরদা উৎসবে মেতে উঠেছেন—"মোদের কিছু নাইরে নাই, আমরা ঘরের বাইরে গাই—তাইরে নাইরে না" গানে। তারপর একদল স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঠাকুরদা রসালাপে লিপ্ত হন। এদিকে নাচের দলের প্রবেশে তাঁর চিরচঞ্চল চিত্ত উদ্বেল হয়। নাচতে নাচতে তিনি গাইতে থাকেন — 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে, তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ।' অসীমের আনন্দে বন্ধন থেকে মুক্তির আভাস ঝংকৃত হয় তাঁর কণ্ঠে। নাগরিক দলকে তিনি বুঝিয়েছেন, তাঁর রাজাকে তিনি কখনো ত্যাগ করেন নি, যেদিন তাঁর পাঁচ ছেলেই একে একে মারা গেল—সেই চরম দুর্দিনেও না। রাজা ঈশ্বরের ভজনাই যেখানে আসল কথা সেখানে লৌকিক প্রাপ্তির কথা ওঠে কেমন করে? ঠাকুরদাও তাই বলেন, রাজার সঙ্গে তাঁর বন্ধুর সম্পর্ক। আর বন্ধুকে কি কেউ পুরস্কার দেয়? রাজার অস্তিত্ব জাগতিক সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার অতীত। 'সুখে-দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়জয়ৌ' সব সময়েই তিনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন—এমন অভিব্যক্তি রয়েছে ঠাকুরদার গাওয়া 'বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে' গানে।

৩.৩.১১.১.৪ : প্রাসাদশিখর : সুদর্শনা ও সখী রোহিণী —

এই দৃশ্যে রানী সুদর্শনা নকল রাজবেশীকে আসল রাজা ভেবে সখী রোহিণীকে বলেন 'পদ্মপাতায় করে এই ফুলগুলি তাঁর হাতে দিয়ে আয়গে।' রাজাকে চিনতে পারার আগ্রহে তার মন ভীষণ চঞ্চল হয়। পূর্ণিমার আলো মদের ফেনার মতো চারিদিকে উপচে পড়ে তাঁকে যেন মাতাল করে তোলে। বসন্তকে সম্বোধন করে সে বলে— "ওগো বসন্ত, যে-সব ভীরু লাজুক ফুল পাতার আড়ালে গভীর রাত্রে ফোটে, যেমন করে তাদের গন্ধ উড়িয়ে নিয়ে চলেছে, তেমনি তুমি আমার মনকে হঠাৎ কোথাও উদাস করে দিলে, তাকে মাটিতে পা ফেলতে দিলে না।" আম্রবীথিকার ভিতর দিয়ে উৎসব-বালকেরা গান গেয়ে চলেছিল। উৎফুল্ল আবেগে তিনি প্রতিহারীকে আদেশ দেন ওদের ডেকে আনতে। ভগবান চন্দ্রমার দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হয়, তিনি যেন স্মিতহাস্যে—কৌতুকের তাঁকে কটাক্ষ করেছেন। আত্মগোপনের আর জায়গা নেই দেখে নিজের দিকে তাকিয়েই তিনি লজ্জাবোধ করেন। লজ্জা-ভয়-সুখ-দুঃখ সব মিলে সুদর্শনার বুকে নৃত্য শুরু করে— তার শরীরের রক্ত নাচে, চারিদিকের জগৎ নাচে, সমস্ত ঝাপসা ঠেকে। উৎসব-বালকগণের 'বিরহ মধুর হল আজি মধুরাতে' — গান শুনে সুদর্শনার চোখে জল ভরে আসে। তাঁর মনে হয় 'যা পাবার জিনিস তাকে হাতে পাবার জো নেই; তাকে হাতে পাবার দরকার নেই। এমনি করে খোঁজার মধ্যেই সমস্ত পাওনা যেন সুধাময় হয়ে আছে।" তাঁর ইচ্ছে করে, চোখে দেখা কানে শোনা হটিয়ে দিয়ে হৃদয়ের ভিতরটাতে যে গহন পথের কুঞ্জবন আছে সেইখানকার ছায়ার মধ্যে তিনি উদাসভাবে চলে যান। রোহিণী নকল রাজার কাছ থেকে ফিরে এলে তিনি অনুশোচনায় দগ্ধ হন—'ভাল করি নি, ভাল করি নি রোহিণী।' আকস্মিক ভাবেই সুদর্শনা বুঝতে পারেন, "যা সকলের চেয়ে বড়ো পাওনা তা যেমন ছুঁতে পাওয়া নয়, তেমনি যা সকলের চেয়ে বড়ো দেওয়া তা হাতে দেওয়া নয়।" সুদর্শনার আত্মদ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। অনুভব করেন, তাঁর দর্পচূর্ণ হয়েছে, তবুও সেই মোহন রূপের কাছ থেকে মন ফেরাতে পারেন না। তাঁর অভিমানের নির্মোক খসে পড়ে— 'পরাভব, সর্বত্রই পরাভব — বিমুখ থাকবে সে শক্তিটুকু নেই।' রোহিণীর কাছ থেকে নকল রাজবেশীর দেওয়া অগৌরবের মালাটা গ্রহণ করেও তা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করতে পারেন না—"এ যে কাঁটার মালার মতো আমার আঙুলে বিঁধছে, তবু ত্যাগ করতে পারলুম না। উৎসব-দেবতার হাত থেকে এই কি আমি পেলুম—এই অগৌরবের মালা!"

৩.৩.১১.১.৫ : কুঞ্জদ্বার : ঠাকুরদা ও একদল লোক —

এই দৃশ্যে একদল স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঠাকুরদা বসন্তোৎসবের স্মৃতিচারণমুখর। এ সময়ে বাউল এসে গান ধরেছে — 'যা ছিল কালো ধলো তোমার রঙে রঙে রাঙা হল' ইত্যাদি। এবারের বসন্তোৎসব যে খুব জমেছিল, চারদিক যে রঙে রঙে লালে লাল হয়ে গিয়েছিল, কেবলমাত্র ফাঁকি দিয়েছিল আকাশের চাঁদটা — সে সাদাই রয়ে গেল — প্রভৃতি বাউলের গানে-কথায় জানা গেল। ঠাকুরদা আকাশের ঐ সাদা চাঁদকেই তাঁর প্রিয়তম রাজার প্রতীকরূপে গ্রহণ করে বলেন, যিনি হৃদয়রাজ তিনি সকলকে রঞ্জিত করলেও নিজে অরঞ্জিতই থেকে যান। 'আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা' — 'প্রিয় আমার ওগো প্রিয়' ঠাকুরদার এই গানে তারই আভাস। স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রথমা ও দ্বিতীয়া বসন্ত পূর্ণিমার অচঞ্চল চাঁদ এত রাতেও পশ্চিমে একটুও হেলে পঁড়ে না বলে বিস্ময় প্রকাশ করে। ঠাকুরদা একে সর্বনাশের সংকেতরূপে অনুভব করেন। "আমার সকল নিয়ে বসে আসি সর্বনাশের আশায়। আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি পথে যে জন ভাসায়।" ঠাকুরদার পরাণ প্রিয় রাজা নিজে থেকে কারো কাছে ধরা দেন না, কাউকে ধরেও রাখেন না, সবার প্রতি তাঁর সমদৃষ্টি, আড়াল থেকে তিনি সবাইকে ভালোবাসেন। সেই গভীরের প্রতি গোপন ভালোবাসাতেই তাঁর মন মজেছে। ভীষণকে, ভয়ঙ্করকে, সর্বনাশকে ভালোবেসেই তিনি মুক্তির উল্লাস অনুভব করেছেন 'আমার ঘুর লেগেছে—তাধিন তাধিন' গানে।

সুরঙ্গমা শুনতে পায় কোথায় যেন বাঁশি বাজছে। সে জানতো, রাজা উৎসবে ভেপুর ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। কিন্তু ঠাকুরদা বলেন— "তাঁর বাঁশি কারো বাজনা ছাপিয়ে ওঠে, তা না হলে লজ্জায় আর সকলের তাল বন্ধ হয়ে যেতো।" সুরঙ্গমা অন্তরে অন্তরে অনুভব করে, তার প্রভু বোধহয় এবার তাকে দুঃখ দেবেন। অনেক দিন সে কাছে থেকে তাঁর সেবা করে এসেছে, এবার তিনি তাকে অনেক দূরে পাঠিয়ে দেবেন। ঠাকুরদা অনুভব করেন, রাজা এবার কাঁটাবনের পার থেকে সুরঙ্গমাকে দিয়ে পারিজাত তুলিয়ে আনাবেন। সেই দুর্গমের খবরটা জানতে তাঁর উৎসাহ। রাজার কাজে সম্ভাব্য সকল পথেই যে তিনি যাতায়াত করেছেন, সুরঙ্গমা তাঁকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এদিকে কাঞ্চিরাজ্য রাজবেশে করভোদ্যানের মধ্যে রানীর প্রাসাদে আগুন লাগিয়ে দেবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। অকস্মাৎ তাঁদের মাঝখানে আবির্ভূত হন ঠাকুরদা। পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবার আশঙ্কায় কাঞ্চীরাজ তাঁকে বন্দী করে শিবিরে নিয়ে যেতে চান।

৩.৩.১১.১.৬ : করভোদ্যান

এই দৃশ্যে রানীর সখী রোহিণী লক্ষ্য করে করভোদ্যানের মালিরা সব রাজার ডাকে সাত তাড়াতাড়ি কোথায় চলেছে। কোন্ রাজা? — জিজ্ঞাসা করলে তারা সঠিক জবাব দিতে পারে না; শুধু বলে, 'চিরদিন যে রাজার কাজ করছি সেই রাজা।' রোহিণী বিস্মিত হয়। এমন সময়ে কোশলরাজ ও অবন্তীরাজ করভোদ্যানে প্রবেশ করে রোহিণীর কাছে জিজ্ঞাসা করেন কাঞ্চীরাজ কোথায়। রোহিণী আঁচ করতে পারে, রাজাদের মধ্যে কী একটা ব্যাপার চলছে, শীঘ্রই একটা দুর্দৈব ঘটবে। কোশলরাজ ও অবন্তীরাজের ধারণা হয় কাঞ্চীরাজ বোধ হয় তাঁদের ফাকি দিয়ে বেড়াচ্ছেন। তাঁরা করভোদ্যান থেকে বাইরে বেরোবার পথটা দেখিয়ে দেবার জন্য রোহিণীকে অনুরোধ করে। রোহিণী বলে, সে পথ তার জানা নেই। মালিরা সব কোথায় জিজ্ঞাসা করলে সে জানাল যে রাজা তাদের সবাইকে বাগান ছেড়ে যেতে বলেছেন। কোন্ রাজা তা অবশ্য সে জানে না। তার মনে অনাগত বিপদের আশঙ্কা। রাজাকে দেখতে পেলে সে যেন বাঁচে। হঠাৎ সে লক্ষ্য করে, এত রাতে পাখিরা সব ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে কোথায় উড়ে চলেছে। রানীর পোষা হরিণী চপলা তার ডাক উপেক্ষা করেই ওদিকে কোথায় যেন দৌড়াল। এমন তো কখনোই হয় না। চারদিকের দিগন্ত মাতালের চোখের মতো হঠাৎ লাল হয়ে উঠেছে। যেন চারদিকেই অকালে সূর্যাস্ত হচ্ছে। বিধাতার এই উন্মত্ততা দেখে শঙ্কিত হয়েই সে রাজদর্শনপ্রত্যাশী।

৩.৩.১১.১.৭ : রানীর প্রাসাদদ্বার

এই দৃশ্যে রাজবেশী কাঞ্চীরাজের সংলাপ। সারা করবোদ্যানে আগুন লাগানো কাঞ্চীরাজের উদ্দেশ্য ছিল না, শুধু প্রাসাদের কাছটাতেই তিনি আগুন ধরাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে আগুন যে এত শীঘ্র চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে তা তিনি ভাবতেও পারেন নি। রাজবেশীর কাছে করভোদ্যান থেকে বেরোবার পথের সন্ধান না পেয়ে ক্রুদ্ধ কাঞ্চীরাজ তাকে দু'টুকরো করে কেটে ফেলার ভয় দেখান। নকল রাজা ভয়ে আসল রাজার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করে আর্তসুরে বলে উঠেন— "আমি রাজা না, রাজা না। (মাটিতে পড়িয়া জোর করে) কোথায় আমার রাজা, রক্ষা করো। আমি পাপিষ্ঠ, আমাকে রক্ষা করো। আমি বিদ্রোহী, আমাকে দাণ্ড দাও, কিন্তু রক্ষা করো।" কাঞ্চীরাজ তাকে শূন্যতার কাছে নিষ্ফল চিৎকারের চেয়ে পথ বের করবার জন্য সচেষ্ট হতে আদেশ দেন। রাজবেশী তাতে অনীহা প্রকাশ করে ভবিতব্যের উপর নিজেকে ছেড়ে চাইলে কাঞ্চীরাজ ব'লে উঠেন— 'সে হবে না। পুড়ে মরি তো একলা মরবো না, তোমাকে সঙ্গী নেব।' এমন সময়ে নেপথ্যে শোনা যায় আর্তস্বর—'রক্ষা করো রাজা, রক্ষা করো। চারিদিকে আগুন।' কাঞ্চীরাজ রাজবেশীকে বলেন — 'মূঢ়, ওঠ্ আর দেরি না।' ইতোমধ্যে সুদর্শনা প্রবেশ করে চিৎকার করে বলে ওঠেন — 'রাজা রক্ষা করো। আগুনে ঘিরেছে।' রাজবেশী বলেন— 'কোথায় রাজা? — আমি রাজা নই।' বিস্মতা সুদর্শনা আবার তাকে জিজ্ঞাসা করেন — 'তুমি রাজা নও।" আমি ভণ্ড, আমি পাষণ্ড। (মুকুট মাটিতে ফেলিয়া) আমার ছলনা ধূলিসাৎ হোক্'—এই কথা বলে রাজবেশী কাঞ্চীরাজের সঙ্গে সেখান তেকে চলে যায়।

বিস্ময়ের ঘোর কাটবার সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শনা অনুশোচনা-পর্ব শুরু হয়। অগ্নিতে আত্মবিসর্জন দিয়ে এই লজ্জা ও অপমানের হাত থেকে তিনি নিষ্কৃতি কামনা করেন—"রাজা না! এ রাজা না! তবে ভগবান হুতাশন, দগ্ধ করো আমাকে; আমি তোমারই হাতে আত্মসমর্পণ করব। হে পাবন, আমায় লজ্জা, আমার বাসনা পুড়িয়ে ছাই করে ফেলো।" সখী রোহিণী রাণীকে নিষেধ করে, অন্তঃপুরের চারদিকে আগুন ধরে গেছে, তিনি যেন ওর মধ্যে প্রবেশ না করেন। সুতীব্র অন্তর্দাহে সুদর্শনা বলেন— "আমি তারই মধ্যে প্রবেশ করব। এ আমারই মরবার আগুন।' পরে তিনি প্রাসাদদে প্রবেশ করেন।

৩.৩.১১.১.৮ : অন্ধকার কক্ষ

এই দৃশ্যে অন্ধকার কক্ষে রাজা ও সুদর্শনার নিভৃত আলাপ। রাজা সুদর্শনাকে অভয় দিয়ে বলেছেন, এ ঘরে আগুন এসে পৌঁছবে না। সুদর্শনার ভয় নেই, কিন্তু লজ্জা! লজ্জা যে আগুনের মতে তার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। তার মুখ-চোখ, তার সমস্ত

হৃদয়টাকে রাঙা করে রেখেছে। রাজা বলেন—‘এ দাহ মিটতে সময় লাগবে।’ সুদর্শনা বলেন, তা কোন দিন মিটবে না। রাজা তাকে অভয় দিয়ে বলেন — ‘হতাশ হয়ো না রানী।” মনের মধ্যে জমে ওঠে লজ্জা ও অনুশোচনার মেঘকে একটু হালকা করার অভিপ্রায় সুদর্শনা রাজাকে বলেছে— “তোমার কাছে মিথ্যে বলব না রাজা—আমি আর একজনের মালা গলায় পরেছি।” রাজা—বলছেন “ও মালাও যে আমার নইলে সে পাবে কোথা থেকে। সে আমার ঘর থেকে চুরি করে এনেচে।” তীব্র অনুশোচনাদগ্ধা সুদর্শনা রাজার কাছে তাঁর পাপবোধের কথা নিবেদন করে অন্তর্দাহের পরিচয় দিয়েছেন— “আমি তোমাকে বাইরে দেখব বলে পতঙ্গের মতো এ কোন্ আগুনে ঝাঁপ দিলুম! আমিও মরি না, আগুনও নেবে না, এ কী জ্বালা!” রাজা বলেন—“তোমার সাধ তো মিটেছে, আমাকে তো আজ দেখে নিলে।” সুদর্শনা জানান যে তিনি তাঁকে সর্বনাশের মধ্যে দেখতে চাননি, তার বুকের কাঁপুনি এখনও থামেনি। রাজা জিজ্ঞাসা করেন— ‘কেমন দেখলে রানী?’ সুদর্শনা বলেন—“ভয়ানক, সে ভয়ানক। সে আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়। কালো, কালো, তুমি কালো’ .... ধূমকেতু যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো তুমি কালো। .... ঝড়ের মেঘের, মতো কালো, কুলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো—তারই তুফানের উপর সন্ধ্যার রক্তিমা।” রাজা তাকে বলেছেন— “এই কালোতেই একদিন তোমার হৃদয় স্নিগ্ধ হয়ে যাবে। নইলে আমার ভালোবাসা কিসের।” গানের মধ্যে দিয়ে সুদর্শনাকে তিনি আভাস দিয়েছেন তাঁর প্রেমের রীতি— “আমি রূপে তোমার ভোলাব। আমি হাত দিয়ে দ্বারা খোলাব।” প্রভৃতি। তবুও রূপের নেশায় উদ্‌ভ্রান্ত সুদর্শনা রাজাকে ছেড়ে যেতে চেয়েছেন—“কেন আমাকে লোকে বলেছিল, তুমি সুন্দর! তুমি যে কালো, কালো — তোমাকে আমার কখনও ভালো লাগবে না। আমি যা ভালোবাসি তা আমি দেখেছি — তা ননীর মতো কোমল, শিরীষ ফুলের মতো সুকুমার, তা প্রজাপতির মতো সুন্দর! .... আমাকে এখান থেকে যেতেই হবে। তোমার সঙ্গে মিলন যে আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব!” রাজাকে ছেড়ে দূরে চলে যাবার চেষ্টায় সুদর্শনার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। রাজা তবুও তাঁকে আটকে রাখার কোনো চেষ্টাই করেন না। রাজার এই ঔদাসীন্যে সুদর্শনার ক্ষোভ ও অভিমান চরমে ওঠে— “তুমি কেশের গুচ্ছ ধরে জোর করে আমাকে টেনে রেখে দাও কেন! তুমি আমাকে মারো না কেন! মারো, মারো, আমাকে মারো! তুমি আমাকে কিছু বলছ না, সেই জন্যেই আরো অসহ্য বোধ হচ্ছে।” রানীর আকাঙ্ক্ষা, রাজা তাকে জোর করে ধরে রাখুন, কিন্তু সে ইচ্ছা বারে বারে প্রতিহত হয়। জোর করে স্পর্ধা ভরে চলে যেতে গিয়েও রানী যখন ফিরে এসে রাজার খোঁজ করেন রাজা তখন অদৃশ্য হয়েছেন। রাজার এই অবহেলায় রানীর অভিমানে আঘাত লাগে। নিজেকে তিনি সর্বপ্রকার বাঁধন থেকে মুক্ত মনে করেন। সুরঙ্গমার সঙ্গে আলাপে তিনি জানতে পারেন, তাঁর রাজা কাউকে কোনোদিন বিনাশ করেন না, শাস্তিও দেন না। তাই বন্দী রাজাদের তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। কাঞ্চীরাজ পরাভব স্বীকার করে দেশে ফিরে গেছেন।

সুদর্শনাকে ভালোবেসেই সুরঙ্গমা প্রভুকে ছেড়ে তাঁর দূরযাত্রার সঙ্গী হতে চায়। তার বিশ্বাস, তারা দূরে গেলেও প্রভু তাদের কাছে কাছেই থাকবেন। তাই সে সুদর্শনার কলঙ্ক গায়ে মেখে নেয়, গান গেয়ে ওঠে—‘আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্ক ভাগী। আমি সকল দাহে হব দাগি।’ ইত্যাদি।

৩.৩.১১.১.৯ : সুদর্শনার পিতা কান্যকুব্জরাজ ও মন্ত্রী

এই দৃশ্যে কান্যকুব্জরাজ ও তাঁর মন্ত্রী সুদর্শনার স্বামীগৃহত্যাগের খবর পেয়েছেন। মন্ত্রী সুদর্শনাকে সমাদর করে বরণ করবার অভিপ্রায় জানালে মহারাজ বলে ওঠেন— “হতভাগিনী স্বামীকে ত্যাগ করে আসছে, অভ্যর্থনা করে তার সেই লজ্জা ঘোষণা করে দেবে? অন্ধকার হোক, রাস্তায় যখন লোক থাকবে না তখন সে গোপনে আসবে!” মন্ত্রী প্রাসাদে সুদর্শনার থাকার ব্যবস্থা করে দিতে চাইলে কান্যকুব্জরাজ রূঢ় ভাষায় তাকে নিরস্ত করেন— “কিছু করতে হবে না। ইচ্ছে করে সে আপনার একেশ্বরী রানীর পদ ত্যাগ করে এসেছে—এখানে রাজগৃহে তাকে দাসীর কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে।” মহারাজ সুদর্শনার জন্য অনর্থপাতের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁর মনে হয়, — ‘নারী যখন আপন প্রতিষ্ঠা থেকে ভ্রষ্ট হয় তখন সংসারে সে ভয়ঙ্কর বিপদ হয়ে দেখা দেয়।’

৩.৩.১১.১.১০ : অন্তঃপুর

এই দৃশ্যে আত্মদহনে দগ্ধ সুদর্শনার মধ্যে আগুন জ্বলতে থাকে। সুদর্শনার শান্ত নীরবতা মহারাজার কাছে অসহ্য বোধ হয়। কার উপর তাঁর রাগ তিনি বুঝতে পারেন না। কিন্তু তাঁর ধারণা, অতবড়ো রানীর পদ এক মুহূর্তে বিসর্জন দিয়ে আসার মতো ঘটনায় বিধ্বংসী একটা কিছু ঘটবে—মশাল জ্বলে উঠবে, ধরণী কেঁপে উঠবে। কারণ তাঁর পতন তো শিউলি ফুলের খসে পড়া

নয়। তা কি নক্ষত্রের পতনের মতো অগ্নিময় হয়ে দিগন্ত বিদীর্ণ করে দেবে না। সুরঙ্গমা দাবানলের সংকেত অনুভব করে। সুদর্শনা অসহায় একাকীত্বের বেদনায় বিহ্বল। সুরঙ্গমা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তিনি একলা নন। ক্রমশঃ রাজবেশীর (সুবর্ণ) মেকী রূপটা সুদর্শনার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রূপলালসা, আত্মবঞ্চনা ও অগৌরবে হাত থেকে তাঁর রাজা তাঁকে মুক্ত করতে এলেন না বলে তাঁর অভিমান তীব্র হয়। সুরঙ্গমাকে তিনি বলেন, 'তোর রাজার কি উচিৎ ছিল না আমাকে এখনো ফেরাবার জন্যে আসে।' সুরঙ্গমা বলে, তার রাজা কঠিন, নিষ্ঠুর, তাকে কেউ কোনো দিন টলাতে পারে না। রাজাকে পর্বতের মতো কঠিন জেনেও সে বিচলিত হয় না, বলে— 'আমার দুঃখ আমারই থাক্, সেই কঠিনেরই জয় হোক।' হঠাৎ মাঠের পারে পুবদিগন্তে ধূলো উড়তে দেখে সুদর্শনা ভাবেন, ঐ বুঝি তাঁর রাজা তাঁকে নিতে এলেন। মনে মনে স্থির করেন, রাজা এসে তাঁকে ডাকলেও তিনি কখনো যাবেন না। কিন্তু এত হীনতা থেকেও রাজা তাঁকে উদ্ধার করতে এলেন না। সুরঙ্গমার অহেতুক প্রভুভক্তির দীনতাও তাঁর কাছে হেয় মনে হ'ল।

৩.৩.১১.১.১১ : শিবির

এই দৃশ্যে কাহ্নকুঞ্জরাজের দূতের সঙ্গে কাঞ্চীরাজের বাক্যবিনিময়। কাঞ্চীরাজ সুদর্শনাকে লাভের আশায় ভণ্ডরাজা সুবর্ণকে সুদর্শনার স্বামী বলে পরিচয় দেন এবং ক্ষত্রিয়ধর্মানুসারে বলপূর্বক সুদর্শনাকে কেড়ে নিয়ে যাবার হুমকি দিলে দূতও সমুচিত জবাব দেয়। একজন সৈনিক এসে কাঞ্চীরাজকে খবর দেন যে, কোশলরাজ, অবন্তীরাজ ও কলিঙ্গরাজ সসৈন্যে আসছেন। ধূর্ত কাঞ্চীরাজ বুঝতে পানের, সুদর্শনার পলায়ন-সংবাদ রটে গিয়েছে; এখন সকলে মিলে কাড়াকাড়ি করে বসলে সকলেই ব্যর্থ হ'বে। তৎসত্ত্বেও দৃঢ়বিশ্বাসে তিনি সুবর্ণকে বলেন— 'আমি এখনো বলছি, তোমাদের রাজা আগাগোড়াই ফাঁকি।' অতঃপর জনৈক সৈনিক তাঁকে সংবাদ দেয় যে বিরাট, পাঞ্চাল ও বিদর্ভরাজও নদীর ওপারে এসে ছাউনি ফেলেছেন।

৩.৩.১১.১.১২ : অন্তঃপুর

এই দৃশ্যে সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার ভাববিনিময়। রাজাকে কেন্দ্র করে অভিমানের পাহাড় জমে উঠেছে সুদর্শনার মনে। সুরঙ্গমাকে তিনি বলেন, "তোর রাজার যদি রক্ষা করবার শক্তি থাকত তা হলে আজ তিনি কি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারতেন?" সুরঙ্গমা জবাব দেন — 'আমি কিছুই বুঝিনে জানি, সেই জন্যে কোনো দিন তাঁর বিচার করিনে।' সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার সংলাপে জানা গেল, সাতজন রাজাই যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। সুবর্ণ কাঞ্চীরাজের শিবিরে বন্দী। এই সময়ে পিতার দুর্দৈবে নিজেকে অপরাধী ভেবে সুদর্শনা আন্তরিকভাবে রাজার উপস্থিতি কামনা করেন— "রাজা, রাজা, আমার পিতাকে রক্ষা করবার জন্যে যদি আসতে তাহলে তোমার যশ বাড়ত বৈ কমত না।" হঠাৎ তাঁর মনে হয়, জানলার নীচে যেন বীণা বাজছে। তাঁর স্মৃতিচারণায় অন্ধকার বাসরকক্ষের বাতায়ন ও সঙ্গীতমুখর সন্ধ্যার মুগ্ধতা প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। সুরঙ্গমা আবেগের সঙ্গে বলে ওঠে— 'আহা মা, সে কী অন্ধকার। সেই অন্ধকারের দাসী আমি।' এই সময় দ্বারী এসে খবর দেয়, মহারাজা বন্দী হয়েছেন।

৩.৩.১১.১.১৩ : বন্দি কাহ্নকুঞ্জরাজ, অন্যানা রাজগণ ও সুবর্ণ

এই দৃশ্যে সুবর্ণসহ কাঞ্চী, কলিঙ্গ, বিদর্ভ, কোশল প্রভৃতি দেশের বিজয়ী নরপতিগণ বীরত্বের পুরস্কার হিসেবে 'জয়মাল্য' ছেড়ে 'বরমাল্য' গ্রহণে উৎসাহী। তাঁরা সকলেই 'জয়লক্ষ্মী' রাজকন্যা সুদর্শনার পাণিপ্রার্থী। এদিকে কাঞ্চীরাজের প্রস্তাব, রাজকন্যা স্বয়ংবৃতা হোন— 'এই স্বয়ংবর সভায় রাজকন্যা স্বয়ং যাঁর গলায় মালা দেবেন, বসন্তের সফলতা তিনি লাভ করবেন।' অন্যান্য রাজগণ এই প্রস্তাবে সম্মত হলেও এতে শঙ্কিত কাহ্নকুঞ্জরাজ আত্মমর্যাদা রক্ষায় গর্জে ওঠেন, 'রাজগণ, আমাকে বধ করুন অথবা দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি, আপনারা আসুন — আমাকে জীবিত-মৃত্যুর হাতে সমপর্ণ করবেন না।'

অন্তঃপর কুশলী কাঞ্চীরাজ সুদর্শনার বরমাল্য লাভের প্রত্যাশায় ভণ্ডরাজ সুবর্ণকে আসন্ন স্বয়ংবর সভায় তাঁর 'ছত্রধর' মনোনীত করেন। শঙ্কিত সুবর্ণ অমূলক কল্পনা — এই মিথ্যা বিপত্তিজাল থেকে মুক্তি চাইলে কাঞ্চীরাজ জানিয়ে দেন, উদ্দেশ্য সফল হলেই তাঁর মুক্তির জন্য তিনি এক মুহূর্তও বিলম্ব করবেন না।

৩.৩.১১.১.১৪ : বাতায়ন : সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা

এই দৃশ্যে পিতার প্রাণ রক্ষার জন্য সুদর্শনা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ও স্বয়ংবর সভায় প্রবেশ করেছেন। সভায় রাজাগণ বসে আছেন। সুরঙ্গমা বসন্তোৎসবের স্মৃতিচিহ্নবহনকারী কাঞ্চীরাজ ও তাঁর ছত্রধর সুবর্ণের প্রতি সুদর্শনার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তার মন লজ্জায়-ঘৃণায় জর্জরিত হ'ল— "ওই সুবর্ণ। তুই সত্যি বলছিস? .... ওকেই সেদিন আমি দেখেছিলুম? না, না, সে আমি আলোতে-অন্ধকারে বাতাসে-গন্ধেতে মিলে আর একটা কী দেখেছিলুম। ও নয়, ও নয়।" সুরঙ্গমা বলেন, 'সকলে তো বলে, ওকে চোখে দেখতে সুন্দর।' বিস্মিতা সুদর্শনা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন — 'ওই সুন্দরেও মন ভোলে! আমার এ পাপ চোখকে কী দিয়ে ধূলে এর গ্লানি চলে যাবে।' সুরঙ্গমা উত্তর দেয়— "সেই কালোর মধ্যে ডুবিয়ে ধুতে হবে— সেই আমার রাজার সকল রূপ ডোবানো রূপের মধ্যে। রূপের কালি যা-কিছু চোখে লেগেছে সব যাবে।" এমন ভুলেও মানুষ ভোলে কেন? —সুদর্শনার এই প্রশ্নের জবাবে সুরঙ্গমার সংক্ষিপ্ত উত্তর — 'ভুল ভাঙ্গবে বলে ভোলে।' রাজা তাঁকে ত্যাগ করেছেন এই অভিমানে সুতীব্র আত্মদহনে জর্জর সুদর্শনা স্বয়ংবর সভায় বুকে ছুরি মেরে আত্মহননের পথ বেছে নেন—"... দেহে আমার কলুষ লেগেছে, এ দেহ আজ আমি সবার সমক্ষে ধুলোয় লুটিয়ে যাব। কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমার দাগ লাগে নি —বুক চিরে সেটা কি আজ জানিয়ে যেতে পারব না? তোমার সেই মিলনের অন্ধকার ঘরটি আমার ভিতরে আজ শূন্য হয়ে রয়েছে—সেখানকারক দরজা কেউ খোলে নি প্রভু! সে কি খুলতে তুমি আর আসবে না? তবে দ্বারের কাছে তোমার বীণা আর বাজবে না? তবে আসুক মৃত্যু, আসুক— সে তোমার মতোই কালো, তোমার মতোই সুন্দর, তোমার মতোই সে মনোহরণ করতে জানে। সে তুমিই, সে তুমি।" গানের মধ্যে দিয়ে সুদর্শনা তাঁর সকল বাসনা, বিকৃতি, ইচ্ছা প্রভৃতি 'অন্ধকারের স্বামী'র পায়ে নিবেদন করেছেন : সকল আমিত্ব বিসর্জন দিয়ে তাঁর প্রিয়, শ্রেয়, পরমের সঙ্গে বাঁধা পড়তে চেয়েছেন।

৩.৩.১১.১.১৫ : স্বয়ংবর সভা : রাজগণ

এই দৃশ্যে সুদর্শনালাভেচ্ছ কাঞ্চীরাজের অঙ্গে কোনো আভরণ নেই দেখে বিদর্ভ-কলিঙ্গ বিরাট-পাঞ্চাল প্রভৃতি দেশের নরপতিগণ তাঁর সঙ্গে রসিকতা করছেন। হঠাৎ কোশলরাজের মনে হয়, বোধহয় ভূমিকম্পে তাঁদের আসনগুলো কেঁপে উঠেছে। কলিঙ্গ ও পাঞ্চালরাজ বাজনার আওয়াজ শুনতে পেলে কাঞ্চীরাজ তাকে সুদর্শনার পায়ের শব্দ বলে মনে করেন। সংকুচিত সুবর্ণ কাঞ্চীরাজের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। তার হাতের রাজছত্র কাঁপতে থাকে।

এমন সময় যোদ্ধৃবেশে ঠাকুরদা এলেন স্বয়ংবর সভায়। বললেন—রাজা এসেছেন, তিনি তাঁদের সকলকে যুদ্ধে আহ্বান করেছেন, তিনি রাজসেনাপতি।

কাঞ্চীরাজ ঠাকুরদাকে চিনতেন। তাই তাঁর কথা তিনি বিশ্বাস করলেন না। একমাত্র বিদর্ভরাজ ছাড়া সকল রাজাই যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত। ইত্যবসরে কাঞ্চীরাজের ছত্রধর সুবর্ণ কখন যে পালিয়েছে কে জানেন না। রাজছত্র ধুলোয় লুটোচ্ছে দেখে কাঞ্চীরাজ ঠাকুরদাকে জানালেন তিনি রণক্ষেত্রে যাচ্ছেন। ঠাকুরদা বললেন, — 'রণক্ষেত্রেই আমার প্রভুর সঙ্গে আপনার পরিচয় হোক, সেও অতি উত্তম প্রশস্ত স্থান।

৩.৩.১১.১.১৬ : সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা

এই দৃশ্যে যুদ্ধশেষে রাজা কখন আসবেন তাই নিয়ে সুরঙ্গমার কাছে সুদর্শনার উৎকণ্ঠা। আনন্দে তাঁর বুকের ভেতরটা এমন কাঁপছে যে বেদা বোধ হচ্ছে। রাজার কাছে মুখ দেখাবেন কেমন করে — এই লজ্জাতে তিনি ম্রিয়মান। সুরঙ্গমা তাঁকে বলেছেন, — "এবার হার মেনে তাঁর কাছে যাও, তাহলে আর লজ্জা থাকবে না।" সুদর্শনা স্বীকার করেন যে রাজার কাছে তাঁর চিরদিনের মতো হার হয়ে গেছে। কিন্তু রূপের গর্ব, গুণের প্রশংসা, তাঁর প্রতি রাজার অন্তহীন অনুগ্রহ—এ সবই তাঁকে বড়ো বেশি অভিমানী করে তুলেছে বলেই সকলের সামনে তাঁর হৃদয় নত হতে এত লজ্জাবোধ করছে। সুরঙ্গমা বলেছে, 'অভিমান না ঘুচলে তো লজ্জাও ঘুচবে না!' কিন্তু রাজার কাছ থেকে তাঁর আদর পাবার ইচ্ছা কিছুতেই মনে থেকে ঘুচতে চায় না। সুরঙ্গমা বলে, 'সব ঘুচবে রানী মা! কেবল একটি ইচ্ছা থাকবে, নিজেকে নিবেদন করবার ইচ্ছা।' বিনীতা সুদর্শনা ইচ্ছা হয় — দেখা নয়, শোনা নয়, চাওয়া নয়, কেবল গভীরের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে নিই। কিন্তু এখনও তিনি অহংকে বিসর্জন দিতে পারেন নি। 'আমার রাজা নিষ্ঠুর'—সুরঙ্গমা একথা বলা সত্ত্বেও রানী আশা ছাড়েন নি যে রাজা নিজে তাঁকে নিতে আসবেন।

এমন সময়ে ঠাকুরদার প্রবেশ। সুদর্শনা তাঁকে প্রণাম করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন—"তুমি আমার রাজার বন্ধু — আমার প্রণাম গ্রহণ করেন না, সকলের সঙ্গে তাঁর হাসির সম্বন্ধ। সুদর্শনা তাঁর কাছে রাজার সংবাদ জানতে চান। ঠাকুরদা বলেন, "যুদ্ধ শেষে তিনি যে কোথায় চলে গেলেন তার হদিশ নেই।" অভিমানী সুদর্শনা আর্তনাদ করে ওঠেন —"চলে গেলেন। ওরে ওরে, কী কঠিন কী কঠিন। একেবারে পাথর, একেবারে বজ্র। সমস্ত বুক দিয়ে ঠেলছি —বুক ফেটে গেল — কিন্তু নড়ল না।" ঠাকুরদাকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, এমন বন্ধুকে নিয়ে তাঁর চলে কি করে। ঠাকুরদা বলেন— 'চিনে নিয়েছি যে — সুখে-দুঃখে তাকে চিনে নিয়েছি — এখন আর সে কাঁদাতে পারে না।' সুদর্শনা জিজ্ঞাসা করেন — 'আমাকেও সে কি চিনতে দেবে না।' ঠাকুরদা বলেন — "দেবে বৈ কি — নইলে এত দুঃখ দিচ্ছে কেন? ভালো করে চিনিয়ে তবে ছাড়বে।" অশান্তচিত্ত সুদর্শনা রাজার নিষ্ঠুরতা মেনে নিতে পারেন না। কখনো জিদ করে জানালার পাশে নিশ্চল পড়ে থেকে রাজা কেমন না আসেন তা যাচাই করতে চান। আবার কখনো সুরঙ্গমাকে চিৎকার করে বলে ওঠেন — "চাই নে, তাকে চাই নে। সুরঙ্গমা, তোর রাজাকে আমি চাই নে। কিসের জন্যে সে যুদ্ধ করতে এল? আমার জন্যে একেবারেই না? কেবল বীরত্ব দেখবার জন্যে?" সুরঙ্গমা এসব অভিযোগ অস্বীকার করেন।

৩.৩.১১.১.১৭ : নাগরিকদল

এই দৃশ্যে তিনজন পথিকের কথাবার্তায় যুদ্ধের ফলাফল জানা যায়। এই যুদ্ধে একমাত্র ব্যতিক্রম কাঞ্চীরাজ যিনি শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছিলেন, আর সবাই রণে ভঙ্গ দিয়েছিলেন। যুদ্ধে সকল রাজাই পরাজিত হয়ে বন্দী হন। তাঁদের সবারই দণ্ড হল। কেবল কাঞ্চীরাজকে বিচারক নিজের সিংহাসনের পাশে বসিয়ে আপন হাতে তাঁর মাথার রাজমুকুট পরিয়ে দিলেন। পথিকেরা মহারাজের এই বিচিত্র বিচারপদ্ধতি দেখে বিস্ময়বোধ করেন।

৩.৩.১১.১.১৮ : শিবির

এই দৃশ্যে কাঞ্চীরাজকে পথের মধ্যে দেখে ঠাকুরদা বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনি বলেন যে রাজাই তাঁকে পথে বের করেছেন। 'ঠাকুরদাও বলেন, 'ওই তো তার স্বভাব'। এক সময়ে যে কাঞ্চীরাজকে মানতেই চাইতেন না, এখন তিনিই সেই রাজার কাছে হার মানবার জন্যে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু এখনও দিনের আলোয় পথে বের হতে তাঁর লজ্জা। ঠাকুরদাকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন তার শম্ভু-সুধনের দলের কথা। সবার আগে তারা যুদ্ধে মরেছে শুনে মন্তব্য করেন, 'সিধে রাস্তা ধরে সব বুদ্ধিমানের চেয়ে এগিয়ে গেল আর কি।' ঠাকুরদা আবার নতুন ছেলেদের নিয়ে পথে বের হয়েছেন। কণ্ঠে তাঁর ঘরের মানুষদের পথে বের করার আহ্বান — 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।'

৩.৩.১১.১.১৯ - পথ সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা

এই দৃশ্যে সুদর্শনার অভিমানের কঠিন বরফ গলতে শুরু করেছে। মুক্তির উল্লাসে তিনি সরঙ্গমাকে বলেন, "বেঁচেছি সুরঙ্গমা। হার মেনে তবে বেঁচেছি। ওরে বাসরে! কী কঠিন অভিমান! কিছুতেই গলতে চায় না! আমার রাজা কেন আমার কাছে আসতে যাবে, আমিই তাঁর কাছে যাব।" .... সুদর্শনা এরই মাঝে শুনতে পান কোথায় যেন বীণা বাজছে করুণ মিনতির সুরে। সুরঙ্গমাকে জিজ্ঞাসা করেন সে ঐ বীণার সুর শুনেছিল কিনা। সুরঙ্গমা বলে, "সেই বীণা শুনব বলেই তো তোমার কাছে আছি। অভিমান-গলানো সুর বাজবে জেনেই কান পেতে পড়েছিলাম।" আত্মসমর্পণের প্রস্তুতির মধ্যেও সুদর্শনা গর্ব অনুভব করে — "মলন হলে এই কথাটাই তাকে বলব যে, আমিই এসেছি, তোমার আসার অপেক্ষা করি নি, বলব, চোখের জল ফেলতে ফেলতে এসেছি, কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতে এসেছি। এ গর্ব আমি ছাড়ব না।" কিন্তু তাঁর সে গর্বও টেকে না। অনুতাপ ও বেদনার আগুনে প্রায়শ্চিত্ত করে, পরিশুদ্ধ মনে, সকল অহংকার চোখের জলে ডুবিয়ে, মোহমুক্ত সুদর্শনা বেরিয়ে পড়লেন পথে। সুরঙ্গমাও তার সঙ্গে গেল। এদিকে কাঞ্চীরাজও মুক্তির আহ্বান শুনতে পেয়ে রাজার সন্ধানে পথে বের হয়েছেন। পথের মধ্যেই রাণী ও সুরঙ্গমার সঙ্গে তাঁর দেখা। মোহমুক্ত কাঞ্চীরাজ সুদর্শনাকে মাতৃসম্বোধন করে রথ এসে দিতে চাইলে সুদর্শনা বলেন — "না, না অমন কথা বোলো না — যে পথ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে দূরে এসেছি সেই পথের সমস্ত ধুলোটা পা দিয়ে মাড়িয়ে ফিরব, তবেই আমার বেরিয়ে আসা সার্থক হবে। রথে করে নিয়ে গেলে আমাকে ফাঁকি দেওয়া হবে।.... যখন রাণী ছিলুম তখন কেবল সোনারূপোর

মধ্যেই পা ফেলেছি, আজ তাঁর ধুলোর মধ্যে চলে আমার সেই ভাগ্যদোষ খণ্ডিয়ে নেব। আজ আমার সেই ধূলোমাটির রাজার সঙ্গে পদে পদে এই ধূলোমাটিতেই মিলন হচ্ছে — এ সুখের খবর কে জানত।”

ঠাকুরদাও রাণীকে বলেছেন — “এই দীনবেশে তুমি রাজভবনে যাচ্ছ, একটু দাঁড়াও, আমি ছুটে গিয়ে রাণীর বেশটা নিয়ে আসি।” সুদর্শনা বলেছেন — ‘না না না! সে রাণীর বেশ আমাকে তিনি চিরদিনের মতো ছাড়িয়েছেন, সবার সামনে আমাকে দাসীর বেশ পরিয়েছেন — বেঁচেছি, বেঁচেছি। আমি আজ তাঁর দাসী — যে কেউ তাঁর আছে, আমি আজ সকলের নীচে।” রাজা সে সবার রাজা — এই অনুভব থেকে ঠাকুরদা বলেছেন — ‘সকলে মিলে আজ ধূসর হয়ে প্রভুর কাছে যাব।’ কাঞ্চীরাজও তাঁর সঙ্গী হ’লেন। রাজা অরূপ হয়েও রূপপ্রিয়। ঠাকুরদা তাই বলেন — “আমাদের রাজাটির নিজের নাকি রূপের সম্পর্ক নেই, তাই তো এই বিচিত্র রূপ সে এত ভালোবাসে, এই রূপেই তো তার বক্ষের অলঙ্কার।” সুরঙ্গমার কণ্ঠে তখন সূর্যোদয়ের মাঙ্গলিক।

৩.৩.১১.১.২০ - অন্ধকার ঘর

এই দৃশ্যে আবার সেই অন্ধকার ঘরে রাজার সঙ্গে রাণীর দেখা। রাণী আত্মনিবেদন করে বলেছেন — ‘আমি তোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও।’ রাজা তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য বলেছেন, ‘আমাকে সইতে পারবে?’ রাণী বলেছেন — ‘পারব রাজা, পারব। আমার প্রমোদবনে, আমার রাণীর ঘরে তোমাকে দেখতে চেয়েছিলুম বলে তোমাকে এমন বিরূপ দেখেছিলুম — সেখানে তোমার সাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে চোখে সুন্দর ঠেকেছে। তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা আমার একেবারে ঘুচে গেছে। তুমি সুন্দর নও প্রভু, তুমি অনুপম।” প্রেমের মধ্যে সুদর্শনা রাজার দর্শন পেলেন। তখন রাজা তাঁকে খুলে দিলুম। এখানকার লীলা শেষ হল। এসো, এবার আমার সঙ্গে এসো, বাইযর চলে এসো — আলোয়।”

পরিশেষে মোহমুক্ত সুদর্শনা বলেছেন — ‘যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে, আমার নিষ্ঠুরকে, আমার ভয়ানককে প্রমাণ করে দিই।’ এখানেই নাটকটি শেষ হয়েছে।

৩.৩.১১.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। ‘রাজা’ নাটকের বিষয়বস্তু আলোচনা করো।

২। নাটকের মূল বিষয়বস্তু অনুসারে নাটকটির ব্যঞ্জনার্থ বিচার করো।

৩.৩.১১.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা — উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

২। রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ — প্রমথনাথ বিশী

৩। বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম — স্বামী বিদ্যারণ্য

একক — ১২

নাট্যবিশ্লেষণ

বিন্যাস ক্রম

৩.৩.১২.১ : নাট্য বিশ্লেষণ

৩.৩.১২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩.৩.১২.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩.৩.১২.১ - নাট্য বিশ্লেষণ

রবীন্দ্রনাথ রাজেন্দ্রলাল মিত্র-অনূদিত 'কুশজাতক'-এর সংক্ষিপ্ত কাহিনী থেকে রাজা নাটকের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। সুতরাং মূল মহাবস্তু-অবদান-এর বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ কাহিনীর সঙ্গে তার হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। অস্বীকার করে লাভ নেই যে, বিষয়বস্তুর দিক থেকে কাহিনীগত উপাদানটুকু বাদ দিলে উভয়ের মধ্যে মিলের চেয়ে গরমিলটাই বিশিষ্ট হ'য়ে ওঠে। তার কারণ মহাবস্তুর কাহিনী ঘটনাপ্রধান আর রাজা ভাবপ্রধান নাটক। কুশজাতকের কাহিনীর দীর্ঘবিস্তারের মধ্যে কদাকার-কুৎসিৎ রাজা কুশের সঙ্গে প্রিয়দর্শিনী রাণী সুদর্শনার অসমঞ্জস বিবাহ এবং তজ্জনিত মানসিক প্রতিক্রিয়ার জৈবিক স্বরূপটি অত্যন্ত মনস্তত্ত্বসম্মত ভাবেই উপস্থাপিত হয়েছে। 'কন্যা কাময়তে রূপম্' — নারীজীবনের এই প্রাথমিক ও সহজাত আকাঙ্খার সঙ্গে পুরুষের শৌর্য-বীর্যের প্রতি নারীর সশ্রদ্ধ আকর্ষণের বাঙ্‌ময় অভিব্যক্তি রয়েছে 'কুশজাতকে।' বিকৃতদর্শন হলেও মেধা-শৌর্য-বীর্যে দীপ্ত মহারাজ কুশের সুন্দরী রমণীর পাণিগ্রহণের আকাঙ্ক্ষাও স্বাভাবিক। কিন্তু রাজা ও রাণীর মানসিক দূরত্ব উভয়ের জীবনেই অশান্তির বীজ বপন করেছে যার পরিণতি প্রেমের কাছে ততোটা নয় যতোটা শক্তি বা বীর্যের কাছে সুন্দরের পরাভবে। মূল কাহিনীতে সুদর্শনার অন্তরে রাজা কুশের প্রতি ভালোবাসার বিন্দুমাত্র পরিচয় মেলে না, প্রেমের সুনির্মল অভিব্যক্তি তো দূরের কথা। মূল কাহিনীর সুদর্শনার আদ্যান্ত পরিচয় রূপলিপ্সু রমণীরূপে। প্রেমে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কৃচ্ছ্র সাধনার যা কিছু তা সবই রাজা কুশের মধ্যে প্রতিভাত। ভালোবাসার তপস্যায় কুশ যথার্থই প্রেমতাপস।

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের রাজা নাটকের নরনারীর প্রেমের জৈব রূপটিকে সম্পূর্ণ অবহেলা করা হয়েছে। এই নাটকের সুদর্শনা দুঃখ-দহনদীপ্ত নির্মল-নিষ্কলুষ প্রেমের দুশ্চর তপস্যায় ব্রতী হয়েছেন। কুশজাতকের চমকপ্রদ ঘটনাবৃত্ত সেখানে নাট্যকারের বিশেষ ভাবাদর্শ প্রচারের অনুষঙ্গ রূপে কাজ করেছে। বলা বাহুল্য, কুশজাতকের রক্তমাংসে জীবন্ত মানবিক ভালোবাসার কাহিনী অবলম্বনে বাস্তবরসসমৃদ্ধ একটা আস্ত প্রেমের নাটক রচিত হওয়ার পর্যাপ্ত অবকাশ থাকা সত্ত্বেও পাঠকের দৃষ্টিকে নাট্যকার অন্যত্র আকর্ষণ করেছেন। বস্তুতঃ রাজা প্রায় বাস্তব পটভূমিকাবর্জিত ভাবাবেগপ্রধান ও সংকেতধর্মী নাটক। রাজা-রানী — কুশ-সুদর্শনার দেহাবরণ থেকে বাস্তবতার নামমাত্র নির্মোকটুকু সরিয়ে নিলে সাগ্রিকভাবে তারা প্রতীক চরিত্র। মহাবস্তু অবদানের গল্প তাই রবীন্দ্রনাটকে সম্পূর্ণ ভিন্ন তাৎপর্যে প্রোজ্জ্বল হয়েছে। কল্পনার অভিনবত্ব, বিষয়বস্তুর অসাধারণত্ব, রচনার চারুত্ব, দুর্বোধ্য রহস্যময় পরিবেশসৃষ্টি এবং সাংকেতিক ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষার প্রয়োগ-কুশলাতায় রাজা এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সৃষ্টি। সুধী সামলোচকও তাই বলেন — 'It must be acknowledged that Tagore's keeping in fact the theme of the dark chamber in which the hero and the heroine lived and amused themselves without seeing each other created two unique and brilliant pieces of drama in which he introduced many innovations and divergences from the original Mahavastu story for his own dramatic purpose.

যাইহোক, রাজা নাটকের কাহিনী-উপস্থাপনা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তা রবীন্দ্রনাথের মৌলিক ভাবাদর্শের বাণীমূর্তি। নাটকের চরিত্র-ভাব-ভাষা প্রভৃতি সবকিছুর মধ্যেই একটা সাংকেতিক অর্ত পরিস্ফুট হয়েছে। সাংকেতিক নাটকে প্রত্যক্ষ বস্তুজগৎ অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষ রহস্যময় জগতের প্রতি আমাদের দৃষ্টি ও মন বেশি আকৃষ্ট হয়। এই রহস্যময় জগতের বাঙ্‌ময় প্রকাশে আমাদের সংবেদনশীল ও অনুভূতিপ্রবণ চিত্রেত যে রসাবেদন সৃষ্টি হয়, তার অবলম্বন কাব্যময় ভাষা। সাংকেতিক নাটকের ভাষা তাই অপরিহার্য কারণেই কাব্যময়। রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি-নাট্যকার। তাঁর বিশেষত্বই হল এই যে, তিনি সচেতনভাবে নাটক লিখতে গিয়েও যেন অজ্ঞাতসারেই কাব্যসৃষ্টি করে বসেন। আবার কখনো কাব্যসৃষ্টির সচেতন প্রয়াসেও অবচেতনভাবে মিশে

যায় নাট্য-বৈশিষ্ট্য। রাজা মূলতঃ নাটক এবং ভাবাবেগপ্রবণ সাংকেতিক নাটক বলেই তার সংলাপ অধিকাংশ স্থলেই কাব্যময় হয়ে পড়েছে।

রাজা নাটক সম্পর্কে নাট্যকারের নিজের মন্তব্য হ'ল যে এটি 'Inner Drama of the Soul'. ভক্ত ও ভগবানের স্বাভাবিক সম্পর্ক এবং দুঃখ-বেদনা-উত্তীর্ণ প্রেমের জগতে তাঁদের মিলন — এই নাটকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিপাদ্য। এই ভাবটি পরিস্ফুট করতে গিয়ে তিনি কতকগুলি প্রতীকধর্মী শব্দ ব্যবহার করেছেন। রাজা — ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ঈশ্বর বা ভগবান, আর রাণী সুদর্শনা — বদ্ধজীব বা জীবাত্মা। ঈশ্বর করুণাময়, প্রেমময়, সত্য ও সুন্দর। ভগবৎসাধনা — প্রেমের সাধনা, সুন্দরের আরাধনা। রাজা নাটকে বিভিন্ন চরিত্রাশ্রয়ে রাজা অর্থাৎ পরমাত্মা বা ঈশ্বরের সঙ্গে রাণী সুদর্শনা বা জীবাত্মার প্রেমসাধনার বিভিন্ন ভাব ও রসের পর্যায়গুলি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। প্রেমসাধনায় বৈষ্ণবীয় পঞ্চরসের কয়েকটি পর্যায়কে (দাস্য-সখ্য ও মধুর) বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই নাটকে। গীতায় শ্রীভগবানের কণ্ঠনিঃসৃত সুভাষিত 'যে যতা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' — রাজা নাটকে বাণীরূপ লাভ করেছে। রাজাকে অর্থাৎ পরমাত্মা বা ভগবানকে এক এক জন জন এক এক ভাবে পেয়েছেন। রাজার সঙ্গে সুদর্শনার সম্পর্ক বর-বধূর, সুরঙ্গমার দাসীর, ঠাকুরদার বন্ধুর। তাই রাজাকে সুদর্শনা পেয়েছেন দাম্পত্য প্রেমে (অর্থাৎ মধুরভাবে), সুরঙ্গমা দাস্যপ্রেমে (অর্থাৎ দাস্যভাবে বা দাসীভাবে), এবং সুরসিক ঠাকুরদা আনন্দের পথে বন্ধভাবে (অর্থাৎ সখ্যপ্রেমে বা সখ্যভাবে)। কাঞ্চীরাজ নাস্তিকতার প্রতিমূর্তি, নেতি নেতি করেও তিনি ঈশ্বরপ্রাপ্তির সোপানে আরোহণ করেছেন। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে, উত্থান-পতনে সুদর্শনা সুরঙ্গমা, ঠাকুরমা কাঞ্চীরাজ — সবাই শেষ পর্যন্ত রাজা বা ভগবানের পায়ে আত্মনিবেদন করেছেন।

নাট্যরূপের ব্যাখ্যায় রাজা নাটকের পরবর্তী সংক্ষিপ্ত সংস্করণ অরূপরতন (১৯৩১)-এর ভূমিকায় নাট্যকার যে মন্তব্য করেছেন প্রসঙ্গতঃ তা প্রণিধানযোগ্য —

"সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধনজন খ্যাতি, সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে, বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না; নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা একথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল, সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গ লাভ করিল, যে-প্রভু সকল দেশে, সকল কালে, সকল রূপে, আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায় — এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।"

রাজা নাটকে রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য যে ভগবৎপ্রেমসাধনার একটি নির্বিশেষরূপের নাট্যায়ন, উদ্ধৃত মন্তব্যেই তা স্পষ্ট প্রতীয়মান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন, পূর্বোক্ত-উদ্ধৃতি অরূপরতন নাটকের উপস্থাপনারূপে রচিত হয়েছিল এবং লেখক যা বলেছেন তা ঐ নাটক সম্পর্কে সুপ্রযুক্ত। কিন্তু আমাদের স্মরণে রাখতে হবে, একই বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে একই নাটকের দুটি ভিন্ন সংস্করণ ('রাজা' ও 'অরূপরতন') রচিত হলেও অরূপরতন-এর প্রস্তাবনা রাজা নাটকে একটি গভীর মর্মসত্য উদঘাটনে সহায়তা করে না। সেই মর্মসত্যের স্বরূপটি প্রকৃতপক্ষে কি আলোচনার সাহায্যে আমরা তা পরিস্ফুট করতে চাই।

রাজ্য কুড়িটি পৃথক দৃশ্যে বিভক্ত একাঙ্ক নাটক একাঙ্ক বলছি এই কারণে, রাজা নাটকে 'অঙ্ক' শব্দটির ব্যবহার নেই। দৃশ্য' শব্দটি সেখানে অনুল্লিখিত হলেও এক, দুই ইত্যাদি ক্রমে এক একটি সংখ্যাকে দৃশ্যের নামান্তর রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। আজীবন ঔপনিষদিক ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, মানবজীবনের পরিণামী লক্ষ্য ঈশ্বরপ্রাপ্তি। এই ধ্রুবলক্ষ্যের কথা স্মরণে রেখেই তিনি রাজা নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন বলে আমাদের মনে হয়। ভগবৎ-সাধানা জীবনসাধনারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই কী জীবনসাধনায় আর কী ভগবৎসাধনায় দূর্বল মানুষের সংস্কারে মিশে থাকা কিছু ভ্রান্তিনিরসনের সচেতন প্রয়াসও এই নাটকে লক্ষ্য করা যাবে। ভীরু-দুর্বলের ঈশোপাসনা আর শক্তিমানের ঈশোপাসনার মধ্যে বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংশয়-সন্দেহজনিত স্বাতন্ত্র্যও এই নাটক পরিস্ফুট হয়েছে। সংস্কারজীর্ণ দুর্বল নর-নারী ঈশ্বরের প্রেম-করুণা ও আনন্দঘন রূপটিকেই সত্য বলে মনে করে। তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারলে জাগতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা বা কামনা-বাসনার ধন করায়ত্ত হবে, আরামের সুখশয্যায় দিন কাটবে, কোথাও দুঃখ-কষ্ট বা আশিব-অমঙ্গলের ছায়ামাত্রও থাকবে না — অধিকাংশ সাধারণ মানুষও তাই বিশ্বাস করে। এই পক্ষপাতযুক্ত বিশ্বাস যে কতবড়ো ভ্রান্তি রাজা নাটকে রবীন্দ্রনাথ তা দেখিয়েছেন।

একপ্রকার ভ্রান্ত সংস্কার যা ধর্মপ্রাণ নর-নারীর সত্তায় মিশে আছে, তা হল এই যে ভক্ত ভগবানকে ডাকলেই পতিতপাবন ভক্তের ভগবান সশরীরে ছুটে এসে বিপন্ন ভক্তকে উদ্ধার করবেন। এই প্রকার সরল বিশ্বাস বা অভিমানও একপ্রকার অহংকার। এ থেকে মুক্ত হতে না পারলে ঈশ্বরের করুণা যে পাওয়া যায় না সুদর্শনার প্রেমসাধনায় রবীন্দ্রনাথ তা প্রকাশ করেছেন।

আর একপ্রকার ভ্রান্তি বা সংস্কার বদ্ধ মূল সাধারণ নর-নারীর চেতনায়। তারা মনে করে মঙ্গলময় ঈশ্বর বা ভগবানের সবকিছুই সুন্দর, অসুন্দরের কণামাত্রও তাতে নেই। অন্যভাবে যা কিছু অসুন্দর, অসঙ্গত, অশোভন তার সঙ্গে ঈশ্বরের কোনো যোগ নেই, তা তাঁর করুণাবঞ্চিত। রাজা নাটকে রবীন্দ্রনাথ নর-নারীর নিগূঢ় চেতনায় আঘাত দিয়ে পূর্বকথিত সংস্কার বা ভ্রান্তধারণাগুলি থেকে তাদের মুক্ত হতে সহায়তা করেছেন। এই নাটকে বিশেষ করে তিনি দেখিয়েছেন — যিনি সুন্দর, আনন্দময় সত্য (ঈশ্বর), একই সঙ্গে তিনি ভীষণ কঠিন-নির্মম-নিষ্ঠুর। ব্রহ্ম বা ভগবান বলেই তিনি নির্গুণ, জাগতিক সবকিছু তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু জগতের সুখ-দুঃখ তাঁকে বিচলিত করে না। রাজা নাটকে ঈশ্বর পুরুষটিকে রবীন্দ্রনাথ ‘ঝড়ের মেঘের মতো’ ‘কূলশূন্য সমুদ্রের মতো’ কালো রূপে চিত্রিত করেছেন। এখানে ‘কালো’ শব্দটির ব্যবহারিক তাৎপর্যও লক্ষণীয়। বিজ্ঞান (Science)-মতো কালো কোনো বর্ণ নয় কিন্তু সকল বর্ণকে তা আত্মসাৎ করে। অনুরূপভাবে ব্রহ্ম-ভগবান বর্ণহীন বলেই ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর সকল বর্ণরূপই তাঁর সঙ্গে ওতপ্রোত। ‘কালো’ শব্দটির সচেতন ব্যবহারের তাৎপর্য বোধকরি এখানেই।

রাজা নাট্যসৃষ্টি রবীন্দ্রসচেতনার কোন আকস্মিক ফল নয়। রাজা নাটকে যে ভাবনার উত্তরণ, তার প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। ‘খেয়া’ কাব্যগ্রন্থে তিনি ঈশ্বরের ‘মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্’ (কঠোপনিষৎ) রূপকে জীবনে আকণ্ঠ স্বীকার করে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। “সত্যে পৌঁছতে গেলে রুদ্রের স্পর্শ নিয়ে যেতে হবে। রুদ্রকে বাদ দিয়ে যে প্রসন্নতা, অশান্তিকে অস্বীকার করে যে শান্তি, সে তো স্বপ্ন, সে সত্য নয়” — এ জাতীয় অনুভূতি তিনি প্রকাশ করেছেন ‘আত্মপরিচয়’-এর ‘আমার ধর্ম প্রবন্ধে। সকল দুঃখ-দ্বন্দ্বের মধ্যেই তিনি রুদ্রের প্রসন্ন মুখ — কল্যাণময়রূপ প্রার্থনা করেছেন — ‘রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।’ উপনিষদের দুঃখবেদনাহীন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দবাদে বিশ্বাসী হয়েও রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, ‘অলস শান্তি ও সৌন্দর্যরসভোগ’ [যা আমরা রাজা-র সুদর্শনার মধ্যে অনেকটা প্রত্যক্ষ কবি] তাঁর ধর্মের প্রধান লক্ষ্য বা উপাদান নয়। তাই তিনি বলেন — ‘আমি স্বীকার করি, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে এবং আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি — কিন্তু সেই আনন্দ দুঃখকে বর্জন করা আনন্দ নয়, দুঃখকে আত্মসাৎ করা আনন্দ। সেই আনন্দের যে মঙ্গলারূপ তা অমঙ্গলকে অতিক্রম করেই, তাকে ত্যাগ করে নয়, তার যে অখণ্ড অদ্বৈত রূপ তা সমস্ত বিভাগ ও বিরোধকে পরিপূর্ণ করে তোলে, তাকে অস্বীকার করে নয়।” পরে কবিতায় একই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন — “অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো/সেস তো তোমার আলো/সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো/সেই তো তোমার ভালো।” এই জাতীয় অনুভবে উপনিষদ্ দর্শনের উপর রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় ভাবনার স্ফুটোজ্জ্বল প্রকাশটুকু লক্ষণীয়, সন্দেহ নেই। রাজা নাটক রচনার আগেই খেয়ার ‘দুঃখমূর্তি’, ‘আগমন’, ‘দান’ প্রভৃতি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের আনন্দববাদী দর্শনের বিশিষ্ট প্রকাশ দেখা যায়। ‘দুঃখমূর্তি’ কবিতায় প্রিয়তমকে দুঃখের মধ্য দিয়ে বরণ করে নেবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে — ‘দুঃখের বেশে এসেছ বলে/তোমারে নাহি ডরিব হে। যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা/নিবিড় ক’রে ধরিব হে। আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী,/তোমারে নাহি ডরিব হে।” ‘আগমন’ (খেয়া) কবিতায় কবি যে ‘আঁধার ঘরের রাজা’ — ‘দুঃখরাতের রাজা’কে স্বাগত জানিয়েছেন তিনিও তো ‘মদহ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্’ই — “ওরে দুয়ার খুলে দে রে/বাজা শঙ্খ বাজা! গভীর রাতে এসেছে আজ/আঁধার ঘরের রাজা। বজ্র ডাকে শূন্য তলে/বিদ্যুতেরই ঝিলিক ঝলে,/ছিন্নশয়ন টেনে এনে/আঙিনা তোর সাজা। ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল/দুঃখরাতের রাজা।” ‘দান’ (খেয়া) কবিতায় প্রিয়তমের আশীর্বাদকে মনে হয়েছে — ‘এ তো মালা নয় গো, এ যে/তোমার তরবারি/জ্বলে ওঠে আগুন যেন,/বজ্র হেন ভারি — /এ যে তোমার তরবারি।”

‘প্রচ্ছন্ন’ (খেয়া) কবিতার নায়িকা যে নায়কের আকস্মিক আবির্ভাব প্রত্যাশা করেন তার সঙ্গে রাজা নাটকের সুদর্শনার রাজার আগমন-প্রত্যাশা হুবহু মিলে যায় — “আমি সুদূর পানে চেয়ে চেয়ে ভাবি আপন মনে/হেথা তৃণে আসন মেলে —/তুমি হঠাৎ কখন আসবে হেথায় বিপুল আয়োজন/তোমার সকল আলো জ্বেলে।/রথের পরে সোনার ধ্বজা ঝলবে ঝলমল,/সাথে বাজবে বাঁশির তান —/প্রতাপ ভরে বসুন্ধরা করবে টলমল,/আমার উঠবে নেচে প্রাণ।” গীতালি-র ‘এক হাতে ওর কৃপাণ আছে/আর এক হাতে ভয়’.... প্রভৃতি গানে, শারদোৎসব, মুকুট, অচলায়তন, ডাকঘর ও ফাল্গুনী নাটকে একই ভাবনার প্রকাশ।

বিশ্বমহাযুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর সমগ্র বিশ্বজোড়া হিংসা-হানাহানি-ভয়ংকরতা দেখে বিচলিত কবি অনুভব করেছিলেন, ভীষণ তা-ভয়ংকরতা-নির্মম-নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি সত্যেরই অন্য এক প্রকাশ। বুঝেছিলেন, ঈশ্বরকে নিজের মতো করে ভাবা ঠিক নয়, এবং সত্যের উপাসনা করতে গিয়ে কেবল সুন্দর-মধুরকে ভালোবাসলেই চলবে না, আলোর সঙ্গে ছায়ার মতো সুন্দরের মধ্যে যে

ভীষণ-ভয়ঙ্কর রয়েছে সেই কঠিনকেও ভালোবাসতে হবে। রাজা নাটকে রবীন্দ্রনাথ এই উদ্দেশ্যকেই ভাষারূপ দান করেছেন। এর জন্যেই তাঁর রাজার ধ্বজায় কিংশুক পুষ্প শোভিত ছিল না, ছিল 'পদ্মের মাঝখানে বজ্র'। দার্শনিক স্পিনোজার মতো রবীন্দ্রনাথও অনুভব করেছিলেন, নিষ্ঠুর সত্যকেও ভালোবাসা যায় এবং যে তাঁকে ভালোবাসে তাকে তিনি মুক্ত করেন। [Truth is cruel but it can be loved, and it makes free those who have loved it.]

৩.৩.১২.২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। সাংকেতিক নাটক হিসেবে 'রাজা'-র সার্থকতা বিচার করো।

২। 'রাজা' নাটকের শিরোনামটি কোন্ কোন্ দিক থেকে সার্থক তা আলোচনা দ্বারা বুঝিয়ে দাও।

৩। 'রাজা' নাটক অবলম্বনে সুদর্শনা চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ করো।

৪। রবীন্দ্রনাথ 'রাজা' নাটককে বলেছেন 'Inner Drama of the Soul'— নাটকের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে মন্তব্যটির যাথার্থ্য প্রতিস্থাপন করো।

৫। রাণী সুদর্শনার আলোর পিপাসা 'রাজা' নাটকের মুখ্য বিষয়। বস্তুত 'রাজা' অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তররণের নাটক। — আলোচনা করো।

৬। সুদর্শনার আত্মশোধন ও আত্মোপলব্ধিতে দাসী সুরঙ্গমার ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

৭। 'রাজা' নাটকে নাট্যকারের মূল বক্তব্য-উপস্থাননে ঠাকরদার ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

৮। 'রাজা নাটকটি রবীন্দ্রনাথের মৌলিক তত্ত্বাদর্শ ও ভাবের বাণীমূর্তি।' — আলোচনা করো।

৯। রাজা নাটক অবলম্বনে রবীন্দনাথের রাজার স্বরূপ বুঝিয়ে দাও।

১০। কুশজাতকের কাহিনী ও রবীন্দ্রনাথের 'রাজা'র মধ্যে এমটি তুলনামূলক আলোচনা লিপিবদ্ধ করো।

৩.৩.১২.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। আবদানসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ (২য় সং -২০০৭) — কল্যাণীশঙ্কর ঘটক।

২। অরূপরতন — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩। প্রাকৃতপ্রকাশ (বররুচি) — বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

৪। প্রাকৃত সাহিত্য — মনোমোহন ঘোষ

৫। পালিপ্রকাশ — বিধুশেখর শাস্ত্রী

৬। বঙ্গীয় শব্দকোষ (১ম ও ২য় খণ্ড) — হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৭। বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম — স্বামী বিদ্যারণ্য

৮। বৌদ্ধধর্ম ও রবীন্দ্রনাথ — আশা দাশ

৯। রবীন্দ্র রচনাবলী (বিশ্বভারতী) — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০। রাজা — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১। রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ (২য় সং) — প্রমথনাথ বিশী

১২। রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি (১ম সং) — সুধাংশুবিমল বড়ুয়া

১৩। রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক (১৩৬৭, গৌষ) — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১৪। রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃতসাহিত্য (২য় সং) — কল্যাণীশঙ্কর ঘটক

১৫। A History of Indian Literature (Vol I &II) - M. Winteritz.

১৬। Avadana Sataka (Buddhist Sanskrit Text No. 19) - Mithila Institute of Higher Studies and Learning, Darbhanga) - Ed, Dr. P. L. Vaidya.

১৭। A study on the Jatakas and Avadanas (Gitical and Comparative, Vol-I) - S. C. Sarkar

১৮। Avadana and Apadana - Indian Historical Quartcrly (No. IX)

১৯। Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary (Vol 1-3) Ed. Franklin Edgerton

২০। Life and Thoughts of Goutama Buddha - Ananda Kumar Swami.

২১। Studies in the Buddhilst Jatakas - B. C. Sen

২২। The History of Buddhilst Thoughts - E. J. Thomas.

২৩। The Light of Asia (Poetry) - Mr. & Mrs. Rhys Davis.

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

তাসের দেশ

একক — ১৩

তাসের দেশ নাটকের সারসংক্ষেপ

বিন্যাস ক্রম

৩.৪.১৩.১ : ভূমিকা

৩.৪.১৩.২ : পেক্ষাপট

৩.৪.১৩.৩ : সারসংক্ষেপ

৩.৪.১৩.৪ : মূল থীম বা ভাবসত্য

৩.৪.১৩.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩.৪.১৩.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩.৪.১৩.১ - ভূমিকা

সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির দিক থেকে ভারতের অন্যতম একটি প্রাগ্রসর পরিবারে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলে। সুবৃহৎ ঠাকুর পরিবারের সন্তানেরা প্রায় সকলেই মননসাধনার সঙ্গে সঙ্গে কলাচর্চার বিভিন্ন শাখায় যে ঋদ্ধি ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তা আজ কিংবদন্তীর পর্যায়ে পৌঁছেছে।

কলাসাধনার মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় সঙ্গীতচর্চা সম্পর্কে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ ও উদ্যমে তাঁর সন্তানদের জীবনে প্রথম থেকেই এই প্রেরণা জাগে। ভারতীয় ধ্রপদী সঙ্গীতের উজ্জীবন ঠাকুর পরিবারে সার্থকভাবে সম্ভব হয়েছিল। তার অন্যতম কারণ দেবেন্দ্রনাথের সন্তানদের সকলেরই ছিল আশ্চর্য সঙ্গীতপ্রতিভা। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ সকলেই হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গসঙ্গীত, কালোয়াতি গানে পারঙ্গম ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে বিষ্ণুপদ চক্রবর্তীর কাছে দেশি গান, তারপর ওস্তাদ যদুভট্টের তত্ত্বাবধানে, শ্রীকণ্ঠ সিংহের কাছে গান শেখেন। এর সঙ্গে তরুণ কবির য়ুরোপবাস আর জ্যোতিদাদার প্রভাব থেকে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অভিজ্ঞতা লাভ ঘটে। পারিবারিক আবহ থেকে, পরিবেশ পরিজনের কাছে থেকে মনের অনুকূল ধাতে সঙ্গীতরসসুধা গ্রহণ করে ক্রমশই তিনি নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই প্রক্রিয়ায় অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর ভূমিকা যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমনি দেশীয় বাউল, কীর্তন বা লালন ফকিরের গানের জগতও রবীন্দ্রমানসের সাঙ্গীতিক বিভাকে করেছে প্রসারিততর।

নৃত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় প্রথমবার বিলেতবাসের সময়ে। পাশ্চাত্য নৃত্যে প্রাণের উচ্ছ্বসিত রূপের প্রকাশ লক্ষ্য করেছিলেন অল্পবয়সী কবি। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর দেখা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ধ্রুপদী নৃত্য, জাপান ও জাভা দ্বীপের নৃত্যশৈলীতে তাঁর মন অধিকতর আশ্বস্ত হয়েছিল। তাঁর প্রথম নাট্যসৃষ্টি 'বাল্মীকি প্রতিভা'। তাতে বিশুদ্ধ নৃত্যের সংস্থান ছিল না। গীতিনাট্যরূপে গানসহযোগে অভিনয় মাধ্যমে উপস্থাপনাই ছিল তার মূল লক্ষ্য। গীতিপ্রাণ কবির সৃষ্টিতে গানের ও নৃত্যের মেলবন্ধনে যখন অভিনব শৈলীতে পূর্ণাঙ্গ নাট্যসৃষ্টির রূপায়ণ ঘটল, তখন অনেকদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা (১৯১২) এবং সেই প্রতিষ্ঠানে নৃত্যকলা শিক্ষারও ব্যবস্থা, তার গুরুনিযুক্তি এবং প্রশিক্ষণের যথাযথ পর্বগুলি শুরু হয়ে গেল। রবীন্দ্রভাবনৃত্য হয়ে উঠল বিশেষ এক কলা বা শৈলীসমৃদ্ধ শিল্প, যার মধ্যে ধ্রুপদী নৃত্য, লোকনৃত্য, বিদেশি নাচ প্রভৃতির রাসায়নিক সংশ্লেষে গড়ে ওঠা নতুন আবেদন এবং আঙ্গিক। যার সম্পর্কে আশ্রম কন্যা অমিতা সেনের উক্তি থেকে একটি স্পষ্ট ধারণা করা যাবে — রবীন্দ্রনাথের নাচ হল ভাবের নাচ। আকাশের কোলে মেঘের খেলা। পাতায় হাওয়ার কাঁপন, ঘাসে ঘাসে আলোর পুলক, উছলে পড়া চাঁদের আলো, ফুল ফোটা ঝরা, শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনি - মানুষের মনের আনন্দ হিল্লোল, দুঃখ

বেদনায় হৃদয়ের আকুলতা সব কিছু ব্যক্ত হয় এই ভাবনৃত্যের ভঙ্গিতে, চোখে মুখের ভাবে। প্রকৃতির তাণ্ডব লীলা, ঝড়ের মত্ত মাতামাতি উন্মত্ত সমুদ্রের তরঙ্গ — সবই এই নৃত্যে রূপ পায়।

নাট্যচর্চায় ঠাকুর — পরিবারের বিশিষ্ট অবদানের কথা ঐতিহাসিকভাবে সমর্থিত। ১৮৭৪ থেকে অপেরাধর্মী গীতিনাট্যের একটি ধারা খুব শিল্পসম্মতভাবে না হলেও, এদেশে গড়ে উঠেছিল। এরই পর্যায়ভুক্ত একটি উপস্থাপনা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে দেখা গেল ১৮৭৯ তে। রচয়িতা স্বর্ণকুমারী দেবী। নাম 'বসন্ত উৎসব'। পরের বছর অভিনীত হল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা 'মানময়ী'। দক্ষ সুরস্রষ্টা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গীতসমৃদ্ধ এই উপস্থাপনার পরের বছর ১৮৮১ তে বিদেশ প্রত্যাগত তরুণ রবীন্দ্রনাথের রচনা 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনীত হয়। জোঁড়াসাকো বাড়ির ভারতী-উৎসবে এই অভিনব গীতিনাট্য গুণীজনসমাবেশে অভিনীত হবার পর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। এতে সেই প্রথম অভিনয়কালে সংগীত ও অভিনয় যতটা ছিল নৃত্যপ্রয়োগ ততখানি ছিল না। পরবর্তীকালে এই বিশিষ্ট মাধ্যমটি ক্রমে সংগীত, নৃত্য ও নাট্যরসসহযোগে গীতিনৃত্যনাট্যরূপে সমাদর লাভ করে। প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে পড়ে কালমৃগয়া (১৮৮২), শারদোৎসব (১৯০৮), ইত্যাদি, দ্বিতীয় পর্বে বসন্ত (১৯২৩), নটীর পূজা (১৯২৬) উল্লেখযোগ্য রচনা এবং তৃতীয় তথা শেষ পর্বে রচিত হয় তাঁর শ্রেষ্ঠ গীতিনৃত্যনাট্যগুলি। যেমন শাপমোচন (১৯৩১), তাসের দেশ (১৯৩৩), চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬), চণ্ডালিকা (১৯৩৮), শ্যামা (১৯৩৯) প্রমুখ।

৩.৪.১৩.২ - প্রেক্ষাপট

বিশ্বভারতীতে পূজাবকাশের আগে আসন্ন উৎসবের প্রাক্কালে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠান করার রীতি প্রচলিত ছিল। তারই তাগিদ থেকে রবীন্দ্রনাথ আশ্রমিকদের অভিনেয় একটি নাটক রচনা করার জন্য অনুরুদ্ধ হ'ন। সেটা ছিল ১৯৩৩ সাল। কবি তাঁর অতীতে লেখা একটি গল্পের কথা স্মরণ করলেন। প্রায় চল্লিশ বছর আগে ১২৯৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে তিনি লিখেছিলেন 'একটা আষাঢ়ে গল্প' নামে এক অদ্ভুতরসের গল্প। গল্পগুচ্ছের প্রথম খণ্ডে সংকলিত সেই কাহিনীরই নির্যাস নিয়ে তার সঙ্গে অনেকগুলি গান জুড়ে নাট্যরূপ দিলেন নতুন লেখটির। সৃষ্টি হল 'তাসের দেশ'।

রূপকথার জগতের আবহের মধ্য যে সমস্ত পাত্রপাত্রী আসর জমিয়েছে তারাও যেন বা রূপকথার জগতেরই — রাজপুত্র, সদাগরপুত্র। রাজ্যটি শুধু তাসের রূপকে মোড়া। নির্দিষ্ট ছাপমারা তাসের যেমন নির্দিষ্ট মান, তেমনই মাপে-জোকে খোপের মধ্যে বসানো তাসের দেশের নারী-পুরুষ। সেখানেও রাজা আছে, রাণী আছে, আছে রাজকুমারী, পণ্ডিত, গোলাম, সৈন্য সামন্ত। আর সবার ওপরে রয়েছে নিয়মের কঠোর নাগপাশ, অনুশাসনের অজস্র তালিকা। সেই নিয়মশাসন অথবা প্রথা-সংস্কারজালে চাপা পড়ে গেছে তাসের দেশের মানুষগুলির চিন্তাশক্তি। ব্যক্তিমনের ইচ্ছে অনিচ্ছের চেতনাই তাদের হারিয়ে গেছে। এই জড়পিণ্ডবৎ প্রাণীকুলকে জাগাবার জন্য ইচ্ছেমন্ত্র নিয়ে হাজির হয়েছে ভিন্‌দেশি রাজপুত্র।

"তাসের দেশ" বাংলা ১৯৪০ সালের ভাদ্র মাসে, চণ্ডালিকার সহিত একই সময়ে, প্রথম বাহির হয়। উক্ত সংস্করণে মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় নাটিকাটির সমসাময়িক অভিনয় -সংবাদটুকুও মুদ্রিত হইয়াছিল —

প্রথম অভিনয় — ম্যাডান থিয়েটার, ২৭ শে, ২৮ শে ও ৩০ শে ভাদ্র ১৩৪০

১৩৪৫ সালের মাঘ মাসে 'তাসের দেশ'এর যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাহা বহুল পরিমাণে 'সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে নাটিকাটির অধুনাপ্রচলিত উক্ত পরিবর্ধিত পাঠই মুদ্রিত হইল। দ্বিতীয় সংস্করণ 'তাসের দেশ' সুভাষচন্দ্র বসুকে উৎসর্গীকৃত হয়।"

[বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলী ত্রয়োবিংশ খণ্ডের গ্রন্থ পরিচয় অংশ থেকে]

'তাসের দেশ' নাটকের উৎসর্গপত্রে রবীন্দ্রনাথ লেখেন —

কল্যাণীয় শ্রীমান সুভাষচন্দ্র,

স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ ক'রে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলুম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
মাঘ ১৩৪৫

৩.৪.১৩.৩ - সারসংক্ষেপ

'তাসের দেশ' নাটিকার আছে মোট চারটি দৃশ্য।

প্রথম দৃশ্যটি মূল নাট্যের ভূমিকা বলা যায়। কিন্তু এখানে নাট্যবিষয়ের আসল বক্তব্যও সংকেতিত হয়েছে। দুই বন্ধু রাজপুত্র এবং সদাগরপুত্র আলাপনরত। রাজপুত্র তার বৈভব এবং নিরাপত্তাবেষ্টিত জীবনে হাঁপিয়ে উঠেছে। একই ছকে তার চব্বিশ ঘন্টার ঘোরাফেরা। তাই সে বন্ধনমুক্ত বিহঙ্গের মতো দূরের আকাশের হাতছানিতে ধরা দিতে চায়। অচিন দেশে অজানা নৌযাত্রায় সে ভেসে পড়তে চায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে —

কোন্ তারকা লক্ষ্য করি
কূল-কিনারা পরিহরি
কোন্ দিকে যে বাইব তরী
বিরাট কালো নীরে —
মরব না আর ব্যর্থ আশায়
সোনার বালুর তীরে।

রাজপুত্রের এই তারকা, নবীনা, ধ্যানের ধন — কোনও স্পষ্ট রূপে মূর্ত নয় তখনও। রাজমাতা তাঁর মর্মস্পর্শী মন নিয়ে বুঝতে পারেন রাজপুত্রের ভাবান্তরের মূল রহস্যটি — "বুঝেছি, বাছা, আসলে তোমার অভাবটা অভাবেরই অভাব। পাওয়া জিনিসে তোমার বিতৃষ্ণা। জন্মেছে। তুমি চাইতে চাও, ... বাছা, তোমাকে ধরে রাখতে গেলেই হারাব। তুমি বইতে পারবে না আরামের বোঝা, সহিতে পারবে না সেবার বন্ধন।"

তাই এরপর মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে তরঙ্গিত সাগরবক্ষ পাড়ি দিতে অভিযাত্রায় বেরিয়ে পড়ে রাজপুত্র। শুধু বন্ধু সদাগরপুত্র রইল তার সঙ্গী।

দ্বিতীয় দৃশ্যে রাজপুত্র ও সদাগরপুত্র পৌঁছেছে অন্য এক দেশে। সংলাপ থেকে জানা যায় যে তাদের নৌকো ডুবেছিল মাঝ সমুদ্রে — তারপর তারা অজানা এক দেশের তীর ভূমিতে ভেসে উঠেছে। 'এতদিন পরে মনে হচ্ছে, জীবনে নতুন পর্ব শুরু হল'। সদাগরপুত্র রাজপুত্রের মতো নতুন কিছুর সম্পর্কে আশাবাদী হতে পারে না। কেননা এদেশের লোকজন যতটুকু তার চোখে পড়েছে তা যেন 'ছুতোরের তৈরি কাঠের কুঞ্জবন'। সেই মরা দেশে নতুনত্ব কোথায় কীভাবে আবিষ্কৃত হবে তা তার মাথায় আসে না। রাজপুত্র কিন্তু এরই মধ্যে প্রবল উৎসাহ অনুভব করে। সে খুঁজে পায় এক মহতী সম্ভাবনাময় উদ্দেশ্য — যেন এতদিনে প্রত্যাশাপূরণের একটি সুযোগ এসেছে সামনে, কিছু করতে পারার সুযোগ! রাজপুত্রের মন বলে, নতুন দেশের রীতিনীতি তার আসল সত্য নয়, ওপর থেকে চাপানো খোলসবিশেষ। তাই সে বলে — 'আমরা এসেছি কী করতে — খসিয়ে দেব। ভিতর থেকে প্রাণের কাঁচা রূপ যখন বেরিয়ে পড়বে, আশ্চর্য করে দেবে।' সদাগরপুত্র জীবনের ওপরমহলটুকু দেখে। রাজপুত্র দেখতে পায় আরও গভীর করে। তাই তাসের দেশের আপাত নিষ্প্রাণতার আড়ালে লুকানো প্রাণের উৎসমুখ সে আবিষ্কার করবে, খুলে দিতে পারবে — এমনই তার বিশ্বাস।

এমন সময় তাসের দলকে কুচকাওয়াজ কের আসতে দেখে এরা দুজন মঞ্চের একধারে সরে যায়। কিন্তু ওদের রকম সকম দেখে সদাগরপুত্র হাসি সংবরণ করতে পারে না। ছক্কা আর পঞ্জার নামের তাস-মানুষ তাদের তিরস্কার করে। নিয়মবহির্ভুত যেকোনও অভিব্যক্তিই তাদের কাছে অপরাধমূলক। নিজেদের বংশ পরিচয় দিয়ে তারা জানায় নিয়মের ছকে বাঁধা পথে তাদের চলা — এর বিচ্যুতির কথা এখানে কেউ কখনো ভাবতেও পারে না। তার উত্তরে রাজপুত্র উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে ওঠে তার বাঁধনভাঙার উচ্ছ্বাসমুখর সঙ্গীত —

আমরা নূতন যৌবনেরই দূত,
আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত।
আমরা বেড়া ভাঙি,
আমরা অশোকবনের রাঙা নেশায় রাঙি,
ঝঞ্ঝার বন্ধন ছিন্ন করে দিই,.........

এমন সৃষ্টিছাড়া গান শুনে ছক্কা-পঞ্জা আপত্তি করে। এ কোন্ নিয়মভাঙা খামখেয়ালী মাতন নিয়মশৃঙ্খলিত তাসের দেশকে ব্যতিব্যস্ত করতে এল? এখানে মান্য হবে না কোনও হেলাদোলার স্বাধীনতা! রাজপুত্র তখন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রকৃতি জগতের দিকে। ওই অরণ্য যে ডালপালা মেলে ধরেছে আকাশের দিকে, আছে কি সেখানে কোনো মাপে-বাঁধার আইন? পর্বতের ঝরণা ধারার উচ্ছলিত আবেগ যে বেপরোয়া আনন্দে নির্গলিত হয়ে চলে তাকে বাঁধবে কোন্ অনুশাসন? এই সমস্তই তাসের দলের কাছে অর্থহীন মনে হয়। আসলে অর্থ-নিরর্থকতার সন্ধান করতে পারে যে মন, তার মৌলিক কোনও অস্তিত্ব এরা রাখেনি। নিজেদের অভ্যাসের গণ্ডীর বাইরে তাকানো তাদের ধাতে নেই, ধারণাতেও নেই।

মঞ্চে এর পরে আসেন রাজাসাহেব, রাণীবিধি। তাদের জাতীয় সংগীত যথেষ্ট কৌতুক উদ্দীপক —

চিড়েতন, হরতন, ইস্কাবন —
অতি সনাতন ছন্দে
　　করতেছে নর্তন
চিঁড়েতন হর্তন। ....
নাহি কথা কহে কিছু
　　একটু না হাসে,
　　　　সামনে যে আসে
　　চলে তারি পিছু পিছু।
বাঁধা তার পুরাতন চালটা
নাই কোনো উলটা-পালটা,
　　নাই পরিবর্তন।

রাজার সম্মানে বিদেশি রাজপুত্র রাজপুত্র যে ভেট পেশ করে, তার কথা শুনে সকলে হতবাক। রাজপুত্র বলে এদেশে যা দুর্লভ তাই তার উপঢৌকন — সে হল উৎপাত। নিরবচ্ছিন্ন শান্তির মধ্যে স্বাধীন মনের ওঠা-পড়া-গতি-বিভঙ্গে যে আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে — রাজপুত্র তাকেই বলে উৎপাত। শুনে ভয় পেয়ে যায় গতে চলা তাসমানুষেরা। মনে করে অভ্যাসের মধ্যে এ কোন্ বিপত্তি এসে তাদের অজানার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল! রাজপুত্র এই অবকাশে তাসরাজকুমারীদের কাছে তার প্রাণবন্ত আবেদন রাখে — 'চঞ্চলেরে হৃদয়তলে লল করি।' এমন অদ্ভুত কথা শুনে রাজা দ্বিধাগ্রস্থ হন। কিন্তু রাজপুত্রের নির্বাসনদণ্ডে (রাণীর) আপত্তি। বাধ্যতামূলক আইন জারির বিরোধিতা করে টেক্কা সুন্দরীরা সমস্বরে অবাধ্যতামূলক বে-আইন দাবি করে। একটা গোলমাল বেধে যাওয়ায় রাজা সভা ভেঙে দেন।

এই যে রাণী এবং রাজকুমারীদের বিচলিত হওয়া, বাধ্যতার অবরোধ থেকে বেরিয়ে আসার প্রেরণা পাওয়া — এ যেন পুতুলের মধ্যে প্রাণে প্রথম সঞ্চার। শুধু তাই নয়, রাজপুত্র ও সদাগরপুত্র দেখতে পেল এক অভাবিত দৃশ্য — ইস্কাবনের নহ্‌লা একলা গাছের তলায় পা ছড়িয়ে বসে আকাশ থেকে অন্তরের মধ্যে শুনছে বুঝি বা চিঁড়েতনীর পায়ের শব্দ! এ কীসের ইঙ্গিত? তাদের খোলসের অন্তরমহলে লেগেচে মানবীয় অনুভূতির পরশমণি! রাজপুত্র আশান্বিত হয়ে ওঠে।

তৃতীয় দৃশ্যটিতে স্থান পেয়েছে ইস্কাবনী, টেক্কানী ও চিঁড়েতনীর মতো শুধুই তাসরমণীরা। সবচেয়ে ছোট এই দৃশ্যে নারীচিত্তে জেগে ওঠা প্রথম আত্মবোধ যার সঙ্গে আছে কিছুটা প্রেমচেতনাও। চিঁড়েতনী সাহসিকা। তাসিনীজন্মের পিছুটান ঝেড়ে ফেলে মানবী হবার ইচ্ছে সে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করে। অন্যদের মনে ইচ্ছে থাকলেও প্রথা ভাঙার সাহস পায় না তারা। সেই বাস্তব মানস অবস্থাটি নাট্যকার চমৎকার ভাবে ফুটিয়েছেন। নারীর সহজাত ভঙ্গিমা, তার সংলাপের বৈশিষ্ট্য দৃশ্যটিতে অন্য এক মাত্রা এনে দিয়েছে।

চতুর্থ তথা শেষ দৃশ্যটি সবচেয়ে বৃহৎ, তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে সাজ খসিয়ে ফেলে বিবিসুন্দরীরা নদীর ধারে গাছের তলায় আপন মনে ঘুরে বেড়ায়। নতুন করে নিজেদের দিকে ফিরে তাকায়। কেউ খোলা চুল নিয়ে বেণী বাঁধতে বসে, কেউ বা তার পুরুষ সঙ্গীকে ধন্য করে জবা ফুল তুলে আনবার বরাত দিয়ে — সেই ফুলের রসে সে পা রাঙাবে। কোন্ জন্মান্তরের সৌহৃদ্যে গাঁথা সম্পর্কের অনুরাগে রক্তিম হয়ে ওঠে তাদের মন। তারই শক্তিতে তারা বলতে পারে 'সব যদি যায় হব তোমার সর্বনাশের ভাগী'। বলে — 'সামনে কী যেন কালো পাথরের ভ্রুকুটি, ভেঙে চুরমার করাতে হবে। ভেঙে মাথায় যদি পড়ে পড়ুক। পথ কাটতে

হবে পাহাড়ের বুক ফাটিয়ে দিয়ে। কী করতে এসেছি এখানে। ছি ছি, কেন আছি এখানে। এ কী অর্থহীন দিন, কী প্রাণহীন রাত্রি। কী ব্যর্থতার আবর্তন মুহূর্তে মুহূর্তে?' প্রাণের গভীর থেকে এমন অসহ দিনযাপনের গ্লানি মোচনের ঝংকার ওঠে। এক তাসনারী, হরতনীর কণ্ঠে প্রথম অলসতা, নির্জীবতা, নিরর্থকতার গণ্ডীভাঙার গান উদ্দাম হয়ে জেগে ওঠে। বিপ্লবস্পন্দিত রুইতন অর্থহীন জীবনের বঞ্চনাকে ধিক্কার জানায় — 'ছিঁড়ে ফেলো আবরণ, টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেলো। মুক্ত হও, শুদ্ধ হও, পূর্ণ হও'।

এরপর আসে ছক্কা-পঞ্জা। ওপর মহলের হুকুম তামিল করাই ছিল যাদের কাজ, তারাও আর দহ্‌লা পণ্ডিতের বানানো শান্তির পাঠ শুনে চলতে চায় না। হরতনী সেই শান্তির স্বরূপ ধরিয়ে দেয় একটি উপমা দিয়ে — ভেতরে ভেতরে পোকা লেগে ক্ষয়ে যাওয়া গাছের মতো তাদের শান্তি — তাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা না করে কেটে ফেললেই মঙ্গল। যে - শান্তির হিমরসের অনুপান রক্তে মিশে তাকে হিমঠাণ্ডা নির্জীব করে তোলে, তার হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়া দরকার। দহলাপণ্ডিত সংকটে পড়ে আর ছক্কা-পঞ্জা হরতনীকে অনুরোধ করে পথ দেখাতে, বন্ধনমুক্তির পথ।

তারপর আসে ইস্কাবনী, টেক্কানী ও দহলানী। তাদের অনেকদিনের অনুভূতি ও বেদনা তারা আর আড়াল করতে পারে না। মানুষের যথার্থ মন, মানুষের আকৃতি নিয়ে স্বাভাবিক প্রকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে তাদের মনে — 'আমি কিন্তু, ভাই, ঠিক করেছি, মানুষের মন্তর নেব রাজপুত্তুরের কাছে।' ইস্কাবনীর এই কথা শুনে টেক্কানী বলে — 'আমিও'। যন্ত্রজীবনের থেকে প্রকৃত মানবজীবনে প্রবেশে করার মানে মানুষের অনুভূতিগুলির প্রবর্তন মেনে নেওয়া। সেখানে সুখ ও আনন্দ যেমন আছে, তেমনি আছে দুঃখ ও বেদনা। কিন্তু সেই গভীর অনুভব থেকে উঠে আসা বেদনার কথা তারা আজ এড়িয়ে যেতে চায় না। সেই দুঃখ-অনুভূতির ভেতরে আছে পরম পাওয়া — যা অকারণ, কিন্তু অনিবার্য — যেন এক নেশার জড়িমা — প্রাণের নিবিড়তার মাঝে তা পরম পাওয়া —

কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়,
মন কেন এমন করে —
যেন সহসা কী কথা মনে পড়ে।
যেন কাহার বচন দিয়েছে বেদন,
যেন কে চলে গিয়েছে অনাদরে —
বাজে তারি অযতন প্রাণের পরে।

এমন করে মনের কথা খুলে বলা, সখীতে সখীতে কানাকানি তাসের দেশের আইনে নিষিদ্ধ। সম্পাদককে আসতে দেখেই সকলে সেখান থেকে প্রস্থান করে। কারণ সংবাদমাধ্যমের প্রতাপ অখণ্ড — বেচাল দেখলে তা ক্ষমা করে না। দেশসুদ্ধ টি টি ফেলে দেওয়াই তার কর্ম।

রাজাসাহেব তাঁর দলবলসহকারে মঞ্চে প্রবেশ করেন। আসে বিদেশি রাজপুত্র আর সদাগর পুত্রও রাজপুত্র তার দেশের ছন্দে আবৃত্তি করে এমন কিছু, যা ছক্কা-পঞ্জা বুঝতে হয়তো ঠিক ঠিক পারল না, কিন্তু তাদের 'মন উঠল মেতে'। এই মনমাতানো ব্যাপারটা রাজার ভালো ঠেকল না। তিনি বললেন, 'আমাদের সনাতন শাস্ত্রের ছন্দ একটা শোনো —

শান্ত যেই জন
যম তারে ঠেলে ঠেলে
নেড়ে চেড়ে যায় ফেলে;
বলে মোর 'নাহি প্রয়োজন'।

বললেন — শোনো বিদেশী।
রাজপুত্র — আদেশ করো।
রাজা — তোমরা যে তাসদ্বীপময় অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছে - জলে দিচ্ছ ডুব, চড়ছ পাহাড়ের মাথায়, কুড়ুল হাতে বনে কাটছ পথ — এ- সব কেন।
রাজপুত্র — রাজাসাহেব, তোমরা যে কেবলই উঠছ বসছ, পাশ ফিরছ, পিঠ ফেরাচ্ছ, গড়াচ্ছ মাটিতে, সেই - বা কেন।
রাজা — সে আমাদের নিয়ম।
রাজপুত্র — এ আমানের ইচ্ছে।

রাজা — ইচ্ছে? কী সর্বনাশ! এই তাসের দেখো ইচ্ছে। বন্ধুগণ, তোমরা সবাই কী বল।
ছক্কা-পঞ্জা — আমরা ওরা কাছে 'ইচ্ছেমন্ত্র' নিয়েছি।
রাজা — কী মন্ত্র।
ছক্কা-পঞ্জা — (গান)

ইচ্ছে।
সেই তো ভাঙছে, সেই তো গড়ছে,
সেই তো দিচ্ছে নিচ্ছে।
সেই তো আঘাত করছে তালায়,
সেই তো বাঁধন ছিঁড়ে পালায়
বাঁধন পরতে সেই তো আবার ফিরছে।

ইচ্ছা শক্তির এমন জয়গান তাসেরই যখন তাসরাজার সামনে দাঁড়িয়ে গাইছে তখন রাজার বারণ সত্ত্বেও তাতেই যোগ দিচ্ছে চিঁড়েতনী, হরতনী, রুইতন, এমনকি দহলা পণ্ডিত, শেষ পর্যন্ত রাণীবিবিও। এরা সকলে মিলে তাসের দেশের উল্টো ভাবনা আর ভুল চালনার কথা রাজার কাছে স্পষ্ট মেলে ধরল। যেমন — তাসের দেশের ভাষায় শিকলকে বলে অলঙ্কার!

জেলখানাকে বলে শ্বশুরবাড়ি!
হেঁয়ালিকে বলে শাস্তর!
বোবাকে বলে সাধু!
বোবাকে বলে পণ্ডিত!
মরাকে বলে বাঁচা!
স্বর্গকে বলে অপরাধ!

এমন নিয়মভাঙা কথাবার্তা শুনে রাজা সবাইকে ধমক দিয়ে স্তব্ধ করে দিতে চাইলেন। কিন্তু কেউ তখন আর পুরোনো ও নকল ধ্যান ধারণার মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে চাইছে না। অগত্যা রাণীকে পর্যন্ত নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত বলে ঘোষণা করলেন। তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই রাণীবিবির। প্রজারাও রাণীর সঙ্গে রাজ্য ত্যাগ করে যেতে চায়। এমনকি সবচেয়ে গোঁড়া দহলা পণ্ডিতও তার পুঁথিগুলো ভাসিয়ে দিয়ে প্রস্তুত। এই দেখে সেই মানুষদের খোঁজ পড়ল। তারাই তো এদেশে ইচ্ছেমন্ত্রের হোতা হয়ে এসেছে। রাজপুত্র এসে আশ্বাস দিল সকলকে — হ্যাঁ, সবাই তাসের নকল খোলস ছেড়ে আসল মানুষ হয়ে স্বরূপ নিতে পারবে। রাজা স্বয়ং তখন মানুষ হতে ইচ্ছুক। রাণীমার সহায়তায় তিনিও বেড়া ভাঙার শক্তি পেয়ে গেছেন। এরপর সমবেত কণ্ঠে ভাঙার গান দিয়ে নাটকের অন্তিম লগ্ন ঘনিয়ে আসে। যে - গানটি আসলে ভাঘা নয়, প্রাণশক্তির জলগাথা

বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও,
বাঁধ ভেঙে দাও।
বন্দী প্রাণমন হোক উধাও।
শুকনো গাঙে আসুক
জীবনের বন্যার উদ্দাম কৌতুক;
ভাঙনের জয়গান গাও।.......

৩.৪.১৩.৪ - মূল থীম বা ভাবসত্য

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীয় শারদ অবকাশের আগে আশ্রমের ছাত্রছাত্রীরা একটি সুন্দর অনুষ্ঠান করত। একবছর এমনই একটি আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আশ্রমিকেরা কবিকে অনুরোধ করেন একটি নতুন কোনও সৃষ্টির জন্য। যাকে আশ্রয় করে একটি সুচারু মঞ্চাভিনয় সম্ভব হবে। রবীন্দ্রনাথ তখন নজর দিলেন তাঁর বহু পূর্বে লেখা একটি গল্পের দিকে। ১৮৯২ তে তিনি 'একটা আষাঢ়ে গল্প' নামে রূপকথার ধাঁচে যে - গল্পটি লিখেছিলেন, তারই কাঠামোর ওপরে গড়ে তুললেন এক মঞ্চাভিনয়যোগ্য উপস্থাপনা — 'তাসের দেশ'।

আপাতদৃষ্টিতে গল্পটির যে রসাবেদন, তাতে তাকে রূপকথা বলে মনে হয়। এতে আছে রাজা, রাণী, রাজপুত্র, সদাগরপুত্র, রাজকুমারীরা; আছে সভাসদ, পার্শ্বচর, পরিচারক। রূপকথায় যেমন মধুর ইতিবাচক এবং মিলনান্ত পরিণতি থাকে, এখানেও তেমনটিই ঘটেছে। কিন্তু এরই মধ্যে এএমন রূপকের ব্যবহার রয়েছে, তাতে একটি সমতল গল্পরসপ্রধান রচনার অতিরিক্ত অন্য কিছু পাঠক বা দর্শকের দৃষ্টিতে ধরা দেয়। সেখান থেকেই বুঝতে পারা যায় যে লেখক একটি গূঢ় সত্য লুকিয়ে রেখেছেন হাসি ও রঙ্গ-ব্যঙ্গমুখর 'তাসের দেশ' নাটকের গভীরে। সেই সত্যটিই এই নাটকের মূল তত্ত্ব।

তাসের দেশের অধিবাসী নারীপুরুষ সকলকেই তাসের এক একটি মার্কা নিয়ে মঞ্চে নামতে হয়। এই বেশভূষা, তাদের বাঁধা চালে হাত-পা নাড়া থেকে শুরু করে কথনভঙ্গি — সব কিছুর মধ্যে থেকেই এক অনাবিল হাস্যরস উদ্রিক্ত হয়। এসের যেন ভালো-মন্দ, সাদা কালোর ধারণা নেই। নেই মৌলিক চেতনা, অনুভব করবার মতো মনের সজীবতা। সেই পুতুলের দেশে এসে ভিড়েছে রাজপুত্র — অন্য দেশ থেকে প্রাণশক্তির অমেয়তা নিয়ে। তার উষ্ণ হৃদয়বত্তা তাসের দেশকে কীভাবে আপ্লুত করল, প্রাণের জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, সেই কৌতূহলোদ্দীপক পর্যায়গুলি দৃশ্যে দৃশ্যে গাঁথা পড়েছে নাচে-গানে-কৌতুকরসে।

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনায় যৌবনের প্রাণসঞ্জীবনে জড়বৎ আবেগহীন মানুষের চিৎশক্তির উদ্বোধন স্থান লাভ করেছে। নাটকে অচলায়তন, রথের রশি, ফাল্গুনী বা নবীন তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। জড় প্রাণ বা নিষ্প্রাণতার রূপটি অদ্ভুতরসের মোড়কে পরিবেশন করাতে হাস্যরস উচ্ছলিত হয়েছে। আবার তার অসারতার দিকটিও এতে সংকেতিত। শেষপর্যন্ত জীবনের স্পর্শে জড়ের সংস্কারমুক্তির বার্তায় নাটকের তত্ত্ব প্রতিষংগ। মানবাত্মা ততক্ষণ মুক্ত নয়, যতক্ষণ না সে স্বরূপে প্রকাশ পায়। সনাতন পন্থা যখন তাকে আগ্রাসনের মধ্যে রেখে দেয়, নিয়মের শাসন নিয়েও তখন সে বড়হি করতে থাকে — বিচার করতে পারে না তার ঔচিত্য কতখানি। তাসের দেশের রূপকে লেখক সংস্কারপীড়িত সেই জাতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যারা স্বকীয় ভাবনা-চেতনার জগৎ থেকে নির্বাসিত। তাদের নিরর্থক জীবনযাপন সত্যকে তখনই স্পর্শ করতে পেরেছে, যখন নিয়মের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে তারা আপন স্বাধীন ইচ্ছের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইচ্ছের মর্ম তারা এভাবেই উপলবদ্ধি করেছে —

ইচ্ছে
সেই তো ভাঙছে, সেই তো গড়ছে,
সেই তো দিচ্ছে নিচ্ছে।

তাই জড়ত্ব ঘুচিয়ে ফেলে তাসবংশীয়েরা মানুষ হয়ে উঠেছে। ইচ্ছের শক্তিতে বলীয়ান হতে পারলেই মুক্তি — মানবজন্মের সার্থকতাও সেখানে।

৩.৪.১৩.৫ — আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'তাসের দেশ' নাটকের মূল থিম বা ভাবসত্য লেখো।

৩.৪.১৩.৬ — সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। একটা আষাঢ়ে গল্প, গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১ম খণ্ড)।

২। জাভাযাত্রীর পত্র; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩। রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ; প্রমথনাথ বিশী।

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড); সুকুমার সেন।

৫। রবীন্দ্রনাট্য-পরিক্রমা; অশোক সেন।

৬। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস; আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৭। বাংলা নাটকের ইতিহাস; অজিত কুমার ঘোষ।

৮। আনন্দ সর্বকাজে অমিতা সেন।

৯। রবীন্দ্রমনন রবীন্দ্রগীতিনৃত্যনাট্য; জয়শ্রী নন্দী (বিশ্বাস)।

একক — ১৪

গীতিনৃত্যনাট্য

বিন্যাস ক্রম

৩.৪.১৪.১ : তাসের দেশ গীতিনৃত্যনাট্য
৩.৪.১৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি
৩.৪.১৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩.৪.১৪.১ - তাসের দেশ গীতিনৃত্যনাট্য

সদ্য বিদেশ প্রত্যাগত নব্যযুবক রবীন্দ্রনাথ যখন অনেকখানি পাশ্চাত্যদেশীয় সুর ও তালের প্রয়োগে 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১) সৃষ্টি করলেন, তখনই এক অভিনব কলা আঙ্গিক একজন নবীন স্রষ্টার হাত ধরে বঙ্গভারতীয় অঙ্গনে প্রত্যাশা ও অঙ্গীকার বহন করে আনল। ত্রিবিধ কলা — গান, নাচ ও নাটক-এর সমন্বয়ে এমন নতুন আঙ্গিক দর্শক মনোরঞ্জনের ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক ভূমিকা রচনা করল। এই পর্যায়ে পরপর আরও রচনা ও উপস্থাপনা হতে থাকল — কালমৃগয়া, মায়ার খেলা, ঋতুরঙ্গ, নবীন ইত্যাদি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী পর্যায়ে, বিশ্বভারতীর স্থাপনা এবং সেখানে নৃত্যগীতিদির পাঠক্রম প্রচলন ও তার নান্দনিক চর্চা যখন পূর্ণ উদ্যম নিয়ে বয়ে চলেছে, তখন পরিণত বয়সী কবি আরও পরিশীলিত সুচারু ও মননসমৃদ্ধ গীতিনৃত্যনাট্য উপহার দিলেন। এই পর্বের মধ্যে আছে শাপমোচন, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, শ্যামার সঙ্গে 'তাসের দেশ'ও।

তাসের দেশ-এর গানের প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকের মতই সুপ্রযুক্ত ও ভাবপ্রকাশে বিশেষ সহায়ক। প্রথম সূত্রপাতে 'খরবায়ু বয় বেগে' গানটি সমুদ্রযাত্রার অনুষঙ্গ যেমন ধরিয়ে দেয়, তেমনি এর সুর ও দ্রুত তাল বন্ধনমুক্তির আবহ প্রস্তুত করে। রাজপুত্রের মনোভঙ্গিটি ধরা পড়েছে —

আমার মন বলে 'চাই চাই গো
যারে নাহি পাই গো।'
সকল পাওয়ার মাঝে
আমার মনের বেদন বাজে,
'নাই নাই নাই গো'।
তাই সে সংকল্প করে —
...... বাণিজ্যেতে যাবই।
লক্ষ্মীরে হারাবই যদি
অলক্ষ্মীরে পাবই।

তাসের দেশে পৌঁছে যখন তাসের দলকে দেখা গেল, তাদের কাওয়াজে প্রকাশ পেল গানের আড়ষ্ট সুরের সঙ্গে কেঠো পদক্ষেপের কৌতুকনৃত্য

তোলন নামন,
পিছন সামন,
বাঁয়ে ডাইনে
চাই নে, চাই নে,
বোসন ওঠন,
ছড়ান গুটন,
উলটো-পালটা
ঘূর্ণি চালটা
বাস বাস্ বাস্।

কিম্বা অন্যত্র
নাহি কোনো অস্ত্র,
খাকি-রাঙা বস্ত্র।
নাহি লোভ
নাহি ক্ষোভ ....
যথারীতি জানি,
সেইমতে মানি,
কে তোমার শত্রু, কে তোমার মিত্র,
কে তোমার টক্কা, কে তোমার ফক্কা।

এমন নৃত্যগীতাভিনয়ে এক মুহূর্তেই দর্শকের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় — এই জড়পিণ্ডবৎ জীবগুলি 'কিছু নুতন রকমের। যেন জগতে ইহাদের কোথাও মূল নাই। যেন ইহাদের টিকি ধরিয়া কে উৎপাটন করিয়া লইয়াছে, ইহারা এক প্রকার হতবুদ্ধিভাবে সংসারের স্পর্শ পরিত্যাগ করিয়া দুলিয়া দুলিয়া বেড়াইতেছে। যাহা কিছু করিতেছে, তাহা যেন আর একজন কে করাইতেছে। ঠিক যেন পুৎলাবাজির দোদুল্যমান পুতুলগুলির মতো। তাই কাহারো মুখে ভাব নাই, ভানা নাই, সকলেই নিরতিশয় গম্ভীর চালে যথানিয়মে চলাফেরা করিতেছে। অথচ সবসুদ্ধ ভারি অদ্ভুত দেখাইতেছে।' — 'একটা আষাঢ়ে গল্প' লেখার সময় যে বর্ণনা এভাবে স্থান পেয়েছিল, গীতনৃত্যসহযোগে অভিনয়ের মাধ্যমে কত সহজে তা গোচর হতে পেরেছে। আবার সাহিত্যরস হিসেবেও এর মূল্য কমে যায়নি।

রাজপুত্রের কণ্ঠে 'আমরা নূতন যৌবনেরই দূত' এই গান নৃত্যাভিনয় সহযোগে কতো প্রাণস্পর্শী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর একটি গানে রাজপুত্র যখন রাজকুমারীদের কাছে 'চঞ্চলেরে হৃদয়তলে লও বরি' এই আবেদন রাখে, তখন স্পর্শমণির ছোঁয়ায় যেন 'পাষাণমূরতি সুন্দরী'দের হৃদয়ের হিল্লোল তরঙ্গিত হয়ে তাসের দেশকে মুখরিত করে, ছড়িয়ে যায় আকাশে-বাতাসে। তাদের মনেও যে গত জন্মের মাধবীবন থেকে ভ্রমর গুঞ্জন তোলে, তার দূরগন্ধবাণীবহ অজানা বেদনার সুর নৃত্যগীতমাধ্যমেই এমন নিবিড় হয়ে ঘনিয়ে উঠতে পারে দর্শকেরও মনে। তাস-মানুষের নৃত্যের হিল্লোলে আন্দোলিত দেহ-মনকে এতখানি ধরা যেত না, যদি না হরতন গাইত সেই গান, যা রাজপুত্রের দেওয়া মন্ত্র থেকে সে পেয়েে তার অন্তরপ্রকৃতিতে। বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে হরতনের গানটি শাশ্বত হয়ে থেকে যায় শ্রোতার মনে —

উতল হাওয়া লাগল আমার গানের তরণীতে।

এইভাবেই একসময় তারা সবাই মিলে নিয়মের প্রতিস্পর্ধিতা করে গেয়ে উঠেছে 'ইচ্ছে'র জয়সূচক গানটি! আর সবশেষে বাঁধনভাঙার সম্মিলিত আহ্বান। তাস বংশের সবাই, ছক্কা-পঞ্জা-গোলাম-পণ্ডিত থেকে রাজা-রাণী পর্যন্ত যে-আহ্বানে প্রাণের মুক্তিতে চিত্তস্ফূর্তির জোয়ারে ভেসে যায় তা নাট্যশেষের এই গানে ছাড়া কীভাবেই বা দর্শককে এমন করে মাতিয়ে দিতে পারতো —

বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও,
বাঁধ ভেঙে দাও।
বন্দী প্রাণমন হোক উধাও।

গানগুলির সঙ্গে যেমন নৃত্যপরিকল্পনা আছে, তেমনি সংলাপের মধ্যে সেই সম্ভাবনার সংস্থান রাখা হয়েছে। মূলত নাটকাভিনয়ের উদ্দেশ্য নিয়েই তাসের দেশ রচিত হয়েছে। নাট্যোচিত দৃশ্যপরম্পরা, প্রবেশ-প্রস্থান ইত্যাদির সুনির্দিষ্ঠ, সপরিকল্পিত নির্দেশ নাট্যসৃষ্টিটিতে বর্তমান। চারটি দৃশ্যের মধ্যে প্রথম দৃশ্যটি ভূমিকাস্বরূপ। রাজপুত্রের বিদেশযাত্রার পশ্চাতে প্রথানুগত্য থেকে মুকিনত পাবার আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট। এরই সূত্র ধরে পরবর্তী দৃশ্যে তার অজানা এক দেশে অভিসঞ্চার — 'এলেম নতুন দেশে'। রাজপুত্রের ও সদাগরপুত্রের নাট্যব্যাপী সমস্ত তাদের দেশ-পরিক্রমায় একটি কৌতুকরসের ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়েছে — নাট্যকৌতূহল সৃষ্টিতে এর ভূমিকা যথেষ্ট। ছোট ছোট সংলাপ সৃষ্টিতে নাট্য আবেদন আর নৃত্যচ্ছন্দ যেন পরস্পরের মান ও আকর্ষণকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ

বললেন — শোনো বিদেশী।

রাজপুত্র — আদেশ করো।

রাজা — তোমরা যে তাসদ্বীপময় অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছে - জলে দিচ্ছ ডুব, চড়ছ পাহাড়ের মাথায়, কুড়ুল হাতে বনে কাটছ পথ — এ- সব কেন।

রাজপুত্র — রাজাসাহেব, তোমরা যে কেবলই উঠছ বসছ, পাশ ফিরছ, পিঠ ফেরাচ্ছ, গড়াচ্ছ মাটিতে, সেই - বা কেন।

রাজা — সে আমাদের নিয়ম।

রাজপুত্র — এ আমানের ইচ্ছে।

নাটকীয় চমক যে এই নৃত্যগীতবহুল নাটকে পরিত্যক্ত হয়নি উদ্ধৃতাংশটি তার পরিচয় বহন করছে।

এই ধরণের দৃষ্টান্ত গ্রন্থটির পাতায় পাতায় পাওয়া যাবে। নাট্যরসসহযোগে গানের কথা ও সুর, নাচের ছন্দ অত্যন্ত সার্থকভাবেই 'তাসের দেশ' এ প্রতিষ্ঠিত করেছে এক চিরন্তন সত্য। 'বাঁধন ছেঁড়া যৌবনাবেগ ও তারুণ্যশক্তি' পারে সমস্তরকম মাপজোকের কুঠুরি থেকে মানুষকে মুক্তির দিকে উজ্জীবিত করতে — এই হল একটি সাহিত্য ও মঞ্চসফল সৃজন 'তাসের দেশ'-এর মূল বাণী।

মঞ্চে অভিনয়কালে তাসবংশীয়দের স্পষ্ট চিহ্নিত করবার জন্য তাদের সাজে বিশিষ্টতা রাখা হতো। তাসের মার্কা দেওয়া পোশাক ও উষ্ণীষের ব্যবহারের পেছনে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব-এশীয় দ্বীপভ্রমণের অভিজ্ঞতার প্রভাব আছে বলে মনে হয়। জাপানী মুখোশের কলাবিদ্যা, জাভাদ্বীপের মুখোশনৃত্যের কথা কবির 'জাভাযাত্রীর পত্র' থেকে জানা যায়। 'মুখোশ তৈরী যে গুণী করে, সে সেই শ্রেণিপ্রকৃতিকে মুখোশে বেঁধে দেয়। নট সেই মুখোশ পরে এলে আমরা তখনই দেখতে পাই একটা বিশেষ মানুষকে কেবল নয়, বিশেষভাবে এক শ্রেণীর মানুষকে'।

সম্ভবত এই ধারণাটি রবীন্দ্রনাথ তাসের দেশের অভিনেতাদের নৃত্যভঙ্গিমা ও বেশ নির্ধারণের সময় মনে রেখেছিলেন। তাই সমালোচক বলেছেন — '..... বিদ্রুপনৃত্যের কিছু আভাস যেন 'তাসের দেশ' নাটকে আছে। সে দেশের তাসের জনতার চলাফেরা, কথাবার্তা ও সঙ্গীতে এই বিদ্রূপনৃত্যের ভঙ্গি।'

(রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ — প্রমথনাথ বিশী)

৩.৪.১৪.২ — আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। গীতিনাট্য কাকে বলে?

২। রবীন্দ্র গীতিনাট্য হিসেবে 'তাসের দেশ'-এর স্থান নির্দেশ করো।

৩.৪.১৪.৩ — সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। একটা আষাঢ়ে গল্প, গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১ম খণ্ড)।

২। জাভাযাত্রীর পত্র; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩। রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ; প্রমথনাথ বিশী।

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড); সুকুমার সেন।

৫। রবীন্দ্রনাট্য-পরিক্রমা; অশোক সেন।

৬। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস; আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৭। বাংলা নাটকের ইতিহাস; অজিত কুমার ঘোষ।

৮। আনন্দ সর্বকাজে অমিতা সেন।

৯। রবীন্দ্রমনন রবীন্দ্রগীতিনৃত্যনাট্য; জয়শ্রী নন্দী (বিশ্বাস)।

একক — ১৫

ইচ্ছামন্ত্র : বন্ধনমোচনের অভিযান

বিন্যাস ক্রম

৩.৪.১৫.১ : ইচ্ছামন্ত্র : বন্ধনমোচনের অভিযান

৩.৪.১৫.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩.৪.১৫.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩.৪.১৫.১ - ইচ্ছামন্ত্র : বন্ধনামোচনের অভিযান

রবীন্দ্রজীবন ও রচনাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার মন্ত্র ছিল মুক্তির মন্ত্র। সমস্ত সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে গিয়ে মানবমুক্তির মহনীয় দীক্ষা রবীন্দ্রসৃষ্টি থেকে বিশ্বের মানুষ লাভ করতে পারে। খুবই আশ্চর্য হই আমরা যখন দেখি, নিতান্ত শিশুকালে মাষ্টারমশাইয়ের দেওয়া একটি লাইনের পাদপূরণ করতে গিয়েও রবীন্দ্রনাথ মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই বুঝি ব্যক্ত করেছিলেন। 'মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে' — শিশু কবির অনুভবে ধরা পড়েছিল যে সেই কূপবন্দীত্বের হীনতা থেকে মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত তাদের পথ চেয়ে থাকা — যতক্ষণ না 'বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই'! 'অতিথি'র কিশোর তারাপদকে কোনো বাঁধনেই বাঁধতে পারা যায়নি। নিয়মের পাশ সহজকে কঠিন, প্রবহমানকে 'অচলায়তন' করে ফেলে। তার বিরুদ্ধে মুক্ত চেতন রবীন্দ্রনাথ গল্পে-কবিতায়-গানে-গদ্যে-নাটকে, আজীবন কর্ম সাধনায় মুক্তিমন্ত্র উচ্চারণ করে এসেছেন। এইজন্যেই তাঁর সৃষ্টি কালান্তরের বাণীবহ, শাশ্বত মূল্যে স্বীকৃত।

'তাসের দেশ' রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের রচনার মধ্যে পড়ে। গীতিনৃত্যনাট্যের প্রথম সার্থক রূপকার এই নাট্যসৃষ্টিতে অনেকটাই অভিনব ভাব-ভাবনা-আঙ্গিক নিয়ে এসেছিলেন। গানের সুরের আন্দোলন এ-নাটকের অন্যতম আকর্ষণ। কথা ও সুরের জাদুতে নতুন দেশের অভিসারী রাজপুত্রের কণ্ঠে জাগে বন্ধনমুক্তির উচ্ছ্বাস — অজানাকে জয় করবার সংকল্প —

হেরো, সাগর উঠে তরঙ্গিয়া
বাতাস বহে বেগে।
সূর্য যেথায় অস্তে নামে
ঝিলিক মারে মেঘে
দক্ষিণে চাই, উত্তরে চাই,
ফেনায় ফেনা, আর কিছু নাই
যদি কোথাও কূল নাহি পাই
তল পাব তো তবু। ....
ভিটার কোণে হতাশমনে
রইব না আর কভু
অকূল মাঝে ভাসিয়ে তরী
যাচ্ছি অজানায় ....

অকূলের কূলে ভিড়ে সত্যিই এক অদ্ভুত অজানা দেশে এসে পৌঁছোল রাজপুত্র। অভিনবত্ব তার প্রার্থিত। সেই হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন যেন এই তাসের দেশ। কিন্তু এ কী ধরনের বৈচিত্র্য! অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাসের দেশের দলবল প্রবেশ করেছে মঞ্চে। তাদের চলনের ঢং দেখলে সং-এর নৃত্য বলেই মনে হয়। তেমনি তাদের ধ্যানধারণার অবাস্তবতা। তাসবংশের উৎপত্তির ইতিহাস রাজপুত্র-সদাগরপুত্রকে বিস্মিত করে। গোধূলি লগ্নে পিতামহ ভীষ্মের হাই তোলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চারমুখ থেকে চার ধরনের তাসেদের উৎপত্তি হল। তারাই হরতন, রুইতন, চিড়েতন ইস্কাবন। কিন্তু সবচেয়ে যা অদ্ভুত তা এদের ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, কথাবার্তায়। একেবারে নিয়মের নিগড়ে বাঁধা অস্তিত্ব নিয়ে তারা তটস্থ - পাশে কোথাও নিয়মভঙ্গ হয়ে যায়। বাঁধা গতে পথ

চলে বলেই তাদের পথ আর এগোয় না। জালে বন্দী তাসেরা বুঝতেও পারে না তাদের জীবনের বঞ্চনার কথা। উপরন্তু এইসব অবোধেরা এই নিয়েই বড়াই করে থাকে।

রাজপুত্র এই নাট্যে বাঁধনভাঙার মন্ত্র নিয়ে এসেছে। যৌবনের জয়গান করতে গিয়ে সে গেয়েছে 'আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত'। নৃত্যের চপল লীলায় এর স্পন্দন নিশ্চয়ই তাসেদের মধ্যে কমবেশি ছড়িয়ে পড়েছে। তাই যাদের বৈশিষ্ট্য ছিল

বাঁধা তার পুরাতন চালটা,
নাই কোন উলটা-পালটা,
নাই পরিবর্তন।

তাদের কণ্ঠেও এমন উত্তাল সঙ্গীত; তাদের মনও হয়ে পড়ল আবেগে উতলা —

উতল হাওয়া লাগল আমার গানের তরণীতে
দোলা লাগে, দোলা লাগে
তোমার চঞ্চল ওই নাচের লহরীতে।

গানের সুরে আর নাচের ঝংকারে এই জন্মের বেড়ি তো ঘুচে গেলই, তারা পূর্বজন্মের অচেনা গণ্ডীও ছাড়িয়ে গেল। কেননা তাদের চিত্তশীলের বিস্ফার ঘটেছে। হরতনী রুইতনকে বলে, 'মনে কি আসছে....., তোমার গানে আমি নেচেছিলুম কোনো একটা যুগে।' দ্বিতীয় দৃশ্যে যেকথা রাজপুত্র বলেছিল সদাগর পুত্রকে — 'আমরা এসেছি কী করতে — খসিয়ে দেব'। সেই কথাই চতুর্থ-দৃশ্যে ফুটে উঠেছে হরতনীর হৃদয়মূলে — 'কী করতে এসেছি এখানে। ছি ছি, কেন আছি এখানে। একি অর্থহীন দিন, কী প্রাণহীন রাত্রি। কী ব্যর্থতার আবর্তন মুহূর্তে মুহূর্তে।' স্বজাতির মধ্যে আজন্মকাল যে অনুবর্তন দেখে আসছে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে হরতনী। নিজেকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে সে — এমন নব প্রেরণা জাগাতে রাজপুত্রের আনা ইচ্ছেমন্ত্রই কাজ করেছে চাবিকাঠির মতো। প্রাণের আলোর দ্যুতি ঠিকরে উঠেছে রাজপুত্রের নৃত্যগীতচ্ছন্দের দোলায় —

ছন্দ নাচিল হোমবহ্নির তরঙ্গে,
মুক্তিরণের যোদ্ধবীরের ভ্রূভঙ্গে,
ছন্দ ছুটিল প্রলয়পথের
রুদ্ররথের চাকাতে।

সমুদ্রপারের ছন্দ মাতিয়ে দিয়েছে তাসের দলের মন। সনাতন শাস্ত্রের ছন্দে মরে থাকার অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য উচাটন তাদের অন্তর। নিয়ম ভাঙার মধ্যে দিয়ে ইচ্ছের প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমস্বরে রাজার কাছে দাবি করেছে তারা। রাজার বিস্ময় বর্ধিত করে ইচ্ছেমন্ত্রের জয়গান করেছে ছক্কা-পঞ্জা

ইচ্ছে
সেই তো ভাঙছে, সেই তো গড়ছে,
সেই তো দিচ্ছে নিচ্ছে।
সেই তো আঘাত করছে তালায়,
সেই তো বাঁধন ছিঁড়ে পালায়
বাঁধন পরতে সেই তো আবার ফিরছে।।

এমনি করে জীবন্ত নির্জীবতার দৃষ্টান্ত তাসের দেশের জীবগুলির মধ্যে চেতনা জেগেছে। ক্রমে ক্রমে তারা বুঝল যে ইচ্ছে কি। দেখতে লাগল এমনি করেই শুধু না চলে অমনি করেও চলা সম্ভব। বিদেশ থেকে যে দুটি মানুষ এসেছে, তারা বুঝিয়ে দিয়েছে 'বিধানেই মধ্যেই মানবের সমস্ত স্বাধীনতার সীমা নহে। এমনি করিয়া তাহারা ইচ্ছানামক একটি রাজশক্তির প্রভাব' অনুভব করল। তাদের রাজার চেয়েও যে এই ইচ্ছেরাজের শক্তি বেশি, তা প্রমাণ হয়ে গেল। টেক্কা-সাহেব গোলামরা যেমন এতদিনের নিয়ম অমান্য করেছে, তাদের মধ্যে অনুরাগ, ঈর্ষা, হাসি-কান্না সংশয়-ব্যাকুলতার ঢেউ-এর ওঠাপড়া শুরু হয়েছে, বিবিসুন্দরী ও রাণীবিবির মধ্যেও তেমন ভাবের উদ্বেল আলোড়ন! রাজা স্বয়ং আর নিজেকে আলাদা করে বিয়মবিধানে বদ্ধ রাখতে পারলেন না।' একটা আষাঢ়ে গল্পে'র উপসংহারে পরিবর্তনের সেই সুরটি সুন্দরভাবে ধরা আছে — "ছবির দল হঠাৎ মানুষ হইয়া উঠিয়াছে।

এখন আর পূর্বের মত সেই অবিচ্ছিন্ন শান্তি এবং অপরিবর্তনীয় গাম্ভীর্য নাই। সংসারপ্রবাহ আপনার সুখদুঃখ রাগদ্বেষ বিপদসম্পদ হইয়া ..... নবরাজ্যকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। এখন কেহ ভালো, কেহ মন্দ, কাহারও আনন্দ, কাহারও বিষাদ — এখন সকলে মানুষ। এখন সকলে অলঙ্ঘ্য বিধানমতে নিরীহ না হইয়া নিজের ইচ্ছামতে সাধু ও অসাধু"।

ব্যক্তি স্বাধীনতার অপর নাম ইচ্ছাস্বাধীনতা। তাসের খোলস হল বিধানের খোলস। সেই মুখোশ ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই তাদের আসল মুখ বেরিয়ে পড়ল। হয়ে উঠল তারা প্রাণশক্তি সম্পন্ন ইচ্ছেবান প্রকৃত মানুষ পদবাচ্য।

৩.৪.১৫.২ - আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'তাসের দেশ' নাটকে ইচ্ছামন্ত্র বিষয়টির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।

২। 'ভাঙতে হবে অলসতার বেড়া, নির্জীবের গণ্ডী, নিরর্থকের আবর্জনা' — এই উক্তি কার? উক্তিটির অন্তর্নিহিত অর্থ বিশ্লেষণ করো।

৩.৪.১৫.৩ - সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। একটা আষাঢ়ে গল্প, গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১ম খণ্ড)।

২। জাভাযাত্রীর পত্র; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩। রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ; প্রমথনাথ বিশী।

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড); সুকুমার সেন।

৫। রবীন্দ্রনাট্য-পরিক্রমা; অশোক সেন।

৬। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস; আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৭। বাংলা নাটকের ইতিহাস; অজিত কুমার ঘোষ।

৮। আনন্দ সর্বকাজে অমিতা সেন।

৯। রবীন্দ্রমনন রবীন্দ্রগীতিনৃত্যনাট্য; জয়শ্রী নন্দী (বিশ্বাস)।

একক — ১৬

তাসনারী ও রাজপুত্রদের ভূমিকা

বিন্যাস ক্রম

৩.৪.১৬.১ : তাসনারীদের ভূমিকা

৩.৪.১৬.২ : রাজপুত্রের ভূমিকা

৩.৪.১৬.৩ : উৎসর্গপত্র

৩.৪.১৬.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩.৪.১৬.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩.৪.১৬.১ - তাসনারীদের ভূমিকা

রূপক তত্ত্বনাট্য 'তাসের দেশ-এর রাজা-প্রজা সকলেই তাসবিশেষ। হরতন, রুইতন, চিঁড়েতন ও ইস্কাবন এই চার শ্রেণির মধ্যে বিভক্ত হয়ে নিয়মসিদ্ধ তাসবংশীয়েরা জীবন অতিবাহিত করছে। তাদের মধ্যে যারা স্ত্রী-জাতীয়, তারা আখ্যাত হয়েছে এইভাবে — টেক্কানী, দহলানী, ইস্কাবনী, হরতনী এবং সর্বোপরি বিবিরাণী বা রাণীবিবি।

'তাসের দেশ' গীতিনৃত্যনাট্যে লেখক যে পটভূমি গ্রহণ করেছেন, তা একটি দ্বীপে অবস্থিত। মানব সংসার থেকে বহুদূর তাসের দেশে এসে পড়েছে দুই যুবক — রাজপুত্র আর তার বন্ধু সদাগর পুত্র। এদের, বিশেষত রাজপুত্রের প্রাণের আবেগ ক্রমে তাসের দলের নিষ্প্রাণ জড়ত্বে ফাটল ধরাল এবং শেষপর্যন্ত সে দেশের ইমোশন বর্জিত নির্মনষ্ক মানুষগুলি প্রকৃত মানুষের প্রাণচেতনায় সঞ্জীবিত হতে পারল। এই যে ভাবান্তর এবং রূপান্তর — রবীন্দ্রনাথ নাতিবৃহৎ নাট্য রচনায় রূপকের আশ্রয়ে তার ধারাবাহিক বিশ্বাস্যতামুখী পরিচয় রেখেছেন। এ প্রসেঙ্গে প্রকৃতির ভূমিকার কথা এসে পড়ে। মানবপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে অনবচ্ছেদী সম্পর্কের কথা রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যতম বিষয়। তাসের দেশে রাজপুত্র দেখেছিল মানব প্রকৃতি বা মানুষের স্বাভাবিক অনুপ্রাণনার একান্ত অভাব। তখন সে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে প্রকৃতিজগতের দিকে —

হেরো অরণ্য ওই
হোথা শৃঙ্খলা কই,
পাগল ঝরণাগুলো
দক্ষিণ পর্বতে।

রাজপুত্রের কথায় প্রথমে তাসপুরুষেরা কর্ণপাত না করলেও রাজপুত্র হাল ছাড়েনি। তার আবেদন সে যথার্থভাবেই রেখে দিয়েছে রাজকুমারীদের কাছে। সকরুণ বেদনার অনুভূতিতে তাদের সাশ্রুনয়নে কুঞ্জবনের নিভৃত আহ্বান রাজপুত্রের কণ্ঠে বেজে উঠেছে। আসলে সমস্ত পিণ্ডবৎ, পাষাণবৎ তাসজনতার মধ্যে সুন্দরীকুলের প্রাণপ্রতিষ্ঠা সত্যিই সহজ হয়েছে, সফল হয়েছে। কেননা তারা তো বিশ্বপ্রকৃতির সত্তার সঙ্গে অভিন্ন। নিয়মবাধ্যতার বিরুদ্ধে টেক্কা কুমারীরা একথা বলতে ভয় পায়নি যে 'আমরা চালাব অবাধ্যতামূলক বে-আইন!' তাই দেখা যায় হরতনীর নিত্য নিয়মের ভুল হয়ে যাওয়া। চতুর্থ দৃশ্যের শুরুতে শোনা যায় হরতনীর কণ্ঠে গান — 'আমি ফুল তুলিতে এলেম বনে......' পূর্ব পরিচয়ের রেখা পেরিয়ে সে অতলান্ত মনের মধ্যে অসীমের কল্লোল শুনতে পায়। তার চরণছন্দে লাগে অনিয়মের নাচের আনন্দজোয়ার। মেয়েরা সকলেই বনপথে, ঝরণাতলার নির্জনে একলা মনের দোসরের সংকেত পায়। তারা চুল বাঁধতে চায় সুন্দর করে। তাদের পদতল রাঙাবার জন্য আর জলভরবার ঘট চিত্রিত করবার জন্য অনুভবী সঙ্গীও পায়। হরতনীর উদ্দেশ্যে রুইতন গেয়ে ওঠে —

তোমার পায়ের তলায় যেন গো রঙ লাগে,
আমার মনে বনের ফুলের রাঙা রাগে।
যেন আমার গানের তানে

তোমার ভূষণ পরাই কানে,
যেন রক্তমণির হার গেঁথে দিই প্রাণের অনুরাগে।

প্রাণের অনুরাগ মনুষ্যমহিমায় শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। তাসনারীর দীক্ষাই তাসপুরুষের বক্ষে অনুরাগের অনাসাবাদিত স্পন্দন জাগিয়েছে। চিঁড়েতনী, ইস্কাবনী, টেক্কানীকে নিয়ে নাটকের তৃতীয় দৃশ্যটি জমে উঠেছে। সকলেরই মনে 'ইচ্ছে' জেগে উঠেছে। সকলেরই হাবে ভাবে গোপন রাখা যাচ্ছে না তাসিনীর সাজ খসিয়ে দিয়ে মানবী হবার বাসনা। "নবপ্রস্ফুটিত রমণীহৃদয় হইতে এ কী অভূতপূর্ব শোভা, এ কী হৃদয়ের হিল্লোল, তাহার সমস্ত অস্তিত্ব হইতে এ কী একটি আরতি-উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। ...

এই পুরাতন দ্বীপে বসন্তের কোকিল অনেকবার ডাকিয়াছে, কিন্তু সেইবার যেমন ডাকিল এমন আর- কখনো ডাকে নাই। সমুদ্র চিরদিন একতান কলধ্বনিতে গান করিয়া আসিতেছে, কিন্তু এতদিন সে সনাতন বিধানের অলঙ্ঘ্য মহিমা একসুরে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে — আজ সহসা দক্ষিণ বায়ু চঞ্চল বিশ্বব্যাপী দুরন্ত যৌবনতরঙ্গ রাশির মতো আলোতে ছায়াতে ভঙ্গিতে ভাষাতে আপনার অগাধ আকুলতা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।" — 'একটা আষাঢ়ে গল্প' থেকে উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে বিশ্বপ্রকৃতি ও প্রকৃতিরূপিণী নারীর একাত্ম উদ্বোধন অত্যন্ত শিল্প সম্মতভাবে করা হয়েছে। বর্তমান নাট্যে বিষয়টি তাসনারীদের সংলাপ এবং গানের মধ্যে অভিব্যক্তি। বিশেষত হরতনীর কণ্ঠে 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুণ্‌গুণিয়ে' গানটি, বিবিসুন্দরীদের নৃত্যসহযোগে গাওয়া

অজানা সুর কে দিয়ে যায় কানে কানে,
ভাবনা আমার যায় ভেসে যায় গানে গানে। ......
কোন্ বসন্তের মিলন রাতে তারার পানে
ভাবনা আমার যায় ভেসে যায় গানে গানে।

— প্রকৃতির সঙ্গে নারীমনের গভীর যোগ আভাসিত করে। তারই ছোঁয়া পেয়ে মনের বেড়ি ঘুচিয়ে দেয় পুরুষেরা। চাঞ্চল্যের টানে, যৌবনের বন্যায় ভেসে যাবার আনন্দসন্ধান তারা তো তাসনারীদের কাছ থেকেই পেয়েছে। নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলে মিলে যখন রাজার নিয়ম প্রত্যাখ্যান করে, তাসের দেশের বেড়াজাল থেকে নির্বাসনদণ্ড যেচে গ্রহণ করতে চায়, তখন রাজাও সেই বেড়িভাঙা পথের যাত্রী হবার জন্যে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করেন — 'ওগো বিদেশী, আমিও কি পারব?' রাজপুত্র রহস্য করে বলে — 'সন্দেহ করি। কিন্তু রানী আছেন তোমার সহায়। জয় রাণীর।' অর্থাৎ নব জাগৃতির আসল কাণ্ডারী নারী। নারীর এক রূপ রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন 'রক্তকরবী'র নন্দিনীর মধ্যে। হ্লাদিনী শক্তির অনুরূপ প্রকাশ না হলেও তাসের দেশের তাসনারীরাও যে মুক্তিপথের দিশারী হয়ে এই নাটকে দেখা দিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। নিজেদের মুখাশ সরিয়ে দিয়ে মানবীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে তারা। সেই দর্পণে প্রতিবিম্বিত করে তারাই তাস পুরুষদের স্বরূপে আত্মস্থ হবার সূত্র ধরিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতি ও প্রকৃতিরূপিণী নারীর ভূমিকা সীমাবেষ্টিত তাসের দেশকে দিয়েছে অপরিসীমের বিস্তার।

৩.৪.১৬.২ - রাজপুত্রের ভূমিকা

'তাসের দেশ' নামে কাল্পনিক একটি দ্বীপ 'তাসের দেশ' নামে নায্য রচনার স্থানিক প্রেক্ষাপট। কিন্তু নাটকের মূল কেন্দ্র যার তৎপরতায় ,কটি তত্ত্ব তথা বক্তব্য হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে, সে ভিন্‌দেশি রাজপুত্র। 'একটা আষাঢ়ে গল্প' যখন লেখা হয়েছিল, তখন রাজপুত্র ছিল দুয়োরাণীর পুত্র। নির্বাসিত মা'র সঙ্গে সে একলা সমুদ্রতীরে আপনমনে বাল্যকাল যাপন করে। তার অভিলাষ ও কল্পনার জাল দিগ্‌দিগন্তরে প্রধাবিত হয়। "তাহার অশান্ত চিত্ত সমুদ্রের তীরে আকাশের সীমায় ওই দিগন্তরোধী নীল গিরিমালার পরপারে সর্বদা সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে — খুঁজিতে চায় কোথায় পক্ষীরাজ ঘোড়া, সাপের মাথার মাণিক, পারিজাত পুষ্প, সোনার কাঠি, রূপার কাঠি পাওয়া যায়, কোথায় সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে দুর্গম দৈত্যভবনে স্বপ্নসম্ভবা অলোকসুন্দরী রাজকুমারী ঘুমাইয়া রহিয়াছেন।"

উদ্ধৃত অংশটিতে সম্পূর্ণভাবেই রূপকথার আবহ ও আয়োজন। রাজপুত্রের মধ্যে অজানাকে জয় করবার প্রেরণা এক থাকলেও নাটকে তার আবহ একটু বদলে গেছে। এখানে দুয়োরাণীর পুত্র নয় সে। প্রচুর বিলাস বৈভব, বন্দনাগান ও নিরাপত্তার মাঝখানে হাঁপিয়ে উঠে বৈচিত্র্যপিপাসু রাজপুত্র পাড়ি দিয়েছে 'সুবুদ্ধি ঘেরা জগতের' পরিকাঠামোর বাইরে। অভাবের অভাব থেকে সে গেয়ে উঠেছে —

আমার মন বলে, 'চাই চাই গো
যারে নাহি পাই গো।'
সকল পাওয়ার মাঝে
আমার মনে বেদন বাজে,
'নাই, নাই, নাই গো।'

তাসের দেশ নাটকের রাজপুত্র তার বন্ধু সদাগরপুত্রকে নিয়ে ভিখারী মনকে রাজার সম্পদে পূর্ণ করে ফিরে আসবে বলে সমুদ্রযাত্রায় বেরোয়। নৌকোডুবি হয়ে তারা অচেনা এক দেশের সমুদ্রতীরে ভেসে ওঠে। সেটাই 'তাসের দেশ'। কেননা সেখানকার মানুষজনের নিজস্ব কোনো ভাব নেই — তাই ভাবের পরিবর্তনও নেই। চিরকাল তাদের একটাই ভাব যেন তাসের গায়ের ছাপের মতো তাদের ওপরে সেঁটে রয়েছে। অসামান্য শৃঙ্খলাপরায়ণ এই প্রাণীগুলির মধ্যে কোনো আশা, অভিলাষ, হাসি, কান্না, সন্দেহ, নতুন পথে চলবার কোন চেষ্টা নেই। নেই চিন্তা বা বিবেচনা করবার ক্ষেত্র। তারা শুধু পূর্ববর্তীর অনুগমন করে যায় — দাগা বুলোবার মতো করে।

এদের দেখেশুনে রাজপুত্র বুঝতে পারে নিয়মিত জীবনচর্যার নিশ্চিত নিরাপত্তাই এদের জীবনকে নির্জীব নিষ্প্রাণ করে রেখে দিয়েছে 'ব্যাঙের আরাম এঁদো কুয়োর মধ্যে'। যে একঘেয়ে নিশ্চিন্ততা রাজপুত্রকে সমুদ্রযাত্রায় উদ্বেলিত করেছিল, তাসের দেশবাসীর জীবনাচরণে তারই আরও দৃষ্টান্ত রাজপুত্রকে অন্য এক লক্ষ্যে নিয়ে গেছে। বন্ধুকে তাই সে বুঝিয়েছে — "জিনিসটা সত্যি নয়, এটা বানানো, এটা উপর থেকে চাপানো, এদের দেশের পণ্ডিতদের হাতে গড়া খোলস। আমরা এসেছি কী করতে — খসিয়ে দেব। ভিতর থেকে প্রাণের কাঁচা রূপ যখন বেরিয়ে পড়বে, আশ্চর্য করে দেবে"।

রাজপুত্রের ব্রত হল তাসের খোলস ঘোচানো। সাধারণভাবে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সে ছক্কা-পঞ্জা-দহলা পণ্ডিত কাউকেই তাসের বেশ ভূষা কিম্বা অস্তিত্বের অসারতার কথা গোচর করাতে পারল না। তখন রাজপুত্র সে দেশের রাজার অনুমতি নিয়ে রাজকুমারীদের কাছে হৃদয়বোধ জাগরণের মন্ত্র উচ্চারণ করেছে। কষ্টিপাথরে যেমন সোনার দাগ ধরে, তেমনি অনুভববেদ্য নারীর চিত্তলোকে রাজপুত্রের হৃদয়সংবাহী আবেদন অনুভূতির তরঙ্গ তুলেছে। সব আইন-কানুন, হিসেব নিকেশ জলাঞ্জলি দিয়ে তাসসুন্দরীরা স্বভাবসৌন্দর্যের জগতে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। শুধ তাই নয়। তাদের দেখে এতদিনের ঠলি-পরা চোখ দিয়ে দেখা থেকে বেরিয়ে গিয়ে মুক্তির প্রশস্ত দিগন্তে তাকিয়েছে পুরুষকুলও। হরতনীর উদ্দেশ্যে রুইতনের গান তাসজন্মস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার গান —

তোমার পায়ের তলায় যেন গো রঙ লাগে,
আমার মনের বনের ফুলের রাঙা রাগে।
যেন আমার গানের তানে
তোমায় ভূষণ পরাই কানে,
যেন রক্তমণির হার গেঁধে দিই তোমার অনুরাগে।

এমন রাগ-অনুরাগে যেমন অভিসিঞ্চিত হয়েছে নারীপুরুষের অন্তর, তেমনই মিথ্যে জীবন টেনে চলা থেকে অব্যাহতি পাবার তাগিদে তারা বলে উঠেছে — "ভাঙতে হবে এখানে এই অলসের বেড়া, এই নির্জীবের গন্ডি, ঠেলে ফেলতে হবে এই-সব নিরর্থকের আবর্জনা।" যৌবনের প্রতীক রাজপুত্র তাসেদের মুক্তিমন্ত্রদাতা। তারই স্পর্শমণির ছোঁয়া পেয়ে তাসবংশ প্রাণের জোয়ারে মুছে দিতে প্রস্তুত হয়েছে জীর্ণ পুরাতনকে।

এরই সূত্রে তাসজাগরণের বাণীবহ ইচ্ছেমন্ত্রের জয়ধ্বনি শোনা গেছে। রাজার নিয়মতন্ত্রকে স্পর্ধার সঙ্গে যে-মুহূর্তে রাজপুত্র নস্যাৎ করেছে তখনই দলের সর্বস্তর থেকে নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলের কণ্ঠ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত আত্মঘোষণা নিস্যন্দিত হয়েছে। ইচ্ছের জয় ঘোষণা তো আসলে আত্মশক্তি উদ্বোধনেরই ঘোষণা। সর্বপ্রকার বেড়াজাল ভেঙে বেরিয়ে আসাতে সামিল হয়েছে তাসের দেশের আপামর জনতা — রাজা-রাণী সকলেই।

যৌবনের দূত হয়ে রাজপুত্র এসেছিল তাসের দেশে। সেখানকার শান্তভাব ও শান্তির আবরণ ঘুণ ধরা পোকা-খাওয়া গাছের মত। চঞ্চলতার দোলা লাগিয়ে সেই ভেতরে ভেতরে পোকা লাগা নির্জীব গাছটার মতো তাসের দেশের আপাত শান্তিরক্ষক নিয়মের ভূতকে সমূলে উপড়ে দিল রাজপুত্র।

রাজপুত্রের গানগুলি, সংলাপগুলি প্রাণোচ্ছ্বাসে ভরিয়ে নৃত্যচ্ছন্দে প্রকাশ করলে তার সার্থকতা বহুগুণিত হয়। মঞ্চে উপস্থাপনার যোগ্য করে রচনাটি সৃষ্টি হয়েছিল। পাঠক হিসেবে রসগ্রহণে তাই কিছুটা সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিতে হয়। আর

একটি কথাও উল্লেখ্য। 'একটা আষাঢ়ে গল্পে'র রাজপুত্র স্বয়ং হরতনের বিবির বরমাল্য লাভ করেছে। 'তাসের দেশ' — এ কিন্তু রাজপুত্রকে নাট্যকার এরকম কোনো সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট করেননি। প্রাণের বন্যায় তাসের দেশকে প্লাবিত করেই তার ভূমিকা সার্থক হয়েছে। 'তাসের দেশ'-এর রাজপুত্র তাই চিরচঞ্চল, চিরযৌবনের প্রতীক, নিত্যসম্পর্কবন্ধনের অতীত।

৩.৪.১৬.৩ - উৎসর্গপত্র

'তাসের দেশ' নাটিকাটি উৎসর্গিত হয়েছে ভারতের গৌরব ত্যাগব্রতী দেশপ্রেমিক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্দেশ্যে। (প্রেক্ষাপট অংশে 'উৎসর্গ' অংশটি উদ্ধৃত হয়েছে।) দেশের মানুষকে তাদের প্রাপ্য থেকে মিথ্যার ঘেরাটোপ পরিয়ে দূরে সরিয়ে রাখা, দেশের সম্পদ এবং প্রাণপ্রেরণার সুফল গ্রহণ করার স্বার্থপূর্ণ হীনতা পৃথিবীর নানা দেশের মত ভারতবর্ষেও ঘটে চলেছিল। ভারতবর্ষের বুকে দীর্ঘকাল ধরে কুসংস্কারের অনুবর্তন এবং স্বার্থপুষ্ট শ্রেণিশত্রুদের সুপরিকল্পিত শোষণ চলেছিল। তার ফলে দেশবাসীর নিরুচ্চার দুর্ভোগ রবীন্দ্রনাথ আপন মর্মে অনুভব করেছিলেন। সমসাময়িকভাবে সুভাষচন্দ্রের হৃদয়বত্তা এবং কর্মসাধনা দিয়ে এই দুরপনেয় অন্যায় ও বাধা দূর হওয়া সম্ভব, এমন বিশ্বাস হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। 'মানুষকে রাষ্ট্রক্রীড়ার ঘুঁটিরূপে জনপিণ্ডে পরিণত করার চেষ্টা'র প্রতিস্পর্ধী যে সাহসী সুভাষচন্দ্রের কর্ম-প্রেরণার মধ্যে রূপ পেয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তাকেই স্বীকৃতি ও অভিনন্দন জানিয়েছেন তাঁকে নাটিকাটি উৎসর্গ করে। রাজপুত্রের ভাবাবেগ, মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষাদানের দৃপ্ত শক্তি যেমন, তেমনই কর্মোদ্যোগে সাফল্যের জয়ধ্বনি আমানের শাশ্বতকালের নেতার উদ্দেশ্যেও জ্ঞাপিত হয়েছে।

৩.৪.১৬.৪ - আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'তাসের দেশ' রচনাটিকে সাহিত্যের কোন্ শাখার পর্যাভুক্ত করা যায়? তোমার অভিমতের সপক্ষে যুক্ত দেখাও।
২। তত্ত্বনাট্য হিসেবে 'তাসের দেশ'-এর স্থান নির্দেশ করো।
৩। রবীন্দ্র গীতিনৃত্যনাট্য হিসেবে 'তাসের দেশ'-এর স্থান নির্দেশ করো।
৪। 'তাসের দেশ' নাটকে ইচ্ছামন্ত্র-বিষয়টির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।
৫। 'ভাঙতে হবে অলসতার বেড়া, নির্জীবের গণ্ডী, নিরর্থকের আবর্জনা' — এই উক্তি কার? উক্তিটির অন্তর্নিহিত অর্থ বিশ্লেষণ করো।
৬। 'তাসের দেশ'-এর মুক্তিতে তাসনারীরা কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা ব্যাখ্যা করো।
৭। প্রকৃতি ও নারী — এই দুয়ের সঙ্গে রাজপুত্র কীভাবে তাসের দেশ প্রাণের জোয়ার এনেছিল তা বর্ণনা করো।
৮। যৌবনের চঞ্চলতা ও প্রাণশক্তির প্রতীক 'তাসের দেশ'-এর রাজপুত্র। — মন্তব্যটি বিশদ করো।
৯। 'তাসের দেশ' নাটিকার ব্যবহৃত গানের গুরুত্ব কোথায় তা পর্যালোচনা করো।
১০। 'তাসের দেশ' নাটকটি রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করেছিলেন। — এস নিবেদনের যাথার্থ্য কোথায় তা আলোচনা করো।

৩.৪.১৬.৫ - সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। একটা আষাঢ়ে গল্প, গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১ম খণ্ড)।
২। জাভাযাত্রীর পত্র; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩। রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ; প্রমথনাথ বিশী।
৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড); সুকুমার সেন।
৫। রবীন্দ্রনাট্য-পরিক্রমা; অশোক সেন।
৬। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস; আশুতোষ ভট্টাচার্য।
৭। বাংলা নাটকের ইতিহাস; অজিত কুমার ঘোষ।
৮। আনন্দ সর্বকাজে অমিতা সেন।
৯। রবীন্দ্রমনন রবীন্দ্রগীতিনৃত্যনাট্য; জয়শ্রী নন্দী (বিশ্বাস)।

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম. এ. তৃতীয় সেমেস্টার

চতুর্থ পত্র

বিশেষ পত্র ঃ বাংলা নাট্যসাহিত্য

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

(ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং)

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া - ৭৪১ ২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

পাঠ-প্রণেতা

অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. তাপস বসু — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. তরুণ মুখোপাধ্যায় — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. স্মরণ আচার্য — প্রাক্তন অধ্যক্ষ, রানাঘাট মহাবিদ্যালয়

ডিসেম্বর, ২০১৯

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও

নিউ স্কুল বুক প্রেস, ২ ডিক্সন লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১৪

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়-এর অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ-সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইনানুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের লেখক/পাঠ-প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of distance and reaching the unreached students are the threefold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellor has invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directoate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Sankar Kumar Ghosh, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of PGBOS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks is also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would especially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and co-ordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Director

Directorate of Open and Distance Learning

University of Kalyani

পাঠক্রম

বাংলা

প্রতি পত্রের পূর্ণমান—১০০

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম. এ. তৃতীয় সেমেস্টার

চতুর্থ পত্র

বিশেষ পত্র ঃ বাংলা নাট্যসাহিত্য

বিশ শতকের নাটক

পর্যায় গ্রন্থ ঃ ১ রথের রশি – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সময় ঃ ৪ ঘন্টা)

একক–১ ঃ রথের রশি ঃ প্রাসঙ্গিক তথ্য

একক–২ ঃ রূপকের তাৎপর্য ও নামকরণ

একক–৩ ঃ নাট্যপ্রকরণ ও গঠন

একক–৪ ঃ চরিত্র চিত্রমালা

পর্যায় গ্রন্থ ঃ ২ দেবীগর্জন – বিজন ভট্টাচার্য (সময় ঃ ৪ ঘন্টা)

একক–৫ ঃ গণনাট্যের শর্ত ও দেবীগর্জন

একক–৬ ঃ দেবীগর্জন ঃ প্লট বিন্যাস

একক–৭ ঃ নামকরণের তাৎপর্য

একক–৮ ঃ লোকায়ত জীবনের গুরুত্ব

পর্যায় গ্রন্থ ঃ ৩ সিরাজদ্দৌল্লা – শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (সময় ঃ ৪ ঘন্টা)

একক–৯ ঃ সিরাজদ্দৌলা নাটকের পটভূমি ও ঐতিহাসিকতা বিচার

একক–১০ ঃ ট্রাজেডি প্রসঙ্গ

একক–১১ ঃ নাটকে গানের তাৎপর্য

একক–১২ ঃ চরিত্র পর্যালোচনা

পর্যায় গ্রন্থ ঃ ৪ একাঙ্ক নাটক – অজিতকুমার ঘোষ ও সাধনকুমার ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) (সময় ঃ ৪ ঘন্টা)

একক–১১ ঃ একাংক নাটকের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

একক–১২ ঃ তুলসী লাহিড়ী—দেবী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা

একক–১৩ ঃ মন্মথ রায়—রাজপুরী, বনফুল-শিককাবাব

একক–১৪ ঃ কিরণ মৈত্র—কোথায় গেল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—এক সন্ধ্যায়

সূচিপত্র

তৃতীয় সেমেস্টার

চতুর্থ পত্র

বিশেষ পত্র ঃ বাংলা নাট্যসাহিত্য

বিশ শতকের নাটক

তৃতীয় পত্র	একক	পাঠ প্রণেতা	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ-১	১	অধ্যাপক ড. তরুণ মুখোপাধ্যায়	রথের রশি ঃ প্রাসঙ্গিক তথ্য	১
	২	অধ্যাপক ড. তরুণ মুখোপাধ্যায়	রূপকের তাৎপর্য ও নামকরণ	৫
	৩	অধ্যাপক ড. তরুণ মুখোপাধ্যায়	নাট্যপ্রকরণ ও গঠন	৯
	৪	অধ্যাপক ড. তরুণ মুখোপাধ্যায়	চরিত্র চিত্রমালা	১৩
পর্যায় গ্রন্থ-২	৫	অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	গণনাট্যের শর্ত ও দেবীগর্জন	১৮
	৬	অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	দেবীগর্জন ঃ প্লট বিন্যাস	২৫
	৭	অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	নামকরণের তাৎপর্য	৩১
	৮	অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	লোকায়ত জীবনের গুরুত্ব	৩৪
পর্যায় গ্রন্থ-৩	৯	ড. স্মরণ আচার্য	সিরাজদ্দৌলা নাটকের পটভূমি ও ঐতিহাসিকতা বিচার	৪০
	১০	ড. স্মরণ আচার্য	ট্র্যাজেডি প্রসঙ্গ	৪৭
	১১	ড. স্মরণ আচার্য	নাটকে গানের তাৎপর্য	৫২
	১২	ড. স্মরণ আচার্য	চরিত্র পর্যালোচনা	৬০
পর্যায় গ্রন্থ-৪	১৩	অধ্যাপক ড. তাপস বসু	একাংক নাটকের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য	৭৪
	১৪	অধ্যাপক ড. তাপস বসু	তুলসী লাহিড়ী–দেবী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা	৮১
	১৫	অধ্যাপক ড. তাপস বসু	মন্মথ রায়–রাজপুরী, বনফুল-শিককাবাব	৮৬
	১৬	অধ্যাপক ড. তাপস বসু	কিরণ মৈত্র–কোথায় গেল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়–এক সন্ধ্যায়	৯১

পর্যায়গ্রন্থ - ১

একক - ১

রথের রশি ঃ প্রাসঙ্গিক তথ্য

বিন্যাসক্রম :

৪.১.১.১ : রথের রশি : প্রাসঙ্গিক তথ্য

৪.১.১.২ : সময় বা কালের মাত্রা

৪.১.১.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪.১.১.১ : রথের রশি : প্রাসঙ্গিক তথ্য

"কালের যাত্রা"র জন্মকথা যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর 'রথযাত্রা' নামক একটি রচনা কবির মনে বর্তমান নাটকটি লেখার প্রেরণা জুগিয়েছিল। একথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করে গেছেন। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত 'রবীন্দ্র জীবনী' গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, বিশ্বভারতীর সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনের দিনে শ্রীবিশী তাঁর স্বরচিত 'রথযাত্রা' নাটকটি পাঠ করেছিলেন। এবং তারপরেই কবির মনে 'কালের যাত্রা' লেখার পরিকল্পনা আসে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রমানসের তৎকালীন ছবিটি শ্রী মুখোপাধ্যায় এভাবে তুলে ধরেছেন —

শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় পূজাবকাশের জন্য বন্ধ হইল ২৫ আশ্বিন, ১৩৩০ (১২ অক্টোবর, ১৯২৩)। কবি আশ্রমেই থাকিলেন। বিজয়া দশমীর দিন তিনি তাঁহার 'যক্ষপুরী' নাটক পড়িয়া শুনাইলেন; কিন্তু এখনো মনের মতো হইতেছে না; তাই প্রকাশের তাড়া নেই।

ছুটির মধ্যে হাতে তেমন কাজের চাপও নেই, তাগিদও নেই; একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা লিখিলেন। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন যে, 'আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান প্রমথনাথ বিশীর কোনো রচনা হইতে এই নাট্যদৃশ্যের ভাবটি আমার মনে আসিয়াছিল।' (রবীন্দ্র জীবনী ঃ ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১৮)।

'রথযাত্রা' নাটকটি রচনার এই তথ্যসূত্রের পাশাপাশি আমরা স্মরণ করতে পারি স্বয়ং শ্রী প্রমথ নাথ বিশীর স্মৃতিচারণা। তাঁর সাম্প্রতিককালের লেখা 'পুরানো সেই দিনের কথা' গ্রন্থে তিনি 'রথযাত্রা' নাটিকা রচনার উৎস সুন্দরভাবে নির্দেশ করেছেন। প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্ধৃত করা হল —

> ...... একদিন আমরা বিশ্বভারতীর কয়েকজন ছাত্র বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে উপস্থিত হলাম সুপুর গ্রামটিতে। সেদিন ছিল রথযাত্রার টান। গিয়ে দেখি, উঁচু একটা খড়ের ঘরের মধ্যে ভারি একটা রথ দণ্ডায়মান। আর সবাই মিলে তার দড়ি ধরে টানছে। রথ নড়ে না। শেষে আমরাও হাত লাগালাম। তবু রথ অনড়। এ কি, রথ চলে না কেন ? এতে তো গাঁয়ের অমঙ্গল সূচিত হচ্ছে। এমন সময় সকলে দেখল ধানের কলের কাজ শেষ করে সাঁওতাল নরনারী আসছে। তখন আমার মনে হঠাৎ চমক খেলে গেল, যে, এদের দিয়ে রথের দড়ি টানালে কেমন হয় ?
>
> আমরা নিজেদের মধ্যে কানাকানি করলাম। সন্দেহ হল, গাঁয়ের লোকের পছন্দ হবে

কিনা ! সাঁওতালদের কাছে প্রস্তাবটা করবামাত্র তারা তখনি রাজী হল, আর হাসতে হাসতে রথের দড়ি ধরে টান শু(করল। রথ ঘড়ঘড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পথ ধরে ছুটল। ......কয়েকদিন পর একটা নাটক লিখলাম, যার নাম দিলাম রথযাত্রা। সেটি বি(েভারতীর বয়স্ক ছাত্রদের সভায় পড়লাম।

(পুরানো সেই দিনের কথা ঃ পৃঃ ১৭৮-১৭৯)

শ্রীবিশীর এই নাটকটিই পরে রবীন্দ্রনাথ পরিমার্জনা করেন এবং প্রবাসীতে দেন। ১৯২৩-এর অক্টোবর-এ 'রথযাত্রা' লিখিত হলেও, পরবর্তীকালে কবি তাকে পুনরায় সংশোধন ও পরিবর্তন করেন (নাম দেন 'রথের রশি'। বর্তমানে এই নাটকটি 'কালের যাত্রা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত(। একই নাট্যবস্তুর দুই রূপ ও রূপান্তর যে-সময়ব্যাপী হয়, সেই সময় কবির অন্যান্য রচনা ও দেশকালের পরিস্থিতির সং(িপ্ত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। এতে স্পষ্ট হবে কবির মানসিকতাও।

'বলাকা' কাব্য রচনাকালেই 'কবির সঙ্গে একজন কর্মী এসে যোগ দিল' বলে মন্তব্য করেছেন আবু সয়ীদ আইয়ুব। তিনি আরো লিখেছেন, "এই কর্মী পু(ষকে আমরা আগের কোনো কোনো কাব্যেও দেখেছি, বিশেষত নৈবেদ্য-এ। কিন্তু এতখানি সমাজ সচেতন, অমঙ্গলপীড়িত দেশবিদেশের দুঃখ ও পাপ বিষয়ে কর্তব্য ভারগ্রস্ত কর্মীপু(ষের অস্তিত্ব ইতিপূর্বে অনুদ্ঘাটিত ছিল।" (আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ। পৃঃ ১০১-১০২) এক উদার মানবতাবোধ তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। ভাঙতে চেয়েছিলেন যুগ-যুগ সঞ্চিত প্রথার ধর্মমোহের কারাগার। শেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথ যেমন 'eternal man'কে খুঁজেছেন, তেমনি মানুষে মানুষে চেয়েছেন ঐক্য। প্রথম মহাযুদ্ধের বীভৎস রূপ তাঁকে পীড়িত করেছিল। তেমনি, এ দেশের রাজনীতিতে যে দলীয় স্বার্থবুদ্ধি, হানাহানি সাম্প্রদায়িকতা শু(হয়েছিল তা ও তাকে করেছিল বেদনাবিদ্ধ। দুঃখের সঙ্গে ল(করেছিলেন, যারা প্রধান পাপী সেই উচ্চবর্ণের উঁচুতলায় দালানকোঠায় বসবাস করে, আর মার খায় অস্পৃশ্যের দল। যাদের স্থান নীচুতলায়। প্রথম বি(েযুদ্ধ এবং গান্ধীজির নীতি — দুইই সমস্যাকে জটিল করেছে(ঈ(েরের দোহাই পেড়ে এই অসাম্যকে বিধান বলে তিনি মেনে নিতে পারেননি।

এদিকে নোবেল প্রাইজ পাবার জন্যই বিদেশে নানাস্থানে কবি আমন্ত্রণ পাচ্ছেন বারে বারে। এই যাওয়া তাঁকে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করল। তিনি দেখলেন, ধনীর দম্ভ, যন্ত্রের পীড়ন ও আস্ফালন, আর মনুষ্যত্বের পেষণ। আলোচনা করলেন নানা মনীষীর সঙ্গে। মানবতাবোধ বি(েমৈত্রীতে উন্নীত হল। রাশিয়া ভ্রমণ তাঁর কাছে 'এজন্মের তীর্থদর্শন' রূপে প্রতিভাত হল, এখানে এসে উপলব্ধি করলেন, সমস্ত মানুষ কিভাবে সমানভাবে জেগে উঠেছে। আমাদের দেশে যে সংকীর্ণ ধর্মবুদ্ধি বিভেদ সৃষ্টি করে তার সম্পর্কে তিনি নতুন করে ভাবতে শু(করলেন 'কালান্তর' গ্রন্থের অনেক প্রবন্ধেই কবির এইসব চিন্তা ও চেতনার চিহ(খুঁজে পাওয়া যায়।

কালান্তর-এর প্রকাশ গ্রন্থরূপে পরে হলেও প্রবন্ধগুলির লেখা শু(হয়েছে অনেক আগেই। সুতরাং 'কালের যাত্রা' রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির আকস্মিক ফলমাত্র নয়। বরং একটি ত্র(মবিবর্তন রয়েছে। ডঃ (ুদিরাম দাস এই বিবর্তন ল(করেই বলেন যে, প্রৌঢ়ত্বে রবীন্দ্রনাথ উত্তরোত্তর নবসমাজ দর্শনের আকাঙ(া পোষণ করেছেন তাঁর ফাল্গুনী থেকে কালের যাত্রা নাটকে।' (সমাজ ঃ প্রগতি ঃ রবীন্দ্রনাথ/ পৃ. ১৫৩)। একেবারে, শেষপর্বে রূপকথার মতন লেখা "গল্পস্বল্প" গ্রন্থেও দেখি এই মানবতা ও মনুষ্যত্বের বন্দনা। সেখানে 'বড় খবর' গল্পে নৌকার রূপকে প্রকাশিত হয়েছে দাঁড়ের দল তথা। নিচুতলার মানুষের অভিযোগ। মাঝিদের শাসিয়ে বলে, 'আমরা যদি ছোটলোক হই তবে জোটবেঁধে কাজে ইস্তফা দেব। দেখি তুমি নৌকা চালাও

কি করে।" এই ছোটলোকদের জোটবাঁধার এবং জনশক্তি(র প্রতাপের কথাই বিশেষভাবে পাই 'রথের রশি' নাটকে। এতদিন যারা রথের চাকায় পিষ্ট হওয়াই ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছিল, সকলের অনাদর আর অপমানই পাথেয় ভেবেছিল, তারাই এই নাটকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। প্রমাদ গুণেছে উঁচুতলার মানুষজন। জয় হয়েছে তাদের। 'লোকহিত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে আ(েপ ছিল, 'আমাদের দেশে লোকসাধারণ এখনো নিজেকে জানান দিতে পারে না' — তা' এই নাটকে খণ্ডিত হয়েছে। 'লোকসাধারণ' এখানে 'নিজেকে জানান' দিতে পেরেছে। 'মানুষের মনুষ্যত্ব র(ার জন্য সমাজ' — এই সত্যই তিনি প্রকাশ করেছেন 'কালের যাত্রা' নাটকে। 'চণ্ডালিকা' নাটকেও এই মনুষ্যত্বই আনন্দের উক্তি(তে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

এই প্রসঙ্গে আমরা মনে করতে পারি স্বামী বিবেকানন্দের কথাও। যেহেতু একই সময়ে এই দুই মহাপু(ষের কর্মকাণ্ড দেশে-বিদেশে প্রসারিত, প্রচারিত ছিল। সংগত কারণেই সাদৃশ্য ও প্রভাব থেকে গেছে। 'কালের যাত্রা'র পটভূমি বা প্রে(াপটে একে উপে(া করা হয়ত অনুচিত হবে।

তাঁর বিভিন্ন বক্তৃ(তায়, চিঠিতে, প্রবন্ধে ও গ্রন্থে বিবেকানন্দ বারংবার এই সমাজের পদদলিত শ্রমজীবীদের (ধিরস্রাবকে পূর্ণ মূল্য দেবার আহ্বান জানিয়েছেন। জাতিভেদ যে মনুষ্যত্ব ও মানবতার বড় অপমান জেনেই বলেছিলেন —

'break down every barrier in the way of caste, and we should rise'

শ্রমবিভাজন মানেই শ্রেণীবিভাজন নয়, সমস্ত মানুষই এক — এই উপলব্ধি থেকে বিচ্যুত হলেই আমাদের ধ্বংস অনিবার্য(অগ্রগতি (দ্ধ। তাই ভারতের দরিদ্র, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, হীনবর্ণ সমস্ত মানুষকে অসীম ভালোবাসায় ডাক দিয়ে বলেছিলেন —

> Come all ye, the poor the poor and the disinherited, come ye, who are trampled under foot ; we are one. তাঁর বাণীই ছিল, ওঠো, জাগো, মানুষ হও —
> Come, be men ?

৪.১.১.২ : সময় বা কালের মাত্রা

রথযাত্রার একটি দিনই 'রথের রশি'র ঘটনা ও নাট্যবস্তু। উৎসব অথবা তার প্রস্তুতি শু(হয়েছে ভোর থেকেই। মেয়ের দল ও নাগরিকদের সংলাপে দিনের শু(ধরা পড়েছে এইভাবে —

১. উঠেছে কোন্ ভোরে, তখন কাক
ডাকেনি
কঙ্কালিতলার দিঘিতে দুটো ডুব
দিয়েই
ছুটে এলুম রথ দেখতে, বেলা হয়ে
গেল —

২. তবু আজ ভোর বেলা উঠে দেখি
ঠাকুর লেগেছেন টান দিতে —

এই একই ভোরের উজ্জ্বলতা কাব্যিক উচ্চারণে ও উপমায় আভাসিত। রথের দড়ি প্রসঙ্গে যখন মেয়েরা বলে 'যেন যমুনা নদীর ধারা।' আমরা যমুনার নীল লাবণ্যকে ভোরের আলোয় ঝিকমিক করে উঠতে দেখি।

কিন্তু এই স্নিগ্ধতা, উৎসবের আবেশ বেশি(ণ স্থায়ী হয় না। 'বেলা হয়ে গেল' উক্তি(র পরেই জানতে পারি, রথ চলেনি। 'সব যেন থমথমে হয়ে আছে', এক অশুভ বোধে উচ্চকিত সকলেই। যে রথের দড়ি সকালবেলায় রৌদ্রে ছিল মনোহর, দুপুরের প্রখরতায় তাকে দেখে শেঠজির মনে হয়েছে 'যেন বাসুকি মরে উঠল ফুলে'। দুপুরের এই আলোর তীব্রতা আরো ঠিকরে পড়ে ধনপতিদের হীরের আংটি থেকে, যেন 'আলোর উচ্চিংড়েগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে চোখে।' একইসঙ্গে ধনের বিকার এবং মধ্যাহ্নে(র খরতা এই উপমায় প্রতিভাত হয়েছে। এই মধ্যাহ্নে(ধনিকদের আগমনও কি ইঙ্গিতবহ নয় ? যে বৈশ্যশক্তি(ঐশ্বর্যে—প্রতিপত্তিতে দীপ্তিমান (রাজাও যেখানে 'অর্ধ-বেনেরাজেশ্বর' তাদের সেই গৌরবের মধ্যাহ্ন(কি সূচিত করে না অপরা(এবং অবসানকে ? যা আমরা এই নাটকের প্রায় অন্তিমেই দেখতে পাই। রথের দড়ি টানায় ধনিকদের 'অর্থবান হাতের পরী(া' ব্যর্থ হয়েছে (জয়ী হয়েছে শূদ্রদল। দিনের চতুর্ভাগে চতুর্বর্ণের আসা-যাওয়াও মনে হয় তাৎপর্যপূর্ণ।

মেয়েদের পুনরাগমন ঘটেছে প্রায় বিকেল বেলায়। দ্বিতীয় নারী জানিয়েছে, তিনকড়ির মায়ের নির্দেশ মতো 'ঠিক 'দুপুর বেলা' তালপুকুরে সতের বছরের ব্রাহ্মণকন্যার স্নান করিয়ে তারই হাতে 'পাটশিয়ালা' তুলে এবং অন্যান্য মেয়েলি তুকতাক করে তবেই সে এসেছে রথের কাছে। সুতরাং দুপুর যে গড়িয়ে যাচ্ছে, এতে সন্দেহ নেই। কারণ, রথের কাছে এসে সে জেনেছে দড়ি-নারায়ণের 'রোদ্দুরে তেতে উঠেছে মেঘবরণ গা'। খেদি যখন ভোগের জন্য আনে খিচুড়ি, তখন 'বেলা হয়ে গেল' এই আ(প যথার্থ মনে হয়। রান্না হয়ে যাবার মত সময় অন্তত সেদিনের বিপর্যস্ত দিনে, এই সময়ের অতিবাহন অবসিত দুপুরকেই নির্দেশ করে।

দিনের অন্তিমে এসেছে শূদ্রদল। এ যেন যুগাবসানের ইঙ্গিতও। যে রথ চলেনি পুরোহিত-রাজা-সৈনিক-ধনিকদের হাতে, সেই রথ চলল শূদ্রের হাতের স্পর্শে। সকলের আর্ত হাহাকার 'অন্যায়', 'ঘোর অন্যায়' ধুলোয় মিশিয়ে রথের চাকা এগিয়ে গিয়েছে।

দিনের শু(থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত 'কালের যাত্রা'র গতি। তবু সীমাবদ্ধ নয় সেই চলা, কালের যাত্রার কালসীমা সীমাহীন। তার যাত্রা অন্তহীন পথে।

৪.১.১.৩ : আদর্শ প্র্রোবলী

১। 'রথের রশি' নাটিকায় কালান্তরের কি আভাস পাও, ব্যাখ্যা করো।

২। 'রথের রশি' নাটকে রবীন্দ্রনাথের সমাজ ভাবনার সঙ্গে এসে মিলেছে ইতিহাসের বীক্ষা।—আলোচনা করো।

৩। কালের যাত্রায় শোষিত বঞ্চিত, অন্ত্যজ গোত্রের মানুষজনের ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গ 'রথের রশি' নাটিকায় কীভাবে উন্মোচিত তা আলোচনা করো।

৪। ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিবর্তনের ক্রমপরম্পরা 'রথের রশি' নাটকে বিধৃত হয়েছে—বিষয়টি উদ্ধৃতিসহ আলোচনা করো।

———————

পর্যায়গ্রন্থ - ১

একক - ২

রূপকের তাৎপর্য ও নামকরণ

বিন্যাসক্রম :

৪.১.২.১ : রূপকের তাৎপর্য

৪.১.২.২ : নামকরণ

৪.১.২.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪.১.২.১ : রূপকের তাৎপর্য

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের ৫৭তম জন্মদিন উপলক্ষে কবি 'কালের যাত্রা' নাটকটি তাঁকে উৎসর্গ করেন। একটি চিঠিতে নাটকটির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে জানান। ৩১শে ভাদ্র, ১৩৩৯-এ কবি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লেখেন —

তোমার জন্মদিন উপলক্ষে 'কালের যাত্রা' নামক একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। আশা করি, এ দান তোমার অযোগ্য হয়নি। বিষয়টি এই — রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে মহাকালের রথ অচল। মানবসমাজের সকলের চেয়ে বড় দুর্গতি, কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানবসম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অপমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে। তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে সম্মুখের দিকে চলবে।

এখানে লক্ষ করার মতো, যে, 'কালের যাত্রা' গ্রন্থে কবি যে হতমান মানুষকে সম্মানিত করেছেন, সেই গ্রন্থ তুলে দিয়েছেন শরৎচন্দ্রের হাতে। এই শরৎচন্দ্র, যিনি, যারা সংসারে শুধু দিলে, পেলে না কিছুই ক্ষ মানুষ হয়ে মানুষ যাদের চোখের জলের হিসাব নিলে না, — তাদের কথা, কথা ও অভিযোগ তাঁর লেখনীর মাধ্যমে প্রচার করেছেন। এই দিক দিয়ে গ্রন্থটির উৎসর্গ তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। 'অখ্যাতজনের নির্বাক মনের বাণী' শরৎচন্দ্র জানেন বলেই তাঁর প্রতি কবির শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রয়েছে। নইলে কেন পুনরায় 'সাধারণ মেয়ে'র কথা লিখতে শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ জানাবেন !

শরৎচন্দ্রকে লেখা উল্লিখিত চিঠিই প্রমাণ করে, যে, কালের যাত্রা সাধারণ নাটক নয়। তা রূপকধর্মী নাটক। এবং এই কারণে এই নাটকে একটি তত্ত্ব দুর্নিরীক্ষ নয়। তবু প্রশ্ন জাগে, অচলায়তন, মুক্তধারা, রক্তকরবীতে কবিরূপকে প্রতীকে নানাভাবে যা বলেছেন, সেই কথা বলার জন্য কবি কেন রূপকের দ্বারস্থ হলেন ? প্রবন্ধগুলিতে যেভাবে তাঁর বক্তব্য সোজাসুজি বলেছেন, নাটকে তা বললে কি ক্ষতি ছিল ?

রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্যে দৃশ্যমান জগৎ অরূপের আভাস সত্ত্বেও অবাস্তব নয়। যুগোচিত চিন্তাভাবনা যথাযথ পরিবেশে চিত্রিত হয়েই যুগোত্তীর্ণ হয়েছে। রূপক নাটক মূলত ভাবমূলক। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে

সেই ‘ভাব’ নীরক্ত নয়। শিল্পের প্রেরণায় নাটকে যখন তিনি রূপকে-প্রতীকে নেপথ্যচারী, তখন তাঁর প্রবন্ধের ভাষা স্বচ্ছ, খাপখোলা তলোয়ারের মতই শাণিত, উজ্জ্বল। যেমন ‘পল্লীসেবা’ প্রবন্ধে তিনি যখন বলেন —

> মুখে আমরা যাই বলি, দেশ বলতে আমরা যা বুঝি, সে হচ্ছে ভদ্রলোকের দেশ। জনসাধারণকে আমরা বলি ছোটলোক (এই সংজ্ঞাটা আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছে।

কিংবা রাশিয়ার চিঠিতে সোজাসুজি বক্তব্য রাখেন —

> চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে। তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন (তাদের মানুষ হবার সময় নেই, দেশের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত।

‘কালের যাত্রা’য় রথ চলার রূপকে এই উচ্ছিষ্টপালিত ছোটলোকদের কথাই বলেন, তবে অন্যভাবে —

দলপতি ঃ একবার তিনি ডাক দিয়েছেন তাঁর রশি ধরতে।

পুরোহিত ঃ রশি ধরতে ! ভারি বুদ্ধি তোমাদের। জানলে কি করে !

দলপতি ঃ কেমন করে জানা গেল সে তো কেউ জানে না।

ভোরবেলা উঠে সবাই বললে সবাইকে ডাক দিয়েছেন বাবা। কথাটা ছড়িয়ে গেল পাড়ায় পাড়ায়, পেরিয়ে গেল মাঠ, পেরিয়ে গেল নদী, পাহাড় ডিঙিয়ে গেল খবর—

ডাক দিয়েছেন বাবা।

এই রূপকের মেঘাবরণ এমন ঘন নয়, যে, ভিতরের সূর্যটি দেখা যাবে না। শূদ্রের হাতেই যখন রথ প্রাণ পায়, তখন গুহাহিত সত্য সহজেই চোখে পড়ে। বচনে, বাচনে, আচরণে সমস্তই এমন জীবন্ত হয়ে ওঠে, যে, অবিশ্বাস করার কিছু থাকে না। অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। নাট্যশিল্পের সব শর্ত মেনে কিভাবে এই নাটক ‘কালান্তর’-এর ভাষা পায় তাও দেখার মত ! শূদ্র দলপতি যখন বলে,

> আমরাই তো জোগাই অন্ন, তাই তোমরা বাঁচ আমরাই বুনি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লজ্জারক্ষা।

আবার মন্ত্রী যখন জানায়,

নীচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়, / বরাবর যা প্রচ্ছন্ন তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্তর।’

তখন রূপকের অন্তরাল দূরতিক্রম্য মনে হয় না। যে রথ জগন্নাথের তা যে সমাজরথ তা অস্পষ্ট থাকে না।

৪.১.২.২ : নামকরণ

‘কালের যাত্রা’ নামে কোনো স্বতন্ত্র নাটক নেই। ‘রথের রশি’ এবং ‘কবির দীক্ষা’ এই দুটি নাটিকার সমন্বয়ই ‘কালের যাত্রা’।

‘রথযাত্রা’ নাটিকাটির প্রকৃত রচয়িতা কে, এই নিয়ে গবেষণার অন্ত ছিল না। শ্রী প্রমথনাথ বিশী

তাঁর 'পুরানো সেই দিনের কথা' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে যে তথ্য দিয়েছেন, (যার বিবরণ আমরা পূর্বেই দিয়েছি) তাতে সমস্ত কৌতূহল নিরস্ত হয়েছে। 'রথযাত্রা' রবীন্দ্রনাথেরই রচনা, অন্য কারোর নয়।

'রথযাত্রা' ও 'রথের রশি'র বিষয়বস্তু একই হওয়া সত্ত্বেও এই নামবদল কেন ? এই প্র্ন স্বাভাবিকভাবেই মনে আসে। দুটি নাটকের রচনারীতির পার্থক্য —

প্রথমটি গদ্যে, পরের গদ্যছন্দে লেখার জন্যই নামান্তর, গ্রাহ্য হতে পারে না। 'রথযাত্রা' কোনো আধ্যাত্মিক নাটক নয়, মানুষের এগিয়ে চলার ইতিবৃত্ত এই 'রথযাত্রা'। কিন্তু দেখা দরকার, এগোবে কে ? রথ, নাকি মানুষ ? 'রথযাত্রা' গদ্যনাটিকায় সৈনিকদের প্র্নের উত্তরে কবি বলেন, 'ওরা ভুলে গিয়েছিল মহাকালের শুধু রথকে মানলেই হল না, মহাকালের রথের দড়িকেও মানা চাই।' এই 'দড়ি' কি ? রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, — 'মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধবন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই রথ টানবার রশি'। এই রশি আজ অনাদৃত, অবহেলিত বলেই কালের যাত্রা স্তব্ধ। সুতরাং রথ যারা চালায়, তাদের দিতে হবে মর্যাদা। রথ বড় নয় (রথ চলাই বড় এবং সেই রথ যারা চালায়, 'সেই মানুষকেই প্রকাশ করতে হবে' (মানুষের ধর্ম)। সুতরাং 'রথযাত্রা' নামকরণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঈপ্সিত মতাদর্শের সম্যক প্রতিফলন দেখতে পেলেন না। সেই নাম পরিত্যক্ত(হল। নতুন নাম 'রথের রশি'। নামের সঙ্গে সঙ্গে রীতিরও বদল ঘটল। এই নামান্তরে প্রাসঙ্গিকতা চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন প্রমথনাথ বিশী — সেই রশিতে টান পড়িলে ইতিহাসের রথ নড়িয়া ওঠে, যে রথের রথী হইতেছেন মানবভাগ্যবিধাতা। কিন্তু কোনো কারণে যদি রথের রশির গ্রন্থি শিথিল হয়, বাঁধন আলগা হইয়া আসে, তখন দড়িতে টান পড়িলেও সে টান রথ পর্যন্ত পৌঁছায় না, রথ অচল হইয়া থাকে। নাটকে রথ না চলিবার ইহাই কারণ।

(রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ, দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ১৯৭)

'রথের রশি' নাটকের কবি-ও কি সেই ইঙ্গিত দেননি, যখন শূদ্রের ঐক্যমুখী শক্তি(তে রথ ছুটে চলেছে দেখে পুরোহিত বলেন, শূদ্রশক্তি(ই কি শেষপর্যন্ত জয়ী হবে ? প্রত্যুত্তরে কবির সংলাপ অনাগত ভবিষ্যৎকে তুলে ধরেছে —

পারবে না হয়ত
একদিন ওরা ভাববে, রথী কেউ নেই, রথের
সর্বময় কর্তা ওরাই।
দেখো, কাল থেকেই শু(করবে চেঁচাতে-
জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের

এবং 'রথযাত্রা' গদ্য নাটকে কবির ব্যাখ্যা আরেকটু বিশদ ('যে বিধাতা মানুষের বুদ্ধিবিদ্যা নিজের হাতে গড়েছেন, অন্তরে বাহিরে অমৃতরস ঢেলে দিয়েছেন, তাঁকে গাল পাড়তে বসবে।' জ্ঞান, কর্ম ও ভাবের এই অনৈক্য দূর করার স্বপ্ন দেখেছেন তাঁরা।

অতএব 'কালের যাত্রা' গ্রন্থের 'রথের রশি' নাটিকার নামকরণ কেন তাৎপর্যপূর্ণ, তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ, তাতে অবহেলা, অনাদর, বিদ্বেষ এলেই ঘটে ছন্দপতন।

নাটকে মেয়েদের ব্যাকুল প্রার্থনা ও পূজো ব্যর্থ হল এইজন্যই যে, তারা পূজো করেছিল বাইরে ('তাদের পূজো পড়েছে ধূলোয়, ভক্তি(করেছে মাটি।' যে দড়ি 'মানুষে মানুষে বাঁধা' তাকেই করেছে অনাদর। 'জমেছে অপরাধ, বাঁধন হয়েছে দুর্বল।'

তাই কবির আহ্বান 'ওদের সঙ্গে মিলে ধরো সে রশি' এবং 'রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধুলোয় ফেলো না।' এই রূপক বা প্রতীকের অন্তরাল ভেদ করে বেরিয়ে আসে সেই চিরচেনা কবিকণ্ঠস্বর যা আমরা গীতাঞ্জলি পর্বেই শুনেছি —

১. এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন, ধরো হাত
সবাকার
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব
অপমান ভার।

২. নেমেছে ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবান
অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান।

৪.১.২.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'রথের রশি' নাটিকার নামকরণ যথাযথ কিনা আলোচনা করো।

২। 'রথের রশি' নাটিকার রূপকার্থ বিশ্লেষণ করো।

৩। 'রথের রশি' নাটকটির নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

৪। 'রথের রশি'—নাটকটির রচনার পূর্ব-ইতিহাস বর্ণনা করে নাটকটির নামকরণ কতদূর প্রাসঙ্গিক ও সার্থক তা' দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করো।

———————

পর্যায়গ্রন্থ - ১

একক - ৩

নাট্যপ্রকরণ ও গঠন

বিন্যাসত্র(ম :

৪.১.৩.১ : নাট্য-প্রকরণ ও গঠন

৪.১.৩.২ : আদর্শ প্র(াবলী

৪.১.৩.১ : নাট্য-প্রকরণ ও গঠন

প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কোনো নাট্যশাস্ত্রীর নির্দেশেই 'রথের রশি' কে বাঁধা যায় না। এর কারণ, প্রথমত এটি পূর্ণাঙ্গ নাটক নয় (ছোট একাঙ্কধর্মী নাটক। দ্বিতীয়ত, প্রচলিত নাটকের নিয়মকে অগ্রাহ্য করে নবতমরূপ খোঁজার যে চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন থেকেই করেছিলেন, এখানেই তা ফলবান হয়েছে। যদিও 'কালের যাত্রা' অভিনীত হবার বিস্তারিত কোনো সংবাদই আমরা পাই না (শুধু জানি, ১৯৩২-এ শান্তিনিকেতনে এই নাটিকা মঞ্চস্থ হয় এবং রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল আবৃত্তিকারের। 'কালের যাত্রা'র মঞ্চসাফল্য কতখানি তার বিবরণ দুর্লভ।

তথাপি এই নাটকের রীতি ও প্রয়োগে তথা প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক ভাবনাই বিজড়িত। এই হিসেবে তার মূল্য যথেষ্ট।

প্রথম জীবনের নাট্যরচনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর আদর্শ হিসেবে মেনেছিলেন শেক্সপীয়রকে। এছাড়াও সংস্কৃত নাটকের প্রভাব কম ছিল না। তাঁর 'বিসর্জন', 'রাজা ও রানী' ইত্যাদি নাটক তারই সা(্য দেয়। মুক্ত(ধারা ও রক্ত(করবীতে এই রীতি বিশেষভাবে ল(ণীয়। আমাদের দেশে 'যাত্রা', জাপানের 'নো' নাটকের আদর্শ ত্র(মশ তাঁকে অনুপ্রাণিত করল সেই নাটক লিখতে, যেখানে দৃশ্যপটের ব্যবহার লোকের চোখ ভোলায় না। 'তপতী' নাটকের ভূমিকায় তিনি স্পষ্ট জানালেন — 'অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল, দৃশ্যপটটা তার বিপরীত।' ওটা তাঁর কাছে 'ছেলেমানুষ'। তিনি দর্শকের 'কল্পনার উপরে দাবি' রাখলেন।

'রথের রশি'র (্রে দেখা গেল কবি তাঁর মতাদর্শকে রূপ দিতে পেরেছেন। এখানে কোথাও প্রবেশ ও প্রস্থান ছাড়া সামান্যতম বিবরণ নেই। শু(থেকেই শেষপর্যন্ত এক আদ্যন্ত সুসম গতিতে বয়ে চলল নাট্যপ্রবাহ। দৃশ্য ও দৃশ্যান্তরের আঘাতে বি(ত হল না তার অখণ্ডতা। এই নাটকেই বোঝা গেল নাটক ও তার অভিনয় কত বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল। রথ না চলার একটিমাত্র ঘটনাকে কেন্দ্র করে আগাগোড়া এই নাটক স্তরে স্তরে এগিয়ে গেল প্রোথিত ল(্যে। চতুর্বর্ণ বিভক্ত(সমাজের শ্রেণীসংগ্রাম তথা ধর্মমোহের প্রতি ধিক্কার এই নাটকে সোচ্চার হতে দেখা গেল। চিরাচরিত প্রথানুসারে রথ চলত রাজা ও ব্রাহ্মণের হাতে। এইবার দেখা গেল ব্যতিত্র(ম, রথ চলল না তাঁদের হাতে। অবশেষে শূদ্র দলপতির হাতের টানে চলল রথ। 'হায়, হায় করে উঠল প্রাচীনপন্থীর দল। তবু তারাই যোগ দিলে সেই কালের রথযাত্রায়। সমাজ-রথের দেবতা এতদিন যে অনাচার সহ্য করেছিলেন, আজ হল তার প্রায়শ্চিত্ত।

নাটকের শু(থেকেই আমরা উৎকণ্ঠিত নরনারীদের দেখতে পাই যারা রথের মেলায় এসেছে আনন্দের জন্য (পুণ্যার্জনের জন্য। কিন্তু রথের অচলতা তাদের আতঙ্কিত ও অশুভবোধে পীড়ন করে।

সংলাপে টের পাওয়া যায় কিভাবে আকুল নরনারী রথের যাত্রাপথে চেয়ে আছে। প্রচলিত নাট্যভঙ্গিতে লেখা নয় এই নাটক। সমগ্র দিন ও রাত্রিকেও ব্যবহার করা হয়নি এই নাটকে। সমস্ত নাটকটিই দাঁড়িয়ে আছে পথের ওপরে। পথে চলাটাই বড় ব্যাপার (তবু পথ এই নাটকের শেষ কথা নয় (চলাও নয়। বড় কথা, যারা চলবে এবং রথ চালাবে তারা।

আগাগোড়া ঘটনার অভিঘাতে, নাটকীয়তায়, এবং কাব্যিকভাবে উজ্জীবিত এই নাটক হয়তো বা ‘কাব্যনাট্য’র সঙ্গে তুলনীয়।

সমগ্র নাটকটি একটি মাত্র পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কিভাবে আমাদের জীবনের মুখোমুখি করে দেয়, সেটা দেখবার মত। উপমায়, প্রতীকে এই নাট্যরস ও কাব্যরস যুগপৎ কাব্যনাট্যের সম্ভাবনা প্রবল করে তোলে। স্থান-কাল-পাত্র ছাপিয়ে এই নাটক আবেদন রাখে আমাদের বুদ্ধি ও হৃদয়ের কাছে। ঘটনার আঘাতে মন যখন বিমূঢ় ও উৎকণ্ঠিত, তখনই কাব্যের আবেগ করে চিত্তকে প্রশমিত। নাটকের দ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত(হয়েছে কাব্যের প্রশান্তি — এক মহৎ মানবতাবোধে উত্তীর্ণ হই আমরা। রথযাত্রার আড়ম্বর, সংকীর্ণতা, কোলাহল পেরিয়ে আমরা অনুভব করি, পূজা নয়, ভালোবাসা — মানুষকে ভালোবাসা।

যে-কোনো নাটকেই সংলাপের গু(ত্ব স্বীকার করা হয়েছে। যদি তা কাব্যনাট্য হিসেবে বিচার্য হয়, তবে দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়। এক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গদ্যই কাব্যপদবাচ্য। ‘রথের রশি’র (্ত্রে তার ব্যতিত্র(ম হয়নি। রবীন্দ্র-নাটকের চরিত্রেরা তাঁরই ভাষায় কথা বলে, এই অভিযোগ অসত্য নয়। তথাপি দেখা দরকার সেই সংলাপ নাটককে তার যথার্থ প্রে(াপট দিচ্ছে কিনা !

‘রথের রশি’র বিভিন্ন চরিত্ররা নানা কণ্ঠে কথা বলেছে, আর সেই বচন-বাচনে যেমন পাই বাস্তবতা, তেমনি তা বস্তুর অতীতকে ছুঁয়ে যায়। মেয়েরা যখন এই নাটকে বলে,

দেশের লোকের প্রথম যাত্রার দিন আজ—

বেরোবেন ব্রাহ্মণ ঠাকুর শিষ্য নিয়ে —

বেরোবেন রাজা, পিছনে চলবে সৈন্যসামন্ত

পণ্ডিতমশায় বেরবেন, ছাত্ররা চলবে পুঁথিপত্র হাতে।

তখন চলমান জীবনকেই দেখি। তারপরই ‘কিন্তু কেন সব গেল হঠাৎ থেমে’ এই উৎকণ্ঠা ভবিতব্যকে গম্ভীর করে তোলে। এক আসন্ন সর্বনাশকে ইঙ্গিত করে। আবার সন্ন্যাসী যখন ‘সর্বনাশ এল’ বলে ছুটে আসে, তখন এক অলৌকিক বাতাবরণ রচিত হয় সংলাপে —

গু(গু(শব্দ মাটির নীচে।

ভূমিকম্পের জন্ম হচ্ছে।

গুহার মধ্য থেকে আগুন লকলক মেলছে

রসনা।

মেয়েদের সংলাপে রথের দড়িকে ঘিরে যেসব প্রতীকী উৎকণ্ঠা, আবেগ পাই তাও পরিবেশকেই স্বীকার করে। ‘রথের দড়ি’ তাদের কাছে কখনো অজগর সাপ, কখনও বা যমুনা নদীর ধারা, গনেশ ঠাকুরের শুঁড়। এই দড়ির বন্দনা তারা করে। মানতও করে। দড়িকে ঘিরে এই বিচিত্র অনুভূতি তাদের মনের প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয়। সাপ বা নাগকন্যার বেণীর প্রতীকে আদিম কামনার ইঙ্গিত লুকিয়ে থাকে, বুঝি। যমুনা নদীকে ঘিরে যে কৃষ(কথার মিথ, সেখানেও আছে প্রেমের আভাস। সেইসঙ্গে সৌন্দর্য্য দর্শনও। নাগরিকরা

এই একই দড়িকে দেখেছে 'যুগান্তের নাড়ী' রূপে। — যা সান্নিপাতিক জ্বরে আজ দব্ দব্ করছে। শ্রী শঙ্খ ঘোষ এই দুই দেখার তুলনা করে বলেছেন 'মেয়েদের সংলাপে আছে এক অবোধ ভঙ্গি, সর্বনাশকে তারা দেখতে পাচ্ছে অনেকটা বাইরের দিক থেকে। কিন্তু পু(ষ নাগরিকদের কথায় দেখি, যুগযুগান্তকে বুঝে নেবার চেষ্টা, আর তাই তারা ব্যাধিটা ল(করে আত্মশরীরের ভিতর থেকে। .... এর জন্য প্রয়োজন ঘটবে আত্মচিকিৎসার।' (কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক, পৃঃ ৩৭-৩৮)

সৈনিক ও ধনিকদের সংলাপে তাদের স্বভাব ও চরিত্রই প্রতিফলিত।

১. আদেশ ক(ন কী করতে হবে, ভয় করিনে আমরা

২. ঘড়ার ঢাকনার মতো শূদ্রগুলোর মাথা দেব উড়িয়ে ঢালব ওদের রক্ত(।

সৈনিকদের এই সংলাপ যেমন নাটকের বস্তুগত প্রয়োজন সিদ্ধ করে, তেমনি কাব্যনাট্যের শর্তকেও উপে(া করে না। শত্রুর মুণ্ডপাত 'ঘড়ার ঢাকনা'র উপমায় অনায়াসে উঠে আসে তাদের জিভে। ধনপতির দল প্রসঙ্গেও তারা দেখতে পায় তাদের হীরের আংটি থেকে 'আলোর উচ্চিংড়ে' লাফিয়ে চোখে পড়ছে। প্রত্যেক চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই সংলাপের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। কাব্যের স্বাদ রেখেও নাটক বলেই সংলাপে আবেগ সংহত। এমনকি নাটকে কবি যখন ছন্দের কথা বলেন, তখনও তা আবেগার্ত হয় না। 'যুগাবসানে, লাগেই তো আগুন। / যা ছাই হবার তাই ছাই হয়' — কবির এই সংলাপ একইসঙ্গে বাস্তবতাকে স্বীকার করেও এক অন্যতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে — যা এক মহত্তম মানবতাবোধে, ভালবাসায় আমাদের উন্নীত করে। 'রথের রশি'র ভাষা প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছেন, 'রথের রশির ভাষা গদ্য হইলেও কবিতার ন্যায় মধুর।' (বাংলা নাটকের ইতিহাস, অজিত কুমার ঘোষ, পৃ ৪১৫)

'রথযাত্রা' নাটকের সাদামাটা গদ্যভাষার সঙ্গে 'রথের রশি'র গদ্যছন্দ তুলনা করলেই দেখা যাবে, সাদা গদ্যে কবির ভাব যেন যথেষ্ট বলশালী ও ব্যঞ্জনাধর্মী হতে পারেনি। বড্ড বেশি বিবরণময় মনে হয় সংলাপগুলোকে। অথচ যখনই গদ্যছন্দে রূপান্তরিত হল একই নাটক (নামান্তরে 'রথের রশি') যেন প্রাণ পেয়ে নেচে উঠল। ঠিক ঐ অসাড় রথের দড়ির মতোই 'রথযাত্রা' থেকে 'রথের রশি'র রূপান্তর মনে হয় 'মরা নদীতে যেমন বান আসে,' তেমনি যেন প্রাণ পেয়েছে নাটক। শ্রী অশ্রুকুমার সিকদার তাঁর 'রবীন্দ্র নাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে যে মূল্যবান দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং যে সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন, তা যথার্থ বলে মনে হয়, 'গদ্য সংলাপ কী কৌশলে গদ্যকবিতায় রূপান্তরিত হয়েছে তার সূত্র নির্ণয় করা সহজ হয় যখন দেখি, নিঃ(াসের পতন, উচ্চবর্ণের সুবিধা এবং ভাব অনুযায়ী গদ্যের বাক্যগুলিকে নানা দীর্ঘ হ্রস্ব পংক্তি(তে বিন্যস্ত করা হয় এবং অসমাপিকা ত্রি(য়ার পূর্বে(যেখানে গদ্যের মতো বাক্যের শেষে বসে সেখানে ব্যতিত্র(ম বৈচিত্র্য সৃষ্টির দায়ে। নিম্নোদ্ধৃত সংলাপের দুইরূপ ল(করলে এই দুইটি সূত্র সত্য বলে গ্রাহ্য হবে মনে হয়।

রথযাত্রা

২ সৈনিক ।। কবি, আজ রথযাত্রায় এই যেসব উল্টোপাল্টা কাণ্ড হয়ে গেল, কেন বুঝতে পারো ?

কবি ।। পারি বৈকি।

১ সৈনিক ।। পু(তের হাতে রাজার হাতে রথ চল্‌ল না, এর মানে কী ?

কবি ।। ওরা ভুলে গিয়েছিল মহাকালের শুধু রথকে মানলেই হয় না, মহাকালের রথের দড়িকেও মানা চাই।

রথের রশি

দ্বিতীয় সৈনিক ।। একি উল্টোপাল্টা ব্যাপার কবি। পু(তের হাতে চলল না রথ —রাজার হাতে না— মানে বুঝলে কিছু ?

কবি ।। ওদের মাথা ছিল অত্যন্ত উঁচু মহাকালের রথের চূড়ার দিকেই ছিল ওদের দৃষ্টি—

নিচের দিকে নামল না চোখ,
রথের দড়িটাকেই করল তুচ্ছ।
মানুষের সঙ্গে মানুষকে বাঁধে যে বাঁধন
তাকে ওরা মানেনি।
রাগী বাঁধন আজ উন্মত্ত হয়ে ল্যাজ আছড়াচ্ছে
— দেবে
ওদের হাড় গুঁড়িয়ে।" ....

(রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য। পৃ ৮৪-৮৫)

এই প্রতিতুলনায় বোঝা যায় 'রথযাত্রা' নিয়েছিল বোঝাবার দায় (ফলে এসেছিল অতিকথন দোষ। 'রথের রশি' সেই দোষমুক্ত(। এখানে কবি তাঁর শর্ত — পাঠক ও দর্শকের কল্পনার দাবি মেনে নিয়েছেন। তাই তা বোঝবার চেয়ে বাজবার হয়ে ওঠে নাট্যরসিকের কাছে।

৪.১.৩.২ : আদর্শ প্র্নোবলী

১। রূপক ও প্রতীক বলতে কি বোঝো? রথের রশিকে কোন্ শ্রেণীর নাটক বলা যায়?

২। 'রথের রশি' নাটকের সংলাপ বিষয় ও চরিত্রানুযায়ী হয়নি। তুমি এই অভিমত সমর্থন করো? উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দাও।

৩। 'রথের রশি'–নাটকের ঐশ্বর্য-এর সংলাপ নাট্যদ্বন্দ্ব ও চরিত্রের মূল্যায়নে এ নাটকের সংলাপ কতখানি সহায়ক তা' দৃষ্টান্ত সহযোগে পর্যালোচনা করো।

———————

পর্যায়গ্রন্থ - ১

একক - ৪

চরিত্র চিত্রমালা

বিন্যাসত্র(ম :

৪.১.৪.১ : চরিত্র চিত্রমালা

৪.১.৪.২ : আদর্শ প্র(াবলী

৪.১.৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪.১.৪.১ : চরিত্র চিত্রমালা

রবীন্দ্রনাথের নানা চর্চা ও অনুসন্ধিৎসার মধ্যে লোকজীবন ও লোকসাহিত্য নিয়ে ভাবনাচিন্তা এবং সত্রি(য় ভূমিকা গ্রহণ অন্যতম, একথা আমাদের অজানা নয়। 'রথযাত্রা' কে কেন্দ্র করে আমাদের জনমানসে যে উদ্দীপনা জাগে, তার প্রত্য(প্রমাণ একালেও সুলভ। সুদূর নীলাচল বা পুরীতেই নয়, গ্রামবাংলার সর্বত্র এই 'রথযাত্রা'। এক বিশিষ্ট উৎসব। একে কেন্দ্র করে ধর্মভী(মানুষের বিচিত্র বি(াস ও সংস্কার আবর্তিত হয়। রথ চলার ওপর নির্ভর করে দেশ ও দেশবাসীর শুভাশুভ, ভবিষ্যৎ। 'কালের যাত্রা' নাটকে সংগত ভাবেই রথযাত্রাকে ঘিরে উৎকণ্ঠিত নরনারীর সমাবেশ ঘটেছে। টমসনের মত সমালোচক যখন নির্দ্বিধায় লেখেন, রবীন্দ্র-নাটকের মানুষরা 'vehicle of ideas', তখন 'কালের যাত্রা'য় জনসংঘের কথা মনে পড়ে। কেননা, এই জনতা ভাবচিত্র নয়, জীবন্ত চরিত্র। তাদের কথায়, আচরণে তারা স্বতন্ত্র প্রত্যেকে। অথচ অখণ্ড এক 'জনতা'।

'রথযাত্রা' ও 'রথের রশি' নাটকের চরিত্রমালার দিকে তাকালে যে পার্থক্য প্রথমে চোখে পড়ে, তা মেয়েদের উপস্থিতি। গদ্যনাটক 'রথযাত্রা'য় মেয়েরা অনুপস্থিত। অথচ 'রথযাত্রা'র মধ্যে যে শুভাশুভ বোধ, সংস্কার, স্ত্রীআচার, মেয়েলি উচ্ছ্বাস থাকে প্রাক্ত(ন নাটকে তা নেই। সেই পরিবেশগত বিবর্ণতা দূর হয়েছে 'রথের রশি'তে, এসেছে সম্পূর্ণতা। এই নাটকে মেয়েদের উপস্থিতি, তাদের প্রতিত্রি(য়া, আচার-আচরণ সমগ্র নাটকে একইসঙ্গে বাস্তব ও জীবন্ত করেছে। নাটকের শু(তে দেখি, রথ দেখতে ছুটে আসা মেয়ের দল আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বিস্মিত, চঞ্চল, উৎকণ্ঠিত। রথ চলছে না। একি অসম্ভব, অবি(াস্য কাণ্ড। এতদিন তারা দেখে এসেছে, ব্রাহ্মণঠাকুর, রাজা, সৈন্য-সামন্ত একে একে বেরোয় এই শুভযাত্রায়। উচ্ছল, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে চারদিক। কিন্তু আজ

চারদিকে সব যেন থমথমে হয়ে আছে,

ছমছম করছে গা।

রথের দড়িকে ঘিরে শু(হয় তাদের উদ্বেগ, ত্রাস, আকুলতা। প্রতীকের প্রয়োগে সেই ভাবনাচিন্তা আরো তীব্র ও জটিল হয়েছে। দড়ি তাদের কাছে দেবতা, এমনকি রাস্তাকেও ঠাকুর বানায় তারা। তুচ্ছ হয়ে যান রথাসীন দেবতা।

রথযাত্রার লোকায়ত রূপটি নানাভাবে ফুটে উঠেছে এ নাটকে। যেসব লৌকিক সংস্কার অর্থহীন, অবাস্তব— তাও এই রথের জন্যই মেয়ের দল মেনে নিয়েছে।

লোকচেতনায় যেসব আদিম বি(াস আজো অটুটভাবে রয়ে গেছে, 'সিঁদূর' তার অন্যতম মাঙ্গলিক দ্রব্যবিশেষ। সেই সঙ্গে 'চন্দন' পুজোর অপরিহার্য অঙ্গ। রথযাত্রায় এই দুয়ের উল্লেখ তাই লোকায়ত আবহকেই সুস্পষ্ট করে তোলে।

রথযাত্রার উৎসবে উৎসুক মেয়ের দলের পরেই এসেছে পু(ষ নাগরিকবৃন্দ। নাগরিকের আভিধানিক অর্থ যাই হোক, এখানে তারা জনতার অন্যতম। তাদের স্বতন্ত্র জাত বা জাতি নেই। সমাজের ভালোমন্দের ব্যাখ্যাকর্তা তারা। তারাই এই সমাজ ও মানুষের ভালোমন্দের পারদযন্ত্র। — যেখানে ধরা পড়ে তাপমাত্রা। তাদের উক্তি(তেই বুঝি সমাজ কতটা এগোল কিংবা অনড়।

অচল রথ ও অনড় দড়ি নিয়ে মেয়ের দল যখন অমঙ্গলের ভয়ে শঙ্কিত, পূজোর আয়োজনে ব্যস্ত, তখনি নাগরিকদলের প্রবেশ। মেয়েদের মতো ভী(তা তাদের হয়ত নেই (কিন্তু ভবিতব্য ভেবে তারাও উদ্বিগ্ন। রথের দড়ি তাদের কাছে 'যুগান্তের নাড়ী' বা 'সান্নিপাতিক জ্বরে আজ দব্ দব্ করছে।' তার রঙ নীলবর্ণ মনে হয়েছে কারোর কাছে।

সচেতনতা, পরিহাস, যুক্তি(বাদিতা নিয়েও এই নাগরিকদল মেয়েদের সঙ্গে তুলনায় খুব দূরে থাকে না। রথের অচলতা, শূদ্রের অধিকারবোধ, শুচিতা ইত্যাদি বিষয়ে তারাও র(ণশীল, ধর্মভী(। 'রথের রশি' নাটকের শেষে এই নাগরিকদের আর পাই না।

'রথের রশি' নাটকে (রথযাত্রা গদ্যনাটকেও) মন্ত্রী চরিত্রটি আমাদের বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। মন্ত্রী অর্থাৎ যিনি মন্ত্রণা দেন (এই পদের যোগ্য ব্যক্তি(তিনি। এই নাটকে পদে পদে তাঁর বিচ(ণতা আমাদের চমৎকৃত করে। এই দূরদর্শিতার ফলে চরিত্রটির বিবর্তনও ঘটেছে। জনতার প্রধান প্রতিনিধি হিসেবে তিনিই প্রথম যুগান্তরকে স্বাগত জানিয়েছেন।

রথযাত্রার দিনে যে অঘটনে সকলে বিচলিত, সেখানে একমাত্র মন্ত্রীই মাথা ঠাণ্ডা রেখে একের পর এক চেষ্টা চালিয়ে গেছেন রথ চালাতে। 'রাজা'র নাম পেলেও এই নাটকে রাজার প্রত্য(উপস্থিতি নেই। ধরে নিতে পারি রাজার ইচ্ছাকেই মন্ত্রী রূপ দিচ্ছেন। জনতা যখন পারস্পরিক বি(াস-অবি(াস নিয়ে যুক্তি(-তর্কে মত্ত, তখনই ধনপতির সঙ্গে মন্ত্রীর সরাসরি প্রবেশ। তাঁর সংলাপে এটুকু বোঝা যায়, এর আগেও এই রথ চালাবার নানা ব্যবস্থা তিনি করেছেন এবং ব্যর্থ হয়েছেন।

মন্ত্রীকে অনুভব করতে হয়েছে, সংসার চালায় ঐ সমাজের অধঃপতিত 'ছোটলোক' মানুষরাই। শূদ্রদলপতিকে বলতে হয়েছে —

নিজ গুণেই চলে, তাই র(।

চালাক লোকে বলে আমরাই চালাচ্ছি

আমরা মান রাখি লোক ভুলিয়ে।

যুগের পরিবর্তন মেনে নিতে দেরী হয় না তার। যোগ দেন শূদ্র দলে (ধরেন রথের রশি। র(া পাবার, মান বাঁচাবার পথ এটাই। তাছাড়া 'ওরাই, যে আজ পেয়েছে কালের প্রসাদ।'

নাটকের শু(তে পুরোহিতকে দেখা যায় না। শুধু মেয়েদের কথোপকথনে জানতে পারি তাঁর উপস্থিতি। কিন্তু তা বড়ই ক(ণ ও বিবর্ণরূপ।

ঐ দেখ, পু(তঠাকুর বিড় বিড় করছে ওখানে

মহাকালের পাণ্ডা বসে মাথায় হাত দিয়ে।

রথ চলছে না। পুরোহিতের মন্ত্র ও নিষেধ আজ নিষ্ফল। দেবতার ডানহাত যিনি, সহসা তাঁর এই ব্যর্থতা ও পতন বুঝি জনতা' কে সাহস জোগায় পুরোহিতকে অগ্রাহ্য করার।

'রথের রশি' তে সন্ন্যাসীর বারংবার (ণিক উপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ। ঘটনাধারার মাঝে মাঝে তিনি এসেছেন বিবেকের মতো(ভবিষ্যদ্বত্ত(ার মতো। অচল রথের দিকে তাকিয়ে জনতা যখন বিহ্বল, সন্ন্যাসীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে আসন্ন অমঙ্গলের কথা।

সর্বনাশ এল।

বাধবে যুদ্ধ, জ্বলবে আগুন, লাগবে মারী

ধরণী হবে বন্ধ্যা, জল যাবে শুকিয়ে।

তিনি দেবতার সা(াৎ প্রতিনিধি। যা সাধারণে জানে না(তিনি জানেন। অলোকচারী তাঁর দৃষ্টি। জনতা তাই তাঁকে শ্রদ্ধা ও সমীহ করে। 'রথের দড়ি' যে মানবপ্রীতির চিহ্(, মনে রেখেই সন্ন্যাসী সৈনিকদের বলেন 'তোমরা দড়িটাকে করেছ জর্জর।' নাটকের শেষে তারই কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে 'মহাকালনাথের জয়'।

রবীন্দ্রসাহিত্যে 'কবি'র ভূমিকা গু(ত্বপূর্ণ ঃ ধ্বংস ও নির্মাণের মধ্যে তাঁর চলা। 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের 'তপোভঙ্গ' কবিতায় কবি বলেন —

বিদ্রোহী নবীন বীর স্থবিরের শাসন-নাশন

বারে বারে দেখা দিবে(আমি রচি তারি সিংহাসন

— তারি সম্ভাষণ।

সৌন্দর্য ও আনন্দকে নির্মাণ ও সৃষ্টির ভার কবির ওপর।

'রথের রশি' নাটকের কবিও চান প্রথাভ্যাসের শৃঙ্খল ছিন্ন হোক(দূর হোক মানুষে মানুষে অপ্রীতি, অসাম্য। পু(ত ঠাকুরের ঠাট্টার উত্তরে কবি জানিয়েছেন, রথ যদি ফের অচল হয় তো ডাকতে হবে কবিকেই। এগিয়ে যাবার পথ ও মন্ত্র জানেন কবিই।

লড়াই এর ছবিটা 'রথের রশি' নাটকে 'কবি'র চোখে ধরা পড়েছে এইভাবে —

ওদের দিকেই ঠাকুর পাশ ফিরলেন

নইলে ছন্দ মেলে না। এদিকটা উঁচু

— হয়েছিল অতিশয় বেশি

ঠাকুর নীচে দাঁড়ালেন ছোটর দিকে, সেইখান থেকে মারলেন টান, বড়টাকে

— দিলেন কাত করে।

সমান করে নিলেন আসনটা।

কবি নিজেও দাঁড়িয়েছেন এই ব্রাত্যদলে। কবির জয় বারে বারেই ঘোষিত হয়েছে এই নাটকে

নিতান্ত ঠাট্টা নয় পু(তঠাকুর।

রথযাত্রায় কবির ডাক পড়েছে বারেবারে।

কিন্তু কেন ? কারণ ছন্দ মেলাতেই কবির দরকার। চলার ছন্দ, জীবনের ছন্দ, আমরাই ভেঙে ফেলি বারংবার। সেই ছন্দপতনের অপরাধ যখন পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে, তখনি 'তালকাটে'। (দ্ধ হয় জীবনের গতি ও প্রগতি। সেই (দ্ধদ্বার খোলার ভার কবির উপরে ন্যস্ত।

'রথের রশি'র জনগণ আ(রিকভাবে শূদ্রদলপতি ও তার দলবল। কিন্তু নাটকের পরিণতি যে ইঙ্গিত দেয়, তাতে দেখি দ্বিস্তর বিভক্ত('জনতা' শেষপর্যন্ত এই 'জনগণ'-এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। শ্রেণীসংগ্রাম বা ধনতান্ত্রিক শোষণের বি(দ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ছাপিয়ে এক মহত্তর মানবতাবাদ এই নাটকে উচ্চারিত হয়েছে — যা রবীন্দ্র-নাটকের বৈশিষ্ট্য।

অচল রথ চালাবার দায়িত্ব নিয়ে নাটকের প্রায় শেষদৃশ্যে এসেছে শূদ্রদলপতি। অনাহূত সে। কিন্তু তার কথায় জানতে পারি, সে রবাহূত। বাবার ডাক পেয়েই দলবল নিয়ে সে বেরিয়ে পড়েছে রথ চালাতে। এতদিন তাদের ভূমিকা ছিল রথের চাকার পিষ্ট হওয়ার । কিন্তু রথের দেবতা এবার সেই বলি নিলেন না (পরিবর্তে ডাক দিলেন পদদলিতদের। কারো হাতেই যখন রথ চলল না, তখন শূদ্রের হাতে রথ চলবে, জনতার কাছে তা অবিধ্বাস্য ঠেকছে। যারা এতদিন মাথা নীচু করেছিল তারাই পাবে 'কালের প্রসাদ' (মানতে পারেনি জনতা। এত জপতপ, তুকতাক, ভক্তি(নিবেদন সব কি ব্যর্থ হতে পারে ? প্রতিবাদ করেছে তারা। সৈনিকেরা তুলেছে তলোয়ার। পুরোহিত শাস্ত্র ও অভিশাপের ভয় দেখিয়েছেন, বিদ্রূপ করেছেন। কিন্তু শেষর(া হয়নি। রাজমন্ত্রীর আদেশে শূদ্রদলই তুলে নিয়েছে রথের দড়ি। টান দিয়েছে 'জয় মহাকালনাথ' বলে। রথ নড়ে উঠেছে। উড়েছে ওর কেতন। পথ বিপথ অগ্রাহ্য করে ছুটে চলেছে সেই রথ। — যেন মরানদীতে জোয়ার এসেছে। সেই রথের চাকার তলায় গুঁড়িয়ে গেছে শাস্ত্রাচার (জীর্ণ প্রথা ও অভ্যাস (বহুকালের সঞ্চিত বঞ্চনা ও পাপ। স্তম্ভিত বিস্ময়ে মানুষ দেখেছে সেই রথের চলা। অনেক দ্বিধা ও সংশয় কাটিয়ে শেষে তারাও যোগ দিয়েছে রথযাত্রায়। নেমে এসেছে পথে। কর্মযোগে সকলের সঙ্গে এক হয়ে তবেই পেয়েছে তাদের দেবতাকে।

এই প্রথম এবং শেষ রবীন্দ্রনাটকে 'জনতা'র আত্মশক্তি(বিষয়ে সচেতনতা দেখা গেল। সংসার চালাবার পুরো দায় তারা সাগ্রহে চেয়ে নিয়েছে। এর জন্য কারোর নেতৃত্ব বা নির্দেশের অপে(া তারা করেনি। যে কারণে, চরের মুখে শূদ্রদলের আগমন জানতে পেরেও মন্ত্রী বিস্মিত হননি। বাধা দিতে চাননি। শুধু বলেছিলেন ওরা পারবে। 'কবি'র ভাষ্যে আমরা জানতে পারি, অচল রথ চালাবার জন্য ব্যাকুল মেয়ের দল কিভাবে ভক্তি(ও পুজোকে নষ্ট করেছে পথের ধুলোয়। রথের দেবতাকে তারা ভুলেই গিয়েছিল ফুল ও ধূপের ধোঁয়ায়। অস্বীকার করেছিল, সেই রথাসীন দেবতার প্রকৃত বাহনদের। তাই দেবতা হয়েছেন অপ্রসন্ন। যতদিন শূদ্রদল তথা, কর্মীরা নিজেদের 'রথের সর্বময় কর্তা' না ভাববে, ততদিন এই রথ চলবে অব্যাহত গতিতে। কিন্তু যেদিন এর ব্যত্যয় ঘটবে, সেদিন আসবে উল্টোরথের পালা। তবে আজ সে পালা শু(হয়েছে, তার মূল্য অস্বীকার করা যাবে না।

'সবার পিছে, সবার নীচে' যারা ছিল, তারাই আজকের রথযাত্রার প্রধান মানী দল। মহাকালের মহাসন র(ার ভার তাদের উপরেই ন্যস্ত। নতুন যুগের বার্তাবহ তারাই।

৪.১.৪.২ : আদর্শ প্র্াোবলী

১। ‘রথের রশি’ নাটিকায় ‘সন্ন্যাসী’ ও ‘কবি’র গুরুত্ব বিচার করো।

২। ‘রথের রশি’ নাটিকায় নারী চরিত্রগুলির ভূমিকা নির্দেশ করো।

৩। ‘রথের রশি’ নাটকে সন্ন্যাসী ও কবি কাহিনীর গতি নিয়ন্ত্রণ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যানে কতটা ভূমিকা নিয়েছে—বিচার করো।

৪। ‘রথের রশি’ নাটকটিতে নারী চরিত্রগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ—মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

৪.১.৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। ‘রবীন্দ্র-নাট্যপ্রবাহ’ — প্রমথনাথ বিশী

২। রবীন্দ্র নাট্য পরিত্র(মা — অশোক সেন।

৩। রবীন্দ্রনাট্যপরিত্র(মা — উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

৪। কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক — শঙ্খ ঘোষ।

৫। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব নাটক — কনক বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬। রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাটক — মঞ্জুশ্রী চৌধুরী।

৭। রবীন্দ্রনাট্য সমী(া ঃ রূপক-সাংকেতিক — দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

৮। রবীন্দ্রনাট্যকলাপ — ত(ণ মুখোপাধ্যায়।

৯। বাংলা নাটকের ইতিহাস — অজিত কুমার ঘোষ।

১০। Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist by Edward Thompson.

————————

পর্যায়গ্রন্থ - ২

একক - ৫

গণনাট্যের শর্ত ও দেবীগর্জন

বিন্যাসত্র(ম :

৪.২.৫.১ : বাংলা নাট্যসাহিত্য ও বিজন ভট্টাচার্য

৪.২.৫.২ : বাংলা নাট্যসাহিত্যে ও নাট্যাভিনয়ে বিজন ভট্টাচার্যের অভিনবত্ব

৪.২.৫.৩ : গণনাট্যের উদ্ভব-বিকাশ : গণনাট্যের শর্ত

৪.২.৫.৪ : 'দেবীগর্জন' কি গণনাট্য?

৪.২.৫.৫ : আদর্শ প্র্নোবলী

৪.২.৫.১ : বাংলা নাট্যসাহিত্য ও বিজন ভট্টাচার্য

অবিভত্ত(বাংলাদেশ থেকে স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের ষাটের দশকের খাদ্য আন্দোলন এবং প্রথম যুত্ত(ফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বাংলা নাটক ও নাট্যপ্রযোজনার (ে ত্রে পঞ্চাশের মন্বন্তর, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে অবিশ্বাস, স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে অবিভত্ত(বাংলার বিভত্তি(করণ, প্রবল উদ্বাস্তুস্রোত, ভারতবর্ষে জমিদার-আইন চালুর পর নবজাত জোতদার-মহাজনদের শোষণ, নাট্যকারদের প্রবলভাবে নাড়া দেয়।

বিশ শতকের চল্লিশের দশকের আগে পর্যন্ত, বাঙালি নাট্যকাররা যে বিষয়গুলি নিয়ে নাটক লিখছিলেন, চল্লিশের দশকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠার পর থেকে তার আমূল পরিবর্তন ঘটে। স্বভাবতই আঙ্গিকের (ে ত্রেও গু(ত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে যায়। একথা ঠিক দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ', মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ', রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন', 'অচলায়তন', 'রথের রশি', 'রত্ত(করবী', দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার পতন' ও ীরোদপ্রসাদের 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে কৃষক-আন্দোলন, ধর্মীয় মৌলবাদ, শ্রেণীশোষণ, জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িক বিভাজন এবং স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগের প্রসঙ্গ এসেছিল এবং গণনাট্যকার ও গণনাট্যের শিল্পীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে তা মনেও রেখেছিলেন। তবু গণনাট্য সংঘ তার বিভিন্ন সম্মেলনে যে সব প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল তার উপর দাঁড়িয়েই বিজন-তুলসী-সলিল সেনরা গণমুখী নাটক রচনা করেছিলেন। কেউ কেউ যদিও বলেন, পঞ্চাশের দশকের শু(থেকেই গণনাট্যের উপর স্বাধীন দেশের সরকারের প্রত্য(- পরো(আত্র(মণের ফলে অন্য অনেকের মতো গণনাট্যের অন্যতম স্থপতি বিজন ভট্টাচার্যও গণনাট্যের আওতা ছেড়ে নতুন থিয়েটার গড়েছিলেন কিন্তু আমরা মনে করি আমৃত্যু রচিত তাঁর নাটকে গণনাট্যের আদর্শ ও ল(্যই অনুসৃত হয়েছে।

কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে কলকাতা এবং গ্রাম বাংলার শ্রমিক-কৃষকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যেভাবে নাট্যচরিত্র সৃষ্টিতে, সংলাপ যোজনায়, সঙ্গীত প্রয়োগে তাঁকে সাহায্য করেছে, তাঁর পূর্বে আর কোনো বাঙালী নাট্যকারকে তা করেনি। আজন্ম পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় কথা বললেও পশ্চিমবঙ্গের নানা আঞ্চলিক উপভাষা তাঁর নাটকে উঠে এসেছে তা বিস্ময়কর। এ কথা ঠিক, মূলত দীনবন্ধুর নাটক 'নীলদর্পণ'-ই বাংলায় প্রথম কৃষক-জীবন নির্ভর নাটক এবং সে কারণেই গণনাট্যকারদের কাছে

দিকনির্দেশক। তবে নীলদর্পণে টুকরো টুকরো প্রতিবাদের ছবি তোরাপ ও নবীনমাধবের মধ্যে পাওয়া গেলেও বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' ও 'দেবীগর্জনে' সংঘবদ্ধ কৃষকের প্রতিবাদ প্রথম পাওয়া যায়। বিজন ভট্টাচার্যের জীবনও নাটকীয়তায় পূর্ণ। ফরিদপুরের মায়া কাটিয়ে ১৯৩০-এ কলকাতার কলেজে পড়াশুনো। ঐ সময়ই ছাত্র ফেডারেশনের সত্রি(য় কর্মী। ১৯৩৮-এ আনন্দবাজারে সাংবাদিক হিসেবে কাজ শু(। ১৯৪২-এ কমিউনিস্ট নেতা মুজফফর আমেদের প্রেরণায় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ পান। ঐ বছরই তাঁর প্রথম একাঙ্ক - 'আগুন' ছাপা হয়। 'অরণি' পত্রিকায় তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাটক 'নবান্ন' ধারাবাহিক বার হয়ে ১৯৪৪-এ গ্রন্থাকারে বার হয়। ঐ বছরই আনন্দবাজারের চাকরি ছেড়ে কমিউনিস্ট পার্টির হোলটাইমার হন।

বিচিত্র জীবন বিজন ভট্টাচার্যের। ১৯৪৮-এ গণনাট্য সংঘের সংস্রব ত্যাগ এবং ১৯৫০-এ 'ক্যালকাটা থিয়েটারে'র প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা।

১৯৫০-এ কলঙ্ক নাটক লিখলেন এবং পরের বছরই নেতাজী সুভাষ ইনস্‌টিট্যুট-এ তার প্রযোজনা করলেন। এই নাটকটিই পরে, অনেক পরিবর্তন নিয়ে, 'দেবীগর্জন' নাটকের রূপ পায়। 'দেবীগর্জন' নাটকের শেষ দৃশ্যে তাঁর চলচ্চিত্র-অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে।

১৯৫২-তে জীবিকার জন্য বিজন বোম্বাই পাড়ি দেন এবং 'নাগিন' ছায়াছবির Script রচনা করেন। ১৯৬৯-এ ঋত্বিক ঘটকের 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'(১৯৬০-এ 'মেঘে ঢাকা তারা'য়, ১৯৬১ তে 'কোমল গান্ধার', ১৯৬৫-তে 'সুবর্ণরেখা'য় অভিনয় করে সিনেমা-অভিনয়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পান।

ল(ণীয় সিনেমার পাশাপাশি তাঁর নাট্যচর্চা ও নাট্যাভিনয় ধারাবাহিক চলছিল। আমরা তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাট্যতালিকা তুলে ধরেছি যাতে এই সমান্তরাল দুটি শিল্পধারায় তাঁর সাফল্য বোঝা যায়।

	নাটকের নাম	প্রথম অভিনয়	মঞ্চ	গ্রন্থপ্রকাশ
১	আগুন	মে, ১৯৪৩	নাট্যভারতী	অপ্রকাশিত
২	জবানবন্দী	৩ জানুয়ারি, ১৯৪৪	স্টার থিয়েটার	১৯৬২
৩	নবান্ন	২৪ অক্টোবর, ১৯৪৪	শ্রীরঙ্গম	১৯৪৪
৪	জীয়নকন্যা	১৯৪৭	রঙমহল	১৯৪৮
৫	মরাচাঁদ	১৯৫২	ই বি আর ইনস্টিটিউট	অপ্রকাশিত
৬	কলঙ্ক	১৯৫১	” ”	,,
৭	জননেতা	অনভিনীত		,,
৮	গোত্রান্তর	১৬ আগস্ট, ১৯৫৯	নিউ এম্পায়ার	১৯৫৯
৯	মরাচাঁদ (পূর্ণাঙ্গ)	৩১ মার্চ, ১৯৬১	” ”	১৯৬৮
১০	ছায়াপথ	১১ অক্টোবর, ১৯৬১	মিনার্ভা থিয়েটার	১৯৬২
১১	মাষ্টারমশাই	১৯৬১	পার্কসার্কাস রবীন্দ্র-শতবর্ষ মঞ্চ	অপ্রকাশিত
১২	জতুগৃহ	অনভিনীত		
১৩	দেবীগর্জন	২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬	ওয়েলিংটন স্কোয়ার	১৯৬৯

নাটকের নাম	প্রথম অভিনয়	মঞ্চ	গ্রন্থপ্রকাশ
১৪ কৃষ(প(	১২ জানুয়ারি, ১৯৭৫	রবীন্দ্র সদন	অপ্রকাশিত
১৫ ধর্মগোলা	১৯৬৭		”
১৬ সাগ্নিক	অনভিনীত		”
১৭ গর্ভবতী জননী	মে, ১৯৬৯	মুক্ত(াঙ্গন	১৯৭১
১৮ স্বর্ণকুম্ভ	অনভিনীত		অপ্রকাশিত
১৯ আজ বসন্ত	১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২	আকাদেমি	”
২০ লাস ঘুইর‍্যা যাউক	১৯৭০		”
২১ সোনার বাংলা	১৯৭১	ইডেন গার্ডেন	”
২২ গুপ্তধন	অনভিনীত		”
২৩ চলো সাগরে	৩০ মার্চ, ১৯৭৭	তপন থিয়েটার	১৯৭২
২৪ চুল্লী	অনভিনীত		অপ্রকাশিত
২৫ হাঁসখালির হাঁস	”		

‘দেবীগর্জনে’র ক্যালকাটা থিয়েটারের প্রথম অভিনয় ১৯৬৬-র ২১ ফেব্রুয়ারি সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার বা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। বিজন ভট্টাচার্যের নির্দেশনা, সুরযোজনা এবং প্রভঞ্জন চরিত্র অভিনয়ে প্রথমদিনই সাফল্য আসে। তিনবছর পরে রবীন্দ্র লাইব্রেরী নাটকটি গ্রন্থাকারে বার করে।

৪.২.৫.২ : বাংলা নাট্যসাহিত্যে ও নাট্যাভিনয়ে বিজন ভট্টাচার্যের অভিনবত্ব

ক- তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, কলকাতার সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে যদি গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে যুক্ত(করা না যায় তাহলে প্রগতি আন্দোলন পূর্ণতা পায় না। কিন্তু গণনাট্যের সঙ্গে সম্পর্কছেদের ফলে তাঁর উদ্যোগ মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত হয়েছে। ‘কবচকুণ্ডল’ নাট্যদলের প্রতিষ্ঠা (১৯৭০) এবং ‘লাস ঘুইর‍্যা যাউক’, ‘চলো সাগরে’, এবং ‘হাঁসখালির হাঁস’ - এ তাঁর ল(্যচ্যুতি ঘটেছে। তবু সামগ্রিকতার বিচারে তিনি প্রগতি নাট্যকার হিসেবে প্রথম সারির নাট্যকার। উৎপল দত্তের নাট্যধারাতেও একদা এই ত্রুটি ঘটলেও বিজনের মত তিনিও প্রবাদপ্রতিম প্রগতিশীল নাট্যকার ও অভিনেতা।

খ - বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যশৈলীও একান্তই তাঁর নিজস্ব। ‘কলঙ্ক’ নাটকে ব্রিটিশ ও আমেরিকান সৈন্যদল সাঁওতাল কন্যাকে যে (্বেতসন্তান উপহার দেয় তার উপস্থাপনা বিচিত্র। ‘দেবীগর্জনে’ রত্নার উপর প্রভঞ্জনের ধর্ষণের দৃশ্য, প্রভঞ্জন ও ত্রিভূবনের দাবা খেলার দৃশ্য এবং নাট্যশেষে মাতৃকাশক্তি(আবির্ভাবের ছায়াদৃশ্য অসাধারণ। ‘স্বর্ণকুম্ভ’ নাটকে সংকেতের ব্যবহার।

গ - নাটকে লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, লোকত্র(ীড়া ও লোকাচারের চমৎকার প্রয়োগ দেখি ‘দেবীগর্জনে’। বিজন নিজে গান লিখেছেন, সুর দিয়েছেন এবং গেয়েছেন। ‘কৃষ(প(’ নাটকে চর্যাপদের একটি গান তুলে ধরেছেন। ‘জীয়নকন্যা’য় এনেছেন দাঙ্গাবিরোধী গান। দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ তাঁর নাট্যসঙ্গীতের প্রাণ।

ঘ - 'নবান্ন' থেকে 'দেবীগর্জনে' পৌঁছতে নাট্যকারকে অনেকটা পথ পার হতে হয়েছে। দুটোই কৃষক জীবনের মর্মবাণী। ফলে দুটো নাটকের মধ্যে তুলনা অবশ্যম্ভাবী। যদিও 'নবান্ন' স্বাধীনতার পূর্বমুহূর্তে এবং 'দেবীগর্জন' স্বাধীনতার দু-দশক পরে লেখা, কিন্তু শাসক বদল হলেও শোষণের অবসান হয়নি। তবে এই কাল পরিবর্তনে কৃষকের প্রতিরোধের শক্তি(বেড়েছে।

গণনাট্যের কোনও নাটকেই ব্যক্তি(চরিত্র শ্রেণীসংগ্রামের পূর্ণ নেতৃত্ব দেয় না। নাট্যপ্-টের বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রেণীনেতৃত্ব গড়ে ওঠে। হয়তো তার সামনের সারিতে দু-একটি বিকশিত চরিত্র এগিয়ে আসতে পারে, যেমন 'নবান্ন'-তে অগ্রণী চরিত্র, প্রতিবাদী চরিত্র নিরঞ্জন, কুঞ্জ, রাধিকা। প্রমাণ, হা(-কালীধনের বি(দ্ধে নিরঞ্জন প্রত্য(ভাবে দাঁড়িয়েছিল। কুঞ্জ সংসারের সকলের প্রতি যেমন কর্তব্যপরায়ণ তেমনি দয়ালকে সে সংসারের শেষ সম্বল দু সের চাল নির্দ্বিধায় তুলে দেয়। আবার কলকাতার ফুটপাথে আশ্রয় নেওয়া খুড়ো, রাধিকা, পঞ্চাননী, বিনোদিনী — সবাইকে সে আগলে রাখে। তাই তার প্রতিবাদী শক্তি(কে নাট্যশেষে নেতৃত্বের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল।

নিরঞ্জন এবং কুঞ্জ ব্যক্তি(গত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে শ্রেণী সংগ্রামের শি(া প্রাথমিক ভাবে হলেও, লাভ করেছিল। কিন্তু সেই পাঠ দয়াল কোথা থেকে পাবে ? কাজেই প্রথমাংশের নিষ্(য় চরিত্র দ্বিতীয়াংশে যখন হঠাৎ আমিনপুর গ্রামের শোষিত মানুষের নেতা বনে গেল, তখন ঘটনাটা নাটকীয় হলেও অবিá(াস্য। সে এখন হিন্দু-মুসলমানের সৌভ্রাতৃত্বের রূপকার, পরবর্তীকালে 'দেবীগর্জনে' যে ধর্মগোলার পরিচয় পাই, 'নবান্ন'-তে বিজনবাবু তার সূচনা দেখিয়েছেন দয়ালের নেতৃত্বে ধর্মগোলায় কৃষকের ধান মজুতের দৃশ্যে। সর্বোপরি একদিকে নবান্ন উৎসবের পরিকল্পনা, অন্যদিকে নাট্যশেষে প্রতিরোধের অবিনাশী শপথ — এ দুয়েরই দাবিদার হল দয়াল। নাটকের ঘটনার কার্য-কারণ সূত্র, নাট্যচরিত্রের গতিময়তা — কোনও দিক থেকেই কিন্তু নাট্যকার দয়াল চরিত্রকে কেন্দ্রে এনে সফল হয়নি। তাই গণনাট্যে থেকেও গণনাট্যীয় গোষ্ঠীনায়কের দেখা মিলল না 'নবান্ন'-তে, অথচ 'দেবীগর্জন' লেখার সময় বিজন গণনাট্যের আওতায় না থেকেও গণনাট্যের আইনানুগ শ্রেণীনায়কের সফল রূপ দিলেন। মংলা প্রথম থেকেই নিরঞ্জনের মতো জোতদার মজুতদারের বি(দ্ধে লড়েছে। তার কয়েকটি উক্তি(প্রমাণ করে অন্যান্য কৃষক — খগে(র, লক্ষ্মণ, ভাল্লু, গুণাই-এর চেয়েও পরিণত বুদ্ধির অধিকারী ঃ

১. মংলা ।। (গর্জে ওঠে) বেআইনি সুদ দিব নাই। নামাই দাও পাথর, বন্ধ করি দাও মাপজোপ!

২. মংলা ।। কে রাজা, কার রাজ্য?

৩. মংলা ।। খুলি দাও ধর্মগোলা।

মংলার হাতে টাঙি ধরিয়ে দেয় ঘুগর্যা। সে প্রথম যোদ্ধা। কিন্তু নাট্যকার দেখালেন ঃ

অ. প্রভঞ্জনের পালাবার সুযোগ নেই কেননা বল্লম হাতে সবদিকে জনতার কঠিন পাহারা

আ. জনতা ধর্মগোলা অবরোধ করে

ই. মংলার সঙ্গে আশেপাশের কৃষকদের 'সমস্ত অস্ত্রগুলিও ঝিলিক দিয়ে ওঠে শত্রুকে ল(করে।'

অর্থাৎ 'নবান্ন'-র শেষের জোর প্রতিরোধের শপথ ছিল আর 'দেবীগর্জনে' প্রতিরোধ কার্যকর হ'ল। প্রথাসিদ্ধ এক নায়কের পরিবর্তে সম্মিলিত গণশক্তি(র প্রয়োজনীয়তার তত্ত্বপ্রতিষ্ঠাই বিজন ভট্টাচার্যের অভিনবত্ব। এ নাটক নায়কহীন (No Hero), কৃষক সমাজ এখানে সম্মিলিত শ্রেণী নায়ক।

৪.২.৫.৩ : গণনাট্যের উদ্ভব-বিকাশ : গণনাট্যের শর্ত

১৮৫২ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত বাংলা নাটকে সংস্কৃত-গ্রীক-ফারসী-ইংরাজী প্রভৃতি দেশ বিদেশের নাটকের অজস্র অনুবাদ হয়েছে, পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডি, কমেডি-ফার্সের আঙ্গিক ব্যবহৃত হয়েছে, নাট্যাভিনয়ে নতুন নতুন আঙ্গিকের প্রয়োগও হয়েছে কিন্তু নিপীড়িত জনতার কণ্ঠস্বর পুরোপুরি কোনো নাটকে ছিল না। কোনো নাট্যকারই জনগণের সংগ্রামের সাথী হতে পারেননি।

গণনাট্যের নাট্যকারদের কলমে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত মানুষের চরিত্র যে জীবন্ত হতে পারল তার পিছনে তাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সাহায্য করেছিল। ঐ সময়কালের ইতিহাস না জানলে গণনাট্যগুলির সাফল্যের কারণ বোঝা যাবে না।

বিশের শতকের তিরিশের দশকে সরকারের চরম পরাজয়ের ছবিটি দৃশ্যগ্রাহ্য হচ্ছিল। ঐ সময় কেবল নাট্যনিয়ন্ত্রণই নয়, সর্বরকমে জনতার ইচ্ছা-নিয়ন্ত্রণই শাসকের ল(্য হয়ে উঠেছিল। ১৯৩৬-এ ব্রুসলস্-এ অনুষ্ঠিত 'Women's International League for Peace and Freedom'-এ ভারতের প্রগতিশীল লেখকেরা যে মন্তব্য প্রেরণ করেন তাতেই সেই সময়ের নিয়ন্ত্রণ-চিত্রটি পরিস্ফু ট ঃ

> 'ভারতের নাগরিক অধিকার হইতে যে সাংঘাতিকভাবে সর্বসাধারণকে বঞ্চিত করা হইয়াছে, উহা কেবল রাজনীতির দিক হইতে অনর্থপাত নহে, কিন্তু উহা দ্বারা সংস্কৃতি ও তাহার বিস্তার চেষ্টাকে খোলাখুলিভাবে আক্র(মণ করা হইতেছে। নানাপ্রকার পুস্তকের মধ্যে ... ওয়েব দম্পতির [Sidney and Beatrice webb; Soviet Communism] পুস্তক নিষিদ্ধ হইয়াছে(এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাশিয়ার চিঠি'র ইংরেজী অনুবাদও নিষিদ্ধ হইয়াছে।' অর্থাৎ নাটকের পাশাপাশি অন্যান্য শ্রেণীর রচনার উপরও সরকারের দৃষ্টি ঘুরে ফিরছিল। তবে নাটককে মূল্য দিতে হয়েছিল সবচেয়ে বেশি।

এই তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে সারা বিশ্বের রাজনীতিতে ব্যাপক ভাঙাগড়ার খেলা চলে যার পরিণতি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫)। এই ঢেউ ভারতেও আসে। এই সব রাজনৈতিক ঘূর্ণীর মাঝে বসে নাট্যকাররাও তাঁদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রতিষ্ঠিত হল 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ' যার প্রকাশ্য সম্মেলন প্রথম হল ১৯৩৬ সালে ইস্টারের ছুটিতে, মুন্‌সী প্রেমচন্দ্রের সভাপতিত্বে। এরই সূত্র ধরে ১৯৪০ সালে বাঙ্গালোরে ও বোম্বাইয়ে 'জননাট্য সংঘ'-এর উৎপত্তি। প্রগতি লেখক সংঘ উঠে গিয়ে ১৯৪২-এ বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হল 'ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। এরই একটি নাম, গণনাট্য সংঘ। এর পাশাপাশি, ১৯৪৬-এ চলা শু(করল 'ক্র(ান্তি শিল্পী সংঘ'। বাংলাদেশে পরবর্তীকালে এমন বহু নাট্যকার, অভিনেতা এবং গায়কের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে যাঁদের হাতেখড়ি গণনাট্যের পরিবেশে। গণনাট্যের মধ্যেই পূর্ববর্তী যুগের নাট্যকারদের বিদ্রোহী মনোভাব এবং নতুন সৃষ্টির শপথ দানা বাঁধল।

এখানে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ইতিহাসকার ডঃ দর্শন চৌধুরীর একটি গু(ত্বপূর্ণ মন্তব্য আমরা উদ্ধার করছি ঃ

> "গণনাট্য সংঘই পেরেছিল, তার কার্যক্র(মের মধ্য দিয়ে সারাদেশের চিন্তাশীল, প্রগতিবাদী মানুষগুলিকে সংস্কৃতি জগতের পতাকাতলে সমবেত করতে।"

বিজন ভট্টাচার্যের আদর্শ হল রোমা রোঁলার 'The Peoples Theatre' গ্রন্থ এবং গণনাট্য সঙ্ঘের প্রথম প্রকাশিত বুলেটিনের ঘোষণা। তার ভাষ্য মেনেই লিখলেন কৃষকের যন্ত্রণানির্ভর নাটক 'জবানবন্দী'

(১৯৪৩), 'নবান্ন' (১৯৪৩), বেদে সমাজনির্ভর 'জীয়নকন্যা', শ্রমিকশোষণ নির্ভর নাটক 'অবরোধ' (১৯৪৭), আদিবাসী সমাজের দুর্দশা নিয়ে 'কলঙ্ক' (১৯৪৬) একাঙ্ক এবং সাম্যবাদী দর্শনে বি()াসী এক গণনায়ককে নিয়ে 'মরাচাঁদ' একাঙ্ক।

এইভাবে যে সংঘ গড়ে ওঠে, স্বাধীনতার অব্যবহিত পর ১৯৪৮-এ কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয় এবং আগেই ১৯৪৭-এ গণনাট্যের রিহার্সাল (ম আত্র(ান্ত হওয়ার ঘৃণ্য ঘটনা তীব্রতর হল ১৯৪৮ থেকে। গণনাট্যের শিল্পীরা খুনও হলেন। সে সময় প্রতিত্রি(য়াশীলদের আত্র(মণের ভয়ে কিংবা উচ্চাশার কারণে সংঘ ত্যাগ করলেন তাঁদের মধ্যে শম্ভু মিত্র, রবিশঙ্কর, তৃপ্তি মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, মহম্মদ ইসমাইল এবং বিজন ভট্টাচার্য অন্যতম। কাজেই পরবর্তীতে লেখা 'দেবীগর্জন' গণনাট্য কিনা এ নিয়ে বিতর্ক তৈরী হয়েছে। এ সম্পর্কে আমাদের অভিমত, 'দেবীগর্জন' 'গণনাট্য' না 'নবনাট্য' এ নিয়ে বিতর্ক অর্থহীন। গণনাট্যের পতাকাতলে নাট্যজীবন-সংগীতজীবন শু(করার পর, মোটামুটি ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ থেকেই কেউ কেউ গণনাট্য সংঘ ছেড়ে যান। বিজন ভট্টাচার্য সে(ত্রে একা নন। শম্ভু মিত্রও তাঁদের একজন। সংঘ ত্যাগের নানা কারণ ছিল। প্রথমত, স্বাধীন সরকারের গণনাট্য-বিরোধী ভূমিকা(দ্বিতীয়ত, সংঘের আওতায় জনপ্রসিদ্ধি ঘটায় ব্যত্তি(গত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ঝোঁক(তৃতীয়ত, গণনাট্যের নাট্যকর্মীদের আদর্শ র(ার উদ্দেশ্যে, কিছু নির্দেশিকা মানার বাধ্যবাধকতা। বিজন ভট্টাচার্য মনে করেছিলেন, কমিউনিস্ট অনুশাসন গ্রহণীয়, কিন্তু শিল্পসংস্কৃতির প্র()ে শিল্পীর উপর পার্টির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কাম্য নয়। কিন্তু তাই বলে 'সৎনাট্য', 'নবনাট্য' ইত্যাদি নামের আড়ালে বামপন্থার বি(দ্ধে যাঁরা নেমেছিলেন, বিজন ভট্টাচার্য আজীবন তাঁদের থেকে দূরে ছিলেন। পঞ্চাশ-ষাট-সত্তরের দশকে রচিত তাঁর নাটকগুলি কোনোটাই গণনাট্যের আদর্শবিরোধী নয়। গণনাটকের শর্তগুলি হল — ১. নাটকে শ্রমিক-কৃষক ও মধ্যবিত্তদের সংগ্রাম প্রাধান্য পাবে। ২. নাট্যকারকে অবশ্যই রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুত্ত(হতে হবে। ৩. গণসঙ্গীত, লোকনৃত্য ও লোকভাষার উপর তাঁর দ(তা থাকা চাই। ৪. শোষকশ্রেণীর প্রতিনিধি চরিত্রদের শোষণের রূপটি মার্কসীয় দর্শনে ব্যাখ্যাত হবে। ৫. গণনাট্যকারকে ব্যত্তি(নায়কের বদলে শ্রেণীনায়ক সৃষ্টিতে উদ্যোগ নিতে হবে।

৪.২.৫.৪ ঃ 'দেবীগর্জন' কি গণনাট্য ?

'দেবীগর্জন' গণনাটক। এ নাটকের মূল প্র()ে — 'কে রাজা, কার রাজ্য?' নাটকের ঘটনাস্থল স্বাধীনতা-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের অজস্র গ্রামের সমতুল, বীরভূমের একটি গ্রাম। স্বাধীনতার পর দেশের সংবিধানে সব নাগরিকদের সমান মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। বহু শতাব্দীর জমিদারি ব্যবস্থার অভিশাপ আইন করে বন্ধ করা হয়েছে। অথচ ১৯৫৯-এর রাজ্যজোড়া খাদ্য আন্দোলনে অংশ নিয়ে কত মানুষ প্রাণ দিল। ১৯৬২-তে ভারতর(া আইন চালু এবং রাতারাতি বহু জননেতাকে গ্রেপ্তার করার ঘটনা পশ্চিমবঙ্গবাসী দেখল। গ্রামের মানুষ এও দেখল জমিদারের জায়গায় নতুন জোতদারকে। এরা মহাজন, এরাই অবৈধ মজুতদার, এরাই কালোবাজারি। এরাই ১৯৬৬-তে আবার খাদ্য সংকটের সৃষ্টি করে, যার বি(দ্ধে গ্রাম-নগরের মরিয়া জনগণ প্রত্য(সংগ্রামে নামে। সেই ১৯৬৬-তেই গণনাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য লেখেন গণনাটক 'দেবীগর্জন'। সৎনাট্য বা নবনাট্যের ভাববাদ, শৈল্পিক কলাকৌশল অথবা সমঝোতার মনোভাব এ নাটকে নেই। সাবেকী পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বদলে নতুন পঞ্চায়েতের প((সওয়াল করেছেন বিজনবাবু। শ্রেণীবৈষম্যের গণনাট্যসুলভ ব্যাখ্যা এ নাটকে সুস্পষ্ট। একশ্রেণী অত্যাচারী, প্রভঞ্জন-ত্রিভুবনরা(

আর এক শ্রেণী অত্যাচারিত, সর্দার-মংলা-মনা-রত্না-সঞ্চারিয়ারা। গণনাট্যকাররা জানেন, শ্রেণীবিভক্ত(সমাজে শ্রেণীসংগ্রাম অনিবার্য। 'দেবীগর্জন' সেই শ্রেণীসংগ্রামের নাটক এবং অবশ্যই গণনাট্য।

এ সম্পর্কে পরবর্তী আলোচনার মধ্যেও 'দেবীগর্জন'কে গণনাট্য বলার যুক্তি(আরও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৪.২.৫.৫ : আদর্শ প্র(্নাবলী

১। 'দেবীগর্জন' নাটকে গণনাট্যের আদর্শ ও লক্ষণগুলি উপস্থিত কিনা?

২। 'দেবীগর্জন' নাটকে গান ও সংলাপ সৃষ্টিতে নাট্যকারের কৃতিত্ব।

৩। 'দেবীগর্জন' নাটকে গণনাট্যিক ঐতিহ্য কতটা অনুসৃত হয়েছে, আলোচনা করো।

৪। 'দেবীগর্জন' নাটকের ভাষা-সংলাপ কতটা নাট্যোপযোগী? দৃষ্টান্তসহ বিশ্লেষণ করো।

৫। 'দেবীগর্জন' নাটকে গণনাট্য ও লোকনাট্য উভয় ধারার বৈশিষ্ট্য বর্তমান—বিচার করো।

————————

পর্যায়গ্রন্থ - ২

একক - ৬

দেবীগর্জন ঙ্ম প্লট বিন্যাস

বিন্যাসত্র(ম :

৪.২.৬.১ : 'কলঙ্ক' থেকে 'দেবীগর্জন'

৪.২.৬.২ : 'দেবীগর্জন' : প¬ট বিন্যাস

৪.২.৬.৩ : আদর্শ প্র(্নাবলী

৪.২.৬.১ : 'কলঙ্ক' থেকে 'দেবীগর্জন'

১৯৬৬ সালে রচিত ও বিজন ভট্টাচার্যেরই প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা থিয়েটারের উদ্যোগে অভিনীত 'দেবীগর্জন' নাটকটি নাট্যকারের দু-দশকের উপর নাট্যচর্চার পরিণত ফসল। চল্লিশের দশকে তাঁরই লেখা নাটিকা 'কলঙ্ক' অনেকটাই অনুসৃত হয়েছে দেবীগর্জনে। দুটি নাটকেই মোড়ল বা সর্দার, তার স্ত্রী গিরি, পুত্র মংলা, পুত্রবধূ রত্নাকে আমরা দেখেছি। কৃষক পরিবারগুলি সাঁওতাল ও বাউরি সম্প্রদায়ের।

পরিবর্তন ঘটেছে দুটি দিক থেকে — এক. বাঁকুড়ার গ্রাম স্থানান্তরিত হয়েছে বীরভূমের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। দুই. ব্রিটিশ শাসনের শেষ মুহূর্তে লেখা নাটকে ছিল গোরা সৈন্য, স্বাধীনতার বিশ বছর পরে লেখা নাটকে তারা স্বভাবতই নেই। তাছাড়া 'কলঙ্ক' ছোট নাটক, 'দেবীগর্জন' পূর্ণাঙ্গ নাটক।

'কলঙ্ক' নাটকে সাঁওতাল আদিবাসী পরিবারের নববধূ রত্নার উপর গোরা সৈন্যের ধর্ষণের ঘটনা আছে। তার ফলশ্রুতিতে সদ্যোজাত শিশু সন্তানের হত্যার প্রস্তাবও হয়। কিন্তু বৃদ্ধ মোড়ল তাতে বাধা দেয় একারণে যে তাহলে গোরা সৈন্যদের বি(দ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধের সুযোগ থাকবে না। কালো আদিবাসীর ঘরে সাদা চামড়ার সন্তান দেখে রত্নার প্রতি স্বামী মংলার (োভ তীব্র হলেও তার পিতা প্রকৃত পদ(েপ নেওয়ায়, সন্তানকে ঘরে স্থান দেওয়ায় গণনাট্যের প্রতিরোধী ভূমিকা স্পষ্ট হয়।

'দেবীগর্জন'-এ 'কলঙ্ক' নাটকের চরিত্রগুলির নামের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি তবে নাট্যদৃশ্যের ব্যাপ্তি ঘটেছে, নতুন চরিত্র এসেছে। 'কলঙ্ক'-র ঘটনাস্থল বাঁকুড়া 'দেবীগর্জন'-এ স্থানান্তরিত হয়ে বীরভূম। কিন্তু দুটি নাটকেই আদিবাসী ও সাঁওতাল চাষীদের কাহিনী।

'কলঙ্ক' নাটকের শেষে গোরা সৈন্যদের বি(দ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের শপথটুকু ছিল। কিন্তু 'দেবীগর্জন'-এর শেষে অত্যাচারী জোতদার প্রভঞ্জনের হত্যাদৃশ্য এঁকে নাট্যকার আরও পরিণত সমাপ্তি আনতে পেরেছেন।

'কলঙ্ক'-তে রত্নার উপর ধর্ষণ ও সন্তান জন্মের বিষয়টি 'দেবীগর্জন'-এ পাল্টেছে। প্রথমত রত্নার প্রতি লালসা থেকে প্রভঞ্জনকে দূরে রাখতে ত্রিভুবন চেষ্টা করে(বলে — 'গ্রামের বউ-বিটি-মেয়ের সম্ভ্রম রাখি কাজ করিবারে হয়।' তবু রত্না নি(দ্দিষ্ট। বাঘরূপী প্রভঞ্জনের গ্রাস থেকে রত্নাকে উদ্ধারের শপথ করে মংলা জননীর কাছে। দ্বিতীয়তঃ প্রভঞ্জন রত্নাকে নানা প্রলোভন দেখিয়েও বশ করতে ব্যর্থ হয়। মদ্যপ অবস্থায় জন্তুর মত ধর্ষণের চেষ্টা করে। 'কলঙ্ক'-র রত্নার মতই 'দেবীগর্জন'-এর রত্না সহজে হারতে চায় না। নাট্যাঙ্গিকের বদলে উপন্যাসের মত সেই প্রতিরোধের ছবি আঁকেন নাট্যকার ঃ

'প্রাণভয়ে রত্না তখন প্রভঞ্জনের মুষ্টিবদ্ধ হাতে দাঁত বসিয়ে দেয় নাগিনীর মতো। শিকার ছেড়ে দিয়ে আহত জন্তুর মতো আর্তনাদ করে ওঠে প্রভঞ্জন। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার ছুটে যায় রত্নার দিকে (িপ্ত হয়ে। কঠিন আকর্ষণ করে দুহাত বেড়ে রত্নাকে।'

[রত্না অজ্ঞান হলেও 'দেবীগর্জন'-এর রত্নাকে 'কলঙ্ক'-এর রত্নার মত ধর্ষিতা হতে দেননি নাট্যকার] —

মদের গ্-াসে চুমুক দিয়ে চাঙা হয়ে নেয় প্রভঞ্জন। তারপর জানোয়ারের মতো রত্নার দিকে টলতে টলতে এগিয়ে যায়। ছিটকে সরে যায় রত্না। শঙ্কা ও আগুন দুটোই যুগোপৎ রত্নার চোখে জ্বলতে থাকে। প্রভঞ্জন এগিয়ে গিয়ে রত্নার কেশপাশ জাপটে ধরে। দৃঢ়মুঠ ছাড়িয়ে নিয়ে কোনোত্র(মে আত্মর(া করে রত্না। শিকার ছুটে গেলে বাঘ যেমন হিংস্র হয়ে ওঠে — প্রভঞ্জন (্াপদ-সঞ্চারে রত্নার অনুধাবন করে। বসন-ভূষণ বিশ্রস্ত হয়। রত্নার হাত ধরে মুচড়ে মুচড়ে আকর্ষণ করে প্রভঞ্জন রত্নাকে। প্রাণভয়ে রত্না তখন প্রভঞ্জনের মুষ্টিবদ্ধ হাতে দাঁত বসিয়ে দেয় নাগিনীর মতো। শিকার ছেড়ে দিয়ে আহত জন্তুর মতো আর্তনাদ করে ওঠে প্রভঞ্জন। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার ছুটে যায় রত্নার দিকে (িপ্ত হয়ে। কঠিন আকর্ষণ করে দুহাত বেড়ে রত্নাকে। লুটিয়ে পড়ে বরদেহ মাটিতে সংজ্ঞাহীন হয়ে। কিন্তু প্রভঞ্জনের ভ্রূ(প নেই। পাশব-লালসায় প্রভঞ্জন তখনও রত্নাকে দু-হাতে জাপটে তুলতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার অবচেতন মনের পাপবোধ এক মুহূর্তের জন্য শঙ্কার সৃষ্টি করে মনে। মহাকালের খাঁড়া লাফিয়ে ওঠে তার মাথার ওপর। প্রভঞ্জন স্পষ্ট দেখতে পায় (ধিরাক্ত(একখানি উদ্যত খাঁড়া। আঁৎকে ওঠে প্রভঞ্জন। ভীষণ ভয় পেয়ে আর্তনাদ করে ওঠে অনুচরদের উদ্দেশে। হাজির হয় রংকু, ভীমা। প্রভঞ্জনের নির্দেশমতো রত্নাকে তারা মুহূর্তের মধ্যে ভেতরে নিয়ে গিয়ে গুম করে রাখে।

[সুতরাং বলা যায় 'কলঙ্ক' এবং 'দেবীগর্জন'-এর মধ্যে সাদৃশ্য অপে(া বৈসাদৃশ্যই বেশি।]

৪.২.৬.২ : দেবীগর্জন : প্-ট বিন্যাস

গণনাট্যের আঙ্গিক-গঠন বা প্-ট নির্মাণ প্রচলিত নাট্যধারা থেকে যে আলাদা তার প্রমাণ 'দেবীগর্জন'-ও। পাঁচ অঙ্কের বদলে সমগ্র নাটকটি তিন অঙ্কের। দৃশ্যসংখ্যাও ঐতিহাসিক-পৌরাণিক নাটকের চেয়ে কম। যেমন এখানে প্রথম অঙ্কে পাঁচটি, দ্বিতীয় অঙ্কে চারটি এবং তৃতীয় অঙ্কে দুটি দৃশ্য। এই এগারোটি দৃশ্যেই আছে সংস্কৃত পঞ্চসন্ধি কিংবা অ্যারিস্টটলের প্-ট রচনার পাঁচটি ধাপের যোগ পরম্পরা।

প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য। বীরভূমের প্রত্যন্ত গ্রামের আদিবাসী সর্দার পরিবারের সমস্যার বর্তমান রূপ। **দ্বিতীয় দৃশ্যেই** শোষক প্রভঞ্জনের খামার বাড়িতে কর্জ শোধ করে কৃষকদের ধান নেবার প্রয়াস। স্বাধীনতার দু-দশক পরেও কী নির্মম পরিহাস, ওজনের বাটখারা কম পড়ায় মনা নামের এক ঋণী কৃষককে পাল্লায় চাপিয়ে, তার বুকের ওপর ওজন চাপানো হল। মনা-ধনারা এটা নীরবে মেনে নিলেও নাট্যকার মংলার কণ্ঠে প্রতিবাদী উক্তি(শোনালেন —

বেআইনি সুদ দিব নাই।

প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য। সংি(-ষ্ট দৃশ্যটি অনবদ্য, ব্যঞ্জনাময়। প্রভঞ্জন ও ত্রিভুবনের দাবা খেলার দৃশ্য। এ খেলা, খেলা নয়। আসলে গ্রামজীবনে নিপীড়িত জনগণের মধ্যে নতুন পঞ্চায়েত গড়ে তোলার যে আওয়াজ উঠছে, তাতে পুরোনো পঞ্চায়েতের মাতব্বররা বিচলিত। অবশ্য (মতা ও অর্থের দম্ভে অন্ধ

প্রভঞ্জন কোনও পরিবর্তনেই রাজি নয়, কিন্তু ত্রিভুবন শোষণের প(থেকেও, চাতুর্যের সঙ্গে এই সংকটের মোকাবিলা করতে চায়। দাবার রাজা-মন্ত্রি-গজ-বোড়ের চলাফেরার মধ্য দিয়ে ত্রিভুবন সেই নতুন যুদ্ধসজ্জার শি(া দিতে চেয়েছে প্রভঞ্জনকে। এই দৃশ্যটি গণনাট্যে নতুন আঙ্গিক পরিকল্পনা।

দৃশ্যটি শু(হচ্ছে এইভাবে —

[মিড-স্টেজ বরাবর টানা কালো সামনে আপ-স্টেজ-এর মাঝামাঝি একটা ছোট্ট ফরাস। বিদরি হুঁকোয় সটকা টানতে টানতে দাবা খেলছে প্রভঞ্জন। সর্দার ত্রিভুবনের সঙ্গে। পাশে পরিচারিকা। সতর্ক দু-তিনটি চাল। প্রভঞ্জনের ঘোড়া লাফিয়ে পড়ে ত্রিভুবনের গজের ওপর।]

প্রভঞ্জন ।। ই দিতেম!

ত্রিভুবন ।। হুঁশ কর।

প্রভঞ্জন ।। হঁ হঁ।

ত্রিভুবন ।। সমুঝ কর।

প্রভঞ্জন ।। হঁ হঁ, মারলম গজে, — চাল ঘুঁটি।

ত্রিভুবন ।। (সতর্ক করে) আবার কহি বুঝ কর।

প্রভঞ্জন ।। হঁ হঁ, ঠিকই আছে।

ত্রিভুবন ।। ঠিকই আছে, না? (ঘুঁটি খায়) তবে ই দেখ।

প্রভঞ্জন ।। অঁ হঁ হঁ হঁ — কীরকম কথা!

ত্রিভুবন ।। (হাসে) ই কথা।

প্রভঞ্জন ।। না না, দিতম নাই।

ত্রিভুবন ।। (ঠাট্টাচ্ছলে) কী খেলোয়াড়, দেখেন আপনারা।

প্রভঞ্জন ।। নজর করি নাই।

ত্রিভুবন ।। সেটাই তো তুমার নাই। অতিকম চার চারবার আমি তোমাকে হুঁশিয়ারি করেছি।

প্রভঞ্জন ।। আরে যাও কেনে!

ত্রিভুবন ।। নাও নাও, ঘুরতি নিলম চাল। কিন্তুক ইটা কোনো ত্রীড়া না, — ছেল্যাখেলা করছ তুমি। ঘুঁটি ফিরাও।

প্রভঞ্জন ।। (ঘুঁটি টানে) হঁ হঁ, ফিরবে ঠিকই, ঠিকই ফিরবে ঘুঁটি। কিন্তুক ফিরতি এসেই চলতে থাকবে ঘুঁটি বন্দুকের গুলিটার মতো ছত্রভঙ্গ করি শত্রুব্যূহ।

[চুপচাপ ঘুঁটি চালে তিনবার। চারবারের বার ঝাঁপিয়ে পড়ে ত্রিভুবন মন্ত্রী নিয়ে]

ত্রিভুবন ।। মার কিস্তি।

এই পর্যন্ত অভিজাত সমাজের দাবাখেলার মজার পরিচয় মেলে। কিন্তু তার পরই খেলার প্রতীকে শোষকের যুক্তি(বিহীন শক্তি(প্রদর্শন দেখিয়ে প্রভঞ্জনের মুর্খামি ও ত্রিভুবনের চাতুর্যের ছবি আঁকা হয়েছে —

প্রভঞ্জন ।। একই চাল?

ত্রিভুবন ।। একই চাল।

প্রভঞ্জন ।। একই চাল, না! — একই চাল! একই চাল যখন, তখন ই দেখ আমি গজটাক চালাইতম।

ত্রিভুবন ।। ঘুঁটিটাক টপকে?

প্রভঞ্জন ।। আলবাৎ টপকাবে গজ।

ত্রিভুবন ।। হাঁতিঠো তুমার বড় বুড়া হঁইয়েছে প্রভঞ্জন(— মন্ত্রীর মাথাঠো আমার অনেক উঁচা।

প্রভঞ্জন ।। পাও দিয়া মন্ত্রীর মাথাঠো দাবাই চলবে আমার হাঁতি শুণ্ডটা তুলি।

ত্রিভুবন ।। হঁ, সে এক দৃশ্য হবেক বটে। তবেই খেলাঠো জমবে তুমার ময়দানের মাঠে। দাবার ছকে হাঁতিঠোর তুমার হাত-পাও বাঁধা।

প্রভঞ্জন ।। (রাগে লাথি মেরে উল্টে দেয় দাবার ছক) ইটা কোনো ত্রীড়া না। ইটাক আমি বুলব ভাঁওতা মারছ তুমি আমাক, জুয়াচুরি করছ তুমি।

ত্রিভুবন ।। (ধমক দেয়) প্রভঞ্জন! ই রকম খেলাটা তুমার সবঠাঁই, সবখানে। এই তো দেখলম তুমার হাঁতির খেলাটা খোলানের ময়দানে। কর্জা ধানের সুদের দায়ে আধিয়ারের মস্তকটা ফাঁড়ি দিলে তুমি লাঠিবাজি করি। আধিয়ারের রক্তে(খোলানের মাঠি যদি না ভিজল তো কীসের দাপট তুমার! তারপর, চাল দিয়েই বেচাল তুমি, ঘুরতি নিলে তুমি সে চাল, — আমাক পাঠাইলা ঐ অতগুলান মারমুখী (খী আধিয়ারের সাথ সমঝোতা করতে।

প্রভঞ্জন ।। হঁঃ।

[জালের ওধারে প্রেতছায়ার মতো সর্দার এসে দাঁড়ায়]

ত্রিভুবন ।। ঝঙ্কার আর হুঙ্কার তুমার আমি অনেক শুনেছি। — তুমি ইখানেও অন্ধ, উখানেও অন্ধ। আর তুমার চোখে চোখ রেখে আজ আমিও হয় তো দৃষ্টিটা হারাতে বসেছি, — জানি না। —

প্রভঞ্জন ।। (পাল্টা ধমক দেয়) ত্রিভুবন!

ত্রিভুবন ।। (সর্দারের দিকে প্রভঞ্জনের দৃষ্টি ইঙ্গিতে আকর্ষণ করে সতর্ক করে ত্রিভুবন) রায়ত, — বুঝ করি গলাটো কাটিবার হয়।

ল(ণীয় ত্রিভুবন এই খেলার মধ্যে প্রভঞ্জনের যে একনায়কসুলভ ব্যবহার সে জন্য বারবার সতর্ক করেছে। যুগের পরিবর্তন, নতুন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ইত্যাদির কবলে মহাজন, জোতদারদের একচেটিয়া শোষণের সুযোগ যে দ্রুত কমছে, খেলার ফাঁকে ত্রিভুবন তা বোঝাতে চেয়ে ব্যর্থ। সে শোষক শ্রেণীর দাসত্ব করলেও পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী শোষণের পদ্ধতি বদল যে জ(রী এই সার কথাটি বুঝে সর্দারের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে, আর একবার প্রভঞ্জনকে সতর্ক করে মঞ্চ ছেড়ে যায়।

গণনাট্যে শি(া দাবা খেলার দৃশ্যে এইভাবে আছে — সামন্ততান্ত্রিক হাতির দিন শেষ হতে চলেছে, গণতান্ত্রিক মন্ত্রীর ভূমিকা গু(ত্ব পেতে চলেছে। বাংলা নাটকের ধারায় দাবাখেলার মধ্য দিয়ে শ্রেণীসংগ্রামের বিষয় মঞ্চস্থ করায় দৃশ্যটি অসম্ভব গু(ত্ব পেয়েছে।

চতুর্থ দৃশ্যটিতে গণনাট্য-সুলভ গ্রামীণ লোকায়ত আচার দৃশ্যমান। সম্ভাব্য সংগ্রামের মাঝে মংলা-রত্নার বিবাহ Comic রিলিফ দিচ্ছিল। গরিব গ্রামবাসীরা নাচে-গানে মেতে উঠেছিল। কিন্তু নাট্যকার এই পরিবেশের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন অকস্মাৎ মহাজন প্রভঞ্জনের চত্র(ান্ত সামনে এনে। এই সংকটময়তা আসলে নাটকের মধ্যে একাধিকবার প্রয়োগ করা হয়েছে।

দাবা খেলার দৃশ্যে ত্রিভুবন বলেছিল —

হাঁতিটো তুমার বড় বুড়া হঁইয়েছে প্রভঞ্জন(— মন্ত্রীর মাথাটো আমার অনেক উঁচা।

এই শি(া প্রভঞ্জনের মনে ধরেনি। সে ভেবেছিল, তার সামন্ততান্ত্রিক হাতি, নবীন গণতান্ত্রিক মন্ত্রীর মাথার ওপর পা দিয়ে, উঁচুতে শুঁড় তুলে চলতেই থাকবে। তাই মংলার সদ্য বিবাহিতা বউ রত্নাকে অপহরণ করে(ভাবে না, আগামী পঞ্চায়েতে ত্রিভুবন এবং তাকে জব্দ করার জন্য কৃষকেরা সংঘবদ্ধ হতে পারে।

তৃতীয় অঙ্কের সূচনা সেই শপথ দিয়ে। এই প্রথম বিজন ভট্টাচার্য গণনাট্যের সংগ্রামের নতুন রূপরেখা আঁকলেন। দেখলেন, ভূস্বামী-মহাজনদের আত্র(মণ যখন সর্বগ্রাসী, তখন গ্রামের পর গ্রাম সংঘবদ্ধ হতে হবে। এ নাটকে ভিন্ন গ্রাম থেকে এসেছে সঞ্চারিয়ারা। দাবা খেলার মত বহুরূপীর দলের উপস্থিতিও প্রতীকী।

[রাত্রি। সর্দারের আঙিনা। সঞ্চারিয়া আর ভাল্লু বাঁধের ওপর দিয়ে এসে চুপিসাড়ে আঙিনায় দাঁড়ায়। ভাল্লুর হাতে জ্বলন্ত মশাল। সঞ্চারিয়া হাতে তালি দিয়ে সর্দারকে ডাক দেয়। সর্দার বেরিয়ে আসে ঝোপড়ার ভেতর থেকে]

সর্দার ।। হঁ হঁ, তালি শুনলম কিন্তু মানুষ চিনলম নাই। কে বটে?

সঞ্চারিয়া ।। সঞ্চারিয়া বুলছি।

সর্দার ।। অ, সঞ্চারিয়া!

সঞ্চারিয়া ।। গড়খণ্ড গেঁইছিলম।

সর্দার ।। দামোদর পার?

সঞ্চারিয়া ।। হঁ, দামোদর পার! মংলাক দেখলম।

মংলা প্রস্তাব দিয়েছে বাঘবন্দী খোলায় পুরানো পঞ্চায়েতের প(থেকে সভায় যখন সওয়াল করবে ত্রিভুবন তখন নতুন পঞ্চায়েতের প(নিয়ে সওয়াল করবে সঞ্চারিয়া। মংলার যুক্তি(, 'আমি বহুরূপী, থাকতম, কিন্তু মুখ খুলতাম নাই। সঞ্চারিয়া, মংলার কথানুযায়ী 'বহুরূপীর আজ্ঞা' বলেই, নেতৃত্ব দেবে। সঞ্চারিয়ার নেতৃত্ব দেওয়ার যে (মতা আছে তা দোলাচলচিত্ত খগে(্রকে তার কঠিন মতামত দিয়ে বোঝায় এবং খগে(্রেও হাতে টাঙি তুলে নেয়।

তৃতীয় অঙ্ক জুড়েই চরম নাটকীয়তা, একটানা climax! মদ্যপ প্রভঞ্জন পশুবল প্রয়োগ করেও রত্নাকে করায়ত্ব করতে ব্যর্থ হল।

রত্নার মৃত্যু হল। আবার এর পাশাপাশি জন্মও হল সংগঠিত প্রত্যাঘাতের। মংলা-সঞ্চারিয়ার দল এবার শ্রেণীশত্রুকে শেষ আঘাত করবেই। চতুর ত্রিভুবন পালাবার আগে প্রভঞ্জনকে শেষবার সতর্ক করে—

হিসাব যারা চাহে তারা আসছে।...

৪.২.৬.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ‘দেবীগর্জন’ নাটকের নামকরণের সাফল্য।

২। ‘দেবীগর্জন’ নাটকের গঠন কৌশল বিশ্লেষণ করো।

৩। ‘দেবীগর্জন’—নাটকে গ্রামীণ পটভূমিতে সামাজিক শোষণের যে রূপটি প্রতিভাত, তার স্বরূপ নির্ধারণ করো।

৪। ‘দেবীগর্জন’ নাটকে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের চিত্রকল্প কিভাবে এসেছে দেখাও।

———————

পর্যায়গ্রন্থ - ২

একক - ৭

নামকরণের তাৎপর্য

বিন্যাসত্র(ম :

৪.২.৭.১ : শেষ দৃশ্যের তাৎপর্য : নামকরণের তাৎপর্য

৪.২.৭.২ : আদর্শ প্র(্াবলী

৪.২.৭.১ : শেষ দৃশ্যের তাৎপর্য : নামকরণের তাৎপর্য

দেবীগর্জনের শেষ দৃশ্যটিই নাট্য নামকরণের গু(ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। ১৯৭৭-এর আগস্টে জওহরলাল নেহে(বি(েবিদ্যালয়ের একটি সেমিনারে স্বয়ং নাট্যাকর বলেছেন—

'In *Devigarjan,* I moved into the experience of the peasantry, into the economic repression and exploitation that endure even today. Drawn to a last ditch they are compelled to revolt. The violence of their revolt I associated with the Devi's garjan, the roar of the angry goddess. As long as my people make the gods and goddesses dance, I am prepared to accomodate the belief of my people.'

নাট্যকর ভূমিকায় শেষদৃশ্য এবং নামকরণের যে আলোচনা বিজন ভট্টাচার্য করেছেন তা এখানে তুলে ধরা জ(রী—

দেবীগর্জন—আভিধানিক অর্থে দেবী অর্থাৎ বসুধা গর্জন করেছেন। অশান্ত হয়ে উঠেছেন জননী। বাসুকীর ফণায় ধরিত্রী মাতা অস্থির। ভূমিকম্প হচ্ছে।

লোকায়ত অর্থে দেবীগর্জন-এর ব্যাখ্যা একটু ভিন্নতর। বর্ষান্তে শরৎকালের আকাশ মেঘমুক্ত(। অমন দিগন্ত প্রসারী নীলিমা আর কোনো ঋতুতে মেঘলোকে পরিদৃশ্যমান নয়। অখণ্ড নীলিমার নিচে ঘনসন্নিবিষ্ট কাশফুলের আন্দোলিত (েত উত্তরীয় এক গৈরিক প্রশান্তিতে ভরে দেয় প্রাণমন। শরৎ যেন এক উদাসীন মাঠ। যৌবন নয়, বানপ্রস্থ নয়, এমন কী কৈশোরও নয়, শুধু শিশুদেরই যেন এখানে মানায় ভালো—ঘুমভাঙা শত শত শিশু। ঢাকের বাজনায় হাততালি দিয়ে তারা মাকে আবাহন জানায়। আর লক্ষ্মীর ভাঁড়ে চতুরালির সামান্য সঞ্চয়ে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীর আয়ব্যয়ের হিসেব-নিকেশ করে। ছেলেরা সবাই অসুর আর যারা কাকলীতে কথা কয়, কৃষ(া কাবেরীর দল, সিংহবাহিনী।

এমনই এক সুন্দর দিন—যখন আকাশ পৃথ্বী আনন্দঘন, তখন আচম্বিতে শুনি ঘন ঘন বজ্রনির্ঘোষ হচ্ছে। অথচ নিঃসীম নীলিমায় কালো মেঘের লেশমাত্র নেই। লোকে বলে, শিব দুর্গায় ঝগড়া লেগে গেছে। ত্রিশূলীর তাণ্ডব শুর হয়েছে। মায়ের বাপের বাড়ি আসতে মানা। কিন্তু মাকে তো আসতেই হবে। তাঁর ছেলেমেয়েরা যে চরাচর কাশবন জুড়ে বাজনা বাজাচ্ছে আর মাঙ্গলিক গাইছে। শেষটার দীর্ঘ কলহের পর একটা রফা হয়ই—ফি বছরই তিন চার দিনের কড়ারে। মাঝখানে ঐ তাণ্ডব, ঐ অশান্তি — আর দেবীর গর্জন। লোকায়ত অর্থে, বিশেষ করে, পূর্ববাংলার দেশাচার কালচারে দেবীগর্জনের ব্যাখ্যা এই রকম।

দুই ব্যাখ্যার যে ব্যাখ্যাই গ্রাহ্য হোক — ঊষর লালমাটির দেশ বীরভূমের পটভূমিতে আদিবাসী

ও সাঁওতাল চাষীদের কৃষক —আন্দোলনের ভিত্তিতে, শত্রুকে পরাহত করে, জননীকে খুঁজে পাবার সংগ্রামী সাধনায় দেবীগর্জন নাটকটির নামের দিক থেকে সার্থক হতে বাধা নেই — এই বি(্বাসে একান্তই বাস্তবনিষ্ঠ কৃষক আন্দোলনের পটভূমিতে সংগ্রামী এই চিত্রকল্প কাহিনীর পৌরাণিক নামাকরণ করেছিলাম। আমার মনে হয় লোক-সংস্কৃতির বহতা অ(ু ণ্ন রেখেই এই নামটি প্রযোজনার পরিপ্রে(িতে সার্থক হতে পরেছে। সুরাসুরের যুদ্ধে দেবীকে চিনে নিতে আজকের মানুষ ভুল করেনি।

নাটকটির নামকরণটিকে যথাযথ প্রতিষ্ঠা করতে নাট্যকার কিভাবে দৃশ্যটিকে মহিষাসুর বধ এবং মহাকালীর তাণ্ডবনৃত্যের মধ্যে কৃষকদলের প্রভঞ্জন হত্যার ঘটনা মঞ্চে এনেছেন তা দর্শক দেখেছে। পুরাণকে সমকালের পটে স্থাপনের এই পদ্ধতি গণনাট্যধর্মী।

‘দেবীগর্জন’ নাটকের সমাপ্তি দৃশ্যে বিজনবাবু যে মাতৃকাশক্তি(র ছবি দেখিয়েছেন, এবং সংগ্রামের (ে ত্রে তার যে ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা নিয়ে কেউ কেউ প্র(্ন তুলেছেন। এখন দেখা যাক্ বিতর্কমূলক সেই অংশটি ঠিক কী ছিল।

নতুন গণমুখী পঞ্চায়েতের সাধারণ অধিবেশন। দশরথ কৃষকদের সামনে জনমুখী কর্মসূচী ঘোষণা করল। স্বভাবতই প্রভঞ্জন এখন (মতার কেন্দ্র থেকে বিতাড়িত। একদিনে ত্রিভুবনের কৌশল তার মনে পড়েছে। এই বকধার্মিক অত্যাচারিতদের হাতে (মতা দিয়ে পালাবার পথ খোঁজে।

কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। নাট্যকার ইতিমধ্যে মঞ্চ নতুন করে সাজিয়েছেন। সামনে একটি স্থির চিত্র— মহিষাসুর বধ, তবে দেবী দুর্গা নয়, মহাকালী। পুরাণানুযায়ী অবশ্য কোনও পার্থক্য নেই। কালী এবং দুর্গা—উভয়েই শিবের স্ত্রী।

ঐ দৃশ্যটি মংলাকে অতিরিক্ত(শক্তি(যোগাল। তাণ্ডব নৃত্য অতিরিক্ত(তম শক্তি(সঞ্চারি। প্রভঞ্জনের মাথায় মংলার টাঙ্গি নেমে এল। মহিষাসুর বধ ও প্রভঞ্জন বধ। কোনও সংলাপের প্রয়োজনও হল না। (দ্ব(্বাস এই পরিণতি পরে মনোজ মিত্র-র বহুপরিচিত ‘চাকভাঙা মধু’র পরিণতিতে অনুসৃত। ব্যতিক্র(ম, ‘দেবীগর্জনে’ শেষ আঘাত হেনেছে পু(ষ মংলা, ‘চাকভাঙা মধু’তে সে দায়িত্ব পালন করছে নারী বাদামী।

গণনাট্যে জনতার সংগ্রামে দেবীশক্তি(র ব্যবহার গ্রহণযোগ্য কিনা এ নিয়ে একদল দর্শক প্র(্ন তুলেছিল। ১৯৭৭-এ দিল্লির জওহরলাল নেহে(বি(্ববিদ্যালয়ের একটি সেমিনারে বিজনবাবু তার জবাবও দিয়েছিলেন। আমরা এ বিষয়ে তিনটি বিষয় উল্লেখ করছি। প্রথমত, গণনাট্যকাররা কোনও দর্শকের ধর্মীয় বি(্বাসকে আঘাত করতে চান না, বিশেষত পূর্ববর্তী পঁচাত্তর বছর ধরে বাংলা পৌরাণিক নাটকে মুগ্ধ সাধারণ বাঙালি দর্শক এ জাতীয় পরিণতি গ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয়ত, আদিবাসী সমাজ কালীর আরাধনা বেশি করে, তাই দুর্গার বদলে কালীর পরিকল্পনা। তৃতীয়ত, প্রভঞ্জনের ধর্মগোলা অধিকার করে প্রভঞ্জনের বাঁধ ও বাধা ধ্বংস করতে যখন কৃষকরা সংঘবদ্ধ তখন চালচিত্রে দেবী কালীর সংহারিণী রূপ তুলে ধরে এটিকে লোকনাট্যের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হল।

দেবীগর্জনের সমাপ্তি দৃশ্যের কোরিওগ্রাফি — প্রযোজনার নানা রূপ

দেবীগর্জনের শেষদৃশ্যের কোরিওগ্রাফি নিয়ে নানা নাট্যসংস্থা মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত, চালচিত্রের ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ে নানা পরী(া করেছেন। বিজনের পুত্র নবা(ণ ভট্টাচার্য যে শেষ দৃশ্যের পরিকল্পনা করেছিলেন তা নাট্যকারই জানান। ‘ক্যালকাটা থিয়েটার’-এর প্রযোজনার সময় তিনি স্বয়ং এর কিছু বদল ঘটান। বালুরঘাটের ‘ত্রিতীর্থ’ গোষ্ঠী দৃশ্যটি কিছুটা পালটে নেয়। আবার কলকাতার ‘অর্ণব নাট্যসংস্থা’ ‘দেবীগর্জন’ অভিনয়ের সময় কিছু পরিবর্তন ঘটায়। কিন্তু তার ফলে মূল কোরিওগ্রাফির কোনও পরিবর্তন চোখে পড়ে না। যেমন মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যাক্।

নাটকে বর্ণিত মূল, 'কোরিওগ্রাফি' ছিল এরকম —

প্রভঞ্জন ডানদিকের চোরাপথ ধরে পালাতে চেষ্টা করে। আবছা অন্ধকারের ভেতর থেকে ঝিলিক দিয়ে ওঠে একটি বল্লম। কঠিন প্রহরা। প্রভঞ্জন তখন বাঁদিক দিয়ে পালাবার পথ খোঁজে। কিন্তু এখানেও অনিবার্য আর একটি বল্লম। এগুলেই গেঁথে ফেলে দেবে। প্রভঞ্জন তখন পেছন দিকে পথ খোঁজে। কিন্তু সর্বত্রই কঠিন প্রতিরোধ। উদ্যত বল্লম, টাঙি, কুঠার, রামদা — বহুবিধ শস্ত্রের দৃঢ় বেষ্টনী। কোনো পথ নেই পালাবার। অপে(া করে প্রভঞ্জন অনন্যোপায় হয়ে।

ওদিকে ধর্মগোলা অবরোধ পর্বও শেষ হয়। ধানের বদলে মংলা খুঁজে পায় মাঠের লক্ষ্মী রত্নাকে। মান বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিয়ে আত্মশুদ্ধির পথে মুক্তি(পেয়েছে সে।

জনতা পাথর। সতীর দেহভার নিয়ে এগিয়ে আসে মংলা সামনের দিকে। শুইয়ে দেয় রত্নাকে মাটিতে।

এইবার শুধু একটি কঠিন কর্তব্য। হাত বাড়িয়ে অস্ত্র খোঁজে মহাবলী। ঘুগর্‍্যা মংলার হাতে টাঙি এগিয়ে দেয়। একটি মুহূর্তমাত্র। দৃপ্তভঙ্গিতে দু-হাতে ঘুরিয়ে ধরে টাঙি মংলা প্রভঞ্জনের মাথার ওপর। আশপাশের সমস্ত অস্ত্রগুলিও ঝিলিক দিয়ে ওঠে শত্রুকে ল(করে। মহিষাসুর-বধের একটি স্থির চালচিত্রে পশ্চাতে বাঁধের ওপর মহাকালীর তাণ্ডবনৃত্যের মধ্যে প্রভঞ্জন - নিধন পালার যবনিকা পড়ে।

নাটকের এই বর্ণনা বিভিন্ন নাট্যদল কিভাবে করেছে দেখা যাক —

ক. ক্যালকাটা থিয়েটার ঃ দৃশ্যায়িত হয় অকালবোধন, দেবী দুর্গার মূর্তি। মঞ্চের উপর রত্নার মৃতদেহ। কিভাবে মহিষাসুরের মতো প্রভঞ্জন নিজেকে বাঁচাতে চাইছে এবং কিভাবে কৃষকরা লাঠি-সড়কি দিয়ে তাকে আঘাতে প্রস্তুত তা প্রচণ্ড বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজে উত্তেজিত দর্শক দেখে। মঞ্চের শেষদিকে মহাকালীর নৃত্যরতা রূপ।

খ. ত্রিতীর্থ ঃ বালুরঘাটের ত্রিতীর্থ প্রভঞ্জনের উপর কৃষকদের সরাসরি আত্র(মণ দেখাত। তারা বহুরূপীর দল, কালীনৃত্য এবং মহিষাসুর বধ বাদ দিয়ে পরিণতিকে সরাসরি বাস্তব জগতের দিকে নিয়ে আসে।

গ. অর্ণব ফাইন আর্টস ঃ এখানে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি(র প্রতীক হিসেবে একটি কৃষক শয্যাশায়ী প্রভঞ্জনকে বল্লম দিয়ে মারছে। পাশ থেকে একজন লাঠি দিয়ে আঘাত করছে। এখানেও জনশক্তি(র উপর মাতৃকাশক্তি(র প্রভাব কাটিয়ে ওঠার প্রবণতা।

নাটকটির নামকরণটি এই শেষ দৃশ্যটির জন্যই সফল-উত্তীর্ণ।

৪.২.৭.২ : আদর্শ প্র(াবলী

১। 'দেবীগর্জন' নাটকের নামকরণের সার্থকতা এবং নাটকের শেষ দৃশ্যের গুরুত্ব বিচার করো।

২। 'দেবীগর্জন' নাটকের শেষ দৃশ্যের বিষয়বস্তুর পরিচয় দিয়ে তা কতটা নাট্যোপযোগী হয়েছে বিশ্লেষণ করে দেখাও।

৩। 'দেবীগর্জন'-নাটকে 'বাদামি'-অত্যন্ত বাস্তব ও সক্রিয়"।– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

৪। 'দেবীগর্জন'-নাটকে সংযোজিত সঙ্গীতগুলির উপযোগিতা বিচার করো।

————————

পর্যায়গ্রন্থ - ২

একক - ৮

লোকায়ত জীবনের গুরুত্ব

বিন্যাসত্র(ম :

৪.২.৮.১ : 'দেবীগর্জনে' লোকায়ত জীবনের গু(ত্ব কতখানি?

৪.২.৮.২ : প্রভঞ্জন ও ত্রিভূবন : একই শ্রেণীর দুই চরিত্রের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য

৪.২.৮.৩ : সম্ভাব্য প্র(াবলী

৪.২.৮.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪.২.৮.১ : 'দেবীগর্জনে' লোকায়ত জীবনের গু(ত্ব কতখানি ?

'দেবীগর্জন' নাটকে বাংলা লোকনাট্য, লোকগীত ও লোকনৃত্যের ত্রিবেণী সংগম ঘটেছে। গণনাট্যের অন্যতম ল(্য হল বাংলার লোকসমাজ ও লোকসংস্কৃতির সঙ্গে পল্লীনির্ভর নাটকের সংযোগ ঘটাতে হবে। নাটকের তেমনি কয়েকটি লোকায়ত চিত্র ঃ

ক. মংলা-রত্নার বিয়ের অংশ। আদিবাসী বিবাহ-আচারের সুন্দর পরিচয় এখানে মেলে। লোকনৃত্যগীতের প্রয়োগে (দ্ধ(াস এই নাটকে এক চিলতে সুখাবেশ। বাসরঘরে আনা হয়েছে লোকসাহিত্যের অন্তর্গত রূপকথার প্রসঙ্গ।

দৃষ্টান্ত —

১. দশরথ ।। হঁ, প(ীরাজে বসাই। (সবাই হাসে)

[মেয়েদের গান ও জোকার-পুকারের মাঝখানে বরানুগমন হয় টেঙ্গোবাঁশী ঢোলসহরতে। মেয়েরা বরণডালা হাতে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে গিয়ে সংবর্ধনা করে নব বরবধূকে]

২. [বর্ষীয়সী মেয়েরা নবাগতা বধূকে আচারসম্মতভাবে বরের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে স্ত্রী-আচারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তারপর আশীর্বাদের পালা। দশরথ, সনাতন, ত্রিভুবন—বয়োজ্যেষ্ঠগণ বরবধূকে আশীর্বাদ করে। উৎসব-আনন্দের মাঝখানে মংলার বাপ বুড়ো সর্দার ঘরে ফেরে হন্তদন্ত হয়ে। বুড়োকে দেখে গিরি গদগদ হয়। চাদর ধরে টানে। গায়ে ঢলে পড়ে। পুরনারীগণ মিঠাই-মণ্ডার দাবি জানায় সর্দারের কাছে]

[বরণ ও স্ত্রী-আচারের পর বরবধূ ঘরে যাবে(কিন্তু এখানেও নবীনারা বাধার সৃষ্টি করে। হাতে হাতে বন্ধনী রচনা করে তারা বরবধূর পথ আগলে দাঁড়ায়]

প্রথম নবীনা ।। টাকা পয়সায় হবেক নাই গ, সোনা দানা রূপা চাই।

গিরি ।। (হাসে) অ বুড়া বুড়া গ। তামাশা দেখ। বুলে কিনা টাকা পয়সা লিব নাই, সোনা দানা রূপা চাই।

৪. দিগম্বর ।। ইবার বেয়াই বেয়ানের পাল্টা লিবে — ধানখেলা শু(হোক কেনে?

[তুমুল হট্টগোলের মাঝখানে কোমর বেঁধে এগিয়ে আসে ধান ভরতি কুলো হাতে গিরি]

গিরি ।। নাচবে নাকি গ বিয়াই বুড়াকালে? — কোমর ভাঙবে তো?

লেদুয়া ।। মন ভেঙেছে আর কোমর ভাঙবেক নাই? দেখি নাচুনী কেমন? (ঢোলে কাঠি দেয়)

[দু-ধারি নৃত্যপর স্ত্রী-পু(যের মাঝখানে লেদুয়া ও গিরির ধানখেলা শু(হয় ঢোলের তালে নেচে নেচে।]

খ. বহুরূপীর দল বাংলার লোকজীবনে আনন্দের উৎসব হাজির করে। 'দেবীগর্জনে'র শেষাংশে বহুরূপীর দল সেই ভূমিকা পালনের সঙ্গে কৃষক সংগ্রামেরও অংশীদার হয়।

গ. বাংলায় লোকক্রীড়ার একটি হল দাবা খেলা। মহাভারত-হিন্দুপুরাণ - বৌদ্ধপুরাণ - চর্যাপদে এই পৌরাণিক ক্রীড়া, 'দেবীগর্জনে'র সমাজ-বদলের লৌকিক ছক হিসেবে প্রযুক্ত(। প্রভঞ্জন ও ত্রিভুবনের ভবিষ্যৎ কৌশলগত বিরোধের পটভূমি আগেই তাদের লোকক্রীড়ার মধ্যে আভাসিত।

ঘ. ঘটনার ঘনঘটায় একসময় অশিক্ষিত কৃষক রমণী গিরি মনে করে তার পুত্রবধূ রত্নার 'অপয়া' ভাগ্যই সর্দার-পরিবারের সর্বনাশের কারণ। তার সংলাপের মধ্যে লৌকিক ধর্মীয় কুসংস্কারই প্রকাশ পেয়েছে।

দৃষ্টান্ত ঃ

গিরি ।। (স্বগত) যেই দিন থিকা পাঁও দিছে ঘরে, লেগেই আছে অশান্তি। আবাগীর বিটি জ্বালাই দিল ঘর-সংসার(জমি-জিরাৎ নীলামে চড়াইছে, ছেলেটাকে দেশান্তরী কঁরছে, এখন বুড়া-বুড়ির কল্‌জাটা খোঁপাইতে লেগেছে।— খা কেনে খা, চিবাই চিবাই খা আবাগীর বিটি, মুখ্যার বিটি।

ঙ. লোকসমাজে লাঠিয়াল পাঠিয়ে নারী অপহরণের নানা ঘটনা যুগ যুগ ধরে প্রচলিত। অনেক সামন্ততান্ত্রিক প্রভু এজন্যই লাঠিয়াল পুষতেন। প্রভঞ্জন লাঠিয়াল পাঠিয়ে যেভাবে রত্নাকে অপরহণ করল, তা লোকনাট্য-সুলভ ঘটনা।

চ. 'দেবীগর্জনে' এমন অনেক লৌকিক ছড়া ও প্রবাদ ব্যবহৃত হয়েছে, যা কেবল গণনাট্যের পরিধিতেই বাস্তবসম্মত হতে পারে। লোকউৎসবের অঙ্গরূপে ছড়া ব্যবহার বাংলার জনজীবনে সুলভ। এ নাটকের একেবারে শু(তে যখন পূবাকাশে ঊষার সূচনা হতে চলেছে তখন ছড়াগান গেয়ে পথ চলার দৃশ্যটি অসাধারণ। তেমনি প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে, কামিনেরা যখন কুলোয় শস্য প্রস্তুত করছে, তখনও শ্রমসংগীত হিসেবে ছড়াগানের সার্থক ব্যবহার।

দৃষ্টান্ত —

এক.

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[বীরভূম অঞ্চলের আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চল। ঊষাকালের পূর্ব-মুহূর্ত। পূর্ব-দিগন্তের দিকচক্রবাল রেখা ধরে টানা সড়ক তখনও অস্পষ্ট। বাউরি, সাঁওতাল কুলি-কামিন ছেলেমেয়েরা আলো হাতে লাইনবন্দী কাজে চলেছে গান গাইতে গাইতে]

হাতে মগের বাতি মাথাত বেতের ঝুঁড়ি,
চলিলাম দাদা গ পাতালপুরী।

চোখেতে ঘুম ঘুম পায়েলা (ম্ঝুম্
সুমরি শুকরি যাঁইছে পাতাল নিঝুম।।

[কামিন ছেলেমেয়েরা গান গাইতে গাইতে চলে গেলে সোনার থালায় সূর্য ওঠে।]

দুই.

দ্বিতীয় দৃশ্য

[প্রভঞ্জন সর্দারের খামারবাড়ির খোলান। সকালবেলা। ডানদিকে খামারবাড়ির লাগাও সিঁড়িসমেত ধানের মরাই। মঞ্চের পশ্চাদ্‌ভাগে বাঁদিক ঘেঁসে ধানসমেত খড়ের ডাঁই, মই ও মাচাং। মেয়ে কামিনরা এখানে ধান ঝাড়ছে(কুলো করে ধান উড়োচ্ছে গান গাইতে গাইতে]

গুণের ননদ ময়না
নিশাকালে শিয়াল ডাকে
ঘরেতে মন রয় না।
গুণের ননদ ময়না
ধনীর প্রাণে সয় না
ধান ঝাড়িতে দোসর পাইলম না।

ছ. সংলাপে সাঁওতালী আদিবাসী ভাষার বলে প্রয়োগ

দৃষ্টান্ত —

১. গিরি ।। আঁই দেখ। ...বুঝলম...তা সে রাগমান কঁরেছেন ভালো করেছেন, এখন আসান একটা করেন দেখি। আমরা তো নাচার হঁইয়েছি। (বউকে) জল দিস কেনে? (ত্রিভুবনকে) বুল্লম না, দেঁখতেই, কামের লয় বউ!

ত্রিভুবন ।। তা, তুমরা বসাই বসাই খোঁয়াইবে, উয়ার কী দোষ? গতর আছে, খাটি খাক। বউ-বিটি আজকাল সব্বল করছে। (সর্দারকে) পাঠাও কেনে খোলান? ধান উড়াবে, চাল ঝাড়বে — দেড় টাকা থিকা দুই টাকা রোজ উশুল হয় তো মন্দ কী?

[রত্না জল এনে দেয়]

গিরি।। তা, সে মন করলে তো করিবারই পারে।

ত্রিভুবন ।। মনঠো কন্যার ঠিকই আছে, এখন আঁজ্ঞাঠো তুমাদের হলেই হয়!

সর্দার ।। আঁজ্ঞাঠো দেওয়াই আছে, — ও বুঝবে, ও করবে....

ত্রিভুবন ।। তা পাঠাও কেনে খোলান? কামঠো উয়ার বাঁধা থাকবে, আমি কথা দিলম।... বড় ভালো বউ হঁইয়েছে, টুক্‌চা বউ!

....তা, মংলাটাকে দেখিবার পাই না। — না না, বুল্লে তো শহর গেঁইছে।

সর্দার ।। কয়লাখাদে কাম লিয়েছে।

ত্রিভুবন ।। হঁ হঁ, ভুলে গেঁইছিলম কথাঠা। আচ্ছা তো আসি সর্দার!

(২) কাটা কাটা উপভাষার মধ্যে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর —

প্রভঞ্জন ।। সে কঁরেছিলেন এক রামচন্দ্র।

মংলা ।। তা সে আমরাও করব অকালবোধন। একশত আটঠো নীলোৎপল লাগে তো তাই দিব। আজই পূজা, আজই সেবা। খুলি দাও ধর্মগোলা।

প্রভঞ্জন ।। না, ধর্মগোলা খুলি দিব নাই।

সঞ্চারিয়া ।। ধর্মগোলা খুলি দাও!

প্রভঞ্জন ।। না, দিব নাই।

মংলা ।। খুলি দাও ধর্মগোলা!

প্রভঞ্জন ।। না।

মংলা ।। প্রভঞ্জন!

প্রভঞ্জন ।। রংকু, ভীমা, সাটোর।

[ধর্মগোলা অবরোধ করবার জন্য মংলা চেঁচিয়ে ওঠে]

মংলা ।। ধর্মগোলা!

গণনাট্যের সংগ্রামী ভাষার এটি একটি উৎকৃষ্ট নমুনা।

রত্নার একাধিক সংলাপে লোকসংস্কার-লোকপ্রবাদ প্রতিধ্বনিত হতে শুনি।

জ. বহুরূপীর দলকে দশরথ রক্ততিলক পরিয়েছে। অতঃপর তাদের লৌকিক বৃন্দগান। রক্তের রঙ লাল। এই লাল রং বিপ্লব-বিদ্রোহের চিহ্ন। আসন্ন কৃষক-বিদ্রোহের কথা মনে রেখে, লোকশিল্পীদের ললাটে এই রক্ততিলকের ব্যবহার নাট্যানুগ। গণনাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য গ্রন্থের ভূমিকায় আশা প্রকাশ করেছিলেন—

সুরাসুরের যুদ্ধে আজকের মানুষ দেবীকে চিনে নিতে ভুল করবে না। তাঁর আশা যে পূর্ণ হয়েছে, তার প্রমাণ 'দেবীগর্জনে'র ব্যাপক জনপ্রিয়তা। আর তার পিছনে রয়েছে প্রভূত লোকনাট্যের উপাদানের সার্থক প্রয়োগ।

৪.২.৮.২ : প্রভঞ্জন ও ত্রিভূবন : একই শ্রেণীর দুই চরিত্রের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য

প্রভঞ্জন :

শোষক ও অত্যাচারী জোতদার মহাজন। চরিত্রটি আগাগোড়া অবিবর্তিত। নতুন পঞ্চায়েতে কৃষকদের দাবী শেষ পর্যন্ত না মানায় তার পরাজয় ও মৃত্যু।

প্রভঞ্জন শুধু শোষক নয়, সে দেহবিলাসী। বহু নারীর সর্বনাশ সে করেছে। যুগের ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তনে তার চরিত্রের বদল না ঘটলে যে সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী সেকথা ত্রিভুবন তাকে বারবার বললেও সে শোনেনি। রত্নাকে ভোগ করতে যাওয়ায় তার প্রতি স্বামী মংলার ক্রোধ তীব্র হয়।

'কর্জ ধানের সুদের দায়ে আধিয়ারের' মাথা সে ফাটিয়ে দেয়। সাক্ষী ত্রিভুবন। এ ক্ষেত্রেও সে প্রভঞ্জনকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে। কিন্তু প্রভঞ্জন তাতেও নিরস্ত হয় না। সে কৃষক হত্যার স্বপ্ন দেখে। এটাও তার বুদ্ধিহীনতার পরিচয়। প্রভঞ্জনের অহংকার আকাশস্পর্শী। তার সর্বত্র 'মঙ্গলগ্রহে ইজারা নিব।'

প্রভঞ্জন হত্যার সময় পুলিসের অনুপস্থিতিতে সমালোচকদের কেউ কেউ অস্বাভাবিক ভেবেছেন। কিন্তু সর্বহারা কৃষকের হাতে জমিদার-জোতদার-নিধন বাংলাদেশে অনেক ঘটেছে। সে আর এক ইতিহাস।

ত্রিভুবন :

নাটকে সে প্রভঞ্জনের দোসর প্রায় শেষাংশ পর্যন্ত। তবে শেষে সে আত্মর(া করার জন্য মঞ্চ ছেড়ে পালিয়েছে।

একদিকে ত্রিভুবন অন্নদাতাকে র(া করার জন্য চাষীদের বোঝায়। নতুন পঞ্চায়েতের সভায়। অন্যদিকে সর্দারকে বলে ত্রিভুবন এখন আর ত্রিভুবন নাই। বহু আঘাতে পোড়খাওয়া চাষীরা অবশ্য তার কথায় ভোলে না। তার চতুর বক্তৃ(তায় কোন কৃষক বিভ্রান্ত হলে সঞ্চারিয়া তাদের সামনে প্রভঞ্জন ও ত্রিভুবনের মুখোশ খুলে দেয়।

ত্রিভুবনও রত্নার রূপে আকৃষ্ট হয়েছিল। সর্দারের বাড়ি থেকে প্রস্থানের সময় রত্নার প্রতি উক্তি(টি তার প্রমাণ। রত্নাকে খোলানে কাজ দেওয়ার প্রস্তাবে তার অভিসন্ধি আরও দৃঢ় হয়। আবার রত্নার প্রতি প্রভঞ্জনের লালসা বিস্তারিত হওয়ায় একইভাবে সে ত্রে(াধ প্রকাশ করে।

প্রভঞ্জন বুদ্ধিহীন তাই সদরে কাজকর্মের জন্য ত্রিভুবনকে তার প্রয়োজন। এজন্য ত্রিভুবনের অহংকারও কম নয়। সেই জোরেই অন্নদাতার মুখের ওপর কথাও বলতে পারে।

ত্রিভুবন চতুর। কালসচেতন। তার সংলাপ বুদ্ধিদীপ্ত। ভিলেন চরিত্রের সব ল(ণই তার আচরণে ও সংলাপে মেলে। প্রভঞ্জন ও ত্রিভুবনের কিছু সংলাপ তুলে দুটি চরিত্রের স্বরূপ বোঝানো যায়।

প্রথমতঃ শোষক প্রভঞ্জন ধান মাপবার বাটখারার ঘাটতি হলে কৃষক মনাকে পাল্লায় চাপায়। এমনকি তার বুকে পাথর বসায়। নির্লজ্জ মহাজনের সংলাপ ভয়াবহ—

[প্রভঞ্জনের নির্দেশে মনাকে পাল্লায় চাপান দেওয়া হয়]

....এইবার ঠিক হইয়েছে বাটখারাঠো। (হাসে)

মনা ।। (চিৎকার করে) আঁই দেখ, বাটখারা বানাইল দেখ....ই দেখ বাটখারা বানাইছে, দেখ...

প্রভঞ্জন ।। (ধমকে) আরে চাপি বসেক খাসিটা! সরেস বাটখারা। আমার ধানঠো ই বাটখারায় মাপিবার হয়। চাপা পাথর।

অন্যদিকে শোষকের অনুচর হলেও ত্রিভুবন অন্ধ নয়। সে জানে কৃষকের উপর এই সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচার আর চলবে না। নিম্নোক্ত(সংলাপে তার দূরদৃষ্টির আভাস আছে —

ত্রিভুবন।। বুলছিলম বুদ্ধির কথাঠো। আগেও বুলেছি, এখনও বুলছি— পঞ্চায়েতী শাসন তোমাক এখনই চালু করিবার হয়। কেন কী, অভাব আর অভিযোগের বহরঠো যে পরিমাণ বাড়ি যাঁইছে, তাত করি দায়িত্বটা তুমার নিজের উপুর রাখাটা আর উচিত হয় না জানিবে।

দ্বিতীয়তঃ এই দুই চরিত্রেই নারীতে আসক্ত(। কিন্তু ত্রিভুবনের দেহলালসার বহিঃপ্রকাশ এতই নগ্ন নাট্যকার বর্ণনায়, সংযমের সাহায্যে তার পরিণতি এঁকেছেন। কিন্তু রত্নার প্রতি ত্রিভুবনের আকর্ষণ থাকলেও তা ধর্ষকামীর মত নয়, বরং ইঙ্গিতধর্মী —

ত্রিভুবন।। হঁ হঁ, ভুলে গেঁইছিলম কথাঠো। আচ্ছা তো আসি সর্দার! (হাসে) টুকচা বউ, সুন্দর বউ, খাসা বউ!

[সর্দারের চোখে প্র(া। গিরিরও সেই একই প্র(া। ত্রিভুবনের প্রস্থান।]

তৃতীয়তঃ নতুন পঞ্চায়েতে অনেক বাক্যজাল বিস্তার করেও ব্যর্থ ত্রিভুবন নিজেকে সঠিক সময়ে সরিয়ে নিয়ে বেঁচে গেল। কিন্তু বুদ্ধিহীন, শক্তি(গর্বী প্রভঞ্জন কৃষক সমাজের কঠোর ফাঁদ ছেড়ে বার হতে পারল না, নিহত হল।

৪.২.৮.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ‘দেবীগর্জন’ নাটকে লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্য কতখানি আছে?

২। ‘দেবীগর্জন’-এ প্রভঞ্জন ও ত্রিভুবন একই শ্রেণীর প্রতিনিধি হয়েও একই ছাঁদের চরিত্র নয় কেন?

৩। ‘দেবীগর্জন’ নাটকটির মধ্যে লোকায়ত সংস্কৃতির যে পরিচয় পাওয়া যায় তা দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করো।

৪.২.৮.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকর্ম ও সমকালীন প্রে(ত—ড. মন্দিরা রায়।

২। কালজয়ী বাংলা নাটক ঃ পুনর্বিচার — ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়।

৩। নাট্য আকাদেমি পত্রিকায় (৫ম সংখ্যা)—ড. দর্শন চৌধুরীর প্রবন্ধ ‘দেবীগর্জন ও নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য’।

৪। দুই দশকের বাংলা নাটকের বিবর্তন — ড. গীতশ্রী দে সরকার।

৫। বিজন ভট্টাচার্য — রণেশ দাশগুপ্ত।

————————

পর্যায়গ্রন্থ - ৩

একক - ৯

সিরাজদ্দৌলা নাটকের পটভূমি ও ঐতিহাসিকতা বিচার

বিন্যাসত্র(ম :

৪.৩.৯.১ : নাট্যকার শচীন্দ্র সেনগুপ্ত

৪.৩.৯.২ : সিরাজদ্দৌলা নাটকের পটভূমি সিরাজদ্দৌলা ও ইংরেজদের মধ্যে বিরোধের কারণ

৪.৩.৯.৩ : নাট্যকাহিনির ঐতিহাসিকতা বিচার

৪.৩.৯.৪ : আদর্শ প্র(াবলী

৪.৩.৯.১ : নাট্যকার শচীন্দ্র সেনগুপ্ত

ঊনবিংশ শতকে শৌখিন থিয়েটার প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে বাংলা নাট্যচর্চার শুভারম্ভ ঘটেছিল। তারপর ১৯৭২ সালে জাতীয় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পর বাংলায় নাটক রচনা এবং অভিনয়ের প্রবল জোয়ার এল। গিরিশচন্দ্র অজস্র নাটক রচনা করে এবং অসাধারণ দৃষ্টিনন্দন অভিনয় করে বাংলা নাট্যসাহিত্য এবং নাট্যাভিনয়কে বাঙালির কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। এই সময় একাধিক প্রতিভাধর অভিনেতা ও নাট্যকারের আবির্ভাবে বাংলা নাটক গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অমৃতলাল বসু, (িরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, মনমোহন বসু প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

বাংলা নাটক যখন নানা পরী(ানিরী(ার মধ্যে দিয়ে চলছে ঠিক তখনই শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত নাট্যরচনায় ব্রতী হলেন।

১২৯৯ (১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে) বঙ্গাব্দে শচীন্দ্রনাথের জন্ম। প্রথম বি(্বযুদ্ধ পরবর্তী এবং রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের অন্যতম প্রধান নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ। শচীন্দ্রনাথের কর্মজীবন তথা সাহিত্যজীবনের সূচনা হয়েছিল সাংবাদিকতার মধ্যে দিয়ে। পরবর্তীকালে নাট্যকার হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় শচীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ অন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত(হন। জাতীয় বিদ্যালয়ে পাঠকালেই তাঁর বিপ্-বমন্ত্রে দী(া। এই সময় তিনি সখারাম দেউস্কর, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তি(ত্ব এবং অধ্যাপকগণের সংস্পর্শে এসে বিপ্-বমন্ত্রে দী(িত হয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনে তাঁর কর্মে ও সৃষ্টিতে এই আদর্শের প্রভাব বিশেষ ভাবে ল(করা যায়। বিশেষ করে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে দেশপ্রেমের আবেগময় প্রকাশ এই বিপ্-বী চেতনারই ফলশ্রুতি।

শচীন্দ্রনাথের নাটক রচনার কালসীমা প্রায় তিরিশ বছর (১৯২৯-৬০)। তাঁর নাট্যরচনার এই কাল সীমাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। স্বাধীনতার পূর্ববর্তীকালের এবং পরবর্তীকালের নাট্যরচনার মধ্যে গুণগত পার্থক্য অবশ্যই ল(ণীয়।

১৯২৯ সালে তাঁর প্রথম নাটক 'রক্ত(কমল' প্রকাশিত হয়। দেশাত্মবোধক নাটক রচনায় বাংলা নাট্য সাহিত্যে সমৃদ্ধ। শচীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকগুলি সেই ধারাকেই পুষ্ট করেছে। রঙ্গমঞ্চ, অভিনেতা, অভিনেত্রী, দর্শক প্রভৃতি সম্পর্কে নাট্যকারের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। সেই দিকে ল(রেখেই তিনি নাটকের গঠনশৈলী নির্মাণ করেছেন। এইখানেই তাঁর নাটকের সাফল্যের চাবিকাঠি।

শচীন্দ্রনাথের নাটকের অন্যতম আকর্ষণ সংলাপ। আবেগধর্মী সংলাপ রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাছাড়া নাটকীয় সংঘাতও কাহিনিকে যথেষ্ট আকর্ষণীয় করে তুলেছে। শচীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের নাটকগুলিতে দ্বিজেন্দ্রলালের পরো(প্রভাব ল(করা যায়। তাছাড়া ইতিহাসের প্রতি বি(স্তুতা এবং তথ্যের প্রতি নিষ্ঠা তার নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'রক্ত(কমল' ছাড়াও 'গৈরিক পতাকা', 'সিরাজদ্দৌলা', 'রাষ্ট্রবিপ-ব' প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটকগুলির নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ্য।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে শচীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। এখান থেকেই শু(হয় তার নাট্যকার জীবনের দ্বিতীয় পর্ব। এই সময় তিনি নাট্যকর্মী এবং নাট্য সংগঠক। এই সময় বামপন্থী মতাদর্শ নাট্যকারকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বাম আদর্শের সাংস্কৃতিক শাখা আই.পি.টি. এর সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযেগ ঘটে। ফলে নাট্যকারের দ্বিতীয় পর্বের নাটকগুলিতে বাম চিন্তাদর্শ বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। শচীন্দ্রনাথ প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে কমিউনিস্ট ছিলেন না। কিন্তু তিনি যে বহুল অংশে গণনাট্য সংঘের আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। এই সময়ের নাটকে তাই সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ, বেদনা ব্যর্থতার কথা বড় হয়ে উঠেছে। প্রতিবাদী কণ্ঠের তীব্রতা ও নাটকগুলিকে ভিন্নমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের অব(য়, দ্বিধাদ্বন্দ্ব মূল্যবোধের বিনষ্টি, তাঁর মনকে নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু নৈরাজ্য বা হতাশা তাঁর নাটককে ভারাত্র(া‌ন্ত করেনি। তবে এই পর্বের নাটকে তাত্ত্বিকতা যথেষ্ট প্রাধান্য পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই এবং অনিবার্য ভাবেই সেটা ঘটেছে।

শচীন্দ্রনাথ শৌখিন নাট্যকার ছিলেন না। সমাজের এবং মানুষের আনন্দ বেদনা অব(য় আর হতাশাকে তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন নাটকে। 'কালোটাকা' স্বাধীনতার সাধনা, 'এই স্বাধীনতা', "ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর" 'সবার উপরে মানুষ সত্য', 'জয়নাদ ও আর্তনাদ' প্রভৃতি নাটকে নাট্যকারের বিপ-বী চিন্তার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে।

দুঃখের বিষয় শচীন্দ্রনাথের প্রগতি চেতনায় উদ্বুদ্ধ নাটকগুলির আলোচনা অগ্রতিকালে বিশেষ দেখা যায় না। কিন্তু সম্প্রতিকালে যে গণচেতনা সমৃদ্ধ নাটকগুলি লেখা হচ্ছে, তার মূল প্রেরণার সন্ধান শচীন্দ্রনাথের নাটকে পাওয়া যাবে তাতে সন্দেহ নেই।

৪.৩.৯.২ : সিরাজদ্দৌলা নাটকের পটভূমি

সিরাজদ্দৌল্লা ও ইংরেজদের মধ্যে বিরোধের কারণ —

সুবে বাঙালার নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিবাদ এবং সংঘর্ষের বৃত্তান্ত বাঙলা তথা ভারতের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ অধ্যায়। অন্যদিকে আবার ইংলন্ডের সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাসেও এই ঘটনার গু(ত্ব কম নয়। আর সেই কারণেই ভারতীয় এবং বৃটিশ ঐতিহাসিকেরা এ বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছেন প্রথম থেকেই। সমকালীন লেখকদের মধ্যে গোলাম হোসেন ও রবার্ট অর্ম এবং পরবর্তীকালের পণ্ডিতদের মধ্যে এম. সি হিলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ সম্পর্কে সম্প্রতিকালে একাধিক ঐতিহাসিক নতুন করে গবেষণা করেছেন প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের জন্য। এদের মধ্যে পিটার মার্শাল, ত্রি(স, বেইলী, ব্রিজেন গুপ্ত, সুশীল চৌধুরী, রজতকান্ত রায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। আলোচ্য ঐতিহাসিকগণের গবেষণার ফলে এই পর্বের ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে আমাদের হাতে এসেছে।

কোম্পানির সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ প্রসঙ্গে রজতকান্ত রায় যথার্থই লিখেছেন, কোম্পানির সঙ্গে নবাবের বিরোধ একদিনের নয়। ১৬৫৬ সালে সুবেদার সুজা বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বিনা শুল্কে কোম্পানিকে বহির্বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু কোম্পানির বাড়বাড়ন্তের ফলে মুঘলদের বাণিজ্যিক ও আর্থিক (তি হচ্ছিল। তাই বাঙলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ কোম্পানির সুযোগ সুবিধা নাকচ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দিল্লীর বাদশাহ আগের চুক্তি(র সুযোগ সুবিধা বহাল রেখে ফর্মান দিলেন (১৭১৭) । এর মধ্যেই ইংরেজরা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মাণ করে ফেলেছিল (১৭১৬)। ১৭১৭ সাল থেকে ১৭৫৬ সাল পর্যন্ত ইংরেজদের উদ্ধত কার্যকলাপের বিষয়টি নবাবকে বিচলিত করে তুলেছিল। ইংরেজরা বিপুল বিত্র(মে সশস্ত্র বরকন্দাজ নিয়ে বাণিজ্য করে চলেছিল। শুধু তাই নয় দস্তকের অপব্যবহার করে কোম্পানির দেশি ও বিলাতি কর্মচারীরা নিজেদের পণ্যদ্রব্যাদি বিনা শুল্কে চালান করত। নবাব সরকারকে খাজনা দিতে ইংরেজদের ঘোরতর অনিচ্ছা ছিল। তাছাড়া নবাবের এলাকায় বাস করে ইংরেজরা চন্দননগরের ফরাসী বণিকদের উপর মারমুখী ভাব দেখাত। ইংরেজের এই বাড়াবাড়ি ল(করে সুজাউদ্দিন খান থেকে আলিবর্দি পর্যন্ত সকলেই চিন্তিত ও বিরক্ত(হয়ে উঠেছিলেন। তবে এই দুই নবাব ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিলেন। দ(িণ ভারত থেকে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব যাতে বাঙলায় ছড়িয়ে না পড়ে সে জন্য আলিবর্দি উভয় প(কে সামরিক শক্তি(বাড়াতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর কিছু আগেই ইংরেজরা কলকাতায় দুর্গসংস্কার এবং সেটির দুর্ভেদীকরণের প্রত্রি(য়া শু(করে। আলিবর্দির মৃত্যুর পর (এপ্রিল ১৭৫৬) মসনদে বসলেন তাঁর দৌহিত্র সিরাজ। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আলিবর্দির অপর দৌহিত্র শওকৎ জঙ্গ। ঘসেটি বেগম ছিলেন এই দুইজনেরই মাসী। তিনি শওকতের প(নিলেন। মসনদঘটিত এই বিবাদের প্রতি ইংরেজরা সজাগ দৃষ্টি রেখেছিল। তাদের ধারণা ছিল শওকৎ শেষপর্যন্ত জয়ী হবেন। তারা ফরাসীদের সঙ্গে শক্তি(পরী(ার জন্য তৈরি হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে ত(ণ নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজ বণিকদের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ, অবি(াস এবং বিদ্বেষ বাড়তেই লাগল।

সিরাজ মসনদে বসার পরে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ইংরেজরা নবাবকে কোনো নজরানা পাঠায়নি। এমনকি একবার কাশিমবাজারে তাদের এলাকায় ইংরেজরা সিরাজকে প্রবেশ করতেও দেয়নি। বলা বাহুল্য ইংরেজদের এই আচরণ নবাবের ভালো লাগেনি।

তবু এটিই যে সিরাজ-ইংরেজ বিরোধের একমাত্র কারণ সেটা ভাবলে ভুল করা হবে। ইংরেজদের বি(দ্ধে সিরাজের তিনটি অভিযোগ ছিল—

প্রথমতঃ ইংরেজরা নবাবের অপরাধী প্রজাদের আশ্রয় দিয়েছিল। সিরাজের শত্রু ঘসেটি বেগমের ডানহাত ছিলেন ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভ সেন। সিরাজ তাঁকে বরখাস্ত করে মুর্শিদাবাদে নজরবন্দি করে রাখেন। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ(দাস সপরিবারে ধনরত্নসহ ইংরেজের আশ্রয় নেন (১৭৫৬)। এই ঘটনায় (ু দ্ধ সিরাজ নবাব হয়ে ঘসেটি বেগমকে গৃহবন্দিনী করেন। ইংরেজকে পলাতক কৃষ(দাসকে তাঁর হাতে তুলে দিতে বলেন। কিন্তু কলকাতার গর্ভনর ড্রেক এই প্রস্তাবে রাজি হলেন না। ফলে সিরাজের (োভ বাড়ল। তাঁর ধারণা হল ইংরেজের সঙ্গে ঘসেটি বেগম এবং শওকৎ জঙ্গের গোপন যোগ আছে।

নবাবের দ্বিতীয় অভিযোগ দস্তকের ব্যবহার নিয়ে। সিরাজের পূর্বসূরীরাও এ ব্যাপারে ইংরেজদের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। কোম্পানির কর্মচারীরা তাদের ব্যক্তি(গত বাণিজ্যে শুল্কের রেহাই পাওয়ার জন্য দস্তক বা ছাড়পত্র ব্যবহার করতেন। তাছাড়া ইংরেজদের বহির্বাণিজ্য ছিল শুল্কমুক্ত(অন্তর্বাণিজ্য নয়। কিন্তু অন্তর্বাণিজ্যের (েত্রেও দস্তক ব্যবহার করে তাঁরা শুল্ক ফাঁকি দিতেন। এর ফলে নবাব তাঁর প্রাপ্য রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন।

তৃতীয়তঃ কলকাতার দুর্গসংস্কার এবং সুর(ার ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে নবাবের সঙ্গে ইংরেজের প্রত্য(সংর্ঘষ শু(হল।

কলকাতায় ইংরেজরা চন্দননগরের ফরাসীদের সঙ্গে পারস্পরিক বিবাদ ও লড়াই-এর সম্ভাবনায় নবাবের অনুমতি না নিয়েই দুর্গ সুর(িত করবার কাজ শু(করে দেয়। সার্বভৌম (মতার অধিকারী নবাব দুপ(কেই এ জাতীয় বেআইনী কাজ করতে নিষেধ করেন। ফরাসীরা নবাবের আদেশ মান্য করলেও ইংরেজরা নবাবের নির্দেশে কর্নপাত করল না। সিরাজ ঘসেটি বেগমকে গৃহবন্দিনী করার পর শওকৎকে দমন করবার জন্য পূর্ণিয়ার দিকে পা বাড়ালেন। এই সময় পথে গভর্নর ড্রেকের লেখা একখানি দুর্বিনীত চিঠি পেলেন নবাব। চিঠি পড়ে নবাব বুঝলেন দুর্গ নির্মাণ বন্ধ করার আদেশ ইংরেজরা মানবেন না। এই পরিস্থিতিতে শত্তকৎকে দমন করার চিন্তা স্থগিত রেখে ইংরেজের বি(দ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। তাদের কাশিম বাজার কুঠি এবং কলকাতার দুর্গ সহজেই নবাবের অধিকারভুক্ত(হল (জুন ১৭৫৬)। বিতাড়িত ইংরেজরা ফলতায় আশ্রয় নিল। হলওয়েলের সা(্য অনুযায়ী এই সময়েই কলকাতায় কুখ্যাত অন্ধকূপ হত্যা ঘটনা ঘটেছিল। এই ঘটনার কয়েক মাস পরেই চেন্নাই থেকে ক্লাইভ এবং ওয়াটসন এলেন এবং কলকাতার দুর্গ পুনরাধিকার করলেন (জানুয়ারী ১৭৫৬)। সেই সঙ্গে হুগলী লুণ্ঠন করলেন। স্বাভাবিক কারণেই ভয় পেয়ে নবাব আলিনগরের সন্ধি করে (ফেব্রুয়ারী ১৭৫৭) শান্তি ফিরিয়ে আনলেন। ইংরেজরা তাদের সমস্ত অধিকার ফিরে পেল। এর মধ্যে শত্তকৎ যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হওয়ায় সিরাজ নিষ্কন্টক হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক এস.সি. হিল উল্লিখিত তিনটি অভিযোগকে ইংরেজদের আত্র(মণ করার জন্য নবাবের মিথ্যা ছলনা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। হিল সাহেবের মত হল, সিরাজের দম্ভ এবং অর্থলিপ্সাই ছিল এই সংঘর্ষের মূল কারণ। বলা বাহুল্য হিলের এই দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতামত প(পাতদুষ্ট। তিনি এ (েত্রে সিরাজের প্রতি সুবিচার করেননি।

আলিনগরের সন্ধির পর ভিন্ন কারণে সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের আবার বিবাদ এবং সংঘর্ষ শু(হল। এই সন্ধির আগেই ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসীদের যুদ্ধ শু(হয়েছিল। (সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ)। ইংরেজরা চেয়েছিল বাঙলা থেকে ফরাসীদের উৎখাত করতে, যাতে তাদের বাণিজ্যিক সুবিধা হয়। তাছাড়া ইংরেজরা জানত নবাবও তাদের বি(দ্ধে ফরাসীদের ব্যবহার করতে পারবেন না। অতএব ক্লাইভ চন্দননগর দখল করে (১৭৫৭ মার্চ) ফরাসীদের বিতাড়িত করলেন। নবাব এই পরিস্থিতিতে ইংরেজদের বি(দ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন না বটে তবে বিতাড়িত ফরাসীদের তিনি আশ্রয় দিলেন। এদিকে ইংরেজদের শক্তি(দিনে দিনেই বাড়তে লাগল। ফলে নবাব পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন। তিনি ইংরেজদের চাপে ফরাসীদের চলে যেতে বাধ্য করলেন। কিন্তু এতেও ইংরেজদের প্রতি মনোভাব পাল্টাল না সিরাজের। তিনি ফরাসী সেনাপতি বুসীর সাহায্য চেয়ে চিঠি দিলেন। এই ঘটনায় ইংরেজদের চিন্তা ভিন্ন দিকে মোড় নিল। তারা চাইল বাংলা থেকে ফরাসীদের তাড়ানোর পর তাদের বন্ধুভাবাপন্ন কাউকে বাংলার সিংহাসনে বসাতে। অন্য দিকে মুর্শিদাবাদে একদল রাজপু(ষ এবং বণিক ঠিক একই রকম চিন্তাভাবনা করছিলেন। দেশী-বিদেশী এই সব ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে গোপন বৈঠক হল (১৭৫৭ এপ্রিল-মে)। বৈঠকে ব্যাপারটি পাকা হল যে সিরাজকে গদিচ্যুত করে তাঁর স্থলে মীরজাফর হবেন বাংলার নবাব। এ বিষয়ে তিনি ইংরেজদের সঙ্গে গোপন চুক্তি(ও সেরে ফেললেন (১৭৫৭, ৫ জুন)। পরিস্থিতি অনুকূল বিবেচনায় ইংরেজরা কালবিলম্ব না করে নবাবের বি(দ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করল। পলাশীর প্রান্তরে দুই প(মুখোমুখি হল। শু(হল বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসের এক রক্ত(াক্ত(অধ্যায়। মীরজাফর, রায়দুর্লভ এবং ইয়ারলতিক খান এই তিন ষড়যন্ত্রীর বি(্বাসঘাতকতায় পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭-২৩ জুন) নবাবের পরাজয় ঘটল। এরপর সিরাজ ধরা পড়লেন এবং তাঁকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হল।

৪.৩.৯.৩ : নাট্যকাহিনির ঐতিহাসিকতা বিচার

ইতিহাসের ‘তথ্য’ এবং কল্পনার ‘সত্য’র সার্থক মেলবন্ধনে সৃষ্টি হয় ঐতিহাসিক নাটক এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস। তাই ঐতিহাসিক নাটক ইতিহাস নয়। ইতিহাসের উপাদান এবং বিষয়বস্তুকে কল্পনার রসে জারিত করে রচিত হয় ঐতিহাসিক নাটক। কিন্তু ইতিহাসের তথ্যের প্রতি অবশ্যই নাট্যকারকে সত্যনিষ্ঠ থাকতে হয়। ইতিহাসের সুপ্রতিষ্ঠিত এবং স্বীকৃত ঘটনাকে বিকৃত করবার অধিকার নাট্যকারের নেই। ইতিহাসের ঘটনার শোভাযাত্রায় কেবল বৃহৎ এবং গু(ত্বপূর্ণ ঘটনাগুলিই স্থান পায়, প্রাধান্য পায়। কিন্তু ইতিহাসের কোনো একটি পর্বের উত্থান পতনের বিরাট আলোড়নে হারিয়ে যায় অনেক ছোট ঘটনা, উপে(িত হয় ঘটনার সঙ্গে যুত্ত(মানব হৃদয়ের অনেক অকথিত বেদনা। ঐতিহাসিক নাটক নাট্যকার সেই অকথিত আনন্দ বেদনার ভাষ্যরচনা করে থাকেন। আর এই কাজে যুগমানসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাল্পনিক চরিত্র ও ঘটনা সৃষ্টির অধিকার নাট্যকারের আছে। নাটকে এই কাল্পনিক চরিত্র ও ঘটনাগুলি যতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় ততই নাটকের সার্থকতা। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘রাজসিংহ’ উপন্যাসখানির ঐতিহাসিকতা বিচার করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস-নির্ভর উপন্যাস ও নাটকের মূল সত্যটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই উপন্যাসখানি প্রসঙ্গে তিনি ‘ইতিহাস এবং মানব উভয়কেই একত্র’ করে তোলার আশর্চ্য নিপুনতার কথা বলেছেন, ইতিহাসের ঘটনাকে যথাযথ রেখে ঐতিহাসিক নাটকে ‘মানব জীবনের মহিমা’ তুলে ধরাই হবে নাট্যকারের ল(। ইতিহাসের সত্য বিশেষ জাতির প(বিশেষকালের সত্য কিন্তু মানব জীবনের সত্য চিরকালের। এই সত্য দেশ ও কালকে অতিত্র(ম করে যায়। তাই ইতিহাসের সত্য আর জীবনের সত্য ভিন্ন উপলব্ধির বিষয়। জীবনের সত্য কাব্যের সত্য এবং রসগত সত্য। ইতিহাসের সত্য বহু চর্চার ফলে জীর্ণ, মতভেদে কন্টকাকীর্ণ। কিন্তু জীবনের সত্য, রসের সত্য চিরন্তন, চিরায়ত। ঐতিহাসিক নাটক দর্শককে যে রসানুভূতি দেয় রবীন্দ্রনাথ তাকেই ‘ইতিহাস রস’ বলেছেন। ইতিহাসের অধিকজন গ্রাহ্য তথ্যের ভিত্তিভূমিতে মানব জীবনের দ্বন্দ্ব সংঘাত এবং অনিবার্য পরিণতিকে রূপ দেওয়াই ঐতিহাসিক নাট্যকারের কাজ। ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাসের যে অধ্যায় বা কালপর্বকে নাট্যরূপ দেওয়া হয় তার কালসঙ্গতি সম্পর্কে নাট্যকারকে অবশ্যই অবহিত থাকতে হয়। নচেৎ কালানৌচিত (Anachronism) দোষ ঘটতে পারে।

পৃথিবীর প্রখ্যাত নাট্যকারগণ প্রায় সকলেই সার্থক ঐতিহাসিক নাটক লিখেছেন। শেক্সপীয়রের ঐতিহাসিক নাটকগুলি বি(েসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। নাটক যেহেতু দ্বন্দ্বময় জীবনের ইতিবৃত, সেহেতু নাট্যকারগণ নাটকীয় সংঘাত ও দ্বন্দ্বসৃষ্টির জন্য ইতিহাসের বিশেষ ঘটনাকে নির্বাচন করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঐতিহাসিক নাটক ঘটনা প্রধান বা ব্যত্তি(প্রধান হতে পারে। দ্বিজেন্দ্রলালের ‘মেবার পতন’ ঘটনানির্ভর ঐতিহাসিক নাটক। অন্যদিকে ‘সাহাজান’, ‘চন্দ্রগুপ্ত’, ‘নূরজাহান’, ব্যত্তি(প্রধান বা চরিত্র প্রধান নাটক। গিরিশচন্দ্রের ‘মীরকাশিম’, ‘ছত্রপতি শিবাজী’ চরিত্রপ্রধান নাটক।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ‘সিরাজদ্দৌলা’ চরিত্র প্রধান ঐতিহাসিক নাটক। বাংলা নাটকের সূচনাপর্ব থেকেই ঐতিহাসিক নাটক লেখা হয়ে আসছে। মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র, (ীরোদ প্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি নাট্যকারগণের ঐতিহাসিক নাটকগুলি বাংলা নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

বিংশ শতাব্দীতে বঙ্গভঙ্গ ইত্যাদি জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিতে ঐতিহাসিক নাটক নতুন তাৎপর্য লাভ করেছিল। এই সময় ‘প্রতাপাদিত্য’, ‘শিবাজী’, ‘সিরাজদ্দৌলা’ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যত্তি(ত্বকে পরাধীন ভারতের মুত্তি(আকাঙ্খার প্রতীক রূপে প্রতিষ্ঠিত করে লেখা হয়েছে একাধিক নাটক। তাই এই সময়ের

অধিকাংশ ঐতিহাসিক নাটকই স্বদেশিকতার প্রেরণা সঞ্চারি। এই কালোচিত চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির কথা মনে রেখেই নাটকগুলির ঐতিহাসিকতা বিচার করতে হবে।

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলাকে নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে একাধিক নাটক লিখিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সবার আগে মনে পড়ে গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকটির নাম। তৎকালীন ঐতিহাসিকগণের অনুসন্ধান নির্ভর তথ্যাদি নির্ভর করেই গিরিশচন্দ্র নাটকখানি লেখেন। এই নাটকে গিরিশচন্দ্র সিরাজকে স্বদেশপ্রেমিক, প্রজাবৎসল ও জননায়ক রূপে চিত্রিত করেন।

পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক গবেষণায় সিরাজ সম্পর্কে ভিন্ন মত প্রকাশ পেয়েছে। সিরাজ সম্পর্কে পূর্ববর্তীদের সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়েছে। আধুনিক গবেষকদের মতে—

(ক) সিরাজ দুশ্চরিত্র মদ্যপ এবং লম্পট ছিলেন।

(খ) রাজ্য শাসনে তাঁর যথেষ্ট যোগ্যতা ছিল না।

(গ) স্বদেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদী চেতনার কোনো পরিচয় সিরাজ চরিত্রে ছিল না। কারণ স্বদেশ প্রেমের উপলব্ধির উদ্ভব ঊনবিংশ শতকেই ঘটেছিল তার আগে নয়।

যাই হোক গিরিশচন্দ্র ও শচীন্দ্রনাথ উভয়েই সিরাজদ্দৌলার রাজত্বকালের কয়েকটি প্রধান ঘটনা এবং তাঁর ব্যক্তি(জীবনের ট্র্যাজেডিকে ভিত্তি করেই তাঁদের নাটক লিখেছেন। এ(ে ত্রে ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতি আনুগত্য গিরিশচন্দ্রের যতটা, শচীন্দ্রনাথের ততটা নয়।

শচীন্দ্রনাথের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকখানি সং(িপ্ত এবং সংহত। সে তুলনায় গিরিশচন্দ্রের নাটকখানির বিস্তৃতি অনেক বেশি। মাত্র তিনটি অঙ্কেই নাটকখানি শেষ করেছেন শচীন্দ্রনাথ। সেইজন্য ঘটনাও বাহুল্য বর্জিত। নাট্যকার ঐতিহাসিক কাঠামোর মধ্যেই কাহিনি সীমাবদ্ধ রেখেছেন। গিরিশচন্দ্রের মতো তিনিও লিখিল নাথ রায়, অ(য় কুমার মৈত্রের সিরাজ সম্পর্কে অনুসন্ধাকেই নাটকীয় উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

ইতিহাসের কাহিনি অনুসরণ করেই নাটকের ঘটনা বিন্যাস করেছেন শচীন্দ্রনাথ। নাটকের সূচনাতেই দেখা যাচ্ছে রাজ্যের প্রধানগণ সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আলেয়া এবং গোলাম হোসেনের সাবধানবাণীর মধ্যে দিয়েই নাট্যকার সেটা জানিয়েছেন। এই ষড়যন্ত্র যে ঐতিহাসিক সত্য তাতে সন্দেহ নেই (এ বিষয়ে 'সিরাজদ্দৌলা ও ইংরেজদের মধ্যে বিরোধের কারণ' অংশে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে)। ইতিহাসের জটিল এবং বিতর্কিত ঘটনাবর্তের মধ্যে শচীন্দ্রনাথ প্রবেশ করেননি। সূত্রাকারে ঘটনাগুলি চরিত্রের মুখে ব্যক্ত(হয়েছে। নাট্যকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সিরাজকে স্বদেশপ্রেমের প্রতীক রূপে প্রতিষ্ঠিত করা। তবে সিরাজ চরিত্রের দুর্বলতা ও অপবাদগুলি নাট্যকার উপে(া করেননি। সিরাজের সংলাপের মধ্যে সেটিকে প্রকাশ করেছেন ঠিক তেমনি সুকৌশলে সেগুলিকে খণ্ডনও করেছেন। সিরাজের সংলাপ থেকে জানা যায় সিংহাসনলাভের পূর্বে তাঁর জীবনে যে উশৃঙ্খলতা ও ভোগপ্রবৃত্তি ছিল সিংহাসনলাভের পর তার পরিবর্তন ঘটেছে এটিই নাট্যকারের বক্ত(ব্য। তাই তাঁর সংলাপে নারী সম্পর্কে একটি দার্শনিক উপলব্ধির পরিচয় ফুটে উঠেছে।

সিরাজ—"প্রথম যৌবনের উন্মাদনায় নারী চেয়েছি ও পেয়েছি। নারীকে তখন দেখেছি শুধু ভোগের সামগ্রীর মতো। আর সে উদ্মাদনা নেই। আজ নারীর কাছে আমার নানা দাবী। রাজ্য যা দিতে পারে না। প্রভুত্ব যা দিতে পারে না, পরাত্র(ম যা দিতে পারে না, অথচ যা না পেলে জীবন ম(ভূমির মত শুষ্ক হয়ে যায়, তাই আমি চাই নারীর কাছে।' (২/২)

পরিবর্তিত সিরাজকেই শচীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকের নায়ক করেছেন, তার কারণ ঐতিহাসিক সিরাজ চরিত্র নাট্যকারের ল(বস্তু নয়, দেশপ্রেমিক সিরাজকে তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন দেশ প্রেমের উদাত্তবাণী প্রচারের জন্য।

'সিরাজদ্দৌলা' নাটকখানিকে পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক নাটক রূপে উপস্থিত করার পরিকল্পনা শচীন্দ্রনাথের ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন দেশপ্রেম উত্তপ্ত একখানি নাটক রচনা করতে। তাই ইতিহাসের প্রতি অতিরিত্ত(আনুগত্য দেখবার প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি। তাছাড়া ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে নাট্যকারের ধারণাটিও তাঁর কথাতেই ব্যত্ত(হয়েছে তিনি বলেছেন—

'ইতিহাস ঘটনাপঞ্জি, নাটক তা নয়। ঐতিহাসিক লোকের ঘটনাবহুল জীবনের মাত্র একটি ঘটনা অবলম্বন করেও একাধিক নাটক রচনা করা যায়। এই জন্যই যে ঘটনা নয়, ঘটনাটি ঘটাবার কারণই নাট্যকারের বিষয়বস্তু।'

শচীন্দ্রনাথ ইতিহাসের ঘটনা থেকে ইতিহাস চেতনার উপরেই বেশি জোর দিয়েছেন। আর সেই জন্যই ইতিহাসের ঘটনাস্তুপের মধ্যে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেননি।

কিন্তু এটাও অবশ্য ল(ণীয় ইতিহাসকেও তিনি কোথাও বিকৃত করেননি। চরিত্র চিত্রণেও আছে ইতিহাসের আনুগত্য। সিরাজের বি(দ্ধে স্বদেশ ও বিদেশের কিছু মানুষের ষড়যন্ত্র ইতিহাস স্বীকৃত। ঘসেটি বেগমের চরিত্র ও কর্মকাণ্ড অবশ্য ইতিহাস স্বীকৃত। কাহিনি বিন্যাস ও নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্য একাধিক অনৈতিহাসিক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন নাট্যকার। আলেয়া এবং গোলাম হোসেন চরিত্র দুটি নাটকে অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ জাতীয় চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকার অসাধারণ দ(তার পরিচয় দিয়েছেন। সিরাজের পতন এবং পরিণাম ইতিহাসসম্মত (দানসা সিরাজকে ধরিয়ে দেয় এর মীবনের আদেশে মহম্মদী বেগ তাঁকে হত্যা করে)। ঐতিহাসিক তথ্যের অপ্রতুলতার জন্য শচীন্দ্রনাথের 'সিরাজদ্দৌলা নাটকখানিকে ঐতিহাসিক নাটক বলে চিহ্নি(ত করতে দ্বিধার কোনো কারণ নেই।

৪.৩.৯.৪ : আদর্শ প্র(্নাবলী

১। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে সিরাজ চরিত্রে কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মসমালোচনা লক্ষ করা যায় কিনা বিচার করো।

২। ঐতিহাসিক নাটকের লক্ষণগুলি 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে কতখানি বর্তমান তা বিচার করো।

৩। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকটির ঐতিহাসিকতা বিচার করো।

৪। সমগ্র জাতির ট্রাজিক পরিণতির প্রতীক হিসেবে সিরাজ চরিত্রটির সার্থকতা ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও চিত্ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা নির্দেশ করো।

পর্যায়গ্রন্থ - ৩

একক - ১০

ট্রাজেডি প্রসঙ্গ

বিন্যাসত্র(ম :

৪.৩.১০.১ : সংলাপ

৪.৩.১০.২ : ট্র্যাজেডি প্রসঙ্গ

৪.৩.১০.৩ : আদর্শ প্র(াবলী

৪.৩.১০.১ : সংলাপ

নাটকের গুণাগুণ উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচারে সংলাপ সম্পর্কে আলোচনা অপরিহার্য। প্রকৃতপ(সংলাপের মধ্যেই নাটকের প্রাণশক্তি(নিহিত থাকে। নাটক তন্ময় (objective) শিল্পপ্রকরণ। সেজন্য অন্তরালবর্তী নাট্যকারের বক্ত(ব্য চরিত্রের সংলাপের মধ্যে দিয়েই উপস্থাপিত হয়। চরিত্রের যথাযথ উপস্থাপনার এবং পরিস্ফূটনের (েত্রেও সংলাপের ভূমিকা গু(ত্বপূর্ণ। সংলাপ রচনার সময় অবশ্যই সচেতন থাকতে হয়। সংলাপ যেন চরিত্র, ঘটনা এবং চরিত্র বিকাশের সহায়ক হয়। সংলাপের মধ্যে দিয়েই চরিত্রের যথার্থ উন্মোচন ঘটে।

তিরিশের দশকে শচীন্দ্রনাথ যখন 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকখানি লেখেন তখন বাংলা নাটকের সংলাপ যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। ইতিমধ্যে বাংলা গদ্যও যথেষ্ট সাবলীল এবং নমনীয় হয়েছে। প্রতিভাধর নাট্যকারগণ সে সুযোগ গ্রহণ করে নাট্যসংলাপকে শিল্পীত করে তুলেছেন প্রয়োজন মত। গিরিশচন্দ্র নাট্যসংলাপের একটি বিশিষ্ট ধারার প্রবর্তন করেছিলেন। সেটি বহুলাংশে পরিস্ফূট এবং শিল্পরূপ লাভ করেছে দ্বিজেন্দ্রলালে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের প্রাণশক্তি(নিহিত আছে আশর্ম্ব আবেগধর্মী সংলাপের মধ্যে।

নাট্যসংলাপের এই ধারাবাহিকতা অনুসরণ করেই শচীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে সংলাপ রচনা করেছেন। শচীন্দ্রনাথের পূর্বে গিরিশচন্দ্র সিরাজদ্দৌলার ক(ণ জীবনালেখ্য নিয়ে নাটক রচনা করেছেন। কিন্তু নাট্য সংলাপে গিরিশচন্দ্রের সাফল্য কোনোদিনই প্র(াতীত ছিল না। আবেগ উচ্ছ্বাসের তীব্র স্রোতে ভেসে গিয়েছে তাঁর সংলাপ। অতি আবেগধর্মী সংলাপ অনেক সময় নাটকীয় রস সৃষ্টির বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিজেন্দ্রলালের সংলাপও উচ্ছ্বাসধর্মী আবেগ প্রধান। আর ভাবাবেগ প্লাবিত সংলাপই ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য সাফল্যের চাবিকাঠি। এই জাতীয় সংলাপ দর্শকের মনে একটি তাৎ(ণিক আবেদন এনে দেয় বটে কিন্তু অনেক(েত্রেই নাটকের স্বাভাবিক গতিধারা ও সংহতিকে ব্যাহত করে।

শচীন্দ্রনাথের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকটির অসাধারণ জনপ্রিয়তার কারণ তার কাব্যগন্ধী মর্মস্পর্শী সংলাপ একসময় এই নাটকের সংলাপগুলি লোকের মুখে মুখে ফিরেছে। দর্শকমনে আবেগ ও উন্মাদনা সৃষ্টিতে নাট্যকার যে যথেষ্ট সফল হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। গিরিশচন্দ্রের উচ্ছ্বাসবহুল সংলাপের সঙ্গে তুলনা করলে শচীন্দ্রনাথের সংলাপগুলি অনেক বেশি চরিত্রানুগ এবং মর্মস্পর্শী বলেই মনে হয়। স্বাদেশিকতার আবেগ সঞ্চারিত করবার প(এই সংলাপ যে যথেষ্ট অনুকূল ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

গিরিশচন্দ্র তাঁর সিরাজদ্দৌলা নাটকে একাধিক স্থানে 'গৈরিশ ছন্দ' ব্যবহার করেছেন। এমনকি

নাটকের চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে সিরাজের স্বগতোক্তি(ও লেখা হয়েছে গৈরিশ ছন্দে। শচীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে কোথাও ছন্দ-সংলাপ ব্যবহার করেননি।

নাটকের সূচনা থেকেই নাট্যকার দর্শকের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য সংলাপে সহায়তা গ্রহণ করেছেন। সিরাজ নবাব আলিবর্দির মৃত্যুর পর সিংহাসন লাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই রাজ্যলাভ নিষ্কন্টক ছিল না। একদিকে বিদেশী ইংরেজদের ঔদ্ধত্য দিনে দিনেই বেড়ে চলেছিল অন্যদিকে তাঁর ঘনিষ্ঠ আমত্যবর্গ, আত্মীয়জন একটি ষড়যন্ত্রে জাল বিস্তার করতে তৎপর হয়েছিলেন। এই পরিস্থিতির পরিপ্রে(তে সিরাজের আত্মকথন মূলক আবেগময় সংলাপ দর্শকের মনে ভাবাবেগ সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। নবাব বলেছেন—

সিরাজ। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার মহান অধিপতি। তোমার শেষ উপদেশ আমি ভুলিনি জনাব। ইউরোপীয় বণিকদের উদ্ধত ব্যবহার আমি সহ্য করব না। তোমার রাজ্যে আমি তাদের মাথা তুলে দাঁড়াতে দেব না।

এই সংলাপটুকুতে একদিকে যেমন সিরাজের আত্মপ্রত্যয় ঘোষিত অন্যদিকে তেমনি তাঁর অনাগত সংঘাতময় দিনগুলির বিপদ সংকেত ঘোষিত হয়েছে।

কোনো কোনো (েত্রে তাঁর সংলাপে আবেগ বা হৃদয়ানুভবের কোনো চিহ্(নেই। শচীন্দ্রনাথ 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকখানি রচনা করেছিলেন একটি বিশেষ যুগানুভবকে উদ্বুদ্ধ করতে। আর সেই তিনি সিরাজদ্দৌলাকে দেশপ্রেমিকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নাটকে। সিরাজদ্দৌলার সংলাপে তাই দেশপ্রেমের তপ্ত অনুভূতি। গোলাম হোসেনকে তিনি বলেছেন—

"গোলাম হোসেন বাঙলাকে তোমাদের মতো আমি তো ভালোবাসিনি। তবু আজ নিজের সব দুঃখ দুর্দশা ছাপিয়েও বাঙলার কথাই কেবল বারবার মনে পড়ে কেন? বাংলা কি আমাকে ভালো বেসেছিল গোলাম হোসেন?"

ইংরেজের বন্দিশালায় সিরাজের সংলাপগুলি বাঙালির হৃদয়কে সহজেই স্পর্শ করে যায়। মৃত্যু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সিরাজ একবার শেষ চেষ্টা করতে চেয়েছিলেন বাংলা আর বাঙালিকে বিদেশী বণিকদের আর ষড়যন্ত্রকারীদের হাত থেকে র(া করতে। তাই অপমানে (তবি(ত হয়েও সাধারণ মানুষের কাছে আকুল আবেদন জানিয়েছেন তিনি। মর্মমাথিত ব্যাকুলতায় সিরাজ বলেছেন—

'তাই যদি সত্য জানো। সত্যই যদি বুঝে থাকো তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য, তাহলে এস ভাই সব, এস আর একবার চেষ্টা করে দেখি, পলাশীর প্রান্তরে যা আমরা হেলায় হারিয়ে এসেছি, বঙ্গজননীর কনককীরিটে আবার তা পরিয়ে দিতে পারি কিনা?'

মৃত্যুর পূর্বে সিরাজের সংলাপটি হৃদয় বিদারক। এই দৃশ্যে সিরাজের বেদনার সমব্যথী হয়ে যায় দর্শকরা। আর সেইসঙ্গে সিরাজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল আর গৌরবময় হয়ে ওঠে। মহম্মদী বেগের ছুরিকাঘাতের পর—"দিলে না। শেষ চেষ্টা ওরা করতে দিলে না। বাঁচতে দিলে না আমাকে। কাউকে অভিশাপ দেব না। সুখে থাক ভাই সব। বাংলায় শান্তি ফিরে আসুক।"

গোলাম হোসেনের দ্ব্যর্থব্যঞ্জক সংলাপগুলি নাটকের অন্যতম আকর্ষণ। বিদেশী চরিত্রগুলির সংলাপ অধিকাংশ (েত্রেই ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করেছেন নাট্যকার। সাধারণত বিদেশী চরিত্রেই মুখে ভাঙা বাংলা এবং হিন্দি শব্দ মিলিয়ে খিচুড়ি সংলাপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শচীন্দ্রনাথ তুলনামূলকভাবে খুব কমই ভাঙা বাংলা ব্যবহার করেছেন। সাহেবদের মুখে কোথাও কোথাও হিন্দি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে অবশ্য।

যেমন —

ওয়াটস — 'আপনারা বিচারে ভুল করেন। আপনারা.....বহুত দূর কি আছে দেখিতে পান না। আপনারা সকলেই নবাব হইতে চাহেন, ভাবিয়া দেখেন না that there is only one throne in Bengal সিংহাসন আছে এক। রাজবল্লভ উহাতে বসিবেন ও জাফর আলি গলা কাটিবেন। জাফর আলি নবাব হইলে শেঠরাজা গোঁসা হইলেন।'

সামাগ্রিক ভাবে বলতে গেলে সং(প্তা ঋজুতা ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে আবেগময়তার মেলবন্ধনে শচীন্দ্রনাথের সিরাজদ্দৌলা নাটকটির সংলাপ একটি বিশেষ আদর্শ স্থাপন করেছে।

৪.৩.১০.২ : ট্র্যাজেডির প্রসঙ্গ

ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা এবং রসনিষ্পত্তি বিষয়ে এতাবৎ বহু বিচার বি(-ষণ হয়েছে। নাট্যতত্ত্ববিদ্ অ্যারিস্টটলের নির্ধারিত সংজ্ঞা অনুসরণ করে পরবর্তী নাট্য সমালোচক অগ্রসর হয়েছেন। অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা নি(পণ করে বলেছেন- "The imitation of an action that is serious and also, as having magnitude, complete, in itself" আলোচনা মূলক নয়, নাট্যরূপেই ট্যাজেডির যথার্থ পরিচয়। ট্যাজেডি দর্শকের মনে "incidents arousing pity and fear" (ঘটনাগুলি ভয় ও ক(ণার সঞ্চার করে)। এই প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটল 'Catharsis' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যার প্রকৃত তাৎপর্য হল Purgation বা 'Pugification'। অর্থাৎ আমাদের মনে জমে থাকা অনুভবের শুদ্ধিকরণ বা মো(ণ। এই বিশেষ চিত বৃত্তির অনুভব সঞ্চারের জন্য নায়ককে হতে হবে সাধারণ মানুষ থেকে উঁচু স্তরের মানুষ। যার পতনের ফলে দর্শকের মনে ক(ণা ও ভয়ের সঞ্চার হবে। নায়কের পতন একাধিক কারণে হতে পারে। কোথাও নায়কের পতন ঘটে নিয়তির নিষ্ঠুর অঙ্গুলি হেলনে (গ্রীক ট্যাজেডি) আবার কোথাও নায়কের পতনের বীজ নিহিত থাকে তার চরিত্রের মধ্যেই (শেক্সপীরিয়ান ট্রাজেডি)। কখনো ভাগ্যই হবে চরিত্রের পরিণতি আবার কখনো চরিত্রই ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করবে। গ্রীক ট্রাজেডি এবং শেক্সপীরীয় ট্রাজেডি চিন্তার মৌলিক পার্থক্য এখানেই। ট্রাজেডির দুঃখান্তক পরিণাম দর্শক চিত্তে ক(ণার সঞ্চার করলেও এই কৃত্রিম বেদনাবোধের মধ্যে দিয়ে চিত্তের শুদ্ধিকরণ বা মো(ণ ঘটে। তাই ট্র্যাজেডি বেদনাদায়ক পরিণাম দর্শকের চিত্তে আনন্দ দেয়। গ্রীক এবং শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডিগুলি বি(্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার মর্মান্তিক পরিণতির ঘটনাটিকে নাটকের বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচন করেছেন। নাটকটিতে সিরাজের মর্মান্তিক ভাগ্য বিপর্যয়ের বেদনাময় কাহিনি নাটকে উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার। নাটক সিরাজদ্দৌলা নায়ক। সিরাজদ্দৌলা ব্যক্তি(-ট্র্যাজিডে নির্ভর নাটক।

নবাব সিরাজদ্দৌলা সামাজিক বিচারে উচ্চস্তরের ব্যক্তি(ত্ব। কিন্তু নাটকে সিরাজকে কেবল নবাব হিসেবেই দেখানো হয়নি। নাটকে সিরাজ জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক এবং স্বাধীন বাংলার শেষ প্রতিনিধি। সিরাজচরিত্র অঙ্কনে নাট্যকার ঐতিহাসিক তথ্যের উপরে বিশেষ গু(ত্ব দেননি। ইতিহাস বলে, সিরাজ ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল, অত্যাচারী, লম্পট এবং স্বেচ্ছাচারী নবাব। এই চারিত্রিক দুর্বলতাই ছিল তাঁর বি(দ্ধে বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সচেতন ভাবেই সিরাজের চরিত্রের এই কলঙ্কময় দিকটিকে উপে(া করেছেন। এই নাটকে সিরাজ লম্পট, অত্যাচারী সিরাজ নন, তিনি দেশপ্রেমিক মহৎ-হৃদয় ব্যক্তি(ত্ব। সুতরাং সিরাজদ্দৌলার ভাগ্যবিপর্যয় অনিবার্য ভাবেই দর্শকের মনে ট্র্যাজেডির বেদনা সঞ্চার করে।

নাটকটির ঘটনা এবং ঐতিহাসিক পটভূমি অবশ্যই ট্র্যাজিক রসসৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। পলাশীর

যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে বাঙলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং পরিবেশ ছিল কুয়াশাচ্ছন্ন। বাঙলার সিংহাসনকে ঘিরে অবি(্বাস, ষড়যন্ত্র, বি(্বাসঘাতকতার বিষবাস্প এক পাপচক্রে(র সৃষ্টি করেছিল। এই ভয়ঙ্কর (্বাস(দ্ধকারী পরিবেশে, নবাব একা সমস্ত প্রতিকূলতার বি(দ্ধে সংগ্রাম করেছেন। সিরাজ মর্মস্পর্শী ভাষায় দেশকে ইংরেজের দুষ্ট অভিসন্ধি থেকে র(া করার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করে বলেছেন— 'ইউরোপীয় বণিকদের উদ্ধত ব্যবহার আমি সহ্য করব না। ....আমি বেঁচে থাকতে তোমার রাজ্যে তারা দুর্গ তৈরী করতে পারবে না। সৈন্য সমাবেশে স(ম হবে না।' (১/১)

সিরাজের বি(দ্ধে তখন ষড়যন্ত্রের জাল জটিল ও বিস্তৃত হয়েছে। একদিকে ঘসেটি বেগম, সৌকত জঙ্গ আর অন্যদিকে মীরজাফর, রায়দুর্লভ। জগৎশেঠের দল সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করতে সক্রি(য় হয়ে উঠেছে। ব্যক্তি(ও জাতির জীবনের এই চরম বিপদের দিনে নবাবের পাশে একমাত্র আলেয়া আর গোলাম হোসেন। আলেয়া প্রতি নিয়ত ইংরেজ এবং নবাবের তথাকথিত আস্থাভাজন মানুষের গোপন ষড়যন্ত্রের কথা নবাবকে জানিয়েছে।

নবাবের এই অসহায়তা এবং তাঁর স্বদেশ র(া ব্যাকুলতা দর্শকে মনে তাঁর প্রতি গভীর মমত্ববোধের সৃষ্টি করেছে।

সিরাজের চারিত্রিক দুর্বলতাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছে ষড়যন্ত্রকারীরা রাজা রাজবল্লভ বলেছেন—

'রানী ভবানীর কন্যার প্রতি আসক্তি(র কথা এমন কৌশলে প্রচার করেছে যে বাঙলার সমগ্র হিন্দু জমিদারেরা, হিন্দু প্রজারা সমস্ত মন দিয়ে সিরাজের ধ্বংস কামনা করছে।'

নাট্যকার সিরাজকে সর্বগুণযুক্ত(নায়ক হিসেবে চিত্রিত করেননি। সিরাজের চরিত্রের দোষত্রুটি গুলিতে সচেতন ভাবে খণ্ডন করেছেন তিনি। নায়ক হিসেবে পরিচ্ছন্ন চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন নাট্যকার। সিরাজের চারিত্রিক দুর্বলতাগুলি নিছক 'লোকপবাদ' বলেই গু(ত্বহীন করেছেন নাট্যকার, অন্যদিকে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি গভীর মমত্ববোধে উদ্দীপ্ত সিরাজ চরিত্রটিকে একটি সুউন্নত (ে(ত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তার ফলে নায়কের মর্মান্তিক পরিণতি দর্শকের মনে ক(ণা ও ভয়ের অনুভূতি এনে দেয়। চারিদিকের প্রতিকূলতার সঙ্গে সিরাজের একক সংগ্রাম এবং তাঁর অসহায় অবস্থা নাটকে একটি সহানুভূতির বাতাবরণ সৃষ্টি করে। গোলাম হোসেন এবং আলেয়ার সাবধানবানী সত্ত্বেও সিরাজ অপ্রতিরোধ্য সর্বনাশ থেকে নিজেকে র(া করতে পারেননি। এ যেন নিয়তির নিষ্ঠুর অঙ্গুলি নির্দেশ। গ্রীক ট্র্যাজেডির নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত ভাগ্যের কথাই এখানে মনে করিয়ে দেয়। সিরাজ চরিত্রে সক্রি(য়তার অভাব ছিল না। ঘসেটি বেগমের ষড়যন্ত্রের জাল তিনি ছিন্ন করেছেন। কাশিমবাজার কুঠিতে ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রীদের গোপন পরামর্শ বানচাল করে দিয়েছেন। আদেশ অমান্য করে দুর্গ নির্মাণ করার জন্য ইংরেজ দূতকে কঠোর তিরস্কার করতেও তিনি দ্বিধা করেননি। কিন্তু যথেষ্ট সক্রি(য়তা সত্ত্বেও শেষ র(া হয়নি। নায়ক চরিত্রের দুর্বলতাই শেষপর্যন্ত তাঁর ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সারল্য এবং নির্বিচারে স্বজন পরিজনকে বি(্বাস করাই সিরাজের পতনের প্রত্য(কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। মীরজাফরকে বি(্বাসঘাতক জেনেও তাঁর হাতেই যুদ্ধের দায়িত্ব তুলে দিয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছেন তিনি। আলেয়াকে নবাব বলেছেন—

'মীরজাফরকে তুমি জাননা, কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করেছেন, আর কখনো আমার বি(দ্ধাচারণ করবেন না।'

যুদ্ধে জয় যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে ঠিক তখনই মীরজাফরের বি(্বাসঘাতকতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন নবাব।

সিরাজ — 'আমি আর ভাবতে পারছি না। সিপাহসালার আপনিই আমার ভরসাস্থল। যা ভালো বোঝেন, আপনি ক(ন।'

সিরাজের বিচারহীন সরলতাই তাঁর পতনের কারণ-আলেয়া আর গোলাম হোসেনের কথায় সেটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আলেয়া। 'এমন সরল বি(াসী লোকের নামেও দুর্নাম রটে।'

গোলাম হোসেন। 'বাঙলার নবাবের এই সারল্যই বাঙলার অপরিসীম দুঃখের কারণ হয়ে রইল।'

সিরাজদ্দৌলা নাটকে সিরাজের মর্মান্তিক মৃত্যুর মধ্যেই নাটকের সমাপ্তি। পলাশীর যুদ্ধে সৈনিকর পরাজয়ের পর আত্মর(ার জন্য পলায়ন ছাড়া গত্যন্তর ছিল না সিরাজের। কিন্তু শেষপর্যন্ত নিয়তি আবার তাঁর সঙ্গে বি(াসঘাতকতা করেছে। তাঁর পায়ের জুতোতেই পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে নবাবের। মহম্মদী বেগ ব্যঙ্গ করে ছেঁড়া জুতো উপহার দিয়েছে নবাবকে। বলেছে—

'জুতোর জন্য আপনি ধরা পড়েছেন তাই ও জুতো পাল্টে ফেলে এই জুতো প(ন হুজুর।'

যে মহম্মদী বেগ একদিন নবাবের অনুগত্য লাভ করেছিল তাঁর অস্ত্রের আঘাতেই মৃত্যুবরণ করেছেন নবাব। অস্ত্রাঘাতের পূর্বমুহূর্তে মহম্মদী বেগকে চিনতে পেরে সিরাজের মর্মান্তিক আর্তনাদ—

'তুমি! মহম্মদী বেগ তুমি।'

নাটকের এই অন্তিম মুহূর্তটি দর্শকের মনে তীব্র প্রতিত্রি(য়ার সৃষ্টি করে ক(ণা এবং বিস্ময়ের যুগপৎ অনুভূতিতে ট্র্যাজিক বেদনার সঞ্চার হয়।

একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের শেষ দৃশ্যটি অতিনাটকীয়তার (মেলোড্রামা) পরিচয় বহন করছে। মঞ্চের উপরে সিরাজের হত্যাকাণ্ডের মধ্যে খানিকটা চমক সৃষ্টির প্রয়াস আছে। নাটকে অতিমাত্রায় ভাবাবেগ সৃষ্টি করার জন্যই নাট্যকার হত্যাকাণ্ডের এই দৃশ্যটির অবতারণা করেছেন বলে মনে হয়।

৪.৩.১০.৩ : আদর্শ প্র(াবলী

১। সিরাজের ষড়যন্ত্র কন্টকিত বিষাদঘন জীবননাট্যে আলেয়া এবং গোলাম হোসেনের ভূমিকার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

২। বিষাদান্ত নাটক (ট্রাজেডি) হিসেবে 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের মূল্য নির্ধারণ করো।

৩। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের সংলাপ রচনার নাট্য সার্থকতা বিচার করো।

৪। স্বাধীনতা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে নব্যজাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা'– নাটকে কাহিনী ও চরিত্র সৃজনের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে তা' সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো।

পর্যায়গ্রন্থ - ৩

একক - ১১

নাটকে গানের তাৎপর্য

বিন্যাসত্র(ম :

৪.৩.১১.১ : নাটকে গানের তাৎপর্য

৪.৩.১১.২ : কাহিনি বি(-ষণ : বিন্যাসরীতি এবং শিল্প প্রকরণ

৪.৩.১১.৩ : নাটকের অন্তিম দৃশ্যটির শিল্পমূল্য—জনতা চরিত্র চিত্রণে দ(তা

৪.৩.১১.৪ : আদর্শ প্র(াবলী

৪.৩.১১.১ : নাটকে গানের তাৎপর্য

বাঙালির জীবনচর্চার সঙ্গে গান অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে আছে। পদাবলী আর বাউলের গানে বাঙলার আকাশবাতাস মুখোরিত। তাই বাঙালি সঙ্গীতহীন নাটক কল্পনাও করতে পারেনা। বাংলা নাটকের ঊষালগ্নে অর্থাৎ ঊনিশ শতকের মধ্যপর্বেই নাটকের সঙ্গে গানের গাঁটছড়া বাঁধা শু(হয়েছিল। বাংলার যে দেশজ নাট্য প্রকরণ যাত্রাও ছিল সঙ্গীত নির্ভর। তাই বাংলার নাট্যকারগণ মনমোহন বসু, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকে গানের সুন্দর শিল্পীত ব্যবহার করেছেন। এঁরা সকলেই নাটকের জন্য গান রচনা করেছেন এবং সেগুলির সুমিত ব্যবহারে নাটকগুলিকে আবেগধর্মী করে তুলেছেন। পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটকেই গানের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। বিশেষ করে স্বদেশী যুগে দর্শকের মনে স্বাদেশিকতার আবেগ সঞ্চারের জন্য গানের ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের প্রাণশক্তি(সন্ধান গানের মধ্যেই পাওয়া যাবে। রবীন্দ্র নাটকের গভীর অনুভব সমৃদ্ধ গানগুলি দর্শকের হৃদয়ে অচিন লোকের স্পর্শ বহন করে আনে। কালের পরিবর্তনে অনিবার্য ভাবেই নাটকের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটেছে। তবু আধুনিক জীবনধর্মী নাটকেও গান বর্ণিত হয়নি। বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী প্রভৃতি আধুনিক নাট্যকারগণও তাঁদের নাটকে প্রচুর গান সংযোজিত করেছেন।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখ্য, সেটি হল নাটকের গানের ব্যবহারে যেমন একটি ইতিবাচক দিক আছে তেমনি তার অতিপ্রয়োগ বা অপপ্রয়োগ সম্পর্কেও সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা' ইতিহাস নির্ভর নাটক। নবাব সিরাজদ্দৌলার রাজত্বকালে স্বদেশী এবং বণিকদের চত্র(ান্ত বি(াসঘাতকতা এবং তাঁর রাজত্বের অবসান এবং মর্মান্তিক মৃত্যুর ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত নিয়ে শচীন্দ্রনাথের আগে 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকখানি লিখেছিলেন গিরিশচন্দ্র। তৎকালীন দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকে দশখানি গান যুক্ত(করেছিলেন। অবশ্য তাঁর নাটকের সবগানগুলিই যে সুপ্রযুক্ত(এমন বলা যায় না। এই নাটকের সব গানগুলি গিরিশচন্দ্র নিজেই লিখেছিলেন।

শচীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে যখন 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকখানি লিখলেন তখন তিনিও গানের ভূমিকা অস্বীকার করতে পারেননি। তবে গিরিশচন্দ্রের তুলনায় তাঁর নাটকে গানের সংখ্যা কম। শচীন্দ্রনাথ মাত্র পাঁচখানি গান দিয়েছেন তাঁর নাটকে। আর এই গানগুলি সবই আলেয়ার কণ্ঠে গীত।

এখানে একটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখ্য তাঁর নাটকের গানগুলির গীতিকার তিনি নন। শচীন্দ্রনাথের অভিন্নহৃদয় বন্ধু বিদ্রোহী কবি নজ(ল ইসলাম নাটকের জন্য গানগুলি লিখে দিয়েছিলেন। তার ফলে গানগুলির কাব্যমূল্য এবং তাৎপর্য হয়েছে ব্যাপক এবং গভীর। এবং গানগুলির আবেদন দর্শকের হৃদয় স্পর্শ করেছে সহজেই।

আলেয়ার দেশানুরাগ, ব্যক্তি(প্রেম, দেশ ও জাতির জন্য, নবাব সিরাজদ্দৌলার জন্য সুগভীর মঙ্গলাকাঙ্খা সবই প্রকাশ পেয়েছে গানের মধ্যে দিয়ে। গানের মাধুর্যময় কোমলায় আলেয়া যেন রহস্য লোকের দূতি। কখনও সে নর্তকী, কাশিমবাজার কুঠিতে ইংরেজ আর ষড়যন্ত্রকারীদের গোপন খবর সংগ্রহ করবার জন্য গানের ফাঁদ পাতে। রূপ আর গানের আকর্ষণে ষড়যন্ত্রীরা অবির্ভূত। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ভুল করেনি আলেয়া গানই এখানে তার সম্মোহনের অস্ত্র।

একদিকে যেমন গানে চিত্তহরণ করে সংবাদ সংগ্রহে পটু আলেয়া ঠিক তেমনি এই গানের মধ্যে দিয়েই সে প্রকাশ করেছে জীবনের বিষণ্ণতা বেদনা। নাটকের প্রথমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আলেয়ার কণ্ঠে আত্মপ্রত্যয়ের অভিব্যক্তি(। আলেয়া গেয়েছে—'আমি আলোর শিখা। ফুটাই আঁধার ভবনে দীপ-কলিকা।'

নবাবের দরবারে নিরিড় অন্ধকার দূর করে আলো জ্বালিয়েছে আলেয়া। গানটিতে তার জীবনের স্বপ্ন এবং আশার পরিচয় ধ্বনিত হয়েছে। সিরাজকে আ(্বাসবাণী শুনিয়েছে গানে। আলেয়া বলেছে—

'আধাঁর দেখলেই আলো জ্বালাব হাসি দিয়ে দুশ্চিন্তা দূর করবো, চঞ্চল চরণে ছন্দ টেনে এনে জড়তা ঘুচিয়ে দেব।'

আলেয়ার জীবনের এই মহৎ ব্রতটির উদঘাটন ঘটেছে তাঁর গানে প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে নর্তকী আলেয়ার গান—

'ম্যায় প্রেম নগরকো জাউঙ্গী'

গানটি হিন্দি ভাষায় গীত হয়েছে। কাশিমবাজার কুঠিতে সিরাজের বি(দ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ওয়াটস্, আমির চাঁদ, মীরজাফর, রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ প্রভৃতিরা। এই ষড়যন্ত্রে প্রকৃত স্বরূপটি জানাই আলেয়ার উদ্দেশ্য। তাই গানে উপস্থিত ব্যক্তি(বর্গের মনোরঞ্জন করে কাছে আসাটা অনায়াস করেছে সে। এই বিদেশীদের সভায় হিন্দি গানই সুপ্রযুক্ত(। স্বদেশ এবং এবারের মঙ্গলের জন্যই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে কাশিমবাজার কুঠিতে মন্ত্রনাসভায় উপস্থিত হয়েছে। প্রেমের মাদকতা সঞ্চারী গানটি এখানে খুব তাৎপর্য পূর্ণ হয়েছে।

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যটির সূচনা আলেয়ার গানে। রাধাকৃষে(র প্রেমমধুর এই গানটিতে হৃদয়ের ভক্তি(অর্ঘ উৎসারিত করে দিয়েছে সে।

'সখি, শ্যামের স্মিরিতি শ্যামের পীরিতি

মম জীবন-মরণের সাথী।'

বৈষ(ব ভাবনায় ভাবিত এই গানটি কোমল মধুর আবেদন দর্শকের মনে মাধুর্যভাবের সঞ্চার করে। রাধার মতোই বিরহ বেদনায় ব্যাকুল সে। তার হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে আছে নিবিড় বেদনার কৃষ(মেঘ। তাই সে গেয়েছে—'দা(ণ বিরহ-দহন জুড়াইতে শ্যাম নাম সুরধুনি ধারা।'

আলেয়ার বাইরের উজ্জ্বল এবং উচ্ছল রূপের অন্তরালে লুকিয়ে রাখা প্রেম তৃষাতুর হৃদয়ের প্রকাশ তার গানে।

সিরাজের ভাগ্যের সঙ্গে আলেয়ার ভাগ্যও একসূত্রে গাঁধা হয়ে গিয়েছে। দুজনের সম্মুখেই এক

অজানা ভবিষ্যৎ। বেদনার্ত হৃদয়ে অনাগত কালের এই অন্ধকার দিনগুলির কথা স্মরণ করেছে আলেয়া তার গানে—

'বুঝি-দুঃখ নিশি মোর হবেনা হবেনা ভোর।

ফুটিবে না আশার আলোক রেখা।'

গানটির মধ্যে নাটকের দুঃখজনক পরিণতির আভাস আছে। ঐতিহাসিক নাটকে এই বেদনারঞ্জিত গানগুলি একটি রোমান্টিক বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে।

নাটকের শেষ গানটি গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত। পলাশীর প্রান্তরেই অস্তমিত বাংলা স্বাধীনতা সূর্য। গোলাম হোসেন যর্থার্থই বলেছে—'সমগ্র জাতির ললাটে লেপে দিয়েছে কলঙ্কের মসী, পলাশী।'

তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে আলেয়ার শেষ গানে ধ্বনিত হয়েছে সমগ্র জাতির মর্মবেদনা। পলাশী বাঙালি জাতি বেদনা ও কলঙ্কের প্রতীক। আলেয়ার কণ্ঠে উৎসারিত হতাশা এই গানে।

'পলাশী! হায় পলাশী'

এঁকে দিলি তুই জননীর মুখে

কলঙ্ক কালিমা রাশি।'

আত্মঘাতি জাতির বিবেকহীন বি(াসঘাতার প্রতি ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছে গানটিতে। কিন্তু এই নিবিড় বেদনা ও হতাশার মধ্যেও ভবিষ্যতের আশার এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার জ্যোর্তিময় রেখা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে গানের শেষ অংশে আলেয়া গেয়েছে—

'তোর গঙ্গার তীরে পলাশ-সঙ্কাশ

সূর্য ওঠে যেন দিগন্ত উদ্ভাসি।'

৪.৩.১১.২ : কাহিনি বি(-ষণ : বিন্যাস রীতি এবং শিল্পপ্রকরণ

সার্থক এবং শিল্পসম্মত নাট্যবৃত্ত গঠন নাটকের একটি গু(ত্বপূর্ণ বিষয়। সুবিন্যস্ত কাহিনিবিন্যাস ও নাট্যবৃত্ত ছাড়া নাটক কখনই সার্থক হয় না। নাটকের সমগ্র ঘটনাটিকে অঙ্কে এবং দৃশ্যে বিভক্ত(করে তাকে পরিণতিমুখী করে তোলাই নাটকের প্রধান শিল্পরীতি। নাটকে নায়কের জীবনের উত্থান পতন বিশেষ ভাবে প্রাধান্য পায়। দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়েই নাটক গতিময় হয়। দ্বন্দ্ব অন্তর আর বাহিরের জটিলতা আনে।

প্রচলিত রীতি অনুসারে পঞ্চমাঙ্ক নাটকে প্রথম দুটি অঙ্কে ঘটনার জটিলতা, তৃতীয় অঙ্কে চূড়ান্ত অবস্থিতি (ক্লাইম্যাক্স)। শেষ দুটি অঙ্কে গ্রন্থিমোচনের মধ্যে দিয়ে ঘটনার অনিবার্য পরিণতি। শচীন্দ্রনাথ তাঁর সিরাজদ্দৌলা নাটকে এই প্রচলিত ছকটি অনুসরণ করেননি। ঐতিহাসিকতার তথ্য অনুসরণ করে নায়ক সিরাজদ্দৌলার ট্র্যাজিক পরিণতি দেখিয়েছেন নাট্যকার।

সিরাজদ্দৌলা নাটকটির বিন্যাস ও শিল্প প্রকরণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এখানে সূত্রাকারে উল্লেখ করা যেতে পারে—

প্রথমতঃ— নাটকটি পঞ্চমাঙ্ক নয়। সমগ্র কাহিনি তিনটি অঙ্কে সীমাবদ্ধ।

দ্বিতীয়ত—নাটকটির আয়তন ও বিস্তার তুলনামূলকভাবে সং(প্ত এবং সংহত।

তৃতীয়ত—রঙ্গমঞ্চের অভিনয় সম্ভাব্যতার দিকে নজর রেখেই নাটকটি ঘটনা বিন্যাস করেছেন নাট্যকার।

চতুর্থত—ঐতিহাসিক ঘটনা নির্ভর নাটক হলেও দেশপ্রেমই সিরাজদ্দৌলা নাটকের মূল সুর। সিরাজ নাটকে ব্যক্তি(মাত্র নয় একটি যুগ চেতনার প্রতিনিধি। ঐতিহাসিক বি(েস্ততার চেয়ে আবেগধর্মীতার দিকেই মূলত দৃষ্টি দিয়েছেন নাট্যকার।

পঞ্চমত — চরিত্রসংখ্যা সীমিত। চরিত্রগুলি সজীব এবং বাস্তবধর্মী।

ষষ্ঠত — নাটকে গান একটি গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

কাহিনি বি(ে-ষণ ঃ

প্রথম অঙ্ক ঃ তিনটি দৃশ্য

প্রথম দৃশ্য ঃ সিরাজের আত্মকথনের মধ্যে দিয়েই নাটকের সূচনা। সূচনাতেই নবাব আলিবর্দির কথা স্মরণ করেছেন সিরাজ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর উদ্ধত্ব এবং ষড়যন্ত্রের আভাস এই দৃশ্যেই পাওয়া যায়। এই দৃশ্যেই আলেয়া এবং গোলাম হোসেনের গু(ত্বপূর্ণ উপস্থিতি। তাদের কথায় নবাবের বি(দ্ধে ঘোরতর সংবাদের খবর। আলেয়ার জীবন কাহিনির উদঘাটন। সিরাজদ্দৌলার ব্যক্তি(ত্ব। পত্নী লুৎফার সঙ্গে কথোপকথনে সিরাজের মর্মবেদনার প্রকাশ।

প্রথম দৃশ্যেই বাইরের সংঘাত এবং নায়কের অন্তর্বেদনা নাটকের পরিণতির ইঙ্গিত বহন করেছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য ঃ এই দৃশ্যে ঘটনা আবর্তিত হয়েছে ঘসেটি বেগমকে কেন্দ্র করে। পালিত পুত্রের সিংহাসনলাভের জন্য তিনি সিরাজের বি(দ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ঘসেটি বেগমের সঙ্গে লুৎফার কথোপকথন তাৎপর্যপূর্ণ। শেষ পর্যন্ত সিরাজের নির্দেশে ঘসেটি বেগম বন্দিনী।

তৃতীয় দৃশ্য ঃ দৃশ্যটির ঘটনাস্থল কাশিমবাজার কুঠি। এখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে মীরজাফর, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ প্রভৃতি অমাত্যদের সঙ্গে সিরাজের বি(দ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রস্তুতি। ইংরেজদের প(ওয়াটস, ডাক্ত(ার ফোর্থ পাদরী স্ট্রং প্রভৃতি অংশ নিয়েছেন।

আলেয়ার উপস্থিতি নর্তকী হিসেবে। উদ্দেশ্য গোপন ষড়যন্ত্রের তথ্য সংগ্রহ।

সিরাজের কুঠি আত্র(মণ। ওয়াটস বন্দি। তীব্র সংঘাত প্রত্য(রূপ নিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক ঃ দৃশ্যসংখ্যা তিন

প্রথম দৃশ্য ঃ দরবার ক(। বন্দি ওয়াটস্‌কে সিরাজ তিরস্কার করেই ছেড়ে দিলেন। সিরাজের সঙ্গে মীরজাফর, রাজবল্লভ জগৎশেঠ প্রভৃতিদের তীব্র বাদানুবাদ। মীরজাফর, জগৎশেঠ প্রভৃতির ষড়যন্ত্র মুখোস খুলে পড়েছে। অন্য দিকে মীরমদন, মোহনলাল প্রভৃতির সিরাজের প্রতি আনুগত্য। প্রকৃতপ(ঘটনা দুটি শিবিরে বিভক্ত(হয়ে গিয়েছে।

ষড়যন্ত্রকারীদের বি(দ্ধে যথাসময় উপযুক্ত(ব্যবস্থাগ্রহণ করলেন না সিরাজ। এটা তাঁর একটি বড় ভুল। সিরাজ আবেগময় ভাষায় শত্র(প(ের হৃদয় পরিবর্তন করতে চেয়েছেন। সিরাজের স্বদেশপ্রাণতা এই দৃশ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ষড়যন্ত্রকারীদের বি(দ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না নিয়ে এক বড় ভুল করলেন সিরাজ। এই দৃশ্যেই অনিবার্য ধ্বংস এবং তাঁর নিষ্ঠুর নিয়তির অশনি সংকেত দেখতে পেয়েছেন তিনি। তাই তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে ‘পলাশী রা(সী পলাশী’!

দ্বিতীয় দৃশ্য ঃ আলেয়া এবং মীরণের কথোপকথন। মীরণের হীন কামুক চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় এই দৃশ্যে। ফুটে উঠেছে তার নিষ্ঠুরতার পরিচয়।

আলেয়ার সঙ্গে আলাপচারিতায় সিরাজের বিষণ্ণ ক্লান্ত হৃদয়ের পরিচয়টি উদঘাটিত হয়েছে। অনিবার্য সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সিরাজের রোমান্টিক হৃদয়ের কোমল অনুভব ট্রাজেডির বেদনাকে তীব্র করে তুলেছে।

তৃতীয় দৃশ্য ঃ দৃশ্যটি খুবই গু(ত্বপূর্ণ। এই দৃশ্যটিকেই নাটকের শীর্ষ পরিণতি বা ক্লাইম্যাক্স বলা যেতে পারে। এই দৃশ্যেই বাইরে সংঘাত অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধ। যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের প্রকৃত রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। সিরাজের অসহায় আত্মসমর্থন তাঁর চরম পতনকে আভাসিত করেছে। আলেয়া এবং গোলাম হোসেনের সাবধানবাণী সত্ত্বেও মীরজাফরের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করে চরম ভুল করেছেন সিরাজ। শেষপর্যন্ত এই চত্র(ান্তের শিকার হয়েছেন তিনি। পরাজিত সিরাজের আত্মর(ার চেষ্টা এবং পলায়ন। সিরাজকে বন্দি করবার নির্দেশ ক্লাইভের।

সিরাজের ভাগ্যবিপর্যয়ের সঙ্গে জাতির ভাগ্য একসূত্রে গাঁথা নাটকের ট্র্যাজিক পরিণতির অশুভবার্তা এই দৃশ্যেই ঘোষিত হয়েছে।

তৃতীয় অঙ্ক - দৃশ্য সংখ্যা তিন

প্রথম দৃশ্য - এই দৃশ্যটিতে দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনার ধারাবাহিকতা। ঘটনার জাল ধীরে ধীরে গুটিয়ে এসেছে। আত্মর(ার জন্য সিরাজ এবং লুৎফা ছদ্মবেশে পলায়ন করেছেন। সিরাজ আজ একা—কেউ তার পাশে নেই। সিরাজের কণ্ঠে তাই হতাশা আর বেদনার ব্যাকুলতা। বন্দি হয়েছে আলেয়া আর গোলাম হোসেন। পলাতক সিরাজের গন্তব্যস্থল জানবার জন্য তাদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করা হয়েছে। কিন্তু এরা কেউই সিরাজ প্রসঙ্গে কোনো খবর দেয়নি। আলেয়া এবং গোলাম হোসেনের কথোপকথনে ব্যক্তি(প্রেম এবং স্বদেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটেছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য ঃ কারাগারে আলেয়া আর গোলাম হোসেন। এই দুই বন্দির উপর মীরণের পীড়ন এবং প্রলোভন। উদ্দেশ্য সিরাজের গতিবিধির খবর জানা।

বন্দি হয়েছেন সিরাজ। তাঁকে মুর্শিদাবাদে আনা হয়েছে। তাঁর মর্মান্তিক পরিণতি শুধু সময়ের অপে(া। সিরাজের সঙ্গে আলেয়া এবং গোলাম হোসেনের কথোপকথন। এই কথোপকথনে দেশপ্রেমের অপূর্ব প্রকাশ। দৃশ্যের শেষ আলেয়ার গান — 'পলাশী! হায় পলাশী'।

তৃতীয় দৃশ্য ঃ অন্তিম দৃশ্য। এখানে সুপরিকল্পিত ভাবে একটি জনতার দৃশ্য রচনা করেছেন নাট্যকার। সিরাজ প্রজাদের উদ্বুদ্ধ করতে আবেগময়ী ভাষণ দিয়েছেন। জনতার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে। তারা নবাবকে সাহায্য করবার আশ্বাস দিয়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তে মহম্মদী বেগের ছুরিকাঘাত। বাঙলায় নতুন সূর্যোদয়ের অভয় বাণী উচ্চারণ করে সিরাজের মৃত্যু।

৪.৩.১১.৩ : নাটকের অন্তিম দৃশ্যটির শিল্পমূল্য—জনতা চরিত্র অঙ্কনে দ(তা

শচীন্দ্রনাথ সিরাজদ্দৌলাকে দেশপ্রেমিক এবং প্রজাবৎসল নায়ক রূপেই চিত্রিত করেছেন। এখানেও হয়ত সমকালের রাজনৈতিক ভাবনা প্রাধান্য পেয়েছিল।

শচীন্দ্রনাথের নাটকখানি গাঢ়বদ্ধ, সুপরিকল্পিত এবং সুসংহত। মাত্র তিনটি অঙ্কে ন-টি দৃশ্যে তিনি

নাটকখানিকে তীব্র গতিময় করে তুলেছেন। এর ফলে নাটকের প্রতিটি দৃশ্যই গু(ত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্যতা লাভ করেছে। দৃশ্য পরিকল্পনায় শচীন্দ্রনাথের সচেতনতা অবশ্যই শিল্পগুণের পরিচয় বহন করছে। নাটকটি শু(হয়েছে নবাব সিরাজদ্দৌলার বি(দ্ধে তাঁর বি(স্ত আমীর ওমরাহগণের ষড়যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে। আলেয়া আর গোলাম হোসেন এই ষড়যন্ত্রের গোপন সংবাদ নবাবকে জানিয়েছে। কিন্তু অসহায় নবাব এর বি(দ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নিতে পারেননি। মীরমদন, মোহনলাল ছাড়া আর কেউই নবাবের দুর্দিনে তাঁর পাশে ছিলেন না। মীরজাফর, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ প্রভৃতিরা এবং ইংরেজ বণিকেরা এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত(ছিলেন।

শেষপর্যন্ত মীরজাফরের বি(াসঘাতকতায় সিরাজের পরাজয় ঘটে। পলাশী যুদ্ধে প্রহসন হয়ে দাঁড়ায়। মীরমদন, মোহনলাল শত চেষ্টাতেও মীরজাফরের অধীনস্থ সৈন্যদের যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাতে পারেনি। মীরজাফর এবং তাঁর অনুচরবর্গের ষড়যন্ত্র সফল হয়েছে। আকস্মিকভাবে যুদ্ধ বন্ধ করে দিয়ে ক্লাইভের যুদ্ধজয়কে সুনিশ্চিত করেছে।

পরাজিত সর্বহারা নবাব সিরাজদ্দৌলা আত্মর(ার জন্য পলায়ন করতে বাধ্য হলেন। পাটনায় আশ্রয় পাবার আশায় তিনি গোপনে রাজধানী ছেড়ে যান। কিন্তু তাঁর ভাগ্য বিরূপ তাই ধরা পড়ে যান রাজকীয় জুতোটির জন্য। তাঁকে রাজধানীতে ফিরিয়ে আনা হয়। নাটকের অন্তিম দৃশ্যটি ক(ণ এবং নাটকীয়। দর্শকের (দ্ব(াস আশঙ্কা এবং রোমাঞ্চ ঘনীভূত হয়েছে শেষ দৃশ্যটিতে। শেষ দৃশ্যটি পরিকল্পনায় নাট্যকার অসাধারণ শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন।

বন্দি সিরাজদ্দৌলা জনতার দরবারে উপস্থিত। বিচারে বোধহীন লোভী বিবেকবর্জিত জনতার উন্মত্ত আচরণের পটভূমিতেই দৃশ্যটির পরিকল্পনা। দৃশ্যটি পরিচয় দিয়ে নাট্যকার বলেছেন, এই দরবার ক(সভাসদেরা নেই, মন্ত্রী-সেনাপতি আমির ওমরাহরাও নেই। আছে একটা জনতা। তাদের মলিন বস্ত্র, ((চেহারা, চোখে মুখে নিষ্ঠুরতা।

এই দৃশ্যটি পরিকল্পনায় অভিনবত্ব আছে। এই প্রসঙ্গে শেক্সপীয়রের নাটকে জনতা দৃশ্য পরিকল্পনার কথা মনে পড়ে যায়। শেক্সপীয়র তাঁর ‘জুলিয়াস সীজার’ নাটকে অসাধারণ জনতার দৃশ্য অঙ্কিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের একাধিক নাটকেও জনতার দৃশ্য আছে।

জনতার একটি নিজস্ব চরিত্র আছে। জনতায় একক বা পৃথক ব্যক্তি(ত্বে কোনো অস্তিত্ব নেই। সামগ্রিক ভাবে জনতাই যেন একটি চরিত্র। তাদের আবেগ উত্তেজনা হাউই বাজির মতো (ণস্থায়ী। জনতার মত বা বি(াসের পরিবর্তন ঘটতে দেরি হয় না। কোনো প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি(ত্বের বা বক্ত(ার উত্তেজনাকর বক্ত(ব্য সহজেই তাদের উত্তেজিত করে তোলে, তেমনি আবার বিপরীত চিন্তার আবেগময় ভাষণে পূর্ব বি(াস বা ভাবনা অনায়াসেই ধুয়ে মুছে যায়। বি(াস ও প্রত্যয়ের দোদুল্যমানতাই জনতা চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ‘সিরাজদ্দৌলা’ নাটকের শেষ দৃশ্যে জনতা চরিত্রের সার্থক চিত্রায়ণ ঘটিয়েছেন নাট্যকার। নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের পর জনতা রাজপ্রাসাদে ঢুকে যথেচ্ছচার করছে। লোকের তাড়নায় তারা অস্থির। মীরণ তাদের লোভ দেখিয়ে এসেছে। জনতার বি(াস রাজপ্রসাদে ঢুকতে পারলে প্রচুর ধনরত্ন হীরামুক্ত(া এমনকি হারেমের নারীদেরও তারা লুটে নিতে পারবে। কিন্তু কিছুই তাদের ভাগ্যে জোটেনি। ফলে কিছু না পেয়ে তারা (িপ্ত হয়ে ওঠে। মীরণের কাছে তারা ধনসম্পত্তি দাবি করতে থাকে। বলে, ‘বেগম মহল কোন্ দিকে চাচা? উত্তেজিত জনতা বলে ‘আমরা লুট করবো। লুটে নেব।’

মীরণ এবং মহম্মদী বেগ বুঝতে পারে পরিস্থিতি ত্র(মশই জটিল হয়ে উঠছে। যে লোভের আগুনে

তারা ঘি ঢেলেছিল এখন তা নিভানো কঠিন। অবস্থা সামাল দেবার জন্য মহম্মদী বেগ জনতাকে সেপাই-এর ভয় দেখায়-'তা হলে সেপাইদের ডাকব'। সেপাই এর কথা শুনেও ভয় পায় না জনতা। ব্যঙ্গ করে বলে — 'মীরণ চাচা এ বেটা যে সেপাই শোনায়'। মীরণের হঠকারিতা এবং দুষ্ট অভিসন্ধি দৃশ্যটিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে চেয়েছে সিরাজ জনতার হাতে নিগৃহীত হোক। সেই উদ্দেশ্যেই সে জনতাকে উত্তেজিত করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে মীরণের এই উদ্দেশ্য অনেকটাই সফল হয়েছে। এই বিস্ফোরক পরিস্থিতির মধ্যেই সিরাজ দরবারে উপস্থিত হয়েছেন। আর তারপর থেকেই শু(হয়েছে জনতার তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রুপ। সিরাজের মাথায় তারা পরিয়ে দিয়েছে ঝাঁটার মুকুট। নিষ্ঠুর বিদ্রুপে জনতার একজন বলেছে—'কালকের নবাব ভেগে পড়া, বাঙলাহারা সিরাজদ্দৌলা বন্দি বাহাদুর।' সিরাজের সিংহাসনটিকে ঘেঁটুফুল দিয়ে সাজিয়েছে ওরা। ছেঁড়া জুতো উপহার দিয়েছে — 'হুজুর। জুতোর জন্যে আপনি ধরা পড়েছেন, তাই ও-জুতো পাল্টে ফেলে এই জুতো প(ন হুজুর।'

পরিহাস এবং বিদ্রুপের কশাঘাতে জর্জরিত করে জনতার 'একজন বলে—'ফকিরের দরগায় যাবেন বলে খিচুড়ি চাপিয়েছিলেন, খাওয়া আর হয়নি। আপনার কপাল পোড়াবার সঙ্গে সঙ্গে খিচুড়িও পুড়ে গেছে।'

পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে আকস্মিক ভাবেই। সমস্ত বিদ্রূপ নিন্দা (-ষ মাথা পেতে নিয়ে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন সিরাজ। জনতাকে সম্বোধন করে বলেন—'ভাই সব'। এই নির্বোধ অল্পবুদ্ধি জনতার প্রতি কোনো কটুবাক্য বলেননি তিনি। নবাবের এই 'ভাই' সম্বোধন তীব্র প্রতিত্রি(য়ার সৃষ্টি করেছে জনতার মধ্যে। একজন বলেছে — 'বলে কি রে! এত অপমান করলাম তবু বলে ভাই।'

এরপর সিরাজের আবেগসঞ্চারী ভাষণ জনতাকে বিপরীত মে(তে পৌছে দেয়। সিরাজ বর্গী হাঙ্গামার অত্যাচার নিপীড়নের দিনগুলিতে প্রজাদের পাশে দাঁড়িয়ে দুঃসাহসী সংগ্রামের কথা স্মরণ করিয়ে দেন জনতাকে। এবার জনতার ভাবনা ভিন্নমুখী হতে থাকে। ভুল বুঝতে পেরে অকুণ্ঠ চিত্তে জনতা বলে — 'কু- লোক আমাদের দিয়ে এই সব কাজ করিয়েছে।' অতীতদিনের অনেক আনন্দঘন মুহূর্তের কথা সিরাজ স্মরণ করিয়ে দেন তাঁর প্রিয় প্রজাবৃন্দকে । প্রাসঙ্গিক ভাবেই এসেছে কলকাতা জয়ের সেই আনন্দময় দিনটির কথা।

এবার দ্বিধাহীন চিত্তে জনতা আত্মসমর্পণ করেছে তাদের প্রিয় নবাবের কাছে। বলেছে — 'হুজুর আমরা বোকা, বলে না দিলে আমরা কিছুই বুঝতে পারি না।'

জনতার মুখ থেকে এবার তিনি শুনেছেন ভালোবাসার কথা। স্তুতি ঝরে পড়েছে তাদের মুখ থেকে-'তুমি আমাদের রাজা, তুমি আমাদের দেবতা।' সিরাজের মনে আবার আশার আলো জ্বলে ওঠে। উৎসাহ এবং উদ্দীপনায় সিরাজের সামনে ভেসে ওঠে স্বাধীন বাঙলার স্বপ্ন। সিরাজ উদার কণ্ঠে আহ্বান জানিয়ে বলেন—

"ভাই সব এস আর একবার চেষ্টা করে দেখি পলাশীর প্রান্তরে যা আমরা হেলায় হারিয়ে এসেছি, বঙ্গজননীর কনককীরিটে আবার তা পরিয়ে দিতে পারি কেনা।'

ঘটনার এই আকস্মিক পরিবর্তনে বিচলিত তাঁর শত্রুপ(। তাই আর বিলম্ব করতে চায়নি তারা। সিরাজের উপর নেমে এসেছে মহম্মদী বেগের তীক্ষ্ম ছুরির আঘাত। শেষ হয়েছে একটি সম্ভাবনার।

এই পরিস্থিতিকে 'অ্যান্টি ক্ল্যাইমাক্স' বলা যেতে পারে। আশা আর নতুন সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে দর্শকচিত্ত যখন অনাগত সুদিনের স্বপ্ন দেখছে ঠিক তখনই নিষ্ঠুর হত্যা এক ভয়ঙ্কর বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে। কিছুটা মেলোড্রামাটিক হলেও ট্র্যাজিক রসসৃষ্টিতে নাট্যকার যথেষ্ট সফল।

৪.৩.১১.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের প্রারম্ভিক দৃশ্যের নাট্যতাৎপর্য নির্দেশ করো।

২। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে সঙ্গীত ব্যবহারের কৃতিত্ব বিশ্লেষণ করো।

৩। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটতে পরাধীনতার শৃঙ্খলামোচন, জাতীয়তাবোধ এবং হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির বিষয়টি কীভাবে নাট্যকার তুলে ধরেছেন তা দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করো।

৪। আবেগ এবং প্রয়োজনের মুখোমুখি রচিত 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকটি ঐতিহাসিক না উদ্দেশ্যবাহী? না কি দুই-ই? তোমার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দাও।

———————

পর্যায়গ্রন্থ - ৩

একক - ১২

চরিত্র পর্যালোচনা

বিন্যাসক্রম :

৪.৩.১২.১ : চরিত্র পর্যালোচনা

৪.৩.১২.১.১ : সিরাজদ্দৌলা

৪.৩.১২.১.২ : গোলাম হোসেন

৪.৩.১২.১.৩ : মীরজাফর

৪.৩.১২.১.৪ : জগৎশেঠ

৪.৩.১২.১.৫ : রাজা রাজবল্লভ

৪.৩.১২.১.৬ : মীরণ

৪.৩.১২.১.৭ : ক্লাইভ

৪.৩.১২.১.৮ : আলেয়া

৪.৩.১২.১.৯ : লুৎফউন্নেসা বা লুৎফুন্নেসা

৪.৩.১২.১.১০ : ঘসেটি বেগম

৪.৩.১২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪.৩.১২.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪.৩.১২.১ : চরিত্র পর্যালোচনা

৪.৩.১২.১.১ : সিরাজদ্দৌলা

বাংলার শেষ নবাব সিরাজদ্দৌলা ইতিহাসের অন্যতম বিতর্কিত চরিত্র। সিরাজদ্দৌলার ব্যক্তিচরিত্র সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা পরস্পর বিরোধী মত পোষণ করেছেন। পলাশীর যুদ্ধ এবং সিরাজদ্দৌলার পরাজয় বাঙালির জীবনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পরবর্তীকালে ইতিহাসে এবং সাহিত্যে এই চরিত্রটি নানাভাবে চিত্রিত হয়েছে। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং', মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থে সিরাজ প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে। সিরাজের পতনের কাহিনিও সেখানে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে।

পরবর্তীকালে চার্লস স্টুয়াট তাঁর 'History of Bengal' গ্রন্থে সিরাজদ্দৌলার ঐতিহাসিক পরিচয়টি আলোচনা করেছেন। এইসব ঐতিহাসিকগণ সিরাজের ব্যক্তিচরিত্র এবং রাজনৈতিক চরিত্রে নানা কলঙ্ক লেপন করেছেন। বিশেষ করে তার সময়ে অন্ধকূপ হত্যার ঘটনাটির জন্যও তিনি সিরাজকে দায়ি করেছেন। অন্ধকূপ হত্যার ঘটনায় সিরাজের নিষ্ঠুরতা এবং প্রতিহিংসাপরায়ণতা প্রকাশ পেয়েছে বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। অবশ্য অনেকে আবার মনে করেন অন্ধকূপ হত্যার ঘটনাটি সিরাজের অজ্ঞাতসারেই ঘটেছিল। কিন্তু তাতে

সিরাজের অমানবিকতার পরিচয় মুছে যায়না। পরবর্তীকালে আচার্য যদুনাথ সরকার অন্ধকূপ হত্যার ঘটনাটি সত্য বলেই স্বীকার করেছেন।

পারিপার্শ্বিকের ষড়যন্ত্রের মধ্যে দিয়েই আলিবর্দি খাঁ সিংহাসন লাভ করেছিলেন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে সিরাজকেও এক জটিল ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হয়েছে। আলিবর্দি তাঁর নাতি সিরাজকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। সেইজন্য তিনি চেয়েছিলেন সিরাজই সিংহাসনে বসুক। কিন্তু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাব ছিল না। তাই সিংহাসন লাভের পরই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র দানা বেধে ওঠে। এরজন্য সিরাজ চরিত্রের হঠকারিতা এবং নিন্দনীয় ব্যক্তিচরিত্রই হয়তো খানিকটা দায়ি। ব্যক্তিজীবনে সিরাজ যে অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তিনি ছিলেন মদ্যপ এবং রমনী আসক্ত। সমকালীন বিবরণেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। Mutaqherin (মুতাক্ষরিন) গ্রন্থে গোলাম হোসেন লিখেছেন— "নবাব আলিবর্দি খাঁনের বিবিজানেরা এবং তাঁর পেয়ারের সিরাজউল্লাহ এমন সব কদর্য কুকর্ম এবং বেহায়া বেলেল্লাপানায় লিপ্ত থাকতেন যা খানদানী লোকের কথা দূরে থাক আমজনতাকে পর্যন্ত বেইজ্জত করবে।"

সিরাজদ্দৌলা চরিত্রটি নারীঘটিত কালিমা লিপ্ত। রানী ভবানীর কন্যা তারার প্রতি সিরাজের মুগ্ধতা একটি কলঙ্কজনক ঘটনা। বাঙলার আকাশে বাতাসে এইসব ঘটনা সদা প্রচারিত ছিল।

সিরাজদ্দৌলার রাজনৈতিক বিচক্ষণতারও অভাব ছিল। তিনি অকারণে ক্রোধ প্রকাশ করতেন। রাজত্বের সূচনাতেই প্রচারিত হয় যে জগৎশেঠের মতো একজন সম্মানিত ব্যক্তিকে তিনি চপেটাঘাত করেছেন। এছাড়াও মীরজাফর, রায়দুর্লভ প্রভৃতি বড় বড় মনসবদারকে নিজের ইয়ার মোহনলালের বাড়িতে সেলাম বাজাতে যেতে বাধ্য করেন। বলা বাহুল্য এর ফল ভালো হয়নি। এইভাবেই তিনি তাঁর আশে পাশের মানুষগুলিকে বিরূপ করে তুলেছিলেন।

ইংরেজের সঙ্গে প্রথম থেকেই তাঁর বিরোধ শুরু হয়েছিল। ইতিমধ্যে কলকাতার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। ইংরেজদের শিক্ষা দেবার জন্য কলকাতা থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে শহরের নামকরণ করলেন 'আলিনগর'।

এতো গেল ইতিহাসের দিক। কিন্তু নাটক ইতিহাস নয়। ইতিমধ্যে কিছুসংখ্যক ঐতিহাসিক সিরাজকে কলঙ্কমুক্ত করতে কলম ধরলেন। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, নিখিল নাথ রায় প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা সিরাজদ্দৌলার একটি অকলঙ্ক মানবিক পরিচয় তুলে ধরতে তৎপর হয়েছেন।

নবাব সিরাদ্দৌলাকে অবলম্বন করে কাব্য নাটক রচনার সূচনা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতেই। কবি নবীনচন্দ্র সেন সিরাজদ্দৌলার পতনের কাহিনি অবলম্বন করে লিখলেন তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'পলাশীর যুদ্ধ'। এই কাব্যে নবীনচন্দ্র সিরাজ সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাস নির্ভর করে তাঁকে নিষ্ঠুর এবং চরিত্রহীন হিসেবেই চিহ্নিত করলেন।

সেই সময় বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে তখন দেশবাসী উদ্বেলিত। এই সময় নাট্যকারগণ নাটকে স্বাদেশিকতার অনুভবকে প্রবল ও প্রত্যক্ষ করে তোলার জন্য বীর চরিত্রের সন্ধান করছিলেন। প্রতাপাদিত্য, শিবাজী প্রভৃতি ঐতিহাসিক বীর চরিত্র অবলম্বনে লেখা হয়েছে নাটক। গিরিশচন্দ্র এই পরিস্থিতিতে সিরাজকে জাতীয় বীর হিসেবে, নায়ক হিসেবে বেছে নিলেন। আর তাই অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, নিখিল নাথ রায় প্রভৃতি ঐতিহাসিকের বিচার নির্ভর করে গিরিশচন্দ্র সিরাজকে প্রজাবৎসল দেশপ্রেমিক সিরাজের চিত্র প্রতিষ্ঠিত করলেন তাঁর নাটকে। তবে সিরাজ চরিত্রের দুর্বলতাগুলি সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারেননি তিনি। নাটকে নানা ইঙ্গিতে সেটি তিনি প্রকাশ করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে শচীন্দ্রনাথ সিরাজদ্দৌলা নাটকখানি নতুন করে লিখলেন। গঠনরীতি

ও চরিত্রসৃষ্টি সব দিক থেকেই তাঁর নাটক অভিনবত্বের পরিচয় দিল। সিরাজদ্দৌলাকে নতুন রূপে চিত্রিত করলেন তিনি। কলঙ্কবর্জিত, দেশপ্রেমিক সিরাজ চরিত্র তিনি গিরিশচন্দ্রের পদাঙ্কই অনুসরণ করেছেন। সিরাজ চরিত্রটিকে তিনি সমগ্রজাতির ট্রাজিক পরিণতির প্রতীক হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। নাট্যকার বলেছেন—

'জাতির প(যা চরম ট্র্যাজেডি তাই আমি সিরাজচরিত্র অবলম্বনে তুলে ধরতে চেয়েছি।' শচীন্দ্রনাথের নাটক সংি(প্ত এবং স্বল্পকালীন ঘটনানির্ভর। এই সময়টুকুর মধ্যে তাঁর বি(দ্ধে যে ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত হয়েছিল তার পরিচয় আছে। শচীন্দ্রনাথের সিরাজ দুর্বল, স্নেহপ্রবণ এবং কিছুটা রোম্যান্টিক আবার যথেষ্ট পরিমাণে আবেগপ্রবণও বটে। মীরজাফরের প্রকৃত পরিচয় তার ষড়যন্ত্রের কথা জেনেও তার প্রতি তিনি কঠোর হতে পারেননি এমনকি চরম মুর্হূতে তাঁর আস্থাস্থাপন করে চরম সর্বনাশ ডেকে এনেছেন। এই ঘটনাটি সিরাজের রাজনৈতিক বিচ(ণতার অভাবকে সূচিত করে। শত্রু পরিবেষ্টিত পরিবেশে যে চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং কূটবুদ্ধি থাকা প্রয়োজন সিরাজের তা ছিল না—নাটকে সেই কথাটিই প্রমাণিত হয়েছে।

সিরাজ যে কলঙ্কিত নায়ক এ কথাটি নাট্যকার ভোলেননি, তাই সংলাপের মধ্যে দিয়ে সিরাজ চরিত্রের পরিবর্তনের দিকটিও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ভোলেননি নাট্যকার, সিরাজকে নির্দোষ নায়করূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁর চিত্তপরির্তনের পরিচয়টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল।

স্বদেশভাবনার সঙ্গে সিরাজের অনুভূতিপ্রবণ হৃদয়ের পরিচয়টিও দিতে ভোলেননি নাট্যকার। বাঙালির দুঃখ বেদনা তাঁকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে।

রাজ্যশাসন এবং ষড়যন্ত্র কন্টকিত পরিবেশে বিচারহীন বি(াস এবং ষড়যন্ত্রকারীদের পরিচয় জানবার পরেও কোনো কঠোর ব্যবস্থাদি না নেওয়ার ফলেই সিরাজের জীবনে নেমে এসেছে চরম আঘাত। অতি বি(াসপ্রবণতাই তাঁর জীবনের প্রধান দুর্বলতা। তাঁর জীবনের ট্যাজেডির মূল সত্যটি খুঁজে পাওয়া যাবে এখানেই। ইংরেজ বণিকদের ঔদ্ধত্য এবং ষড়যন্ত্রের যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েও ওয়াটসকে কোনো শাস্তি দেননি সিরাজ। এটি শাসক হিসেবে তাঁর দুর্বলতাও বলা যায়। পলাশীর যুদ্ধের চরম মুহূর্তে বি(াসঘাতক মীরজাফরের কাছে সিরাজের আত্মসমর্পন তাঁর চরিত্রে চরমতম দুর্বলতা।

নাটকে পরিণতি দুঃখান্তক। সিরাজদ্দৌলা বন্দি হয়েছেন ষড়যন্ত্রীদের হাতে। নাটকের শেষ দৃশ্যটি তাৎপর্যপূর্ণ। লোভী বিবেকহীন জনতার সম্মুখে সিরাজের শেষ বিচার। প্রজাদের সমস্ত অপমান এবং লাঞ্ছনা মাথায় নিয়ে আবার নতুন করে স্বদেশমুক্তি(র আবেগ ধ্বনিত হয়েছে সিরাজের কণ্ঠে। সিরাজ বলেছেন—

'তা হলে এস ভাইসব, আর একবার চেষ্টা করে দেখি। পলাশীর প্রান্তরে যা আমরা হেলায় হারিয়ে এসেছি বঙ্গজননীর কনককীরিটে আবার তা পরিয়ে দিতে পারি কিনা।'

কিন্তু সিরাজের শেষ ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে গিয়েছে। নাটকের চরম মুহূর্তটি যেমন আকস্মিক তেমনি মর্মান্তিক। মহম্মদী বেগের তীক্ষ্ণ ছুরিকার আঘাতে শেষ হয়েছে বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাবের স্বপ্ন। এই মহম্মদী বেগ একদিন নবাবের অনুগৃহ লাভ করেছিল। আজ সেই অনুগৃহীত মানুষটিকে ঘাতকের ভূমিকায় দেখে অন্তিম মুহূর্তে সিরাজের মুখ থেকে একটি সংি(প্ত বাক্য উচ্চারিত হয়েছে—

'তুমি! মহম্মদী বেগ, তুমি!'

এ যেন জুলিয়াস সিজারের সেই উক্তি(টিকে মনে করিয়ে দেয়—

'ব্রুটাস্ তুমিও!'

শচীন্দ্রনাথ সিরাজদ্দৌলাকে সমগ্র জাতির ট্র্যাজোডির প্রতীক রূপে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। সফল হয়েছেন তিনি।

৪.৩.১২.১.২ : গোলাম হোসেন

নাট্যকার শচীন্দ্র সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা' ইতিহাস-নির্ভর নাটক। ঐতিহাসিক নাটকে ঐতিহাসিক ঘটনা এবং চরিত্রের প্রাধান্য স্বাভাবিক। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটক ইতিহাস নয়। তথ্য আর কল্পনার যুক্ত(বেণীতে ঐতিহাসিক নাটকের রসরূপ। আর সেইজন্য নাট্যকার ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রের পাশাপাশি অনৈতিহাসিক চরিত্রও ঘটনাকে বিশেষ গু(ত্ব দিয়ে থাকেন। অবশ্যই এই অনৈতিহাসিক ঘটনা চরিত্রগুলিকে যুগ ও পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখেই সৃষ্টি করতে হয়। সিরাজদ্দৌলা নাটকে একটি অতিগু(ত্বপূর্ণ চরিত্র গোলাম হোসেন।

ট্র্যাজেডিতে একাধিক কারণে কিছু লঘু এবং নিম্নমানের চরিত্রের অবতারনা করা হয়ে থাকে। ট্রাজেডির তীব্র সংকটময় পরিস্থিতিতে দর্শকের চিত্ত বিশ্রামের জন্য কিছু লঘু ঘটনা এবং চরিত্রের প্রয়োজন হয়। সংস্কৃত নাটকে বিদূষক চরিত্রটি এই ভূমিকাই পালন করে। বিদূষক রাজার বয়স্য তাই রাজার সঙ্গে রহস্যময় ভঙ্গিতে লঘুসংলাপের মধ্যে দিয়ে অকপট সত্য উদঘাটিত হয়। ইংরেজী নাটকে এই জাতীয় চরিত্রের পরিচিতি ফুল (Fool)। এই আপাত নির্বোধ চরিত্রগুলির মুখ দিয়ে নাটকের অনেক গূঢ় রহস্য উদঘাটন করেন নাট্যকার।

বাঙলা নাটকেও এই জাতীয় চরিত্রে দেখা মিলবে একাধিক। গিরিশচন্দ্র তাঁর 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে 'করিমচাচা' দ্বিজেন্দ্রলাল 'সাজাহান' নাটকে 'দিলদার' প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টি করে এই ধারণাই অনুবর্তন করেছেন।

শচীন্দ্রনাথ সিরাজদ্দৌলা নাটকে নবাবের পরিণাম পর্বের কাহিনির নাট্যরূপ দিয়েছেন। গোলাম হোসেন নবাব সিরাজদ্দৌলার পরম বি(স্ত সহচর। দুঃখের দিনে সংশয় সন্দেহের পটভূমিতে গোলাম হোসেন নবাবের একমাত্র নির্ভর। কাল্পনিক এই চরিত্রটির আবেগাপ্-ুত সংলাপের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে জাতির অনাগত সর্বনাশের অশুভ সংকেত।

গোলাম হোসেন মূর্তিমান ভাঁড়। তার সাজপোশাক কথাবার্তা সবই অস্বাভাবিক এবং হাস্যকর। বিশেষ করে তার বেশভূষায় বৈচিত্র্য দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার সংলাপগুলি আপাত অসঙ্গতিপূর্ণ হলেও তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে দ্ব্যর্থক ব্যঞ্জনা। হাস্যকর আচার আচরণের অন্তরালে গভীর স্বদেশানুরাগ। নাট্যকার গোলাম হোসেনের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন—

'যেমন উৎকট তাহার চেহারা, তেমনি উদ্ভট পোশাক। এক পায়ে প্যান্ট আর বুট। আর এক পায়ে মোগলাই পাজামা আর নাগরা। দেহের এক অর্ধ্বে ইংলিশ কোট, আর এক অর্ধ্বে নামাবলির মেজরাই। গলায় কন্ঠি, নাকে তিলক। মাথায় অর্ধেক টপহ্যাট আর অর্ধেক ফেজ। গোঁফ কামানো আর চাপ দাড়ি। প্রকাণ্ড এক গোছা টিকি।'

এই বিচিত্র পোষাকের তাৎপর্য অবশ্যই আছে। গোলাম হোসেন তার পোশাকের বৈচিত্র্যে মধ্যে দিয়ে বাঙালির অব(য় এবং আত্মঅবনতির পরিচয়টি তুলে ধরতে চেয়েছেন। গোলাম হোসেন বলেছে—

'ফরাসী, ইংরেজ, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, হিন্দু মুসলমান সবাই মিলে বাঙালীর যে হাস্যকর রূপ ফুটিয়ে তুলেছে তা দেখিয়ে দিয়েও তাদের বোঝাতে পারি না। তারা ভাবে পাগলের খেয়াল। বোঝেনা যে, আজকের বাঙালীর সত্যিকারের রূপই এই।'

গোলাম হোসেন কেন এই ছদ্মবেশের অন্তরালে নিজেকে গোপন রাখে। কেন আজ তাই ভাঁড়ের ভূমিকা? এর উত্তর পাওয়া যায় তার কথাতেই। গোলাম হোসেন বলেছে—

'দেখলাম বড় বড় সেনাপতি, রাজা উজীর সবাই স্বার্থের সন্ধানে উদ্মাদ, শুধু একটি লোক স্বার্থেরই খাতিরে বাঙলা-বাঙলার স্বাধীনতা-বাঙলার মর্যাদা রাখবার চেষ্টা করছে। সে হচ্ছে বাঙলার এই হতভাগ্য নবাব। বাঙলার জন্যই বাঙলার নবাবের প্রেমে পড়লাম, ব্যক্তি(টির জন্য নয়।'

তথাকথিত 'ভাঁড়' গোলাম হোসেনের গৌরবময় অতীত আছে। সেই অতীতকে গোপন করবার জন্যই তার এই ছদ্মবেশ। গোলাম হোসেনের প্রকৃত নাম পুরন্দর। তার প্রকৃত পরিচয়টি কেবলমাত্র আলেয়ারই জানা ছিল। পলাশীর যুদ্ধের তিন বছর আগে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অন্যতম নেতা নিরঞ্জন স্বামীর শিষ্য পুরন্দর। আজ গোলাম হোসেন ছদ্ম নামের অন্তরালে তার প্রকৃত পরিচয় হারিয়ে গিয়েছে।

স্বদেশপ্রেম গোলাম হোসেনের জীবনের প্রধান উপাদান। বাঙলা আর বাঙালিকে তার মত আর কেউ ভালোবাসেনি। আর এই স্বদেশ স্বজাতির প্রতি ভালোবাসাই নবাবের প্রতি ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়েছে। তাই নবাবের বিপদের দিনে সে অতন্দ্র প্রহরী। নবাবের প্রতি ভালবাসার গোপন রহস্যটি উদঘটিত হয় তার কথায়—

'সারা বাঙলা ঘুরে এসেছি ভাই, পুণ্যবান লোক দেখেছি , দয়ালু দাতা দেখেছি, শক্তি(মান বীরও দেখেছি কিন্তু দেশপ্রেমিক একটিও দেখিনি।'

গোলাম হোসেনের দার্শনিক উপলব্ধি গভীর। পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের পর জাতি যখন চরম লাঞ্ছনা আর সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে তখনও সে অনাগত দিনের শুভ পরিণতির ইঙ্গিত দিয়েছে, বলেছে—

'এ পরাজয়ের প্রয়োজন আছে জাঁহাপনা, দাঁত থাকতে নির্বোধেরা দাঁতের মর্ম বোঝে না। দেশের স্বাধীনতা থাকতে অপদার্থরা স্বাধীনতারও মর্ম বোঝেনা।'

গোলাম হোসেনের ছদ্মবেশ এবং আত্মগোপন প্রয়াসের মধ্যে থেকে মাঝে মাঝে প্রকাশ পায় সংবেদশীল একটি হৃদয়। সমস্ত দুঃখকষ্ট লাঞ্ছনাকে মাথা পেতে নিয়ে দেশপ্রেমের প্রতীক রূপে নবাবকে ভালোবেসেছিল। নাটকের শেষে বড় বিষণ্ণ বেদনাকৃত গোলাম হোসেন।

আত্মর(ার চেষ্টায় পলাতক নবাব সিরাজদ্দৌলা। মীরণ তাঁর সংবাদ জানতে চায় গোলাম হোসেন এবং আলেয়ার কাছে। দুজনেই বন্দি। অকথ্য অত্যাচারেও সামান্য একটি কথাও বলাতে পারেনি মীরণ গোলাম হোসেনকে।

গোলাম হোসেন দেশপ্রেমিক এবং প্রেমিক। নাটকের শেষে গোলাম হোসেন তথা পুরন্দরের প্রেমিক হৃদয়ের স্নিগ্ধ প্রকাশে মানবিক। আলেয়ার প্রতি তার প্রেমগোপন পুষ্পগন্ধের মতই মধুর। অপ্রয়োজনীয় এই প্রেম শুধু বেদনাই বহন করেছে।

ব্যর্থতা, বেদনা এই নিয়েই গোলাম হোসেনরা জীবনের ট্র্যাজেডি। জীবনে যে শুধু দিয়েই গেছে, পায়নি কিছুই। স্বদেশের প্রতি ভালবাসা, নবাবের প্রতি ভালবাসা তার জীবনের একমাত্র সঞ্জীবনী মন্ত্র। আনন্দ বেদনার অপূর্ব বর্ণচ্ছটায় গোলাম হোসেন চরিত্রটি শিল্পমাধুর্যের পরিচয় বহন করছে।

গোলাম হোসেন চরিত্রটি অনেকটা গ্রীক নাটকের কোরাসের মতো। কোরাসের মত বারবার সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছে সে। তবু নিয়তির অঙ্গুলি হেলনে ঘটেছে মহতি বিনষ্টি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য সিয়র-উল-মুতা(রিণ গ্রন্থের লেখকের নাম গোলাম হোসেন খান। তাঁর গ্রন্থে

পলাশীর যুদ্ধের শেষ তিন-চার বছরের ইতিহাসের রূপ রেখাটি স্থান পেয়েছে। নাট্যকার শচীন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর কাল্পনিক চরিত্রটির নামকরণে এই নামটির কথা মনে করেছিলেন এমন অনুমান হয়ত অসঙ্গত নয়।

৪.৩.১২.১.৩ : মীরজাফর

বাঙালির কাছে 'মীরজাফর' বি(াঘাতকতার আর এক নাম। বাঙলা নাটকেও দেশদ্রোহী এবং বি(াসঘাতক রূপেরই মীরজাফরের স্থান নির্দিষ্ট আছে। শুধু বি(াসঘাতকই নয় ব্যক্তি(হিসেবেও মীরজাফর ছিলেন কাপু(ষ এবং অর্কমণ্য। কিন্তু মীরজাফর সম্পর্কে এই অপবাদ কতখানি ঐতিহাসিক সত্য সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। কাপু(ষ এবং অকর্মণ্য হলে তিনি কেমন করে দু-দুবার বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যার মোগল সওয়ার বাহিনীর 'বকশী' (Paymaster-General) হয়েছিলেন? পলাশীর যুদ্ধের বি(াসঘাতকতাই তাঁর নামের সঙ্গে কলঙ্ক পরিচয়টি চিরস্থায়ী করেছে।

মীরজাফরের সম্পূর্ণ নাম মীরজাফর আলি খান (১৭৪৭-৬০, ১৭৬৪-৬৫)। তিনি উচ্চবংশীয় আরব সৈনিক ছিলেন। তাঁর বাবার নাম সৈয়দ আহম্মদ নজাগি। প্রথমে তিনি নবাব সুজাউদ্দিনের নিম্নপদস্থ সেনানী ছিলেন। পরে আলিবর্দির সৎ বোনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। আলিবর্দি বাঙলার নবাব হবার পর মীরজাফর পুরোদস্তুর মনসবদার বনে যান। পরবর্তীকালে বর্গির হাঙ্গামার সময় বীরত্ব দেখিয়ে তিনি নবাবের আস্থা ভাজন হন এবং ধীরে ধীরে সুরে বাঙলার 'বকশী' পদে নিযুক্ত(হয়ে নবাবের দ(িণ হস্ত ও প্রধান সেনাপতির গু(ত্বপূর্ণ পদ লাভ করেন।

কিন্তু এরপর তাঁর কাপু(ষতা এবং বি(াসঘাতকতায় দরবারে তাঁর প্রতিপত্তি কমে যায়। বৃদ্ধ আলিবর্দি মৃত্যুর পূর্বে মীরজাফরকে কোরান হাতে শপথ করিয়ে নেন তাঁর মৃত্যুর পরে তিনি সিরাজদ্দৌলাকে শত্রুর হাত থেকে র(া করবেন। কিন্তু সিরাজের সিংহাসন লাভের পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। (মতা হাতে পেয়েই সিরাজ ঘসেটি বেগমের মোতিঝিল প্রাসাদ ধুলিসাৎ করে দিলেন। আর সেই সঙ্গে পুরানো সেনাপতির উপরেও (ষ্ট হলেন। মীরমদন এবং মোহনলালকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করা হল। সব দরবারী মনসবদারদের মোহনলালকে সেলাম জানাতে হুকুম দেওয়া হল। অনেকে গেলেও মীরজাফর সেলাম জানাতে গেলেন না। সিরাজের অপমানজনক ব্যবহারে প্রধান প্রধান সেনাপতিদের আত্মসম্মান বজায় রাখাই কঠিন হয়ে দাঁড়াল। মীরজাফর প্রকাশ্য দরবারে অপমানিত হলেন।

এইসব ঘটনার অনিবার্য প্রতিত্রি(য়াতেই মীরজাফর সিরাজ-বিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রধান হয়ে উঠলেন। প্রথমে তিনি পূর্ণিয়ার নবাব শওকৎ খানের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁকেই মসনদে বসাবার আ(াস দিলেন। কিন্তু শওকৎ জঙ্গের নিবুদ্ধিতায় পূর্ণিয়ার ষড়যন্ত্র দানা বাঁধল না। এদিকে ক্লাইভ এবং ওয়াটসনের কলকাতা জয়ের পর তাদের শক্তি(সম্পর্কে মীরজাফরের কোনো সন্দেহ ছিল না। তিনি জগৎশেঠ রায়দুর্লভ প্রভৃতির সঙ্গে জোট বেঁধে সিরাজের বি(দ্ধে ষড়যন্ত্রের নায়ক হয়ে উঠলেন।

সিরাজদ্দৌলার পতনের পর মীরজাফর সিংহাসনে বসেন। কিন্তু এই সৌভাগ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৭৫৭-তে নবাব হবার পর ১৭৬০ সালে ইংরেজরা তাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে তাঁর জামাতা মীরকাশিমকে বাঙলার নবাব করেন।

ভারতের ইতিহাসে মীরজাফর কলঙ্কিত চরিত্র হয়েই আছেন। চরিত্রহীন মাদকাসক্ত(মীরজাফরকে বলা হত 'ক্লাইভের গাধা।'

ইতিহাসের এই ষড়যন্ত্রকারী চরিত্রটিকে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র এবং শচীন্দ্রনাথ ঘৃণিত চরিত্র হিসেবেই

এঁকেছেন। উভয়েই সিরাজ বিরোধী ষড়যন্ত্রে এই মানুষটি বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় উদঘাটিত করেছেন। গিরিশচন্দ্র মীরজাফরকে নিজে নবাব হবার জন্যই ষড়যন্ত্র করেছিলেন বলে দেখিয়েছেন। অন্যদিকে শচীন্দ্রনাথ চরিত্রটিকে আরও সক্রিয় করে তুলেছেন। তার কথাবার্তা এবং ষড়যন্ত্রের ছক রচনার কূটবুদ্ধিও দেখানো হয়েছে। এই চরিত্রটিতে খানিকটা 'ভিলেন' চরিত্রের আভাস আছে।

৪.৩.১২.১.৪ : জগৎ শেঠ

অষ্টাদশ শতকে বাঙলার নবাবদের উত্থান পতন এবং তাঁদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রা ছিলেন ধনকুবেরগণ। অপর্যাপ্ত ধনসম্পদের অধিকারী এই শেঠগণ তাঁদের অর্থের কৌলিন্যে বাঙলার শাসন ক্ষমতাকেও নিয়ন্ত্রিত করতেন। শেঠ সদাগরদের পূর্ব ইতিহাস হল জগৎশেঠ মহতাব রায় এবং স্বরূপ চন্দ্র ছিলেন একই পরিবারের কর্তা। মরুভূমির মারওয়াড়ের মধ্যস্থিত মরুদ্যান শহর নাগৌর। সেখান থেকে পরিবারের পূর্বপুরুষ হীরানন্দসাহ বাদশাহ শাহজাহানের সময় পাটনায় আসেন। এঁরা জাতিতে ওসওয়াল, ধর্মে জৈন। এই পরিবারের খ্যাতিমান পুত্র মহাজন শেঠ মানিক চন্দ্র, জগৎশেঠ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা।

দিল্লির বাদশাহ ফতেহ চন্দকে 'জগৎশেঠ' উপাধি দেন। বাদশাহ মহম্মদ শাহের রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে (১৭২২-২৩) প্রদত্ত এক ফরমানে ফতেহ চন্দকে 'জগৎশেঠ', তাঁর ছেলে আনন্দ চন্দকে 'শেঠ' উপাধি দেওয়া হয়। তারপর থেকে 'জগৎশেঠ' শেঠ পরিবারের বংশানুক্রমিক উপাধি।

মাঝে মাঝে বিবাদ হলেও ইংরেজদের সঙ্গে জগৎশেঠদের সম্পর্ক ভালোই ছিল। ইংরেজরা ভালোভাবেই জানতেন জগৎশেঠদের ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। ইংরেজদের কাগজপত্রে ফতেহ চন্দকে The Nabab's Chief favourite বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দিল্লীর রাজদরবারে জগৎশেঠদের প্রতাপ এবং প্রতিপত্তি দিন দিন বেড়েই চলতে থাকে। এমনকি বর্গির হাঙ্গামার সময়েও শেঠদের ব্যবসার কোনো ভাঁটা পড়েনি। কি পদমর্যাদায় কি ধনসম্পদের বা দরবারে প্রভাব প্রতিপত্তিতে জগৎশেঠ ভাতৃদ্বয় ছিলেন চূড়ায়। ক্লাইভের অন্যতম সুহৃদ রবার্ট অর্মের কথায় শেঠরা তখন 'The Greatest shroff and banker in the known world'

নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে শেঠদের সম্পর্ক যে খারাপ ছিল তা নয়। নবাব ভালো করেই জানতেন শেঠদের সাহায্য ছাড়া তাঁর পক্ষে রাজত্ব চালান সম্ভব নয়। আবার ইংরেজরাও বুঝেছিল শেঠদের এড়িয়ে কোনো কিছুতেই সফল হওয়া যাবে না।

শেঠদের গুরুত্ব জানা সত্ত্বেও সিরাজ হিসেবে ভুল করে বসলেন। ক্ষমতায় বসে তরুণ নবাব হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি পুরোনো মানী ও প্রতিপত্তিশালী লোকদের অপমান করতে শুরু করলেন। শেঠরাও তাঁর লাঞ্ছনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেন না।

মহতাব রায় যিনি সিরাজের মাতামহকে সিংহাসনে বসাবার ব্যাপারে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন তিনি আশা করেছিলেন আলিবর্দির মৃত্যুর পর সিরাজ মসনদে বসে তাঁদের পরামর্শ মতোই চলবেন। কিন্তু শেঠ মহতাবের যে আশা পূর্ণ হয়নি, বরং অস্থিরমতি সিরাজ ক্ষমতা পেয়েই উচ্চপদস্থ সম্মানীয় ব্যক্তিগণকে অপমান করতে লাগলেন। স্বয়ং মহতাবও সিরাজের হাতে অপমানিত হলেন।

সিরাজের অপমান নীরবে হজম করে নেবার লোক শেঠেরা ছিলেন না। এরপর থেকেই সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করতে যে ষড়যন্ত্র শুরু হয় জগৎশেঠ তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। মঁসিয় ল তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন— "শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ই পলাশীর বিপ্লবের জন্মদাতা, তাঁদের ছাড়া ইংরেজরা কখনোই কিছু করতে পারত না।" [Mamoir by Jean Law, Chief of the French Factory at Cossimbazar. [পলাশীর

ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ’-রজতকান্ত রায়-গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত]

সিরাজের হাতে অপমানিত হয়ে জগৎশেঠ ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন এবং সিরাজ তথা মুসলমান বংশ ধ্বংস করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

৪.৩.১২.১.৫ : রাজা রাজবল্লভ

নবাব সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করবার ষড়যন্ত্রের অন্যতম যন্ত্রী ছিলেন রাজা রাজবল্লভ। ঢাকা সরকারের কৃষ(জীবন মজুমদার নামে এক অখ্যাত রাজকর্মচারীর পঞ্চম পুত্র রাজবল্লভ সেন। ফরাসী ভাষা জানতেন বলে তিনি পেশকারের পদ পেয়েছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে পদোন্নতি। তিনি হোসেন কুলীখানের ঢাকার নিয়ামতে কাজ করতে থাকেন, তার ফলে রাজবল্লভের (মতা এবং প্রতিপত্তি প্রচুর বেড়ে যায়। আর এই (মতা এবং প্রভূত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তিনি পৌরাণিক রীতি অনুসারে অগ্নিষ্টোম এবং বাজপেয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। তিনি বৈদ্যজাতির উপবীত ধারণ বিধি প্রবর্তন করেন। রাজবল্লভ হিন্দু বিধবাদের পুনর্বির্বাহ সম্পর্কে নবদ্বীপের পণ্ডিতদের কাছ থেকে ব্যবস্থাপত্র আদায়ের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কৃষ(নগরের রাজা মহারাজ কৃষ(চন্দ্রের বিরোধিতায় শেষ পর্যন্ত এ কাজে ব্যর্থ হন।

প্রচুর অর্থ ও প্রতিপ্রত্তি লাভ করলেও রাজবল্লভ অসৎ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। আলিবর্দির অসুস্থতার সুযোগে তিনি রাজকোষের বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করেন। পরে তাঁর কাছে নবাব হিসাব নিকাশ চাইলে তিনি সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় ধনসম্পত্তিসহ সপরিবারে কলকাতায় আশ্রয় ভি(া করেন। আলিবর্দির মৃত্যুর পর ঘসেটি বেগম (মতা দখল করবে ধরে নিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম কতৃপ(রাজবল্লভের পুত্র এবং তাঁর পরিবার বর্গকে আশ্রয় দেন।

পলাশীর ষড়যন্ত্রে রাজা রাজবল্লভ প্রত্য(ভূমিকা গ্রহণ না করলেও গোপন সংবাদ আদান প্রদানের মধ্যে দিয়ে তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। রাজা রাজবল্লভ অনেক প্রাসাদ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু কীর্তিনাশার প্লাবনে সবই নিশ্চিহ্ন(হয়ে গিয়েছে।

শচীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে রাজবল্লভকে অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী হিসেবেই দেখিয়েছেন। রাজা যে ঘসেটি বেগমের প্রতি যথেষ্ট বি(েস্ত ছিলেন সে কথাও নাটকে আছে।

৪.৩.১২.১.৬ : মীরণ

বি(াসঘাতক মীরজাফরের কুলাঙ্গার পুত্র মীরণ। মীরণের চরিত্র পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা এবং চরিত্রহীনতায় কলঙ্কিত। পলাশীর ষড়যন্ত্র সফল হবার পর নবাব হলেন মীরজাফর—এটি তাঁর বি(াসঘাতকতার পুরস্কার। কিন্তু রাজ্য চালাবার যোগ্যতা তাঁর ছিল না। তাই সকলের কাছে তাঁর পরিচয় হল ‘ক্লাইভের গাধা।’ রাজকার্যে বীতশ্রদ্ধ মীরজাফর নেশাগ্রস্ত হয়েই দিন কাটাতেন। ফলে মীরণ সর্বেসর্বা হয়ে উঠলেন। লোকে মীরণকে ‘ছোট নবাব’ বলতে লাগল। অপদার্থ মীরজাফর যতদিন বেঁচে ছিলেন প্রকৃতপ(মীরণই তাঁর হয়ে রাজত্ব চালাতেন।

মীরণ ছিলেন নিষ্ঠুর বিবেকহীন মানুষ। পলাশীর ষড়যন্ত্রের সময় তিনি ষড়যন্ত্রকারী এবং ইংরেজদের মধ্যে যোগাযোগ র(া করে ষড়যন্ত্রকে বেশ পাকিয়ে তুলেছিলেন। মীরণের নিষ্ঠুরতার সীমা ছিল না। বন্দি সিরাজকে হত্যার ব্যাপারে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। সিরাজ নিহত হবার পর আলিবর্দি বেগম, তাঁর দুই কন্যা ঘসেটি এবং আমিনা এবং সিরাজের পত্নী এবং শিশুকন্যাকে অত্যাচারে জর্জরিত করেছেন তিনি। তাঁর হুকুমেই ঘসেটি বেগম এবং আমিনা বেগমকে জলে ডুবিয়ে মারা হয়। ডুবে মরবার আগে দুই বোন মীরণের মাথায় বজ্রাঘাতের অভিসম্পাত দেন। আশ্চর্য এই যে, শেষপর্যন্ত অভিসম্পাত আ(রিক অর্থেই

ফলেছিল। খোলা মাঠে তাঁবুর মধ্যে তিনি বজ্রাহত হয়ে মারা যান। মীরণের সমস্ত দুষ্কার্যের সঙ্গী ছিলেন খাদেম হোসেন খান। মীরণের মৃত্যুর পর খাদেম তরাইয়ের জঙ্গলে পালিয়ে যান।

শচীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে মীরণকে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ রূপেই চিহি(ত করেছেন। সিরাজকে হত্যার ব্যাপারেও যে তাঁর ভূমিকা ছিল নাটকে সে ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে।

মহম্মদী বেগ

নবাব সিরাজদ্দৌলার ঘাতক— ইতিহাসে মহম্মদী বেগের এই ঘৃণিত পরিচয়। মহম্মদী বেগের মত কৃতঘ্ন চরিত্র খুবই কম দেখা যায়। সে একসময় সিরাজের পিতার স্নেহের পাত্র ছিল। প্রচুর অর্থব্যয় করে মহম্মদী বেগের বিয়েও দিয়েছিলেন তিনি। পিতার স্নেহের এবং উপকারের প্রতিদান সে দিয়েছিল সিরাজকে হত্যা করে। তার তলোয়ারের আঘাতে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় সিরাজের দেহ। মীরণের হুকুমে জল্লাদ মহম্মদী বেগ সিরাজকে শেষ বারের মত নমাজ পড়বার সুযোগও দেয়নি। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে সিরাজ আর্তনাদ করে বলে ওঠেন—'হয়েছে আর নয়-খতম হলাম হোসেন কুলীখাঁর খুনের বদলা।'

৪.৩.১২.১.৭ : ক্লাইভ

বাঙলা তথা ভারতের রাজনৈতিক পালাবদলের প্রধান নায়ক কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ (১৭২৫-১৭৭৪)। 'ব্যারন অফ পলাশী' ক্লাইভ ভারতের ইতিহাসের একটি গু(ত্বপূর্ণ ব্যক্তি(ত্ব।

ক্লাইভের প্রথম জীবনের ইতিহাস আদৌ গৌরবের নয়। তখন ক্লাইভের মত অপদার্থ ছেলেদেরই ভারতে পাঠানো হত। ভাগ্যান্বেষণেই ক্লাইভ ভারতে এসেছিলেন। কিন্তু প্রথম দিকে কিছুই করে উঠতে পারেনি। এমনকি একসময় আত্মহত্যা করবার চেষ্টাও করেছিলেন তিনি। যদিও সে যাত্রায় তিনি বেঁচে যান। পরে ফরাসীদের সঙ্গে এবং মারাঠা জলদস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধে যথেষ্ট বীরত্ব দেখিয়েছিলেন তিনি। এই সাফল্যের জন্যই তিনি 'কর্নেল' উপাধি পান। ক্লাইভের বীরত্বের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে কলকাতার বিপদগ্রস্থ ইংরেজদের সাহায্যের জন্য পাঠানো হয়। কলকাতায় এসেই তিনি কর্মদ(তা দেখাতে থাকেন। ক্লাইভ একদিকে যেমন ছিলেন বীর, সাহসী অন্যদিকে তেমনি ছিলেন চতুর এবং কূটকৌশলী। তিনি কলকাতায় এসে সিরাজদ্দৌলার হাত থেকে ফোর্টউইলিয়ম দুর্গটি পুনর্দখল করেন।

পলাশীর ষড়যন্ত্রের ইংরেজ প(ের প্রধান নায়ক ছিলেন তিনি। সিরাজের প্রতি তাঁর অমাত্য এবং আত্মীয়স্বজনের অসন্তুষ্টির সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেন তিনি। এই সব লোভী স্বার্থপর দুর্বলচিত্ত মানুষগুলিকে চিনতে তাঁর ভুল হয়নি। আর সিরাজের বি(দ্ধে ষড়যন্ত্রে এদের প্রয়োজনমত ব্যবহার করে সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করতে স(ম হয়েছিলেন। ক্লাইভ ছিলেন শঠতার প্রতিমূর্তি। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করবার পর অনেককেই তার প্রতিশ্রুতি মতো প্রাপ্যে থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। চন্দননগর জয় করার পর তিনি হয়েছিলেন পলাশীর যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক। ক্লাইভের সাফল্যের পিছনে ছিল ধূর্ততা, মিথ্যাচার এবং জালিয়াতি। কিন্তু এই মানুষটির জীবনে যথেষ্ট সাফল্য এলেও তাঁর জীবনের পরিণতি ঘটেছে অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে।

১৭৬০ সালে প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে তিনি দেশে ফিরেছিলেন। এরপর আবার ১৭৬৪তে তিনি ভারতে আসেন। এই সময় তিনি কোম্পানির সর্বেসর্বা-প্রভূত (মতার অধিকারী। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর বি(দ্ধে অভিযোগ উঠতে শু(হয় পার্লামেন্টে। অনেক জলঘোলার পর সে যাত্রা এই সব অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি পান এবং নির্দোষ প্রমাণিত হন।

কিন্তু এই অপমানের জ্বালা তিনি সহ্য করতে পারেননি। ১৭৭৪ সালের ২২ নভেম্বর 'ব্যারণ অব

পলাশী' কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ (ুর দিয়ে নিজের গলা কেটে আত্মহত্যা করেন। তৃতীয়বারের চেষ্টায় তিনি আত্মহত্যায় সফল হন।

ক্লাইভের কর্মময়, বর্ণময় জীবনের দুঃখজনক পরিসমাপ্তি নিষ্ঠুর নিয়তির বিধানকেই মনে করিয়ে দেয়।

৪.৩.১২.১.৮ : আলেয়া

আলেয়া নাট্যকারের মানসকন্যা। ইতিহাসের পাতায় তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু এই অনৈতিহাসিক চরিত্রটির ভূমিকা নাটকে বিশেষ গু(ত্বপূর্ণ। ঘটনা গ্রন্থনের সঙ্গে সঙ্গে নাটকে চরিত্রসৃষ্টির দ(তা এবং নিপুনতা নিঃসন্দেহে একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। কারণ চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে দিয়েই নাট্যকার নাটকে তাঁর বক্ত(ব্যটি উপস্থাপিত করেন। আলেয়া চরিত্রটির সার্থক রূপায়ন সেই কথাই মনে করিয়ে দেয়।

'আলেয়া' চরিত্রটির এই নামকরণ তাৎপর্যপূর্ণ এবং অর্থবহ। আলেয়া অধরা আলোর (অভিধানিক অর্থে বিভ্রান্তিকর প্রহেলিকা)। আলেয়ার মায়াময় রূপ ও দ্যুতিতে সৃষ্টি হয় মায়াজালের। নাটকে আলেয়া চরিত্রটির ভূমিকাটিও মায়াবী। রূপ আর ব্যক্তি(ত্বের বর্ণময় উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে সেই হয়েছে নাটকের প্রধান আকর্ষণ। স্বদেশাত্মার প্রতিভূ সে—বাঙালার স্বদেশপ্রেমী নবাব সিরাজদ্দৌলার মঙ্গল সাধনে তার দুঃসাধ্য সাধনা। মায়াময় আলোকবৃত্তের প্রহেলিকায় সে সিরাজ বিরোধী ষড়যন্ত্রীদের চত্র(ান্তের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করেছে।

গোলাম হোসেন খাঁন প্রণীত Seir Mutaqherin (মুতা(রীন) গ্রন্থের হাজী মুস্তাফাকৃত অনুবাদের পাটটীকায় জানা যায়, সিরাজদ্দৌলাকে নিজের পরমাসুন্দরী স্বচ্ছগ্রীবা (ীণতটী ভগিনীকে উপহার দিয়ে কাশ্মেরী মোহনলাল স্বীয় পদ বৃদ্ধি করেছিলেন। আলেয়া চরিত্রটির পরিকল্পনায় এই সুন্দরী মোহনলালের ভগিনীর ছায়া থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। নাটকে আলেয়াকে মোহনলালের ভগিনী হিসেবেই দেখানো হয়েছে।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, নবাবের আপনজন যাঁরা, প্রিয় অমাত্য যাঁরা, তারাই তাঁর বি(দ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে এবং এই স্বার্থপর মানুষগুলির বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই সিরাজকে প্রাণ দিতে হয়েছে। ষড়যন্ত্রের বিষবাস্পে বিষাক্ত(পরিবেশে তার জীবনের চরম দুর্দিনে যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন তাঁর পাশে ছিল আলেয়া তাদের মধ্যে অন্যতম। নাটকে আলেয়া এবং গোলাম হোসেন পরস্পরের পরিপূরক। এই দুটি নরনারী দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য সিরাজের মঙ্গল কামনা করেছে এবং তাঁকে অনিবার্যে ধ্বংসের হাত থেকে র(া করতে সচেষ্ট হয়েছে।

বিষাদাচ্ছন্ন জীবন আলেয়ার। সে দিয়েছে অনেক, পায়নি কিছুই। এই নারীটির জন্মলগ্নেই বিধাতা তার ভাগ্যে দুঃখের মসীলেখা এঁকে দিয়েছিলেন। নবাবের সঙ্গে কথোপকথনে তার ভাগ্যবিড়ম্বনা এবং লাঞ্ছনার ইতিবৃত্ত জানা যায়। জানা যায় সে সিরাজের একান্ত বি(স্ত সেনাপ্রধান মোহনলালের ভগিনী। তাঁর জীবনের ট্র্যাজেডির সূচনা যৌবনেই। এই সময় পর্তুগীজরা তাকে অপহরণ করে। বুদ্ধি এবং তৎপরতায় বন্দিদশা থেকে মুক্তি(পেলেও সমাজ তাকে গ্রহণ করেনি। অসহায় এই নারী স্বদেশ এবং স্বজাতির মঙ্গলের জন্য দু(হ কাজে ব্রতী হয়েছে। তার জীবনের একমাত্র ল(সিরাজের মঙ্গলসাধন। কারণ সিরাজ দেশপ্রেমিক স্বাধীন বাঙলার প্রতিনিধি।

নাটকের প্রথম দৃশ্যই আলেয়ার উপস্থিতি। সুকৌশলে সে নবাবের হাবেমে প্রবেশ করেছে। আলোয়ার উপস্থিতি সিরাজকে বিভ্রান্ত করেছে। গুপ্তচর বলেই সন্দেহ করেছেন তাকে। গুপ্তচরের কঠিন শাস্তির বিধান দিয়েছেন।

কিন্তু নবাবের প্রচণ্ড ত্রে(াধ এবং অপমানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আলেয়া অকুতভয়।

সিরাজের সংবেদনশীল হৃদয় বেদনার প্রকাশ ঘটেছে আলেয়ার সঙ্গে তাঁর আন্তরিক আলাপচারিতায়। শুধু তাই নয় তাঁর চরিত্রের অপবাদ ও কলঙ্কের স্খালন করতে চেয়েছেন এই মোহিনী নারীটির কাছে। তাই সিরাজ চরিত্রটি সম্যক পরিচিতির জন্য আলেয়া চরিত্রটির একান্ত প্রয়োজন। নারীঘটিত অপবাদে সিরাজের অস্তিত্ব বিপন্ন। নায়ক হিসেবে, দেশপ্রেমিক হিসেবে তাঁর গৌরবজন প্রতিষ্ঠার জন্য এই অপবাদকে মিথ্যা বলে প্রমাণিত করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

আলেয়া সিরাজের বি(দ্ধে এই অপবাদ বিশ্বাস করে না তাই সে বলেছে—

'আলেয়া। ঐ সিংহাসনের উপর লোভ রয়েছে অনেকের। কিন্তু শক্তি(র পরিচয় দিয়ে সিংহাসন অধিকার করবার সাহস যাদের নেই, তারাই প্রজাদের (েপিয়ে তোলবার জন্য এই কুৎসা রটায়'।

নবাব হিসেবে সিরাজের সীমাবদ্ধতা প্রচুর। তাঁর আন্তর বেদনা প্রকাশের কোনো সুযোগই নেই। আলেয়ার সান্নিধ্যে নবাব তাঁর ব্যক্তি(অনুভবকে উজাড় করে দিয়েছেন—

'কলঙ্ক কালিমায় নাম পরিচয় সবই ঢাকা পড়েছে। বেঁচে থাকবার একটু গৌরববোধ এখনও অবশিষ্ট আছে। গুপ্তচরের কলঙ্ক দিয়ে তাও নষ্ট করে দেবেন না জাঁহাপনা।'

মোহনলাল এবং সিরাজের সংলাপের পর আলেয়ার প্রকৃত পরিচয় উদঘাটিত হয়েছে। অনুতপ্ত সিরাজ তাই বলেছেন—'তোমাদের নবাবকে (মা করো সুন্দরী।' গোলাম হোসেনের মন্তব্যটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। সে বলেছে—'চেয়ে দেখুনত জনাব, এই আগুনের শিখা একি কলঙ্কের পরশে কালো হতে পারে।'

প্রাসাদের বাইরে নবাবের হিতৈষী যে সামান্য কয়েকটি নরনারী ছিল আলেয়া তাদেরই একজন। নবাবের ভুল ভাঙানোর পর আলেয়াই তার পরম সহায়, পরম হিতার্থী। শত্রুপ(ের অভিসন্ধি এবং ষড়যন্ত্রের গোপন খবর জানবার জন্য নর্তকী হয়ে সে কাশিম বাজার কুঠির মন্ত্রনা ক(উপস্থিত। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইংরেজ ওয়াটসের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতেও সে দ্বিধা করেনি। খোজা পিদ্রুর গোপন চিঠিটি সেই তুলে দিয়েছে নবাবের হাতে। এইভাবে সিরাজদ্দৌলার চরম সঙ্কটের দিনে নিজের সমস্ত ভয় এবং লাঞ্চনার কথা ভুলে নবাব তথা দেশের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে গিয়েছে আলেয়া। যুদ্ধের চরম মুহূর্তেও আলেয়া নবাবের পাশে থেকেছে। যথোচিত পরামর্শ দিয়েছে তাঁকে। তবু শেষর(া হয়নি। সিরাজের অতি সারল্যের মাশুল দিতে হয়েছে প্রাণ দিয়ে। ধীরে ধীরে নবাবের প্রতি গভীর আবেগ এবং গোপন দুর্বলতা সঞ্চারিত হয়েছে আলেয়ার হৃদয়ে। নবাবের সঙ্গে নিভৃত আলোচনায় তার হৃদয়াবেগ উদবেলিত হয়েছে। আলেয়া বলেছে—'নিজেকে বুঝি আর সামলাতে পারি না জাঁহাপনা।' আবেগ জর্জরিত হয়ে সে বলেছে- 'বড় কষ্ট হচ্ছে জাঁহাপনা আমাকে একটু কালের জন্য অবসর দিন। আমি নিজেকে সুস্থ করে ফিরে আসি।'

আলেয়ার জীবনে আবার কঠিন পরী(া শু(হয়েছে যুদ্ধে পরাজয়ের পর। কঠিন পীড়নে জর্জরিত হতে হয়েছে তাকে। তার সামনে এসেছে লোভ প্রলোভন। তবু সমস্ত অত্যাচার মাথা পেতে নিয়ে সে অটল থেকেছে।

মীরণ তাকে প্রলুব্ধ করেছে। বলেছে—'তাহলে আমার সঙ্গে ঝুলে পড়-আমি তোমাকে নতুন জগতে নিয়ে যাবো।'

মীরণ সিরাজের মর্মান্তিক পরিণতির কথাও শোনাতে ভোলেনি। মীরণ বলেছে—'শুনে রাখ সুন্দরী, পলাশীতেই সিরাজের সমাধি।'

পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের পর আত্মর(ার জন্য পলায়ন করেছেন সিরাজ। এই সময় মীরণের হাতে বন্দি হয়েছে আলেয়া, সিরাজের গন্তব্যস্থল জানবার জন্য তার ওপর চলে বর্বরোচিত অত্যাচার। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর অত্যাচারের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সিরাজকে নিরাপদে রাখতে চেয়েছে সে। চতুরতার সঙ্গেই সে সিরাজের গন্তব্যস্থলটি গোপন রেখেছে। বরং সে ভুল সংবাদ দিয়ে মীরণকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে। বলেছে— 'ঘসেটি বেগমের মহলে যাও। সন্ধান পাবে তাদের।'

আলেয়ার অজেয় মানসিক শক্তি(র পরিচয় মেলে তার নির্ভয় সংলাপে।

গোলাম হোসেন। আলেয়া আর কতদিন এ পীড়ন সইবে তুমি।

আলেয়া। যতদিন না জানব নবাব নিরাপদ।

দেশপ্রেম আলেয়ার জীবনের প্রধান উপাদান হলেও ব্যক্তি(প্রেমের অনুভবের মধ্যে দিয়ে চরিত্রটি মানবিক গুণে অভিষিক্ত(হয়েছে। গোলাম হোসেনের (পুরন্দর) প্রতি তার ভালোবাসা অব্যক্ত(ই থেকে গিয়েছে। আলেয়া প্রথমেই ছদ্মবেশী পুরন্দরকে চিনতে পেরেছিল। আলেয়াই কেবল গোলাম হোসেনকে পুরন্দর বলে সংস্বোধন করেছে। নাটকের শেষে সং(প্ত সংলাপের মধ্যে আলেয়া তার গোপন হৃদয় বেদনার কথা প্রকাশ করেছে। গোলাম হোসেনকে সে বলেছে—'তাহলে ভালো তুমিও বেসেচ?'

আলেয়া চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে তার গানে। তার গাওয়া গানগুলি নাটকের সম্পদ। একদিকে গানের মধ্যে দিয়েই সে তার হৃদয়ের গভীর অনুভূতি প্রকাশ করেছে আবার গানের মাদকতায় আচ্ছন্ন করে সে শত্রুপ(ের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করেছে। তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের গানটি তাৎপর্যপূর্ণ। সে গেয়েছে—'পলাশী! হায় পলাশী। নাটকের মর্মবাণী গানটিকে ধ্বনিত হয়েছে। ব্যক্তি(জীবনের এবং স্বদেশ প্রেমের ব্যর্থতার বেদনা নিয়েই তার ট্র্যাজেডি। দুঃখ আর মর্মপীড়ায় তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে আলেয়া স্বদেশের ঋণশোধ করেছে।

৪.৩.১২.১.৯ : লুৎফউন্নিসা বা লুৎফুন্নেসা

নবাব সিরাজদ্দৌলার পত্নী হিসেবে পরিচিত হলেও লুৎফুন্নেসা তাঁর বিবাহিত স্ত্রী ছিলেন না। সিরাজের বিবাহিতা পত্নী ছিলেন মীর্জা ইরাজ খান নামে এক উচ্চবংশীয় মোগল রাজপু(ষের কন্যা। সিরাজ (শ্বশুর এবং স্ত্রীর দ্বারা পরিত্যক্ত(হন। সিরাজের স্ত্রীর নাম ছিল ওসদাৎউন্নেসা। পরে সম্ভবত লুৎফুন্নেসাকে সিরাজ বিবাহ করেছিলেন। এছাড়াও ফৈজী এবং মোহনলালের ভগ্নীও সিরাজের স্ত্রী ছিলেন বলে জানা যায়। তবে এঁরা হয়তো কেউ সিরাজের বিবাহিত স্ত্রী ছিলেন না।

বেভারিজের মতে লুৎফুন্নেসা এবং উমদাৎউন্নেসা একই ব্যক্তি(ছিলেন। যাইহোক সিরাজের যে একাধিক পত্নী এবং উপপত্নী ছিল তাতে সন্দেহ নেই। সিরাজের জীবনে একাধিক নারী এলেও লুৎফুন্নেসাই যে সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন একথা স্বীকৃত। তিনিই ছিলেন নবাবের প্রিয়তমা পত্নী (লুৎফ-ভালবাসা নেসা-স্ত্রী। লুৎফউন্নিসা-প্রিয়তমা স্ত্রী) ইতিহাসে বলা হয়েছে-'লুৎফ কোনো উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। বাল্যকাল হইতে ত্র(ীতদাসী রূপে নবাব আলিবর্দির সংসারে প্রবিষ্ট হন।'

[মুতা(রিনে লুৎফুন্নেসাকে সিরাজের 'জরিয়া' বলা হয়েছে। জরিয়া বলতে নিচ ত্র(ীতদাসী বোঝায় না। কালত্র(মে এঁরাই ভার্যার গৌরব লাভ করতেন।]

লুৎফুন্নেসা অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন। বেভারিজ বলেছেন— 'বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লুৎফা তাঁহার অপূর্বরূপের ছটায় যুবরাজ সিরাজের হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া বসিলেন।' সিরাজ একাধিক রমণীর সঙ্গ লাভ করলেও তাঁকেই সর্বাধিক ভালবাসতেন।

১৭৯০ সালে লুৎফুন্নেসার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর একমাত্র কন্যাসন্তান জীবিত ছিলেন।

শচীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে ইতিহাসকে অনুসরণ করেই লুৎফুন্নেসা চরিত্রটি অঙ্কিত করেছেন। নাটকেও তাঁর চরিত্রটি প্রেমে উজ্জ্বল।

৪.৩.১২.১.১০ : ঘসেটি বেগম

নবাব আলিবর্দি খাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা ঘসেটি বেগমের জীবন আদৌ সুখের ছিল না। ঘসেটি বেগম তাঁর প্রকৃত নাম নয়। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মেহেরউন্নিসা। কিন্তু ইতিহাসে তিনি ঘসেটি বেগম নামেই পরিচিত। জীবনের একটি পর্বে তিনি সিরাজের বি(দ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দেন। কিন্তু তার আগে তাঁর জীবনে একাধিক দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে।

আলিবর্দির বড় ভাই হাজী আহমদের বড় ছেলে নওয়াজিশ মুহম্মদ খানের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। নওয়াজিশ ছিলেন ঢাকার শাসনকর্তা। আলিবর্দির পরে তিনিই ছিলেন সিংহাসনের দাবিদার। কিন্তু আলিবর্দির জীবদ্দশাতেই নওয়াজিশের মৃত্যু হয়। নওয়াজিশ এবং ঘসেটির দাম্পত্যজীবন সুখের ছিল না। তাঁদের কোনো সন্তানাদিও হয়নি। নওয়াজিশের অধীনস্থ রাজ পু(ষদের অন্যতম ছিলেন হোসেন কুলী খান এবং রাজা রাজবল্লভ। হোসেন কুলীর সঙ্গে ঘসেটির অবৈধ সম্পর্ক ছিল। আর সে জন্য নওয়াজিশ খাঁ হোসেন কুলীর উপর যথেষ্ট চটেছিলেন। এদিকে পরবর্তীকালে ঘসেটি বেগমও হোসেন কুলীর উপর (িপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। কারণ হোসেন কুলী ঘসেটিকে ছেড়ে তার বোন আমিনার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। এদিকে পারিবারিক সম্মানহানিতে (ুদ্ধ আলিবর্দি হোসেন কুলীর গর্দান চাইলেন এবং শেষপর্যন্ত সিরাজই তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর ঘসেটি বেগম স্বামীর প্রিয় পাত্র রাজা রাজবল্লভের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন এবং সিরাজের বি(দ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়ে অন্যতমা নায়িকা হয়ে উঠলেন। মীরজাফর, রাজবল্লভ এবং ঘসেটি বেগম এই ত্রয়ী মিলে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটিকে তো মজবুত করে তুললেন। এই পরিস্থিতিতে আলিবর্দি মীরজাফরকে কোরান হাতে শপথ করিয়ে নিলেন শত্র(র হাত থেকে সিরাজকে তিনি র(া করবেন। মীরজাফরের ভিন্ন চিন্তা ছিল। তিনি চেয়েছিলেন ঘসেটি বেগম (মতায় প্রতিষ্ঠিত হন। সেইজন্যই এই শপথ নিয়েছিলেন তিনি। এই ষড়যন্ত্রে ঘসেটি বেগম যদি সেদিন সফল হতেন তা হলে নওয়াজিশের পালিত শিশু পৌত্রকে (এই শিশু সিরাজের ছোট ভাইয়ের ছেলে) মসনদে বসিয়ে মীর নজরআলি রাজত্ব করতেন। কিন্তু বেগমেরে সে চেষ্টা সফল হয়নি মীরজাফরের কূট কৌশলে।

পলাশীর যুদ্ধে ষড়যন্ত্রীরা সফল হলেও ঘসেটি বেগমের আখেরে কিছুই জুটল না। বরং মর্মান্তিক পরিণতি হল ঘসেটি বেগমের ষড়যন্ত্রকারীদের অন্যতম মীরণ তাঁকে মাঝনদীতে ডুবিয়ে মেরে ফেলেন।

নাটকে ইতিহাস নির্ভর ঘসেটি বেগমের পরিচয়টি তুলে ধরেছেন নাট্যকার। তিনি যে সিরাজের বি(দ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের অন্যতম ছিলেন নাটকে তাও দেখানো হয়েছে। ঘসেটি বেগমের বন্দি হবার ঘটনাটিও নাটকে স্থান পেয়েছে।

৪.৩.১২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। গোলাম হোসেন ও আলেয়া অনৈতিহাসিক হলেও নাটকে তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ কেন? আলোচনা করো।

২। সিরাজদ্দৌলা নাটকের অন্তিম দৃশ্যে জনতার দরবারে সিরাজের উপস্থিত ইতিহাসের সীমা অতিক্রম করে এক উচ্চতর জগতে সিরাজকে মুক্তি দিয়েছে। এই শেষ দৃশ্যটি নাটকের মূল ভাবনার সঙ্গে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ?

৩। পাঠ্য 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের অন্তিম দৃশ্য অবলম্বনে সিরাজের ভূমিকা কতটা স্বাভাবিক এবং সঙ্গতিপূর্ণ তা আলোচনা করে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করো।

৪.৩.১২.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। ক্ষৌতিশ বংশাবলীচরিত — দেওয়ান কার্তিকচন্দ্র রায়।

২। সিরাজদ্দৌলা — নিখিলনাথ রায়।

৩। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস — ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

৪। বাংলা নাটকের ইতিহাস — ডঃ অজিত কুমার ঘোষ।

৫। শচীন সেনগুপ্ত — ডঃ অজিত কুমার ঘোষ।

৬। বাংলা নাটক ও নাট্যশালা — শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

৭। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা — মন্মথ রায়।

৮। The Bengali Drama — its origin and devolepment — Dr. P. Guha Thakurata.

৯। পলাশির যুদ্ধ — নবীন চন্দ্র সেন।

১০। বাংলা নাটকের পুনর্বিচার — ডঃ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১১। পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ — রজতকান্ত রায়।

১২। গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা — (সম্পাদনা — ৫(ত্র গুপ্ত)

১৩। সিরাজদ্দৌলা — (সম্পাদনা — স্মরণ আচার্য)

১৪। সিরাজদ্দৌলা ঃ গিরিশচন্দ্র ও শচীন্দ্রনাথ — অপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়।

———

পর্যায়গ্রন্থ - ৪

একক - ১৩

একাংক নাটকের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

বিন্যাসক্রম :

৪.৪.১৩.১ : পাঠ্য নির্বাচিত নাট্যগুচ্ছ

৪.৪.১৩.২ : ভূমিকা

৪.৪.১৩.৩ : একাংক নাটক সম্পর্কে নানা অভিমত

৪.৪.১৩.৪ : একাংক নাটকের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

৪.৪.১৩.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪.৪.১৩.১ : পাঠ্য নির্বাচিত নাট্যগুচ্ছ

১। দেবী — তুলসী লাহিড়ী

২। এক সন্ধ্যায় — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

৩। রাজপুরী — মন্মথ রায়

৪। শিককাবাব — বনফুল

৫। অপচয় — দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৬। কোথায় গেল — কিরণ মৈত্র

৪.৪.১৩.২ : ভূমিকা

একাংক নাটকের উদ্ভব — নাট্যরচনা ও অভিনয়ের উন্মেষ পর্বেই। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে আচার্য ভরত এবং আচার্য বিশ্বনাথ-এর নির্দেশে যে দশরূপকের বা নাটকের কথা উল্লিখিত হয়েছে, তার মধ্যে 'ভাণ', 'ব্যায়োগ', 'বীথী', 'প্রহসন' এবং 'উৎসসৃষ্টিকাংক' অবশ্যই একাংক নাটক। প্রতীচ্যে নাটকের পথ চলা যে দেশে শুরু সেই গ্রীসে প্রথম যুগে নির্দিষ্ট, অংকবিহীন নাটকই রচিত ও অভিনীত হত। দীর্ঘ সময় ধরে অভিনীত হলেও সেই নাটকও ছিল 'একাংক'। তবে আধুনিক একাংক বা সংস্কৃত একাংকের সঙ্গে তার কোনো সাযুজ্যই লক্ষিত হয় না।

বিংশ শতাব্দীর ব্যস্ত জীবনে একদিকে দীর্ঘ সময় ধরে নাট্যরচনা, নাট্যাভিনয় এবং নাটক দেখার বিষয়টিকে সংক্ষিপ্ত করা; অন্যদিকে নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রসার — এই দুয়ের হাত ধরেই একাংক নাটকের সাড়ম্বর উপস্থিতি। এই উপস্থিতি বাঙলা বা ভারতবর্ষ নয়, বিকশিত সংস্কৃতির সব দেশেই। উপন্যাস থেকে গল্প বা ছোটগল্পের জন্ম হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রতীচ্যের দেশগুলিতে। সময়কাল থেকে এ দেশে খানিকটা পরে। আধুনিক কালে এই একাংক নাটক রচনার ক্ষেত্রে একই কারণ কাজ করেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় স্বল্পায়তনে কখনওবা একাংক নাটক রচিত হয়েছে প্রধানত পেশাদারী - বাণিজ্যিক থিয়েটারে অভিনীত মূল নাটকের পর নির্দিষ্ট সময়ের ফাঁকটুকু পূরণের জন্য। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল বসু, জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা অপ্রধান প্রহসনকারদের কথা প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের কৌতুক নাটকগুলির মধ্যে একাংক নাটক আছে। অংকবিহীন 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা', 'ডাকঘর', ভিন্নগোত্রের নাটক, তবে তাদের একাংকও বলা যাবে না। প্রতীচ্যে ঐ ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'কার্টেন রেইজার' বা পূর্বরঙ্গের উপস্থিতি একাংক-এর ভূমিকাই পালন করেছে। লণ্ডনের রঙ্গালয়ে বিলম্বিত দর্শকদের জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

স্বাধীনোত্তরকালে একাংক নাট্যরচনা - অভিনয় অনেকটা আন্দোলনে পরিণত হয়েছে বাঙলা নাটকের প্রসারিত আঙিনায়। ষাট, সত্তর দশকে পরিবর্তিত সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শিল্প-সংস্কৃতির নানা ধারার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে নাটক রচনায়-অভিনয়ে যে ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছিল তার প্রধান লক্ষ্য ছিল — শোষক মানুষ এবং শোষিত মানুষ। সর্বতোভাবে একাংক নাটকের জমজমাট রূপচ্ছবিটি এই সময় প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রতীচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, স্কটল্যান্ডে একাংক নাটক আন্দোলনের পর্যায়ে পৌঁছেছিল গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। এর পিছনে যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যথাক্রমে তাঁরা হলেন — আর্থার হপকিন্স এবং জিওফ্রে হুইটওয়ার্থ।

৪.৪.১৩.৩ : একাংক নাটক সম্পর্কে নানা অভিমত

একাংক নাটক সম্পর্কে বিভিন্ন সুধীজন এদেশে-বিদেশে যে অভিমত জ্ঞাপন করেছেন, আমরা সে দিকে একবার দৃষ্টি ফেরাব।

(১) "In a sentence the ideal one act play is a concise, unbroken expression of a single idea untrammellea by side issues and unnescessary elaborations." (J. Bourne/Threatre stage, ed. by Downs.)

(২) Dealing with a single episode or situation and having no space to show the development of character in action, it is necessarily much more climatic in structure and demands therefore great skill in exposition of circumstance and personality and the utmost economy throughout. (John Hampden/24 one act plays).

(৩) The one-act-play which can be read aloud in twenty minutes or half an hour shows how a single theme can be presented, developed and brought to a climax with the minimum of material and the maximum of drammatic effect. (J. Marriot/ One-act plays of To-day-1st series).

(৪) In the short play, however, the author has no time in which to develop character and situations. His characters must be flashed on the audience, his the round, so to speak, like figures passing a window; has situations must be apprehended quickly, like a picture hung on a wall. And in reading the best type of short play it is, may be, not the least point of interest to perceive how all this is achieved with the extreme of verbal economy. (Seven famous one-act-plays/ Ferguson).

(৫) Self-evidently a dramatic work consisting of only one act. Usually short (a playing time of fifteen to forty minutes is about normal). ...

A One-act play is the dramatic equivalent of a short story and tends to concentrate on a single episode or situation and as a general rule has only two or three characters. In theme, mood and subject the range is considerable – from farce to tragedy. (The penguin Dictonary of Literary terms and Literary theory, ed. by J. A. Cuddon.)

(৬) একাংক নাটিকা হচ্ছে সেই শ্রেণীর দৃশ্যকাব্য যার "কার্য্য" একটিমাত্র অঙ্কের পরিসরে এবং স্বল্পায়তনে উপস্থাপিত হয়। ... একাংক নাটিকা নিজেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বৃত্ত — "ছোট" হলেও "সমগ্র" একটি "কার্য"। (ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য/একাংক সঞ্চয়ন, নাটকের রূপ, রীতি ও প্রয়োগ)

(৭) ঘটনার অবিচ্ছিন্নতা, ভাবগত অখণ্ডতা, ঘনীভূত রসময়তা — এগুলিই একাংক নাটকের অপরিহার্য লক্ষণ। একাধিক দৃশ্য ও দৃশ্যসজ্জার মধ্যে এই লক্ষণগুলি মাঝে মাঝে দেখা গেলেও একটিমাত্র দৃশ্যের মধ্যে এই লক্ষণগুলি সবচেয়ে সার্থক ভাবে ধরা পড়ে। (ড. অজিতকুমার ঘোষ/একাংক সঞ্চয়ন, নাট্যতত্ত্ব পরিচয়)

(৮) একাংক নাটক হল একক প্রতীতিসম্পন্ন, উত্থান-পতন-বহুল ঘটনাসমৃদ্ধ, পরিমিত আয়তন, আদি-মধ্য-সমন্বিত দৃশ্যকাব্য — যা একদিকে এক দৃশ্যময় ত্রি-ঐক্যে সংবৃত, অন্যদিকে অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড ভাবময়তায় সংহত। (দিলীপকুমার মিত্র/একাংক নাটকের কথা)

(৯) একাংকিকা মাত্র একটি প্রধান নাটকীয় ঘটনার আবর্ত সৃষ্টি করে। নাটিকার প্রধান উদ্দেশ্যও হয় মাত্র একটি ফলাফল সৃষ্টি করা, তা বিয়োগান্ত হোক বা মিলনান্ত হোক। আর, একাঙ্ক নাটিকার অভিনয় যখন অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমাধান করতে হয়, তখন তাকে সার্থক করে তুলতে হবে নাটিকার গঠননৈপুণ্যে দীর্ঘসূত্রতা সম্পর্ণ অর্জন করতে হবে। স্থান-কাল-পাত্র সমন্বয়ে সূক্ষ্মতা দেখাতে হবে। সেখানেই শিল্পীর শিল্পস্থাপনের বিরাট নৈপুণ্য। প্রথম দৃশ্যপটের উদ্‌ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকের চিত্ত জয় করে রেখে দিতে হবে, নতুবা সব ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য। দুর্বল ঘটনাবিন্যাস বা বিশ্লেষণ করার সেখানে সময় নেই, অবসরও নেই, অযথা বক্তৃতা দেবারও সুযোগ নেই; একটি প্রধান বা মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার সুবিধাও নেই। গাঠনিক ও বাচনিক সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠতা দেখাতে গেলে শিল্পীকে অতি সতর্কভাবে চলতে হবে, তবেই সার্থকতা। এটা সম্ভবপর করে তুলতে পারলে সেইখানেই হবে একাংকিকার বিরাট শিল্পসম্ভাবনা। (অহীন্দ্র চৌধুরী/ভূমিকা : একাংক নাটক সংকলন, ১৯৫৮)।

(১০) The one-act form must, as it were, be presented in a "single sitting"; it must start at the beginning with certain definite elements and pass quickly and effectively to the end without half or digression. (B. Rolland Lewis/The technique of the One-act Play).

(১১) একাংকিকায় একটিমাত্র বিশেষ ঘটনা-সংস্থানকে সংক্ষিপ্ত পরিধির একটি শেষ ভাবসৃষ্টির সহায়রূপে পরিকল্পিত হয়।... এই জাতীয় নাটকে সুদীর্ঘ কথাবার্তা বা গুরুগম্ভীর আত্মবিবৃতির

অবসর নেই — স্বল্প সময়ে একটি সুনির্বাচিত ঘটনার নাটকীয় চরম পরিণতি (climax)) প্রদর্শন ইহার উদ্দেশ্য। ইহাতে একটি বিশেষ পরিবেশ (setting) বা একটি ক্রমপ্রসারী দৃশ্যে বা একটি মাত্র চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া নাটকীয় চরম পরিণতি লাভ করে এবং একটি বিশেষ ভাবানুভূতি (impression) সৃষ্টিই ইহার লক্ষ্য। মাঝে মাঝে ঘটনাপ্রবাহের দ্রুত স্রোতে বিস্ময় ও কৌতূহল সঞ্চার করিয়া নাট্যকার চরিত্রের নাটকীয় গতিবিধান করিবেন। (শ্রীশচন্দ্র দাশ/সাহিত্য সন্দর্শন)

(১২) একাংক নাটিকা হল এক অঙ্কের স্বল্পায়তন, এমন একটি স্বল্প চরিত্রবিশিষ্ট নাটিকা, যাতে কল্পনায় অনুভূত, কোনো একটি চরিত্রের বিশেষ একটি দিক বা জীবনের একটি গভীর তার নাটকীয় গতিবেগযুক্ত হয়ে দ্রুত চূড়ান্ত মুহূর্তে সৃষ্টি করে দ্বন্দ্বাত্মক পথে দর্শকদের উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে চরম পরিণাম লাভে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বৃত্তে একটি সমগ্র কার্যের ব্যঞ্জনা দেয়। (দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়/নাট্যতত্ত্ব এবং নাটকের কথা)।

(১৩) আদ্যন্তের ত্বরিৎ গতিতে অথবা অন্ত্যাংশের বিলম্বিত গতিতে নিষ্পন্ন কোনো বিষয় বা ভাবের সম্পৃক্ত নাটকই একাঙ্ক নাটক। (ড. কৃষ্ণলাল ভট্টাচার্য/বাংলা একাংক নাটকের উদ্ভব, প্রকৃতি ও বিকাশ)।

(১৪) আধুনিক একাংকী কলাকে বিকাস এবং ইস্‌কে বর্তমান শিল্পবিধান পর পশ্চিম কী একাংকী কলা কা বিশেষ রূপ সে প্রভাব পড়া হ্যায়। ইসকে ফলস্বরূপ একাংকী কলা সে অন্তর্দ্বন্দ্ব ঔর ঘটনায়ো কা ঘাত প্রতিঘাত সবসে প্রধান তত্ত্ব সিদ্ধ হুঅ হ্যায়। দো বিরোধী পরিস্থিতিঅ অপনে-অপনে সত্য কে সাথ আপস মে টকরাতী হ্যায়, ঔর উনকা সংঘর্ষ সমূচে একাঙ্কী মে খৈল জাতা হ্যায়। ইস্ তরহ একাংকী মে কে নিশ্চিত সমস্যা কী তীব্রতা, উসকে দ্রুত বিকাস কা বেগ ঔর চরম সীমা পর উস্ সমস্যা কী চরম অন্বিতি, ইস কী কলা কী মূল বিশেষতায়েঁ হ্যায়। ইস্‌কো এক অদভুত সূত্র মে বাঁধ রখনে কে লিয়ে ইস কলা মে কৌতূহল ঔর জিজ্ঞাসা কী সবসে অধিক আবশ্যকতা হোতি হ্যায়। ইসী তত্ত্ব মে একাংকী কে সমস্ত তত্ত্ব আপস মে ইস তরহ জুড়ে রহতে হ্যায়, জৈসে এক পূর্ণ বিকসিত পুষ্প মে উসকী পঙ্খড়িয়াঁ, পরাগ ঔর সুগন্ধী। (উদয় নারায়ণ তেওয়ারী/নয়ে একাংকী)।

(১৫) একটি মাত্র অঙ্কের পরিসরে সমাপ্য এই নাটকে সংক্ষিপ্ত কালসীমায় বিধৃত জটিলতাহীন এমন একটি কাহিনী বা পরিস্থিতি রূপায়িত হয়, যাহাতে দর্শক এক অখণ্ড অভিজ্ঞতার স্বাদ পায়। কাহিনীর ধারায় পর্যায়ক্রমে চরিত্র বিকশিত করিয়া তুলিবার সুযোগ থাকে না। নাট্যীয় তাৎপর্য নয় সংক্ষিপ্ত সংলাপের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ঘটনা ও চরিত্র উপস্থাপন করা হয়। (শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়/ভারতকোষ/২য় খণ্ড)

(১৬) However, it is apparent that in the one-act play there can be no sub-plot, and no irrelevant detail or incident can be introduced without damage to the whole. (Manju Dutta Gupta/The One Act Play — A Critical Approach).

(১৭) এক অঙ্কের পরিসরে সংক্ষিপ্ত কালসীমায় সামান্য একটি কাহিনীর নাট্যরূপকে একাংক নাটক বলে।..... লক্ষ্যের দিক থেকে একটিমাত্র বিষয়ের প্রতি একাংক নাটকের আনুগত্য থাকবে, এবং ঘটনা একমুখী হবে। একটি চরিত্রকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করাও একাংক নাটকের লক্ষ্য হতে পারে। ছোটগল্পের চারিত্রিক লক্ষণ যেমন একমুখিতা, একাংকে ঘটনার

উদ্দেশ্যেও কতকটা একমুখী। সংক্ষেপে, অবান্তর বিন্যাস বাদ দিয়ে নাট্যপরিস্থিতিকে চরম কৌতূহলোদ্দীপক করে কেন্দ্রীয় চরিত্রেকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। যদি ঘটনাকে প্রাধান্য দিতে হয় — তবে তা ক্লাইমেক্সের মাধ্যমে উপস্থিত করতে হবে। চরিত্রবিকাশই হোক বা ঘটনার উপস্থাপনাই হোক, কিংবা জীবনের একটি গভীর উপলব্ধ সত্য প্রকাশের ব্যাপারই হোক, নাট্যকারকে গভীর সংযমের সঙ্গে বক্তব্য প্রকাশ করতে হবে, দেখতে হবে কোথাও শৈথিল্য বা বাহুল্য যেন না থাকে। নাট্যচমকের দ্যুতি ও দীপ্তি বৈদ্যুতিক আকস্মিকতা নিয়ে একাংকে হাজির হয়। (শুদ্ধসত্ত্ব বসু/বাংলা সাহিত্যের নানারূপ)

(১৮) একাংক নাটক extravaganza নয়, সম্পূর্ণ extra-ordinary — জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র থেকে সুনির্বাচিত একটি নাটকীয় মুহূর্তকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরার প্রদীপ্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে তার জন্ম। সে বর্তমান শতাব্দীর লোক, বিগত শতাব্দীর কেউ নয়।..... একাঙ্কিকার য়েঙ্গ ঐক্যটি প্রত্যাশিত তা হল ভাব-ঐক্য (unity of impression); সেই ঐক্যবিন্দুটিকে উজ্জ্বল করার জন্যই একাংকিকার যৎসামান্য আয়োজন। (চিত্তরঞ্জন লাহা/সাহিত্য সম্পর্কিত)।

(১৯) একাংক নাটক হল এক দৃশ্যে অভিনয়যোগ্য, দ্রুত সংঘটিত বাহুল্যবর্জিত এমন এক ধরনের সংবদ্ধ নাটক, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য তীব্র একমুখিনতা, অথচ নাটকের মৌল লক্ষণ অবিকৃত রেখে যাতে প্রচুর স্বাধীনতা গ্রহণের অবকাশ রয়েছে। (হীরেন চট্টোপাধ্যায়/সাহিত্য প্রকরণ)

(২০) একাংক নাটক - ক্ষুদ্র গবাক্ষের মধ্য দিয়ে দেখা বহু ব্যাপ্ত জীবনযন্ত্রণার সুতীব্র স্বাক্ষর অথবা বলা যায়, দিগন্ত প্রসারিত দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ, বিপর্যস্ত, নিষ্পেষিত মানবজীবনের সংহত, সীমাবদ্ধ ক্যানভাসে বিবৃত নাট্যবৃত্ত। (সনাতন গোস্বামী, একাংক নাটকের রূপ ও রূপকার)

৪.৪.১৩.৪ : একাংক নাটকের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

একাংক নাটক সম্পর্কে নাট্যসমালোচক — নাট্যবিশেষজ্ঞদের নানা অভিমত জানার পর আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসব। মাত্র একটি অংকে সীমাবদ্ধ একাধিক দৃশ্যবিহীন একমুখী লক্ষ্য ও কাহিনীবেষ্টিত, অবশ্যই অখণ্ড ভাবসূত্রে গ্রথিত, স্বল্প সংখ্যক চরিত্রের উপস্থিতিতে, সহজ সরল দৃশ্যস্থাপনায়, প্রয়োজনীয় আলোক সম্পাতে, আবহ সৃষ্টিতে, চরিত্রানুযায়ী পোশাক পরিকল্পনা ও সাজসজ্জা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত কিন্তু শিল্পিত, গতিসম্পন্ন নাটকের কৌতূহলদ্দীপক (Dramatic suspense) কাহিনীতে বিভাসিত জীবনজিজ্ঞাসার বীজবপনের মধ্যদিয়ে পরিণতিতে (Exposition) উপনীত নাটকই হল, একাংক নাটক। *(বিভিন্নজনের অভিমত সংগ্রহের কাছে কৃতজ্ঞ ড. সনাতন গোস্বামীর কাছে)।*

নামকরণ এবং পরিণতিতে সংশয়, সংকেত, থাকাটা অনিবার্য না হলেও অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ। ছোটগল্পের সঙ্গে একাংক নাটকের সাযুজ্য এখানেই।

উপরের সংজ্ঞা এবং বিভিন্ন সুধীজনের অভিমত থেকে আমরা একাংক নাটকের বৈশিষ্ট্যগুলি পরিমার্জিতভাবে সাজিয়ে নিতে পারি।

১। একটি অংকে কাহিনী (Plot) সীমাবদ্ধ থাকবে।

২। শিল্পিত রূপটি প্রগাঢ় এবং নাট্যকাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে অবশ্যই দৃশ্যও একটিতে সীমায়িত হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োগের দিক থেকেও তা সুবিধাজনক। সংশ্লিষ্ট একাংক নাটকটিকে অভিনীত হতে হবে। অতএব প্রয়োগের বিষয়টি ভাবতেই হবে।

৩। কাহিনী অনুযায়ী চরিত্রের উপস্থিতি ঘটবে। চরিত্রের সংখ্যাও সীমায়িত হওয়া জরুরী। একাধিক চরিত্রের উপস্থিতিতে একমুখী নির্দিষ্ট কাহিনী (Plot) এলোমেলো হতে বাধ্য।

৪। কাহিনী একমুখী হবে।

৫। অভিনয়ের ক্ষেত্রে দৃশ্যসজ্জা-মঞ্চভাবনা, পোশাক-সাজসজ্জা, আলোক সম্পতে সরলীকরণ প্রয়োজন। কারণ একাংক নাটক যাঁরা প্রযোজনা করেন তাঁরা বা সেই নাট্যগোষ্ঠীগুলিকে নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে অভিনয় করতে হয়, বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হয়। ছোট গোষ্ঠীগুলি একাংক নাটক প্রযোজনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তাই খরচের দিকটিতে নজর দিতে এটা করা দরকার।

৬। আবহসংগীত এখন সর্বত্র টেপরেকর্ড করে বাজানো হয়। এক্ষেত্রে দায়িত্বপালনের বিষয়টি যেন গুরুত্ব পায়।

৭। নাটক শেষ হবার পর দর্শক যেন চিন্তাভাবনার খোরাক পায়, তা' কাহিনী গুরুগম্ভীর-সিরিয়াস হোক বা হাসির।

৮। এক্ষেত্রে সংশয়, সংকেত, ব্যবস্থা থাকাটাও জরুরী।

৯। নামকরণের ক্ষেত্রে ঐ বিষয়গুলি যেন প্রকাশ পায়। দর্শকমনে প্রথম থেকে যেন কৌতূহল বজায় (Dramatic Suspense) থাকে।

১০। অবশ্যই কাহিনী পঞ্চসন্ধিতে আবদ্ধ হয়। অর্থাৎ (Starting point) (প্রারম্ভ), Rising action (উৎকণ্ঠামুখিনতা), Climax (উৎকণ্ঠা), Falling action (পরিণতিমুখিনতা), Exposition (পরিণতি)।

১১। কাহিনীর ত্রি-ঐক্য (Trio-Unity) — Unity of Time (সময়ের ঐক্য) Unity of action (ঘটনার ঐক্য) এবং Unity of Place (স্থানিক ঐক্য)।

১২। বিষয়বস্তু (Theme) হবে বাস্তবজীবনের উপর ভিত্তি করে এবং নাটকীয় সম্ভাবনায়পূর্ণ — নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে যা বিকশিত হয়ে পরিণতিতে পৌঁছবে।

১৩। আদ-মধ্য-অন্ত সমন্বিত হবে একাংক নাটকের বৃত্ত।

১৪। সংহত ভাবাবেগের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব, উৎকণ্ঠা, কৌতূহল চূড়ান্ত রূপ নেবে।

১৫। সংলাপ (Dialogue) সহজ-সরল-প্রাণবন্ত অবশ্যই বোধগম্য হতে হবে। কাহিনী এবং চরিত্রানুযায়ী কাম্য।

১৬। অখন্ড অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেন চালিত হতে পারে।

১৭। শিল্পসম্মত হওয়াও বাধ্যতামূলক।

১৮। ঘটনার (action) অবিচ্ছিন্নতা, ভাবগত অখণ্ডতা, ঘনীভূত রসময়তা অপরিহার্য।

১৯। অপ্রাসঙ্গিক, দ্রুত সংঘটিত, বাহুল্য বর্জিত এবং অবশ্যই অভিনয়যোগ্য হতে হবে।

২০। 'একাংক নাটক Extravaganza নয়, extra-ordinary' — জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র থেকে একটি সুনির্দিষ্ট নাটকীয় মুহূর্তকে স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রদীপ্ত করাই তার প্রকৃত লক্ষ্য।

৪.৪.১৩.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'একাংক' নাটকের বৈশিষ্ট্যগুলির অনুসরণে আলোচ্য নাটকগুলির মধ্যে কোন্‌টিকে তুমি সার্থক বলে মনে করো।

২। 'অপচয়' নাটকের সমস্যা সংলাপের অভিনবত্বে কিভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে?

৩। একাংক নাটকের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে লিখে পঠিত একাঙ্ক নাটকগুলিতে সেইসব বৈশিষ্ট্য কীভাবে ধরা পড়েছে বুঝিয়ে দাও।

৪। নাট্যকারের বাস্তব অভিজ্ঞতার নিটোল প্রকাশ 'অপচয়' একাঙ্ক নাটকে সম্ভব হয়েছে নাটকটির কাহিনী–চরিত্র এবং সংলাপের গুণে। এই অভিমতের যথার্থতা বিচার করো।

৫। 'অপচয়' নাটকে 'দেশভাগজনিত কঠিন পরিস্থিতি দুই যুবক যুবতীর মিলনের অন্তরায় হলেও প্রেমের অঙ্গীকারই এই নাটকে স্বীকৃত সত্য'–মন্তব্যটি আলোচনা দ্বারা প্রতিষ্ঠা করো।

পর্যায়গ্রন্থ - ৪

একক - ১৪

তুলসী লাহিড়ী—দেবী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-বিগ্র প্রতিষ্ঠা

বিন্যাসত্র(ম :

৪.৪.১৪.১ : একাংক সঞ্চয়ন প্রসঙ্গ

৪.৪.১৪.২ : তুলসী লাহিড়ী — দেবী

৪.৪.১৪.৩ : তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় — বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা

৪.৪.১৪.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪.৪.১৪.১ : একাংক সঞ্চয়ন প্রসঙ্গ

দুই বাঙালী নাট্যবিশারদ অধ্যাপক (ড.) সাধনকুমার ভট্টাচার্য এবং অধ্যাপক (ড.) অজিতকুমার ঘোষ — এর সম্পাদনায় 'একাংক সঞ্চয়ন' নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল : ১৩৬৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে। তারপর আরো কয়েকবার প্রকাশিত হয়েছে এই গ্রন্থের বিভিন্ন মুদ্রণ নানা সময়ে। একাংক এই নাট্যসংকলনে কুড়িটি একাংক নাটক সংকলিত হয়েছে। নাট্যকারেরা হলেন ক্রমান্বয়ে — রবীন্দ্রনাথ, শচীন সেনগুপ্ত, তুলসী লাহিড়ী, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, বনফুল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, পরিমল গোস্বামী, বিধায়ক ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অখিল নিয়োগী, সুনীল দত্ত, গিরিশংকর, সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, সিতাংশু মৈত্র, কিরণ মৈত্র, রমেন লাহিড়ী।

কুড়িটি নাটকের নামও আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন, যথাক্রমে — 'খ্যাতির বিড়ম্বনা', 'রাজধানীর রাস্তা', 'দেবী', 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা', 'রাজপুরী', 'অসাধারণ', 'শিককাবাব', 'উপসংহার', 'আধিভৌতিক', 'সাপ্তাহিক সমাচার', 'উজানযাত্রা', 'অপচয়', 'একসন্ধ্যায়', 'সাজঘর', 'কুয়াশা', 'একচিলতে', 'সকাল বেলায় একঘন্টা', 'একটি রাত্রি', 'কোথায় গেল', 'মনোবিকলন'।

রবীন্দ্রনাথ-এর নাটক দিয়ে সূচনার কারণ তাঁকে স্পর্শ করে যাত্রার সূত্রপাত। এই সংকলনে মন্মথ রায় ছাড়া অন্য কারোর প্রকাশিত নাটক স্থান পায়নি। অধিকাংশ নাটকগুলির নামকরণে স্পষ্ট যে, স্বল্প সময়, নির্দিষ্ট বিষয়কে নাট্যকারদের প্রাধান্য বিস্তারই মুখ্য হয়ে উঠেছে। সাতচল্লিশ বছর আগে সংকলিত এই গ্রন্থটিতে ষাট, সত্তর দশকের - জনপ্রিয় নাট্যকারদের নাটক সংকলিত হয়নি। সেই সুযোগ ছিলনা সংকলনের সময়। পরে সংস্করণ হলে ভালো হত। অবশ্যই তাতে — উৎপল দত্ত, মনোজ মিত্র, দেবাশিষ দাশগুপ্ত, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, শাঁওলি মিত্র, বাদল সরকার, শ্যামল সেনগুপ্ত, জোছন দস্তিদার, অরূপ মৈত্র, কুমার রায় প্রমুখের রচিত নাটক অনায়াসে সংকলন করা যেত। অধ্যাপক অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত বাংলা একাংক নাটক সংকলন প্রকাশ করেছে সাহিত্য আকাদেমি (নয়াদিল্লি)। সেই সংকলনে সংশ্লিষ্ট প্রায় সকলের নাটক সংকলিত হয়েছে।

আমাদের পাঠ্য আলোচ্য সংকলন পঞ্চাশ উত্তরকালের নাট্যকারদের নাটক না থাকায় বিশ শতকের ষাট-সত্তর-আশির দশকের পরিবর্তিত সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতির ছবিটি উচ্চকিত হতে পারেনি। এটি দুর্ভার্গের বিষয়। এ বিষয়ে পাঠ্যসূচী প্রণয়ণকারীদের গঠনমূলক ভাবনাচিন্তা প্রয়োজন।

এবার আমরা পাঠ্য নাটকগুলি নিয়ে আলোচনা করব।

৪.৪.১৪.২ : তুলসী লাহিড়ী — দেবী

তুলসী লাহিড়ী (৪.৪.১৯৮৭ - ১২.৬.১৯৫৯) — পূর্ববঙ্গ (বর্তমানে বাংলাদেশ)-এর রংপুর জেলার গাইবান্দ্যা সাবডিভিশনের নলডাঙ্গা গ্রামে জন্ম। তাঁর আসল নাম ছিল হেমচন্দ্র। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ছাত্রাবস্থায় জড়িয়ে পড়ায় স্কুল থেকে বিতাড়িত হন এবং নতুন স্কুলে ভর্তির সময় অভিভাবকেরা পারিবারিক কৃষ্ণ আরাধনার সূত্রে নামকরণ করেন তুলসী। এই নামটি শেষপর্যন্ত স্থায়ী হয়। কলকাতা, রংপুর, কোচবিহার এই তিনটি স্থানে তাঁর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়। স্নাতক হওয়ার পর তিনি আইন (Law) পাশ করেন। সঙ্গীত নিয়েও মরিস কলেজে পড়েন। এই বিষয়ে বিশেষ উৎসাহসঞ্চারী ছিলেন কোচবিহারের রাজগায়িকা হারাবাঈ। তার সঙ্গে সংযোগ গড়ে ওঠে পিতামহ শিবচন্দ্রের সূত্রে। শিবচন্দ্র ছিলেন কোচবিহার রাজার ঘনিষ্ঠ এবং উচ্চপদের রাজকর্মচারী। পিতা ডিমনা টি এস্টেটের ম্যানেজার। আলিপুর কোর্টে ওকালতি শুরু করলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সাহিত্য সঙ্গীতের জগৎ ছিল তাঁর স্বক্ষেত্র। সুরকার, গীতিকার এবং নাটকে সঙ্গীত পরিচালক রূপে তার স্বীকৃতি সর্বজনবিদিত। তিনি চলচ্চিত্রও পরিচালনা করেন। সাহিত্যচর্চ্চার হাত ধরেই নাটকের জগতে তাঁর প্রবেশ। শেষপর্যন্ত নাটক রচনা এবং নাট্যাভিনয় গণ-নবনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্তি তাকে দিয়েছে যোগ্য স্বীকৃতি। ছোট-বড় মিলিয়ে তাঁর রচিত নাটকের সংখ্যা নেহাত কম নয়। এক সময় গণনাট্য সংঘের সভাপতি হয়েছিলেন পরে গণনাট্য সংঘ ছেড়ে নবনাট্য আন্দোলনের পথিকৃত বহুরূপীতে যোগ দেন, সেখান থেকে বেরিয়ে ‘আনন্দম’ ও ‘রূপকার’ নাট্যগোষ্ঠির সঙ্গে যুক্ত হন। ‘ছেঁড়া তার’ (১৯৫০) ও ‘দুঃখীর ইনাম’ (১৯৪৩) তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ শুধু নয়, নবনাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে মাইলস্টোনও বটে।

পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার পাশাপাশি তিনি একাঙ্ক নাটকও রচনা করেছিলেন। একাঙ্ক নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য নববর্ষ, নাট্যকার, নায়ক, গ্রীনরুম, ওলটপালট, মনিকাঞ্চন, চৌর্যানন্দ এবং অবশ্যই ‘দেবী’। ‘দেবী’ নাটকটির পটভূমি কয়লাখনি সন্নিহিত জঙ্গল পরিবেষ্টিত বনবাংলো (Forest Banglo)। এই নাটকে মোট চরিত্রের সংখ্যা চার। এরা হল কয়লাখনির ম্যানেজার নিতাইবাবু, থানার দারোগাবাবু মি. ঘোষ, বাউড়ি নারী শুখনি ও চৌকিদার গোবর্ধন।

নাটকটি শুরু হয়েছে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পর, সমাপ্তি রাত্র বারোটার মধ্যে অর্থাৎ Unity of time যথার্থ। স্থান বনবাংলো এবং সন্নিহিত জঙ্গল, সেখানে নাট্যঘটনা সংঘটিত হয়। Unity of action স্বাভাবিক, আর Unity of place-ও পুরোপুরি বজায় থেকেছে। নাট্যকাহিনী একমুখী লক্ষ্য নির্দিষ্ট; — কয়লাখনির ম্যানেজার নিতাইবাবু অপেক্ষমান এক সন্ধ্যায় বনবাংলোতে স্থানীয় থানার বড়বাবুর সঙ্গে ফূর্তি করে রাত কাটাবেন ভেবে, বড়বাবু মি. ঘোষের আসতে দেরী হওয়ায় তিনি চঞ্চল হয়ে চৌকিদার গোবর্ধনের সঙ্গে তখন এবং রাতের খাবার নিয়ে আলোচনায়রত। সেই আলোচনার মধ্যে উঠে আসে হাজারিবাগের এই জঙ্গলের এক ভয়ানক বাঘিনীর উপদ্রবের সম্প্রতিক কথা। অবশেষে দেরীতে মি. ঘোষ আসেন। সঙ্গে আসে বিবাহিত বাউড়ি নারী শুখনি (অভাবে-দরিদ্রে হতশ্রী, শারীরিক অপটু সে; তার নামকরণে এই বিষয়টি স্পষ্ট)। খাওয়া-দাওয়ার ও অন্যান্য জিনিস বহন করে। বাংলোর কিছু দূরে গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ায় সামান্য অর্থের বিনিময়ে শুখনিকে বাহকের কাজ করতে হয়। মাছ-মাংস এবং মহিলা (শুখনিকে ভোগ) সহ স্ফূর্তি চলে বেশ খানিকক্ষণ। শুখনি মালপত্র বহনের জন্য চারআনার পরিবর্তে দুটি টাকা চায়, কারণ ঐ টাকায় সে একটা দিনতো ছেলেগুলোকে হাইসতে দেখি।’ দু’টি টাকার জন্য সে নিতাই ও মি. ঘোষের ভোগের সামগ্রি হয়। ওরা দুজন মদ্যপানের পর শুখনির শুকনো কালো শরীরটাকে ভোগ করে অতঃপর গভীর রাতে শুখনি দুটি টাকা নিয়ে তার কুঠিরের দিকে যখন এগোতে থাকে অতর্কিত আক্রমণ করে সেই নরখাদক বাঘিনী। শুখনি রক্তাক্ত হয়। তার সঙ্গে থাকা ছুরি হাতে তুলে নিয়ে বাঘিনীকেও সে জখম-খতম করে। শুখনিরও মৃত্যু হয়,

তার বাম হাতে গোঁজা দুটি টাকা রক্তাক্ত হয়ে গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। নিতাই, মি. ঘোষ, গোবর্ধন ঘটনাস্থলে এসে একধারে বিস্মিত, চমকিত হয়। তাদের বোধদয়ও ঘটে।

কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যে শুখনি ছিল আপনভাবে। সে, সন্তানদের জন্য সমস্ত কষ্ট-দুঃখ অত্যাচার সহ্য করেও এগিয়ে যেতে চায় সামনের দিকে। বাঘিনী 'দেবী'কে মেরে ফেলে নিজেও শেষপর্যন্ত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। বাস্তবিক ক্ষেত্রে সেই হয়ে ওঠে দেবী। একদিকে সন্তানদের জন্য অপার স্নেহ, তাদের মুখে অন্ন জোগানোর দায়বদ্ধতা, অন্যদিকে অর্থ উপার্জনের জন্য সমাজের বিত্ত-ক্ষমতাশালী মানুষজনের অত্যাচার শোষণ বঞ্চনায় তার দুরন্ত আত্মনিগ্রহ, সন্তান বাৎসল্যের পাশে মানবের পাশব প্রবৃত্তি-শক্তির শিকার হয়ে জঙ্গলের পশুশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম জারি রাখা — এসব কিছু অনবদ্য করে তুলেছে এই নাটকের কাহিনীকে এবং মুখ্য চরিত্ররূপে তাকে।

একাঙ্ক নাটকের সব বৈশিষ্ট্যই তুলসী লাহিড়ীর 'দেবী'র মধ্যে উপস্থিত। সবমিলিয়ে, কাহিনী, সংলাপ, চরিত্রসৃজন এবং তত্ত্বের দিক থেকে এটি একটি সার্থক একাঙ্ক নাটক একথা আমাদের বলতেই হবে।

৪.৪.১৪.৩ : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩.৮.১৮৯৮—১৪.৯.১৯৭১), শরৎচন্দ্র উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে একটি অত্যুজ্জ্বল নাম। রাঢ় বাঙ্গলার মানুষ তারাশঙ্কর ছিলেন বিধবস্ত সামন্ততন্ত্রের উত্তরসূরি। বীরভূম জেলার সদর-সাবডিভিশনের অন্তর্গত লাভপুর গ্রামে তার জন্ম। শিক্ষার সূচনা সেখানে পরিণতি কলকাতায়। রাঢ় বাঙ্গলা বিশেষত বীরভূম জেলার মানুষ-সমাজ আঞ্চলিক জীবনযাত্রা লোকায়ত সংস্কৃতি, অন্ত্যজ বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি মানুষজনের সমাজবীক্ষা আচার আচরণ অবশ্যই গভীর জীবনভাবনাকে সুললিতভাবে সাহিত্যের পাতায় তিনি তুলে ধরেন। তাঁকে রাঢ় বাঙ্গালর জীবন্ত ভাষ্যকার বললেও ভুল বলা হয় না। শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের পীঠস্থান বীরভূমে ধর্মীয় সংস্কৃতি পরিবেশ গুরুত্বের সঙ্গে তার গল্প উপন্যাসে উঠে এসেছে। তার বিখ্যাত উপন্যাসগুলির মধ্যে আছে 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা', 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা', 'পঞ্চগ্রাম', 'কবি', 'রাধা', কালিন্দি', 'সপ্তপদী' ইত্যাদি। তাঁর রচিত ছোটগল্পের সংখ্যা দীর্ঘ। গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য তারিণী মাঝি, জননী, জলসাঘর, ইত্যাদি। তাঁর গল্প-উপন্যাসের মধ্যে দুটি বিষয় প্রাধান্য বিস্তার করেছে — (১) ভেঙে পড়া সামন্ততন্ত্রের করুণ ছবি এবং (২) বীরভূমের আঞ্চলিক জীবনযাত্রা জাত শিল্পীর অভিজ্ঞান মিলিয়ে একে একে তুলে ধরেছেন গল্প — উপন্যাসে বেং নাটকে।

তিনি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার (১৯৫৫) সহ জ্ঞানপীঠ (১৯৬৬) সম্মানে সম্মানীত হন। গান্ধিবাদী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। আই. এস. সি. পড়ার সময় অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেওয়ার কালে অন্তরীন হন। এর ফলে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ছেদ ঘটে।

লাভপুর থাকাকালীন তিনি নাট্যচর্চার সূচনা করেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত নাট্যকার নির্মল শিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট আত্মীয়। লাভপুরে অতসী মঞ্চে একই সঙ্গে তিনি নাট্য পরিচালনা ও অভিনয় করেন। তাঁর রচিত নাটক হল মীত, পার্থসারথী, পোষ্যপুত্র, বঙ্গনারী, মন্ত্রশক্তি, সরমা, কর্নার্জুন ইত্যাদি। নরেশচন্দ্র মিত্র, তিনকড়ি চক্রবর্তীর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল। তার রচিত কালিন্দী এবং দুই পুরুষ নাট্যভারতী ও নাট্যনিকেতনে অভিনীত হয়েছিল। তার আর একটি নাটক হল পথের ডাক এবং আরোগ্য নিকেতন (উপন্যাসের নাট্যরূপ)। বিশ্বরূপা সহ নানা পেশাদার মঞ্চে অভিনীত হয়েছে দীপান্তর, কবি, বালাজীরাও ইত্যাদি তাঁর রচিত নাটকগুলি। কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্যকার সত্তাটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

তিনি মাত্র দুটি একাঙ্ক নাটক লিখেছিলেন - বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং মহাত্মা শিশির কুমার (অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শিশির কুমারের জীবন অনুসরণে)।

'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' নাটকের পটভূমি অজয় নদের তীরে একটি বৈষ্ণব আকড়াকে কেন্দ্র করে। বলাবাহুল্য এই নাটকেও সেই বীরভূম - রাঢ় অঞ্চলের বৈষ্ণবীয় পরিমন্ডলের কথা। সবমিলিয়ে চরিত্র সংখ্যা চার। এরা হল আকড়ার প্রতিষ্ঠাতা এবং সত্বাধিকারী গোবিন্দদাস, অনৈক্য ব্রাহ্মণ, গোবিন্দদাসের অনুচর হরি ঘোষ এবং সতী ওরফে বৈষ্ণবী কৃষ্ণভামিনী, একসময়ে গোবিন্দদাসের স্ত্রী। নাট্যবিষয় এবং নাট্যকাহিনী আবর্তিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট আকড়াকে কেন্দ্র করে। কাহিনী একমুখী, আয়তন সীমাবদ্ধ। সবমিলিয়ে একাঙ্ক নাটকের সব বৈশিষ্ট্য এখানে বর্তমান। কাহিনীবৃত্ত, কাহিনীর ত্রি-ঐক্য এবং সংলাপ চরিত্র সৃজনও সতোচ্ছল-সাবলীল।

এই একাঙ্ক নাটকে কৃষ্ণের পায়ে সমর্পিত নারী বৈষ্ণবী কৃষ্ণভামিনী দেহ-শরীর নিবেদনের মধ্য দিয়ে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ সেবার প্রচেষ্টা, অন্যদিকে সুকন্ঠের অধিকারী এবং অন্তর ও বাহিরে কুৎসিত দর্শন বিকট মানসিকতার অধিকারী গোবিন্দদাসের ভোগলিপ্সার পূরণ। এই দুই সমস্যার দ্বন্দ্বে উদ্ভূত জীবন ট্র্যাজেডির বাতাবরণে আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রমান্বয়ে দীর্ঘ এবং গাঢ় হয়েছে। কামনালোলুপ কঠি চিত্ত বৈষ্ণব গোবিন্দদাস দীর্ঘদিনের প্রয়াসে পরম বৈষ্ণব কৃষ্ণদাসের আকড়াকে দখল নিয়ে একসময় জোর করে বিবাহ করা স্ত্রী কৃষ্ণভামিনীকে হাতের মধ্যে পায়। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে সে কৃষ্ণভামীনির কাছে পরাজয় স্বীকারের মধ্যদিয়ে আত্মহত্যা করে। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণভামিনীর সাধনাই জয়যুক্ত হয়।

এই নাটকটি আলোচ্য ছ-টি নাটকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নাটকের rising action থেকে Exposition পর্যন্ত তীব্র সংঘাতে পরিপূর্ণ। বৈষ্ণব সাধক হয়েও কৃষ্ণদাসের আকড়ার দখল নিতে তৎপর গোবিন্দদাস যে বীভৎস মানসিকতার পরিচয় দেয় তা মানুষের অন্ধকার জীবনের অনুকূল সাধনা নয়, বিঘ্নিত ছলনাও অন্তরের বীভৎস কালিমা সংশ্লিষ্ট চরিত্রের বহিরঙ্গে যেভাবে প্রকাশিত—তা এককথায় অভিনব, অনবদ্য। এমন চরিত্র বাংলা নাটকে খুব বেশি নেই। এজন্য নাট্যকার তারাশঙ্কর বিশেষ অভিনন্দন অবশ্যই প্রাপ্য। ছোট ছোট সংলাপের মধ্যদিয়ে গোবিন্দদাসের লোলুপ মানসিকতা, চারিত্রিক দুর্বলতা কল্পনাতুর বিভ্রমতা নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ হরি ঘোষ এক্ষেত্রে সহযোগী ভূমিকা পালন করেছে মাত্র। কৃষ্ণভামিনী চরিত্রের বলিষ্ঠতা আমাদের শুধু আকৃষ্ট করেনা আবিষ্টও করে।

গোবিন্দদাসের বিবাহ স্ত্রী নিজেকে 'সতী' বলেই উচ্চঃস্বরে চিহ্নিত করে। আপন নামের শুদ্ধতা স্বচ্ছতা বজায় রাখার কারণে এবং ঘর ছাড়া হয়েও সে তাঁর সতীত্ব বজায় রেখেছে আত্মবিশ্বাস এবং আত্মশক্তির উপর ভর দিয়ে। গোবিন্দদাসের শ্লেষাত্মক জিজ্ঞাসার উত্তরে সে জানায় 'হ্যাঁ, (আমি সতী), কলঙ্কিনী সতী। তুমি কুসুমপুরের গাইয়ে কালো গোস্বামী (আর আমি তোমার স্ত্রী কলঙ্কিনী সতী)'। গোবিন্দদাসের জিজ্ঞাসার উত্তরে সে বলিষ্ঠভাবে জানাতে ভোলেনা — 'লজ্জা আমার নাই। ঘৃণা লজ্জা ভয় তিন থাকতে নয়। গোঁসাই যাত্রার আসরে অভিমন্যু সেজে মনে হল আমি জন্মজন্মান্তরের উত্তরা। ..... লজ্জা ঘিন্না সব ভাসিয়ে দিলাম। (দিয়েছিলাম) অজয়ের জলে। ..... লজ্জা আমার নাই। ..... তোমার লজ্জা নাই কিন্তু মনে তোমার ঘা আছে। সেই ঘায়ে আবার ঘা খাবে। বুকের ভিতরটা তোমার রক্তারক্ত হয়ে যাবে।' গোবিন্দদাসের অন্তিম পরিণতি কৃষ্ণভামিনীর গভীর অনুভবকেই সত্য করে তুলেছে এই নাটকে। নিরন্তর সাধনা, আরাধ্য দেবতার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার আন্তরিক প্রয়াস সততা ও সতীত্বের যথাযোগ্য মর্যাদা রক্ষা কৃষ্ণভামিনী ও গৃহিনী 'সতী' চরিত্রে অদৃশ্য প্রকাশ। সমাজজীবন সাধনার পজিটিভিটি শেষপর্যন্ত প্রাধান্য পেয়েছে, জয়যুক্ত করেছে — এটাই এই নাট্যের ক্ষেত্রে বড় কথা।

৪.৪.১৪.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ‘দেবী’ নাটকটির কাহিনী আলোচনা করে শুখনির আত্মত্যাগ কতটা স্বাভাবিক এবং শিল্পসম্মত—তা আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

২। ‘বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা’ নাটকে সতী—কৃষ্ণভামিনীর আত্মত্যাগের পরিচয় দাও।

৩। এই নাটকে গোবিন্দদাসের বিপরীতমুখী মানসিকতার বিবরণ দিয়ে নাট্যকাহিনীতে তা কতটা সঙ্গতিপূর্ণ?—আলোচনা করো।

৪। একাংক নাটকরূপে ‘দেবী’র সার্থকতা যুক্তিনিষ্ঠভাবে বিচার করো।

পর্যায়গ্রন্থ - ৪

একক - ১৫

মন্মথ রায়—রাজপুরী, বনফুল-শিককাবাব

বিন্যাসক্রম :

৪.৪.১৫.১ : মন্মথ রায় — রাজপুরী

৪.৪.১৫.২ : বনফুল — শিককাবাব

৪.৪.১৫.৩ : দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় — অপচয়

৪.৪.১৫.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪.৪.১৫.১ : মন্মথ রায় — রাজপুরী

মন্মথ রায় (১৬.৬.১৮৯৯ - ২৬.৮.১৯৮৮) — পূর্ববঙ্গের (বর্তমানে বাংলাদেশ) ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল সাবডিভিশনের গালাগ্রামে জন্ম। স্নাতোকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন শিক্ষাজীবনে। আইন নিয়ে পড়াশুনা করেও সাফল্যলাভ করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তারপর দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন আকাশবাণী কোলকাতা কেন্দ্রে কর্মেসূত্রে। মাত্র ২৪ বছর বয়সে তিনি সাধারণ রঙ্গালয়ে যুক্ত হন। তাঁর একাঙ্ক 'মুক্তির ডাক (১৯২৩/রচনার সূত্রে তিনি পূর্ণাঙ্গ এবং একাঙ্ক মিলিয়ে বহু নাটক রচনা করেন)। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার সঙ্গে যুক্ত থাকায় গ্রামগঞ্জে প্রচারের জন্য যে সব নাটক লেখেন — তা হল, মাতৃভারতী, আমরা কোথায়, লাঙল, জীবনমরণ, মসৃণপ্রেম, এক আকাশ দুই আঙ্গিনা, কৃষাণ, মহাউদ্বোধন, যাত্রা হল শুরু, মানভঞ্জন, সাত ভাই চম্পা, এইসব নাটকগুলির রচনাকাল ১৯৫২ থেকে ১৯৫৩। পুরাণের পটভূমিতে চাঁদসদাগর (১৯২৭), কারাগার (১৯৫০), সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্য রচনা করেন। সংশ্লিষ্ট নাটক দুটিতে সমকালিন পরাধীন দেশের শৃঙ্খলমোচনের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছিল। স্বভাবতই ব্রিটিশ সরকার কারাগার নাটকটি অভিনয় নিষিদ্ধ করেছিল। তার রচিত অন্যান্য নাটকগুলি হল কাজলরেখা (১৯২৩), দেবাসুর (১৯২৯), শ্রীবৎস ও মহুয়া (১৯২৯), সাবিত্রী (১৯৩১), অশোক (১৯৩৩), সাক্ষ্য (১৯৩৫), বিদ্যুৎধ্বংস (১৯৩৭), রাজনটী (১৯৩৭), মীরকাশিম (১৯৩৮), ভাঙ্গাগড়া (১৯৫০), মমতাময়ী হাসপাতাল (১৯৫২), পথেবিপথে জীবনটাই নাটক, আজব নেশা, ধর্মঘট, উর্বসী, নিরুদ্দেশ (সবগুলির রচনাকাল ১৯৫৩), মীরাবাঈ (১৯৫৪), শ্রীশ্রীমা (১৯৫৫), অমৃত অতীত (১৯৫৯), স্বর্ণকীট (১৯৬২), অমাবস্যা (১৯৬৩), মহাউদ্বোধন (১৯৬৩), মহাঅভিসার (১৯৬৩), পারিবারিক (১৯৬৪), দুর্গেশনন্দিনীর জন্ম (১৯৬৫), অমরপ্রেম (১৯৭৬), এগেসোলেলীন (১৯৮৭) তার উল্লেখযোগ্য নাটক।

তাঁর রচিত একাঙ্ক নাটকগুলির মধ্যে 'রাজপুরী' শ্রেষ্ঠ এবং জনপ্রিয়। গ্রীক ট্র্যাজেডির আদর্শে রচিত হয়েছে রাজপুরী নাটকটি। এই নাটকের প্রেক্ষাপট কোশলরাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তী উৎযাপিত বসন্ত উৎসব। শ্রাবস্তী নামটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে গৌতমবুদ্ধ অর্থাৎ শাক্যমুণির নাম। গৌতমবুদ্ধের সময়কালকে কেন্দ্র করে এই নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে। সুদূর অতীতের পটভূমিতে বর্তমানের হিংসা বিদ্বেষ অ-সম্প্রীতি মৈত্রীহীনতার বিষয়টিকে উচ্চকিত করে তোলা হয়েছে। চরিত্র সংখ্যা পাঁচ। এছাড়া আছে প্রতিহারী, দাসী এবং নগরের নারীগণ।

আলোচ্য নাটকগুলির মধ্যে এই নাটকের আয়তন দীর্ঘ। দীর্ঘ হলেও এটি একাঙ্ক নাটক। স্বল্পচরিত্র, নির্দিষ্ট নাট্যকাহিনী একটি অঙ্কে সম্পূর্ণ আয়তনে একমুখী। অবশ্যই তীব্রগতি সম্পন্ন। এই নাটকটির মধ্যে একাঙ্ক নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি পুরোপুরি উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন, মালিনী, রাজা, ইত্যাদি নাটকের প্রভাব এ নাটকে পড়েছে। আবার দ্বিজেন্দ্রলালের নূরজাহান, শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ নাটকের কথা এই নাটকটি পড়তে পড়তে মনে পড়ে যায়।

নাটকটি শুরু হয়েছে কোশলরাজের রাজধানী শ্রাবস্তীর রাজপুরীতে। সমাপ্তিও সেই রাজ অন্তঃপুরে। Unity of time, Unity action ও Unity of place এই তিন ঐক্য এবং নাট্যবৃত্ত সৃষ্টির ক্ষেত্রে নাট্যকার সকল সংলাপ, চরিত্র চিত্রণ এবং কাহিনীচয়নে ও বয়নে অভিজ্ঞ নাট্যকার মন্মথ রায় যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

কৌলিন্য বজায় রাখতে কোশলরাজ শাক্যরাজকন্যা ভেবে যাকে বিবাহ করে তিনি আসলে দাসী কন্যা (মহাভারতীয় 'জীবনভাবনার অনুসরণ)। এই বিবাহের ১৬ বছর পর প্রকৃত সত্য উন্মোচিত হলে রাজা এবং যুবরাজ বিরুধক রানীর প্রতি প্রতিশোধ স্পৃহায় মত্ত হয়ে ওঠে। রানীর মনস্তাত্বিক টানাপোড়েন, শাক্যবংশের প্রতি তীব্র ঘৃণা, প্রতিহিংসার স্তরে যুবরাজ বিরুধককে শাক্যমুনিকে হত্যার আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও বিরুধক, শেষপর্যন্ত অন্তরে পোষিত প্রতিশোধস্পৃহায় মাতৃহন্তা হল। দাসী কন্যা হয়েও প্রবল ব্যক্তিত্ব নিজস্ব ধর্ম ধৈর্য রাজার প্রতি অনুরাগ বিরাগ, সন্তানের প্রতি স্নেহ পরিশেষে নির্মম আদেশ, সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা রানীর চরিত্রে অসামান্য দ্যুতিগুলিকে শেষপর্যন্ত রক্তাক্ত এবং মসীলিপ্ত করেছে।

ইতিহাসের নিরিখে রচিত এই নাটকে যে ট্র্যাজেডি দেখা দিয়েছে শেষপর্যন্ত তা অনেকটাই ভাগ্যদৈব, Nemesis, নিয়ন্ত্রিত; যা কিনা গ্রীক নাটকের প্রধান অবলম্বন। মন্মথ রায় অভিজ্ঞ নাট্যকার। তাই নিজস্ব পড়াশুনা, ভাবনাচিন্তা, দেশবিদেশে নাট্যভাবনার নানা রঙ অনায়াসে মিলিয়ে মিশিয়ে অসাধারণ নাট্যকাহিনী এবং চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। 'রাজা' নাটকের রানী সুদর্শনার ভুল ভাঙিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাকে সত্যের আলোকে আলোকিত করে Nemesis। কিন্তু এখানে রানী প্রথম থেকে অসত্যের শিকার তাই পরিণতিতে আত্মহুতি অনভিপ্রেত হওয়া সত্ত্বেও অনিবার্য হয়ে উঠেছে। নাটকের ডিটেলিং-এর কাজ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাটকের প্রভাব আছে। এই নাটকে কবির রাজকন্যা মল্লিকার উপস্থিতির আমাদের দৃষ্টি এড়ায়নি। তবে নাটকের শেষে স্বর্ণথালায় চিহ্ন মস্তকসহ প্রবেশ হেগেলিয়াম ট্র্যাজেডির কথা তিনি মনে করিয়ে দেন। অলৌকিক আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ ব্রজপাত অন্যান্য অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ স্বাভাবিকভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে।

৪.৪.১৫.২ : বনফুল — শিককাবাব

বনফুল (১৯.০৭.১৮৯৯ - ৯.০২.১৯৭৯)-এর প্রকৃত নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। তিনি বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মণিহারীতে জন্মগ্রহণ করেন। পেশায় ছিলেন এম.বি.বি.এস. ডাক্তার। বনফুল এই ছদ্মনামে তিনি গল্প-উপন্যাস-কবিতা-আত্মচরিত রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে 'তৃণখণ্ড', 'হাটেবাজারে', 'অগ্নীশ্বর', 'স্থাবর', 'জঙ্গম', 'ভীমপলশ্রী', 'বিন্দুবিসর্গ', 'দ্বৈরথ' প্রভৃতি। পাখির জগত নিয়ে তিনি তিনখণ্ডে 'ডানা' উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন। 'ভোটার সাবিত্রীবালা', একটি চমৎকার গল্প। একটি পোষ্টকার্ডে গল্প লিখে তিনি বিস্ময় ও ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। 'পশ্চাৎপট' তার আত্মজীবনী। মৃত্যুর অল্পদিন আগে প্রকাশিত হয়েছিল।

বনফুল নাট্যকার রূপেও সর্বজনপরিচিত ‘শ্রী মধুসূদন’ ও ‘বিদ্যাসাগর’ — এই জীবনীনাটক দুটি রচনা করে তিনি বিশেষ সমাদৃত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত অন্যান্য নাটকগুলি হল ‘মন্ত্রমুগ্ধ’, ‘রূপান্তর’, ‘মধ্যবিত্ত’, ‘কঞ্চি’, ‘সিনেমার গল্প’, ‘বন্ধন মোচন’, ‘দশ ভাণ ও আর ও কয়েকটি’, ‘শৃন্বন্তু’, ‘প্রচ্ছন্ন মাহিমা’, ‘আসন্ন’, ‘ত্রিনয়ন’ ইত্যাদি। রবীন্দ্রপুরস্কার ছাড়া তিনি সান্মানিক ডি.লিট. উপাধি পেয়েছিলেন ভাগলপুর এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

আলোচ্য ‘শিককাবাব’ নাটকটি ‘দশ ভাণ ও আরও কয়েকটি’ নাট্যগ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। ‘শিককাবাব’ - নাটকের পটভূমিতে আছে দিশাহীন, বিপর্যস্ত এক নারীকে ভোগ করার সামন্ততান্ত্রিক বীভৎস মানসিকতা-প্রস্তুতি-দুরন্ত লোভ এবং আদিম ফূর্তি। কাঁচা মাংসখণ্ডকে যেমন শিকে গেঁথে তাপদগ্ধে কাবাব তৈরী করে রসনা ও লালসা তৃপ্তির সামগ্রী বানানো হয়, ঠিক তেমনি নারীশরীর ভোগের মধ্যে সমমানসিকার প্রতিফলন ঘটে এই পরিবেশে। দুটি ঘটনাকে নাট্যকার পরস্পরের পরিপূরক করে গড়ে তুলেছেন। এখানেই নাটকের নামকরণের সার্থকতা। নাটকটিতে চরিত্র সংখ্যা ছটি। তবে, একমাত্র নারীচরিত্র সৌদামিনীকে নাটকের শেষ মুহূর্তে গলায় শাড়ি জড়িয়ে ঝুলতে দেখা যায় মৃত অবস্থায়। তার কথা নাটক জুড়েই আছে। শিয়ালদা স্টেশনের অদূরে রেলে গলা দিতে গিয়ে ব্যর্থ সৌদামিনীকে উদ্ধার করে, পুলিশের হাত থেকে সামলে নিয়ে পান্নালাল, তথাকথিত সপার্ষদ পরিবেষ্টিত জমিদারের ভোগ-লালসা-ফুর্তির বিবরে পৌঁছে দিয়েছিল। একদিকে মদ ও মাংসের শিককাবাবের মাঝে এই সৌদামিনীর আগমনে জান্তব মন ও চেহারা এবং নৃশংস বীভৎসতা যেভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে তাতে নাট্যকার বনফুলের কৃতিত্বই চিহ্নিত হয়েছে। নাটকটির অন্তিমপর্ব বা পরিণতি (exposition) একদিকে প্রবল উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ, অন্যদিকে, নাট্যকারের উদ্দেশ্য সাধনেও আনুকূল্য লাভ করেছে। অসহায় সৌদামিনীকে সমবেতভাবে ভোগ করার মুহূর্তে কামলিপ্সু সপারিষদ জমিদারের মধ্য দিয়ে তাবৎ ধর্ষণকারী এবং সৌদামিনীর আত্মহত্যা একই সঙ্গে নিকষ কালোরাত্রির বুকে অজস্র প্রশ্নে জারিত হয়েছে এসবের নিরুত্তর অবস্থান সত্ত্বেও নাটকটিকে চরম শিল্পোৎকর্ষে পৌঁছে দিয়েছে।

একাংক নাটক রূপে এটি অবশ্যই সার্থক। প্রথমদিকে একাংক নাটকের যে কুড়িটি বৈশিষ্ট্য আমরা উল্লেখ করেছি তার সবগুলিই এখানে বর্তমান। কাহিনীর অগ্রগতি, উৎকণ্ঠার ব্যাপ্তি এবং তারই মধ্যে অসহনীয় সমাপ্তি শিল্পোত্তীর্ণ করে তুলছে ঠিকই কিন্তু অত্যাচার, অত্যাচারী, টাউটদের বিরুদ্ধে, তীব্র ধীক্কার, জনতার সোচ্চার প্রতিবাদ বা তীব্র শাস্তি — বা বর্তমানের প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক, তার প্রকাশ কিন্তু ঘটল না। চরিত্রচিত্রণ এবং সংলাপসৃজনে নাট্যকার সফল—বিশেষত সৌদামিনীকে নেপথ্যে রেখে জমিদার এবং পান্নালাল চরিত্র দুটির কথোপকথনে সমগ্র ঘটনার বিন্যাস সংশ্লিষ্ট জনের লোলুপ মানসিকতার প্রকাশ যেভাবে নাট্যকার দেখিয়েছেন তা এককথায় অনবদ্য। প্রসঙ্গত, একটি জরুরী কথা বলে নেওয়া দরকার, তা হল, মধুসূদনের জীবনী নিয়ে বনফুল নাটক রচনা করেছিলেন, সেই মধুসূদনের ‘বুড়ো শালিখের ঘারে রোঁ’ প্রহসনের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে এই নাটকে। জমিদারের উপস্থিতিতে সময়টা বোধহয় স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্তে নয়।

৪.৪.১৫.৩ : দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় — অপচয়

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৫.৭.১৯০৮ - ১২.৪.১৯৯০)-এর জন্ম পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) ঢাকা জেলার সদর সাবডিভিশনের পাউলদিয়া গ্রামে। কলেজে পড়ার সময় ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিয়ে (১৯৪২) কারাবরণ করেন। জেলের অভ্যন্তরে ‘আহুতি’ নামে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করেছিলেন কিন্তু পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই তা নষ্ট হয়ে যায়। পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে রচিত

'দীপশিখা' (১৯৪৩) নাটকটির অভিনয় পঞ্চাশ দশকে রঙমহলে সাড়া জাগিয়েছিল। তাঁর রচিত অন্যান্য নাটকগুলি হল — 'তরঙ্গ', 'বাস্তুভিটা', 'পূর্ণগ্রাম', 'নয়া শিবির', 'অন্তরাল', 'মশাল', 'মোকাবিলা', 'জীবনস্রোত', 'অমৃতসমান' ইত্যাদি। তিনি পঞ্চাশটিরও বেশি একাংক নাটক রচনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য একাংক নাটকগুলি হল 'অপচয়', 'এপিঠ-ওপিঠ', 'পাকাদেখা', 'পুনর্জীবন', 'বেওয়ারিশ', 'আপেক্ষিক', 'হারানো সুর', 'তরুবালা', 'মেঘের আড়ালে সূর্য', 'গোলটেবিল' ইত্যাদি। তিনি ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্তি ছিলেন। ১৯৪৬-এ গণনাট্যসঙ্ঘের বাংলা প্রাদেশিক কমিটির নাটক শাখার সম্পাদক হন। আর, রাজ্য কমিটির সভাপতি ছিলেন ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর পূর্ণাঙ্গ এবং একাঙ্ক নাটকগুলি গণনাট্য সঙ্ঘের আদর্শ অনুসরণে রচিত। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি তাঁকে দীনবন্ধু পুরস্কারে সম্মানিত করে।

তাঁর রচিত একাঙ্ক 'অপচয়' — নাটকের চরিত্রসংখ্যা চার। দুজন পুরুষ ও দুজন নারী। চরিত্রগুলি হল — মিলন, সন্ধ্যা, ফটিক ও সুশীলা। নাটকের পটভূমিতে আছে দেশবিভাগের বিপর্যয় সত্ত্বেও এপার বাংলায় চলে আসা মানুষজনের মধ্যে সংস্কারবশত জাতপাতের প্রবাহমানতা। এই মানসিকতা সমর্থনযোগ্য না হলেও, মনের ভিতর থেকে সহজে সংস্কারকে উপড়ে ফেলা যায় না। যদিও নাটকের শেষে সংস্কারমুক্ত বলিষ্ঠ মনের পরিচয় দিয়ে সন্ধ্যা জাতপাতের উর্দ্ধে উঠে দাঁড়ালেও হৃদয়ের গভীর ভালোবাসায় তার ও মিলনের সার্থক মিলন ঘটে না। জাতপাত জনিত সুশীলার ক্রোধে এবং প্রবল ক্ষয়রোগে (TB) আক্রান্ত মিলনের প্রত্যাখ্যানজনিত সকরুণ আর্তনাদে। জীবনের রক্তরাগ, সমস্ত উত্তাপ 'অপচয়' এ পর্যবসিত হয় তবে মৃত্যু বা আত্মহত্যায় নয়, সন্ধ্যার প্রত্যয়, নতুনভাবে বাঁচার - বেঁচে ওঠাকে কেন্দ্র করে ঘোষিত হয়।

দিগিন্দ্রচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ এবং একাঙ্ক — এই দুধরনের নাটকে দেশভাগ এবং দেশভাগ — উত্তর, সংকটে আবর্তিত মানুষের জীবন সংগ্রামের কথাই উঠে এসেছে। আসলে তিনি নিজেও ছিলেন তার শরিক। উদ্বাস্তু কলোনীর নিটোল চিত্রণ, সংলাপে ঢাকা জেলার কথ্যভাষার নিপুণ প্রয়োগ, কাহিনীর বাস্তবতা, চরিত্রগুলির স্বাভাবিকতা আমাদের দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। সন্ধ্যা চরিত্রের বলিষ্ঠতা, নিমাই-এর সারল্য অবশ্যই আমাদের আবিষ্ট করে রাখে। ভাষা-সংলাপের তিনটে দৃষ্টান্ত দেওয়াই যেতে পারে :

(ক) সুশীলা : চাইরটা প্যাট চালাই কি কইরা ও দেখি। কত লোকের আতে-পায়ে দরলাম, একটু খোঁজ খবর নিতে। কে কার কতা ক'বে কও তো? আর সকলেই তো নিজের দান্দায় ব্যস্ত, কারে কি কমু।

(খ) সন্ধ্যা : ক্যান অয় না? তুমি বিন্ন জাইতের বইল্যা? গরীব গো কি আলদা আলদা জাইত আছে নাকী, মিলন দা? তাগো অ্যাক জাইত। তারা গরীব।

(গ) মিলন : সেই কতা না ..... সেই কতা না। আমি যে হকার। ট্রেনে লজেন্স ফিরি কইরা প্যাট চালাই।

কাহিনীটি অভাবত্বের দাবী করে অনায়াসে। বিবাহযোগ্য পাত্রের ব্যবস্থা হলেও বিবাহের মুহূর্তে পাত্রের অনুপস্থিতির কথা জানা গেলে সুশীলা কন্যার জন্য প্রতিবেশি ফটিককে নির্বাচন করে কিন্তু সন্ধ্যা 'চোর-লম্পট' ফটিককে বিবাহে প্রচন্ডভাবে নারাজ। সে শেষপর্যন্ত 'ট্রেনের হকার' মিলনকেই জীবনসঙ্গী করতে চায়; কিন্তু তুলনায় নীচুজাতের যুবক মিলন ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মুখে এগোয়। তাই বিবাহ হয় না। আর জাতের নামে বজ্জাতিতে আগ্রহী সুশীলার অনিচ্ছাও আপাত জয়যুক্ত হয়। সন্ধ্যা, নিজে নতুনভাবে বাঁচতে চায়। কিভাবে সেই কথা ছোট গল্পকারের মতো একাংক নাটকের নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র জানান না। শক্তিপদ রাজগুরুর সাড়াজাগানো উপন্যাস এবং ঋত্বিক ঘটকের যুগান্তকারী চলচ্চিত্র

'মেঘে ঢাকা তারা'র প্রভাব-প্রতিধ্বনি—ক্ষয়িষ্ণু আলো 'অপচয়'-এ অনেকটাই লক্ষ করা যায়। হৃদয়ের স্বপ্ন অভীপ্সাও একইভাবে অধরা। সন্ধ্যা চরিত্রে বলিষ্ঠতা এই নাটকের অন্যতম আকর্ষণও।

সব মিলিয়ে একাংক নাটক রূপে 'অপচয়' সার্থক। শুধু তাই নয়, পরিণতিতে একটা সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বড় হয়ে ওঠে। এটা গণনাট্য আন্দোলনেরই বার্তা।

৪.৪.১৫.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'শিককাবাব' নাটকের নামকরণে যে ব্যঞ্জনা আছে তা কাহিনীর মধ্যে কিভাবে বিস্তৃত হয়েছে?

২। 'রাজপুরী' নাটকে সংঘটিত ট্রাজেডির পরিচয় দিয়ে সংশ্লিষ্ট ট্রাজেডি কোন্ শ্রেণীর তা আলোচনা করো।

৩। রাণী চরিত্রের অনুপুঙ্খ পরিচয় দাও।

৪। 'রাজপুরী' নাটকটি শেষ পর্যন্ত ট্রাজেডি হয়ে উঠল কেন? 'রাজপুরী' নাটকে কোন্ ট্রাজেডির ধারাকে অনুসরণ করা হয়েছে তা' নাট্যঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখাও।

৫। বনফুলের 'শিককাবাব' নাটকটিতে 'সৌদামিনী'র মধ্যে কোন দিকটি বেশী নাটকীয় এবং শৈল্পিক–আলোচনা করো।

৬। 'শিককাবাব' নাটকটির বক্তব্য বা ব্যঞ্জনা-এর নামকরণে সার্থকতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কিনা বিচার করো।

৭। 'রাজপুরী'তে একাংকের পরিণতি কতটা শিল্পসম্মত হয়েছে? দৃষ্টান্তসহ বিচার করো।

পর্যায়গ্রন্থ - ৪

একক - ১৬

কিরণ মৈত্র—কোথায় গেল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—এক সন্ধ্যায়

বিন্যাসক্রম :

৪.৪.১৬.১ : কিরণ মৈত্র — কোথায় গেল

৪.৪.১৬.২ : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় — এক সন্ধ্যায়

৪.৪.১৬.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪.৪.১৬.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৪.৪.১৬.১ : কিরণ মৈত্র — কোথায় গেল

কিরণ মৈত্র (জন্ম - ২৫.১.১৯২৪)—বেশি মাত্রায় সমাজ সচেতন নাট্যকার। তিনি শুধু নাট্যকারই নন, সেই সঙ্গে নট এবং নির্দেশক। 'অভ্যুদয়' নাট্যসংস্থা তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর রচিত নাটক এই সংস্থা বেশিরভাগ প্রথম অভিনয় করেছে। নির্দেশনার দায়িত্ব নিজের হাতে থাকায় অভিনয় স্বতন্ত্রমাত্রা পেত সেক্ষেত্রে, অভিনেতা রূপে।

তাঁর ভূমিকা কম উজ্জ্বল নয়। নিজের সংস্থায়, নিজের লেখা নাটক ছাড়াও তিনি রঙমহল এবং বিশ্বরূপা থিয়েটারে বেশ কিছুকাল অভিনয় করেছেন। পেশাদারী অভিনেতা রূপে তিনি 'কড়ি দিয়ে কিনলাম', 'সাহেব বিবি গোলাম', 'দেনাপাওনা', 'জনগণমন', 'সুবর্ণলতা' এবং 'সম্রাজ্ঞী নুরজাহান' নাটকে অভিনেতা রূপে অংশ নিয়েছেন। তাঁর রচিত 'তৃষ্ণা' নাটক 'সেতু' নামে পরিবর্তিত হয়ে বিশ্বরূপা থিয়েটারে ১০৫০ বার অভিনীত হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সেই ইতিহাস আজও অমলিন। এমন একজন 'নাটুকে' অর্থাৎ সারাজীবন নাটক রচনা - নির্দেশনা - অভিনয়-এর মধ্যে ডুবে থাকা মানুষ কিরণ মৈত্র সরকারী-বেসরকারী বহু পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন।

কিরণ মৈত্র পূর্ণাঙ্গ এবং একাংক মিলিয়ে পঞ্চাশেরও বেশি নাটক রচনা করেছেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত নাটকগুলি হল — 'বারোঘন্টা', 'চোরাবালি', 'আমরা বেকার', 'রাতের কান্না', 'মৃতের মিছিল', 'শুধু ছবি', 'মহানায়ক', 'জীবনদর্পণ', 'জাগরণ', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'তৃষ্ণা', 'নাটক নয়', 'বিশ পঞ্চাশ', 'এপিডেমিক', 'কালনেমির লঙ্কাভাগ', 'এলোপাথাড়ি', 'যা হচ্ছে তাই', 'যা হল তাই', 'টোপর বদল হল', 'কেঁচে গন্ডুষ', 'তেলেজলে', 'মেয়ে দেখা', 'কাজের মেয়ে' ইত্যাদি।

আর একাংক নাটকগুলি হল — 'বুদবুদ', 'কোথায় গেল', 'যা তারা পারেনি', 'অন্ধকারায়', 'চেতনা', 'অমোঘ', 'জীবন্ত কবর', 'অকল্পনীয়', 'ভাগ্যে লেখা', 'উৎসবের দিন', 'দেহ আলো', 'পথের ঠিকানা', 'আলোর নীচে', 'খুন', 'ডুবুরি', 'একান্তে', 'একজন অন্যমন' প্রভৃতি।

প্রসঙ্গত বলে নেওয়া ভালো যে, কিরণ মৈত্র-এর সব নাটকই প্রকাশিত হয়েছে। অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাব বা পাড়ার একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় কিরণ মৈত্র রচিত নাটক একটা বড় ভূমিকা নিয়ে থাকে।

কিরণ মৈত্র বিংশ শতাব্দীর মানুষের জীবন বিশেষত স্বাধীনতা উত্তর বাঙালি পরিবার-সমাজের শত

সমস্যা প্রত্যক্ষ করছেন গভীরভাবে। তাঁর নাটকে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষের মুখ তাইতো খুব বেশি। 'কোথায় গেল' নাটক এরই একটি নির্মম নিদর্শন। মাত্র দুটি চরিত্র। সাদামাটা মঞ্চে, স্বল্প আলোকে, ৪৫-৫০ মিনিটের এই নাটকটি খাঁটি একাংক নাটক। কিরণ মৈত্র, অত্যন্ত সচেতনভাবে এই একাংকটি রচনা করেছেন। তাই একাংকের বৈশিষ্ট্যগুলি এই নাটকে পরিপূর্ণভাবে উপস্থিত।

বহু মানুষের সঙ্গে ওঠা-বসা। শিক্ষার সুযোগ সামান্য মিলেছে। তা দিয়ে উপার্জন-জীবিকা নির্বাহ ঠিকমতো চলে না, চলেও নি। অতএব 'সমাজবিরোধী' কাজ — চুরি করা - পকেটমারি। বৌ-ছেলে-মেয়ে ।। ভাই-বোনদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার তাগিদে। ফলশ্রুতি জেল-হাজতবাস। জেলফেরৎ স্বজনহারা অতুল এবং নিমাই দিশাহারা। বৃষ্টির একরাতে পুরোনো ভাঙা বাড়িতে ঘটনাচক্রে অতুল ও নিমাই আশ্রয় নেয়। সামনে অন্ধকার। পরদিন সকালে কোথায় যাবে কি করবে কোনো কিছুর ঠিক নেই। ভবিষ্যত বড় বেশিই অন্ধকার তাই দুজনের প্রথম ইচ্ছেটা মিলে যায় এইভাবে,—

> 'তাহলে চল দুজনে ট্রেনের তলায় মাথা দিয়ে দিই। পকেটে এক টুকরো কাগজে লিখে রেখে দেব, যে আমরা ভালো হতে চেয়েছিলাম। তাই ভালোভাবে খেতে পাই নি — .....।' বাঁচার অভীপ্সা তাদের প্রবল। তাই আর অসৎ হয়ে নয়। প্রকাশ পায় দ্বিতীয় ইচ্ছেটা, — 'আমরা মা কালির পা 'ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি যে আর চুরি করব না। চুরি করা খুব খারাপ কাজ।'

ভালো হওয়ার সঙ্গে ভালো থাকাটাও ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত। ভালো থাকার - সৎ থাকার জন্য অন্নসংস্থান করবে কে? 'কুলি-মজরী' কিংবা গায়ে-গতরে খাটা। তবু দিন চলে, লোভ পিছু হটে না। নাট্যকার চরম পরীক্ষার বলয়ে পৌঁছে লোভের স্তর-থাকটা মেপে নিতে চেয়েছেন। সেই লোভের অবসানে মানবিক মনস্তত্ত্বকে প্রকাশ করে সৎ পথে বাঁচার প্রত্যয়টি ঘোষণার মধ্যে নাটকের পরিসমাপ্তি। পরীক্ষাটি কি? চমৎকার নাটকীয় উৎকণ্ঠার মধ্যে অতুল, নিমাই-এর সঙ্গে কিরণ মৈত্র দর্শকদের টেনে নিয়ে গেছেন। মধ্যরাতে ঐ ভাঙাচোরা বাড়ির এক ঘরে অতীতের স্মৃতিচারণে - আগামী দিনের দিনযাপনে যখন দুজন মশগুল তখন কাপড়ের পুঁটলিতে বাঁধা আট হাজার টাকার হদিশ পায় তারা। সেই টাকা নিয়ে দু'জনের মধ্যে নানা টানাপোড়েন, দুরন্ত লোভ, একা ভোগ করার বাসনা, পলায়ন, প্রয়োজনে খুন — এসবই ভাবনায় পেয়ে বসে। অনিদ্রায় কেটে যায় সময়, দুজনের মধ্যে একই সঙ্গে মানসিক - শারীরিক সংঘাত, প্রকাশ পায় চূড়ান্ত স্বার্থপরতা। নাট্যকার শেষ ধাক্কাটা দেন নাটকের প্রয়োজনে, জীবনের প্রয়োজনে, স্থিতিশীল, সমাজ গঠনের প্রয়োজনে, মুখরিত মানবতার জয়গানের প্রয়োজনে। আবিষ্কার হয় ঐ টাকাগুলো 'জাল'। ওই ঘর-বাড়ি আদপে জাল টাকা তৈরির আস্তানা। অতএব নির্মম লোভ-লালসা চূড়ান্ত স্বার্থপরতা সলমা চুমকীর মত ঝরে পরে অনায়াসে। অতুল, নিমাই ফিরে পায় মানবিক মূল্যবোধ। সাময়িক তীব্র সংকটের অবসান হয়। বিশ্বাসের শক্ত ভূমি পায়ের তলায়। ভিতরে বাজতে থাকে এই শব্দগুলো—'হঠাৎ আমরা কত ছোট হয়ে গিয়েছিলাম। নাঃ।'

নাট্যকাহিনীর বিন্যাস, ঘটনা সংস্থাপন, চরিত্রচিত্রণ, সময়ের সীমাবদ্ধতা — এসব দিক থেকে অবশ্যই 'কোথায় গেল' সার্থক। তবে দুটি আপত্তি আছে। (ক) নামকরণে (খ) সংলাপে কিছু আলগা শব্দ ব্যবহারে। অন্যকোনো নামকরণ, 'বোধোদয়' জাতীয় হলে ভালো হতো। বোধোদয়ের সংলাপে সেই শব্দ-ভাষার প্রকাশও তখন সহজে এসে যেত।

৪.৪.১৬.২ : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় — এক সন্ধ্যায়

একাংক নাটকগুলির মধ্যে ধ্রুপদী 'এক সন্ধ্যায়'। তাই আমাদের আলোচনার শেষে এনেছি তাকে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-৬.১১.১৯৭০) বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তবে জীবন দীর্ঘস্থায়ী না

হওয়ার প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেনি। পূর্ববঙ্গের বরিশালে আদি নিবাস। জন্ম দিনাজপুরের বালিয়াচালিতে। প্রকৃত নাম তারকনাথ। বাংলা সাহিত্যের দিক্‌পাল অধ্যাপক। 'দেশ' পত্রিকায় সুনন্দ'র জার্নাল লিখেছেন। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক — সবক্ষেত্রেই ঘটেছিল তাঁর অবাধ উপস্থিত। চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন। ফরাসী ভাষায় দক্ষতা ছিল। ফরাসী গল্প উপন্যাস মূলভাষায় পড়ার সুযোগ পেয়েছেন। গল্প-উপন্যাস রচনায় তার প্রভাব লক্ষণীয়।

উল্লেখযোগ্য উপন্যাস — 'অমাবস্যার গান', 'পদকঞ্চার', 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী', 'বীতংস', 'সূর্যসারথি', 'তিমিরতীর্থ', 'আলোর সরণি', 'শিলালিপি', 'বৈতালিক' ইত্যাদি। ছোটগল্পের সংকলন — 'ছোটগল্প বিচিত্রা'। বিখ্যাত 'টেনিদা'র জন্ম তাঁর হাতে। প্রবন্ধের বই — 'ছোটগল্পের সীমারেখা', 'কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ' ইত্যাদি। বিখ্যাত পূর্ণাঙ্গ নাটক — 'রামমোহন', 'আগন্তুক', 'চোরাবালি' ইবসেনের 'গোস্টস' অনুসরণে 'ভীমবধ' ও 'বারো ভূত' প্রভৃতি। একাংক নাটক খুব বেশি লেখেননি। 'ভাড়াটে চাই' এবং 'এক সন্ধ্যায়', 'লগ্ন', এই তিনটি একাংকের কথা বারেবারেই উঠে আসে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আশির দশককে পটভূমি করেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'এক সন্ধ্যায়' নাটকে। গীতিকবিতায় 'ভোরের পাখি' বিহারীলাল চক্রবর্তীর নিমতলার বাড়িতে তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ 'এক সন্ধ্যায়' উপস্থিত হয়েছেন, জ্যোতিদাদার অনুরোধ — 'ভারতী'র জন্যে লেখা দেবার কথা কবিকে জানাতে। এই লেখালেখির কথা থেকেই শুরু নানা আলাপচারিতা প্রৌঢ় বিহারীলালের সঙ্গে তরুণ রবীন্দ্রনাথের। সেই আলাপচারিতা নিয়েই রচিত হয়েছে এই একাংক নাটক।

> কথায় কথায় সমকালে রচিত নানা কাব্য-কবিতা নিয়ে গম্ভীর আলোচনা চলে। রবীন্দ্রনাথ জানান — 'রাজসভার কবি ভারতচন্দ্রকে না হয় ক্ষমা করা যায়'। কিন্তু মধুসূদন?
>
> বিহারীলাল — '(আশ্চর্য হয়ে) মধুসূদন তোমার ভালো লাগে না। 'মেঘনাদবধ' কাব্য।
>
> রবীন্দ্রনাথ — 'মেঘনাদবধে কল্পনার ঐশ্বর্য আছে, ভাষার সমারোহ আছে, আবেগেরও অভাব নেই। কিন্তু সবমিলিয়ে আমি কেমন তৃপ্তি পাই না'।

স্বভাবতই বিহারীলালের এই মন্তব্য - অভিমত মনমতো হল না। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের কবিতা পাঠ করলেন। প্রশংসা করলেন। 'ভোরের পাখি' আখ্যা — সে তো তাঁরই দেওয়া। তবুও প্রাজ্ঞের প্রবল অনুভূতি থেকে বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথের গান শুনে বাহবা দিলেন না তেমন। 'ভারতী'তে তখন 'কবিকাহিনী' প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের। সে সম্পর্কে আগ্রহী রবীন্দ্রনাথ জানতে চাইলে বিহারীলাল প্রশংসাকুণ্ঠ হয়ে রইলেন। রবীন্দ্রনাথ হতাশগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং বিহারীলাল পত্নীর চা-জলখাবার খেয়ে বিদায় নেন। নাটক শেষ হয়।

তবে প্রবীনের ভূমিকা নবীন কবির প্রতি যেমন হওয়া প্রয়োজন, বিহারীলাল (দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুগামী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমসাময়িক) তেমন আচরণ করেন। তিনি পত্নী কাদম্বরী দেবীর জিজ্ঞাসার উত্তরে জানান, — 'উড়িয়ে দিলুম 'কবিকাহিনী'কে? কী শক্তি ওর 'কবিকাহিনী'তে, তার ভাব, কী তার গভীরতা। আমি উড়িয়ে দিতে পারি তাকে? ওর কবিতা মহাকালের খাতায় জমা হয়ে যাচ্ছে — তাকে উড়িয়ে দেবে সাধ্যকার? নিজের কবিতার চেয়েও যে ওর লেখা আমার বেশি ভাল লাগে।'

বিহারীলাল রবীন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি যথেষ্ট টের পেয়েছিলেন। ধ্রুপদী সৃষ্টি ধীরে ধীরে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছয়। এটাও তাঁর জানা। খুবই জানা। তাই 'নব বাল্মীকি'র যে হদিশ রবি কবির মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তা রবি কবিকে ঐ সময়ে, ঐ বয়সে বলা যায় না। তাই সদর্থক সমালোচনায় তাঁকে আরো উস্কে দেওয়া সৃষ্টি যজ্ঞে।

নাট্যকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রনুরাগী। স্বভাবতই অন্যান্য একাংক থেকে এই নাটক একেবারেই স্বতন্ত্র। তিন চরিত্রের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্য-কবিতার যে বিস্তৃত পরিবেশ স্বল্প পরিধিতে উঠে এসেছে তাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংলাপে গীতিময়তা - কাব্যিক সুর উচ্চকিত। চরিত্রগুলি সংগত স্বাভাবিক। নামকরণও স্বতোচ্ছল। একাংক নাটকের বৈশিষ্ট্যগুলিও এখানে উপস্থিত।

এই একাংক নাটকগুলি অভিনীত হয় আলোচ্য বাংলার নানা প্রান্তে। পাঠের মধ্য দিয়ে নয়, অভিনয় করা এবং দেখার মধ্য দিয়েই নাটকের গুণাগুণের বিচার সঠিক মাত্রায় করা হয়েছে। তবে এই আলোচনায়, পাঠ্য নাটকগুলির কিছুটা মূল্যায়ন করা গেল — এটাই বড় বড় কথা।

৪.৪.১৬.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ‘কোথায় গেল’ একাংকে দুরন্ত লোভ থেকে নির্লোভের জগতে উত্তরণের ঘটনা বিবৃত করো।

২। ‘এক সন্ধ্যায়’ স্বতন্ত্র সৃষ্টি। কোন্ কোন্ দিক থেকে এই স্বাতন্ত্র্য তা আলোচনা করো।

৩। ‘কোথায় গেল’ নাটকের প্রধান সমস্যা আর্থিক অভাব–অসঙ্গতি। নাটক দুটি বিস্তৃতভাবে আলোচনার বিষয়টি পরিস্ফুট করো এবং উত্তরণে নাটকটি শিল্পোত্তীর্ণ হয়েছে কি? তোমার মতামত লিপিবদ্ধ করো।

৪। ‘এক সন্ধ্যায়’ একাংকটি কোন্ কোন দিক থেকে স্বতন্ত্র তা প্রস্ফুটিত করো।

৪.৪.১৬.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। একাংক সঞ্চয়ন, — সম্পাদক : ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, ড. অজিত কুমার ঘোষ।

২। একাংক নাটকের রূপ ও রীতি — সরোজমোহন মিত্র।

৩। একাংক নাটকের রূপ ও রূপকার — সনাতন গোস্বামী।

৪। বাংলা নাটক ঃ ঐতিহ্য ও আধুনিকতা ঃ তাপস বসু।

৫। একাংক নাটকের কথা — দিলীপ কুমার মিত্র।

৬। বাংলা একাংক নাটকের উদ্ভব প্রগতি ও বিকাশ — কৃষ্ণলাল ভট্টাচার্য।

৭। নয়ে একাংকী — উদয় নারায়নণ তেওয়ারী।

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সি বি সি এস) কার্যক্রম

এম. এ. তৃতীয় সেমেস্টার

চতুর্থ পত্র

বিশেষ পত্র : ভাষাবিজ্ঞান

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ
(ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং)
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
কল্যাণী, নদীয়া - ৭৪১ ২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস – বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. অরুণ ঘোষ – বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. দিলীপ নাহা – বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. বাণীরঞ্জন দে – বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

ডিসেম্বর, ২০১৯

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও

নিউ স্কুল বুক প্রেস, ২ ডিক্সন লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১৪

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়-এর অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ-সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইনানুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের লেখক/পাঠ-প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of distance and reaching the unreached students are the threefold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellor has invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directoate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Sankar Kumar Ghosh, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of PGBOS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks is also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would especially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and co-ordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

পাঠক্রম

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম এম. এ. তৃতীয় সেমেস্টার

চতুর্থ পত্র

বিশেষ পত্র : ভাষাবিজ্ঞান

পর্যায় গ্রন্থ্ ঙ্ম ১ বাংলা ভাষার স্বনিম (সময় ঙ্ম ৪ ঘন্টা)

একক–১ ঙ্ম স্বনিম

একক–২ ঙ্ম উপধ্বনি

একক–৩ ঙ্ম স্বনিম নির্ণয়

একক–৪ ঙ্ম বিভাজ্য স্বনিম ও অবিভাজ্য স্বনিম

পর্যায় গ্রন্থ্ ঙ্ম ২ রূপিম বা মূলরূপ ও রূপতত্ত্ব (সময় ঙ্ম ৪ ঘন্টা)

একক–৫ ঙ্ম রূপকল্পের সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য

একক–৬ ঙ্ম রূপকল্পের বিশ্লেষণ

একক–৭ ঙ্ম রূপকল্পের সনাক্তকরণ ও নীদার সূত্র

একক–৮ ঙ্ম বাংলা মরফেমের মূলসূত্র

পর্যায় গ্রন্থ্ ঙ্ম ৩ বাংলা যৌগিক স্বর ও সংযুক্ত ব্যঞ্জন (সময় ঙ্ম ৪ ঘন্টা)

একক–৯ ঙ্ম বাংলা যৌগিক স্বরের বৈশিষ্ট্য

একক–১০ ঙ্ম যৌগিক স্বরের তালিকা

একক–১১ ঙ্ম সংযুক্তব্যঞ্জনের সংজ্ঞা ও গঠন বৈশিষ্ট্য

একক–১২ ঙ্ম সংযুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জন সমাবেশের পার্থক্য

পর্যায় গ্রন্থ্ ঙ্ম ৪ বাক্য বিশ্লেষণ (সময় ঙ্ম ৪ ঘন্টা)

একক–১৩ ঙ্ম বাক্যের সংজ্ঞা ও গঠন

একক–১৪ ঙ্ম প্রথানুসারী অন্বয়তত্ত্ব ও বাংলা বাক্য

একক–১৫ ঙ্ম বাংলা বাক্যের গঠন

একক–১৬ ঙ্ম বাক্যিক উপাদান সংগঠন ও বৃক্ষচিত্র

সূচিপত্র

চতুর্থ পত্র

বিশেষ পত্র : ভাষাবিজ্ঞান

চতুর্থ পত্র	একক	পাঠ প্রণেতা	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ-১	১	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	স্বনিম	১ – ২
	২	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	উপধ্বনি	৩ – ৫
	৩	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	স্বনিম নির্ণয়	৬ – ১১
	৪	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	বিভাজ্য স্বনিম ও অবিভাজ্য স্বনিম	১২ – ৩১
পর্যায় গ্রন্থ-২	৫	অধ্যাপক ড. দিলীপ নাহা	রূপকল্পের সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য	৩২ – ৩৮
	৬	অধ্যাপক ড. দিলীপ নাহা	রূপকল্পের বিশ্লেষণ	৩৯ – ৪০
	৭	অধ্যাপক ড. দিলীপ নাহা	রূপকল্পের সনাক্তকরণ ও নীদার সূত্র	৪১ – ৪৪
	৮	অধ্যাপক ড. দিলীপ নাহা	বাংলা মরফেমের মূলসূত্র	৪৫ – ৫২
পর্যায় গ্রন্থ-৩	৯	অধ্যাপক ড. দিলীপ নাহা	বাংলা যৌগিক স্বরের বৈশিষ্ট্য	৫৩ – ৫৫
	১০	অধ্যাপক ড. দিলীপ নাহা	যৌগিক স্বরের তালিকা	৫৬ – ৫৮
	১১	অধ্যাপক ড. দিলীপ নাহা	সংযুক্তব্যঞ্জনের সংজ্ঞা ও গঠন বৈশিষ্ট্য	৫৯ – ৬২
	১২	অধ্যাপক ড. দিলীপ নাহা	সংযুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জন সমাবেশের পার্থক্য	৬৩ – ৬৫
পর্যায় গ্রন্থ-৪	১৩	অধ্যাপক ড. অরুণ ঘোষ	বাক্যের সংজ্ঞা ও গঠন	৬৬ – ৬৮
	১৪	অধ্যাপক ড. অরুণ ঘোষ	প্রথানুসারী অন্বয়তত্ত্ব ও বাংলা বাক্য	৬৯ – ৭২
	১৫	অধ্যাপক ড. অরুণ ঘোষ	বাংলা বাক্যের গঠন	৭৩ – ৭৬
	১৬	অধ্যাপক ড. অরুণ ঘোষ	বাক্যিক উপাদান সংগঠন ও বৃক্ষচিত্র	৭৭ – ৭৮

চতুর্থ পত্র

পর্যায় গ্রন্থ - ১

বাংলা ভাষার স্বনিম

একক - ১

স্বনিম

বিন্যাস ক্রম :

৪.১.১.১ : স্বনিম

৪.১.১.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.১.১.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪.১.১.১ : স্বনিম

মনের ভাব প্রকাশের জন্য মানুষ বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে যে শব্দ সৃষ্টি করে থাকে তার ক্ষুদ্রতম একককটিকে ধ্বনি বলে। আর এই ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগত এককের মধ্যে পারস্পরিক স্বনিমীয় বা মূলধ্বনিগত যে বিরোধ থাকে সেই ধ্বনিগত এককগুলির প্রত্যেকটিকে ধ্বনিতা বা স্বনিম (phone) বলে।

স্বনিম কথাটি এসেছে ইংরেজি 'phoneme' শব্দ থেকে। 'phoneme' কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন ফরাসি ভাষাতাত্ত্বিক লুই আভে। কিন্তু তিনি শব্দটির আধুনিক অর্থটি জানতেন না। পরবর্তীকালে নানা লোকের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে অবশেষে আধুনিক বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী ফোর্দিনা দ্য সোস্যুর 'phoneme' শব্দটি গ্রহণ করেন। এসব নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানী মহলে ব্যাপক আলোচনা হয়।

অন্যদিকে ভাষাবিজ্ঞানী প্রিন্স এুবেৎস্‌কর ও গ্লীসন স্বনিমের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল—

"স্বনিম হলো পৃথিবীর কোনও বিশেষ একটি ভাষার প্রায় সমোচ্চারিত শব্দগুলির মধ্যে অর্থের পার্থক্য সৃষ্টিকারী ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগত একক। যাকে আর ক্ষুদ্র এককে ভাগ করা যায় না।"

কিন্তু এই সংজ্ঞাটি সামগ্রিক সংজ্ঞা হয়ে হয়ে উঠতে পারেনি।

যেমন—'কাল' ও 'ফাল' শব্দ দুটির উচ্চারণ প্রায় একই ধরনের বা কাছাকাছি। আবার এই শব্দ দুটির মধ্যে অর্থের পার্থক্য রয়েছে। শব্দ দুটিকে বিশ্লেষণ করলে তা বোঝা যাবে।

কাল = ক্ + আ + ল্ =	ক্	+	আ + ল্
ফাল = ফ + আ + ল্ =	ফ্	+	আ + ল্
	বৈসাদৃশ্য		সাদৃশ্য

এখানে 'ক্' এবং 'ফ' ধ্বনি দুটিতে বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। আর এই কারণেই শব্দ দুটির মধ্যে অর্থের পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

সুতরাং—ক্ / k / ও ফ / P^h / দুটি স্বনিম বা মূলধ্বনি

স্বনিম হওয়ার শর্ত :

ক. স্বনিম হতে গেলে প্রায় সমোচ্চারিত শব্দজোড়ের দরকার পড়ে, যাকে ন্যূনতম শব্দজোড় বা 'Minimal pair' বলে।

খ. স্বনিমের শব্দজোড় একই ভাষার হতে হবে। অন্য ভাষার শব্দ হলে তা গণ্য করা হবে না। অর্থাৎ দুটি শব্দ একই ভাষার হবে।

গ. স্বনিমের শব্দ দুটি প্রায় সমোচ্চারিত হবে। কিন্তু সমোচ্চারিত হলেই চলবে না, তাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগত পার্থক্য থাকতে হবে।

ঘ. শব্দদুটির মধ্যে অর্থের পার্থক্য থাকতেই হবে।

ঙ. ন্যূনতম শব্দজোড় যে ভাষা থেকে নেওয়া হবে সেই ভাষার বেশিরভাগ মানুষের অবিমিশ্র খাঁটি দেশীয় উচ্চারণ থেকে নিতে হবে।

চ. ন্যূনতম শব্দজোড়ের একটিমাত্র ধ্বনিতে উচ্চারণ বৈচিত্র্য হবে, ধ্বনিতে বেশি পার্থক্য থাকলে চলবে না।

ছ. কোনও ভাষায় যে ধ্বনি একবার স্বনিম বলে বিবেচিত হবে, সেটি সবসময় স্বনিম রূপেই থাকবে।

৪.১.১.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। স্বনিম বলতে কী বোঝ?

২। স্বনিম হওয়ার শর্তগুলি লেখো।

৩। স্বনিম শব্দটি কোথা থেকে এসেছে?

৪। স্বনিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

৫। স্বনিমের উদাহরণ দাও।

৪.১.১.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। ভাষাবিদ্যা পরিচয় – অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

২। প্রসঙ্গ ঃ বাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড) – অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস

৩। ভাষার ইতিবৃত্ত – সুকুমার সেন

৪। ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ – সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

৫। ভাষাবিজ্ঞান পরিচয় – ড. শ্রীকুমার বিশ্বাস

একক - ২

উপধ্বনি

বিন্যাস ক্রম :

৪.১.২.১ : উপধ্বনি
৪.১.২.২ : পরিপূরক অবস্থান
৪.১.২.৩ : মুক্ত বৈচিত্র্য
৪.১.২.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি
৪.১.২.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪.১.২.১ : উপধ্বনি

যদি দুই বা ততোধিক ধ্বনির অবস্থান এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যে একটি আরেকটির স্থানে বসতে পারে না; তবে উচ্চারণগত দিক থেকে ধ্বনিগুলির মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকে, তবে সেই ধ্বনিগুলিকে একই মূলধ্বনির উপধ্বনি বা পূরকধ্বনি বলে।

আবার অন্যভাবে বলা যায়, যদি একটি মূলধ্বনির উচ্চারণ বৈচিত্র্য তার অবস্থান দিয়ে নিয়ন্ত্রিত ও ধ্বনি সংযোগের শর্তাধীন হয়, তা বক্তার খেয়াল মতো বসতে না পারে, তখন মূলধ্বনির সেই উচ্চারণ বৈচিত্রগুলিকে উপধ্বনি বা পূরকধ্বনি (Allophone) বলে।

ভাষাবিজ্ঞানী (জ্যুল ব্লক) পূরক ধ্বনির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—

> "If two more sounds are so distributed among the forms of a language that none of then ever occurs in exactly the same position as any of the others, and if all the sounds in question are phonetically similar in the sense of sharing a feature of articulation absent from all other sounds, then they are to be classified together as allophones of the same phoneme."

তবে উপধ্বনি হতে পারে সেই সব ধ্বনি, যেগুলি উচ্চারণের দিক থেকে মূলধ্বনির কাছাকাছি বা প্রায় সমোচ্চারিত কিংবা উচ্চারণের দিক থেকে কোনও না কোনও সাদৃশ্য থাকবে। তবে সেগুলি স্বনিমের উপধ্বনি বা পরকধ্বনি হতে পারে। এক্ষেত্রে ধ্বনিগুলিকে স্বনিমের উপধ্বনি সন্দেহ করে উচ্চারণ প্রকৃতি ও শব্দে তাদের অবস্থানের বিচার করে সন্দেহভাজন জোড় হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং পরবর্তীতে উপধ্বনি রূপে গ্রহণ করা হয়। যেমন—'ক' ও 'খ'—সন্দেহভাজন জোড়। কারণ দুটির উচ্চারণস্থান স্নিগ্ধ তালু। কিন্তু সন্দেহভাজন জোড় হলেই যে উপধ্বনি হবেই, তা কিন্তু নয়।

৪.১.২.২ : পরিপূরক অবস্থান

মূলধ্বনি বা স্বনিমের উচ্চারণ বৈচিত্র্যগুলি তার নিজস্ব বিশিষ্ট অবস্থান বা ধ্বনি সংযোগের দ্বারা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত যে একটির স্থানে আর একটি বসতে পারে না। যেমন—'শ্রী' শব্দে তালব্য 'শ' ও 'শীল' শব্দে 'স' উচ্চারিত হতে পারে না। তাই একই মূলধ্বনির উচ্চারণ বৈচিত্র্যকে পৃথক স্বনিমরূপে গ্রহণ না

করে পৃথক ধ্বনি রূপে গ্রহণ করেছেন ভাষাবিজ্ঞানী গ্লীসন। তাঁর মতে—একাধিক ধ্বনির মধ্যে একটি যখন অন্যটির অবস্থানে বা পরিবেশে বসতে পারে না, তখন ধ্বনিগুলি পরিপূরক অবস্থানে আছে বলা হয়। যেমন—ইংরেজিতে যে (ph) ও (p) আছে, সেগুলি সাধারণভাবে একই ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবেশে ব্যবহৃত হয় না। দুটি ধ্বনি ভিন্নতর ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবেশে ব্যবহৃত হলে তাকে পরিপূরক অবস্থান (complementary distribution) বলে। পরিপূরক অবস্থানে দুটি ধ্বনি পরস্পর স্বতন্ত্র পরিবেশে ব্যবহৃত হয়।

অর্থাৎ উপধ্বনি নির্ণয় করতে হলে ধ্বনিসমূহের অবস্থান শর্তাধীন কি না, ধ্বনিগুলি পরিপূরক অবস্থানে আছে কি না—তা বিচার করতে হয়।

৪.১.২.৩ : মুক্ত বৈচিত্র্য

যেখানে দুটো ধ্বনি অর্থগত কোনও পরিবর্তন ছাড়াই একই পরিবেশে ব্যবহৃত হতে থাকে, সেই পর্যায়ে ধ্বনি দুটিকে যুক্ত পরিবর্তনশীল রূপ বিশ্লেষণ করা হয়। সমাজবিজ্ঞানী ল্যাবভের মতে ধ্বনির ক্ষেত্রে মুক্ত বৈচিত্র্য প্রক্রিয়ায় সামাজিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। একই ভাষাভাষী একটা সামাজিক পরিবেশে ও ধ্বনির একটা বিশেষ পরিবর্তনশীল রূপ ও অন্য একটা স্বতন্ত্র সামাজিক পরিবেশে আর একটা স্বতন্ত্র পরিবর্তনশীল রূপ ব্যবহার করে থাকেন। এই স্বতন্ত্র ব্যবহারের প্রক্রিয়াটাকেই মুক্ত বৈচিত্র্য বলা হয়।

অন্যভাবে বলা যায় কোনও শব্দের শেষে যদি মহাপ্রাণ ধ্বনি থাকে, তবে বারবার স্বাধীনভাবে তা উচ্চারণের ফলে শব্দের শেষের মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াকে মুক্ত বৈচিত্র্য বলা হয়। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে। যেমন—

মাছ < ছ / চ

এখানে 'ছ' মহাপ্রাণ ধ্বনি এবং তা বারবার উচ্চারণের ফলে অল্পপ্রাণে পরিণত হয়েছে। অনুরূপভাবে—

বাঘ < ঘ / গ

আখ < খ / ক

'বাঘ' শব্দে 'ঘ' বারবার স্বাধীনভাবে উচ্চারণের ফলে 'গ' এবং আখ শব্দে 'খ' মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ 'ক' এ পরিণত হয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে মুক্ত বৈচিত্র্য বলা হয়।

৪.১.২.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। স্বনিম বলতে কী বোঝো? বাংলা ভাষায় স্বনিমের সন্দে উপধ্বনির সম্পর্ক নির্ণয় করো।

২। স্বনিমের সংজ্ঞা দাও। এই প্রসন্দে উপধ্বনি, পরিপূরক অবস্থান ও মুক্ত বৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্য লিখে উদাহরণসহ আলোচনা করো।

৩। বাংলা ভাষায় স্বর ও ব্যঞ্জন স্বনিমগুলি নির্ণয় করো।

৪.১.২.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। ‘সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা’ (১৪০৩)—ড. রামেশ্বর শ, পুস্তক বিপণি।

২। ‘ভাষার ইতিবৃত্ত’ (১৯৯৬)—সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৩। ‘আধুনিক ভাষাতত্ত্ব’ (১৯৯৭)—আব্দুল কালাম মনজুর মোরশেদ, নয়া উদ্যোগ।

৪। ‘ভাষাতত্ত্ব’ (১৩৯৬)—রফিকুল ইসলাম, উজ্জ্বল বুক স্টোরস্

৫। ‘বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত’ (১৯৯৮)—মহম্মদ শহীদুল্লাহ, মাওলা ব্রাদার্স।

৬। ‘ভাষাবিদ্যা পরিচয়’ (২০০২)—অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জয়দুর্গা লাইব্রেরি।

৭। ‘ভাষা পরিক্রমা’ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ২০০২)—অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার, দেজ পাবলিশিং।

৮। ‘ভাষা দেশ-কাল’ (২০০০)—পবিত্র সরকার, মিত্র ও ঘোষ।

৯। ‘ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী’ (১৯৯৮)—রফিকুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি।

১০। ‘ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা’ (২০০৪)—অনিমেষকান্তি পাল, বামা পুস্তকালয়।

১১। ‘বাঙালির ভাষাচিন্তা’ (২০০২)—সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

১২। ‘বাঙালির ভাষাচিন্তা’ (সমাজভাষা, ২০০৩)—সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

১৩। ‘বাংলা গদ্য স্টাইলিস্টিকস্’ (২০০১)—নবেন্দু সেন, মহাদিগন্ত।

১৪। ‘ফলিত ভাষাবিজ্ঞান’ (১৯৯৭)—ভূদেব বিশ্বাস ও ভবদেব বিশ্বাস, তাহেরপুর কবিতা কুটির।

১৫। ‘শৈলীবিজ্ঞান’ (১৯৯৮)—অপূর্ব দে, মডার্ন বুক এজেন্সি।

১৬। ‘সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান’ (১৯৯৪)—আশিস দে, পুস্তক বিপণি।

একক - ৩

স্বনিম নির্ণয়

বিন্যাস ক্রম :

৪.১.৩.১ : স্বনিম নির্ণয়ের পদ্ধতি

৪.১.৩.২ : স্বনিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য

৪.১.৩.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.১.৩.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪.১.৩.১ : স্বনিম নির্ণয়ের পদ্ধতি

কোনও ভাষার স্বনিম নির্ণয়ের জন্যে প্রথমেই দরকার হয় ন্যূনতম শব্দজোড়। তারপর এই ন্যূনতম শব্দজোড় দিয়ে অর্থের পার্থক্য সৃষ্টিকারী ধ্বনিগুলিকে বেছে নিতে হয়। দেখতে হয় একটিমাত্র ধ্বনিতে উচ্চারণ বৈচিত্র্য সৃষ্টি হচ্ছে কিনা। তারপর শব্দ দুটির মধ্যে উচ্চারণের এবং অর্থের পার্থক্য সৃষ্টিকারী ধ্বনিগুলি খুঁজে আলাদা করতে হয়। আর এই ধ্বনিগুলিই হল স্বনিম। যেসব ক্ষেত্রে ন্যূনতম শব্দজোড় পাওয়া যায় না, সেখানে কাছাকাছি শব্দজোড় দিয়ে বিচার করা হয়। অথবা দেখা হয় ধ্বনি দুটি পরিপূরক অবস্থানে আছে কিনা। যেসব ধ্বনি সমোচ্চারিত হয় সেই ধ্বনিগুলিকে বিনা প্রমাণে পৃথক স্বনিম বলে ধরে নেওয়া হয়। শব্দের মধ্যে স্বনিমের তিন রকম অবস্থান হতে পারে—আদি, মধ্য, অন্ত্য। দুটি ধ্বনির মধ্যে স্বনিমীয় বিরোধ ধ্বনির তিন রকম অবস্থাতেই হতে পারে। যথা—

	শব্দের ধ্বনির স্থান	স্বনিম
আদি অবস্থান :		
	কান / kan /	/ k / ক্ /
	খান / k^han /	/ k^h / খ্ /
মধ্য অবস্থান :	পাতা / pata /	/ p / প /
	মাতা / mata /	/ m / ম্ /
অন্ত অবস্থান :	সুদ / sud /	/ d / দ্ /
	সুধ / sud^h /	/ d^h / ধ্ /

কিন্তু স্বনিম নির্ণয়ের জন্য তিনটি অবস্থানেই স্বনিমীয় বিরোধ দেখার দরকার নেই। অবস্থান যেরকমই হোক না কেন স্বনিম একটাই। তাছাড়া সব ধ্বনিই এই তিনরকম অবস্থানে বসে না। যেমন, বাংলা, ইংরেজি, জার্মানি ভাষায় 'ঙ' (n) শব্দের আদিতে বসে না। আবার ইংরেজিতে 'হ' (h) শব্দের শেষে বসে না। ফরাসিতে 'ঞ' আদিতে বসে না। আবার একবার স্বনিম নির্ণীত হলেই তো সর্বত্র স্বনিম হিসেবে তা গণ্য হবে।

বাংলা স্বরস্বনিম :

ন্যূনতম শব্দজোড়ের মাধ্যমে আদর্শ বাংলা চলিত ভাষায় যে যে স্বরস্বনিম পাওয়া যায়। তা হল—

খিল / k^hil / = দরজার খিল—ই / i /

খেল / k^hel / = 'খেলা' ক্রিয়ায় ধাতু—এ / e /

খ্যাল / k^hæl / = (তুই) খেলা কর্—অ্যা / æ /

খাল / k^hal / = জলের খাল—আ / a /

খল / k^hol / = চতুর—অ / o /

খোল / k^hol / = বাজনা বিশেষ—ও / o /

খুল / k^hul / = 'খোলা' ক্রিয়ার ধাতু—উ / u /

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আদর্শ চলিত বাংলায় সাতটি স্বরস্বনিম আছে।

অনুনাসিক স্বরস্বনিম :

বিধি / bid^hi / = নিয়তি—ই / i /

বিধি / b ĩ d^hi / = বিঁধিয়ে দিই—ইঁ /   /—(১)

এরা / era / = এই সব লোকেরা—এ / e /

এঁরা /   ra / = এই সব (সম্মানিত) লোকেরা—এঁ /   /—(২)

ট্যাক / tæk / = তুই টিকে থাক—অ্যা / ae /

ট্যাঁক / tæk / = কোমরের কাপড়ে টাকা রাখার জায়গা—অ্যাঁ / ãe /—(৩)

ছাদ / c^had / = ঘরের ছাদ—আ / a /

ছাঁদ / c^hãd / = গড়ন—অ্যাঁ / ã /—(৪)

গদ / god / = অতি ভোজনে পেটে অস্বস্তি—অ / o /

গঁদ / gõd / = আঠা—অঁ / õ /—(৫)

ধোয়া / d^hoẽa / = পরিষ্কার করা—ও / o /

ধোঁয়া / d^hõ   / = ধূম—ওঁ / õ /—(৬)

কুড়ি / kuri / = বিশ—উ / u /

কুঁড়ি / kũri / = ফুলের কুঁড়ি—উঁ / ũ /—(৭)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাংলায় সাতটি আনুনাসিক স্বর ইঁ, এঁ, অ্যাঁ, আঁ, অঁ, ওঁ ও উঁ স্বনিমীয় তাৎপর্য বহন করেছে।

ব্যঞ্জন স্বনিম :

ন্যূনতম শব্দজোড়ের সাহায্যে আদর্শ বাংলা ভাষার (চলিত) যে যে ব্যঞ্জন স্বনিম পাওয়া যায়, সেগুলি হল—

পান / pan /—প্ / p /

ফান / p^han /—ফ্ / p^h /

বান / ban /—ব্ / b /

ভান / b^han /—ভ্ / b^h /

তাল / tal /—ত্ / t /

থাল / t^hal /—থ্ / t^h /

দাল / dal /—দ্ / d /

ধাল / d^hal /—ধ্ / kd^h /

টন / ton /—ট্ / t /

ঠন / t^hon /—ঠ্ / t^h /

ডন / don /—ড্ / d /

ঢন / d^hon /—ঢ্ / d^h /

চাল / cal /—চ্ / c /

ছাল / c^hal /—ছ্ / c^h /

জাল / Jal /—জ্ / J /

ঝাল / J^hal /—ঝ্ / J^h /

কোন / kon /—ক্ / k /

খোন / k^hon /—খ্ / k^h /

গোন / gon /—গ্ / g /

ঘোন / g^hon /—ঘ্ / g^h /

অর্থাৎ এখানে পাওয়া গেল মোট ২০টি ব্যঞ্জন স্বনিম। এছাড়া যে সব ব্যঞ্জন স্বনিম আছে, সেগুলি হল—

নাসিক্য ব্যঞ্জন স্বনিম

ছিম / c^him /—ম্ / m /

ছীন / ছিন / c^hin /—ন্ / n /

ছিঙ / chi ŋ /—ঙ্ / ং / ŋ /

কম্পিত ও পার্শ্বিক ব্যঞ্জন স্বনিম

রান / ran /—র্ / r /

লান / lan /—ল্ / l /

উষ্ম ব্যঞ্জন স্বনিম

শান / ʃan /—শ্ / ʃ /

হান / han /—হ্ / h /

কম্পিত ও তাড়িত ব্যঞ্জন স্বনিম

বার / bar /—র্ / r /

বাড় / bar /—ড় / n /

এছাড়া অর্ধস্বর আছে

ছাটা / c^haẽa /—য় /   /

ছাওয়া / c^haoẽa /—য় /   /

সুতরাং দেখা যাচ্ছে অর্ধস্বরসহ ৩০টি ব্যঞ্জনধ্বনিকে স্বতন্ত্র স্বনিম রূপে ধরা হচ্ছে। অর্থাৎ প্রচলিত যতগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ আছে, ততগুলি ব্যঞ্জন স্বনিম নেই। অর্থাৎ ঞ, ন, র, ষ, স কে স্বতন্ত্র স্বনিম ধরা হয়নি। কারণ এদের স্বতন্ত্র উচ্চারণ নেই। যা স্বনিম হওয়ার মূল শর্ত।

৪.১.৩.২ : স্বনিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য

একটি শব্দকে বিশ্লেষণ করলে এক বা একাধিক বর্ণ পাওয়া যায়। প্রত্যেক ধ্বনির কিছু স্বাতন্ত্র্য সূচক বৈশিষ্ট্য আছে। যার জন্য একটি ধ্বনি অন্য ধ্বনি থেকে আলাদা হয়। অনেক সময় দেখা যায় দুটি ধ্বনি উচ্চারণের দিক থেকে একরকম হলেও তাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। যেমন—'প' ও 'ব' ধ্বনি দুটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই ধ্বনি দুটি স্পর্শ ধ্বনি, দুটিই ওষ্ঠ থেকে উচ্চারিত। কিন্তু এদের স্বাতন্ত্র্যসূচক পার্থক্য হল 'প' ধ্বনি এবং 'ব' ঘোষ ধ্বনি।

আসলে ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য দুটি ধ্বনির মধ্যে স্বনিমীয় বিরোধ ঘটে এবং ধ্বনিটি স্বাতন্ত্র্য হয়ে ওঠে। এই বৈশিষ্ট্যকে ধ্বনিটির স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য বলে।

য়াকবসন সর্বপ্রথম রোমান ভাষার ধ্বনিগুলিকে বিশ্লেষণ করে স্বনিমের বারোটি (১২) স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন। বাংলাতে স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনিকে বিশ্লেষণ করে স্বনিমীয় স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন ফাগুর্সন ও মুনীর চৌধুরী 'phoneme of Bengali' গ্রন্থে। এবং 'Distnctive Features of Bengali' গ্রন্থে অধ্যাপক রামেশ্বর শ্ বাংলা স্বনিমের ৭টি স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন। সেগুলি হল—

১. যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু মুখগহ্বর বা কণ্ঠের পথে আংশিক বা পূর্ণভাবে বাধা পায় না, সে ধ্বনিকে স্বরধ্বনি বলে। যেমন—অ, আ, ই, এ ইত্যাদি। আর যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু মুখগহ্বর বা কণ্ঠের পথে কোনও না কোনও স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। স্বর ও ব্যঞ্জনের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য হতে পারে। যেমন—গ

আল—আ + ল্—আ / a / স্বরধ্বনি

খাল—খ + আ + ল্—খ / k^h / ব্যঞ্জনধ্বনি

২. যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু শুধুমাত্র মুখ দিয়ে নির্গত হয়, তাকে মৌখিক ধ্বনি বলে। যেমন—ক, গ, ঘ, ত, থ, দ, ধ ইত্যাদি যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু মুখ ছাড়াও নাসিকা দিয়ে বের হয় পরবর্তী স্বরের একটি অনুরণন তৈরি করে তাকে নাসিক্য ধ্বনি বলে। সুতরাং নাসিক্য ও মৌখিক ধ্বনির স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য হতে পারে।

স্বনিমীয় বিরোধ—

মান—ম্ + আ + ন্—ম / m / (নাসিক্য ধ্বনি)

কান—ক্ + আ + ন্—ক / k / (মৌখিক ধ্বনি)

৩. ঘনীভূত ধ্বনি উচ্চারণের সময় মূল উচ্চারণ প্রক্রিয়ার উপরে নয়, উচ্চারিত ধ্বনির তরঙ্গজাত ফলশ্রুতির উপর ভিত্তি করে হয়। ঘনীভূত ধ্বনি উচ্চারণের সময় সামগ্রিক শক্তি অনেক বেশি থাকে কিন্তু বিক্ষিপ্ত ধ্বনি উচ্চারণে শক্তি কম থাকে। ঘনীভূত ধ্বনি কেন্দ্রীয় এলাকায় এবং বিক্ষিপ্ত ধ্বনি কেন্দ্রীয় এলাকার চারপাশে থাকে। ঘনীভূত ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ুর অবরোধের ক্ষেত্র বা জিহ্বার ওপরে ও সামনে বেশি জায়গা ফাঁকা থাকে না, কিন্তু বিক্ষিপ্ত ধ্বনি উচ্চারণে ফাঁকা থাকে। সুতরাং ঘনীভূত বনাম বিক্ষিপ্ত ধ্বনির স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা যেতে পারে। বাংলা ঘনীভূত ধ্বনিগুলি হল অ, আ, চ, ছ, ক, খ ইত্যাদি। বিক্ষিপ্ত স্বনিম হল—ই, এ, ও, দ, ধ, প, ফ, ব, ভ ইত্যাদি। বাংলায় ঘনীভূত বনাম বিক্ষিপ্ত স্বনিমের বিরোধ দেখানো হল—

দান—দ্ + আ + ন্—আ / d / (ঘনীভূত)

দিন—দ্ + ই + ন্—ই / i / (বিক্ষিপ্ত)

কান—ক্ + আ + ন্—ক্ / k / (ঘনীভূত)

খান—খ্ + আ + ন্—খ্ / k^h / (বিক্ষিপ্ত)

৪. অনেকসময় ধ্বনি উচ্চারণের ক্ষেত্রে শ্বাসবায়ু মুখগহ্বরে বা কণ্ঠপথে হঠাৎ বাধা পায়। ফলে ধ্বনিটির উচ্চারণ প্রক্রিয়া হঠাৎ থেমে যায়। একে বলে আকস্মিক ধ্বনি। যেমন—ক, খ, চ, ছ, জ, দ ইত্যাদি। কিন্তু যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু কণ্ঠপথে বাধা পায় না, ফলে ধ্বনির উচ্চারণ অনেক সময় ধরে চলে। সেই ধ্বনিকে বলে বিলম্বিত ধ্বনি। যেমন—শ, হ ইত্যাদি। এই আকস্মিক ও বিলম্বিত ধ্বনির বিরোধের একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে।

চাক—চ্ + আ + ক্—চ্ / c / (আকস্মিক)

শাক—শ্ + আ + ক্—ছ্ / c^h / (বিলম্বিত)

৫. উচ্চারণের সময় যে ধ্বনিগুলির উচ্চারণজাত সুর সুরতন্ত্রীর কম্পনজাত সুরের সঙ্গে মিশে থাকে না, তাদেরকে বলে সঘোষ ধ্বনি। যেমন—গ, ঘ, জ, ঝ, দ, ধ ইত্যাদি। কিন্তু উচ্চারণের সময় যে ধ্বনির উচ্চারণজাত সুর সুরতন্ত্রীর কম্পনজাত সুরের সঙ্গে মিশে থাকে, তাকে অঘোষ ধ্বনি বলে। যেমন—ক, খ, চ, ছ, ত, থ ইত্যাদি। এই সঘোষ ও অঘোষ ধ্বনির স্বনিমীয় বিরোধটি হল এই রকম—

গাল—গ্ + আ + ল্—গ্ / g / (সঘোষ)

খাল—খ্ + আ + ল্—খ্ / k^h / (অঘোষ)

ঝোল—ঝ্ + ও + ল্—ঝ্ / j^h / (সঘোষ)

ছোল—ছ্ + ও + ল্—ছ্ / c^h / (অঘোষ)

৬. মুখগহ্বরের মাঝামাঝি স্থান থেকে উচ্চারণের ফলে যে ধ্বনিগুলির সুর তীব্র থাকে, তাদের অনুদত্ত ধ্বনি বলে। যেমন—এ, ও, ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ ইত্যাদি। কিন্তু মুখগহ্বরের সামনে থেকে যে ধ্বনিগুলি উচ্চারতি হয়, তাদের উচ্চারণের সময় সুর তীব্র থাকে না। এগুলিকে উদাও ধ্বনি বলে। যেমন—প, ফ, ব,

ভ, ত, থ, ধ ইত্যাদি। এই দুইয়ের মধ্যে যে স্বনিমীয় বিরোধ আছে, তা হল—

গাট—গ্ + আ + ট্—গ্ / g / (অনুদাত্ত)

ভাট—ভ্ + আ + ট্—ভ্ / b^h / (উদাত্ত)

৭. যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখ, কণ্ঠ ইত্যাদি বাগ্ অঙ্গ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না। অধিকতর বিকৃত হয়, সেই ধ্বনিকে দৃঢ় ধ্বনি বলে। যেমন—ফ, খ, ঘ, ছ ইত্যাদি। আর যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখ, কণ্ঠ ইত্যাদি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, বিকৃত হয় না এবং মাংসপেশি সঙ্কুচিত হয় না, তাকে শিথিল ধ্বনি বলে। যেমন—প, ব, ক ইত্যাদি। দৃঢ় বনাম শিথিল ধ্বনির মধ্যে ও স্বনিমীয় বিরোধ আছে। যেমন—

পাল—প্ + আ + ল্—প্ / p / (শিথিল)

ফাল—ফ্ + আ + ল্—ফ্ / p^h / (দৃঢ়)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ধ্বনি বিভিন্ন প্রকার হচ্ছে এবং বিভিন্ন ধ্বনির মধ্যে স্বনিমীয় বিরোধ দেখা দিচ্ছে। তবে য়াকবসন কথিত স্বনিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক অন্য বৈশিষ্ট্যগুলি বা সূত্রগুলি বাংলা ভাষায় প্রযোজ্য হয়নি।

৪.১.৩.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। স্বনিম নির্ণয়ের পদ্ধতি আলোচনা করো।

২। বাংলা স্বর স্বনিমের বিশ্লেষণ করো।

৩। স্বনিমের শ্রেণিবিভাগ করো।

৪। স্বনিমের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

৪.১.৩.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। বাঙালির ভাষাচিন্তা – সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা – অনিমেষ কান্তি পাল।

৩। সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান – আশিষ দে।

৪। বাঙালির ভাষাচিন্তা (সমাজভাষা ২০০৩) – সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

একক - ৪

বিভাজ্য স্বনিম ও অবিভাজ্য স্বনিম

বিন্যাস ক্রম :

৪.১.৪.১ : বিভাজ্য স্বনিম ও অবিভাজ্য স্বনিম

৪.১.৪.২ : শ্বাসাঘাত

৪.১.৪.৩ : সুরাঘাত

৪.১.৪.৪ : যতি

৪.১.৪.৫ : দৈর্ঘ্য

৪.১.৪.৬ : নাসিক্যভবন

৪.১.৪.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.১.৪.১ : বিভাজ্য স্বনিম ও অবিভাজ্য স্বনিম

স্বনিম দুই ভাগে বিভক্ত। যথা—(ক) বিভাজ্য স্বনিম (খ) অবিভাজ্য স্বনিম। ধ্বনিও দুই ভাগে বিভক্ত। যথা—(ক) বিভাজ্য ধ্বনি (খ) অবিভাজ্য ধ্বনি।

কোনও ভাষার বিভাজ্য স্বনিম নির্ণয় করতে হলে প্রথমে ন্যূনতম শব্দজোড় খুঁজে বের করতে হবে। এরপর দেখতে হবে অর্থের পার্থক্য আছে কি না। একের পর এক এই কাজগুলি সেরে শব্দ দুটির মধ্যে উচ্চারণ এবং অর্থের পার্থক্য সৃষ্টিকারী ধ্বনিগুলি খুঁজে আলাদা করতে হবে। আর এই ধ্বনিগুলি তখন স্বনিম হবে।

এইবার বাংলা ভাষায় বিভাজ্য স্বনিম কতগুলি আছে, তা আলোচনা করা হল—

পান / pan /—প্ / p /

ফান / p^han /—ফ্ / p^h /

বান / ban /—ব্ / b /

ভান / b^han /—ভ্ / b^h /

তাল / tal /—ত্ / t /

থাল / t^hal /—থ্ / t^h /

দাল / dal /—দ্ / d /

ধাল / d^hal /—ধ / d^h /

টব / tob /—ট্ / t /

ঠব / t^hob /—ঠ্ / t^h /

ডব / dob /—ড্ / d /

ঢব / d^{h}ob /—ঢ্ / d^{h} /

চার / car /—চ্ / c /

ছার / c^{h}ar /—ছ্ / c^{h} /

জার / Jar /—জ্ / J /

ঝার / J^{h}ar /—ঝ্ / J^{h} /

কান / kan /—ক্ / k /

খান / k^{h}an /—খ্ / k^{h} /

গান / gan /—গ্ / g /

ঘান / g^{h}an /—ঘ্ / g^{h} /

এখানে পাওয়া গেল মোট ২০টি বিভাজ্য স্বনিম।

নাসিক্য স্বনিম

রিম / rim /—ম্ / m /

রীন / রিন / rin /—ন্ / n /

রিং / রিঙ্ / ri ŋ /—ঙ্ / ŋ /

কম্পিত ও পার্শ্বিক স্বনিম

রাশ / ra /—র্ / r /

লাশ / la /—ল্ / l /

উষ্ম স্বনিম

শান / an /—শ্ / /

হান / han /—হ্ / h /

কম্পিত ও তাড়িত

বার / bar /—র্ / r /

বাড় / bar /—ড়্ / r /

অর্ধস্বর

মায়া / maẽa /—য়্ / /

যাওয়া / jaõea /—ওয়্ / õ /

সুতরাং দেখা গেল বাংলা ব্যঞ্জনমালায় বিভাজ্য স্বনিম মোট ৩০টি।

এবারে অবিভাজ্য স্বনিম সম্পর্কে আলোচনার পালা।

অবিভাজ্য স্বনিম

অবিভাজ্য স্বনিম পাঁচ প্রকার। যথা—

(ক) শ্বাসাঘাত

(খ) সুরাঘাত

(গ) যতি

(ঘ) দৈর্ঘ্য

(ঙ) নাসিক্যভবন

■ গলার ভিতর দিয়ে বেশি পরিমাণে ও জোরে শ্বাসবায়ু বের করে গলার পেশিকে শক্ত করে গলার আওয়াজ বাড়িয়ে জোর দেওয়ার প্রক্রিয়াকে বলে শ্বাসাঘাত। শ্বাসাঘাত দু-প্রকার। যথা—শব্দ শ্বাসাঘাত ও বাক্য শ্বাসাঘাত।

সুরের তীব্রতা বাড়িয়ে কোনও ধ্বনি বা শব্দের উপর জোর দিলে তাকে সুরাঘাত বা স্বরাঘাত বলে। আর ওই সুরাঘাতের হ্রাসবৃদ্ধিগত প্রয়োগ কোনও বাক্যের সুরে তীব্রতর ওঠানামা ঘটিয়ে বাক্যটির সামগ্রিক অর্থকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকলে, সেই সুরের ওঠানামাকে সুরতরঙ্গ বলে। সুরতরঙ্গ তিন প্রকার। যথা—

১। ঊর্ধ্ব থেকে নিম্নগামী।

২। নিম্ন থেকে ঊর্ধ্বগামী।

৩। সমান্তরাল।

দুটি শব্দ বা সন্নিহিত শব্দ বা সমাসবদ্ধ পদের প্রথমটির শেষ বর্ণ বা ধ্বনি ও দ্বিতীয় পদের প্রথম বর্ণ বা ধ্বনির মধ্যে যে বিরতি থাকে, তাকে যতি বলে। যতি চার প্রকারের হতে পারে। যথা—(ক) বিরতি (খ) সংযুক্তি (গ) লঘু যতি (ঘ) পূর্ণ যতি। এছাড়া প্রধানত যতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

১। বাহ্য উন্মক্ত যতি।

২। অভ্যন্তরীন উন্মুক্ত যতি।

৩। সংবদ্ধ যতি।

কোনও কোনও ভাষায় কোনও কোনও হ্রস্বধ্বনিকে দীর্ঘ উচ্চারণ করলে একই শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায় সেইসব ভাষায় ধ্বনির হ্রস্বতা থেকে দীর্ঘতা স্বনিমীয় তাৎপর্য বহন করে, তাকেই ধ্বনির দৈর্ঘ্য বলে।

কোনও নাসিক্য ব্যঞ্জন লোপ পেলে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু আংশিকভাবে নাসারন্ধ্র দিয়ে নির্গত হয়। তার ফলে এই স্বরধ্বনিতে নাসিক্য অনুরণন যুক্ত হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে নাসিক্যীভবন। যেমন—পঞ্চ > পাঁচ ইত্যাদি।

৪.১.৪.২ : শ্বাসাঘাত

ব্যবহারিক জীবনে ভাষা উচ্চারণকালে দেখা যায় বাক্যের সব ধ্বনি বা সব শব্দ সমানভাবে গুরুত্ব পায় না। বা সবগুলি সমান জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করি না। কখনও কখনও কোনও ধ্বনি বা শব্দের উপর জোর দিই। এই জোর দেবার কৌশল দু-রকমের। যথা—

(ক) শ্বাসঘাত।

(খ) স্বরাঘাত।

শ্বাসঘাত ও স্বরাঘাত বাংলা অবিভাজ্য স্বনিমেরই দুটি ভাগ।

বাক্যের অন্তর্গত কোনও কোনও বিশেষ ধ্বনি বা অক্ষরের উপরে আমরা যদি জোর দিয়ে সেই ধ্বনি বা অক্ষরটিকে উচ্চারণ করি, তবে সেই জোরের মাত্রাকে শ্বাসাঘাত বলে। শ্বাসাঘাত দেওয়ার সময় আমাদের কণ্ঠের শ্বাসনালী কঠিন হয়ে যায়। অর্থাৎ অবিভাজ্য ধ্বনিরই একটি প্রকার হল অবিভাজ্য ধ্বনির এই অবিভাজ্য ধ্বনি যখন কোনও ভাষায় অর্থ নিয়ন্ত্রণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে, তখন তাকে অবিভাজ্য স্বনিমের মর্যাদা দেওয়া হয়। যাই হোক, আমরা এবার শ্বাসাঘাতকে আলোচনার সুবিধার জন্য দুই ভাগে ভাগ করে আলোচনা করব। যথা—

(ক) শব্দ শ্বাসাঘাত (Word-Stress)

(খ) বাক্য শ্বাসাঘাত (Sentence-Stress)

শব্দ শ্বাসাঘাত

কোনও ভাষার শব্দাস্থিত ধ্বনি বা অক্ষরের উপর জোর দিলে, তার অর্থ যদি পরিবর্তিত হয়ে সেই শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তাকে শব্দ শ্বাসাঘাত বলে। শব্দ শ্বাসাঘাতের ক্ষেত্রে বিশেষ ধ্বনি বা অক্ষরের উপর জোর দেওয়া হয়।

শব্দ শ্বাসাঘাতের চিহ্ন মোটামুটি তিন ভাবে বসে। যথা—

(ক) প্রবল বা মুখ্য শ্বাসাঘাত (Strong / Primary Stress)

(খ) মধ্যম বা গৌণ শ্বাসাঘাত (Medium / Secondary Stress)

(গ) দুর্বল বা ক্ষীণ শ্বাসাঘাত (Weak-Stress)

কিন্তু এই সব শ্বাসাঘাতের চিহ্ন ছন্দ বিশ্লেষণের শ্বাসাঘাত থেকে আলাদা প্রকৃতির। এখানে শ্বাসাঘাত বসে এইভাবে—

(ক) শ্বাসাঘাত মুখ্য হলে চিহ্নটি লাইনের একটু উপরে পূর্ণচ্ছেদের মতো ছোট খাড়া হয়ে থাকে

ক. মুখ্য শ্বাসাঘাত 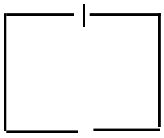

(খ) শ্বাসাঘাত মধ্যম হলে একইভাবে লাইনের নীচে বসে।

খ. মধ্যম শ্বাসাঘাত 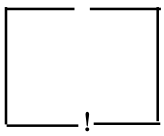

(গ) শ্বাসাঘাত ক্ষীণ হলে অক্ষরের আগে একটা ছোট হাইফেন একটু নীচে নামিয়ে বসানো হয়।

গ. ক্ষীণ শ্বাসাঘাত 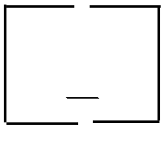

তবে শব্দের অর্থ নিয়ন্ত্রণে ইংরেজি ও জার্মান ভাষার শ্বাসঘাত মতো বাংলা ভাষার শ্বাসাঘাতের ভূমিকা নেই। বাংলা শব্দ শ্বাসাঘাত সম্পর্কে আবদুল হাই বলেছেন যে—ইংরেজির মতো বাংলা stress বা শ্বাসাঘাত প্রধান ভাষা নয়। উক্তিটিকে যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে দুটি বিষয় চোখে পড়ে। যথা—

প্রথমত :

উচ্চারণের দিক থেকে বাংলা শ্বাসাঘাত ইংরেজির মতো উঁচু মাপের নয়।

দ্বিতীয়ত :

বাংলায় শব্দ শ্বাসাঘাত ইংরেজির শব্দ শ্বাসাঘাতের মতো স্বনিমীয় তাৎপর্যপূর্ণ নয়। সুনীতিবাবু বলেছেন—

> "In Bengali stress is not significant i.e. presence or absence of it does-not ofter the senoe or word."

বোঝা যায় বাংলা শ্বাসাঘাতের ভূমিকা ইংরেজির শব্দের অর্থ নিয়ন্ত্রণের মতো নেই। তবে ব্যতিক্রমি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। যেমন—

বাংলা ভাষায়

অতুল = অ-তুল / o-tul / = ব্যক্তির নাম

অতুল = অ 'তুল / -otul / = অতুলনীয়

এখানে প্রথম অক্ষরের মুখ্য শ্বাসাঘাত ও দ্বিতীয় অক্ষরে দুর্বল বা ক্ষীণ শ্বাসাঘাত পড়েছে। কিন্তু এই দুই শব্দে শ্বাসাঘাতের পার্থক্য সকল বাঙালির পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।

আবার ইংরেজি ভাষায় দেখা যাচ্ছে—

'in-sult = অপমান

-in'sult = অপমান করা

এখানে প্রথম অক্ষরে মুখ্য শ্বাসাঘাত এবং দ্বিতীয় অক্ষরে দুর্বল শ্বাসাঘাত পড়েছে। ফলে সেটার মানে হয়েছে 'অপমান' কিন্তু পরেরটিতে প্রথমে দুর্বল শ্বাসাঘাত এবং শেষে মুখ্য শ্বাসাঘাত চলে এসেছে। ফলে তার অর্থ হয়ে 'অপমান করা'। কিন্তু বাংলা ভাষার শব্দে এইভাবে শ্বাসাঘাতের স্থান পরিবর্তন করা যায় না। কারণ তার ফলে বাংলা ভাষার স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়েও অর্থের পরিবর্তন হয় না।

বিভিন্ন প্রকারের গঠনযুক্ত শব্দে শ্বাসাঘাতের অবস্থান বাংলায় বিভিন্ন প্রকার হয়। তবে বাংলায় শব্দ শ্বাসাঘাতের অবস্থান যেখানেই হয়ে থাকুক, তা পরিবর্তন হয় না। পরিবর্তন করাও যায় না।

বাক্য শ্বাসাঘাত :

বাক্যে ব্যবহৃত কোনও বিশেষ শব্দের উপর জোর দিলে তার অর্থ পরিবর্তিত হয়ে সেই শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সমগ্র বাক্যে ছড়িয়ে পড়ে, তখন তাকে বাক্য শ্বাসাঘাত বলে। বাক্য শ্বাসাঘাত নিয়ন্ত্রণ করে সমগ্র বাক্যকে। ধ্বনিবিজ্ঞানে শব্দ শ্বাসাঘাত হিসেবে চিহ্নিত করার রীতি থাকলেও বাক্য শ্বাসাঘাত চিহ্নিত করার কোনও রীতি নেই। অনেকে অবশ্য বাক্য শ্বাসাঘাতকে চিহ্নিত করেছেন শ্বাসাঘাত শব্দটির আগে লাইনের একটু ছোট মত্ত বসিয়ে (o) থাকেন।

বাক্য-শ্বাসাঘাত বিভিন্ন শ্রেণির বাক্যে বিভিন্ন হয়। যেমন—

যুক্তিমূলক বাক্যে অন্য কোনও জিনিসের থেকে একটা জিনিসকে স্বতন্ত্র দেখিয়ে সেই জিনিসটার উপর জোর দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে অর্থজ্ঞাপক শব্দটির উপর শ্বাসাঘাত পড়ে। যেমন—

(ক) '^{0}মুরগি ডিম পাড়ে'—এখানে 'মুরগি' শব্দটির উপর বাক্য শ্বাসাঘাত দ্বারা বোঝানো হয়েছে একমাত্র 'মুরগি' ডিম পাড়ে।

(খ) 'মুরগি ^{0}ডিম পাড়ে'—এখানে 'ডিমের' উপর জোর দিয়ে বোঝানো হয়েছে, 'মুরগি' 'ডিম' পাড়ে অন্য কিছুই পাড়ে না।

(গ) 'মুরগি ডিম ^{0}পাড়ে'—এখানে 'পাড়ার' উপর জোর দিয়ে বোঝানো হয়েছে মুরগি 'ডিমই পাড়ে'। অন্য কিছু করে না।

বিস্ময়, আনন্দ ইত্যাদি প্রকাশ পায় যে সব বাক্যে তাকে আবেগপ্রধান বাক্য বলে। এরকম বাক্যে শ্বাসঘাত গুরুত্ব অনুসারে পড়ে এবং তার ফলে সাধারণ বিস্ময়মূলক বাক্য ও আবেগপ্রধান বাক্যের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়। যেমন—

সাধারণ বিবৃতিমূলক বাক্য—

আমি ^{0}বই পড়ি—এখানে আমার বই পড়ার অভ্যাস আছে বোঝাচ্ছে।

আবেগমূলক বাক্য—

আমি বই ^{0}পড়ি—এখানে আমার বই পড়ার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

শ্বাসাঘাতের স্থান পরিবর্তনে এইভাবে বাংলা বাক্যের অর্থের পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ শ্বাসাঘাত বাংলা বাক্যে অর্থ নিয়ন্ত্রিত করছে। তাই বলতে পারি অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষায়ও বাক্য শ্বাসাঘাতের স্বনিমীয় তাৎপর্য আছে। তবে মনে রাখতে হবে বাংলা ভাষায় শব্দ শ্বাসাঘাতের স্বনিমীয় গুরুত্ব তেমন নেই। আর একটা কথা মনে রাখা দরকার, সাধারণ বিবৃতিমূলক বাক্য ও সাধারণ বাক্যের গোড়ার দিকে শ্বাসাঘাত পড়ে।

৪.১.৪.৩ : সুরাঘাত

সুরকে তীব্র করে কোনও ধ্বনি বা শব্দের উপরে জোর দিলে তাকে সুরাঘাত বা স্বরাঘাত বলে। শব্দের অন্তর্গত কোনও বিশেষ ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের সুরাঘাত দেওয়ার ফলে শব্দের অর্থ নিয়ন্ত্রিত হলে হয় শব্দ সুরাঘাত। সুরের তীব্রতা দিয়ে সমগ্র বাক্যের অর্থ নিয়ন্ত্রণ হলে হয় সুরতরঙ্গ বা স্বরতরঙ্গ।

প্রাচীন বৈদিক ভাষা ও হোমারের গ্রীক ভাষায় এবং আধুনিক চিনা, তিব্বতি ইত্যাদি ভাষায় সুরাঘাত স্বনিমীয় তাৎপর্যপূর্ণ। এই সব ভাষায় সুরাঘাত শব্দের অর্থ নিয়ন্ত্রণ করে। এসব ভাষা শব্দের মধ্যে একটি ধ্বনি থেকে অন্য ধ্বনিতে সুরাঘাতের স্থান বা প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটলে, শব্দের অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে। আধুনিক চিনা বা তিব্বতি ভাষায় শব্দের অর্থের নিয়ন্ত্রণে সুরাঘাতের ভূমিকা এত বেশি যে একই শব্দ একটু ভিন্ন সুরে উচ্চারণ করলে অর্থের বিরাট বিপর্যয় ঘটে যায়। উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি স্পষ্টই বোঝা যাবে। যেমন—

বৈদিক ভাষায় সুরাঘাত শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটায় এইভাবে—

র্রাজপুর = রাজা যার পুত্র (বহুব্রীহি)　　　রাজপুর্ত্র = রাজার পুত্র (ষষ্ঠী পুরুষ)

বৈদিক ভাষাতে স্বরাঘাতের তাৎপর্য এমন ছিল বলেই সুরাঘাতের তিনটি শ্রেণি নির্ণীত হয়েছিল। যথা—

(ক) উদাত্ত (Highe or Acute tone)

(খ) অনুদাত্ত (Low or grave tone)

(গ) স্বরিত (Combined / circumflex tone)

আর আধুনিক ভাষার মধ্যে চিনা ভাষায় সুরাঘাত অর্থের পরিবর্তন ঘটায় এইভাবে—

'মা' শব্দটি চার রকম সুরে উচ্চারণ করলে এর চার রকম অর্থ হয়। যেমন—মা, পাট, ঘোড়া, বকা ইত্যাদি। এছাড়া হোমারের গ্রীক ভাষায় শব্দের ধ্বনি থেকে ধ্বনিতে শব্দ সুরাঘাতের স্থান পরিবর্তনের ফলে অর্থের বদল ঘটে। যেমন—

mu´ria = অনেক (many)

muria´ = দশ লক্ষ (million)

চিনা ভাষায় সুর বিরাট প্রভাব ফেলে। সে কারণে এই ভাষাকে সুরনির্ভর ভাষা বা Tonal Language বলে। তিব্বতি ভাষাও এই শ্রেণিতেই পড়ে।

তবে বাংলা ভাষায় সাধারণত এরকম ঘটে না। বাংলায় শব্দের অর্থ নিয়ন্ত্রণে সুরের কোনো ভূমিকা নেই ঠিক। কিন্তু বাক্যের অর্থ নিয়ন্ত্রণে যে সুরের কোনও ভূমিকা নেই একথা বলা যায় না। বাংলায় একই বাক্য বিভিন্ন প্রকার সুরতরঙ্গ দিয়ে উচ্চারণ করলে, তার অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়। তবে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন দুই একটি অব্যয়, শব্দে সুর যোগ করে বাক্যের সুরের মতো সার্থকতা আনা যেতে পারে। যেমন—'উ', সুরতরঙ্গ অনুপাতে বা সুরাঘাতের ফলে 'উ' এর অর্থ পরিবর্তিত হয়।

সুনীতিকুমার দেখাতে চেয়েছেন যে বাংলায় একটি শব্দের বিভিন্ন সুরে উচ্চারণ করলে তার অর্থ পৃথক হয়ে যায়। কিন্তু এখানে শব্দ একক হিসেবে গ্রহণীয় নয়, অর্থ বিচারে এই একটি শব্দই অনেকটা গোটা বাক্যের তাৎপর্য আনে। সুতরাং বোঝা যায় শব্দের অর্থনিয়ন্ত্রণে সুরের ভূমিকা অপরিসীম। তবে বাংলা ভাষার মতো চিনা ভাষায় সুরের ভূমিকা ততটা নেই। তিনি বলেছেন—

> "Intonation or pitch of voice as not a
> significant element of speech in Bengali"

এই মতকে ফার্গুসন ভুল বুঝেছেন। তিনি বলেছেন শব্দের অর্থ নিয়ন্ত্রণে সুরের ভূমিকা না থাকলেও বাক্যের অর্থ নিয়ন্ত্রণে সুরের ভূমিকা অপরিসীম। 'A Brief sketch of Bengali phonetics' গ্রন্থে সুনীতিকুমার লিখেছেন—

> "—in a sentence information is a highly expression
> speech attribute in the language (i.e. Bengali) possibly
> to a greater extent than in English."

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে সুনীতিকুমার বা মোহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ ভাষাবিদ্ সুর নিয়ে আলোচনা করলেও, তাকে প্রথম সূত্রবদ্ধ করেন চার্লস এ. ফার্গুসন ও মুনীর চৌধুরী। তাঁদের সূত্র ও অধ্যাপক ড্যানিয়েল জোনসের সুরতরঙ্গের রৈখিক রূপায়ণ পদ্ধতি অবলম্বন করে বাংলা সুরতরঙ্গের প্রকারভেদ আলোচনা করা যেতে পারে।

সুরতরঙ্গ মূলত তিন প্রকার। যথা—

(১) ঊর্ধ্ব থেকে নিম্নগামী = ↘ (High falling)

(২) নিম্ন থেকে ঊর্ধ্বগামী = ↗ (Low rising)

(৩) সমান্তরাল = → (level / Sustained)

সুরের তীব্রতা ও মাত্রাভেদ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হতে পারে। যে কারণে মোটামুটিভাবে সুরে তীব্রতার তিনটি প্রধান গ্রাম বা মাত্রাভেদ নির্ণয় করা হয়। যথা—উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন।

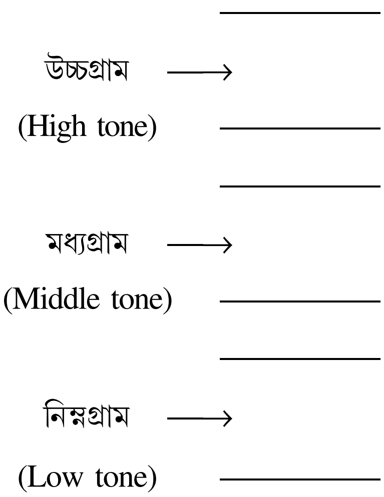

এবার বিভিন্ন প্রকার বাক্যের সাহায্যে বাংলা সুরতরঙ্গের একটা রেখাচিত্র দেওয়া যেতে পারে। প্রসঙ্গত বলা দরকার সমস্ত বাক্যে সুর উঁচু থেকে যখনও আরও উঁচুতে, কখনও নিচুতে, কখনও আরও নিচে, কখনও বা নিচু থেকে উঁচুতে ওঠা নামা করার ফলে সুরের রেখাচিত্র তরঙ্গের মতো দেখায়। তাই এই বাক্য সুরের সুরতরঙ্গকে এক বৈশিষ্ট্যময় পরিচয় দেওয়াই যায়। সুরতরঙ্গের বৈষম্যে বাক্যের অর্থভেদ হয়ে থাকে। এবার সাধারণ চলিত বাংলায় বিবৃতিমূলক বাক্যে সুরের উঁচু থেকে নিচে ক্রমিক অবতরণ দেখানো হল। যেমন—

বিবৃতিমূলক বাক্যে এই রকম বাক্য উচ্চারণের ক্ষেত্রে শুরুর দিকে সুর উচ্চগ্রামে থাকে, শেষে নীচে নেমে যায়। যেমন—অভিজিৎ বলে।

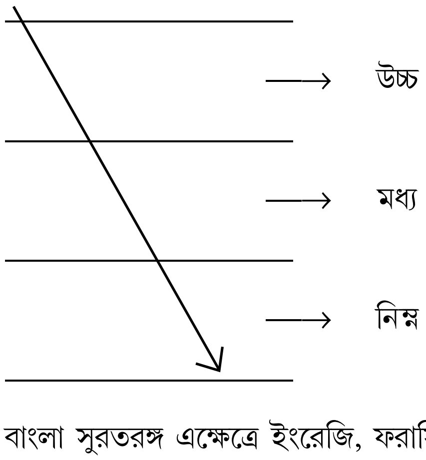

বাংলা সুরতরঙ্গ এক্ষেত্রে ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মান ভাষার মতো।

প্রশ্নবোধক বাক্যে দুই রকমের সুরতরঙ্গ দেখা যায়। যথা—

১। প্রথম শ্রেণির সুরতরঙ্গ নিম্ন থেকে ঊর্ধ্বগামী হয়। যেমন—

মধু কি বলে?

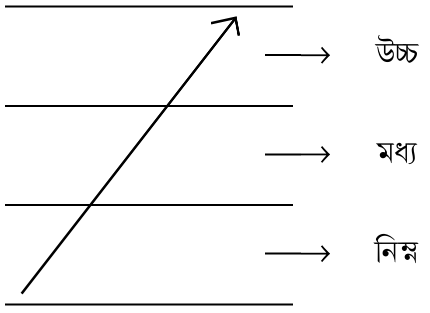

এখানে শুধু 'হ্যাঁ' বা 'না' উত্তর প্রত্যাশা করা হয় এবং ক্রিয়ার উপর জোর দেওয়া হয়।

২। দ্বিতীয় শ্রেণির প্রশ্নে শুধু 'হ্যাঁ' বা 'না' জানতে চাওয়া হয় না। এখানে বিশেষ উত্তরের প্রত্যাশা করা হয়। আর ক্রিয়ার উপর জোর না দিয়ে কর্তার উপর জোর দেওয়া হয়। এখানে সুরতরঙ্গ বিবৃতিমূলক বাক্যের মতোই প্রায় অনেকটা উঁচু থেকে নিচু হয়। যেমন—

মধু কী বলে?

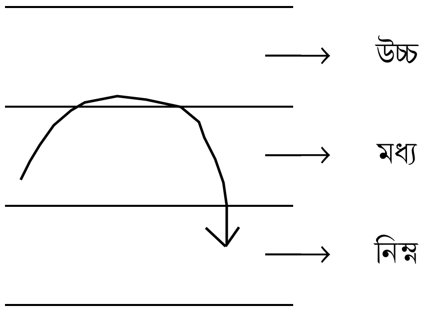

এখানে সুর প্রথমে নরম হয়, তারপর তীব্র হয় ও পরে নরম হয়।

অনেক সময় আমরা 'কি' শব্দে প্রশ্ন বোঝাই না, তুচ্ছার্থে নেতিমূলক কিছু বোঝাতে চাই। এসব ক্ষেত্রে সুরতরঙ্গ উপর থেকে নীচের দিকে আসে। যেমন—

সে কি জানে?

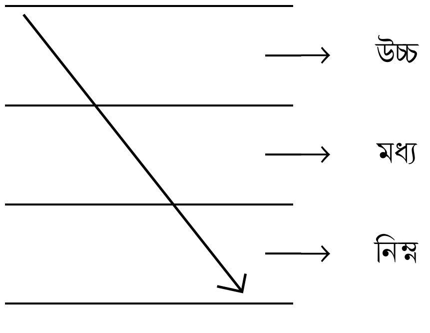

সংশয়মূলক বাক্যে যখন কোনও সঠিক সিদ্ধান্তে আমার আসতে পারি না একটা সংশয়ের মধ্যে থাকি, তখন এই রকম বাক্যে সুরতরঙ্গ ওঠানামা না করে একই রকম থাকে। যেমন—

রূপা মিথ্যা কথা বলে।

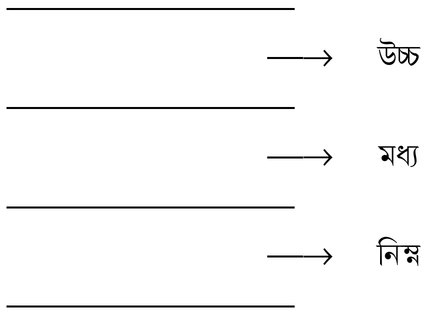

নির্দেশমূলক বাক্যে আদেশ, অনুরোধ, নির্দেশ ইত্যাদি বোঝালে বাক্যের সুরতরঙ্গ উপর থেকে নীচের দিকে আসে। যেমন—

আপনি একটু বসুন।

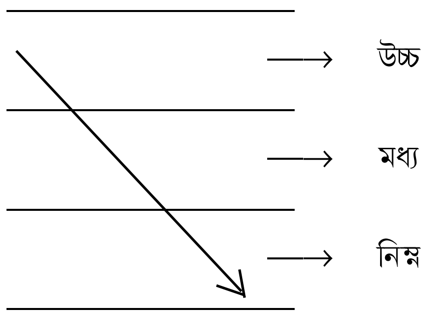

এছাড়াও প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তির ক্ষেত্রে সুরতরঙ্গ আলাদা হয়। যেমন—

১. প্রত্যক্ষ উক্তির ক্ষেত্রে বাক্যের সামগ্রিক সুরতরঙ্গ উপর থেকে নীচের দিকে হয়ে আবার উঁচুতে উঠে পুনরায় নীচে নামে। যেমন—

সমীর বলল, "এই কাজ মোহনের দ্বারাই সম্ভব"।

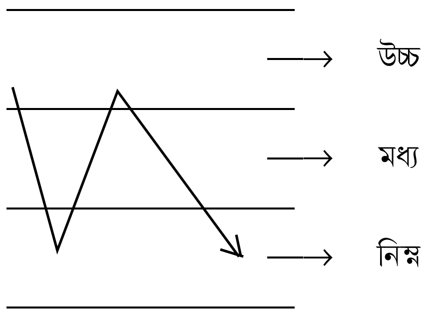

এক্ষেত্রে বক্তার বক্তব্য বিবৃতিমূলক।

কিন্তু বক্তার বক্তব্য যদি প্রশ্নবোধক হয়, তবে বাক্যটির সুরতরঙ্গ নীচ থেকে উঁচুতে যাবে। যেমন—সমীর বলল, 'এই কাজ মোহনের দ্বারা কি সম্ভব?'

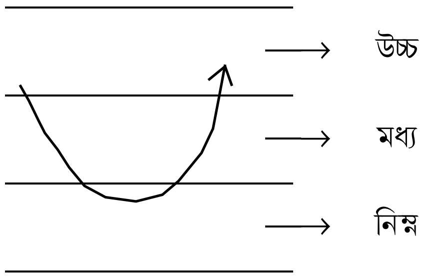

আর প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার বক্তব্য সংশয়মূলক হলে বাক্যের সুরতরঙ্গ উঁচু থেকে নীচু হয়ে স্বাভাবিক চলবে। যেমন—বিনয় বলল, 'পিয়া আমাকে অবিশ্বাস করেঙ্গ'

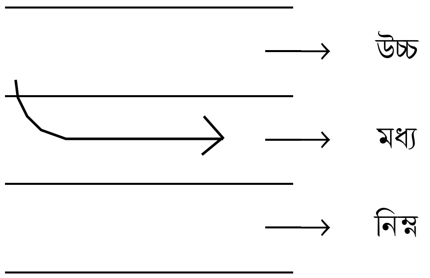

এছাড়া বিভিন্নমুখী ভাব প্রকাশের সময় ভাবানুসারে সুরতরঙ্গের ওঠানামা চলে। আনন্দ, বিস্ময়, আবেগ ইত্যাদি বাক্যের শ্বাসাঘাত যুক্ত শব্দে (বিশেষ শব্দে) জোর দিতে গিয়ে যেমন শ্বাসাঘাত পড়ে, তেমনি বাংলা সুরও তীব্র হয়ে উচ্চগ্রামে উঠে যায়। যেমন—কী অপূর্ব দৃশ্য দেখলাম, কি বলব।

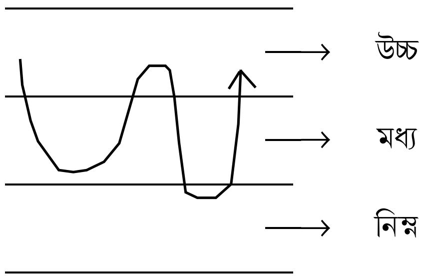

এইভাবে নানা প্রকারে নানা বাক্যের সুরতরঙ্গ বাংলা ভাষায় ওঠানামা করে।

৪.১.৪.৪ : যতি

দুটি শব্দ বা সন্নিহিত শব্দ বা সমাসবদ্ধ পদে প্রথমটির শেষ বর্ণ বা ধ্বনি এবং দ্বিতীয় পদের প্রথম বর্ণ বা ধ্বনির মধ্যে যে বিরতি থাকে, তাকেই বলে যতি, আমাদের বাক্‌প্রবাহের ধারায় দুটি স্বনিমের মধ্যবর্তী বিরতি বা পারস্পরিক সংযোগকে যতি বা ধ্বনি সংযোগ বলে। পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানী A. Hall-এর মতে—

> "The way in which phonemes follow each other or are 'joined' in the stream of speech."

গদ্যে বাক্য ও বাক্যাংশের অর্থ অনুসারে ধ্বনিসহ শ্বাসপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু গদ্যে তেমন হয় না। সেখানে নির্দিষ্ট অল্পবিস্তর শ্বাসের বিরাম দিতে হয়। এখানেই গদ্য ও পদ্যের যতিচ্ছেদ আলাদা। গদ্যে যতিচ্ছেদ সুনির্দিষ্ট নয়, বক্তার ইচ্ছাধীন। কিন্তু পদ্যে যতির সংখ্যা সুনির্দিষ্ট এবং যতিক্রম নিয়মিত। যতির দ্বারাই পদ্যে ছত্রের বিভাগ হয়।

যতিকে প্রকাশ করার চিহ্ন চার রকম। যথা—

ক. বিরতি

খ. সংযোগ

গ. স্বল্প বিরতি

ঘ. পূর্ণ বিরতি

কিন্তু পদ্যে ও গদ্যের খাতিরে যতিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়— (ক) লঘু যতি (খ) পূর্ণ যতি। কবিতায় ছন্দের কারণে লাইনে স্বল্পতম প্রয়াসে যে বিরতি দেওয়া হয়, তাকে লঘু যতি বলে। যেমন—

“এ জগতে হায় / সেই বেশি চায়
আছে যার ভুরি / ভুরি।”

কিন্তু অর্থের প্রয়োজনে বা ছন্দের কারণে বাক্যের শেষে যে বিরতি দেওয়া হয়, তাকে পূর্ণ যতি বলে। যেমন—

“মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।”

এছাড়া ভাষাবিজ্ঞানীরা যতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা—

(১) বাহ্য উন্মুক্ত যতি (External open juncture]

(২) অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতি (Internal open juncture)

(৩) ঘনিষ্ঠ বা সংবদ্ধ যতি (Close open juncture]

ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিপ্রবাহে দুটি ধ্বনির মধ্যে স্পষ্ট বিরতি থাকলে এবং সেটি কানে শুনেই বোঝা গেলে সেই বিরতিকে বলে বাহ্য উন্মুক্ত যতি। এখানে ধ্বনি দুটির মধ্যে বিরতি থাকে বলে, এখানে ধ্বনি দুটি যুক্ত হয় না। অর্থাৎ ধ্বনি সংযোগ ঘটে না। এটি নেতিমূলক সংযোগ।

বাহ্য উন্মুক্ত যতির বৈশিষ্ট্য :

ক. বাহ্য উন্মুক্ত যতিতে কোনও সংযোগ নেই, কেবল বিরতি লক্ষ করা যায়।

খ. সাধারণ বাক্যের পদগুচ্ছ, বাক্যাংশ এবং বাক্যের দুই প্রান্তে বাহ্য উন্মুক্ত যতি থাকে।

গ. এই প্রকার যতির ক্ষেত্রে দেখা যায় কোনও কোনও ভাষায় বাহ্য যতির ঠিক পরবর্তী অক্ষরটিতে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে। যেমন—

সে-বাড়ি যাবে।

এখানে 'সে' ও 'বাড়ি' শব্দের মধ্যে বিরতি চিহ্ন পড়েছে এবং 'বাড়ি' শব্দের প্রথম অক্ষর 'ব'-তে তীব্র শ্বাসাঘাত পড়েছে।

বাহ্য উন্মুক্ত যতিকে ভাষাবিজ্ঞানীরা দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা—

(ক) বাক্য প্রান্তিক যতি

(খ) বাক্যাংশ বা পদগুচ্ছ প্রান্তিক যতি।

বাক্য প্রান্তিক যতি

এই প্রকার যতির চিহ্ন—'।।' আসলে ভাষায় ব্যবহৃত বাক্যের শেষে সম্পূর্ণরূপে যে বিরতি চিহ্ন দেওয়া হয়, তাকে বাক্য প্রান্তিক যতি বলা হয়।

পদগুচ্ছ প্রান্তিক যতি

এই প্রকার যতির চিহ্ন—'।'। বাক্যের অন্তর্গত দুই বাক্যাংশ বা দুই পদগুচ্ছের মধ্যে যে বিরতি চিহ্ন দেওয়া হয়, তাকে বাক্যাংশ বা পদগুচ্ছ যতি বলে।

আর একপ্রকার যতিও আছে। যেটি পদের শেষে বিরতি চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাকে পদান্তিক যতি বলে। পদান্তিক যতিতে ক্ষণকালের জন্য বিরতি ঘটলে, তাকে বাহ্য উন্মুক্ত যতির মধ্যে ফেলা হয়। আর পদান্তিক যতিতে বিরতি ক্ষণকালের জন্যে হলেও উচ্চারণের বিরাম থাকে না। সেক্ষেত্রে সেই পদান্তিক যতি বাহ্য উন্মুক্ত যতির মধ্যে পড়ে না।

দুটি ধ্বনির মধ্যে কোনও উচ্চারণগত বিরতি থাকে না। আরও বলা যায় সমাসবদ্ধ বা উচ্চারণে ঘনসন্নিবিষ্ট দুটি শব্দ বা পদের মধ্যে আপাত অদৃশ্য যে সূক্ষ্ম বিরতি পদান্তিক যতি রূপে অবস্থান করে, তাকে অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতি বলে। বাংলায় সাধারণত দুটি শব্দের মাঝখানে যখন কোনও ধ্বনিগত বিরতি শোনা যায় না, অথচ শব্দদুটির মিলন রেখাটি চেনা যায়, তখন শব্দদুটির মাঝখানে আভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতি আছে বলা হয়। এই প্রকার যতির চিহ্ন হল (—)।

বৈশিষ্ট্য :

ক. সমাসবদ্ধ বা ঘনসন্নিবিষ্ট শব্দগুলির মাঝখানে এই প্রকার যতি থাকে।

খ. সমাসবদ্ধ পদ না হলেও অনেক সময় অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতি থাকতে পারে।

গ. উচ্চারণ বৈচিত্র্য এই প্রকার যতিতে থাকে না।

ঘ. বাংলায় এই উন্মুক্ত যতির ক্ষেত্রে বাহ্য উন্মুক্ত যতির বৈশিষ্ট্য সর্বদা দেখা যায় না। অর্থাৎ বাহ্য উন্মুক্ত যতির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী স্বনিমের উচ্চারণগত বৈচিত্র্য সবসময় এই যতিতে দেখা যায় না।

ঙ. সাধারণ দৃষ্টিতে অনায়াসে অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতি চোখে পড়ে না।

উদাহরণ :

দয়ামায়া = দয়া-মায়া

পার্থসারথী = পার্থ-সারথী ইত্যাদি

সংবদ্ধ যতিতে দুটি ধ্বনির মাঝখানে বাহ্য উন্মুক্ত যতি বা অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতি থাকে না। ওইসব যতির কোনও বৈশিষ্ট্যও দেখা যায় না, এইরকম ধ্বনি দুটির মধ্যে সংবদ্ধ যতি রয়েছে বলে ধরা হয়। এই প্রকার যতির চিহ্ন হল (+)।

বৈশিষ্ট্য :

ক. এইপ্রকার যতি দুটি ধ্বনির সংযোগস্থলে বসে।

খ. বাহ্য উন্মুক্ত যতি ও অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতির কোনও বৈশিষ্ট্য সংবদ্ধ যতিতে থাকে না।

গ. এই প্রকার যতিতে যে ধ্বনিগুলি যুক্ত হয়, তা একটি শব্দেই থাকে।

ঘ. সংবদ্ধ যতিতে বিরতি না হয়ে ধ্বনিগুলি পরস্পরের কাছে এসে যুক্ত হয়। অর্থাৎ বিরতির পরিবর্তে সংযুক্তি (+) ক্রিয়া করে।

ঙ. এই যতি উচ্চারণ বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করে না।

উদাহরণ :

কিন্তু = কিম + তু

চলতে = চল + তে

হিসেবী = হিসেব + ঈ

চিন্তন = চিন + তন

অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতি ও সংবদ্ধ যতির একটা তুলনা করলে দেখা যাবে, দুই প্রকার যতির মধ্যেই কিছু সাদৃশ্য ও কিছু বৈসাদৃশ্য আছে।

অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতি ও সংবদ্ধ যতির সাদৃশ্য :

ক. দুই প্রকার যতিই, যতির এক একটা শ্রেণিবিভাগ।

খ. অভ্যন্তরীণ যতিও সমাসবদ্ধ পদের ভিতরে অবস্থিত। আবার সংবদ্ধ যদিও ভিতরে বা দুটি ধ্বনির মাঝে অবস্থিত।

গ. অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতিতে বাহ্য উন্মুক্ত যতির বৈশিষ্ট্য যেমন প্রায় থাকে না, তেমনি সংবদ্ধ যতিতেও থাকে না।

ঘ. উভয় প্রকার যতিই উচ্চারণ বৈচিত্র্যের ওপর নির্ভর করে না।

ঙ. উভয় প্রকার যতিই অনুসন্ধান করে পেতে হয়।

অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতি ও সংবদ্ধ যতির বৈসাদৃশ্য :

ক. অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতির চিহ্ন (—)।

অন্যদিকে সংবদ্ধ যতির চিহ্ন (+)।

খ. অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতির জন্য বিরতি (-) বা পদান্তিক যতি ব্যবহৃত হয়। অপরপক্ষে সংবদ্ধ যতিতে সংযুক্তিই (+) ব্যবহৃত হয়।

গ. অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতির ক্ষেত্রে ধ্বনিগুলি একই শব্দের অন্তর্গত ধ্বনি হয়।

ঘ. অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতি বিরতিহীন দুই শব্দের মাঝখানে পড়ে। কিন্তু সংবদ্ধ যতি একই শব্দের দুই অক্ষরের মাঝখানে পড়ে।

ঙ. অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতি একপ্রকার উন্মুক্ত যতি।

অন্যদিকে সংবদ্ধ যতি পুরোপুরি ঘনিষ্ঠ যতি।

চ. অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতির উদাহরণ—

সাথীহারা = সাথী-হারা ইত্যাদি।

অপরপক্ষে সংবদ্ধ যতির উদাহরণ—

জলপাই = জল + পাই ইত্যাদি।

৪.১.৪.৫ : দৈর্ঘ্য

বাংলা ভাষায় অবিভাজ্য স্বনিমের পাঁচ প্রকার ভাগের মধ্যে দৈর্ঘ্য এক প্রকার। বাক্যে ব্যাবহারের সময় অথবা অনেকক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে কোনও কোনও শব্দের স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনি বেশিক্ষণ ধরে রাখা হয় বলে উচ্চারণের সময় সেই ধ্বনিগুলি প্রলম্বিত হয়। সাধারণ ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে যে মাত্রা, ধ্বনিতত্ত্বে আছে তা ধ্বনিদৈর্ঘ্য নামে পরিচিত। অক্ষর গঠনের ক্ষেত্রে ধ্বনিদৈর্ঘ্যের ধ্বনিগত গুরুত্ব অপরিসীম। কোনও কোনও ভাষায় একই ধ্বনি দীর্ঘ উচ্চারণ করলে তাদের মধ্যে অর্থপার্থক্য সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ সেই ভাষায় ধ্বনির দৈর্ঘ্য স্বনিমীয় তাৎপর্য বহন করে।

সংস্কৃত, জার্মান, হিন্দি, ইংরেজি ইত্যাদি ভাষায় স্বনিমীয় তাৎপর্য বহন করে স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য। উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। যেমন—

ইংরেজি

Kin / Kin / সম্পর্ক = কিন্-হ্রস্বই

Kean / Ki:n / = তীক্ষ্ণ [কী-ন-দীর্ঘ ঈ]

সংস্কৃত ও হিন্দি

দিন / din / = দিবস

দী-ন / di:n / = দরিদ্র

জার্মান

Lamm / lam / = ভেড়া

Lahm / la:m / = খোঁড়া

তবে বাংলা ভাষার ধ্বনির দৈর্ঘ্য সবসময় স্বনিমীয় তাৎপর্য বহন করে না। এর কারণ বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণের হ্রস্ব বা দীর্ঘ উচ্চারণের উপরে শব্দের অর্থ নির্ভর করে না। বাংলা ভাষায় হ্রস্বস্বর বা দীর্ঘস্বরে স্বনিমীয় কোনও বিরোধ নেই। তাই হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর আলাদা আলাদা স্বনিম নয়। অবশ্য

বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে ই, ঈ, উ, ঊ ইত্যাদি স্বর বানানোর পার্থক্য সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন—কূজন (পাখির কাকলি) ও কুজন (মন্দ লোক)। কিন্তু উচ্চারণের সময় এই পার্থক্য বোঝা যায় না। কিন্তু এইসব শব্দের উচ্চারণে হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ নেই। আর এজন্যই বাংলায় ব্যাকরণের নির্মিতি অধ্যায়ে 'সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ'—নামক একটা অধ্যায় সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং এটা বোঝা যায় বাঙালির প্রকৃত উচ্চারণে হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ নেই। অর্থাৎ ধ্বনির দৈর্ঘ্য বাংলা ভাষায় দেখা যায় না। তবে একটু 'কিন্তু' আছে। যেমন—

"যখন বাড়ি থেকে বের হলে তখন তো পুরোপুরি দিন।"

এই বাক্যে 'দিন' শব্দে 'ই' লিখিত। কিন্তু উচ্চারিত হচ্ছে দীর্ঘস্বরের মতো। কিন্তু—"দিনের বেলায় সূর্যকে আকাশে দেখা যায়" এই বাক্যে 'দিনের' শব্দটি দুটি অক্ষর (দিন + এর) নিয়ে গঠিত। একাধিক অক্ষর নিয়ে গঠিত শব্দে শেষ অক্ষরের আগের অক্ষরে স্বরধ্বনি হ্রস্ব উচ্চারিত হয়। তাই এই বাক্যে 'দিনের' শব্দের 'ই' এর উচ্চারণ হ্রস্ব। কিন্তু এদের অর্থের পার্থক্য নেই। দুটি বাক্যই শব্দটি 'দিন' এবং যাদের অর্থ 'দিবস' আর বানানও এক। হ্রস্ব দীর্ঘত্ব নির্ভর করে তার অবস্থানের উপর। অতএব স্বরের উচ্চারণ হ্রস্ব দীর্ঘ হবে শর্তাধীনে। কাজেই তা মূলধ্বনির উপধ্বনি, কিন্তু স্বতন্ত্র ধ্বনিরূপে মর্যাদা পায় না বলে ধ্বনির দৈর্ঘ্য বলা যায় না।

এক থাকা সত্ত্বেও একই ধ্বনির এই হ্রস্বতা দীর্ঘতা নির্ভর করছে বাংলা ভাষায়—

ক. তার অবস্থানের কারণে।

খ. গঠনের কারণে। যেমন—এক অক্ষর দ্বারা গঠিত হলে দীর্ঘতা পেতে পারে।

গ. ব্যবহারের পদ্ধতি অনুসারে।

ঘ. ব্যক্তিবিশেষের বা অঞ্চল বিশেষের উচ্চারণে।

ঙ. সুরতরঙ্গের কারণে।

চ. শ্বাসাঘাতের কারণে ইত্যাদি।

এই নিয়মের ব্যতিক্রম অবশ্য কেউ কেউ দেখাতে চেয়েছেন। যেমন—বাংলা ভাষায় 'কি' ও 'কী' শব্দ দুটির অর্থ আলাদা। 'কি' শব্দের অর্থে 'হ্যাঁ'/'না' বোঝায়, আর 'কী' শব্দের অর্থে বিশেষ কোনও দ্রব্য বোঝায়। উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। যেমন—

(ক) 'রাম কি খাবে?'

এখানে 'রাম' খাবে কি না, শুধু তাই জানতে চাওয়া হয়েছে।

(খ) রাম কী খাবে?

এখানে 'রাম' কি কি খাবে সেটা জানতে চাওয়া হচ্ছে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছ 'কি' ও 'কী' শব্দের 'ই'-কার ও 'ঈ'-কার এর মধ্যে স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য বর্তমান।

কিন্তু তাঁদের ধারণায় ত্রুটি আছে। কারণ এই দুই বাক্যে অর্থের পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে মূলত সুরতরঙ্গ ও শ্বাসাঘাতের ফলে, দৈর্ঘ্যের কারণে নয়। যেমন—

প্রথম বাক্যে সুরতরঙ্গ

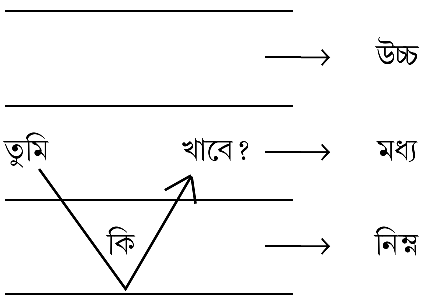

এখানে সুরতরঙ্গ প্রথমে নিম্নমুখী ও পরে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। তাছাড়া বাক্যটিতে শ্বাসাঘাত পড়েছে শেষ শব্দের প্রথমে। যেমন—তুমি কি খাবে?

সুতরাং শ্বাসাঘাতের আগের শব্দের স্বরধ্বনি হ্রস্ব উচ্চারণ হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই।

আর দ্বিতীয় বাক্যে সুরতরঙ্গ

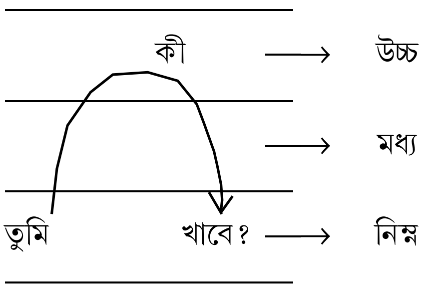

এই বাক্যে সুরতরঙ্গ প্রথমে ঊর্ধ্বমুখী পরে নিম্নমুখী হয়েছে এবং এখানে শ্বাসাঘাত পড়েছে দ্বিতীয় শব্দে। তাই দ্বিতীয় শব্দের 'কী' এর 'ঈ' এর উচ্চারণ দীর্ঘই হয়েছে। তবে 'কি' এর উচ্চারণ হ্রস্ব হলেও অর্থ কিন্তু 'ঈ' কার যুক্ত 'কী' এর মতো হয়। যেমন—

(ক) রাম কি করছে আর শ্যাম কি করছে তা আমার জানা।

(খ) মধু আর সুমন যে কি খাবে, তা আমার জানা।

এই দুটি বাক্যেই ব্যবহৃত 'কি' শব্দের অর্থ দ্রব্য বা বিষয় তাই বলা যায় পূর্বোক্ত মন্তব্যকারীদের সিদ্ধান্ত সঠিক নয়।

ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যঞ্জনধ্বনির দৈর্ঘ্যকে ব্যঞ্জনদ্বিত্বের সঙ্গে এক করে ফেলেছেন। তাঁদের মতে ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে দ্বিত্বপ্রয়োগ করে দীর্ঘ ধ্বনি সৃষ্টি করে অর্থপার্থক্য সৃষ্টি করা যায়। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার বলেছেন—

> "Length of consonants, commonly described as doulring, other serves to distinguish words in Bengali and is thus of considerable importance."

তিনিও এখানে ব্যঞ্জনদ্বিত্বকেই ব্যঞ্জনের দীর্ঘতা বলেছেন। যেমন—সকলে (হ্রস্বব্যঞ্জন) > কিন্তু

সক্‌কলে (দ্বিত্বব্যঞ্জন)। দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জন 'ক্ক' এর জন্য একটু অর্থের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু অর্থের পার্থক্য ঘটেছে 'সককলে'। শব্দের শ্বাসাঘাতের জন্য। ধ্বনির দ্বিত্বপ্রাপ্তির জন্য নয়।

আবার অনেক ভাষাবিজ্ঞানী বলেছেন, ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্যকে পাওয়া যায়। তাঁদের মতে একক ব্যঞ্জন হলে হ্রস্বব্যঞ্জন, আর দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জন হল দীর্ঘব্যঞ্জন। কারণ এই দুই ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে স্বনিমীয় বিরোধ আছে। যেমন—'সবাই' শব্দে 'ব' একক ধ্বনি হওয়ায় এটি হ্রস্বব্যঞ্জন। আর 'সব্বাই' শব্দে 'ব' দ্বিত্ব বা দীর্ঘ ধ্বনি। সুতরাং ধ্বনি ও অর্থ দুইদিকেই পার্থক্য ঘটেছে। এখানে 'ব' ও 'ব্ব' ধ্বনি উভয়ই দৈর্ঘ্যের বৈশিষ্ট্যবাহী। তবে সুনীতিকুমার বা আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানী দৈর্ঘ্যকে মানেননি, শ্বাসাঘাতের প্রভাবেই শব্দে অর্থের পার্থক্য ঘটছে। এই কারণে দুটি ধ্বনিকে নিয়ে একসঙ্গে টেনে দীর্ঘধ্বনির মর্যাদা দেওয়া হয় না। যে কারণেই বিশেষজ্ঞ ভাষাবিজ্ঞানীদের অন্যতম মহম্মদ আব্দুল হাই তাঁর 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' গ্রন্থে বলেছেন—

> "দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ......
>
> একাত্মতাপ্রাপ্ত হয় না।"

বৈজ্ঞানিক বিচারে বাংলায় দীর্ঘব্যঞ্জন বলে কিছু নেই। তাই ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য স্বনিমীয় তাৎপর্যপূর্ণ নয়। স্বরধ্বনিও এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম নয়। সব মিলিয়ে পৃথিবীর যেসব ভাষায় ধ্বনির দৈর্ঘ্য নেই, বাংলা ভাষায়ও তেমন দৈর্ঘ্য স্বনিমীয় তাৎপর্যে দৈর্ঘ্যহীন। কারণ স্বরবর্ণ টেনে টেনে উচ্চারণ করলেও অর্থের কোনও পরিবর্তন হয় না।

৪.১.৪.৬ : নাসিক্যভবন

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু নাক দিয়ে বা একত্রে মুখ ও নাক দিয়ে নির্গত হওয়ার ফলে নাসাগহ্বরে অনুরণন সৃষ্টি করে, সেই ধ্বনিকে বলে নাসিক্য আনুনাসিক ধ্বনি। বাংলা ভাষায় নাসিক্যধ্বনি স্বনিমীয় তাৎপর্য বহন করে। যেমন—বাংলায় সাতটি স্বরস্বনিম যেমন আছে, তেমনি সাতটি সানুনাসিক স্বরস্বনিমও আছে। সাতটি স্বরস্বনিম হল যথাক্রমে ই, এ, অ্যা, আ, অ, ও, উ ইত্যাদি। অনুরূপভাবে সাতটি সানুনাসিক স্বরস্বনিম হল—

বিধি / bid^{h}i / = নিয়তি—ই / i /

বিঁধি / bĩd^{h}i / = বিঁধিয়ে দিই—ইঁ / ĩ /—(১)

এরা / era / = এই সব লোকেরা—এ / e /

এঁরা / ẽra / = এই সব (সম্মানিত) লোকেরা—এঁ / ẽ /—(২)

ট্যাক / tæk / = তুই টিকে থাক—অ্যা / ae /

ট্যাঁক / tæ̃k / = কোমরের কাপড়ে টাকা রাখার জায়গা—অ্যাঁ / æ̃ /—(৩)

ছাদ / c^{h}ad / = ঘরের ছাদ—আ / a /

ছাঁদ / c^{h}ãd / = গড়ন—অ্যাঁ / ã /—(৪)

গদ / god / = অতি ভোজনে পেটে অস্বস্তি—অ / o /

গঁদ / gõd / = আঠা—অঁ / õ /—(৫)

ধোয়া / d^hoẽa / = পরিষ্কার করা—ও / o /

ধোঁয়া / d^hõ a / = ধূম—ওঁ / õ /—(৬)

কুড়ি / kuri / = বিশ—উ / u /

কুঁড়ি / kũri / = ফুলের কুঁড়ি—উঁ / ũ /—(৭)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাংলায় সাতটি আনুনাসিক স্বর ইঁ, এঁ, অ্যাঁ, আঁ, অঁ, ওঁ এবং উঁ স্বনিমীয় তাৎপর্য বহন করেছে।

নাস্যিকীভবনের ফলে ধ্বনির মধ্যে স্বনিমীয় বিরোধ সৃষ্টি হয় ও অর্থের পার্থক্য ঘটে। হিন্দি ও ফরাসি ভাষাতেও এই সানুনাসিক ধ্বনি স্বনিমীয় তাৎপর্য বহন করে। বাংলার সঙ্গে এই দিক থেকে হিন্দি বা ফরাসির মিল রয়েছে। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। যেমন—

বাংলায়

কুড়ি / kuri / = বিশ

কুঁড়ি / kũri / = ফুলের কুড়ি

হিন্দি

আধী / ad^hi / = অর্ধেক

আঁধী / $\tilde{a}d^h$i / = ঝড়

ফরাসি

essdi / e e / = চেষ্টা

essdim / e em / = ভিড়

তাহলে বোঝা যায় বাংলা, হিন্দি ও ফরাসিতে সানুনাসিক ধ্বনির স্বনিমীয় তাৎপর্য বহন করে। নাসিক্যীভবনের ফলে ধ্বনির মধ্যে স্বনিমীয় বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং অর্থের পার্থক্য ঘটায়।

৪.১.৪.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। স্বনিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

২। স্বনিমের শ্রেণিবিভাগ করো। এই প্রসঙ্গে অবিভাজ্য স্বনিমের পর্বগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৩। ‘শ্বাসাঘাত’ বলতে কী বোঝো? বাংলা ভাষায় শ্বাসাঘাতবিধি সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪। সুরাঘাতের সংজ্ঞা দাও। বিভিন্ন বাক্যে সুরাঘাতের রৈখিক চিত্র অঙ্কন করো।

৫। যতি কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার যতির শ্রেণিবিভাগ করে উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়ে দাও।

৬। দৈর্ঘ্য বলতে কী বোঝো? বাংলা ধ্বনির দৈর্ঘ্য মূলত কিসের উপর নির্ভর করে? উদাহরণসহ তা বুঝিয়ে দাও।

৭। নাসিক্যীভবন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

৪.১.৪.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' (১৪০৩)—ড. রামেশ্বর শ, পুস্তক বিপণি।

২। 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৬)—সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৩। 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' (১৯৯৭)—আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, নয়া উদ্যোগ।

৪। 'ভাষাতত্ত্ব' (১৩৯৬)—রফিকুল ইসলাম, উজ্জ্বল বুক স্টোরস্।

৫। 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৮)—মহম্মদ শহীদুল্লাহ, মাওলা ব্রাদার্স।

৬। 'ভাষাবিদ্যা পরিচয়' (২০০২)—অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জয়দুর্গা লাইব্রেরি।

৭। 'ভাষা পরিক্রমা' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ২০০২)—অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার, দেজ পাবলিশিং।

৮। 'ভাষা দেশ-কাল' (২০০০)—পবিত্র সরকার, মিত্র ও ঘোষ।

৯। 'ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী' (১৯৯৮)—রফিকুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি।

১০। 'ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা' (২০০৪)—অনিমেষকান্তি পাল, বামা পুস্তকালয়।

১১। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (২০০২)—সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

১২। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (সমাজভাষা, ২০০৩)—সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

১৩। 'বাংলা গদ্য স্টাইলিস্টিকস্' (২০০১)—নবেন্দু সেন, মহাদিগন্ত।

১৪। 'ফলিত ভাষাবিজ্ঞান' (১৯৯৭)—ভূদেব বিশ্বাস ও ভবদেব বিশ্বাস, তাহেরপুর কবিতা কুটির।

১৫। 'শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৮)—অপূর্ব দে, মডার্ন বুক এজেন্সি।

১৬। 'সাহিত্যলোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৪)—আশিস দে, পুস্তক বিপণি।

পর্যায় গ্রন্থ - ২

রূপিম বা মূলরূপ ও রূপতত্ত্ব

একক - ৫

রূপকল্পের সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য

বিন্যাস ক্রম :

৪.২.৫.১ : উদ্দেশ্য
৪.২.৫.২ : প্রস্তাবনা
৪.২.৫.৩ : রূপ-রূপকল্প-রূপবিকল্প
৪.২.৫.৪ : রূপকল্পের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য—রূপকল্প ও অক্ষর—রূপকল্প ও শব্দ
৪.২.৫.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি
৪.২.৫.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪.২.৫.১ : উদ্দেশ্য

- বর্তমান একক পাঠককে শব্দ ও শব্দের গঠন সম্বন্ধে অবহিত করবে।
- শব্দ যে সবসময় অখণ্ড নয়, এক বা একাধিক গঠনগত উপাদান নিয়ে গঠিত পাঠক বর্তমান একক পাঠ করলে তা বুঝতে পারবেন।
- বর্তমান একক পাঠ করলে রূপকল্প (রূপিম, মূলরূপ, রূপমূল) এবং শব্দ যে এক নয় পাঠক তা অনুধাবন করবেন।
- রূপকল্প যে এক শৈলী নয়, তারও যে বৈচিত্র্য আছে বর্তমান এককে পাঠক তার অনুসন্ধান পাবেন।
- বাংলা শব্দরূপের গঠন ও গঠনগত বৈচিত্র্য সম্বন্ধে পাঠক অবহিত হবেন।
- বাংলা ক্রিয়ার রূপ ও তার গঠনগত বৈচিত্র্য সম্বন্ধেও পাঠকের একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা হবে।

৪.২.৫.২ : প্রস্তাবনা

ধ্বনিতত্ত্বের পর্বে পাঠক ধ্বনি এবং মূল ধ্বনি (ধ্বনিকল্প, ধ্বনিমূল, ধ্বনিতা, স্বনিম) সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। বর্তমান এককে পরবর্তী স্তর অর্থাৎ ধ্বনিমূলের সমাহার এবং তার অর্থযোজ্যতা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। ভাষায় যেমন ধ্বনিগত একক অর্থাৎ ধ্বনিমূল বা ধ্বনিকল্প থাকে, অর্থবোধক এককের ক্ষেত্রেও ন্যূনতম একক হল রূপকল্প বা রূপিম। সাধারণ ধারণায়, যেভাবে ব্যাকরণে বলা থাকে, ভাষার অর্থপূর্ণ ন্যূনতম একক হল শব্দ। ভাষাবিজ্ঞানে শব্দের মধ্যেও অর্থপূর্ণ অণু বা একক খোঁজার একটা পদ্ধতি আছে। সেই এককের অনুসন্ধান এবং বর্ণনাই রূপতত্ত্বের মূল আদর্শ। সাধারণের ধারণা শব্দকে ক্ষুদ্রতম একক

হিসেবে চিহ্নিত করার কারণ মূলত লিখিত রূপের প্রভাব এবং অভিধানের অস্তিত্ব। বাক্যকে লিখিত রূপ দেওয়ার যে পদ্ধতি প্রচলিত তা হল প্রতিটা শব্দের মাঝে যতি বা ছেদের ব্যবহার যা রূপকল্প বা রূপিমের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় না। দ্বিতীয়ত অভিধানে যে শব্দগুলো অন্তর্ভুক্ত হয় সেগুলোর যেমন স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা আছে তেমনি সেগুলির নির্দিষ্ট অর্থ আছে।

সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানে শব্দের অর্থপূর্ণ উপাদানগুলো চিহ্নিত করা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভাষায় যেমন অখণ্ড শব্দও থাকে তেমনি খণ্ডযোগ্য অর্থপূর্ণ উপাদান সমন্বিত শব্দের ব্যবহারও কম নয়। যেমন সৎ, সততা, সততার-জাতীয় শব্দ উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের সংজ্ঞানুযায়ী 'সৎ' শব্দটি অখণ্ড অর্থাৎ শব্দটিকে আর নতুন করে অর্থপূর্ণ উপাদানে বিশ্লেষণ করা যায় না। কিন্তু 'সততা' শব্দটি খণ্ডযোগ্য, কেননা শব্দটির মধ্যে 'সৎ' নামক পূর্বোক্ত 'সৎ' শব্দটি বতর্মান এবং সেটির সঙ্গে 'তা' নামক একটি উপাদানযুক্ত হয়েছে। 'তা'-বিশ্লেষণযোগ্য কেননা যে উপাদানের সঙ্গে এটি সংযোজিত হয়েছে সেটির মৌলিক অস্তিত্ব আছে, অর্থাৎ স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। আবার 'কৃতকার্যতা', 'অসামাজিকতা', 'প্রাসঙ্গিকতা' জাতীয় শব্দে 'তা' নামক উপাদানটি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থগত দিক থেকে 'তা' নামক উপাদানটির পূর্বোক্ত শব্দগুলিতে একটা ভূমিকা রয়েছে তা হল বিমূর্তবাচকতা প্রকাশ করা। ব্যাকরণগত দিক থেকে 'সৎ', 'প্রাসঙ্গিক', 'অসামাজিক', 'কৃতকার্য', যখন বিশেষণ শ্রেণিভুক্ত তখন এই শব্দগুলির 'তা'-যুক্ত রূপ (যেমন সততা, কৃতকার্যতা, প্রাসঙ্গিকতা, অসামাজিকতা) বিশেষ্য শব্দরূপে চিহ্নিত হয়। অর্থাৎ 'তা' নামক উপাদানটি বিশেষণ পদকে বিশেষ্য পদে পরিণত করে। 'সৎ', 'প্রাসঙ্গিক', 'কৃতকার্য', 'অসামাজিক' শব্দগুলি বাক্যে স্বাধীনভাবে প্রযুক্ত হলেও 'তা' উপাদানটি স্বাধীনভাবে প্রযুক্ত হতে পারে না। যেহেতু 'তা' উপাদানটি একটি নির্দিষ্ট অর্থ আছে এবং ব্যাকরণগত একটি ভূমিকা আছে তাই উপাদানটিকে ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় একটি অর্থপূর্ণ একক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই উপাদানটি রূপকল্প বা রূপিম নামে পরিচিত। প্রথাগত ব্যাকরণে এই ধরনের উপাদানকে প্রত্যয় বলে চিহ্নিত করা হয়।

বর্তমানে এককে রূপকল্প চিহ্নিত করার যেমন প্রয়াস নেওয়া হবে তেমনি বাংলা ভাষার রূপকল্পগুলি একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরা হবে।

৪.২.৫.৩ : রূপ-রূপকল্প-রূপবিকল্প

ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় যে-কোনোও অর্থপূর্ণ উপাদানই এক একটি রূপ। সেই রূপগুলির মধ্যে যখন ধ্বনিতাত্ত্বিক এবং ব্যাকরণগত সমরূপতার সম্পর্ক আলোচনা করা হয় তখনই রূপকল্প এবং রূপবিকল্প (উপরূপ, সহরূপত)-এর প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য কতকগুলি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। যেমন—

১.	লোক—লোকেরা	২.	মানুষ—মানুষের
	দাদা—দাদারা		মেয়ে—মেয়ের
	মেয়ে—মেয়েরা		বাবা—বাবার
	ছাত্র—ছাত্ররা		নেতা—নেতার
	গায়িকা—গায়িকারা		লোক—লোকের।

এক সংখ্যক স্তম্ভে চিহ্নিত শব্দগুলিতে দুধরনের এককের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। এক, 'লোক'

জাতীয় শব্দ যেখানে বহুবচন তৈরি হয় 'এরা' উপাদানের সহায়তায়, অর্থাৎ লোক + এরা = 'লোকেরা'। আবার 'ছাত্র', 'দাদা', 'মেয়ে', 'গায়িকা' জাতীয় শব্দে বহুবচন তৈরি হয় 'রা' নামক একটি উপাদানের সহায়তায়। 'রা' এবং 'এরা' প্রত্যেকটি উপাদানই এক একটি রূপ, কারণ এগুলির ধ্বনিগত একটা চেহারা রয়েছে এবং একটি অর্থও বিদ্যমান, এখানে ব্যাকরণগত অর্থ বহুবচন। একইভাবে দুই সংখ্যক স্তম্ভেও আমরা দেখি দুধরনের রূপ—এক, 'মানুষ', 'লোক'-জাতীয় শব্দ যেগুলির সম্বন্ধ কারকের রূপ 'এর' নামক উপাদানের সহায়তায় তৈরি হয়। আবার 'মেয়ে', 'বাবা', 'নেতা' জাতীয় শব্দের সম্বন্ধের রূপ তৈরি হয় 'র' নামক উপাদানের সহায়তায়। এখানেও 'র' এবং 'এর' এক একটি রূপ যেহেতু এগুলির ধ্বনিগত একটি গঠন আছে এবং একটি ব্যাকরণিক অর্থও আছে। এবার এক সংখ্যক এবং দুই সংখ্যক স্তম্ভের যে রূপগুলি চিহ্নিত হল সেগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক দেখে নেওয়া যাক। এক সংখ্যক স্তম্ভে আমরা দুটি রূপ পেয়েছি 'রা', 'এরা'। দুটি উপাদানের অর্থই এক, অর্থাৎ বহুবচন। কিন্তু এগুলির মধ্যে গঠনগত চেহারা অমিল বর্তমান। যেহেতু রূপগুলির মধ্যে অর্থগত সাম্য বিদ্যমান তাই এই রূপগুলির ব্যবহার শর্তসাপেক্ষ কিনা দেখা যেতে পারে। এক সংখ্যক স্তম্ভে দেখা যাচ্ছে 'এরা' নামক উপাদানটি যুক্ত হচ্ছে সেই সব শব্দের সঙ্গে যে শব্দগুলি ব্যঞ্জনান্ত (অর্থাৎ যে শব্দগুলি ব্যঞ্জন দিয়ে শেষ হয়) আর 'রা' উপাদানটি যুক্ত হচ্ছে সেইসব শব্দের সঙ্গে যে শব্দগুলি স্বরান্ত (যে শব্দগুলি শেষ হয় স্বর ধ্বনি দিয়ে)। অর্থাৎ 'রা' এবং 'এরা' রূপদুটির ব্যবহারের মধ্যে একটা শর্তসাপেক্ষতা বর্তমান, যাকে আমরা ধ্বনিতাত্ত্বিক শর্তসাপেক্ষতা বা phonological conditioning বলে চিহ্নিত করতে পারি। 'রা' এবং 'এরা' রূপদুটির অর্থ একই, তফাৎ শুধুমাত্র রূপদুটির অবস্থানে, তাই রূপদুটিকে আমরা একই রূপকল্পের (রূপিমের) দুটি বিকল্প রূপ বলে চিহ্নিত করতে পারি। এই বিকল্প রূপই রূপবিকল্প বা উপরূপ বা সহরূপ (Allomorph) বলে পরিচিত।

দুই সংখ্যক স্তম্ভেও আমরা সম্বন্ধ কারক নির্দেশক দুটি রূপের সঙ্গে পরিচিত হই—এক 'র' এবং দুই 'এর'। আগেই বলা হয়েছে এগুলি পৃথকভাবে এক একটি রূপ। যেহেতু রূপদুটির মধ্যে অর্থগত সাম্য বিদ্যমান তাই এক সংখ্যক স্তম্ভের মতই দুই সংখ্যক স্তম্ভেও রূপদুটির মধ্যে ('র' এবং 'এর') অবস্থানগত কোনোও শর্তসাপেক্ষতা আছে কিনা দেখা যেতে পারে। 'র' উপাদানটি যুক্ত হচ্ছে সেই সমস্ত শব্দের সঙ্গে যেগুলি ব্যঞ্জনান্ত, এখানে 'লোক' এবং 'মানুষ'। অন্যদিকে 'এর' উপাদানটি যুক্ত হচ্ছে সেই সমস্ত শব্দের সঙ্গে যে শব্দগুলি স্বরান্ত, এখানে 'মেয়ে', 'বাবা', 'নেতা'। এখানেও 'র' এবং 'এর' রূপদুটির মধ্যে অবস্থানগত শর্তসাপেক্ষতা বিদ্যমান। যেহেতু রূপদুটির অর্থ একই, পার্থক্য শুধুমাত্র গঠনগত রূপে, অবস্থানগত কারণে তাই এই রূপদুটিও একই রূপকল্প (রূপিম, রূপমূল, মূলরূপ) হিসেবে চিহ্নিত এবং ধ্বনিগত পার্থক্যবিশিষ্ট রূপদুটি- ('র' এবং 'এর') রূপবিকল্প (উপরূপ বা সহরূপ) হিসেবে চিহ্নিত। [রূপকল্প এবং রূপবিকল্প পরিভাষা দুটি প্রবাল দাশগুপ্ত লিখিত 'ভাষা বর্ণনার স্তর' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত। রামেশ্বর শ রূপিম, মূলরূপ, উপরূপ পরিভাষাগুলি ব্যবহার করেছেন। সহরূপ পরিভাষাটি আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ব্যবহৃত। যেহেতু রূপমূলের এ অস্তিত্ব অনেকাংশেই ধারণাগত তাই এখানে রূপকল্প শব্দটাই গ্রহণ করা হয়েছে।]

৪.২.৫.৪ : রূপকল্পের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য—রূপকর ও অক্ষর—রূপকল্প ও শব্দ

রূপকল্পের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা দিলেও রূপকল্পের মূল আখ্যানটি দাঁড়িয়ে আছে একটি সহজতম অভিধার উপর, যেমন, ন্যূনতম অর্থবোধক উপাদান অর্থাৎ এমন একটি উপাদান যার আভিধানিক বা ব্যাকরণগত অর্থ আছে এবং ধ্বনিগত গঠনের দিক থেকেও

ন্যূনতম একক। অর্থাৎ এককটিকে আর নতুন করে ভাঙা যায় না আর যদি ভাঙা হয় তাহলে অর্থের ব্যাঘাত ঘটে যায়। গ্লীসন রূপকল্পের সংজ্ঞা দেন এইভাবে—রূপকল্প হল ধ্বনিকল্পের ছোট পরম্পরা যেগুলি পৌনঃপুনিক। অর্থাৎ ভাষায় রূপকল্প বা অর্থপূর্ণ ধ্বনিকল্পের পরম্পরা বারবার ব্যবহৃত হয়। তবে সব পৌনঃপুনিক পরম্পরা রূপকল্প নয়। এককথায় রূপকল্পকে 'ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।

"Morphemes are generally short sequences of phonemes. These sequences are recurrent—but not all recurrent sequences are morphomes......... Perhaps the best that can be done is to define the morphome as the smallest unit which is grammatically pertinent." [H. A. Gleason, An Introduction to Descriptive Linguistics, pp. 51.] এই সংজ্ঞা থেকে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়—

১. রূপকল্প ক্ষুদ্রতম একক;

২. রূপকল্প এক বা একাধিক ধ্বনিকল্পের পরম্পরা;

৩. রূপকল্পের একটি অর্থ থাকবে;

৪. ক্ষুদ্রতম একক হিসেবে রূপকল্প ভাষায় বারবার ব্যবহৃত হবে।

৫. যে-কোনোও ধ্বনিকল্পের পরম্পরা রূপকল্প হিসেবে গ্রাহ্য নাও হতে পারে। Bloch এবং Trager এর মতে যে-কোনোও গঠনরূপ, মুক্ত অথবা বদ্ধ, যেগুলিকে আর ছোট ছোট অর্থপূর্ণ এককে আর ভাগ করা যায় না সেগুলি রূপকল্প হিসেবে পরিচিত। "Any form, whether free or bound, which can not be divided into smaller meaningful parts is a Morpheme." [Bernard Bloch and G. L. Trager, Outlines of Linguistic Analysis, 1972, p. 54] এখানে রূপকল্পের অখণ্ডতাই মূল বিবেচ্য, সেই রূপকল্প মুক্ত অথবা বদ্ধ যা-ই হোক না কেন। Hockett-এর মতে রূপকল্প ভাষার বয়ানে ক্ষুদ্রতম এবং এককভাবে অর্থপূর্ণ একক। "Morphemes are the smallest individually meaningful elements in the utterances of a language." [Charles F. Hockette, A Course in Modern Linguistics, 1970, p. 123] এই সংজ্ঞায় রূপকল্পকে ক্ষুদ্রতম একক হিসেবে যেমন চিহ্নিত করা হয় তেমনি ভাষার বয়ানে একক অর্থপূর্ণ উপাদান হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। নীদার সূত্রেও রূপকল্প ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক হিসেবে নির্দেশিত।

রূপকল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি এখন আলোচনা করা যেতে পারে।

১. রূপকল্পের ধ্বনি-শরীর এক বা একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ের গঠিত। বাংলা নঞর্থক উপসর্গ 'অ' এবং 'অন' উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। এই দুটি রূপ একই অর্থের দ্যোতক—নঞর্থকতা। কিন্তু ধ্বনি-শরীরে পার্থক্য আছে—প্রথমটি যখন একটিমাত্র স্বরধ্বনি সহযোগে গঠিত {অ} দ্বিতীয়টি একটি স্বর এবং একটি নাসিক্যব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত। অর্থের মিল অনুসারে রূপদুটি একই রূপকল্প এবং {অন}। 'অ' রূপটি আদিতে ব্যঞ্জনধ্বনি আছে এমন শব্দের সঙ্গে যুক্ত আর 'অন' রূপটি আদিতে স্বরধ্বনিবিশিষ্ট শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত। 'অ' বা 'অন' রূপকল্পটি যে রূপই ধারণ করুক না কেন তার সে শরীর একটি অথবা একাধিক ধ্বনি সমন্বয়ে গঠিত।

২. ধ্বনিকল্পে পরম্পরা যা রূপকল্প হিসেবে নির্দেশিত হবে সেটি ভাষায় পৌনঃপুনিকভাবে ব্যবহৃত হবে। উদাহরণ হিসেবে 'সততা', 'পূর্ণতা', 'সামাজিকতা', 'প্রতিযোগিতা' প্রভৃতি শব্দগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে। এখানে প্রতিটি শব্দেই 'তা' নামক একটি উপাদান যুক্ত হয়েছে যাকে আগেই একটি রূপকল্প হিসেবে

চিহ্নিত করা হয়েছে যার অর্থ বিমূর্তবাচক বিশেষ্য গঠনগত উপাদান। 'তা' নামক উপাদানটি এই ধরনের বহু বিশেষণ শব্দের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। তাই উপাদানটি পৌনঃপুনিক বা recurrent। যদিও ভাষায় এমন কিছু উপাদান থাকতে পারে যেগুলো একক পরিবেশেই ব্যবহৃত হয়।

৩. রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত এককের একটা অর্থ থাকবে। যেমন 'তা' নামক রূপকল্পটির অর্থ 'বিশেষ্য বাচকতা'। ভাষায় একই ধ্বনিকল্পের পরম্পরা পৃথক রূপকল্প হিসেবে বিবেচিত হয়। যদি তার অর্থ ভিন্ন হয় যেমন 'কর্তা', 'দাতা', 'জ্ঞাতা', 'ভর্তা' জাতীয় শব্দেও 'তা' নামক একটি উপাদান আছে (দা + তা = দাতা, জ্ঞা + তা = জ্ঞাতা, কর + তা = কর্তা, ভৃ + তা = ভর্তা) যার অর্থ 'ক্রিয়ার কারক'। তাহলে বোঝা যাচ্ছে একই ধ্বনিকল্পের পরম্পরা হলেও সেগুলি যে একই রূপকল্প হবে তা নাও হাতে পারে, যেমন এখানে দুটি 'তা' রূপকল্পের সন্ধান পাওয়া গেল, একটির অর্থ 'বিশেষ্যবাচকতা' এবং অন্যটি 'ক্রিয়ার কর্তা'। আবার 'তা যে সবসময় অর্থপূর্ণ হবে তা নাও হতে পারে। যেমন 'লতা', 'পাতা' প্রভৃতি শব্দে 'তা' অংশটি বর্তমান থাকলেও সেটির কোনো অর্থ নেই এবং খণ্ডটি বিশ্লেষণযোগ্যও নয়।

রূপকল্প এবং অক্ষরের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হতে পারে যেহেতু দুটিই ক্ষুদ্রতম উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। রূপকল্প এবং অক্ষর ক্ষুদ্রতম একক হিসেবে বিবেচিত হলেও প্রথমটি যখন শব্দের ক্ষুদ্রতম একক দ্বিতীয়টি তখন উচ্চারণের ক্ষুদ্রতম একক। রূপকল্পের প্রাথমিক শর্ত হল, এটির একটি অর্থ থাকতে হবে। অক্ষরের ক্ষেত্রে অর্থ বিবেচ্য নয়। শ্বাসের একক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনিসমবায়ই অক্ষর হিসেবে চিহ্নিত হয়। যেমন—'লতা' শব্দ দুটি অক্ষরের সমন্বয়—'ল' এবং 'তা' যেগুলির কোনোও অর্থবোধকতা নেই। রূপকল্প একক বা একাধিক অক্ষরের সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে। 'প্রণাম' শব্দে 'প্র' একটি অক্ষর এবং একটি রূপমূলও বটে যার অর্থ 'প্রকৃষ্ট'। কিন্তু 'লতা' শব্দটি দুটি অক্ষর নিয়ে গঠিত হলেও একটিমাত্র রূপকল্প যেহেতু শব্দটি অর্থগত দিক দিয়ে বিশ্লেষণযোগ্য নয়। তাই অক্ষর যখন একটি উচ্চারণগত একক রূপকল্প একটি অর্থগত একক। কখনও কখনও অক্ষর এবং রূপকল্প একই চেহারা নিয়ে প্রকটিত হলেও এই দুই সত্তার মিলে যাওয়া ব্যতিক্রম মাত্র। যেমন 'প্রণাম' শব্দের 'প্র' কিংবা 'অবিচার' শব্দের 'অ' অক্ষর এবং রূপমূল দুই-ই যদিও 'অ' বা 'প্র' এর অক্ষরগত ও রূপকল্পগত সত্তা ভিন্ন মাত্রায় বিবেচিত হয়।

রূপকল্প এবং শব্দের পারস্পরিক সম্পর্কটিও আলোচনা সাপেক্ষ। রূপকল্প এবং শব্দ উভয়ই অর্থগত একক হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। রূপকল্প ভাষায় স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে আবার নাও হতে পারে। যেমন 'লতা', 'লোক' বা 'মানুষ' জাতীয় শব্দ এক একটি রূপকল্প যেহেতু এগুলির প্রত্যেকের এক একটি অখণ্ড সত্বা রয়েছে এবং একটি অর্থও রয়েছে। আবার 'অবিচার', 'অকথ্য', 'অকাজ', জাতীয় শব্দে 'অ' নামক উপাদানটি একটি রূপকল্প যেহেতু এর একটি নির্দিষ্ট অর্থ আছে। কিন্তু ভাষায় এর কোনোও স্বাধীন অস্তিত্ব নেই যেহেতু অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে এটি ভাষায় ব্যবহৃত হতে পারে না। তাই এটি একটি বদ্ধ রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত হয়। অন্যদিকে শব্দ সবসময়ই স্বাধীনভাবে ভাষায় ব্যবহৃত হয় এবং এর একটি অর্থ থাকে। শব্দ যখন মৌলিক, সাধিত এবং যৌগিক রূপ পরিগ্রহ করে রূপকল্প তখন স্বাধীন অথবা বদ্ধ বলে চিহ্নায়িত হয়। যে সব রূপকল্প স্বাধীনভাবে বাক্যে প্রযুক্ত হয় সেগুলি শব্দ হিসেবে গণ্য হতে পারে আর যেসব রূপকল্প স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় না সেগুলি শব্দ হিসেবে গণ্য নয়।

বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী রূপকল্পের বিভিন্ন ধরনের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। প্রাথমিকভাবে রূপকল্পকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়—স্বাধীন রূপমূল বা মুক্ত রূপকল্প এবং পরাধীন বা বদ্ধ রূপকল্প। যে সমস্ত রূপকল্প ভাষায় স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় সেগুলিকে স্বাধীন বা মুক্ত রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। যেমন—পাখি, নদী, লতা, লাল, সাদা, কালো প্রভৃতি। অর্থাৎ যে রূপকল্প অন্য রূপকল্পের সাহায্য ছাড়াই ভাষায় ব্যবহৃত

হতে পারে, যার নিজস্ব অর্থ রয়েছে, যেটির একটি নির্দিষ্ট ধ্বনি শরীর বর্তমান, যেটি ক্ষুদ্রতম অংশে বিভাজ্য নয় তাকে স্বাধীন বা মুক্ত রূপকল্প বলে। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (১৯৯৭ : ৩০৪—৩০৫) মুক্ত বা স্বাধীন রূপকল্পের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ্য করেছেন :

ক. মুক্ত রূপকল্প অন্য রূপকল্পের সাহায্য ব্যতীত স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়;

খ. মুক্ত রূপকল্পের অর্থদ্যোতক গুণ বর্তমান;

গ. মুক্ত রূপকল্পের গঠনের যে আকৃতি বিদ্যমান, তার চেয়ে ছোট অংশে বিভাজ্য নয়।

পরাধীন বা বদ্ধ রূপকল্পের নিজস্ব অর্থ আছে এবং ক্ষুদ্রতর অংশে বিভাজ্য নয়। কিন্তু এগুলি স্বাধীনভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। কেবলমাত্র অন্য রূপকল্পের সঙ্গে যুক্তভাবে এগুলি ব্যবহৃত হতে পারে। কখনও মুক্ত রূপকল্পের সঙ্গে যুক্ত আকারে আবার কখনও বা অন্য একটি পরাধীন বা বদ্ধ রূপকল্পের সঙ্গে যুক্ত আকারে এগুলিকে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন—‘প্রণাম’, ‘অনাচার’, ‘অনুল্লেখ’, ‘অপরূপ’, জাতীয় শব্দে ‘প্র’, ‘অন্’, ‘অপ’ প্রভৃতি উপাদানগুলি স্বাধীন বা মুক্ত রূপকল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আবার ‘প্রবাদ’, ‘বিবাদ’ প্রভৃতি শব্দে দুটি উপাদানই (‘প্র’ এবং ‘বাদ্’, ‘বি’ এবং ‘বাদ’) পরাধীন বা বদ্ধ, যেহেতু এগুলির কোনোওটিই স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না, দুটি রূপকল্পের সহাবস্থানে একটি স্বাধীন শব্দ তৈরি হয়ে যায়। বাংলায় ‘রা’, ‘গুলো’, ‘দিগ’, ‘অ’, ‘অন্’ প্রভৃতি উপাদানগুলি (ছেলেরা, ছেলেগুলো, অগণ্য, অনালোকিত, আমাদিকে প্রভৃতি শব্দে) পরাধীন বা বদ্ধ রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত।

কোনোও কোনোও ভাষাবিজ্ঞানী রূপকল্পকে বিভাজিত এবং অতিরিক্ত এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যে রূপকল্প ধ্বনি সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং গঠনে স্বরাঘাত, মীড়, যতির কোনোও ভূমিকা থাকে না সেগুলি বিভাজিত রূপকল্প বলে পরিচিত অর্থাৎ ধ্বনি দিয়ে গঠিত রূপকল্পই বিভাজিত রূপকল্প। আর যে রূপকল্প গঠনে বিভাজিত রূপকল্পের উপর স্বরাঘাত, মীড়, যতির অন্তর্ভুক্তির সাহায্যে সমশ্রেণির বিভাজিত রূপকল্পের অর্থগত পার্থক্য নির্দেশিত হয় সেগুলি অতিরিক্ত রূপকল্প বলে পরিচিত। যেমন—পাগল এবং পা + গোল, কবিতা এবং কবি + তা, চানা এবং চা + না, খানা এবং খা + না। প্রতিটি শব্দযুগ্মের প্রথম সদস্য বিভাজিত রূপকল্প এবং দ্বিতীয় সদশ্যে বিভাজিত রূপকল্পের উপর অতিরিক্ত রূপকল্পের প্রভাবজাত অর্থপার্থক্য বর্তমান।

রূপকল্পের প্রয়োগ অনুসারে রূপকল্পকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে—সাধিত রূপকল্প এবং সম্প্রসারিত রূপকল্প। যে রূপকল্প নতুন ধরনের শব্দসাধনে সহায়তা করে তা সাধিত রূপকল্প হিসেবে পরিচিত। যেমন—‘-ইক্’, ‘-তা’, ‘বে-’, ‘-ই’ প্রভৃতি রূপকল্পগুলি সাধিত রূপকল্প। কারণ এই উপাদানগুলি নতুন শব্দ সৃজনে সহায়তা করে। যেমন—সমাজ থেকে সামাজিক, কৃতকার্য থেকে কৃতকার্যতা, হিসাবি থেকে বেহিসাবি, দেশ থেকে দিশি।

যে রূপকল্প ব্যাকরণিক সম্পর্ক প্রকাশে সহায়তা করে বা যে রূপকল্পের সংযুক্তির মাধ্যমে ক্রিয়ার কাল, বচন, পক্ষ, শব্দের কারক, তুলনার মান প্রকাশিত হয় সেই রূপকল্পকে সম্প্রসারিত রূপকল্প বলে। যেমন—

কর + এ = করে	রাম + এর = রামের
দেখ + এ = দেখে	রাম + কে = রামকে

+ চিহ্নের পরস্থিত রূপকল্পগুলি ব্যাকরণিক সম্পর্ক প্রকাশক এবং সম্প্রসারিত রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত।

গঠনগত দিক থেকে সম্প্রসারিত ও সাধিত রূপকল্পের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। (মোরশেদ ১৯৯৭ : ৩২০)

ক. সম্প্রসারিত রূপকল্পের তুলনায় সাধিত রূপকল্প ব্যবহারগতভাবে বিস্তৃত নয়। ভাষায় ব্যবহৃত প্রত্যেকটির বিশেষের সঙ্গে সম্প্রসারিত রূপকল্প যুক্ত হতে পারে, কিন্তু বিশেষ্যমূলক বা বিশেষণমূলক রূপকল্পের সঙ্গে প্রত্যয় বিভক্তি সংযুক্তির মাধ্যমে অল্পসংখ্যক বিশেষ্য বিশেষণে বা বিশেষণ বিশেষ্যে পরিণত হতে পারে।

খ. একটি রূপকল্পের সঙ্গে একই সঙ্গে একাধিক সাধিত রূপকল্প সংযুক্ত হতে পারে। যেমন— সমাজ—সামাজিক—সামাজিকতা। এখানে 'সমাজ' এই মৌলিক রূপকল্পটির সঙ্গে বিশেষণীয় রূপকল্প 'ইক্' যেমন যুক্ত হয়েছে (সামাজিক) তেমনি আবার বিমূর্ত বিশেষ্যবাচক 'তা' রূপকল্পও যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ মৌলিক রূপকল্পের সঙ্গে একাধিক সাধিত রূপকল্প যুক্ত হতে পারে। কিন্তু মৌলিক রূপকল্পের সঙ্গে একাধিক সম্প্রসারিত রূপকল্প যুক্ত হতে পারে না। যেমন—'রাম' এই রূপকল্পটির সঙ্গে সম্বন্ধবাচক 'এর' যুক্ত হলে (রামের) অন্য কোনোও সম্প্রসারিত রূপকল্প আর যুক্ত হবে না।

গ. সাধিত রূপকল্প যখন একটি উন্মুক্ত বর্গ সম্প্রসারিত রূপকল্প একটি বদ্ধ বর্গ। অর্থাৎ একটি সাধিত রূপকল্পের সঙ্গে যেমন আর একটি সাধিত রূপকল্প যুক্ত হতে পারে (যেমন, সামাজিকতা) তেমনি সাধিত রূপকল্প যুক্ত হওয়ার পরে সম্প্রসারিত রূপকল্প যুক্ত হতে পারে (যেমন—সততার = সততা + সম্বন্ধ বাচক সম্প্রসারিত রূপকল্প-'র')। কিন্তু মৌলিক রূপকল্পের সঙ্গে একবার সম্প্রসারিত রূপকল্প যুক্ত হলে অন্য কোনো রূপকল্প (সাধিত অথবা সম্প্রসারিত) যুক্ত হতে পারে না।

৪.২.৫.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। রূপকল্পের উদ্দেশ্য কী?

২। রূপকল্প বলতে কী বোঝ?

৩। রূপকল্পের সজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

৪। স্বাধীন রূপকল্পের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

৫। সাধিত রূপকল্প বলতে কী বোঝ?

৪.২.৫.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা – রামেশ্বর শ।

২। ভাষা বর্ণনার স্তর – প্রবাল দাশগুপ্ত।

৩। আধুনিক ভাষাতত্ত্ব – আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ।

৪। ভাষাবিজ্ঞান ঞ্জ তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ – অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস।

৫। প্রসঙ্গ ঞ্জ বাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড) – অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস।

একক - ৬
রূপকল্পের বিশ্লেষণ

বিন্যাস ক্রম :

৪.২.৬.১ : রূপকল্পের বিশ্লেষণ
৪.২.৬.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি
৪.২.৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪.২.৬.১ : রূপকল্পের বিশ্লেষণ

আগেই বলা হয়েছে রূপকল্পের দুটি সত্তা—স্বাধীন বা মুক্ত এবং পরাধীন বা বদ্ধ। স্বাধীন বা মুক্তরূপকল্পের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সমস্যা নেই কারণ সেগুলি অন্য রূপকল্পের সাহায্য ছাড়াই স্বাধীনভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। এগুলির স্বাধীন অর্থও যেমন বর্তমান [আন্বয়িক শব্দ (রূপকল্প) ব্যবহার অনুযায়ী অর্থ পরিগ্রহ করে]। তেমনি এগুলি অখণ্ড। পরাধীন বা বদ্ধরূপকল্প বিশ্লেষণই রূপতত্ত্বের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে যেহেতু এগুলি অন্য রূপকল্পের সহযোগে ব্যবহৃত হয়। প্রথাগত ব্যাকরণে নির্দেশিত উপসর্গ, প্রত্যয়, বিভক্তি এই ধরনের রূপকল্পের আওতায় পড়ে। এই ধরনের রূপকল্প বিশ্লেষণে দুটি শর্ত বিশেষ জরুরি—এক, বিশ্লিষ্ট উপাদান শব্দসাধনে সহায়তা করে কিনা তা দেখা দরকার; দুই, বিশ্লিষ্ট উপাদানটি ব্যাকরণিক সম্পর্ক প্রকাশে সহায়তা করে কিনা দেখা দরকার; তিন, বিশ্লিষ্ট উপাদানটির নির্দিষ্ট অর্থ আছে কিনা দেখা দরকার; চার, বিশ্লিষ্ট উপাদানটি একাধিক সংযোগে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা দেখা দরকার। এই চারটি শর্ত যদি পূরণ করে তাহলে যে-কোনো উপাদানকে রূপকল্প বলে চিহ্নিত করা যায়। যদিও ভূমিকা অনুসারে শব্দসাধন ও শব্দসম্প্রসারণকে দুটি আলাদা শর্তে (এখানে, এক, এবং দুই-সংখ্যক শর্ত) ভাগ করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে নীচের দুটি স্তম্ভ আলোচনা করা যেতে পারে—

১.	অন্যায্য (অ + ন্যায্য)	২.	করছি (কোর + ছ + ই)
	অনিষ্ট (অন + ইষ্ট)		করি (কোর + ই)
	বেআব্রু (বে + আব্রু)		করলাম (কোর + ল + আম)
	গরমিল (গর + মিল)		ঘরে (ঘর + এ)
	যোগান্দার (যোগান + দার)		আমায় (আমা + এ)
	নৈতিক (নীতি + ইক্)		দুধের (দুধ + এর)
	বৈবাহিক (বিবাহ + ইক্)		লোকে (লোক + এ)
	মানসিক (মানস + ইক্)		
	ছেলেমি (ছেলে + মি)		
	দুরন্তপনা (দুরন্ত + পনা)		
	নোন্তা (নুন + তা)		

এক সংখ্যক স্তম্ভে চিহ্নিত শব্দগুলিতে বিভিন্ন ধরনের পরাধীন বা বদ্ধ উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে— অ-, অন্-, বে-, গর-, -দার, -ই, -মি, -পনা, -তা। অ-, অন-, বে-, গর- প্রভৃতি উপাদানগুলি স্বাধীন রূপকল্পের আগে বসে নঞর্থক বা অভাব অর্থ প্রকাশ করে। -দার, -ইক্, -মি, -পনা, -তা প্রভৃতি উপাদানগুলি স্বাধীন রূপকল্পের পরে বসে হয় আর একটি বিশেষ্য তৈরি করছে (যোগান্দার, ছেলেমি, দুরন্তপনা) অথবা '-ইক্' বা '-তা'-যোগ করে বিশেষণ পদ তৈরি হচ্ছে। এক্ষেত্রে পূর্বোক্ত উপাদানগুলি পরাধীন বা বদ্ধ রূপকল্প যেহেতু এগুলির নতুন শব্দ তৈরি করায় ভূমিকা আছে, একটি নির্দিষ্ট অর্থ আছে এবং একাধিক সংযোগে বসার যোগ্যতা আছে।

দুই সংখ্যক স্তম্ভে -ছ, -ই, -ল, আম, -এ, -এর উপাদানগুলি ব্যাকরণিক সম্পর্ক প্রকাশ করছে। -ছ প্রকারবাচক উপাদান, ক্রিয়াপদের ঘটমানতা প্রকাশ করছে, -ল কালবাচক উপাদান অতীত কাল বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, -ই এবং -আম পক্ষবাচক উপাদান-প্রথম পক্ষ (পুরুষ) বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, -এ অধিকরণ কারকবাচক উপাদান (ঘরে), -এ গৌণকর্মের প্রকাশক, -এ অনির্দিষ্ট কর্তার চিহ্ন এবং -এর সম্বন্ধের প্রকাশক। এই উপাদানগুলি সবকটি অন্য উপাদানের সহযোগ ছাড়া ব্যবহৃত হতে পারে না, ব্যাকরণিক সম্পর্ক প্রকাশে নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে এবং অখণ্ড। এগুলি পরাধীন বা বদ্ধ রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত।

৪.২.৬.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। রূপকল্পের সংজ্ঞা দাও।

২। শর্ত অনুসারে রূপকল্পের বিশ্লেষণ করো দেখাও।

৩। উদাহরণসহ রূপকল্পের বিশ্লেষণ করো।

৪। বাংলা রূপতত্ত্বে রূপকল্পের গুরুত্ব নির্ণয় করো।

৪.২.৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। প্রসঙ্গ ঃ বাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড) – অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস।

২। ভাষাবিজ্ঞান ঃ তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ – অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস।

৩। ভাষার ইতিবৃত্ত – সুকুমার সেন।

৪। ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ – সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

একক - ৭

রূপকল্প সনাক্তকরণ ও নীদার সূত্র

বিন্যাস ক্রম :

৪.২.৭.১ : রূপকল্প সনাক্তকরণ

৪.২.৭.২ : রূপকল্প সনাক্তকরণ ও নীদার সূত্র

৪.২.৭.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.২.৬.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪.২.৭.১ : রূপকল্প সনাক্তকরণ

রূপকল্প সনাক্তকরণের কতকগুলি পদ্ধতি আছে।

১. যে উপাদানটি রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত হবে সেটি যে-কোনো সংযোগেই ধ্বনি শরীরে সমতা বজায় থাকবে। যেমন—পেটুক, মেঘলা, লালচে প্রভৃতি শব্দে -উক, -লা, -চে উপাদানগুলি। এগুলি যে-কোনো অবস্থানেই নিজস্ব চেহারা বজায় রাখে। এগুলি পৃথক রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত হবে। একই চেহারা ছাড়াও অর্থ ও ভূমিকা অনুসারে এগুলি একই থাকে, অর্থাৎ উপাদানগুলি বিশেষণ শব্দ তৈরি করে।

২. অর্থ এক থাকা সত্ত্বেও কখনো কখনো দেখা যায় একাধিক উপাদানের মধ্যে ধ্বনি শরীরে পার্থক্য থাকে। উদাহরণ হিসেবে নিম্নলিখিত স্তম্ভগুলি আলোচনা করা যেতে পারে—

১. অকাজ (অ + কাজ)	২. সম্প্রচার (সম + প্রচার)
অকথ্য (অ + কথ্য)	সম্বুদ্ধ (সম + বুদ্ধ)
অবিচার (অ + বিচার)	সন্ত্রাস (সন্ + ত্রাস)
অকর্মা (অ + কর্মা)	সন্দর্শন (সন্ + দর্শন)
অনাচার (অন্ + আচার)	সন্তাপ (সন্ + তাপ)
অনাস্বাদিত (অন্ + আস্বাদিত)	সংকর্ষণ (সং + কর্ষণ)
অনাঘ্রাত (অন্ + আঘ্রাত)	সংঘাত (সং + ঘাত)

এক সংখ্যক স্তম্ভে চিহ্নিত শব্দগুলিতে আদি অবস্থানে দুধরনের উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে—'অ' এবং 'অন্'। দুটি উপাদানের অর্থ এক, অর্থাৎ নঞর্থক। কিন্তু ধ্বনি শরীরে তফাৎ বর্তমান—প্রথমটি শুধুমাত্র স্বরধ্বনি এবং দ্বিতীয়টি স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির সমবায়ে গঠিত। গঠনগত দিক থেকে তফাৎ থাকলেও এই দুটি উপাদানকে একই বলে চিহ্নিত করা যায় যেহেতু ব্যবহারের মধ্যে শর্তসাপেক্ষতা রয়েছে। অর্থাৎ 'অ'-উপাদানটি যুক্ত হয় আদিতে ব্যঞ্জনবিশিষ্ট শব্দের সঙ্গে এবং 'অন্'-উপাদানটি ব্যবহৃত হয় আদিতে স্বরধ্বনিবিশিষ্ট শব্দতে। অর্থাৎ ব্যবহারগত দিক থেকে বা অবস্থানগত দিক থেকে উপাদান দুটির মধ্যে শর্তসাপেক্ষতা বর্তমান। তাই উপাদান দুটি একই রূপকল্পের দুটি রূপবিকল্প বা উপরূপ বা সহরূপ বলে চিহ্নিত হয়।

৩. কখনো কখনো কিছু উপাদানের মধ্যে অর্থগত মিল থাকলেও ধ্বনি শরীরে তফাৎ থাকে কিন্তু এই তফাৎ ধ্বনিগত দিকে থেকে ব্যাখ্যা করা যায় না অর্থাৎ এগুলির মধ্যে ধ্বনিতাত্ত্বিক শর্তসাপেক্ষতা থাকে না। শর্তসাপেক্ষতা না থাকলেও রূপতাত্ত্বিক অবস্থান অনুসারে, উপাদানগুলিকে একই অর্থবিশিষ্ট বলে একটি রূপকল্পের সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বাংলা স্ত্রীলিঙ্গবাচক উপাদানগুলি নেওয়া যেতে পারে। 'বৃদ্ধা', 'বুড়ি', 'বেদেনি', 'গোয়ালিনী', 'গায়িকা', 'নায়িকা' শব্দগুলি ধরা যাক। প্রথম শব্দটিতে -আ, দ্বিতীয় শব্দটিতে -ই, তৃতীয় শব্দটিতে -নি, চতুর্থ শব্দটিতে -আনী/ইনী, এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ শব্দ দুটিতে -ই~আ উপাদানগুলি ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই ব্যবহার শব্দকেন্দ্রিক , ধ্বনিতাত্ত্বিক শর্তসাপেক্ষতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই ধরনের ব্যবহারকে রূপতাত্ত্বিক শর্তসাপেক্ষতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। কোনো উপাদানের ব্যবহার যদি রূপকল্প-কেন্দ্রিক হয় বা রূপকল্পের উপর নির্ভর করে তাকে রূপতাত্ত্বিক শর্তসাপেক্ষতা বা Morphological conditioning বলে। এই ধরনের উপাদানগুলিও একই রূপকল্পের ব্যতিক্রমী সদস্য বা রূপবিকল্প হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। প্রসঙ্গত রূপকল্পের ব্যতিক্রমী সদস্যকে রূপবিকল্প বা সহরূপ বা উপরূপ বলে।

৪. অবস্থান অনুসারে ভিন্ন রূপকল্প বিরোধের সম্পর্কে (Contrast) অবস্থান করে। উদাহরণ হিসেবে

দেশ

দেশের

দেশকে

দেশে

শব্দগুলি নেওয়া যেতে পারে। স্তম্ভে প্রদত্ত শব্দগুলিতে শেষের উপাদান হিসেবে -এর, -কে, -এ, একই অবস্থানে অর্থাৎ 'দেশ' রূপকল্পের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে অর্থাৎ যেখানে -'এর' ব্যবহৃত হয় সেখানেই -'কে' অথবা '-এ' ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা রাখে এবং প্রত্যেকটি উপাদানের পৃথক ব্যাকরণিক ভূমিকা রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি উপাদান পৃথক রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত হবে। সংক্ষেপে রূপকল্প শনাক্তকরণের শর্তগুলি নির্দেশ করা যেতে পারে—

ক. উচ্চারণ এক অথবা ভিন্ন;

খ. উচ্চারণ ভিন্ন হলে ধ্বনিতাত্ত্বিক অথবা রূপতাত্ত্বিক শর্তসাপেক্ষতা থাকবে;

গ. অর্থ অভিন্ন;

ঘ. পৃথক রূপমূলের বৈপরীত্যের সম্পর্ক।

কখনো কখনো একই ধ্বনিশরীর বিশিষ্ট কিছু রূপ পাওয়া গেলেও অর্থের ভিন্নতা হেতু রূপগুলিকে ভিন্ন রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই ধরনের রূপকল্পগুলিকে সমধ্বনি রূপকল্প বা Homophonous morpheme বলে।

৪.২.৭.২ : রূপকল্প সনাক্তকরণ ও নীদার সূত্র

ভাষাবিজ্ঞানী নীদা (E. A. Nida) রূপকল্প সনাক্তকরণের মাপকাঠি হিসেবে বিশ শতকের চারের দশকের শেষ ভাগে ছয়টি সূত্র নির্দেশ করেন। [Eugene A. Nida, 'The Identification of Morphemes.' *Language,* 24, 1944, pp, 414-441]

১. বচনসমূহের কিছু অংশ থাকবে যেগুলো একই রকম ধ্বনি বা ধ্বনি সমন্বয়ে গঠিত এবং একই অর্থ প্রকাশ করে সেগুলি এক একটি অভিন্ন রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত হবে। যেমন— -দাল, -পনা, -মি, -ইক্।

২. বচনের কিছু অংশ থাকবে যেগুলি একই অর্থ প্রকাশ করলেও গঠনগত দিক থেকে ভিন্ন। এই ভিন্নতা যদি ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক থেকে ব্যাখ্যাযোগ্য হয় তবে উপাদানগুলি অভিন্ন অর্থাৎ একই রূপকল্পের অংশ হিসেবে চিহ্নিত হবে। যেমন— 'অ'-, 'অন্'- জাতীয় উপাদান (অবিচার, অনাচার জাতীয় শব্দ) অভিন্ন বলে বিবেচিত যেহেতু দুটি রূপই একই অর্থ প্রকাশ করে এবং গঠনগত ভিন্নতা ধ্বনিতাত্ত্বিক শর্তসাপেক্ষতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়—আদিতে ব্যঞ্জনবিশিষ্ট শব্দের সঙ্গে 'অ'- এবং স্বরধ্বনি বিশিষ্ট শব্দের সঙ্গে 'অন'-। অর্থাৎ 'অ'- এবং 'অন'- একই রূপকল্পের দুই ব্যতিক্রমী সদস্য অর্থাৎ দুটি রূপবিকল্প।

৩. বচনের কিছু অংশ একই অর্থ প্রকাশ করলেও যদি ধ্বনিগত দিক থেকে ব্যাখ্যা করা না যায় এবং সেগুলো যদি পূরক অবস্থানের (Complementary distribution) শর্ত পূরণ করে তবে উপাদানগুলিকে একই রূপকল্পের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা হবে। বাংলা স্ত্রীলিঙ্গবাচক উপাদানগুলিকে উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। উপাদানগুলি যেভাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন—বৃদ্ধা (বৃদ্ধ + আ), স্ত্রী (-ঈ), বেদেনি (বেদে + নি), সাধিকা (সাধক + ই + আ) তাতে এমন কোনো ইঙ্গিত থাকে না যাতে করে বলা যেতে পারে এই উপাদানগুলির মধ্যে ধ্বনিতাত্ত্বিক শর্তসাপেক্ষতা আছে। এই ধরনের ব্যবহার রূপকল্পকেন্দ্রিক এবং উপাদানগুলিকে একই রূপকল্পের সদস্য হিসেবে ধরা হয়।

৪. বচনের কোনো কোনো অংশে অবয়বগত পার্থক্য থাকতে পারে। এই অবয়বগত পার্থক্য যেমন ধ্বনিমূলক হতে পারে আবার শূন্য ধ্বনিমূলও হতে পারে। ধ্বনিমূলকের সঙ্গে শূন্য ধ্বনিমূলক যখন সমরূপতা প্রতিষ্ঠা করে তখন এই শূন্য ধ্বনিমূলক গঠনকে শূন্য রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উদাহরণ হিসেবে নিম্নলিখিত বাক্য দুটি নেওয়া যেতে পারে—

সে ঘরে আছে।

সে বাড়ি গেল।

বাক্য দুটিতে এক জায়গায় 'ঘরে' শব্দের সঙ্গে অধিকরণের রূপকল্প '-এ' ব্যবহৃত হয়েছে, দ্বিতীয় বাক্যে 'বাড়ি' শব্দে অধিকরণবাচক শূন্য চিহ্ন (ϕ) ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু দুটি ক্ষেত্রেই অধিকরণের অর্থ প্রকাশিত অথচ শব্দদুটির আনুষ্ঠানিক পার্থক্য এক জায়গায় ধ্বনিমূলক রূপকল্পের মাধ্যমে প্রকাশিত অন্যটিতে ধ্বনিমূলক রূপকল্পের অবর্তমানতার দ্বারা সেই সম্পর্ক প্রকাশিত সেহেতু দ্বিতীয় বাক্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী উপাদানটি শূন্য রূপকল্প হিসেবে বিবেচ্য।

৫. নিম্নরূপ শর্তে একাধিক সমধ্বনিমূলক রূপকে ভিন্ন রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত করা যায়—

ক. সমধ্বনিমূলক রূপ যদি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে তাহলে রূপগুলি ভিন্ন রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত হবে। যেমন—বাংলায় '-তা' গঠনটি। এই গঠনটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন—

কর্তা	সততা
দাতা	জনপ্রিয়তা
ভর্তা	মাদকতা
	সচ্ছলতা

দুটি স্তম্ভেই '-তা' নামক উপাদান ব্যবহৃত হলেও এবং একই ধ্বনির সমন্বয়ে গঠিত হলেও প্রথম স্তম্ভে যখন ক্রিয়ার 'কর্তা'-র অর্থ প্রকাশ করে তখন দ্বিতীয় স্তম্ভে প্রদত্ত শব্দগুলিতে বিমূর্ত বিশেষ্যের অর্থ প্রকাশিত হয়। ধ্বনিগত গঠন এক হওয়া সত্ত্বেও অর্থগত পার্থক্য এগুলিকে ভিন্ন রূপকল্পে পরিণত করে।

খ. সমধ্বনিমূলক যে সকল রূপের অর্থ 'পরস্পর সম্পর্কযুক্ত' সেগুলিকে অভিন্ন রূপকল্প হিসেবে ধরা হবে যদি আর্থশ্রেণি বৈশিষ্ট্য অবস্থানগত পার্থক্যের সঙ্গে সমান্তরাল হয়। সমান্তরাল না হলে সেগুলো ভিন্ন রূপমূল হিসেবে চিহ্নিত হবে। যেমন—কাল 'সময় বা দিন'

কাল 'সর্বনাশ'

এগুলি পৃথক রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত।

৬. পরিবেশ সাপেক্ষে একটি রূপকল্প পৃথকভাবে চিহ্নিত হতে পারে ঃ

ক. সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বা সতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হলে স্বাধীন বা মুক্ত রূপকল্পতা;

খ. রূপকল্প বিভিন্ন সমন্বয়ে ব্যবহৃত হতে পারে—এভাবে ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও অন্তত একটি সমন্বয়ে বা অন্যান্য সমন্বয়ে তা সতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হলে পরাধীন বা বদ্ধরূপকল্পতা;

গ. কোনো একক সমন্বয়ে ব্যবহৃত হলেও তা রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে অনন্য রূপকল্প যা (Unique morpheme)। তবে যে উপাদানটির সঙ্গে ব্যবহৃত হবে তা বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করতে পারে অথবা অন্য কোনো উপাদানের সমন্বয়ে থাকলে তা সতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হতে হবে। এই ধরনের রূপকল্প বাংলায় খুবই কম।

[বিস্তৃত পাঠের জন্য দ্রঃ মহম্মদ দানীউল হক্, ভাষার কথা : ভাষাবিজ্ঞান। ঢাকা : করিম বুক কর্পোরেশন, ১৯৯৩, পৃ: ১৪৯-১৫২]

৪.২.৭.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। রূপকল্প সনাক্তকরণ পদ্ধতিগুলি সূত্রানুসারে লেখো

২। সূত্রানুসারে রূপকল্পের সনাক্তকরণ করো।

৩। রূপকল্প সনাক্তকরণে নীদার সূত্রটি নির্দেশ করো।

৪.২.৭.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। প্রসঙ্গ ঞ্জ বাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড) – অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস।

২। ভাষাবিজ্ঞান ঞ্জ তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ – অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস।

৩। ভাষার ইতিবৃত্ত – সুকুমার সেন।

৪। ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ – সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

একক - ৮

বাংলা মরফেমের মূলসূত্র

বিন্যাস ক্রম :

৪.২.৮.১ : ভূমিকা

৪.২.৮.২ : বচন

৪.২.৮.৩ : লিঙ্গ

৪.২.৮.৪ : কারক

৪.২.৮.৫ : ক্রিয়াপদ

- ৪.২.৮.৫.১ : ক্রিয়ার কাল
- ৪.২.৮.৫.২ : ক্রিয়ার প্রকার
- ৪.২.৮.৫.৩ : ক্রিয়ার পক্ষ (পুরুষ) বাচক বিভক্তি
- ৪.২.৮.৫.৪ : যুক্তক্রিয়া—যৌগিকক্রিয়া-সংযোগমূলক ক্রিয়া
- ৪.২.৮.৫.৫ : অসমাপিকা ক্রিয়ারূপ
- ৪.২.৮.৫.৬ : ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য

৪.২.৮.৬ : সারসংক্ষেপ

৪.২.৮.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.২.৮.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪.২.৮.১ : ভূমিকা

বাংলা শব্দের গঠনে এবং বাংলা শব্দ যখন বাক্যে প্রযুক্ত হয় তখন তার রূপবৈচিত্র্য এই পর্যায়ে আলোচিত হবে। বাংলা শব্দ যেমন একটিমাত্র রূপকল্প নিয়ে তৈরি হতে পারে তেমনি একাধিক রূপকল্প নিয়েও তৈরি হতে পারে। গঠন অনুসারে প্রথাগত ব্যাকরণে বাংলা শব্দকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়—মৌলিক, জটিল এবং যৌগিক শব্দ। মৌলিক শব্দ একটিমাত্র রূপকল্পের সহযোগে গঠিত হয়। যেমন—মানুষ, গরু, লোক, পাখি, আকাশ, জল প্রভৃতি। জটিল শব্দ একটি স্বাধীন রূপকল্প এবং একটি পরাধীন বা বদ্ধকল্পের সহযোগে তৈরি হয়। যেমন—অনাদর (অন্ + আদর), গরমিল (গর + মিল), নাবালক (না + বালক), নিখুঁত (নি + খুঁত) প্রভৃতি। যৌগিক শব্দ দুটি বা দুই-এর অধিক স্বাধীন বা মুক্ত রূপকল্পের সহযোগে গঠিত হয়। যেমন—গাঙচিল (গাঙ + চিল), নজরুলগীতি (নজরুল + গীতি), রবীন্দ্রসংগীত (রবীন্দ্র + সংগীত)।

দুটি বদ্ধ বা পরাধীন রূপকল্পের সহযোগও জটিল শব্দ তৈরি হতে পারে, যেমন—গমন (গম্ + অন্), বিবাদ (বি + বাদ), প্রবাদ (প্র + বাদ্) প্রভৃতি। জটিল শব্দকে সাধিত শব্দ বলেও চিহ্নিত করা হয় যেহেতু সাধিত রূপকল্পের সহযোগে শব্দটি তৈরি হয়।

অনেক সময় মৌলিক শব্দের যে রূপ সে রূপ পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হয়ে সম্প্রসারিত রূপকল্প গ্রহণ করে ব্যাকরণিক সম্পর্ক প্রকাশ করে, যেমন—'আমাকে', 'তোমাকে', 'তাকে'। এই শব্দগুলির স্বাধীন বিকল্প হল 'আমি', 'তুমি', 'সে'। সম্প্রসারিত রূপকল্প গ্রহণ করার জন্য মূল বা স্বাধীন রূপকল্পের এই যে বিকল্প চেহারা তাকে **কাণ্ড** বা **প্রতিপাদিক** বলে। অর্থাৎ সম্প্রসারিত রূপকল্পযুক্ত হওয়ার জন্য স্বাধীন রূপকল্পের এই যে বৈকল্পিক চেহারা তাকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—এক, মূল এবং দুই, কাণ্ড বা প্রাতিপাদিক। মূল রূপকল্প সেগুলিই যেগুলি ব্যাকরণিক সম্পর্ক প্রকাশ করার জন্য সরাসরি রূপকল্প গ্রহণ করে ধ্বনি-শরীরে কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়েই। **কাণ্ড** বা **প্রাতিপাদিক** আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

এবার সম্প্রসারিত রূপকল্পের কথা যার সাহায্যে বচন, কারক, ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপ—কাল, প্রকার, পক্ষ প্রভৃতি প্রকাশিত হয়।

৪.২.৮.২ : বচন

বাংলায় বচন প্রকাশ করার জন্য কয়েকটি রূপকল্প আছে; যেমন—'রা', 'গুলো/গুলি' এবং 'দি' বা 'দিগ'। প্রতিটি রূপকল্পই পরাধীন বা বদ্ধ কারণমুক্ত রূপকল্পের সহযোগ ছাড়া এগুলো ব্যবহৃত হয় না। রূপকল্পগুলির মধ্যে ব্যবহারগত শর্তসাপেক্ষতা রয়েছে; যেমন—মনুষ্যবাচক বিশেষ্য এবং পক্ষবাচক সর্বনামের সঙ্গে 'রা' রূপকল্পটি ব্যবহৃত হয়। যেমন—ছেলেরা (ছেলে + রা), মেয়েরা (মেয়ে + রা), লোকেরা (লোক + এরা), মানুষেরা (মানুষ + এরা) উদাহরণগুলি থেকে 'রা' রূপকল্পের দুটি রূপবিকল্প (উপরূপ বা সহরূপ) চিহ্নিত করা যায় 'রা' এবং 'এরা'। এই দুইটি রূপের মধ্যে ধ্বনিতাত্ত্বিক শর্তসাপেক্ষতা বর্তমান—'রা' এবং 'এরা'। এই দুটি রূপের সঙ্গে এবং 'এরা' যুক্ত হয় ব্যঞ্জনান্ত রূপকল্পের সঙ্গে। অর্থাৎ রূপকল্পটিকে এভাবে চিহ্নিত করা যায়—{-রা~এরা}। 'গুলো' এবং 'গুলি' নির্দেশক বহুবচনবাচক রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত এবং মনুষ্য-অমনুষ্য, প্রাণী-অপ্রাণীবাচক বিশেষ নির্বিশেষে ব্যবহৃত হয়। যেমন—ছেলেগুলো, ছেলেগুলি, মেয়েগুলো, মেয়েগুলি, বইগুলো, ছাগলগুলো প্রভৃতি। 'গুলো' এবং 'গুলি'-র মধ্যে ব্যবহারগত সূক্ষ্ম পার্থক্য বর্তমান। 'গুলো' + রূপকল্পের মাধ্যমে যখন সাধারণ বা তাচ্ছিল্য প্রকাশিত হয়, 'গুলি' রূপটি তখন নৈকট্য বা আদর প্রকাশ করে। তির্যক কারকের প্রতিপাদিকের সঙ্গে 'দি' বা 'দিগ' ব্যবহৃত হয়। তবে 'দিগ' রূপটির পরিবর্তে 'দি' বা 'দ'-ই বেশি ব্যবহৃত হয়। যেমন—'আমাদিগকে', 'আমাদের', 'ছেলেদের' [ছেলে + দ (বহুবচন) + এর]।

উপর্যুক্ত বহুবচনজ্ঞাপক রূপকল্প ছাড়াও 'কুল' (প্রাণিকুল), 'গণ' (প্রজাগণ), 'জাল' (মণিজাল), 'শ্রেণি' (প্রাণিশ্রেণি), 'বর্গ' (নেতৃবর্গ), 'দল' (ছাত্রদল), 'মালা' (আলোকমালা), 'রাশি' (সৈন্যরাশি), 'পাল' (পতঙ্গপাল), 'মণ্ডলী' (দর্শকমণ্ডলী), 'পুঞ্জ' (মেঘপুঞ্জ), 'সমূহ' (বৃক্ষসমূহ), 'মহল' (মহিলামহল) প্রভৃতি উপাদানগুলি তৎসম রূপকল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়। তৎভব বাংলায় এগুলির ব্যবহার নেই।

৪.২.৮.৩ : লিঙ্গ

বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গ প্রকাশক কয়েকটি রূপকল্প রয়েছে যার মধ্যে কয়েকটি তদ্ভব শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয় বাকি রূপকল্পগুলি তৎসম শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। তদ্ভব শব্দের সঙ্গে প্রযুক্ত স্ত্রীলিঙ্গবাচক রূপ দুটি—'ই' এবং 'নি'। যেমন—কাকি, বেটি, বুড়ি, বেদেনি, জেলেনি। তৎসম শব্দের সঙ্গে প্রযুক্ত স্ত্রীলিঙ্গবাচক রূপ তিনটি—'-আ', '-আনি', '-ই ~ আ'। যেমন—বৃদ্ধা, পাঠিকা, নায়িকা, গায়িকা, মাতুলানী।

সংস্কৃতে তিন ধরনের লিঙ্গের অস্তিত্ব ছিল—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ। প্রতিটি লিঙ্গের পৃথক শব্দরূপ ছিল। লিঙ্গ ছিল ব্যাকরণসম্মত অর্থাৎ বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষণের এবং কর্তার সঙ্গে ক্রিয়াপদের লিঙ্গগত অন্বয় ছিল। বাংলায় (তদ্ভব) বিশেষণের রূপ নিয়ন্ত্রণে লিঙ্গের কোনো ভূমিকা নেই। পুরুষবাচক বা স্ত্রীবাচক শব্দের আগে ব্যবহৃত বিশেষণে লিঙ্গের কোনো প্রভাব পড়ে না। যেমন—ভাল ছেলে, ভাল মেয়ে। একমাত্র তৎসম ধারায় স্ত্রীবাচক শব্দের আগে ব্যবহৃত বিশেষণ শব্দে স্ত্রীলিঙ্গের রূপ যুক্ত হয়। যেমন—'সুন্দরী স্ত্রী', কিন্তু বাংলায় 'সুন্দর বউ'। কর্তা এবং ক্রিয়াপদের মধ্যেও কোনো লিঙ্গগত অন্বয় বাংলায় নেই। সংস্কৃতে যেমন পক্ষবাচক ও নির্দেশক সর্বনামের লিঙ্গগত রূপ ছিল—অয়ম্ (পুংলিঙ্গ), ইয়ম্ (স্ত্রীলিঙ্গ), ইদম্ (ক্লীবলিঙ্গ), সঃ (পুংলিঙ্গ, সা (স্ত্রীলিঙ্গ), তৎ (ক্লীবলিঙ্গ) বাংলায় সর্বনামের এই ধরনের কোনো বিভাজন নেই।

৪.২.৮.৪ : কারক

সংস্কৃত ভাষায় যে অর্থে কারক সম্পর্ক প্রকাশ করা হত, অর্থাৎ 'ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্', বাংলায় সেই অর্থে কারক ব্যবহৃত নয় 'পদান্বয়ি কারকম্' বাংলা কারকের মূল অভিমুখ অর্থাৎ সংস্কৃতের মতো শুধুমাত্র ক্রিয়ায় সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেই তা কারকসম্পর্ক বিবেচিত নয়, পদের সঙ্গে পদের সম্পর্কই কারকসম্পর্ক। এই সূত্র অনুযায়ী সংস্কৃতে যখন সম্বন্ধপদ হিসেবে চিহ্নিত, বাংলায় কারক হিসেবে চিহ্নিত। সংস্কৃত ভাষায় ছ-টি কারক এবং দুটি পদ ছিল—কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণকারক, সম্প্রদান কারক, অপাদান কারক, অধিকরণ কারক, সম্বন্ধপদ এবং সম্বোধন পদ। প্রতিটি কারকের পৃথক বিভক্তি ছিল। বাংলায় কারকের মূল বৈশিষ্ট্য বিভক্তিহীনতা আবার কখনো বা বিভক্তি প্রয়োগের বৈচিত্র্য। বাংলা কারক বাচক রূপকল্পগুলি নিম্নরূপ ঃ

ϕ (শূন্য) রূপকল্প—	কর্তৃকারকে	**রাম** বাড়ি যাবে।
	মুখ্য কর্মকারকে	সে আমাকে একটা **বই** দিল।
	করণ কারকে	ছাত্রকে **বেত** মারা ভাল নয়।
	অধিকরণ কারকে	সে **বাড়ি** যাবে।
- এ রূপকল্প	কর্তৃকারকে	**লোকে** বলে।
- তে রূপকল্প		**গোরুতে** ঘাস খায়।
	গৌণ কর্মকারকে	সে **আমায়** বলল।
	করণ কারকে	এ **কলমে** লেখা যায় না।
	অপাদান কারকে	কালো **মেঘে** জল হয়।
	অধিকরণ কারকে	সে **ঘরে** গেল।
		সে **বাড়িতে** আছে।
- কে রূপকল্প	কর্মকারকে	সে **রামকে** মারল (মুখ্যকর্ম)
		সে **আমাকে** বলল। (গৌণকর্ম)
- র ~ এর রূপকল্প	সম্বন্ধ কারকে	**আমার** ভাই বাড়ি যাবে।
		রামের ছেলে বড় হয়েছে।

-'র' এবং 'এর' রূপ দুটি একই রূপকল্পের দুটি রূপবিকল্প যেহেতু রূপদুটির মধ্যে ধ্বনিতাত্ত্বিক শর্তসাপেক্ষকতা বর্তমান—ব্যঞ্জনান্ত শব্দের শেষে 'এর' যুক্ত হয় এবং স্বরান্ত শব্দের সঙ্গে 'র' যুক্ত হয়।

কারক সম্পর্কে প্রকাশ করার জন্য দুটি স্বাধীন রূপকল্প আলোচনা সাপেক্ষ—দিয়ে এবং থেকে। মূলত করণ কারকের অনুসর্গ হিসেবে 'দিয়ে' ব্যবহৃত হলেও ('দ্বারা' আর একটি বিকল্প) অপাদান ও অধিকরণ কারকেও 'দিয়ে' অনুসর্গের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

'দিয়ে' রূপকল্প	করণ কারকে	**লাঠি দিয়ে** ডাল ভাঙো।
		আমার দ্বারা এ কাজ হবে না।
	অপাদান কারক	**চোখ দিয়ে** (চোখ থেকে) জল পড়ছে।
	অধিকরণ কারকে	**রাস্তা দিয়ে** হেঁটে যাও।
'থেকে' রূপকল্প	অপাদান কারকে	**গাছ থেকে** ফল পাড়।

৪.২.৮.৫ : ক্রিয়াপদ

বাংলা ক্রিয়াপদের গঠন নিম্নরূপ ঃ

[ধাতু (+ মৌলিক/সাধিত/যুক্ত) + প্রকারবাচক রূপকল্প + কালবাচক রূপকল্প + পক্ষবাচক রূপকল্প]

এটি বাংলা ক্রিয়াপদের গঠনরূপের চরমতম সম্ভাবনা। কোনো ক্ষেত্রে কালবাচক আবার কোনো ক্ষেত্রে প্রকারবাচক রূপকল্প শূন্য রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত হয়। ক্রিয়াপদের মূলকে তিনভাবে দেখা যায়—স্বয়ংসিদ্ধ বা মৌলিক, যেটিকে আর ভাঙা যায় না, সাধিত, মৌলিক রূপকল্প ও সাধিত রূপকল্পের সহযোগে গঠিত, এবং যুক্ত, একাধিক স্বাধীন রূপকল্পের সহযোগে গঠিত। যেমন—

পড়ছে (পড় + ছ + এ) এখানে ধাতুটি কোনো সহযোগ ছাড়াই ব্যবহৃত হয়েছে।

পড়াচ্ছে (পড় + আ সাধিত রূপকল্প + চ্ছ + এ) এখানে মূল রূপকল্পের সঙ্গে একটি সাধিত রূপকল্প যোগ করে তারপর কালবাচক, প্রকারবাচক, পক্ষবাচক রূপকল্প যুক্ত হয়েছে।

গাছটা রাস্তায় পড়ে আছে (পড় + এ অসমাপিকা রূপকল্প + আছ + এ) এখানে ক্রিয়াপদটি একাধিক মৌলিক রূপকল্পের সহযোগে গঠিত হয়েছে যা যুক্ত বা যৌগিক ক্রিয়া হিসেবে পরিচিত।

এবার ক্রিয়ার কালবাচক, প্রকারবাচক এবং পক্ষবাচক রূপকল্পগুলির আলোচনা করা হবে।

৪.২.৮.৩.১ : ক্রিয়ার কাল

বাংলা ক্রিয়ার কালের তিন রূপ—বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যত। তিনটি কাল প্রকাশ করার জন্য তিনটি রূপকল্প—(শূন্য), 'ল' এবং 'ব'।

(শূন্য) রূপকল্প	বর্তমান কাল	সে করে (কর্ + ϕ + এ)
		সে করছে (কর্ + ছ + ϕ + এ)
		সে করেছে (কর্ + এছ + ϕ + এ)

'-ল' রূপকল্প	অতীত কাল	সে করল (কর্ + ল + ও)
		সে করছিল (কর্ + ছ + ইল + ও)
		সে করেছিল (কর্ + এছ + ইল + ও)
'-ব' রূপকল্প	ভবিষ্যত কাল	সে করবে (কর্ + ব + এ)

অতীতবাচক রূপকল্পের দুটি রূপবিকল্প—একটি '-ল' এবং অন্যটি '-ইল'। সাধারণত স্বরান্ত এবং তরল ও পার্শ্বিক ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর পরে 'ল' যুক্ত হয় আর প্রকারবাচক রূপকল্প 'ছ' বা 'এছ' -র পরে 'ইল' যুক্ত হয়। অর্থাৎ অতীতবাচক রূপকল্পটিকে {-ল ~ - ইল} এভাবে দেখানো যেতে পারে।

৪.২.৮.৩.২ : ক্রিয়ার প্রকার

প্রকার অর্থাৎ কীভাবে ক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে তা বোঝাবার জন্য বাংলায় দুটি রূপকল্পের আশ্রয় নেওয়া হয়—'ছ' এবং 'এছ'। '-ছ' ঘটমান প্রকারের প্রকাশক এবং 'এছ' পুরাঘটিত প্রকারের প্রকাশক।

-ছ	ঘটমান	সে করছে (কর্ + ছ + ϕ + এ)
		সে করছিল (কর্ + ছ + ইল + ও)
এছ	পুরাঘটিত	সে করছে (কর্ + এছ + ϕ + এ)
		সে করছিল (কর্ + এছ + ইল + ও)

সাধারণ প্রকার (যেমন—সাধারণ বর্তমান, সাধারণ অতীত, সাধারণ ভবিষ্যত) বোঝানোর জন্য ϕ (শূন্য) রূপকল্প ব্যবহার করা হয়।

৪.২.৮.৩.৩ : ক্রিয়ার পক্ষ (পুরুষ) বাচক বিভক্তি

বাংলায় পক্ষবাচক রূপকল্প ক্রিয়াপদের শেষে প্রযুক্ত হয়। প্রথম পক্ষ (উত্তম পুরুষ), দ্বিতীয় পক্ষ (মধ্যম পুরুষ) এবং তৃতীয় পক্ষ (প্রথম পুরুষ)-এর রূপকল্পগুলি নিম্নরূপ :

প্রথম পক্ষ

বর্তমান কালে ব্যবহৃত	অতীত কালে ব্যবহৃত	ভবিষ্যত কালে ব্যবহৃত
-ই	-আম্/উম্	-ও
আমি করি	আমি করলাম	আমি করব।

দ্বিতীয় পক্ষ

বর্তমান কালে ব্যবহৃত	অতীত কালে ব্যবহৃত	ভবিষ্যত কালে ব্যবহৃত
-ও ~ -ইস ~ -এন	-এ ~ -ই ~ -এন	-এ ~ -ই ~ -এন
তুমি করো	তুমি করলে	তুমি করবে
তুই করিস	তুই করলি	তুই করবি
আপনি করেন	আপনি করলেন	আপনি করবেন

তৃতীয় পক্ষ

বর্তমান কালে ব্যবহৃত	অতীত কালে ব্যবহৃত	ভবিষ্যত কালে ব্যবহৃত
-এ ~ -এন	-ও ~ -এন	-এ ~ -এন
সে করে	সে করল	সে করবে
তিনি করেন	তিনি করলেন	তিনি করবেন

অর্থাৎ প্রথম পক্ষের রূপকল্পে {-ই ~ আম ~ - ও}, রূপতাত্ত্বিক শর্তসাপেক্ষতা বর্তমান— -ই বর্তমানকালে প্রযুক্ত, -আম অতীতকালে প্রযুক্ত এবং -ও ভবিষ্যতকালে প্রযুক্ত। একইভাবে দ্বিতীয় পক্ষর রূপকল্প {-ও ~ ইস ~ ই ~ এ ~ -এন}। -ও বর্তমান কালে এবং -এ অতীত ও ভবিষ্যতকালে প্রযুক্ত। নৈকট্য-দূরত্ব, মর্যাদা প্রভৃতি মাত্রানুসারেও পক্ষবাচক বিভক্তির পরিবর্তন ঘটতে পারে— -ও সাধারণ (তুমি)। - ইস ~ -ই নৈকট্যবাচক বা তুচ্ছার্থক (তুই) এবং -এন (মর্যাদা সূচক)। {-এ ~ - ও ~ -এন} তৃতীয় পক্ষের রূপকল্প— -এ বর্তমান ও ভবিষ্যত কালে প্রযুক্ত এবং -ও অতীত কালে প্রযুক্ত। {-ও ~ এ} যখন সাধারণ রূপের সঙ্গে ব্যবহৃত তখন {-এন} তৃতীয় পক্ষের সম্ভ্রমার্থক রূপের সঙ্গে ব্যবহৃত।

৪.২.৮.৩.৪ : যুক্তক্রিয়া—যৌগিক ক্রিয়া-সংযোগমূলক ক্রিয়া

একাধিক মৌলিক রূপকল্পের সহযোগে গঠিত ক্রিয়াপদকে যুক্তক্রিয়া বলে। যুক্তক্রিয়া দু ধরনের— সংযোগমূলক এবং যৌগিক ক্রিয়া। দু ধরনের ক্রিয়াপদের মধ্যে মিল হল দু ধরনের ক্রিয়াপদই দ্বিপদময়। তবে সংযোগমূলক ক্রিয়ার প্রথম পদ যখন বিশেষ্য, বিশেষণ বা অনুকার শব্দ দ্বিতীয় পদটি সমাপিকা ক্রিয়া। যেমন—গান করে, মানা করে, ভাল করে, মন্দ করছে, ঝকঝক করছে, কটকট করছে। যৌগিক ক্রিয়ায় দুটি পদই ধাতু—প্রথম পদ অসমাপিকা ক্রিয়ারূপ এবং দ্বিতীয় পদটি সমাপিকা ক্রিয়ারূপ। যেমন—বসে আছে, পড়ে আছে, খেয়ে ফেলল, পড়ে গেল, বলে ফেলল প্রভৃতি। দু ধরনের ক্রিয়ারূপের ক্ষেত্রেই দুটি পদের মধ্যে যতি বা ছেদ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। যৌগিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদটির যেমন রূপবৈচিত্র্য ঘটে প্রথম পদটির ক্ষেত্রে শুধু অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপকল্প যুক্ত হয়। সংযোগমূলক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদটির রূপবৈচিত্র্য ঘটে থাকে প্রথম পদটির কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

৪.২.৮.৩.৫ : অসমাপিকা ক্রিয়ারূপ

বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়া গঠনে তিনটি রূপকল্প ব্যবহৃত হয় -এ, -তে এবং -লে। রূপকল্পগুলি যথাক্রমে পুরাঘটিত অসমাপিকা, তুমর্থক অসমাপিকা ও শর্তজ্ঞাপক অসমাপিকা ক্রিয়া গঠনে ব্যবহৃত হয়। যেমন—

তুমর্থক অসমাপিকা	-তে	করতে, খেতে, যেতে, বলতে।
পুরাঘটিত অসমাপিকা	-এ	করে, খেয়ে, গিয়ে, বলে।
শর্তজ্ঞাপক অসমাপিকা	-লে	করলে, বললে, খেলে, গেলে।

সূত্রাকারে অসমাপিকা রূপকল্প এভাবে দেখানো যেতে পারে—{-এ ~ তে ~ -লে} অর্থাৎ -এ, তে এবং -লে একই রূপকল্পের তিনটি রূপবিকল্প।

৪.২.৮.৩.৬ : ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য

মূল বা ধাতুর সঙ্গে পরাধীন বা বদ্ধ রূপকল্প যোগ করে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠিত হয়। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে প্রযুক্ত রূপকল্পগুলি নিম্নরূপ ঃ

'-আ'	বল্ + আ = বলা
	কর + আ = করা
	খা + আ = খাওয়া
'-না'	দা + না = দেনা
	পাওয়া + না = পাওনা
'-অন'	চল্ + অন্ = চলন
	বল্ + অন্ = বলন
	কথ্ + অন্ = কথন
	মর্ + অন্ = মরণ
'-উনি'	বাঁধ + উনি = বাঁধুনি
	বক্ + উনি = বকুনি

: রূপধ্বনিপ্রকরণ:

একটি রূপকল্প যখন অন্য রূপকল্পের সহযোগে ব্যবহৃত হয় তখন রূপকল্পটির ধ্বনি-শরীরে পরিবর্তন ঘটতে পারে। রূপধ্বনিপ্রকরণ পর্যায়ে এই বিষয়টি আলোচিত হয়। মূল রূপকল্প 'কর্' [কোর] রূপে উচ্চারিত হয় যখন এর সঙ্গে পক্ষবাচক রূপকল্প '-ই' বা কালবাচক রূপকল্প (অতীত এবং ভবিষ্যত) এবং প্রকারবাচক রূপকল্প (ঘটমান এবং পুরাঘটিত) যুক্ত হয়।

৪.২.৮.৬ : সারসংক্ষেপ

শব্দের অন্তর্গত ও ছোট ছোট অর্থপূর্ণ উপাদান থাকতে পারে যা রূপকল্প হিসেবে বর্তমান এককে আলোচিত হয়েছে। রূপকল্প যেমন স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে তেমনি অন্য রূপকল্পের সহযোগেও ব্যবহৃত হতে পারে যাকে স্বাধীন বা মুক্ত এবং পরাধীন বা বদ্ধ রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। রূপকল্প সাধিত হতে পারে এবং সম্প্রসারিত হতে পারে। সাধিত রূপকল্পের সহযোগে নতুন শব্দ তৈরি করা যায় আর সম্প্রসারিত রূপকল্পের সাহায্যে বাক্যান্তর্গত পদগুলির মধ্যে ব্যাকরণিক সম্পর্ক প্রকাশিত হয়। বাংলা রূপকল্পের ক্ষেত্রে বহুবচনজ্ঞাপক রূপকল্প যেমন আছে তেমনি স্ত্রীলিঙ্গ বোঝাবার জন্য কয়েকটি রূপকল্প বর্তমান যেগুলি আবার তদ্ভব ও তৎসম পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। বাংলা ক্রিয়ার তিন কাল—বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যত; বর্তমান যখন ϕ (শূন্য) রূপকল্পের সাহায্যে প্রকটিত তখন অতীত এবং বর্তমান পৃথক রূপকল্প দ্বারা চিহ্নিত। বাংলায় তিন প্রকার সাধারণ ঘটমান এবং পুরাঘটিত এবং তিন পক্ষ—প্রথম পক্ষ, দ্বিতীয় পক্ষ এবং তৃতীয় পক্ষ।

৪.২.৮.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। উদাহরণসহ সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন :

রূপ, রূপকল্প, রূপবিকল্প, শূন্য রূপকল্প, স্বাধীন রূপকল্প, পরাধীন রূপকল্প, সমধ্বনি রূপকল্প, সাধিত রূপকল্প, সম্প্রসারিত রূপকল্প।

২। রূপকল্পের সংজ্ঞা দিন এবং রূপকল্পের শ্রেণিবিভাগ করুন।

৩। রূপকল্প নির্ণয়ের সূত্রগুলি উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৪। বাংলা শব্দরূপে বচন এবং লিঙ্গের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৫। বাংলা কারকের গঠনরূপ আলোচনা করুন।

৬। যুক্তক্রিয়া বলতে কী বোঝেন? যুক্তক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ করুন এবং বিভিন্ন ধরনের যুক্তক্রিয়া উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৭। পক্ষ বলতে কী বোঝেন? বাংলা পক্ষবাচক রূপকল্পগুলি উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৪.২.৮.৮ : গ্রন্থাবলি

১। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব। কলকাতা : নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৭ বুক কর্পোরেশন, ১৯৯৩।

২। প্রবাল দাশগুপ্ত, 'ভাষা বর্ণনার স্তর', **নিসর্গ** তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ: ১-১১৩।

৩। রামেশ্বর শ, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা। কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৮৮।

৪। H. A. Gleason, An Introduction to Descriptive Linguistics, Delhi : Oxford IBH, 1961.

৫। C. F. Hockette, A Course in Modern Linguistics. Delhi : Oxford IBH, 1976. Bernard Block and G. L. Trager, Outlines of Linguistic Analysis. New Delhi : Oriental Books Rঙ্গprint Corporation, 1972.

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

বাংলা যৌগিক স্বর ও সংযুক্ত ব্যঞ্জন

একক - ৯

বাংলা যৌগিক স্বরের বৈশিষ্ট্য

বিন্যাস ক্রম :

৪.৩.৯.১ : যৌগিক স্বরের সংজ্ঞা

৪.৩.৯.২ : বাংলা যৌগিক স্বরের বৈশিষ্ট্য

৪.৩.৯.৩ : একক ও যৌগিক স্বরের মধ্যে পার্থক্য কী?

৪.৩.৯.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.৩.৯.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪.৩.৯.১ : যৌগিক স্বরের সংজ্ঞা

স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি একক ভাবে থাকতে পারে, আবার যুক্ত(ভাবেও থাকতে পারে। একটি স্বরের সঙ্গে অন্য স্বরের যোগের ফলে যৌগিক স্বর-এর উদ্ভব ঘটে। এর সংজ্ঞা দেওয়া যায় এই ভাবে---"নিঃশ্বাসবায়ুর ন্যূনতম প্রয়াসে অর্থাৎ শ্বাসবায়ুর এক ধাক্কায় ('one breath impulse') যদি একাধিক স্বরধ্বনি যুক্ত(ভাবে একটিমাত্র অ(র-এ নিবদ্ধ থেকে উচ্চারিত হয় তবে এই স্বরগুচ্ছকে বলা হয় যৌগিক স্বর"।

৪.৩.৯.২ : বাংলা যৌগিক স্বরের বৈশিষ্ট্য

উচ্চারণ-প্রক্রি(য়া অনুযায়ী স্বর দু-প্রকার---একক **স্বর** ও **যৌগিক স্বর**। দেবনাগরী ও বাংলা অ(রমালায় স্বরধ্বনির তালিকায় একক স্বরধ্বনির সঙ্গে দুটি ব্যতিক্র(মী ধ্বনি চিহ্(পাওয়া যায়। এগুলি হল--**'ঐ', 'ঔ'**। এরা কিন্তু একক স্বরধ্বনি নয়। এই স্বরধ্বনি দুটিকে চিহ্নি(ত করা হয় যৌগিক স্বর রূপে। এদের মধ্যে যুক্ত(ভাবে আছে দুটি করে একক স্বর। ধ্বনি বি(-ষণ করলে দাঁড়ায় বাংলা উচ্চারণে ঐ = ওই, ঔ = ওউ।

বাংলা লিপির (ে ত্রে যৌগিক স্বরের বর্ণচিহ্(গুলি নিশ্চয়ই বাড়তি কিছু সুবিধা আমাদের দেয়। সই, বই, কই, মউ, বউ লেখার বদলে সৈ, বৈ, কৈ, মৌ, বৌ লিখে আমরা সং(পে কাজ সারতে পারি।

প্রচলিত অ(রমালায় দুটি মাত্র যৌগিক স্বরের উল্লেখ থেকে এমন মনে করার কারণ নেই যে সংস্কৃত বা বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরের তালিকা শুধু এই দুটি ধ্বনিতেই শেষ। রয়েছে আরো অনেক যৌগিক স্বর। স্বতন্ত্র বর্ণচিহ্(না থাকলেও এগুলির অস্তিত্ব সংশয়াতীত ভাবে বিদ্যমান।

এই, আই, ওই, আউ, এও, ইএ, ইআ ইত্যাদি বহু ধ্বনি সংস্কৃতে ও বাংলায় অপর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে, অথচ এগুলির জন্য—ঐ এবং ঔ-এর মতো কোনো পৃথক বর্ণচিহ্(কল্পিত হয়নি।

৪.৩.৯.৩ : একক ও যৌগিক স্বরের মধ্যে পার্থক্য কী ?

সাধারণভাবে মনে হতে পারে, একক ও যৌগিক স্বরের মধ্যে পার্থক্য বোধহয় সংখ্যা বা পরিমাণগত। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তা নয়। স্বরধ্বনির সংখ্যা নয়, স্বরধ্বনির বিশেষ গুণ (quality) বা উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই একক স্বর থেকে যৌগিক স্বর আলাদা হয়ে যায়।

সচরাচর দুটি স্বর যুগ্মভাবে যৌগিক স্বর গঠন করে বলে এর অন্য নাম দ্বিস্বর ধ্বনি (diphthong)। ভাষাতাত্ত্বিক David Crystal-এর ভাষায় Diphthong হল 'A vowel with a perceptible change of quality during a single syllable'. এখানে 'a perceptible change of quality' এবং 'single syllable' কথাগুলি অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ। দ্বিস্বরধ্বনিতে বাহ্যত দুটি স্বরধ্বনি হাজির থাকলেও উচ্চারণের সময় দ্বিস্বরধ্বনি হয়ে ওঠে এক-আ(রিক ('single syllable')। নিয়মমত দুটি স্বর আলাদাভাবে দুই অ(র হওয়ার কথা। কিন্তু, উচ্চারণগুণে এরা এক-আ(রিক হয়ে উঠতে পারে। উচ্চারণ-প্রত্রি(য়া বি(-ষণ করে ধ্বনিবিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, এরূপ ঘটনার পেছনে রয়েছে স্বরধ্বনির 'a perceptible change of quality'। আর এই স্বরের গুণগত বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে মুখগহ্বরে জিহ্বার অবস্থানের ওপর। একক স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা কোনো না কোনো সুনির্দিষ্ট অবস্থানে থাকে। শুধু জিহ্বার অবস্থান নয়, ওষ্ঠাধর ও মুখবিবরের আকৃতিও যথানির্দিষ্ট। ই, এ, অ্যা, আ, অ, ও, উ ইত্যাদি স্বরধ্বনি উচ্চারণের বেলায় জিহ্বার অবস্থান সুনির্দিষ্ট। এক ধ্বনি উচ্চারণ করতে গিয়ে জিহ্বা অন্যস্থানে যায় না। কাজে কাজেই এরা একক স্বরধ্বনি। কিন্তু এমন যদি দেখা যায় যে কোনো ধ্বনির উচ্চারণকালে জিহ্বা অতিদ্রুত এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানের দিকে সরে যায় এবং সমগ্র উচ্চারণ-প্রত্রি(য়াটি নিঃ(াস বায়ুর এক ধাক্কার মধ্যে (অর্থাৎ এক অ(র বা সিলেবলের উচ্চারণকাল) নিষ্পন্ন হয়, তবে এই স্বরধ্বনিকে বলা হয় যৌগিক স্বর। ধরা যাক্, ঐ, ঔ শব্দ দুটি। ঐ (ওই) উচ্চারণের সময় জিহ্বা প্রথমে পশ্চাৎ (back) ও মধ্যউচ্চ (mid-high) অবস্থানে থেকে 'ও' উচ্চারণ করে, পরমুহূর্তেই দ্রুত সম্মুখ (front) ও উচ্চ (high) অবস্থানে এগিয়ে গিয়ে 'ই' উচ্চারণ করে। 'ঔ' (ওউ) উচ্চারণের সময় একই প্রত্রি(য়ায় জিহ্বা প্রথমে 'ও' উচ্চারণ সেরে পশ্চাৎ (back) ও উচ্চ (high) অবস্থানে গিয়ে 'উ' উচ্চারণ সম্পন্ন করে। সাধারণত একক স্বর উচ্চারণের সময় জিহ্বাকে যতটুকু কাল(প করতে হয় এ(ত্রে ঐ সময়ের মধ্যে দুটো ধ্বনির উচ্চারণ শেষ করতে হয়। দ্রুততার কারণে দ্বিতীয় স্বরধ্বনিটি কখনোই পূর্ণাঙ্গ হয় না--- তা অর্ধস্বরের মতো অর্ধোচ্চারিত থেকে যায়। পৃথকভাবে উচ্চারণকালে যে ধ্বনি স্বয়ংসম্পূর্ণ মুক্ত(অ(র বা মুক্ত(দল (open syllable), যৌগিক স্বরের মধ্যে অন্তিম অবস্থানে তা-ই বদ্ধ অ(র বা (দ্ধ দল (closed syllable) হয়ে যায়। ভাষাতাত্ত্বিক মোহম্মদ আবদুল হাইয়ের ভাষায় বলা চলে---"দ্বৈতস্বর একা(রিক (monosyllable) হওয়ার জন্যে তার প্রথম স্বরধ্বনিটি যেমন দীর্ঘ হয় তেমনি তার দ্বিতীয়টি স্বতন্ত্রভাবে কিংবা শব্দের মধ্যে তার নিজস্ব রূপে উচ্চারিত হলে যেমন পূর্ণতা পায়, এখানে সেভাবে পূর্ণতালাভ করেনা। অন্য কথায় দ্বৈতস্বরের দ্বিতীয় স্বরধ্বনিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বরধ্বনি নয়"।

নমুনা হিসেবে শোও্, আয়্, যাই, ফাও্, ওই্, উই্ ইত্যাদি যৌগিক স্বরধ্বনির প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর পরী(া করলেই উক্তি(টির তাৎপর্য বোঝা যাবে। শো + ও্, আ + য়্, যা + ই, ফা + ও্, ও + ই্, উ + ই্-- এই দৃষ্টান্তগুলিতে যৌগিক স্বরধ্বনির অন্তর্গত দুটি স্বরের মধ্যে পরিমাণগত প্রভেদ বিদ্যমান। শো, আ্, যা, ফ্া, ও, উ প্রভৃতি প্রথম স্বর পূর্ণভাবে উচ্চারিত হয়, কিন্তু ও্, য়্, ই, ও্, ই্, ই্ প্রভৃতি দ্বিতীয় স্বর অর্ধস্বরের মতো পিচ্ছিল ও অসম্পূর্ণভাবে উচ্চারিত হয়।

বলা হয়েছে, যৌগিক স্বর এক-আ(রিক (monosyllable)। তবে উচ্চারণের শিথিলতার কারণে কোনো কোনো যৌগিক স্বরধ্বনি দু-অ(রে সম্প্রাসিরত হতে পারে। উচ্চারণনির্ভর বলে এদেরকে জল-

অচল নিয়মে বাঁধা যায় না। সে(ত্রে এরা আর এক-অ(র থাকে না এবং তখন এদের আর যৌগিক স্বরও বলা যায় না। উচ্চারণরীতির তারতম্য সহজেই অ(র সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটায়। বাংলা ছন্দের বিভিন্ন রীতির আলোকে **এই, ওই, আই, আউ, ইএ** প্রভৃতি যৌগিক স্বরধ্বনির উচ্চারণ বি(-ষণ করলে অ(র ও মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধির বৈচিত্র্য বুঝতে সুবিধা হবে।

সেই, ওই, তাও---এই যৌগিক স্বরধ্বনিগুলিকে পরী(া করা যাক্। একা(রে সীমাবদ্ধ এই যৌগিক স্বরগুলি উচ্চারণের তারতম্যে হয়ে যায় দুই মাত্রা। যদি বলি,

"তোমার সঙ্গে **সে-ই** কবে দেখা!"

"নিষেধ করছি, **তা-ও** তুমি যাবে?"

"**ও-ই** এখানে এসেছে, অন্য কেউ নয়।"

এখানে উচ্চারণের সময় নিশ্চয় 'সে-ই', 'তা-ও', 'ও-ই' প্রভৃতি স্বরধ্বনি আর একা(রে সীমাবদ্ধও থাকে না, অতএব এদের আর যৌগিক স্বরধ্বনি বলা সম্ভব নয়। অতএব, মনে রাখা আবশ্যক, দুটি স্বর পাশাপাশি অবস্থিত থেকেও যদি নিঃ(াসের এক ধাক্কায় উচ্চারিত না হয় তবে এই দুটি স্বরকে কোনোভাবেই যৌগিকস্বর বলার উপায় নেই।

৪.৩.৯.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। যৌগিক স্বরের সংজ্ঞা দাও।

২। বাংলা যৌগিক স্বরের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

৩। কয়েকটি যৌগিক স্বরের উদাহরণ দাও।

৪। একক স্বর ও যৌগিক স্বরের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৫। বাংলা যৌগিক স্বরের উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করে দেখাও।

৪.৩.৯.৪ : গ্রন্থাবলি

১। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব। কলকাতা : নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৭ বুক কর্পোরেশন, ১৯৯৩।

২। প্রবাল দাশগুপ্ত, 'ভাষা বর্ণনার স্তর', **নিসর্গ** তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ: ১-১১৩।

৩। রামেশ্বর শ, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা। কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৮৮।

৪। H. A. Gleason, An Introduction to Descriptive Linguistics, Delhi : Oxford IBH, 1961.

৫। C. F. Hockette, A Course in Modern Linguistics. Delhi : Oxford IBH, 1976. Bernard Block and G. L. Trager, Outlines of Linguistic Analysis. New Delhi : Oriental Books R্ঙprint Corporation, 1972.

একক - ১০

যৌগিক স্বরের তালিকা

বিন্যাস ক্রম :

৪.৩.১০.১ : বাংলা যৌগিক স্বরের প্রকারভেদ

৪.৩.১০.২ : বাংলা যৌগিক স্বরের তালিকা

৪.৩.১০.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.৩.১০.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪.৩.১০.১ : বাংলা যৌগিক স্বরের প্রকারভেদ

অধ্যাপক মোহম্মদ আবদুল হাই উপরোত্ত(এই বৈশিষ্ট্যের দিকে ল(রেখে দ্বিস্বরধ্বনিগুলিকে নিয়মিত ও অনিয়মিত--এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। নিঃ্বাসের এক প্রয়াসে দ্রুত উচ্চারিত হয়ে সহজেই এক অ(রে আবদ্ধ থাকে যেসব দ্বিস্বরধ্বনিকে তিনি বলেছেন নিয়মিত, আর উচ্চারণ-প্রসারণের কারণে যেসব দ্বিস্বরধ্বনি এক ঝোঁকে উচ্চারিত নাও হতে পারে সেসব দ্বিস্বরধ্বনিকে বলেছেন অনিয়মিত দ্বিস্বরধ্বনি। তিনি বাংলা যৌগিক স্বরের যে তালিকা প্রস্তুত করেছেন তা এরূপ---

নিয়মিত দ্বিস্বর-ধ্বনি–

ইই (নিই, দিই)	ইউ (পিউ, শিউ)	এই (এই, সেই)	এও (ফেও)
এউ (ঘেউ)	এ্যাও (দ্যাও)	এ্যায় (ন্যায়)	আই (যাই)
আএ (যায়)	আও (যাও)	আউ (লাউ)	অএ (নয়)
অও (নও)	ওও (শোও)	ওউ (মউ)	ওই (ওই)
ওএ (শোয়)	উই (উই, (ই, পুঁই)		

অনিয়মিত দ্বিস্বর-ধ্বনি

ইএ (নিয়ে)	ইআ (মিয়া, নিয়া, সিয়া)	ইও (নিও)	এআ (কেয়া)
এও (খেও)	এ্যায়া (ন্যায়া)	অআ (নয়া)	ওআ (মোয়া)
ওএ (সয়ে)	উএ (নুয়ে)	উআ (চুয়া)	

৪.৩.১০.২ : বাংলা যৌগিক স্বরের তালিকা

দ্বিস্বরধ্বনির উপরোত্ত(বিভাজন অবশ্যই বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। তাছাড়া, বাংলায় মোট যৌগিক স্বরের সংখ্যা নির্ধারণের (ে ত্রেও ভাষাতাত্ত্বিক মধ্যে মতভেদ যথেষ্ট। আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলায় দ্বিস্বরধ্বনির সংখ্যা ২৫। তিনি নিয়মিত-অনিয়মিত ইত্যাদি বিভাজনের কথা ভাবেননি। কিন্তু, উচ্চারণের তারতম্যে প্রতিটি যৌগিক স্বরই যে পৃথকভাবে ভেঙে যেতে পারে তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। “দ্রুত উচ্চারণে, পূর্বোত্ত(স্বরধ্বনিগুলি যৌগিক স্বরধ্বনি হইয়া যায়, আবার ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলে,

দুইটি পৃথক স্বররূপেই প্রতিভাত হয়।" ড. মোহম্মদ আবদুল হাই-এর মতে যৌগিক স্বরের সংখ্যা ২৯। তাঁর সমী(া অনুযায়ী নিয়মিত দ্বিস্বরের সংখ্যা ১৮, অনিয়মিত দ্বিসরের সংখ্যা ১১। ড. রামে(্বর শ' সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতকেই গ্রহণ করেছেন। অধ্যাপক পবিত্র সরকারের মতে যৌগিক স্বরের সংখ্যা ১৭।

নীচে উক্ত(ভাষাবিজ্ঞানীদের প্রস্তুত বাংলা দ্বিস্বরধ্বনির তালিকা দেওয়া হল—

মোহ. আব. হাই-কৃত	ড. সুনীতি চট্টো.-কৃত	ড. রামে(্বর শ-কৃত	পবিত্র সরকার কৃত
ইই			ইই
ইউ	ইউ	ইউ	ইউ
এই	এই	এই	এই
এও	এও	এও	এও
এউ	এউ	এউ	এউ
এ্যাও	অ্যাও	অ্যাও	অ্যাও
এ্যায়	এয়, অ্যায়	অ্যাএ	অ্যাএ
আই	আই	আই	আই
আয়	আয়	আএ	আএ
আও	আও	আও	আও
আউ	আউ	আউ	আউ
অয়	অয়	অয়	অয়
অও	অও	অও	অও
ওও			ওও
ওউ	ওউ অউ, ঔ	ওউ, ঔ	ওউ, ঔ
ওই	ওই, ঐ	ওই	ওই
ওয়	ওয়	ওএ	ওএ
উই	উই	উই	উই
ইয়ে	ইয়ে, ইএ,	ইএ	
ইয়া	ইয়া	ইআ	
ইয়ো	ইয়ো	ইও	
এয়া	এয়া	এআ	
এ্যায়া			
অয়া			
ওয়া	ওয়া, ওআ	ওআ	
ওয়ে			
উয়ে	উয়ে	উএ	
উয়া	উয়া	উআ	
উয়ো	উয়ো, উও	উও	
	অআ	অআ	

দুটি ধ্বনির মিলনে যেমন 'দ্বিস্বর'-ধ্বনি, তেমনি তিনটি, চারটি বা পাঁচটি ধ্বনির যোগে তৈরি হয়ে থাকে যথাত্র(মে 'ত্রিস্বর', 'চতুঃস্বর' ও 'পঞ্চস্বর' ধ্বনি। বাংলাভাষায় এই জাতীয় ধ্বনির সংখ্যা কম নয়। অবশ্য যুত্ত(ভাবে থাকলেও এইগুলিকে যৌগিক স্বর বলা যাবে না, কারণ (্বাসবায়ুর এক ধাক্কায় এরা উচ্চারিত হয় না বা এক অ(রের মধ্যে সীমাবদ্ধও থাকে না। নীচে বিভিন্ন স্বর-সমাবেশের বৈচিত্র্য দেখানো হল---

ত্রিস্বর -	ইআও (মিঁয়াও)	ইএই (নিয়েই)	আইও (খাইও)	এইএ (ধেইয়ে)
	ওআও (নোয়াও)	উইএ (শুইয়ে)	এইও (হেইও)	এআই (বেয়াই)
	এআও (ধেয়াও)	আওআ (হাওয়া)	ইত্যাদি।	
চতুঃস্বর -	অওআই (হওয়াই)	এওআই (দেওয়াই)	আওআই (খাওয়াই)	ইত্যাদি।
পঞ্চস্বর -	আওআইও (খাওয়াইও)			

৪.৩.১০.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। বাংলা যৌগিক স্বরের প্রকারভেদ করো।

২। দ্বিস্বর ধ্বনি কাকে বলে?

৩। দ্বিস্বর ধ্বনির তালিকাটি উল্লেখ করো।

৪। বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী কৃত বাংলা যৌগিক স্বরের তালিকাটি প্রস্তুত করো।

৪.৩.১০.৪ : গ্রন্থাবলি

১। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব। কলকাতা : নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৭ বুক কর্পোরেশন, ১৯৯৩।

২। প্রবাল দাশগুপ্ত, 'ভাষা বর্ণনার স্তর', **নিসর্গ** তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃঃ ১-১১৩।

৩। রামেশ্বর শ, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা। কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৮৮।

৪। H. A. Gleason, An Introduction to Descriptive Linguistics, Delhi : Oxford IBH, 1961.

৫। C. F. Hockette, A Course in Modern Linguistics. Delhi : Oxford IBH, 1976. Bernard Block and G. L. Trager, Outlines of Linguistic Analysis. New Delhi : Oriental Books R৺print Corporation, 1972.

একক - ১১

সংযুক্তব্যঞ্জনের সংজ্ঞা ও গঠন বৈশিষ্ট্য

বিন্যাস ক্রম :

৪.৩.১১.১ : সংযুত্ত(ব্যঞ্জনের সংজ্ঞা

৪.৩.১১.২ : বাংলা সংযুত্ত(ব্যঞ্জন-এর গঠন বৈশিষ্ট্য

৪.৩.১১.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.৩.১১.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪.৩.১১.১ : সংযুত্ত(ব্যঞ্জনের সংজ্ঞা

আমরা স্বরধ্বনির যুত্ত(-অবস্থান বিষয়ে আলোচনা করলাম। এবার ব্যঞ্জনধ্বনির যুত্ত(ভাবে উচ্চারণের প্রাসঙ্গিক দিক নিয়ে আলোচনায় প্রবেশ করা যেতে পারে।

দুটি বা তার বেশি ব্যঞ্জনধ্বনি যদি নিঃ(্বাসের এক ধাক্কায় (one breath articulation) একা(র নিবদ্ধ হয়ে যুত্ত(ভাবে উচ্চারিত হয় তবে সেই ব্যঞ্জনধ্বনিকে বলা হয় 'সংযুত্ত(ব্যঞ্জন' (Consonant cluster /Conjunct consonant)।

মোহম্মদ আবদুল হাই সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে---'বিভিন্ন স্থানজাত একাধিক ধ্বনি নিঃ(্বাসের এক প্রয়াসে উচ্চারিত হয়ে যদি একাত্মতা লাভ করে তা হলেই তা যথার্থ সংযুত্ত(ধ্বনি বা consonant cluster নামে অভিহিত হবার যোগ্যতা অর্জন করে।

ড. রামে(্বর শ' সংযুত্ত(ব্যঞ্জনকে চিহ্নি(ত করেছেন এইভাবে---কোনো ভাষায় অ(রের (syllable) প্রারম্ভে (onset) অথবা অন্তে (coda) অবস্থি যে ক-টি ব্যঞ্জন অ(রকেন্দ্রিক স্বরধ্বনির সঙ্গে এক ধাক্কায় উচ্চারিত হয় সে ক-টি ব্যঞ্জনকে যথার্থ সংযুত্ত(ব্যঞ্জন (consonant cluster) বলে।

৪.৩.১১.২ : বাংলা সংযুত্ত(ব্যঞ্জন-এর গঠন বৈশিষ্ট্য

সংযুত্ত(ব্যঞ্জন-এর গঠন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনার আগে আমাদের 'যুত্ত(-অ(র'-এর সঙ্গে এর প্রভেদ বুঝে নিতে হবে। প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক ছোটবেলা থেকে আমাদের মধ্যে কিছু ভ্রান্ত ধারণা তৈরি করে দিয়েছে যে দুটি ব্যঞ্জন যুত্ত(ভাবে থাকলেই তা যুত্ত(ব্যঞ্জন। শিশু-পাঠ্যপুস্তকে ফলাযুত্ত(ব্যঞ্জন (র-ফলা, ল-ফলা, ম-ফলা ইত্যাদি) বা যুত্ত(া(রের তালিকাও দেয়া থাকে। পাশাপাশি থাকা ব্যঞ্জন দুটির মাঝে কোনো স্বরধ্বনি নেই বলে এরা পরস্পর যুত্ত(ভাবে রয়েছে—এটা বুঝতে কারোরই অসুবিধা হয়না, কিন্তু বর্ণ-চিহ্নে(র এই যুত্ত(ভাব উচ্চারণে র(িত কিনা অর্থাৎ দৃশ্যমান হরফের সঙ্গে শ্রব্যমান ধ্বনির সামঞ্জস্য কতখানি র(িত তা নিয়ে সাধারণ পাঠকের মাথাব্যাথা কম।

'যুত্ত(া(র' ও 'যুত্ত(ব্যঞ্জন' এক নয়। অথচ এই দুইকে একই অর্থে ব্যবহার করতে আমরা অভ্যস্ত। সংস্কৃত বর্ণমালার উত্তরাধিকার-সূত্রে আমরা প্রচুর যুত্ত(া(র-চিহ্নি(ত বর্ণ বাংলায় পেয়েছি। যুত্ত(া(রপূর্ণ কয়েকটি পংত্তি(বা চরণ উদ্ধার করা যাক—

১। মঞ্জুবিকচ কুসুমপুঞ্জ মধুপশব্দগঞ্জিগুঞ্জ

কুঞ্জরগতি গঞ্জিগমন মঞ্জুলকুলনারী।

২। নন্দপুরচন্দ্রবিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।

৩। সুরাঙ্গনা নন্দনের নিকুঞ্জ প্রাঙ্গনে।

মন্দার মঞ্জরি তোলে চঞ্চল কঙ্কনে।।

৪। অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ ত্র(ন্দন।

ঞ্জ, ন্দ, ন্দ্র, ন্ধ, ঙ্গ, ঞ্চ, ঙ্ক, ন্ত, র্গূ, চ্ছ প্রভৃতি অ(রে অবশ্যই দুই বা তার বেশি ব্যঞ্জন যুক্ত(ভাবে রয়েছে। যেহেতু যুক্ত(ভাবে আছে তাই এগুলি যুক্ত(া(র। মনে রাখা জ(রি, এগুলি কিন্তু যুক্ত(ব্যঞ্জন নয়। যদিও এদেরকে অসতর্ক ভাবে যুক্ত(ব্যঞ্জন নামে অভিহিত করতে অভ্যস্ত অনেকেই। ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনায় যুক্ত(ব্যঞ্জনের ভিন্ন তাৎপর্য নির্দেশিত হয়েছে। ধ্বনিবি(-ষণে সহজেই ধরা পড়বে যে বর্ণচিহ্(ে যুক্ত(ভাবে থাকলেও উচ্চারণে এরা যুক্ত(ভাবে নেই। মঞ্জু-র উচ্চারণ হয়ে থাকে 'মন্ + জু' এই ভাবে। অনুরূপভাবে--নন্দ = নন্ + দ, চন্দ্র = চন্ + দ্র, বৃন্দা = বৃন্ + দা, অন্ধ = অন্ + ধ ইত্যাদি। ঞ্জ, ন্দ, ন্দ্র, ন্ধ, ঙ্গ, ঞ্চ , ঙ্ক, ন্ত, র্গূ, চ্ছ—এই সংযুক্ত(ধ্বনিগুলি স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারণসাধ্যই নয়। পূর্বধ্বনির সহায়তা ছাড়া এদের উচ্চারণ অসম্ভব। আবার শব্দে নিবদ্ধ থাকলেও নিঃ(্বাসের এক ঝোঁকে এদের উচ্চারণ করা যায় না। কাজেই সংযুক্ত(ব্যঞ্জনের বিশেষ ল(ণ এদের মাঝে নেই। মুহম্মদ আবদুল হাই-এর মন্তব্য অনস্বীকার্য যে, "ধ্বনি ও হরফ যে এক নয় তার একটা বড় প্রমাণ হল বাংলার যুক্ত(া(রগুলো।" অ(রের সংযুক্ত(তার দিক দিয়ে বিচার করে বাংলা ভাষায় যুক্ত(া(র-এর সংখ্যা প্রায় আড়াইশো। অন্যদিকে সংযুক্ত(ব্যঞ্জনের সংখ্যা অতি নগণ্য।

স্পর্শধ্বনি, উষ্মধ্বনি, নাসিক্যধ্বনি, কম্পিতধ্বনি ও পার্(্বিকধ্বনির মধ্যে দুটি বা তিনটি ধ্বনির পরস্পর মিলনে বাংলা সংযুক্ত(ব্যঞ্জন কীভাবে গঠিত হয়ে থাকে তা নীচে দেখানো হল---

১। স্পর্শধ্বনি + কম্পিতধ্বনি = প্রাণ, ভ্রম, ঘ্রাণ, ঘৃত, ব্রীড়া।

২। স্পর্শধ্বনি + পার্(্বিকধ্বনি = ক্লেশ, প্-ীহা, গ-ানি।

৩। উষ্মধ্বনি + নাসিক্যধ্বনি = স্মরণ, স্নান।

৪। উষ্মধ্বনি + নাসিক্যধ্বনি + কম্পিতধ্বনি = স্মৃতি।

৫। নাসিক্যধ্বনি + কম্পিতধ্বনি = নৃত্য, মৃত, ম্রিয়মান।

৬। উষ্মধ্বনি + স্পর্শধ্বনি = স্কন্ধ, স্কুল, জ্বলন, স্ফটিক, স্পর্শ, স্থল, স্তব।

৭। উষ্মধ্বনি + পার্(্বিকধ্বনি = (-ীল, (-োক।

৮। উষ্মধ্বনি + স্পর্শধ্বনি + কম্পিতধ্বনি = স্ত্রী, স্পৃহা, স্পৃষ্ট।

৯। নাসিক্যধ্বনি + পার্(্বিকধ্বনি = ম্লান।

১০। উষ্মধ্বনি + কম্পিতধ্বনি = শ্রী, শ্রুতি।

সংযুক্ত(ব্যঞ্জনকে পরী(া করতে হয় শব্দের আদি অবস্থানে। ওপরের দৃষ্টান্তগুলিতে তা দেখানো হয়েছে। শব্দের মধ্যে বা অন্তে উচ্চারণের ধ্বনিবিভাজন প্রকৃতি সংযুক্ত(ব্যঞ্জনকে ভেঙ্গে অ(রসংখ্যা বাড়িয়ে দেয়। যেমন—ভ্রম, (-ীল, ম্লান, শ্রী, প্রাণ প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণে আদিতে সংযুক্ত(ব্যঞ্জন ভ্র, (-, ম্ল, শ্র, প্র

র(িত), কিন্তু এরা যদি শব্দের মধ্যে বা অন্তে অবস্থান করে তবে ধ্বনিবিভাজনের কবলে পড়ে। তখন আর সংযুক্ত(ব্যঞ্জন বিযুক্ত(হয়ে যায়। যেমন—বিভ্রম, অভ্র, অ(ীল, অম্লান, অম্ল, বিশ্রী, বিপ্র, আপ্রাণ উচ্চারণে দাঁড়ায় যথাত্র(মে বিভ্ + রম, অভ্ + র, অশ্ + লীল, অম্ + লান, অম্ + ল, বিশ্ + রী, বিপ্ + র, আপ্ + রাণ।

নীচে বাংলা সংযুক্ত(ব্যঞ্জনের তালিকা দেওয়া হল---

স্ক্ (স্কন্ধ),	স্খ্ (স্খলন),	স্ত্ (স্তব),	স্থ্ (স্থল),	স্ন্ (স্নায়ু),
স্প্ (স্পর্শ),	স্ফ্ (স্ফটিক),	শ্র্ (শ্রম),	(্ ((্ক),	স্প্র্ (স্পৃহা),
স্ত্র্ (স্ত্রী),	প্র্ (প্রাণ),	ব্র্ (ব্রত),	ভ্র্ (ভ্রম),	ত্র্ (ত্রাণ),
দ্র্ (দ্রুত),	ধ্র্ (ধ্রুপদ),	ত্র((ত্র(াধ),	গ্র্ (গ্রহ),	ঘ্র্ (ঘ্রাণ),
ম্র (মৃত),	ন্র, (নৃত্য),	প্ (প্লীহা),	ক্ল্ (ক্লেশ),	গ্ (গ্লানি),
ম্ল্ (ম্লান),	জ্র (জৃম্ভিত),	ড্র্ (ড্রাম),	খ্র্ (খ্রিস্টাব্দ),	ব্ল (ব্লাউজ),
স্ট্ (স্টেশন),	ফ্ল্ (ফ্ল্যাট),	ট্র্ (ট্রাম),	থ্র্ (থ্রেট),	স্ম (স্মার্ত),
ফ্র্ (ফ্রক),	হল্ ((াদিনী),	হ্র্ (হ্রদ),		

বাংলায় গৃহীত বিদেশী শব্দের সংযুক্ত(ব্যঞ্জনগুলিও এই হিসেবে ধরা আছে। এরূপ আটটি সংযুক্ত(ব্যঞ্জন হল---**স্ট্, ফ্ল্, ফ্র্, ড্র, খ্র, ব্ল, ট্র, থ্র**।

হল্ ও হ্র---এই দুটি সংযুক্ত(ব্যঞ্জনের দেখা মেলে শুধু কিছু তৎসম শব্দের সংস্কৃতানুগ উচ্চারণে। যেমন---**(াদিনী, হ্রদ, হৃদয়, হ্রাস, হৃত, হ্রেষা, হ্রীং** ইত্যাদি। ড. রামে(র শ হল্ ও হ্র-কে যুক্তি(যুক্ত(ভাবেই বাংলা সংযুক্ত(ব্যঞ্জনের তালিকায় রেখেছেন। যদিও মুহম্মদ আবদুল হাই-এর তালিকায় এই ধ্বনিগুলি অনুপস্থিত।

মোহম্মদ আবদুল হাই ও ড. রামে(র শ উভয়েই চ্ছ্র-কে তাদের তৈরি তালিকায় স্থান দিয়েছেন। কিন্তু এই ব্যঞ্জনটির বাগ্-ব্যবহারের সঠিক নমুনা আমরা পাইনা। 'কৃচ্ছ্র' বা 'উচ্ছ্রিয়া'---শব্দে **'চ্ছ্র'** কি আদৌ সংযুক্ত(ব্যঞ্জন? উচ্চারণকালে আমরা শব্দগুলির ধ্বনিবিজ্ঞান করি এই ভাবে---**'কৃছ্ + র'**, **'উছ্ + রিয়া'**। শব্দের আদিতেও 'চ্ছ্র'-এর ব্যবহার একেবারেই নেই। সবদিক বিচার করে চ্ছ্র-কে বাংলা সংযুক্ত(ব্যঞ্জনের তালিকার বাইরে রাখাই সমীচীন।

স্ম্-ধ্বনিটি মোহম্মদ আবদুল হাই এবং ড. রামে(র শ-এর প্রস্তুত তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। অথচ **'স্মৃতি'**, **'স্মার্ত'** প্রভৃতি শব্দ ধরলে 'স্ম্' ধ্বনির ব্যবহারে ও উচ্চারণে সংযুক্ত(ব্যঞ্জনের সব ল(ণই রয়েছে। একে আমরা সংযুক্ত(ব্যঞ্জনের তালিকার অন্তর্ভুক্ত(করেছি।

শুধু যুক্ত(া(রের সুনির্দিষ্ট বর্ণ-চিহ্নে(যুক্ত(ব্যঞ্জনের সমাবেশ থাকবে তা নয়, শব্দের মাঝখানে পাশাপাশি অবস্থানে এরা থাকতে পারে। এ(ত্রে প্রথমটি স্পর্শধ্বনি হলে তার উচ্চারণ হয়ে থাকে হলন্ত ব্যঞ্জনের ন্যায়। তার নিজস্ব স্বরধ্বনিটি অনুচ্চারিত থাকে। ব্যঞ্জনধ্বনির এ জাতীয় অসম্পূর্ণ উচ্চারণকে পাণিনি প্রমুখ পন্ডিতেরা বলেছেন 'অভিনিধান'। ধ্বনিবিদ্গণ ল(করেছেন, এই জাতীয় ধ্বনির (েত্রে প্রথম স্পর্শধ্বনিটি উচ্চারণের দিক দিয়ে সামান্য প্রলম্বিত হয়। বাংলায় এই স্পর্শধ্বনিগুলি অবস্থান করে দুটি স্বরধ্বনির মাঝখানে।

৪.৩.১১.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সংজ্ঞাটি লেখো।

২। বাংলা সংযুক্ত ব্যঞ্জনের গঠন স্বরূপ বিশ্লেষণ করো।

৪.৩.১১.৪ : গ্রন্থাবলি

১। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব। কলকাতা : নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৭ বুক কর্পোরেশন, ১৯৯৩।

২। প্রবাল দাশগুপ্ত, 'ভাষা বর্ণনার স্তর', **নিসর্গ** তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ: ১-১১৩।

৩। রামেশ্বর শ, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা। কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৮৮।

৪। H. A. Gleason, An Introduction to Descriptive Linguistics, Delhi : Oxford IBH, 1961.

৫। C. F. Hockette, A Course in Modern Linguistics. Delhi : Oxford IBH, 1976. Bernard Block and G. L. Trager, Outlines of Linguistic Analysis. New Delhi : Oriental Books Rঙ্গprint Corporation, 1972.

একক - ১২

সংযুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জন সমাবেশের পার্থক্য

বিন্যাস ক্রম :

৪.৩.১২.১ : সংযুক্ত(ব্যঞ্জন-এর সঙ্গে ব্যঞ্জন সমাবেশের পার্থক্য

৪.৩.১২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.৩.১২.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪.৩.১২.১ : সংযুক্ত(ব্যঞ্জন-এর সঙ্গে ব্যঞ্জন সমাবেশের পার্থক্য

আমরা সংযুক্ত(ব্যঞ্জন বিষয়ে আলোচনা করেছি। এবার আমরা আলোচনা করব ব্যঞ্জন-সমাবেশ বিষয়ে। সেই সঙ্গে জানা প্রয়োজন 'সংযুক্ত(ব্যঞ্জন' ও 'ব্যঞ্জন-সমাবেশ'-এর মধ্যে মিল ও অমিল কোথায়।

আমরা ড. রামে(র শ-এর বি(-ষণ উল্লেখ করেছি—"একাধিক ব্যঞ্জনের মাঝখানে কোনো স্বরধ্বনি যদি না থাকে এবং সেই ব্যঞ্জনগুলি যদি নিকট সন্নিবিষ্ট হয় তবে তাদের ব্যঞ্জন সমাবেশ (consonant combination) বলতে পারি। যেমন—'অন্তর' শব্দের 'ন্ + ত্'। কিন্তু একাধিক ব্যঞ্জনের মধ্যে যদি স্বরধ্বনি না থাকে, সেই ব্যঞ্জনগুলি যদি নিকট সন্নিবিষ্ট হয় এবং নি(াসের এক ধাক্কায় উচ্চারিত হয় তবে তাদের সংযুক্ত(ব্যঞ্জন (consonant cluster) বলে। যেমন—'স্ত্রী শব্দের 'স্ + ত্ + র্'।"

পূর্বে উল্লিখিত বাংলা সংযুক্ত(ব্যঞ্জনের তালিকা থেকে এটা স্পষ্ট যে বাংলায় সংযুক্ত(ব্যঞ্জনের সংখ্যা সীমিত। খাঁটি বাংলাব্যঞ্জন ২৮টি। বাংলায় গৃহীত বিদেশি শব্দের ব্যঞ্জন রয়েছে আরও ৮টি। সবমিলিয়ে সংযুক্ত(ব্যঞ্জনের সংখ্যা ৩৬। অন্যদিকে ব্যঞ্জন-সমাবেশের সংখ্যা প্রায় আড়াইশো।

ব্যঞ্জন-সমাবেশ বলতে ড. রামে(র শ-এর মন্তব্য স্মরণীয় যে, **"সব সংযুক্ত(ব্যঞ্জনই ব্যঞ্জন-সমাবেশ, কিন্তু সব ব্যঞ্জন যথার্থ সংযুক্ত(ব্যঞ্জন নয়।"** ধ্বনিতাত্ত্বিকগণ বাংলাভাষার নানা ব্যবহারিক নমুনা পরী(া করে সংযুক্ত(ব্যঞ্জন ও ব্যঞ্জন সমাবেশের সংখ্যা নির্ণয় করেছেন। পরিবর্তনশীল বাগ্‌ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে এই সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হতে পারে। মধ্যযুগ থেকে বিদেশি আগন্তুক শব্দের অনুপ্রবেশ বাংলার ধ্বনি ও উচ্চারণে বহুধা বৈচিত্র্য নিয়ে এসেছে। বিশেষ করে ফারসি, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজি থেকে আগত বহু সংখ্যক সংযুক্ত(ব্যঞ্জন বাংলার নিজস্ব সম্পদ হয়ে উঠেছে। বর্তমানে বি(ায়নের যুগে বি(ের অন্যান্য দেশের ভাষার অনিবার্য প্রভাব পড়ছে বাংলার ওপর। নিত্যনতুন শব্দ উপাদানে বাংলার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হচ্ছে। সেই অনুসারে নতুন নতুন ব্যঞ্জন-সমাবেশ ও সংযুক্ত(ব্যঞ্জনও আমাদের ভাষায় দেখা দিতে পারে।

বাংলা শব্দগঠনে নানা ব্যঞ্জনের সমাবেশে রয়েছে অপরিসীম বৈচিত্র্য। তার সামান্য কিছু রীতিপ্রকৃতি ও দৃষ্টান্ত নীচে দেখানো হল--

১। স্পর্শধ্বনি+স্পর্শধ্বনি--	ক্ +ট (এক্‌টা),	ক্ +দ (তক্‌দির),	ক্ +চ (চক্‌চক)
	গ্ + দ (দিগ্‌দর্শন),	গ্ + ফ (ভাগ্‌ফল),	চ্ +ক (বোচ্‌কা)
	চ্ + ট (পাঁচ্‌টা),	ছ্ + প (পিছ্‌পা)	জ্ +খ (বাজ্‌খাই)
	জ্ + প (রাজ্‌পুত),	ট +ক (মট্‌কা)	ঠ +ত (উঠতি)

২।	স্পর্শধ্বনি + নাসিক্যধ্বনি--	ক্ + ম (তক্‌মা),	গ্ +ন (ভাগ্‌নে),	ছ্ +ন (জোছ্‌না),
		জ্ + ম (এজ্‌মালি),	ট + ন (পাটনা),	ত্ + ন (পেত্‌নী)
		দ্ + ম (কদ্‌মা),	ব্ + ন (ভাবনা)	
৩।	স্পর্শধ্বনি + পার্শ্বিকধ্বনি--	ত্ + ল (তোত্‌লা),	ব্ +ল (বাব্‌লা),	প্ + ল (পাগ্‌লা)
৪।	স্পর্শধ্বনি + কম্পিতধ্বনি--	ক্ + র (ছোক্‌রা),	দ্ + র (দাদরা),	প্ + র (চাপরাশ)
৫।	স্পর্শধ্বনি + তাড়নজাত ধ্বনি--	ক্ + ড় (কাঁক্‌ড়া),	গ্ + ড় (ঝগ্‌ড়া),	প্ +ড় (পাপ্‌ড়ি)
৬।	স্পর্শধ্বনি + উষ্ম ধ্বনি--	গ্ + স (লাগ্‌সই),	ত্ + স (কুৎসা),	দ্ + শ (বাদ্‌শা)
৭।	উষ্মধ্বনি + স্পর্শধ্বনি--	শ + ক (মুশকিল),	শ্ + গ (মশ্‌গুল),	শ্ + ল (মশ্‌লা),
		ষ + ট (বোষ্টম)		
৮।	পার্শ্বিকধ্বনি + স্পর্শধ্বনি--	ল্ + গ (আল্‌গা),	ল্ + ট (পাল্‌টা),	ল্ + চ (বেল্‌চি)
৯।	পার্শ্বিকধ্বনি + নাসিক্যধ্বনি--	ল্ + ন (আল্‌না),	ল্ + ম (কল্‌মা)	
১০।	কম্পিত ধ্বনি + স্পর্শধ্বনি--	র্ + খ (বোর্‌খা),	র্ + দ (পর্দা),	র্ + চ (পরচা)
১১।	কম্পিত ধ্বনি + নাসিক্যধ্বনি--	র্ + ম (বর্মা),	র্ +ণ (ঝর্ণা)	
১২।	তাড়নজাত ধবনি + স্পর্শধ্বনি--	ড়্ + দ (খড়্‌দা),	ড়্ + ত (পড়্‌তি)	
১৩।	নাসিক্য ধ্বনি + অন্য ধ্বনি--	ন্ + ক (কান্‌কা),	ন্ + প (বোনপো),	ন্ + স (বন্‌সাই)
		ম্ + ছ (গামছা),	ম্ + ত (নিমতা),	ম + ল (আমলা)
		ঙ্ + ত (রাঙ্‌তা),	ঙ্ + ম (রঙ্‌মশাল)	

৪.৩.১২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। বাংলা যৌগিক স্বরের সংজ্ঞা দাও। যৌগিক স্বরের প্রকারভেদ দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করো।

২। দ্বিস্বরধ্বনি বলতে কী বোঝায়? বাংলা দ্বিস্বরধ্বনির একটি যুক্তি(সন্দত তালিকা প্রস্তুত করো।

৩। দ্বিস্বরধ্বনিগুলিকে নিয়মিত ও অনিয়মিত--এই দুই ভাগে ভাগ করার পিছনে কী যুক্তি(রয়েছে?

৪। বাংলা দ্বিস্বর, ত্রিস্বর, চতুস্বর ও পঞ্চস্বর ধ্বনিগুলি দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করো।

৫। সংযুক্ত(ব্যঞ্জন (consonant cluster) কাকে বলে? বাংলা সংযুক্ত(ব্যঞ্জন-এর গঠনবৈশিষ্ট্য উদাহরণসহ আলোচনা করো।

৬। বাংলায় ব্যঞ্জন-সমাবেশের আনুমানিক সংখ্যা কত? ব্যঞ্জন-সমাবেশের সঙ্গে সংযুক্ত(ব্যঞ্জন-এর পার্থক্য বুঝিয়ে দাও।

৭। "ধ্বনি ও হরফ যে এক নয় তার একটা বড় প্রমাণ হল বাংলার যুক্ত(া(রগুলো।"---এই কথার যৌক্তি(কতা কতখানি আলোচনা করো।

৮। "বাংলা শব্দের গঠনে নানা ব্যঞ্জনের সমাবেশে দেখা যায় অপরিসীম বৈচিত্র্য।"--আলোচনা করো।

৪.৩.১২.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। ড. রামেশ্বর শ'--সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৩৯৪ ব.।

২। ড. সুকুমার সেন--ভাষার ইতিবৃত্ত, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৮।

৩। মোহম্মদ আবদুল হাই--ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধবনিতত্ত্ব, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৮৫।

৪। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়--ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, রূপা, ১৯৮৮।

৫। David Crystal—The Cambridge Encyclopedia of Language, Cambridge University press, 1987.

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

বাংলা যৌগিক স্বর ও সংযুক্ত ব্যঞ্জন

একক - ৯

বাংলা যৌগিক স্বরের বৈশিষ্ট্য

বিন্যাস ক্রম :

৪.৩.৯.১ : যৌগিক স্বরের সংজ্ঞা

৪.৩.৯.২ : বাংলা যৌগিক স্বরের বৈশিষ্ট্য

৪.৩.৯.৩ : একক ও যৌগিক স্বরের মধ্যে পার্থক্য কী?

৪.৩.৯.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.৩.৯.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪.৩.৯.১ : যৌগিক স্বরের সংজ্ঞা

স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি একক ভাবে থাকতে পারে, আবার যুক্ত(ভাবেও থাকতে পারে। একটি স্বরের সঙ্গে অন্য স্বরের যোগের ফলে যৌগিক স্বর-এর উদ্ভব ঘটে। এর সংজ্ঞা দেওয়া যায় এই ভাবে--- "নিঃ(শ্বাসবায়ুর ন্যূনতম প্রয়াসে অর্থাৎ (শ্বাসবায়ুর এক ধাক্কায় ('one breath impulse') যদি একাধিক স্বরধ্বনি যুক্ত(ভাবে একটিমাত্র অ(র-এ নিবদ্ধ থেকে উচ্চারিত হয় তবে এই স্বরগুচ্ছকে বলা হয় যৌগিক স্বর"।

৪.৩.৯.২ : বাংলা যৌগিক স্বরের বৈশিষ্ট্য

উচ্চারণ-প্রক্রি(য়া অনুযায়ী স্বর দু-প্রকার---একক **স্বর** ও **যৌগিক স্বর**। দেবনাগরী ও বাংলা অ(রমালায় স্বরধ্বনির তালিকায় একক স্বরধ্বনির সঙ্গে দুটি ব্যতিক্র(মী ধ্বনি চিহ্(পাওয়া যায়। এগুলি হল---**'ঐ'**, **'ঔ'**। এরা কিন্তু একক স্বরধ্বনি নয়। এই স্বরধ্বনি দুটিকে চিহ্নি(ত করা হয় যৌগিক স্বর রূপে। এদের মধ্যে যুক্ত(ভাবে আছে দুটি করে একক স্বর। ধ্বনি বি(-ষণ করলে দাঁড়ায় বাংলা উচ্চারণে ঐ = ওই, ঔ = ওউ।

বাংলা লিপির (ে ত্রে যৌগিক স্বরের বর্ণচিহ্(গুলি নিশ্চয়ই বাড়তি কিছু সুবিধা আমাদের দেয়। সই, বই, কই, মউ, বউ লেখার বদলে সৈ, বৈ, কৈ, মৌ, বৌ লিখে আমরা সং(পে কাজ সারতে পারি।

প্রচলিত অ(রমালায় দুটি মাত্র যৌগিক স্বরের উল্লেখ থেকে এমন মনে করার কারণ নেই যে সংস্কৃত বা বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরের তালিকা শুধু এই দুটি ধ্বনিতেই শেষ। রয়েছে আরো অনেক যৌগিক স্বর। স্বতন্ত্র বর্ণচিহ্(না থাকলেও এগুলির অস্তিত্ব সংশয়াতীত ভাবে বিদ্যমান।

এই, আই, ওই, আউ, এও, ইএ, ইআ ইত্যাদি বহু ধ্বনি সংস্কৃতে ও বাংলায় অপর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে, অথচ এগুলির জন্য—ঐ এবং ঔ-এর মতো কোনো পৃথক বর্ণচিহ্(কল্পিত হয়নি।

৪.৩.৯.৩ : একক ও যৌগিক স্বরের মধ্যে পার্থক্য কী?

সাধারণভাবে মনে হতে পারে, একক ও যৌগিক স্বরের মধ্যে পার্থক্য বোধহয় সংখ্যা বা পরিমাণগত। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তা নয়। স্বরধ্বনির সংখ্যা নয়, স্বরধ্বনির বিশেষ গুণ (quality) বা উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই একক স্বর থেকে যৌগিক স্বর আলাদা হয়ে যায়।

সচরাচর দুটি স্বর যুগ্মভাবে যৌগিক স্বর গঠন করে বলে এর অন্য নাম দ্বিস্বর ধ্বনি (diphthong)। ভাষাতাত্ত্বিক David Crystal-এর ভাষায় Diphthong হল 'A vowel with a perceptible change of quality during a single syllable'. এখানে 'a perceptible change of quality' এবং 'single syllable' কথাগুলি অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ। দ্বিস্বরধ্বনিতে বাহ্যত দুটি স্বরধ্বনি হাজির থাকলেও উচ্চারণের সময় দ্বিস্বরধ্বনি হয়ে ওঠে এক-আ(রিক ('single syllable')। নিয়মমত দুটি স্বর আলাদাভাবে দুই অ(র হওয়ার কথা। কিন্তু, উচ্চারণগুণে এরা এক-আ(রিক হয়ে উঠতে পারে। উচ্চারণ-প্রত্রি(য়া বি(-ষণ করে ধ্বনিবিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, এরূপ ঘটনার পেছনে রয়েছে স্বরধ্বনির 'a perceptible change of quality'। আর এই স্বরের গুণগত বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে মুখগহ্বরে জিহ্বার অবস্থানের ওপর। একক স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা কোনো না কোনো সুনির্দিষ্ট অবস্থানে থাকে। শুধু জিহ্বার অবস্থান নয়, ওষ্ঠাধর ও মুখবিবরের আকৃতিও যথানির্দিষ্ট। ই, এ, অ্যা, আ, অ, ও, উ ইত্যাদি স্বরধ্বনি উচ্চারণের বেলায় জিহ্বার অবস্থান সুনির্দিষ্ট। এক ধ্বনি উচ্চারণ করতে গিয়ে জিহ্বা অন্যস্থানে যায় না। কাজে কাজেই এরা একক স্বরধ্বনি। কিন্তু এমন যদি দেখা যায় যে কোনো ধ্বনির উচ্চারণকালে জিহ্বা অতিদ্রুত এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানের দিকে সরে যায় এবং সমগ্র উচ্চারণ-প্রত্রি(য়াটি নিঃ(াস বায়ুর এক ধাক্কার মধ্যে (অর্থাৎ এক অ(র বা সিলেবলের উচ্চারণকাল) নিষ্পন্ন হয়, তবে এই স্বরধ্বনিকে বলা হয় যৌগিক স্বর। ধরা যাক্, ঐ, ঔ শব্দ দুটি। ঐ (ওই) উচ্চারণের সময় জিহ্বা প্রথমে পশ্চাৎ (back) ও মধ্যউচ্চ (mid-high) অবস্থানে থেকে 'ও' উচ্চারণ করে, পরমুহূর্তেই দ্রুত সম্মুখ (front) ও উচ্চ (high) অবস্থানে এগিয়ে গিয়ে 'ই' উচ্চারণ করে। 'ঔ' (ওউ) উচ্চারণের সময় একই প্রত্রি(য়ায় জিহ্বা প্রথমে 'ও' উচ্চারণ সেরে পশ্চাৎ (back) ও উচ্চ (high) অবস্থানে গিয়ে 'উ' উচ্চারণ সম্পন্ন করে। সাধারণত একক স্বর উচ্চারণের সময় জিহ্বাকে যতটুকু কাল(প করতে হয় এ(ত্রে ঐ সময়ের মধ্যে দুটো ধ্বনির উচ্চারণ শেষ করতে হয়। দ্রুততার কারণে দ্বিতীয় স্বরধ্বনিটি কখনোই পূর্ণাঙ্গ হয় না--- তা অর্ধস্বরের মতো অর্ধোচ্চারিত থেকে যায়। পৃথকভাবে উচ্চারণকালে যে ধ্বনি স্বয়ংসম্পূর্ণ মুত্ত(অ(র বা মুত্ত(দল (open syllable), যৌগিক স্বরের মধ্যে অন্তিম অবস্থানে তা-ই বদ্ধ অ(র বা (দ্ধ দল (closed syllable) হয়ে যায়। ভাষাতাত্ত্বিক মোহম্মদ আবদুল হাইয়ের ভাষায় বলা চলে---"দ্বৈতস্বর একা(রিক (monosyllable) হওয়ার জন্যে তার প্রথম স্বরধ্বনিটি যেমন দীর্ঘ হয় তেমনি তার দ্বিতীয়টি স্বতন্ত্রভাবে কিংবা শব্দের মধ্যে তার নিজস্ব রূপে উচ্চারিত হলে যেমন পূর্ণতা পায়, এখানে সেভাবে পূর্ণতালাভ করেনা। অন্য কথায় দ্বৈতস্বরের দ্বিতীয় স্বরধ্বনিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বরধ্বনি নয়"।

নমুনা হিসেবে শোও্, আয়্, যাই, ফাও্, ওই্, উই্ ইত্যাদি যৌগিক স্বরধ্বনির প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর পরী(া করলেই উত্তি(টির তাৎপর্য বোঝা যাবে। শো + ও্, আ + য়্, যা + ই, ফা + ও্, ও + ই্, উ + ই্-- এই দৃষ্টান্তগুলিতে যৌগিক স্বরধ্বনির অন্তর্গত দুটি স্বরের মধ্যে পরিমাণগত প্রভেদ বিদ্যমান। শো, আ্, যা, ফা্, ও, উ প্রভৃতি প্রথম স্বর পূর্ণভাবে উচ্চারিত হয়, কিন্তু ও্, য়্, ই, ও্, ই্, ই্ প্রভৃতি দ্বিতীয় স্বর অর্ধস্বরের মতো পিচ্ছিল ও অসম্পূর্ণভাবে উচ্চারিত হয়।

বলা হয়েছে, যৌগিক স্বর এক-আ(রিক (monosyllable)। তবে উচ্চারণের শিথিলতার কারণে কোনো কোনো যৌগিক স্বরধ্বনি দু-অ(রে সম্প্রাসিরত হতে পারে। উচ্চারণনির্ভর বলে এদেরকে জল-

অচল নিয়মে বাঁধা যায় না। সে(ে ত্রে এরা আর এক-অ(র থাকে না এবং তখন এদের আর যৌগিক স্বরও বলা যায় না। উচ্চারণরীতির তারতম্য সহজেই অ(র সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটায়। বাংলা ছন্দের বিভিন্ন রীতির আলোকে **এই, ওই, আই, আউ, ইএ** প্রভৃতি যৌগিক স্বরধ্বনির উচ্চারণ বি(-ষণ করলে অ(র ও মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধির বৈচিত্র্য বুঝতে সুবিধা হবে।

সেই, ওই, তাও---এই যৌগিক স্বরধ্বনিগুলিকে পরী(া করা যাক্। একা(রে সীমাবদ্ধ এই যৌগিক স্বরগুলি উচ্চারণের তারতম্যে হয়ে যায় দুই মাত্রা। যদি বলি,

"তোমার সঙ্গে **সে-ই** কবে দেখা!"

"নিষেধ করছি, **তা-ও** তুমি যাবে?"

"**ও-ই** এখানে এসেছে, অন্য কেউ নয়।"

এখানে উচ্চারণের সময় নিশ্চয় 'সে-ই', 'তা-ও', 'ও-ই' প্রভৃতি স্বরধ্বনি আর একা(রে সীমাবদ্ধও থাকে না, অতএব এদের আর যৌগিক স্বরধ্বনি বলা সম্ভব নয়। অতএব, মনে রাখা আবশ্যক, দুটি স্বর পাশাপাশি অবস্থিত থেকেও যদি নিঃ(াসের এক ধাক্কায় উচ্চারিত না হয় তবে এই দুটি স্বরকে কোনোভাবেই যৌগিকস্বর বলার উপায় নেই।

৪.৩.৯.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। যৌগিক স্বরের সংজ্ঞা দাও।

২। বাংলা যৌগিক স্বরের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

৩। কয়েকটি যৌগিক স্বরের উদাহরণ দাও।

৪। একক স্বর ও যৌগিক স্বরের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৫। বাংলা যৌগিক স্বরের উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করে দেখাও।

৪.৩.৯.৪ : গ্রন্থাবলি

১। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব। কলকাতা : নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৭ বুক কর্পোরেশন, ১৯৯৩।

২। প্রবাল দাশগুপ্ত, 'ভাষা বর্ণনার স্তর', **নিসর্গ** তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ: ১-১১৩।

৩। রামেশ্বর শ, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা। কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৮৮।

৪। H. A. Gleason, An Introduction to Descriptive Linguistics, Delhi : Oxford IBH, 1961.

৫। C. F. Hockette, A Course in Modern Linguistics. Delhi : Oxford IBH, 1976. Bernard Block and G. L. Trager, Outlines of Linguistic Analysis. New Delhi : Oriental Books Rঙ্গprint Corporation, 1972.

একক - ১০

যৌগিক স্বরের তালিকা

বিন্যাস ক্রম :

৪.৩.১০.১ : বাংলা যৌগিক স্বরের প্রকারভেদ

৪.৩.১০.২ : বাংলা যৌগিক স্বরের তালিকা

৪.৩.১০.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.৩.১০.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪.৩.১০.১ : বাংলা যৌগিক স্বরের প্রকারভেদ

অধ্যাপক মোহম্মদ আবদুল হাই উপরোত্ত(এই বৈশিষ্ট্যের দিকে ল(রেখে দ্বিস্বরধ্বনিগুলিকে নিয়মিত ও অনিয়মিত--এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। নিঃ্বাসের এক প্রয়াসে দ্রুত উচ্চারিত হয়ে সহজেই এক অ(রে আবদ্ধ থাকে যেসব দ্বিস্বরধ্বনিকে তিনি বলেছেন নিয়মিত, আর উচ্চারণ-প্রসারণের কারণে যেসব দ্বিস্বরধ্বনি এক ঝোঁকে উচ্চারিত নাও হতে পারে সেসব দ্বিস্বরধ্বনিকে বলেছেন অনিয়মিত দ্বিস্বরধ্বনি। তিনি বাংলা যৌগিক স্বরের যে তালিকা প্রস্তুত করেছেন তা এরূপ---

নিয়মিত দ্বিস্বর-ধ্বনি–

ইই (নিই, দিই)	ইউ (পিউ, শিউ)	এই (এই, সেই)	এও (ফেও)
এউ (ঘেউ)	এ্যাও (দ্যাও)	এ্যায় (ন্যায়)	আই (যাই)
আএ (যায়)	আও (যাও)	আউ (লাউ)	অএ (নয়)
অও (নও)	ওও (শোও)	ওউ (মউ)	ওই (ওই)
ওএ (শোয়)	উই (উই, (ই, পুঁই)		

অনিয়মিত দ্বিস্বর-ধ্বনি

ইএ (নিয়ে)	ইআ (মিয়া, নিয়া, সিয়া)	ইও (নিও)	এআ (কেয়া)
এও (খেও)	এ্যায়া (ন্যায়া)	অআ (নয়া)	ওআ (মোয়া)
ওএ (সয়ে)	উএ (নুয়ে)	উআ (চুয়া)	

৪.৩.১০.২ : বাংলা যৌগিক স্বরের তালিকা

দ্বিস্বরধ্বনির উপরোত্ত(বিভাজন অবশ্যই বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। তাছাড়া, বাংলায় মোট যৌগিক স্বরের সংখ্যা নির্ধারণের (েত্রেও ভাষাতাত্ত্বিক মধ্যে মতভেদ যথেষ্ট। আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলায় দ্বিস্বরধ্বনির সংখ্যা ২৫। তিনি নিয়মিত-অনিয়মিত ইত্যাদি বিভাজনের কথা ভাবেননি। কিন্তু, উচ্চারণের তারতম্যে প্রতিটি যৌগিক স্বরই যে পৃথকভাবে ভেঙে যেতে পারে তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। "দ্রুত উচ্চারণে, পূর্বোত্ত(স্বরধ্বনিগুলি যৌগিক স্বরধ্বনি হইয়া যায়, আবার ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলে,

দুইটি পৃথক স্বররূপেই প্রতিভাত হয়।" ড. মোহম্মদ আবদুল হাই-এর মতে যৌগিক স্বরের সংখ্যা ২৯। তাঁর সমী(া অনুযায়ী নিয়মিত দ্বিস্বরের সংখ্যা ১৮, অনিয়মিত দ্বিসরের সংখ্যা ১১। ড. রামে(বের শ' সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতকেই গ্রহণ করেছেন। অধ্যাপক পবিত্র সরকারের মতে যৌগিক স্বরের সংখ্যা ১৭।

নীচে উত্ত(ভাষাবিজ্ঞানীদের প্রস্তুত বাংলা দ্বিস্বরধ্বনির তালিকা দেওয়া হল—

মোহ. আব. হাই-কৃত	ড. সুনীতি চট্টো.-কৃত	ড. রামে(বের শ-কৃত	পবিত্র সরকার কৃত
ইই			ইই
ইউ	ইউ	ইউ	ইউ
এই	এই	এই	এই
এও	এও	এও	এও
এউ	এউ	এউ	এউ
এ্যাও	অ্যাও	অ্যাও	অ্যাও
এ্যায়	এয়, অ্যায়	অ্যাএ	অ্যাএ
আই	আই	আই	আই
আয়	আয়	আএ	আএ
আও	আও	আও	আও
আউ	আউ	আউ	আউ
অয়	অয়	অয়	অয়
অও	অও	অও	অও
ওও			ওও
ওউ	ওউ অউ, ঔ	ওউ, ঔ	ওউ, ঔ
ওই	ওই, ঐ	ওই	ওই
ওয়	ওয়	ওএ	ওএ
উই	উই	উই	উই
ইয়ে	ইয়ে, ইএ,	ইএ	
ইয়া	ইয়া	ইআ	
ইয়ো	ইয়ো	ইও	
এয়া	এয়া	এআ	
এ্যায়া			
অয়া			
ওয়া	ওয়া, ওআ	ওআ	
ওয়ে			
উয়ে	উয়ে	উএ	
উয়া	উয়া	উআ	
উয়ো	উয়ো, উও	উও	
	অআ	অআ	

দুটি ধ্বনির মিলনে যেমন ‘দ্বিস্বর’-ধ্বনি, তেমনি তিনটি, চারটি বা পাঁচটি ধ্বনির যোগে তৈরি হয়ে থাকে যথাত্র(মে ‘ত্রিস্বর’, ‘চতুঃস্বর’ ও ‘পঞ্চস্বর’ ধ্বনি। বাংলাভাষায় এই জাতীয় ধ্বনির সংখ্যা কম নয়। অবশ্য যুক্ত(ভাবে থাকলেও এইগুলিকে যৌগিক স্বর বলা যাবে না, কারণ (শ্বাসবায়ুর এক ধাক্কায় এরা উচ্চারিত হয় না বা এক অ(রের মধ্যে সীমাবদ্ধও থাকে না। নীচে বিভিন্ন স্বর-সমাবেশের বৈচিত্র্য দেখানো হল---

ত্রিস্বর -	ইআও (মিঁয়াও)	ইএই (নিয়েই)	আইও (খাইও)	এইএ (ধেইয়ে)
	ওআও (নোয়াও)	উইএ (শুইয়ে)	এইও (হেইও)	এআই (বেয়াই)
	এআও (ধেয়াও)	আওআ (হাওয়া)	ইত্যাদি।	
চতুঃস্বর -	অওআই (হওয়াই)	এওআই (দেওয়াই)	আওআই (খাওয়াই)	ইত্যাদি।
পঞ্চস্বর -	আওআইও (খাওয়াইও)			

৪.৩.১০.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। বাংলা যৌগিক স্বরের প্রকারভেদ করো।

২। দ্বিস্বর ধ্বনি কাকে বলে?

৩। দ্বিস্বর ধ্বনির তালিকাটি উল্লেখ করো।

৪। বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী কৃত বাংলা যৌগিক স্বরের তালিকাটি প্রস্তুত করো।

৪.৩.১০.৪ : গ্রন্থাবলি

১। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব। কলকাতা : নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৭ বুক কর্পোরেশন, ১৯৯৩।

২। প্রবাল দাশগুপ্ত, ‘ভাষা বর্ণনার স্তর’, **নিসর্গ** তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ: ১-১১৩।

৩। রামেশ্বর শ, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা। কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৮৮।

৪। H. A. Gleason, An Introduction to Descriptive Linguistics, Delhi : Oxford IBH, 1961.

৫। C. F. Hockette, A Course in Modern Linguistics. Delhi : Oxford IBH, 1976. Bernard Block and G. L. Trager, Outlines of Linguistic Analysis. New Delhi : Oriental Books R≫print Corporation, 1972.

একক - ১১

সংযুক্তব্যঞ্জনের সংজ্ঞা ও গঠন বৈশিষ্ট্য

বিন্যাস ক্রম :

৪.৩.১১.১ : সংযুক্ত(ব্যঞ্জনের সংজ্ঞা

৪.৩.১১.২ : বাংলা সংযুক্ত(ব্যঞ্জন-এর গঠন বৈশিষ্ট্য

৪.৩.১১.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.৩.১১.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪.৩.১১.১ : সংযুক্ত(ব্যঞ্জনের সংজ্ঞা

আমরা স্বরধ্বনির যুক্ত(-অবস্থান বিষয়ে আলোচনা করলাম। এবার ব্যঞ্জনধ্বনির যুক্ত(ভাবে উচ্চারণের প্রাসঙ্গিক দিক নিয়ে আলোচনায় প্রবেশ করা যেতে পারে।

দুটি বা তার বেশি ব্যঞ্জনধ্বনি যদি নিঃ(াসের এক ধাক্কায় (one breath articulation) একা(র নিবদ্ধ হয়ে যুক্ত(ভাবে উচ্চারিত হয় তবে সেই ব্যঞ্জনধ্বনিকে বলা হয় 'সংযুক্ত(ব্যঞ্জন' (Consonant cluster /Conjunct consonant)।

মোহম্মদ আবদুল হাই সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে---'বিভিন্ন স্থানজাত একাধিক ধ্বনি নিঃ(াসের এক প্রয়াসে উচ্চারিত হয়ে যদি একাত্মতা লাভ করে তা হলেই তা যথার্থ সংযুক্ত(ধ্বনি বা consonant cluster নামে অভিহিত হবার যোগ্যতা অর্জন করে।

ড. রামে(র শ' সংযুক্ত(ব্যঞ্জনকে চিহ্নি(ত করেছেন এইভাবে---কোনো ভাষায় অ(রের (syllable) প্রারম্ভে (onset) অথবা অন্তে (coda) অবস্থি যে ক-টি ব্যঞ্জন অ(রকেন্দ্রিক স্বরধ্বনির সঙ্গে এক ধাক্কায় উচ্চারিত হয় সে ক-টি ব্যঞ্জনকে যথার্থ সংযুক্ত(ব্যঞ্জন (consonant cluster) বলে।

৪.৩.১১.২ : বাংলা সংযুক্ত(ব্যঞ্জন-এর গঠন বৈশিষ্ট্য

সংযুক্ত(ব্যঞ্জন-এর গঠন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনার আগে আমাদের 'যুক্ত(-অ(র'-এর সঙ্গে এর প্রভেদ বুঝে নিতে হবে। প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক ছোটবেলা থেকে আমাদের মধ্যে কিছু ভ্রান্ত ধারণা তৈরি করে দিয়েছে যে দুটি ব্যঞ্জন যুক্ত(ভাবে থাকলেই তা যুক্ত(ব্যঞ্জন। শিশু-পাঠ্যপুস্তকে ফলাযুক্ত(ব্যঞ্জন (র-ফলা, ল-ফলা, ম-ফলা ইত্যাদি) বা যুক্ত(া(রের তালিকাও দেয়া থাকে। পাশাপাশি থাকা ব্যঞ্জন দুটির মাঝে কোনো স্বরধ্বনি নেই বলে এরা পরস্পর যুক্ত(ভাবে রয়েছে—এটা বুঝতে কারোরই অসুবিধা হয়না, কিন্তু বর্ণ-চিহ্নে(র এই যুক্ত(ভাব উচ্চারণে র(িত কিনা অর্থাৎ দৃশ্যমান হরফের সঙ্গে শ্রব্যমান ধ্বনির সামঞ্জন্য কতখানি র(িত তা নিয়ে সাধারণ পাঠকের মাথাব্যাথা কম।

'যুক্ত(া(র' ও 'যুক্ত(ব্যঞ্জন' এক নয়। অথচ এই দুইকে একই অর্থে ব্যবহার করতে আমরা অভ্যস্ত। সংস্কৃত বর্ণমালার উত্তরাধিকার-সূত্রে আমরা প্রচুর যুক্ত(া(র-চিহ্নি(ত বর্ণ বাংলায় পেয়েছি। যুক্ত(া(রপূর্ণ কয়েকটি পংক্তি(বা চরণ উদ্ধার করা যাক—

১। মঞ্জুবিকচ কুসুমপুঞ্জ মধুপশব্দগঞ্জিগুঞ্জ

কুঞ্জরগতি গঞ্জিগমন মঞ্জুলকুলনারী।

২। নন্দপুরচন্দ্রবিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।

৩। সুরাঙ্গনা নন্দনের নিকুঞ্জ প্রাঙ্গনে।

মন্দার মঞ্জরি তোলে চঞ্চল কঙ্কনে।।

৪। অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ ত্র(ন্দন।

ঞ্জ, ন্দ, ন্দ্র, ন্ধ, ঙ্গ, ঞ্চ, ঙ্ক, ন্ত, র্গূ, চ্ছ প্রভৃতি অ(রে অবশ্যই দুই বা তার বেশি ব্যঞ্জন যুক্ত(ভাবে রয়েছে। যেহেতু যুক্ত(ভাবে আছে তাই এগুলি যুক্ত(া(র। মনে রাখা জ(রি, এগুলি কিন্তু যুক্ত(ব্যঞ্জন নয়। যদিও এদেরকে অসতর্ক ভাবে যুক্ত(ব্যঞ্জন নামে অভিহিত করতে অভ্যস্ত অনেকেই। ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনায় যুক্ত(ব্যঞ্জনের ভিন্ন তাৎপর্য নির্দেশিত হয়েছে। ধ্বনিবি(-ষণে সহজেই ধরা পড়বে যে বর্ণচিহে(যুক্ত(ভাবে থাকলেও উচ্চারণে এরা যুক্ত(ভাবে নেই। মঞ্জু-র উচ্চারণ হয়ে থাকে ‘মন্ + জু’ এই ভাবে। অনুরূপভাবে--নন্দ = নন্ + দ, চন্দ্র = চন্ + দ্র, বৃন্দা = বৃন্ + দা, অন্ধ = অন্ + ধ ইত্যাদি। ঞ্জ, ন্দ, ন্দ্র, ন্ধ, ঙ্গ, ঞ্চ , ঙ্ক, ন্ত, র্গূ, চ্ছ—এই সংযুক্ত(ধ্বনিগুলি স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারণসাধ্যই নয়। পূর্বধ্বনির সহায়তা ছাড়া এদের উচ্চারণ অসম্ভব। আবার শব্দে নিবদ্ধ থাকলেও নিঃ(াসের এক ঝোঁকে এদের উচ্চারণ করা যায় না। কাজেই সংযুক্ত(ব্যঞ্জনের বিশেষ ল(ণ এদের মাঝে নেই। মুহম্মদ আবদুল হাই-এর মন্তব্য অনস্বীকার্য যে, “ধ্বনি ও হরফ যে এক নয় তার একটা বড় প্রমাণ হল বাংলার যুক্ত(া(রগুলো।” অ(রের সংযুক্ত(তার দিক দিয়ে বিচার করে বাংলা ভাষায় যুক্ত(া(র-এর সংখ্যা প্রায় আড়াইশো। অন্যদিকে সংযুক্ত(ব্যঞ্জনের সংখ্যা অতি নগণ্য।

স্পর্শধ্বনি, উষ্মধ্বনি, নাসিক্যধ্বনি, কম্পিতধ্বনি ও পার্(িকধ্বনির মধ্যে দুটি বা তিনটি ধ্বনির পরস্পর মিলনে বাংলা সংযুক্ত(ব্যঞ্জন কীভাবে গঠিত হয়ে থাকে তা নীচে দেখানো হল---

১। স্পর্শধ্বনি + কম্পিতধ্বনি = প্রাণ, ভ্রম, ঘ্রাণ, ঘৃত, ব্রীড়া।

২। স্পর্শধ্বনি + পার্(িকধ্বনি = ক্লেশ, প-ীহা, গ-ানি।

৩। উষ্মধ্বনি + নাসিক্যধ্বনি = স্মরণ, স্নান।

৪। উষ্মধ্বনি + নাসিক্যধ্বনি + কম্পিতধ্বনি = স্মৃতি।

৫। নাসিক্যধ্বনি + কম্পিতধ্বনি = নৃত্য, মৃত, ম্রিয়মান।

৬। উষ্মধ্বনি + স্পর্শধ্বনি = স্কন্ধ, স্কুল, জ্বলন, স্ফটিক, স্পর্শ, স্থল, স্তব।

৭। উষ্মধ্বনি + পার্(িকধ্বনি = (-ীল, (-াক।

৮। উষ্মধ্বনি + স্পর্শধ্বনি + কম্পিতধ্বনি = স্ত্রী, স্পৃহা, স্পৃষ্ট।

৯। নাসিক্যধ্বনি + পার্(িকধ্বনি = ম্লান।

১০। উষ্মধ্বনি + কম্পিতধ্বনি = শ্রী, শ্রুতি।

সংযুক্ত(ব্যঞ্জনকে পরী(া করতে হয় শব্দের আদি অবস্থানে। ওপরের দৃষ্টান্তগুলিতে তা দেখানো হয়েছে। শব্দের মধ্যে বা অন্তে উচ্চারণের ধ্বনিবিভাজন প্রকৃতি সংযুক্ত(ব্যঞ্জনকে ভেঙ্গে অ(রসংখ্যা বাড়িয়ে দেয়। যেমন—ভ্রম, (-ীল, ম্লান, শ্রী, প্রাণ প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণে আদিতে সংযুক্ত(ব্যঞ্জন ভ্র, (-, ম্ল, শ্র, প্র

র(িত), কিন্তু এরা যদি শব্দের মধ্যে বা অন্তে অবস্থান করে তবে ধ্বনিবিভাজনের কবলে পড়ে। তখন আর সংযুক্ত(ব্যঞ্জন বিযুক্ত(হয়ে যায়। যেমন—বিভ্রম, অভ্র, অ(ীল, অম্লান, অম্ল, বিশ্রী, বিপ্র, আপ্রাণ উচ্চারণে দাঁড়ায় যথাত্র(মে বিভ্ + রম, অভ্ + র, অশ্ + লীল, অম্ + লান, অম্ + ল, বিশ্ + রী, বিপ্ + র, আপ্ + রাণ।

নীচে বাংলা সংযুক্ত(ব্যঞ্জনের তালিকা দেওয়া হল---

স্ক্ (স্কন্ধ),	স্খ্ (স্খলন),	স্ত্ (স্তব),	স্থ্ (স্থল),	স্ন্ (স্নায়ু),
স্প্ (স্পর্শ),	স্ফ্ (স্ফটিক),	শ্র্ (শ্রম),	(্ ((েক),	স্প্র্ (স্পৃহা),
স্ত্র্ (স্ত্রী),	প্র্ (প্রাণ),	ব্র্ (ব্রত),	ভ্র্ (ভ্রম),	ত্র্ (ত্রাণ),
দ্র্ (দ্রুত),	ধ্র্ (ধ্রুপদ),	ত্র((ত্রে(াধ),	গ্র্ (গ্রহ),	ঘ্র্ (ঘ্রাণ),
ম্র (মৃত),	ন্র, (নৃত্য),	প্ (প্ীহা),	ক্ল্ (ক্লেশ),	গ্ (গ্নি),
ম্ল্ (ম্লান),	জ্র (জৃম্ভিত),	ড্র্ (ড্রাম),	খ্র্ (খ্রিস্টাব্দ),	ব্ল (ব্লাউজ),
স্ট্ (স্টেশন),	ফ্ল্ (ফ্ল্যাট),	ট্র্ (ট্রাম),	থ্র্ (থ্রেট),	স্ম (স্মার্ত),
ফ্র্ (ফ্রক),	হল্ ((াদিনী),	হ্র্ (হ্রদ),		

বাংলায় গৃহীত বিদেশী শব্দের সংযুক্ত(ব্যঞ্জনগুলিও এই হিসেবে ধরা আছে। এরূপ আটটি সংযুক্ত(ব্যঞ্জন হল---**স্ট্, ফ্ল্, ফ্র্, ড্র, খ্র, ব্ল, ট্র, থ্র**।

হল্ ও হ্র---এই দুটি সংযুক্ত(ব্যঞ্জনের দেখা মেলে শুধু কিছু তৎসম শব্দের সংস্কৃতানুগ উচ্চারণে। যেমন---**(াদিনী, হ্রদ, হৃদয়, হ্রাস, হৃত, হ্রেষা, হ্রীং** ইত্যাদি। ড. রামে(র শ হল্ ও হ্র-কে যুক্তি(যুক্ত(ভাবেই বাংলা সংযুক্ত(ব্যঞ্জনের তালিকায় রেখেছেন। যদিও মুহম্মদ আবদুল হাই-এর তালিকায় এই ধ্বনিগুলি অনুপস্থিত।

মোহম্মদ আবদুল হাই ও ড. রামে(র শ উভয়েই চ্ছ্র-কে তাদের তৈরি তালিকায় স্থান দিয়েছেন। কিন্তু এই ব্যঞ্জনটির বাগ্-ব্যবহারের সঠিক নমুনা আমরা পাইনা। 'কৃচ্ছ্র' বা 'উচ্ছ্রিয়া'---শব্দে **'চ্ছ্র'** কি আদৌ সংযুক্ত(ব্যঞ্জন? উচ্চারণকালে আমরা শব্দগুলির ধ্বনিবিজ্ঞান করি এই ভাবে---**'কৃছ্ + র'**, **'উছ্ + রিয়া'**। শব্দের আদিতেও 'চ্ছ্র'-এর ব্যবহার একেবারেই নেই। সবদিক বিচার করে চ্ছ্র-কে বাংলা সংযুক্ত(ব্যঞ্জনের তালিকার বাইরে রাখাই সমীচীন।

স্ম্-ধ্বনিটি মোহম্মদ আবদুল হাই এবং ড. রামে(র শ-এর প্রস্তুত তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। অথচ **'স্মৃতি'**, **'স্মার্ত'** প্রভৃতি শব্দ ধরলে 'স্ম্' ধ্বনির ব্যবহারে ও উচ্চারণে সংযুক্ত(ব্যঞ্জনের সব ল(ণই রয়েছে। একে আমরা সংযুক্ত(ব্যঞ্জনের তালিকার অন্তর্ভুক্ত(করেছি।

শুধু যুক্ত(া(রের সুনির্দিষ্ট বর্ণ-চিহ্নে(যুক্ত(ব্যঞ্জনের সমাবেশ থাকবে তা নয়, শব্দের মাঝখানে পাশাপাশি অবস্থানে এরা থাকতে পারে। এ(ত্রে প্রথমটি স্পর্শধ্বনি হলে তার উচ্চারণ হয়ে থাকে হলন্ত ব্যঞ্জনের ন্যায়। তার নিজস্ব স্বরধ্বনিটি অনুচ্চারিত থাকে। ব্যঞ্জনধ্বনির এ জাতীয় অসম্পূর্ণ উচ্চারণকে পাণিনি প্রমুখ পন্ডিতেরা বলেছেন 'অভিনিধান'। ধ্বনিবিদ্গণ ল(করেছেন, এই জাতীয় ধ্বনির (েত্রে প্রথম স্পর্শধ্বনিটি উচ্চারণের দিক দিয়ে সামান্য প্রলম্বিত হয়। বাংলায় এই স্পর্শধ্বনিগুলি অবস্থান করে দুটি স্বরধ্বনির মাঝখানে।

৪.৩.১১.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সংজ্ঞাটি লেখো।

২। বাংলা সংযুক্ত ব্যঞ্জনের গঠন স্বরূপ বিশ্লেষণ করো।

৪.৩.১১.৪ : গ্রন্থাবলি

১। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব। কলকাতা : নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৭ বুক কর্পোরেশন, ১৯৯৩।

২। প্রবাল দাশগুপ্ত, 'ভাষা বর্ণনার স্তর', **নিসর্গ** তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ: ১-১১৩।

৩। রামেশ্বর শ, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা। কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৮৮।

৪। H. A. Gleason, An Introduction to Descriptive Linguistics, Delhi : Oxford IBH, 1961.

৫। C. F. Hockette, A Course in Modern Linguistics. Delhi : Oxford IBH, 1976. Bernard Block and G. L. Trager, Outlines of Linguistic Analysis. New Delhi : Oriental Books Rঈprint Corporation, 1972.

একক - ১২

সংযুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জন সমাবেশের পার্থক্য

বিন্যাস ক্রম :

৪.৩.১২.১ : সংযুক্ত(ব্যঞ্জন-এর সঙ্গে ব্যঞ্জন সমাবেশের পার্থক্য

৪.৩.১২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.৩.১২.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪.৩.১২.১ : সংযুক্ত(ব্যঞ্জন-এর সঙ্গে ব্যঞ্জন সমাবেশের পার্থক্য

আমরা সংযুক্ত(ব্যঞ্জন বিষয়ে আলোচনা করেছি। এবার আমরা আলোচনা করব ব্যঞ্জন-সমাবেশ বিষয়ে। সেই সঙ্গে জানা প্রয়োজন 'সংযুক্ত(ব্যঞ্জন' ও 'ব্যঞ্জন-সমাবেশ'-এর মধ্যে মিল ও অমিল কোথায়।

আমরা ড. রামে(র শ-এর বি(-ষণ উল্লেখ করেছি—"একাধিক ব্যঞ্জনের মাঝখানে কোনো স্বরধ্বনি যদি না থাকে এবং সেই ব্যঞ্জনগুলি যদি নিকট সন্নিবিষ্ট হয় তবে তাদের ব্যঞ্জন সমাবেশ (consonant combination) বলতে পারি। যেমন—'অন্তর' শব্দের 'ন্ + ত্'। কিন্তু একাধিক ব্যঞ্জনের মধ্যে যদি স্বরধ্বনি না থাকে, সেই ব্যঞ্জনগুলি যদি নিকট সন্নিবিষ্ট হয় এবং নি(াসের এক ধাক্কায় উচ্চারিত হয় তবে তাদের সংযুক্ত(ব্যঞ্জন (consonant cluster) বলে। যেমন—'স্ত্রী শব্দের 'স্ + ত্ + র্'।"

পূর্বে উল্লিখিত বাংলা সংযুক্ত(ব্যঞ্জনের তালিকা থেকে এটা স্পষ্ট যে বাংলায় সংযুক্ত(ব্যঞ্জনের সংখ্যা সীমিত। খাঁটি বাংলাব্যঞ্জন ২৮টি। বাংলায় গৃহীত বিদেশি শব্দের ব্যঞ্জন রয়েছে আরও ৮টি। সবমিলিয়ে সংযুক্ত(ব্যঞ্জনের সংখ্যা ৩৬। অন্যদিকে ব্যঞ্জন-সমাবেশের সংখ্যা প্রায় আড়াইশো।

ব্যঞ্জন-সমাবেশ বলতে ড. রামে(র শ-এর মন্তব্য স্মরণীয় যে, **"সব সংযুক্ত(ব্যঞ্জনই ব্যঞ্জন-সমাবেশ, কিন্তু সব ব্যঞ্জন যথার্থ সংযুক্ত(ব্যঞ্জন নয়।"** ধ্বনিতাত্ত্বিকগণ বাংলাভাষার নানা ব্যবহারিক নমুনা পরী(া করে সংযুক্ত(ব্যঞ্জন ও ব্যঞ্জন সমাবেশের সংখ্যা নির্ণয় করেছেন। পরিবর্তনশীল বাগ্‌ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে এই সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হতে পারে। মধ্যযুগ থেকে বিদেশি আগন্তুক শব্দের অনুপ্রবেশ বাংলার ধ্বনি ও উচ্চারণে বহুধা বৈচিত্র্য নিয়ে এসেছে। বিশেষ করে ফারসি, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজি থেকে আগত বহু সংখ্যক সংযুক্ত(ব্যঞ্জন বাংলার নিজস্ব সম্পদ হয়ে উঠেছে। বর্তমানে বি(ায়নের যুগে বি(ের অন্যান্য দেশের ভাষার অনিবার্য প্রভাব পড়ছে বাংলার ওপর। নিত্যনতুন শব্দ উপাদানে বাংলার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হচ্ছে। সেই অনুসারে নতুন নতুন ব্যঞ্জন-সমাবেশ ও সংযুক্ত(ব্যঞ্জনও আমাদের ভাষায় দেখা দিতে পারে।

বাংলা শব্দগঠনে নানা ব্যঞ্জনের সমাবেশে রয়েছে অপরিসীম বৈচিত্র্য। তার সামান্য কিছু রীতিপ্রকৃতি ও দৃষ্টান্ত নীচে দেখানো হল--

১। স্পর্শধ্বনি+স্পর্শধ্বনি--	ক্ +ট (এক্‌টা),	ক্ +দ (তক্‌দির),	ক্ +চ (চক্‌চক)
	গ্ + দ (দিগ্‌দর্শন),	গ্ + ফ (ভাগ্‌ফল),	চ্ +ক (বোচ্‌কা)
	চ্ + ট (পাঁচ্‌টা),	ছ্ + প (পিছ্‌পা)	জ্ +খ (বাজ্‌খাই)
	জ্ + প (রাজ্‌পুত),	ট +ক (মট্‌কা)	ঠ +ত (উঠতি)

২।	স্পর্শধ্বনি + নাসিক্যধ্বনি--	ক্ + ম (তক্‌মা),	গ্ +ন (ভাগ্‌নে),	ছ্ +ন (জোছ্‌না),
		জ্ + ম (এজমালি),	ট + ন (পাটনা),	ত্ + ন (পেত্‌নী)
		দ্ + ম (কদ্‌মা),	ব্ + ন (ভাবনা)	
৩।	স্পর্শধ্বনি + পার্শ্বিকধ্বনি--	ত্ + ল (তোত্‌লা),	ব্ +ল (বাব্‌লা),	প্ + ল (পাগ্‌লা)
৪।	স্পর্শধ্বনি + কম্পিতধ্বনি--	ক্ + র (ছোক্‌রা),	দ্ + র (দাদরা),	প্ + র (চাপরাশ)
৫।	স্পর্শধ্বনি + তাড়নজাত ধ্বনি--	ক্ + ড় (কাঁক্‌ড়া),	গ্ + ড় (ঝগ্‌ড়া),	প্ +ড় (পাপ্‌ড়ি)
৬।	স্পর্শধ্বনি + উষ্ম ধ্বনি--	গ্ + স (লাগ্‌সই),	ত্ + স (কুৎসা),	দ্ + শ (বাদ্‌শা)
৭।	উষ্মধ্বনি + স্পর্শধ্বনি--	শ + ক (মুশকিল),	শ্ + গ (মশ্‌গুল),	শ্ + ল (মশ্‌লা),
		ষ + ট (বোষ্টম)		
৮।	পার্শ্বিকধ্বনি + স্পর্শধ্বনি--	ল্ + গ (আল্‌গা),	ল্ + ট (পাল্‌টা),	ল্ + চ (বেল্‌চি)
৯।	পার্শ্বিকধ্বনি + নাসিক্যধ্বনি--	ল্ + ন (আল্‌না),	ল্ + ম (কল্‌মা)	
১০।	কম্পিত ধ্বনি + স্পর্শধ্বনি--	র্ + খ (বোর্‌খা),	র্ + দ (পর্দা),	র্ + চ (পরচা)
১১।	কম্পিত ধ্বনি + নাসিক্যধ্বনি--	র্ + ম (বর্মা),	র্ +ণ (ঝর্ণা)	
১২।	তাড়নজাত ধবনি + স্পর্শধ্বনি--	ড়্ + দ (খড়্‌দা),	ড়্ + ত (পড়্‌তি)	
১৩।	নাসিক্য ধ্বনি + অন্য ধ্বনি--	ন্ + ক (কান্‌কা),	ন্ + প (বোনপো),	ন্ + স (বন্‌সাই)
		ম্ + ছ (গামছা),	ম্ + ত (নিমতা),	ম + ল (আমলা)
		ঙ্ + ত (রাঙ্‌তা),	ঙ্ + ম (রঙ্‌মশাল)	

৪.৩.১২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। বাংলা যৌগিক স্বরের সংজ্ঞা দাও। যৌগিক স্বরের প্রকারভেদ দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করো।

২। দ্বিস্বরধ্বনি বলতে কী বোঝায়? বাংলা দ্বিস্বরধ্বনির একটি যুক্তি(সন্দত তালিকা প্রস্তুত করো।

৩। দ্বিস্বরধ্বনিগুলিকে নিয়মিত ও অনিয়মিত--এই দুই ভাগে ভাগ করার পিছনে কী যুক্তি(রয়েছে?

৪। বাংলা দ্বিস্বর, ত্রিস্বর, চতুস্বর ও পঞ্চস্বর ধ্বনিগুলি দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করো।

৫। সংযুক্ত(ব্যঞ্জন (consonant cluster) কাকে বলে? বাংলা সংযুক্ত(ব্যঞ্জন-এর গঠনবৈশিষ্ট্য উদাহরণসহ আলোচনা করো।

৬। বাংলায় ব্যঞ্জন-সমাবেশের আনুমানিক সংখ্যা কত? ব্যঞ্জন-সমাবেশের সঙ্গে সংযুক্ত(ব্যঞ্জন-এর পার্থক্য বুঝিয়ে দাও।

৭। "ধ্বনি ও হরফ যে এক নয় তার একটা বড় প্রমাণ হল বাংলার যুক্ত(া(রগুলো।"---এই কথার যৌক্তি(কতা কতখানি আলোচনা করো।

৮। "বাংলা শব্দের গঠনে নানা ব্যঞ্জনের সমাবেশে দেখা যায় অপরিসীম বৈচিত্র্য।"--আলোচনা করো।

৪.৩.১২.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। ড. রামেশ্বর শ'--সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৩৯৪ ব.।

২। ড. সুকুমার সেন--ভাষার ইতিবৃত্ত, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৮।

৩। মোহম্মদ আবদুল হাই--ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধবনিতত্ত্ব, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৮৫।

৪। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়--ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, রূপা, ১৯৮৮।

৫। David Crystal—The Cambridge Encyclopedia of Language, Cambridge University press, 1987.

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম. এ তৃতীয় সেমেস্টার

চতুর্থ পত্র

বিশেষ পত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

(ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্‌ট্যান্স লার্নিং)

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া - ৭৪১ ২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

পাঠ-প্রণেতা

অধ্যাপক ড. কল্যাণী শঙ্কর ঘটক – প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক – বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপিকা ড. সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী – বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় সদস্যা

ডিসেম্বর, ২০১৯

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও

নিউ স্কুল বুক প্রেস, ৩/২ ডিক্সন লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১৪

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়-এর অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ-সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইনানুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের লেখক/

পাঠক্রম

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম এম. এ. তৃতীয় সেমেস্টার

চতুর্থ পত্র

বিশেষ পত্র ঃ রবীন্দ্রসাহিত্য

পর্যায় গ্রন্থ ঃ ১ চতুরঙ্গ (সময় ঃ ৪ ঘন্টা)

একক–১ ঃ চতুরঙ্গ উপন্যাসের বিষয় সংক্ষেপ

একক–২ ঃ চরিত্র বিন্যাস

একক–৩ ঃ চতুরঙ্গ উপন্যাসের নামকরণ

একক–৪ ঃ গঠনশৈলী ও আধুনিকতা

পর্যায় গ্রন্থ ঃ ২ মানুষের ধর্ম (সময় ঃ ৪ ঘন্টা)

একক–৫ ঃ ধর্ম সম্পর্কিত ধারণা

একক–৬ ঃ রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্ম-এর প্রেক্ষিত

একক–৭ ঃ মানুষের ধর্মকেন্দ্রিক রাবীন্দ্রিক বোধ

একক–৮ ঃ মানবধর্ম

পর্যায় গ্রন্থ ঃ ৩ লিপিকা (সময় ঃ ৪ ঘন্টা)

একক–৯ ঃ লিপিকার গঠনশিল্প

একক–১০ ঃ প্রথম পর্বের রচনা — কাব্যলক্ষণাক্রান্ত পাঠ বিশ্লেষণ

একক–১১ ঃ দ্বিতীয় পর্বের রচনায় গল্পরসের প্রাধান্য

একক–১২ ঃ তৃতীয় পর্ব ঃ সমাজ সচেতন ব্যঙ্গরূপক

পর্যায় গ্রন্থ ঃ ৪ মালঞ্চ (সময় ঃ ৪ ঘন্টা)

একক–১৩ ঃ মালঞ্চ উপন্যাসের বিষয় সংক্ষেপ

একক–১৪ ঃ চরিত্র নির্মাণ

একক–১৫ ঃ মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস

একক–১৬ ঃ নামকরণ

সূচিপত্র

চতুর্থ পত্র

বিশেষ পত্র ঞ্ঝ রবীন্দ্রসাহিত্য

প্রথম পত্র	একক	পাঠ-প্রণেতা	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ-১	১	অধ্যাপক ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক	চতুরঙ্গ উপন্যাসের বিষয় সংক্ষেপ	১–৭
	২	অধ্যাপক ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক	চরিত্রবিন্যাস	৮–১৬
	৩	অধ্যাপক ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক	চতুরঙ্গ উপন্যাসের নামকরণ	১৭–১৮
	৪	অধ্যাপক ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক	গঠনশৈলী ও আধুনিকতা	১৯–২৩
পর্যায় গ্রন্থ-২	৫	অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক	ধর্ম সম্পর্কিত ধারণা	২৪–২৯
	৬	অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক	রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্ম-এর প্রেক্ষিত	৩০–৩১
	৭	অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক	মানুষের ধর্মকেন্দ্রিক রাবীন্দ্রিক বোধ	৩২–৩৬
	৮	অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক	মানবধর্ম	৩৭–৪৫
পর্যায় গ্রন্থ-৩	৯	অধ্যাপক ড. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক	লিপিকার গঠনশিল্প	৪৬–৪৮
	১০	অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক	প্রথম পর্বের রচনা কাব্যলক্ষণাক্রান্ত পাঠ বিশ্লেষণ	৪৯–৫১
	১১	অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক	দ্বিতীয় পর্বের রচনায় গল্পরসের প্রাধান্য	৫২–৫৩
	১২	অধ্যাপিকা ড. কেকা ঘটক	তৃতীয় পর্ব ঞ্ঝ সমাজ সচেতন ব্যঙ্গ রূপক	৫৪–৫৫
পর্যায় গ্রন্থ-৪	১৩	অধ্যাপিকা ড. সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	মালঞ্চ উপন্যাসের বিষয় সংক্ষেপ	৫৬–৬২
	১৪	অধ্যাপিকা ড. সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	চরিত্র নির্মাণ	৬৩–৬৭
	১৫	অধ্যাপিকা ড. সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস	৬৮–৭১
	১৬	অধ্যাপিকা ড. সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	নামকরণ	৭২–৭৪

চতুর্থ পত্র

বিশেষ পত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

চতুরঙ্গ

পর্যায় গ্রন্থ - ১

একক - ১

চতুরঙ্গ উপন্যাসের বিষয় সংক্ষেপ

বিন্যাস ক্রম :

৪.১.১.১ : ভূমিকা

৪.১.১.২ : পটভূমি

৪.১.১.৩ : বিষয় সংক্ষেপ

৪.১.১.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.১.১.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪.১.১.১ : ভূমিকা

বহুমুখী রবীন্দ্রপ্রতিভার অন্যতম বিষয় তাঁর উপন্যাস। সাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলির মতো উপন্যাস সৃষ্টিতেও তিনি অনন্য। বঙ্কিম উপন্যাসের বিশ্ববোধ, সমুন্নত কল্পনা, স্বচ্ছ জীবনদৃষ্টি, আদর্শায়িত চরিত্র ও শিল্পরসবোধ বাংলা উপন্যাসকে যে গৌরবোজ্জ্বল মহিমা দান করেছিল, রবীন্দ্র ভাবনায় তার যুগোচিত-অভিনব উত্তরণ। এই উত্তরণ সম্ভব হয়েছিল তাঁর মৌলিক অনুভবদীপ্ত শিল্পাঙ্গিকের জন্য। তাঁর উপন্যাসের ভাব-ভাষা, বিষয়-বৈচিত্র্য, চরিত্রায়ণ, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, সূক্ষ্মানুভূতি, কাব্যময় বর্ণনা ও সংলাপ, সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও দার্শনিক প্রত্যয়দীপ্ত সমুজ্জ্বল জীবনরসবোধ সেই শিল্পাঙ্গিককে বর্ণময় শোভন-সুন্দর উজ্জ্বলতা দান করেছিল। দ্বন্দ্ব নিবিড় বহিরঙ্গ জীবনচিত্রের তুলনায় অন্তর্ভেদী মর্মলোকের রহস্যসন্ধানে ব্যাপৃত রবীন্দ্র উপন্যাস বাংলা উপন্যাসধারায় একটি নতুন শৈলী সংযোজিত করে ভাবীকালের ঔপন্যাসিকের চিন্তন-মননের ক্ষেত্রকে করেছিল উর্বর, উন্মোচিত করেছিল বিপুল সম্ভাবনার দিগন্ত। ব্যক্তিসত্তা ও সমাজ সত্তার দ্বান্দ্বিক চিত্রণে রবীন্দ্র উপন্যাস সাহিত্য প্রথম দেশ-কাল ও সমাজচৈতন্যের ধ্রুবলোক সৃজন করে বাস্তবের সঙ্গে আদর্শের সমন্বয় স্থাপন করেছিল। প্রকৃতার্থেই তাঁর উপন্যাসগুলি হয়ে উঠেছিল 'দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-বিমথিত মানবজীবনের শিল্পিত গদ্যরূপ।' (বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়) বাংলা উপন্যাস সাহিত্য তাই রবীন্দ্রনাথের কাছে অশেষভাবে ঋণী।

রবীন্দ্রসৃষ্ট উপন্যাসধারার মধ্যপর্বে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটির স্থান। 'সুবজপত্র' (মাসিক) পত্রিকার প্রথম বর্ষের (১৩২১) অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত চারটি সংখ্যায় জ্যাঠামশায়, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস এই চারটি শিরোনামাঙ্কিত হয়ে চারপর্বে ধারাবাহিকভাবে 'চতুরঙ্গ' পূর্ণ রূপ পায়। বৈশাখ, ১৩২২ সালে, ইংরেজী ১৯১৬তে পুস্তকাকারে গ্রন্থটির প্রকাশ হয়। সবুজপত্রে এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সাতটি বিশিষ্ট গল্পও প্রকাশিত হয়েছিল। বিভিন্ন সংখ্যায় হালদার গোষ্ঠী, হৈমন্তী, বোষ্টমী, স্ত্রীর পত্র, ভাইফোঁটা, শেষের রাত্রি, অপরিচিতা এই গল্পগুলি ছাড়াও পরবর্তীকালে 'ঘরেবাইরে' উপন্যাস, 'ফাল্গুনী নাটিকাও সবুজপত্রের পাতাতেই জন্ম নিয়েছে। পূর্ববর্তী 'গোরা' উপন্যাসের বিশ্বপট থেকে চতুরঙ্গে এক অভিনব আলোকবৃত্তে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। 'বলাকা'র

যুগে লেখা এই রচনাটিতে খুব স্বাভাবিকভাবেই এসেছে কবির দার্শনিক অনুচিন্তনের প্রভাব। প্রচলিত ধারণায় আমরা সমাজ-পরিবেশ বলতে যা বুঝি, চতুরঙ্গ তেমন কোনও সাজানো প্রেক্ষাপটের মধ্যে জন্ম নেয়নি। বরং বাঁধনভাঙার ব্রত নিয়ে দ্রুতি ও গতিসহযোগে তা এগিয়ে চলেছে পর্ব থেকে পর্বান্তরে। আবার বস্তুহীন উৎক্ষিপ্তও নয় উপন্যাসটির বক্তব্য, তেমনই মৃত্তিকাসংশ্লেষহীন বায়বীয় নয় এর চরিত্রগুলি। জ্যাঠামশাই, শচীশ দামিনী ও শ্রীবিলাসের নামে পর্বগুলির নামকরণ। একটি কালপর্ব যে উপন্যাসটির প্রেক্ষাপটে থাকা দরকার, তারও সূত্র এখানে পাওয়া যায়। সুনির্দিষ্ট সমাজ-পরিধিতে ঔপন্যাসীয় বৃত্তি রচিত না হলেও সামাজিক আবহ, সমাজজীবনের কলুষ ও তা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এই উপন্যাসটিতে যথাযথভাবেই উপস্থিত। সমাজের ওপরে যে মানুষ - তেমন মানুষকেই রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন মুখ্য চরিত্র হিসেবে। যাদের নামে উপন্যাসের পর্বগুলি সাজানো, সেই জ্যাঠামশাই, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস সেই মুখ্য চরিত্রের মধ্যে পড়ে। আর এদের যাত্রাপথের রেখাগুলিতে স্পষ্ট করতে এসেছে ননীবালা, হরিমোহন, পুরন্দর, চামারকুল, লীলানন্দ স্বামী, শিবতোষ, নবীন, নবীনের স্ত্রী, দামিনীর পরিজন। স্বল্পাকারে রচিত হলেও তাদের মুখও অস্পষ্ট হয়ে নেই-যথাকৃত্য করিয়ে নিয়ে লেখক তাদেরও সার্থক প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।

৪.১.১.২ : পটভূমি

রবীন্দ্রজীবনের প্রথম পর্বে লিখিত উপন্যাসগুলিতে (‘করুণা’, ‘বৌঠাকুরানীর হাট’, ‘রাজর্ষি’) বঙ্কিম-অনুসরণের চিহ্ন স্পষ্ট হলেও ধীরে ধীরে তিনি স্বচ্ছন্দ ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগলেন। ‘চোখের বালি’ (১৩০৮-১৩০৯, ‘নব পর্যায় বঙ্গদর্শনে’ প্রকাশিত) উপন্যাস থেকেই তাঁর ঔপন্যাসিক চিন্তন-মননের মৌলিকতা প্রকটিত হতে শুরু করেছে। ‘আঁতের কথা’ বের করে দেখানোর এটিই প্রথম প্রয়াস কি না সে বিতর্কে প্রবেশ না করেও বলা যায়, অন্যন্য জীবনবোধ, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও বর্ণনারীতির অনুপুঙ্খতায় এখান থেকে রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র শিল্পব্যক্তিত্বরূপে নিজেকে ধরতে পেরেছেন। সমসাময়িকখালে রচিত ‘নষ্টনীড়’ -এ (‘ভারতী’-এ ১৩০৮) সমাজনিষিদ্ধ প্রেমের জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণেও তিনি অনেকটাই সপ্রতিভ ও স্বপ্রতিষ্ঠ। সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্মীয় সমস্যাদীর্ণ জটিল বৃহৎ জীবনপটে আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তিমানসের স্বদেশ জিজ্ঞাসা ও সুকঠিন অন্তর্দ্বন্দ্বের ইতিহাসকে আশ্রয় করে লিখিত হয়েছে তাঁর মহাকাব্যোপম উপন্যাস ‘গোরা’ (‘প্রবাসী’ — ১৩১৪-১৬)। শিলাইদহ পর্বে রচিত সহজ প্রগাঢ় জীবনপ্রত্যয়-স্পন্দিত তাঁর অসাধারণ ছোট গল্পগুলি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু তবুও ১৩১৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন মাসে ‘সবুজপত্রে’ প্রথম সর্বাঙ্গীণ আধুনিক উপন্যাস। ... বাংলা উপন্যাসে এই প্রথম চরিত্র আত্মানুসন্ধানে, আত্মসমীক্ষায় ব্যাপৃত হল, নিজের মুখোমুখি হল। বিশেষ থেকে নির্বিশেষে, বহির্জগৎ থেকে ভিতর দেহলিতে প্রত্যাবর্তনের প্রথম শিল্পরূপ ‘চতুরঙ্গ’।” (‘কালের প্রতিমা’ - অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়)।

‘চতুরঙ্গ’কে আধুনিক উপন্যাসের ‘পথিকৃৎ’ বলা সঙ্গত কিনা তা নিয়ে সমালোচক মহলে বিতর্ক থাকলেও এক বিষয়ে সকলে একমত যে ‘চতুরঙ্গ’ই বাংলা উপন্যাসে প্রথম বুদ্ধিজীবী বাঙালি তারুণ্যের বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণাকে সার্থক রূপ দিয়েছে। ‘চতুরঙ্গ’র প্রেক্ষাপটে একদিকে রয়েছে বিশ্বব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) কালো ছায়া, দীর্ঘ বিদেশ ভ্রমণের পর স্বদের প্রত্যাগত কবির বীক্ষণে প্রতিফলিত শিক্ষিত তরুণ নাগরিক সমাজের ত্রিশঙ্কু -অনিকেত মূর্তি। অন্যদিকে ঘরে ও বাইরে ছিন্নমূল তারুণ্যের এই মূর্তি দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলেন কবি। সেই সুগভীর বেদানাবোধ থেকে জন্ম নিয়েছিল ‘চতুরঙ্গ’। তিনি জানতেন, তরুণ বঙ্গসন্তানের এই বিচ্ছিন্নতার মূলে প্রোথিত ছিল উনিশ শতকীয় নবজাগরণের একান্ত আত্মমগ্ন উৎকেন্দ্রিতা যার ভয়াবহ বাস্তবরূপ পরিস্ফুট হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তীকালে কিংবা দেশ-বিভাজনের অনেক পরে। শচীশ-শ্রীবিলাস-দামিনীর জীবনবিকাশের ধারায় ঐ যন্ত্রণাই ঐকান্তিক রূপে ব্যক্ত হয়েছে। দূরের কালকে এত নিবিড়

করে দেখা লেখকের প্রকর দেশ-কাল সচেতনতার নির্দশন। তাই এই কালসচেতনতা সমালোচকের ভাষায় ''বর্তমানের প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যৎকেও প্রত্যক্ষ করেছেন চিরকাল; এ তাঁর সামগ্রিক ইতিহাস চেতনা কিংবা পরিপূর্ণ মানবিকতা- ধ্যানজনিত অন্তর্দৃষ্টির পরিণাম।'' ('রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে কালসচেতনতা' পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্রসংখ্যা -৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫ — ভূদেব চৌধুরী) চতুরঙ্গের রচনাকাল ও সমাজ পটভূমির ক্রান্তিলগ্নটিও এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

এই পটভূমিকায় উপন্যাসটির ধাত্রী পত্রিকা 'সবুজপত্রের' (প্রমথ চৌধুরী-সম্পাদিত) ভূমিকাটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলা সাহিত্যে বিভিন্নমুখী নবধারার প্রবর্তক এই 'সবুজপত্র'। গল্প-উপন্যাসের আঙ্গিক ও বিষয় নিয়ে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অতন্দ্র। তবুও সাহিত্যে নতুন ভাব, বিষয়, বলবার রীতি প্রভৃতি সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর সাম্প্রতিকতম দিকদর্শন প্রকাশের আকাAক্ষাও অন্তর্লীনভাবে ক্রিয়াশীল ছিল তাঁর মনে। যদিও প্রগতিশীল চিন্তাধারার মাধ্যমে নিজের সীমাকে তিনি নিজে অতিক্রম করেছেন বারবার, তবুও 'চতুরঙ্গ' রচনার প্রাক্কালে 'সবুজপত্রের' সজীব তারুণ্য ও চলিতভাষার ঐশ্বর্যে তাঁর শিল্পসাধনা অনেকটা যেন ভিন্নখাতে মুক্তি প্রয়াসী হয়ে উঠলো। বুদ্ধদেব বসুর মূল্যবান মন্তব্যটি এ প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ— 'সবুজপত্রে মুক্তি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অবিরলতায় যদিও কোথাও ফাঁক নেই, তবু নদীর স্রোত তীব্র বাঁক নিল এখানে। সবুজপত্রের আগে এবং পরে যেন দুই আলাদা রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখতে পাই।'' (কথাসাহিত্য : রবীন্দ্রনাথ) স্মরণীয়, সবুজপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'চতুরঙ্গ'।

গোরা উপন্যাসে বৃহৎ ও মহৎ মহাকাব্যিক উপন্যাসের পটভূমি রচনার পর রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন তথাকথিত এক ক্ষুদ্রাকৃতি উপন্যাস 'চতুরঙ্গ'। এর পরিসর ছোট, চরিত্রও চারটি, তবুও নতুনত্বের মাপে মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। মানসিক অনুভূতি এখানে ঘটনার চেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে। প্রচলিত ছককেও ভেঙেছেন তিনি এখানে। গোরার 'এপিক' কৌশল পরিবর্তিত হয়ে এখানে 'এপিগ্রামিক' রূপ নিল। নিবিড় উপলব্ধির ব্যঞ্জনায় জীবনের সারাৎসারটুকু উৎসারিত হল নির্ধারিত পথে এবং তা স্বদেশ-পরিবেশের ঐতিহাসিক পটভূমি বিশ্লিষ্ট নয়। উপন্যাসের কোথাও সন-তারিখের উল্লেখ না থাকলেও কাহিনি সংস্থান থেকে ঘটনাকাল খুঁজে পাওয়া যায়। শচীশের জ্যাঠামশাই মারা গিয়েছিলেন প্লেগরোগীদের সেবা করতে গিয়ে। কলকাতায় মহামারি রূপে প্লেগ রোগের আর্বিভাব হয়েছিল ১৮৯৯ সালে। অর্থাৎ 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের মুখ্য ঘটনাকাল ১৮৯৯ এর কাছাকাছি একটি দশকের সীমানায় বাঁধা।

৪.১.১.৩ : বিষয় সংক্ষেপ

আগেই দেখা গেছে যে চারটি পৃথক নাম চিহ্নিত হয়ে চার পর্বে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের প্রকাশ। একই ফ্রেমে বাঁধানো চারটি ছবি হিসেবে দেখবার মতো মানসিক প্রস্তুতি যদি পাঠকের মনে ঘটে যায়, তবে তা দোষের হবে না। বস্তুতঃ প্রথম অংশ 'জ্যাঠামশায়' লেখবার সময় রবীন্দ্রনাথ যে দীর্ঘতর পরিকল্পনা ভেবে রেখেছিলেন এমনটাও নয়। কিন্তু কার্যত জ্যাঠামশায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশের হাত ধরে উপন্যাসে ক্রমে এসে গেল আরও চরিত্র, ঘটনা এবং ঘটনাসংকেত, ভাবদ্বন্দ্বজটিলতা।

উপন্যাসটি উত্তর পুরুষের জবানীতে বলা। এই কথক শ্রীবিলাস। তার কথাগুলি সে ডায়রীতে লিখে রাখে। অন্য কোন চরিত্র, যেমন শচীশ - তার একান্ত অভিজ্ঞতা ও অনুভব - কীভাবে ধরা যাবে? এক্ষেত্রে লেখক ডায়রীর মধ্যে ডায়রীর সাহায্য নিয়েছেন। শ্রীবিলাস সেখানে যেন শচীশের ডায়রীর অংশ থেকে তার ডায়রীতে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করছে। আরও একটি পদ্ধতি আছে। শচীশ ও দামিনীর একান্ত সাক্ষাৎ কিংবা বাক্যালাপ, তর্ক বা মানসসংকট দামিনীর স্মৃতিচারণার মধ্যে দিয়ে জানতে পেরেছে শ্রীবিলাস। তাই সে নিজের ডায়রীতে লিপিবদ্ধ

করেছে। ‘চতুরঙ্গ-কথক শ্রীবিলাস। এই কথক নির্বাচন, এই প্রেক্ষণবিন্দুর ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।... শ্রীবিলাসকে কথক নির্বাচনের কারণ খুবই দৃঢ়। শচীশ-দামিনী এবং জগমোহন-ননীবালা জীবনকথায় লেখকের কথকতা শিল্পগুণের প্রতিবন্ধক হতো — ওদের টেনশনের নাটকীয়তা লেখক-মাধ্যমী বর্ণনায় প্রয়োজনীয় নিরাসক্তি ও দূরত্ব বজায় রাখতে পারতো না।’’

প্রথম অংশ জ্যাঠামশায়-এ শ্রীবিলাস নিজেকে পরিচিত করায় কলকাতায় পড়তে আসা গাঁয়ের ছেলে বলে। দ্বিতীয় বাক্যে উঠে আসে শচীশ প্রসঙ্গ। তার উজ্জ্বল তীক্ষ্ম দীপ্ত সৌন্দর্য তার বহিরাবয়বের সঙ্গে চিৎশক্তির অমেয়তাও শ্রীবিলাসের সামনে আকর্ষণীয় হয়ে দেখা দিয়েছিল। শ্রীবিলাস শচীশকে বন্ধুত্বপূর্ণ ভালোবাসা দিয়ে গ্রহণ করেছিল। শচীশ ছিল তার নাস্তিক অকৃতদার জ্যাঠামশায়ের শিষ্য। জগমোহন শচীশের জ্যাঠা। শচীশের বাবা হরিমোহন একান্ত স্বার্থপুষ্ট, নীতিহীন, রুচিহীন, বিষয়সর্বস্ব মানুষ। জগমোহন ইংরেজি ভাষায় সুপণ্ডিত বলে হরিমোহন শচীশের শিক্ষার ভার তাঁর দাদা নেওয়ার আপত্তি করেননি। কিন্তু ক্রমে শচীশ জ্যাঠার কাছে সার্বিক শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। জগমোহনের পজিটিভিজম্ তত্ত্বে আনুগত্য, গরীব চামারদের সঙ্গে একাসনে নির্বিচারে খাদ্যাখাদ্য গ্রহণ শচীশেরও ব্রত; ঈশ্বরে বিশ্বাসের জন্য তারও মনে কোনো জায়গা রইল না। ওদিকে তার বাবা বড় ছেলে পুরন্দরকে নিয়ে দাদার ‘প্রচুরতম লোকের প্রভূততম হিতসাধন’- যজ্ঞে যাতে চিরকালের মতো ছেদ পড়ে, তার বন্দোবস্ত করতে উদ্যোগ নিলেন।

হরিমোহন শচীশের দোহাই দিয়ে জ্যাঠামশায়কে হেয় করার পথ সৃষ্টি করছেন বুঝতে পেরে শচীশ মেসে গিয়ে উঠল। সেখানে সে একটি অসহায় বিধবা মেয়েকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য জ্যাঠার আশ্রয়ে রেখে গেল। ক্রমশ প্রকাশ পায় পুরন্দর এই মামাবাড়ির আশ্রিতা অনাথা মেয়েটিকে তার দুশ্চরিত্র মামাতো ভাইদেরই সহায়তায় বাইরে বার করে এনেছিল বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। তারপর অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ‘‘পুরন্দর একদিন লাথি মারিয়া ননীকে অর্ধরাত্রে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল।’’ ননীবালাকে জ্যাঠামশায় পরম মমতায় গ্রহণ করলেন। তাঁর গৃহে কন্যাস্নেহে ননী স্থান পেল। পুরন্দরের কাছে এই কথা গোপন থাকেনি। মৃত সন্তান প্রসবের পর ননীর মর্যাদা রক্ষার জন্য শচীশ তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলে জ্যাঠামশায় অভিভূত হলেন। কিন্তু বিবাহের আগেই ননী আত্মহত্যা করেছে। কারণ ‘তাঁকে যে আজও ভুলিতে পারে নাই’। এর পরের জ্যাঠামশায়-সংক্রান্ত সংবাদ সংক্ষিপ্ত। ‘শচীশ’-পর্বের শুরুতে জানানো হয়েছে যে কলকাতা শহরের প্রথম প্লেগ মহামারী হয়ে দেখা গেল যখন, তখন জগমোহন তাঁর বাড়িটি প্লেগ রোগীদের উৎসর্গ করলেন। সেই হাসপাতালে অর্থাৎ স্বগৃহে জগমোহনের মৃত্যু হলো প্লেগে।

উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্যায়ে শচীশ যখন তার পিতা-পুত্র-সখা স্বরূপ জ্যাঠামশায়কে আকস্মিকভাবে হারালো, তখন সে তার পরিচিত সমাজ ছেড়ে কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। দুবছর পরে শ্রীবিলাস তাকে আবিষ্কার করল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এক অবস্থানে — পরিবেশগত ও মানসিকভাবে। লীলানন্দ স্বামী নামে এক রসসন্ধানী সন্ন্যাসীর পদসেবারত শচীশকে দেখে বন্ধু শ্রীবিলাস মর্মাহত। সে জিজ্ঞাসা না করে পারে না — ‘শচীশ, জন্মকাল হইতে তুমি মুক্তির মধ্যে মানুষ, আজ তুমি একী বন্ধনে নিজেকে জড়াইলে? জ্যাঠামশায়ের মৃত্যু কি এতবড়ো মৃত্যু?’ শচীশ তখন ভক্তিরসের নেশায় বিহ্বল, আইডিয়ার মোহমদ তাকে মুক্তির অভিনব ক্ষেত্রে বশীভূত করে নিয়েছে। শচীশের গুণমুগ্ধ ভক্ত শ্রীবিলাসও অনেকটা বন্ধুপ্রীতির নেশায় শচীশের অলৌকিক রূপ দেখতে পেল এবং তার দলে ভিড়ে গেল। যদিও শচীশের আত্ম-অবলোপ থেকে শ্রীবিলাসের আত্মচেতনা একটা স্পষ্ট ভেদচিহ্নরেখায় আলাদা করে ধরা গেল - ‘আমি তে ভেদজ্ঞানবিলুপ্ত একাকারতা - বন্যার একার ঢেউমাত্র হইতে চাই না — আমি যে আমি।’

লীলানন্দ স্বামীর খ্যাতি ও মহিমার অন্যতম অবলম্বন নামী ছাত্র ও বিখ্যাত জ্ঞানী তাঁর দুই শিষ্য শচীশ ও

শ্রীবিলাস। কলকাতাবাসী শিষ্যদের আগ্রহে লীলানন্দ তাঁর দুই প্রধান শিষ্যসমেত দলে বলে কলকাতার এক লোকান্তরিত শিষ্য শিবতোষের গৃহে গিয়ে উঠলেন। 'সে মরিবার সময় অল্প বয়সের নিঃসন্তান স্ত্রীকে জীবনস্বত্ব দিয়া তার কলিকাতার বাড়ি ও সম্পত্তি গুরুকে দিয়া যায়।'

এখান থেকেই উপন্যাসে জটিল গভীর পর্ব শুরু হয়। মৃত স্বামী শিবতোষের স্ত্রী দামিনী সেই নতুন মাত্রা যোজনার গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক। শিবতোষের যেমন গুরুকে সর্বস্ব সঁপে দেবার ব্রত ছিল, দামিনী সেই পথের পথিক ছিল না। তার অনেক বাস্তব কারণের মধ্যে ছিল প্রথমত দামিনীর পিতার দানে তার স্বামী যে অর্থকৌলীন্য লাভ করেছিল তার অনেক বাস্তব কারণের মধ্যে ছিল প্রথমত দামিনীর পিতার দানে তার স্বামী যে অর্থকৌলীন্য লাভ করেছিল তাই সে গুরুকে সমর্পণ করে। দ্বিতীয়ত অবস্থাবৈগুণ্যে দামিনীর পিতৃ পরিবার যখন সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসেছে, তখন শিবতোষ তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকেছে। আর তৃতীয়ত দামিনীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করে তার ধনসম্পত্তিরই মতো স্থাবরজ্ঞানে স্ত্রীকে গুরুপদে সমর্পণ করে গেছে। দামিনীর ওপরে এই 'ভক্তির দস্যুবৃত্তি' সে সহ্য করা তো দূরের কথা- প্রতি কাজে ও আচরণে তার বিদ্রোহই প্রকটিত হয়েছে। গুরুর পদার্পণে দামিনী নত-নম্র তো হয়ইনি, - 'ভক্ত মেয়ের দল আসিয়া তার কাণ্ড দেখিয়া গালে হাত দিয়া বলিত। একে তো তার বেশভূষা বিধবার মতো নয়, তার পরে গুরুরু উপদেশবাক্যের সে কাছ দিয়া যায় না...।'

এই দামিনী গুরুর শিষ্যদ্বয়ের সঙ্গে ক্রমে অন্তঃপুরের বাইরে সহজভাবে মেলামেশা শুরু করল। তার বিদ্রোহের রূঢ়তা কেটে গিয়ে সেই আগের দামিনী 'স্থির সৌদামিনী' হয়ে উঠেছে দেখে শ্রীবিলাস তার রহস্য ধরতে পারল। শচীশের প্রতি দামিনীর অনুরাগ শচীশ নিজে কিন্তু বুঝতে পারল না। আর শচীশের মন-প্রাণ যে গুরুধ্যানে নিবিষ্ট তার প্রতি দামিনী ক্রোধে অধীর হয়ে উঠল।

লীলানন্দের বার্ষিক পরিভ্রমণের দলে দামিনীও জোর করে সেবছর সঙ্গী হলো। সমুদ্রের মাঝে নির্জন অন্তরীপে রাত্রিকালীন গুহাবাসের অভিজ্ঞতায় উপন্যাস নতুন এক বাঁক নিয়ে অন্যতম স্তরে ছড়িয়ে পড়ল। অভিজ্ঞতাটি শ্রীবিলাস আহরণ করেছেন শচীশের ডায়রী থেকে। নিশ্চিদ্র অন্ধকারে পর্বতগুহার এক রোমাঞ্চকর ভয়কুটিল গুহার মধ্যে শচীশ তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় অন্য কোনও এক অস্তিত্বের আভাস পেল। তার পা জড়িয়ে ধরেছে সে কোন বুনো জন্তু, কোনো সাপের মতো জন্তু কিনা বুঝতে পারল না শচীশ, ভয়ে-ঘৃণায় সে লাথি ছুঁড়ে আঘাত করল। পূর্ণ চেতনা ফিরে পাবার আগেই আগন্তুক ফিরে গেল — তার চাপা কান্নাই শুধু শোনা গেল।

'দামিনী' শিরোনামে তৃতীয় পর্বে শুরু থেকেই দামিনী আবার বিদ্রোহিণী ও রুক্ষ। গুরুর প্রতি উপেক্ষা দেখিয়ে গুরুকুলকে আঘাত করতে থাকল দামিনী। তার সঙ্গে নিস্পৃহ শচীশকে সচকিত করতে শ্রীবিলাসের সঙ্গে সহজ সখ্যতার মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলল। গুরুজী একভাবে, শচীশ অন্যভাবে দামিনীর আচরণে বিব্রত-বিরক্ত এবং অস্বস্তি-অশান্তির মধ্যে প্রতিকারহীনভাবে দামিনীর আচরণ দেখতে থাকল।

এই সময়ে শ্রীবিলাসের কাছে দামিনীর মনের খবর অজানা ছিল না। সে বুঝতো, গুরুজীর প্রতি রাগের কারণে আর শচীশের প্রতি অনুরাগের কারণেই দামিনী তাদের এড়িয়ে চলে। প্রসঙ্গত শ্রীবিলাস তার ডায়রীতে লেখে যে, মেয়েরা যেখানে দুঃখ পায় সেখানেই তাদের হৃদয় দিয়ে বসে। তার দেখা ননীবালা এমন কণ্ঠে বরমালা দিতে চেয়েছিল যে তাকে কামনার পাঁকে দলিত করেছে। আবার দামিনী এমন একজন পুরুষকে ভালোবাসার অর্ঘ্য দিতে চেয়েছে, যে ভাবের সূক্ষ্মতায় নাগালের এতই বাইরে থাকে, তাতে আদৌ প্রাপ্তিযোগ্য কিনা বোঝা যায় না। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে শচীশের আকর্ষণ এবং তাকে ঘিরে বেদনা দামিনীর অন্তরকে অশান্ত ক্ষতবিক্ষত করে। এই বেদনা পুনরায় বিদ্রোহের রূপ নিল যখন শচীশ তাকে আশ্রম ত্যাগ করে যেতে অনুরোধ করল। দামিনী স্পষ্টই বলল - 'তোমাদের কোনো ভক্ত - বা এক মতলবে এক বন্দোবস্ত করিবেন, কোনো ভক্ত বা আর এক মতলবে আর এক বন্দোবস্ত করিলেন - মাঝখানে আমি কি তোমাদের দশ-পঁচিশের ঘুঁটি?' দামিনী মানবীয় কামনা-বাসনা দিয়ে

জীবনকে পুরোদস্তুর নিজের আনন্দে সামিল করতে চায়। সাজানো সব যুক্তিক্রম বুদ্ধি-সাহস-দৃঢ়তায় ভেঙে দেয় সে — 'উত্তুরে হাওয়াকে সিকি পয়সা খাজনা দিবে না পণ করিয়া বসিয়া আছে'। শচীশ এই প্রকৃতির আহ্বান থেকে নিজেকে বাঁচাতে বেরিয়ে পড়ে। কয়েকদিনের মধ্যেই শচীশ ঝড়বিধ্বস্ত মানুষের মতো ফিরে আসে, দামিনীকে সে চলে যেতে বলেছিল। তার কাছে অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা চায়। তাদের রসচর্চার আসরে দামিনীও যেন সহজভাবে যোগ দেয় — শচীশের এমন অনুরোধ দামিনী নত মস্তকে গ্রহণ করে নেয়। শচীশ যখন দামিনীকে বিশিষ্টভাবে দেখল, শ্রীবিলাসের কাছে দামিনীর আহ্বান আসার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। ঠিক তখনই এক আকস্মিক ঘটনা ঘটল। আবার একটি মৃত্যু। এক নারীর আত্মহনন। গুরুজীর গানের দলের নবীন তার আশ্রিতা শ্যালিকার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। একথা জেনে নবীনের স্ত্রী বোনের সঙ্গে স্বামীর বিবাহ দিয়ে নিজে বিষ খেয়েছে। এই খবর দিয়ে দামিনী গুরুদেব এবং তাঁর চেলাদের রসচর্চার সার্থকতা সম্পর্কে তীব্র প্রশ্ন তোলে। তার প্রশ্ন শচীশকেও নিশ্চয়ই গূঢ় জিজ্ঞাসায় আলোড়িত করে। দামিনীর অনুরোধ মেনে সে দামিনীর 'পথের' দিশারী হবার আশ্বাস দেয়। এখান থেকে শচীশের সাধনা পথের আবার বাঁক ফেরা। সে এবার বুঝতে পারল - 'আমার অন্তর্যামী কেবল আমার পথ দিয়াই আনাগোনা করেন - গুরুর পথ গুরুর আঙিনাতেই যাওয়ার পথ'। নতুন সাধন পথ আবিষ্কার করার জন্য শচীশের কৃচ্ছ্রসাধন দামিনীর অসহনীয় লাগে। তার প্রাণের ও ধ্যানের পুরুষটিকে আগতে রাখতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয় দামিনী।

শ্রীবিলাস পর্বে এক ঝড়ের রাত্রির কথা আছে। সেই রাত্রির ঝোড়ো হাওয়ার মাতন অন্তর্লোকের আবরণ উড়িয়ে নিয়ে গেল। শচীশের জ্ঞান ও কর্মোদ্যোগের পর ভক্তি ও রসচর্চার পর্বও যেমন করে বই-এর এক-একটি পাতার মতো উড়ে গিয়েছিল, তেমনি করেই সে বুঝতে পেরেছে যে দামিনীর গুরু হবার দায়িত্ব নেওয়া বা তাকে শিষ্যত্বে দীক্ষা দেবার দায় বহন করাও নিজের উদ্দিষ্ট হতে পারে না। উপলব্ধিগত তৃতীয় স্তরটি পার হতে চাইল শচীশ। এবারে তার অভিযাত্রা অসীমের উদ্দেশ্যে। 'দামিনী তুমি আমাকে দয়া করো — তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।' — এই আদেশে দামিনী ব্যথাহত হলেও মেনে নেয়। এই আঘাত দামিনীকে তার প্রেম, আত্মনিবেদন, অবস্থান সব মিলিয়ে সঠিক আত্মোপলব্ধির মধ্যে চিনিয়ে ও দাঁড় করিয়ে দেয়। তাই সমব্যথী শ্রীবিলাস শচীশের প্রত্যাখানের সমালোচনা করাতে দামিনী প্রতিবাদ জানায় তীব্রভাব — 'তিনি আমাকে কী বাঁচান বাঁচাইয়াছেন তুমি তার কী জান? তুমি কেবল আমারই দুঃখের দিকে তাকাও, আমাকে বাঁচাইতে গিয়া তিনি যে দুঃখটা পাইয়াছেন সে দিকে বুঝি তোমার দৃষ্টি নাই? সুন্দরকে মারিতে গিয়াছিল তাই অসুন্দরটা বুকে লাথি খাইয়াছে। বেশ হইয়াছে...'

আকাশের চাঁদ, স্বর্গের দেবরাজ (শচীশ নামটির যা অর্থ) যদি মাটির টানে স্থানভ্রষ্ট হয়, তবে তা পতনের সামিল। শচীশ দামিনীকে নিয়ে সুষ্ঠুপরিণতি টেনে আনলে তাতে যেমন শচীশের সাধনার অবনমন ঘটতো, তেমনই দামিনীর চিত্তাকশের বিমল আদর্শের জন্য সজ্জিত অর্ঘ্য ধুলিমলিন হয়ে পড়তো। এ যেন চণ্ডালিকার আনন্দ-কামনার পরিণামের অসাফল্য।

শচীশ চলে গেল। আশ্রমত্যাগের পর শ্রীবলাস দামিনীর স্বামীত্বকামনা করল। এই প্রস্তাবে দামিনী প্রথমে রাজি না হলেও পরে সম্মত হয়েছে। প্রথমে বিধবা, পরে প্রণয় প্রার্থিনী এবং প্রত্যাখ্যাতা দামিনী এতদিনে একজন নিষ্ঠিত ও মরমী, মাটির পৃথিবীর প্রেমিক পুরুষকে স্বামীরূপে পেয়ে তার অপমানিত ব্যথাহত স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত জীবনে সার্থকতার পথের সন্ধান পেলো।

কিন্তু এই সুখ স্থায়ী হলো না বেশিদিন। দুবছর না কাটতে দামিনী তার দীর্ঘকালের চাপা বক্ষঃপীড়ায় পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেল। ফেলে গেলো তার বাস্তববাদী মহান স্বামীকে। নিয়ে গেলো স্বামীসঙ্গবাসের অপূর্ণতার বেদনা আর গুরু ও আদর্শ প্রেমিকের দেওয়া বেদনাময় স্মৃতির অলঙ্কার।

৪.১.১.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

1 [illegible]

2 [illegible]

3 [illegible]

4 [illegible]

৪.১.১.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

1 [illegible]

2 [illegible]

3 [illegible]

4 [illegible]

পর্যায় গ্রন্থ - ১
একক - ২
চরিত্র বিন্যাস

বিন্যাস ক্রম :

৪.১.২.১ : শচীশ চরিত্র
৪.১.২.২ : শচীশ-জ্যাঠামশাই
৪.১.২.৩ : দামিনী চরিত্র
৪.১.২.৪ : রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনা ও দামিনী
৪.১.২.৫ : শ্রীবিলাস চরিত্র
৪.১.২.৬ : শ্রীবিলাস সূত্রধর কেন?
৪.১.২.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলি
৪.১.২.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪.১.২.১ : শচীশ চরিত্র

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের কায়ারূপ গড়ে উঠেছে আপাত শিথিল সংগতিবিহীন কয়েকটি দৃশ্যের মাধ্যমে। সেই সকল দৃশ্য সূক্ষ্ম অন্তরঙ্গবোধে সুষম ও শিল্প তাৎপর্যে সমুজ্জ্বল। 'চতুরঙ্গে' রবীন্দ্রনাথের অন্বিষ্ট ছিল চরিত্র। অতএব চরিত্রই এই উপন্যাসের কেন্দ্রস্থল। মানবজীবনের বিচিত্র সংঘাত জটিল ছককে তিনি এখানে দেখিয়েছেন। প্রতি ছকের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার পরবর্তী ছকগুলি একটি একটি করে ভেঙেছে এবং চরিত্রগুলি পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়েছে। শচীশ এই উপন্যাসের নায়ক চরিত্র। কিন্তু যেহেতু এই উপন্যাসের কোনো সুস্পষ্ট পরিণতি নেই, নিটোল উপসংহার নেই, প্রথাসিদ্ধ আদি-মধ্য-অন্ত নেই - সেকারণেই শচীশ আমাদের কাছে শেষপর্যন্ত প্রহেলিকা। পূর্ণতা অন্বেষী শচীশ জীবনের শেষ সাধনার সর্বোত্তীর্ণ অবস্থায় উপনীত হয়েও আত্মশরণ। তাই সে কেবল আমাদের নয়, দামিনী ও শ্রীবিলাসেরও আয়ত্তের বাইরে।

উপন্যাসের সূচনায় শচীশের প্রথম ছবি শ্রীবিলাসের চোখে — 'শচীশকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ্ক - তার চোখ জ্বলিতেছে; তাঁর লম্বা সরু আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা; তার গায়ের রঙ যেন রঙ নহে, তাহা আভা।'' এই বর্ণনা দিয়েই শ্রীবিলাস লিখেছে — ''শচীশকে যখন দেখিলাম অমনি যেন তার অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাইলাম; তাই এক মুহূর্তে তাহাকে ভালবাসিলাম।'' কিন্তু ভক্ত শ্রীবিলাসের পূজা ব্যাহত হয়েছে গোড়াতেই। সাদা পাথরে খোঁদা দেবমূর্তি শচীশ ব্রাহ্মণ নয়, সোনার বেনে, আস্তিক নয়, নাস্তিক। এখানে আমাদের নায়ক সংস্কার চূর্ণ হয়েছে।

৪.১.২.২ : শচীশ-জ্যাঠামশাই

জ্যাঠামশাই জগমোহনের ভাবছায়ালালিত শচীশ চরিত্রকে সম্যকভাবে উপলব্ধির জন্য তার জ্যাঠামশাইয়ের চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য বুঝে নেওয়া দরকার। কারণ প্রাথমিক পর্যায়ে শচীশের সকল আচার-আচরণ জগমোহন-নিয়ন্ত্রিত।

প্রবল ব্যক্তিত্বের স্বঘোষিত সীমায় একচ্ছত্র অধিপতি জগমোহন মল্লিক। 'মতবাদে', 'জীবনাভ্যাসে' বংশগতির কোন চিহ্নই তিনি বর্তমান রাখেননি। বৈষ্ণব বংশে নাস্তিক্যবাদের তিনি একনিষ্ঠ প্রচারক। 'না ঈশ্বরে তার বিশ্বাস'— এই নাস্তিক্যবোধ চিনিয়ে দেয় তাঁর বিশিষ্ট প্রকৃতিতে। প্রচলিত সংস্কার ও লোকবিশ্বাসের প্রতি যে কালাপাহাড়ি প্রতিক্রিয়া নিয়ে নাস্তিক্যবাদের আর্বিভাব, আমরা প্রায়ই তাকে বিচার করি নীতির দিক থেকে। কিন্তু এই মতবাদেও বিশ্বাসের আস্তিক্য আছে, এটা প্রায়ই আমরা ভুলে যাই। ঈশ্বরে বিশ্বাস ছেড়ে জাগ্রত গণদেবতার পূজায় না নামলে, শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপযোগবাদের নির্দেশকে কর্মধারায় প্রতিফলিত না করলে, নাস্তিক্যবাদের ইতিবাচক গৌরব থাকে না। জগমোহনের জীবনে ও আচরণে এরই প্রয়োগ সাফল্যকে উজ্জ্বলতরভাবে পাঠকের গোচরে আনা হয়েছে। — শচীশ তাঁর ভক্ত শিষ্য ঠিকই। কিন্তু শচীশ বিহনেও জগমোহন একক সংগ্রামের সামর্থ্য রাখেন।'' (উপন্যাসে সমাজদৃষ্টি : বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ' — ড. জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়) নাস্তিকতা ও মানবতাবাদে শচীশের দীক্ষা এই জগমোহনের কাছেই। মিল-বেন্থাম পড়া জগমোহনের সমাজ-সাধনার লক্ষ্য ছিল মানুষ। 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধন' ছিল তাঁর লক্ষ্য। শচীশের লালনে অতৃপ্ত পিতৃত্বের সুখ পেয়েছেন এই অকৃতদার সত্য-সন্ধানী। শচীশকে দিয়েছেন উদার ও মুক্ত সাহচর্যের শিক্ষা। পিতা-পিতৃত্বের সঙ্গে সন্তানের অভ্যস্ত দূরত্বের বাঁধও তিনি ভেঙেছেন। সন্তানের সঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনায় আমরা লৌকিক লজ্জা পাই, সেই বিষয় উত্থাপনের মধ্য দিয়ে শচীশের মনের জড়তা দূর করতে চেয়েছেন জগমোহন। ভ্রাতা হরিমোহন ও তৎপুত্র পুরন্দরের যাবতীয় হীনকর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এর প্রতিবিধানকল্পে সংগ্রাম করেছেন তিনি। পুরন্দর যার চরম সর্বনাশ করেছিল সেই ননীবালাকে আশ্রয়দানও একই কার্যসূত্রে গ্রথিত।

সমাজলাঞ্ছিতা মেয়ে ননীবালাকে আশ্রয় দিয়ে এবং মাতৃসম্বোধন করে জগমোহন মহৎ মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই সমাদর যত অকুণ্ঠিত হয়েছে ততই কুণ্ঠিতা হয়েছে সমাজের চোখে অপরাধিনী ননীবালা। ননীবালার সম্মান উদ্ধারের জন্য শচীশের সঙ্গে তার বিবাহ পরিকল্পনায় জড়তাগ্রস্ত সমাজের সামনে মুক্ত মনুষ্যত্বের যে আধিপত্য সূচিত করতে চাইলেন জগমোহন, ননীবালার দুর্বল নারীত্ব তাতে সাড়া দিতে পারলো না — ননীবালা আত্মহত্যা করলো। সে যাকে ভালবেসেছিল তাকে সম্পূর্ণই বেসেছিল। ননীবালা শচীশকে ঠকাবে কী করে?

কিন্তু জগমোহন এতে দমলেন না। সমস্ত প্রাণশক্তি একত্র করে এবার তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্লেগের অত্যাচারে মুমূর্ষু অন্ত্যজ মানুষের সেবায়। স্বল্প সমার্থ্যে সমায়িক হাসপাতাল খুলে আতুরজনের সেবার করতে গিয়ে মহিমান্বিত মৃত্যুবরণ করলেন জগমোহন। মৃত্যুকালে তার সংলাপ — ''এতদিন যে ধর্ম মানিয়াছি আজ তার শেষ বকশিশ চুকাইয়া লইলাম - কোন খেদ রহিল না।'' অন্ধ স্নেহাবেগের পরিবর্তে জাগ্রত নিষ্ঠা নিয়ে যে উইল তিনি মৃত্যুর পূর্বে করে যান - সেটি তাঁর জীবনাদর্শের সঙ্গে আগাগোড়া সামঞ্জস্যপূর্ণ —''কোনদিন এ বাড়িতে পূজা অর্চনা হইতে পারিবে না, নিচের তলায় পাড়ার মুসলমান চামার ছেলেদের জন্য নাইট স্কুল বসিবে, আর শচীশের মৃত্যুর পর সমস্ত বাড়িটাই ইহাদের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য দান করিতে হইবে।'' মানবকল্যাণের দৃষ্টি, উপযোগবাদ ও হিতবাদের উপলব্ধি-প্রসূত উইলের এ ভাষা যেন জগমোহনেরই আত্মচেতনার বাণী।

শচীশ তার জ্যাঠামশাই জগমোহনের প্রতিচ্ছায়া হলেও তার জীবনে এই জ্ঞানতপস্বীর প্রভাব আজীবন কাজ করেনি। জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর পরেই শচীশ গৃহত্যাগ করলো এবং জড়িয়ে পড়লো আধ্যাত্মিক আত্মমুক্তির বেড়াজালে হয়তো কতকটা বংশগতির প্রভাবেই।

দুবছর বাদে চট্টগ্রামের নিভৃত গ্রামে শচীশকে আবার দেখা গেল — এবার লীলানন্দ স্বামীর শিষ্যরূপে। শচীশ সম্পর্কে শ্রীবিলাসের ও পাঠকের সব শ্রদ্ধা আরেকবার লেখক ভেঙে দিলেন। গুরুর পা টেপা ও তামাক সাজায় নিরত শচীশকে দেখে শ্রীবিলাসের শ্রদ্ধাবোধ আহত হল। কোনো সমালোচক শচীশের এই রূপান্তরকে

জন্মান্তর আখ্যা দিয়ে বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথ এখানে চরিত্রের বিবর্তন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন বক্তব্য উপস্থিত করেছেন - যার মূল কথা হল, জগমোহন-শিষ্য আর লীলানন্দ শিষ্য এক নয়, দুই। জীবনের কাজের ক্ষেত্রে তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন জগমোহন, এখন রসের সমুদ্রে মুক্তি দিলেন লীলানন্দ। এখানে নৌকার বাঁধনই মুক্তির রাস্তা। তাই গুরু লীলানন্দ শচীশকে সেবার মধ্যে আটকে রেখেছেন। শচীশ তাই করেছে। নিশ্ছিদ্র মুক্তির রাজ্য থেকে মুক্তিবর্জিত ভক্তির রাজ্যে শচীশের উত্তরণ - শচীশের দ্বিতীয় জীবনে অনুপ্রবেশ।

শচীশের জীবনের দ্বিতীয় ছকও একদিন ভেঙে গেল, ভক্তি-মদের বিহ্বলতাও গেল কেটে, শচীশের উত্তরণ হল তৃতীয় ছকে রসসাধনায়। এই পর্বে দামিনী তার প্রবল পিপাসা নিয়ে শচীশকে আকর্ষণ করেছে। এই দামিনীর মাথাখোঁড়ার দৃশ্যের আচম্বিতে অভিজ্ঞতায়, দ্বিতীয়বার গুহায় দামিনীর বাসনাপরবশে আত্মদানের চেষ্টায় ও তৃতীয়বার দামিনীর শয়নকক্ষের দ্বারপ্রান্তে উদভ্রান্ত শচীশের পরাভূত আত্মসংযমের মুহূর্তে দামিনী তার মনকে শচীশের সামনে উন্মুক্ত করেছে। শচীশের চিত্তে যে ঝড় উঠেছে তা কখন পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে প্রেমে। শচীশের আপাত ঔদাসীন্যের জালকে দামিনী অবলীলাক্রমে ছিঁড়ে দেয়, শ্রীবিলাস সাহচর্যের বিজ্ঞাপিত মুহূর্তগুলিতে মানুষ করে দিয়েছে দামিনী। আত্মপ্রতিরোধে অক্ষম শচীশ মিনতি করেই চেয়ে নিয়েছে সাধনার মুহূর্তগুলিতে দামিনীর সহযোগী উপস্থিতি। রসের স্বর্গলোকে শচীশকে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন লীলানন্দ স্বামী। মাটির পৃথিবীর টানে সে স্বর্গলোক ভেঙে গেল। শচীশকে মানতে হ'ল মাটির পৃথিবীতেই রসের প্রতিষ্ঠা। তার প্রতিমা দামিনী।

কিন্তু শচীশ এখানেই থেমে গেল না। চতুর্থ ছকে পৌঁছে সে আবার নতুন করে তার পথ অন্বেষণ করেছে। শচীশের এই সাধনা দুরূহের পথে, অন্তরের পথে আত্ম-আবিষ্কারে পথে। এ পথে শচীশ নিঃসঙ্গ পথিক — সেখানে দামিনীর কোন ভূমিকা নেই। এই পর্বে অরূপের সন্ধানে তার যাত্রা। শচীশ বলেছে— ''একদিন বুদ্ধির উপর ভর করিলাম, দেখিলাম সেখানে জীবনের সব ভার সয়না। আর একদিন রসের উপর ভর করিলাম, দেখিলাম সেখানে তলা বলিয়া জিনিষটাই নাই।'' এবার নাস্তিক পজিটিভিস্ট জ্যাঠামশায়ের বা রসসাধক গুরু লীলানন্দের নির্দেশের উপর ভিত্তি করে নয় — আপন উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হবার সংগ্রাম তার ভেতরে শুরু হয়েছে। বিশ্বব্যাপী অরূপের লীলা সঙ্গীতের তাৎপর্য এবরে সে ধরতে পেরেছে। অরূপ তার সৃষ্টির মধ্যে ধরা দিয়েছে রূপের বন্ধনে। রূপবদ্ধ মানুষ অরূপ উপলব্ধিতে পৌঁছাতে চাইলে অরূপ রূপাকর্ষণের টানে মধ্যপথে তার সঙ্গে মিলিত হয় — এই আত্মোপলব্ধি তার কাছে মহামূল্যবান মণির খনি আবিষ্কারের মতই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তার এই উপলব্ধির স্বরূপ, তার পরবর্তী চলার পথের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে শচীশ বলে ''গান যে করে সে আনন্দের দিক হইতে রাগিনীর দিকে যায়, গান যে শোনে সে রাগিণীর দিক হইতে আনন্দের দিকে যায়। একজন আসে মুক্তি হইতে বন্ধনে, আর একজন যায় বন্ধন হইতে মুক্তিতে, তবে তো দুইপক্ষের মিল হয়। তিনি যে গাহিতেছেন আর আমরা সে শুনিতেছি। তিনি বাঁধিতে বাঁধিতে শোনেন, আমরা খুলিতে খুলিতে শুনি।'' - এবার শচীশের যাত্রা ''সীমা থেকে অসীমের মাঝে হারা'' হতে চেয়ে।

এক গভীর জীবনদর্শন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসের ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিলেন। '' জীবনের পথে মানুষ যাত্রা করে নিজেকে খুঁজে পাবার জন্য'' (পত্রপুট — ১২ নং কবিতা)। কবিকণ্ঠের এই উচ্চারণের মধ্যেই রবীন্দ্র উপন্যাসের আত্মিক পরিচয় নিহিত। রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রায় সমস্ত প্রধান চরিত্রই জীবন-পথিক। জীবনের পথ চলতে চলতে তারা জীবনের সত্যকে অন্বেষণ করে চলে। এদের জীবনে যেমন জিজ্ঞাসা আছে, তেমনি আছে স্বপ্ন। তাই বেদনাও পায় তারা — যন্ত্রণা থেকে মুক্তি নেই তাদের আত্মার। যদিও এরা কেউ নির্ভুল নয়, কিন্তু সত্যকে খুঁজে ফেরার সাধনায় অকৃত্রিম আন্তরিক। ''রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস মূলত: এই জীবনসন্ধিৎসু মানুষের সত্যসাধনা ও আত্মোপলব্ধির কাহিনি'' (ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ/ধীরেন্দ্র দেবনাথ)।

মানুষের জীবন এক অনির্দেশ্য ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা। এই যাত্রার পথে স্বভাবতঃই মানুষ দেখা পায় কিছু চরিত্রের, জড়িয়ে পড়ে কিছু ঘটনায়। কিন্তু না কোন চরিত্র, না কোন ঘটনায় বাঁধা পড়া জীবন সদাই জঙ্গম- চির চলিষ্ণু। কখনো আর্দশায়িত জীবনবাদ, কখনো বন্ধুপ্রীতি, কখনো অনুরাগীর প্রিয়সান্নিধ্য, কখনো গুরুমার্গে জীবনানন্দ। একে একে এই সমস্ত বাধা কাটিয়ে যে পথে 'চতুরঙ্গ'-এর নায়ক শচীশ যাত্রা করেছে — সেই পথ একান্তভাবেই তার নিজস্ব। রূপবদ্ধ মানুষ হয়েও অরূপ উপলব্ধির আকাAক্ষায় অরূপ রূপাকর্ষণের টানে বোধের পথে শচীশের এই যে যাত্রা - একে 'আত্মোপলব্ধির পথ' ছাড়া আর কীই- বলা যেতে পারে? শচীশের এই চলার পথের রেখাচিত্রই রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে। বক্তব্যপ্রধান ও ভাবনির্ভর এই উপন্যাসে রবীন্দ্ররচনার ধারায় কালগতভাবে অবস্থান করেছেন গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি-নৈবেদ্য-র ঠিক পরে ও 'বলাকা' ঠিক আগে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথের উভয়প্রকার মনোভঙ্গীই এ উপন্যাসে পরিস্ফুট। মানবজীবনের একটি বিশিষ্ট স্বরূপের উদঘাটন এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য হলেও — ''পরিবার ভিত্তি বা সামাজিক সমস্যা প্রচলিত দুই ভিত্তির কোনটিরই উপর 'চতুরঙ্গের' পরিকল্পনা নয়। শচীশের আত্মানুসন্ধানের পথ ধরেই এখানকার গল্প অগ্রসর হয়েছে।'' (উপন্যাসে সমাজদৃষ্টি : বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ — জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়)।

৪.১.২.৩ : দামিনী চরিত্র

সমগ্র উপন্যাস ধরে শচীশের আত্মানুসন্ধানের ইতিহাস বর্ণিত হলেও উপন্যাসের আর একটি চরিত্রও পাঠকের কাছে সমপরিমাণ মনোযোগ আকর্ষণ করে, সে দামিনী। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রসৃষ্টি সমীক্ষা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লিখেছেন — ''উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ও প্রাণোচ্ছল চরিত্র হইল দামিনী। উহার মধ্যে মেঘের বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তি ও বিলয়, বিদ্রোহ ও বশ্যতার মধ্যে ঘন ঘন মেজাজের নেবা-জ্বলা স্থির বিচারকে বিড়ম্বিত করে। উহার স্বরূপ একটা সমাধানহীন ধাঁধার মত আমাদের বোধশক্তিকে ফাঁকি দেয়।'' দামিনী গোড়া থেকেই বিস্ফোরণোন্মুখ আগ্নেয়গিরি - পারিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধে তার অনির্বাণ বিক্ষোভে সদা ধূমায়িত। প্রথমেই তার স্বামী গুরুভক্তির আতিশয্যে তার ব্যাক্তিস্বাতন্ত্রের অবমাননা করে তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে লীলানন্দ স্বামীর রসচক্রের অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই সময় থেকেই তার বুভুক্ষু বঞ্চিত নারীহৃদয়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে। শচীশের সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকেই তার মনে বাসনাতরঙ্গ উদ্বেল হয়ে উঠেছে। তার অন্তর্নিহিত ব্যক্তিস্বতন্ত্রের বোধ একদি লীলানন্দের আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহ জানিয়েছে, অন্যদিকে রসসাধনার বিকৃতিকে সমস্ত সত্তা দিয়ে ঘৃণা করেছে। আবার হিন্দুঘরের বিধবা হয়েও শচীশের প্রতি এক অমোঘ আকর্ষণ অনুভব করেছে। শচীশের ডায়েরীতে লেখা আছে - ''দামিনীর মধ্যে নারীর আর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি, সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়। সে জীবনরসের রসিক।'' অন্যদিকে দামিনীর গর্ব এইখানে যে, শচীশকে জীবনসঙ্গী হিসাবে সে লাভ করতে না পারলেও তার প্রণয়-স্বীকৃতি সে আদায় করে ছেড়েছে। দুর্দমনীয়া দামিনীর কাছে শচীশ আত্মদমনে সম্পূর্ণ পরাভূত।

শেষ পর্যন্ত ''পশ্চিম সমুদ্র উপকূলগুহায় নিশীথের গভীর অন্ধকারে'' শচীশের কাছে পদাঘাত পেয়ে দামিনীর অন্তর্জীবনে এক অন্তর্গূঢ় পরিবর্তনের সূচনা হল। শচীশকে শেষ পর্যন্ত 'গুরু' পদে বরণ করে নিয়ে প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ আবিষ্কার করে দামিনী হয়ে উঠল 'স্থির সৌদামিনী'। শচীশ দামিনীর মুক্তি, তার আকাশ, তার পরিণামী সমুদ্র। কিন্তু আকাশকে ব্যক্তির সীমার মধ্যে ধরা যায় না — এখানেই দামিনীর ভুল হয়েছিল। শচীশ প্রত্যাখ্যাতা দামিনী মাটির পৃথিবীতে ফিরেছে, বাস্তবকে আশ্রয় করতে চেয়েছে, তাই শ্রীবিলাসকে বিবাহ করেছে। শচীশ হল আগুন - তাকে নিয়ে ঘরকন্না করা চলে না — একথা দামিনী বুঝেছে কিন্তু সেই প্রলয়াগ্নির পরশমণিতেই হয়েছে দামিনীর নবজন্ম। দামিনী শ্রীবিলাসকে বলেছে ''সুন্দরকে মারিতে গিয়াছিল, তাই অসুন্দরটা বুকে লাথি খাইয়াছে।

বেশ হইয়াছে, বেশ হইয়াছে, খুব ভালো হইয়াছে।''— একথা বলতে বলতে দামিনী নিজের বুকে দমাদম্ কিল মেরেছে। শাস্তির পদাঘাতটা বুকে লেগেছে ঠিকই কিন্তু সে বুক কেবল শরীর যন্ত্রের অঙ্গ নয়, মানসচেতনার সূক্ষতম আধারও। এ হ'ল দামিনীর আত্মদহন। তার দ্বিতীয় স্বাকীরোক্তি, তার বুকের ব্যথার মূল্যে ক্রীত আনন্দ। গুহা থেকে ফিরে আসার পর থেকে দামিনীর বুকের মধ্যে একটা ব্যথা হয়েছিল। শ্রীবিলাসকে বিবাহের পর বৎসরের মধ্যে যখন ব্যথা বাড়াবাড়ি হল, দামিনী বলল, ''এই ব্যথা আশার গোপন ঐশ্বয' এ আমার পরশমণি।'' দামিনীর এই স্বীকারোক্তি আধুনিক উপন্যাসের অন্যতম লক্ষণ বলেই গৃহীত হবে।

স্বামী শিবতোষ গুরু লীলানন্দ, শচীশ ও সবশেষে শ্রীবিলাস - এই চার ব্যক্তির সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে দামিনীর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছে। দামিনী ও শ্রীবিলাসের বিবাহ বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ তাই সমাজ-চলিত নীতিবোধের দ্বারা চালিত হননি। নরনারীর ব্যক্তিস্বরূপের ওপরে দৃষ্টিক্ষেপ করে কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলেছেন — ''এই বিবাহের রহস্য কি তাহা সকলে বুঝিবে না, বোঝায় প্রয়োজনও নাই।'' — এই রহস্য আসলে ব্যক্তির আত্ম-জিজ্ঞাসার মধ্যেই নিহিত।

৪.১.২.৪ : রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনা ও দামিনী

নারীর প্রবল জীবনতৃষ্ণাকে রবীন্দ্রনাথ কখনো ধর্ম বা সমাজের দোহাই দিয়ে অস্বীকার করেননি। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসেও প্রাণময়ী দামিনীর জীবন পরিক্রমার সঙ্গে পৃথিবীর নারীসত্তার উপলব্ধিকে একাত্ম করে তুলেছেন। তাঁর এই উপলব্ধি আত্মার তুরীয় অভিযানে নয় — সংসারের সহজ মানুষের সহজ-সরল জীবন-যাপনের মধ্যেই সৃষ্টির রহস্যে স্বতঃসম্পূর্ণ। আর তাই আঘাত-প্রত্যাঘাতে অস্থির দামিনীর নারীসত্তার পক্ষে শচীশের আত্মোৎসরণের দাবি মেনে নেওয়া, জীবনের খোঁজে শ্রীবিলাসের সুস্থ-অনুগ্র-নিরভিমান সামান্য জীবনরচনায় জীবনসঙ্গীনীরূপে যোগদান — প্রাণের আকাAক্ষারই প্রকারভেদ। দামিনীর মৃত্যুতেই উপন্যাসের উপসংহার। দামিনী চরিত্রের মূল্যায়ন করতে গিয়ে সমালোচক যথার্থই বলেছেন — ''দামিনী বিশ শতকের বিদ্রোহিনী নারী। যদিও সে ললিতা, সুচরিতা বা পরবর্তীকালের বিমলার সমকক্ষ শিক্ষিতা নয়, তবু আত্মাধিকারবোধের তীব্রতায়, যা আধুনিক রমনীর প্রধান স্বরূপলক্ষণ, তাকে আমরা জ্বলতে দেখেছি।'' (বাংলা উপন্যাসে সমাজবাস্তবতা : জয়ন্ত ঘোষাল)

দামিনী তাই এই উপন্যাস চারজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার পরও আপন ব্যক্তিসত্তা হারায়নি। সে কারও স্ত্রী, কারও প্রাপ্ত সম্পত্তির অংশ বিশেষ, কারও প্রেমপ্রার্থিনী এবং শেষে আবার কারও বা স্ত্রীরূপে দেখা দিয়েছে বটে, কিন্তু এই সবকটি পর্যায়ের পরেও তার একটি মাত্রই পরিচয় - সে 'দামিনী'। - এই সত্য ফুটে উঠেছে শ্রীবিলাসের উক্তিতে — ''আমি গৃহী হইবার সময় পাইলাম না, — আমি যাকে কাছে পাইলাম সে গৃহিনী হইল না। সে মায়া হইল না, সে সত্য রহিল, সে শেষপর্যন্ত দামিনী।'' ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের এই অখণ্ড পরিচয়ের অন্বেষণই রবীন্দ্রনাথের এ পর্বের উপন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে দামিনী চরিত্রের বিশ্লেষণ করেছেন তাকে অনায়াসেই এক নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনি বলা যেতে পারে। সঙ্গতকারণেই সমালোচক ডঃ জ্যোর্তিময় ঘোষ প্রশ্ন তুলেছেন - 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটিতে সকলের মতো আমারও মনে হয়েছে এতকাল, শচীশের সত্যসন্ধানের বা আত্ম-আবিস্কারের কাহিনি, এখন ভাবি, দামিনীর জীবনতৃষ্ণাকে সর্বতোভাবে জয়ী করে রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসের পরিণামে যেভাবে কায়েমী স্বার্থের ধ্বংসস্তুপের উপরে সংগ্রামমুখর সৃষ্টিশীল জীবনের জয়পতাকা উড্ডীন করেছেন তাতে 'চতুরঙ্গ' কে কেন বলব না, দামিনীর আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনি?'' (রবীন্দ্র উপন্যাসের দ্বন্দ্ব ও বস্তুভূমি - পশ্চিমবঙ্গ — রবীন্দ্রসংখ্যা - ২৫শে বৈশাখ, ১৩৮৭)।

৪.১.২.৫ : শ্রীবিলাস চরিত্র

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটির কৈফিয়ৎ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — এই গ্রন্থখানির নাম 'চতুরঙ্গ'। জ্যাঠামশায়, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস, ইহার চারি অংশ।'' এই কৈফিয়তটি উপন্যাসের চারটি অংশের বহিরাশ্রয়ী বিভাগ সম্পর্কেই প্রযোজ্য, কোন গভীরাশ্রয়ী, ভাবের দিক থেকে নয়। কারণ জ্যাঠামশায়, শচীশ ও দানীর ভূমিকা কাহিনির অন্তর্নিহিত ভাবস্বরূপ ফোটাতে যেমন কার্যকর, শ্রীবিলাসের ভূমিকাটি তেমন নয়। শ্রীবিলাস একজন নিরাসক্ত দ্রষ্টামাত্র - সে শচীশের বন্ধু ও দামিনীর দ্বিতীয় স্বামী। উপন্যাসের অধিকাংশ ঘটনা তার উপস্থিতিতে ঘটলেও কাহিনির মোড় ফেরাবার জন্য তার কোন দায়িত্বই নেই। শচীশের মনে পুরুষমূলক ঈর্ষার সৃষ্টির জন্য দামিনী তাকে উপকরণরূপে ব্যবহার করেছে -- এক মর্মভেদী কৌতুকনাট্যে সে যেন এক সকরুণ বিদুষক। তবুও শ্রীবিলাস চরিত্র সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দোপ্যাধ্যায়ের অভিমত - ''চতুর্থ চরিত্র শ্রীবিলাস, সর্বাপেক্ষা বাস্তব গুণান্বিত ও জীবননিষ্ঠ। এই সূক্ষ্মভাববিলাস ও স্থূল মননের জগতে সে একটি আটপৌরে ব্যতিক্রম। সদাচঞ্চল, ঊনপঞ্চাশ পবনের খেয়ালী সঞ্চরণের নীলাকাশে সে একটি ভূমিচারী, মূলসংসক্ত, মানবপ্রবৃত্তি - শাসিত ব্যক্তিসত্তা।'' (রবীন্দ্রসৃষ্টি-সমীক্ষা - প্রথম খণ্ড) — এখানেই শ্রীবিলাস চরিত্রের অভিনবত্ব।

শচীশই তার গুরু। জীবনের সতীর্থ থেকে জগমোহনের নেতৃত্বে কর্মবাদের ক্ষেত্র পর্যন্ত সে শচীশের নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গী। জগমোহনের মৃত্যুর পর লীলানন্দ স্বামীর আখড়ায় শচীশের উন্মত্ত আচরণে সে ব্যথিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু অচিরেই নিজেকে সে এই আশ্রমের উপযুক্ত করে তুলেছে। ব্যক্তিত্ববান বন্ধুর নকলনবিশী তাকে ছায়াসত্তায় পরিণত করলেও বন্ধুকৃত্যে সর্বত্র আত্মলোপে আনন্দিত হওয়াই তার প্রকৃতি। শচীশ দামিনী প্রেমপর্বেও তার এই মনোভাবই কাজ করেছে - যদিও তার দিক থেকেও দামিনীর প্রতি নিরুচ্চার প্রেমে কোনো খামতি ছিল না । দামিনীর নান প্রকার খিদমতগারির মাধ্যমে সাময়িক সান্নিধ্যসুখে উদ্ভাসিত হয়েও পরক্ষণেই অভিমানে আত্মদৈন্যে ম্লান হয়েছে শ্রীবিলাস। কিন্তু দামিনী নারী - শুধুমাত্র পূজারিণীই নয় —তাই শচীশের কাছে প্রত্যাখ্যাত হবার মুহূর্তেই সে বুঝেছে 'সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান' দেওয়া যায় না বলেই তার প্রতিষ্ঠা অন্তরের পূজামন্দিরে। তাই জীবনবসের সাধনায় তাকে ফিরতে হয়েছে শ্রীবিলাসেরই দিকে। জীবনরসের সাধনায় শ্রীবিলাসের মত এমন সহজ স্বাভাবিক পৃথিবীর মানুষ আর কোথায় পাওয়া যেত ?

দামিনী সম্পর্কে নিজের অবস্থান বিষয়ে পরিপূর্ণ সচেতন থেকে শ্রীবিলাস মন্তব্য করেছে — ''মেয়েরা স্বয়ংম্বরা হইবার বেলায় তাদেরই বর্জন করে যার আমাদের মতো মাঝারি মানুষ, যারা স্থূলে সূক্ষ্মে মিশাইয়া তৈরী - নারীকে যারা নারী বলিয়াই জানে, অর্থাৎ এটুকু জানে যে তারা কাদায় তৈরী খেলনা পুতুল নহে আর সুরে তৈরি বীণার ঝংকারমাত্রও নহে।...এইজন্য তারা যদিবা আমাদের পছন্দ করে, ভালবাসিতে পারে না, আমরাই তাদের সত্যকার আশ্রয়, আমাদেরই নিষ্ঠার উপর তারা নির্ভর করিতে পারে, আমাদের আত্মোৎসর্গ এতই সহজ যে তার কোনো দাম আছে সে কথা ভুলিয়া যায়,'' এরকম যথার্থ সত্যজ্ঞানের পরও প্রতীক্ষা করা, অন্যজনের কাছে নৈবেদ্য পৌঁছানোর সহায়শক্তি হিসেবে ধৈর্যসহকারে থাকা শ্রীবিলাসের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু অবশেষে দামিনীর ভুল ভেঙ্গেছে, শ্রীবিলাসের নিঃশব্দ প্রশান্ত প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়নি। 'আকাশের চাঁদে'র উপাসনায় নিজেকে শূন্য করে দিতে গিয়ে 'জীবনরসের রসিক দামিনী শেষপর্যন্ত আত্মস্থ হয়েছে। ফিরে এসেছে পৃথিবীর প্রেমের, ধূলো মাটির ঘরে, শ্রীবিলাসের উদার নির্ভরতাময় বাহুর আশ্রয়ে।

শচীশ দামিনীকে রক্তমাংসের মানুষ হিসাবে না দেখে সৌন্দর্য মাধুর্যের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু শ্রীবিলামস সাধারণ মানুষ, আইডিয়ার ঘূর্ণাবর্তে সে আবর্তিত হয় না — দামিনীকেও সে প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে না। সে বলেছে — ''আমি যাকে পাইলাম... সে শেষ শেষপর্যন্ত দামিনী। কার সাধ্য তাকে ছায়া

বলে।'' দৃষ্টিভঙ্গির কোথায় আতিশয্য না থাকায় দামিনীকে সে সহজভাবেই গ্রহণ করেছিল। উপযুক্ত স্বামীত্বে দামিনীর সাংসারিকতায় কোনো অভাবই সে অপূর্ণ রাখলো না। প্রতিদানে দামিনীও পূর্ণ উদ্যমে সাংসারিকতার স্বার্থরক্ষায় অবতীর্ণ হল। কিন্তু শ্রীবিলাসের দিক থেকে সে প্রেমের অবিরল প্রবাহ সতত দামিনীর দিকে প্রবহমান ছিল, দামিনীর ব্যবহারে তাতে কৃতজ্ঞতার প্রকাশ যতটুকু ছিল, প্রেমের উন্মেষ ততখানি ছিল কি না - এ প্রশ্ন থেকেই যায়। — এখানেই শ্রীবিলাস-চরিত্রের ট্রাজেডি। বন্ধুত্ব, প্রেমিকতা ও স্বামীত্ব সব ভূমিকাতেই সে যথেষ্ট আন্তরিক। কোন ভূমিকাতেই স্বীকৃতি সমেত সমুচিত প্রতিদান সে পায়নি। তবু ''যেদিন মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়িল, জোয়ারের ভরা অশ্রুর বেদনায় সমস্ত সমুদ্র ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, সেদিন দামিনী আমার পায়ে ধূলা লইয়া বলিল, সাধ মিটিল না, আবার যে তোমাকে পাই।'' দামিনীর মৃত্যুকালীন এই স্বীকারোক্তিটুকুই শ্রীবিলাসের একমাত্র সম্পদ।

৪.১.২.৬ : শ্রীবিলাস সূত্রধর কেন?

একজন দায়িত্বশীল চরিত্র হিসেবে ভূমিকা পালন ছাড়াও 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও শ্রীবিলাস যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছে। শ্রীবিলাস এই কাহিনির সূত্রধর। উপন্যাসের উদ্ভবকাল থেকেই ঔপন্যাসিকেরা উপন্যাসের ঘটনা বর্ণনায় বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। কখনো ঔপন্যাসিক নিজে নির্লিপ্ত থেকে চরিত্র ও ঘটনাগত দ্বন্দ্বের মাধ্যমে কাহিনি বর্ণনা করে, উপন্যাসের পরিণতির দিকে এগিয়ে কখনো বা নিজেই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হয়ে উত্তমপুরুষে কাহিনি ব্যক্ত করেন। আবার কোনো কোনো উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্র নিজের মতো করে ঘটনার বিবরণ দেয়। চিঠির মাধ্যমে উপন্যাস রচনার রীতিও বহুল প্রচলিত। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই রীতিগুলির একটিও গ্রহণ করেননি বরং উপন্যাসের একটি চরিত্রকে দায়িত্ব দিয়েছেন বিবরণ দেবার এবং ঐ চরিত্র উত্তমপুরুষে উপন্যাসের কাহিনিটি সমস্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাসহ বর্ণনা করেছে। আলোচ্য উপন্যাসে শ্রীবিলাস এই দায়িত্বপ্রাপ্ত। বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে এই জাতীয় কৌশল সম্পূর্ণ অভিনব। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, শ্রীবিলাসকেই রবীন্দ্রনাথ এই দায়িত্ব দিলেন কেন?

'চতুরঙ্গ' উপন্যাস যদি শচীশের আত্মোপলব্ধির ইতিহাস হয়, তবে এই পথচলার কাহিনি জ্যাঠামশায় দেখে যেতে পারেননি শেষপর্যন্ত।- আর তার গড়ে ওঠার ঘটনাটি ঘটেছে দামিনীর অগোচরে। তাই স্বাভাবিকভাবেই জ্যাঠামশাই কিম্বা দামিনীর পক্ষে উপন্যাসের কথাকার হওয়া সম্ভব নয়। বাকি রইল শচীশ আর শ্রীবিলাস। নাস্তিক এবং 'প্রচুরতম মানুষের প্রভুততম সুখসাধনে' নিমগ্ন জ্যাঠামশায়ের ছত্রছায়ায় থাকা শচীশ, লীলানন্দ স্বামীর শিষ্য, রসসাধনায় মগ্ন শচীশ, দামিনীর আকর্ষণ উপেক্ষাকারী শচীশ এবং শেষপর্যন্ত অরূপের সন্ধানে যাত্রাকারী শচীশ — শচীশের সাধনপথের চারটি স্তরের প্রত্যক্ষদর্শী শচীশ ছাড়া একমাত্র শ্রীবিলাস। এই যুক্তিতে অবশ্যই শ্রীবিলাস উপন্যাসের কথক হতে পারে।

দ্বিতীয়ত: একমাত্র শ্রীবিলাসই ননীবালার আত্মহত্যা থেকে শুরু করে দামিনীর মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা একটা স্থির অবস্থান থেকে দেখেছে। এই উপন্যাসের একমাত্র স্থির চরিত্র সে-ই। তাই তার পক্ষে স্থির এবং চলমান — উভয় অবস্থার ঘটনাগত এবং চরিত্রগত দ্বন্দ্বের বর্ণনা দেওয়া সহজসাধ্য এবং সম্ভবপর। কিন্তু শচীশ তার পরবর্তিত অবস্থার সাপেক্ষে সমস্ত কিছু দেখেছে। চলন্ত রেলগাড়ী থেকে দেখলে বাইরের সমস্ত কিছুকেই যেমন উল্টোদিকে বেগমান মনে হওয়ার ভ্রান্তি জন্মায়, এই উপন্যাসের কথন শচীশ হলে, তার পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সে-ও একই ভ্রান্তির সৃষ্টি করত। স্থির অবস্থানে (Static) না থাকার জন্য স্থির অবস্থার, ঘটনার বা চরিত্রের বিশ্লেষণ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না — এই বিচারে শ্রীবিলাসই কথক হবার পক্ষে যোগ্যতম।

ঔপন্যাসিক শচীশকে যে উপন্যাসের বর্ণনাকারী করেননি, তার আরো একটি বড় কারণ শচীশের ব্যক্তিত্ব। সে এতখানি প্রখর ব্যক্তিত্ববান যে চারিদিকের ক্ষুদ্রতুচ্ছ-সাধরণ সমস্ত ঘটে যাওয়া ঘটনা, সাধারণ মানব-মানবীর চরিত্র, তাদের কার্যকলাপ তার চোখে পড়ে না। অন্যান্য বক্তিত্বপ্রবণ মানুষদের মতোই শচীশও 'আপনাতে আপনি মগ্ন' নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত সর্বদা। ফলতঃ এ ধরনের চরিত্রের মানুষদের দিয়ে কোনো উপন্যাসের ঘটনা-চরিত্র দ্বন্দ্বের বিবরণ দেওয়া যায় না। কেননা, উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রে ঘটনার যে ধরনের অনুপুঙ্খ বিবরণ প্রয়োজন হয়, সেগুলি শচীশের মতো মানুষের নজর এড়িয়ে যায়। শচীশ সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেছে শ্রীবিলাস- 'শচীশ কেবল শোভাই দেখিল, দামিনীকে দেখিল না।'' -- সব জিনিসেরই শচীশ বাহ্যাবরণটাই দেখব, তার অন্তঃস্থল পর্যন্ত তারা দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করত না। তাই তার পক্ষে কোন কিছুই বিশ্লেষণ করা সম্ভব ছিল না, অথচ কোন উপন্যাসের কথক হতে গেলে বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন। সম্ভবতঃ সেকারণেই রবীন্দ্রনাথ শচীশের ওপর এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেননি।

সমস্ত দিক দিয়ে বিচার করলে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত চরিত্র শ্রীবিলাস-ই। শ্রীবিলাসের শচীশের মত প্রখর ব্যক্তিত্ব না থাকলেও সে ব্যক্তিত্বহীন নয়। সে এক অসাধারণ নমনীয় ও কমনীয় চরিত্রের অধিকারী। সে সকলের সঙ্গে, সব কিছুর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে, সকলকে ভালবাসতে পারে, সবকিছুর দিকে মমত্বপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে পারে, সকলের কাছ থেকে ভালবাসাও পেতে পারে তেমনি। আর এই সবার কাছে গ্রহণীয় হবার সুবাদেই সে জানতে পারে সমস্ত ছোটোখাটো ঘটনার অনুপুঙ্খ বিবরণ। তাই জ্যাঠামশাই এবং শচীশের পাশাপাশি হরিমোহন, পুরন্দর, ননীবালা বা তার মামাতো ভাই কিম্বা দামিনীর পোষা-চিল-বেজী-কুকুর যেমন তার দৃষ্টি এড়ায় না, তেমনি লীলানন্দ স্বামী আশ্রয়ে ধর্মতত্ত্ব-রসতত্ত্ব আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে দামিনীর পাড়ায় নাড়ু কুটতে যাওয়া, নবীনের স্ত্রীর বিষ খেয়ে আত্মহত্যার কারণও শ্রীবিলাসের নজরে আসে। নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রকোপে অন্যকে যেমন সে উপেক্ষা করেনি, তেমনি অন্যকে স্থান দেবার মত প্রশস্ত ও বিস্তৃত প্রেক্ষাপট তার ছিল। শচীশকে যদি রবীন্দ্রনাথ প্রবল ব্যক্তিসম্পন্ন করে থাকেন, তবে শ্রীবিলাসকে করেছেন মহৎ ও হৃদয়বান।

কোন উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রগত দ্বন্দ্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে কিম্বা বিশ্লেষকের ভূমিকা নিতে গিয়ে কথককে শুধুমাত্র হৃদয়বত্তার অধিকারী হলেই চলে না -তাকে এক নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত সংঘাত-সংকটকে - এককথায় গোটা বিষয়টিকেই পর্যবেক্ষণ করতে হয়য়। এই উপন্যাসের কথক শ্রীবিলাসও উপন্যাসে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনাকেই বেশ কিছুটা দূরত্ব থেকে পর্যবেক্ষণ করেছে। ফলে তার পক্ষে একটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী, নিঃস্পৃহ-নিরাসক্ত মনোভাব তৈরী করা সম্ভবপর হয়েছে। এই দৃষ্টিসম্বলিত মন নিয়েই এস জীবনকে সমাজকে ব্যক্তিকে দেখেছে, জেনেছে, বুঝেছে এবং তুলে ধরেছে পাঠকের সামনে। শচীশের জীবনের ঘটনাকে নিঃস্পৃহভাবে প্রকাশ করা শচীশের পক্ষে সম্ভব ছিল না বলেই রবীন্দ্রনাথ কথক হিসেবে শ্রীবিলাসকেই ব্যবহার করেছেন।

উপন্যাসের উপস্থাপককে হতে হয় ঈশ্বরের মতো সর্বশক্তিমান - যিনি সব শুনতে বা বুঝতে পারেন — যিনি সর্বত্রকারী এবং সকলের সবরকম অবস্থার মনোভাব প্রকাশেও সক্ষম। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে একমাত্র শ্রীবিলাস-ই এ সকল গুণে গুণান্বিত। অবশ্য উপন্যাসের কোন কোন অংশের বিবরণ শ্রীবিলাস 'শচীশের ডায়েরী' থেকে উদ্ধৃত করেছে - সেটা ছিল শচীশের ব্যক্তিগত অন্তর উপলব্ধির স্তর — সেখানে শ্রীবিলাসের পক্ষে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না - উপন্যাসের ঘটনার বাস্তবতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখার জন্যই সে এই পন্থা অবলম্বন করেছিল। সেই অংশগুলির বিবরণ সরাসরি শ্রীবিলাস দিলে উপন্যাসের বিশ্বাসযোগ্যতা বরং ক্ষুন্ন হবার আশঙ্ক ছিল।

৪.১.২.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

1 õ%þ‡%þÚó vþ‡¯Ä¡õ¢î¡ûþ‡¯%&¡ìç ˜yî#%þîû=!œ xyõ¢œy%þ‡y „þî¡ýû

2 Ÿ%þîÿ îû<#î˜ ¢y•˜yëûõ%þ‡%þÚó„þy!Ýþû‘þ‡ þ‡¯Å!îõ¡Ç¡ì „þî¡ýû

3 ò<Ä¡ãþ›Ÿy£áx‚Ÿ õ%þ‡%þÚóvþ‡¯Ä¡õ¢î¡û!¦þ ¦þ› î%þ‡y „þîõŠé¡ëëë› þ‡Ä!Ýþûë íyíÅ!î%þîû„þî¡ýû

4 õ%þ‡%þÚóvþ‡¯Ä¡õ¢î¡û¢)•îû×#!îœy¢î¸ «îÄ!Ýþ!îõ¡Ç¡ì „þî¡ýû

৪.১.২.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

1 îû# vþ‡¯Ä¡¢ ¢›#¸þ‡ëëë¢“þ‡îÊþ‡õ”

2 îû# ˜yõî îûvþ‡¯Ä¡¢é*õ%þ‡þ‡yõ¢œy„þç !ŸÒ îþ‡ëëë-¢ëû xy„þ‡õ¢õ£yõ¢˜

3 îûî îûÂëëë%þîû&þ îõî Ä¡þ‡y•Ä¡ëû

4 vþ‡¯Ä¡¢ ¢›y <”‚ÜT* îû¸ « ç îû# ˜yíëëë<ëûþ‡îõî Ä¡þ‡y•Ä¡ëû

পর্যায় গ্রন্থ - ১
একক - ৩
চতুরঙ্গের উপন্যাসের নামকরণ

বিন্যাস ক্রম :

৪.১.৩.১ : ‘চতুরঙ্গ’ এর নামকরণ

৪.১.৩.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.১.৩.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪.১.৩.১ : ‘চতুরঙ্গ’ এর নামকরণ

অতঃপর নামকরণ প্রসঙ্গ। নাম নির্বাচনের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সতর্কতা বহুজনবিদিত। বহুক্ষেত্রেই আমার দেখেছি, নাম নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি নিঃসন্দিগ্ধ হতে পারছেন না — ফলে বারবার তাঁকে পাল্টাতে হয়েছে রচনার নাম। বিখ্যাত নাটক ‘রক্তকরবী’ র নাম প্রথমে রেখেছিলেন ‘যক্ষপুরী’, তারপর নাম পাল্টে রাখলেন ‘নন্দিনী’। এ নামও তার পছন্দ হল না—শেষে নাম হল ‘রক্তকরবী’, এরকমই ‘রাজর্ষি’ উপন্যাসের নাট্যরূপের নাম হল ‘বির্সজন’, ‘রাজা’ নাটকের পরিবর্তিত রূপের নাম ‘অরূপরতন’, বিনোদিনী’ হল ‘চোখের বালি’, ‘পথ’ পাল্টে হল ‘মুক্তধারা’ এবং ‘তিনপুরুষ’ পরিবর্তিত হল ‘যোগাযোগ’-এ।

এর থেকে আমরা রবীন্দ্রনাথের নাম নির্বাচনের ব্যাপারে কয়েকটি বিশেষত্ব খুঁজে পাই। প্রথমতঃ তিনি নির্দেশাত্মক নাম খুব কমই ব্যবহার করতেন। নামের মধ্যে দিয়ে গল্প-উপন্যাসের সারাৎসারটাই প্রকাশিত হবে- তেমন নাম তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। দ্বিতীয়তঃ নামকরণের ব্যাপারে তাঁর স্বাভীবিক ঝোঁক ছিল ব্যঞ্জনার দিক। এ প্রসঙ্গে ‘সমাপ্তি’ কিম্বা ‘গুপ্তধন’ গল্পের কথা করণীয়। ‘রক্তকরবী’ নামের ক্ষেত্রেও ব্যঞ্জনার দিকটি ফুটে উঠেছে।

‘চতুরঙ্গ’ নামকরণের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের ঐ বিশিষ্ট মনোভঙ্গি কাজ করছে। ‘চতুরঙ্গ’ নামকরণের একটা ইতিহাস পাওয়া যায় রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘পিতৃস্মৃতি’ গ্রন্থে। তৎকালীন বিশিষ্ট শিল্পী, সাহিত্যিক ও সমালোচকদের সঙ্গে এক ঘরোয়া আড্ডায় ‘চতুরঙ্গ’ পঠিত হবার পর ঐ চারটি গল্পের একত্রিত রূপের কী নামকরণ হবে তা নিয়েও আলোচনা হল - ‘চারজনা’, ‘চতুষ্ঠয়’, ‘শচীশ’, ‘দামিনী’, ‘শ্রীবিলাস’ প্রভৃতি নামকরণ Suggested হল। শেষটার ‘চতুরঙ্গ’ বলাতেই একবাক্যে পছন্দ হল — বাবারও এটা একবার মনে হয়েছিল।

‘চতুরঙ্গ’ নামকরণের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কোনো বক্তব্য কোথাও নেই। গ্রন্থারম্ভে শুধু বলেছেন — ‘‘জ্যাঠামশায়, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস ইহার চারি অংশ’’ - কিন্তু শুধু এই চারটি অংশের জন্যই ‘চতুরঙ্গ’ নামটি রবীন্দ্রনাথের কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়েছিল একথা মেনে নিলে গ্রন্থটির প্রতি সুবিচার করা হবে না। চতুরঙ্গ শব্দটি একটি অর্থ হল ‘দাবার ছক’। উপন্যাসের কাহিনিতে দেখা যায়, নায়ক শচীশ তার জীবনের ছক বারবার সাজিয়েছে আর বারবার সেই ছক গেছে ভেঙ্গে। দামিনীর জীবনেও সেই একই ছকের খেলা। ডঃ সুকুমার সেন এই দুই অর্থই গ্রহণের পক্ষপাতি। অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘বাংলা উপন্যাসের কালান্তর’ গ্রন্থে বলেছেন — ‘চতুরঙ্গ’ নামের মধ্যে নায়ক-নায়িকার জীবনের চারটি পর্যায়ের ইঙ্গিত রয়েছে — জ্যাঠামশাই, লীলানন্দ, গুরুবিদ্রোহ, শচীশ এবং শ্রীবিলাস। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়র মতে ‘চতুরঙ্গ’ নামকরণ এই দিক দিয়ে সার্থক।

উপন্যাসটি গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে পাঠ করলে কথক শ্রীবিলাসের জীবনেরও চারটি পর্যায় পাওয়া যায়, শচীশের বন্ধু হিসেবে চারটি পর্যায়েই সে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে শচীশের ছক ভেঙ্গে যাওয়া লক্ষ্য করেছে। 'না-ঈশ্বরে বিশ্বাসী' জ্যাঠামশায়ের চেলা থাকে লীলানন্দের ভক্তি ও রসবাদ, সেখানে দামিনীর করাল ছায়ায় ঢেকে যাওয়া (যে দামিনী উত্তরের বাতাসকে সিকি পয়সা খাজনা দেয়না') এবং ক্রমশঃ তার নিজের জীবনকে জড়িয়েছে দামিনীর সঙ্গে।

'চতুরঙ্গ' মূলত শচীশের আত্মানুসন্ধান তথা সত্যানুসন্ধানের কাহিনি। এজন্য তার জীবনের সুস্পষ্ট চারটি স্তরই নামকরণের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে। কিন্তু 'চতুরঙ্গ' নামকরণের ব্যাপারে একটি বিষয় সম্ভবতঃ অনালোচিতই থেকে যায় — প্রথমেই আমরা যে ঘরোয়া আড্ডার কথা বলেছিলাম, সেখানে অধিকাংশ রবীন্দ্রনুরাগী সমষ্টিবাচক নাম প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' নামটিই কেন ভাল লাগলো? নামকরণের ব্যাপারে পূর্বোক্ত কারণগুলি স্বীকার করেই আরও একটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা যায়। রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যে 'লীলা' ও 'রঙ্গ' কথাদুটি বারবার এসেছে নানা তাৎপর্য নিয়ে। শচীশের জীবনলীলা চারটি অধ্যায়ে বিধৃত হয়েছে। হয়তো একারণেই 'রঙ্গ' শব্দটির ব্যবহার। আবার শচীশের জীবনে সুস্পষ্ট দুটি ছেদ আছে — গতি ও স্থিতি। শচীশ নিজেই বলেছে — '' এ যে রসের সমুদ্র এখানে নৌকার বাঁধ নেই, মুক্তির রাস্তা।'' **চতুরঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রতিপাদ্য বিষয় উদ্দাম কর্ম ও কর্মহীন ভিত্তি — দুই-ই জীবনের পক্ষে অচল। জীবন চায় গতি ও স্থিতির সমাহার। গোঁড়ামি দিয়ে গোঁড়ামিকে চাপা দেওয়া যায় না। সব মানা কিছুই না মানা দুই-ই দুর্বলতা।** সেদিন থেকে শচীশের জীবনাচরণ রবীন্দ্রদৃষ্টিতে রঙ্গ ছাড়া আর কী? এই জীবনরঙ্গের মধ্য দিয়েই শচীশের সত্যোপলব্ধি ঘটেছে। বলা বাহুল্য, এই জীবনরঙ্গই চতুরঙ্গ। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে 'চতুরঙ্গ' নামকরণ সবদিক থেকেই সার্থক।

৪.১.৩.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

1 ‰þ“%ÎÛó vþ¯Ä¦ïÌ¢ÎÛÕ¦› „þÛ „þ“þ)ÛÏ¦í Åþ£ëï òŠéÎïè “%þ ›ïÎ „þïÎ¦Û

2 vþ¯Ä¦ïÌ¢ÎÛ!ŸïÎ¦Õ¦ï› Îë í¦í Åþ !Î%þÛ„þïÎ¦Û

৪.১.৩.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

1 ÎÛ# vþ¯Ä¦¢ ¢›#Ç þéééé¢“ÄþÎÊþï”

2 ÎÛ# ˜¦ïÎ ÎÛvþ¯Ä¦¢é* ‰þ“þ¦ïè¦„ þÇ !ŸÒ Îþ¯éééé–¢ëÛ x¦„ þÛ ï£¦ïÌ¢

3 ÎÛ ÎÛÀéééé%þÎ&þ Îïî Ä¦þ¦•Ä¦ëÛ

4 vþ¯Ä¦¢ ¢›¦ ‹”„ÜT* ÎÛ « Ç ÎÛ# ˜¦íéééé‹ëÛþÎïî Ä¦þ¦•Ä¦ëÛ

ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ

পর্যায় গ্রন্থ - ১
একক - ৪
গঠনশৈলী ও আধুনিকতা

বিন্যাস ক্রম :

৪.১.৪.১ : ‘চতুরঙ্গ’ এর গঠনশৈলী ও আধুনিকতা

৪.১.৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.১.৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪.১.৪.১ : ‘চতুরঙ্গ’ এর গঠনশৈলী ও আধুনিকতা

১৩১৯ সালে সবুজপত্রের পৃথক পৃথক সংখ্যায় জ্যাঠামশায়, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস নামে চারটি পৃথক গল্প প্রকাশিত হয়। শচীশ অধ্যায় থেকেই বোঝা যাচ্ছিল এই গল্পের অন্তঃসূত্র। পরে এই চারটি গল্প একত্রিত হয়ে যখন ‘চতুরঙ্গ’ নামে প্রকাশিত হ’ল, তখন গল্পগুলির ভেতরের অন্তঃসূত্রটি আরো ভালো ভাবে বোঝা গেল। এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ একটি বিশিষ্ট ফর্ম বা গঠনশৈলী ব্যবহার করেছেন। আগের উপন্যাসের মতো টানা গল্প বলে যাননি। গল্পরস যেটুকু আছে, তার মধ্যেকার সমস্ত বিষয়গুলিরও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেননি। আসলে উপন্যাসের বিষয় সন্নিবেশে, চরিত্রের অন্তর-রহস্য উদঘাটনে এমন এক বিশিষ্ট শিল্পরীতির আশ্রয় রবীন্দ্রনাথ নিলেন যাতে পাঠক ও সমালোচক মহলের প্রচলিত সাহিত্যবোধে লাগলো এক প্রচণ্ড আঘাত। উপন্যাস শিল্পের গতানুগতিক গঠনশৈলী ও শিল্পরূপের মূলে প্রচণ্ড আঘাত করলেন। ফলে সাহিত্যিক ও বিদগ্ধ মহলে একেবারে উল্টো রকম মতামত শোনা গেল---শুরু হল বিতর্ক এবং দ্বিধা।

‘চতুরঙ্গে’ উনিশ শতকী প্লটের মোহ ঘুচিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ, উপন্যাস হয়ে উঠল বক্তব্যে প্রধান, ভাবনির্ভর। বুদ্ধদেব বসুর মতো আপাদমস্তক আধুনিক মানুষও ‘চতুরঙ্গ’ পড়তে গিয়ে মনে করেছেন ‘চতুরঙ্গ’ পড়তে পড়তে সূক্ষ্ম একটা অস্বস্তি কি অনুভব করি না আমরা, কেমন হাঁপ-ধরা ভাব, যেন বড় বেশি পাতলা হাওয়ার বই?’ (রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য) আবার অন্যদিকে বাংলা উপন্যাস আলোচনায় প্রবাদপ্রতিম শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়েরও মনে হয়েছে - ‘‘যেন একটা পাগলা হাওয়া যদৃচ্ছাক্রমে চরিত্রগুলিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও তাহাদের পরস্পর সম্পর্কটিকে অস্থির পরিবর্তনের ঘূর্ণাবর্তে সর্বদা বিবর্তিত করিতেছে।’’ (বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা)। তাঁর মনে হয়েছে, প্রচলিত উপন্যাসের সাধারণগুণের কোনটাই প্রায় চতুরঙ্গে নেই বললেই চলে। আলোচনা প্রসঙ্গে ড. বন্দ্যোপাধ্যায় ‘চতুরঙ্গ’ সম্পর্কে যে মন্তব্যগুলি করেছেন সেগুলি সূত্রাকারে সাজানো হ’ল—

১। কাহিনি আংশিকতা দুষ্ট এবং জীবন-নাটকের পরিচয় আংশিক।

২। কাহিনি বিন্যাসে পারম্পর্যের অভাব।

৩। উপন্যাস পাঠের বিশিষ্ট স্বাদ এখানে পাওয়া যায় না।

৪। উপন্যাসের গভীরতা ও আয়তন কৃত্রিম ভাবে নিয়ন্ত্রিত।

৫। তৃপ্তিকর সমাপ্তি মেলে না।

আপাতদৃষ্টিতে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের এইসব ত্রুটি ধরা পড়বেই সন্দেহ নেই। কিন্তু এই উপন্যাসের গঠনরূপের বৈশিষ্ট্য খুঁজতে হলে আমাদের আরও গভীরে প্রবেশ করতে হবে।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের মূল চারটি ভাগ। এ প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভালো যে 'চতুরঙ্গ' নামের যে প্রচলিত ব্যাখ্যা তা এই উপন্যাসের প্রতি সুবিচার করে না। আসলে এ গল্পের নায়ক শচীশের জীবনের চারটি পর্যায় দেখানোই ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য। আমরা আগেই দেখেছি যে নায়িকা দামিনীর জীবনও অনুরূপ চতুঃস্তরবিভক্ত। ঘটনাপ্রবাহ এখানে মোটেই প্রশ্রয় পাইনি কারণ চতুরঙ্গের উদ্দেশ্য অন্য। উপন্যাসের প্রধান পাত্র-পাত্রী জীবনের নানা ছকে ঘুরেছে এবং প্রতিটি ছক তাদের ভেতরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় একটা একটা করে ভাঙ্গছে। এই ভাঙ্গার ক্রিয়া ঔপন্যাসিক ব্যাখ্যা করলেও ছকগুলি কিভাবে গড়ে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করেননি। শচীশের জীবনের পরিবর্তনের স্তরগুলিকে উপেক্ষা করে গেছেন। তাই হয়তো সমালোচক মন্তব্য করেছেন উপন্যাসের 'গ্রন্থনাসূত্র কাঁটাছেঁড়া'। আসলে এই উপন্যাসের মধ্যবর্তী স্তরসমূহ ততটা প্রয়োজনীয় নয়, যতটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি ছক ছকান্তরে উপনীত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের কিভাবে মথিত করেছে - তাকে রূপায়িত করা। সেদিক এই উপন্যাসের বড় কথা সুতরাং এদিক থেকে চতুরঙ্গ আংশিকতা দোষে দুষ্ট একথা বলা যাবে না। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাই নির্দ্ধিধায় বলেছেন - "হয়তো 'চতুরঙ্গে'র ঘটনা-শৃঙ্খলের মধ্যে ফাঁক আছে, হতে পারে, এরা চারটি অঙ্গ সর্বক্ষেত্রেই অনিবার্যভাবে সংযুক্ত নয়; চরিত্রগুলির বাধা-বিশ্লেষণে হয়তো গ্রন্থাগার অতি স্পষ্টতার সুযোগ গ্রহণ করেনি; এর পরিণতির ধারাও হয়তো কুহেলী বিজড়িত। তবু 'চতুরঙ্গ' আধুনিক চিন্তসম্মত নবতম রীতি অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস এবং সার্থক উপন্যাস। কারণ শিথিল-গ্রথিত মনে হলেও উপন্যাসের একটি নির্দিষ্ট ক্রমবিকাশ আছে, একটি সুনিশ্চিত ভাববৃত্ত এতে সম্পূর্ণ হয়েছে।" (কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ)।

চরিত্রসৃষ্টির সময়েও রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাস বিশদ হননি। এক একটা কথায় গোটা চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। এতে কাহিনির কথনভঙ্গী এবং চরিত্র পরিচয়ের মধ্যে অদ্ভুত সংগতি স্থাপিত হয়েছে জীবনরসের রসিক দামিনীকে পরিস্ফুট করতে রবীন্দ্রনাথ — কে এমন রূপকের সাহায্যে হাজির করেছেন (শচীশের গুহায় অন্ধকার রাত্রের অভিজ্ঞতা/শচীশের ডায়েরী) যাকে উপন্যাসের বিশিষ্ট রীতিকৌশল থেকে আলাদা করা যায় না। এখানেই বাঙালি পাঠক প্রথম জেনেছে চরিত্রের বিবর্তন বলতে বোঝায় তার নিঃশর্ত স্বাধীন বিবর্তন ওরফে চরিত্রের জন্মান্তর। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় - 'চতুরঙ্গ একটি শচীশের কাহিনি নয়, নানা শচীশের কাহিনি। শচীশের অনেক জন্ম, অনেক মৃত্যু ঘটেছে। শচীশ জীবনের একটি ছক আশ্রয় করেছে। অনতিবিলম্বেই তাকে ভেঙে ফেলে নতুন একটি ছক আশ্রয় করেছে এবং পরমূহূর্তেই তাকে পরিত্যাগ করে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। দামিনীও তাই করেছে। বাংলা উপন্যাসের এ দুই চরিত্র প্রথম আধুনিক চরিত্র।" (কালের প্রতিমা)। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের প্রবক্তা শ্রীবিলাস জানিয়েছে, এ দুই চরিত্রের অভিনয় আত্মগত। বাংলা উপন্যাসে এই প্রথম চরিত্র আত্মানুসন্ধানে, আত্মসমীক্ষায় ব্যাপৃত হল, নিজের মুখোমুখি গল। বিশেষ থেকে নির্বিশেষে বহির্জগৎ থেকে ভিতরে দেহলিতে প্রত্যাবর্তনের প্রথম শিল্পরূপ 'চতুরঙ্গ'। উপন্যাসটি কার্যকারণহীন নয়। চতুরঙ্গের চারতলার ভিত্তি জগমোহন। জগমোহন আখ্যায়িকা একথা প্রমাণ করে যে উপন্যাসের কাঠামো, সংস্থান কৌশল বা উপন্যাসের স্থাপত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান কত গভীর ছিল। যদিও শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়ের মতে — "উপন্যাসটির গঠন শিথিলতার একটি প্রমাণ শচীশের জ্যাঠামশায়ের অনাবশ্যকরূপে পল্লবিত জীবনবর্ণনায়। উপন্যাসমধ্যে শচীশের জীবনাদর্শের উপর প্রভাব বিস্তার করা ছাড়া তাঁহার কোন প্রত্যক্ষ অংশ নাই। অথচ শচীশ অপেক্ষা তাঁহার জীবনকাহিনি অধিকতর ধারাবাহিকতার সহিত ও সবিস্তার বিবৃত হইয়াছে।" (বঙ্গসাহিত্য উপন্যাসের ধারা)। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে শচীশ চরিত্রের প্রাথমিক অবস্থার স্বরূপ উদঘাটনে জ্যাঠামশায় চরিত্রের এই পল্লবিত বিস্তার অনিবার্য ছিল - যেখানে শচীশ চরিত্র এই পর্বে সম্পূর্ণভাবেই জ্যাঠামশায় নিয়ন্ত্রিত। এছাড়া নীরস বুদ্ধিচর্চায় যে জীবনের খাদ পূর্ণ হতে

পারে না এবং জীবন যে ছকে ফেলা ব্যাপার নয়, — জ্যাঠামশায় অধ্যায়েই তা পরিস্ফুট। মানুষের মন যে যুক্তির পারম্পর্য মেনে চলে না সেটা ননীর আত্মহত্যা ও শেষ চিঠিতেই প্রমাণিত। আর মানুষের মনের গভীরে, কত গভীরেই বা যেতে পারে অন্য একজন মানুষ? — তাইতো এই গঠনকৌশল — এখানেই সেই বিশিষ্ট চেতনাপ্রবাহ রীতির ব্যবহার।

শচীশের মোহভঙ্গের কারণটিও উপন্যাসে সূক্ষ্মভাবে বর্ণিত। দ্বিতীয় ছকে যখনই শচীশ দামিনীকে অস্বীকার করে সাধনাকে বিপন্মুক্ত করতে চেয়েছে। তখনই সে তা ভক্তিসাধনরা ছকের ভগ্নাংশকে — তার স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। এখানেই এ ছকটি ভাঙ্গার এবং শচীশের পর্বান্তরে যাবার সূচনা হয়েছে।

''চোখের বালি' (১৯০২-০৩) থেকেই আমরা লক্ষ্য করেছি যে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশঃই মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস রচনায় আগ্রহী হয়েছেন। উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে তিনি যা ব্যক্ত করতে চেয়েছেন, তা হল ব্যক্তিসত্তার নিগূঢ়-জটিল সমস্যা। কয়েকটি বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির আঘাতে কোন মানুষের সাময়িক বা আকস্মিক মানস-প্রতিক্রিয়া দেখাহেই তাঁর উপন্যাসের লক্ষ্য নয়। এক একটি মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের সামগ্রিক বিকাশের ইতিহাস, নানা মানবী সম্পর্কের সংস্পর্শে তার ব্যক্তিসত্তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিজের ব্যক্তিস্বরূপের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তার সচেতনতা অন্বেষণ ও যন্ত্রণা-বেদনার ছবিই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ও তাঁর শেষপর্যায়ের ছোটগল্পের অধিকাংশ নরনারীকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। আর যেখানে কথাশিল্পীর লক্ষ্য এইরকম, সেখানে কাহিনি গৌণ হয়ে উঠবেই। রবীন্দ্রনাথের 'বউঠাকুরানীর হাট' বা 'রাজর্ষি' তে যে গল্পরস আছে, 'চোখের বালি', কিম্বা 'গোরা'-য় তা নেই। আবার সেখানেও যেটুকু কাহিনিগত আকর্ষণ আছে, আমাদের আলোচ্যপর্বে অর্থাৎ 'চতুরঙ্গ' - 'ঘরে বাইরে' থেকে শেষপর্যন্ত প্রসারিত পর্বে সে আকর্ষণটুকুও অন্তর্হিত। এই পর্বে আসলে ব্যক্তিস্বরূপের পরীক্ষা-নিরীক্ষাই মুখ্য বিষয়। আর এই কাহিনি অংশ গৌণ হয়ে পড়ার ফল হচ্ছে উপন্যাসগুলির আয়তন হ্রাস। 'চতুরঙ্গে'র ক্ষেত্রেই এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উপন্যাসটিতে কাহিনিকে বিশদভাবে বিবৃত করার অনেক অবকাশ ছিল। শচীশের মতো এক 'অসাধারণ নায়কের বিচিত্র জীবনকথা শোনার জন্য পাঠকের প্রবল কৌতুহল থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু ঔপন্যাসিক এ ধরনের কৌতুহল নিবৃত্তির ব্যাপারে নির্মমভাবে নীরব। এই নীরবতা বলাবাহুল্য অকারণ নয়। আর এই কারণ খুঁজতে গিয়েই সমালোচক গোপিকানাথ রায়চৌধুরী পৌঁছেছেন 'চতুরঙ্গ'-এর বাস্তবতা সম্পর্কিত প্রশ্নের মূলে -''চতুরঙ্গে এসে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবতার প্রচলিত ছক পালটে নিয়ে এলেন রিয়ালিজমের এক নতুন 'ডাইমেনশন'। অনুপুঙ্খ বর্ণনা ও উপকরণ নির্ভর বহিরঙ্গ বাস্তবতার বদলে সন্ধান দিলেন অন্তঃবাস্তবতার (inner reality)।... নিছক ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় চরিত্র নির্মাণ নয়, বিগতকালের পুরানো মূল্যবোধের জগৎ থেকে নির্বাসিত ব্যক্তির উন্মুক্ত আত্মখণ্ডিত সত্তার আপন 'আইডেনটিটি'র অন্বেষণসূত্রে ব্যক্তির দ্বিধা-দ্বন্দ্ব জিজ্ঞাসার, যন্ত্রণা ও আর্তির কে তুলে ধরাই একালের ঔপন্যাসিকের অন্বিষ্ট।'' (দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য)।

রবীন্দ্রনাথ যে সময়ে 'চতুরঙ্গ' লিখেছেন ঠিক সেই সময়ে ইংরেজী উপন্যাসেও নতুন রীতি প্রবর্তিত হ'ল। ভার্জিনিয়া উলফ্-কথিত 'Human nature' তত্ত্বের প্রতিপাদনে ফরাসী দেশে প্রকাশিত হয় মার্সেল প্রুস্তের 'Du cate de chez Swann' (1913) ইংরাজীতে ডরোথি রিচার্ডসনের উপন্যাসের প্রথম খণ্ড (1915)। এবং interior monologue ও জেমস্ জয়েসের। জেমস্ জয়েস শুরু করেন তাঁর কালজয়ী রচনার। সর্বত্রই অন্তর্জীবনের গভীরতা বাস্তবতার সন্ধান। মনের অবচেতন স্তরের গূঢ়েষা ও যৌনচেতনার গহন জটিলতার নীতি-নিরপেক্ষ রূপায়ণ, চরিত্র-অঙ্কনের চেয়ে ব্যক্তির আত্মান্বেষণ, চেতনাপ্রবাহ (Stream of Conscriousness) কিংবা আত্মসংলাপ (Interior monologue) প্রকরণের প্রয়োগ। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে সাহিত্যের যে বিপ্লবের দুন্দুভি ইয়োরোপে বসে শুনেছিলেন প্রুস্ত-জয়েন্স-ডরোথি-উলফ্- বাংলাদেশে বসেও রবীন্দ্রনাথ সেই দুন্দুভি

শুনতে ভুল করেননি। অথচ সবগুলিই একই সময়ের রচনা, সুতরাং অনুসরণ বা প্রভাবিত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ডরোথি রিচার্ডসন বা ভার্জিনিয়া উলফ্ উপন্যাসের প্রকরণের যেভাবে রূপান্তর ঘটান — 'চতুরঙ্গ'-এর গঠন কৌশলের সেইরকম রূপান্তর রবীন্দ্রনাথ না ঘটালেও আধুনিক চেতনাপ্রবাহী উপন্যাসের সমস্ত গুণই যে চতুরঙ্গে আছে সে বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় সিদ্ধান্তে এসেছেন যে— "বাংলা উপন্যাসে পূর্ণতার অন্বেষণ ও ব্যক্তিচরিত্রের সর্বময় প্রতিষ্ঠান সূচনা রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ'। তাই আধুনিক বাংলা উপনাসের স্বরূপ -সন্ধানপথে চতুরঙ্গের শিল্পমূল্য বিচতার সৎ বিবেকী উপন্যাস পাঠকের অবশ্য কর্তব্য।" (কালের পুতুল)।

কোনো সমালোচকের দৃষ্টিতে 'চতুরঙ্গ' থেকে বাংলা উপন্যাস সাবালক হতে চলেছে। প্রসঙ্গত, 'চতুরঙ্গে'র গঠনকৌশল যুক্ত হয়েছে ছোট গল্প ও আধুনিক কবিতার প্রতীকী ব্যঞ্জনা। এটাও আধুনিক মননেরই আর একটি ধর্ম। অবচেতন, প্রতীক ও সংলাপ এই তিনটি আধুনিক মাধ্যমকে তিনি চরিত্রের নিঃশর্ত স্বাধীন বিবর্তন ঘটাতে ব্যবহার করেছেন। শচীশ অধ্যায়র দশম অনুচ্ছেদে তিনি যে স্বগতোক্তি শচীশের মুখে বসিয়েছেন তা interior monologue এর শিল্পসমৃদ্ধ দৃষ্টান্ত তাই প্রথানুবর্তন নেই বলেই এই উপন্যাসকে 'আংশিক' বলা উচিত হবে না। আসলে রবীন্দ্রনাথ তো বাস্তবপন্থী উপন্যাস লিখতে চাননি - তাঁর বিষয় ছিল 'আইডিয়া' জিনিষটা। তাই এ প্রসঙ্গে আর ও একধাপ এগিয়ে গিয়ে সমালোচক অশ্রুকুমার শিকদার যে মন্তব্য করেছেন তা উদ্ধৃত করে আলোচনরা ইতি টানছি — " যে উপন্যাসের বিষয় চরিত্রের বিবর্তন বিকাশ বা ত্রিভুজ সমস্যার জটিলতা দেখানো নয়, রেনেসাঁসের যুক্তিবাদের সারবত্তাহীনতা দেখানো সেই উপন্যাসে বিষয়ের অনুরোধেই বাস্তবপরিবর্তনের ন্যায়যুক্তিসংগত সোপানগুলো যে স্বেচ্ছায় গোপন করা হয়েছে — এ কথা বুঝলে 'চতুরঙ্গে'র বিরুদ্ধে আংশিকতার অভিযোগ উঠতে না, উঠতে না পাগল হাওয়া বা পাতলা হাওয়ার কথা।" (আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস)।

৪.১.৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের শিরোনামের সার্থকতা বিচার করো।

২। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস অবলম্বনে দামিনীর চরিত্র বিকাশ চারটি স্তর সংযোজনের গুরত্ব ব্যাখা করো।

৩। শচীশের জীবনসাধনায় 'চতুরঙ্গ' কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

৪। 'জ্যাঠামশাই অংশ 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের ভিত্তিভূমি রচনা করেছেন।' — মন্তব্যটির যাথার্থ্য বিচার করো।

৫। 'চতুরঙ্গ' কে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলা যায় কি? উপন্যাসের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে এ সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

৬। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের গঠনশৈলী ও আধুনিকতা সম্পর্কে আলোচনা করো।

৭। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের সূত্রধর শ্রীবিলাস। উপন্যাসে তাঁর কথকের ভূমিকা পালন কতোটা যুক্তিসঙ্গত ও শিল্পসুষম হয়েছে তা আলোচনা দ্বারা প্রতিষ্ঠা করো।

৮। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের পটভূমি বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্র-উপন্যাস ধারায় তার স্থান-নির্দেশ করো।

৯। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে 'লীলানন্দ স্বামী' - চরিত্র সংযোজনের প্রাসঙ্গিকতা বুঝিয়ে দাও।

১০। শ্রীবিলাসের সঙ্গে দামিনীর বিবাহ কতোখানি যুক্তিসম্মত তা 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস অবলম্বনে ব্যাখা করো।

৪.১.৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি ও পত্র-পত্রিকা

গ্রন্থাবলি :

১। বঙ্গসাহিত্য উপন্যাসের ধারা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২। রবীন্দ্রসৃষ্টি-সমীক্ষা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

৪। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ—ধীরেন্দ্র দেবনাথ

৫। রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য—বুদ্ধদেব বসু

৬। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

৭। রবীন্দ্র উপন্যাস : কালের প্রেক্ষিতে—ভূদেব চৌধুরী

৮। কালের পুতুল—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

৯। উপন্যাসে সমাজদৃষ্টি : বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ—জয়ন্ত বন্দোপাধ্যায়

১০। বাংলা উপন্যাস সমাজ বাস্তবতা—জয়ন্তকুমার ঘোষাল

১১। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য—গোপিকানাথ রায়চৌধুরী

১২। রবীন্দ্র উপন্যাস-সমীক্ষা—সত্যব্রত দে

পত্র-পত্রিকা :

১। পশ্চিমবঙ্গ — রবীন্দ্রসংখ্যা (৪ঠা জৈষ্ঠ্য, ১৮৮৫, প্রবন্ধ—‘রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য কালচেতনা’) - ভূদেব চৌধুরী।

২। পশ্চিমবঙ্গ — রবীন্দ্রসংখ্যা (২৫শে বৈশাখ, ১৩৮৭, প্রবন্ধ—‘রবীন্দ্র উপন্যাসের দ্বন্দ্ব ও বস্তুভূমি) - জ্যোতির্ময় ঘোষ।

চতুর্থ পত্র

বিশেষ পত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

মানুষের ধর্ম

পর্যায় গ্রন্থ - ২

একক - ৫

ধর্ম সম্পর্কিত ধারণা

বিন্যাস ক্রম :

৪.২.৫.১ : উপস্থাপনা : ধর্মকেন্দ্রিক বিশ্ব পরিস্থিতি

৪.২.৫.২ : ধর্মচেতনার উদ্ভব

৪.২.৫.৩ : মানবজীবনে ধর্মের প্রয়োজন

৪.২.৫.৪ : ধর্মের বিচিত্র স্বরূপ

৪.২.৫.৫ : এসো ধম্মো সনাতনো

৪.২.৫.৬ : রিলিজিয়ন

৪.২.৫.৭ : ইসলাম

৪.২.৫.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.২.৫.৯ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪.২.৫.১ : উপস্থাপনা : ধর্মকেন্দ্রিক বিশ্ব পরিস্থিতি

বর্তমান বিশ্বে ধর্মকে কেন্দ্র করে বিচিত্র জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য ধর্ম নিয়ে জিগির কেবল আজকের নয়। সুপ্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় আপনাপন ধর্মাদর্শকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করবার জন্য ফতোয়া জারি করে পরস্বাপহরণে লিপ্ত হয়েছে। প্রাচ্য দেশে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ এবং পাশ্চাত্যে ক্রুসেড্ এর জ্বলন্ত উদাহরণ। কিন্তু ধর্ম বিষয়টি আসলে কি, তার অক্ষরার্থ ও অন্তর্নিহিত ভাবব্যঞ্জনাই বা কি, সমাজজীবনে তার গুরুত্বই বা কতখানি এসব নিয়ে গভীর আত্মনিমগ্নতার ও আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে নতুন করে।

৪.২.৫.২ : ধর্মচেতনার উদ্ভব

আমরা জানি, সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সুষ্ঠু কৌম জীবন-যাপনের আকাঙ্ক্ষায় অনৈসর্গিক শক্তিগুলি দ্বারা ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ এককালে তাদের স্তুতি করেছিল। স্বভাবতঃই কল্পিত হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন শক্তির অধিকারী বিভিন্ন দেব-দেবীর। ভারতবর্ষে হিন্দু লোকানুভবে এই সব দেবদেবীর সংখ্যা তেত্রিশ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তৎসত্ত্বেও প্রাচীন আর্য-মুনি-ঋষিদের আত্মানুভবে বিশ্বসৃষ্টি ও মহাবিশ্ব-পরিমণ্ডলের পশ্চাতে একজন স্রষ্টার (ব্রহ্মার) কল্পনা সমুজ্জ্বলিত হয়েছিল। ঈশ্বর এক ও অনন্তশক্তির উৎস- এই অনুভব থেকে গড়ে উঠেছিল একেশ্বরবাদ বা

অদ্বৈতবাদ (Monotheism)। মহাবিশ্বে-মহাকাশে এক অক্ষর-প্রশাসনের অখণ্ড-অক্ষয় ঐক্যবোধের কথা তাঁরা জেনেছিলেন - 'এতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি' (বৃহদারণ্যক ৩/৮/১১)। পরবর্তীকালে ঈশ্বর ও সৃষ্টিসম্পর্কিত জটিল মানবিক জিজ্ঞাসার সরল সমীকরণরূপে গড়ে উঠেছিল ত্রিমূর্তিবাদ - সৃজন পালন ও বিনাশের তিন অধিকর্তা — ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের রূপকল্পনা। 'একোহহং বহুস্যাম্' — এক থেকে বহুর এই কল্পনা উত্তেরোত্তর পল্লবিত-বিচারিত ও সংশ্লেষিত হয়ে ক্রমান্বয়ে দ্বৈত, বিশিষ্ট্যদ্বৈত, শুদ্ধদ্বৈত অচিন্তভেদাভেদ ও সর্বেশ্বর প্রভৃতি মতবাদের মধ্যে পরিণতি লাভ করেছিল।

৪.২.৫.৩ : মানবজীবনে ধর্মের প্রয়োজন

সুতরাং বোঝা গেল, ব্যবহারিক দিক ছাড়াও ধর্মের একটা দার্শনিক প্রেক্ষিত আছেই। এই পটভূমিটুকু আছে বলেই 'ধর্ম' শব্দটি বুদ্ধিক ও আনুভবিক তাৎপর্যে সমুজ্জল হয়ে যুগে যুগে মানুষকে-বৈষম্যের পথ পরিহার করে শান্তি ও সামঞ্জস্যের ধ্রুবলোকে চালিত করেছে। ধর্মের প্রায়োগিক ও প্রায়োজনিকতাৎপর্য বোধ করি এখানেই। মানুষের বিচিত্র সংঘাতমুখর প্রয়োজন, জটিল আশা-আকাAক্ষা-অগ্রতি ও পরিবর্তন - এককথায় জীবন ও জীবিকার সঙ্গে ওতঃপ্রোত হয়ে রয়েছে ধর্ম। এই ধর্ম মানুষকে একদিকে যেমন পারমার্থিক প্রয়োজন একটা কিছু উপলব্ধির প্রান্তসীমায় পৌঁছে দেয়, তেমনি বাস্তব জীবনকেও অস্বীকার করে না। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনগুলিকে উপেক্ষা রা যেমন চলে না, তেমনি অধি-আত্মিক জীবনের আকর্ষণকেও ঠেকিয়ে রাখা যায় না। একজন হিন্দুর কাছে 'ধর্ম' তাই বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের চাহিদা সম্পূরক ধমার্থকামমোক্ষপ্রদ চতুর্বর্গ।

আমাদের সংস্কারে 'ধর্ম' শব্দটি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত। সংগ্রামশীল মানুষের আশা-আকাঙক্ষা-প্রয়োজন, জীবন-জীবিকার সর্বস্তরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই ধর্ম। পঞ্চকোষ ও পঞ্চেন্দ্রিয় বিশিষ্ট মানুষের জীবন চরিতার্থ হয় তা আধিভৌতিক তথা পারমার্থিক প্রয়োজন সাধনের মধ্যে। চতুর্বর্গ ফল-প্রাপ্তির দ্বারা এই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। 'ধর্ম' তাই জীবনকে দেখে পূর্ণতা ও সমগ্রতার মধ্যে নিবিষ্ট করে।

জীবন তো একটাই। এখানে পবিত্রতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার, ভুক্তি ও মুক্তির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। এখানে ধর্ম-অর্থ ও কাম হাত ধরাধরি চলে। মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে —

''শ্রতং বহুবিধং ধর্মম্ ইহামুত্রসুখপ্রদম্।
ধর্মার্থকামদং বিঘ্নহরং নির্বাণকারণম্।''

পরস্পরবিরোধী এই কথার সূত্রে জিজ্ঞাসু শিষ্য তোলেন —

''ধর্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ পরস্পরবিরোধিনঃ।
এষ্যাং নিত্যবিরুদ্ধানাং কথম্ একত্র সমাগমঃ?''

উত্তরে গুরু বলেন—

''যদা ধর্মশ্চ ভার্যা চ পরস্পরবশানুগৌ।
তদা ধর্মার্থকামানাং ত্রয়াণামপি সঙ্গমঃ।''

অর্থাৎ ধর্ম-অর্থ-কাম একসঙ্গে চলে।

আসলে মানুষের ভৌতজীবনের যা কিছু কৃতাকৃত তা পরিণামী সত্যের প্রতি তথা ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত। ব্যক্তি জীবনের লাভালাভেরচেয়ে সমাজ জীবনের কল্যাণ-এষণা অনেক বেশি কাAক্ষিত বলেই শরীর রক্ষার জন্য

যা কিছু প্রয়োজন তাকে ধর্মবোধ দিয়ে উজ্জ্বল করে তুলতে হয় - 'শরীরং ধর্মসর্বস্বং রক্ষণীয়ং প্রযত্নতঃ।' আসল কথা, ঐ সমগ্রতাই জীবনের ধর্ম। তাই ধর্ম পালনের জন্য ধর্ম-অর্থ ও কাম - জীবনের এই অপিরহার্য ত্রিবর্গকে স্বীকার করতেই হয় - ''ধর্মার্থকামঃ সমবেম সেব্যঃ। যো হি একসক্তঃ সো জনো জঘন্যঃ।। (মহাভারত/শান্তি ১৪০-১৬৭)। অর্থাৎ ধর্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্বর্গ পালনের মধ্যেই ধর্মের পূর্ণতা।

কিন্তু ধর্মপালনের আপাতত লক্ষপূরণে সদা নিয়োজিত থেকেও ধর্মের অন্তর্নিহিত শ্রেয়োবোধকে বিসর্জন দিলে চলবে না। মনে রাখতে হবে, মানবশক্তির মর্যাদা, মানবমহিমার মহত্বের কথা। মনে রাখতে হবে, এই জীবশরীরেই পরাশক্তির (Supreme Force) বিচিত্র প্রকাশ - 'Poor body is the temple of living God' ।এই মানবহৃদয় ঈশ্বরের বাসস্থান, তাঁর লীলাক্ষেত্র' - এই বোধকেই বলে ধর্ম—

''ভগবান বাসুদেবোহি সর্বভূতেষু ব্যবস্থিত)।

এতদ্ জ্ঞানং হি সর্বস্যং মূলং ধর্মস্য শাশ্বতম্।''

এই ধর্ম পালনীয় আচরণীয়। কারো কোনো ক্ষতি করা নয়, কাউকে পীড়িত করা নয়, কায়মনোবাক্যে সর্বভূতের কল্যাণ কামনা ও সৌহৃদ্য ধর্মের পরম লক্ষ্য—

''সবের্ষৎ যঃ সুহৃন্নিত্যং সর্বেষাং চ হিতে রতঃ।

কর্মণা- মনসা বাচা স ধর্মং বেদ জাজলে।।''

(মহাভারত শান্তি ২৬১/৯)

এই ধর্মভাবনায় আত্মতৃপ্তির ভাবটিও মহাভারতকারের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি—

''অদ্রোহঃ সর্বভূতানাং কর্মণা-মনসা-গিরা।

অনুগ্রহশ্চ দানঞ্চ সতাং ধর্মঃ সনাতনঃ।।''

(মহা. শান্তিপর্ব ২৬১/৯)

এই ধর্মভাবনায় আত্মতৃপ্তির ভাবটিও মহাভারতকারের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি—

''অদ্রোহঃ সর্বভূতানাং কর্মণা-মনসা-গিরা।

অনুগ্রহশ্চ দানঞ্চ সতাং ধর্মঃ সনাতনঃ।।''

(মহা. শান্তিপর্ব ১২৬/২৯)

৪.২.৫.৪ : ধর্মের বিচিত্র স্বরূপ

আচার্য উপদেশ দিলেন — 'ধর্মং-চর'। কিন্তু সে ধর্ম কোন্ ধর্ম? এ প্রশ্নের সদুত্তর পেতে হলে আমাদের প্রবেশ করতে হবে প্রাচীন ভারতীয়-সাহিত্য-শাস্ত্র-দর্শন-পুরাণ-মহাকাব্য প্রভৃতির গভীরে। কারণ ধর্মচর্চা ও চর্যার পীঠস্থান এই ভারতভূমি। ভারতীয় জীবনের সঙ্গে শিকড়ের তন্ময়তা নিয়ে মিশে আছে ধর্ম। বৈদিক কাল থেকে বর্তমান কাল অবধি 'ধর্ম' পদটি বহু বিচিত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। কখনো ঘটেছে তার অর্থপ্রসার, কখনো অর্থসংকোচ। ধৃ-ধাতুনিষ্পন্ন 'ধর্ম' শব্দের বাচ্য অর্থ - ধারণ বা ধারণা ('ধারণাৎ ধর্মঃ)। অর্থাৎ যাকে গ্রহণ বা ানুভব করে মানুষ বেঁচে-বর্তে তাকে তাই 'ধর্ম'। বৈদিক যুগে 'ছান্দস্' বা ছন্দোদ্ভব, বেদস্থিত, বেদসম্বন্ধী (ছান্দসীভিঃ ...

হরিবংশ ২২৩.৭ প্রভৃতি অর্থে ধর্মশব্দের ব্যবহার সুপ্রচলিত। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডে সমৃদ্ধ 'বেদ' যাগ-যজ্ঞাদি-উপাসনা-বিধি ও ঋষিগণের দার্শনিক আত্মোপব্ধিতে পূর্ণ। এই সূত্রে ধর্ম প্রসঙ্গে আচারক্রিয়া ও পারমার্থিক উপলব্ধির ভাব একাত্ম হয়ে গেছে ঐ মহদ্ গ্রন্থে।

যুগ ভেদে বহু অর্থ ও ভাবরূপে ধর্ম শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। অথর্ব বেদে বলা হয়েছে পুরাতনের অনুশীলনই ধর্ম। (ধর্মং পুরাণমনুপালয়ন্তি — অথর্ব ১৮.৩.১) রামায়ণে ধর্ম স্বভাব, ভাব, প্রকৃতি অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে - 'মৃত্যুং মরণধর্মেণ যোজয়েয়ম্' (রামায়ণ — Gasparo Gorresis ৩.২৯.১৮) শ্রেয়ঃ, পুণ্য, শুভদৃষ্ট, লোকধারক প্রভৃতি অর্থে ধর্ম শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায় মহাভারতে - 'ধর্মং যো বাধতে ধর্মো ন স ধর্মং কুবত্ম' তৎ।' (মহা ১৩১.১১) যা আমাদের সুপথে চালিত করে তাই ধর্ম, আর এর বিপরীতটাই অধর্ম। মনস্বিনী গান্ধারী 'ধর্ম' বলতে বুঝতেন শ্বাশ্বত ন্যায়নীতির মূর্তপ্রতীক শ্রীকৃষ্ণকে। তাঁর কাছে 'কৃষ্ণ যেখানে ধর্মও সেখানে, যেখানে ধর্ম, সেখানেই জয়' —'যতঃকৃষ্ণস্ততো ধর্মো যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ (মহা ১৩.১৬৭.৪১) ধর্মকে পরম মূল্য-বিভূমিষত করে হিতোপদেশে বলা হয়েছে — 'এক এব সহৃদ্ধর্মঃ' —ধর্মই মানুষের একমাত্র সুহৃদ্ (হি.১৬৭ঃ আবার ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুভবে ধর্মের নিহিতার্থ গূঢ় ও রহস্যময় — 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্ ...।' দেশ-জাতি-কুল প্রভৃতি অর্থে 'ধর্ম' শব্দের প্রয়োগ গীতায় সুলভ —

''কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনঃ।

ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোহভিভত্যুত।।'' (গীতা ১৩৯)

'মনুসংহিতা' ধর্ম বলতে বুঝিয়েছেন মানবশাস্ত্রানুশাসন ও তদনুযায়ী বৈধ কর্মগুলিকে। (মনু ১.১১৪.৪১) কালিদাস রঘুবংশে ধর্মকে চতুবর্গের প্রথম বর্গ, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি অর্থে ব্যবহার করেছেন। (রঘু১/২১) গুণবাচক অর্থে ধর্ম শব্দের প্রয়োগ (যেমন ভালবাসার ধর্ম, শোকের ধর্ম প্রভৃতি) প্রাচীন -মধ্য ও আধুনিক যুগের ভারতীয় সাহিত্যে সুলভ। উপমাসাম্য, অভিধেয়বস্তু প্রভৃতি বোঝাতে ধর্ম শব্দের ব্যবহার করেছেন 'সাহিত্যদর্পণ'-কার-বিশ্বনাথ - ''একোহপি ধর্মঃ সামান্যে যত্র, নির্দিশ্যতে পৃথক্' (সা. দ ১০.৫০) একই ধর্ম হিতোপদেশে 'অহিংসা' (কো ধর্মো ভূতোদয়া)' - হি, ১.১৪৬), কঠোপনিষদে যজ্ঞাদি, ঈশ্বরে অনুরাগ (কঠ ২.১৪), আত্মা (কঠ. ৪.১৪ঃ, মৎস্য পুরাণে ব্রহ্মা দক্ষিণহস্তস্থিত দেবতা-বিশেষ, (ম.পু.৩, ১০) শ্রীমদ্ভাগবতে জীবত্মা, সৎসঙ্গ - ধনুঃ- তপঃ শৌচাদি চারটি পদযুক্ত ধর্মের বৃষরূপ ('ধর্মোহপি বৃষরূপধৃক্' - ভা. ১.১৭.২২ ও ২৮), জ্যোতিষিক গণনায় লগ্ন থেকে নবম স্থান, কাশীরাম দাসের মহাভারতে সোমপ, যম, অর্হদ্‌বিশেষ ও যুধিষ্ঠির (মহা ৫-১); আবার বাংলায় গ্রাম্য-লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুর - 'দআর আসনে ধর্ম বসিল আপনে' (শূন্যপুরাণ - রামাইপণ্ডিত)

৪.২.৫.৫ : এসো ধম্মো সনাতনো

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মশাসনে 'ধর্ম' সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা রয়েছে। ভগবান বুদ্ধ ধর্মপ্রসঙ্গে তিনটি স্কন্ধের প্রশংসা করতেন এবং অনুগামী শিষ্যদের সেগুলি পালনের নির্দেশ দিতেন। স্কন্ধ তিনটি যথাক্রমে 'আর্যশীলস্কন্ধ' 'সমাধিস্কন্ধ' ও 'আর্য-প্রজ্ঞাস্কন্ধ' (দীর্ঘনিকায় শুভুসুত্ত - ১০)। শীলসমাধি ও প্রজ্ঞা—বৌদ্ধ ধর্মের মুখ্য তিনটি অঙ্গ। পরবর্তীকালে এদের সঙ্গে আরও দুটি স্কন্ধ যুক্ত হয় — 'বিমুক্তিস্কন্ধ' ও 'বিমুক্তিজ্ঞান-দর্শনস্কন্ধ'। এ সকলের পালনে চিত্ত পরম শুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, মার নিহত হয় এবং বোধিলাভ হয়। (দ্র. 'মজ্‌ঝিমনিকায়' — 'মহাসীহনাদসুত্ত' ১২, 'দীর্ঘনিকায়' — 'মহাপরিনিববাণ সুত্ত' ১৬. ও সংযুক্তনিকায়' — 'কোসলনাদসংযুত্ত' ৪,৩,৪) — এই পঞ্চধর্মের সাক্ষাৎ বৌদ্ধমাত্রেরই কর্তব্য সারিপুত্রের সঙ্গে আলোচনায় এমন কথা বলেছিলেন স্বয়ং বুদ্ধ।

নির্বাণলিপ্সু নরনারীর কতকগুলি চর্যাচর্য ঐ সকল ধর্ম- স্কন্ধের মূল কথা। বৌদ্ধগণের কাছে 'ধর্ম' তাই নির্বাণের অনুকূলে কতকগুলি আচরণীয় বিধি-নিষেধ। বৌদ্ধ ধর্ম সনাতন আর্যধর্মের একটি শাখামাত্র; গৌতমবুদ্ধের ভাষায় — 'এসো ধম্মো সনাতনো'।

৪.২.৫.৬ : রিলিজিয়ন

পাশ্চাত্যে ধর্ম বা পদটি এদেশের মতো বহু অর্থদ্যোতক হয়েও মুখ্যতঃ সাধু-সন্ত মঠ চার্চ ঈশ্বর-বিশ্বাস, ইশোপাসনা-বিধি প্রভৃতি —"Religion-Monastic Condition, being monk or nun, (rare) a monastic order, (rare), practice of sacred rites, on eof the prevalent systems of faith & worship (The Christian, Mohammedan), established, that or established Church, Human recognition of superhuman controlling power & esp, of a persoanal God entitled to obedience, effect of such recognition on conduct & mental attitude" (The Concis Oxforn Dictionary, ed. Flower & Flower, P 988).

৪.২.৫.৭ : ইসলাম

ইসলামী ধর্মশাস্ত্র কোরাণ শরীফ'-এও দেখতে পাই, ধর্মপ্রসঙ্গে কতকগুলি পালনীয় আচরণ বিধির উল্লেখ করা বলা হয়েছে - ''তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদের এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের ধর্মকে , যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের নিরাপত্তা দান করবেনই। তারা আমার উপাসনা করবে, আমার কোনো অংশী করবে না, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই সত্যত্যাগী। যথাযথভাবে নামাজ পড়, যাকাত দাও (দান কর) এবং রসুলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার। তোমরা অবিশ্বাসীদের পৃথিবীতে প্রবল মনে করো না। ওদের আশ্রয়স্থল অগ্নি, কত নিকৃষ্ট এ পরিণাম।'' মওলানা মোবারক করীম জওহর-অনুদিত কোরআন শরীফ (হরফ প্রকাশনী) সুরা নূর ২৪, রকু ৭ (৫৫-৫৬ মন্ত্র) অনুরূপভাবে একই গ্রন্থের ৪১ সংখ্যক সুরা (সূরা হামীম সিজদাহ, রুকু ৫ (৩৩ সংখ্যক মন্ত্র), ৭১ নং সুরা জিন্ রুকু ৪ এবং সুরা কাফেরুন - সুরা ১০৮, রকু ১-৬ প্রসঙ্গতঃ বিবেচ্য।

দেখা গেল, 'ধর্ম' শব্দের বাচ্যার্থ ও অভিধার্থ নিয়ে পণ্ডিতগণের চিন্তা ভাবনার অন্ত নেই এবং এক কথায় এর সমীকরণ প্রায় অসম্ভব। তবুও পৃথিবীর যে - কোনো দেশের তুলনায় ভারতে ধর্মভাবনা-সম্পর্কিত যে বিশেষ ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল, বুধজন তাকে নানাভাবে প্রসারিত অর্থে গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করেছেন। ধর্ম এদেশে যেন কল্পতরুর মতো ব্যক্তির অনুভব বেং সমাজ বা সম্প্রদায়ের অনুভবরূপে বিশ্যেষ মর্যাদার আসনটি অক্ষুন্ন রেখেছে। হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসে 'ধর্ম তাই জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি নীতি যা আমরা দৈনন্দিন জীবনে নিজেদের মধ্যে ও আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে মেনে চলি। এই নীতিগুলি আসলে আমাদের মধ্যে শক্তি ও সাহস সঞ্চারিত করে আমাদের স্বভাব বা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই সূত্রে ধর্ম হল, মানব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তির সেই আনন্দর সময় অভিব্যক্তি — "Truth's embodiment in life and the power to refashion our nature". (The concept of Dharma-Religion and Society - 2nd edn. p. 104 - Dr. S. Radhakrishnan.

বলা বাহুল্য, এরূপ ধর্মভাবনার ক্ষেত্রে পশুর সঙ্গে মানুষের একটা গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান। প্রাকৃতিক বিবর্তনের ধারায় পশু ও মানুষ একই সঙ্গে বিবর্তিত হয়েছে সত্য। কিন্তু প্রবৃত্তিগত মিলটুকু বাদ দিলে উভয়ের

স্বাতন্ত্র্য দুস্তর। দুটি প্রজাতিই মগজ বা বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হলেও পশুর নিজ স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও স্মৃতি নেই। অন্যদিকে মানুষ স্বাধীন চিন্তার অধিকারী স্মৃতিশক্তিপরায়ণ বলেই সে মনে রাখে অতীত ও বর্তমানকে এবং ভবিষ্যতের রূপরেখা নির্মাণ করতে পারে। বৈজ্ঞানিক কোহ্লার ও অন্যান্যরা দেখিয়েছেন যে শিম্পাঞ্জী ও ওরাংওটাং — এদের সঙ্গে মানুষের একমাত্র পার্থক্যহল যে মানুষ স্মৃতিশক্তিপরায়ণ, আর ওরা স্মৃতিশক্তিহীন। জীববৃত্তে পশু ও মানুষ জন্ম-মৃত্যুরূপ নিয়মের অধীন। কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে পশুর বিবর্তন কেবল তার বংশগতি ও প্রবৃত্তি নির্ভর। তাই বাঘ-সিংহ প্রভৃতি প্রাণীকুলের কোনো সভ্যতা ও সংস্কৃতি নেই, কারণ তাদের কোনো স্মৃতি নেই। অন্যদিকে স্মৃতিশক্তিপরায়ণ, মননশীল মানুষ গড়ে তুলেছে নিজস্ব ইতিহাস-সভ্যতা-সংস্কৃতি। এই মননশীলতা ও স্মৃতি মানুষকে অমরত্বের সন্ধান দিয়েছে, তরুলতা মৃগ-পক্ষী প্রভৃতি থেকে তাকে স্বতন্ত্র করেছে। যোগবাশিষ্ট তাই বলেছেন—

> ‘‘তরবোহপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
>
> স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি।।’’

৪.২.৫.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

1 ²‰þe“þ›ÅÁ™„Åþ›yîûyîûÁ îû# ˜yö îû›y˜Ø÷þîûö›ÅûþÝ Åþ!ö”Ÿ „þiîyû

2 ò›y˜Ø÷þîûö›Å²îöþûx˜%ûö ›y˜Ø÷þîûö›ÅûßþÞ™!îŸ” xyöey%þy „þiîyû

৪.২.৫.৯ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। আত্মপরিচয় (বিশ্বভারতী সং)	—	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২। মানুষের ধর্ম (বিশ্বভারতী সং)	—	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩। *Religion of Man*	—	Rabindranath Tagore
৪। *Sadhana*	—	Rabindranath Tagore
৫। *Personality*	—	Rabindranath Tagore
৬। বাংলার বাউল	—	ক্ষিতিমোহন সেন
৭। *The Principle Upanishads*	—	Dr. S. Radhakrishnan
৮। *Indian Philosophy*	—	Dr. S. Radhakrishnan
৯। *Occasional Speeches and Writings*	—	Dr. S. Radhakrishnan
১০। *Religion of the Forest*	—	Rabindranath Tagore
১১। *Religion of the Artist*	—	Rabindranath Tagore
১২। রবীন্দ্র দর্শন	—	হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩। রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য	—	কল্যাণীশঙ্কর ঘটক
১৪। সাহিত্যের বিশ্লেষণ - প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ	—	কল্যাণীশঙ্কর ঘটক

পর্যায় গ্রন্থ - ২
একক - ৬
মানুষের ধর্ম-এর প্রেক্ষিত

বিন্যাস ক্রম :

৪.১.৬.১ : রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্ম-এর প্রেক্ষিত

৪.১.৬.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.১.৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪.১.৬.১ : রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্ম-এর প্রেক্ষিত

ধর্মের এই সকল বহুধা প্রসারিত বিচিত্র প্রেক্ষণীতে রবীন্দ্রভাবনায় প্রতিফলিত মানুষের ধর্মের স্বরূপ বুঝে নিতে হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, মানুষের ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন রচনায় যে সকল কথা বলেছিলেন এবং অনেক ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য (১৯৩০ সালের মার্চ মাসে বিলাতের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত হিবার্ট বক্তৃতামালার সংকলন, **'মানুষের ধর্ম'** (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকরূপে প্রদত্ত 'কমলা'-বক্তৃতা মালার সংকলন) — ১৯৩২-৩৩, **'The Religion of an Artist, the Religion of the Forest,' 'আত্মপরিচয়', 'Sadhana', 'Personality'** প্রভৃতি গ্রন্থ। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ ধর্মকে তথাকথিত প্রচলিত কোনো সাম্প্রদায়িক অর্থে গ্রহণ ও বিশ্লেষণ করেননি। নতুন কোনো ধর্মের প্রবক্তা বা ধর্মনেতাও তিনি নন। অথচ তাঁর বোধ ও মননশীলতায় মানবজীবনে ধর্মের যথাযোগ্য গুরুত্ব স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুবিশাল প্রাচ্য ধর্ম-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার ও পাশ্চাত্ত্য জীবনাভিমুখী বিজ্ঞানচেতনাসমৃদ্ধ মানুষের ধর্মোপলব্ধির কার্যকরী দিকটি তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। কবির হৃদয়বোধ ও বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকের মননের সমন্বয়ে তাঁর ধর্মীয় উপলব্ধি মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ ও অগ্রশক্তির বিকাশে সহায়র হয়েছিল। তাঁর **'The Religion of man'** ও **'মানুষের ধর্ম'** গ্রন্থদুটি একে অপরের পরিপূরক। তৎসত্ত্বেও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত **Hibert** বক্তৃতা (১৯৩০) মূলতঃ কবি রবীন্দ্রনাথের আত্মবোধনির্ভর ধর্মপ্রসঙ্গের ব্যাখ্যান। অন্যদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমলা-বক্তৃতামালায় প্রদত্ত **'মানুষের ধর্ম'** প্রকৃত প্রস্তাবে কবির ব্যক্তিজীবনের না, সাধারণভাবে সমগ্র মানব-সমাজে মানুষের অনুধ্যেয় ধর্মীয় প্রসঙ্গের শাস্ত্রীয় ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যান।

৪.১.৬.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

1 [illegible]

2 [illegible]

৪.১.৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। আত্মপরিচয় (বিশ্বভারতী সং) — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২। মানুষের ধর্ম (বিশ্বভারতী সং) — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩। *Religion of Man* — Rabindranath Tagore

৪।	*Sadhana*	—	Rabindranath Tagore
৫।	*Personality*	—	Rabindranath Tagore
৬।	বাংলার বাউল	—	ক্ষিতিমোহন সেন
৭।	*The Principle Upanishads*	—	Dr. S. Radhakrishnan
৮।	*Indian Philosophy*	—	Dr. S. Radhakrishnan
৯।	*Occasional Speeches and Writings*	—	Dr. S. Radhakrishnan
১০।	*Religion of the Forest*	—	Rabindranath Tagore
১১।	*Religion of the Artist*	—	Rabindranath Tagore
১২।	রবীন্দ্র দর্শন	—	হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩।	রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য	—	কল্যাণীশঙ্কর ঘটক
১৪।	সাহিত্যের বিশ্লেষণ - প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ	—	কল্যাণীশঙ্কর ঘটক

পর্যায় গ্রন্থ - ২

একক - ৭

মানুষের ধর্মকেন্দ্রিক রাবীন্দ্রিক বোধ

বিন্যাস ক্রম :

৪.১.৭.১ : মানুষের ধর্মকেন্দ্রিক রাবীন্দ্রিক বোধ

৪.১.৭.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.১.৭.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪.১.৭.১ : মানুষের ধর্মকেন্দ্রিক রাবীন্দ্রিক বোধ

নিজের ধর্ম সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বললেন — "My Religion is the reconciliation of the super personal Man, theUniversal Human Spirit in my own individual being." (The Religion of Man) অর্থাৎ জীবশরীরে অতীন্দ্রিয়-নৈর্ব্যক্তিক পরাশক্তির তথা চিরন্তন মানবশক্তির উপলব্ধিকে তিনি তাঁর ধর্ম বলতে চেয়েছেন। নিজেকে তিনি কবিরূপে - 'বিশ্বরচনার অমৃতস্বাদের যাচনদার' রূপে বারংবার তুলে ধরেছেন এবং বলেছেন — "I have already confessed that my religion is a poet's religion, all that I feel about it is from vision and not from knowledge." (The religion of an Artist, P-12) ''আত্মপরিচয়'-এ আরও পরিষ্কারভাবে নিজের ধর্মবোধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বললেন — ''ঠিক যাকে সাধারণে ধর্ম বলে সেটা যে আমি আমার নিজের মধ্যে দৃঢ়রূপে লাভ করতে পেরেছি, তা বলতে পারিনে। কিন্তু মনের ভিতরে ক্রমশঃ যে একটা সজীব পদার্থ সৃষ্ট হয়ে উঠেছে, তা অনেক সময় অনুভব করতে পারি। বিশেষ কোনো একটা নির্দিষ্ট মত নয়- একটা নিগূঢ় চেতনা, একটা নতুন অন্তরিন্দ্রিয়। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি ক্রমশঃ আপনার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব- আমার সুখ-দুঃখ, অন্তর-বাহির, বিশ্বাস-আচরণ সমস্তটা মিলিয়ে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব।'' ('আত্মপরিচয়'- ১ম অধ্যায় পৃ.-১৫)। ধর্মের মধ্যে জীবনের সামঞ্জস্য বিদান তথা সমগ্রতা-উপলব্ধির ভাবটি এখানে সুপরিস্ফুট হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ 'ধর্ম' বলতে বুঝতেন বিশ্বহিতে নিরত মনুষ্যত্ববোধের সমুজ্জ্বল আদর্শকে। ধর্মের প্রকৃত উপলব্ধি ঘটে মনুষ্যত্ব বিকাশের সাধনায়। আত্মকেন্দ্রিকতা নয়, সংকীর্ণ স্বার্থবোধ নয়, — বৃহৎ ও মহৎ জীবনের সাধনার অন্য নাম ধর্ম। তাঁর নিজের ভাষায় — ''স্বার্থ আমাদের যে সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীবপ্রকৃতিতে। যা আমাদের ত্যাগের দিকে, তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।'' (মানুষের ধর্ম — ভূমিকা)

মানুষের পূর্ণতা দেহে -মনে ভাবে। দেহগতভাবে মানুষের দটো সত্তা—

(১) জীবসত্তা - ছোট, খণ্ডিত আমি বা 'অহং' এবং (২) মানবসত্তা - বড়ো অখণ্ড আমি বা ''আত্মা''। মানষের সাধনা — জীবাত্মা থেকে মানবাত্মায় উত্তরণের সাধনা। বিশ্বের সকল মানবের অন্তরে আছেন এমন এক সত্তা যা ব্যক্তির সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত, তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ' এই শাশ্বত মানুষটির প্রেরণাতেই মানুষের চিন্তায় কর্মে ভাবে বিশ্বজনীনতার আবির্ভাব। আপন অন্তরস্থিত এই বড়ো মানুষটির উপলব্ধিতে ব্যক্তি তার জীবসীমা অতিক্রমে করে মানব সীমায় উত্তীর্ণ হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ''এই বৃহৎ মানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরে আছে নানা দেশের নানা সমাজের নানা জাত, অন্তরে আছে এক মানব।'' এই অন্তরের মানবকেই মানুষ নাম দিয়েছে দেবতা, বলেছে — 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা'। এই মানবদেবতার প্রেরণাতে

মানুষ অনুভর করেছে - ''সে শুধু ব্যক্তিগত মানুষ নয়, সে বিশ্বগত মানুষের একাত্ম। সেই বিরাট মানব 'অবিভক্তঞ্চ ভূতেযু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।'' মানুষের জীবকোষের মধ্যেই রয়েছে এই বিশ্বদৈহিক প্রবণতা। সে একই সঙ্গে স্বদৈহিক হয়েও বিশ্বদৈহিক।

মনোধর্মেও মানুষ দুইপ্রকার মনের অধিকারী (১) ব্যক্তিমন ও (২) বিশ্বমন। আবার ভাবধর্মের দিক থেকেও মানুষ দুটি ভাবের অধিকারী। (১) ব্যক্তিভাব ও (২) বিশ্বভাব। মনোগত ও ভাবগত দিক থেকেও মানবজীবনের লক্ষ্য ব্যক্তিমন থেকে বিশ্বমনে এবং ব্যক্তিবাব থেকে বিশ্বভাবে উত্তরণ। অতএব মানুষের ধর্ম, মানুষের সাধনা — এই সত্যোপলব্ধির সাধনা; কারণ'' যে মানুষ আপন আত্মর মধ্যে অন্যের আত্মাকে ও অন্যের আত্মার মধ্যে আপনার আত্মাকে জানে, সেই জানে সত্যকে - যস্মিস্মন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্বভূতেষু চাত্মানং ততে ন বিজগুন্সতে।।' নরের মধ্যে নারায়ণের, দেহভাণ্ডে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের - বিশ্বদেবতার অস্তিত্বের অনুভব আসলে মনুষ্যত্বেরই অনুভব। নিজের হৃদয়ের অন্তপুরে 'মনের মানুষের' অন্বেষণ, সেই বিশ্বদেবতা — বিশ্বকর্মা মহাত্মার উপলব্ধিই রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্মের মূল উদ্দেশ্য। তাই বিশ্বের শুভবুদ্ধি পরায়ণ সকল মানুষের প্রার্থনা — 'স দেবঃ/স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু' — সেই দেবতা আমাদের শুভবুদ্ধি দান করুন।

'মানুষের ধর্ম' বিষয়টিকে সপ্রসঙ্গ ও পূর্ণায়ত রূপদানের জন্য রবীন্দ্রনাথ সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত নৃতাত্ত্বিক ও দার্শনিক যুক্তিপ্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাঁর 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলির সারনির্যাস গ্রহণ করলে বক্তব্যে বিষয়টি দাঁড়ায় এইরূপ :

সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার স্বাভাবিক অভিব্যক্তিতে মানুষের আবির্ভাব। দেহে ও মনে তার পূর্ণতা। দেহভেদে সে অন্য থেকে স্বতন্ত্র, কিন্তু মনোধর্ম অন্যের সঙ্গে তার মিল। মনে মনে সে আপনার মিল পায় এবং মিল চায়, মিল না পেলে সে অকৃতার্থ। তার সফলতা সহযোগিতায়। বহুর মধ্যে নিজের অস্তিত্ব অনুভব করে জ্ঞানে-কর্মে-ভাবে সকলের যুক হওয়াতে সে চরিতার্থতা লাভ করে। এই ব্যক্তি যতই নিজেকে বিশ্বমনের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে, ততই সে সত্য হয়ে ওঠে। ব্যক্তিমনের সঙ্গে বিশ্বমনের এই যোগেই মানুষের সভ্যতা। এই সর্বজনীন, সর্বকালীন মনকে উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ করে উপলব্ধি করাতেই মানুষের অভিব্যক্তির উৎকর্ষ। এই বৃহৎ মানুষের সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় — ''এই বৃহৎ মানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরের আছে নানা দেশের নানা সমাজের নানা জাত, অন্তরে আছে এক মানব।'' বৃহৎ মানুযে সাধনাই সত্যের সাধনা; বাহ্যানুষ্ঠানে নয়, আত্মানুভাবে। উপনিষদ্ তাই বলেন 'যে মানুষ আপনার আত্মার মধ্যে অন্যের আত্মাকে ও অন্যের আত্মার মধ্যে আপনার আত্মাকে জানে, সেই জানে সত্যকে —

''যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্ন্যোবানুপশ্যতি।

সর্বভূতেযু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে''।

প্রতিটি ব্যক্তি মানবের দুটো ভাব — জীবভাব ও বিশ্বভাব। বিশ্বভাব হল জীবভাবের সংকীর্ণতামুক্ত এমন একটা আদর্শ যা ব্যক্তি মানুষের সীমানা ছাড়িয়ে পূর্ণতার দিকে, বিশ্বমানবতার দিকে এগিয়ে চলে।

শারীরবৃত্তে মানবদেহে আপাতন স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও বহুকোটি কোষের সমন্বয়। এই সমন্বয়েই সমস্ত দেহের জীবনের সার্থকতা। আবার কোষময় সত্তার অভিব্যক্তিও স্বদৈহিক নয়, বিশ্বদৈহিক যা সমস্ত দেহের জীবন-প্রবাহে পরিব্যাপ্ত। জীবকোষগুলিও অপন ক্ষুদ্রভাবে স্বতন্ত্র, বৃহৎভাবে সমগ্র দেহে ব্যাপ্ত। এ ছাড়াও আরও একটা প্রত্যক্ষাতীত পদার্থ রয়েছে যা সর্বদেহব্যাপী কল্যাণ, যাকে বলি স্বাস্থ্য। জীবকোষগুলি যে ধর্ম আশ্রয় করে স্বতন্ত্র কোষধর্ম রক্ষা করেও দেহের কল্যাণ তথা স্বাস্থ্য রক্ষায় সচেষ্ট — সেই ধর্মের আশ্রয় তাদের বিশ্বদেহ। মানুষের জীবকোষের মধ্যেও প্রকৃতিগতভাবে এই বিশ্বদৈহিক প্রবণতা। এই সূত্রে মানুষ 'আপন অন্তরের গভীরতর চেষ্টার প্রতি লক্ষ্য করে অনুভব করেছে যে, সে শুধু ব্যক্তিগত মানুষ নয়, সে বিশ্বগত মানুষের একাত্ম। সেই বিরাট মানব 'অবিভক্তঞ্চ ভূতেযু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।' পাখির ছানা যে পর্যন্ত ডিমের ভিতরে থাকে, তার অপরিণত অঙ্গে সুচনা হয় ডানার।

ডিমের বাঁধা জীবনে সেই ডানার কোনো অর্থেই নেই। কিন্তু সেই অপুষ্ট ডানার সংকেত জানিয়ে দেয় ''ডিমের বাইরে সত্যের যে পূর্ণতা আজও তার কাছে অপ্রত্যক্ষ, সেই মুক্ত সত্যে সঞ্চরণেই পাখির সার্থকতা। তেমনি মানুষের পূণসত্যের পরিচয় ফুটে ওঠে তার চিত্তবৃত্তির ঔৎসুক্য। এই উদ্যম-উৎসাহে মানুষও যেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমুক্ত, সেখানে সে বিশ্বাভিমুখী।

মানুষ কোনো যন্ত্র নয়, কারণ যন্ত্রের কোনো স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নেই, গতিও নেই। মানুষ সীমাবদ্ধ জীবও নয়, সেই কারণে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়াতেই তার আনন্দ। মনের আশ্রয়ে সে আপন সীমা অতিক্রম করে অসমীনে সন্ধানী। দেহগত বিচারেও মানুষ জন্তু থেকে পৃথক এবং উন্নত। তার দেহটা 'চতুষ্পদ জীবের প্রশস্ত ছন্দে' বানানো হলেও সমস্ত জান্তব প্রকৃতি ও বাধা বিপত্তি কাটিয়ে সে স্পর্ধাভরে উঠে দাঁড়িয়েছে।

নিম্নদৃষ্টি জন্তু খণ্ড খণ্ড বস্তুকে দেখে ঘ্রাণযোগে, 'দেহবৃত্তির সংকীর্ণ সীমায়।' তার দৃষ্টি ও ঘ্রাণশক্তি আশু প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ। কিন্তু উন্নতমস্তক মানুষ দেখল কেবল বস্তুকে নয়, দৃশ্যকে অথবা বিচিত্র বস্তুর ঐক্যকে। ''একটি অখণ্ড বিস্তারের কেন্দ্রস্থলে দেখলে নিজেকে। একে বলা যায় মুক্তদৃষ্টি।'' মানুষ উন্নত (খাড়া-হাওয়া) জীব বলেই তার বহিদৃষ্টি ও অন্তরের কল্পনাদৃষ্টি নিকট অপেক্ষা দূরের প্রতি, অজ্ঞাত অভাবনীয়ের প্রতি বেশি আকর্ষণ বোধ করেছে। এর সঙ্গে দ্বিপদ মানুষের হাত দুটোও পায়ের কাজ থেকে ছুটি পেয়ে মুক্ত হয়েছে দাসত্বের বন্ধন থেকে। এর প্রমাণ আছে পুরাণে। পুরাণে বলে, ব্রহ্মার পায়ের থেকে শুদ্র জন্মেছে, ক্ষত্রিয়-হাতের থেকে।

এমনিভাবে মানুষের দেহে পদোন্নতি হল ক্ষাত্রধমে অর্থাৎ হাতের গৌরবে। এই হাতের সঙ্গে যুক্ত হল মানুষের মন ওকল্পনাশক্তি। কর্মেন্দ্রিয় ও মননেন্দ্রিয়ের সহযোগে সে আর জৈবিক প্রয়োজনেই নিজেকে আবদ্ধ রাখল না, কেবল অন্ন-ব্রহ্মের উপাসনা করল না, বেরিয়ে পড়ল, বিজ্ঞানময় আনন্দময় ব্রহ্মের সন্ধানে। কোনো প্রয়োজনের তাগিদে নয়, নিজের খুশিতেই সে তার অন্নময় কোষের আবরণ ভেদ করে পশুত্ব থেকে মুক্তি চেয়েছে। মানুষের এই কাজটাকে বলা যেতে পারে তার লীলা। অর্থাৎ যেখানে সে দেহধারণের জন্য অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের প্রয়োজন ছাড়িয়ে আনন্দরসের সন্ধানী, ব্যক্তিপ্রয়োজনের গণ্ডী পেরিয়ে অসীমের অভিমুখী, সেখানে সে সত্যকে পায়, আনন্দকে পায়। সত্যের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে যোগের প্রসারেই আত্মার সত্য।

মানুষ যে আত্মকামনায় দীপ্ত তা জৈবিকতার জন্য নয়, অন্যের সঙ্গে নিজের একাত্মতা স্থাপনের প্রেরণায়। পুত্র চাই বলেই পুত্র প্রিয় হয় না, তার মধ্যে নিজেকেই খুঁজে পাই ব'লে সে আমার প্রিয়—

''ন আর অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি।

আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি।''

মানুষ কি করে প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠবে তা নিয়ে বর্বর দশা থেকে সভ্য দশা পর্যন্ত তার চিন্তার অন্ত নেই। ''আমি কে, আম কী, আমার চরম মূল্য কোথায়'' — প্রভৃতি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে সে আত্মস্বরূপ অন্বেষণে তৎপর। নানা তন্ত্রে-মন্ত্রে দেবার্চনায় তার এই চেষ্টা। কিন্তু যেখানে সে শ্রেয়োবোধে দীপ্ত বৃহৎ আদর্শের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনে ব্যাপৃত, সেখানেই সে সত্য। কারণ ''মানুষের দায় মহামানবের দায়, কোথাও তার সীমা নেই। অন্তহীন সাধনার ক্ষেত্রে তার বাস।'' এখানেই সে জন্তুর ভৌমগুলিক সীমা অতিক্রম করে উত্তীর্ণ হয়েছে মানসিক দেশ চেতনায়। জ্ঞানে- কর্মে -তপস্যায় আত্মত্যাগে এই দৈশিক চেতনায় সে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিল খুঁজে পেয়েছে, মৈত্রী স্থাপন করেছে। খণ্ড দেশ-কাল-পাত্র ছাড়িয়ে, জাতি-ধর্ম-কর্মের ভেদবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে মানুষের জয়যাত্রা এগিয়ে চলেছে সেই দিকে যেখানে মানুষের বিদ্যা, মানুষের সাধনা সত্য হয় সকল কালের মানুষকে নিয়ে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ - কোনো কালেই এই জয়যাত্রার রথ থেমে থামেনি। মানুষের এই অধ্যবসায়কে বলা যেতে পারে তার মহত্ব। এই মহত্ত্বের আশ্রয় পূর্ণতায়। মানুষের ধর্ম, মানুষের সাধনা, অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতায়, সীমাবদ্ধতা থেকে অসীমে মুক্তির সাধনা।

সীমাকে মানুষ কোনো দিনই স্বীকার করছে না কারণ তাহলে সীমার মধ্যে তার জিজ্ঞাসা অসমাপ্ত থেকে যেতো, সভ্যতার অগ্রগতির হ'তো রুদ্ধ।সীমাকে অতিক্রমের তাগিদে মানুষ একদিকে যেমন ভৌত বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি আশ্রয় নিয়েছে বোধির। অর্থাৎ প্রত্যক্ষকে স্বীকার করেও অপ্রত্যক্ষের অন্তহীন রসলোকের প্রতিই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। এখানেই সে সত্যকে পায়, ভূমা বা আনন্দকে পায়। এইভাবে মানুষ নিয়ত প্রজ্ঞার সাধনা করছে, বস্তুসত্যের তথ্যের স্তূপ অপসারিত করে প্রবহমানতার তাগিদে সত্যের স্বাদ আহরণ করছে, এখানেই জন্তুর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য - ''অন্যান্য জন্তুর মতই তথ্য মানুষের সম্বল, কিন্তু সত্য তার ঐশ্বর্য। তার চরম লক্ষ্য অভাব দূর করা নয়, মহিমাল উপলব্ধি করানো। তাই ঐশ্বর্য-অভিমানী মানুষ বলেছে 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।' বলেছে অল্পে সুখ নেই, বৃহতেই সুখ।''....

মানুষের সত্তার মধ্যে দ্বৈধতা আছে। তার যে সত্তা জীবসীমার মধ্যে, সেখানে যেটুকু আবশ্যক সেটুকুতেই তার সুখ। কিন্তু অন্তরে অন্তরে জীব-মানব বিশ্বমানবেই প্রসারিত; সেদিকে সে সুখ চায় না সুখের বেশি চায় — সে ভূমাকে চায়'' উপনিষদের কথা, ভগবান নিজের স্বভাবে, নিজের মহিমায় (স্বে মহিম্নি) প্রতিষ্ঠিত। সেই মহিমাই তার স্বভাব। সেই স্বভাবেই তিনি আনন্দিত। তেমনি মানুষের মহিমাও ঐ আনন্দে। তাই বলা হয়েছে 'ভূমৈব সুখম্'। মানুষের স্বভাবের মধ্যে রয়েছে বিরোধ। তাই বিরোধের মধ্য দিয়েই সে আনন্দকে পেতে চায় বাঁধা বরাদ্দের সীমা ছাড়িয়ে। এটা তার উপরি পাওনা, এতেই প্রকাশ পায় তার মহিমা।

মানুষ নিয়ত মনুষ্যত্ব বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা করে চলেছে বলেই পশুধর্মের সঙ্গে মানবধর্মের, বাস্তবের সঙ্গে আদর্শের দ্বন্দ্ব বেধেছে। পশুধর্মের সহজ ভোগের পথ ত্যাগ করে মানুষ ব্রতী হয়েছে মানবধর্মের তপস্যায় — মৃত্যু থেকে অমৃতে, ব্যক্তিগত সীমা থেকে বিশ্বগত বিরাটে, প্রত্যক্ষ থেকে অপ্রত্যক্ষে। মানুষের বুদ্ধি তাকে জ্ঞানের পথে আকৃষ্ট করে। এই জ্ঞানে সে জেনেছে প্রত্যক্ষ বাস্তবকে। কিন্তু সেখানেই তার জিজ্ঞাসা থেকে থাকে নি, তার প্রসারিত হয়েছে গূঢ় আত্মজিজ্ঞাসায়, মানবধর্মের গভীরে নিহিত সত্যে। সকল খণ্ডিত জানাকে অতিক্রম করে মানুষ চেয়েছে শোত্রের শোত্র, মনের মন, প্রাণের প্রাণ সেই এক অদ্বিতীয় সত্যকে যার অস্তিত্ব মানুষের অন্তরতম বোধে। সেই বোধের সাধনাকে মানুষ বলে ধর্মসাধনা।

'ধর্ম' শব্দের আর এক অর্থ স্বভাব। তাই স্বভাবকে স্বীকার করেই মানুষের ধর্মসাধনা। কিন্তু নিজের সহজ স্বভাবকে সে স্বীকৃতি দেয় না, শ্রদ্ধা করে না। স্বভাবেরও দুটে দিক - একটা আত্মগত, অন্যটা ভূমাগত। এই দ্বিতীয় স্বভাবটাই তার কাছে অধিকতর সত্য। এই জন্য শাস্ত্রে বলে—

''শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য, বিবিনক্তি ধীরঃ।

তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু হীয়তোহর্থাৎ য উ প্রেয়োবৃণীতে।।

অর্থাৎ ''মানুষের স্বভাবে শ্রেয়ও আছে, প্রেয়ও আছে। ধীর ব্যক্তি দুইকে পৃথক করেন। যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন তিনি সাধু, যিনি প্রেয়কে গ্রহণ করেন তিনি পুরুষার্থ থেকে হীন হন।''

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃকে নিয়েই মানবস্বভাবের পূর্ণতা। প্রেয়োবোধ মানুষের প্রবৃত্তিজাত। একে গ্রহণ করেও সে তার সঙ্গে শ্রেয়ঃকে যুক্ত করে। এইভাবে প্রাকৃতিক স্বভাবে উপরেও নিজের আত্মিক স্বভাবকে মর্যাদা দিয়ে সে নিজের মধ্যেই সর্বকালীন বিশ্বভূমিন মনুষ্যধর্মকে উপলব্ধি করেছে। তার এই প্রচেষ্টা, জ্ঞানের এই সাধনা, ব্যক্তিগত সংস্কার কাটিয়ে বিশ্বগত কর্মের দ্বার উদ্বুদ্ধ হবে তার প্রেম, সে হয়ে উঠবে বিশ্বকর্মা বিশ্বগত আত্মীয়তার সে হবে মহাত্মা। 'মানুষের এই সত্য স্বভাবেই তার যথার্থ মুক্তি। কারণ মানুষের একটা স্বভাবে আবরণ অন্য স্বভাবে মুক্তি।'

বেদে ঈশ্বরকে বলা হয়েছে আবিঃ-প্রকাশস্বরূপ। তিনি আবার 'মহাদ্‌যশঃ' ও - আপন মহৎ কীর্ত্তিতেই তিনি সত্য। মানুষের স্বভাবও তাই - আত্মাকে প্রকাশ। দৈহিক ও অর্থনৈতিক ঐশ্বর্যের দিক থেকে মানুষের যে প্রকাশ তা অহংমন্য হীনতাই প্রকাশ। সেখানে প্রাণীজগতের পশুদের সঙ্গে তার মিল কিন্তু যেখানে সে তার সত্যকে, ভূমানন্দকে

প্রকাশ করে, সেখানে সে পশু থেকে পৃথক। যা কিছু বস্তুগত বা বাহ্যিক তা সীমায় আবদ্ধ। কেননা তাকে বাড়িয়ে চলা সম্ভব হলেও পেরিয়ে চলা যায় না। মানুষ সব সময় এই সীমাকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্ট করেছে। ''অন্যের চেয়ে আমার বস্তুসঞ্চয় বেশি, এ কথা মানুষের পক্ষে বলবার কথা নয়। তাই মৈত্রেয়ী বলেছিলেন, যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিহমহং তেন কুর্যাম্। তিনি উপেক্ষা করেছিলেন উপকরণবতাং জীবিতম্।''

যথার্থ গায়কের গান তখন বিস্তারে সংখ্যা দ্বারা সার্থক হয় না, সার্থক হয় মসগ্রতা দ্বারা। শ্রেষ্ঠ গায়কের সফল গান তাই 'অপরিমেয়, অনির্বচনীয়, যেখানে সুর-তাল-লয়ের সুষম সামঞ্জস্য আত্মপ্রকাশের অসীম আনন্দে আত্মহারা। মানুষ তাই প্রতিমুহূর্তে তার অহং-এর খণ্ডিত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র থেকে অসীমের দিকে, আত্মার দিকে এগিয়ে চলেছে। সৌন্দর্যে-কল্যাণে-বীর্যে ত্যাগে প্রাকৃত মানুষকে অতিক্রম করে আসল মানুষ প্রকাশ করে আপন আত্মাকে। উপলব্ধি করে জীবমানবের অন্তরতম বিশ্বমানবকে। এর চেয়ে বড়ো লাভ আর কিছুতেই নেই- ''যং লব্ধা চাপরং লাভং নাধিকং মন্যতে ততঃ।''

৪.১.৭.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

1 [illegible]

2 [illegible]

৪.১.৭.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। আত্মপরিচয় (বিশ্বভারতী সং)	—	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২। মানুষের ধর্ম (বিশ্বভারতী সং)	—	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩। *Religion of Man*	—	Rabindranath Tagore
৪। *Sadhana*	—	Rabindranath Tagore
৫। *Personality*	—	Rabindranath Tagore
৬। বাংলার বাউল	—	ক্ষিতিমোহন সেন
৭। *The Principle Upanishads*	—	Dr. S. Radhakrishnan
৮। *Indian Philosophy*	—	Dr. S. Radhakrishnan
৯। *Occasional Speeches and Writings*	—	Dr. S. Radhakrishnan
১০। *Religion of the Forest*	—	Rabindranath Tagore
১১। *Religion of the Artist*	—	Rabindranath Tagore
১২। রবীন্দ্র দর্শন	—	হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩। রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য	—	কল্যাণীশঙ্কর ঘটক
১৪। সাহিত্যের বিশ্লেষণ - প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ	—	কল্যাণীশঙ্কর ঘটক

পর্যায় গ্রন্থ - ২
একক - ৮
মানবধর্ম

বিন্যাস ক্রম :

৪.২.৮.১ : মানব ধর্ম সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা

৪.২.৮.২ : মানুষের ধর্মের পরম উপলব্ধি : বাউলের অন্বেষা

৪.১.৮.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.২.৮.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪.২.৮.১ : মানব ধর্ম সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা

'মানুষের ধর্ম' - এর দ্বিতীয় প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'মানবধর্ম' সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অথর্ববেদে আছে—

ঋতং সত্যং তপো রাষ্ট্রং শ্রমোধর্মশ্চ কর্মচ

ভূতং ভবিষ্যদুচ্ছিষ্টে বীর্যং লক্ষ্মীবলং বলে।

অর্থাৎ ঋত, সত্য, তপস্যা, রাষ্ট্র, শ্রম, ধর্ম, ভূত, ভবিষ্যৎ, বীর্য, সম্পদ ও বল - সমস্তই উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ উদ্বৃত্ত বলে গণ্য। ঐ সব গুণগুলির সবই মানবগুণ যেগুলি প্রকৃতির প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে না বলেই উদ্বৃত্ত। তাই 'জীবজগতে মানুষ বাড়তির ভাগ। প্রকৃতির বেড়ার মধ্যে তাকে কুলোলো না।' ঐ সকল মানবগুণের যোগে আমার অনুভব করি জীবসীমার অতিরিক্ত সত্তাকে - মানবব্রহ্মকে। আমাদের সত্যবোধে, তপস্যায় ধর্মে-কর্মে সেই মানবকে — মানবব্রহ্মকেই অনুভব করি। এই মানবব্রহ্মই আমাদের জীবনের পরমলক্ষ্য - পরম গতি, পরম সম্পদ, পরম আশ্রয়, পরম আনন্দ। উপনিষদ্ তাই বলেছেন —

এযাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদ্

এষোহস্য পরমো লোক এষোস্য পরম আনন্দং।''

এই বোধ যখন জাগে তখন মন সেই বৃহৎ - অসীম সত্যকে অনুভব করে, ভক্তি করে। তখন মনে হয়, 'এক বৃহৎ আনন্দের অন্তর্গত আমার আনন্দ।'

জড় জগতে এক একটি বস্তু যেমন তার সম্বন্ধশক্তি, ঐক্যশক্তির প্রতীকরূপ, তেমনি প্রাণীজগতে দেশ-কালের ব্যবধান সত্ত্বেও সমস্ত মানুষকে নিয়ে আছে একটি 'বৃহৎ' এবং গভীর 'ঐক্য'। সেই ঐক্য ইন্দ্রিয়বোধের অতিরিক্ত সংখ্যা-সমষ্টিকে নিয়ে নয়, তাকে অতিক্রম করে। সেই ঐক্য সমস্ত মানুষের এক গূঢ় আত্মা, তার প্রকাশ বহুধা শক্তিযোগে। সকল মানুষের মধ্যে সেই ঐক্যশক্তি বর্তমান। সেই শক্তিকে, জীবনমানবরূপী আত্মাকে যিনি নিজের মধ্যে অনুভব করতে পারেন তিনি মহাত্মা। তাঁরা সর্বমানবের জন্য নিজের প্রাণ দিতে পারেন, ''গূঢ় আত্মার প্রতি লক্ষ্য করে বলতে পারেন; তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্বস্মাদ্ অন্তরতরং যদয়মাত্মা। তিনি পুত্রের চেয়ে প্রিয়, বিত্তের চেয়ে প্রিয়, অন্য সকল হতে প্রিয়, এই আত্মা যিনি অন্তরতর।''

মানুষ সকল বিষয়বস্তুর মধ্যে মানবত্বকেই অনুভব করে। দেবতাকেও প্রিয় বললে তার উপর মানবত্ব আরোপ

করা বোঝায় না। এর অর্থ মানবত্ব উপলব্ধি করা। ''মানুষ আপন মানবিকতারই মাহাত্ম্যবোধ অবলম্বন করে আপন দেবতায় এসে পৌঁছেছে। মানুষের মন আপন দেবতায় আপন মানবত্বের প্রতিবাদ করতে পারে না। করা তার পক্ষে সত্যই নয়। ঈথরের কম্পনে মানুষ আলোকত্ব আরোপ করে না, তাকে স্বততই আলোকরূপে অনুভব করে, আলোক রূপেই ব্যবহার করে, করে ফল পায় — এও তেমনি।''

কিন্তু পরম মানবিক সত্তাকে অতিক্রম করেও আছে পরম জাগতিক সত্তা। যেমন সূর্যালোক অতিক্রমী নক্ষত্রলোক। এই সূর্যালোককে কেন্দ্র করেই পার্থিব জীবন, দিন-রাত্রি, চলা-ফেরা সবই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''জ্ঞানে আমরা নক্ষত্রলোককে জানি কিন্তু জ্ঞানে কর্মে আনন্দে দেহমনে সর্বতোভাবে জানি এই সূর্যালোককে। তেমনি জাগতিক ভূমা আমাদের সমগ্র দেহমন ও চরিত্রের পরিতৃপ্তি ও পরিপূর্ণতার বিষয়। আমাদের ধর্মশ্চ কর্মচ, আমাদের ঋতং সত্যং, আমাদের ভূতং ভবিষ্যৎ সেই সত্তারই অপর্যাপ্তিতে।''

মানবিক সত্তা পেরিয়ে যে নৈর্ব্যক্তিক জাগতিক সত্তা তাকে প্রিয়, মন্দ প্রভৃতি গুণ-দোষবাচক অভিধা দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলবে না। কারণ যা নৈর্ব্যাক্তিক তাকে নিয়ে ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, পাপ-পুণও প্রভৃতির বিচার চলে না। কেন না তা ঐসকল স্বভাববর্জিত। ঋষিকবি তাই বলেন, 'অস্তীতি ধ্রবতোন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে? তিনি আছেন এ ছাড়া তাঁকে কিছুই বলা যায় না। বস্তুত বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতায় আমার যে জগৎকে জানি সে জগৎ মানব জগৎ। এই জগতের গূঢ় তত্ত্বকে মানুষ যেভাবে আপন অন্তর্নিহিত তত্ত্বের দ্বারা মিলিয়ে পাচ্ছে তাকে অতিমানবিক' বলা চলে না। আমাদের শাস্ত্রে যে সগুণ ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে তিনি 'সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসম্। ''তার অর্থ এই যে, মানবব্রহ্ম, তাই তাঁর জগৎ মানবজগৎ। এ ছাড়া অন্য জগৎ যদি থাকে তাহলে সে আমাদের সম্বন্ধে শুধু যে আজই নেই তা নয়, কোনো কালেই নেই।'' যে বোধে আমরা জগৎকে জানি, সেই একই বোধে জানি নিজেকে, নিজের আত্মাকে। এই আত্মা স্বপ্রকাশ। কিন্তু সর্বমানবাত্মার মিলিত ঐক্যরূপ। তিনি পরমাত্মা। ''এই পরমাত্মা, ইনি সদা জানানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ইনি আছেন সর্বদা জনে-জনের হৃদয়।''

ভৌত জগতের সঙ্গে আমাদের বাস্তব পরিচয় ইন্দ্রিয়ের বোধে। কিন্তু আত্মিক জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় প্রেমে। এক আত্মার সঙ্গে আর এক আত্মার 'যে সম্বন্ধ সকলের চেয়ে, নিবিড়, সকলের চেয়ে সত্য, তাকেই বলে প্রেম।'' অপরিমেয় রহস্য, অনির্বচনীয়ের স্পর্শ এই প্রেমে। প্রশ্ন ওঠে, পিতামাতার সহ্য কোথায় প্রতিষ্ঠিত? উত্তরটা সহজ নয়। সাধারণভাবে বলা যায় মাটিতে। কিন্তু সত্য হল, যিনি 'পিতৃতমঃ পিতৃণাম্ - সকল পিতাই যার মধ্যে পিতৃতম হয়ে আছেন তাঁরই মধ্যে।' আপন আত্মার গভীরে পিতামাতার রহস্য বুঝতে পারি, বুঝতে পারি পিতৃতমকেও। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ''সেই পিতৃতম বিশেষ কোনো স্বর্গে নেই, নিশেষ কোনো দেশকালে বদ্ধ ইতিহাসে নেই, ইনি বিশেষে কোনো একটি মানুষে একদা অবতীর্ণ নন, ইনি প্রেমের সম্বন্ধে মানবের ভূতভবিষ্যৎকে পূর্ণ করে আছেন নিখিল মানবলোকে। আহ্বান করেছেন দুর্গম পথের ভিতর দিয়ে পরিপূর্ণতার দিকে, অসত্যের থেকে সত্যের দিকে, অন্ধকার থেকে জ্যোতির দিকে, মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে, দুঃখের মধ্য দিয়ে, তপস্যার মধ্য দিয়ে।'' এই আহ্বান মানুষকে কোনোকালে কোথাও থামতে দিলে না; তাকে চিরপথিক করে রেখে দিলে।' এই আহ্বান স্যতরে আহ্বান যার আকর্ষণে মানুষ প্রতিবাদে আপনাকে ছাড়িয়ে যায়। অর্থববেদে বলা হয়েছে, 'এই আরোর দিকে, এই ছাড়িয়ে যাবার দিকে মানুষের শ্রী, তার ঐশ্বর্য, তার মহত্ত্ব।' তাই মানবদেবতার কথা প্রসঙ্গে ঋষি বলেন —

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা

তত্তদেবাবগচ্ছ তং মম তেজোহংশসম্ভবম্।

অর্থাৎ 'যা কিছুতে ঐশ্বর্য আছে, শ্রী আছে, শ্রেষ্ঠতা আছে, সে আমারই তেজের অংশ থেকে সম্ভূত।'

বিশ্বমানবমনের প্রকাশ প্রকাশ বিশুদ্ধ সত্যের উপলব্ধিতে। শিল্পই হোক আর সৌন্দর্যই হোক তাকে অন্তরের ভালোলাগা, ভালোবাসা দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। জীবনধারণের জন্য এর প্রয়োজন নেই, এর প্রয়োজন আত্মিক। অর্থাৎ মহৎ কোনো কিছুর উপলব্ধি তাকে বাইরের দিকে থেকে পাওয়া নয়, অন্তরের দিক থেকে পাওয়া।

মানুষ নিয়ত হয়ে উঠছে। এই হয়ে ওঠার সঙ্গে প্রাপ্তিরও একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু 'যা চরম পাবার বিষয় তার সঙ্গে মানুষ একাত্মক, মানুষ তারই মধ্যে সত্য - কেবল তার বোধের বাধা আছে।' এই পাওয়া কেবল জ্ঞানে পাওয়া নয়, হওয়ার দ্বারা পাওয়া — 'দুশ্চরিত থেকে বিরত হওয়া, সমাহিত হওয়া, রিপুদমন করে অচঞ্চলমন হওয়া দ্বারাই তাঁকে পেতে হবে। অর্থাৎ এ এমন পাওয়া যা আপনারই চিরন্তন সত্যকে পাওয়া'

মানুষ বিশ্বাস করে যে প্রত্যক্ষ বিচ্ছিন্নতাকে পরিপূর্ণ করে আছে 'অপ্রত্যক্ষ নিখিলতার সত্য'। তার মনে আছে অপ্রত্যক্ষ নিখিলকে সমগ্র করে উপলব্ধির প্রেরণা। এই হল তার ভূমার বোধ।— "মানুষ অন্তরে বাহিরে অনুভব করে — সে আছে একটি নিখিলের মধ্যে। সেই নিখিলের সঙ্গে সচেতন সচেষ্ট যোগসাধনের দ্বারাই সে অপনাকে সত্য করে জানতে থাকে। বাহিরের যোগে তার সমৃদ্ধি, ভিতরের যোগে তার সার্থকতা।"

আপন সত্তার পরিচয়ে মানুষের দুটি ভাগ - একটি তার অহং, অন্যটি তার আত্মা। অহংকে যদি প্রদীপের সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহেল সেই প্রদীপনির্গত আলো হল তার আত্মা। বস্তুত মানুষের আলো দ্বালায় তার আত্মা তখন তার অহংকার ছোটো হয়ে যায়। তখন ব্যাপ্তির মধ্যে জ্ঞানে প্রেম ভাবে সার্থক হয় সেই আত্মা। এই আত্মার সত্যতা ধরা পড়ে পরম মানবত্মার বন্ধনে। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন, "...আত্মার সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলেছেন, 'তমেবৈকং জানথ আত্মানম্' — সেই আত্মাকে জানো, সেই এককে, যাকে সকল আত্মার মধ্যে এক করে জানলে সত্যকে জানা হয়। প্রার্থনা মন্ত্রে আছে, য একঃ যিনি এক, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, শুভবুদ্ধির দ্বারা তিনি আমাদের সকলকে এক করে দিন। যে বুদ্ধিতে আমরা সকলে মিল, সেই বুদ্ধিই শুভবুদ্ধি, সেই বুদ্ধিই আত্মার। যথেবাত্মা পরস্তদ্বদ্ দ্রষ্টব্যং শুভমিচ্ছতা। আপনার মতো করে পরকে দেখার ইচ্ছাকেই বলে শুভ ইচ্ছা, সিদ্ধিলাভেও শুভ নয়, পুণ্য লোভেও শুভ নয়। পরের মধ্যে আপন চৈতন্যের প্রসারণেই শুভ, কেননা পরম মানবত্মার মধ্যেই আত্মা সত্য।

সর্বব্যাপী স ভগবান্ সর্বগতঃ শিবঃ। যেহেতু ভগবান সর্বগত, সকলকে নিয়ে আছেন, সেই জন্যই তিনি শিব। সমগ্রের মধ্যেই শিব, শিব ঐক্যবন্ধনে। আচারীরা সামাজিক কৃত্রিম বিধির দ্বারা তখন খণ্ডতার সৃষ্টি করে তখন কল্যাণকে হারায়, তার পরিবর্তে যে কাল্পনিক পদার্থ দিয়ে আপনাকে ভোলায় তার নাম দিয়েছে পুণ্য। সেই পুণ্য আর যাই হোক সে শিব নয়। সেই সমাজবিধি আত্মার ধর্মকে পীড়িত করে। স্বলক্ষন্তু যো বেদ স মুনিঃ শ্রেষ্ঠউচ্যতে। আত্মার লক্ষণকে যে জানে সেই মুনি, সেই শ্রেষ্ঠ। আত্মার লক্ষণ হচ্ছে শুভবুদ্ধি, যে শুভবুদ্ধিতে সকলকে এক করে।"

এই শুভবুদ্ধির প্রেরণায় ব্যক্তিমানব তার অহংসীমার মধ্যে যে সুখ-দুঃখ সেই সকলকে ছাড়িয়ে যায়, সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করে দেশের জন্য, লোকহিতের জন্য বৃহৎ ভূমিকায় নিজেকে স্থাপন করে। কেননা 'আপনাকে বৃহতে উপলব্ধি করাই সত্য, অহংসীমায় অবরুদ্ধ জানাই অসত্য। ব্যক্তিগত দুঃখ এই অসত্যে।'

সত্যের আকর্ষণ বিরাটের আকর্ষণ এই বিরাট রুদ্ররূপে দুঃখের পথে আমাদের মুক্তির দিকে আকর্ষণ করেন। অপূর্ণতাকে ক্ষয় করে পূর্ণের সঙ্গে মিলনে বিশ্বমানব বিশুদ্ধ আনন্দময় হয়ে উঠবে। ব্যক্তি আত্মা থেকে বিশ্বাত্মা, বিশ্বাত্মা থেকে পরমাত্মার আহ্বানে ব্যক্তিমানব বিশ্বমানবের সঙ্গে মিলিত হয়ে ছুটে চলবে মহামানবতার দিকে।

দুঃখবেদনার ঝড়-ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে মহাবিশ্ব-জীবনকে — সত্যকে লাভ করবার জন্য নির্ভয়-নিঃশর্ত আত্মসমর্পণেই পরিপূর্ণ সার্থকতা, সফলতা, আনন্দ। একটি কবিতায় মহামানবধর্মের এই ভাবটিকে ফুটিয়ে তুলবার জন্য কবি লিখেছেন —

"মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা,
মৃত্যুরে না করি শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি, তারি মাঝে যাব অভিসারে
তারি কাছে জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যাবে
জন্মজন্মধরি।
কে সে। জানি না কে। চিনি নাই তারে।
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি।"

'মানুষের ধর্ম গ্রন্থের তৃতীয় প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপনিষদের তত্ত্ব-আশ্রিত দর্শনের সঙ্গে মানুষের ধর্মকে একাত্ম করেন। প্রসঙ্গ বিস্তার সূত্রে নানা পূর্বকথার অল্পবিস্তর পুনরাবৃত্তি সেখানে আছে। তবে তাঁর সঙ্গে অবশ্যই কবির মৌলিক অনুভবের দিকগুলি বিষয় বস্তুকে প্রাঞ্জল অভিব্যক্তি দান করেছে। এই সূত্রেই আমরা লক্ষ্য করতে পারি, একদিকে উপনিষদ্ দর্শন ও তার রবীন্দ্রভাষ্য, অন্য দিকে একেবারে নিরক্ষর সাধারণ মানুষের ধর্মকেন্দ্রিত নিজস্ব উপলব্ধি। কী আশ্চর্য কুশলতায় তিনি তাদের মিলিয়েছেন। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি, উপনিষদ্ কিম্বা বিশেষ কোনো ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ নিরক্ষর বাউল তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতাও জীবনবোধ থেকে অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে গানে গানে যে কথা বলছেন তার সঙ্গে উপনিষদের ঋষির কিম্বা তার আধুনিক ভাষ্যকর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির কী আশ্চর্য সুন্দর মিল।

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন- প্রণীত 'বাংলার বাউল' গ্রন্থে সংকলিত বাউল গান ও কবির নিজস্ব বাউলগীতি সংগ্রহের মর্মার্থ অনুধাবন করে কবির মনে হয়েছিলো উপনিষদক ধর্ম, তাঁর অভিপ্রেত মানুষের ধর্ম ও অশিক্ষিত, অশাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু ঈশ্বরে নিবেদিতপ্রাণ ভক্ত বাউলের ধর্মবোধের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা বাউল বিশ্বাসে করেন, আমাদের প্রাণের দেবতা— ঈশ্বর যা ভগবান, তিনি বিরাজ করেন মানুষের মধ্যেই। তাঁকে বাইরে খুঁজতে যাওয়া বিড়ম্বনা, মূর্খতা। উপনিষদের ঋষিও তো বলেছেন ঐ কথাই। বৃহদারণ্যকে আছে - যে মানুষ অন্য দেবতাকে উপাসনা করে, সেই দেবতা অন্য আমি অন্য এমন কথা ভাবে, সে তো দেবতাদের পশুর মতোই —

"অথ যোহন্যাং দেবতাম্ উপাস্তে
অন্যোহসৌ অন্যোহহম্ অস্মীতি
ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাম্।"

এই একই কথা শুনি অশাস্ত্রজ্ঞ, অশিক্ষিত বাউলের কণ্ঠে। তাঁর নিজের মতো করে নিজের ভাষায় তিনি বলেন, তিনি আপন দেবতাকে জেনেছেন আপনার মধ্যে। তিনিই তাঁর মনের মানুষ। সেই মনের মানুষকে জানতে হবে। চিনতে হবে। তাই তাঁর অকপট কাতরতা — 'মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ।' বাহ্যিক অনুষ্ঠান-আচার-পূজাপাঠের আড়ম্বর নেই। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দীর্ণ অহঙ্কার নেই, আছে কেবল ভক্তি, আছে আত্মনিবেদন। এতেই তাঁর আনন্দ। এই আনন্দ অহংমুক্ত আনন্দ, এই আনন্দই ভূমা। এই ভূমার উপলব্ধি কেবল মানুষেরই সাধ্য। কেন না মানুষের পক্ষে তাই সত্য। ভূমার এই উপলব্ধির বিষয় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ভূমা আহারে বিহারে আচারে বিচারে ভোগে নৈবেদ্যে মন্ত্রে-তন্ত্রে নয়। ভূমা বিশুদ্ধ জ্ঞানে, বিশুদ্ধ প্রেমে, বিশুদ্ধ কর্মে। বাইরে দেবতাকে রেখে স্তবে অনুষ্ঠানে পূজোপচারে শাস্ত্রপাঠে বাহ্যিক বিধিনিষেধ পালনে উপাসনা করা সহজ কিন্তু আপনার চিন্তায়, আপনার কর্মে, পরম মানবকে উপলব্ধি ও স্বীকার করা সবচেয়ে কঠিন সাধনা। সেই জন্যেই কথিত আছে, ন্যায়মাত্মা বলহীনের লভ্যঃ। তারা সত্যকে পায় না যারা অন্তরে দুর্বল। অহংকারকে দূর করতে হয়, তবেই অহংকে পেরিয়ে আত্মাকে পৌঁছতে পারি।—

য আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোহবিজিঘৎ।

সোহপিপাসঃ সত্যকামং সত্যসংকল্পঃ সোহন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।।

আমার মধ্যে যে মহান আত্মা আছেন, যিনি জরা-মৃত্যুশোক-ক্ষুধাতৃষ্ণার অতীত, যিনি সত্যকাম, সত্যসংকল্প, তাঁকে অন্বেষণ করতে হবে, তাঁকে জানতে হবে।। 'মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ।' এই যে তাঁকে সন্ধান করা, তাকে জানা, এতো বাইরে জান, বাইরে পাওয়া নয়; এ যে আপন অন্তরে আপনি হওয়ার দ্বারা জানা, হওয়ার দ্বারা পাওয়া।

কেমন করে সেই অন্তরতম মানুষকে পেতে হবে? তাঁকে পেতে হলে চাই সুগভীর অর্ন্তদৃষ্টি। একেই উপনিষদ্ বলেছেন প্রজ্ঞা বা দিব্যদৃষ্টি। সুতরাং যুক্তি-তর্ক-বিচার-বিশ্লেষণ্য- আচার-আহার-বিহার মন্ত্র-তন্ত্রে না, প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে পেতে হবে তাকে 'প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।' যাকে বলি প্রজ্ঞা তা ব্যক্তিমানবের সংস্কারলব্ধ জ্ঞানের বাইরে। তাকে বলা যেতে পারে বিজ্ঞান। তাতে বিশ্বমানবের অধিকার, কেননা তা সকল মানবের শ্রদ্ধেয়। তেমনি মানুষের সার্থগত 'আমি'র (অহং) চেয়ে বড়ো যে আমি (আত্মা) তার সঙ্গেও সকলে ঐক্য, তার কর্ম সকলের কর্ম। কেননা 'একলা আমি কর্মই বন্ধন, সকল আমির কর্ম মুক্তি'। বাংলার সরলপ্রাণ বাউল ও তো এই পরম সত্যের উপলব্ধিটি প্রকাশ করলেন তাঁর গানে। তিনি কেবল 'মনের মানুষ' অন্বেষণের কথাটি বলেই ইতি টানলেন না, উপেয়ের সঙ্গে উপায়টিও বলে দিলেন - 'একবার দিব্যচক্ষু খুলে গেলে দেখতে পাবি সর্বঠাঁই। "সেই মানুষ সকল মনের মানুষ, আপন মনের মধ্যে তাঁকে দেখতে পেলে সকলের মধ্যেই তাঁকে পাওয়া যায়। এই কথাই উপনিষদ্ বলেছেন; যুক্তাত্মানং সর্বমেবাবিশন্তি। বলেছেন তং বেদ্যং পুরুষং বেদ। যিনি বেদনীয় সেই পূর্ণ মানুষকে জানো; অন্তরে আপনার বেদনায় যাঁকে জানা যায় তাঁকে সেই বেদনায় জানো, জ্ঞানে নয়, বাইরে নয়।"

মানুষ সত্য হয়ে ওঠে পরম সত্যের উপলব্ধিতে। সত্যকে আপন করাই মানুষের সাধনা। মানুষের ইতিহাসে নানা সম্প্রদায়, নানা নাম, নানা সংকল্পের মধ্য দিয়ে এই সাধনাই চলছে। "যিনি পরম আমি, যিনি সকলের আমি, সেই আমিকেই আমার বলে সকলের মধ্যে জানা যে পরিমাণে আমাদের জীবনে আমাদের সমাজে উপলব্ধ হচ্ছে সেই পরিমাণেই আমরা সত্য মানুষ হয়ে উঠেছি। মানুষের রিপু মাঝখানে এসে এই সোহহম্ উপলব্ধিকে দুই ভাগ করে দেয়।" সেইজন্যই উপনিষদের নির্দেশ - মা গৃধঃ — লোভ কোরো না। মানুষের ঈশ্বরপ্রদত্ত ভোগ্য বিষয় ছাড়া আর সকল ত্যাগ করো - 'তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জিথাঃ।' সকলেই জানেন যে "লোভ বিশ্বের মানুষকে ভুলিয়ে বৈষয়িক

মানুষ করে দেয়। যে ভোগ মানুষের যোগ্য তা সকলকে নিয়ে তা বিশ্বভৌমিক, তা মানুষের সাহিত্যে আছে, শিল্পকলায় আছে, তাই প্রকাশ পায় মানুষের সংসার যাত্রায়, তার হৃদয়ের আতিথ্যে। তাই আমাদের শাস্ত্রে বলে অতিথি দেবো ভব। কেননা আমার ভোগ সকলের ভোগ এই কথাটা অতিথিকে দিয়ে গৃহস্থ স্বীকার করে; তবে ঐশ্বর্যের সংকোচ দূর হয়।... এই আতিথ্যের মধ্যে আছে, সোহহংতত্ত্ব — অর্থাৎ আমি তাঁর সঙ্গে এক যিনি আমার চেয়ে বড়ো। আমি তাঁর সঙ্গে মিলে আছি যিনি আমার এবং আমার অতিরিক্ত।''

আমাদের দেশের একদল সন্ন্যাসী সোহহং তত্ত্বকে নিজেদের মতো করে গ্রহণ করেন। 'নিরতিশয় নৈষ্কর্ম্য ও নির্মমতায় জড় প্রকৃতিকে লঙঘন কবার জন্যে দেহকে পীড়ন করেন। মানবপ্রকৃতিকে অস্বীকার করবার জন্যে তাঁরা যে কঠোর-কৃচ্ছ সাধনার পথ গ্রহণ করেন তা ব্রহ্মিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের না পসন্দ্। তাই তিনি বলতে পারেন — ''তাঁরা অহংকে বর্জন করেন যে অহং বিষয়ে আসক্ত, আত্মাকে অমান্য করেন যে আত্মা সকল আত্মার সঙ্গে যোগে যুক্ত। তাঁরা যাঁকে ভূমা বলেন তিনি উপনিষদে উক্ত সেই ঈশ নন যিনি সকলকে নিয়ে আছেন, তাঁদের ভূমা সবকিছু হ'তে বর্জিত, সুতরাম তাঁর মধ্যে কর্মতত্ত্বং নেই। তাঁরা মানেন না তাঁকে যিনি পৌরুষন নৃষু-মানুষের মধ্যে যিনি মনুষ্যত্ব, যিনি বিশ্বকর্মা মহাত্মা, যাঁর কর্ম খণ্ডকর্ম নয়, যাঁর কর্ম বিশ্বকর্ম, যাঁর স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ - যাঁর মধ্যে জ্ঞানশক্তি ও কর্ম স্বাভাবিক, যে স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তিকর্ম অন্তহীন দেশে-কালে প্রকাশমান।'' আসলে মানুষের অভিব্যক্তির গতি অন্তরের দিকে। এই দিকে তার সীমার আবরণ খুলে যাবার পথ। এইজন্যই মধ্যযুগের সন্ত কবি রজ্জব তার বাণীতে সারবার কথাটি বলেছেন —

সব সাঁচ মিলে সো সাঁচ হৈ, না মিলে সো ঝুঁঠ।

জন রজ্জব সাঁচী কহী ভাবই রিঝি ভাবই রূঠ।।

- সব সত্যের সঙ্গে যা মেলে তাই সত্য, যা মিলন না তা মিথ্যে; রজ্জব বলছে এই কথাই খাঁটি- এতে তুমি খুশিই হও আর রাগই করো। মানুষ পবিত্র হয় নির্মল হয়, সুন্দর হয় এই সত্যবোধে - অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি'- দেহের শোধন হয় জল দিয়ে কিন্তু মনের শোধন হয় কেবল সত্যে।

উপনিষদের আরও একটি সুন্দর কথা - পাপ করে সন্তপ্ত হলেই সব পাপ ধুয়ে মুছে যায়, যে পাপ করেছি তা আর করবো না ভেবে দৃঢ়চিত্ত হলে মানুষ পবিত্র হতে পরে—

''কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপং প্রমুচ্যতে।

নৈবং কুর্যাম্ পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ।।

এই সকল কথা বলার মধ্য দিয়ে মানুষ স্বীকার করে নেয় বিশ্বমনের প্রজ্ঞাকে, কে না 'তং হ দেবম্ আত্মবুদ্ধি প্রকাশম্ — সেই দেবতা আত্মবুদ্ধি প্রকাশক, তাঁকে আমরা আত্মায় জানি। এ থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া চলে ''আমার মন আর বিশ্বমন একই, এই কথাই সাধনার মূলে, আর ভাষান্তরে এই কথাই সোহহম্।'' সত্যসাধনার এই বোধে - সোহহম্ তত্ত্বটিকে আত্মস্থ করে ব্রাহ্মণ রামানন্দ বর্ণগত অহঙ্কার তুচ্ছ করে 'আলিঙ্গন করেছিলেন নাভা চণ্ডালকে, মুসলমান জেলা কবীরকে, রবিদাস চামারকে,' বলেছিলেন সোহহম্। জগতের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বুদ্ধ-খ্রীষ্ট প্রভৃতি সকলেই আপন সীমাকে ছাড়িয়ে অনুভব করেছিলেন বৃহৎ-মহৎ সত্যকে, বলেছিলেন সোহহম্। উপনিষদের সম্ভূতি-অসম্ভূতি তত্ত্বকে তাঁরা অন্তর দিয়ে বুঝে ছিলেন, এক সঙ্গে মেলাতে পেরেছিলেন। সম্ভূতি হল তাই যা দেশে-কালে অভিব্যক্ত আর অসুম্ভুতি হল তাই যা অসীমে অব্যক্ত। সম্ভূতি সীমার আর অসম্ভূতি অসীমতার দিকটিকেই ব্যক্ত করে। এই সীমা-অসীমের মিলনেই সত্যের বোধ, কবির নিজের অনুভবে দীপ্ত এই মিলন তত্ত্বটি—

"সীমার মাঝে, অসীম তুমি
বাজাও আপনা সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।"

(গীতাঞ্জলি - ১২০)

বস্তুত মানুষের মধ্যে যিনি অসীম তাঁকে সীমার জীবনে সমাজে ব্যক্ত করে তুলতে হবে। অসীম সত্যকে বাস্তব সত্য করতে হবে। এর জন্য কর্মের প্রয়োজন। এইজন্য উপনিষদ বলেছেন কর্মের মধ্য দিয়েই শতবর্ষ বাঁচতে হবে। মানুষ এরই জন্যে সাধনা করে চলেছে। এই সাধনারই অন্য নাম সত্যসাধন- মনুষ্যত্বসাধন - মানুষের ধর্ম। এই কর্মের মধ্যে সত্যবোধের তথা মনুষ্যত্বের জাগরণকেই বাউল বলেছেন লীলা, বলেছেন —

"জীবে জীবে চাহিয়া দেখি সবই যে তার অবতার—
ও তুই নূতন লীলা কী দেখাবি, যার নিত্যলীলী চমৎকার!

প্রতিদিনই মানবসমাজে এই লীলা। অসংখ্য মানুষ জ্ঞানে প্রেমে ত্যাগে নানা আকারেই অপরিমেয়কে প্রকাশ করছে।" যুগে যুগে মহাপুরুষেরা বিচিত্র লীলার মধ্যে ঐক্যের এই বাণীটি বহন করে বলেছে— সোহহম্, বলেছে 'I am my Father are alone'. এই বোধে আত্মপ্রসাদ যেমন, আনন্দ ততোধিক। অভিব্যক্তির সকল স্তরেই আত্মবিকারে গূঢ়ার্থ নিহিত ছিলো, মানুষ তা উপলব্ধি করেছে। তাই রবীন্দ্রনাথ বললেন —জগতের বিপুল অভিব্যক্তিকে প্রথম অর্থ দেখলুম প্রাণকণায়, তার পরে জন্তুতে, তার পরে মানুষে। বাহির থেকে অন্তরের দিকে একে একে মুক্তির দ্বার খুলে যেতে লাগল। মানুষ এসে যখন ঠেকল তখন যবনিকা উঠতেই জীবকে দেখলুম তার ভূমায়। দেখলুম রহস্যময় যোগের তত্ত্বকে, পরম ঐক্যকে। মানুষ বলতে পারলে, যাঁরা সত্যে জানেন তাঁর সর্বমেবাবিশন্তি — সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন।

আলোকের মতো মানুষের চৈতন্য মহাবিকিরণের দিকে চলেছে জ্ঞানে-কর্মে-ভাবে। সেই প্রসারণের দিকে দেখি তার মহৎকে, দেখি মহামানবকে, দেখি যশ্চায়মস্মিন্ আত্মনি তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষং সর্বানুভুঃ; এই শুভ কামনায় হৃদয়কে সর্বত্র এই বলে ব্যাপ্ত করতে পারি —

সবের সত্তা সুখিতা হোন্তু, অব্যাপজ্ঝা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু।

সব্বে সত্তা দুক্খাপমুঞ্চন্তু। সব্বে সত্তা মা যথালব্ধ-সম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।—

সকল জীব সুখিত হোক, অবধ্য হোক, সুখী হয়ে কালহরণ করুক। সকল জীব দুঃখ হতে প্রমুক্ত হোক, সকল জীব যথালব্ধ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হোক।। সেয়ই সঙ্গে এও বলতে পারি, দুঃখ আসে তো আসুক, মৃত্যু হয়তো হোক, ক্ষতি ঘটে তো ঘটুক— মানুষ আপন মহিমা থেকে বঞ্চিত না হোক, সমস্ত দেশকালকে ধ্বনিত করে বলতে পারুক; সোহহম্।"

৪.২.৮.২ : মানুষের ধর্মের পরম উপলব্ধি : বাউলের অন্বেষা

মানুষ ছাড়া সকল প্রাণী বাইরে থেকে জীবিকার অন্বেষণে ব্যস্ত। কিছু মানুষ আপন অন্তরের মধ্যে আর একজনের অস্তিত্ব অনুভব করলে যিনি তাকে তার অন্তর্নিহিত অর্থসকল দিচ্ছেন। সেই অর্থ মানুষের আপন আত্মারই গভীর অর্থ। "সেই অর্থে এই যে মানুষ মহৎ; তবেই প্রমাণ হবে যে সে মানুষ। প্রাণের মূল্য দিয়েও তার আপন

ভূমাকে প্রকাশ করতে হবে; কেননা তিনি চিরন্তন মানব, সর্বজনীন মানব, তিনি মৃত্যুর অতীত, তাকে যে অর্ঘ্য দিতে হবে, যে অর্ঘ্য সকল মানুষের হয়ে, সকল কালের হয়ে আপনারই অন্তরতম বেদীতে।'' বাইরের সম্পদ, খ্যাতি, প্রভাব-প্রতিপত্তি , ভোগ- এ সকল নিয়েই তো মানুষের সঙ্গে মানুষের যত বিবাদ, যত দুঃখ যত কান্না। অন্তরের যে মানুষটি রয়েছেন অন্তরতম বেদীতে তার খোঁজ রাখি কই? এই মানুষকে পেতে হলে সীমায় আবদ্ধ সংকীর্ণ সার্থমগ্নতা পরিহার করে বেরিয়ে আসতে হবে পথে। এই সার কথাটি, এই গভীর সত্য বোধটি ধরা পড়েছে নিরক্ষর - ভিখারী বাউলের একটি গানে—

''আমি কথাটি পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশ বেড়াই ঘুরে।''

সেই বাউলই অন্য একটি গানে বলেছিলেন - 'তোরই ভিতর অতল সাগর'।

মানুষ যে যথার্থ মহৎ, সে যে যথার্থ মানুষ যেখনে জ্ঞানে-কর্মে-ভাবে সে বিশ্বের সঙ্গে, ভূমার সঙ্গে যুক্ত, তা তাকে প্রমাণ করতে হ'বে। মানুষের নিজের মধ্যে যে বৃহৎ-মহৎ মানবসত্তা রয়েছে যাকে বাউল বলেছেন 'মনের মানুষ'- তার অন্বেষণই মানুষের ধর্ম। তাই বাউল বলেছেন - 'মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ'। সেই অন্বেষণেরই প্রার্থনা বেদে আছে —'আবিরাবীর্ম এধি'। ''পরম মানবের বিরাটরূপে যাঁর স্বতঃ প্রকাশ, আমারই মধ্যে তাঁর প্রকাশ সার্থক হোক।''

৪.১.৮.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। প্রচলিত ধর্ম-সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্মের পার্থক্য নির্দেশ করো।

২। 'মানুষের ধর্ম'প্রবন্ধের অনুসরণে মানুষের ধর্মের স্বরূপ বিশদ করো।

৩। 'মানুষের ধর্ম' অবলম্বনে জীবদেহ ও বিশ্বদেহ, জীবভাব ও বিশ্বভাব এবং ব্যক্তিমন ও বিশ্বমন -সম্পর্কিত ধারণার পরিচয় দাও।

৪। মানুষের ধর্ম কেন্দ্রিত আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ কীভাবে বাউলের অন্বেষণকে মানুষের ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করেছেন তা ব্যাখ্যা করো।

৫। 'মানুষের ধর্ম' সম্পর্কিত আলোচনায় 'মানব ধর্ম' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য উপস্থাপন করো।

৬। 'মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ' - 'মানুষের ধর্ম' - গ্রন্থের আলোচনায় প্রেক্ষিতে উদ্ধৃতিটির গুরুত্ব নির্দেশ করো।

৭। ''স্বার্থ আমাদের যে সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীবপ্রকৃতিতে; যা আমাদের ত্যাগের দিতে তপস্যার দিকে নিয়ে যায়, তাকেই বলি মনুষ্যত্ব- মানুষের ধর্ম।''-আলোচনা করো।

৪.২.৮.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। আত্মপরিচয় (বিশ্বভারতী সং) — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২। মানুষের ধর্ম (বিশ্বভারতী সং) — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩।	*Religion of Man*	—	Rabindranath Tagore
৪।	*Sadhana*	—	Rabindranath Tagore
৫।	*Personality*	—	Rabindranath Tagore
৬।	বাংলার বাউল	—	ক্ষিতিমোহন সেন
৭।	*The Principle Upanishads*	—	Dr. S. Radhakrishnan
৮।	*Indian Philosophy*	—	Dr. S. Radhakrishnan
৯।	*Occasional Speeches and Writings*	—	Dr. S. Radhakrishnan
১০।	*Religion of the Forest*	—	Rabindranath Tagore
১১।	*Religion of the Artist*	—	Rabindranath Tagore
১২।	রবীন্দ্র দর্শন	—	হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩।	রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য	—	কল্যাণীশঙ্কর ঘটক
১৪।	সাহিত্যের বিশ্লেষণ - প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ	—	কল্যাণীশঙ্কর ঘটক

চতুর্থ পত্র

বিশেষ পত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

লিপিকা

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

একক - ৯

লিপিকার গঠনশিল্প

বিন্যাস ক্রম :

৪.৩.৯.১ : পটভূমি

৪.৩.৯.২ : লিপিকার গঠনশিল্প

৪.৩.৯.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.৩.৯.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪.৩.৯.১ : পটভূমি

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে যখন রবীন্দ্রনাথের শরীর অসুস্থ কোনো বড় কাজে হাত দিতে মন চায় না, তখন তিনি শান্তিনিকেতনে শিশুদের মধ্যেই নিজেকে ভুলিয়ে রেখেছেন, কখনো লিখছেন শিশু ভোলানাথের ছড়া, একটি একটি ছড়া যাতে সমাকালীন সময় ও সমাজ একেবারে অনুপস্থিত এই সময়ই তাঁর মধ্যে কবিতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার খেয়াল এল, এই খেয়াল - বহুদিন ভেবেছিলেন গদ্যকবিতার কথা - কখনো বলেছেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে বা কখনো গদ্যশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এবার নিজেই সচেষ্ট হয়ে উঠলেন।

ভারতে তখন ইংরেজ শাসনে দমননীতি কঠোর হয়ে উঠেছে, রাওলাট বিলের প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ৩০শে মার্চ প্রতিরোধ আন্দোলনের সূচনা। ১৯১৯ এর ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের উপর পুলিশের জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে গুলিবর্ষণ হয়। এই ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় ভারতীয় জনমানসে। রবীন্দ্রনাথ অ্যাণ্ড্রুজের কাছ থেকে খবর পান, তিনি গান্ধী কিংবা চিত্তরঞ্জনের কাছে এর প্রতিবাদে কিছু করতে চান এবং কোনো সাড়া না পেয়ে নাইটহুড ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। এই সময়েই তিনি ছিলেন 'লিপিকা'। তাঁর সমস্ত বিমর্ষচিত্তের ভার থেকে মুক্তির সন্ধানে তাঁর সজনশীল মন এই নতুন (আর্ট ফর্মের) শিল্পরূপের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিল।

৪.৩.৯.২ : লিপিকার গঠনশিল্প

লিপিকা রচনার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ এই গদ্যকবিতা রচনার জন্য বিশেষ প্রেরণা অনুভব করেন। ১৯৩২-এ প্রকাশিত পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় কবি লিখছেন - 'পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কিনা তারই'' পরীক্ষা তিনি করেছিলেন লিপিকার 'অল্প কয়েকটি লেখায়'' তবে ''ছাপবার সময় সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয়নি - বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ''। সাহিত্যের স্বরূপ প্রবন্ধ

গ্রন্থে কাব্য ও ছন্দ প্রবন্ধটিতে (১৯৩৬এ লিখিত) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন - ‘‘কাব্যের লক্ষ্য হৃদয় জয় করা - পদ্যের ঘোড়ায় চড়েই হোক বা গদ্যে পা চালিয়েই হোক। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির সক্ষমতার দ্বারাই তাকে বিচার করতে হবে।’’... ‘‘ছন্দের একটা সুবিধা এই যে ছন্দের স্বতই একটা মাধুর্য আছে।’’ ..‘‘গদ্যই হোক, পদ্যই হোক, রচনামাত্রেই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত। সেই নিগূঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহত করা হয়। পদ্যছন্দবোধের চর্চা বাঁধা নিয়মের পথে চলতে পারে কিন্তু পদ্যছন্দের পরিমাণবোধ মনের মধ্যে যদি সহজে না থাকে তবে অলঙ্কার শাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না। অথচ অনেকেই মনে রাখে না যে, যেহেতু গদ্য সহজ, সেই কারণেই গদ্যছন্দ সহজ নয়।’’ ... ‘‘কিন্তু এই সহজ কথাটা বলতেই হবে, যেটা যথার্থ কাব্য সেটা পদ্য হলেও কাব্য, গদ্য হলেও কাব্য।’’ ...‘‘যা আমাকে রচনাতীতের আস্বাদ দেয় তা গদ্য বা পদ্য রূপেই আসুক তাকে কাব্য বলে গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ হব না।’’

এই বক্তব্যগুলি মনে রেখে লিপিকা রচনাগুলিকে বিচার করলে মনে হবে যে সত্যিই এগুলির অধিকাংশই গদ্যকবিতা, গদ্যের প্রবহমান রূপের মদ্যে প্রকাশিত অন্তর্লীন ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ কাব্য। শ্রেষ্ঠকাব্যের সঙ্গে রসাবেদনের দিক দিয়ে তার কোনো প্রভেদ নেই অথচ উপকরণে, আয়োজনে সজ্জায় তা নিঃসন্দেহে গদ্যের সহোদর। তার অন্তর্লীড় ব্যঞ্জনাকে লক্ষ্য করে কোনো কোনো সমালোচক এর নাম দিয়েছেন ‘গীতিগদ্য’। লিপিকা গ্রন্থটির জন্য স্বয়ং রচয়িতা কোনো ভূমিকা লেখেননি তবু এ গ্রন্থটি হাতে নিলে দেখা যায় এই নবরূপের রচনাগুলির মধ্যে তিনি সূক্ষ্মভাবেই তিনটি ধারারাকে একত্রিত করেছেন। রচনাক্রমের মধ্যে ১,২,৩ পর্বে রচনাগুলিকে বিন্যস্ত করেছেন। লিপিকার রচনাগুলির মধ্যে প্রথম পর্বের রচনা যেগুলি ‘১’ শিরোনামের অন্তর্গত তার মধ্যে যে রচনাগুলি আছে সেগুলি বিশেষভাবেই ভাবমুখ্য এবং ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ এগুলিকে গদ্যকবিতা মনে করাই সংগত।

দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলিতে কাব্যের ব্যঞ্জনার চেয়ে ছোট গল্পের ক্ষীণ আভাস, ঘটনার ছোট পরিসর বর্ণিত হয়েছে। ছোটগল্পের সঙ্গে কবিতার যে মিল — ছোটগল্পের পরিণতির কাব্যিক ব্যঞ্জনা তাও এখানে দুর্লভ নয়। তাই এই রচনাগুলি নতুন ধরনের গল্পশিল্প। গল্পগুচ্ছের থেকে এই গল্পগুলি অবশ্য স্বতন্ত্র, গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি বিষয়মুখ্য এবং লিপিকার গল্পগুলি ভাবমুখ্য। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা অবশ্য লিপিককাকে গল্পগুচ্ছের গল্পগুলির সঙ্গে এক করতে চাননি। তাদের গঠনগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা এই গল্পর চরিত্র স্বল্প, ঘটনার গতি মন্থর এবং গল্পের বিস্তারও অনেক কম। দ্বিতীয় পর্বের অধিকাংশ রচনাই এই পর্বের, মীন, সুয়োরানীর সাধ, নামের খেলা। গল্পগুচ্ছের যে গল্পগুলি আকারে ছোট সেগুলোর মধ্যে একটা সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় কিন্তু লিপিকার গল্পগুলির আকৃতি সচেতন প্রয়াসে সংক্ষেপিত হয়নি। সমালোচক বলেছেন - ‘‘বরং ভাবই যেন স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে এক একটি মুক্তা কণিকার মতো শিল্পরূপে সর্বাঙ্গীন সম্পূর্ণতা পেয়েছে। স্বরূপধর্মে গল্পগুচ্ছর গল্প সাধারণতা বস্তুমুখ্য, লিপিকার গল্প ভাবমুখ্য। এই ভাব কোথাও রূপকের শিল্পরূপে সুনির্দিষ্ট, কোথাও বা প্রতীকের শিল্পরূপে অনির্দেশ্য ব্যঞ্জনাময়।’’ (রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ : তপোব্রত ঘোষ)।

তৃতীয় পর্বের কয়েকটি রচনায় গল্পরস প্রাধান্য পেয়েছে আবার কয়েকটি রচনায় নাটকীয় চমকও লক্ষণীয়। বিশেষ করে ব্যঙ্গ রসের কাহিনি এই পর্বের রচনাগুলিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। তোতাকাহিনি, ঘোড়া, কর্তার ভূত প্রভৃতি রচনাকে নাট্যলক্ষণাক্রান্ত বলা যায়। এইভাবে ‘লিপিকা’ নামের একটি গ্রন্থে তিনটি ধারার রচনা মিলে মিশে আছে। ১,২,৩ এই পর্বে ভাগ করতে গিয়ে লেখকের এই অন্তরালবর্তী অভিপ্রায়টিই টের পাওয়া যায়। সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ‘‘কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ’’ গ্রন্থে বলেছে যে সূর্যাস্তর সময়ে গাছের ডালে বসে থাকে নানা জাতের পাখি এবং তাদের দেখে পৃথক করা যায় না, অথচ সূর্যোদয়ের সময়ে দুই ভিন্ন দিকে দুই জাতের পাখি। লিপিকার রচনাগুলি এমনই।

৪.৩.৯.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

1 òbe !bÉ™„ |pó„ |pîÄ!Ýp„ |b|pÇ¡öe îü%|b|p£ëû

2 òbe !bÉ™„ |pó„ |pöîÄîû|+àþ !Ÿöò îüßþbp™î ’Åy „ |pîÿû

৪.৩.৯.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

২। রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ — তপোব্রত ঘোষ।

৩। রবীন্দ্র ছোটগল্পের প্রকরণ শিল্প — গোপিকানাথ রায়চৌধুরী।

৪। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প — প্রমথনাথ বিশি

পর্যায় গ্রন্থ - ৩
একক - ১০
প্রথম পর্বের রচনা — কাব্যলক্ষণাক্রান্ত পাঠ বিশ্লেষণ

বিন্যাস ক্রম :

৪.৩.১০.১ : প্রথম পর্বের রচনা --- কাব্যলক্ষণাক্রান্ত পাঠ বিশ্লেষণ

৪.৩.১০.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.৩.১০.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪.৩.১০.১ : প্রথম পর্বের রচনা — কাব্যলক্ষণাক্রান্ত পাঠ বিশ্লেষণ

১। 'পায়ে চলার পথ' — রচনাটি প্রথমে পড়লে মনে হবে বিবৃতিমূলক। গ্রামের মেঠো পথের বর্ণনা, তারপরে এই পথের বর্ণনা ক্রমশ অনুভূতিময়তায় সান্দ্র হয়ে উঠেছে। ক্রমশঃ মনে হয় এই বর্ণনা শুধু বাইরের বর্ণনা নয়, জীবন পথ। কবি বলেন — ''একদিন এই পথকে মনে হয়েছিল আমারই পথ, একান্তই আমার, এখন দেখছি, কেবল একটিবার মাত্র এই পথ দিয়ে চলবার হুকুম নিয়ে এসেছি, আর নয়।'' ...''এ যে চলার পথ ফেরার পথ নয়। কখনো কবির কান পেতে শুনতে ইচ্ছে করে যে পথ যেন তার বুকে বহুবিস্মৃত পদচিহ্নের পদাবলী যে সুর ধ্বনিত করে। ''ওগে পায়ে তলার পথ, অনেক কালের অনেক কথাকে তোমার ধূলিবন্ধনে বেঁধে নীরব করে রেখো না। আমি তোমার ধূলোয় কান পেতে আছি, আমাকে কানে-কানে বলো।'' এই আর্তি এই গদ্যরচনাকে কাব্যের জগতে উত্তীর্ণ করেছে। আর এই রচনার শেষাংশে কবির দার্শনিক জিজ্ঞাসা- ''পথ কি নিজের শেষকে জানে, যেখানে লুপ্ত ফুল আর স্তব্ধ গান পৌঁছল, যেখানে তারার আলোয় অনির্বাণ বেদনার দেওয়ালি উৎসব।''

জীবনের পথের পথিক যে, সে তার চলার শেষ পরিণতিকে জানে না, কিন্তু বেদনার যে দহন তার অনিঃশেষ দেওয়ালি যেন কবির বেদনাময় অস্তিত্বকে অনির্দেশ্য করে তুলেছে।

এই অন্তর্লীন ব্যঞ্জনাময়তাই এই রচনার প্রাণ যা এই রচনাকে কাব্য করে তুলেছে। রসাবেদনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিচার করলে একে বাক্য ছাড়া আর কিছুই মনে করা যায় না।

২। 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' — এই রচনাটির মধ্যেও সহজ প্রবহমান গতিশীল গদ্য - কিন্তু তারই মধ্যে পৃথিবী দুই প্রান্তে দুটি কালিক ব্যবধান যেন ব্যঞ্জনায় দুটি পৃথক জগৎকে আভাসিত করেছে। দিবা এবং রাত্রি, ঊষা এবং সন্ধ্যা পৃথিবীর দুটি সত্যকে জীবনের দুটি প্রান্তকে দ্যোতিত করে। কবি বলেছেন যে রচনা রচনাতীতের আস্বাদ দেয় তাকেই তিনি মনে করেন যখন 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' রচনায় ফুটে ওঠে — ''অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠেছে রজনীগন্ধা, বাসরঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো; কোন্‌খানে ফুট্‌লো ভোরবেলাকার কনকচাঁপা?

জাগলো কে? নিবিয়ে দিল সন্ধ্যায় জ্বালানো দীপ, ফেলে দিল রাত্রে গাঁথা সেঁউতিফুলের মালা।

এখানে একে একে দরজায় আগল পড়ল, সেখানে জানলা গেল খুলে। এখানে নৌকো ঘাটে বাঁধা, মাঝি ঘুমিয়ে; সেখানে পালে লেগেছে হাওয়া। এই বর্ণনার মধ্যে যে ব্যঞ্জনা আছে তাতে দুই পৃথিবী 'ইহলোক আর পরলোকের চিত্র ফুটে উঠেছে।'' একদিকে জীবনের জয়রথ অন্যদিকে মৃত্যু পথযাত্রীর যাত্রার সূচনা। আর পরিশেষে ''সূর্যদেব তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত, এদের তুমি মিলিয়ে দাও। এর ছায়া ওর কোলে তুলে

নিয়ে চুম্বন করুক। এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে চলে যাক।'' এই জন্ম এবং মৃত্যুর দুটি পরিণতিকে কবি সমদূরত্বসম্পন্ন সহজ প্রেক্ষণ বিন্দুতে মিলিয়ে দিতে চান, 'আসা যাওয়ার খোলা রবে দ্বার' - সেই খোল দরজায় 'এর ছায়া ওর আলোর মিলন যেন।' মৃত্যু আর কোনো রহস্যময় দূরের জগতের ভয়ংকর সত্য নয়, সে কেবল একটি আলো ছায়ার মিলন। এওতো সেই বচনাতীতের প্রকাশ।

'কৃতঘ্ন শোক', 'সতেরো বছর' — এই দুটি রচনাতেও জীবনের শেষে মৃত্যুর প্রকাশ কেমন গভীর তাৎপর্যসহ তাই প্রকাশিত। দুটি রচনাতেই কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনে ঘটে যাওয়া সেই অভাবিত শোককাহিনিটিই সেই বউঠান কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু জনিত শোকের একটা ইঙ্গিত আছে। সেই শোক শুধু নঞর্থক শোক নয়, সেই শোক থেকে এক অমলিন সৌন্দর্যময় জীবনোপলব্ধির প্রকাশ লক্ষণীয়, 'কৃতঘ্ন শোক' -রচনায় কবির মন যখন শোকের আঘাতে বিশ্বের সবকিছুতেই যা একান্ত আপনার তাকেই মনে করেছিল 'বিশ্বাসঘাতক' - অমনি কে যেন বলে উঠল 'অকৃতজ্ঞ'। ''জানলার বাইরে দেখি ঝাউগাছের আড়ালে তৃতীয়ার চাঁদ উঠেছে, যে গেছে যেন তারই হাসির লুকোচুরি। তারা ছিটিয়ে দেওয়া অন্ধকারের ভিতর থেকে একটি ভৎর্সনা এল, ''ধরা দিয়েছিলেন সেটাই কি ফাঁকি, আড়াল পড়েছে এইটেকেই তে জোরে বিশ্বাস?''

অর্থাৎ যা আড়ালে পড়েছে তা কোথাও হারিয়ে যায়নি শেষ হয়নি, কেবল যেন তার চেহারা বদলে গেছে, জানলার বাইরে ঝাউগাছের আড়ালে তৃতীয়ার চাঁদের হাসির মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে আছে সেই চিরচেনা হাসিটি। যাকে হারিয়ে কবির বেদনা হয়েছিল প্রগাঢ় আবার তাকে অন্যভাবে উপলব্ধি করে তাঁর শোক যেন কৃতার্থ হল, উত্তরণের পথে।

'সতেরো বছর'— শীর্ষক রচনাটিও ভাবমুখ্য রচনা। কত অনুষঙ্গে ভরা এ জীবন অনুভূতির স্তর পরম্পরা দিয়ে গড়া। সেই ''সতেরো বছরের জানা দিয়ে গড়া; কখনো আদরে কখনো অনাদরে, কখনো কাজে কখনো অকাজে, কখনো সবার সামনে কখনো একলা আড়ালে, কেবল একটি লোকের মনে-মনে জানা দিয়ে গড়া; সেই মানুষ।'' কিন্তু মৃত্যু যা চিরকালীন বিচ্ছেদ তাই ধরে রাখে ''দিনগুলি, রাতগুলি, সেই নামের রাখিবন্ধনে আর তো এক হয়ে মেলে না - এরা ছড়িয়ে পড়ে।'' ''সন্ধ্যেবেলাকার খাপছাড়া মেঘের মতো অন্ধকারে পাড়ি দেয়''— এই অন্ধকার বিচ্ছেদের অন্ধকার যেখানে সব স্মৃতির মেঘ খাপছাড়া হয়ে ভেসে বেড়াতে বেড়াতে অন্ধকারে হারিয়ে যায়। ব্যক্তিবিশেষের স্মৃতি হিসে,বে তো আর বিশিষ্ট থাকে না, মূল্যহীন হয়ে পড়ে নির্বিশেষের মধ্যে। স্মৃতিভাবাতুর কবির বিষণ্ণতাই এখানে বড়ো, গদ্য হয়েও তাই তা বাক্যাতিরিক্ত ব্যঞ্জনাকেই প্রকাশ করে।

৪.৩.১০.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'লিপিকা'র অন্তত তিনটি রচনা অবলম্বনে দেখাও সেগুলিকে ছোটগল্পের পর্যায়ভুক্ত করা যায় কিনা।

২। 'তোতাকাহিনি' ও ঘোড়ায় যথাক্রমে সমকালীন শিক্ষা সমাজ-অভিঘাতের যে ছায়াচিহ্ন ধরা আছে আলোচনায় তা স্পষ্ট করো।

৩। লিপিকার গদ্যকবিতার ছন্দ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪। লিপিকার আখ্যানধর্মী কথিকাগুলিতে লেখকের যে সমাজ ভাবনার পরিচয় আছে - পঠিত রচনাগুলি অবলম্বনে মন্তব্যটি প্রতিষ্ঠিত করো।

৫। লিপিকার আখ্যানধর্মী কথিকাগুলিতে লেককের যে সমাজ ভাবনার পরিচয় আছে - পঠিত রচনাগুলি অবলম্বনে মন্তব্যটি প্রতিষ্ঠিত করো।

৬। লিপিকার কোনো একটি রচনার ভাববস্তু ও শিল্পরীতি সম্পর্কে আলোচনা করো।

৭। লিপিকার কয়েকটি রচনা ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত - উপযুক্ত উদ্ধৃতিযোগে মন্তব্যটি প্রতিষ্ঠা করো।

৮। "লিপিকা (১৩২৯) রবীন্দ্রাথের একখানি দেসরহীন অসাধারণ গদ্য গ্রন্থ" -রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি ধারায় লিপিকা কোন্ অর্থে কেন 'লিপিকা' দোসরহীন। তার অভিনব শিল্প প্রকরণ সম্পর্কে আলোচন করে গ্রন্থটির গোত্র নির্ণয় করো।

৯। গ্রন্থকার 'লিপিকা'কে তিনটি পর্বে ভাগ করে উপস্থাপিত করেছেন। এই বিভাজন কতটা যুক্তিসঙ্গত হয়েছে তা নিজের ভাষায় আলোচনা করো।

১০। 'লিপিকা'র কয়েকটি রচনা রূপকথার ছাঁদে লেখা - দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করো।

৪.৩.১০.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

২। রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ — তপোব্রত ঘোষ।

৩। রবীন্দ্র ছোটগল্পের প্রকরণ শিল্প — গোপিকানাথ রায়চৌধুরী।

৪। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প — প্রমথনাথ বিশি

পর্যায় গ্রন্থ - ৩
একক - ১১
দ্বিতীয় পর্বের রচনায় গল্পরসের প্রাধান্য

বিন্যাস ক্রম :

৪.১.১১.১ : দ্বিতীয় পর্বের রচনায় গল্পরসের প্রাধান্য

৪.৩.১১.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.৩.১১.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪.৩.১১.১ : দ্বিতীয় পর্বের রচনায় গল্পরসের প্রাধান্য

'মীনু' — মীনু পশ্চিমের খোলা মাঠ, অড়রখেত আর গাছের তলায় ছেলেবেলা কাটিয়েছেন। ''কাঁচা ফলটির মতো ওর কাঁচা প্রাণা পৃথিবীর বোঁটা শক্ত করে আঁকড়ে ছিল। যা কিছু ছিল কবি, সবুজ সজীব তার পরেই ওর বড়ো টান।'' ''ওর বাগানটি যেন তার কোলের ছেলে।'' আর সে ভালবাসতো তার পোষা কুকুর ভোঁতাকে। সে আরোগ্যলাভের জন্যই কলকাতায় এসেছিল। কিন্তু এই শহরে ইঁটকাঠের মধ্যে যে সব মানুষকে সে তার পরিবেশে পেয়েছিল, তার সঙ্গে তার মেলেনি। তার শোবার ঘরের নীচে গোলকচাঁপার গাছ সাজি হাতে নির্মম পূজারি ব্রাহ্মণের হাত থেকে বাঁচানো যায় না। তেমনি, পাশের বাড়ির ছোট্ট শিশুটিকে সে কোলে নিতে পারেনি। দাই এর হাত দিয়ে তার দেওয়া সন্দেশ শিশুটির অভিভাবকেরা কেড়ে নিয়ে শিশুটিকে মারল। সে মার বেশী বাজল মীনুকেই। তার মনের আশ্রয় একটির পর একটি যখন তার আয়ত্তের বাইরে তখন সে তার স্বামীকে কলকাতা থেকে চলে যাবার জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়েছে।

— এ গল্পটি একটি ভালবাসতে চাওয়া ব্যর্থ মেয়ের বেদনাময় কাহিনি। আর নিজের সন্তান বাঁচেনি, তার মাতৃত্ব চরিতার্থতা পায়নি, সে পাশের বাড়ির শিশুটিকেও কোলে নিতে পারেনি। প্রকৃতিতে সে ভালবাসে, কিন্তু ব্রাহ্মণ পুরোহিতের অত্যাচার থেকে সে রক্ষা করতে পারেনি গোলকচাঁপার গাছটিকে, — এখান থেকে সে তাই চলে যেতে চেয়েছে। এই গভীর বেদনাবোধ এই রচনাটির আবেদন — যা ক্ষুদ্র রচনাটির গল্পরস হিসেবেই পরিবেশিত।

নামের খেলা — এটিরও গল্পবেদন মুখ্য। ছোট বড়ো সব মানুষই নিজের নাম প্রচার করতে ভালবাসে। ছোট ছেলেটি কানাই যখন তার মামার নামে ছাপা বইগুলো অসংখ্য তার বাড়িতে দেখলো তখন থেকে তারও নিজের নাম প্রচার করা ইচ্ছে। সে ইস্কুলের পাশের ছাপাখানার থেকে নিজের নামের কয়েকটা ছোটবড়ো সীসের অক্ষর জুটিয়ে এনে তাতে কালি লাগিয়ে যে বই পাচ্ছে তারউপর নিজের নাম ছাপাচ্ছে মামার ছিল মাত্র তিনটে বইতে নাম, ভাগনের নাম উঠল পঁচিশটা বইতে। ভাগনের এই খেলা মামার মনে রাগ তৈরী করেছে। হয়তো এই নামের খেলার মধ্যে যে নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পেয়েছে সেটায় মামা নিজের নামের মোহের কথা ভাবেননি। মামা কানাইয়ের প্রতি রূঢ়তাবশতঃ নামের অক্ষরগুলি কেড়ে নিলেন। কানাই যত কাঁদতে লাগল- ক্ষীরের পুলি কিংবা রেলগাড়ি কোনো কিছুতেই সে শান্ত হোল না।

এদিকে মামা চেয়েছিলেন তাঁর নিজের লেখা নাটক শহরে মঞ্চস্থ করা যাবে -তাঁর বন্ধু এ প্রস্তাব নিয়ে শহরে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন - থিয়েটারের ওরা রাজী হন না। মামা একেবারে সর্বস্ব দিয়ে পণ করে বসলেন যে যেভাবে পারেন থিয়েটার খুলবেনই। মনে মনে স্পষ্ট দেখতে লাগলেন যে ''রাস্তায় গলিতে গলিতে তার নিজের নামে আর নাটকের নামে যেন শহরের গায়ে উল্কি পরিয়ে দিয়েছে।''

মামা আর ভাগনে প্রাপ্তবয়স্ক এবং বালক দুজনকেই আকর্ষণ করেছে নাম প্রতিষ্ঠা- 'নামের খেলা' এর ভিতর দিয়ে রচয়িতা নামমোহগ্রস্ত ব্যক্তির স্বরূপকেই কৌতুকস্নিগ্ধ করে দেখিয়েছেন।

গল্পরস এই রচনাগুলিতে প্রাধান্য পেয়েছে, একথা মেনে নেওয়া যায় নিঃসন্দেহে।

রাজপুত্তুর, উপসংহার, সিদ্ধি, মুক্তি, পরীর পরিচয়, প্রথম চিঠি, সুয়োরানীর সাধ প্রভৃতি রচনাগুলিতে গল্পরসের পরিপূর্ণতা আছে, অথচ বচনাতীতের অনুভব। কাহিনি বীজ রয়েছে এই রচনাগুলির মধ্যে কোথাও রূপকথার আদল, কোথাও উপন্যাসের সুপ্ত সম্ভাবনা তবু পৃথক রচনা হিসেবে রস পরিবেশনের পূর্ণতায় বিশিষ্ট হয়েছে। গদ্য কবিতা ধীরে ধীরে অতি ছোট ছোট গল্প বা 'গল্পস্বল্প' হয়ে সার্থকতা পেয়েছে।

৪.৩.১১.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'লিপিকা'র অন্তত তিনটি রচনা অবলম্বনে দেখাও সেগুলিকে ছোটগল্পের পর্যায়ভুক্ত করা যায় কিনা।

২। 'তোতাকাহিনি' ও ঘোড়ায় যথাক্রমে সমকালীন শিক্ষা সমাজ-অভিঘাতের যে ছায়াচিহ্ন ধরা আছে আলোচনায় তা স্পষ্ট করো।

৩। লিপিকার গদ্যকবিতার ছন্দ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪। লিপিকার আখ্যানধর্মী কথিকাগুলিতে লেখকের যে সমাজ ভাবনার পরিচয় আছে - পঠিত রচনাগুলি অবলম্বনে মন্তব্যটি প্রতিষ্ঠিত করো।

৫। লিপিকার আখ্যানধর্মী কথিকাগুলিতে লেককের যে সমাজ ভাবনার পরিচয় আছে - পঠিত রচনাগুলি অবলম্বনে মন্তব্যটি প্রতিষ্ঠিত করো।

৬। লিপিকার কোনো একটি রচনার ভাববস্তু ও শিল্পরীতি সম্পর্কে আলোচনা করো।

৭। লিপিকার কয়েকটি রচনা ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত - উপযুক্ত উদ্ধৃতিযোগে মন্তব্যটি প্রতিষ্ঠা করো।

৮। ''লিপিকা (১৩২৯) রবীন্দ্রাথের একখানি দেসরহীন অসাধারণ গদ্য গ্রন্থ'' -রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি ধারায় লিপিকা কোন্ অর্থে কেন 'লিপিকা' দোসরহীন। তার অভিনব শিল্প প্রকরণ সম্পর্কে আলোচন করে গ্রন্থটির গোত্র নির্ণয় করো।

৯। গ্রন্থকার 'লিপিকা'কে তিনটি পর্বে ভাগ করে উপস্থাপিত করেছেন। এই বিভাজন কতটা যুক্তিসঙ্গত হয়েছে তা নিজের ভাষায় আলোচনা করো।

১০। 'লিপিকা'র কয়েকটি রচনা রূপকথার ছাঁদে লেখা - দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করো।

৪.৩.১১.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

২। রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ — তপোব্রত ঘোষ।

৩। রবীন্দ্র ছোটগল্পের প্রকরণ শিল্প — গোপিকানাথ রায়চৌধুরী।

৪। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প — প্রমথনাথ বিশি

পর্যায় গ্রন্থ - ৩
একক - ১২
তৃতীয়পর্ব : সমাজ সচেতন ব্যঙ্গ রূপক

বিন্যাস ক্রম :

৪.৩.১২.১ : তৃতীয়পর্ব : সমাজ সচেতন ব্যঙ্গ রূপক

৪.৩.১২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.৩.১২.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪.৩.১২.১ : তৃতীয়পর্ব : সমাজ সচেতন ব্যঙ্গ রূপক

লিপিকার তৃতীয় পর্বের প্রথম তিনটি রচনায় সমাজ সচেতন লেখকের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ লক্ষণীয়। ব্যঙ্গ থাকলেও এই রচনাগুলি সরস, কোথায় কোনও তীব্রতা অনুভূত হয় না, বরং বৈদগ্ধ ও বাক্‌চাতুর্য নির্ভর ব্যঙ্গের সূক্ষ্মতা অত্যন্ত প্রশংসনীয় হয়েছে। তোতাকাহিনি ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের আবাল্য সঞ্চিত বিদ্যালয় সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা ও তাঁর গৃহেও পঠন পাঠনের আয়োজন তাঁকে প্রচলিত ব্যবস্থার বিরোধী করে তুলেছে। এই প্রচলিত ব্যবস্থার বিকল্প ব্যবস্থার অনুসন্ধান করেছেন তিনি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে। আর সাহিত্যিক সত্তায় সমকালীন শিক্ষানীতির বিরোধীতা করেছেন - 'তোতাকাহিনি' রচনা করে। যা একালেও সমানভাবেই প্রাসঙ্গিক। 'তোতাকাহিনি' লিপিকার একমাত্র রচনা যা সাধুভাষায় রচিত। শিক্ষাব্যবস্থার স্থূলতা ও অসারতা দেখান এবং রাজা শিক্ষাব্যবস্থার ভণ্ডামিকে প্রকট করাই এর উদ্দেশ্য তাই এই সাধুভাষার ব্যবহার। 'তোতাকাহিনি' তোতাকে শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা— সেজন্য প্রথমে একটি শক্ত খাঁচা তৈরী, এরপরে স্যাকরাকে দিয়ে দামী সোনার খাঁচা বানানো, এর পরে পণ্ডিতেরা, পুঁথি লেখকেরা পাখির পাঠ্য তৈরী করলেন, রাজা ভাগিনারা খবরদারি করে, খাঁচাটার মেরামত পালিশ লেগেই থাকে, খাঁচায় দানা-পানি নেই, কেবল রাশি পুঁথির পাতা ছিঁড়ে কলমের ডগা দিয়ে পাখির মুখে ঠাসা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে পাখিটি কেবল ডানা ঝটপট করে, সকাল বেলার আলোর দিকে চায় — এরই শিক্ষার এত আয়োজন অকৃতজ্ঞের মতো ব্যর্থ করে পাখিটি মরে গেল। রাজার ভাগিনা বলল, ''পাখিটির শিক্ষা পুরো হইয়াছে। পুরোদস্তুর সমারোহময় পঠন পাঠন পদ্ধতিটি সে স্বাভাবিক প্রাণশক্তির বিরোধী, এবং প্রাণের গতিকে রুদ্ধ করে শিক্ষা সম্ভব নয় এই স্বাভাবিক সত্যটাই সমাজের গণ্যমান্যদের বিশেষ করে যাঁরা শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত তাঁদের বিশেষভাবে অনুধ্যেয়। ব্যঙ্গরূপক গল্প হিসেবে তোতাকাহিনি অসামান্য শিল্প সার্থকতা পেয়েছে।

'কর্তার ভূত'- বিচার বিবেচনাকে বাদ দিয়ে যে ইহবিমুখতাকে ভারত ঐতিহ্য হিসেবে গ্রহণ করে চিরকাল গর্ব করে এবং পরবর্তী প্রজন্মের উপর চাপিয়ে দেয় এটাই সেই 'ঘুম', জাগরণের চেয়েও যা প্রাচীনতম। ''মানুষের মৃত্যু আছে, ভূতের তো মৃত্যু নেই।'' ... তাই 'দেশশুদ্ধ লোক ভূতগ্রস্ত হয়ে চোখ বুজে চলে।'' সমকালীন ভারতীয়দের এই ভূতগ্রস্ততাই লেখকের বিদ্রুপের বিষয় হয়েছে।

'ঘোড়া'- সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা নানা বৈচিত্র্য দিয়ে নানা জীবের সৃষ্টি করেন সে অনুযায়ী জীবেনর গুণাবলীও পৃথক হয়। ঘোড়া তৈরী হোল মরু আর ব্যোম দিয়ে। অর্থাৎ শূন্যতা ও বায়ু হল তার প্রধান উপাদান। ঘোড়াকে দৌড়বার জন্য দিলে অবারিত মাঠ। কিন্তু মানুষের তার গতিকে নিজেদের কাজে লাগাবে বলে তাকে ছোট জায়গায় বেঁধে, তার সামনের পা দুটো আটকে রাখল। ঘোড়া তার নিজস্ব চলন হারিয়ে মানুষের ক্রীতদাস হয়ে রইল। এই

ঘোড়াকে নিয়েই মানুষ তার উন্নতির জয়রথ নিয়ে অগ্রসরমান। মানুষের স্বার্থপরতা, বিবেকহীনতা এবং নির্মমতাই উদঘাটিত হয়েছে এই রচনায়। ভারতে ইংরেজ শাসন ও অবদমন নিপীড়ন যেন ঘোড়া রচনাটির মধ্যে বিশিষ্টতা পেয়েছে। এই ব্যঙ্গরূপক রচনায় লিপিকার বৈচিত্রময় সম্পূর্ণতা, প্রকাশিত হয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়টি মিশ্র আবেদনের রচনায় সজ্জিত। রূপকথা থেকে গদ্যকবিতা, স্বল্পগল্প এসব মিলিয়েই লিপিকা বাংলা গদ্যকবিতার পরিসরকে অনেক প্রসারিত করেছে।

৪.৩.১২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। ‘লিপিকা’র অন্তত তিনটি রচনা অবলম্বনে দেখাও সেগুলিকে ছোটগল্পের পর্যায়ভুক্ত করা যায় কিনা।

২। ‘তোতাকাহিনি’ ও ঘোড়ায় যথাক্রমে সমকালীন শিক্ষা সমাজ-অভিঘাতের যে ছায়াচিহ্ন ধরা আছে আলোচনায় তা স্পষ্ট করো।

৩। লিপিকার গদ্যকবিতার ছন্দ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪। লিপিকার আখ্যানধর্মী কথিকাগুলিতে লেখকের যে সমাজ ভাবনার পরিচয় আছে - পঠিত রচনাগুলি অবলম্বনে মন্তব্যটি প্রতিষ্ঠিত করো।

৫। লিপিকার আখ্যানধর্মী কথিকাগুলিতে লেককের যে সমাজ ভাবনার পরিচয় আছে - পঠিত রচনাগুলি অবলম্বনে মন্তব্যটি প্রতিষ্ঠিত করো।

৬। লিপিকার কোনো একটি রচনার ভাববস্তু ও শিল্পরীতি সম্পর্কে আলোচনা করো।

৭। লিপিকার কয়েকটি রচনা ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত - উপযুক্ত উদ্ধৃতিযোগে মন্তব্যটি প্রতিষ্ঠা করো।

৮। “লিপিকা (১৩২৯) রবীন্দ্রাথের একখানি দেসরহীন অসাধারণ গদ্য গ্রন্থ” -রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি ধারায় লিপিকা কোন্ অর্থে কেন ‘লিপিকা’ দোসরহীন। তার অভিনব শিল্প প্রকরণ সম্পর্কে আলোচন করে গ্রন্থটির গোত্র নির্ণয় করো।

৯। গ্রন্থকার ‘লিপিকা’কে তিনটি পর্বে ভাগ করে উপস্থাপিত করেছেন। এই বিভাজন কতটা যুক্তিসঙ্গত হয়েছে তা নিজের ভাষায় আলোচনা করো।

১০। ‘লিপিকা’র কয়েকটি রচনা রূপকথার ছাঁদে লেখা - দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করো।

৪.৩.১২.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

২। রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ — তপোব্রত ঘোষ।

৩। রবীন্দ্র ছোটগল্পের প্রকরণ শিল্প — গোপিকানাথ রায়চৌধুরী।

৪। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প — প্রমথনাথ বিশি

চতুর্থ পত্র

বিশেষ পত্র : রবীন্দ্রসাহিত্য

মালঞ্চ

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

একক - ১৩

মালঞ্চ উপন্যাসের বিষয় সংক্ষেপ

বিন্যাস ক্রম :

৪.৪.১৩.১ : ভূমিকা

৪.৪.১৩.২ : পটভূমি

৪.৪.১৩.৩ : বিষয় সংক্ষেপ

৪.৪.১৩.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.৪.১৩.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪.৪.১৩.১ : ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-রচনাপর্বের পরিণত সৃষ্টিগুলি গুণমানে ও উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন যে সময়ে, সেটি স্রষ্টার জীবনের মধ্যপর্ব বলা চলে। ‘গোরা’ বা ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসের সামগ্রিকতা, নিটোলত্ব কিম্বা আবেদনসমৃদ্ধি তার পরবর্তীকালে রচিত উপন্যাসসমূহে একই মহত্ব নিয়ে ঘনসংবদ্ধ হতে পারেনি। তবুও অন্তিম পর্বের রচনা শেষের কবিতা, দুইবোন, মালঞ্চ ও চার অধ্যায় বিভিন্ন মাত্রায় বাঙালী পাঠকের মনোযোগ তথা হৃদয় জয় করে নিয়েছে।

কবি জীবনের ঐশ্বর্যপর্বে নারীসম্পর্কিত একটি বিশেষ ভাবনা তথা দর্শনকে অনুভূতিবেদ্য রূপদান করতে দেখা গেছে বিভিন্ন কবিতায়। বিশেষত বিজয়িনী ও উর্বশী কবিতায় নারীর আর তত্ত্বের অপূর্ব সৌন্দর্যময় অভিব্যক্তি রবীন্দ্রবাক্য-তাত্ত্বিকদের বহু আলোচিত একটি বিষয়। কবিতায় যা সূক্ষ্ম কোমল অনুভব - যাকে নানা ছন্দে ঝংকৃত ও নানা সাজে অলংকৃত করে ভাবব্যঞ্জনা সঞ্চার করতে পারলেই কবির সার্থকতা। সেই একই বিষয়কে যদি কথাশিল্পের আঙিনায় আহ্বান করা যায় — তখন বাস্তবের কঠিন-জটিল মাটিতে শত সংঘাত-সংকটের মধ্যে তাকে বুনে দেবার আয়োজন করতে হয় কথাশিল্পীকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অল্পকালের ব্যবধানে লেখা দুটি ছোট উপন্যাসে নারীভাব সম্পর্কিত পূর্বতন কল্পনাকে নতুন আকারে উপস্থাপিত করলেন।

‘দুই বোন’ ও ‘মালঞ্চ’ তাঁর সৃষ্ট সেই উপন্যাস, যা হয়ে উঠেছে সেই তত্ত্বচিন্তার বাহন। “ মেয়েরা দুই জাতের, কোনো কোনো পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি। এক জাত প্রধানত মা, আর - এক জাত প্রিয়া।

ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বর্ষাঋতু। জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, ঊর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব।

আর প্রিয়া বসন্তঋতু। গভীর তার রহস্য, তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায়, যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে, ঝংকারের অপেক্ষায়, যে-ঝংকার বেজে বেজে ওঠে সর্বদেহে মনে অর্নিবচনীয়ের বাণী।'' ['দুই বোন' উপন্যাসের প্রথম অংশ-লেখনের জবানীতে]

৪.৪.১৩.২ : পটভূমি

গদ্যকবিতার ছন্দে যখন পুনশ্চ শেষ সপ্তক বা শ্যামলীর মত কাব্য রচনা করে রবীন্দ্রনাথ কাব্যের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিলেন, কবিতায় গল্পাভাস থাকাতে অন্যতর উৎসুক্য সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল তাঁর এই শ্রেণীর কবিতা। এরই সঙ্গে কবির 'গল্পের বৃহত্তর ক্ষেত্রে গল্প বলিবার ইচ্ছা রূপ পাইল ....'। তার প্রমাণ 'দুই বোন' ও 'মালঞ্চ' নামে ১৯৩৩ ও ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত উপন্যাসের ক্ষুদ্র রূপ - বই দুটি। দুটি রচনাই বিচিত্রা-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। আরও একটি বিষয়ে এদের মিল আছে। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্কিত বৈধতার বাইরে তথাকথিত 'প্রেম' এ আবির্ভাব; তার আকর্ষণে শান্তিময় ঘরোয়া জীবনছবি ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে যাবার সাহসী রূপায়ণ দুটি উপন্যাসেরই বিষয়। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণে বিষয়টি স্পষ্ট হয় - কবি 'প্রেম' ও 'ভালোবাসা'র মধ্যে সূক্ষ্ম রেখা টানিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার বাহিরে সামাজিকভবে নিঃসম্পৃক্ত নরনারীর আকর্ষণজনিত প্রেমেরও ক্ষেত্র আছে। সে প্রেম-দেহসম্বন্ধ -নিরপেক্ষ .... একই পুরুষের সঙ্গে দুইজন নারীর প্রতি প্রেম কী সমাজে কী সাহিত্যে দুর্লভ নহে। কিন্তু সার্থক দাম্পত্যজীবনের দান-প্রতিদান যে বড় একটা অঙ্গ, সে -কথা অস্বীকৃতি বা বিস্মৃতি হইতেই সমাজবন্ধনের সমস্যা। নিঃস্বার্থ প্রেম দেবতা বা মহামানবে সম্ভব হইলেও হইতে পারে, জৈব ও প্রাকৃত জগতে তাহার স্থান অত্যন্ত সংকীর্ণ ও ক্ষণস্থায়ী।'

'মালঞ্চ' উপন্যাসে স্বামী-স্ত্রীর সুখের সংসারে দাম্পত্য-সম্পর্কের মধ্যে আকস্মিকভাবে এসে পড়েছে অযাচিত সংকট। রবীন্দ্রনাথ এমন সংকটের কথা 'চোখের বালি', 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে-বাইরে'তে বিভিন্ন প্রেক্ষিত-সহযোগে উপস্থিত করেছেন। 'চোখের বালি'-তে মহেন্দ্রর লোভ ও কামনা, 'চতুরঙ্গে' দামিনীর নারীত্বচেতনা, আত্মবোধ, নবীনের ভ্রষ্টাচার, এবং ঘরে-বাইরে'তে বিমলার আত্মোপলব্ধির ইতিহাসে দাম্পত্যবৃত্তের মধ্যে অসংলগ্ন অনুপ্রবেশই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ভারসাম্যকে টলিয়ে দিয়েছে। এক মনস্তত্ত্বের ভাষায় যাই বলা হোক না কেন, সামাজিক রীতিনীতির দিক থেকে তা অবৈধ ও নিন্দনীয়।তবুও বাস্তব সংসারে এমন অনভিপ্রেত সম্পর্ক গড়ে ওঠে বলেই জীবনের রূপকার তাকে অগ্রাহ্য করে শিল্পলোকের বাইরে ফেলে রাখতে পারেন না। নিষিদ্ধ প্রেম সমস্ত বড় সাহিত্যিকের সৃষ্টিতে যথাযোগ্য ভূমিকা নিয়ে হাজির থেকেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল তার উত্তম দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর উত্তরসূরী বাংলা সাহিত্যের কথাকারদের লেখায় বিষয়টি নানা স্তরে ও মাত্রায় অভিনব দিক্‌চিহ্ন স্থাপন করে জীবনবাস্তবতারই স্বাক্ষর রেখে গেছে।

৪.৪.১৩.৩ : বিষয় সংক্ষেপ

মালঞ্চ-উপন্যাসে আছে সংখ্যাচিহ্নিত দশটি পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদে অসুস্থ ও অবসন্ন নীরজার কথা। তারই স্মৃতির সূত্র বেয়ে উপন্যাসের প্রেক্ষাপটটিকে জেনে নেবার সুযোগ পাওয়া যায়। নীরজার স্বামী আদিত্য ফুলের ব্যবসায় নাম করেছিল। তার বিস্তৃত বাগানে বিভিন্ন ঋতুর ফুল ও ফলে গাছের বৈচিত্র্য, আছে জানা-অজানা সেই পুষ্প- পত্ররাজির পর্যাপ্ত সম্ভার, একটি স্বচ্ছ গভীর জলে-ভরা ঝিল। দশ বছর আগে আদিত্যর

সাথে বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই নীরজা আদিত্যের বাগানটিকেও পরম মমতায় আপন করে নিয়েছে। তাদের দুজনের মিলিত পরিচর্যায় বাগানের সৌন্দর্য, ব্যবসায়িক সমৃদ্ধি যেমন বিকশিত হয়েচে, তেমনি দাম্পত্যটিও পূর্ণতায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। 'বিবাহের পর দশটা বছর চলে গেল অবিমিশ্র সুখে'। এর পরে এল প্রথম আঘাত। 'দুর্গের প্রাচীরে প্রথম ছিদ্রে'র মতো তাদের প্রিয় সারমেয় ডলির মৃত্যু নীরজার কাছে দুর্লক্ষণের বার্তাবহ বলে মনে হলো। তারপর নীরজার মাতৃত্বকামনা সফল করতে ঘটলো তার সন্তান সম্ভাবনা। কিন্তু তাদের প্রত্যাশায় নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ হেনে নীরজার প্রাণরক্ষা করতে গিয়ে তাদের সন্তানকে বলি দিতে হল। 'তারপর থেকে নীরজা আর উঠতে পারলে না। বালুশয্যাশায়িনী বৈশাখের নদীর মতো তার স্বল্পরক্ত দেহে ক্লান্ত হয়ে রইল পড়ে।' বাগানের কাজে নিজেকে বিকীর্ণ করাতে যেমন সুখ ছিল, তেমনই আনন্দ ছিল স্বামীর যথার্থ সহধর্মিণীর মতো তার পাশে থেকে বাগানের পরিচর্যায়। আকস্মিক দুর্ভাগ্যে নীরজা সেখান থেকে স্খলিত হয়ে পড়ে' অসহায় একাকীত্ব জর্জরিত। তারই সঙ্গে নতুন এক আশঙ্কা তাকে বিহ্বল করে তুলল তখন, 'যখন দেখলে বাগানের কাজে সহযোগিতার জন্যে আদিত্যের দূরসম্পর্কীয় বোন সরলাকে আনাতে হয়েছে। নীরজা তার স্বামী এবং উদ্যানের ওপর এতদিন ধরে অখণ্ড অধিকার ভোগ ও প্রয়োগ করে এসেছে রাজেন্দ্রাণীর মতো। তারই আনন্দ তার মনের মধ্যে অবিরত গুঞ্জরিত হয়ে চলেছিল - তার কথায় - কাজে-আচারে-ব্যবহারে তাই বিকিরিত হয়েছে পুলকে ও মাধুর্যরসে। সেখানে, নীরজা নিজেই বুঝতে পারে আজ এক অমোঘ কীটের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। নিজের শরীর, নিজের মনটাই তার নিজের কাছে অচেনা বলে মনে হয়। পরিপার্শ্বের বিপাকে সে যেন আজ 'বাদুড়ের চঞ্চুক্ষত ফলের মতো, ভদ্র-প্রয়োজনের অযোগ্য'। নিজের কাছেই নিজের এমন অচেনা অস্তিত্বটি পাছে তার স্বামীর কাছে ধরা পড়ে যায়, এই লজ্জা ও আশংকার সে সঙ্কুচিত হতে থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নীরজার সঙ্গী তার বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে আসা আয়া রোশ্‌নি। রোশইনি নীরজাকে মানুষ করেছে। তাই সমস্ত ব্যাপারেই নীরজার প্রতি তার সমর্থন। আর নিঃসঙ্গ, কর্মহীন নীরজা মানসিক আদান প্রদানের অনুপযুক্ত জেনেও রোশ্‌নিকে ডেকে কথা বলে, সান্ত্বনা খোঁজে তারই মধ্যে দিয়ে। সেই আলাপনে যেমন আদিত্যর কাজকর্ম গতিবিধির তত্ত্ব নেওয়া থাকে, তেমনি থাকে বাগানের বিষয়ে খোঁজখবর নেবার পালা। আর সর্বোপরি, সরলার কাজে বাগানের যত্নে কতটা ঘাটতি পড়ছে তাতে দুজনে সহমত হয়। সরলার চেয়ে হলামালীর দক্ষতা নীরজার কাছে স্বীকৃত। রোশনিকে দিয়েও কবুল করাতে চায় সেই কথাই।

এই পরিচ্ছেদেই সরলাকে দেখতে পাওয়া যায় নীরজার ঘরে। কিন্তু একটি অনভিপ্রেত কাজের দায়িত্ব নিয়ে ঘরে ঢোকে সে। আদিত্য প্রতিদিন সকালে তার স্ত্রীর জন্য বাগানের সেরা ফুলটি সংগ্রহ করে তার সঙ্গে দেখা করতে আসত। সেদিন নীরজা নিদ্রিত থাকায় আদিত্য জরুরী কাজে বেরিয়ে গেছে। তার স্বামীকৃত্যটি সরলাকে পালন করার দায়িত্ব দিয়ে গেছে সে। নীরজা সরলার মারফৎ পাঠানো অবজ্ঞা ও তিরস্কাররূপে বর্ষিত হয়। বিশ্বসংসারে পিছিয়ে-পড়া নীরজার কাছে স্বামীর যেটুকু মনোযোগ ও আদর ফুলের উপহার হয়ে আসত, তা তো আজ 'গঙ্গার জল হলেও নলের ভিতর দিয়ে' আসার মতো। নীরজার ভর্ৎসনা মেনে নিয়ে সরলা 'রাগ করতে পারত কিন্তু রাগ করলে না। সে বোঝে বউদিদির বুকের ভিতরটা টনটন করছে। নিঃসন্তান মায়ের সমস্ত হৃদয় জুড়েছে যে বাগান, দশ বছর পরে আজ এত কাছে আছে, তবু এই বাগানের থেকে নির্বাসন।''

তৃতীয় পরিচ্ছেদে আদিত্যর ভাই রমেনের সঙ্গে নীরজার কথোপকথন। নীরজার আত্যন্তিক আগ্রহ, সে রমেনকে রাজি করায় সরলাকে বিয়ে করতে। কিন্তু রমেন ঠাট্টা-তামাশার ছলে সে কথা এড়িয়ে যায়। সরলার সঙ্গে সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্কে সে সাবলীলভাবে মিশতে পারে। কেননা রমেনই এই উপন্যাসে সেই বোদ্ধা মানুষ - বাকি তিনজন, অর্থাৎ দুটি নারী ও একটি পুরুষ-চরিত্রের ভেতরে গড়ে-ওঠা আবর্ত ও

জটিলতাকে যে অনুধাবন করতে পেরেছে। প্রত্যেকের অনুভবকে মূল্য দিয়ে রমেন তার সমাধানের চেষ্টাও করে গেছে নিজের সাধ্যমতো।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে নীরজার ঘরে এসেছে আদিত্য। উপন্যাসেও এখানেই তার প্রথম প্রবেশ। আদিত্যকে প্রথম দর্শনে স্ত্রীর প্রতি আনুগত্যে, কর্তব্য পরায়ণতায় এবং সর্ব্বৈ মনোরঞ্জনে একজন আদর্শ স্বামী বলেই মনে হয়। কিন্তু 'ভয়'-পাওয়া কমপ্লেক্স-পীড়িত নীরজা সরলার প্রসঙ্গ টেনে আনে বারবার। আদিত্য শোনায় তার ছেলেবেলা এবং বড় হয়ে ওঠার কাহিনি। একই ব্যক্তি আদিত্যর মেসোমশাই আর সরলার জ্যেঠামশাই ছিলেন দুটি অপরিণত অনাথ ছেলেমেয়েদের অভিভাবক। আদিত্য, আজ স্বাবলম্বী, নিজের বাগানের ব্যবসায় সফল। কিন্তু সরলার জ্যেঠামশাই মারা গেলেন যখন, তার আগেই তাঁর বাগান দেনায় বিকিয়ে গিয়েছিল। আজ সরলা তাই নিজের ভারে নিজেই পীড়িতা। কিন্তু আশ্চর্য আত্মসংযম নিয়ে সে যথাকর্তব্য করে যায়। সরলার প্রতি সহানুভূতি এবং তার সম্পর্কে আদিত্যের প্রশংসাবাক্য শুনে নীরজা সহ্য করতে পারে না। তার বেদনার উৎস সে স্বামীকে নিয়ে সরলার প্রতি ঈর্ষা, এই সত্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। নীরজার আশঙ্কা নীরজারই কথা ও আচরণের মধ্যে দিয়ে আদিত্যের অন্তরের আড়ালে পড়ে থাকা সত্যকে বাইরে বার করে আনে। নীরজার অভিমান-আক্ষেপ-দোষারোপ-কান্নায় 'স্তম্ভিত হয়ে গেল আদিত্য। ঠিক যেন এতদিন স্বপ্নে চলছিল, ঠোকর খেয়ে উঠল চমকে'। তখনই তার স্মৃতিতে জেগে উঠল সুস্থ থাকাকালে নীরজা কতভাবেই না অপদস্ত করতে চেয়েছে সরলাকে। আদিত্যর কাছে বাগান সম্পর্কে তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় সরলাকে ছাপিয়ে যাবার কথা জানান দিয়েছে নানাভাবে। এ এক ধরনের হীনমন্যতা আর অবশ্যই অসূয়াগ্রস্ত মানসিকতারই প্রমাণ দেয়। শেষ পর্যন্ত দুর্বল দেহে-মনে সব প্রতিরোধ ভেঙে নীরজা আদিত্যকে জানায় তার মুক্তকণ্ঠের নালিশ - 'আমি হলে একটার জায়গায় দশটা মালী রাখতুম কিন্তু আসতে দিতুম না আর কোনো মেয়েকে .... এমনটা কেন হতে পারল, বলব? ... তুমি আমার চেয়ে ওকে ভালোবাসো বলে। এতদিন সেকথা লুকিয়ে রেখেছিএল।' আদিত্য কিছুক্ষণ কথা খুঁজে পায় না। তারপর তাদের দশবছরের দীর্ঘ মিলিত বিবাহিত জীবন স্মরণ করিয়ে দেয়। আদিত্য নীরজার উত্তেজনা প্রশমনে জন্যই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে যায়। নীরজা ডেকে না পাঠালে তার অসুস্থ শরীর মনের ওপর উপদ্রব করতে তার কাছে আর আসবে না — এটা আদিত্যের সিদ্ধান্ত। উপন্যাসের মূল সমস্যা উত্থাপিত হয়েছে এখানে এসে। নীরজার মনে যা চাপা-ঢাকা দেওয়া ছিল- তা প্রকাশ হয়ে যেতেই সংসারের এবং সম্পর্কের ভারসাম্য বিচলিত হয়ে পড়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদের প্রেক্ষাপট রাত্রিকালীন দীঘির জলের ধারে ঘাটের বেদি। বেদির ওপরে সরলা। রমেন তার সহজাত বাচনিক দক্ষতা নিয়ে সরলার সঙ্গে কথা বলে। সরলার মনে যে অশান্তির ঝড় উঠেছে তার মধ্যে একদিকে আছে নীরজার সংসারে এসেছে তার জন্য অপরাধবোধ। কেননা নীরজার আচরণে সরলার প্রতি বিদ্বেষ গোপন থাকেনি। অন্যদিকে, আদিত্য যে জটিল পরিস্থিতিতে পড়ে কষ্ট পাচ্ছে, সরলা তার জন্য মনে-মনে নিজেকেই দায়ী করছে। এইসব ভাবনা ও বেদনার কথা খুলে বলার উপযুক্ত মানুষ রমেন। তাকেই সরলা নিজের পূর্বজীবনের কথা, আদিত্যর ও তার সহজ দুই-ভাইয়ের মতো বেড়ে ওঠার কথা বলেছে। সাম্প্রতিকালে নীরজার 'বিরাগের আগুনের আভায়' নিজের অন্তরলোক কীভাবে নিজের কাছে ধরা পড়েছে তাও বলতে পেরে তার হৃদয় কিছুটা হালকা হয়েছে। বউদির প্রতি সে অন্যায় করেছে - এমন চিন্তা রমেন প্রতিবাদ করে উড়িয়ে দিয়েছে - '' দেখো সরলা, আমি মানিনে ওসব পুঁথির কথা। দাবির হিসেব বিচার করবে কোন্ সততা দিয়ে। তোমাদের মিলন কতকালের, তখন কোথায় ছিল বউদি।'' সরলা যদিও জটিল পরিস্থিতি থেকে মুক্তির আর কোনো রাস্তা দেখতে না পেয়ে স্বদেশী রমেনের কাছে জানতে চেয়েছিল জেলে যাবার উপায় কি! সেই কথা থেকে তার অন্তরটি যখন মেলে ধরেছে, রমেন সরলা ও আদিত্যর আবেগ-অনুরাগকে অস্বীকার্য মনে

করল না। এমন সময় আদিত্য সেখানে প্রবেশ করেছে। নীরজার ডাকে রমেন গেছে তার কাছে। সরলা ও আদিত্য নিজেদের মুখোমুখি কখনো হয়নি এমন অকপট সত্যকে সামনে রেখে। উন্মোচিত এই সত্য তাদেরকে বিচ্ছিন্ন না করে ছাড়বে না কোনোমতেই। আদিত্য বলে '' তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে এ আমি ঘটতে দেব না, দেব না। এ অন্যায়, এ নিষ্ঠুর অন্যায়।'' সরলা তার বিবাহসম্বন্ধগুলি একসময় যেন ফিরিয়ে দিয়েছিল আজ আদিত্য তার ব্যাখ্যা খুঁজে পায়। তাদের ভেতরের অনুক্ত সম্বন্ধের স্বরূপ আদিত্যর মনে জেগে উঠেছে নীরজার ঈর্ষার ঘা খেয়ে। 'ভালোবাসি তোমাকে, একথা আজ এত সহজ করে সত্য বলতে পারছি এতে আমার বুক ভরে উঠেছে। তেইশ বছর যা ছিল কুঁড়িতে, আজ দৈবের কৃপায় তা ফুটে উঠেছে। আমি বলছি, তাকে চাপা দিতে গেলে সে হবে ভীরুতা, সে হবে অধর্ম।' পুরুষের নবাবিষ্কৃত এই প্রেমাবেগ সরলার স্থৈর্য এবং সহনশীলতায় বাধা মানতে চায় না। তবুও ব্যথিতহৃদয়ে নিরুপায় আদিত্য বাধ্য হয় এই পরিস্থিতিতে নিরুদ্যমভাবে মেনে নিতে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নীরজার আহ্বানে একাধারে তার দেবর এবং সখা এসেছে - নীরজার মানসিক সঙ্কটে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে রমেনের উপস্থিতি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত চতুর্থ পরিচ্ছেদের শেষে আদিত্য যখন নীরজার ঘর ছেড়ে চলে গেছে, তখন নীরজার অনতিক্রম্য বেদনা সে আর কাকেই বা ব্যক্ত করে বোঝাতে পারে রমেন ছাড়া? রমেনকে নীরজা দেখায় তাতে লেখা আদিত্যর চিঠিখানি। যাতে সরলার প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে আদিত্য একচুল সরতে নারাজ - তাতে তার কর্তব্যচ্যুতি ঘটবে। 'তোমার সঙ্গে কথা হবার পর এই প্রশ্নই বার বার মনে আমার উঠেছে, আমিই ওকে আশ্রয় দিয়েছি, না আমাকেই আশ্রয় দিয়েছে সরলা আমার গলগ্রহ।'' সরলার জ্যেঠামশায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতার সূত্রে সরলাকে রক্ষা করতে হবে। নীরজার সঙ্গে তার দেখাশোনা যাতে না হয় তার জন্য প্রয়োজনে অন্য জায়গায় অন্য ব্যবসায় তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সেই অর্থসংগ্রহে 'আমাদের এই বাগানবাড়ি বন্ধক' রাখতেও দ্বিধা নেই আদিত্যর। এই চিঠি পড়ে নীরজা সম্পূর্ণত বুঝতে পেরেছে যে তার ঘর ভেঙে গেছে। রমেন তখন সবচেয়ে বাস্তব অবস্থানে থেকেও আদর্শের কথাটি উচ্চারণ করেছে, নীরজাকে যা পথ দেখাবে আত্মজয়ে — 'যদি যাবার দিন এসেই থাকে, তা হলে যাকে বড়ো করে পেয়েছ, তাকে বড়ো করে ছেড়ে যাও।' তবেই নীরজার সংসারে নীরজার অবশেষের পরেও শ্রদ্ধার আসনে আসীন থাকবে সে। এই ত্যাগের প্রশান্তি, দানের তৃপ্তি নীরজা গ্রহণ করতে চাইল। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজনীয় অনুশীলনটুকুর ধৈর্য সে রাখতে পারে না। আদিত্য ঘরে প্রবেশ করলে নীরজা সরলাকে নিয়ে আসবার অনুরোধ জানায়। আদিত্য সেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়াতে চেয়েও পারেনা। সরলা এল ঘরে। নিজেকে দান করবে বলে নীরজা যে-সংকল্প স্থির করেছিল, তার বনিয়াদ যে কত দুর্বল, তা প্রকাশ গয়ে পড়ল সরলাকে দেওয়া তার উপহারের সঙ্গে তার অভীপ্সায়। সে বলল - সরলা ওই মালাটি যেন নীরজার হয়ে গলায় পরে। কারণ ''বিশেষ বিশেষ দিনে এ মালা কতবার পড়েছি সে তোমার দাদা জানেন। তোমার গলায় থাকলে সে দিনগুলি ওঁর মনে পড়বে।'' এই দেবার প্রস্তুতি যেন প্রহসনে পর্যবসিত হয়েছে। কেননা আত্মঘোষণা ও স্বকীয় প্রতিষ্ঠাকে অক্ষয় করে রাখবার প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নিহিত ছিল না এই দানের মধ্যে। এতে নীরজার দীনতা যেমন প্রকাশ পেল, অন্যদিকে সরলার অসম্মানও প্রকট হয়ে উঠল। এমন পরিস্থিতিতে সরলা নিজের মানসিক অবস্থার কথা অকপটে বলে ফেলল। এতদিন পর্যন্ত তার বিশ্বস্ততা সন্দেহাতীত থাকলেও এখন আর তার মন সেই অবস্থায় নেই। তবে 'ভাগ্য যে দান থেকে আমাকে বঞ্চনা করেছে, কাউকে বঞ্চনা ক'রে সে-দান আমি নেব না।' সরল নিষ্ক্রান্ত হলে অশান্ত অব্যবস্থিতচিত্ত আদিত্যও ঘর ছেড়ে গেল। অপ্রস্তুত এবং হতাশ নীরজা রমেনের কথা থেকে বুঝল যে তার মন মুক্ত হতে পারেনি। ঠিক সুরটি যে তার কথায় ও আচরণে বেজে ওঠেনি একথা বুঝে নীরজার মন অনুশোচনায় হাহাকার করে ওঠে।

সপ্তম পরিচ্ছেদের শুরুতে দৃশ্যান্তরে আদিত্য সরলার সঙ্গী হয়ে বেরিয়ে আসাতে সরলা তার প্রতিবাদ করেছে। ইতিমধ্যে রমেন এসে আদিত্যকে তার স্ত্রীর পরিচর্যায় পাঠিয়ে দেয়। তখন সরলা রমেনকে আত্যন্তিক আনুরোধ জানায় কোনোভাবে ইংরেজ সরকারের বিরোধিতার সূত্র সরলার কারাবাসের ব্যবস্থায় সাহায্য করবার জন্য। এছাড়া আদিত্য-নীরজার পারিবারিক আবহে জমে - থাকা রুদ্ধশ্বাস যন্ত্রণা থেকে মুক্তির থেকে কোনো পথ জানা নেই তার। আদিত্য ফিরে আসে অনতিকালের মধ্যেই। রমেন বেরিয়ে আসে। একই প্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে অষ্টম পরিচ্ছেদ। সরলা তখন নিজের চলে যাবার কথা বলে আদিত্যকে। অনুরোধ করে নীরজার যেকটা দিন পরমায়ু আছে, তারই মধ্যে তার মন থেকে সন্দেহের কাঁটা উপড়ে দেবার জন্য। বলে, 'অমার হয়ে এই ব্রতটি তুমি নাও। দিদির জীবনান্তকালের শেষ কটা দিন দাও তোমার দাক্ষিণ্যে পূর্ণ করে। আদিত্য শর্তসাপেক্ষে রাজি হবে জানায়। সেই শর্তটি বড় নির্মম, বড়োই কঠোর। ''তুমি যা বলছ তা শুনব এবং বিনা ত্রুটিতে পালন করা সম্ভব হবে যদি নিশ্চিন্ত জানি একদিন তুমি পূর্ণ করবে আমার সমস্ত শূন্যতা।''

নবম পরিচ্ছেদে নীরজা আয়ার কাছে খবর পায় সরলা স্বদেশী করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। জেল হয়েছে তার। রমেনেরও সেই একই অবস্থা- সেও কারারুদ্ধ। নীরজা ছট্‌ফট্ করে - তার মনে হয়, সরলার 'বেহায়াগিরির একশেষ, বাগান থেকে আরম্ভ করে জেলখানা পর্যন্ত' — এ সরলার বাহাদুরি-দেখাবার প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু রোশ্‌নির কথায় পরক্ষণেই সে নিজের ভুল বুঝতে পারল। সরলাকে হেয় করার বদলে সে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখল একখানা। জেলে পাঠিয়ে দিল সেই চিঠি। রমেনের উদ্দেশে মনে-মনে প্রণাম জানাল। কেননা তারই দেখানো পথে সে আজ চলতে চাইছে - আত্মত্যাগের মধ্যে থেকেই পেতে চাইছে শান্তি।

অন্তিম পরিচ্ছেদ একটু ঘটনাবহুল। নাটকীয় দ্বন্দ্ব এখানে উত্তাল হয়ে রূপ নিয়েছে। ঘটনাসংঘাত, মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয় দশম পরিচ্ছেদে বিচিত্র জটিলতা ঘনিয়ে তুলে পরিণামমুখী হয়েছে। নীরজার ঘরে আদিত্য স্ত্রীর পরিচর্যা ও শুশ্রূষায় রত। নীরজা স্বামীকে বোঝাতে চায় যে মালী ও মজুর পরিচালনা করে সে রোগশয্যা থেকেও তাদের বাগানের ক্ষয়িষ্ণু চেহারা ফিরিয়ে দেবে। সরলার অনুপস্থিতিতেও বাগান কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। বলতে বলতেই তার অন্তরের বেদনাটি প্রকাশ পেল। ''আদিত্যের হাত হঠাৎ জোর করে চেপে ধরলে, বললে, ''একেবারেই থাকব না, কিচ্ছুই থাকব না? বলো আমাকে... বলো না আমাকে সত্যি করে।'' করুণ আর্তকণ্ঠে সে মিনতি করে '' সরলার উপর অন্যায় করেছি। তোমার পায়ে ধরে বলছি আর অন্যায় করব না। যা হয়েছে, তার জন্যে আমাকে মাপ কোরো। কিন্তু আমাকে ভালোবেসো, ভালোবেসো তুমি, যা চাও আমি সর করব।'' ... ''কাল রাত্রি থেকে বারবার পড় করেছি, এবার দেখা হলে নির্মল মনে ওকে বুকে টেনে নেব আপন বোনের মতো। তুমি আমাকে এই প্রতিজ্ঞা রক্ষায় সাহায্য করো। বলো, আমি তোমার ভলোবাসা থেকে বঞ্চিত হবে না, তাহলে সবাইকে আমার ভালোবাসা দিয়ে তেতে পারব।'' নীরজা কিছুটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে যখন তখন সরলার ছাড়া পাবার খবর আসে। নীরজা রমেনকে স্মরণ করে মন দৃঢ় করে রাখতে চায়, বারবার করে জপমন্ত্র উচ্চারণের মতো বলে, ' দেব দেব দেব, সব দেব।' সরলা ঘরে আসে। সে নীরজার পা ছুঁতেই যেন বিদ্যুৎ স্পর্শ ঘটল। এতক্ষণের সমস্ত প্রস্তুতি ব্যর্থ হয়ে গেল। সর্বশক্তি নিয়ে শেষবারের মত উঠে দাঁড়াল নীরজা দিতে সে পারবে না, কিছুই, 'জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, ...পালা পালা পালা এখনই, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত''- অদ্ভূত গলায় এই শেষ কথাগুলি বলেই মেঝের ওপরে স্তব্ধ হয়ে পড়ে গেল নীরজা।

৪.৪.১৩.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

1 ò›yœMṕv|þ™Ä¡öiC¡îû²Ì,|þŸ „|þœ „|þ“þ

2 ò›yœMṕv|þ™Ä¡öiC¡îû›ç e î «âÄ !î¡ è ÚÝþC,öÇ |þiþ™!î î;“|þ,|þiîyû

3 v|þ™Ä¡ C!Ýþî%þyë ûö²Ç |þ™Ýþ,“þ|Ýþ= î& |þ)™Å

৪.৪.১৩.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১।	বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা	—	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
২।	বাংলা উপন্যাসের কালান্তর	—	সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩।	রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য	—	বুদ্ধদেব বসু
৪।	কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ	—	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
৫।	রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক (৩য় খণ্ড)	—	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
৬।	রবীন্দ্রনাথ	—	সুবোধ সেনগুপ্ত
৭।	রবীন্দ্রমনন	—	রথীন্দ্রনাথ রায়
৮।	রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন	—	অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়
৯।	রবীন্দ্র উপন্যাস-সমীক্ষা	—	সত্যব্রত দে
১০।	রবীন্দ্র উপন্যাস নির্মাণ শিল্প	—	গোপিকানাথ রায়চৌধুরী।

পর্যায় গ্রন্থ - ৪
একক - ১৪
চরিত্র নির্মাণ

বিন্যাস ক্রম :

৪.৪.১৪.১ : নীরজা চরিত্র

৪.৪.১৪.২ : আদিত্য চরিত্র

৪.৪.১৪.৩ : সরলা চরিত্র

৪.৪.১৪.৪ : রমেন ও অন্যান্য চরিত্র

৪.৪.১৪.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.৪.১৪.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪.৪.১৪.১ : নীরজা চরিত্র

‘মালঞ্চ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নীরজা। উপন্যাসের সূচনা রোগশয্যালীন নীরজার বর্ণনায়। তার স্বামী আদিত্যের জীবিকা ও জীবন যে মালঞ্চকে ঘিরে, দশবছরের বিবাহিত জীবন নীরজা সেই বাগানের কাছেই উৎসর্গ করে দিয়েছিল। এতদিন পর এল তার প্রথম সন্তানসম্ভবা। কিন্তু তা অচরিতার্থ থেকে গেল। সন্তানকে বাঁচাো গেল না, সে নিজেও অশক্ত দেহ-মনে শয্যা বন্দী। তার স্মৃতিতে ঘুরে ফিরে আসে দশ বছরের নিষ্কন্টক দাম্পত্যের মধুময় স্মৃতি। স্বামীর সহধর্মিণীরূপে তার সবৈব ভূমিকা থেকে এখন যেন সে পিছিয়ে পড়ছে। এমনই আশঙ্কার মাঝে অন্য মেঘ ঘনিয়ে ওঠে নীরজার মনের আকাশে। তার স্বামীর দূর সম্পর্কের আত্মীয়া, ছোটবেলা থেকে একই অভিভাবকের অবধায়কত্বে বেড়ে-ওঠা সরলা এসেছে আদিত্যের সংসার আর বাগানের সহায়তা করার কাজে আদিত্যেরই আহ্বানে। নীরজার সংকট সরলাকে নিয়ে।

নীরজা-চরিত্রের মূল ভিত্তি প্রেম। তার শ্রমনিষ্ঠা, হাস্য-আলাপনদক্ষ সতেজতা এবং স্বামীসৌভাগ্য তাকে আত্মবিশ্বাসে ভরে রেখেছিল। সেখান থেকে রোগজীর্ণ নিষ্কর্মের মধ্যে নির্বাসন তাকে অসহায় করেছে। সরলার আগমনে সে অক্ষম ঈর্ষায় জর্জরিত হয়েছে। স্বকীয় কর্মোদ্যগ নিয়ে পরিস্থিতি থেকে অব্যাহতি পাবার রাস্তা নেই সে জানে। সেখান থেকেই তার মানসিক আভিজাত্য ও রুচি অবনমিত হয়ে পড়েছে। জ্ঞাতসারে-অজ্ঞাতসারে সরলাকে হেয় করে সে স্বস্তি পেতে চেয়েচে। তার জ্বালা প্রশমিত হয়নি তাতে, আদিত্যকে বিনা প্ররোচনায় তীব্রভাবে অভিযুক্ত করেছে। ফলে যা ছিল সুপ্ত, তাই যেন নীরজার ঈর্ষার ইন্ধন পেয়ে মহাসমারোহে জেগে উঠেছে আদিত্যের হৃদয়ে।

অন্যদিকে, সরলাকে অন্যত্র সংশ্লিষ্ট করার জন্য নীরজা কখনও রমেনের সঙ্গে তার বিবাহ সম্বন্ধ করতে তৎপর হয়েছে, কখনও আদিত্যকে জোর করেছে সরলার বিবাহ দিতে, নয়তো বারাসাতের মেয়ে ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রীর কাজে লাগিয়ে দিতে। এ সমস্তই নীরজার অন্তর্দাহ এবং নিরাপত্তাহীনতাবোধ থেকে জাত। তার উদ্বেগ ও দ্বন্দ্ব সমস্ত উপন্যাসের সঙ্গে বাতাসের মতো জড়িয়ে রয়েছে। তাকে মানসিক শান্তি দেবার চেষ্টা করেছে যে রমেন, সে প্রত্যক্ষ সমস্যায় যুক্ত নয়, কিন্তু আদিত্য-নীরজা-সরলার ত্রিভুজ দ্বন্দ্বজটিলতা বোঝে, সহমর্মিতা দিয়ে। একজন্য হিতৈষী বন্ধুর মতো নীরজার প্রশান্তি আনার জন্য অনুশীলনে সে সহায়তা করে। কিন্তু এই পৃথিবীর সবকিছু ছাড়াও স্বামীপ্রেমের

একতম অধিশ্বরীর পদ নিঃশর্তে চিরকালের মতো ছেড়ে যেতে হবে — এ কিছুতেই মেনে নিতে পারে না নীরজা। তাই সরলাকে তার সব কিছু দিয়ে যাবার জন্য নিজেকে তৈরী করলেও শেষপর্যন্ত নিজেকে উত্তীর্ণ করতে পারে না। তার আত্যন্তিক জীবনকামনা এবং প্রেমাবেগ ত্যাগমন্ত্রের কাছে আশ্বাস পেতে লাভে ব্যর্থ হয়। মালঞ্চের বর্ণালি-সুরভি গভীর জীবনরসের সন্ধান দেয়নি নীরজাকে। যেহেতু প্রাক্-বিবাহ বা বিবাহোত্তর কালেও স্বামী ছাড়া অন্য কোনোও বিশেষ মানবিক সম্পর্কে বাঁধা পড়ার কোনও সংকেতও উপন্যাসে নেই, তাই স্বামীকে এবং স্বামীরই একাংশরূপে মালঞ্চকেও হারাবার বেদনা নীরজার মনপ্রাণকে শূন্যতার হাহাকারে ভরিয়ে তোলে। তার ব্যাকুল বেদনা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তার অনুপস্থিতির দিনগুলির কথা ভেবে —"ঐ বাগানটা সম্ভব আর আমিই হব অসম্ভব, এ হতেই পারে না, কিছুতেই না। সন্ধে বেলায় অমনি করেই অস্পষ্ট আলোয় কাকেরা ফিরবে বাসায়, এমনি করেই দুলবে সুপারি গাছের জাল ঠিক আমারই চোখের সামনে। সেদিন তুমি মনে রেখো আমি আছি, আমি আছি, সমস্ত বাগানময় আমি আছি। মনে কোরো বাতাস যখন তোমার চুল ওড়াচ্ছে, আমার আঙ্গুলের ছোঁয়া আছে তাতে। বলো, মনে করবে?" এইটুকু আশ্বাসের জন্য তার মন উদ্বেলিত— কেননা মৃত্যু আসার আগে থেকেই তার শূন্যস্থান পূর্ণ হয়ে যাবার সংকেত সে পেয়ে গেছে। নীরজার নিগূঢ় জীবনবাসনার এমন ট্রাজিক বৈপরীত্য তার পক্ষে কিছুতেই মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 'এতদিনের সুখের সংসারকে অত করে আঁকড়ে ধরতে (তার) এই নৈরাশ্যের কাঙালপনা'। তার থেকে উদ্ধার পেতে রমেনের পরামর্শ সে মেনে নিতে চায় — 'যাকে বড়ো করে পেয়েছ, তাকে বড়ো করে ছেড়ে যাও।... যা নিজে ভোগ করতে পারবে না, তাও প্রসন্ন মনে দান করতে পার না যাকে এতদিন এত দিয়েছ? - নীরজা তার বাগান-ঘরসংসার-স্বামী সমস্তই স্বেচ্ছায় দেবার জন্য তৈরী হতে চায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই সংকল্প ফলপ্রসূ হয় না। সরলার জন্য অধীর অপেক্ষায় থাকার পর যখন সে আসে তখন নীরজা মানসিক স্থৈর্য রক্ষা করা দূরের কথা - অসম্ভব স্নায়বিক চাপে এক উৎকট প্রতিক্রিয়ায় ফেটে পড়ে। চরম উত্তেজনার ফলে তার মৃত্যু নেমে আসে। রবীন্দ্রসাহিত্যের পক্ষে ব্যতিক্রমী কিন্তু এক জ্বলন্ত বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতার পরিচয় রেখেছে তাঁর পরিণত বয়সের সৃষ্টি নীরজা-চরিত্র। রবীন্দ্রনাথের সর্বাত্মক শুদ্ধসৌন্দর্যবাদ বা শুভদ অধ্যাত্মবিবেক নিয়ে কটাক্ষের উপযুক্ত জবাব রয়েছে নীরজা চরিত্রের মধ্যে, যেমন আছে কবির ভিন্নতর শিল্পমাধ্যম- চিত্রকলার অভিনবত্বে ও অবিস্মরণীয়তায়।

৪.৪.১৪.২ : আদিত্য চরিত্র

'মালঞ্চ' উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্র আদিত্য। সমস্ত কাহিনি ও ঘটনা সংস্থানে আদিত্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকায় তাকে নায়ক বলে আখ্যাত করা যায়। বিবাহিত পুরুষের দাম্পত্যের মাঝে অন্যতর নারীর অনুপ্রবেশ রবীন্দ্র-উপন্যাসে প্রায় প্রথম থেকেই দেখা গেছে। 'চোখের বালি'র মহেন্দ্র বিনোদিনীর প্রতি অধিকার বিস্তার করতে চেয়েছিল। মালঞ্চের অব্যবহিত আগের রচনা 'দুই বোন' - এর শশাঙ্কও তার শ্যালিকা ঊর্মিমালার প্রতি প্রেমানুরাগ ব্যক্ত করেছিল। এই দুই নায়কের মানসিক চাঞ্চল্য, ভারসাম্যহীনতা এবং কর্তব্যচ্যুতির যে পরিচয় রবীন্দ্রনাথ রেখেছেন, আদিত্যকে সেই দলে ফেলা যায় না। সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে তুলনামূলকভাবে আদিত্য বলিষ্ঠতা ও ঋজুতা দ্বারা অন্বিত।

প্রাক্ বিবাহ জীবনের প্রেমানুভব আদিত্য সচেতনভাবে উপলব্ধি করেনি। বিবাহের মধ্যে দিয়ে যে নারীকে সে পেয়েছিল, তাকে স্ত্রী এবং প্রেমিকারূপে সঙ্গে নিয়ে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়ে দিয়েছে বিবাহ-পরবর্তী দশ বছর। নীরজা অসুস্থ হওয়ার ফলে তার ও বাগানের পরিচর্যার ভার নিয়ে যখন সরলার আগমন ঘটেছে তখন থেকেই জটিলতার শুরু। প্রকৃতপক্ষে নীরজার ঈর্ষার ইন্ধন থেকেই যেন ছাই-চাপা আগুনের মতো আদিত্যের মনে চাপা-পড়া ভালোবাসার সত্যটি প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এই ভালোবাসার ইতিহাস আদিত্যের বিবাহপূর্ব জীবনের গভীরে;

তার বাল্যসহচরী দূর সম্পর্কের আত্মীয়া সরলার সঙ্গে একই বাড়ীতে একই শিক্ষায় মানুষ হয়েছে সে। তাদের মধ্যে একটি সহজ-সরল আন্তরিক সম্পর্ক থাকলেও একে ভালোবাসা বলে আদিত্য বুঝতে পারিনি। নাড়া খেয়ে ভেতর থেকে সেই ভাবনাটি জেগে ওঠার পর আদিত্য সরলার স্বেচ্ছায় অবিবাহিত থাকবার কারণটিও উপলব্ধি করেছে। আত্মআবিষ্কার ও আত্মোপলব্ধির পর আদিত্য দৃঢ়মনে সত্য প্রতিষ্ঠায় তার সংকল্প স্থির করেছে। নীরজার প্রতি দশবছরের যে আদর্শ স্বামীত্ব আদিত্য পালন করে গেছেন সেখানে কোনো খাদ ছিল না। আবার সরলার প্রতি তার প্রেমানুভবের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসরণেও সে কোনো বাধা মানতে রাজি নয়। ''আদিত্য সরলার দুই হাত চেপে ধরে বললে - ভালোবাসি তোমাকে, একথা, এত সহজ করে সত্য করে বলতে পারছি এতে আমার বুক ভরে উঠেছে। ... আমি বলছি একে চাপা দিতে গেলে সে হবে ভীরুতা, সে হবে অধর্ম।'' আদিত্যের এমন বলিষ্ঠ প্রত্যয় তাকে চপলমতি মহেন্দ্র এবং লঘুচিত্ত শশাঙ্কর চেয়ে গভীর রেখায় মুদ্রিত করে। পূর্বতন একটি সম্পর্কের ইতিহাস-সূত্র আদিত্যকে হীনতা ও দুর্বলতা থেকে রক্ষা করেছে।

তবে আদিত্যকে নিয়ে সমালোচকমহলে যে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি, তা নয়। প্রথমত মৃত্যুপথযাত্রিণী নীরজা সব কিছু জেনেও নিতান্ত নিরুপায় হয়ে বারে বারে তার স্বামীকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করে। তার জিজ্ঞাসা হ'ল, তার মৃত্যুর পর সে কোনোবাবেই কি তার স্বামীর জীবনে বা বাগানে থাকতে পারবে না? আদিত্য এই প্রশ্নের উত্তরে নীরজাকে কোনো স্তোক দেয়নি। ''যমের দরজায় ওপারের জগৎ তার কাছে অজানা।''---স্পষ্ট করেই এই কথাটি শুনিয়ে সব খোয়ানো নীরজাকে সে আরও হতাশা ও শূন্যতার আঁধারে এগিয়ে দিয়েছে। এতে আদিত্যের সততা প্রমাণিত হলেও তার মমত্ব ও মানবতাবোধ প্রকাশ পায়নি। এছাড়া সরলার প্রতি তার মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ার পর সরলা তাকে স্ত্রীর প্রতি তার আনুগত্য প্রকাশে তাকে অটল থাকতে বলেছে। তখন আদিত্য যে শর্তটি করেছে, তাতে আদিত্যের মানবিক বোধ সম্পর্কে মনে প্রশ্ন জাগে। নীরজার স্বামী হিসেবে তার কর্তব্যবোধ এবং সরলার প্রেমিক হিসেবে তার নবজাগ্রত হৃদয়বোধের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চিত্র উপন্যাসে স্থান পায়নি। আদিত্যকে যতখানি কর্তব্যপরায়ণ ও নীতিনিষ্ঠ হিসেবে প্রথমাবধি দেখা যায়, পরবর্তী জটিল আবহে তাকে সেইভাবে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে দেখা যায়নি। বরং সরলার 'দিদির জীবনান্তকালের শেষ কটা দিন দাও তোমার দাক্ষিণ্যে পূর্ণ করে...'' এই অনুরোধ মানার বদলে আদিত্য যখন তাকে দিয়েও একটি প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিতে চেয়েছে - ''তুমি যা বলছ তা শুনব এবং সেটা বিনা ত্রুটিতে পালন করা সম্ভব হবে যদি নিশ্চিন্ত জানি একদিন তুমি পূর্ণ করবে আমার শূন্যতা।...'' অর্থাৎ নীরজার মৃত্যুর পর সরলা আসবে আদিত্যের জীবনে- এই আশ্বাস পেলে তবেই সে নীরজার মৃত্যুশয্যার পাশে মরমী স্বামীর ভূমিকায় 'অভিনয়' করবে। এতে আর যাই হোক, আদিত্যের বিবেকপ্রাণ নীতিনিষ্ঠ ভাবমূর্তিটি অক্ষুণ্ণ থাকেনি। অথচ এই অবস্থায় দ্বিধাদীর্ণ আদিত্যের মানসংকট প্রতিফলিত হলে চরিত্রসৃষ্টির উৎকর্ষ প্রমাণিত হতো। বরং তাকে আবেগাপ্লুত নিষ্ঠুর নিয়ন্ত্রণহীন মানুষ বলেই মনে হয়েছে - অন্তত এই পর্বে এসে। আর এইখানেই আদিত্য-চরিত্রটির সাফল্যের অন্তরায় ঘটেছে বলা চলে।

৪.৪.১৪.৩ : সরলা চরিত্র

সরলা রবীন্দ্রনাথের কবিমানসীর ধাঁচে অনেকখানি গড়া। পূর্ববতী উপন্যাসগুলিতে আমরা যেমন হেমনলিনী -সুচরিতা-কুমুকে পেয়েছি - তারই উত্তরসূরী সরলা। সরলা জ্যাঠামশায়ের গৃহে ললিত। তাঁর সুশিক্ষা সে যেমন পেয়েছে, তেমনি মাতৃস্থানীয়া কোনও নারীর স্নেহলালান থেকে সে থেকেছে বঞ্চিত। যাঁরা সুশিক্ষা সে যেমন পেয়েছে, তেমনি মাতৃস্থানীয়া কোনও নারীর স্নেহলালন থেকে সে থেকেছে বঞ্চিত। যার ফলে তার স্বভাবের মধ্যে স্থৈর্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণ সহজেই গড়ে উঠেছে। এই স্বল্পভাষী মেয়েটির বুদ্ধিমত্তা ও ঔচিত্যবোধ এমনই সহজাত যে, আলাদা করে তা নজরে পড়েনি এমন কি আদিত্যেরও। অথচ আদিত্য বিবাহিত জীবনে দশ বছর ধরে সুখী

দাম্পত্যের মধ্যে থেকেই সরলার ওপরে অনায়াস দাবি এবং স্বচ্ছন্দ নির্ভরতা রেখে দিয়েছে। সরলাকে পাত্রস্ত করার কথা জ্যাঠামশায় ভাবেননি।। কেননা তাঁর পুত্রসন্তান প্রবাসী। তাঁক প্রিয় সন্তান তাঁর বাগান। সেই বাগানের প্রতি এতটাই তিনি অন্ধ মোহগ্রস্ত সে সরলার ভবিষ্যৎ না দেখে বাগানের ভবিষ্যতের দায় রেখে গেলেন সরলার ওপরে। আদিত্য সে সরলাকে ভালোবাসে, তা নিজে সে বুঝতেই পারেনি কোনোদিন। অথচ কতো সাবলীলভাবে স্ত্রীর অসুস্থতার পরিচর্যা ও বাগানের তত্ত্বাবধানের কাজে সরলাকে ডেকে পাঠিয়েছে সে। এই সমস্ত বিষয় নিরীক্ষা করলে মনে হয়, বুদ্ধিমতী গুণসম্পন্না সৎস্বভাব কোমল ও শ্রীময়ী এই মেয়েটি প্রথমাবধি শুধু ব্যবহৃত হয়েছে। নিরুচ্চারভাবে সে নীরজার র্ভৎসনা ও অন্যায় দোষারোপ মেনে নিয়েছে।

অথচ সরলার মধ্যে ব্যক্তিত্বের এবং আত্মনির্ভরতার যে অভিজ্ঞান লেখক ছুঁইয়ে দিয়েছেন, সেখান থেকেই নীরজার পাশে তার স্বকীয়তার দীপ্তি আমাদের 'বৌদ্ধিক কৌতুহল' কে আকৃষ্ট করে রাখে। নীরজার অস্তিত্ব সবটুকুই তার স্বামীর ওপরে নির্ভরশীল। স্বামীকে হারানো অর্থ তার সার্বিক বিনষ্টি। কিন্তু সরলার স্বচেতনা তাকে স্বক্ষেত্রের সন্ধান দিতে পারে। ঘটনাবর্তে পড়ে আদিত্যের প্রতি তার ভালোবাসার কথা যখন প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন সরলা তা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়নি। আবার সংসার ও সমাজকে মূল্য দিয়ে নিজের কর্তব্য স্থির করেছেন। আদিত্যকে বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে গেছে। রমেনের সঙ্গে সরলার সাবলীল বন্ধুত্ব নতুন যুগের মানসস্বাচ্ছ্যন্দকে সংকেতিত করে। স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে সংস্কারবাহিত জড়তা সরলার ঋজু মানসিকতাকে স্পর্শ করতে পারেনি। রমেনের সহায়তা নিয়ে জেলবাসের সুযোগ গ্রহণ- আদিত্য নীরজার সংস্পর্শ থেকে মুক্ত হবার উপায়মাত্র। সরলার কারাবাস এবং আকস্মিক মুক্তি খানিকটা আরোপিত বলে মনে হলেও একেবারে অসম্ভব নয়। সর্বোপরি বলা যায়, একাধারে 'রোমান্টিক' ও বিচক্ষণ, আশ্রয়হীনা হয়েও অপরকে মানসিক আশ্রয়দানের শক্তিসম্পন্না, সহনশীল ও ব্যক্তিত্বময়ী সরলা চরিত্রটি রবীন্দ্রসৃষ্টির ইতিহাসে অনন্য চরিত্রসৃজন।

৪.৪.১৪.৪ : রমেন ও অন্যান্য চরিত্র

'মালঞ্চ' উপন্যাসে মূল চরিত্র তিনটি — আদিত্য, নীরজা-সরলা। লেখকের মনোযোগ এবং পরিকল্পনা এদের যতখানি নিয়ন্ত্রণ করেছে — অন্যান্য চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে তা নয়। কার্যত মূল চরিত্রস্ফুটনে রমেন, সংযোগরক্ষায় রোশ্‌নি- আয়া বা হলধর মালী এই তিনটি চরিত্রের সৃষ্টি।

রমেন আদিত্যের সম্পর্কিত ভাই। আদিত্যের ও নীরজার যুগল সংসারে অন্য কোনো আত্মীয়-বন্ধুর স্পষ্ট ও অন্তরঙ্গ ভূমিকার পরিচয় উপন্যাসে নেই। পূর্বাবিবৃতি থেকে সরলার কথা আছে, রমেনের তাও নেই। কিন্তু যে-মুহূর্তে ত্রিভুজ-সংকট ঘনিয়ে উঠেছে, উপন্যাসে তখন থেকেই রমেনের গুরুত্ব। প্রধান তিনটি চরিত্রই নির্দ্বিধায় তাদের সমস্যা ও সংকট রমেনের কাছে ব্যক্ত করেছে। রমেনও নিজেকে অসম্পৃক্ত রেখে অনেকটা যাত্রার বিবেকের মতো ভূমিকা নিয়েছে। ফলত অসহায় হৃদয়াভারাতুর নীরজা রমেনকে অনুরোধ করেছে তাকে পথ দেখাবার জন্য। রমেন যখন নীরজার পথ ও পাথেয় সহজ করে দয়ে, তখন তার মধ্যে যেন রবীন্দ্রজীবনদর্শনকেই রূপ পেতে দেখি — ''বউদি, একটা কথা বলি শোনো। যতক্ষণ মনে করবে তোমার ধন কেউ কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ বুকের পাঁজর জ্বলবে আগুনে। পাবে না শান্তি। কিন্তু স্থির হয়ে বসে বলো দেখি একবার —'দিলেম আমি। সকলের চেয়ে যা দূর্মুল্য তাই দিলেন তাঁকে যাঁকে সকলের চেয়ে ভালোবাসি' - সব ভার যাবে এক মূহূর্তে নেমে। মন ভরে উঠবে আনন্দে। গুরুকে দরকার নেই; এখনই বলো - 'দিলেম দিলেম, কিছুই হাতে রাখলেম না, আমার সব-কিছুই দিলেম, নির্মুক্ত হয়ে নির্মল হয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেম, কোনো দুঃখের গ্রন্থি জড়িয়ে রেখে গেলেম না সংসারে'।''

রমেন আদিত্যকে সুস্থিত হতে পরামর্শ দিয়েছে - ভারসাম্য রক্ষা করে হৃদয় আর কর্তব্যবুদ্ধির সংস্থান করে নেবার রাস্তা বলেছে; সরলাকে রমেনই সত্য প্রেমনিষ্ঠার সততায় আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। আবার বাস্তব সংঘাত এড়াতে জেলবাসের উপায়ও বার করেছে তার জন্য।

এই সব ক্রিয়াশীলতার দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও রমেন চরিত্র আমাদের মনে দাগ কাটে না তেমন করে। তার অন্যতম কারণ নিশ্চয়ই এই যে সহমর্মী অবস্থানে থাকা আর ব্যক্তিগত আশ্লেষ-সংশ্লেষে জড়িত হওয়া এক কথা নয়। রমেনের ব্যক্তিক আবেগস্পর্শ উপন্যাসে নেই বললেই চলে। তাই সে সম্পূর্ণ একরক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি।

রোশ্‌নি ও হলামালী চরিত্র দুটির প্রয়োজনসীমা রক্ষা করেই লেখক তাদের উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। রোশ্‌নি নীরজাকে মানুষ করেছে, সে তার বাপের বাড়ি থেকে আসা আয়া। কিন্তু বিবাহের আগের নীরজার প্রত্যাশিত কোনও ভূমিকাই রোশ্‌নির মাধ্যমে প্রকাশ পায়নি। সরলা-সম্পর্কিত যা কিছু চিন্তা ঈর্ষা-সংশয়-বিদ্বেষ সবই নীরজা রোশ্‌নিকে নিঃকুণ্ঠভাবে বলতে পারে। আবার তার কাছেই নিজের নীচতা-হীনমন্যতার স্বীকারোক্তিও করে — যদিও জানে রোশ্‌নি মানসিক স্তরে তার সমমানের নয়। এ যেন জড় পদার্থের কাছে মাথা ঠোকা। রোশ্‌নি শুধু মমতা দিয়ে নীরজার শারীরিক বেদনা ও মানসিক যাতনাটুকু বোঝে। হলামালী স্বার্থপর লোভী ও মতলবী চরিত্র। সরলা ও নীরজার দ্বন্দ্ব সে নিজের মতো করে বুঝে নিয়েছে। এরই ফয়দা সে ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করতে ছাড়ে না। মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা স্বল্পরেখায় মুক্তি পেয়েছে এমন ক্ষুদ্র চরিত্রসৃষ্টিতে।

৪.৪.১৪.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

1 ò›yœMþvþ5™Ä)öiC¢îûõ˜y î#ó%þ5ûöi îû›öiÄè þ5™Ä)!¢öi„þû„þ5›˜ßþ´²ì„þŸ öiþ5™ëöiŠé“þöiœöi.y

2 vþ5™Ä)öiC¢˜#îûy %þ5ûû!Ýþ„þÝþ!î!ŸÜT“þxyöiey%þ5y „þöiîyû

3 vþ5™Ä)öiC¢îû›%Äç öi†ï’ %þ5ûû=Þe îûC¢%þ5ï˜Ä)¢„þöiîyû

৪.৪.১৪.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা	—	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
২। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর	—	সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩। রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য	—	বুদ্ধদেব বসু
৪। কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ	—	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
৫। রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক (৩য় খণ্ড)	—	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
৬। রবীন্দ্রনাথ	—	সুবোধ সেনগুপ্ত
৭। রবীন্দ্রমনন	—	রথীন্দ্রনাথ রায়
৮। রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন	—	অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়
৯। রবীন্দ্র উপন্যাস-সমীক্ষা	—	সত্যব্রত দে
১০। রবীন্দ্র উপন্যাস নির্মাণ শিল্প	—	গোপিকানাথ রায়চৌধুরী।

পর্যায় গ্রন্থ - ৪
একক - ১৫
মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস

বিন্যাস ক্রম :

৪.৪.১৫.১ : 'মালঞ্চ' কি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস

৪.৪.১৫.২ : 'মালঞ্চ' কি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলা যায় কিনা

৪.৪.১৫.৩ : 'মালঞ্চ' উপন্যাসের নাট্যধর্ম

৪.৪.১৫.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.৪.১৫.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪.৪.১৫.১ : 'মালঞ্চ' কি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস

রবীন্দ্র উপন্যাসমালায় শেষ পর্বে চয়িত কুসুমগুলির মধ্যে 'মালঞ্চ' পড়ে। প্রায় সমকালে রচিত 'দুই বোন' এবং এ-দুটি উপন্যাসের আগের রচনা 'শেষের কবিতা' আর প্রায় সমসাময়িক 'চার অধ্যায়' - সব কটি লেখাই পরিসরে বৃহৎ নয়। মানবমনের বিচিত্র বৃত্তিগুলিকে নিয়ে বহু চরিত্রের ও আখ্যানের শাখাপ্রশাখার সমাবেশ ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ চোখের বালি, নৌকাডুবি, গোরা, ঘরে বাইরে বা যোগাযোগের মত বৃহদায়তন উপন্যাস ইতিপূর্বে রচনা করেছেন। তুলনামূলক দৃষ্টিতে লক্ষ্য না করে তাঁর শেষ পর্বের একখানি ক্ষুদ্রায়তন উপন্যাস মালঞ্চ সম্পর্কে আমরা নিরপেক্ষ বিচার করতে পারি।

'মালঞ্চ' উপন্যাসের মূল সমস্যা নীরজার। স্বামীর পূর্বপরিচিতাকে নিজের অস্তিত্বের প্রতিস্পর্ধী শক্তিশালী ভূমিকায় আবিষ্কার করে নীরজা ঈর্ষাতুর হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে তার ঈর্ষার ইন্ধনে সে নিজে যেমন পুড়ে ছাই হয়েছে, তেমনিই তার পরিপার্শ্বও ঝল্‌সে গেছে। অসুস্থ নীরজা মৃত্যুকে শিয়রে নিয়েও কোনও প্রশান্ত উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। এই মানবিক পরাজয়ের তীব্র দহনময় চিত্র রবীন্দ্রনাথ যে বাস্তবাতাবোধ থেকে উপহার দিয়েছেন, রবীন্দ্রসাহিত্য তার দৃষ্টান্ত বিরল।

'মালঞ্চ' এর মূল বক্তব্য উপন্যাসের গঠনের দিক থেকে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য। অপ্রতুল হলেও চরিত্রসংখ্যা তাদের বৈচিত্র দিয়ে উপন্যাসের দাবি পূরণ করতে সমর্থ। কিন্তু উপন্যাসটির একমাত্র অতৃপ্তির জায়গা তার বিন্যাস তথা উপস্থাপনা কৌশলে। স্পষ্ট কথায় - অতি দ্রুত, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে উপন্যাসটিকে শুরু করা হয়েছে, পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অসুস্থ নীরজা রোগশয্যায় - এই বর্ণনার সূত্রে তার অতীত-বর্তমান লেখক নিজের বিবৃতি থেকেই তুলে ধরেছেন। ফলে উপন্যাসে প্রত্যাশি ব্যাপক-বিস্তৃত পটভূমিতে আমরা প্লটটিকে সঞ্জীবিত হয়ে উঠতে দেখি না। নীরজার প্রাক্-বিবাহ জীবনে একেবারেই অব্যক্ত, বিবাহিত জীবনের কেটে-যাওয়া দশ বছরও নেপথ্যে থেকে গেছে। ঠিক তেমনি করেই সরলা-আদিত্যর বাল্য-কৈশোর সম্পর্কে পরস্পরের সংক্ষিপ্ত সংলাপের মধ্যে থেকে পাঠককে জানতে হয়। অথচ এই সময়ে উভয়ের সম্পর্কের একটা বিশ্বাস দলিল উপন্যাসের মূল দ্বন্দ্ব-জটিলতার প্রেক্ষিতরূপে পাঠকের জ্ঞাত থাকা নিতান্ত জরুরী ছিল। ঘটনাকে উপন্যাসোচিতভাবে ধীরে ধীরে পল্লবিত করার পরিবর্তে আদিত্যর মানস পরিবর্তনের সূত্রগুলি বাদ দিয়েই তাকে সরলার প্রণয়ী রূপে আত্মপ্রকাশ

করতে দেখি। তেমনই দ্রুততায় সরলাকে কারাবাসে পাঠিয়ে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে। লেখকের সমকালীন মানসিক অবস্থানই এর কারণ। উপন্যাসের উপযুক্ত প্লট ও চরিত্রসৃষ্টি সত্ত্বেও দ্রুততা ও অতিসংক্ষেপণের কারণে 'মালঞ্চ' অভিহিত হয়ে থাকে ছোট উপন্যাস বলে।

৪.৪.১৫.২ : 'মালঞ্চ' কি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলা যায় কিনা

আধুনিক কালের সৃষ্টি উপন্যাস স্বভাবতই যুগলক্ষণাক্রান্ত। সমকালীন জটিলতাপূর্ণ জীবন উপন্যাসের আঙ্গিকে বিচিত্র রঙে-রসে রূপায়িত হয়েছে। মানবমনের গহনচারণায় সব উপন্যাসেই কমবেশি আলোকপাত ঘটে থাকে। তাই কোনও উপন্যাসকে বিশেষভাবে মনস্তাত্ত্বিকতার গুণসম্পন্ন বলা সঙ্গত কিনা এ প্রশ্ন উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে মূল প্রস্তাবের পক্ষে এই যুক্তি হয়তো খাটে যে অন্যান্য সাধারণ উপন্যাসের তুলনায় যেসব উপন্যাসে বাস্তব ঘটনাসংঘাতের চেয়ে মনের রহস্যময় অভিচারণা লেখকের কাছে অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে; কিম্বা মনোলোকের অতলস্পর্শ অনুভূতি বা অভিপ্রায় যেখানে প্রাধান্য পায়, উপন্যাসের অগ্রগতি - ক্রমবিকাশ তারই প্রভাবে পরিচালিত হয়, - মূলত সেই মনোজীবন নিয়ন্ত্রিত উপন্যাসকে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলা যেতে পারে।

'মালঞ্চ' উপন্যাস রচনার অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথ 'মনের সংসারের কারখানা ঘরে' অবতীর্ণ হবার কথা শুনিয়ে রেখেছিলেন। চোখের বালি, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ, যোগাযোগ বা দুই বোন মসস্তত্ত্ববিশারদ হিসেবে তাঁর সাফল্যকেই প্রমাণিত করে।

ব্যক্তিজীবনে রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীসমেত বহু প্রিয়জনের মৃত্যুর করুণ সাক্ষী হয়ে থেকেছেন। একজনকে তার জ্ঞাতসারে চিরকালের মতো পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে একথা জানলে তার মানসিক প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, তার স্রষ্টা ভালো করেই বুঝতে পারতেন। 'মালঞ্চ'-এর নীরজার মনে এই বোধ শূন্যতার বেদনা বহন করে এনেছিল। কিন্তু যখন সে বুঝেছে সে তার শূন্যস্থানটি অচিরেই ভরাট করতে অন্য এক নারী প্রস্তুত, তখন তার নিঃস্বতার যন্ত্রণা তার মনের রাজ্যে ঝড় তুলে দিল। এতে তার নিজের যেমন অস্বস্তি ও অসুস্থতা বেড়ে গেল, তেমনই তার পরিজনেরাও বিভ্রান্তির আঁধারে পথ হারাল। বিশেষত তার স্বামী আদিত্য। নীরজার মনে ঘনিয়ে ওঠা ঈর্ষা উপন্যাসের মূল সঙ্কট বা সমস্যার বীজ উপ্ত করেছে। পূর্বপরিচিতা সরলা সম্পর্কে আদিত্য নতুন করে অন্য এক ভাবানুভূতি থেকে মূল্যায়ন করেছে। দশ বছরের বিবাহিত স্ত্রী নয়, সরলাই যে তার প্রকৃত ভালোবাসার পাত্রী, নীরজাই তার এই সত্যকে চিনিয়ে দিয়েছে। এতদিনে আদিত্য বুঝেছে, তারই জন্য সরলা অন্যপাত্রে বিবাহ রাজি হয়নি। এরপর স্বামীর প্রতি আর তার বাগানের প্রতি আত্যন্তিক অধিকার হারাতে বসে নীরজার মনের স্থিতি টলে গেছে। দেবর রমেনের শত চেষ্টাতেও সে প্রশান্তমনে সরলাকে সব কিছু দান করে যেতে পারেনি। তার মনের চেতন-অর্ধচেতন অবচেতন স্তরগুলি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবেই বর্ণিত হয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে তার পক্ষে অসম্ভব এক সংকল্প যখন সে গ্রহণ করছে— 'জ্ঞানে অজ্ঞানে জড়িত বিহ্বল মুখ' তার। এবং শেষ দৃশ্যে সরলাকে দেখে তার বিকারগ্রস্ত মনের আক্ষেপ, তীব্র স্নায়বিক চাপে মৃত্যু কোলে এলিয়ে পড়া সবটুকুই মনোবিজ্ঞানীর পর্যালোচনার বিষয় হবার মতো। অন্যদিকে আদিত্যের আত্মাবিষ্কার এবং 'তেইশ বছর যা ছিল কুঁড়িতে, আজ দৈবের কৃপায় তা ফুটে উঠেছে' — এই পুলকিত বিস্ময়ের আবেগ, সরলার সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগব্রত সাধনা, অথচ উন্মোচিত সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া বা অস্বীকার না করার দৃঢ়তা - সমস্ত দিক থেকে প্রতিটি চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ উপন্যাসে যুক্তিসঙ্গতভাবে উপস্থিত। অন্যান্য চরিত্র - রমেন, আয়া রোশ্‌নি বা হলামালী — এরা সকলেই মূল চরিত্রের মানসলোকে উদঘাটনে কোনো না কোনোভাবে সহায়তা করেছে।

তাই, পরিণত অভিজ্ঞতা নিয়ে স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ 'মালঞ্চ' উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক জগতের রহস্যময় দিকগুলির অন্বেষণ ও রূপায়ণে আগ্রহী হয়েছিলেন এমনই মনে হয়।

৪.৪.১৫.৩ : 'মালঞ্চ' উপন্যাসের নাট্যধর্ম

কোনও উপন্যাসের সম্পর্কে তার নাট্যধর্মিতার কথা উঠলে তা অনেকটা 'সোনার পাথরবাটি'র মতো শোনাতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে তাত্ত্বিকদের সিদ্ধান্ত আমাদের স্মরণে রাখা জরুরী। তা হলো, উপন্যাস সর্বরসসিদ্ধ। ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে কাব্য ও নাট্যধর্মকেও সে প্রয়োজন অনুসারে অক্লেশে গ্রহণ ও ধারণ করতে পারে।

নাটক রচনায় সংলাপনির্ভরতা, দৃশ্যসংস্থানগত উপস্থাপনা, অধিক পাত্রপাত্রীর স্থলে স্বল্পসংখ্যক চরিত্রের অবতারণা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে নাট্যকারকে সতর্ক থাকতে হয়। উপন্যাসিকের জন্য এগুলি তেমন জরুরী নয়। 'মালঞ্চ' উপন্যাসের ক্ষুদ্রায়তনে চরিত্র সংখ্যা নিতান্তই অঙ্গুলিমেয়। বর্ণনার তুলনায় লেখক বেশি ব্যবহার করেছেন সংলাপ। নীরজার স্মৃতিচারণা ছাড়া আর সমস্ত সংলাপই ছোট, নাট্যোপযোগী। নাটকে যেমন সমস্যার উপস্থাপনা, তার জটিলতার তীব্র থেকে তীব্রতর রূপগ্রহণ এবং শেষে ভাবমোক্ষণে পরিণতি— মালঞ্চের আদি-মধ্য অন্ত সমন্বিত প্লটে এই সমস্ত দিকগুলিরই পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসের বিবৃতিধর্মিতার স্থানে অতি সংক্ষেপিতকরণের একটি প্রবণতা যেন কিছুটা নাট্যধর্মকে আশ্রয় করেছে বলে সমালোচকদের মনে হয়েছে। আবার একটি দৃশ্যকে যেভাবে নাট্যকার উপস্থিত করেন দর্শকের সামনে, তেমনি অনুপুঙ্খ দিয়ে মঞ্চদৃশ্যই যেন সজ্জিত হয়ে উঠে এসেছে এই উপন্যাসের পাঠকের সামনে। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের উল্লেখ করা যেতে পারে। নীরজার আত্মদ্বন্দ্ব এবং অন্তর্দাহ যথার্থই নাট্যদ্বন্দ্বের উপযোগী। সে-তুলনায় আদিত্যের দ্বন্দ্বপ্রকাশে লেখক যত্নবান হয়েছেন কম। মূল চরিত্র হিসেবে নীরজা যতখানি সার্থক, তার অনেকটাই এই কারণে যে, সে নাট্যিক দ্বন্দ্বময়তা দ্বারা একটি বাস্তব চরিত্রসৃষ্টি হয়ে উঠতে পেরেছে। ঐক্য ও সংহতি উপন্যাসটিকে অনেক শৈথিল্য থেকে রক্ষা করেছেন ঠিকই, তবে উপন্যাস পাঠকের প্রত্যাশা একই কারণে কোথাও কোথাও অপূর্ণ তেকে গেছে। উপন্যাসের শেষ অংশটিকে নাটকের শেষ দৃশ্য বলা যেন অধিক সঙ্গত বলে মনে হয়। নীরজার মৃত্যুদৃশ্যের কঠোরতা মনে পড়ায় 'মালিনী' নাটকের হত্যাদৃশ্যের নিষ্ঠুরতা। সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে নীরজার জীবন্ত মুহূর্তটির তুল্য দৃশ্য কমই আছে। এতে নাটকীয় চমক থাকলেও তা কার্য-কারণসূত্রের বাইরে থেকে আরোপিত হয়নি।

আর একটি প্রাসঙ্গিক তথ্যের উল্লেখ এই আলোচনায় প্রয়োজনীয়। তা হলো, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'মালঞ্চ' উপন্যাসটিকে এক সময় নাটকে রূপান্তরিত করেছিলেন। বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলী (১৯৭৩) র দ্বাদশ খণ্ডে উল্লেখিত আছে যে, ''সম্পূর্ণ নাটক পাণ্ডুলিপি আকারে রবীন্দ্র ভবনে রক্ষিত ছিল, বর্তমানে (অগ্রহায়ণ ১৩৭৫) বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে।'' (পৃ.৬০৯) 'মালঞ্চ' উপন্যাসের নাট্য সম্ভাবনা স্বয়ং স্রষ্টা কর্তৃকই যে উপলব্ধ ছিল তার প্রমাণ তাঁর স্বহস্তরচিত এই উপন্যাসের নাট্যরূপান্তর।

৪.৪.১৫.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

1 ò›yœMþv ìþ™Ä¡öì¢îû%þìû=þe îû›ö•Ä²ì¸þŸ"þöe…öì¸þû›˜ßþì îû¢)' ÷Ÿ Ò„þ',Ü¦ þ îûþ™!î%þû
”yç

2 ò›yœMþöì¸þ›˜ßþ! ´„þvþ™Ä¢ îœy ëyë œœ!î%þû¸þìÿû

৪.৪.১৫.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর — সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য — বুদ্ধদেব বসু

৪। কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

৫। রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক (৩য় খণ্ড) — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

৬। রবীন্দ্রনাথ — সুবোধ সেনগুপ্ত

৭। রবীন্দ্রমনন — রথীন্দ্রনাথ রায়

৮। রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন — অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

৯। রবীন্দ্র উপন্যাস-সমীক্ষা — সত্যব্রত দে

১০। রবীন্দ্র উপন্যাস নির্মাণ শিল্প — গোপিকানাথ রায়চৌধুরী।

পর্যায় গ্রন্থ - ৪
একক - ১৬
নামকরণ

বিন্যাস ক্রম :

৪.৪.১৬.১ : 'মালঞ্চ' উপন্যাসের নামকরণ

৪.৪.১৬.২ : 'মালঞ্চ' উপন্যাসের পরিণাম কতটা স্বাভাবিক

৪.৪.১৬.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.৪.১৬.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৪.৪.১৬.১ : 'মালঞ্চ' উপন্যাসের নামকরণ

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের ইতিহাস থেকে তাঁর জীবনে বেশ কয়েকটি ফুলবাগানের প্রভাব সম্পর্কে জানা যায়। তার মধ্যে বউ ঠাকরুণের সৃষ্টি ছাদের বাগান যেমন আছে, তেমনি আছে পেনেটির ছাতুবাবুদের বাগান, মেজদাদার কাছে বেড়াতে গিয়ে দেখা আমেদাবাদের শাহীবাগ, চন্দননগরের মোরান সাহেবের বকুলবীথিকা, গাজীপুরের গোলাপ বাগিচা থেকে শিলাইদহের কুঠিবাড়ির বাগান, বোম্বাইয়ের অন্না তড়খড়ের বাড়ির বাগিচা, বিদেশের বিভিন্ন বাগানের কথা। তেমনই রবীন্দ্রসাহিত্যে অজস্র ফুল- দেশ-বিদেশি সম্ভার থেকে অনায়াসে এসে জায়গা নিয়ে সৌন্দর্যবর্ধন করেছে।

'মালঞ্চ' শব্দের মানে বাগান-মূলত ফুলবাগান। নায়ক আদিত্যের মালঞ্চ তার জীবন ও জীবিকার কেন্দ্রস্থল। তেমনই উপন্যাসের প্রেক্ষিত রচনায় মালঞ্চের ঘনিষ্ঠ ও তাৎপর্যপূর্ণ অবস্থান। ''উপন্যাসটির পরতে পরতে সুগন্ধি পুষ্পের সৌরভ, শ্রীময়ী উদ্ভিদের বর্ণচ্ছটা এবং চারুপর্ণী উদ্ভিদের চিত্রপট অনুপম সুষমায় মণ্ডিত। ফুলের বর্ণে গন্ধে, বক্ষঃস্পন্দনে মদির আবেগে আদিত্য ও নীরজার প্রেম বিকশিত, নিয়মিত ও ঘনীভূত হয়েছে। নীরজার সযত্নলালিত কুসুমোদ্যান সেই প্রেমের প্রতীকী নিদর্শন''।

সংসারজীবনে প্রবেশ করার আগে আদিত্য তার মেসোমশায়ের কাছ থেকে বাগানের কাজে শিক্ষানবিশী করে দক্ষ হয়েছে। মেসোমশায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী সরলাও ছিল তার সহশিক্ষার্থী। বিবাহের পরদিন থেকেই স্ত্রী নীরজা স্বামীর অনুরাগের স্থান মালঞ্চকে আপন করেছে। নীরজার জীবনসংশয় রোগে বাগান ও সংসার বাঁচাতে সরলাকে আনিয়ে নিয়েছে আদিত্য। এখানেই দেখা গেছে মৃত্যুশয্যাশ্রয়ী নীরজার ঈর্ষা-বিকার। বাগানের প্রসঙ্গে বারবার এসেছে অকির্ডের কথা। এই পরজীবী উদ্ভিদের বিষয়টি লেখক প্রতীকের মত ব্যবহার করেছেন। বিয়ের দশ বছর পর নীরজা বুঝি বুঝতে পারছে তার অস্তিত্ব আজ শুধু পরনির্ভর হয়ে উঠেছে তাই নয়, কোনোকালেই সে স্বমহিমায় তার বাগান ও সংসারে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। তাই প্রতিদ্বন্দ্বিনী সরলার বিরুদ্ধে স্বামীপ্রেম ও স্বহস্তরচিত ফুল-ফল-সব্জি বাগিচার ওপরে নিঃসপত্ন্য অধিকার অক্ষুন্নরাখার জন্য তার মর্মান্তিক প্রয়াস। কাহিনির 'পরিণতিতে যদিও নারী-হৃদয়েরএকটি বিশিষ্ট বৃত্তির প্রকাশই মুখ্য' কিন্তু মালঞ্চের প্রভাব এই উপন্যাসে সর্বাতিশায়ী হয়ে রয়েছে। উপন্যাসের মধ্যে লেখক এক স্নিগ্ধ কাব্যময়তার আবেগ কবিজনোচিতভাবেই সৃষ্টি করেছেন। মালঞ্চের বিচিত্র পত্রপুষ্প সমাবেশের ভেতর থেকে উঠে এসেছে 'প্রখর অন্তর্দাহময়, তীব্র দ্বন্দ্বজর্জর মানসসংকট। বাংলা কথা সাহিত্যের জগতে এর মূল্য অভিনবত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুন্ঠের খাতা'র অবিনাশ চরিত্রটিও তার

বাগানপ্রিয়তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত। 'মালঞ্চ' উপন্যাসে মালঞ্চের সার্বিক অস্তিত্ব এবং ভূমিকার দিক থেকে দেখলে উপন্যাসের নামকরণ যথার্থ হয়েছে বলেই মনে হয়।

৪.৪.১৬.২ : 'মালঞ্চ' উপন্যাসের পরিণাম কতটা স্বাভাবিক

রাবীন্দ্রিক মঙ্গলচেতনা ও শুভদ প্রেরণার পরিপ্রেক্ষিতে 'মালঞ্চ' উপন্যাসের পরিণতিতে মুখ্য চরিত্র নীরজার জীবনান্তকালীন তীব্র ও প্রখর অন্তর্জ্বালাময় অভিব্যক্তি কিছুটা অসঙ্গতিপূর্ণ বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। নীরজার মতো রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট অনেক চরিত্রেরই মৃত্যুপরিণতি দিয়ে লেখা শেষ হয়েছে। ডাকঘর ও বিসর্জন নাটক, মধ্যবর্তিনী বা শেষের রাত্রি গল্পের কথা আমাদের মনে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু এই লেখাগুলির সঙ্গে 'মালঞ্চ' উপন্যাসের কিছুটা গুণগত পার্থক্য রয়েছে।

আদিত্য ও নীরজার মাঝখানে তাদের সুখী দাম্পত্যে কোথাও ফাটল ধরার সম্ভাবনাও দেখা দেয়নি। অন্তত আদিত্যের মনে তো নয়ই। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রিণী যখন সরলার প্রতি আদিত্যের হৃদয়ে লুকোনো ছবির কথা বারে বারে তুলে তাকে বিদ্ধ করতে থাকল, তখন সেই আঘাতের বেদনা থেকে উঠে এল সেই আসল সত্য। আর নীরজা যখন সুস্থ ছিল তখনকার কিছু স্মৃতি ভেসে এলে আদিত্যের মনে —স্পষ্ট মনে পড়ল, ইংরেজি বই খুঁজে খুঁজে নীরজা মুখস্থ করে রাখত অপরিচিত ফুলের উদ্ভট নাম; ভালোমানুষের মতো জিজ্ঞাসা করত সরলাকে, যখন সে ভুল করত, তখন থামতে চাইত না ওর হাসির হিল্লোল; 'ভারি পণ্ডিত, কে না জানে ওর নাম ক্যাসিয়া জাভানিকা। আমার হলামলীও বলতে পারত'। (৪র্থ পরিচ্ছেদ) এর থেকে বোঝা যায় নীরজার ছিল যে-কোনো উপায়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসাবার উগ্র আকাঙ্ক্ষা। সে যতখানি না ভালোমানুষ, তার চেয়ে 'ভালোমানুষের মতো'। নারীর সহজাত প্রজ্ঞায় সে বুঝেছিল আদিত্য ও সরলার অন্তর্লোকে এমন একটা সদৃশতর সমঝোতা আছে যা নিরুচ্চার - কিন্তু যাকে নীরজা কোনদিন ছুঁতে পারবে না। তারপর এমন একসময় এল, যখন নিয়তিপ্রেরিত দুর্ভাগ্যের বোঝা গ্রাস করল তাকে। সরলা না চেয়েও নীরজার স্বামী আর বাগানের দায়দায়িত্ব পেয়ে গেল। নীরজা জানে তাকে যেতে হবে সব ছেড়ে- কিন্তু তার অহংচেতনা তা মেনে নিতে পারে না। তার দেওর রমেন তার মনকে আশ্বস্ত করার পথ বলে দেয়। স্বামীকে একখানি ভলোবাসে বলেই নীরজা স্বামীরই জন্যে নিজের সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়। আমিত্বের অনপনেয় ভারটি থেকে মুক্ত করে নিতে চায় সে নিজেকে মৃত্যুর আগে। প্রথম প্রচেষ্টায় দিতে যায় সরলাকে তার মুক্তার মালা। কিন্তু তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতেই নীরজার দীনতা বেরিয়ে পড়ে- 'আমার হয়ে মালা তুমিই পরে থেকো শেষ দিন পর্যন্ত। বিশেষ বিশেষ দিনে এ মালা কতবার পরেছি সে তোমার দাদা জানেন। তোমার গলায় থাকলে সেই দিনগুলি ওর মনে পড়বে।' এতে নীরজার মহত্ব নয়, তার অন্তরতর মনের জ্বালাই এই দানের মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

এই সমস্ত ধারাবাহিক যুক্তিশৃঙ্খলা মান্য করেই 'মালঞ্চ'-এর উপসংহার রচিত হয়েছে। মৃত্যু আসন্ন বুঝতে পেরে নীরজা সরলার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। 'জ্ঞানে অজ্ঞানে জড়িত বিহ্বল মুখ'। বিড় বিড় করে যেন মন্ত্র জপ করছে —'দেব, দেব দেব, সব দেব'। কিন্তু সরলা ঘরে ঢুকে তাকে 'প্রণাম করবার জন্য পায়ে হাত দিতেই যেন বিদ্যুতের আঘাতে ওর সমস্ত শরীর আক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। পা দ্রুত আপনি গেল সরে। ভাঙা গলায় বলে উঠল, 'পারলুম না, পারলুম না, দিতে পারব না, পারব না।' সরলাকে জায়গা ছেড়ে দিতে পারব নীরজা। এত চেষ্টা এত মানসিক প্রস্তুতি ব্যর্থ করে বেরিয়ে এল মানবাত্মার পরাজয়ের চরম চেহারা। ''হঠাৎ ঢিলে-শেমিজ-পরা পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণমূর্তি বিছানা ছেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। অদ্ভুত গলায় বললে, 'পালা পালা পালা এখনই, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত।' বলেই পড়ে গেল মেঝের উপর।

নিদারুণ নিষ্ঠুরতার কঠিন মর্মদাহী এই রূপ নীরজার আদ্যন্ত চরিত্র লক্ষণের সঙ্গে বেমানান হয়নি। 'ডাকঘর' বা 'শেষের রাত্রি'-র মৃত্যুর বিষাদ কারুণ্যের থেকে অন্যতর এক অভিব্যঞ্জনা নিয়ে মৃত্যু এসেছে 'মালঞ্চ' উপন্যাসের

পরিণামে। এতে মানবতাধর্ম হয়তো জয়ী হয়নি। কিন্তু রক্ষিত হয়েছে বস্তুচেতনাজাত এক প্রখর নির্মম সত্যদর্শন। এই পরিণাম কোনোমতেই অতিনাটকীয় বা মেলোড্রামটিক নয়। রবীন্দ্রমনন ও দর্শনে, তাঁর উপলব্ধিতে নিষ্ঠুর জীবনাভিঘাতের দৃশ্যের স্বল্পতা সম্পর্কে অনেকের অভিযোগ আছে। আদর্শায়িত জীবনানুভব এবং জীবনায়নই শুধু নয়, রবীন্দ্রমানসে সত্যের নিষ্করুণ তীক্ষ্ণ রূপও যে কত সহজভাবে ধরা আছে তার প্রমাণ তাঁর কিছু চিত্রকলায়, সাহিত্যলোকে অবশ্যই 'মালঞ্চ'-উপন্যাসে। তাই এই উপন্যাসের পরিণাম নিয়ে অভিযোগ খাটে না। অভিযোগের উদ্যত অঙ্গুলি একটি দিককেই শুধু নির্দেশ করে। তা হলো উপন্যাসটির কাহিনি বিন্যাসে অতি-সংক্ষিপ্ত। ঘটনাকে জীবন সদৃশ ও প্রত্যয়সিদ্ধ করে তুলতে হলে যে 'ডিটেল্স্' এর একান্ত প্রয়োজন, তার অভাব'।

৪.৪.১৬.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

1 রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বে রচিত উপন্যাস হিসেবে 'মালঞ্চ'-এর গুরুত্ব বিচার করো।

২। আয়তনে ক্ষুদ 'মালঞ্চে'র উপন্যাসধর্ম রক্ষিত হয়েছে কিনা আলোচনা করে দেখাও।

৩। 'মালঞ্চ' উপন্যাসটিকে মনস্তত্ত্বধর্মী উপন্যাস বলার পক্ষে তোমার যুক্তি প্রদর্শন করো।

৪। 'মালঞ্চ' উপন্যাসে নাট্যগুণের সমাবেশ লক্ষিত হয়। — মন্তব্যটি বিশদ করো।

৫। 'মালঞ্চ' উপন্যাসে নীরজা চরিত্রটি রবীন্দ্রসৃষ্ট চরিত্র হিসেবে কোথায় বিশিষ্টতার অধিকারী তা বিশ্লেষণ করো।

৬। 'মালঞ্চ' উপন্যাসের আদিত্য চরিত্রটি পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠতো যদি তার অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপায়ণ থাকতো। — আদিত্য-চরিত্রটি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মন্তব্যের সারবত্তা বুঝিয়ে দাও।

৭। 'মালঞ্চ' - এর সরলা স্বাতন্ত্র্যময়ী, নবযুগের ভাবনায় গড়া। — মন্তব্যটি বিচার করো।

৮। 'মালঞ্চ' উপন্যাসের গৌণ চরিত্রগুলির ভূমিকার গুরুত্ব সম্পর্কে তোমার অভিমত দাও।

৯। 'মালঞ্চ' উপন্যাসের নামকরণ যথাযথ হয়েছে কিনা বিচার করো।

১০। 'মালঞ্চ' উপন্যাসের পরিণাম কি শিল্পসঙ্গত হয়েছে? এ বিষয়ে তোমার অভিমত যুক্তিসহ লিপিবদ্ধ করো।

৪.৪.১৬.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর — সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য — বুদ্ধদেব বসু

৪। কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

৫। রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক (৩য় খণ্ড) — প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

৬। রবীন্দ্রনাথ — সুবোধ সেনগুপ্ত

৭। রবীন্দ্রমনন — রথীন্দ্রনাথ রায়

৮। রবীন্দ্রনাথের মনোদর্শন — অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

৯। রবীন্দ্র উপন্যাস-সমীক্ষা — সত্যব্রত দে

১০। রবীন্দ্র উপন্যাস নির্মাণ শিল্প — গোপিকানাথ রায়চৌধুরী।